সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সময়ের উপহার

দীপ প্রকাশন □ কলকাতা ৭০০ ০০৬

ভূমিকা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয়তম লেখক, তাঁর সম্পর্কে পাঠকের কৌতূহলও সীমাহীন। এই অভিনব সংকলনে রয়েছে সুনীলের দুটি ভ্রমণ-কাহিনি, চারটি চিত্রনাট্য এবং সর্বমোট ৩৪টি সাক্ষাৎকার। ভ্রমণ-কাহিনি দুটির মধ্যে আবার একটির পটভূমি পশ্চিম ইউরোপের তিনটি দেশ, কানাডা ও আমেরিকা, অন্যটির পটভূমি রাশিয়ার চারটি শহর। ফলে স্বাদে ও অভিজ্ঞতায় দুটি কাহিনি একেবারে ভিন্ন ধরনের। চিত্রনাট্যগুলির মধ্যেও নানা ব্যাপ্তি, একটিতে বিষয় হিসাবে এসেছে রাধা-কৃষ্ণ, তো অন্যটিতে নেতাজি। একটিতে মানিক বন্দোপাধ্যায়ের স্মরণীয় 'অহিংস' উপন্যাসটিকে চিত্রনাট্যের আকারে লেখা হয়েছে, তো অপরটি গৌতম ঘোষ পরিচালিত 'দেখা' ছবিটির প্রাথমিক চিত্রনাট্য। সাক্ষাৎকারগুলির মধ্য দিয়েও উঠে এসেছেন এযাবৎ অনাবিষ্কৃত এক বহুবিচিত্র সুনীল। সবমিলিয়ে এক বহুমুখী প্রতিভার বহুমাত্রিক বিচ্ছুরণে সমৃদ্ধ এই সংকলন।

এই গ্রন্থের সূচনাতেই রয়েছে একটি দীর্ঘ ভ্রমণ-কাহিনি 'তিন সমুদ্র সাতাশ নদী'। কাহিনির সূচনা হল্যাণ্ডের আমস্টারডাম শহরে, যেখানে রয়েছে ডাচ শিল্পীদের ভুবন-বিজয়ী বহু ছবি। রেমব্রাঁ, ভারমিয়ের, গোইয়া, মুরিল্লো, ভ্যান ডাইক। এরপরই রয়েছে প্যারিস-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। সেখানে রয়েছে 'মেত্রো' নামের এক ট্রেন, যা মাটির নীচ দিয়ে যায় আর যার দরজা আপনা-আপনিই খুলে যায়, আর সেই ট্রেনের গোটা ব্যবস্থাই নিয়ন্ত্রিত হয় কমপিউটার মারফত। এর কয়েক বছর পরেই কলকাতায় পাতালরেল চালু হয়, সুনীল যার উল্লেখ করেছেন। এরপর রয়েছে লণ্ডন-ভ্রমণের কথা। সেখানে ইমিগ্রেশন কাউন্টারে শ্বেতাঙ্গদের জন্য একরকম ব্যবস্থা, আর কালো বা খয়েরিদের জন্য অন্যরকম। টেমস নদীর ধারে লণ্ডন ব্রিজের অদূরে একইসঙ্গে তৈরি হওয়া নাট্যশালা, শিল্প প্রদর্শনী ভবন, চলচ্চিত্র ও কনসার্ট হল দেখেছেন। পিকাসোর ছবি দেখতে গিয়ে নগ্ন নারীরা তাঁর কাছে মনে হয়েছে নিছকই যৌন অবয়ব। লণ্ডন থেকে আবার প্যারিস হয়ে কানাডা এবং শেষ পর্যন্ত আমেরিকা। রয়েছে চির বসন্তের দেশ ক্যালিফোর্নিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। লস এঞ্জেলিসে গিয়ে হলিউড ও ডিজনিল্যাণ্ড দেখা, প্রশান্ত মহাসাগরের বেলাভূমি ও সূর্যাস্ত দেখা। সান ফ্রান্সিসকো গিয়ে নানা ঐতিহাসিক ঘটনা ও অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয় দেখা।

এরপরই রয়েছে এক ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনার বর্ণনা। নিউ ইয়র্কের খুঁটিনাটি বর্ণনা, আমেরিকার একমাত্র শহর যার সঙ্গে কলকাতার খুব মিল, সেখানে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, স্ট্যাচু অব লিবার্টি দেখা, নাট্য আন্দোলনের কথা, আন্তর্জাতিক সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতা, নিউ জার্সি দেখা। নিউ ইয়র্কে গ্রিক লেখক ইয়র্গো কুরটিস নীলুকে বলেছিলেন, 'আমরা যারা কালো লোক, আমরা কক্ষণো কোনও পার্টির ঠিক মাঝখানে থাকি না, আস্তে আস্তে কোনও না কোনও দেওয়ালের দিকে সরে যাই। তুমি দ্যাখো, সব কালো লোকরাই দেওয়ালের পাশে।... ওরা গ্রিকদের প্রায় কালোর মতনই অবজ্ঞা করে, বুঝলে?' এরপর রয়েছে ওয়াশিংটন ডি সি ও স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউট দেখা। সেখান থেকে

কিছুটা দূরে গিয়ে লুরে ক্যাভার্নের গুহা দেখা। এরপর রয়েছে বস্টন-যাত্রা ও সেখান থেকে আবার নিউ ইয়র্ক ফেরা, নায়েগ্রা-দর্শন, তারপর শিকাগো-যাত্রা, লেক মিশিগান দেখা, তারপর আইওয়া যাওয়া, গিনসবার্গ, পল এঙ্গেল ও মার্গারিটের স্মৃতি। এইভাবে পাঁচ মাস ধরে ইউরোপ, কানাডা ও আমেরিকা ভ্রমণ চলে। সুনীল এক জায়গায় লিখেছেন, 'কোনও ঔপন্যাসিক যখন ভ্রমণ কাহিনি লেখেন, তখন বোঝা যায় তাঁর চিন্তার ব্যাপকতা ও ভাষার ওপর দখল কতখানি।' এই দুইয়েরই পরিচয় সুনীল এই গ্রন্থে দিয়েছেন। এসেছে অজস্র বাঙালি চরিত্র। এক জায়গায় নীললোহিতের সঙ্গে দেখা হয় সুনীল ও স্বাতীর। এত ঘোরার পরও নীললোহিতের দেশের প্রতি টান অম্লান রয়ে যায়। কাহিনির শেষ লাইনটি তাই, 'এইরকম সুন্দর শীতকালে একবার সাঁওতাল পরগনা ঘুরে গেলে মন্দ হয় না!'

'রাশিয়া ভ্রমণ' তুলনামূলকভাবে নাতিদীর্ঘ ভ্রমণ-কাহিনি, যদিও এখানে এসেছে ইউরোপ-আমেরিকার বাইরে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পটভূমি। এ এমন এক দেশ, যেখানকার নাগরিকরাই গোটা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি বই বড়ে। কাহিনির শুরু মস্কোয়। দস্তয়েভস্কি-তলস্তয়-পুশকিন-তুর্গেনিভ-গোর্কি-মায়াকোভস্কির দেশে এসে অদ্ভুত রোমাঞ্চ হয় লেখকের। তাঁকে মুগ্ধ করে মস্কো বিমানবন্দর ও মস্কোভা নদী, বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্মৃতি-স্মারক, বলশয় থিয়েটার, ক্রেমলিন প্রাসাদ ও থিয়েটার, রেড স্কোয়ার, পার্ক ও ভাস্কর্য, মস্কো লেখক সমিতির কার্যালয়, মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়। লেখক লিখেছেন, 'সোভিয়েত দেশে কোথাও বিজ্ঞাপন নেই, কারণ সমস্ত ব্যবসাই এদেশে সরকার-পরিচালিত, সুতরাং পণ্যদ্রব্যের ভালো-মন্দ প্রমাণ করার বিজ্ঞাপন প্রতিযোগিতার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।' মস্কো থেকে সুনীল যান নেভা নদীর তীরবর্তী বিখ্যাত লেনিনগ্রাদে, আগে যার নাম ছিল সেন্ট-পিটার্সবার্গ। সেখানে দেখেন নেভা নদীর দু'পাশে সুন্দর গড়নের সব প্রাসাদের সারি, গির্জার চূড়া, উইন্টার প্যালেস, হারমিটেজ মিউজিয়ম। তারপর সেখান থেকে যান পুশকিন-শহর, দেখেন বালটিক উপসাগর। এখানেই এক রুশ লেখক সুনীলকে বলেন, 'শহরে অনেক লোকজন, নানারকম আকর্ষণ। ...এরকম কোনও ফাঁকা জায়গায় বেশ কয়েকদিন থাকলে কল্পনাশক্তি বাড়ে।'

সুনীল লিখেছেন, 'বই বার করা সহজ নয়। ...কবিরা তাদের পাণ্ডুলিপি জমা দেয় সরকারি প্রকাশনালয়ে। সেখানকার বিশেষজ্ঞরা যদি মনোনীত করেন, তবে বই ছাপা হয়। সেজন্য সময় লাগে।' তিনি আরও লিখেছেন, 'এ দেশে পত্রিকার খরচ তোলার ব্যাপারে বিজ্ঞাপনের জন্য ঘোরাঘুরি ও হ্যাংলামির প্রয়োজন হয় না, ছাপার খরচ জোগাড় করার দুশ্চিন্তা নেই। কারণ সরকারই এর পৃষ্ঠপোষক। সোভিয়েত ইউনিয়নে যে কোনও পত্র-পত্রিকার কোনও লেখা ছাপা হলেই লেখককে টাকা দেওয়া হয়।' এরপর সুনীল যান ল্যাটাভিয়ার রিগায়। রবীন্দ্রনাথের লেখা মূল ভাষায় পড়ার জন্য বাংলা শিখেছেন, এমন এক অধ্যাপকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় সেখানে। সুনীল আরও অবাক হয়ে যান এই তথ্য জানতে পেরে যে, ল্যাটভিয়ার জনসংখ্যা মাত্র ২৫ লক্ষ, কিন্তু সেখানে লেখকের সংখ্যা ২০০, শিল্পীর সংখ্যা ৭০০। এরপর সুনীল যান ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ শহরে, মুগ্ধ হয়ে যান নিপার নদী দেখে, পদ্মার সঙ্গে মিলও খুঁজে পান। চারটি শহরে চোদ্দ দিনের সফর সেরে ফিরে আসেন সুনীল। অনুভব করেন, 'সোভিয়েত দেশে রবীন্দ্রনাথ যতখানি নপ্রিয়, তেমন আর বোধহয় পৃথিবীর অন্য কোনও দেশেই নয়।' তাঁর প্রতিটি অভিজ্ঞতাই যেন একেকটি দৃশ্য হয়ে ওঠে, এমনই প্রাণবন্ত তাদের বর্ণনা।

সুনীলের বেশ কয়েকটি চিত্রনাট্য এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। প্রথমেই রয়েছে 'রাধাকৃষ্ণ'। গোড়াতেই লেখক স্পষ্ট করে দিয়েছেন, 'পৌরাণিক রাধাকৃষ্ণ আখ্যানের সঙ্গে এই কাহিনির কোনও যোগ নেই।' এই চিত্রনাট্যে কৃষ্ণ, 'তিনি যোদ্ধা, তিনি গ্রামের রাখাল।' শিষ্টের পালন ও দুর্জনের দমনই তাঁর কাজ, তাই সে বিদ্রোহী। চিত্রনাট্যের শেষে আছে এই লাইনটি, 'আসুন, আমরা সবাই মিলে এই বিদ্রোহীকে প্রণাম করি।' এরপর রয়েছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের, অনেকের মতে জীবনের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, 'অহিংসা'র চিত্রনাট্য। মানিকের উপন্যাসের চিত্রনাট্য লিখেছেন সুনীল, দুই বিশিষ্ট প্রতিভার সম্মেলন ঘটেছে এখানে। ধর্মব্যবসা, যৌনতা, শ্রেণী-বৈষম্য, ইত্যাদি যেসব বিষয়কে মানিক গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন, টানটান, গতিশীল

সংলাপে ও দৃশ্য-বিভাজনের কুশলতায় মূল কাহিনির আশ্চর্য পুনর্নির্মাণ ঘটেছে এখানে। গৌতম ঘোষের 'দেখা' চলচ্চিত্রের প্রাথমিক চিত্রনাট্য লিখেছিলেন সুনীল। একজন শিল্পীর সঙ্কট ও স্বাধীনতার কথা আছে এখানে। শশী তাই বলে, 'জীবনটা তোমার নিজের, কী ভাবে বাঁচবে তা তুমিই ঠিক করবে, অন্যদের কথা শুনবে কেন?' 'স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজি' লেখা হয়েছিল মূলত একটি 'লাইট অ্যান্ড সাউণ্ড' শোয়ের জন্য। এখানে সুভাষচন্দ্রের জীবনী বলে গিয়েছেন কথক, মাঝেমাঝে শোনা গিয়েছে নেতাজির কণ্ঠস্বর।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মোট ৩৪টি সাক্ষাৎকার স্থান পেয়েছে এই সংকলনে। সমকালের সবচেয়ে আলোচিত লেখকের জীবন ও দর্শনকে বুঝতে হলে এই সাক্ষাৎকারগুলোর গুরুত্ব অপরিহার্য। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, শিশুসাহিত্য, বিচিত্র ও আকর্ষণীয় জীবন, সুনীলের মহাবিশ্ব ধরা হয়েছে এই সাক্ষাৎকারগুলোয়। আমরা জানতে পারি, একসময় তিনি একটি আশ্চর্য চিঠি পেয়েছিলেন, যাতে লেখা ছিল, 'আপনি কী এক বছরের জন্য অন্য সমস্ত লেখা বন্ধ করে শুধু ছোটদের জন্য লিখতে পারেন না!' বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর মতামত, 'বিজ্ঞান একদিকে মানুষকে যেমন বাঁচাচ্ছে, আর অন্যদিকে ধ্বংসের জন্য তৈরি হচ্ছে। কোনটা জয়ী হবে সেটাই দেখার।' ইতিহাস সম্পর্কে মন্তব্য, 'আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতিকে মাঝে মাঝে পেছনের দিকে সরে এসে তাকিয়ে দেখতে হয়। তাহলে সামনে এগোনো যায়। তবে সব লেখাই আনন্দের জন্য। চিন্তা করতে হলেও তার মধ্যে একটা আনন্দ থাকা দরকার। শুধু চিন্তা করার জন্য লিখলে কেউ পড়তে চায় না।'

সলমন রুশদি সম্পর্কে সুনীলের মন্তব্য, 'ও হচ্ছে আস্ত একটা মূর্খ লেখক। কোনও কিছু না জেনে তার সম্পর্কে লেখা তো মূর্খতাই, কি বলো? তবে তাঁর লেখার ক্ষমতা আছে।' অপর এক জায়গায় বলেছেন, 'স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে একটি জীবনীগ্রন্থ লেখার ইচ্ছে আছে যাতে আমি তাঁর সত্য জীবনটাকে তুলে ধরতে চাই। ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর একটা সম্পর্ক ছিল, এটা আমি সেখানে বলতে চাই।' তাঁর অকপট উচ্চারণ, 'সাহিত্য কখনও অশ্লীল হতে পারে না।' আরও বলেছেন, 'শঙ্খ ঘোষ বামপন্থীদের সঙ্গে হেঁটেছেন, তবে ওঁর লেখার মধ্যে উগ্র বামপন্থীবোধ আমরা বিশেষ দেখিনি।' নিজের লেখা সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'লেখার দুটি স্তর থাকে। একটি তার পাঠযোগ্যতা, আর একটি গভীরতা। আমি এ দুটির মধ্যে সামঞ্জস্য আনার চেষ্টা করেছি।' অমরতা সম্পর্কে বলেছেন, 'শারীরিক মৃত্যুর পরের কোনও কিছু নিয়েই আমার মাথাব্যথা নেই।' সব মিলিয়ে এক অজানা, অচেনা, হয়তো বা বিতর্কিত কিন্তু স্বচ্ছ, উদার, অকপট মনের এক সুনীল তাঁর বহুস্তর নিয়ে ধরা পড়েছেন এই সাক্ষাৎকারগুলোয়। এই বিপুলায়তন সংকলনটি প্রকাশের জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রাপ্য দীপ প্রকাশনের কর্ণধার শ্রী শংকর মণ্ডল, তাঁর সুযোগ্য পুত্র শ্রী দীপ্তাংশু মণ্ডল এবং তাঁদের কর্মসহযোগী শ্রী আশিস চৌধুরীর। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে এরকম এক সংকলনে সম্পূর্ণ অভিনবভাবে ধরে রাখার কৃতিত্ব তাঁদেরই।

রাহুল দাশগুপ্ত

সূচিপত্র

ভ্রমণ

তিন সমুদ্র সাতাশ নদী

প্রায় পাঁচ হাজার মানুষের ভিড়ের মধ্যেও আমার ঠিক চোখে পড়ল, চারটি বাঙালি ছেলে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়ে গল্প করছে। আমার থেকে তারা অনেকখানি দূরে, তাদের কথা আমি শুনতে পাচ্ছি না, কিন্তু তারা যে বাঙালি তা চিনতে আমার একটুও ভুল হয় না। মনটা একটু চঞ্চল হয়ে উঠল।

বাঙালি দেখলেই যে ছুটে যেতে হবে তার কোনও মানে নেই। বাঙালিরা এমন কিছু দ্রষ্টব্য ব্যাপার নয়। মাত্র কিছুদিন আগেই তো বাংলার জনসমুদ্র ছেড়ে এসেছি, আবার কিছুদিন বাদেই সেখানে ফিরে যাব। তবু বিদেশে এসে অনবরত অপর ভাষায় কথা বলতে-বলতে এক সময় যেন মুখে ফেনা উঠে যায়। তখন ইচ্ছে করে দুটো বাংলা কথা কইতে, একটু বাংলায় হাসাহাসি করতে। কিন্তু সেধে কারুর সঙ্গে ভাব জমাতে আমি কখনোই পারি না। তা ছাড়া বিপদও আছে। লন্ডন শহরের বড় রাস্তায় হামেশাই বাঙালির দেখা পাওয়া যায়। এবার পিকাডেলি স্কোয়ারে একজন বাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে ডেকে কথা বলতে গিয়েছিলুম, তিনি গম্ভীর দায়সারাভাবে দুটি একটি কথা বলে চলে গেলেন। হয়তো তিনি খুব বড় চাকরি করেন, আমার মতন এলেবেলে বাঙালিকে পাত্তা দিতে চাননি।

এটা অবশ্য লন্ডন নয়, আমস্টারডাম শহরের কেন্দ্রস্থল। জায়গাটার নাম ডাম-স্কোয়ার, একটা পরিত্যক্ত রাজপ্রাসাদের সামনে বিশাল চত্বর, দেশ-বিদেশের ভ্রমণকারীরা প্রায় সবাই বিকেলের দিকে এখানে এসে ভিড় জমায়। অনেকে অলসভাবে বসে থেকে পায়রাদের ছোলা খাওয়ায়। বড়-বড় হোটেলগুলো এ-পাড়াতেই। চত্বরটার চার পাশে বহু দোকান পর্যটকদের পকেট কাটবার জন্য হাজার রকম মনোহর দ্রব্য সাজিয়ে রেখেছে। এখানেই কাছাকাছি হল্যান্ডের অতি মূল্যবান হিরে এবং সুলভ রমণী পাওয়া যায়।

একটা সিগারেট ধরিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমার তো কোথাও জরুরি যাওয়ার তাড়া নেই, খানিকটা সময় কাটানো নিয়ে কথা। রাত সাড়ে আটটা বাজে, আকাশে রোদ্দুরহীন দিনের আলো। পৃথিবীর বহুদেশের মানুষের মুখ আলাদাভাবে চেনা যায়, আর সব পোশাকের কী বিচিত্র রং! এত মানুষের ভিড়েও নিজেকে সব সময় একলা মনে হয়।

একটু বাদে বাঙালি ছেলে চারটির মধ্যে দুজন চলে গেল ডানপাশের রাস্তায়, আর দুজন এগিয়ে আসতে লাগল আমার দিকে। এসব দেশে অচেনা-মানুষের সঙ্গেও চোখাচোখি হয়ে গেলে হাসিমুখ করতে হয়। আমি তৈরি হয়ে রইলুম।

ছেলে দুটির সঙ্গে আমার চোখাচোখি হল না, ওরা আমার পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল। এক্ষেত্রে পিছু ডাকা চলে না। আমি আড়-চোখে দেখতে লাগলুম ওদের। ওরা একটু দূরে গিয়েও থমকে গেল। তারপর পিছিয়ে এসে আমার মুখোমুখি দাঁড়াতেই আমি একগাল হেসে বললুম, কী খবর?

একটি ছেলে তার উত্তরে ইংরেজিতে জিগ্যেস করল, পাকিস্তানি?

আমি মাথা নাড়লুম দুদিকে।

অন্যজন জিগ্যেস করল, কামিং ফ্রম বাংলাদেশ?

এবারও আমি দুদিকে মাথা নেড়ে বললুম, না, ভারত।

ছেলে দুটি বাঙালি নয়। বেশ খানিকটা নিরাশই হলুম বলতে গেলে।

ওদের একজন আবার ইংরেজিতে জিগ্যেস করল, নতুন এসেছেন মনে হচ্ছে। কী চাকরি নিয়ে এলেন?

আমি বললুম, আমাকে আবার কে চাকরি দেবে? আমি এমনি ভবঘুরে হয়ে এসেছি।

—কী রকম লাগছে আমাদের দেশ? হল্যান্ড বড় সুন্দর জায়গা কি না বলুন? আমরা অনেক দেশ দেখেছি, কিন্তু আমাদের হল্যান্ডের মতন এত ভালো আর কোথাও লাগে না।

আমাদের হল্যান্ড? এই বাঙালি-চেহারার ছেলে দুটি হল্যান্ডের নাগরিক? আমার চট করে মনে পড়ল, সুরিনামের অনেক লোক এখন হল্যান্ডে থাকে। সুরিনাম এক সময় ডাচ কলোনি ছিল, সেখানকার অনেকেই হল্যান্ডের নাগরিক হয়ে আছে, তারা ভারতীয় বংশোদ্ভূত, এখনও পুজো-আচ্চা করে, হিন্দি গান শোনে। এরা কি তবে সুরিনামিজ?

ওদের একজন বলল, আমরাও এক সময় ভারতীয় ছিলাম, মানে, আমাদের বাবা-মায়েরা। আমরা জন্মেছি ভারতে, তারপর পাকিস্তানে চলে যাই। এখন অবশ্য দশ বছর এ-দেশে আছি।

—তা হলে আপনারা পাকিস্তান থেকে এসেছেন! 'আমাদের হল্যান্ড' বললেন কেন?

একটি ছেলে অন্যজনের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ও এখানকার সিটিজেনশিপ পেয়ে গেছে। আমি এখনও পাইনি, তবে শিগগির পেয়ে যাব।

অন্য ছেলেটি হাসতে-হাসতে বলল, প্রথমে ছিলাম ভারতীয়, তারপর পাকিস্তানি, তারপর ডাচ। এক জীবনে তিনদেশের নাগরিক। চলুন না, কোথাও একটু বসে গল্প করা যাক? আমাদের আরও দুজন বন্ধু ছিল, এখনও গেলে তাদের ধরা যাবে। আপনার বিশেষ কোনও কাজ নেই তো? উঠেছেন কোথায়? আপনি হিন্দি জানেন?

যুবক দুটির বয়েস তিরিশ-বত্রিশের মতন। একজনের নাম আলম, আর একজনের নাম মুনাব্বর। দুজনেরই স্বাস্থ্য চমৎকার। ওদের সঙ্গে হাঁটতে লাগলুম চত্বরটার ডান পাশ দিয়ে। একটা রেস্তোরাঁর সামনে উঁকি দিয়ে আলম বলল, ওই তো ভেতরে শমীম আর ইমতিয়াজ রয়েছে। চলুন, এখানে বসা যাক। এটা আমাদের আড্ডাখানা।

আমি প্রথমে একটু ইতস্তত করলুম। এ তো আর কলকাতার চায়ের দোকান নয় যে চার আনা পয়সা দিয়ে এক কাপ চা খেয়ে তিন ঘণ্টা কাটিয়ে যাব। এখানে এক কাপ চায়ের দাম অন্তত চার টাকা, তা ছাড়া এ-পাড়ার দোকানে চা পাওয়া যায় কিনা তাও সন্দেহ। বিদেশে এলে কৃপণের মতন প্রতিটি পাই পয়সা হিসেব করে চলতে হয়। কিন্তু এতদূর এসে আর ফিরে যাওয়া যায় না।

শমীম আর ইমতিয়াজ আমাদের দেখে হইহই করে উঠল এবং হিন্দিতে স্বাগত জানাল। হিন্দি কিংবা উর্দুও হতে পারে। এদের মধ্যে ইমতিয়াজের বয়েস একটু বেশি, মাথায় টাক আর শমীমের চেহারা ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মতন। আমার পরিচয় পেয়ে ওরা হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিয়ে বলল, বসুন, বসুন! আপনার কাছে দেশের খবর শোনা যাক। এখানকার কাগজে আমাদের দেশের কোনও খবর থাকে না।

দেশের খবর মানে কোন দেশ? পাকিস্তানের কতটুকু খবরই বা আমি জানি? ভারতের খবর জানতে কি এদের আগ্রহ হবে? এদের মধ্যে শমীম এসেছে জার্মানি থেকে বেড়াতে, ইমতিয়াজ তার দুলাভাই অর্থাৎ জামাইবাবু। চারজনেই কাজ করে জাহাজ কোম্পানিতে। গত আট বছরের মধ্যে কেউই পাকিস্তানে যায়নি।

আমাকে কিছু জিগ্যেস না করেই ওরা আমার জন্য একটা বিয়ারের অর্ডার দিল। মুনাব্বর কিছু

নিল না, রোজার মাস, সে উপোস রেখেছে। শমীম তাকে উপরোধ করতে লাগল, আরে ব্রাদার, খাও এক ঢোঁক। এই দূর দেশে কে আর দেখছে তোমাকে।

মুনাব্বর বলল, না, ভাই, জোর কোরো না। অনেক দিনের অভ্যেস, রোজার সময় সারাদিন আমি কিছু খেতে পারি না।

আমি বললুম, এখানে রোজা রাখা তো মহা জ্বালা। রাত দশটা পর্যন্ত দিনের আলো থাকে।

মুনাব্বর বলল, শুধু কী তাই, রাত তিনটে থেকেই আকাশে দিনের আলো ফুটে বেরোয়, তার আগে জেগে উঠে নাস্তা সেরে নিতে হয়।

আলম বলল, এখন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আঠারো-উনিশ ঘণ্টাই দিন বলতে পারেন। আবার শীতকালে মোটে পাঁচ-ছ'ঘণ্টা দিনের আলো থাকে।

শমীম বলল, বিয়ার খাচ্ছ না বটে, কিন্তু মুনাব্বর খাঁ, সিগারেট টানছ যে অনবরত? তাতে রোজা থাকে?

মুনাব্বর লাজুকভাবে হেসে বলল, বিদেশে অত নিয়ম মানলে চলে না। কী বলেন, নীললোহিতদাদা? হিন্দুস্তানে তো সবাই সবাইকে দাদা বলে, তাই না?

আমি বললুম, সারা ভারতবর্ষে বলে না, বাঙালিরা বলে। কিন্তু আপনি তা জানলেন কী করে?

--আমি ঢাকায় ছিলাম যে। প্রায় সাত-আট বছর ছিলাম। সেভেন্টি ওয়ানের সময় চলে আসি, কিছুদিন করাচিতে থেকে তারপর একেবারে এই দেশে। হিন্দুস্তানের ভরতপুরের নাম শুনেছেন? উত্তরপ্রদেশে, সেখানে আমার জন্ম, সেখান থেকে আমরা চলে যাই ঢাকায়।

আমি বললুম, আমার ঠিক আপনার উলটো। আমার জন্ম ঢাকায়, সেখান থেকে চলে আসি ভরতপুরে।

মুনাব্বর বিস্মিতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইল একটুক্ষণ। তারপর বলল, ঠিক বলছেন?

আমি বললুম, ঠিক ঢাকায় নয়, আমার জন্ম ফরিদপুরে। আর ভরতপুরের বদলে আমি চলে এসেছি কলকাতায়। কিন্তু একই তো ব্যাপার, তাই না?

ওরা চারজনে হোহো করে হেসে উঠল, মুনাব্বর বলল, তা ঠিক বলেছেন। তবে আমাকে আবার ঢাকা ছাড়তে হয়েছিল, আপনাকে তো আর কলকাতা ছাড়তে হয়নি এর পরে।

আমি বললুম, ভবিষ্যতের ইতিহাসের কথা কে বলতে পারে? হয়তো এরপর কলকাতায় এক সময় বিদেশি খেদাও আন্দোলন শুরু হবে, তখন আমাদের আবার পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে অন্য কোথাও। ধরা যাক, আন্দামানে।

শমীম বলল, ইতিহাসের মুখে মারো গোলি!

ইমতিয়াজ বলল, ইতিহাস আপনা-আপনি হয় না, কিছু বদমায়েশ লোক এইভাবে ইতিহাস তৈরি করে।

এত বিদেশিদের মধ্যে এই চারজন চেনামুখের যুবককে আমার খুব আপন মনে হয়। এরা বেশ অবলীলাক্রমে জোরে-জোরে হিন্দি-উর্দুতে কথা বলে যাচ্ছে। রেস্তোরাঁটি বেশ বড়, অনেকগুলো টেবিল, আমরা বসেছি মাঝখানের একটা বড় টেবিলে। এদের ব্যবহারে কোনও রকম আড়ষ্টতা নেই, আমাদের পানীয় অর্ডার দেওয়ার সময় এরা কথা বলছে বেশ চোস্ত ডাচ ভাষায়, তারপরই আবার আড্ডা শুরু করছে হিন্দি-উর্দুতে। আমি হিন্দি-উর্দু প্রায় কিছুই জানি না। কিন্তু ইংরিজির বদলে ভাঙা-ভাঙা ওই ভাষায় কথা বলতে বেশ ভালো লাগছে।

এর মধ্যে তিনবার বিয়ারের অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে। এ-দেশি বিয়ার খুব হালকা, সেরকম নেশা হয় না। একমাত্র আলমকেই দেখছি ভদ্‌কা চেয়ে নিয়ে মিশিয়ে নিচ্ছে ওর বিয়ারের সঙ্গে। আলম একটু বেশি হাসছে, বেশি জোরে কথা বলছে, জিভও একটু জড়িয়ে গেছে। সে সিগারেটও খায় সবচেয়ে বেশি। তিনটে পাঁচ মার্কা সিগারেটের একটা পুরো প্যাকেট এরই মধ্যে শেষ করে,

অন্য একটা নতুন প্যাকেট খুলেছে। মুনাব্বর তাকে ভদ্‌কা নিতে বারণ করল দুবার, আলম শুনল না।

আমি পকেটে হাত দিয়ে গোপনে গিল্‌ডারের হিসেব করতে লাগলুম। এক রাউন্ডের অর্ডার আমার দেওয়া উচিত। স্টুয়ার্টের উদ্দেশ্যে আঙুল তুলতেই ইমতিয়াজ বলল, না, না, ওসব চলবে না। আপনি আমাদের অতিথি। আপনি বিদেশ ঘুরতে এসেছেন, অযথা পয়সা খরচ করবেন না। আপনি কোন হোটেলে উঠেছেন? হোটেলে পয়সা দেবেন কেন, আমার বাড়িতে চলে আসুন। দেশ থেকে অনেকেই এসে আমার ওখানে ওঠে। আমার তিনখানা ঘর আছে।

মুনাব্বর বলল, ও এখনও শাদি করেনি, আপনার কোনও অসুবিধে হবে না।

কথায়-কথায় জানতে পারলুম, শমীম বিয়ে করেছে নিজের দেশের মেয়েকে, মুনাব্বরের স্ত্রী ডাচ, আর আলম একটি ডাচ মেয়ের সঙ্গে লিভিং টুগেদার করে। এই লিভিং টুগেদার এখন এসব দেশে বেশ চালু হয়ে গেছে। হল্যান্ডে এসে কেউ কোনো ডাচ মেয়েকে বিয়ে করতে পারলেই তার নাগরিকত্ব পেতে আর কোনও অসুবিধে হয় না, তার কোনও সময় চাকরি না থাকলেও সে মোটা টাকা ভাতা পাবে।

ইমতিয়াজ বলল, এখানে ইন্ডিয়ার লোকও বেশ কয়েকজন আছে। তাদের কারুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে আপনার? আমি আলাপ করিয়ে দিতে পারি।

আমি বললুম, তাদের সঙ্গে আলাপ করবার জন্য আমি খুব ব্যস্ত নই। আপনাদের সঙ্গে গল্প করতেই তো আমার বেশ চমৎকার লাগছে।

আলম আমার পিঠে একটা চাপড় মেরে নেশাগ্রস্ত গলায় বলল, বুঝলেন নীললোহিতদাদা, এদেশে এসে বুঝলুম, ধর্মটর্মতে কিছ্ছু আসে যায় না। গায়ের রঙে কিছু আসে যায় না। তুমিও মানুষ, আমিও মানুষ, খাটো, রোজগার করো, খাও-দাও, ফুর্তি করো। আয়ু ফুরিয়ে গেলে মরে যাও। ব্যস, সোজা কথা।

শমীম বলল, দুঃখের বিষয় এ কথাটা আমরা নিজের দেশে থাকার সময় বুঝতে পারি না। বুঝতে হল কিনা সাহেবদের দেশে এসে! দেশে থাকলে নীললোহিতের সঙ্গে এরকম আড্ডা মারতে পারতুম।

আমি বললুম, কেন, আমার তো মনে হচ্ছে, কলকাতারই কোনও দোকানে বসে আছি। আপনারা আমার কলকাতার বন্ধুদের মতন অনায়াসেই অমল, কমল, ফিরোজ, শামসের হতে পারতেন।

মুনাব্বর বলল, এটা আপনি ঠিক বললেন না, এটা আপনি একটু বেশি মিষ্টি করে বললেন। দেশে থাকলে আমাদের পেছনে স্পাই লেগে যেত।

কথা ঘোরাবার জন্য ইমতিয়াজ বলল, চলো এবার ওঠা যাক। ওহে মুনাব্বর, দেরি করে ফিরলে তোমার বিবি মাথায় কিল মারবে না?

মুনাব্বর বলল, আমার বিবি গেছে তার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। আজ রাতে ফিরবে না। বরং আলমের গার্লফ্রেন্ডই বকাবকি করবে। আলম কত বেশি খাচ্ছে দেখেছ?

আলম বলল, আরও খাব, লাগাও আর এক রাউন্ড।

ইমতিয়াজ বলল, না, আর না।

আলম বলল, আলবত আর এক রাউন্ড হবে। এই নীললোহিত আমাদের মেহমান।

ইমতিয়াজ বলল, ওনার জন্য আর একটা দেওয়া যেতে পারে, আমিও সঙ্গ দিতে পারি ওঁকে, কিন্তু তুমি আর না। সিগারেটের প্যাকেটটা আমাকে দাও, আর একটাও খাবে না।

আলম বলল, ভয় পাচ্ছ কেন! মরি তো মরব, নিজের খুশিতে মরব। মুনাব্বর বলল, বুঝলেন নীললোহিতদাদা, এই আলমের হার্টে একটা জবর গোলমাল দেখা দিয়েছে। সামনের মাসে অপারেশন হবে, খুব বড় অপারেশন। সিগারেট আর মদ খাওয়া একেবারে নিষেধ, কিন্তু ও কিছুতে মানবে না।

হার্টের রুগি এত সিগারেট খাচ্ছে শুনে আমিও আঁতকে উঠলুম। আলমের চোখ দুটো লালচে হয়ে গেছে, মাথার চুল উশকোখুশকো। সিগারেট টানছে গাঁজার মতন।

আলম জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, বুঝলেন দাদা, আমার এই অপারেশনে দু-লক্ষ টাকা খরচ হবে। তাতেও বাঁচব কি মরব ঠিক নেই। দেশে থাকতে গরিবের ছেলে ছিলুম, এত টাকা দিয়ে অপারেশন হত আমার? এমনিই মরতুম না? জাহাজের চাকরি নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়েছিলুম, এদেশে আছি এখন, এখানকার সোসাইটি সব চিকিৎসার খরচ দেয়....সেইজন্যই তো জীবন নিয়ে এত ফুটানি! দু-লাখ টাকার চিকিৎসা...হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ...

তারপরই সে আবার হাঁক দিল স্টুয়ার্টের উদ্দেশ্যে।

আমি জিগ্যেস করলুম, দু-লাখ টাকার চিকিৎসা? কী হয়েছে ওর হার্টে?

ইমতিয়াজ বলল, এমনিতেই এদেশে চিকিৎসার খুব খরচ। তা ছাড়া ওর হার্টের একটা ভাল্‌ভ কাজ করছে না, সব টেকনিক্যাল ব্যাপার আমি বুঝি না, মোটামুটি বেশ শক্ত অপারেশন। তবে ডাক্তার বলেছে, সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু এরকম ভাবে যদি অত্যাচার করে...

আলম বলল, জীবনটা কার, আমার না তোমাদের? আমার জীবন আমি ইচ্ছে মতন খরচ করব। অপারেশনের সময় যদি মরেই যাই, তা হলে তার আগে যে ক'টা দিন বাকি আছে একটু খুশি মতন কাটিয়ে যাব না?

মুনাব্বর আমাকে বলল, আপনি ওকে একটু বারণ করুন না। আমাদের কথা তো শোনেই না, আপনি নতুন লোক, যদি একটু পাত্তা...

মাত্র ঘণ্টা দু-এক আলমের সঙ্গে আমার আলাপ। আমার কথা ও শুনবে কেন? আলম বরং আমার পাশে উঠে এসে বলল, আমার সিগারেটের প্যাকেটটা কেড়ে নিয়েছে, আপনার থেকে দিন তো একটা। আপনার দেশের সিগারেট? চার্মিনার? দিন তো খেয়ে দেখি। আমি কয়েকটা বাংলা কথা জানি, বাংলা সিনেমা দেখেছি...হার্টের দরদ হলে আপনারা বলেন, মন খারাপ, তাই না?

মোট কথা প্রায় জোরজবরদস্তি করেই আলমকে নিয়ে আমরা উঠে পড়লুম একটু বাদেই।

সেই রাতে আমি আলমকে বহুক্ষণ স্বপ্নে দেখলুম।

॥ ২ ॥

আর্ট গ্যালারি কিংবা মিউজিয়াম খুব ভালো জিনিস, কত দেখার জিনিস থাকে, দেখলে কত জ্ঞান বাড়ে, কিন্তু বড্ড পা ব্যথা করে। আমাদের শরীরের মধ্যে পা দুটিই সবচেয়ে নগণ্য, কখনও আমরা পায়ের প্রতি বিশেষ নজর দিই না। পা দুটো আছে ভারবাহী গাধার মতন, আপন মনে নিজের কাজ করে যাবে, এই রকমই কথা। কিন্তু সেই গাধা দুটো হঠাৎ বিদ্রোহ করলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পও নস্যাৎ হয়ে যায়।

আমারও হল সেই রকম দশা।

হল্যান্ডের আমস্টারডাম যেমন ছবির মতন সুন্দর শহর, সেই রকমই পৃথিবী-বিখ্যাত বহু ছবিতে ভরা। আমস্টারডামে এসে শুধু ডাচ চিজ, মাছ ভাজা আর হাইনিকেন বিয়ার খেলেই তো হয় না, ডাচ শিল্পীদের ভুবন-বিজয়ী ছবিগুলি না দেখলে জীবন বৃথা। কোন কোন ছবি দেখব, তা আগেই ঠিক করে এসেছিলুম, কিন্তু দেখা কি অত সোজা!

একে তো দেশ ছেড়ে বিদেশে এলেই আমার মতন লোকের বুকের ভেতরটা সব সময় শুকনো-শুকনো লাগে, এই বুঝি হারিয়ে গেলুম, এই বুঝি হারিয়ে গেলুম মনে হয়। তা ছাড়া, এই সব জায়গায় সব সময় আমাদের পকেটের পয়সা আর সময় খরচ করতে হয় টিপেটিপে। সাহেবদের দেশে ট্যাক্সি চড়বার সৌভাগ্য নিয়ে আমি জন্মাইনি। আমস্টারডাম শহর অপূর্ব, সুশ্রী, ঝকঝকে ট্রাম

চলে অবশ্য, কিন্তু একবার চড়বার পরই যখন টিকিটের দাম হিসেব করে দেখি আমাদের দেশের প্রায় দশ টাকার সমান, তখন গা কচকচ করে। সুতরাং পা দুটিই প্রধান ভরসা।

হল্যান্ডের অধিকাংশ লোক ঠিক ততটাই বাংলা জানে, আমি যতটা ডাচ ভাষা জানি। সুতরাং তারা তাদের ভাষা আর আমি আমার ভাষা বললে যথেষ্ট হাস্যকৌতুক হয় বটে, কিন্তু রাস্তা চেনা যায় না। ইংরেজি জানা লোক এদেশের এয়ারপোর্টে কিংবা হোটেলে পাওয়া গেলেও পথে ঘাটে সব সময় তাদের সন্ধান মেলে না। সুতরাং ম্যাপ হাতে নিয়ে ঘুরতে হয় আন্দাজে। তিন-চার চক্কর ঘুরে আসবার পর দেখা যায়, আমি যে মিউজিয়ামটি খুঁজছি, সেটা ঠিক পেছনের রাস্তায়।

দ্রষ্টব্যস্থল খুঁজে পেলেও হাঁটার শেষ হয় না। এক একটা আর্ট গ্যালারি বা মিউজিয়ামে প্রায় পঞ্চাশটি ঘর, সবক'টি ঘর ঘুরে দেখা মানেও তো কয়েক মাইলের পথ। অথচ কোনওটাই বাদ দিতে ইচ্ছে করে না। শুধু ভ্যান গঘের (এখানকার লোকেরা এই নাম অন্যরকম উচ্চারণ করে, আমাদের বাঙালি উচ্চারণই ভালো) ছবি নিয়েই একটি পাঁচতলা বাড়ির আর্ট গ্যালারি, তার সবটাই না দেখলে কি চলে! তারপর মিউনিসিপ্যাল মিউজিয়াম, রেমব্র্যান্ডটের বাড়ি...সকাল থেকে ঘুরতে-ঘুরতে যখন রিজ্‌কস্‌ মিউজিয়ামের সামনে এসে দাঁড়ালুম, তখন বুকটা হঠাৎ দমে গেল।

এ যে এক বিশাল প্রাসাদ, এর সবটা এখন দেখতে হবে? পা দুটো যে আর চলতে চাইছে না। পায়েরও যে তেমন দোষ নেই। অথচ আমস্টারডামে এসে রিজ্‌কস্‌ মিউজিয়াম না দেখা তো মহা পাপের সমান। বেশি ভালো-ভালো জিনিস একদিনে দেখতে নেই, কিন্তু আজকে এখানে ইতি দিয়ে যে আবার কালকে দেখব তারও উপায় নেই, তা হলেই আর একদিন বেশি হোটেল খরচ।

কলকাতার ছেলে, অধিকাংশ সময়ই চটি পরে ঘোরবার অভ্যেস, কিন্তু সাহেবদের দেশে সর্বক্ষণ মোজা আর বুটজুতো পরে থাকতে হয়। পা দুটো চাইছে সেই বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেতে। আগেকার আমলের পাথরের তৈরি প্রাসাদ, এখানে খালি পায়ে হাঁটতে তবু ভালো লাগত। আমাদের দেশের মন্দির টন্দিরের মতন, এরাও এসব জায়গায় জুতো খুলে ঢোকবার নিয়ম করলে পারে না?

রিজ্‌কস্‌ মিউজিয়ামে ঢোকবার মুখেই নোটিশ ঝুলছে, 'চোর ও গাঁট কাটাদের থেকে সাবধান।' জিনিসটা বেশ চেনা চেনা লাগল। প্রথমেই ছবি দেখতে শুরু না করে ডান দিকে ঢুকে গেলুম রেস্তোরাঁয়। কিছু খাদ্য-পানীয় দিয়ে শরীরকে কিছুটা তোয়াজ করা যাক। কিন্তু ওতে পেট এবং মন সন্তুষ্ট হলেও পা নামের গাধা দুটো খুশি হল না। খাদ্য-পানীয় তো পা পর্যন্ত পৌঁছোয় না। তারা এখনও টনটনে প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

রিজ্‌কস্‌ মিউজিয়ামে ছবির শুরু পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে। সেখান থেকে যাত্রা শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত এসে পৌঁছোতে অনেক ঘর পার হতে হয়। তা ছাড়া আছে মহান শিল্পীদের আলাদা-আলাদা ঘর। এই সব ছবি কি একদিনে সঠিকভাবে দেখা সম্ভব? কিন্তু এই জীবনে আর হয়তো কখনও আমস্টারডামে আসব না, আর দেখাও হবে না।

ভ্রমর যেমন গোটা ফুলটার সৌন্দর্যের তোয়াক্কা করে না, শুধু মধুর সন্ধানে ঠিক মাঝখানটায় ঢুকে যায়, সেই রকমই অধিকাংশ ভ্রমণকারী রিজ্‌কস্‌ মিউজিয়ামে এসে প্রথমেই ছুটে যায় রেমব্র্যান্ডটের 'নাইট ওয়াচ' ছবিখানা দেখতে। এ বিশাল ছবিখানার নাম অনেকেই আগে থেকে শুনে আসে। লুভর-এর যেমন মোনালিজা, রিজ্‌কস্‌-এর সেরকম নাইট ওয়াচ। এখানে যে রেমব্র্যান্ডটের আরও অনেক ছবি আছে, কিংবা কাছাকাছি ঘরে ভারমিয়ের, গোইয়া, মুরিল্লো এবং ভ্যান ডাইকের দুর্লভ ছবি, তা গ্রাহ্য করে না অনেকেই।

আমারও প্রায় সেই অবস্থাই হল। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে 'নাইট ওয়াচ' দেখার পর ভারমিয়ের-এর ঘরে সবে মাত্র চোখ বুলোতে শুরু করেছি, এমন সময় আমার পোষা গাধা দুটি বলল, এবার ছুটি দেবে কি না বলো, নইলে কিন্তু তোমায় গাছের ওপর রেখে আমরা তলা থেকে মই কেড়ে নেব!

সুতরাং অন্যান্য অ-দেখা শিল্পীদের উদ্দেশ্যে সেখান থেকেই প্রণাম জানিয়ে ও ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম, তারপর প্রায় সোজা দৌড়ে গিয়ে হোটেলের বিছানায়।

ঘণ্টা দু-এক বাদে আবার পা দুটি স্ববশে এল। শরীর ও মন ঝরঝরে। আবার নতুন উদ্যোগে কিছু শুরু করা যায়। কালই এই শহর ছেড়ে চলে যাব, আজকের শেষ দিনটা এমনভাবে হোটেলের ঘরে শুয়ে নষ্ট হবে? ঘড়িতে বাজে মাত্র সাতটা, এটা সন্ধে না বিকেল না দুপুর তা বলা মুশকিল। বাইরে ঠিক দুপুরেরই মতন ঝকঝকে রোদ। আমাদের হোটেলের ঘরের জানালার ঠিক সামনেই দুটো বেশ বড় ঝাঁকড়া-চুলো সাইপ্রেস গাছ, ভ্যান গঘের অনেক ছবিতে এই সাইপ্রেস গাছ দেখা যায়, সুতরাং বাইরের দৃশ্যটি ভ্যান গঘের আঁকা একটা ছবি বলেই মনে হয়।

কিছুক্ষণ একটা বই খুলে বসে রইলুম, কিন্তু মনঃসংযোগ হল না। বিদেশের মুল্যবান একটি অপরাহ্ণ এমনভাবে নষ্ট করতে ইচ্ছে করে না। আবার বেরিয়ে পড়লুম হোটেল থেকে।

কয়েক পা হাঁটার পর এমনই চমক লাগল যে দাঁড়িয়ে পড়লুম হঠাৎ। স্বপ্ন দেখছি না তো? এটা কি বাস্তব কোনও শহর না রূপকথার একটা পৃষ্ঠা? ঘড়িতে দেখলুম, আটটা বেজে দশ, এখনও আকাশে রয়েছে পরিষ্কার দিনের আলো, এর মধ্যে চতুর্দিকের রাস্তাঘাট একেবারে জনশূন্য। চৌরাস্তার মোড়ে যেদিকে তাকাই, কোথাও একটাও মানুষ নেই, আমি ছাড়া। এ-ও কি সম্ভব? দুপুরবেলা এই পথ দিয়ে গেছি, সেই সব দোকান চিনতে পারছি, কিন্তু কোথাও কোনও প্রাণের চিহ্ন নেই। সব দোকানেই কাচের দেওয়াল, ভেতরে আলো জ্বলছে, বাইরে থেকে ভেতরের সব কিছু দেখা যায়, কিন্তু ক্রেতা-বিক্রেতা নেই।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। খুব মিহি ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে, বাতাসে শীত-শীত ভাব, আমি শুধু একটা সোয়েটার পরে আছি, ওর ওপরে আর একটা কোনো গরম জামা চাপালে আরাম লাগত, কিন্তু আর কিছু আনিনি আমি। আমার রোমাঞ্চ হল। এত বিখ্যাত এই শহরের এক চৌরাস্তায় আমি দাঁড়িয়ে আছি, চারপাশে বড়-বড় বাড়ি, প্রত্যেক দিকে লাইন করা অজস্র দোকান, অথচ মাত্র সন্ধে আটটায় সব একেবারে নিঃসাড়, একটা মানুষেরও দেখা পাওয়া যায় না।

আমার হোটেলটা শহরের এক প্রান্তে। কিন্তু কল্পনা করা যায় কি যে সন্ধে আটটার সময় টালিগঞ্জ ও দমদমের রাস্তায় একটিও মানুষ নেই?

একটা ট্রামের আওয়াজে চমক ভাঙল। তা হলে ট্রাম চলছে! এখানকার ট্রাম এক-কামরা, আমাদের মতন ফার্স্ট ক্লাস-সেকেন্ড ক্লাস নেই। তাকিয়ে দেখলুম, গোটা ট্রামে ঠিক তিনজন মানুষ বসে আছে। তারপর দেখলুম, গাড়িও চলছে রাস্তা দিয়ে। শহরটা ঘুমিয়ে পড়েনি। মনে পড়ল, এখানকার সমস্ত দোকানপাট ছ'টার সময় বন্ধ হয়ে যায়। তারপর আর কেউ রাস্তা দিয়ে হাঁটে না। বড-বড় বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলুম। সমস্ত জানালার পরদা টানা। রাস্তার ধারে বহু গাড়ি পার্ক করা আছে। এই সব গাড়ির ওয়াইপার কেউ চুরি করে না, হেড লাইট খুলে নেয় না! দোকানগুলোর কাচের দেওয়াল ভেঙে কেউ চুরি করে না! পথ দিয়ে মানুষ হাঁটে না, তবু দোকানগুলোর মধ্যে আলো জ্বেলে রেখেছে কেন? মোড়ের ফোয়ারা থেকে জল পড়েই যাচ্ছে, কেউ দেখবার নেই, তবুও!

সোজা হাঁটতে লাগলুম আপন মনে। খানিকবাদে কোনও-কোনও দোকানের ভেতর থেকে শব্দ পেতে লাগলুম। সেই সব দোকানের অন্দরমহল বাইরে থেকে দেখা যায় না, গাঢ় রঙের পরদা ফেলা। সাইনবোর্ডে দেখলুম, সেটা একটা বার। অর্থাৎ হোটেল-রেস্তোরাঁ এখনও খোলা। একটা ওই রকম দোকান থেকে পুতুলের মতন সুন্দর দুটি নারী-পুরুষ বেরিয়ে সামনের গাড়িতে উঠল। অর্থাৎ প্রায় কুড়ি মিনিট পরে খুব কাছাকাছি দুজন জীবন্ত মানুষ দেখলুম। নির্জনতা জিনিসটা পাহাড় কিংবা সমুদ্রের ধারে ভালো, কিন্তু কোনও বড় শহরের রাস্তায় এরকম নির্জনতা খুবই অস্বস্তিকর।

খানিকক্ষণ হাঁটার পর মনে হল, আমিও তো কোনও রেস্তোরাঁয় ঢুকে একটুক্ষণ বসলে পারি। তবে ঠিক কোনটায় ঢুকব, তা ঠিক করতে একটু সময় লাগল। যদি আমি ঢোকামাত্র সবাই আমার দিকে তাকায়? একটা রেস্তোরাঁর দরজা ঠেলে ভেতরে এক পা দিয়েও আবার বেরিয়ে এলুম। সেখানে অনেক ছেলেমেয়ে নাচছে। হয়তো ওখানে সবাই সবার চেনা, একমাত্র আমিই হব বাইরের লোক!

আরও একটু হাঁটবার পর, আর একটা মোড়ে এসে মনঃস্থির করে একটা ছোট দোকান দেখে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লুম। ভেতরে আবছা আলো। চোখ সইয়ে নেওয়ার পর বুঝলুম, সেটা একটা ট্যাভার্ন জাতীয় জায়গা, ইংরেজরা যাকে বলে পাব্। এক পাশে গোটাচারেক টেবিল, অন্য পাশে লম্বা কাউন্টারের সামনে অনেকগুলো হাই স্টুল, রেকর্ডে বাজনা বাজছে। প্রত্যেক টেবিলেই দুজন করে নারী-পুরুষ বসে আছে বলে আমি গিয়ে বসলুম কাউন্টারের সামনের একটা হাই স্টুলে।

তারপর বারটেন্ডার মহিলার দিকে তাকিয়ে আমি ঠিক ভূত দেখার মতন চমকে উঠলুম। মহিলাকে দেখতে অবিকল আমার ছোট পিসিমার মতন। বছর পঞ্চাশেকের মতন বয়েস হবে, একটু মোটার দিকে চেহারা, নাক-চোখ-ঠোঁটের ভাব এমনকী থুত্নিতে পর্যন্ত হুবহু আমার ছোট পিসিমার সঙ্গে মিল। ইনি মেমসাহেব বলে গায়ের রং তো ফর্সা হবেই, তা আমার ছোট পিসিমাও খুব ফরসা ছিলেন। আমার ছোট পিসিমাকে আমি স্মরণকাল থেকেই বিধবা অবস্থায় দেখেছি, সরু কালো পাড়ের ধুতি পরতেন, তাঁকে একটা গাউন পরিয়ে দিলে একদম এই মহিলার মতনই দেখাত।

মহিলা আমার সামনে এসে ডাচ ভাষায় অনেক কিছু বললেন। উত্তরে আমি একটা আঙুল দেখিয়ে বললুম, বিয়ার। মদের নামগুলো আন্তর্জাতিক, বুঝতে কোথাও কারুর অসুবিধে হয় না।

মধ্যবয়স্কা মোটাসোটা মহিলাটি প্রায় নাচের ভঙ্গিতে উড়ে গিয়ে একটা পিপে থেকে এক গেলাস বিয়ার ঢেলে আনলেন, একটা প্লেটে খানিকটা চিজ আর বাদাম আমার সামনে রেখে একগাল হাসি উপহার দিলেন সেই সঙ্গে। যাক, তা হলে আমি এখানে অনধিকারী নই।

বিয়ারের চুমুক দিতে-দিতে আড় চোখে পরিবেশটা ভালো করে দেখে নিলুম। কাউন্টারে আমার পাশাপাশি আরও পাঁচ-ছ'জন নারী-পুরুষ বসে আছে, তারা বেশ জোরে-জোরে হাসাহাসি ও গল্প করছে নিজেদের মধ্যে। সবাই সবাইকে চেনে। ঘরের একদিকের দেওয়ালে একটা রঙিন বোর্ড, মাঝখানে একটা বৃত্ত আঁকা, একটু দূর থেকে একজন মহিলা ও তার এক সঙ্গী পালকের তীর ছুড়ে-ছুড়ে মারছে সেই বৃত্তের দিকে। একে ডার্ট খেলা বলে, কিন্তু মনে হল যেন এখানে কিছু জুয়ার ব্যাপার আছে। একবার মহিলাটি তাঁর সঙ্গীকে কিছু পয়সা বার করে দিলেন।

আমার পাশেই বসে আছেন এক হাসিখুশি প্রৌঢ় তার পাশে অতিশয় পৃথুলা এক মহিলা। এঁরা স্বামী-স্ত্রী মনে হয়। বারটেন্ডার মহিলাকে এরা নাম ধরে ডাকছে। কয়েকবার মনোযোগ দিয়ে শুনবার পর বুঝলাম, ওঁর নাম লিলি। আমার সেই পিসিমার নাম ছিল শেফালি। নামেও বেশ মিল আছে দেখছি। আমার ছোট পিসি মারা গেছেন বেশ কয়েক বছর আগে, হঠাৎ তার জন্য আমার কষ্ট হল। বিধবা অবস্থায় ছোট পিসিমা একটা ম্লান জীবন কাটিয়ে গেলেন, আর এই লিলি কী রকম নাচতে-নাচতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শুধু নাচ নয়, লিলি এক সময় গান গেয়েও উঠল। রেকর্ডে একটা নতুন গান শুরু হতেই লিলি তার সঙ্গে গলা মেলাল, তারপর সেই পাবের সবাই। নিশ্চয়ই খুব একটা চেনা গান, এরা সবাই জানে। বেশ সহজ সুরের গান, অনেকটা আমাদের 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা'র মতন। গানটা শেষ হতেই একটা টেবিল থেকে একজন লোক কী একটা রসিকতা করতেই সবাই একেবারে হেসে গড়াগড়ি যেতে লাগল এক সঙ্গে। কাউন্টারের একজন লোক গলা বাড়িয়ে ফটাস করে একটু চুমু দিয়ে ফেলল লিলির ঠোঁটে, আর লিলি কৃত্রিম কোপে একটা কিল মারল সেই লোকটির মাথায়। হায়, আমার ছোট পিসিমাকে কেউ কোনওদিন এইভাবে আদর করেনি। এইটুকু আনন্দ তো আমার ছোট পিসিমা পেতেও পারতেন, কী আর এমন দোষ আছে এতে।

হঠাৎ আমার এই জায়গাটাকে খুব চেনা মনে হল। যেন আগে অনেকবার দেখেছি। জর্জ সিমেনোঁর উপন্যাসে ঠিক এইরকম ছোটখাটো কোনও ট্যাভার্নের মাঝ বয়েসি ফুর্তিবাজ নারী পুরুষের ছবি থাকে। সিমেনোঁ অবশ্য বেলজিয়ামের কথা লিখেছেন, কিন্তু বেলজিয়াম আর হল্যান্ড কাছাকাছি দেশ, প্রায় একইরকম পরিবেশ। আমি যেন সেইরকম একটা উপন্যাসের মাঝখানে ঢুকে পড়েছি।

নাচতে-নাচতে গান গাইতে-গাইতে লিলি একবার আমার খালি গেলাসটা নিয়ে গিয়ে ভরতি করে নিয়ে এল। আমাকে জিগ্যেসও করল না, আমি আবার চাই কি না। একটু অবাক চোখে তাকিয়েছি, লিলি আঙুল দিয়ে পাশের লোকটিকে দেখাল। পাশের লোকটি এক আঙুলে নিজের বুকে টোকা মেরে তারপর আমার গেলাসটার দিকে আঙুল ফেরাল, অর্থাৎ সে আমাকে ওই বিয়ার খাওয়াচ্ছে। প্রত্যাখ্যান করা অভদ্রতা, তাই আমি বললুম, থ্যাঙ্ক ইউ। লোকটি তখন একগাদা কথা বলে গেল গড়গড় করে। এক বর্ণ বুঝলাম না। এখানে হাসির ভাষা ছাড়া অন্য কিছু দেওয়া যায় না। তার পাশের মহিলাটি বলল, সে নো নো ইংলিশ। ইউ জাপান।

আমাকে জাপানি বলে কস্মিনকালে কেউ ভুল করতে পারে, এরকম আমার ধারণা ছিল না। না হয় আমার নাকটা একটু বোঁচা, তা বলে গায়ের রং তো হলদে নয়। বললুম, নো, আই অ্যাম অ্যান ইন্ডিয়ান।

মহিলাটির ইংরিজির দৌড় খুবই কম। তিনি আমায় জিগ্যেস করলেন, ইন্দোনেশিয়া? সিঙ্গাপুর?

আমি মাথা নেড়ে পুনরুক্তি করলুম।

এবারে তৃতীয় একজন মাথার পেছনে হাত দিয়ে হাতটা নাড়তে-নাড়তে বলল, ইন্ডিয়ান? ইন্ডিয়ান?

অর্থাৎ মাথায় পালকের মুকুট বোঝাচ্ছে? আমাকে আমেরিকার লাল ইন্ডিয়ান ভেবেছে? কেন, আমাদের যে এত বড একটা দেশ, সে দেশের নাম ওদের মনে পড়ছে না? ভাবতে লাগলুম, আমাদের দেশের কোন প্রতীক আছে যে যা দিয়ে চট করে এদের ভারতবর্ষ বোঝাতে পারি। হাতি? মহারাজা? তাজমহল?

আর একজন লোক জিগ্যেস করল, টুরিস্ট? আফ্রিকা?

এ তো মহা মুশকিলের ব্যাপার দেখছি। এরা কি কখনও ভারতীয় দেখেনি? আমাদের দেশ থেকে তো অনেকেই এখানে বেড়াতে আসে। এই আমস্টারডাম শহরেই তো বেশ কয়েকটি ভারতীয় দোকান দেখেছি। হয়তো এই পাড়ার লোকেরা আমাকেই প্রথম দেখছে। ম্যারি ম্যাকার্থির একটা উপন্যাসে পড়েছিলুম বটে, হল্যান্ডের লোকেরা নিজেদের দেশের বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে খুব কম জানে, তারা বাইরেও খুব কম যায়। আমরা অবশ্য আমাদের দেশের ওলন্দাজ জলদস্যুদের অনেক গল্প পড়েছি, কিন্তু সে তো ইতিহাসের ব্যাপার। এখনকার ওলন্দাজরা নিজেদের দেশের মধ্যে গুটিয়ে রেখেছে।

সকলেরই অল্প-অল্প নেশা হয়েছে। ওরা আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়, কিন্তু ভাবের আদান-প্রদানের কোনও উপায় নেই। লিলিও থুতনিতে আঙুল দিয়ে মাঝে মাঝে আমার দিকে কৌতূহলে তাকাচ্ছে। এর মধ্যে আরও একজন লোক আর একটি বিয়ার অর্ডার দিল আমার জন্য। প্রতিদান হিসেবে আমিও অর্ডার দিলুম তিনটি বিয়ারের। তারপর মনে পড়ল, বার টেন্ডারদেরও অফার করা যায়। লিলির দিকে আঙুল তুলে জিগ্যেস করলুম, ইউ? ওয়ান?

লিলি একগাল হেসে রাজি হয়ে গেল। আমার মনটা খুব হালকা হয়ে গেল এই জন্য যে, এরা আমাকে গ্রহণ করেছে, বাইরের লোক হিসেবে মুখ ফিরিয়ে রাখেনি।

ভাষা না বুঝেও বেশ মিশে গেলুম ওদের সঙ্গে। একটু বাদে দরজা ঠেলে ঢুকল একজন লম্বা মতন লোক। দু-তিন জন লোক চেঁচিয়ে উঠল, হেংক, ইংলিশ, ইংলিশ।

সেই লোকটি কাউন্টারে এসে লিলিকে একটা ব্র্যান্ডির অর্ডার দিয়ে ওদের কী সব জিগ্যেস করতে লাগল। ওরা আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ইংলিশ, ইংলিশ।

অর্থাৎ হেংক নামের লোকটি ইংরেজি জানে, তার মারফত আমার সঙ্গে কথা হতে পারে।

হেংক আমার দিকে ফিরে বলল, টুরিস্ট? হুইচ কানট্রি?

আমি বললুম, ইন্ডিয়া।

লোকটি বললো, ও, ইন্ডিয়া? হাফ অফ দি পপুলেশান ভেরি পুয়োর, রাইট? নো ফুড, নো ড্রিংক, স্টার্ভ, রাইট?

লোকটি পাশ ফিরে এই কথা আবার অন্যদের বোঝাল নিজস্ব ভাষায়। অন্যরা এবার সবাই মাথা ঝাঁকাল। তারা এবার বুঝেছে। পৃথুলা মহিলাটি আমার দিকে চেয়ে বলল, হিন্দু? হিন্দু। নো ইট, ভেরি পুয়োর?

কে যেন ঠাস করে একটা চড় মেরেছে আমার গালে।

হায় আমার জনম দুঃখিনী জননী, পৃথিবীর কাছে এই তার পরিচয়। ভারতের নাম চিনতে পেরেই প্রথমেই ওদের মনে পড়ল ভারতের দারিদ্র্যের কথা? এদেশে এত প্রাচুর্য তাই দারিদ্র্য ওদের কাছে কৌতূহলের বস্তু। আমি একটু আগে ভারতের একটা প্রতীক খুঁজছিলুম, হাত পেতে যদি এদের কাছে ভিক্ষে চাইতুম এরা ঠিক বুঝতে পারত।

হেংক-এর মারফত সবাই জানতে চাইছে ভারত কেন গরিব, সেই সব গরিবরা কী খেয়ে বেঁচে থাকে। কিন্তু আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে, আর এদের সঙ্গে ভাব জমাবার ইচ্ছে নেই। ভারতের দারিদ্র্যের কথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই, কিন্তু লোকে ভারতের শুধু সেই পরিচয়টাই জানবে।

ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একটু বাদেই বেরিয়ে পড়লুম সেই পাব্ থেকে। দশটা বেজে গেছে, এখনও ঠিক মতন অন্ধকার নামেনি। পা দুটো আবার ক্লান্ত লাগছে। গরিব ভারতীয় হয়ে একটু-একটু মন খারাপ নিয়ে আবার হাঁটতে লাগলুম আস্তে-আস্তে।

॥ ৩ ॥

পটল জিনিসটা যে কত মূল্যবান, তা বোঝা গেল প্যারিসে এসে। আমি খুব একটা তরিতরকারির ভক্ত নই, যা পাই তাই খেয়ে নিই। খাওয়ার পাতে মাছ-মাংস আসবার আগে শাক-চচ্চড়ি যেন প্রেমিকার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে প্রেমিকার দাদার সঙ্গে পাড়া-পলিটিক্স নিয়ে আলোচনা। সৈয়দ মুজতবা আলি লিখেছিলেন, যেন পণ্ডিত মশাইয়ের হাতে বেত খাওয়ার আগে কানমলা।

পটলের সঙ্গে পটল-তোলার সম্পর্ক আছে বলে বরং ও জিনিসটা সম্পর্কে আমার মনে একটু বিরাগ ভাবই আছে। প্যারিসে বসে যে পটলের গুণগান শুনতে হবে, তা কোনওদিন কল্পনাই করিনি।

দেশ ছেড়ে বাইরে এলে টের পাওয়া যায় বাঙালি যুবকরা রান্নায় কত পটু। যে-কোনও বাঙালি আড্ডায় রান্নার প্রসঙ্গ উঠবেই। তখন জানা যাবে যে অমুক ইঞ্জিনিয়ার কত ভালো মাছের ঝাল রান্না করেন, আর তমুক পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ধোঁকার ডালনা রেঁধে কতজনকে মুগ্ধ করেছেন। এঁরা অবিবাহিত। আর যাঁরা মাঝখানে একবার দেশে গিয়ে বাঙালি মেয়ে বিয়ে করে এনেছেন, তাঁদের গিন্নিরাও কম যান না। ব্রেবোর্ন বা লোরেটোতে পড়া যেসব বাঙালি মেয়ে দেশে থাকতে কোনওদিন রান্না ঘরে ঢোকেননি, রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন কিংবা ভারত নাট্যম নাচতেন, তাঁরাও বিদেশে এসে চিংড়িমাছের মালাইকারি কিংবা ডিম-সন্দেশ বানাতে শিখে যান।

এক বাঙালি আড্ডায় ডঃ দাস হঠাৎ আমাদের সবাইকে নেমন্তন্ন করলেন সামনের শনিবারে। তা শুনে রায়বাবু বললেন, ঝিঙে-পোস্ত খাওয়াবেন তো? আপনার হাতে কিন্তু পোস্তর রান্না দারুণ খোলে।

দাসবাবু বললেন, ঝিঙে-পোস্ত তো অনেকবার খেয়েছেন, আসুন না। এই শনিবারে আপনাদের মোচার ঘন্ট খাওয়াব!

তাই শুনে এক মুখার্জি বললেন, মোচা? আপনি মশাই মোচা কোথায় পেলেন? আমি তো কখনও দেখেনি!

যেন দারুণ একটা রহস্যের সন্ধান দিচ্ছেন, এইভাবে দাসবাবু বললেন, শুধু মোচা কেন, আমি থোড় পর্যন্ত পেয়েছি। কোথায় জানেন? ভিয়েতনামি বাজারে!

আমার মতন নতুন-আসা লোকের কাছে এসব কথা ধাঁধার মতন লাগে। ঝিঙে-পোস্ত, মোচার-ঘণ্টা, থোড়...এরপর কি নিম বেগুনের কথাও শুনতে হবে? এ যে আমার বিধবা দিদিমার রান্নার লিস্টি। প্যারিসের সব বিখ্যাত খাদ্যদ্রব্য ছেড়ে এসব কী?

রায়বাবু বললেন, আমি ভিয়েতনামি বাজারে যাই মাঝে-মাঝে কাঁচা লঙ্কা কিনতে। একদম আমাদের দেশের মতন কাঁচা লঙ্কা কিনতে পাওয়া যায়, দারুণ ঝাল!

সদ্য দেশ থেকে আসা আর একজন রায়বাবু বললেন, কাঁচা লঙ্কা? চলুন, চলুন, আজই কিনে আনি। কতদিন কাঁচা লঙ্কা খাইনি! আমি তো লঙ্কা ছাড়া কোনও জিনিসের স্বাদই পাই না।

আমি জিগ্যেস করলুম, ভিয়েতনামি বাজার ব্যাপারটা কী?

তখন সবাই মিলে আমাকে বোঝালেন যে গত কয়েক বছর ধরে প্যারিসের শহরতলিতে প্রচুর ভিয়েতনামের শরণার্থী এসে বসতি নিয়েছে। এমনকী তারা নিজস্ব বাজারও বসিয়ে ফেলেছে এর মধ্যে। ভিয়েতনামিদের খাদ্য-অভ্যেসের সঙ্গে বাঙালিদের খুব মিল। দশ-পনেরো বছর ধরে যেসব বাঙালি এ দেশে আছেন, মাংস খেয়ে খেয়ে তাঁদের অরুচি ধরে গেছে, সেইজন্যই তারা বাঙালি খাবারের সন্ধানে ওই সব বাজারে যান।

আমি বেশ ছেলেবেলায় একবার এই সব বিলেত টিলেত দেশ ঘুরে গিয়েছিলুম। তখন আমার ধারণা হয়েছিল, বিদেশেও বাঙালিরা ভাত খায় বটে, আর ফুলকপি-বাঁধা কপি-ট্যাড়শ এইসব কিছু কিছু তরকারিও পায়, তবে দেশের মতন রুই-কাতলা-ইলিশ মাছ কিংবা পাঁঠার মাংস তো পায় না, কতগুলো বিদঘুটে নামের সমুদ্রের মাছ খেয়ে মাছের স্বাদ মেটায় আর পাঁঠার মাংসের বদলে ভেড়ার মাংস খায়, যাতে বেশ বোঁটকা গন্ধ। লন্ডন কিংবা নিউ ইয়র্কের মতন বড় শহরে, যেখানে অনেক ভারতীয়। সেখানে সিন্ধি বা গুজরাটিদের দোকানে পাঁপড়-আচার কিংবা মুসুরির ডাল পাওয়া যেত।

এবার এসে দেখছি সে সব কিছুই বদলে গেছে। এখন আর কিছুরই অভাব নেই, পাওয়া যায় সব কিছুই।

সদ্য দেশ থেকে আসা দ্বিতীয় রায়বাবু জিগ্যেস করলেন, কাঁকড়া? কাঁকড়া যদি পাওয়া যেত, আমি নিজেই রান্না করে আপনাদের খাওয়াতুম।

দাসবাবু বললেন, কেন পাওয়া যাবে না! আমার বাড়িতে টিনের কাঁকড়া আছে। আর যদি ফ্রেস চান তাও এনে দিতে পারি, আমাদের বাজারে প্রায়ই ওঠে।

কাঁকড়া পাওয়া যাবে শুনে দ্বিতীয় রায়বাবুর চোখ খুশিতে চকচক করে উঠল।

এক মহিলা আমেরিকা থেকে ফেরার পথে প্যারিসে এসে থেমেছেন। তিনি বললেন, নিউ ইয়র্কে কী চমৎকার ইলিশ মাছ খেয়ে এলুম। বিশ্বাসই করা যায় না।

দ্বিতীয় রায়বাবু বললেন, ইলিশ? নিশ্চয়ই কলকাতা থেকে নিয়ে গেছে। নাকি ঢাকা থেকে?

তখন দু-তিনজন মিলে প্রায় ধমকে উঠে বললেন, কলকাতা-ঢাকা থেকে কেন আনবে? এ দেশে পাওয়া যায় না? ইলিশ কি আপনাদের নিজস্ব। ইলিশ সমুদ্রের মাছ, নদীতে ঢুকলে তখন বাংলায় তার নাম ইলিশ।

আমেরিকা-ফেরত মহিলাটি বললেন, ও-দেশে বলে শ্যাড। অবিকল আমাদের ইলিশের মতন, তবে সাইজে আমাদের চেয়েও বড়। আমাদের দেশে কখনও আট-ন পাউন্ড ওজনের ইলিশ দেখেছেন? অত বড় ইলিশের স্বাদও কিন্তু খুব ভালো।

আমি জিগ্যেস করলুম, নিউ ইয়র্কে কোনও বাঙালি ইলিশের দোকান খুলেছে? মহিলাটি হেসে বললেন, বাঙালির দোকান কেন হবে? বাঙালিরা কোথাও দোকান খোলে না! সাহেবদের দোকান।

আমি একটু নিরাশই হলুম। সারা ভারতবর্ষে বাঙালি ছাড়া আর কেউ ইলিশ খায় না। আমার ধারণা ছিল ইলিশটা একেবারে বাঙালিদের নিজস্ব ব্যাপার। বাঙালি-সংস্কৃতি, বিশেষত বাঙাল-সংস্কৃতির

প্রধান অঙ্গ। কিন্তু নিউ ইয়র্কে সাহেবদের দোকানে যখন ইলিশ পাওয়া যায়, তখন নিশ্চয়ই সাহেবরাও খায়! হায়, হায়!

আমেরিকা ফেরত মহিলাটি বেশ মাছ-রসিক। তিনি বললেন, ওখানে বাফেলো বলে আর একরকম মাছ আছে, সেটা ঠিক কাতলা মাছের মতন। আর কার্প মানে যে রুই, তা তো জানেনই। আর আছে ক্যাট ফিস, ঠিক আমাদের দেশের বড় আড় মাছ!

দ্বিতীয় রায়বাবু বললেন, মাছের নাম বাফেলো? ক্যাট? দরকার নেই আমার, আমি কোনদিন ওসব মাছ ছুঁয়েও দেখতে চাই না। তার চেয়ে আমার কাঁকড়াই ভালো।

মহিলাটি বললেন, বাফেলো একবার খেয়ে দেখবেন, কলকাতার রুই-কাতলার স্বাদ ভুলে যাবেন। আমার তো ইচ্ছে আছে একবার নিউ ইয়র্ক থেকে একটা পাঁচ কেজি শ্যাড মাছ নিয়ে যাব কলকাতায়, দেশের লোকদের দেখাব।

আমি বললুম, এসব দেশে ভালো-ভালো খাবার পাওয়া যায় জানি। কিন্তু আমাদের দেশের সব খাবারও যে পাওয়া যায়, তা জানতুম না।

তখনই উঠল পটলের প্রসঙ্গ।

দাসবাবু বললেন, শুধু একটা জিনিস খেতে চাইলেও খাওয়াতে পারব না। আলু-পটলের তরকারি।

প্রথম রায়বাবু বললেন, এত বছর ধরে অনেক খুঁজেও আমি পটল পাইনি কখনও।

চৌধুরীবাবু বললেন, দেশে গিয়ে সেই জন্যই আমি রোজ পটল ভাজা খাই!

সেনবাবু বললেন, কতদিন যে দেশে যাইনি!

তিনি যে দীর্ঘশ্বাসটি ফেললেন, সেটা দেশের জন্য, না পটলের জন্য তা ঠিক বোঝা গেল না। আমাদের দেশের আর সব তরকারি এই সব দেশে আসে, শুধু পটলের এই একগুঁয়ে গোয়ার্তুমি কেন? ভিয়েতনামিরাও কি পটল খায় না?

চৌধুরীবাবু বললেন, যাই বলুন, আমাদের দেশে শীতকালে পটল ভাজা এক অপূর্ব জিনিস। এখানে শীত পড়লেই আমার সেই কথা মনে পড়ে।

আমেরিকা-ফেরত মহিলাটি হার মানবার পাত্রী নন। তিনি বললেন, আমরা কিন্তু ওদেশে পটল পাই। ফ্রেস নয় অবশ্য, টিনের।

দাসবাবু বললেন, ও জিনিস আমিও খেয়েছি। আমি টিনের খাবার তেমন পছন্দ করি না, তাছাড়া ও জিনিসটার স্বাদও ঠিক পটলেব মতন নয়।

মহিলাটি বললেন, স্বাদ ঠিক আমাদের পটলের মতন নয় বটে, কিন্তু দেখতে পটলের মতন তো বটে। কলকাতায় যেরকম পটল পাওয়া যায়, নর্থ ইন্ডিয়াতেও তো সেরকম পাওয়া যায় না। আমরা ওই টিনের পটল দিয়েই তবকারি করে খাই।

চৌধুরীবাবু বললেন, আমেরিকা আজব দেশ, সে দেশে নিশ্চয়ই বাঘের দুধও পাওয়া যায়। আমরা ছেলেবেলায় শুনতুম, কলকাতায় নিউ মার্কেটে পয়সা ফেললে বাঘের দুধও পাওয়া যেতে পারে, সেটা কলকাতার ব্যাপারে সত্যি না হলেও নিউ ইয়র্কের ব্যাপারে নিশ্চয়ই সত্যি।

রায়বাবু বললেন, বাঘের দুধ পাওয়া যায় কি না খোঁজ করে দেখিনি, তবে হাতির মাংস পাওয়া যায় শুনেছি।

সবাই হেসে উঠলেও রায়বাবু সজোরে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে কথাটা সত্যি। এমনকী প্রমাণ হিসেবে তিনি একটা নিউজ উইক পত্রিকা এনে ছবি দেখালেন।

আমি বললুম, ফ্রান্সে যখন ঘোড়ার মাংস বিক্রি হয়, তখন আমেরিকায় হাতির মাংস তো পাওয়া যেতেই পারে!

দাসবাবু বললেন, আজকাল অনেক হাতির মতন চেহারার আমেরিকান দেখতে পাচ্ছি, বোধহয় ওই মাংস খেয়েই...।

চৌধুরীবাবু বললেন, আর একটা জিনিস পাই না, সেটা হচ্ছে পান। আমি অবশ্য পানের ভক্ত নই, কিন্তু গত বছর বাবা-মা বেড়াতে এসেছিলেন আমার কাছে, পান পাওয়া গেল না বলে মা তো বেশিদিন থাকতেই চাইলেন না।

রায়বাবু বললেন, পান বোধহয়, লন্ডনে পাওয়া যায়। ওখানে একটু যদি খোঁজ নিতেন...কিংবা আমি তো প্রায়ই লন্ডন যাই, যদি আমাকে বলতেন...

সেনবাবু বললেন, আমেরিকায় পান পাওয়া যায় না?

আমেরিকা-ফেরত মহিলা বললেন, খোঁজ করে দেখিনি, কিন্তু ক্যানাডায় পাওয়া যায়। টোরেন্টোতে জানেন তো রেডিয়োতে হিন্দি গান বাজে, হিন্দি সিনেমার হল আছে, তার সামনে পানের দোকান, ফুচকা, ঝাল মুড়ি...।

আর একজন মহিলা একটু দূরে বসে এক মনে একটা ছবির বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছিলেন। এতক্ষণ একটিও কথা বলেননি। মহিলাটির রোগা পাতলা চেহারা, প্রথম বেড়াতে এসেছেন ফরাসি দেশে।

এবার তিনি বললেন, এসব কী হচ্ছে বলুন তো? প্যারিসে বসে শুধু খাওয়া-দাওয়ার আলোচনা! প্যারিসে জগৎ বিখ্যাত সব আর্ট গ্যালারি, মিউজিয়াম সেসব বাদ দিয়ে শুধু খাওয়ার কথা! এই মুহূর্তে একজন ফরাসি ভদ্রলোক এ-ঘরে ঢুকে পড়লে বাঙালিদের সম্পর্কে কী ভাববে বলুন তো!

প্রথম রায়বাবু হাসতে লাগলেন।

দাসবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, কী ভাববে আপনি জানেন? ভাববে, বাঙালিরা সত্যিই রসিক। তক্ষুনি আমাদের এই আলোচনায় যোগ দেবে। ফরাসিরা দারুণ খেতে ভালোবাসে।

চৌধুরীবাবু বললেন, আমাদের দেশের অনেকের ধারণা, ফরাসিরা বুঝি সবাই কবি আর শিল্পী।

আমি বললুম, প্রথমবার আসবার সময় আমারও সেই ধারণা ছিল। এয়ারপোর্টে পা দিয়েই দেখলুম, দুটি ছেলে হাত-পা নেড়ে খুব কথা বলছে। আমার ধারণা হয়েছিল, ওরা কবি।

চৌধুরীবাবু বললেন, এয়ারপোর্টে কবি? খুব সম্ভবত তারা জোচ্চোর।

রোগা-পাতলা মহিলাটি ঝাঁজালো সুরে বললেন, আপনারা নিশ্চয়ই আসল ফরাসিদের সঙ্গে মেশেন না, বাঙালিরা শুধু বাঙালি খাওয়া নিয়েই ব্যস্ত। ফরাসিদেশ নিশ্চয়ই কবি আর শিল্পীদেরই দেশ।

রায়বাবু-দাসবাবুরা সমস্বরে হাসতে লাগলেন।

চৌধুরীবাবু বললেন, আমরা ইংরেজদের বেনে বলি, কিন্তু ফরাসিরাও কম বেনে নয়। আমেরিকার মতন বড় বড় ডাকাত এ দেশে না থাকলেও ঠগ-জোচ্চোর অসংখ্য। কবি-শিল্পী তো মাত্র হাতের এক মুঠো, বাকি সব ফরাসিরা বেশ স্বার্থপর ধরনের।

সেনবাবু বললেন, বেনেগিরি আর ডাকাতিতে ইংরেজরা যখন ওয়ার্ল্ডের টপ, সেই সময়ই সেদেশে শেক্সপিয়র জন্মায়। ফরাসিরাও যখন ব্যাবসা বাণিজ্যে খুব উন্নতি করে, তখনই এদেশের কিছু লোক ভালো কবিতা লেখে, ছবি আঁকে।

চৌধুরীবাবু বললেন, ফরাসিরা কলোনিগুলোতে যা অত্যাচার করেছে, সেই তুলনায় ইংরেজরা তো অতি ভদ্র! এখনও তো ফ্রান্স নির্লজ্জের মতন সাউথ আফ্রিকার সঙ্গে ব্যাবসা করে।

প্রথম রায়বাবু বললেন, ওসব কথা ছেড়ে দিন। ফরাসিরা শিল্প-সাহিত্য সত্যিই ভালোবাসে বটে, তবে খেতেও খুব ভালোবাসে। ভালো-ভালো জিনিস খাওয়াও এদের কাল্‌চারের একটা অঙ্গ! চিজ আর ওয়াইন নিয়ে কত সূক্ষ্ম আলোচনা হয়...।

চৌধুরীবাবু বললেন, রাখুন মশাই কালচার। আমার অফিসের ফরাসিদের দেখছি তো, লাঞ্চের সময় হলেই ওদের আর জ্ঞান থাকে না। অমনি ছুটে গিয়ে গপ্‌গপ্ করে খাবে। অত বেশি খায় বলেই এদের অনেকেরই পেটের রোগ।

রোগা-পাতলা মহিলাটি আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললেন, আমরা কি পঁপিদু সেন্টারে যাব না? বসে-বসে এইসব আলোচনাই শুনব?

আমি বললুম, যাক বাবা, আমার কী দোষ? সবাই গেলেই আমি যেতে পারি।

দাসবাবু বললেন, আজ ছুটির দিন, আজ সেখানে মস্তবড় লাইন হবে। দু-তিন ঘণ্টা দাঁড়াতে হবে।

মুখার্জিবাবু বললেন, চলুন, তবু যাওয়া যাক। এঁরা মাত্র কয়েকদিনের জন্য এসেছেন। সবক'টা আর্ট গ্যালারি দেখা হবে না। পঁপিদু সেন্টার তো অবশ্যই দেখা উচিত।

চৌধুরীবাবু বললেন, যাচ্ছেন যান। কিন্তু গুণে দেখবেন তো সেখানে কতজন ফরাসি আছে? দেখবেন, বেশিরভাগই বাইরের লোক।

যাওয়ার উদ্যোগ-আয়োজন করতে-করতেই বৃষ্টি এসে গেল। এই বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে কারুর নেই। রোগা-পাতলা মহিলাটি বেশ মনমরা হয়ে গেলেন। আবার শুরু হল আড্ডা।

আড্ডাস্থলটি প্রথম রায়বাবুর বাড়ি। দুপুর বেশ গাঢ় হতে তিনি প্রস্তাব করলেন, আজ আর বেরিয়ে কী হবে? এখানেই খিচুড়ি-টিচুড়ি কিছু রেঁধে পিকনিক করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় রায়বাবু সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, আমি রান্না করতে রাজি আছি।

চৌধুরীবাবু বললেন, চলুন, তা হলে কিছু চিংড়িমাছ কিনে আনা যাক। আর ফুলকপি। খিচুড়ির সঙ্গে জমে যাবে!

ছোট একটা দল বাজারে যাবার জন্য তৈরি হতেই আমি জুটে গেলুম তাদের সঙ্গে। বাজারে যাওয়াও একটা অপূর্ব অভিজ্ঞতা।

বাজার মানে মার্কেট তো নয়, আজকালকার ভাষায় একে বলে শপিং মল। বিশাল জায়গা জুড়ে এক চমৎকার আধুনিক স্থাপত্যের নিদর্শন। এখানে সুঁচ-সুতো থেকে মোটরগাড়ি পর্যন্ত সবই পাওয়া যায়। দোতলা-তিনতলায় ওঠবার জন্য সিঁড়ির বদলে এলিভেটর, চতুর্দিকে শুধু কাচের দেয়াল, তার মধ্যে আলাদা-আলাদা জিনিসের ঘর। ইন্দ্রপুরীর মতন ঝকঝক করছে সব কিছু। আমার ছেলেবেলায় দেখা ফরাসিদেশের সঙ্গে এখনকার ফরাসিদেশের যেন অনেক অমিল। সে বারে দেখেছি প্রাচীন ঐতিহ্য, এবারে অনেক কিছুই টাটকা-নতুন। মাঝখানের দু-দশকে ফরাসিদেশ যেন হঠাৎ বড়লোক হয়ে গেছে।

মাছ-মাংসের দোকানে গিয়ে চোখ একেবারে ছানাবড়া হবার জোগাড়। এত রকমের খাদ্য! চিংড়ি মাছই পাঁচ-ছ'রকম, বিরাট-বিরাট লম্বা বান মাছ, তা ছাড়া গোল-চ্যাপ্টা-মোটা কতরকমের যে নাম না জানা মাছ, তার ঠিক নেই। মাংসের দোকানের বাইরে আস্ত-আস্ত খরগোশ ঝোলানো। খাঁচার মধ্যে পায়রা রাখা রয়েছে, যেটা পছন্দ হবে, সঙ্গে-সঙ্গে সেটা কেটেকুটে ঠিক করে দেবে। সেসব এক-একটা পায়রার সাইজ আমাদের দেশের পায়রার তিনগুণ। তারপর হাঁস, ঘোড়া, হরিণ, ভেড়া, গরু, শুয়োর আরও যে কত ছাল ছাড়ানো জন্তু তার ঠিক নেই। একসঙ্গে এত খাবার দেখলে গা গুলিয়ে ওঠে। পাশের তরকারির দোকানও কম যায় না, রাবণের সাইজের ফুলকপি আর ভীমের গদার সাইজের বেগুন। তার পাশের দোকানে অন্তত একশো রকমের কেক আর দুশো রকমের চিজ। মনে হয় যেন এত খাবার এক অক্ষৌহিণী সৈন্যও খেয়ে শেষ করতে পারবে না।

আমি চৌধুরীবাবুকে চুপিচুপি জিগ্যেস করলুম, আচ্ছা, ফ্রান্সের অনেক দোকানেই এত থরে থরে খাবার সাজানো দেখি। এত খাবার কে খায়? অথচ পাশের দেশ পোল্যান্ডে এখন দারুণ খাদ্যাভাব চলছে। কাগজে রোজই পড়ি, সেখানে মাংসের দোকানের সামনে লম্বা লাইন। তাও সবাই পায় না। বাচ্চাদের খাবারের পর্যন্ত শর্টেজ। ফ্রান্সের এত খাবার, এর কিছুটা এরা পোল্যান্ডে পাঠিয়ে দিলে পারে না?

চৌধুরীবাবু বললেন, নীললোহিতবাবু, আপনাকে আমি বেশি সরল বলব, না বোকা বলব? এরকম প্রশ্নের কোনও মানে হয়? বড়লোকের বাড়িতে কত খাবারদাবার থাকে, কত খাবার নষ্ট হয়, তা বলে কি বড়লোকেরা সেইসব খাবার গরিবদের দিয়ে দেয়?

আমি থতোমতো খেয়ে চুপ করে গেলুম। সত্যিই আমি মাঝে-মাঝে বড্ড বোকার মতন কথা বলে ফেলি। সেইজন্যই আমার চেনাশুনো লোকেরা মাঝে-মাঝে বলে, নীললোহিতটা একটা হাবা গঙ্গারাম!

॥ ৪ ॥

রোমে গিয়ে রোমানদের মতন আচরণ করাই বিধিসঙ্গত, এবং মোগলদের হাতে পড়লে মোগলাইখানা খাওয়াই উচিত হলেও ফ্রান্সে এসে ফরাসি ভাষার কথা বলার চেষ্টা করা খুব একটা সুবিধাজনক নয়। ফরাসিরা ইংরেজি বোঝে না, কিংবা বুঝতে চায় না আর ভাঙা-ফরাসি শুনলে ভুরু একেবারে কপালের শেষ সীমায় তুলে আনে।

আমার এক বন্ধু ফ্রান্স ঘুরে এসে বলেছিল, প্যারিসের চ্যাম্পাস এলিসিস্ রাস্তাটা বড় সুন্দর। তাই শুনে আমরা হেসেছিলুম। আমরা জানি, ইংরেজি বানানে প্যারিসের ওই বিশ্ববিখ্যাত রাস্তাটির নাম ওই রকম হলেও, আসলে ওই রাস্তাটির নাম সাঁজেলিজে। কিন্তু আমাদের এই অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী সম্বল করে ফ্রান্সে এলে কোনও লাভ হয় না। পথে কোনও ফরাসিকে যদি জিগ্যেস করি, সাঁজেলিজে কোন দিকে, সে অমনি ভুরু দুটো ধনুক করে ফেলে। পাঁচবার বললেও বোঝে না। আসলে, সাঁ জে লি জে এই প্রত্যেকটা মাত্রার উচ্চারণ অন্য রকম, যা আমাদের জিভে চট করে আসে না। একটু উচ্চারণের হেরফেরে খুব চেনা জিনিসও দুর্বোধ্য হয়ে যায়। কী এক প্রসঙ্গে একজন ফরাসি আমাকে পাঁচবার ধরে বলল, হ্রাদিয়ো, হ্রাদিয়ো! তখন আমারও ভুরুর অবস্থা সেইরকম। কী করে বুঝব যে সে বলতে চাইছে রেডিও!

এক অক্ষর ফরাসি না জানলেও কিন্তু ফরাসিদেশের ট্রেনে চলাচল করতে কোনো অসুবিধে হয় না। এই চমৎকার ব্যবস্থা দেখে চমৎকৃত না হয়ে উপায় নেই। হাতে একটা ম্যাপ থাকলে কারুকে কিছু না জিগ্যেস করেও ইচ্ছে মতন যেকোনও ট্রেনে চলাফেরা করা যায়। শুধু একটু ধৈর্য লাগে, প্রথম দু-একবার হয়তো স্টেশন ভুল হয়ে যায়। কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই, এদেশে একবার ট্রেনে চাপবার পর বারবার স্টেশন বদলাবদলি করলেও অতিরিক্ত পয়সা লাগে না।

হোটেলে থাকার পয়সা নেই, তাই উঠেছি এক বাঙালির বাড়িতে। অসীম রায় মশাইয়ের সঙ্গে আগে থেকে একটু চেনা ছিল, তিনি দয়া করে আশ্রয় দিয়েছেন। তাঁর বাড়ি একটু শহরতলিতে, প্যারিস থেকে কুড়ি-পঁচিশ মাইল দূরে। এদেশে শহরতলিতে থাকার তো কোনও অসুবিধে নেই, আমাদের কলকাতার মতন তো হাওড়া-শিয়ালদার দুই বিরাট সিংহ দরজা দিয়ে শহরে ঢুকতে হয় না লোকাল ট্রেন নামক আলুর বস্তায় বন্দি হয়ে!

অসীমবাবু প্রথম দিন একটু ট্রেনের ব্যবস্থাটা বুঝিয়ে দিলেন, তারপর থেকে আমি স্বাধীন। যখন খুশি যাই আসি। জানি যে, যেকোনও স্টেশনে নেমে দাঁড়ালেই পনেরো-কুড়ি মিনিটের মধ্যে ট্রেন আসবেই। ট্রেনে জায়গা পাওয়ার কোনও সমস্যা নেই। যেকোনও স্টেশন থেকেই দু-তিন বার ট্রেন বদলে আমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছোতে পারব। এক টিকিটেই যতবার খুশি ট্রেন বদলানো যায়।

এক-একটা স্টেশনকে মনে হয় ভুতুড়ে স্টেশনের মতন। কুলি-কামিন তো নেই বটেই, ইস্টিশন মাস্টার নেই, টিকিট চেকার নেই, এমনকী টিকিট ঘরও নেই। টিকিট কাটার যন্ত্র আছে, সেখানে পয়সা ফেললে টিকিট বেরিয়ে আসবে। পাতলা কাগজের টিকিট। গেট দিয়ে ঢোকার মুখে একটা ফুটোর মধ্যে সেই টিকিটটা ঢুকিয়ে দিলেই একটু দূরের আর একটা ফুটো দিয়ে টিকিটটা বেরিয়ে আসবে। সেখানে যে লোহার ডান্ডাটা পথ আটকে ছিল, সেটাও সরে গিয়ে পথ করে দেবে সঙ্গে-সঙ্গে।

আগের দিনের একটা পুরোনো টিকিট ঢুকিয়ে দিলে কিন্তু সেটা আর বেরিয়ে আসবে না। ডান্ডাটাও সরে যাবে না। ঠিক চিনতে পারে। আবার এখানে সাত দিনের জন্য সিজন টিকিট কিনতে পাওয়া

যায় বেশ সস্তা, সে-ও একখানাই পাতলা কাগজের টিকিট, আপাত দৃষ্টিতে দৈনিক টিকিট আর সিজন টিকিটের চেহারার কোনও তফাত নেই, গেটের ফুটোয় সেই টিকিট ঢোকালে গেটের যন্ত্র ঠিক বোঝে, দরজা খুলে টিকিটখানা ফেরত দেয়। সাত দিনের বেশি আট দিন ব্যবহার করতে গেলেই টিকিটখানা হজম হয়ে যাবে। আজব কাণ্ড একেই বলে।

স্টেশনে ঢোকবার গেট মাত্র কোমর সমান উঁচু। ডাণ্ডা খুলুক বা না খুলুক লাফিয়ে পেরিয়ে যাওয়া কিছুই শক্ত নয়। একটু হাই-জাম্প দিতে পারলেই হয়। তা ছাড়া দেখবার তো কেউ নেই। এমনও হয়েছে যেকোনও দুপুরে আমি এরকম কোনও স্টেশনে দ্বিতীয় কোনও যাত্রী পর্যন্ত দেখিনি। সুতরাং টিকিট না কেটেও কেউ হয়তো কখনও এরকম লাফিয়ে গেট পার হয়ে যায়। আমি একবারও চেষ্টা করিনি। যা সব ময়দানবের কারবার এদেশে। লাফিয়ে ডিঙোতে গেলে ওই লোহার ডাণ্ডাটাও লাফিয়ে উঠে মাথায় মারে কি না তাই-ই বা কে জানে!

বাঙালি পাঠক মাত্রই জানে যে প্যারিস শহরের ট্রেনের নাম মেত্রো, এবং তা মাটির নীচে। শহরতলির ট্রেন কিন্তু বেশিরভাগ জায়গাতেই মাটির ওপর দিয়ে যায়, দু-ধারের সব দৃশ্য চোখে পড়ে। তবে শহরতলিতেও অনেক স্টেশনই বেশ উঁচুতে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে হয়। আমার স্টেশনটা সেই রকম। একদিকে সিঁড়ি, অন্যদিকে এলিভেটর। সে এলিভেটর সারা দিন আপনাআপনি চলছে, লোক থাকুক বা না-ই থাকুক। এমনও হয়েছে যে দুপুরবেলা ট্রেনে চেপে দেখেছি, গোটা ট্রেনে সবসুদ্ধ দশ-পনেরো জন যাত্রী, আমার কামরায় আমিই আলেকজান্ডার সেলকার্ক!

ভূতুড়ে স্টেশন এই জন্য বলছি যে, স্টেশন মাস্টার, কুলি, টিকিটবাবু এইসব কিছু নেই তো বটেই, সিগন্যাল বদলটদলও আপনা-আপনি হয়। সবই নাকি কমপিউটার নামক দৈত্যের কীর্তি। ট্রেন একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় ঠিক সময় প্ল্যাটফর্মের ঠিক নির্দিষ্ট জায়গায় এসে থামে। আপনা-আপনি দরজা খুলে যায়, ঠিক এক মিনিট পরে আবার আপনিই দরজা বন্ধ হয়ে যায়, ট্রেন চলতে শুরু করে। আমার ধারণা, এই সব ট্রেনের কোনও ড্রাইভার থাকে না, অন্তত তাদের চোখে দেখা যায় না। আমি তো কখনও দেখিনি।

কামরার দুপাশে বিরাট-বিরাট কাচের জানলা। এক-এক সময় মনে হয় পুরো ট্রেনটাই কাচ দিয়ে তৈরি। কাচের এত বেশি ব্যবহার যে সম্ভব, ভারতবর্ষের বাইরে না এলে বোঝা যায় না। আমস্টারডামের ভ্যানগগ মিউজিয়ামের চার-পাঁচতলা বাড়িটার সব দেয়ালই তো বলতে গেলে কাচের। পুরোনো মিউজিয়ামগুলোর সামনে বিশাল মোটা-মোটা থাম, পুরু দেওয়াল, অট্টালিকার সৌন্দর্যই প্রথমে চোখ টানে। মনে হয় রাজপ্রাসাদ। লুভ্‌র্ মিউজিয়াম তো এককালে ফরাসি সম্রাটদের রাজপ্রাসাদই ছিল। সেই তুলনায় আধুনিক শিল্প ভবনগুলি অতি ছিমছাম। প্যারিসের নমতব শিল্প ভবন, যেটি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি পঁমপিদু-র নামে নামাঙ্কিত, সেই বাড়িটির স্থাপত্য নিয়ে তো দেশ-বিদেশে পক্ষে-বিপক্ষে বহু আলোচনাই হয়েছে। অনেকে এখনও খেদের সঙ্গে বলেন, ওটা দেখলে কি আর্ট গ্যালারি মনে হয়, না কারখানা?

দূর থেকে পঁমপিদু সেন্টার দেখে প্রথমে আমিও খানিকটা হতাশ হয়েছিলুম বটে, প্রথম নজরে কারখানার মতনই মনে হয়। কিংবা মনে হয় একটা অসমাপ্ত অট্টালিকা, এখনও অনেক কাজ বাকি; শুধুমাত্র কঙ্কালটা তৈরি হয়েছে। চতুর্দিকে মোটামোটা পাইপ, আর নানা রকম তার ঝুলছে, দেওয়াল-টেওয়াল তোলা হয়নি। পরে, ভালো করে ঘুরে দেখে আমি বাড়িটির প্রতি রীতিমতন মুগ্ধ হয়ে পড়ি। মনে হয় যেন ভবিষ্যৎকালের ভাস্কর্য, আগামী শতাব্দীর কোন প্রাসাদে এসেছি। অত বড় বাড়িতে সত্যিই কোনও দেওয়াল নেই, সবই জানলা, ইস্পাত আর কাচ ছাড়া সিমেন্ট-কংক্রিটের ব্যবহারই হয়নি। বাড়িটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে কাচের সুড়ঙ্গ যার নাম স্যাটেলাইট, তারমধ্যে আছে চলন্ত সিঁড়ি। প্যারিসের নতুন বিমানবন্দরেও এই স্যাটেলাইটের খুব প্রাবল্য। প্রায় মাইলখানেকের পথ এক পা-ও না হেঁটে পার হওয়া যায়। যেকোনও মিউজিয়াম বা আর্ট গ্যালারিতে ঘোরাঘুরি

করতে-করতে পা ব্যথা হয়ে যায়, পঁমপিদু সেন্টারে সে অসুবিধে নেই, মানুষ দাঁড়িয়ে থাকে, সিঁড়ি দৌড়োয়।

প্যারিস-মুখী ট্রেনের কাচের জানলার ধারে বসে বাইরের দৃশ্য দেখতে-দেখতে নিজের দেশের কথা মনে পড়ে। বেশ মনে আছে, ছেলেবেলায় আমরা প্রায়ই ট্রেনের জানলা দিয়ে ওঠানামা করতুম। তখন অত আগে থেকে রিজার্ভেশানের ব্যবস্থা ছিল না, যে আগে উঠে দখল করতে পারে, তারই জায়গা। পুজোর সময় দেওঘর-মধুপুরে যাবার সময় প্রত্যেক কামরার কাছে ভিড় ঠেলাঠেলি, সেই সময় বাবা-কাকারা আমাদের মতন ছোটদের চট করে জানলা গলিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দিতেন।

এখন সব ট্রেনের জানলায় লোহার গরাদ। তাতে জানলা দিয়ে লোকজনের ওঠানামা বন্ধ হয়েছে বটে কিন্তু আর একটা জিনিস বন্ধ করা যায়নি। বছরখানেক আগে আমি একদিন মেচেদা লোকালে চেপে হাওড়া ফিরছিলুম, তখন ঠিক দুপুর। কামরায় যথেষ্ট ভিড় থাকলেও আমি সৌভাগ্যবশত জানলার পাশে একটা সিট পেয়ে দুধারের পানা-পুকুর ও সদ্য ধানকাটা শূন্য প্রান্তরের সৌন্দর্য উপভোগ করছিলুম, এমন সময় থপ করে এক তাল গোবর আমার কানের পাশে ও ঘাড়ে এসে লাগল। এমনই চমকে উঠেছিলুম যে মনে হয়েছিল কেউ আমায় গুলি করেছে। সহযাত্রী অনেকেই হেসে উঠল, যারা দাঁড়িয়ে ঝুলতে-ঝুলতে যাচ্ছিল তাদের মনের ভাব যেন, খুব তো আরামে জানলার কাছে বসে যাওয়া হচ্ছিল, এবার হল তো? কয়েকজন বলল, তবু তো আপনার কিচ্ছু হয়নি, শুধু গোবর, এসব জায়গায় এই এত বড় সব থান ইট ছুড়ে মারে, এই তো পরশুদিনই একজনের মাথা ফেটে গেসল...।

এখানেও আমি এক দুপুরের ট্রেনের যাত্রী। এই কাচের ট্রেনে যদি কেউ ইট ছুড়ে মারে...কিন্তু কে মারবে, রাস্তায় তো একটাও লোক নেই। এই সব শহরতলি অঞ্চলে দুপুর কেন, সকাল বা সন্ধেবেলাতেও ক্বচিৎ পায়ে-হাঁটা মানুষ দেখা যায়। আর ফ্রান্সে এসে এ পর্যন্ত একটাও বাচ্চা ছেলে-মেয়ে দেখেছি কি না মনেই পড়ে না। ছোট ছেলেমেয়েদের যে এরা কোথায় লুকিয়ে রাখে তা কে জানে!

বাইরের দুধারের দৃশ্যকেও দৃশ্য না বলে কাল্পনিক ছবি বললেই ভালো মানায়। পুতুলের বাড়ির মতন সব রঙিন, চুড়োওয়ালা বাড়ি। আমরা সমতল ছাদ দেখতে অভ্যস্ত, এদের সব বাড়ির ছাদ ত্রিকোণ। ফ্রান্সে আকাশ-ঝাড়ু বাড়ি অর্থাৎ স্কাই-স্ক্র্যাপার এখনও তেমন বেশি নয়। প্যারিস শহরে কয়েকটি উঠতে শুরু করেছিল, পরে, শহরের সৌন্দর্য নষ্ট হবে বলে সেরকম বাড়ি তৈরি নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখন শহরতলির দিকে সেরকম কিছু বাড়ি উঠলেও এখনও চোখকে তেমন পীড়া দেয় না। ট্রেনের জানলায় দুপাশে অধিকাংশ বাড়িই ছবির বাড়ির মতন। ফরাসিদের বাড়ির সামনে যাহোক ছোটখাটো একটা বাগান থাকবেই। সেই সব বাগানে প্রধান ফলের গাছ দুটি, আপেল ও ন্যাসপাতি। এ ছাড়া আঙুর, বেদানা, স্ট্রবেরি ইত্যাদি। আমরা বরাবর জানি, খুব অসুখ-বিসুখ করলে সান্ত্বনা হিসেবে ওই সব দামি ফল খেতে দেওয়া হয়। কিংবা হাসপাতালে কারুকে দেখতে গেলে নিয়ে যেতে হয়। কিন্তু সেই সব দুর্মূল্য ফল রাস্তার দুপাশে ঝুড়ি-ঝুড়ি ফলে আছে, এ কি আমাদের বাঙালি চোখে সহজে বিশ্বাস হয়।

এ ট্রেনের কামরায় আমি যখন উঠেছিলুম, তখন আর কেউ ছিল না। দু-স্টেশন পরে একজন বছর পঁয়ত্তিরিশেক বয়েসের ভদ্রমহিলা উঠেছেন, তার তিন স্টেশন পরে একটি কুচকুচে কালো যুবক। তার শরীরটি এমনই মজবুত যে কয়েক পলক তাকিয়ে দেখতে হয়। মহিলাটি একটি রঙিন পত্রিকা খুলে রেখেছেন চোখের সামনে, আর যুবকটি পা ছড়িয়ে প্রায় ত্রিভঙ্গ মুরারি অবস্থায় বসে বেশ গলা ছেড়ে গান শুরু করে দিল। ব্যক্তি স্বাধীনতার দেশ, এ দেশে কারুর কোনও ব্যবহারেই কেউ বাধা দেয় না। অন্যের খুব একটা অসুবিধে না হলেই হল। ট্রেনের কামরায় গান জিনিসটা নিশ্চয়ই কোনও অসঙ্গত ব্যাপার নয়। আমি তো আমার দেশে যখন লোকাল ট্রেনে চাপি, তখন

ভিড় আর গরমের মধ্যে যখন যখন ভিখারিরা এসে গান শোনায়, সেইটুকু সময়ই স্বস্তি পাই। আমাদের লোকাল ট্রেন খানিকটা সহনীয় করে রেখেছে ওইসব গায়করাই।

এই কালো ছেলেটির গানের গলা বেশ ভালো। এমন সুদেহী একজন যুবকের কণ্ঠস্বরও যে এত সুরেলা হবে, তা যেন ঠিক বিশ্বাস করা যায় না। হয়তো সে একজন পেশাদার গায়ক। গানের কথাগুলি ফরাসি, সুতরাং আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না। কিন্তু সুরটা খুব বিষাদ মাখা। এই ছেলেটি ন্যাট কিং কোলের কোনও ভাইটাই নয়তো? প্রকৃতির কি বিচিত্র খেলা, গান আর ঘুঁষোঘুঁষির মতন দুটি পরস্পর বিরোধী ব্যাপার কুচকুচে কালো মানুষরাই প্রায় একচেটিয়া করে রেখেছে।

আবার নিজের দেশের কথা মনে পড়ল। তুলনাও এসেই যায়। ভাবা যায় কি, খড়দা কিংবা এঁড়েদা স্টেশান থেকে আমি লোকাল ট্রেনে চেপে শিয়ালদায় যাচ্ছি, কামরায় মাত্র তিনজন যাত্রী, তার মধ্যেও একজন আবার ন্যাট্ কিং কোলের ভাই, যে বিনা পয়সায় দুর্দান্ত গান শোনাচ্ছে। একটা দেশে যে কত লোক বেকার, তা বোঝা যায় দুপুরবেলার ট্রেনে বা রাস্তায় জনসংখ্যা দেখে। আমাদের দেশে তো প্রত্যেকটি নিশ্বাসের সঙ্গে-সঙ্গে কয়েক হাজার জনসংখ্যা বাড়ে। ফ্রান্সে নাকি জনসংখ্যা কমতির দিকে। এদেশে নাকি যে মা বেশি সন্তানের জন্ম দেয়, সেই মা সরকারের কাছ থেকে টাকা পায়। সত্য, সেলুকাস!

দুপাশের রৌদ্র ঝলমল প্রকৃতি ছেড়ে ট্রেনটা যখন অন্ধকারে ডুব দেয়, তখন বুঝতে পার প্যারিস শহরের হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি এসে গেছি। দিনে-দুপুরে ঘুটঘুটে অন্ধকারে ট্রেন যাত্রা আমি ঠিক পছন্দ করতে পারি না। এবারে নামবার জন্য তৈরি হই।

এক সময় প্যারিসে লে আল অঞ্চলে একটি বিখ্যাত কাঁচা বাজার ছিল। আগেকার অনেক গল্প-উপন্যাসে সেই নৈশ বাজারের বর্ণনা আছে। এখন সেই প্রাচীন বাজার ভেঙেচুরে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে সেখানে সব নতুন হর্ম্য আর বিপণি তৈরি হয়েছে। সেটাই তো যুগের নিয়ম। কিন্তু আমি ছেলেবেলায় একবার ক্যানিং শহরের রাতের বাজার দেখতে গিয়েছিলুম। প্রায় কুড়ি বছর পরে আবার ক্যানিং-এ গিয়ে দেখি, বাজারের চেহারা অবিকল একই রকম আছে, শুধু রাস্তাঘাট বেশি ক্ষয়ে গেছে আর জলকাদা বেড়েছে। কিন্তু গল্প-উপন্যাসে জলকাদা মাখা প্যারিসের লে আল বাজারের যে বর্ণনা পড়েছি সে তুলনায় এখনকার লে আল চিনতেই পারা যায় না।

লে আল নামে দুটি স্টেশন আছে। একটি শুধু লে আল আর অন্যটি সাত্‌লে-লে আল। কিন্তু আমি যে ট্রেনে চেপেছি, তার কামরার নির্দেশনামা পড়ে দেখলুম, এ ট্রেন ও দুটো স্টেশনের কোনওটাই ছোঁবে না। যাবে শুধু সাত্‌লে নামে আর একটি স্টেশনে। চিন্তার কিছু নেই, ওই সাত্‌লেতে নেমে ট্রেন বদলে আমার অভীষ্ট স্টেশনে চলে গেলেই হবে।

সবগুলো নয়। কিন্তু প্যারিসের মেট্রোর কয়েকটি স্টেশন এতই সুন্দর আর চাকচিক্যময় যে শুধু স্টেশনটাই ঘুরে-ঘুরে দেখতে ইচ্ছে করে। একতলা-দোতলা-তিনতলায় আলাদা-আলাদা লাইন তো আছে বটেই তা ছাড়া গঠন শৈলীও বড় অপরূপ। লুভ্‌র্ নামে স্টেশনটিতে নামলেই বোঝা যায় যে বিশ্ব বিখ্যাত মিউজিয়ামের পাড়ায় এসে পড়া গেছে। কারণ, স্টেশনেই সমস্ত বড়-বড় শিল্পীদের কাজের নমুনা রয়েছে। কোনও-কোনও স্টেশন যেন পাতালের রাজপুরী। এত আলো, এত সাজ সজ্জা, এত দোকানপাট যে মনেই থাকে না, মাটির দুতিন তলা নীচে রয়েছি।

সাত্‌লে স্টেশনটিও এরকম বৃহৎ ও সুসজ্জিত। সেখানে নেমে একটি বৃত্তান্ত জেনে চমৎকৃত হলাম। সেখান থেকে সাত্‌লে-লে আল যেতে হলে ট্রেন বদলেও যাওয়া যায়, অথবা দুই স্টেশনের মাঝখানে চলন্ত রাস্তা ও চলন্ত সিঁড়ি আছে। সেখানে গিয়ে দাঁড়ালে বিনা পরিশ্রমেই পৌঁছনো যাবে। ধরা যাক, আমাদের বালি আর উত্তরপাড়ার মতন কাছাকাছি স্টেশন, ইচ্ছে করলে ট্রেনেও যেতে পারি, অথবা চলন্ত রাস্তাই আমায় নিয়ে যাবে!

আমি মস্কো যাইনি এখনও। প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখে শুনেছি, মস্কোর পাতালরেল নাকি আরও সুন্দর,

স্টেশনগুলি প্রত্যেকটিই অপরূপ, মনোহর। আগে মস্কো যাই একবার, নিজের চোখে দেখে বিশ্বাস করব। আমি বিলেতে একাধিকবার গেছি বটে, কিন্তু কার্যকারণবশত একবারও টিউবে চড়া হয়নি। কেন জানি না, বিলেতের লোকেরা আমাকে বোধহয় কোনও মহারাজা-টহারাজা বলে ভুল করে। সেই জন্য গাড়িতে-গাড়িতে ঘোরায়। যাই হোক, বিলেতের টিউব ট্রেন সম্পর্কেও খুব একটা আহামরি প্রশংসা শুনিনি কারুর মুখে। নিউইয়র্ক বা শিকাগো সাবওয়ে চাপলে সর্বক্ষণ মনে হয় দমবন্ধ হয়ে আসছে। তা ছাড়া বেশ নোংরা। নিউ ইয়র্কের সাবওয়ের প্রত্যেক ট্রেনের ভেতরে-বাইরে হিজিবিজি দাগ কাটা। স্টেশনগুলো নিছক কালো, নিষ্প্রাণ, রাতের দিকে নিরিবিলিতে গেলে গা ছমছম করে। নিউ ইয়র্কের একমাত্র গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল স্টেশন ছাড়া আর কোনও স্টেশনেরই কোনও সৌন্দর্য নেই। নিউ ইয়র্ক কিংবা শিকাগোর শহরতলির ট্রেন অবশ্য বেশ জমকালো, শিকাগোতে দোতলা ট্রেনও আছে। কিন্তু ভাড়া ভয়ানক বেশি। আর দু-একটা জিনিস দেখলে আমাদেরও হাসি পায়।

সাধারণভাবে মনে হতে পারে যে পৃথিবীর যে-কোনও দেশের তুলনায় আমেরিকার ট্রেন অনেক বেশি যন্ত্র নির্ভর হবে। কিন্তু ঠিক তার উলটো। শিকাগো বা নিউ ইয়র্কের শহরতলির ট্রেনে চাপা মাত্র চেকার এসে টিকিট দেখতে চায়। শহরতলির স্টেশনগুলো এঁড়েদা-খড়দার চেয়েও খারাপ। সব চেয়ে মুশকিল, রাত্তির বেলা ঠিক স্টেশন খুঁজে পাওয়া। স্টেশনগুলোতে টিমটিম করে আলো জ্বলে, কোথায় যে সে স্টেশনের নাম লেখা থাকে খুঁজেই পাওয়া যায় না। ফ্রান্সের মতন প্রত্যেক কামরায় পরপর সব স্টেশনের নাম লেখাও থাকে না। সেইজন্য, এই যন্ত্রযুগেও প্রতিটি স্টেশন এলে ট্রেনের কন্ডাক্টরবাবু হেঁড়ে গলায় সেই স্টেশনের নামটা শুনিয়ে দেন। কিন্তু বাইরের লোকের পক্ষে সেই উচ্চারণ শুনে বোঝা অতি দুষ্কর। 'ম্যা ভ্যানন্' শুনে কার বাপের সাধ্য বোঝে, যে সেটা মাউন্ট ভার্নন? নিউ ইয়র্ক থেকে মাত্র পঁচিশ মাইল দূরের স্টেশনে এখনও কাঠের সিঁড়ির ওভারব্রিজ আছে, প্যারিসে বসে যা বিশ্বাসই করা যায় না।

অবশ্য, গোটা আমেরিকাতেই এখন ট্রেন-ব্যবস্থা অতি মুমূর্ষু। অর্ধেক রেল-রুট এর মধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে, দশ-পনেরো বছর পর হয়তো ট্রেন নামক প্রাণীটি এ দেশ থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সে দেশ এখন আকাশে উড়ন্ত। কোথাও-কোথাও বাস ভাড়ার চেয়ে প্লেন ভাড়া সস্তা।

আমি প্যারিস ও শহরতলির ট্রেন ব্যবস্থার কথা সবিস্তারে লিখলুম এই জন্য যে কয়েক বছর পরেই তো কলকাতার পাতালরেল চালু হচ্ছে। তখন মিলিয়ে দেখতে হবে। আমার তো ধারণা, কলকাতার পাতালরেল প্যারিসের চেয়ে, এমনকী, মস্কোর চেয়েও সুন্দর ও আধুনিক হবে অনেক বেশি।

॥ ৫ ॥

প্যারিস থেকে লন্ডনে বিমানে উড়ে আসতে সময় লাগে একঘণ্টা। দুই দেশের মধ্যে সময়ের ব্যবধানও একঘণ্টা। অর্থাৎ বিকেল পাঁচটার প্লেনে প্যারিস থেকে যাত্রা করলে আবার বিকেল পাঁচটাতেই লন্ডনে পৌঁছোনো যায়। মাঝখানকার একটা ঘণ্টা, যে আমার আয়ু খরচ হয়ে গেল সেটা কী করে মেলাব কে জানে। কিংবা এই এক ঘণ্টা আয়ু অন্য কোন সময়ে আবার ফেরত দিতে হবে।

হিথরো বিমানবন্দর সম্পর্কে আমাদের পূর্ব সংস্কার মোটেই ভালো নয়। অনেক রকম গল্প শুনেছি, খবরের কাগজেও অনেক রকম অপ্রীতিকর ঘটনার কথা পড়া আছে। ভারতীয়দের সেখানে নানারকম হয়রানি করা হয়, একবার আমাদের এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে পর্যন্ত ঢুকতে দেওয়া হয়নি, ভারতীয় মেয়েদের নাকি বিবস্ত্র করে কুমারীত্বের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে, ইত্যাদি।

অনেকেই বিলেত যাওয়ার আগে এনট্রি পারমিট সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। আমার সেসব কিছুই নেই। হুড়ুড়-ধাড়ুস করে বেরিয়ে পড়া, ওসব জোগাড় করার সময়ই পাইনি। হিথরো এয়ারপোর্টে নেমে আমার একটু-একটু অস্বস্তি বোধ হল। ঢুকতে দেবে তো?

অনেকদিন আগে, প্রায় বাল্যকালে আমি যখন লন্ডনে এসেছিলুম, সেবার আমার ছবি হাতে নিয়ে এক মেমসাহেব এই এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করেছিল আমার জন্য। আমাকে সে চেনে না, আমিও তাকে চিনি না, সেইজন্য আমার ছবি সে উঁচু করে তুলে ধরেছিল। এবার সেরকম কোনও ব্যাপার নেই, তা ছাড়া অবস্থাও অনেক বদলে গেছে। এখন যা সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে, তাতে আমার মনে হয়, কমনওয়েলথ ব্যাপারটা ন্যাকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্য যে-কোনও দেশের মতন ব্রিটেনের সঙ্গেও ভারতের সরাসরি ভিসা ব্যবস্থা রাখাই উচিত। ভারতের অন্য কমনওয়েল্থ দোস্ত কানাডাও তো কয়েকদিন আগে ভারতীয়দের জন্য ভিসার সম্পর্ক করে দিল।

ইমিগ্রেশান কাউন্টারে শ্বেতাঙ্গদের জন্য একরকম ব্যবস্থা, আর আমার মতন কালো বা খয়েরিদের জন্য অন্যরকম। দাঁড়ালুম একটা লাইনে। আগের লোকদের নানারকম জেরা করা হচ্ছে। তখনই ঠিক করে রাখলুম, যদি বেশি উলটোপালটা কথা বলে, সাফ বলে দেব, যাব না তোমাদের দেশে, যাও! বিলেত যেতেই হবে এমন কোনো মাথার দিব্যি কেউ দেয়নি। ফেরার টিকিট পকেটেই আছে, পরের প্লেনেই ফিরে যাব।

আমার কাউন্টারে এক তরুণী মেম। ব্যবহারের হেরফেরের জন্য সুশ্রী মুখকেও যে কত অসুন্দর লাগে, তা বোঝা যায় এই সময়। মেয়েটির বয়েস পঁচিশের বেশি না, চোখ-নাক-ঠোঁট সবই সুন্দর, কিন্তু মুখে একটুও হাসি নেই, আর কী কঠোর দৃষ্টি! আমার পাসপোর্টটা বেশ খানিকক্ষণ উলটোপালটা দেখল, তারপর নীরব নীরস গলায় বলল, তুমি লন্ডনে এসেছ কেন?

কেন? সেরকম তো কোনও গূঢ় জরুরি উদ্দেশ্য নেই। সাঁওতাল পরগনা কিংবা সুন্দরবনে যাই কেন? সেইরকমই আলগা উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি। এসেছি আমার বাল্যবন্ধু ভাস্করের সঙ্গে আড্ডা দিতে আর পিকাসোর একটা আলাদা ধরনের ছবির প্রদর্শনী হচ্ছে সেটা দেখতে। কিন্তু এই কথা কি এই রূঢ়লোচনা যুবতীটি বিশ্বাস করবে? নাকি বলব, ওগো, আমি তোমাদের দেশে চাকরিও খুঁজতে আসিনি কিংবা বেশিদিনের জন্য তোমাদের এই ছোট্ট দ্বীপটির ভারবৃদ্ধিও করতে চাই না।

সে কথা না বলে আমি শুধু বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা আর ছবির প্রদর্শনীর কথাই জানালুম। মেয়েটি কয়েকপলক তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে। আমি ভাবলুম, এবার সে নিশ্চয়ই আমার কাছ থেকে সেই বন্ধুর ঠিকানা কিংবা তার কোনও চিঠিপত্র দেখতে চাইবে। কাঁধের ঝোলার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে চিঠি খুঁজছি মেয়েটি অকস্মাৎ তার চেয়ার ছেড়ে উঠে গেল।

তারপর সে আর আসে না, আসেই না। আমি দাঁড়িয়ে আছি। আমার পাসপোর্টটা তার টেবিলের ওপব রাখা। একটুবাদে পাশের কাউন্টার থেকে একজন উঠে এসে আমার পাসপোর্টটা নেড়েচেড়ে দেখে বলল, তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন? তোমায় তো ছেড়ে দিয়েছে!

খানিকটা বিভ্রান্ত অবস্থার মধ্যে আমি দিব্যি বেরিয়ে গেলুম বাইরে, আর কেউ একটাও প্রশ্ন করল না।

হিথরো এয়ারপোর্টে যে আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে তা আমি বলতে পারি না। একটিমাত্র প্রশ্ন করে আমায় ছেড়ে দিয়েছে, কোনওরকম কাগজপত্রও দেখতে চায়নি। কিন্তু ওই মেয়েটি একবারও হাসল না, আর হঠাৎ উঠে চলে গেল কেন? ওই তাচ্ছিল্যটাই ভীষণভাবে গায়ে বেঁধে।

ভাস্কর বাইরেই দাঁড়িয়েছিল, উঠলুম ওর গাড়িতে। ও আবার শুধুমাত্র বাঁহাতের দুটো আঙুল স্টিয়ারিং-এ রেখে গাড়ি চালায়। রাস্তার লোকজনদের ও ধুলো জ্ঞান করে। অনেকদিন আগে ভাস্কর দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে বিলেতে এসেছিল। ইংরেজ মুচি দিয়ে জুতো পালিশ করাবে আর লন্ডনে নিজের নামে একটা রাস্তা করে দিয়ে তারপর দেশে ফিরবে। ওর দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি প্রায় সফল হয়ে এসেছে।

কয়েকদিন তো তুমুল আড্ডা ও ঘোরাঘুরি হল। কিন্তু আমার মাঝে-মাঝেই মনে পড়ে ইমিগ্রেশান কাউন্টারের সেই মেয়েটির কথা। কেন সে অমন অদ্ভুত ব্যবহার করল? তার চোখে আমি কি একটা

মানুষ না? রাস্তাঘাটে, দোকানে কিংবা যে-কোনও জায়গায় কোনও ইংরেজ নারী-পুরুষের সঙ্গে কথা বলতে গেলে আমার দ্বিধা হয়, যদি ওই রকম নীরব অভদ্রতা দেখায়।

মন ভালো করার জন্য গেলুম রাজকীয় শিল্প প্রদর্শনী ভবনে। টেম্‌স নদীর ধারে লন্ডন ব্রিজের অদূরে নতুন তৈরি হয়েছে একই সঙ্গে নাট্যশালা, শিল্প প্রদর্শনী ভবন, চলচ্চিত্র ও কনসার্ট হল মিলিয়ে বিশাল এক সুরম্য হর্ম্য। সঙ্গে আছে রেস্তোরাঁ, অথবা ইচ্ছে করলে ছাদে বসে নদী ও নগরীর শোভা দেখতে-দেখতে নিজস্ব ওয়াইন ও স্যান্ডউইচের জলখাবার সেরে নেওয়া যায়।

এখানেই মহাসমারোহে চলছে পিকাসোর প্রদর্শনী, যার নাম পিকাসো'জ পিকাসো। অর্থাৎ পিকাসোর নিজের কাছে তাঁর নিজের আঁকা সারা জীবনের যে ছবির সঞ্চয় ছিল, তার উত্তরাধিকারীরা এই প্রথম তা বার করে দেখাচ্ছেন সর্বসাধারণকে। নিজের ছবির ব্যাপারে পিকাসো খুব আঁটিসুঁটি ছিলেন, অনেক ছবি ব্যাঙ্কের ভল্টে রেখে দিতেন, তা সবাই জানে। এই প্রদর্শনীটি বিশাল তো বটেই, এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পিকাসোর প্রথম যৌবন থেকে তার পরবর্তী শিল্পী-জীবনের পরিবর্তনগুলো পরিষ্কার বোঝা যায়।

এইসব ছবি সম্পর্কে বিশদ করে কিছু বলা আমার সাজে না। সে ভার রয়েছে শিল্পবোদ্ধাদের ওপর। আমি সাধারণ মানুষ, ছবি দেখতে ভালো লাগে তাই দেখি। তবু একটা কথা না বলে পারি না। ছবিগুলো দেখতে-দেখতে অনেক সময় যেমন বিস্মিত হয়ে যাই; তেমনি মাঝে-মাঝে আবার মর্মাহতও হতে হয়। অনেক ছবিতেই পিকাসোর শক্তিমত্তার পরিচয় পেয়ে হতবাক হয়ে যাওয়ার মতন, মনে হয় এ-লোকটা মানুষ নয়, দৈত্য, রেখা-রং আয়তনকে ব্যবহার করার এক অলৌকিক শক্তি ছিল এর দখলে। নইলে এত বিস্ময়কর আর এত বেশি ছবি একটা মানুষ আঁকতে পারে এক জীবনে? আবার অনেক ছবি দেখে একথাও মনে হয়, এসব কি ছবি, না ইয়ার্কি? পৃথিবীর যাবতীয় শিল্প বোদ্ধাদের বোকা বানাবার জন্য পিকাসো এসব নিজস্ব মজা করেছেন। এ কথাও বলতে ইচ্ছা করে, জীবনের অর্ধেক পর্যন্ত এই লোকটা প্রকৃত শিল্পী ছিল, বাকি জীবনটা ছিল উন্মাদ, আর স্রেফ প্রচারের জোরে বিশ্বের এক নম্বর শিল্পী হয়েছে।

একখানা বিকট মুখের সামনে দাঁড়িয়ে আমি ভাস্করকে জিগ্যেস করলুম, কী বুঝছিস? এটাও শিল্প?

ভাস্কর বললে, ব্যাটাছেলে এখান থেকে ফর্ম ভাঙা শুরু করেছিল। এরপর থেকে ও মানুষকে ক্রমাগত ভেঙে তুবড়ে দিয়েছে।

আমি বললুম, কিন্তু যে ছবি দেখে ভয় হয় কিংবা মুখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে হয়, সেরকম ছবি আঁকার মানে কী?

—ছবির বুঝি মানে থাকে?

ক্রমশ ভাস্কর আর আমি দূরে দূরে সরে গেলুম। আমার গোড়ার দিককার ছবি দেখতেই ভালো লাগছিল। মনে হয় যেন নারীজাতি সম্পর্কে পিকাসোর সারাজীবনের কোনও শ্রদ্ধা ছিল না। প্রথমদিকে নগ্ন নারী শরীর নিয়ে তিনি অনেক কাণ্ড করেছেন। কিন্তু সেই সব নারীরা আমাদের কাছে কোনও ভাষাই প্রকাশ করে না। একজন ভাঙাচোরা চেহারার বৃদ্ধ বেহালাবাদকও পিকাসোর ছবিতে কত বাঙ্ময়, সেই তুলনায় পিকাসোর নারীরা শুধুই যৌন-অবয়ব।

একজোড়া ব্রিটিশ দম্পতি মনোযোগ দিয়ে একটি ছবি দেখছিল, আমি পাশে গিয়ে দাঁড়াতে সরে গেল অন্যদিকে। তখন খেয়াল করলুম, আরও দু-একটা ছবি দেখার সময় আমি যেতেই ওরা সরে গেছে। আমার ছায়া গায়ে লাগলে কি ওদের এঁটো হয়ে যাওয়ার ভয়? শিল্প প্রদর্শনীতে সাধারণত এমনভাবে আলোর ব্যবস্থা থাকে যাতে কারুর কোনও ছায়া না পড়ে। তবে কি আমার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের হাওয়া ওদের গায়ে লাগলে গা জ্বলে যায়?

কিংবা এমনও হতে পারে, এটা আমার মনের ভুল। নিছক কাকতালীয়। আমি পাশে দাঁড়িয়েছি।

ওরা এমনিই অন্য ছবির কাছে চলে গেছে। ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য এবারে আমি ইচ্ছে করে আবার ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম। পুরুষটি তার সঙ্গিনীকে কী যেন বোঝাচ্ছিল, মাঝপথে কথা থামিয়ে ওরা সরে গেল তাড়াতাড়ি। এটাও কাকতালীয়? আমার আবার মনে পড়ে গেল, এয়ারপোর্টের কাউন্টারের সেই তরুণীটির মুখ।

বিলেতে সকলেরই দু-চারজন পরিচিত ইংরেজ থাকে। কোথাও কোনও কবির সঙ্গে দেখা হয়, কোনও বন্ধুর সাহেব-মেম, বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গে আলাপ হয়। তারা কি কথা বলে না? হাসে না? তা কেন করবে না? হাতে হাত ঝাঁকায়, অনর্গল গল্প করে।

কিন্তু অন্য কোথাও অপরিচিতি ইংরেজের সঙ্গে চোখাচোখি হলেই, আমি যেন টের পাই, তারা সঙ্গে-সঙ্গে মুখে একটা কঠিন আবরণ টেনে আনে। সারা শরীরে ফুটে ওঠে অপছন্দের ইঙ্গিত। ইংরেজ জাতি এমনিতেই থাকে খোলসের মধ্যে, চট করে কোনও অচেনার সঙ্গে ভাব করে না, কিন্তু আমাকে দেখামাত্র কেন কোনও ইংরেজের হাসি-হাসি মুখ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যাবে? কলকাতার রাস্তায় কোন সাহেবকে দেখলে আমি তো মুখ গোমড়া করি না।

আর একদিন একটা রেস্তোরাঁয় খেতে গেছি, পাশের টেবিলে এক প্রৌঢ় দম্পতি। আমরা বসবার খানিকটা পরেই সেই দম্পতি তাদের খাবার অসমাপ্ত রেখে উঠে চলে গেল। যতক্ষণ তারা বসেছিল, ততক্ষণ তারা একটিবারের জন্যও আমাদের দিকে চায়নি। আমি চোরা চাহনিতে ওদের লক্ষ করছিলুম, ওরা পরস্পর একটাও কথা বলেনি পর্যন্ত।

আমি ভাস্করকে জিগ্যেস করলুম, ওরা হঠাৎ উঠে গেল কেন রে?

ভাস্কর বলল, নিশ্চয়ই বড় বাথরুম।

আমি বললুম, আমাদের পাশে বসে খাবে না, সেইজন্য উঠে গেল?

ভাস্কর আমার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন আমি একটা উদ্ভট কথা বলছি।

তাহলে কি এটাও আমার মনের ভুল? হয়তো ওরা এমনিই উঠে গেছে। আমরাও অনেক সময় পুরো খাবার খাই না। কিংবা ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া চলছিল। কিংবা ওরা স্বামী-স্ত্রী নয়, লোকটি এসেছে পরস্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে, দূরে, অন্য কোনো লোককে দেখে উঠে গেছে।

কিংবা ভাস্কর চোদ্দো-পনেরো বছর ধরে আছে বলেই ওর এসব চোখে পড়ে না, আমি নতুন এসেছি বলেই টের পাচ্ছি। কিংবা এয়ারপোর্টের সেই মেয়েটি আমার মাথার মধ্যে এই চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়েছে।

শুনেছি, একসময় আমাদের দেশের ট্রেনে ফার্স্ট ক্লাসের কামরায় কোনও ভারতীয়কে দেখলে ইংরেজরা জোর করে নামিয়ে দিত। ইংরেজদের জন্য আলাদা পাড়া, আলাদা ক্লাব, আলাদা সুইমিংপুল ছিল, যেখানে ভারতীয়দের তারা ঢুকতে দিত না। ইংরেজদের সেই প্রতাপ অনেকদিন আগেই শেষ হয়ে গেছে। এখন খোদ লন্ডন শহরে বসে ভারতীয়রা ইংরেজ পুলিসদের ঠ্যাঙানি দেয়। আমাদের মতন কালো মানুষদের গায়ের জোরে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে না বলেই কি ওরা এখন নিজেরাই দূরে-দূরে সরে যায়? নিজের দেশে বসেও!

জওহরলাল নেহরু যে স্কুলে পড়তেন, সেই হ্যারো স্কুলের কাছাকাছি আমার বন্ধুর বাড়ি। ছোট টিলার ওপর স্কুল, তার পাশের উপত্যকাটি বসতি এলাকা। বেশ শান্ত, নির্জন পাড়া। লন্ডনে দাঙ্গাহাঙ্গামা হলে আমরা কলকাতায় বসে উদ্বেগ বোধ করি আমাদের চেনাশুনো বন্ধুদের জন্য। কিন্তু সেরকম কোনও গোলমাল এই মিডলসেক্সে হয়নি। সেরকম পাড়া আছে লন্ডনে যেখানে সন্ধেবেলা রাস্তায় হাঁটলে মনে হতে পারে গুজরাট কিংবা পাঞ্জাবে চলে এসেছি। শুধু হিন্দি জানলেই সেখানকার দোকান-টোকানে কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়। সিঙারা-কচুরির গন্ধ রাস্তায় ভুরভুর করে। একলা কোনো ইংরেজকে ক্বচিৎ দেখা যায় সেসব পাড়ায়।

কিন্তু আমরা যেখানে আছি সেটা পুরো সাহেবপাড়া। দু-একজন বাঙালির বাড়ি আছে এখানে।

সন্ধেবেলা জমিয়ে আড্ডা হচ্ছে, আরও কয়েকজন এসেছেন, কথায়-কথায় আমরা চলে যাচ্ছি প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে। একসময় অশোক বলল, ভাস্করদা, আপনার চেনা কেউ বাড়ি কিনবে? আমাদের পাশের বাড়িটা বিক্রি আছে, বেশ সস্তায় ছেড়ে দিচ্ছে...

ভাস্কর বলল, তোমাদের পাশের বাড়ি? কোনটা? সেই বুড়োর, জেম্‌সন না কী যেন নাম...

—হ্যাঁ সেই বাড়িটা!

—মাত্র তো বছরদেড়েক আগে বাড়িটা বানাল...সুন্দর বাগান করেছে, আমি একদিন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছিলুম, বুড়োর সঙ্গে আলাপও হল,...হঠাৎ বাড়িটা বিক্রি করে দেবে কেন?

—তার পরের বাড়িটাতে একটা নিগ্রো ফ্যামিলি এসে উঠেছে।

—কবে?

—গত মাসে। ওরা সে বাড়িটা কিনেছে কি না বোঝা যাচ্ছে না, মোটকথা উঠেছে একটা নিগ্রো ফ্যামিলি (ওদেশে এখন নিগ্রো কথাটা উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ, বলতে হয় ব্ল্যাক)....

—সেইজন্য বুড়ো তার অত শখের বাড়ি বেচে দেবে?

—মিসেস জেম্‌সনের একটু ইচ্ছে নেই, অত যত্ন করে বাগান করেছে, কিন্তু বুড়ো জিদ ধরেছে কোনও নিগ্রোর পাশে সে কিছুতেই থাকবে না। আমাদের সঙ্গে অবশ্য বুড়ো কোনওদিন খারাপ ব্যবহার করেনি...কিন্তু নিগ্রো শুনেই...

আমি মুচকি হাসলুম। বুড়ো জেম্‌সন কোনওক্রমে খয়েরি ভারতীয়দের প্রতিবেশী হিসেবে সহ্য করেছিল, কিন্তু কুচকুচে কালো ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান তার পক্ষে অসহ্য। খোদ লন্ডন শহরে বসেও পাশের বাড়ি থেকে একটা নিগ্রো পরিবারকে তাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা তার নেই, সেইজন্য রাগ করে, সে নিজের বাড়ি ছেড়ে দূরে সরে যাচ্ছে।

এত সরতে-সরতে শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা কোথায় যাবে?

॥ ৬ ॥

ব্রিটিশ মিউজিয়াম একদিনে দেখে ফেলা আর পাঁচ মিনিটে মহাভারত পড়ে শেষ করা একই ব্যাপার। অদ্ভুতকর্মা প্রতিভাবানদের পক্ষেই শুধু তা সম্ভব।

সব কিছুই যে দেখতে হবে, সে রকম মাথার দিব্যি তো কেউ দেয়নি। গপগপ করে গিলে খেলে কোনও খাবারেরই স্বাদ পাওয়া যায় না।

আমি অলসভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পাণ্ডুলিপি বিভাগে, হঠাৎ মনে হল, একটু চা-ফা খেলে মন্দ হয় না। শিল্প নাকি মানুষের ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলিয়ে দিতে পারে, আমার তো দেখছি উলটো ব্যাপার। দু-একঘণ্টা বাদে-বাদেই চায়ের তেষ্টা পায়। তা ছাড়া এইসব জায়গায় সিগারেট টানা যায় না। মাঝে-মাঝেই বাইরে যাওয়ার ছুতো খুঁজতে হয়। ব্রিটিশ মিউজিয়ামেই এক জায়গায় স্যার ওয়াল্টার র‍্যালের ছবি দেখে আমি মনে-মনে বলেছিলুম, কেন দাদা তামাকের ধোঁয়া টানার ব্যাপারটা চালু করেছিলে? এখন আমরা ওই নেশার দাস হয়ে গেছি আর রাজ্যের লোক আমাদের ক্যানসারের ভয় দেখাচ্ছে।

রাস্তা খুঁজে ক্যান্টিনে পৌঁছে লন্ডনের বিখ্যাত বিস্বাদ স্যান্ডউইচ আর ট্যালটেলে চা নিয়ে বসলুম। এত খারাপ খাবার খেয়েও ব্রিটিশ জাতি যে কী করে বিশ্বজয় করেছিল, তা ভাবলে অবাক লাগে। মোগলদের বুঝি, তারা মোগলাই খানা খেয়েছে, সেই রকম জবরদস্ত লড়াইও করেছে। আর ব্রিটিশরা নাকি সমরক্ষেত্রের তাঁবুতেও সন্ধেবেলা পোশাক না বদলে ডাইনিং টেবলে যেত না। ডাইনিং টেবলে গিয়ে যত রাজ্যের আলুনি-আঝালি সেদ্ধ খাবার খেত। লন্ডন শহরের পাড়ায়-পাড়ায় প্রচুর 'ফিস অ্যান্ড চিপসের' দোকান দেখতে পাওয়া যায়। মাছ জিনিসটাকেও যে কত অখাদ্য করা যায়, তার প্রমাণ দিয়েছে ইংরেজরা।

বিলিতি চা মানে তো আসলে আমাদেরই বা বাংলাদেশি বা সিংহলি চা। তবু এখানে চা খেয়ে যেন কিছুতেই দেশের মতন স্বাদ পাই না। একমাত্র সিগারেটের স্বাদটা এদেশে ভালো। তাও আমার মতন চার্মিনার খোরদের পক্ষে বেশ মুশকিল। এদেশে চার্মিনার বা সমতুল্য কোনও সিগারেট পাওয়া যায় না।

আমার থেকে দুটো টেবিল দূরে তিনটি ছোকরা বসে বেশ জোরে-জোরে কথা বলছে। চেহারা দেখে বোঝা যায় ওরা ভারতীয়, কিন্তু বাঙালি নয়, কারণ ওদের পারস্পরিক ভাষা ইংরেজি। আমার সঙ্গে একবার চোখাচোখি হল কিন্তু আমাকে পাত্তাই দিল না। প্রবাসে ভারতীয় মাত্রই ভারতীয়ের আত্মীয় নয়। অচেনা সাহেবেরা অনেক সময় ডেকে কথা বলে, কিন্তু এক ভারতীয়ের সঙ্গে অন্য ভারতীয়ের দেখা হলে দুজনেই মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি ওদের আলোচনা শুনছিলুম। যুবক তিনটিই চাকরি করে জার্মানিতে, ছুটিতে বেড়াতে এসেছে, কিন্তু লন্ডন ওদের একটুও ভালো লাগছে না। ওদের কথা শুনে আমি রীতিমতন চমৎকৃত হলুম। লন্ডন ওদের ভালো লাগছে না, কারণ এখানে জিনিসপত্রের দাম অত্যন্ত বেশি, শহরটাও নোংরা, ছোট-ছোট রাস্তা, বড্ড ভিড়, খাবারদাবারের সুবিধে নেই, হোটেলের ঘরটা খুব ছোট আর বদ্ধ, পাঁচবার ডাকলেও কারুর সাড়া পাওয়া যায় না...। আমি একবার ভাবলুম, ওরা কি কলকাতার বর্ণনা দিচ্ছে?

দ্বিতীয় সিগারেটটি সবে শেষ করেছি, এই সময় দূর থেকে একজন মধ্যবয়সি ভদ্রলোক হেঁটে এলেন আমার দিকে। দু-দিন ধরে বেশ গরম পড়েছে লন্ডনে.আমার মতন যারা সদ্য আগত, তারা প্রায় সবাই শুধু হাওয়াই শার্ট পরে বেরিয়েছে, কিন্তু এই ভদ্রলোকের পরনে পুরোদস্তুর সুট-টাই। মুখে পাইপ। আমার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে তিনি প্রথমে আপাদমস্তক আমায় নিরীক্ষণ করলেন, তারপর পরিষ্কার বাংলায় বললেন, আপনি...তুমি...নীলু না? দেবপ্রিয়র ভাইপো? তখন থেকে মনে হচ্ছে চেনা-চেনা।

ভদ্রলোকের গায়ের রং এত পরিষ্কার আর হাবভাব এত সাহেবি যে আমি স্প্যানিশ বা ইটালিয়ান ভেবেছিলুম। কিন্তু ওঁর বাংলা উচ্চারণে একটুও টান নেই।

আমি বললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু আপনাকে তো আমি...

উনি বললেন, দেবপ্রিয়র সঙ্গে আমি পড়তুম। তা ছাড়া, তুমি পদ্মনাথ লেনে আমাদের পাশের বাড়িতে খুব আসতে, ভাস্করের বন্ধু ছিলে... তোমাকে হাফ-প্যান্টুল পরা অবস্থায় দেখেছি...

আমি সবিস্ময়ে বললুম, নীতিশদা?

উনি বললেন, ঠিক ধরেছ। তাহলে তোমার সঙ্গে একটু বসি? আমার হাতে আরও মিনিট কুড়ি সময় আছে।

নীতিশদার মাথার চুল কাঁচাপাকা হয়েছে, চোখের নীচে ভাঁজ পড়েছে, কিন্তু চিনতে কোনও অসুবিধে হবার কথা নয়। চোখ দুটি বেশি ঝকমকে, অতি তীক্ষ্ণ নাক, এই রকমই দেখেছি, ছেলেবেলায়। নীতিশদার দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল। উনি ঘুড়ি ওড়াতে খুব ভালোবাসতেন এবং ইংরেজির দুর্ধর্ষ ছাত্র ছিলেন। আমরা জানতুম, নীতিশদার প্রথম থেকে শেষ লাইন পর্যন্ত পুরো হ্যামলেট মুখস্ত। কিন্তু শেষ যতদূর জানতুম, উনি চাকরি করতেন পুণায়।

অবশ্য লন্ডনে এসে যে-কারুর সঙ্গে দেখা হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। যেকোনও সময় যে-কারুর বাবার সঙ্গেও দেখা হয়ে যেতে পারে, এবং তিনি জিগ্যেস করতে পারেন, আরে; তুই এখানে?

অবশ্য, আমার বাবা বেঁচে নেই এই যা। আমার বাবার সঙ্গে অন্তত দেখা হবার সম্ভাবনা নেই লন্ডনে।

নীতিশদা জিগ্যেস করলেন, তুমি এখানে কী করছ?

আমি বললুম, ফ্যাফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

—চাকরি-বাকরি পাওনি?

—না, আছে নাকি আপনার সন্ধানে?

নীতিশদা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে পাইপ ধরালেন। আমি একসময় নীতিশদাকে গুরুজনের মতন সম্ভ্রম করতুম, কিন্তু প্রবাসে নিয়ম নাস্তি এই ভেবে ফস করে জ্বেলে ফেললুম আর একটি সিগারেট।

—আপনি এদেশে কতদিন আছেন, নীতিশদা?

—তা বছর বারো হবে। ঠিক হিসেব ধরতে গেলে বারো বছর চার মাস, আমি জুনে এসেছিলুম।

অল্প বয়েস থেকেই যার হ্যামলেট মুখস্ত, তার পক্ষে পুণার বদলে লন্ডনে বসতি নেওয়াই তো স্বাভাবিক। কিন্তু এর মধ্যে এত বছর কেটে গেছে?

—তুমি কোন ইয়ারে এসেছ, নীলু?

মাত্র চারদিন আগে।

এবারে আমাকে আর একবার ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে নীতিশদা বললেন, আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল, তোমার গায়ে, জামা-কাপড়ে এখনও টাটকা দেশের গন্ধ। সিগারেট টানছও ঠিক কলকাতার ছেলের মতন। তুমি কি এখানে কিছু পড়তে-টড়তে এসেছ নাকি? ব্রিটিশ মিউজিয়ামে মেম্বারশিপ পেয়েছ? সে ব্যাপারে আমি সাহায্য করতে পারি।

—আমি এখানে মাত্র দু-চারদিন থাকব।

—কোথায় যাচ্ছ?

—বালটিমোরে। সেখানে বিশ্ব-বখাটে সম্মেলন হচ্ছে, কিংবা বিশ্ব-নিষ্কর্মা সম্মেলনও বলতে পারেন, আমি সেখানে নেমন্তন্ন পেয়েছি।

নীতিশদা একটু হেসে বললেন, অসম্ভব কিছু না, ও দেশে সবই সম্ভব। ওরা বিশ্ব নর্দমা পরিষ্কার থেকে শুরু করে বিশ্বশান্তি পর্যন্ত যাবতীয় অবান্তর জিনিস নিয়েই কনফারেন্স করে। কিছুদিন আগেই শুনলুম, ওখানে বিশ্ব অনিদ্রা রোগীদের একটা সেমিনার হয়ে গেল। সবই বিশ্ব! যাই হোক এখানে একলা বসে আছ, কোনও মেয়ে বন্ধুটন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছ নাকি?

—সেরকম একজনও জোটেনি এখনও। সিগারেট টানতে এসেছি। আপনি?

—আমার চারটের সময় একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। কিছুক্ষণ এখানে সময় কাটাতে এসেছি। আমি প্রায়ই আসি। তোমার লন্ডন কেমন লাগছে?

—লন্ডনের অনেক রাস্তাঘাট দেখলে বড্ড এলগিন রোড কিংবা ভবানীপুরের জন্য মন কেমন করে। ঠিক আমাদের ওইসব জায়গার মতন দেখতে, আমাদের মতন দোতলা বাস হেলে দুলে চলে, ছাতা হাতে নিয়ে লোকেরা বাসস্টপে দাঁড়িয়ে থাকে—

—তুমি ভুল করছ, কলকাতার মতন বাস এখানে চলে না, লন্ডনের দোতলা বাসের গরিব সংস্করণ কলকাতায় চলে। এলগিন রোড-টোড অঞ্চল লন্ডনের অনুকরণে তৈরি।

—তাই বুঝি! ভুলে গিয়েছিলুম।

—তোমরা লন্ডন দেখে মুগ্ধ হও না, জানি। ওই যে ওই টেবিলের ছেলেগুলো তখন থেকে চ্যাঁচাচ্ছে, ওই রকমভাবে লন্ডনের নিন্দে করা... একটুও সভ্যতা বোধ নেই।

—কেন লন্ডনে বসে বুঝি লন্ডনের সমালোচনা করা যায় না?

—তা করুক না, কিন্তু এদেশে আস্তে কথা বলাই নিয়ম, তাও মানবে না? আর ওই রকম ভুল ইংরেজি শুনলে আমার গায়ে কাঁটা দেয়। ওরা জার্মানি থেকে এসেছে...জার্মানিতে যারা চাকরি করে, তারা আজকাল নিজেদের খুব বড়লোক মনে করে। ওরা ভাবে ওদের চেয়ে আমরা অনেক গরিব হয়ে গেছি।

আমার হাসি পেয়ে গেল। বেশ মজার ব্যাপার। ওরা আর আমরা? ওরাও ভারতীয়, নীতিশদাও ভারতীয়। দেশ ছেড়ে বাইরে এসে দশ-বারো বছর থাকবার পর অনেকেই বেশ সৎ-মায়ের ভক্ত

হয়ে পড়ে। ফ্রান্সের ভারতীয়রা বলে, ইংল্যান্ডটা আবার একটা দেশ নাকি, সর্বক্ষণ প্যাচপেচে বৃষ্টি, নয়তো কুয়াশা, ভালো চিজ বা ওয়াইন কিছুই পাওয়া যায় না, হোটেলগুলোতে গলাকাটা দাম...। ইংল্যান্ডের ভারতীয়রা বলে, ফ্রান্স তো শুধু প্যারিস নিয়েই গর্ব করে, একটু ভেতরের দিকে যাও, দেখবে অনেক বাড়িতে এখনও খাটা-পায়খানা রয়েছে... লোকগুলো নিজেদের ভাষা ছাড়া দুনিয়ার আর কোনো ভাষা বোঝেও না, বুঝতেও চায় না। আর কী কঞ্জুস। ফ্রান্সের যে-কোনও মিউজিয়াম বা আর্ট গ্যালারিতে যাও, সব জায়গায় হাত বাড়িয়ে আছে, পয়সা দাও। লন্ডনের টেট গ্যালারি বা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে কারুর এক পয়সা দিতে হয়?

সৎমায়ের পক্ষ নিয়ে কথা বললেও এই সব ভারতীয়দের সৎ-ভাইরা কিন্তু কখনও ওদের আপন মনে করে না।

নীতিশদা বললেন, আসল ব্যাপার কী জানো, এইসব ছেলেরা, যারা ফর্টিসেভেনের পর জন্মেছে তাদের ইংল্যান্ড বা ইংরেজ জাত সম্পর্কে আলাদা কোনও মোহ নেই। আমরা যারা পরাধীন আমলে জন্মেছি, আমাদের মোহই বলো, শ্রদ্ধা-ভক্তি, ভয়, ঘৃণা—এইসব মিলিয়ে একটা অন্যরকম ধারণা আমাদের মনের মধ্যে গেঁথে আছে এদের সম্পর্কে। আমাদের বাবা-কাকারা এখনও বলেন বিলেত, অর্থাৎ রাজার দেশ, এখানকার ছেলেমেয়েরা বলে লন্ডন। এই যে ট্রাফালগার স্কোয়ার, পিকাডেলি সার্কাস, হাইড পার্ক কর্নার এইসব জায়গা সম্পর্কে ছেলেবেলা থেকে এত পড়েছি যে ছবির মতন সব দেখতে পেতুম, কোনওদিন এসব জায়গায় পা দেব ভাবলেই রোমাঞ্চ হত। এখনকার ছেলেমেয়েদের পক্ষে এগুলো কিছুই না জাস্ট কতকগুলি টুরিস্ট স্পট...।

আমি জিগ্যেস করলুম, নীতিশদা, এখানে প্রথম পা দেওয়ার সময় আপনার যে রোমাঞ্চ হয়েছিল, এই বারো বছর পরেও কি সেই রোমাঞ্চ টিকে আছে?

নীতিশদা বেশ জোর দিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই! লন্ডন আমার কাছে কখনও পুরোনো হয় না। এখন ব্রিটিশ জাতটা একটু নিস্তেজ হয়ে গেছে, পাউন্ডের দাম রোজই হু-হু করে নেমে যাচ্ছে, তবু লন্ডন হচ্ছে লন্ডন। এরকম ওপ্ন সিটি পৃথিবীতে আর একটাও আছে? বিশ্বের যত বড়-বড় জ্ঞানী-গুণী তাদের সবারই স্থান আছে এখানে।

—প্যারিসের লোকেরাও প্যারিস সম্পর্কে এই কথা বলে। যারা নিউ ইয়র্কে থাকে, তাদের মতে নিউ ইয়র্কের মতো ওপন সিটি নাকি আর হয় না।

—আরে প্যারিস শহরটাই হচ্ছে কৃত্রিম। শুধু সুন্দর করে সাজানো। ফ্রান্সের বাগানগুলো দেখেছ? একেবারে নিঁখুত না? ওরকম বাগান কি বাস্তব মনে হয়? সব গাছগুলোকে কাঁচি দিয়ে ছেঁটে-ছেঁটে একেবারে খেলনার মতন করে রাখে। বীভৎস। প্যারিস শহরটাই সন্ধেবেলাকার পরের শহর। দিনের বেলা কী করতে হয়ে ওরা জানেই না। আর নিউ ইয়র্ক তো উটকো ব্যাপার, ওরা ভাবে কোনও কিছুই খুব বড় হলে তবে সুন্দর হয়। মানুষের চিন্তায় যা কিছু শ্রেষ্ঠ ফসল, তা তুমি পাবে লন্ডনে। রবি ঠাকুর বলো আর কার্ল মার্কসই বলো, সবাইকেই আসতে হয়েছিল এখানে। এই লন্ডনের রাস্তায়-রাস্তায় গোটাকতক সেঞ্চুরির ইতিহাসের ধুলো মিশে আছে।

—এখন বড্ড বেশি ধুলো জমে গেছে মনে হয় না আপনার?

নীতিশদা বাঁকা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে, একটুক্ষণ চুপ করে থেকে, তারপর বললেন, আমার সময় হয়ে গেছে, এবার আমায় উঠতে হবে। একদিন আসবে নাকি আমার ওখানে?

—নিশ্চয়ই, ঠিকানা দিন। বউদি কি বাঙালি, না মেমসাহেব?

নীতিশদা প্রথমে কোটের ভেতরের পকেট থেকে পার্স বার করলেন, তারপর তার থেকে একটা কার্ড নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বললেন, সাড়ে পাঁচটার পর আমি বাড়িতেই থাকি, যে-কোনও দিন এসো। বউদি-টউদি কেউ নেই...।

একটু অন্যমনস্কের মতন মাটির দিকে তাকিয়ে থেকে উনি আবার বললেন, তোমার থাকার জায়গার

কোনও অসুবিধে নেই তো? আমার কাছেও এসে থাকতে পারো কয়েকদিন, তবে নিজে রান্না করে খেতে হবে।

—আমার থাকার জায়গা আছে নীতিশদা।

—তা হলে আমি চলি। সম্ভব হলে এসো...বাই-বাই।

নীতিশদা চলে যাওয়ার পর আমিও উঠে পড়লুম। একটা ব্যাপারে খটকা লাগল। নীতিশদা একবারও তো কলকাতার খবর জিগ্যেস করলেন না। সাধারণত অন্য সবাই জিগ্যেস করে, কলকাতার লোডশেডিং-এর বর্তমান পরিস্থিতি, রাস্তার খোঁড়াখুঁড়ি, বাড়ি ভাড়া এবং রান্নার গ্যাস ঠিক মতন পাওয়া যায় কি না, জ্যোতি বসু আর ইন্দিরা গান্ধী ইত্যাদি। অন্তত পুরেনো চেনাশুনো লোকেরা কে কেমন আছে সে সম্পর্কেও নীতিশদার কোনও আগ্রহ নেই!

আরও কিছুক্ষণ ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ঘোরাঘুরি করার পর একটি অভিজ্ঞতা হল।

মিউজিয়ামের দিকটায় বিভিন্ন ঘরে-ঘরে প্রহরী থাকে। তাদের মধ্যে অনেকেই কালো মানুষ। কয়েকজনকে ভারতীয় বলেও মনে হয়। বড্ড বাজে চাকরি, সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত শুধু একটা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা আর লোকজনের হাতের দিকে নজর রাখা। একটুক্ষণের জন্যও বসবার নিয়ম নেই।

সেইরকম একজন প্রহরীকে আমি জিগ্যেস করলুম, মিশরীয় সংগ্রহের দিকটা কোথায়?

প্রহরীটা সরাসরি উত্তর না দিয়ে বলল, তুমি কি ভারতবর্ষ থেকে আসছ?

আমি ঘাড় নাড়তেই সে আবার বলল, এখানে কী দেখতে তোমরা আসো? এই ব্রিটিশ জাতটা পৃথিবীব সব জায়গা থেকে চুরি করে কিংবা লুট করে এইসব জিনিস নিয়ে এসেছে, তা দেখতে তোমাদের ভালো লাগে? রাগ হয় না।

বেশ অবাকই হলুম আমি। এখানকাব প্রহরীর চাকরি করেও এমন কথা বলছে? তা ছাড়া কথা বলছে ইংরেজিতে, অন্য কেউ শুনেও তো ফেলতে পারে!

লোকটি নিজের থেকেই আবার বলল. আমি এসেছি উগান্ডা থেকে। এক সময় আমরা ভারতীয় ছিলুম। এখন আমার ব্রিটিশ পাসপোর্ট, কিন্তু এদেশের সরকার আমাদের সঙ্গে কীরকম খারাপ ব্যবহার করেছে জানো? আমাকে আসতে দিয়েছে, কিন্তু আমার মা আর ছোট ভাইকে ঢুকতে দেয়নি এদেশে। উগান্ডা থেকে ইদি আমিন আমাদের তাড়াল, ব্রিটিশ সরকারও আমাদের কোনও প্রোটেকশন দিল না...এ জাতটা এত স্বার্থপর...

লোকটির চোখমুখ দিয়ে তিক্ততা আর ঘৃণা ঝরে পড়ছে। আমি বেশ একটু অপ্রস্তুত বোধ করলুম। উগান্ডার ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সমস্যার কথা খবরের কাগজে পড়েছি, তাদের কারুকে আমি চোখে দেখিনি। লোকটি আমায় ছাড়তে চায় না। চাপা গলায় অনবরত ব্রিটিশ জাতির নিন্দে করে যেতে লাগল। তার যোগ্যতা অনেক বেশি থাকলেও সে এখানে একটা বাজে চাকরি পেয়েছে, থাকার জায়গার দারুণ সমস্যা...ছোট ভাইটা মাকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত কানাডায় আশ্রয় পেয়েছে বটে কিন্তু চাকরির পারমিট জোগাড় করতে পারেনি, তাদের জন্য দুশ্চিন্তা...।

— তোমরা ভারতে ফিরে গেলে না কেন? সেখানে তোমাদের পুরো পরিবারটা একসঙ্গে থাকতে পারতে।

—ভারতে কি চাকরি পাওয়া যায়? সেখানে কে আমাদের খেতে দেবে? রিফিউজিদের প্রতি ভারত সরকার কী রকম ব্যবহার করে তার কিছু-কিছু খবর আমরা শুনেছি, বাংলাদেশ ওয়ারের সময়কার ছবিও দেখেছি...। তুমি বলতে পারো, ভারতে গেলে আমাদের কিছু সুবিধা হবে?

এই লোকটিও একজন রিফিউজি। আমাদের পুরো জীবনটাই কেটে গেল রিফিউজিদের সমস্যা দেখতে-দেখতে। লন্ডনে এসেও নিস্তার নেই। খুব জোর নিয়ে লোকটিকে বলতে পারলুম না যে, ভারতে গেলে ওর সমস্যার সুরাহা হবে।

লোকটির পূর্বপুরুষ ছিল গুজরাটি। আমরা গুজরাটি শুনলেই ভাবি ব্যবসায়ী আর ধনী। এই লোকটি উগান্ডার কাম্পালায় ছিল একটি ব্যাঙ্কের কেরানি ও কবি। ওর দুটি কবিতার বই আছে। এখানে এসে খুবই খারাপ অবস্থার মধ্যে আছে, কবিতা লেখা মাথায় উঠে গেছে।

মিউজিয়ামের একজন শ্বেতাঙ্গ অফিসারকে এদিকে আসতে দেখেও লোকটি সন্ত্রস্ত হল না, বেপরোয়া ভঙ্গিতে আমার কনুই ধরে রেখে বলল, ভাবছি এখানে এই অপমানের মধ্যে থাকার চেয়ে ভারতে গিয়ে আধপেটা খেয়ে থাকাও ভালো। আমেদাবাদ শহরটা কীরকম বলতে পারো? সেখানে কোনও কেরানির চাকরিও পাওয়া যাবে না?

লোকটির কাছ থেকে অতিকষ্টে নিজেকে ছাড়িয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেলুম অন্যদিকে। জীবন্ত মানুষের সমস্যার কথা শুনলে মিউজিয়াম দেখায় আর মন বসে না।

যে বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছি সে সন্ধেবেলা মিউজিয়ামের সামনে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করবে, যথাসময়ে উপস্থিত হলুম তার কাছে। লন্ডনে অসংখ্য বাঙালি, কে আর কজনকে চেনে, তবু আমার বন্ধুটি নীতিশদার নাম শুনে চিনতে পারল। সে বলল, হ্যাঁ ভদ্রলোক বেশ ভালো মানুষ। কিন্তু এখন বেশ অসুবিধের মধ্যে পড়েছেন। যে কোম্পানিতে উনি চাকরি করতেন, সে কোম্পানিটা উঠে গেছে। এখন পটাপট এরকম অনেক কোম্পানিই উঠে যাচ্ছে। এই ডিপ্রেশানের বাজারে কোনও নতুন চাকরি পাওয়াও মুশকিল। তবে ওই নীতিশবাবু খুব অহংকারী, কারুর কাছে নিজের অসুবিধের কথা বলেন না।

নীতিশদা যে কতটা অহংকারী তা আমিও বুঝতে পারলুম। উনি আমাকে একবারও দেশের অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করেননি। যদি আমি ভেবে ফেলি যে উনি দেশে ফেরার ইচ্ছে পোষণ করছেন। এই স্বর্গপুরী লন্ডন ছেড়ে দেশে ফেরা!

॥ ৭ ॥

লন্ডন থেকে আবার প্যারিসে ফিরে আসাই ঠিক করলুম।

প্যারিসের একটা মস্ত গুণ কী, কোনও কিছু না করলেও, কোনও দ্রষ্টব্য স্থানে না গেলেও এমনি-এমনিই ভালো লাগে। দ্রষ্টব্য জায়গাগুলিতে বড্ড ভিড়।

শরৎকালটাতে যেন সারা পৃথিবীর ভ্রমণকারীরা ধেয়ে আসে ফ্রান্সে। এই সময় ঝকঝকে রোদ ওঠে, নীল আকাশ দেখা যায়, দিনের বেলায় বাতাসে একটুও শীতের ধার থাকে না, আমেরিকান ছেলেমেয়েরা তো শুধু একটা গেঞ্জি গায়ে ঘুরে বেড়ায়। প্যারিসে পার্কের অন্ত নেই, সবক'টি পার্কে এই সব ভিন্‌দেশি ছেলেমেয়েরা ঘাসের ওপর গড়াগড়ি দেয় আর সারাদিন ধরে রোদ শুষে নেয় গায়ে। রিভিয়েরা কিংবা ওই ধরনের বিখ্যাত সমুদ্রতটে নিশ্চয়ই রোদ-শোষকদের ভিড় আরও অনেক বেশি, কিন্তু সেসব জায়গায় যাওয়া আমার পকেটের সাধ্যে কুলোবে না।

ইংল্যান্ডে আমার বন্ধু ভাস্কর ওই রকম একটা ছোটখাটো সমুদ্রতীরে নিয়ে গিয়েছিল। জায়গাটার নাম শুবেরিনেস, লন্ডন থেকে গাড়ি-দূরত্ব ঘণ্টা দুই-আড়াই। রোদ্দুর বড় ভালোবাসে ইংরেজরা, রোদ ওদেশে দুর্লভ। লন্ডনের থেকে প্যারিসে রোদ বেশি। রোদ কম পায় বলে ইংরেজ মেয়েরা ফরাসিনীদের চেয়ে বেশি ফরসা। আমাদের চোখে অবশ্য এটা ধরা পড়ার কথা নয়, কিন্তু শুনেছি প্যারিসের ফলি বার্জার কিংবা বিখ্যাত নৈশ ক্লাবগুলিতে যেসব স্বল্পবাসা সুন্দরীদের নাচ দেখানো হয়, সেই সব মেয়েদের বেশিরভাগই আনা হয় ইংল্যান্ড থেকে। কারণ, মঞ্চের আলোয় তাদের উরু বেশি ফরসা দেখায়। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের চতুর্দিকেই সমুদ্রতীর, কিন্তু ওদের তেমন বিখ্যাত কোনও বিচ নেই। শুবেরিনেসকে তো বিচ না বলে তার অ্যাপোলজি বলা উচিত। আমাদের দীঘার চেয়েও অনেক খারাপ অবস্থা, সমুদ্রকে মনে হয় এঁদো ডোবা, ঢেউ টেউ কিচ্ছু দেখা যায় না, সমুদ্র একটা

আছে এই পর্যন্ত। সেখানেই বেলাভূমিতে পা ফেলার জায়গা নেই, বালির ওপর নিঃসাড়ভাবে শুয়ে আছে হাজারখানেক নারীপুরুষ, ঠিক যেমন সিনেমায় দেখা যায়। সেখানকার মেয়েদের পোশাক, সৈয়দ মুজতবা আলির ভাষায়, "আমার টাই দিয়ে তিনটে মেয়ের জাঙিয়া হয়ে যায়!"

আমাদের তো অত রোদ-প্রীতি নেই আর অত সাহেব-মেমদের সামনে আমরা খালি গাও হতে পারি না, সুতরাং আমি রীতিমতো দরদর করে ঘেমেছিলুম। ওই ঘামেই আবার সাহেবদের আনন্দ। একটা নাকি পারফিউম বেরিয়েছে, যা মাখলে গামের গন্ধ পাওয়া যায়। যাই হোক, শুবেরিনেস-এর নমুনা দেখেই বুঝেছিলুম এই রকম সময় বিখ্যাত সমুদ্রতীরগুলিতে কত ভিড়।

শুধু পার্কে নয়, শরৎকালীন প্যারিসের অনেক রাস্তাও এমন ভিড়ে গিস্‌গিস্‌ করে যে হাঁটতে গেলে মানুষের গায়ে ধাক্কা লাগে। এমন ভিড় আমার পছন্দ নয়। তার চেয়ে একটু জনবিরল কোনও পথে চুপ করে বসে থাকা অনেক ভালো। রাস্তার ওপরেই অনেক রেস্তোরাঁর চেয়ার টেবিল, সেখানে এক কাপ কফি নিয়ে বসে থাকা যায়, অনেকক্ষণ পার হয়ে গেলে পরিচারকটি যদি কাছে এসে ঘোরাঘুরি করে তখন এক কাপ কফির অর্ডার দিলেই হল, কিংবা এক বোতল সাদা ওয়াইনের অর্ডার দিতে পারলে তো আর কোনও কথাই নেই।

বসে-বসে শুধু পথের মানুষ দেখা।

অনেক বেশি সংখ্যায় টুরিস্টদের শুভাগমনে সরকার খুশি হয়, ব্যাবসা-বাণিজ্যের সুবিধা হয় বটে কিন্তু অভিজাত ফরাসি নাগরিকরা নাক সিঁটকোয়। টুরিস্টদের অত্যাচার এড়াবার জন্য তারা এই সময় প্যারিস ছেড়ে চলে যায়। অনেকে বলে, শরৎকালে প্যারিসের রাস্তায় ফরাসিদের দেখতেই পাওয়া যায় না, সবাই বিদেশি। কথাটা অতিরঞ্জিত নিশ্চয়ই, শহরসুদ্ধ সব লোক চলে গেলে অফিস-দোকানপাট চলছে কী করে, তা ছাড়া সবাই বেড়াতে যাবে, এত পয়সা ফরাসিদের নেই।

টুরিস্টদের দেখলেই চেনা যায়। আমি প্রথমে রাস্তার চলন্ত মানুষদের বিভিন্ন রকম জুতো দেখি, তারপর পোশাক, তারপর মুখ। বিশেষ-বিশেষ মেয়েকে দেখে একাধিকবার তাদের সর্বাঙ্গে তাকাতেই হয় অবশ্য।

আমাদের ধারণা, টুরিস্ট বুঝি বেশিরভাগই আমেরিকান। তা ঠিক নয়। প্যারিসে সারা পৃথিবী থেকে মানুষ আসে, এখন টুরিস্টদের মধ্যে জাপানিদের মুখ বেশ চোখে পড়ে। এখন তো জাপানিরাই বড়লোক। তা ছাড়া টুকরো-টাকরা কথাবার্তা শুনে চিনতে পারা যায় জার্মান এবং রাশিয়ানদের। এ ছাড়াও অনেককে দেখে বোঝা যায়। তারা আর যে জাতই হোক, আমেরিকান নয়। ভারতীয়ও কিছু আছে, হঠাৎ হঠাৎ চোখে পড়ে কোনও রঙিন শাড়ির উড়ন্ত আঁচল, প্যারিসের রাস্তায় বাংলা কথা শোনাও আশ্চর্য কিছু নয়। একটি যুগল আমার পাশ দিয়ে বাংলা বলতে বলতে চলে গেল। স্পষ্ট বুঝতে পারলুম তারা চাপা গলায় ঝগড়া করছে। ওরা স্বামী-স্ত্রী নিঃসন্দেহে এবং স্বামীটির জন্য মায়া হল আমার। নিউ ক্যাসেলে কয়লা কিংবা বেরিলিতে বাঁশ নিয়ে যাওয়ার মতন লোকটি প্যারিসে এসেছে নিজের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে, এখন তার ঠ্যালা তো সামলাতে হবে।

অল্পবয়েসি টুরিস্টদের মধ্যে অবশ্য আমেরিকানই বেশি। আমেরিকান ছেলেমেয়েরা ছাত্র অবস্থাতেই যত পয়সা রোজগার করতে পারে, সেরকম পয়সা রোজগারের সুযোগ বোধহয় পৃথিবীর আর কোনও দেশের ছাত্রছাত্রীদের নেই। তা ছাড়া দুনিয়া চষে বেড়াবার ঝোঁকও ওদের আছে। সতেরো-আঠেরো বছরের ছেলেমেয়ে যখনতখন দেশ ছেড়ে বিশ্বের যেকোনও প্রান্তে চলে যায়, এটা আমাদের দেশে বসে কল্পনা করাও শক্ত।

ছেলেবেলায় আমাদের কাছে সাহেবদের যে ইমেজ ছিল, তা একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। হ্যাট-কোট-টাই পরলে তবেই না সাহেব! এখন হাজারজনের মধ্যে পাঁচজন টুপি পরে কিনা সন্দেহ, অফিস-চাকুরে ছাড়া অন্যরা একশো জনের মধ্যে দশ জনও বোধহয় টাই পরে না। আমেরিকান ছেলেরা তো তোয়াক্কাই করে না এসব কিছুর, একটা ব্লু জিন আর যে-কোনও ধরনের একটা গেঞ্জিই

তাদের পক্ষে যথেষ্ট। মেয়েরাও ব্লু জিন পরে কিন্তু তাদের উর্ধ্বাঙ্গের পোশাকের কোনও ফ্যাশান নেই। আমি অন্তত একশোটি আমেরিকান মেয়ে দেখলুম, তাদের মধ্যে কোনও দুজন একরকম জামা পরেনি। রূপের জন্য অবশ্য আমেরিকান মেয়েদের তেমন খ্যাতি নেই, সে দেখতে হয় সাধারণ ফরাসি মেয়েদের। অফিস ভাঙার সময় টুরিস্টদের ছাপিয়ে যায় সাধারণ ফরাসিদের ভিড়। তাদের আলাদা করে চেনা যায়, কারণ তাদের চলার গতি দ্রুত, যেন বাড়ি ফেরার খুব তাড়া। ফরাসি মেয়েরা উগ্র সাজপোশাক করে না। নিশ্চয়ই তারা সযত্ন প্রসাধন করে বাড়িতে, কিন্তু সে প্রসাধনকে তারা চাপা দিতেও জানে, তাদের মুখ চোখ দেখে কক্ষনো তা বোঝা যায় না। এ ছাড়াও তাদের মধ্যে কী যেন একটা আলগা লাবণ্য আছে, চোখ টেনে রাখে। রূপ নিয়ে সবাই জন্মায় না, অথচ ফরাসিদের মধ্যে কুরূপা মেয়ে প্রায় চোখেই পড়ে না। তার মানে ওরা অন্য একটা কিছু জানে।

মেয়েদের প্রসঙ্গে অন্য একটা কথা বলতে ইচ্ছে হল।

প্যারিসে মমার্ত আর প্লাস পিগাল্-এর মাঝখানে একটা এলাকায় নারী মাংসের বাজার আছে। নারী মাংস যে কতরকমভাবে রান্না করে পরিবেশনের ব্যবস্থা আছে, আর তার ইয়ত্তা নেই। পিপ শো, লাইভ শো, সেক্স শপ, সেক্সসাইটমেন্ট, এরোটিকা হ্যানো আর ত্যানো। আমস্টারডামে ওই পাড়াটি তো জগৎ সুখ্যাত বা কুখ্যাত। ওরকম একটা শো-ও দেখার ইচ্ছে আমার হয়নি। তা বলে আমি নীতিবাগীশ তো নই, বরং মেয়েদের প্রতি আমার বেশি আসক্তির দুর্নাম আছে। বেশি আসক্তি আছে বলেই মেয়েদের নিয়ে এরকম ঢালাও ব্যাবসার ব্যাপারটায় আমার গা ঘিনঘিন করে। এই ব্যাবসা চালায় পুরুষেরা, পুরুষ-শাসিত সমাজ এই ব্যবস্থা টিকিয়ে রেখেছে।

মমার্ত থেকে প্লাস পিগাল্-এর দিকে রাত্তিরবেলা হেঁটে আসতে-আসতে চোখে পড়ে রাস্তার ধারে-ধারে গালে রং মেখে মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে আধো অন্ধকারে। তাদের চোখের ভাষা বুঝতে ভুল হয় না, তারা তাদের শরীর কিছুক্ষণের জন্য বিক্রি করতে চায়। কাছাকাছি পিপ্ শো বা লাইভ শো-গুলোর কুৎসিত বিজ্ঞাপনের তুলনায় এইসব মেয়েদের দাঁড়িয়ে থাকা আমার একটুও খারাপ মনে হয় না। পেটের দায়ে মানুষ কত কী করে, রিকশা টানে, ধনীদের ঘাড়ে চাপিয়ে পাহাড়ের ওপর তীর্থস্থানে নিয়ে যায়, খনির মধ্যে বিষাক্ত গ্যাসের ভেতরে গিয়ে জীবনের ঝুঁকি নেয়, সেই রকম মেয়েরাও শরীর খাটিয়ে গ্রাসাচ্ছাদন জোগাড় করতে পারে। কোন মেয়ে কার সঙ্গে শোবে এবং তার বিনিময়ে সে টাকা নেবে কিংবা গয়না উপহার নেবে কিংবা শুধুই ভালোবাসা চাইবে, সেটা মেয়েরাই ঠিক করবে। কিন্তু মেয়েদের শরীরটা নিয়ে পুরুষেরা রোজগার করবে, এই ব্যাপারটাই আমার সহ্য হয় না।

মমার্ত প্লাস পিগাল্-এর ওই রাস্তায় হেঁটে আমার একটা নতুন শিক্ষাও হল। ওই সব লাইভ শো, পিপ্ শোতে কিন্তু দলে দলে লোভী লোকরা ছুটে যায় না। ক্রমশই ওই সব ব্যবসায়ীরা রেট কমাতে বাধ্য হচ্ছে। এককাপ কফির চেয়ে একবারের রমণ দৃশ্য দেখতে খরচ কম হয়। চার আনা আট আনাতেও পিপ্ শো দেখা যায়। দালাল আর ফড়েরা বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করে, পারলে রাস্তা থেকে লোক ধরে নিয়ে যায়। অর্থাৎ ভেতরে অনেক জায়গা তখনও খালি আছে। অথচ, প্যারিসের যেকোনও আর্ট গ্যালারির সামনে প্রতিদিনই লম্বা লাইন।

প্যারিসে এখন 'লেডি চ্যাটার্লির প্রেমিক' নামে নতুন ছবিটি দেখানো হচ্ছে, সিনেমা হলের সামনে তার বিশাল হোর্ডিং। সেই হোর্ডিং-এর পুরো বর্ণনা না লেখাই ভালো। কিন্তু সে সিনেমা হলের সামনে একটুও ভিড় নেই, হাউস ফুল হওয়া তো দূরের কথা। কিছু কিছু সিনেমা হলে হার্ডকোর পর্নোগ্রাফি এখন দেখানো হয় অবাধে। সেখানেও বেশি ভিড় হয় না। লোকে ছুটে যায় না। অথচ, এসব দেশে সত্যিকারের কোনো ভালো থিয়েটার দেখতে গেলে টিকিট কাটতে হয় অন্তত একমাস আগে, তাও সহজে পাওয়া যায় না। কুরুচি জেতে না। শেষ পর্যন্ত শিল্পই জেতে।

প্যারিসের দুটি দোকানে আমার দু-রকম অভিজ্ঞতা হল।

পঁতনফ অঞ্চলে একদিন একটা ঠিকানা খুঁজে গিয়ে রাস্তা হারিয়ে ফেললুম। তারপর এ-রাস্তা সে-রাস্তার গোলোকধাঁধা। বাড়ি ফেরার কোনও অসুবিধে নেই, মাটির নীচে নেমে গিয়ে যেকোনও মেত্রো ধরলেই হল। কিন্তু সেই ঠিকানায় একবার যেতে হবে, শহরের ম্যাপটাও সঙ্গে আনিনি। পথের লোককে জিগ্যেস করি, কিন্তু ভাষার মস্ত বাধা।

আমি ইংরিজিও জানি না, ফরাসিও জানি না। তবু ব্যাকরণ-ভুলো ইংরিজিতে কোনও রকমে কাজ চালাতে পারি, আর ফরাসিজ্ঞান বলতে কয়েকটি মাত্র শৌখিন বাক্য আর কবিতার লাইন, রাস্তার ঠিকানা প্রসঙ্গে তা বলতে যাওয়াও বিপদ। অনেক চেষ্টা করেও কারুর কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া গেল না। একটা বিস্ত্রোতে ঢুকে সেখানকার পরিচালকটিকে বোঝাবার জন্য ইংরিজি-ফরাসি নিয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছি, লোকটি কিছুই বুঝছে না, এক সময় সে দোকান থেকে বেরিয়ে রাস্তার উলটোদিকে কিছু দূরের আর একটা দোকান দেখিয়ে দিল। সে দোকানের নাম লেখা ইংরিজিতে, হ্যামবার্গার কর্নার। তা হলে নিশ্চয়ই ওই দোকানে কেউ ইংরিজি জানে।

সে-দোকানে ঢুকতেই একটি তরুণী মেয়ে বলল, ইয়েস, মে আই হেল্‌প ইউ?

কানে যেন সুধাবর্ষণ হল। ইংরেজি ভাষাকে আগে কোনও দিন এত ভালো লাগেনি।

খাবারের দোকানে ঢুকে কিছু না কিনে প্রথমেই ঠিকানা জিগ্যেস করা কি উচিত? একটু একটু খিদেও পেয়েছে, আমি তাই প্রথমেই সস্তা দেখে একটা হট্‌ ডগের অর্ডার দিলুম। সেটি পাওয়ার পর বললুম, চিলি সস্‌ নেই?

মেয়েটি বলল, না, তা তো নেই, তবে তুমি কেচ্‌ আপ নেবে, মাস্টার্ড নেবে?

দোকানে আর একটি মাত্র খরিদ্দার এক কোণে বসে আছে, আমি বসলুম কাউন্টারে। তারপর বললুম, আমি একটা ঠিকানা খুঁজছি, তুমি এই রাস্তাটা কোথায় বলতে পারো!

মেয়েটি হেসে ফেলে বলল, আমিও তো প্যারিসে নতুন এসেছি। এদিককার রাস্তা চিনি না। তুমি কি ভারতীয়?

—হ্যাঁ। আর তুমি?

—আমি ব্রিটিশ। তিন মাসের জন্য চাকরি নিয়ে এসেছি, আবার লন্ডনে ফিরে গিয়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়ব। তুমি ভারতবর্ষের কোন জায়গা থেকে এসেছ?

—কলকাতা। তুমি নাম শুনেছ?

হ্যাঁ। কেন শুনব না। তাব মানে তুমি বেঙ্গলি? আমি আগে লন্ডনে দু-একজন বেঙ্গলি মিট করেছি।

দোকানের মেয়ে সাধারণত কোনও খরিদ্দারের সঙ্গে এত কথা বলে না। কিন্তু মেয়েটি বেশ আলাপি ধরনের। অনেক কথা বলতে চায়। সে কি শুধু ইংরেজিতে কথা বলবার জন্য? ভুলভাল হলেও আমাদের ইংরিজি তো আমেরিকানদের মতন নয়, পুরোনো দাসত্বের সূত্রে তাতে এখনও কিছু ব্রিটিশ ঝোঁক আছে।

কথা বলতে-বলতে হটডগ শেষ করার পর আমি বললুম, কফি?

মেয়েটি আঙুল দিয়ে পাশে দেখিয়ে দিল। অর্থাৎ এখানে কফি বানিয়ে পরিবেশন করা হয় না, পাশে মেশিন আছে সেখান থেকে নিজেকে নিয়ে আসতে হয়। আমি উঠতে যাচ্ছি, মেয়েটি বলল, আচ্ছা, বসো, বসো, আমি এনে দিচ্ছি।

মেশিন থেকে কাপে কফি ঢেলে মেয়েটি আবার আমাকে মিষ্টি হেসে জিগ্যেস করল, তুমি দুধ চিনি খাও তো?

আমি আগেই লিখেছি যে লন্ডনে চেনাশুনো ইংরেজরা ছাড়া অন্য অচেনা ইংরেজরা কেমন যেন আলগা আলগা ব্যবহার করে। পাশে দাঁড়ালে সরে যায়। কথা বললে উত্তর দিতে চায় না। কিন্তু দেশের বাইরে এসেছে বলেই কি এই মেয়েটি আমার সঙ্গে এমন ভালো ব্যবহার করছে? যেন ইংরেজি ভাষার সূত্রে আমার সঙ্গে ওর দূর সম্পর্কের একটা আত্মীয়তা আছে। আমি ভারতীয় জেনেও আমাকে কফি বানিয়ে দিল!

ঠিকানা জানা হল না বটে কিন্তু একটি অপরিচিতা ইংরেজ মেয়ের হাসি তো উপহার পাওয়া গেল।

দ্বিতীয় দোকানটি মমার্ত্রে। বিদ্যুৎ-গাড়িতে চেপে উঠে এসেছি টিলার ওপরে। ধপধপে সাদা গির্জাটির পেছনেই জ্বলজ্বল করছে পূর্ণিমার চাঁদ। ঠিক যেন আকাশে আঁকা। কিন্তু সে সৌন্দর্য রসিয়ে উপভোগ করার উপায় নেই, এত ভিড় চারদিকে। এক সময়ে এখানে বড়-বড় শিল্পীরা আসতেন, এখন নকল শিল্পীতে ভরে গেছে জায়গাটা। একটুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে মনে হল, এবার ফিরে যাওয়াই ভালো।

কাল সকালে প্যারিস ছেড়ে চলে যাব, কিন্তু এখান থেকে কোনও জিনিস তো কেনা হল না। একটা ছোটখাটো কিছু স্মৃতিচিহ্ন। ঢুকে পড়লুম একটা সুভেনিরের দোকানে। সব জিনিসের আগুন দাম, টুরিস্টদের গলা কাটবার জন্যই এগুলো তৈরি। এ তো আমার পোষাবে না। দোকানে ঢুকে কিছু না কিনলে খারাপ দেখায়, তাই একটা ডটপেন পছন্দ করলুম।

কাউন্টারে দাম দিতে গেছি, মেয়েটি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ফরাসিতে অনেক কিছু বলে গেল। তার মধ্যে শুধু হিন্দু শব্দটি বুঝতে পারলুম। মাথা নেড়ে বললুম, হ্যাঁ।

মেয়েটি তার ব্লাউজের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটা হার বার করে দেখাল আমাকে। সেটা একটা ছোট ছোট রুদ্রাক্ষের মালা।

তারপর সে খুবই ভাঙা ইংরিজিতে, ফরাসি উচ্চারণে বলল, আমি তোমার দেশে যাচ্ছি।

আমি জিগ্যেস করলুম, কোথায়?

সে আমার বলল, তোমাদের দেশে।

আমি বললুম, তা তো বুঝলুম, কিন্তু আমাদের দেশ তো অনেক বড়, তুমি ঠিক কোন জায়গাটায় যাচ্ছ?

সে আমারই ডটপেনটা নিয়ে একটা কাগজে বানান করে লিখল। ভুল বানান সত্ত্বেও বোঝা গেল সেটা হরিদ্বার। তারপর আবার সে কী একটা নাম বলতে গিয়ে উচ্চারণ করতে না পেরে কাগজে লিখল। এবার লিখেছে মুক্তানন্দস্বামী। তার গুরু।

মেয়েদের বয়স আন্দাজ করার মতন শক্তি আমার নেই। তবু মনে হয় পঁচিশ থেকে বত্রিশের মধ্যে ফেলা যায় তাকে। ওই বয়েসের একটা ফরাসি মেয়ে এমন চালু দোকানের মায়া ছেড়ে কেন কোনও এক মুক্তানন্দস্বামীর শিষ্যত্ব নেবে, আর কেনই বা হরিদ্বারের মতন মাছ মাংস বিহীন জায়গায় গিয়ে থাকবে? কিন্তু মেয়েটিকে এই প্রশ্ন করেও কোনও লাভ নেই, তার ইংরেজি জ্ঞান এতই কম। দুটো একটা ইংরেজি শব্দের সঙ্গে বাকিটা সব ফরাসি মিলিয়ে সে আমাকে অনেক কিছু জিগ্যেস করছে, মনে হয় ওই মুক্তানন্দস্বামী বিষয়ে সে আমার কাছ থেকে শুনতে চায়। কিন্তু আমি তো ওই স্বামীজির নাম আগে শুনিনি, হরিদ্বার বিষয়েও আমার বিশেষ আগ্রহ নেই।

মেয়েটি আমার কাছে যা জানতে চায়, সে বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারব না। মেয়েটির কাছ থেকে আমি যা জানতে চাই, তা-ও ও আমায় বোঝাতে পারবে না। সুতরাং আমি হাসি-হাসি মুখ করে তাকিয়ে রইলুম ওর মুখের দিকে।

॥ ৮ ॥

বিমানটি দোতলা।

মোট কত মাইল এখন পাড়ি দিচ্ছি, ঠিক আন্দাজ নেই। সাত-আট হাজার মাইল তো হবেই। নীচে আটলান্টিক মহাসমুদ্র। জানলার ধারে সিট জোগাড় করেছি, কিন্তু বাইরে চোখ মেলে কিছুই দেখার নেই। প্রথমে যেন কিছুক্ষণ নীচে সমুদ্রের অস্পষ্ট চেহারা চোখে পড়েছিল, তারপর শুধু

পাতলা ধোঁয়া-ধোঁয়া। কলকাতা থেকে আসামে কিংবা ত্রিপুরায় বিমান যাত্রায় নানারকম মেঘের খেলা দেখতে পাওয়া যায়। কোথাও যেন দুর্গ, কোথাও মর্মর প্রাসাদ, কোথাও ধপধপে সাদা রঙের শিশুরা ছুটোছুটি করছে বরফের মধ্যে—এইসব কল্পনাতেই দিব্যি সময় কেটে যায়। কিন্তু এই সব জাম্বো-মাম্বো বিমানে কোনও বাইরের বৈচিত্র্য নেই, মেঘের খেলা নেই। এত উঁচুতে কিছুই দেখা যায় না। আর উঁচু মানে কি, মাউন্ট এভারেস্টের ডগার চেয়েও অনেক উঁচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছে এই বিশাল রূপালি পাখি।

আমি ইকোনমি ক্লাসের যাত্রী, অর্থাৎ ট্রেনের থার্ড ক্লাসের মতন, সেইজন্য বসতে দিয়েছে একেবারে লেজের দিকে। কিন্তু বিমানটি দোতলা, একথা জানবার পরই খালি মনে হচ্ছে, একবার ওপরটা দেখে আসব না? কিন্তু প্রথম-প্রথম ঠিক সাহস হয় না।

আমার পাশের দুজন যাত্রীই দুজন গোমড়ামুখো মধ্যবয়সি পুরুষ। একজন তো ওঠামাত্র কোমরের কষি আলগা করে (সিট বেল্ট খুলে) ঘুমোতে লাগলেন, যেন এই সকাল দশটাই তাঁর ঘুমোবার সময়। অন্য লোকটি প্রায় একটি দৈত্য, প্রথমে দু-তিনবার ঘনঘন আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে বোধহয় আমাকে একটি চুনোপুঁটি জ্ঞান করলেন। তারপর আমার প্রতি আর ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে, এবং আমাকে দারুণ বিস্মিত করে তিনি লোরকার একটি কবিতার বই খুলে বসলেন। আমার ধারণা ছিল, বিমানযাত্রীরা আর্থার হেইলি ছাড়া অন্য কারুর বই পড়ে না। এইরকম দৈত্যাকার লোকও কবিতা পড়ে?

এই সব বিশালবপু বিমানে তিন থাক করে বসবার জায়গা থাকে প্রত্যেক সারিতে। মাঝখানের দিকে যারা বসে আছে, তাদের মধ্যে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে এক শ্বেতাঙ্গিনী আর একটি বছরচারেক বয়েসের বাচ্চা। মেয়েটি প্রায় যুবতিই মনে হয়, পরণে একটা লম্বা গেরুয়া রঙের সেমিজ, (যার অন্য নাম ম্যাক্সিও হতে পারে) গলায় রুদ্রাক্ষের আলখাল্লা। ছেলেটির পায়ে জুতো নেই।

ছেলেটি বেশ সুন্দর রকমের দুরন্ত, প্রায়ই ছুটে চলে যাচ্ছে এদিক-ওদিক। তার মায়ের অবশ্য সেজন্য একটুও ব্যস্ততা নেই, সে মন দিয়ে পাশের এক যাত্রীর সঙ্গে গল্পে ব্যস্ত। বাচ্চাটি একবার আমার কাছে চলে এল, সে জানলার কাছে দাঁড়াতে চায়। ফুটফুটে বাচ্চাটি, মাথায় সোনালি চুল। কিন্তু সাহেবের বাচ্চা খালি পায়ে ছুটছে, এটা যেন কেমন-কেমন লাগে। যদিও প্লেনের মধ্যে পুরু করে কার্পেট পাতা, তা হলেও তো চার-পাঁচশো লোকের জুতোর ধুলো রয়েছে এই কার্পেটে। ছেলেটা কি জুতো খুলে ফেলেছে? প্লেন তো বেশিক্ষণ ছাড়েনি। সাধারণত বাচ্চারা জুতো খুলে ফেলতে চাইলে মায়েরা বেশ আপত্তি করে, সে রকম কিছু শুনিনি।

বাচ্চাটাকে আদর করতে ইচ্ছে করে, কিন্তু সাহস পাই না। আমি হাঁটু গুটিয়ে তাকে জানলার কাছে জায়গা করে দিয়ে হেসে বললুম, হ্যালো! বাচ্চাটি অবিকল সত্যজিৎ রায়ের ছবির বাচ্চাদের মতন গাঢ় চোখে আমার দিকে তাকায়, কিন্তু কোনও উত্তর দেয় না। বরং পট করে মুখে একটা আঙুল পুরে দেয়। ছি ছি ছি, সাহেব-বাচ্চার এরকম খারাপ অভ্যেস? তারপরেই ছেলেটি আবার আমাদের ঠেলেঠুলে চলে যায় অন্যদিকে। বাচ্চাটি সত্যিই জুতো খুলে রেখেছে, না খালি পায়েই বিমানে উঠেছে, তা জানবার জন্য দারুণ কৌতূহল হয় আমার । উঁকিঝুঁকি দিয়েও কিন্তু তার জুতো দেখতে পেলুম না।

দু-তিন ঘণ্টার বিমান যাত্রা একরকম আর এ যাত্রা অন্যরকম। অন্তত দশ-এগারো ঘণ্টা থাকতে হবে এই এক জায়গায়। সুতরাং কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিবেশটা অনেকটা বৈঠকখানার মতন হয়ে গেল, অনেকেই উঠে ঘোরাঘুরি করতে লাগল এদিকে ওদিকে, কেউ-কেউ অন্যদের সঙ্গে জায়গা বদলাবদলি করল। বাথরুমগুলোর সামনে দু-তিনজন করে নারী-পুরুষ দাঁড়িয়ে, চোখে-মুখে উদাসীন-উদাসীন ভাব।

আমিও জায়গা ছেড়ে উঠে পড়লুম।

প্রথম থেকেই ইচ্ছে, দোতলাটা একবার দেখে আসা। দোতলা বাস দেখেছি, কিন্তু দোতলা প্লেন তো আগে দেখা হয়নি। ওখানে কি বিশেষ কেউ বসে, ডবল ভাড়া দেয়, আমি উঠতে গেলে বাধা দেবে? সবাই যখন ঘোরাঘুরি করছে, তখন মনের ভুলে একবার ওপরে ঘুরেই আসা যাক না।

ফার্স্ট ক্লাসের পাশ দিয়ে ওপরে ওঠবার সিঁড়ি। একটু-একটু গা ছমছম করছে। এখন তো আর রাজা-মহারাজা নেই, ওপরে উঠলেই একালের কোটিপতিদের দেখতে পাব। উঠে এসে একটু নিরাশ হলুম। বিমানের একতলাটি যত বড়, সেই তুলনায় দোতলাটি বেশ ছোট, সেখানে যারা বসে আছে তাদের কারুর চেহারাই কোটিপতিদের মতন নয়। অবশ্য কোটিপতি আমি কখনও দেখিনি, তাদের চেহারায় কী বিশেষত্ব থাকে তাও আমার জানা নেই, তবু একটা কিছু তো আলাদা থাকবে! এ যে সব সাধারণ চেহারা! এদের মধ্যে শাড়ি-পরা এক মহিলা এবং আরও একজন দাড়িওয়ালা ভারতীয়কে দেখলুম। এরা কি কোটিপতি? নাঃ, তাহলে হয়তা ওপরের জায়গাগুলোর আলাদা কোনও ব্যাপার নেই, দোতলা বাসের মতন ওপরেও এক ভাড়া।

ফার্স্ট ক্লাসে যারা বসে আছে, তাদের মুখে একটা আলাদা ছাপ ঠিকই নজরে পড়ে। কারুর-কারুর মুখে স্পষ্ট অহংকার, কেউ কেউ অহংকার চাপা দিয়ে ঔদার্যের ভাব ফুটিয়ে তোলা রপ্ত করে। বড় মানুষদের একটা বৈশিষ্ট্য হল, তারা অন্যদের সামনে হাসে না। যে যত বড় মানুষ, সে তত গম্ভীর।

ফার্স্ট ক্লাসের ঠিক পরের সারিতেই পাশাপাশি তিনজন লোক বসে আছে, তিনজনের গায়েই এক রকমের ওভারকোট। অন্যরা কোট ফোট খুলে রেখেছে, কিন্তু এরা তিনজন কোটপরা অবস্থাতেই পরস্পর কী একটা আলোচনায় মগ্ন।

লোকজন স্টাডি করার আর বিশেষ অবকাশ হল না, কারণ লক্ষ করলুম খাবার দেওয়া হচ্ছে। পাছে আমারটা ফস্কে যায়, তাই তাড়াতাড়ি গিয়ে বসে পড়লুম নিজের জায়গায়।

প্লেন ছাড়বার কিছুক্ষণ পরেই একবার চা আর কেক দিয়েছে, এর মধ্যেই আবার খাবার! দূরপাল্লার বিমান যাত্রায় শুনেছি খুব ঘনঘন খাবার দেয়। তাতে খানিকটা একঘেয়েমি কাটে। দশ-বারো ঘণ্টা ধরে ঠায় বসে থাকা, এর মধ্যে কাজ তো মাত্র দুটো, খাওয়া আর বাথরুমে যাওয়া। আমার অবশ্য বিমানের বাথরুমে ঢুকতে ভয় হয়, মনে হয়, ভেতরে ঢোকবার পর দরজা যদি আর না খোলে? কেউ যদি আমার চিৎকারও শুনতে না পায়?

খাবারের বহর দেখে চক্ষু চড়কগাছ হওয়ার উপক্রম। একটা গোল রুটি ও মাখন, এক গেলাস ফলের রস, বড় এক চাকা মাংস, খানিকটা ভাত, অনেকটা আলু সেদ্ধ, একবাটি স্যালাড, দুরকম সস্, এক প্যাকেট চিজ আর এক কৌটো আইসক্রিম। এত খাবার কেউ একসঙ্গে খেতে পারে? খাবার নষ্ট করতেও গা কষকষ করে। এত দামি সুখাদ্য!

আমার পাশে কবিতা পাঠক দৈত্যটি খাবারের সঙ্গে ওয়াইনের অর্ডার দিয়েছিলেন। পরপর দু-বোতল ওয়াইন সমেত সে সমস্ত খাবারদাবার চেটেপুটে শেষ করল। তারপর তৃপ্তির সঙ্গে একটি সিগারেট ধরিয়ে আড়চোখে তাকাল আমার দিকে।

আমি অন্য খাবারগুলোর যতদূর সম্ভব যত্ন করলেও পাঁউরুটি-মাখন, চিজ ও আইসক্রিম ছুঁইনি। কত লোক আইসক্রিম ভালোবাসে, অথচ আমাকে ওটা ফেলে দিতে হবে, আইসক্রিম আমার জিভে ঠেকাতেই ইচ্ছে করে না কক্ষনো। এত ঘোরাঘুরির পরও মাঝে-মাঝে সব কিছুই আমার কাছে অবিশ্বাস্য লাগে। সত্যি কি পঁয়তিরিশ হাজার ফিট উঁচুতে আটলান্টিক মহাসাগরের ওপরে একটা জেট বিমানের পেটের মধ্যে বসে আছি? সেই আমি, যে কি না এইমাত্র কয়েক বছর আগেও কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতুম, যদি চেনাশুনো কারুর সঙ্গে দেখা হয় তা হলে ভেতরে ঢুকে এক কাপ কফি খাওয়াতে বলব তাকে। কতদিন পকেটে ট্রাম-বাস ভাড়া থাকেনি বলে হেঁটে গেছি শ্যামবাজার। সেই আমি বিলিতি আইসক্রিম ফেলে দিচ্ছি?

চিজের প্যাকেটটা না খুলেই টপ করে রেখে দিলুম কোটের পকেটে। মাখন আর আইসক্রিম তো পকেটে নেওয়া যায় না, গলে যাবে। পাশের লোকটা দেখে ফেলেছে নাকি?

ঘুমন্ত লোকটি জেগে উঠে খাবারটাবার ঠিক খেয়ে নিয়েছে। এবার সে আমাদের উদ্দেশ করে বলল, ইট ওয়াজ ড্যাম হট ইন প্যারিস। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, নিউ ইয়র্কও গরম হবে এই সময়।

দৈত্যটি বলল, গরমতর।

পাক্কা সাহেবরা প্রথম আবহাওয়া সমাচার দিয়ে আলাপ শুরু করল। তারপর তাদের কথাবার্তা চলল এই প্রকার ঃ

—গত মাসে আমি টরেনটোতে ছিলুম, বড্ড গরমে কষ্ট পেয়েছি।

—আসল গরম হচ্ছে ওয়াশিংটন ডি সি-তে। প্যাচপেচে ঘাম।

—আমি তো এ সময় ওয়াশিংটন ডি সি-তে যাই না। তবে জেনিভায় বেশ মনোরম আবহাওয়া।

—তা ঠিক।

—আমি টরেনটোতে মাত্র দুদিন থাকব, তারপরই ফিরে আসছি জেনিভায়। সেখানেই থাকব কিছুদিন। অবশ্য মাঝখানে একবার জাপান ঘুরে আসতে হবে।

—তোমার কি জেনিভাতেই অবস্থিতি?

—হ্যাঁ। সেখানে আমার শাখা অফিস। বাকি সময়টা আমায় মনট্রিয়েলে থাকতে হয়।

—আমিও মনট্রিয়েলেই যাচ্ছি।

—সেখানে তুমি...

—না, সেখানে আমার অফিস নয়, এমনিই।

এক মাসের মধ্যেই ওদের একজন টরেন্টো-জেনিভা-জাপান ঘোরাঘুরি করবে, যেন ব্যাপারটা কিছুই না। এই সব লোকের পক্ষেই তো বিমানে উঠেই সঙ্গে-সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়া স্বাভাবিক।

এ সব কথাবার্তার চেয়ে উঠে পড়া ভালো। এক চক্কর ঘুরে আসা যাক আবার। মনে করা যেতে পারে, আমি মহাসমুদ্রের ওপর দিয়ে হাঁটছি।

বাথরুমের কাছের ফাঁকা জায়গাটায় সেই গেরুয়া শেমিজ-পরা শ্বেতাঙ্গিনীটি একজন সাফারি-সুট পরা ভারতীয় যুবকের সঙ্গে হাত-পা নেড়ে অনেক কথা বলছে। সিগারেট টানার ছলে আমি একটু কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম এবং আবিষ্কার করলুম যে মেয়েটির পায়েও জুতো নেই। যুবকটির মুখ ভরতি কালো দাড়ি, সে বেশ সাবলীলভাবে কথা বলে যাচ্ছে মেয়েটির সঙ্গে।

দু-একটা কথাতেই বোঝা গেল ব্যাপারটা। আচার্য রজনীশকে ভারত থেকে উৎখাত করায় মেয়েটি খুবই ক্ষুব্ধ। সে বলছে, এটা কি গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষের স্বরূপ? সেখানে যেকোনও মানুষের ধর্মচর্চার অধিকার আছে, তাহলে আচার্য রজনীশের কী দোষ?

ভারতীয় যুবকটি বলল, ধর্ম কাকে বলে? আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে আছে...

শ্বেতাঙ্গিনী বললে, তোমাদের দেশে তন্ত্রচর্চা হয়নি? আচার্যও তো এক রকম তন্ত্র সাধনাই করছিলেন...

—শোনো, গুরু হতে গেল যোগসাধনায় যে ঊর্ধ্বমার্গে উঠতে হয়...

—কী করে তুমি জানলে যে ভগবান রজনীশ সেই ঊর্ধ্বমার্গে ওঠেনি? আমি পাঁচ বছর পুণায় ওই আশ্রমে ছিলুম।

এই সব ধর্মটর্ম আমার মাথা গুলিয়ে দেয়। এ আলোচনাও আমায় আকৃষ্ট করল না। শুধু একটা খটকা রয়ে গেল। মেয়েটি পাঁচ বছর ধরে পুণার আশ্রমে থাকার পর মনের দুঃখে ভারত ছেড়ে ফিরে যাচ্ছে। তা হলে ওই চার বছরের শিশুটি জন্মাল কী করে? ও কি প্রকৃতির দান?

অন্য প্রান্তে হেঁটে গিয়ে সেই ছোট ছেলেটিকে আবার দেখতে পেলুম। সে একজন যাত্রীর ওয়াইনের

বোতল উলটে দিয়েছে, বিমান-সখীরা তাই নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, যাত্রীটি কিন্তু বাচ্চাটাকে কোলে বসিয়ে আদর করছে।

হঠাৎ মনে হল, এই সময় একটা হাইজ্যাকিং হলে মন্দ হত না। একঘেয়েমির বদলে বেশ একখানা নাটক দেখা যেত। প্রত্যেক মাসে দুটো-তিনটে হাইজ্যাকিং-এর কথা কাগজে পড়ি, এই প্লেনে সে রকম হতে দোষ কী? প্লেনখানা ত্রিপোলি কিংবা হাভানায় ঘুরিয়ে নিয়ে যাবে, বেশ একখানা জমজমাট মজা হবে। সর্বক্ষণ পিস্তল আর হাতবোমা নিয়ে শাসাবে দু-তিনটে ছোকরা, তার মধ্যে একটি মেয়ে থাকলে তো কথাই নেই। পরে আমি রয়টারের প্রতিনিধির কাছে রসিয়ে রসিয়ে বলব আমার রোমহর্ষক অভিজ্ঞতার কথা।

ওই যে একই রকম ওভারকোট-পরা তিনজন, এখনও ফিশফিশ করে কথা বলে যাচ্ছে, ওরা হাইজ্যাকার হতে পারে না? ওভারকোট খোলেনি কেন? ওরা কি আরব? প্যালেস্টাইনের বিপ্লবী? তিনজনই বেশ শক্ত সমর্থ যুবা পুরুষ। হাইজ্যাকার হওয়ার সমস্ত যোগ্যতাই ওদের কাছে। হয়তো ওদের আরও দু-চারজন সঙ্গী বা সঙ্গিনী ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অন্য জায়গায়।

ঠিক এই সময়ে ওভারকোটের মধ্যে একজন উঠে দাঁড়াতেই আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল।

এইবার কি সত্যি শুরু হবে সেই নাটক? ছেলেটি দৃঢ় পা ফেলে-ফেলে ককপিটের দিকেই যাচ্ছে না? এবার পাইলটের ঘাড়ের কাছে রিভলবার উঁচিয়ে ধরবে?

ইচ্ছে হল, লোকটির পেছনে-পেছনে যাই। অন্য দুই ওভারকোটের দিকে তাকালুম। তাদের মুখ পাথরের মতন স্থির। ওদের ওভারকোটের আড়ালে কী, বোমা না মেশিনগান?

হঠাৎ প্লেনের ভেতরের সব আলো নিভে গেল। এমনই চমকে গেলুম যে ঢাকঢোল বাজতে লাগল বুকের মধ্যে। তাহলে তো আর কোনও সন্দেহ নেই। এত প্লেনে চড়েছি আগে, কোনওদিন তো এক সঙ্গে সব আলো নিভে যেতে দেখিনি?

টুংটাং শব্দের পর মাইক্রোফোনে ভেসে উঠলো একটি ঘোষণা ঃ

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ আপনারা দয়া করে যে যার নিজের আসনে বসুন। অনুগ্রহ করে জানলার শেড্গুলো টেনে দিন যাতে বাইরের আলো না আসে। আপনাদের এক্ষুনি একটা ফিল্ম দেখানো হবে। সুপারম্যান টু।

দূর ছাই। আশা করেছিলুম জলজ্যান্ত নাটক, তার বদলে সিনেমা।

।। ৯ ।।

দিল্লি থেকে আমস্টারডাম আসবার পথে এক মধ্যবয়স্কা ভারতীয় মহিলার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তিনিই ডেকে আলাপ করেছিলেন আমার সঙ্গে। বিমানসেবিকা সেই ভদ্রমহিলার কথা কিছুই বুঝতে পারছিল না, সেই জন্য ভদ্রমহিলা আমায় ডেকে হিন্দিতে অনুরোধ করেছিলেন যে, তিনি নিরামিষ ছাড়া আর কিছু খান না, সেকথা ওই মেম-মেয়েটিকে বুঝিয়ে দিতে।

ভদ্রমহিলা একা চলেছেন এবং একবর্ণ ইংরেজি জানেন না। ওঁর হিন্দিও এত দুর্বোধ্য যে আমার পক্ষে সব কথার মর্মোদ্ধার করা শক্ত। তাঁর পাশের সিটটা খালি ছিল বলে তিনি বারবার ডেকে আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলেন।

তাঁর বৃত্তান্ত যেটুকু আমি বুঝলুম, তাতেই আমি চমৎকৃত হলুম।

ভদ্রমহিলার বাড়ি পাঞ্জাবের একটি গ্রামে। ওঁর তিন ছেলের মধ্যে একজন সাত বছরের মেয়াদে জেল খাটছে, সে আছে দিল্লির তিহর জেলখানায়। বাকি দু'ছেলের মধ্যে একজন লন্ডনে অন্যজন কানাডায়। ওঁর স্বামী মারা গেছেন এক বছর আগে। এক মেয়ে আছে বিবাহিতা। শরিকদের অত্যাচারে উনি নিজের বাড়িতে একা-একা আর টিকতে পারছিলেন না, তাই কিছুদিন ছিলেন মেয়ের কাছে।

কিন্তু মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে অনেক লোক, সেখানে তাঁর বেশিদিন থাকা ভালো দেখায় না বলে তিনি আবেদন জানিয়েছিলেন প্রবাসী পুত্রদের কাছে। এর মধ্যে সাড়া পাওয়া গেছে এক ছেলের কাছ থেকে, যে লন্ডনে থাকে। সে একটি বিমানের টিকিট পাঠিয়ে দিয়েছে।

ভদ্রমহিলার এক ছেলে কেন জেল খাটছে, সেকথা আমি জিজ্ঞেস করিনি তবু, সাত বছরের মেয়াদ যখন, তখন পেটিকেস নিশ্চয়ই নয়, রক্তারক্তির ব্যাপার আছে মনে হয়।

মেয়ের দেওরকে ভজিয়ে, তাকে নিয়ে ভদ্রমহিলা এসেছিলেন দিল্লি। জীবনে তাঁর সেই প্রথম দিল্লি আসা। তিহর জেলে গিয়ে ছোট ছেলের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন। তারপর মেয়ের দেওর তাঁকে তুলে দিয়েছে এই বিমানে।

অবস্থায় পড়লে মানুষ কত কী করতে পারে। আমাদের বাংলার কোনও গ্রামের ইংরেজি না-জানা প্রৌঢ়া মহিলা একা-একা প্লেনে চেপে বিলেত যাচ্ছেন, এ কথা কল্পনা করতেই আমাদের কষ্ট হয়।

ভদ্রমহিলা শাড়ি পরেননি, পরেছিলেন সালোয়ার-কামিজ। বিলেত যাওয়ার জন্য বিশেষ কিছু সাজপোশাক করেছেন এমন মনে হয় না। পাঞ্জাবের ট্রেনের থার্ড ক্লাসে এরকম পোশাক ও চেহারার মহিলা আগে অনেক দেখেছি। বয়েস পঞ্চান্নর কম নয়, আবার পঁয়ষট্টিও হতে পারে। মনে হয় ওঁর স্বাস্থ্য এই কিছুদিন আগেও বেশ মজবুত ছিল, সদ্য ভাঙতে শুরু করেছে। সঙ্গের হাতব্যাগটি এমনই ক্যাটকেটে সবুজ রঙের যে সেদিকে তাকানো যায় না। আমাদের ভারতীয় ব্যবসায়ীরা অধিকাংশই বর্ণ কানা। বেশিরভাগ জিনিসপত্রের ডিজাইনের রঙের এমন অসামঞ্জস্য যে চক্ষুকে পীড়া দেয়।

আমি বারবার উঠে গেলেও উনি আমার সঙ্গে চোখাচোখি হলেই হাতছানি দিয়ে ডেকে এটা ওটা জিগ্যেস করছিলেন। ওঁর প্রতিটি বাক্য আমি দু-তিনবার জিগ্যেস না করে বুঝতে পারছিলুম না। সেই বিমানে অন্য আরও কয়েকজন ভারতীয় যাত্রী ছিল। আমার হিন্দিতে অল্প-জ্ঞানের জন্য আমার মনে হচ্ছিল, উনি আমার বদলে অন্য কোনও হিন্দি জানা কারুকে ডেকে ওঁর মনের কথা বললে পারতেন। কিন্তু উনি আমায় ডাকলে তো আমি অন্য লোক ভজিয়ে দিতে পারি না।

একবার উনি একটা খাম খুলে ওঁর ছেলের ঠিকানা দেখিয়ে জিগ্যেস করলেন, আমি লন্ডনের এই রাস্তাটা চিনি কি না।

আমাকে উনি কেন লন্ডন বিশেষজ্ঞ ভেবে বসলেন কে জানে! যাই হোক, ঠিকানাটা সাসেক্সের। এইটুকু জানি, লন্ডন শহর থেকে বেশ কিছু দূরে। আশা করি, ওঁর ছেলে ঠিক সময়ে হিথ্‌রো বিমানবন্দরে উপস্থিত থাকবে।

জিগ্যেস করলুম, ছেলেকে চিঠি দিয়েছেন তো?

এমনই ভাষার ব্যবধান যে উনি আমার এ প্রশ্নটাও বুঝতে পারছিলেন না। বারবার জিগ্যেস করতে লাগলেন, কেয়া দিয়া? কেয়া দিয়া?

তখন আমার মনে পড়ল, খত। চিঠির হিন্দি খত। বললুম, খত ভেজ দিয়া তো?

এবার উনি বললেন যে, হ্যাঁ, তাঁর মেয়ের দেওর একটা তার ভেজে দিয়েছে লন্ডনে।

আমি আবার মনে মনে প্রার্থনা করলুম, মেয়ের দেওরটি আশা করি ঠিকানা ঠিক লিখেছে এবং ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ সুপ্রসন্নভাবে তারটি যথাসময়ে পাঠিয়েছে।

এরপর ভদ্রমহিলা আর একটি চমকপ্রদ কথা বললেন। লন্ডন-প্রবাসী সেই ছেলেকে তিনি আট বছর দেখেননি। তিনি শুনেছেন যে, সে একটি আংরেজি মেয়েকে বিয়ে করেছে।

আমি জিগ্যেস করলুম, আপনার স্বামী মারা যাওয়ার পরও আপনার ছেলেরা কেউ দেশে আসেনি?

উনি বললেন, না। এবং এমনভাবে বললেন যে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

হয়তো ওঁদের সমাজে পিতৃশ্রাদ্ধের ব্যাপারে অনুষ্ঠানের বাড়াবাড়ি নেই।

অনেকে বলে পাঞ্জাবে এখন এমনই সমৃদ্ধি এসেছে যে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আলাদাভাবে পাঞ্জাবকে ইটালি বা স্পেনের সঙ্গে তুলনা করা যায়। তা হয়তো ঠিকই। ভদ্রমহিলার ছেলেরা তো

বেশ সাহেবই হয়ে গেছে মনে হয়। বাঙালি ছেলেরা বোধহয় এখনও বিধবা মাকে একা বিদেশের প্লেনে চাপাতে সাহস পায় না।

একটা চিন্তা মনের মধ্যে খচখচ করছিল। আট বছর যে ছেলে দেশে ফেরেনি এবং যে মেম বিয়ে করেছে, তার বিলেতের সংসারে কী করে সে এই ইংরেজি না জানা গ্রাম্য মাকে মানিয়ে নেবে? আশা করি, ভদ্রমহিলা সুখেই থাকবেন।

আমস্টারডাম এয়ারেপোর্টে নামবার জন্য তৈরি হচ্ছি, ভদ্রমহিলা আমাকে জিগ্যেস করলেন, লন্ডন এসে গেছে?

আমি বললুম, না, এখান থেকে আপনাকে প্লেন পালটাতে হবে।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তবে কি এই জায়গাটার নাম পারস্?

ভদ্রমহিলা লন্ডনকে বলেন লোন্দন আর কানাডাকে বলেন কান্ডা। সুতরাং পারস্ যে প্যারিস হবে, তা আমি বুঝতে পারলুম একবারেই।

আমি জানালুম যে প্যারিস নয়, আমরা এক্ষুনি পৌঁছাচ্ছি আমস্টারডামে।

এতক্ষণে ভদ্রমহিলার চোখ মুখে ভয়ের ছাপ দেখা দিল। তিনি বললেন, আমি তো লোন্দন যাব, তবে কি আমি ভুল হাওয়াই জাহাজে উঠেছি?

ভুল বাস বা ভুল ট্রেনের মতন ভুলে বিমান চড়া অত সহজ নয়। অনেকগুলো চেকিং হয়। তবু আমি সিট বেল্ট খুলে ভদ্রমহিলার কাছে এসে বললুম, দেখি আপনার টিকিট।

টিকিট কে এল এম-এরই বটে। এবং ওই বিমান কোম্পানির সব প্লেন আমস্টারডামে থামবেই। ভদ্রমহিলাকে এখান থেকে অন্য প্লেন ধরতে হবে লন্ডনের জন্য। কিন্তু উনি এবার আমার কথা বিশ্বাস করলেন না। উনি লন্ডনে যাবেন, অন্য কোথাও নামবেন না। ওঁকে তো কেউ এই জায়গায় নামবার কথা আগে বলে দেয়নি। মেয়ের দেওর ওঁকে বলেছে যে একবার হয়তো পারসে নামতে হতে পারে। কিন্তু এটা কোন জায়গা?

হয় দেওর মশাই ভুল করেছে কিংবা আমস্টারডাম একটু শক্ত নাম বলে ভদ্রমহিলা ভুলে গেছেন। আমি দু-তিনবার বোঝাবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু উনি আমায় বেশ সন্দেহ করতে লাগলেন।

তখন আমি ভাবলুম, দূর ছাই। আমার কী দায়িত্ব! যাদের পাসেঞ্জার, সেই কোম্পানি বুঝবে কী করে ওঁকে পাঠাতে হবে লন্ডনে।

আমি নেমে পড়লুম।

তারপর কোন দিকে কাস্টমস্, কোন দিকে ইমিগ্রেশন এই সব খোঁজাখুঁজি করছি, সেই সময় ভদ্রমহিলা ভিড়ের ভেতর থেকে দৌড়ে এসে আমার হাত চেপে ধরে বললেন, এ বেটা! তুমি কোথায় চলে যাচ্ছ? আমি এখন কোথায় যাব?

অন্য দেশের বিমানবন্দরে সদ্য নেমে কারুর ব্যাপারে মাথা ঘামাবার সময় থাকে না। সবাই নিজের কাজে ব্যস্ত। মালপত্র ছাড়াবার জন্য উদ্বেগ, বাইরে যদি কেউ অপেক্ষা করে থাকে তার সঙ্গে দেখা করার তাড়াহুড়ো তো থাকবেই। তবু একজন বয়স্কা মহিলা বেটা বলে ডেকে যদি বিপদের সময় কোনও সাহায্য চান, তবে কি এড়িয়ে যাওয়া যায়?

ওঁকে সঙ্গে নিয়ে আমি বিমান কোম্পানির কাউন্টারে গিয়ে ওঁর টিকিটের এনডোর্সমেন্ট করিয়ে ফ্লাইট নম্বর জেনে নিলুম। তারপর নির্দেশ অনুযায়ী সেই ফ্লাইটের বিমানের রাস্তাটা দেখিয়ে বললুম, এবার এদিকে চলে যান, ওরা আপনাকে লন্ডনে পৌঁছে দেবে।

তিনি তখনও আমার হাত ধরেছিলেন। এরপর একটা অদ্ভুত কথা বললেন, তুমিও আমার সঙ্গে লোন্দন চলো। এখানে থেকে কতদূর?

আমার হাসি পেল। একি অমৃতসর থেকে লুধিয়ানা যে ওঁকে এখন আমি লন্ডনে পৌঁছে দিয়ে আসব। আমার এখন থাকার কথা আমস্টারডামে।

অনেক মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে আমি ওঁকে ওঁর বিমানের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলুম এবং একজন কোমল মুখ এয়ার হস্টেসকে দেখে তাঁকে বুঝিয়ে দিলুম যেন লন্ডনে নামার পর মহিলাকে একটু সাহায্য করেন। ভদ্রমহিলা জলে-পড়া মানুষের মতন মুখ করে বারবার আমার দিকে পেছন ফিরে তাকাতে তাকাতে চলে গেলেন ভেতরে।

ভদ্রমহিলা পাঞ্জাবিনী বলেও ওর নাম জিগ্যেস করা হয়নি। সুতরাং ওঁর কি ধর্ম তা আমি জানি না। সেইজন্য আমি মনে মনে বললুম, হে গুরু নানক, হে হজরত মহম্মদ, হে শ্রীকৃষ্ণ আপনারা দয়া করে এই অসহায় মহিলাকে ঠিকঠাক ওঁর ছেলের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবেন লন্ডন বিমান বন্দরে।

সেই মহিলার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল ভূমধ্যসাগর পেরুবার সময়। এরপর অনেকদিন কেটে গেছে, আমি যখন আবার আটলান্টিক মহাসমুদ্র ডিঙিয়ে যাচ্ছি, সেই সময়, যাত্রার একেবারে শেষ দিকে লক্ষ করলুম যে বিমানের এক কোণে সেই মহিলা বসে আছেন।

বেশ চমকে উঠলুম প্রথমে।

এর মধ্যেই তিনি লন্ডন ছেড়ে কানাডায় চলেছেন? উনি বলেছিলেন যে দুই ছেলের কাছেই সাহায্য চেয়ে চিঠি দেওয়ায় কানাডার ছেলে উত্তর দেয়নি, লন্ডনের ছেলে টিকিট পাঠিয়ে দিয়েছিল। তাহলে বোধহয় কানাডার ছেলেটির সুমতি হয়েছে। মাকে সে বেশি ভালোবাসে। সে হয়তো লন্ডনের ভাইকে জানিয়েছে যে, মা তোর কাছে থাকবে কেন, আমার কাছে পাঠিয়ে দে।

কিংবা এর উলটো দিকও থাকতে পারে।

আমার গল্প বানানো অভ্যেস কি না, তাই মনে মনে একটা অন্য রকমও ভেবে ফেললুম। লন্ডনের মেম বিয়ে করা ছেলে মাকে নিয়ে বোধহয় বিড়ম্বনায় পড়েছিল। হয়তো তার বাড়িতে খুব মদ খাওয়ার পার্টি হয়, ওঁর মেম বউয়ের বান্ধবী প্রায়ই এসে নাচানাচি করে, সেখানে এই গ্রাম্য মহিলার উপস্থিতি তো একটা মূর্তিমান অসঙ্গতি। বাচ্চা-কাচ্চা থাকলে অনেক সময় মা-কে কাছে রাখলে সুবিধা হয়, বুড়ি মাকে দিয়ে বিনাপয়সার ন্যানি কিংবা আয়ার কাজ চালিয়ে নেওয়া যায় বেশ। কিন্তু মেমের বাচ্চারা কি এই ইংরেজ না-জানা ঠাকুমার কাছে থাকতে চাইবে। সেইজন্যই কি তিতিবিরক্ত হয়ে তাঁর লন্ডনের ছেলে মাকে এখন ক্যানাডার ভাইয়ের কাঁধে চালান করে দিচ্ছে?

ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা করব কি করব না, এই নিয়ে ইতস্তত করছিলুম। কে আর সাধ করে অন্যের সমসা কাঁধে নিতে চায়। আগেরবার তবু আমাদের গন্তব্য ছিল আলাদা, এবার তো নামতে হবে টরেন্টোতেই একসঙ্গে।

ভদ্রমহিলা আমাকে দেখেননি, দেখলে নিশ্চয়ই ডাকতেন। আমি কিছুক্ষণ ওই দিকটা এড়িয়ে রইলুম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গল্পটা জানবার অদম্য কৌতূহলই আমাকে ঠেলে নিয়ে গেল। কী হল লন্ডনে?

কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলুম, নমস্তে, ভালো আছেন?

ভদ্রমহিলা সাদা চোখ তুলে তাকালেন আমার দিকে। চিনতে পারেননি।

মুখখানা ম্লান, তবে সেই জলেপড়া ভাবটি আর নেই। এক মাসের লন্ডনের অভিজ্ঞতা ওঁকে অনেকখানি পালটে দিয়েছে মনে হয়। পোশাক অবশ্য একই রকম, শুধু আগেরবার পায়ে সস্তা রবারের চটি দেখেছিলুম, এবারে নতুন জুতো। লন্ডনের ছেলে মাকে অন্তত একজোড়া জুতো দিয়েছে।

বললুম, সেই যে আগেরবার প্লেনে দেখা হয়েছিল, তারপর আমস্টারডাম এয়ারপোর্টে...

উনি বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ।

কণ্ঠস্বরে সে রকম কোনও উৎসাহ নেই। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন একদৃষ্টে।

আবার জিগ্যেস করলুম লন্ডনে দেখা পেয়েছিলেন আপনার ছেলের? কোনও অসুবিধা হয়নি তো?

উনি বললেন, না। ছেলে তার পায়নি। সেইজন্য হাওয়াই আড্ডায় আসেনি। ওখানে একজন দেশি লোক নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল, পরদিন ছেলের ঠিকানায় পৌঁছে দিল।

—তা লন্ডন কি আপনার ভালো লাগল না? এত তাড়াতাড়ি চলে এলেন?

আগেরবারের মতন এবারে আর গল্প করার মতন কোনও উৎসাহ নেই ভদ্রমহিলার। শুধু বললেন, এবার কান্ডায় অন্য ছেলের কাছে যাচ্ছি।

সিট বেল্ট বাঁধার নির্দেশ শোনা গেল বলে আমি ফিরে এলুম নিজের জায়গায়। তবু কৌতূহল জেগে রইল। লন্ডনের মতন অচেনা শহরে এই ভারতীয় গ্রামের মহিলা প্রথম দিন প্লেন থেকে নেমে ছেলেকে দেখতে পাননি। তখন কীরকম মনের অবস্থা হয়েছিল ওঁর?

দিল্লির টেলিগ্রাম ঠিক সময়ে লন্ডনে পৌঁছয়নি। বিলেতের টেলিগ্রাম ঠিক সময় কানাডায় পৌঁছেছে তো? কানাডার ডাকব্যবস্থার ওপরেও খুব একটা ভরসা করা যায় না। ভারতের মতন এখানেও ঘন ঘন ডাক ধর্মঘট হয়। চিঠি আসতে পনেরো-কুড়ি দিন লেগে যায়। টরেন্টোর ছেলে ঠিকঠাক উপস্থিত থাকবে তো? লন্ডনে যে দিশি লোকটি ওঁকে একদিনের জন্য আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করেছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই খুব দয়ালু, এখানে যদি সে রকম দয়ালু লোক না থাকে? তাছাড়া আগেই শুনেছি, খালিস্তানের দাবিতে অনেক পাঞ্জাবি এসে টরোন্টো বিমান বন্দরে আস্তানা গেড়ে আছে, তাদের জন্য কানাডার সরকার বিব্রত। যদি ভদ্রমহিলাকে কানাডায় ঢুকতে না দেয়?

টরেন্টো থেকে বিমান বদলে আমার এডমান্টন যাওয়ার কথা। আমার ভিসা, কাস্টমস্ চেকিং সেখানেই হবে। ভেবেছিলুম টরেন্টোতে নেমে কিছুক্ষণ সময় পাব, ততক্ষণ দেখে যাব ভদ্রমহিলার কোনও গতি হয় কি না।

কিন্তু টরেন্টোতে নামামাত্র ঘোষণা শুনতে পেলুম এডমান্টনের ফ্লাইট এক্ষুনি ছাড়বে। তার জন্য যেতে হবে ইন্টারন্যাল এয়ারপোর্টে, সেটা অন্য বাড়িতে। সুতরাং ছুটতে হল সঙ্গে-সঙ্গে। পাঞ্জাবি মহিলাটির কাহিনির শেষ পরিণতি আমার জানা হল না।

।। ১০ ।।

টরেন্টোর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ঘরোয়া বিমান বন্দরে হুড়োহুড়ি করে যেতে হবে, সুটকেসটা তুলতে গেছি, এমন সময় একজন লোক পাশে এসে সেটির দিকে হাত বাড়াল। চেহারা দেখলেই চেনা যায়।

কুলি না বলে পোর্টার বলাই উচিত। কুলি শুনলেই মনে হয় যারা মাথায় করে মালপত্র বয়ে নিয়ে যায়। আর পোর্টার মানে স্মার্ট পোশাক পরা, ছোট ঠেলা গাড়ি নিয়ে ঘোরে। আমার সুটকেসটা যে কারুর বয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার তা-ও নয়, এতদিন তো নিজেই বয়েছি। তাছাড়া ইওরোপের নানান বিমান বন্দরে অনেক ছোট-ছোট হাতে ঠেলা গাড়ি ছড়ানো থাকে, যে-কোনও একটা টেনে এনে নিজের মালপত্র নিজেই যেখানে সেখানে নিয়ে যাওয়া যায়। দিল্লি ছাড়বার পর কুলি বা পোর্টার দেখিনি এ পর্যন্ত। বহু ঘন্টা বিমান যাত্রার পর মাথা ভোঁ ভোঁ করে, সম্পূর্ণ নতুন দেশে একটু হকচকিয়েও যেতে হয়। ভাবলুম এদেশে বুঝি এরকমই নিয়ম, তাই লোকটিকে সুটকেস নিতে দিলুম।

তারপর কাস্টমস ইত্যাদির ফর্মালিটি মেটাবার পর পরবর্তী বিমানের অপেক্ষা স্থলে এসে পৌঁছুতেই সেই লোকটি এসে আমার হাতে লাগেজ ট্যাগ গুঁজে দিল। অর্থাৎ আমার সুটকেস আবার যাত্রার জন্য তৈরি হয়েছে।

ভালো কথা। এবার?

লোকটি লম্বা-চওড়া কুচকুচে কালো। গম্ভীরভাবে বাঁ-হাতের তালুটা বাড়িয়ে দিল আমার দিকে।

একটা কিছু রেট থাকা উচিত, কিন্তু কোথাও তা লেখা নেই। কিংবা, পয়সা নেবার নিয়ম আছে কি না জানে, লোকটির ভাবভঙ্গি একটু গোপন-গোপন। যেন প্রকাশ্যে পয়সা চাইতে সে লজ্জা পাচ্ছে।

পকেটে হাত দিয়েই আমি প্রমাদ গুণলুম। যাঃ টাকা বদলানো তো হয়নি! এক-একটা দেশে

যাওয়া মানেই নতুন করে টাকা পয়সার হিসেব রাখা। তা ছাড়া প্রত্যেক দেশের আলাদা-আলাদা সিকি আধুলি সহজে চেনাও যায় না। আমেরিকান ডলার আর কেনেডিয়ান ডলারের চেহারা প্রায় একরকম হলেও মূল্য আলাদা। আমেরিকান ডলার আমাদের ন-টাকা, আর কেনেডিয়ান ডলার পৌনে আট টাকার মতন।

আমার পকেটে রয়েছে ফ্রেঞ্চ ফ্র্যাংক। সেই এক ফ্র্যাংকের দাম আবার দু-টাকার কাছাকাছি। সেই হিসেবে কত টাকা একে দেওয়া যায়? আমাদের দেশে দু-টাকা দিলেই চলে, সাহেবদের দেশে দশ টাকা দিলে হবে না।

একটা পাঁচ ফ্রাঙ্কের নোট বার করতেই পোর্টার বলল, নো নো নো, ডলার, ডলার!

আমি তাকে কাঁচুমাচুভাবে বললুম, ক্ষমা করবেন, আমার টাকা বদলানো হয়নি। এখন আর সময়ও নেই। আপনি দয়া করে এটাই নিন, আপনি তো এয়ারপোর্টের কাউন্টার থেকে যে-কোনও সময়ই বদলে নিতে পারেন।

লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করল, তোমার কাছে সত্যিই ডলার নেই?

আমি বললুম, সত্যি।

এবার সে জিগ্যেস করল, এটা কত?

এই রে, আবার জটিল অঙ্কের হিসেবের মধ্যে ফেললে। পাঁচ ফ্রাঙ্কে তো এক কেনেডিয়ান ডলারের কাছাকাছিই হবে। সেটা তো আমার চেয়ে এদেরই ভালো করে জানবার কথা। কানাডার এক অংশে প্রচুর ফরাসির বাস, তারা আন্দোলন করে নিজেদের দাবি আদায় করে নিয়েছে। ফরাসি এখন কানাডায় অন্যতম রাষ্ট্রভাষা, সব জায়গায় ইংরেজিরা পাশাপাশি ফরাসি লেখা থাকে। সুতরাং খোদ ফরাসি দেশের টাকার হিসেব এরা জানে না?

বললুম, এক ডলার!

লোকটি এমন একটা চোখ করে তাকাল যেন আমার মতন বে-আদপ সে জন্মে দেখেনি। মাত্র এক ডলার দেওয়ার অসম্ভব প্রস্তাব করছি তাকে?

ঝটিতি আর একখানা পাঁচ ফ্রাঙ্কের নোট বার করে লজ্জা-লজ্জা মুখে দিলুম তার হাতে। সাহেব কুলিকে অপমান করে ফেলছিলুম আর একটু হলে। হোক না গায়ের রং আমার চেয়েও কালো, তবু তো ইংরিজি বলে!

লোকটি তখনও হাত বাড়িয়েই আছে। মুখখানা অপ্রসন্ন।

এবার আমার পকেট থেকে বেরুল একটা দশ ফ্রাঙ্কের নোট। পাঁচ ফ্র্যাঙ্ক আর নেই। এত বড় নোটটা দিয়ে দেব? উপায় কী!

এবারে লোকটি নোটগুলি ভাঁজ করতে লাগল। আমি খুব চাপা ব্যঙ্গের সুরে জিগ্যেস করলুম, ঠিক আছে? এবারে ঠিক আছে তো?

লোকটি একটি ধন্যবাদ পর্যন্ত দিল না। চলে গেল।

আমার তখন গা কচ্‌কচ্‌ করছে। প্রায় চল্লিশটা টাকা চলে গেল কুলি খরচ? অথচ সুটকেসটা আমি নিজেই বইতে পারতুম। লোকটি বোধহয় আমার জন্য ঠিক পাঁচ মিনিট সময় খরচ করেছে।

নতুন দেশে এলে এরকম একটা না একটা বোকামি হয়েই যায়। কালো পোর্টারটি আমায় ঠকিয়েছে। ফরসা, রাঙা কোনও পোর্টার হলে কি এমনিভাবে আমার কাছ থেকে বেশি নিত?

ফ্লাইট নাম্বার দেখে গেটের দিকে এগোচ্ছি, সেই সময় সেই পোর্টারটি আবার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার কাছে এসে বলল, তোমার ফ্লাইট দু-ঘণ্টা বাদে ছাড়বে।

যাচ্চলে! তা হলে তো ধীরেসুস্থে সুটকেস আনা যেত, টাকা বদলে নেওয়া যেত, শুধু-শুধু চল্লিশটা টাকা গচ্চা যেত না!

ইচ্ছে হল, লোকটিকে দু-একটা কড়া কথা শোনাই। কিন্তু সাহস নেই। লোকটির চোখেমুখে

একটা রাগ-রাগ ভাব, যেন আমার মাথায় আরও কিছু কাঁঠাল ভাঙার মতলবে আছে।

সে বলল, অনেক সময় আছে, তুমি ইচ্ছে করলে এখন টাকা বদলে নিয়ে আসতে পারো।

আমি বললুম, দরকার নেই।

লোকটিকে এড়াবার জন্য চলে গেলুম টেলিফোন বুথের দিকে।

পয়সা না থাকলেও টেলিফোন করার কোনও অসুবিধে নেই। আহা, এসব দেশের টেলিফোন দেখলে নিজের দেশের টেলিফোনের জন্য বড্ড মায়া হয়। আমাদের দেশের টেলিফোন যেন অবোধ শিশু, ভালো করে কথা বলতেই শেখেনি এখনও। কিংবা কখনও-কখনও টেলিফোনকে মনে হয়, কানা-খোঁড়া-বোবা। আমাদের তুলনায় এদের টেলিফোন যেন আগামী শতাব্দীর!

প্রথম কথা, ডায়াল করার ব্যাপারটাই উঠে গেছে। দেওয়ালে দেওয়ালে ঝোলানো থাকে শুধু রিসিভারটা, তার গায়েই আছে এক-দুই লেখা বোতাম। সেগুলো টিপলেই পিঁপিঁ শব্দ হয়, আর সঙ্গে-সঙ্গে কানেকশান হয়ে যায়। ঠিক যেন একটা খেলনা। অথচ সেই খেলনার বোতাম টিপেই তক্ষুনি-তক্ষুনি দেশের যে-কোনো জায়গায় তো বটেই, প্যারিস-লন্ডন, জাপান-হংকং-সিঙ্গাপুর পর্যন্ত কানেকশন পাওয়া যায়, কোনও অপারেটরের সাহায্য ছাড়াই। একমাত্র ভারতবর্ষের সঙ্গে এভাবে কথা বলা যায় না।

যে-কোনও পাবলিক জায়গাতেই গাদাখানেক টেলিফোন ছড়ানো। পকেটে পয়সা থাক বা না থাক, এমনকী নম্বর জানা না থাকলেও যে-কোনও দূরের বন্ধুর সঙ্গে কথা বলা যায়। পয়সা না থাকলে অবশ্য অপারেটরের সাহায্য নিতে হয়। অপারেটর আমার নামটা জেনে নিয়ে আমার চাওয়া নম্বরটায় রিং করে জিগ্যেস করবে, এই নামের লোকের সঙ্গে তোমরা কথা বলতে চাও? তখন সে হ্যাঁ বললেই হল। পয়সাটা অবশ্য তাকে দিতে হবে।

টেলিফোন করলুম এডমান্টনে দীপকদার বাড়িতে। মহিলা কণ্ঠ শুনে বুঝলুম, টেলিফোন ধরেছেন জয়তীদি। এই রে, জয়তীদি কি আমায় চিনতে পারবেন? গত বছর দীপকদা এসেছিলেন কলকাতায়, তখন বলেছিলেন, একবার চলে এসো না আমাদের দিকে। তোমাদের অ্যাডভেঞ্চার করতে ইচ্ছে করে না? কোথায় থাকি জানো? প্রায় আলস্কার কাছে, আমাদের বাড়ি থেকে সোজা হেঁটে গেলেই উত্তর মেরু। এক্সকারশান টিকিট সস্তায় পাওয়া যায়, চলে এসো!

সেই ভরসাতেই এসেছি, অবশ্য ইওরোপ থেকে চিঠিও দিয়েছি একটা। এখন জয়তীদি যদি আমার চিনতে না পারেন...।

যথাসম্ভব মধুর গলা করে বললুম, জয়তীদি, আমার নাম নীললোহিত...কলকাতায় দু-তিনবার দেখা হয়েছিল...মনে আছে কি? দীপকদা বাড়িতে আছেন?

জয়তীদি ঝরঝর করে হেসে বললেন, কেন চিনতে পারব না? তোমার জন্যই তো রান্না করছিলুম, হ্যাঁ ভালো কথা, তুমি ঝাল খাও তো? আচার খাও? তুমি কোথা থেকে কথা বলছ?

—টরেন্টো থেকে, রাত দশটায় পৌঁছোব।

—জানি...দীপকদা বেরিয়ে গেছেন ফেরার পথে এয়ারপোর্ট থেকে তোমায় নিয়ে আসবেন।

—তাহলে দেখা হচ্ছে।

ফোন রেখে বেশ নিশ্চিন্ত মনে একটা চেয়ারে এসে বসলুম। কত সহজে ব্যাপারটা মিটে গেল। টরেন্টো থেকে এডমান্টন ঘড়ির হিসেবে আরও চার ঘণ্টার পথ। এজন্য গ্রাহাম বেলকে ধন্যবাদ দিতে হয়।

সদ্য আমেরিকা-ফেরত তাপসদার একটা কথা মনে পড়ল। তিনি আফশোশ করে বলেছিলেন, ভাই কলকাতায় কি এমন কোনওদিন আসবে, যখন কেউ বাড়িতে টেলিফোন রাখতে চাইলে টেলিফোন কোম্পানিতে খবর দেওয়া মাত্র একদিনের মধ্যে টেলিফোন এসে যাবে, আর কোনওদিন খারাপ হবে না।

আমি বলেছিলুম, সামনের সেঞ্চুরিতে নিশ্চয়ই সেরকম দিন আসবে।

তাপসদা আর একটা অত্যাশ্চর্য গল্প বলেছিলেন। উনি ছিলেন আমেরিকার খুব ছোট একটা শহরে। সেখানে টেলিফোনের অফিস একটা দোকানের মতন। নানা রকম রং ও আকৃতির টেলিফোন সেখানে সাজানো থাকে, লোকে ফার্নিচার পছন্দ করবার মতন এসে টেলিফোন কিনে নিয়ে যায়। কয়েকটি মেয়ে সেই দোকানে থাকে, তারাই টেলিফোনের কানেকশানের ব্যবস্থা করে, তারাই বিল নেয়।

একবার তাপসদা বিশেষ দরকারে কলকাতায় ট্রাঙ্ককল করেছিলেন। মাসের শেষে বিল এলে দেখা গেল, তাঁকে ভুলে দুবার ট্রাঙ্ককলের চার্জ করেছে। উনি বিল নিয়ে গেলেন সেই দোকানে। অভিযোগ-বাক্যটি শেষ করবার আগেই একটি মেয়ে বলল, তুমি ওই টেলিফোনে সরাসরি অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে কথা বলো! এক কোণের টেবিলে একটি টেলিফোন রাখা আছে, যেটা তুললেই পার্শ্ববর্তী শহরের হেড অফিসের অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের কেউ ধরবে। তাপসদা সেখানে বললেন তাঁর ব্যাপারটা। অ্যাকাউন্টসের অদৃশ্য মেয়েটি এক মিনিট মাত্র সময় নিয়ে রেকর্ড দেখে নিয়ে বলল, কিন্তু তোমার তো দুটো কল-ই হয়েছে, একটা সন্ধে সাড়ে সাতটায়, আর একটা পৌনে দশটায়। তাপসদা বললেন, না, তা ঠিক নয়। প্রথম কলটায় কলকাতার বাড়িতে রিং হয়ে গেছে, কেউ ধরেনি। দ্বিতীয়বার কথা হয়েছে। সুতরাং প্রথমবার বিল হবে কেন? মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে বলল, ও, প্রথমবার কথা হয়নি? ঠিক আছে! তুমি তোমার বিল থেকে প্রথম কলের চার্জটা বাদ দিয়ে বিল জমা দিয়ে দাও!

ব্যস, মিটে গেল সমস্যা!

তাপসদাকে বলেছিলুম, সামনের সেঞ্চুরিতে আমাদের কলকাতাতেও নির্ঘাত এসবও এরকম সহজ হয়ে যাবে।

বসে-বসে এই সব কথা ভাবছি এমন সময় সেই কালো পোর্টারটিকে আবার আমার দিকে আসতে দেখলুম। কী ব্যাপার, আবার কী চায়? একটু ভয়-ভয় করতে লাগল এবার। আমায় খুব বোকা মনে করেছে নিশ্চয়ই লোকটা! আমি তাড়াতাড়ি একটা বই খুলে মেলে ধরলুম চোখের সামনে।

লোকটি আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে লাগল। কিছু হয়তো বলতে চায়। কিন্তু ওর সঙ্গে গল্প করবার বিশেষ উৎসাহ বোধ করলুম না। বিলেত-আমেরিকা থেকে যতজন আমাদের দেশে ফিরে আসে, কারুর মুখে আজ পর্যন্ত আমরা কোনও নিগ্রো (ইংরেজিতে এখন নিগ্রো কথাটা নিষিদ্ধ হলেও বাংলায় অচল নয়। বাংলায় আমরা কোনও খারাপ অর্থে নিগ্রো কথাটা ব্যবহার করি না, বরং কালো কথাটাই বাংলায় একটু কেমন কেমন) বন্ধুর গল্প শুনিনি। অনেকে মেম বিয়ে করে আসে, কিন্তু কেউ আজ পর্যন্ত নিগ্রো বিয়ে করে ফিরেছে শোনা গেছে কি? অথচ কালো মেয়েদের মধ্যে সুন্দরী কম নেই। কালো লোকরা কালোদের ধার ঘেঁষে না। শুনেছি নিগ্রোরাও ভারতীয়দের তেমন পছন্দ করে না।

এ লোকটাও তো মওকা বুঝে আমার কাছ থেকে চল্লিশ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে, ওর সঙ্গে আবার কথা কীসের?

মনে হচ্ছে লোকটির বিশেষ কোনও কাজ নেই, এদিকে-ওদিকে অলসভাবে ঘুরছে। বোধহয় আর কারুর সুটকেস হাতাবার মতলবে আছে। কিন্তু নতুন বিমান না এলে সে সুযোগ পাবে কেন?

বই পড়ায় ডুবে গিয়েছিলুম, হঠাৎ চমকে গেলুম। ক'টা বাজে? আমার ঘড়িতে তো এখনও ইওরোপের সময়। এখানে ফ্লাইট ছাড়ার আগে তেমন অ্যানাউন্সমেন্ট হয় না, টি ভি-তে দেখানো হয় কোন প্লেন কখন ছাড়ছে। আমার প্লেন ছেড়ে গেল নাকি?

এইরকম সময়ে দারুণ একটা আতঙ্ক এসে যায়। এই প্লেনে যদি উঠতে না পারি তা হলে টিকিট নষ্ট হয়ে যাবে কি না...দীপকদা ফিরে যাবেন এয়ারপোর্ট থেকে...আমি এখানে সারা রাত কোথায় থাকব.

পড়িমরি করে ছুটলুম গেটের দিকে। সত্যি দেরি হয়ে গেছে। প্লেনটা ছেড়ে যায়নি অবশ্য, কিন্তু শেষ দু তিন জন লোক বোর্ডিং পাশ জমা দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে। আমার বোর্ডিং পাশ পকেট থেকে বার করে হাঁপাতে-হাঁপাতে দাঁড়ালুম সেখানে।

সেই সময় পিঠে একটা টোকা। মুখ ফিরিয়ে দেখি সেই কালো পোর্টারটি। দারুন বিরক্ত হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলুম, তার আগেই সে হাত বাড়িয়ে হ্যান্ড ব্যাগটি এগিয়ে দিল। আমার হ্যান্ড ব্যাগ। সর্বনাশ, অতি ব্যস্ততায় আমি ওটা ফেলে এসেছিলুম। ওর মধ্যে আমার পাসপোর্ট, টাকাপয়সা, টিকিট-ফিকিট সব!

লোকটিকে ধন্যবাদ জানাবারও অবকাশ পেলুম না, শুধু এক ঝলক হাসি কোনও রকমে ছুড়ে দিয়ে চলে গেলুম বিমানের দিকে।

॥ ১১ ॥

আমাদের দেশের সঙ্গে তুলনা করলে কানাডাকে মনে হয় মরুভূমি। না, মরুভূমির তুলনাটা ঠিক হল না। বরং বলা উচিত একটি উর্বর, অতি জনবিরল দেশ। কয়েকটা বড় শহর বাদ দিলে শত শত মাইল যেন জায়গা খালি পড়ে আছে। আমেরিকায় যেমন গ্রাম নেই, আছে অসংখ্য ছোট শহর, সেইরকম ছোট শহর কানাডাতেও আছে, আরও ছোট, ধূ ধূ করা মাঠের মধ্যে দু-তিনটে মাত্র বাড়ি, এমনও চোখে পড়ে।

কানাডায় রাস্তাগুলোও আমেরিকার চেয়ে বেশি চওড়া মনে হয়, কারণ রাস্তায় গাড়ি কম। তা বলে যে এদেশের লোক গাড়ি কিনতে পারে না তা নয়, প্রত্যেক পরিবারেই অন্তত দুটো করে গাড়ি, কিন্তু লোক সংখ্যাই তো কম। তবু সারা দেশটায় আষ্টেপৃষ্ঠে চওড়া-চওড়া মসৃণ রাস্তা ছড়িয়ে আছে।

ইতিহাসেই দেখা যায় মানুষের মধ্যে যাযাবর বৃত্তি রয়ে গেছে এখনও। নিজ বাসভূমি শস্যফলমূলের অনটন দেখলেই মানুষ বারবার অন্য বাসভূমির সন্ধানে ছুটে যায়। স্বদেশপ্রেম একটা আইডিয়া মাত্র, যা নিয়ে কবিরা অনেক আবেগের মাতামাতি করেছে এবং যুদ্ধবাজ ও রাজনীতিবিদরা তাতে ইন্ধন জুগিয়ে এসেছে নিজেদের স্বার্থে। আসলে, যেখানে ভালো খাবারদাবার, স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা আছে, সেখানে ছুটে যাওয়াই মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। গ্রাম ছেড়ে যে কারণে মানুষ শহরে চলে আসে, সেই কারণেই কলকাতা-বোম্বাই-লন্ডনের মতন পিঁপড়ে শহর ছেড়ে মানুষ কানাডা-অস্ট্রেলিয়ায় গেছে নতুন সম্ভাবনার প্রত্যাশায়।

সাহেবরা আগে গিয়ে দখল করে নিয়েছে বলে কানাডা সাহেবদের দেশ। কিন্তু পিছু পিছু অ-সাহেবরাও গেছে। ভারতীয়রা গেছে এ শতাব্দীর গোড়া থেকেই, জাপানিরা গেছে, আফ্রিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে গেছে, আর চিনেরা গিয়ে বসতি স্থাপন করেনি, পৃথিবীতে এমন কোনও জায়গাই নেই। কিন্তু তেলে-জলে যেমন মিশ খায় না, সেই রকম সাদা-কালো হলদে-খয়েরি জাতিগুলির মধ্যে মেশামিশির কোনও ব্যাপারই ঘটেনি, ক্রমশ দূরত্ব যেন আরও বেড়েই চলেছে।

সাদায়-কালোয় ভেদাভেদের কথা যেমন প্রায়ই শোনা যায়, তেমনি দূরত্ব ঘোচাবার কথাও মাঝে-মাঝেই ওঠে। কিন্তু কালো-হলদে-খয়েরি জাতিগুলির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের কোনও উদ্যমই নেই। খয়েরিরা এখন খয়েরিদের চেয়ে বেশি পছন্দ করে হলদেদের। এইরকম রঙের খেলা চলছে আর কি। ভারতী মুখার্জি নামে একজন লেখিকা, যাঁর স্বামী কেনেডিয়ান, অনেকদিন ছিলেন ওদেশে, বর্ণ-বিদ্বেষের ব্যাপারে তিতিবিরক্তি হয়ে তিনি গত বছর কাগজে বিবৃতি দিয়েছেন যে, জীবনে আর তিনি ওদেশে ফিরবেন না।

বর্ণবিদ্বেষ নিয়ে অবশ্য কিছু বলা আমার মানায় না। কারণ আমি আসছি এমন একটা দেশ থেকে, যার মতন বর্ণবিদ্বেষী দেশ সারা পৃথিবীতে আর একটিও নেই। আমাদের দেশে এখনও কাগজে

বিয়ের বিজ্ঞাপনে পাত্রীর রং ফরসা না কালো সেটাই প্রধান ব্যাপার। আমাদের দেশে হরিজনদের এখনও পুড়িয়ে মারা হয়, আরও যা সব আছে তা বলার দরকার নেই।

এই প্রসঙ্গে একটা মজার ঘটনা মনে পড়ল।

অনেক সময় হয় না যে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে গিয়ে একজনের সঙ্গে নতুন আলাপ হল, তারপর কথায় কথায় জানা গেল, উনি আমার ভাইবোন, অনেক আত্মীয় বন্ধুকে চেনেন, আর আমিও ওঁর আত্মীয় বন্ধুদের অনেককে খুব ভালো করে চিনি, শুধু আমাদের দুজনেরই আগে দেখা হয়নি! সেইরকমই এ দেশে এসে আলাপ হল মীর চন্দানি নামে একজনের সঙ্গে, তাঁর স্ত্রী উগান্ডার ক্রিশ্চান, এককালের ক্ষীণ যোগাযোগ ছিল আমাদের দেশের গোয়ার সঙ্গে। মীর চন্দানির সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলার পরই আমরা আবিষ্কার করলুম যে, এককালে উনি কলকাতায় আমাদের ঠিক পাশের বাড়িতেই থাকতেন, ওঁর দাদার ছেলে আমার খুব বন্ধু, উনিও আমার বাবাকে খুব ভালো চিনতেন। তখন উনি ছিলেন অবিবাহিত, সে প্রায় পনেরো বছর আগেকার কথা। মীর চন্দানি খুব আবেগের সঙ্গে কলকাতার স্মৃতি রোমন্থন করতে লাগলেন। কথায়-কথায় জিগ্যেস করলেন, অশোককে মনে আছে? সে কেমন আছে?

আমি জিগ্যেস করলুম, কোন অশোক?

উনি বললেন, সেই যে অশোক...পড়াশুনোয় খুব ভালো ছিল, ওর পদবি ছিল বোধহয় মিত্র, তাই না?

এখন ব্যাপার হয়েছে কী? সেই সময় আমরা কলকাতায় যে পাড়ায় থাকতুম, সেই পাড়ায় একই রাস্তায়, খুব কাছাকাছি বাড়িতে দুজন অশোক মিত্র থাকতেন, দুজনেই পড়াশুনোয় ভালো। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, সাংবাদিকতার জগতে যদি দুজন অমিতাভ চৌধুরী থাকতে পারেন, তাহলে এক পাড়ায় দুজন অশোক মিত্র থাকা কিছু অস্বাভাবিক নয়। একজন ফরসা ছিপছিপে, লম্বা অন্যজন কালো, মাঝারি উচ্চতা। দুজনকে আলাদা করে বোঝাবার জন্য আমরা বলতুম, কালো অশোক, ফরসা অশোক।

সেই জন্যই জিগ্যেস করেছিলুম, কোন অশোক বলুন তো? কালো রঙের?

মীর চন্দানি বললেন, না, না, সে বেশ ফরসা ছিল, কোয়াইট হ্যান্ডসাম...

আমি বললুম, বুঝেছি, তবে সেই অশোক মিত্রের সঙ্গে আমার ভালো পরিচয় ছিল না, কালো অশোককেই বেশি চিনতুম।

মীর চন্দানি বললেন নাও আই রিমেমবার কালো অশোকও একজন ছিল বটে...

কথাবার্তা হচ্ছিল ইংরেজিতে, হঠাৎ পাশ থেকে শ্রীমতী মীর চন্দানি দারুণ ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠলেন তোমাদের লজ্জা করে না, তোমরা ভারতীয়দের সম্পর্কে কথা বলতে গিয়েও একজনকে কালো বলছ?

আমি প্রথমটায় হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলুম। ভদ্রমহিলা এমন রেগে উঠলেন কেন?

কোনওরকমে বোঝাবার চেষ্টা করলুম যে, না, না, না, এর মধ্যে বর্ণবিদ্বেষের কোনও ব্যাপার নেই, একই নামের দুজন লোকের একজন কালো, অন্যজন ফরসা, সেটা বোঝাবার জন্যই—

ভদ্রমহিলা আবার ধমক দিয়ে বললেন, ফের বলছ কালো-ফরসা? অল ইন্ডিয়ানস আর ব্ল্যাকস। সেটা তোমরা মানতে চাও না। কালো-জাতি বলে তোমাদের গর্ববোধ নেই, দ্যাখো তো চিনে বা জাপানিদের...।

সাহেবদের চোখে সব ভারতীয়ই যে কালো, এটা সত্যিই আমাদের মনে থাকে না। আমরা আফ্রিকান বা ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান কালোদের অপছন্দ করি, নিজেরা খয়েরি সেজে সাদাদের কাছাকাছি যেতে চাই। অবশ্য আমার গায়ের রং এমনই ছাতার কাপড়ের মতন যে আমার পক্ষে কোনওদিন খয়েরি সাজবার উপায় নেই।

কানাডার জনসংখ্যা যে বিরল সেটা সব সময়েই মনে পড়ে। একটি বাঙালি মেয়ে কানাডায় এসে বলেছিল, ইচ্ছে করে গড়িয়াহাট থেকে এক গুচ্ছের লোক এনে এখানে ছড়িয়ে দিই।

গড়িয়াহাটের চেয়েও শ্যামবাজার কিংবা শিয়ালদায় ভিড় অনেক বেশি। হাঁটতে গেলে মানুষের গায়ে ধাক্কা লাগেই। পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় শহর বোধ হয় এখন মেক্সিকো সিটি। একটি মেক্সিকান মহিলাকে জিগ্যেস করেছিলুম, তোমাদের শহরে হাঁটতে গেলে কি মানুষের সঙ্গে মানুষের ধাক্কা লাগে? সে আমতা-আমতা করে বলেছিল না, মানে, বাজারে কিংবা মেলায় হাঁটতে গেলে সেরকম হতে পারে,...না কিন্তু রাস্তায়...তো! টোকিও, নিউইয়র্কের মতন বাঘা-বাঘা শহরের তুলনায় আয়তনে বা জনসংখ্যায় কলকাতার স্থান বেশ নীচে। তবু কলকাতার মতন এমন ভিড় বোধ হয় আর কোথাও নেই।

কানাডা এত ফাঁকা বলে যে আমাদের দেশের বেকাররা সে দেশে দলে-দলে ছুটে যেতে পারবে, সেরকম সুদিন আর নেই। এখন কড়াকড়ি এবং ভিসা ব্যবস্থা হয়েছে। সাদা মানুষ হলে এখনও কানাডায় বসতি নেওয়ার সুযোগ আছে অবশ্য, কিন্তু ভারতীয়দের প্রবেশ অধিকার কমে আসছে ক্রমশই। মাঝে-মাঝে শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে ভারতীয়দের মারামারিও হয়। সেরকম খবর তো আমরা দেশের কাগজেও পড়ি। এখানে এসে টরেন্টোর একটা ঘটনা শুনলুম। একটি বাঙালির নতুন তৈরি সুদৃশ্য বাড়ির জানলার কাচ পাড়ার কোনও লোক ঢিল মেরে ভেঙে দেয়। একবার নয়, দুবার। বাঙালি ভদ্রলোকটি পুলিশে খবর দিলেও সুরাহা হয় না। পুলিশ বলে, কে ভেঙেছে সেটা না বলতে পারলে পুলিশ কাকে ধরবে? পরের বার ভদ্রলোক তক্কে ছিলেন। একটি ছোকরা যেই কাচে ঢিল ছুঁড়েছে, অমনি তিনি ছুটে গিয়ে ছেলেটিকে জাপটে ধরলেন, এবং টানতে-টানতে তাতে নিয়ে গেলেন থানায়। এবারেও পুলিশের কোনও গা নেই। ছেলেটিকে ছেড়ে দিয়ে পুলিশ ওই ভদ্রলোককে বললেন, এই ছেলেটিই যে ঢিল ছুঁড়েছেন তার প্রমাণ কী? আর কেউ দেখেছে? কোনও সাক্ষী ছিল?

অর্থাৎ শুধু চোর ধরলেই হবে না, চুরি বা গুন্ডামির সময় একজন সাক্ষীও রাখতে হবে, আর তাকেও ধরে নিয়ে যেতে হবে থানায়। সাহেব পুলিশের কী অপূর্ব কৃতিত্ব।

সেই বাঙালি ভদ্রলোককে তাঁর এক পাঞ্জাবি বন্ধু পরামর্শ দিয়েছিলেন, ওসব পুলিশ-টুলিশে অভিযোগ করে কোনও কাজ হবে না, বাড়িতে ডান্ডা রাখবেন, কেউ কাচ ভাঙতে এলে সোজা কয়েক ঘা কষিয়ে দেবেন।

বাঙালিরা অবশ্য ডান্ডা চালাতে তেমন দক্ষ নয়, অনেক জায়গাতেই তাদের চুপ করে সহ্য করে যেতে হয়। কিন্তু পাঞ্জাবিরা ছেড়ে কথা কয় না, বেশ কয়েকবার তারা হামলাবাজদের বেধড়ক মার দিয়েছে।

দীপকদার বাড়ি এডমান্টন শহর থেকে একটু দূরে সেই সেন্ট অ্যালবার্ট নামে একটা ছোট্ট ছিমছাম সুন্দর জায়গায়। কানাডায় টরেন্টো, মন্ট্রিয়েল, কুইবেকের মতন শহরগুলোর তুলনায় এডমান্টন আমাদের কাছে তেমন পরিচিত নয়। কিন্তু এখন ওদের এডমান্টনই সবচেয়ে দ্রুত বর্ধমান শহর, কারণ যে-প্রদেশের একটি প্রধান শহর, সেই আলবার্টায় সম্প্রতি প্রচুর পেট্রল বেরিয়েছে। পেট্রল মানেই বহু টাকার ছড়াছড়ি, অনেক রকম নতুন ব্যাবসা এবং মধু-সন্ধানী বহু মানুষের ভিড়। এডমান্টনে এমন ঝকঝকে ও বিশাল শপিং মল দেখেছি যে, মনে হয় ওরকম দোকান-সমারোহ ইওরোপেও নেই।

এডমান্টন থেকে সেন্ট অ্যালবার্টে যেতে মাঝখানে একটি নদী পড়ে। সে নদীর নাম সাস্‌কাচুয়ান। যাওয়া-আসার পথে সেই নদীটার দিকে বারবার উৎসুকভাবেই তাকাই। নতুন নামের নদী দেখতে পেলেই আমার মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে।

সাস্‌কাচুয়ান নদীর পাশে উদ্যান আছে, জলে বোটিং হয়, ছিপ নিয়ে কেউ মাছ ধরার জন্য বসেও থাকে, কিন্তু কোনওদিন কারুকে স্নান করতে দেখিনি। নদীর জলে কিছু লোক দাপাদাপি না করলে

সে নদীকে যেন ন্যাড়া-ন্যাড়া দেখায়। ঠান্ডার জন্য নয় কিন্তু, জুলাই-আগস্টে কানাডায় বেশ গরম পড়ে। জামার তলায় গেঞ্জি ভিজে যায়। ভয়টা বোধ হয় পলিউশনের। উত্তর আমেরিকার অধিবাসীরা স্নান করতে বা সাঁতার কাটতে খুব ভালোবাসে, সেই রকমই ওদের আবার পরিষ্কার বাতিক। অনেক বাড়িতেই নিজস্ব পুকুর আছে, যার পোশাকি নাম সুইমিং পুল। সেগুলো আসলে বড়সড়ো চৌবাচ্চা, আগাগোড়া সিমেন্ট বাঁধানো, জলের রং কৃত্রিম নীল, সামান্য ধুলোবালি বা একটা গাছের পাতা পর্যন্ত পড়বার উপায় নেই। প্রত্যেক শহরে পাবলিক সুইমিং পুলও আছে অনেক, যেখানে পয়সা দিয়ে সাঁতার কাটা যায়। কিন্তু বাড়ির কাছে নদী থাকলেও কেউ নামবে না। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাকে বলা চলে নদী-ঘাতক। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই নদীগুলোকে নানানভাবে বেঁধে দুর্বল করে ফেলেছে। তা ছাড়া দু-পাড়ের নদীগুলোকে অনবরত সব নদীতে নোংরা ঢালছে।

জয়তীদির এক বান্ধবীর ভাই একদিন কাছাকাছি একটা ছোট হ্রদে গিয়েছিল মাছ ধরতে। তারপর সে সত্যি কয়েকটা মাছ পেয়েছিল, ফেরার পথে জয়তীদিকে একটা মাছ উপহার দিয়ে গেল। মাছটার চেহারা একটু অদ্ভুত, অনেকটা যেন শোল মাছ আর কাতলা মাছ মেশানো। একটা নতুন জাতের মাছ খাওয়া হবে ভেবে আমি বেশ উৎসাহিত হয়েছিলুম, রাত্তিরবেলা জয়তীদি অম্লানবদনে বললেন, সে মাছটা তো আমি ফেলে দিয়েছি।

দীপকদা মাছের ভক্ত নন, তাঁর কোনও তাপ-উত্তাপ দেখা গেল না। কিন্তু আমি চমকে উঠে বললুম, সে কী! আস্ত মাছটা?

জয়তীদি বললেন, কী জানি কী অচেনা মাছ, তা ছাড়া যে লেক থেকে ধরেছে, সেটা পলিউটেড কি না কে জানে! এখানকার জল যা নোংরা...।

নতুন ধরনের মাছ অবশ্য খাওয়া হল কয়েকদিন পরেই। দীপকদাদের এক বন্ধু দিলীপবাবু একদিন আমাদের খাওয়ার নেমন্তন্ন করলেন। খাওয়ার টেবিলে যখন মাছ এল, তখন তিনি বললেন, এ মাছ কোথাকার জানেন তো, উত্তর মেরুর।

দীপকদা একটু বাড়িয়ে বলেছিলেন, ওদের বাড়ি থেকে উঁকি দিয়ে উত্তর মেরু দেখা যায় না। তবে অ্যালবার্টার ওপর দিয়েই কানাডার সীমান্তে প্রদেশ, তারপর হিম রাজ্য। ম্যাপে দেখলে এখান থেকে উত্তর মেরু খুব দূর মনে হয় না। দীপকদার বন্ধু দিলীপবাবু সরকারি কর্মচারী, কাজের জন্য তাঁকে সীমান্ত প্রদেশ যেতে হয়। সেখান থেকে তিনি নিয়ে এসেছেন উত্তর মেরুর রুই মাছ।

উত্তর মেরুর মাছ খাচ্ছি, ভাবলেই রোমাঞ্চ হয় না? অবশ্য এস্কিমোরাও কোনওদিন গঙ্গার ইলিশ খেলে একই রকম রোমাঞ্চিত বোধ করবে বোধ হয়।

কয়েকদিন কানাডায় থেকেই আমি বেশ পুরোনো হয়ে গেলুম। মাঝে-মাঝে দীপকদাদের বাড়িতে আমি একদম একাই থাকি। দীপকদা পণ্ডিত মানুষ, তিনি এখানকার একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। জয়তীদি কলকাতা থেকে অর্থনীতিতে এম এ পাশ করে এসে অনেকদিন কানাডায় ঘরসংসার করছেন। ইদানীং তাঁর শখ হয়েছে আবার পড়াশুনো করার, তিনি ভরতি হয়েছেন আর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। ওদের দুটি মেয়ে জিয়া আর প্রিয়া কাছাকাছি একটা স্কুলে পড়ে। সকালবেলা ছোট-হাজরি খেয়ে ওরা চারজনেই চলে যায়। তারপর বাড়িতে আমি একলা।

একদিন মনে হল, শুধু-শুধু জয়তীদিদের বাড়িতে রয়েছি আর দু-বেলা অন্ন ধ্বংস করছি, বিনিময়ে আমারও কিছু করা উচিত। এদেশে সবাই কাজের মানুষ, চুপচাপ কেউ বসে থাকে না। জয়তীদির বাড়ির ঘর ঝাঁট দিয়ে, বাসনপত্তর মেজেও তো খানিকটা সাহায্য করা যায়।

এ দেশে কেউ কাজ করলেই তার জন্য পারিশ্রমিক পায়। শারীরিক কাজে বেশি দক্ষিণা। ছেলেও যদি বাড়ির বাগান পরিষ্কার করে, তা বলে বাবার কাছ থেকে মজুরির টাকা চায়। ঘর মোছা, বাসন মাজার জন্য আমিও জয়তীদির কাছ থেকে বেশ মোটা মাইনে দাবি করতে পারি! তা হলে আমার চিন্তা কী, পরবর্তী বেড়াবার খরচটাও এইভাবে তুলে ফেলা যাবে!

।। ১২ ।।

জয়তীদিকে যাদবপুরের ছাত্রী অবস্থায় দেখেছিলুম, এখনও চেহারাটা ঠিক সেই রকমই আছে। ছিপছিপে লম্বা তন্বী, ঠোঁটে সব সময় একটা চাপা হাসির ভাব, জীবনটাকে যেন উনি একটা কৌতুক হিসেবে নিয়েছেন। সাহেবদের দেশে প্রবাসী হয়ে আছেন প্রায় চোদ্দো-পনেরো বছর, উনি যখন মাঝে-মাঝে দেশে বেড়াতে আসেন, তখন সবাই ওঁকে দেখে অবাক হয়। ইওরোপ-আমেরিকার খাদ্যে এখন এত বেশি প্রোটিন আর দুধ-মিষ্টির আধিক্য যে সকলেরই ধাত মোটা হয়ে যাওয়ার দিকে। সাহেব মেমদের মধ্যে এত বেশি মোটা-মোটা চেহারা আগে দেখা যেত না। এমনকী অনেক তরুণ-তরুণীর চেহারাও ভীম ভবানী বা হামিদা বানুর মতন। চেহারা ঠিক রাখার জন্য এখন ওরা শুরু করেছে জগিং, অর্থাৎ আস্তে আস্তে দৌড়োনো। সকাল নেই, দুপুর নেই, রাত নেই দেখা যাবে কোনও নির্জন রাস্তায় একজন নিঃসঙ্গ মানুষ আপন মনে ছুটে চলেছে। অনেক সময় এমনও দেখা যায়, কোনও অফিসের বড় সাহেব লাঞ্চ আওয়ারের বিরতির সময় কোট-প্যান্ট-টাই খুলে একটা গেঞ্জি আর জাঙিয়া পরে নিয়ে ছুটতে বেরিয়ে গেলেন।

অনেক বাড়িতে গেলেই খাওয়া সম্পর্কে একটা আতঙ্কের ভাব দেখা যায়। এটা খাব না, ওটা খাব না। খেলেই ওজন বৃদ্ধি। অথচ কোনও রকম বাড়াবাড়ি না করেই জয়তীদি ফিগারটি রেখেছেন বেতস লতার মতন। অবশ্য মানিকদাও যেমন রোগা সে রকম লম্বা। মানিকদার খাদ্য হচ্ছে দুটি কফি আর সিগারেট, দিনে প্রায় তিরিশ কাপ কালো কফি আর পঞ্চাশ-ষাটটা সিগারেট। মাঝে দু-একদিন জয়তীদির অনুরোধে মানিকদা সিগারেট একটু কমালেন, তখন কফি আর সিগারেট সমান হয়ে গেল, দুটোই পঁয়ত্রিশ!

ওঁদের দুই মেয়ে, জিয়া আর প্রিয়া। জিয়ার বয়েস এগারো, সে ইংরেজিতে কবিতা লেখে, পিয়ানো বাজায় এবং বাংলা ভোলেনি। কিন্তু প্রিয়ার বয়েস মাত্র ছয় হলেও তার ব্যক্তিত্ব অনেক বেশি, বাড়িতে তার উপস্থিতি সে কক্ষনো অন্যদের ভুলতে দিতে চায় না। তার প্রতি কারুর অমনোযোগী হওয়ার উপায় নেই। দুই বোনে কখনও ঝগড়া হলে ছোট বোনটিই প্রত্যেকবার জেতে এবং বড় বোনটি কেঁদে ফেলে। প্রিয়াও কবিতা লেখে। পিয়ানো বাজায়, বাংলা সে বলতে ভুলে গেলেও বুঝতে পারে সবই এবং তারমধ্যে অলিম্পিক-বিজয়িনী বালিকা-জিমনাস্ট হওয়ার সব রকম সম্ভাবনাই আছে।

এসব দেশে যেমন ভালো টাকা রোজগার করা যায়, সেইরকম খাটতেও হয় প্রচণ্ড। ফাঁকি দেওয়ার কোনও উপায় নেই। হঠাৎ ছুটি নেওয়ার উপায় নেই। সারা সপ্তাহ সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত কারুর প্রায় নিশ্বাস ফেলারও সময় নেই বলা যায়। সবাই তাকিয়ে থাকে শনি-রবিবারের জন্য। সে ছুটির দিন দুটো ফুরিয়ে যায় দেখতে-দেখতে, কারণ তখন সারতে হয় সারা সপ্তাহের জমে থাকা বাড়ির কাজ।

এ দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরও ফাঁকি দেওয়ার কোনও পথ নেই। কারণ পড়াশুনোর খরচ খুব বেশি। আমাদের মতন সবাই তো আর ঢালাও ভাবে বি-এ, এম-এ ক্লাসে ভরতি হয়ে যায় না। স্কুল-ফাইনালের সমতুল্য পড়া শেষ করলেই একটা কিছু চাকরি পাওয়া যায়। কোনও দোকান-কর্মচারী কিংবা ট্রাক-ড্রাইভারের উপার্জন কোনও অফিস-কেরানির চেয়ে কম নয়। গ্রে-হাউন্ড বাসের ড্রাইভারদের তো রীতিমতন ভারিক্কি অফিসার-অফিসার মনে হয়। সুতরাং উচ্চ শিক্ষার ইচ্ছে যদি থাকে কারুর, তাকে বেশ টাকা খরচ করে কষ্ট করে পড়তে হবে। যেহেতু এদেশের ছেলেমেয়েরা বাবা-মায়ের কাছ থেকে টাকা নেয় না, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার খরচ জোগায় নিজের রোজগারে, সেই জন্য তারা জানে, একটা টার্মে ফেল করলে, পরের টার্মের জন্য তাকেই আবার টাকা জোটাতে হবে, তাই সে দিনরাত পড়াশুনো করে তাড়াতাড়ি পাশ করার চেষ্টা করে।

উচ্চ শিক্ষার কোনও বয়েস নেই এদেশে। আর্থিক কারণে কেউ পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে দু-পাঁচ

বছর বাদে আবার শুরু করতে পারে। চাকরিতে উন্নতির কারণে যোগ্যতা অর্জনের জন্য অনেকে মাঝবয়েসে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স নেয়। পঁয়ষট্টি বছরের কোনও ঠাকুমার হঠাৎ মনে হল, জীবনে ভালো করে অঙ্কটা শেখা হয়নি, এখন শিখলে কেমন হয়? তিনি নিয়ে নিলেন একটা অঙ্কের কোর্স। কিংবা কেউ হয়তো যৌবন বয়সে পড়াশুনো অসমাপ্ত রেখে চাকরি বা বাণিজ্যে ঢুকে পড়েছিলেন, তারপর জীবনে টাকাপয়সা রোজগার হয়েছে অনেক, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নেওয়া হয়নি বলে মনে একটা ক্ষোভ থেকে গেছে, সেই জন্য পরিণত বয়েসে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হয়ে গেলেন।

অবশ্য সবাইকেই কলেজে গিয়ে নিয়মিত ক্লাস করতে হয় না। তার জন্য আছে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে চিঠিপত্রে কিংবা টেলিফোনেও পাঠ নেওয়া যায়। বিজ্ঞানসম্মত পাঠব্যবস্থা আছে, পরীক্ষার মান সমান। মানিকদা এরকমই একটি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগীয় প্রধান। তাঁর চাকরি, বলতে গেলে, ঘুমের সময়টুকু বাদ দিয়ে আর সব সময়ের জন্য। তিনি এ শহর ছেড়ে যখন তখন বাইরে চলে যেতে পারেন না, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়কে জানিয়ে যেতে হবে। ইউনিভার্সিটিতে তিনি তো সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত কাটান বটেই, তা ছাড়াও তাঁর বাড়িতে যখনতখন তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা ফোন করে যে-কোনও প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইতে পারে।

জয়তীদিরও এতদিন পরে পড়াশুনো করবার শখ হয়েছে। বিদেশে এসে প্রায় বারো বছর চুপচাপ থাকার পর উনি আবার ভরতি হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমি থাকতে থাকতেই জয়তীদির পরীক্ষা শুরু হল। ওরে বাবা, সে কি পরীক্ষার পড়া, সারা বাড়ি একেবারে তটস্থ। জয়তীদি শোওয়ার ঘরে পড়ছেন, বসবার ঘরে পড়ছেন, রান্না ঘরে পড়ছেন, এমনকী বোধহয় বাথরুমে গিয়েও পরীক্ষার পড়া পড়ছেন। সন্ধের সময় একটু ঘুমিয়ে নিয়ে ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাত বারোটার সময় জেগে সারা রাত পড়াশুনো। অবশ্য জয়তীদির খাটুনি সার্থক, রেজাল্ট বেরুলে দেখা গেল উনি নব্বই-এর ঘরে নম্বর পেয়েছেন! জয়তীদিকে জিগ্যেস করলুম, আপনি ফার্স্ট হয়েছেন নিশ্চয়ই? উনি ফরাসি কায়দায় কাঁধে ঢেউ তুলে বললেন, কী জানি।

এ দেশে বেশিদিন থাকলে একাকিত্ব বোধ আসতে বাধ্য। সারা সপ্তাহ কাজ, আর শুধু নিজের পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ থাকা। এর মধ্যেই আনন্দের উপকরণ সংগ্রহ করে নিতে হয়। জয়তীদি অধিকাংশ সময় নিজেকে ডুবিয়ে রাখেন গানের মধ্যে। রবীন্দ্র-অতুলপ্রসাদ সঙ্গীতের কত যে স্টক ওঁর গলায় তার ঠিক নেই। যখনতখন মুক্তোর মতন নিখুঁত সুরের কথাগুলো ওঁর কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়ে। দীপকদারও খুব রেকর্ড কেনার শখ, একদিন হঠাৎ ঝাঁ করে ঋতু গুহর নতুনতম এল পি খানা কিনে নিয়ে এলেন। সেদিন বাইরে বর্ষা, পাশে চায়ের সঙ্গে মুড়ি-বাদাম-কাঁচা লঙ্কা, তার সঙ্গে ঋতু গুহর গলার গান শুনতে-শুনতে ভুলে যাই কানাডায় না কলকাতায় আছি।

এরকম মাঝে মাঝে ভুলে যাওয়া যায়। কাছাকাছি, অর্থাৎ পনেরো-কুড়ি মাইলের মধ্যে বেশ কিছু বাঙালি আছেন। পনেরো-কুড়ি মাইল তো এদেশে কোনও দূরত্বই না, কুড়ি-পঁচিশ মিনিটের ব্যাপার। গাড়ি ছাড়া রাস্তায় ঘোরাঘুরির কথা কেউ চিন্তাও করে না। এরকম দূপুরে জয়তীদির এক পিসতুতো দিদি-জামাইবাবুরা থাকেন, সেখানে যাওয়া হয় মাঝে মাঝে! তা ছাড়া আরও কয়েকটি বাঙালি পরিবারের সঙ্গে ওঁদের ঘনিষ্ঠতা আছে। এক এক সপ্তাহান্তে এক এক বাড়িতে আড্ডা বসে।

সব বড় শহরেই ভারতীয়দের ক্লাব আছে। ভাষার ব্যবধানের জন্য বাঙালি-গুজরাতি-পাঞ্জাবিদের আলাদা প্রতিষ্ঠানও থাকে। এডমান্টনের বেঙ্গলি ক্লাবের উদ্যোগে মাঝে মাঝে নাচ-গানের জলসা, থিয়েটার হয় নিজেদের, কখনও-সখনও দেখা হয় বাংলা ফিল্ম। বাচ্চাদের বাংলা শেখাবার জন্য একটা সানডে স্কুলও করেছেন এঁরা। অবশ্য যেখানে বাঙালি থাকবে, সেখানে যে দলাদলিও থাকবে, তা বলাই বাহুল্য। এঁর সঙ্গে ওঁর ঝগড়া, ইনি উপস্থিত থাকলে উনি আসবে না, অমুকের স্ত্রী তমুক বাড়িয়ে গিয়ে অন্য একজনের নামে কী যেন বলেছে, এরকম টিপিক্যাল বাঙালি ব্যাপারও যে এখানে বেশ স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত, তা দুদিন থেকেই টের পেয়ে যাই।

দীপকদাদের বিশিষ্ট বন্ধু বিমল ভট্টাচার্য ওসব সাতে পাঁচে নেই। প্রথম দিন আলাপেই উনি আমাকে একটা বিড়ি উপহার দিলেন। অতি দুর্লভ বস্তু। গত বছর দেশ থেকে এক বান্ডিল বিড়ি এনেছিলেন, তার মধ্যে শেষ দুটি মাত্র বাকি ছিল।

এরপর থেকে উনি ক্রমাগত নানা রকম জিনিস উপহার দিয়ে যেতে লাগলেন। দেশলাই-এর ছদ্মবেশে রেডিও, কলমের ছদ্মবেশে লাইটার কিংবা আলপিনের মধ্যে ঘড়ি, এইসব জিনিস ওঁর খুব পছন্দ। অতদিন দেশ ছাড়া, তবু চেহারায়-পোশাকে ও ব্যবহারে উনি একেবারে মজলিশি বাঙালি। ওঁর স্ত্রী মীরার মুখখানি সব সময় হাসিতে ঝলমল আর অফুরন্ত প্রাণশক্তি। দারুণ রান্না করেন, আর সবাইকে ডেকে ডেকে খাওয়াতে ভালোবাসেন। রাত দুপুরে একদল ছেলে যদি ঘুম ভাঙিয়ে তুলে ওঁকে বলেন, মীরাদি আপনার হাতের খিচুড়ি খেতে খুব ইচ্ছে করছে, উনি অমনি ঝাঁ করে খিচুড়ির সঙ্গে আরও নানান পদ রেঁধে ফেলবেন।

ওদের আর এক বন্ধু দিলীপ চক্রবর্তী, যিনি আমাকে উত্তর মেরুর রুই মাছ খাইয়েছিলেন, তিনি একটু স্বভাব-লাজুক। মানুষটি অতি মাত্রায় ভদ্রলোক। তাঁর স্ত্রী পর্ণার যেমন মিষ্টি স্বভাব, তেমনই রান্নার হাত। দেশে থাকলে এই সব মহিলারা অতি উচ্চপদস্থ অফিসারের স্ত্রী হিসেবে গণ্য হতেন। কোনওদিন রান্না ঘরে ঢুকতেন কিনা সন্দেহ, সংসারের ভার থাকত ঠাকুর-চাকরের ওপর। কিন্তু এখানে যেহেতু সবাইকেই নিজের হাতের রান্না করতে হয়, সেইজন্য রান্নার নানারকম এক্সপেরিমেন্ট করতে-করতে হাতটি অতি সুস্বাদু হয়ে যায়। জয়তীদিও ছানার সন্দেশ বানাতে জানেন। দেশে থাকতে আমি যত না মিষ্টি খেয়েছি, তার চেয়ে বেশি মিষ্টি খেতে হয়েছে এখানে এসে। যে-কোনও বাড়িতে গেলেই সন্দেশ-রসগোল্লা খেতে হয়, সবই বাড়িতে তৈরি।

একটু দূরে থাকেন ডাক্তার মিহির রায়। ছিমছাম পরিচ্ছন্ন ধরনের মানুষ। তাঁর স্ত্রী সুপর্ণাও খুব সপ্রতিভ আর হাসিখুশি মহিলা। ওঁদের বাড়িতে একদিন নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে ডাক্তার রায় অনেক পুরোনো-পুরোনো বাংলা গানের রেকর্ড বাজিয়ে শোনালেন। সেই সন্ধ্যায় সেই ঘরের আবহাওয়া যেন পুরোপুরি কলকাতার হয়ে গেল। কিংবা বড়জোর বলা যায় শিলং কিংবা পুণা।

দীপকদা, বিমলবাবু আর দিলীপবাবু এক সঙ্গে হলেই তাস খেলতে বসেন। ব্রিজ। আমার অনেকদিন তাস খেলার অভ্যেস নেই, বিদ্যেটা একটু ঝালিয়ে নিয়ে ওঁদের পার্টনার হতে লাগলুম প্রায়ই। অনেক বাড়িতে যেমন একটা বেকার গলগ্রহ ভাগ্নে বা ভাইপো থাকে, আমার অবস্থা প্রায় সেই রকম। দীপকদা-জয়তীদিদের বাড়িতে আশ্রিত হয়ে আছি, ওঁদের যেখানে যেখানে নেমন্তন্ন হয়, আমিও সেখানে সেখানে ওঁদের সঙ্গে যাই, অনেকে চোখের ইশারায় জিগ্যেস করে, এ আবার কে?

দীপকদা আমাকে ছাড়ছেনও না, আর এখানে আমার কিছু করবারও নেই। সারাদিন ফাঁকা বাড়িতে শুয়ে বসে বইটই পড়ি, কারণ একা-একা শহরে ঘুরে বেড়াবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। সন্ধ্যেবেলা ওঁরা বাড়ি ফিরলে কিছুক্ষণ আড্ডা হয়।

এখানে বাঙালিদের আর একটি মিলন-উপলক্ষ্য হল হিন্দি ফিল্ম। ভিডিও ক্যাসেটে সমস্ত হিন্দি ফিল্ম পাওয়া যায়, এমনকী যেসব ছবি এখনও ভারতে রিলিজ করেনি, সেইসব টাটকা ছবিরও। কিছু কিছু দক্ষিণ ভারতীয় ফিল্মেরও ক্যাসেট পাওয়া যায় কিন্তু বাংলা ফিল্মের এখনও সে সৌভাগ্য হয়নি। এই ক্যাসেটগুলো কেনারও দরকার নেই, ভাড়া পাওয়া যায় সব জায়গায়, তাও ক্রমশই বেশ সস্তা হয়ে যাচ্ছে, যেমন ধরা যাক এক ডলার। বাড়ি থেকে বেরুতে হবে না, ঘরে বসেই ভি সি আর-এ দেখা যাবে পুরো একটা ফিল্ম। সিনেমা যেহেতু একা দেখে সুখ নেই তাই শুক্কুর-শনিবার রাত্তিরে কোনও না কোনও বাড়ি থেকে ডাক আসে, এই আমার বাড়িতে সিলসিলা এসেছে চলে এসো। কিংবা ইয়ারানা কিংবা এক দুজে কে লিয়ে কিংবা কাতিলোঁ কি কাতিল! মার-দাঙ্গা-কান্নাকাটি-নাচ-গান-প্রেম-বিরহ-স্নেহ-প্রতিহিংসা ইত্যাদি সব কিছুই থাকে প্রত্যেক ফিল্মে।

এই রকম ডাক এলে দীপকদাদের সঙ্গে আমিও চলে যাই। কয়েক সপ্তাহ পরেই আমি আবিষ্কার

করলুম, যে-আমি দেশে থাকতে কক্ষনো ওই সব সিনেমা দেখি না, সুদূর কানাডায় এসে সেই আমি রীতিমতন হিন্দি-সিনেমার ফ্যান হয়ে গেছি। অন্যদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ধর্মেন্দ্রর ও অভিতাভ বচ্চনের তুলনামূলক আলোচনা করছি।

।। ১৩ ।।

মাঝে মাঝে আমি ভাববার চেষ্টা করি, এইসব দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের কোথায় কোথায় মিল।

একটু ফাঁকা জায়গা দিয়ে গাড়ি করে যেতে-যেতে মনে হয়, এখন অনায়াসেই ভাবতে পারি যে নিজের দেশেরই কোনও জায়গা দিয়ে যাচ্ছি। আকাশ তো একই রকম, দূরের মাঠও একই রকম। গাছপালার, চেহারা একটু আলাদা হলেও কিছু আসে যায় না, কাশ্মীর বা শিলং-এর গাছ আর পুরুলিয়া-বর্ধমানের গাছও তো [illegible]াদা। রাস্তার পাশে খানাডোবা দেখলে আমার বড্ড আনন্দ হয়, খুব চেনা লাগে। নোংরা জলের সেরকম খানাডোবা এদেশে একেবারে দুর্লভ নয়।

কিন্তু তফাত আসলে অনেক। পৃথিবীর এ-পিঠ আর ও-পিঠ, তফাত হবে না?

যে-কোনও বাড়ি দেখলেই মনে পড়ে যায়, অন্য দেশে আছি। খুব বরফ পড়ে বলে কোনও বাড়িরই ছাদ সমতল নয়। এ দেশের সাধারণ লোকের বসত বাড়ি একতলা বা দোতলা এবং প্রায় পুরোটাই কাঠের তৈরি, এইসব বাড়ির ছাদ সমতল হলে ওপরে বরফ জমে ছাদ ভেঙে পড়বে। এরকম চুড়োওয়ালা বাড়ি আমাদের দেশের শৈল নিবাসগুলিতে কিছু-কিছু চোখে পড়লেও সেগুলোকে আমরা সাহেবি বাড়ি বলেই জানি।

বাড়ির পরেই গাড়ি। এতরকমের গাড়ি তো আমাদের দেশে দেখবার উপায় নেই। এক জায়গায় যদি তিরিশটা গাড়ি থেমে থাকে, তবে তিরিশটাই আলাদা মডেলের। গাড়িগুলি চলে নিঃশব্দে, ভেতরে বসে থাকলে তো কোনও আওয়াজই পাওয়া যায় না, আর প্রায় প্রতিটি গাড়িই শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। গাড়িতে হর্ন থাকে একটা অলঙ্কার হিসেবে, কেউ হর্ন বাজায় না। দৈবাৎ কারুর হর্নে হাত লেগে গেলে সে লজ্জায় জিভ কাটে। কোনও গাড়ির পিছনে হর্ন দেওয়া মানে তাকে প্যাঁক দেওয়া। একমাত্র যারা নতুন বিয়ে করে চার্চ থেকে বেরোয়, তখন তারা প্যাঁপ্যাঁ করে হর্ন বাজাতে বাজাতে যায়। সেরকম ভাবলে আমাদের দেশের প্রত্যেকটি গাড়িই নতুন বিবাহিতদের।

এরা পৃথিবীর প্রায় সব দেশের গাড়ি কেনে। যার যেরকম গাড়ি পছন্দ তা কিনতে বাধা নেই। আমাদের ভারতবর্ষে যে বিদেশি গাড়ি নিষিদ্ধ তার জন্য আমাদের গর্ব হওয়ার কথা। আমরা নিজেদের গাড়ি বানাই, এশিয়ার অনেক গরিব দেশ মোটর গাড়িতে স্বনির্ভর নয়। বেশ ভালো কথা। কিন্তু এদেশের লোকরা যখন জিগ্যেস করে, তোমাদের গাড়ি দিন দিন খারাপ হচ্ছে কেন, তখন উত্তর খুঁজে পাই না। আমরা অনেকেই বলি, পুরোনো মডেলের অ্যাম্বাসাডর কিংবা ফিয়াট এখনকার নতুনগুলোর তুলনায় অনেক ভালো। এদেশের বিচারে এটা অত্যন্ত অদ্ভুত। যন্ত্রপাতির জিনিস তো দিন দিন আরও উন্নত, আরও ভালো হওয়ার কথা। আমাদের দিশি গাড়িগুলোর কলকব্জা দিন-দিন নিকৃষ্ট হচ্ছে আবার দামও বেড়ে যাচ্ছে। এদের গাড়ি দিন দিন উন্নত মানের ও বেশি আরামদায়ক হচ্ছে, সেই তুলনায় দামও কমছে। জাপানি গাড়ির সস্তা দামের সঙ্গে পাল্লা দিতে দিয়ে তো আমেরিকায় গাড়ি-কোম্পানিগুলির ত্রাহি-ত্রাহি অবস্থা। জাপান না হয় শিল্প-জাদুকরদের দেশ, কিন্তু শুনছি ছোট্ট দেশ উত্তর কোরিয়া আরও সস্তা আরও মজবুত গাড়ি নিয়ে এখানকার বাজারে ধেয়ে আসছে। তবে কেন ভারতীয় গাড়ি এখানকার রাস্তা দিয়ে চলবে না?

চালককে সাবধান করে দেওয়ার জন্য এখানকার গাড়িতে নানা রকম শব্দ হয় ও আলো জ্বলে ওঠে তো বটেই, কোনও-কোনও গাড়ি আবার কথাও বলে। কেউ হয়তো ব্যাক লাইট না নিভিয়ে ভুল করে নেমে পড়ছে, অমনি গাড়ি বলে উঠল, ওগো প্রিয়, তুমি যে বাতি নেভাতে ভুলে গেছ!

নিভিয়ে দিয়ে যাও, লক্ষ্মীটি। তাও পুরোনো স্ত্রীর মতন ঘ্যানঘ্যানে গলায় নয়, নতুন প্রেমিকার মতন সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে।

গাড়ির পরে রাস্তা। ভালো রাস্তা যে আমাদের দেশে নেই তা নয়, চওড়া রাস্তাও কিছু কিছু আছে, কিন্তু মাইলের পর মাইল, একশো, দুশো, পাঁচশো, হাজার মাইল একইরকম মসৃণ বিশাল রাস্তার কথা কি আমরা কল্পনা করতে পারি? একটাও ট্রাফিক লাইটে থামতে হবে না এইরকমভাবে একশো-দুশো মাইল চলে যাওয়া যায়। শহরের বাইরে সব রাস্তায় যাওয়া-আসার পথ আলাদা। দু-দিকে চারটে-চারটে আটটা গাড়ি চলতে পারে, এমন রাস্তা উত্তর-আমেরিকা মহাদেশটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে।

দেখে শুনে মনে হয়, এদেশে গাড়ি চালানো খুব সহজ। এত সহজ বলেই বোধহয় এদেশে গাড়ি দুর্ঘটনা হয় বেশি।

পুরো দেশটাই গাড়িনির্ভর। ছুতোর মিস্ত্রি, কলের মিস্ত্রি, পোস্টম্যান, স্কুল শিক্ষক এমনকী অনেক ছাত্রছাত্রীরও নিজস্ব গাড়ি আছে। যে-কোনও লোক তার দু-তিন মাসের মাইনে জমিয়ে বেশ ঝকমকে তকতকে একটা সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়ি কিনতে পারে। আর একেবারে নতুন গাড়িও কেনা যায় পাঁচ-ছ'মাসর মাইনেতে। একটা পরিসংখ্যান দেখছিলুম, আমেরিকায় লোকের নিম্নতম আয় সাড়ে আটশো ডলার। ডলারকে টাকাই ধরতে হবে এদেশের মান অনুযায়ী। আমাদের দেশের গরিবদের কথা বাদ দিচ্ছি, কিন্তু ব্যাঙ্কের পিওন বা কয়লাখনির শ্রমিকের আয় ওইরকমই টাকা। তারা গাড়ি করে ঘুরছে, এমন চিন্তা করা যায়? এদেশে কিন্তু আড়াই-তিন হাজার ডলারে বেশ চালু গাড়ি পাওয়া যায়। আর পরিসংখ্যান যাই বলুক, দোকান কর্মচারি বা ছুতোর মিস্তিরির রোজগার মাসে বারো-চোদ্দোশো ডলারের কম নয়।

মনে করুন, আপনার বাড়ির জলের পাইপে গুরুতর গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। শীতের সময় কলে গরম জল না এলে কিংবা কমোডের ফ্ল্যাশ ঠিক মতন কাজ না করলে সারা বাড়িতে দারুণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। আপনার বাড়ির নোংরা জল তো আর রাস্তায় যাওয়ার উপায় নেই, তেমন হলে মিউনিসিপ্যালিটি এমন ফাইন করবে যে আপনার ঘটি-বাটি বন্ধক দিতে হবে। সুতরাং জলের পাইপ খারাপ হওয়া মাত্র আপনি ডাক্তারকে কল দেওয়ার মতন টেলিফোনে কলের মিস্তিরিকে খবর দিলেন। মিস্তিরিমশাই যে-মুহূর্তে টেলিফোন ধরলেন, সেই মুহূর্ত থেকে তাঁর সময়ের হিসেব হবে। অবশ্য তিনি আসবেন ঝড়ের বেগে নিজস্ব গাড়ি হাঁকিয়ে, এসেই চটপট কাজ শুরু করে দেবেন। ধরা যাক, ঊনপঞ্চাশ মিনিট পর আপনার কল দিয়ে আবার ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে ঘাড় নাড়লেন। তখন মিস্তিরিমশাই পকেট থেকে ক্যালকুলেটর বার করে, ধরুন মিনিটে দেড় ডলার হিসেবে তাঁর মজুরি কত হয় তা হিসেব করে ফেললেন। আপনার সাড়ে তিয়াত্তর ডলার খসে গেল।

আপনার মনে হতে পারে, ওরে বাপ্‌রে, এত রেট কলের মিস্তিরির। তা তো হবেই, কারণ তিনি তো প্রত্যেকদিনই ঘনঘন কল পান না। খরচ বাঁচাবার জন্য প্রত্যেকেই বাড়ির ছোটখাটো কাজ নিজের হাতে করে। মিস্তিরি মশাই হয়তো গড়ে মাসে তিরিশবার কল পান, সেই জন্যই তিনি উচ্চ রেট করে রেখেছেন, যাতে সমাজের আর পাঁচজনের মতন তিনিও সমান মর্যাদায় জীবন কাটাতে পারেন। কলের মিস্তিরির কাজ করেন বলে তিনি আর পাঁচজনের চেয়ে কোনও অংশে ছোট নন!

হাতি কেনা সহজ, কিন্তু তার প্রতিদিনের খাদ্য জোগাড় করাই যে আসলে বিরাট খরচের ব্যাপার, গাড়ির বেলাতেও সেইরকম তেল। ভারতে দিন দিন তেলের দাম আকাশ ছুঁচ্ছে, সেই তুলনায় এদেশে তেলের দাম অবিশ্বাস্য রকম সস্তা। এক গ্যালন (সাড়ে চার লিটার) তেলের দাম পাঁচ সিকে থেকে এক টাকা চল্লিশ পয়সার মধ্যে। এটা অবশ্য ডলারের হিসেব, টাকার হিসেবেও মাত্র এগারো-বারো টাকা! আমাদের দেশে যে ব্যক্তির আয় এক হাজার টাকা, সে যদি দেড় টাকায় পাঁচ লিটার পেট্রোল

পেত, তাহলে নিশ্চয়ই ট্রাম-বাস এড়াবার জন্য যে-কোনও উপায়ে মরিয়া হয়ে একটা গাড়ি কিনে ফেলত।

এদেশে তেল পাওয়া যায় দু-তিন রকম, লেডেড, আন লেডেড, সুপার লেডেড। গাড়ির তেলপোড়া ধোঁয়ায় স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় বলে এরা এখন চিন্তিত। সেই জন্য গাড়ির যন্ত্রপাতি পালটানো হচ্ছে, তেলও শুদ্ধ করা হচ্ছে।

এখানে একজন অধ্যাপকের একটি চমৎকার সুদৃশ্য দোতলা বাড়ি আছে, তাঁর দুটি গাড়ি, একটি স্ত্রীর জন্য, একটি নিজের জন্য, দুটি টিভি, তার মধ্যে একটি বাচ্চাদের ভিডিও খেলার জন্য, ডিস ওয়াশিং মেশিন আছে। তিনি তিনটি মেয়েকে পড়াবার খরচ চালান। এর মধ্যে একজন তাঁর স্ত্রী। তা ছাড়া এই অধ্যাপকের প্রচুর বই ও রেকর্ড কেনবার এবং ছবি তোলা ও ভ্রমণের শখ আছে। এবং আমার মতন ভ্যাগাবন্ড ঘুরতে-ঘুরতে এখানে এসে পড়লে তিনি অম্লানবদনে দিনের পর দিন আশ্রয় দেন। অর্থাৎ আমি দীপকদার কথা বলছি।

এঁর সঙ্গে আমাদের দেশের অধ্যাপকদের তুলনা করলে নিশ্চয়ই দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হবে। অবশ্য দীপকদা নিজের গাড়ি নিজেই ধোওয়া মোছা করেন, বাড়ির বাগানের ঘাস কাটেন, বাড়ি রং করার সময় নিজেই ব্রাশ আর রং নিয়ে বাড়ির ছাদে উঠে যান এবং একদিন অন্তর অন্তর বাড়ির বাসনপত্তর মাজেন। আমাদের দেশের অধ্যাপকরা করেন এসব কি কাজ?

হঠাৎ দেশ থেকে জয়তীদির মেজদি এসে উপস্থিত হলেন।

এঁরও চেহারা বেশ ছিপছিপে, তবে জয়তীদির মতন অতটা নন। চোখে দশমা, দারুণ ছটফটে। ভদ্রমহিলার চশমা দিনে অন্তত দশবার হারায়। সারা বাড়ির লোক চশমা খোঁজায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রতি এক ঘণ্টা-দু'ঘণ্টা অন্তরই মেজদি সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে অসহায় মুখ করে বলবেন, এই, আমার চশমাটা কোথায় রেখেছি? অমনি আমরা সবাই বেসমেন্ট থেকে রান্নাঘর পর্যন্ত সব জায়গায় চশমা খুঁজতে শুরু করি। কখনও হয়তো মেজদির চশমা চোখেই আছে, তবু দীপকদা মজা করে জিগ্যেস করেন, মেজদি, আপনার চশমা? অমনি তিনি ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠেন, তাই তো, কোথায় রাখলুম এই মাত্র?

মানুষের নাম ভুল করার ব্যাপারেও জুড়ি নেই মেজদির। আমার সংক্ষিপ্ত নীলু নামটির বদলে তিনি কখনও শম্ভু, কখনও মহেন্দ্র, কখনও ধনঞ্জয় ইত্যাদি কত নামেই যে ডাকেন, তার ঠিক নেই। আমি অবশ্য প্রত্যেকবারই সাড়া দিয়ে যাই।

জয়তীদির ব্যক্তিত্ব আছে খুব, তিনি ছটফট করেন না, তিনি তাঁর এই ভুলোমনা মেজদিটিকে সামলাবার চেষ্টা করেন সব সময়। এক এক সময় বোঝাই যায় না, ওঁদের দুজনের মধ্যে কে বড় কে ছোট।

যাই হোক, এই মেজদি এসে পড়ায় বেশ জমে গেল। জয়তীদির পরীক্ষা হয়ে গেছে, তাঁর মেয়েদেরও ছুটি, দীপকদা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এক মাসের ছুটি নিয়েছেন, সুতরাং প্রায়ই নানান জায়গায় বেড়াতে যাওয়া শুরু হল। কোনওদিন বাইরের হোটেলে খাওয়া, কোনওদিন সিনেমা, কোনোদিন দূরের কোনও শপিং মহল ঘোরাঘুরি।

এ ছাড়া সপ্তাহান্তে এর ওর বাড়ি নেমন্তন্ন তো লেগে আছেই।

এর মধ্যে একদিন একটা জিনিস দেখে চমৎকৃত হলুম।

দীপকদা জয়তীদি এই বাড়িটা বিক্রি করে আর একটা বড় বাড়ি কেনার কথা ভাবছেন। এদেশে ভাড়া বাড়িতে থাকা সাংঘাতিক খরচের, তার চেয়ে কিছু টাকা জমিয়ে বাড়ি কিনে ফেলা অনেক সহজ। অনেক রকমের ঋণ পাওয়া যায়, বাড়ি কিনলে ইনকামট্যাক্সের অনেক সুবিধে হয়। এদেশে

যেমন লোকেরা ঘনঘন গাড়ি বদল করে, সেইরকম কয়েক বছর অন্তর বাড়িও পালটায়। পুরোনো বাড়ি বিক্রি করে নতুন বাড়ি কেনার মধ্যে কী সব অঙ্কের ব্যাপারও আছে।

মেজদি আসার পর জয়তীদি নতুন বাড়ি দেখতে শুরু করলেন। আমিও ওঁদের সঙ্গী।

এমনভাবে যে বিক্রির জন্য বাড়ি সাজানো থাকে, তা কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবিনি।

এখানে বাড়ি তৈরি ও বিক্রির নানারকম কোম্পানি আছে। তারা বাড়ি তৈরি করে নিখুঁতভাবে সাজিয়ে রেখে দেয়ে, ইচ্ছুক ক্রেতারা সেই সব বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখতে পারে। সেসব কী বাড়ি, দেখলে চোখ কপালে উঠে যায়।

কোনও কোনও পাড়ায় এরকম নতুন বাড়ি পরপর সাজানো আছে। এগুলোকে বলে শো-হাউজ। কোনও একটা বাড়িতে গিয়ে ঘণ্টা বাজালেই একজন কেউ দরজা খুলে দিয়ে অভ্যর্থনা করবে। তারপর সেই লোকটি বা ভদ্রমহিলাটি সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সারা বাড়ি দেখাবে, অথবা, ইচ্ছুক ক্রেতারা নিজেরাই ইচ্ছে করলে যে-কোনও জায়গায় ঘুরে দেখতে পারে। সমস্ত বাড়িতে কার্পেট পাতা, জানালায় রং মেলানো পরদা, দেওয়াল আলমারির রং ও ডিজাইন অনুযায়ী বিশেষ রকমের চেয়ার ও টেবিল, খাট, বিছানা। এমনকী বসবার ঘরে যেটা তাস খেলার টেবিল, তার ওপরে রাখা আছে দু'সেট তাস, টেবিলে কাপ-ডিশ ও টি. পট, কোনও কোনও দেওয়ালে ছবি পর্যন্ত। অর্থাৎ এই মুহূর্তে দাম চুকিয়ে দিয়ে যে-কেউ এক্ষুনি এই বাড়িতে বসবাস করতে পারে।

ঠিক যেন হলিউডের কোনও সিনেমার সেট, এক্ষুনি শুটিং শুরু হবে।

বাড়ি বিক্রি কোম্পানির যে প্রতিনিধি সেখানে উপস্থিত, তাকে বললে যে-কোনও আসবার বা কার্পেট-এর রং বদলে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। দাম কীরকম? দাম বলবে, দেড় লক্ষ টাকা...আস্কিং। অর্থাৎ ওই টাকা চাওয়া হলেও দরাদরির সুযোগ আছে।

বাড়িগুলো বাইরে থেকে প্রায় একরকম দেখতে হলেও, প্রত্যেক বাড়িরই ভেতরের ব্যবস্থা আলাদা। কত রকম ডিজাইনই যে মন থেকে বার করতে পারে!

আমরা ঘুরে ঘুরে এরকম বেশ কয়েকটা বাড়ি দেশে ফেললুম। আমি নিজেই এমন ভাব করতে লাগলুম, যেন এক্ষুনি একটা বাড়ি কিনে ফেলতে পারি, নেহাত দোতলায় ওঠার সিঁড়িটা পছন্দ হচ্ছে না। কোনও বাড়ি দেখতে গিয়ে রক্ষয়িত্রীকে গম্ভীরভাবে জিগ্যেস করি, বাথরুমে পিঙ্ক রঙের বাথটবটা বেশ ভালোই লাগছে কিন্তু সনা বাথের ব্যবস্থা নেই?

আমরা কালো লোক হলেও এই সব বাড়ি কোম্পানির প্রতিনিধিরা আমাদের মোটেই অবজ্ঞা করে না, আমরা সত্যিই ক্রেতা কিনা তাতেও সন্দেহ করে না। কানাডায় ভারতীয়রা বেশ সচ্ছল সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত।

কুড়ি-পঁচিশটা বাড়ি দেখার পরও জয়তীদির বা তাঁর মেজদির একটাও বাড়ি পছন্দ হল না। আমিও বাড়ি দেখে ক্লান্ত হয়ে গেলুম।

অতিথি কথাটার মানে বোধহয় এই যে, এক তিথির বেশি থাকে না। দীপকদার বাড়িতে আমার পনেরো দিনের বেশি কেটে গেছে। ইংরেজিতে একটা কথা আছে যত তোমার আতিথ্যকে লম্বা করবে, তত তোমার সমাদর কমে যাবে। কিংবা, আরও বলে, মাছ এবং অতিথি দুদিন পরেই পচা গন্ধ ছাড়তে শুরু করে। সুতরাং এবার আমার কেটে পড়াই উচিত।

একদিন কাঁচুমাচু মুখ করে দীপকদাকে বললুম, দীপকদা...মানে...এবার তাহলে আমি যাই...আমার অন্য জায়গায় যাওয়ার কথা আছে...যদি দয়া করে একটু এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেন...।

দীপকদা বললেন পাগল নাকি! এক্ষুনি কোথায় যাবে? তোমায় কি আটকে রেখেছি এমনি-এমনি? মেজদি এসে গেছেন, এবার আমরা অনেক দূরে বেড়াতে যাব।

সত্যি-সত্যি এর দুদিন পরেই আমরা বেরিয়ে পড়লুম দূরপাল্লার ভ্রমণে।

।। ১৪ ।।

আজ সকালে ছিলুম মিদ্‌নাপুরে, কাল দুপুরে চলে গেলুম ম্যাড্রাসে। এমনিতে শুনলে এমন কিছু আশ্চর্য মনে হয় না, কিন্তু এই মিদ্‌নাপুরের সঙ্গে মেদিনীপুরের কোনও সম্পর্ক নেই, আর ওই ম্যাড্রাস আমাদের ম্যাড্রাস থেকে প্রায় চোদ্দো-পনেরো হাজার মাইল দূরে।

ক্যানাডার ক্যালঘেরি শহরের একটা অঞ্চলের নাম মিদ্‌নাপুর। কেন ওই নাম তা কেউ জানে না। খুব সরল অনুমান এই যে বাংলার মেদিনীপুর জেলা থেকে কোনও সাহেব কোনও সময়ে কানাডায় চলে গিয়ে বসতি নিয়েছিলেন, এবং মেদিনীপুরের প্রিয় স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য সেই নামটিই রেখেছেন।

এরকম নাম অনেক আছে।

এই বিশাল দেশে এসে মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গরা নিশ্চয়ই প্রথমে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল। প্রায় কুমারী, উর্বর ভূমি, ভেষজ ও খনিজ সম্পদেও প্রকৃতি অকৃপণ। একটার পর একটা অঞ্চল দখল করতে-করতে এগিয়ে নাম রাখার ব্যাপারে অভিযাত্রীরা খুব সমসায় পড়েছিল। প্রথম অভিযাত্রীদল যত বেশি যোদ্ধা ছিল, তত কল্পনাশক্তি তাদের ছিল না। তাই জায়গার নাম রাখার ব্যাপারে তারা অনেকসময় পূর্ব পরিচিত নামের সঙ্গেই একটা করে নিউ জুড়ে নতুন উপনিবেশ বানিয়েছে। যেমন নিউ ইয়র্ক, নিউ ইংল্যান্ড, নিউ অর্লিয়েন্স, নিউ হ্যাম্পশায়ার, ইত্যাদি। তারপর যার যা পরিচিত নাম এলোপাতাড়ি বসিয়ে দিয়েছে। দিল্লি-বোম্বাই কলিকাতা-মাদ্রাজ এর নামেও শহর আছে উত্তর আমেরিকায়। কলকাতা নামে একাধিক জায়গা এখানে আছে শুনেছি। কিন্তু আমি নিজের চোখে দেখিনি বা যাইনি। মাদ্রাজ দেখেছি। এমনকী মস্কো নামের একটা শহরের পাশ দিয়েও আমরা গেছি। সেই শহরটি আইডাহো আর ওয়াশিংটন রাজ্যের সীমানায়।

এরকম নতুন নাম এখনও হচ্ছে। এরই মধ্যে একদিন কাগজে পড়লুম, আচার্য রজনীশ ভারত থেকে বিতাড়িত হয়ে তাঁর দলবল সমেত আমেরিকার উত্তর অঞ্চলে একটা কলোনি করেছেন। তার নাম হয়েছে রজনীশনগর। স্থানীয় লোকেরা অবশ্য এই নতুন নাম পত্তনে আপত্তি জানিয়েছে, কাগজে চিঠি লেখালেখি হচ্ছে যে আচার্য রজনীশ এবং তাঁর চ্যালারা ব্যভিচারী এবং কমুনিস্ট, সুতরাং তাদের কলোনিকে যেন শহরের মর্যাদা না দেওয়া হয়!

এডমান্টন থেকে বেরিয়ে আমরা প্রথমে এসে থেমেছিলুম ক্যালঘেরিতে। দুশো মাইলের কিছু বেশি দূরত্ব, সে রাস্তা দীপকদা মেরে দিলেন পৌনে তিন ঘণ্টায়।

দীপকদার দুখানা গাড়ির মধ্যে একটি ছোট্ট ছিমছাম, অন্যটি ঢাউস। এই দ্বিতীয় গাড়িটিই নেওয়া হয়েছ। এ গাড়িতে ফার্স্ট ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস, থার্ড ক্লাস আছে। সামনের সিট অর্থাৎ ফার্স্ট ক্লাসে তিনজন বসতে পারে। সেকেন্ড ক্লাসে চারজন। আর থার্ড ক্লাসে মুখোমুখি দুসারি সিট, প্রয়োজনে সেগুলো তুলে দিলে দু-তিনজন বিছানা পেতে শুয়েও যেতে পারে।

অত যাত্রী নেই অবশ্য আমাদের। দীপকদা, জয়তীদি আর ওঁদের দুই মেয়ে জিয়া আর প্রিয়া। এ ছাড়া জয়তীদির মেজদি, শিবাজি রায় নামে আর একজন যুবক আর আমি তো আছিই।

ক্যালঘেরিতে একদিন থামা হল। কারণ এখানে মেজদির ঘনিষ্ঠ বান্ধবী থাকেন একজন। কলকাতায় যিনি এষা মুখার্জি নামে খ্যাতনাম্নী ছিলেন, তিনি এখানে এসে হয়েছেন এষা চৌধুরী। এষা দেবীর মুখ দিয়ে সর্বক্ষণ কথার ফুলঝুরি ছোটে আর সর্বক্ষণ মুগ্ধ হয়ে তা শুনতে ইচ্ছে করে। মেয়েদের মধ্যে এরকম 'কথাশিল্পী' কদাচিৎ দেখা যায়। ওঁর স্বামী শ্যামলবাবু মৃদুভাষী কিন্তু সুরসিক। মাঝে-মাঝে টুকটুক করে এক আধটা মন্তব্য ছাড়েন। বান্ধবীকে পেয়ে এষা চৌধুরি দারুণ খুশি হয়ে হইচই এবং পার্টি লাগিয়ে দিলেন। সেই সুবাদে আমরাও বেশ খাতির যত্ন পেলুম।

ক্যালঘেরি শহরটি অতি মনোরম। পেট্রোলিয়ামের কল্যাণে দিন-দিন শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে, এবং অদূর ভবিষ্যতে এখানে অলিম্পিক সংগঠনের জন্য শহরটি তৈরি হচ্ছে।

ক্যালঘেরি টাওয়ার একটি বিশাল উঁচু ব্যাপার, যার ওপরে উঠলে পুরো শহরটি দেখা যায়। ও শহরেও সত্তর-আশিতলা বাড়ির অভাব নেই। টাওয়ারটি তার চেয়েও উঁচু, এবং চূড়ায় যে রেস্তোরাঁটি রয়েছে, সেটি আস্তে-আস্তে ঘোরে। অর্থাৎ এক জায়গায় টেবিল নিয়ে বসে খাবার খেতে-খেতেই আমরা পুরো শহরের দৃশ্যপটটি উপভোগ করতে পারলুম।

এষা দেবী এত হাসিখুশি মানুষ, তবু মাঝে-মাঝে তাঁর খুব মন খারাপ হয়। এখানে মন টিকছে না। দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে হয়। আমাদের দেখে যেন দেশের জন্য আরও উতলা হয়ে উঠলেন। কিন্তু দেশে ফেরার অনেক বাস্তব অসুবিধে আছে। শ্যামলবাবু যে বিষয়ের বিশেষজ্ঞ, সে ব্যাপারের উপযুক্ত চাকরি আমাদের দেশে বেশি নেই।

এষাকে আমাদের কলকাতার এক বিখ্যাত মহিলা নাকি বলে দিয়েছিলেন, দ্যাখ, যখন খুব মন খারাপ হবে, তখন রেফ্রিজারেটারের দরজা খুলে ভেতরটাতে তাকিয়ে থাকবি। ওসব তো আর দেশে ফিরে গেলে পাবি না। খুব ন্যায্য কথা। ওরকম খাঁটি দুধ, পাঁচ রকমের মাংস, পনেরো রকমের কেক প্যাসট্রি ইত্যাদি যা সব সময় সবার বাড়িতে মজুত থাকে, তা কলকাতায় পাওয়ার কথা চিন্তাও করা যায় না।

কিন্তু আমি ভাবলুম, উপনিষদের মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যকে জিগ্যেস করেছিলেন, যা নিয়ে আমি অমৃত হব না, তা নিয়ে আমি কী করব! আর কলকাতার মৈত্রেয়ী কি না বললেন, খাবারদাবারের কথা? কালের কী বিচিত্র গতি! অবশ্য, ইস্কুল-কলেজের 'এসে'-তে ছেলেমেয়েরা অনেকেই মৈত্রেয়ীর ওই উক্তির কোটেশন দেয় বটে, কিন্তু মৈত্রেয়ীর ওই আদিখ্যেতার কথা শুনে যাজ্ঞবল্ক্য তার উত্তরে যে কী রকম কড়কে দিয়েছিলেন, তা অনেকেই জানে না। জানাবার দায়িত্বও আমার নয়। সুতরাং একালের মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য-এর মতন সঠিক জ্ঞানের কথাই বলেছেন বটে। রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন, "জেনো, বাসনার সেরা বাসা রসনায়"!

ক্যালঘেরি থেকে বেরুবার পরই আমাদের সত্যিকারের যাত্রা শুরু হল। বলতে গেলে নিরুদ্দেশ যাত্রা।

আমাদের শেষ পর্যন্ত একটা লক্ষ্যস্থল আছে বটে, কিন্তু কোন পথে কিংবা কবে সেখানে পৌঁছব, তার ঠিক নেই। অনেকগুলো ম্যাপ সঙ্গে নেওয়া হয়েছে। নেভিগেটারের দায়িত্ব প্রথমে শিবাজি রায় নিয়েছিলেন যদিও, কিন্তু একদিন পরেই আমরা সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে পদচ্যুত করলুম, সে দায়িত্ব নিলেন জয়তীদি। তাঁর যেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তেমনি চোখ সজাগ। এসব রাস্তায় একবার ডানদিক বা বাঁদিক ঘুরতে ভুল করলেই পঞ্চাশ-একশো মাইল ঘোরপথের ধাক্কা। নেভিগেটার হওয়ার বদলে শিবাজি রায় মজার কথা বলে আমাদের আনন্দ দেওয়ার ভার নিলেন। আমার ওপর ভার রইল, যথা সময়ে কফি কিংবা আপেল খাওয়ার কথা মনে করিয়ে দেওয়া আর মেজদির চশমা খোঁজার। চলন্ত গাড়িতেও সেই মহিলা ঘণ্টায় দু-বার করে চশমা হারাতে লাগলেন।

ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার নাম বাল্যকালে ভূগোলে পড়েছি শুধু। সেই রাজ্য ধরে এখন চলেছে আমাদের গাড়ি। পথের দু-পাশে জঙ্গলময় পাহাড়। এগুলোই বোধহয় রকি মাউন্টেনস। এদিকে জনবসতি খুবই কম। তবে আধঘণ্টা পরপরই এসে যাবে গ্যাস স্টেশন, খাবার জায়গা, রাত্রি বাসের জন্য মোটেল।

পথ দিয়ে যেতে-যেতেই রাস্তার দুধারে অনবরত নির্দেশ দেখা যাবে, আর কত মাইল দূরে গ্যাস স্টেশন। সেখানে কী কী সুযোগ-সুবিধে আছে। হোটেল আছে কি না। এদেশের রাস্তাটাই যেন একটা শিল্প। এই শিল্পকে নিখুঁত করার জন্য এদের যত্নের অন্ত নেই।

আরও একটা চমৎকার জিনিস আছে রাস্তার ধারে ধারে। তার নাম রেস্ট এরিয়া। গাড়ি

চালাতে-চালাতে যদি কখনও ক্লান্তি বা একঘেয়েমি আসে তার জন্য এই বিশ্রামের ব্যবস্থা রয়েছে। তরু ছায়াময় একটি চমৎকার নিরিবিলি জায়গা, সেখানে রয়েছে বসার জায়গা, পানীয় জল, বাথরুম, আর টেলিফোনের ব্যবস্থা। সবই বিনা পয়সায়। গাড়ি থামিয়ে সেখানে যতক্ষণ খুশি আলস্য করা যায়। সঙ্গের খাবারদাবার খেয়ে নেওয়া যায়। এই জায়গাগুলিকে দেখলে আমার ঠিক মরূদ্যানের কথা মনে হয়। চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল অন্তর-অন্তর এরকম একটি করে মরূদ্যান। এখানকার গাছগুলো অধিকাংশ ইউক্যালিপটাস, তাই বাতাসে চমৎকার সুগন্ধ।

সঙ্গে খাবার থাক বা না-ই থাক, খিদে বা তেষ্টা পেলে পছন্দমতো খাবার জায়গা পেতে একটুও অসুবিধে নেই। পকেটের উত্তাপ অনুযায়ী নানা রকম পান-ভোজনালয়। যার পকেট গরম সে যদি ওয়াইন বা বিয়ার সহযোগে পাঁচ-সাত কোর্সের লাঞ্চ-ডিনার খেতে চায়, তারও ব্যবস্থা আছে। আবার সস্তায় চট করে কিছু একটা খেয়ে নেওয়ার জায়গাও অসংখ্য। সস্তায় সবচেয়ে ভালো খাবারের দোকানের রাজা হল ম্যাকডোনাল্ড। এদের দোকানের সংখ্যা যে কত লক্ষ তা বলা আমার পক্ষে অসাধ্য। যে কোনও ছোট শহরেই একটা করে ম্যাকডোনাল্ড। আর আশ্চর্য ব্যাপার, এদের সব দোকানেই এদের খাবার একই রকমের ভালো, আর দামও এক। সুরা বা মদিরা বিক্রি করে না এরা, এদের মতন চমৎকার আলুভাজা ও কফি পাঁচতারার হোটেলগুলোও দিতে পারে না, আর এদের হামবার্গারের স্বাদ তো জগৎ বিখ্যাত। এদের সব দোকানই দারুণ খোলামেলা, বাইরে ভেতরে প্রচুর বসবার জায়গা, সেই রকমই পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে, তকতকে। কাউন্টার থেকে নিজেদেরই খাবার আনতে হয়। এঁটো গেলাস-প্লেট খরিদ্দাররা নিজেরাই যথাস্থানে রেখে দিয়ে আসে। ম্যাকডোনাল্ডের তুল্য সস্তা, বিশুদ্ধ ও সুস্বাদু খাবারের দোকান আমাদের সারা দেশে একটাও নেই। এদেশে ম্যাকডোনাল্ড তো কয়েক লক্ষ বটেই, তা ছাড়াও ওদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া 'বার্গার কিং' বা ওই জাতীয় নামের আরও অন্যান্য কোম্পানির দোকান আরও কয়েক লক্ষ।

ব্রিটিশ কলম্বিয়া ছেড়ে আমরা ওয়াশিংটন প্রদেশের সীমানা দিয়ে ঢুকে পড়লুম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

এখানকার চেক পোস্টে ইমগ্রেশন অফিসারটির বয়েস বাইশ-তেইশ বছরের বেশি নয়। প্রায় সাড়ে ছ'ফুট লম্বা হলেও মুখখানা একেবারে বালকের মতন। প্রথমে সে মন দিয়ে আমাদের ভিসা ইত্যাদি পরীক্ষা করল, তারপর সন্তুষ্ট হতেই সে উচ্ছ্বসিত হয়ে আমাদের সঙ্গে খুব আন্তরিক ব্যবহার করতে লাগল। কোন রাস্তা দিয়ে গেলে আমাদের পথ সংক্ষিপ্ত হবে, কোথায় রাত কাটানো বেশি আরামদায়ক, আর ক্যালিফোর্নিয়ায় ঢোকবার সময় গাড়িতে কিন্তু আপেল-টাপেল জাতীয় কোনও ফল রেখো না, জানো তো মেড্ ফ্লাই (ভূমধ্যসাগরের মাছি) নিয়ে ওখানে কত ঝামেলা হচ্ছে। আমাদের গাড়ি ছাড়ার সময় সে হাতছানি দিয়ে আমাদের বিদায় জানাল পর্যন্ত। কোনও বিমানবন্দরে আমরা কক্ষনো এরকম ভালো ব্যবহার পাই না। বিমান বন্দরের অফিসাররা যেন মানুষ নয়, সবাই এক-একটি যন্ত্র।

আমেরিকা ও কানাডার প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রথম-প্রথম এক রকম হলেও আমেরিকার ধরন-ধারণই যেন একটু আলাদা মনে হয়। রাস্তার নিয়মকানুনের বেশ কড়াকড়ি। এখানকার হাইওয়েতে গতি সীমা পঞ্চান্ন মাইল মাত্র, সেটা সত্যি দুঃখের ব্যাপার। এখানকার গাড়িগুলো অশ্বশক্তির বদলে যেন বাঘ-শক্তিতে চলে, ঘণ্টায় একশো কুড়ি কী দেড়শো মাইল বেমালুম চলে যেতে পারে, সেই সব গাড়িকে পঞ্চান্ন মাইলের বল্গায় বেঁধে রাখার কোনও মানে হয়! এক দশক আগেও মার্কিন দেশের গাড়ি গড়ে সত্তর থেকে নব্বই মাইল গতিতে চলত। কিন্তু মাঝখানে একবার তেল সংকটের সময় নাকি হিসেব করে দেখা হয়েছে যে, পঞ্চান্ন মাইল গতিতে চললেই গাড়ির তেল সবচেয়ে কম খরচ হয়। তা ছাড়া দুর্ঘটনার আশঙ্কা কম।

গতিসীমা ভঙ্গ করলেই ফ্যাসাদ। জরিমানা, লাইসেন্স বাতিল থেকে কারাদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। মোড়ে-মোড়ে ট্র্যাফিক পুলিশ থাকে না বটে কিন্তু হেলিকপ্টার, এরোপ্লেনে উড়ে উড়ে পুলিশ রাস্তার

গাড়ির গতি মাপে। তা ছাড়া আছে র‍্যাডার যন্ত্র। এবং ভ্রাম্যমাণ পুলিশের গাড়িতো আছেই। নির্জন রাস্তায় ঝোপঝাড়ের আড়ালে মোটরবাইক চেপে লুকিয়ে থাকে পুলিশ, কোনও গাড়ি একটু নিরিবিলি দেখে নিয়মভঙ্গ করলেই এসে ক্যাঁক করে চেপে ধরবে।

গাড়ি চালাবার সময় মদ্যপান নিষিদ্ধ। এমনকী গাড়িতে ছিপিখোলা কোনও মদের বোতল রাখাও অপরাধ। যখন তখন পুলিশ এসে গাড়ি থামিয়ে চেক করতে পারে। আগে থেকে মদ খাওয়া থাকলেও তিন পেগের বেশি হলেই ব্রিদালাইজার পরীক্ষায় ধরা পড়ে যাবে।

দীপকদা এই প্রসঙ্গে একটা মজার গল্প শোনালেন।

একবার তিনি এক পার্টি থেকে তাঁর এক বন্ধুর গাড়িতে ফিরছিলেন। সঙ্গে ছিলেন বন্ধুর স্ত্রী। মধ্যরাত্রি পেরিয়ে গেছে। বন্ধুটি বেশ খানিকটা হুইস্কি পান করলেও বেপরোয়াভাবে ধরেছিলেন গাড়ির স্টিয়ারিং হুইল, ভেবেছিলেন ঠিক বাড়ি পৌঁছে যাবেন। গাড়িটা মাঝে-মাঝে দু-একবার লগবগ করতেই হঠাৎ কোথা থেকে একটা পুলিশের গাড়ি প্যাঁ-পোঁ করতে-করতে এসে ধরে পড়ল। একেবারে শেষ মুহূর্তে গাড়ি থামিয়ে বন্ধুটি বুদ্ধি খাটিয়ে চট করে নিজে স্টিয়ারিং থেকে সরে গিয়ে নিজের স্ত্রীকে বসিয়ে দিলেন সেই জায়গায়। যেন উনিই চালাচ্ছিলেন গাড়ি। ভদ্রমহিলার পায়ে তখন জুতো নেই, উনি গুটিশুটি মেরে ঘুমোচ্ছিলেন একটু আগে। সেই অবস্থাতেই কোনওক্রমে সামনে সপ্রতিভ হয়ে বসলেন।

পুলিশ ভদ্রমহিলাকে বললেন, নেমে এসো! তুমি বদ্ধ মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছ!

ভদ্রমহিলা বললেন, বাজে কথা! আমি এক ফোঁটা খাইনি।

পুলিশ বলল, বটে! এই রাস্তার মাঝখানের লাইন দিয়ে একশো গজ সোজা হেঁটে দেখাও তো!

ভদ্রমহিলা দিব্যি একশো গজ সোজা হেঁটে দেখিয়ে দিলেন।

. তখন সেই পুলিশ অফিসার তার টুপি ছুঁয়ে বললেন, লেডি, তুমি একটু আগে যেরকম গাড়ি চালাচ্ছিলে, তাতে আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি তুমি অন্তত দশ পেগ খেয়েছ। কিন্তু তোমার সহ্য করার ক্ষমতা আছে বটে। বাপস! তোমার ক্ষুরে-ক্ষুরে দণ্ডবৎ!

তারপর পুলিশটি ভদ্রমহিলার মট্‌কা-মারা স্বামীকে ডেকে বলল, এই, তোমার লাইসেন্স আছে? দয়া করে তুমি তোমার এই ভয়ংকরী স্ত্রীটির বদলে নিজে গাড়ি চালাও!

গল্পটা শুনে আমরা হেসে উঠলুম। তারপর আমি জিগ্যেস করলুম, দীপকদা, গল্পটা তো খুব আপনার এক বন্ধুর নামে চালালেন। আসলে নিশ্চয়ই আপনার আর জয়তীদির অভিজ্ঞতা?

জয়তীদি হাসতে-হাসতে বললেন, না, তখন আমি ছিলুম না, তার মানে তখনও আমাদের বিয়ে হয়নি। সেই আমলে ও-ও মাঝে-মাঝে হুইস্কিতে টইটম্বুর হত নিশ্চয়ই। নইলে বন্ধুর বদলে ও নিজে সেদিন গাড়ি চালায়নি কেন?

সত্যি এখানকার পুলিশের গাড়ি দেখলেই গা ছমছম করে। গাড়ির মাথায় লাল-নীল আলো সব সময় ঘোরে, আর পুলিশের গাড়ি যখন কারুকে তাড়া করে তখন এক সঙ্গে অনেকগুলো শিয়ালের ডাকের মতন শব্দ হয়। আর কী স্মার্ট চেহারা ও পোশাক এখানকার পুলিশদের, যেন আইন ভঙ্গকারীদের ধরাই ওদের ধ্যান জ্ঞান।

আমেরিকার রাজপথের প্যাট্রোল পুলিশকে কেউ কোনওদিন ঘুষ দিতে পেরেছে এমন কথা শুনিনি।

হয়তো আমরা কখনও অপূর্বসুন্দর এক হ্রদের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, অন্য পাশে নানা রঙের গাছের সারি, হঠাৎ পাশ দিয়ে একটা পুলিশের গাড়ি যেতেই আমরা শিউরে উঠি। দৃশ্য উপভোগ করার বাসনা মাথায় উঠে যায়। যেন আমরা অপরাধী। এখানকার পুলিশদের অসীম ক্ষমতা, যে-কোনও ছোট জায়গার শেরিফ ইচ্ছে করলেই আমাদের বিনা বিচারে জেলে ভরে দিতে পারে।

দীপকদা একটু হাত খুললেই আমাদের গাড়িটা একেবারে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারেন বটে কিন্তু অসীম ধৈর্যের সঙ্গে পঞ্চান্ন মাইলেই চালাচ্ছেন।

কিছু একটা হিসেবের ভুলে আমরা চলে গেলুম আইডাহো প্রদেশে। এখানে তো আমাদের যাওয়ার কথা নয়। আমাদের পথ তো অরিগন রাজ্য দিয়ে, সেখানে স্পোকেন নামে মোটামুটি একটা বড় জায়গায় আমরা রাত কাটাব ঠিক করেছি।

আইডাহো একটা পাণ্ডব বর্জিত দেশ বললেই হয়। শহর যেন নেই, শত-শত মাইল ফাঁকা জায়গা। সন্ধ্যের পর গা ছমছম করে। সবাই ঝুঁকে পড়ে ম্যাপ দেখতে লাগলুম, এ জায়গা ছেড়ে আমাদের অরিগনে ঢুকতেই হবে।

অন্যমনস্কভাবে দীপকদা বুঝি অ্যাকসিলারেটারে একটু জোরে চাপ দিয়ে ফেলেছিলেন, হঠাৎ দেখি মোড়ের মাথায় আলো জ্বেলে পুলিশের গাড়ি অপেক্ষা করছে আর আমাদের থামতে ইঙ্গিত করছে।

থামতে আমরা বাধ্য। বুক দুপদুপ করছে। সবাইকে জেলে পাঠাবে? দীপকদার লাইসেন্স কেড়ে নেবে?

পুলিশ অফিসারটি বলল, তোমরা বাষট্টি মাইল স্পিডে গাড়ি চালাচ্ছিলে।

দীপকদা কাঁচুমাচু মুখ করে বললেন, হয়তো!

পুলিশটি বলল, হয় তো নয়, সত্যি!

তারপর গাড়ির মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখল আমাদের। খুব সম্ভবত ভারতীয় নারীদের দেখেই মন গলে গেল তার। সে বলল, ঠিক আছে এই তোমাদের ফার্স্ট ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দিলুম, আর এরকম কোরো না!

।। ১৫ ।।

গায়ে যদি জামা না থাকে
পায়ে যদি জুতো না থাকে
তা হলে কেউ খাবারও দেবে না!

প্রথম একটি দোকানের দরজার বাইরে এরকম লেখা দেখে অবাক হয়েছিলুম। এর মানে কী? তাহলে আমাদের ঢুকতে দেবে তো?

কলকাতায় যেমন প্যান্ট-হাওয়াই শার্ট আর চটি পড়ে ঘুরে বেড়াই, এদেশে এসে এখনও সেই বেশ পরিবর্তনের কোনও প্রয়োজন বোধ করিনি। আমি টাই পরেছিলুম জীবনে মাত্র একবারই। বন্ধুদের কাছ থেকে গিঁট বাঁধা শিখে নিয়ে একদিন তো টাই পরে আয়নার সামনে দাঁড়ালুম। তারপর সাংঘাতিক চমকে উঠলুম। এ কে? আমার মনে হল, আমি যেন আমার বাবা-মায়ের ছেলেই নয়, অন্য কেউ, মারামারির সিনেমায় খলনায়কের শাগরেদ! সেই যে টাই খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলুম, আর জীবনে ছুঁইনি। কত লোককে টাই পরলে কী সুন্দর দেখায়, শুধু আমাকেই কিনা অন্য লোকের মতন, তাও আসল খলনায়ক নয়, তার শাগরেদের মতন।

টাই পরতে পারি না বলেই নিজের দেশে আমার ভদ্রগোছের কোনও চাকরিও জুটল না। খোদ ইংল্যান্ডেও বোধহয় এখন অনেক ছেলে গলায় টাই না বেঁধে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যায়, কিন্তু ভারতবর্ষে তা হওয়ার উপায় নেই। মৃণাল সেন একটা সিনেমায় এ ব্যাপার খুব ভালো দেখিয়েছেন!

আমি পারতপক্ষে মোজা আর শু-ও পরতে চাই না, চটি দিয়েই কাজ চালাই। অবশ্য তেমন ঠান্ডার জায়গায় গেলে পরতেই হয়।

আমাদের সঙ্গের শিবাজি রায় নামের যুবকটি বিলেত-আমেরিকায় আসবে বলে দামি নতুন বুটজুতো কিনে এনেছে। আর একেবারে নতুন জুতো আনলে যা হয় তাই হয়েছে, দুই গোড়ালিতে বিরাট ফোস্কা। তাকে তো চটিজুতো পরতেই হচ্ছে, তা ছাড়া গোড়ালিতে ব্যান্ডেজ।

সুতরাং দোকানের বাইরে যখন লেখা দেখি, 'নো শার্ট, নো শু, নো সার্ভিস', তখন আমাদের

পা সম্পর্কে সচেতন হতে হয়। শু মানে তো আর চটিজুতো নয়। দেখাই যাক না কী হয়, এই ভেবে ঢুকে পড়া গেল। কেউ কোন আপত্তি করল না, কেউ আমাদের পায়ের দিকে তাকালও না।

তা হলে 'নো শু' মানে খালি পা। 'নো শার্ট' মানে খালি গা? খালি গায়ে, খালি পায়ে কেউ সাহেবদের দোকানে খেতে আসে? একি আমাদের হরিদাসপুরের চায়ের দোকান? কিন্তু সাহেবদের দেশে সবই সম্ভব। সত্তরের দশকে যখন এই দেশটা হিপিতে ভরে গিয়েছিল, তখন সেই সব ছেলেমেয়েরা প্রথমেই পা থেকে জুতো বর্জন করেছিল, তারপর ছেলেরা খুলে ফেলেছিল গায়ের জামা, এমনকী, প্রথম-প্রথম টপ্‌লেসের যুগে, অনেক মেয়েও উর্ধ্বাঙ্গ কোনও পোশাকে ঢাকত না।

হিপিদের যুগ প্রায় শেষ। খানিকটা সেই ফ্যাশান চলে যাওয়ার জন্য। খানিকটা মরাল মেজরিটি এবং অন্যান্য সংস্থার দমননীতির জন্য। মার্কিন দেশের অভিভাবকশ্রেণি এখন ছেলেমেয়েদের সুপথে আনবার জন্য বদ্ধপরিকর। সেই জন্যই এরকম ব্যবস্থা।

ক্রমশ প্রায় দোকানের বাইরেই এইরকম নোটিশ চোখে পড়ে। বুড়ো সাহেব মেমরা দোকানে ঢোকবার আগে এই নিয়ে ঠাট্টাও করে। বুড়ি হয়তো তার স্বামীকে বলল, ডিয়ার, তুমি জুতো পরে এসেছ তো? বুড়ো বলল, ডার্লিং, তুমি জামা পরে আসতে ভুলে যাওনি তো, চোখে ভালো দেখতে পাচ্ছি না।

ম্যাকডোনাল্ড বা বার্গার কিং জাতীয় ফাস্ট ফুডের দোকানে এরকম নোটিশ চোখে পড়ে না অবশ্য। অনেকক্ষণ গাড়ি চালাবার পর কেউ সেখানে থেমে খালি পায়ে গেঞ্জি গায়ে ঢুকে পড়তে পারে। হিপি না হলেও খুব গরমের সময় অনেক ছেলে খালি গায়েও বেরিয়ে পড়ে।

কিন্তু ছোট-ছোট কিছু সাজানো গোছানো ব্যক্তিগত মালিকানার হোটেলে অনেক রকম মজার নিয়মকানুন। প্রথম দরজা ঠেলে ঢুকলেই একটা ছোট অপেক্ষা করার জায়গা, সেখানে কিছু আসন পাতা, এবং আর একটি নোটিশ, প্লিজ ওয়েইট হিয়ার টু বি সিটেড। অর্থাৎ ভেতরে অনেক খালি টেবিল পড়ে থাকলেও ইচ্ছে মতন যে-কোনওটায় গিয়ে বসা যাবে না। একজন পরিচারিকা এসে জিগ্যেস করবে, আপনারা কজন? কোন ধরনের টেবিল পছন্দ। তারপর সে সঙ্গে করে আমাদের একটি টেবিলে নিয়ে গিয়ে বসাবে।

এইসব ছোট হোটেলেও দাম খুব বেশি লাগে না, কিন্তু এইটুকু বিলাসিতা করা যায় যে মেনিউ কার্ড দেখে অর্ডার দেওয়া যায় ইচ্ছে মতন, বাচ্চাদের জন্য দুধের কথা বলা যায়। একটা খাবারের সঙ্গে আর একটা খাবার মিশিয়ে নতুন কিছু বানিয়ে নেওয়া যায়। এবং অধিকাংশ জায়গাতেই পরিচারিকাদের ব্যবহার বেশ আন্তরিক। অবশ্য আমরা যাকে পরিচারিকা ভাবছি, সে-ই হয়তো মালিক। সে নিজেই অর্ডার নেয়, খাবার বানায়, টেবিলে এনে দিয়ে যায় এবং ক্যাশ কাউন্টারে সে-ই দাম নেয়।

এখানে পরিবেশনের কায়দাটাও অদ্ভুত।

বাংলাদেশের লোকেরা প্রথমে মাছ-মাংস দিয়ে শুরু করে, একেবারে শেষকালে খায় ডাল। ভারতের কোনও কোনও প্রদেশে খাওয়া শুরু হয় মিষ্টি দিয়ে, শেষকালে নোনতা। সেই রকম এখানেও প্রথমেই এনে দেবে কফি। অর্থাৎ ক্ষুধার্ত অবস্থায় খালিপেটে খেতে হবে দু-তিন কাপ কফি। তারপর এনে দেবে স্যালাড। সেটাও শুধু খেতে হবে। স্যালাডের ব্যাপারেও অনেক কায়দা আছে, অর্ডার নেওয়ার সময় পরিচারিকা খুব সিরিয়াস মুখ করে জিজ্ঞাসা করবে, স্যালাডের সঙ্গে আপনি কী ড্রেসিং চান? যেন এর উত্তরের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। কোন স্যালাডের সঙ্গে কোন ড্রেসিং চলে, এটা আপনার জানা দরকার। আপনি চুপ করে থাকলে পরিচারিকা অনেকগুলি ড্রেসিং-এর নাম বলবে। আমরা অনভিজ্ঞ হিসেবে ইতস্তত করলে জয়তীদি আমাদের সাহায্য করবার জন্য বলেন, তোমরা কি এইটা, না ওইটা, না সেইটা চাও? এর মধ্যে একটার ওপর একটু বেশি জোর দেবেন, যাতে, আমরা বুঝতে পারি, ওইটাই এক্ষেত্রে বলা উচিত। আমি অবশ্য দেখেছি, চোখ-কান বুজে 'ফ্রেঞ্চ ড্রেসিং' বললেই সব জায়গায় বেশ কাজ চলে যায়।

স্যালাড নামের তেল মেশানো ঘাস-পাতা খাওয়া শেষ করলে তারপর আসবে আসল মাংস-টাংস।

জয়তীদির মেজদি নিজে সর্বক্ষণ নানান কিছু হারাচ্ছেন বা ভাঙছেন বটে, কিন্তু অন্য কেউ যাতে কোনও রকম নিয়মকানুন না ভাঙে, সে ব্যাপারে খুব সজাগ।

কফি খাওয়ার পর হয়তো আমি ফস করে সিগারেট ধরিয়েছি, অমনি মেজদি বলে উঠলেন, এই গোবিন্দ, তুমি যে এখানে সিগারেট খাচ্ছ—

আমি নিরীহ মুখে জিগ্যেস করলুম, গোবিন্দ কে?

মেজদি বললেন, ও গোবিন্দ নয়, কী যেন, বিশ্বম্ভর! তুমি যে সিগারেট ধরালে—।

আমি আবার বললুম, বিশ্বম্ভর বলেও তো কারুকে দেখতে পাচ্ছি না।

জয়তীদি হাসতে-হাসতে বললেন, মেজদি, তুই কী রে! নীলু এই ছোট্ট নামটা তুই মনে রাখতে পারিস না। যত সব খটকা খটকা নাম...।

মেজদি এতে লজ্জিত না হয়ে বরং অবাক হয়ে বললেন, সত্যি রে, আমার যে কী হয়, কিছুতেই নামটা...জানিস, একদিন আমি বাবাকে দাদা বলে ডেকেছিলুম? দু-তিনবার বলেছি, দাদা শোনো, দাদা শোনো—। বাবা তো অবাক।

দীপকদা বললেন, মেজদি, আপনি আমাকেও একদিন দর্জি বলে ডেকেছিলেন। একবার না তিনবার!

মেজদি এবার প্রতিবাদ করে বললেন, যাঃ, মোটেই আমি দর্জি বলিনি—

দীপকদা বললেন, হ্যাঁ, বলেছেন। আমি প্রতিবাদ না করে চুপ করে ছিলুম, কারণ, আমি তখন বাথরুম পরিষ্কার করছিলুম, আপনি ভাগ্যিস আমায় মেথর বলেননি!

জয়তীদি বললেন, বাথরুম পরিষ্কারের সঙ্গে দর্জির কি সম্পর্ক রে, মেজদি? তুই আমাকে দু-একবার খুকুমা বলে ডেকে ফেলিস, তাব না হয় মানে রয়েছে।

শিবাজি বলল, আমাকে উনি একবার বিপ্লব, আর একবার মহেন্দ্র বলে ডেকেছেন।

প্রিয়া বলল, ছোট্টিমা ওয়ান্‌স অর টোয়াইস আমায় ডেকেছেন পুপ্‌লু! বাঃ। বাঃ।

এমনকী প্রিয়াও বলল, সি ওয়ান্‌স কল্‌ড মি পুঁচকি!

যাক সবারই যখন নতুন নাম হয়েছে, তখন আর ক্ষোভের কোনও কারণ নেই।

অপ্রতিভ ভাবটা কাটাবার জন্য মেজদি বললেন, কিন্তু নীলু যে এখানে সিগারেট ধরাল, ওরা যদি কিছু বলে?

মেজদির দুশ্চিন্তার কারণ হল এই যে, এখানকার হোটেল-রেস্তোরাঁয় যেখানে যেখানে বসে সিগারেট খাওয়া যায় না। এ ব্যাপারে বেশ কড়াকড়ি আছে। সিগারেটের বিরুদ্ধে প্রচুর আন্দোলন চলছে। ব্যক্তি স্বাধীনতার দেশ বলেই আইন করে সিগারেট খাওয়া বন্ধ করা যায় না, তা ছাড়া ব্যবসায়ীদের স্বার্থও আছে নিশ্চয়ই। আমেরিকান পুরুষরা তো ক্যানসারের ভয়ে সিগারেট খাওয়া ছেড়েই দিয়েছে বলতে গেলে, মেয়েরা অবশ্য এখনও অকুতোভয়ে চালিয়ে যাচ্ছে। সিনেমায়, বাসে, ট্রেনে, হোটেলে কয়েকটি মাত্র সিট নির্দিষ্ট করা থাকে, যেখানে ধূমপায়ীরা বসতে পারে শুধু, সে নিয়মভঙ্গ করলে অনেক টাকা জরিমানা হতে পারে।

মেজদিকে আশ্বস্ত করবার জন্য আমি টেবিলের ওপরের অ্যাসট্রেটা দেখিয়ে বললুম, এখানে নিষেধ থাকলে কি এটা রাখত।

আমার থেকে মনোযোগ সরিয়ে মেজদি এবার বললেন, ইস, শিবাজির কিছু খাওয়া হল না।

সত্যি, এই যুবকটিকে নিয়ে আমরা খুব বিপদে পড়েছি।

দেশে সে বাবা-মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করে এসেছে যে গরু কিংবা শুয়োর খাবে না। এই ম্লেচ্ছদের দেশে গরু-শুয়োর বাদ দিয়ে কি চলা সম্ভব? অনেক দোকানে ও ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। কোথাও হয়তো মুরগি পাওয়া যায়, কিন্তু সেই মুরগিও যে গরু বা শুয়োরের চর্বির তেলে ভাজা নয়, তা

হলফ করে বলা যাবে না। তা ছাড়া এদেশের মুরগি অতি বিস্বাদ। ইঞ্জেকশন দিয়ে ফোলানো-ফাঁপানো ঢাউস চেহারার মুরগি, দু-একদিন খাওয়ার পরেই অখাদ্য লাগে। কোথাও-কোথাও মাছ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে যে কোন জাতের মাছ তা কে বলবে! এদেশের প্রায় সবই সমুদ্রের মাছ। আমাদের এই শিবাজির শুধু পুকুরের রুই-কাতলা আর ভেড়ির ভেটকি ছাড়া অন্য কোনও মাছ পছন্দ নয়।

তবে মনের জোর আছে বটে ছেলেটির, অন্য সব কিছু অপছন্দ বলে সে শুধু, আলু ভাজা আর কফি খেয়ে ডিনার সেরে নেয়।

কিন্তু আমরা ভালো-ভালো খাবার খাচ্ছি, আর একজন শুধু আলু ভাজা আর কফি, এ কি সহ্য করা যায়? আমাদের বিবেকের যন্ত্রণা হয়। বিশেষত মেজদি খুবই কাতর হয়ে পড়েন। ঘরের ছেলেকে ঠিকঠাক কীভাবে ঘরে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, সেই নিয়ে আমরা চিন্তা করি।

মাঝে-মাঝে এই রকম খাওয়ার জন্য থামা, আবার পথ চলা। এক একদিনে আমরা সাতশো-আটশো মাইল এগিয়ে যাই। পথে পুলিশের কাছ থেকে আর কোনও বিপদ আসে না। আসলে পুলিশ সম্বন্ধে আমরা যত ভয় পেয়েছিলমু, ততটা কিছু ভয়ের নয়। এদেশের পুলিশ ঠিক ভক্ষক নয়, রক্ষকই বটে।

আইডাহো কিংবা অরিগন রাজ্যে বাইরের ট্যুরিস্ট বেশি আসে না। আমেরিকার নাম ডাকওয়ালা রাজ্যগুলির তুলনায় এরা অপাঙক্তেয়। এখানে বড়-বড় শহর নেই, সেরকম কিছু দ্রষ্টব্য নেই। তবে প্রকৃতির সমারোহ বড় অপূর্ব। কত পাহাড়, বন, নদী আমরা পেরিয়ে যাই। রাস্তার পাশে মাঝে-মাঝে এক-একটা হরিণের ছবি আঁকা বোর্ডে লেখা থাকে ডিয়ার ক্রসিং। মনে হয় ওটা কথার কথা। কিন্তু সত্যি-সত্যি একদিন রাতে আমরা মস্ত শিংওয়ালা একটা হরিণকে হুড়মুড়িয়ে রাস্তা পার হতে দেখলুম। সামনের গাড়ি হর্ন বাজিয়ে পেছনের গাড়িগুলোকে জানিয়ে দেয়, হরিণ যাচ্ছে, দেখো, দেখো, চাপা দিও না যেন!

আমরা সবাই দেখলুম, শুধু মেজদিই দেখতে পেলেন না। চশমা খুঁজে পাননি সেই মুহূর্তে।

আমেরিকায় গ্রাম নেই, সবই ছোট শহর। প্রত্যেকটি শহরে ঢোকবার মুখে লেখা থাকে, সেখানকার জনসংখ্যা কত, সেখানে কী কী পাওয়া যায়। কোনওটার জনসংখ্যা তিনশো উনিশ, কোনওটার দুশো সাতাশি। কোনওটার বা শুধু উনচল্লিশ। এইসব শহরেও কিন্তু একটা ব্যাঙ্ক বা একটা সুপার মার্কেট আছে। নামও কি সুন্দর সুন্দর সেইসব শহরের, বিড়ালের থাবা, শুকনো ঝরনা, বুনো ফুল...এইরকম।

এক জায়গায় আমরা চমকে উঠলাম। সেই শহরটির নাম গোস্ট টাউন। তার জনসংখ্যা সাতাশ। ম্যানড্রেকের গল্পে আমরা সবাই ভূতের শহরের কথা পড়েছি। এই কি সেই? রাস্তার দু'পাশে বাড়ি, কিন্তু পথ একেবারে জনশূন্য। সাতাশজনই তাহলে ভূত!

জিয়া লাফিয়ে উঠল, আমরা এখানে থাকব! আমরা এখানে থাকব!

এমনকী মেজদিরও খুব উৎসাহ!

কিন্তু সবদিক বিবেচনা করে সেখানে থামা হল না। হোটেল নেই, কোনও ভূতের বাড়িতে তো আশ্রয় চাওয়া যায় না?

রাত দশটার পর আমরা হোটেল খুঁজি রাত্রিবাসের জন্য। আমাদের অন্তত দুটো ঘর দরকার, একটি মেয়েদের আর একটি ছেলেদের জন্য। অনেক হোটেলের বাইরে নো ভ্যাকেন্সির আলো জ্বলে। দু-এক জায়গায় দামে পোষায় না। কোথাও বা একটির বেশি ঘর খালি নেই।

দ্বিতীয় রাত্রে আমরা রাত প্রায় একটার সময় মনমতন একটি হোটেল পেলুম। একটি উনিশকুড়ি বছরের মেয়ে একলা কাউন্টারে জেগে বসে আছে। সম্ভবত কোনও কলেজের মেয়ে, রাত্রে চাকরি করে। এ-দেশের মেয়েদের এই সাহস আর কাজ করার ক্ষমতা দেখে সত্যিই মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না।

মনোমতন ঘর পাওয়া গেল। মেয়েটি নিজেই এসে ঘর খুলে সাজিয়ে দিয়ে গেল বিছানাটিছানা।

জামাকাপড় ছেড়ে সবে আমরা সুস্থ হয়ে বসেছি, শিবাজি তার অভ্যাস মতন রঙিন টিভির চ্যানেল ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে কোনও ওয়েস্টার্ন ফিল্ম খুঁজছে, এমন সময় বাইরে পরপর দুবার গুলির শব্দ হল।

আমরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকালুম।

দীপকদা বললেন, যাই হোক না কেন, দরজা খুলে বাইরে যাওয়ার কোনও দরকার নেই।

।। ১৬ ।।

গভীর রাতে দু-বার গুলির শব্দ ও কিছু লোকের পায়ের আওয়াজ শুনেও আমরা বাইরে আসিনি। নিজের দেশ হলে অন্তত জানলার খড়খড়ি তুলে উঁকি মারতুম, কার কী হল জানবার চেষ্টা করতুম। এখানে সব সময় এই কথাটা মনে থাকে, এটা আমার দেশ নয়, এখানে কোনওরকম ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার দরকার নেই। বেশি কৌতূহল থাকাও ভালো নয়।

ঘুম ভাঙার পর প্রথম দরজা খুলে বাইরে এসে মনে হয়, সব কিছুই ছিল রাত্রির দুঃস্বপ্ন। কী সুন্দর, কী শান্ত এই সকাল, আকাশ কী পরিচ্ছন্ন নীল, অদূরেই নিবিড় সবুজ গাছপালা, মনে হয় একটু হেঁটে গেলেই দেখতে পাব, ঘাসের ওপর ছড়িয়ে আছে শিউলি ফুল।

মোটেলটিতে প্রায় পঞ্চাশটি ঘর, এর চত্বরে প্রায় গোটা চল্লিশেক গাড়ি। আগেকার দিনের সরাইখানার চত্বরে এরকমই গাড়ির বদলে ঘোড়া বাঁধা থাকত।

অধিকাংশ ঘরেরই দরজা জানলা বন্ধ, যাত্রীদের এখনও ঘুম ভাঙেনি।

কাল রাত্তিরে লক্ষ করিনি, আজ দেখলুম, ঘরের বাইরে একটা নোটিশ আছে, 'অনুগ্রহ করে শয়নকক্ষে মাছ রাখবেন না।'

স্বভাবতই অবাক হলুম। এ আবার কী ব্যাপার? এখানে কি শুধু বাঙালিদের আড্ডা নাকি? নইলে এমন মৎস্য-প্রীতি আর কার হবে?

দীপকদা বুঝিয়ে দিলেন যে, কাছাকাছি নিশ্চয়ই কোথাও মাছ ধরার বিখ্যাত জায়গা আছে। মৎস্য শিকারিরা সন্ধ্যের পর ক্লান্ত হয়ে ফিরে মাছ আর বঁড়শি-টঁড়শি ঘরেই রেখে শুয়ে পড়ে। তাতে ঘরের মধ্যে আঁশটে গন্ধ হয়ে যায়।

শিবাজি বলল, কাল রাত্তিরেই আমি বলেছিলুম না যে মাছের গন্ধ পাচ্ছি?

তা সে বলেছিল বটে। কিন্তু আমরা পাত্তা দিইনি। আমরা ভেবেছিলুম, অনেকদিন ও মাছ খায়নি বলে মনের দুঃখে মাছের গন্ধ কল্পনা করেছে।

এখানে মাছ ধরার ব্যাপারটা অদ্ভুত। অনেকেরই মাছ ধরার নেশা বটে, কিন্তু ধরলেও অনেকেই সে মাছ খায় না। শুধু ধরাতেই আনন্দ। কিছু সরকারি নিয়মেরও কড়াকড়ি আছে। এক পাউন্ড ওজনের কম কোনও মাছ কেউ ধরলেও সেটা আবার জলে ছেড়ে দিতে হবে। ছিপ ফেলে পুঁটি কিংবা মৌরলা মাছ ধরার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারে না।

হায়, ধনে-জিরে-কাঁচা লঙ্কা দিয়ে কুচো মাছের ঝোলের যে কী অপূর্ব স্বাদ, তা এরা কোনওদিন জানল না।

আমাদের চা তেষ্টা পেয়েছে। মোটেলে আমরা যে সুইট নিয়েছি, তাতেই রান্নার ব্যবস্থা আছে বটে কিন্তু আমাদের সঙ্গে কোনও সরঞ্জাম নেই। তবে সব হোটেলের কাছাকাছিই বা সংলগ্ন রেস্তোরাঁ থাকে।

দোকানটি ছোট। তবে বাইরে লেখা আছে 'মাইক্রোওয়েভ ইজ অন'। অর্থাৎ চটপট গরম খাবার পাওয়া যাবে।

বিলেত-আমেরিকার খুব আধুনিক যন্ত্রপাতিও আমাদের দেশের ধনীদের কাছে খুব তাড়াতাড়ি চলে আসে। মাইক্রোওয়েভ উনুনও এসে পড়েছে কি না জানি না, তবে আমি কোথাও দেখিনি। এ দেশে এখন মাইক্রোওয়েভ-এর ধুম চলছে!

বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটি আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না, তবে ব্যাপারটা মোটামুটি এই রকম। একটা চৌকো কাচের বাক্সের মতন উনুন। এতদিন পর্যন্ত যত রকম উনুনেই আমরা রান্না করেছি, তা সে কয়লা-গ্যাস-ইলেকট্রিক যাই হোক না কেন, তার উত্তাপ আসে শুধু তলা থেকে। কিন্তু মাইক্রোওয়েভ উনুনে উত্তাপ আসে তলা-ওপর ডানপাশ বাঁ-পাশ অর্থাৎ সব দিক থেকে। সুতরাং বেগুন ভাজতে গেলে যেরকম বারবার ওলটাতে হয়, কিংবা মাংস চাপিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয় অনেকবার, এতে তার কিছু দরকার হচ্ছে না। চার পাশ দিয়ে উত্তাপ আসছে বলে রান্নাও হয়ে যাচ্ছে, খুব তাড়াতাড়ি। বিভিন্ন পদের রান্নার জন্য উত্তাপ কম-বেশি করার ব্যবস্থা তো আছেই।

দোকানে-দোকানে এই জিনিসের খুবই চল হয়ে গেলেও সবাই বাড়িতে এখনও মাইক্রোওয়েভ-উনুন কেনেনি। আমাদের কলকাতায় যখন প্রথম গ্যাসের উনুন চালু হয়, তখন অনেকে বলেছিল, গ্যাসের রান্না খেলে পেটেও গ্যাস হবে। গত শতাব্দীতে কাঠের জ্বালের বদলে কয়লা চালু হওয়ার সময় অনেকে বলেছিল, কয়লার রান্না হজম হয় না। এখনও অনেকে মাইক্রোওয়েভ সম্পর্কে এই রকম কথাই বলছে। মানুষের স্বভাব বিশেষ বদলায়নি তা হলে।

দোকানটিতে প্রথম খরিদ্দার হিসেবে ঢুকলুম আমরা সদলবলে। একটি সোনালি-চুল মহিলা সহাস্যে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। ঘরটা টাটকা কফির সুগন্ধে মদির।

দোকানটির নাম সিডার কাফে। জায়গাটির নাম সিডার সিটি। শহর মানে নিশ্চয়ই আড়াইশো-তিনশো নাগরিক, কারণ এখানে ইতস্তত ছড়ানো কয়েকটি বাড়ি ছাড়া শহরের আর কোনও চিহ্ন দেখতে পাইনি। একটু পরেই এখানে একটা দৃশ্য দেখে আমি চমৎকৃত হয়েছিলুম।

মেনিউ দেখে আমরা খাবারের অর্ডার দিলুম। জিয়া আর প্রিয়াকে নিয়ে কোনও সমস্যা নেই, ওরা এদেশে জন্মেছে, কোন দিন সকালে মন ভালো করবার জন্য ঠিক কোন রকম খাবার দরকার, তা ওরা জানে। ঝটপট নিজেদের পছন্দ জানিয়ে দেয়। আর শিবাজির কোনও খাবারই পছন্দ হবে না বলে তাকে নির্বাচনের কোনও সুযোগই দেওয়া হয় না। জয়তীদিই কার্ডে চোখ বুলিয়ে বলে দেন, শিবাজি, তুমি এগ্-স্যান্ডুইচ খাও, তা ছাড়া তোমার কিছু নেই।

কোনওরকম ভোট না নিয়েই জয়তীদি আমাদের দলের নেত্রী হয়ে গেছেন। আমরা যাতে গয়ংগচ্ছ ভাব না দেখিয়ে তাড়াতাড়ি আবার পথে বেরিয়ে পড়তে পারি, সেই জন্য আমাদের তাড়া দেওয়ার ভার তাঁর ওপর। সেই জন্য আমাদের চোখের দিকে তাকিয়ে তিনি বলতে লাগলেন, তোমরা কে কী নেবে, চটপট বলো, চটপট...।

সবচেয়ে মুশকিল মেজদিকে নিয়ে। কিছুতেই উনি মন ঠিক করতে পারেন না। সসেজ বা হটডগের মতন সাধারণ খাবার ওঁর পছন্দ নয়, উনি চান নতুন-নতুন নাম। কালকেই উনি বেশ কায়দায় স্প্যানিশ নাম দেখে একটা অর্ডার দিয়েছিলেন, আসলে দেখা গেল সেটা কাবলিছোলার মিষ্টি ঘুঘনি। অখাদ্য!

আজও তিনি একটা ফ্রেঞ্চ নামের খাবার চাইলেন। আমরা কফি দিয়ে প্রাথমিক পর্ব শুরু করলুম।

ঠিক এই সময় কাচের দরজা ঠেলে ঢুকল দুটি ছেলে আর দুটি মেয়ে। ওরা এসে বসল ঠিক আমাদের পাশের টেবিলে।

প্রথম দর্শনেই কেমন যেন চেনা-চেনা লাগল ওদের। এমনিতে সাহেব মেমদের মতোই চেহারা ও পোশাক, কিন্তু মাথার চুল যেন বেশি কালো, একটি মেয়ের মাথায় লম্বা চুল, একটি ছেলের মাথায় বাবরি। ওদের ধরনধারণ দেখে আর একটা ব্যাপারও মনে হয়, ওরা ঠিক আমাদের মতন ভ্রমণকারী নয়, কাছাকাছি কোনও জায়গা থেকে এসেছে চা-জলখাবার খেতে।

জয়তীদি ওদের দিকে মৃদু ইঙ্গিত করে আমাদের বললেন, ওরা লাল ভারতীয়।

শিবাজী উত্তেজিত ভাবে বলল, রেড ইন্ডিয়ানস্?

জয়তীদি ধমক দিয়ে বললেন, আস্তে! বাংলায় কথা বলো। ওদের শোনাবার কী দরকার।

আমরা আড় চোখে বারবার ওদের দেখতে লাগলুম। রেড ইন্ডিয়ান শুনলে রোমাঞ্চ হয়ই।

হলিউডের কল্যাণে ওদের সাংঘাতিক সব মারামারির ছবি আমরা কত দেখেছি। এখনও সিনেমায় মাথায় পালকের টুপি আর মুখে লাল রং মাখা দুর্ধর্ষ ইন্ডিয়ানদের দেখতে পাই বটে, কিন্তু বাস্তবে ওদের সে রকম অস্তিত্ব নেই। আসল রেড ইন্ডিয়ানদের মেরে-মেরে প্রায় নিঃশেষই করে ফেলা হয়েছে। এক সময় এই কথাটা খুব চালু ছিল ঃ একজন ভালো ইন্ডিয়ান হচ্ছে একজন মৃত ইন্ডিয়ান! মুষ্টিমেয় যারা বেঁচে ছিল, এই কিছুদিন আগে পর্যন্তও তাদের আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় এনক্লেভে ঘিরে রাখা হত, অনেকটা খোঁয়াড়ের জানোয়ারের মতন। এখন অবশ্য ততটা বাধা নিষেধ নেই। ওদের ছেলেমেয়েরাও ইস্কুলে গিয়ে লেখাপড়া করে, মূল জনজীবনের সঙ্গে মিশে গেছে। দেশের ব্যাপারে ওদের কোনও ভূমিকাই নেই। সিনেমায় এক্সটার পার্ট করবার সময় ওরা অনেকে মাথায় পালকের টুপিফুপি পরে নেয়।

ভারতীয় হিসেবে অবশ্য, আমাদের চেয়ে ওরা অনেক বেশি বিখ্যাত। আমরাই শুধু ওদের রেড ইন্ডিয়ান বলি, কিন্তু বাকি পৃথিবী ওদের জানে শুধু ইন্ডিয়ান হিসেবে। উচ্চারণটা অনেকটা ইনজান্-এর মতন। অসংখ্য গল্পের বইতে, কমিক স্ট্রিপে ওই ইন্ডিয়ানদের কথাই থাকে। ইওরোপ-আমেরিকার শিশু-কিশোররা জানেই না যে ওই ইন্ডিয়ান ছাড়া আর কোনও ইন্ডিয়ান আছে। অনেক জায়গাতে আমি নিজেই দেখেছি, আমি ইন্ডিয়ান শুনে অনেক ছোট ছেলে-মেয়ে আমার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়েছে।

আমিও এই প্রথম 'লাল ভারতীয়' চাক্ষুষ দেখলুম, ওরা নিজেদের মধ্যে মগ্নভাবে মৃদু স্বরে গল্প করছে।

লুই লামুর নামে একজন মারামারির গল্পের লেখকের খুব ভক্ত আমাদের শিবাজি। ওই সব বই পড়ার ফলে লাল ভারতীয়দের বিষয়ে তার অনেক জ্ঞান। সে বলল, এই দেশটা তো ওদেরই ছিল, সাদা চামড়ারা জোর করে ছিনিয়ে নিয়েছে...।

অধিকাংশ বাঙালির মতনই শিবাজিরও আবেগের সময় বাংলার বদলে অনর্গল ইংরিজি কথা এসে যায়। সেই জন্য বারবার সে জয়তীদির কাছে ধমক খায়।

এরপর, নাটকের ঠিক দ্বিতীয় দৃশ্যের মতনই দরজা ঠেলে ঢুকল আর একটি দল। এই দলে নারী নেই, তিনজন পুরুষ ও একজন কিশোর।

ওদের দেখে আমি দারুণ চমকে উঠলুম। এও কি সম্ভব? ওদের একজন তো জন ওয়েন! সেই রকম লম্বা চওড়া, সেই বৃষস্কন্ধ, সেই মুখে একটু অবহেলার হাসি। পোশাকও অবিকল। মাথায় স্টেট্‌সান, কোমরে চওড়া বেল্ট, দুদিকে দুই রিভলভার। এক্ষুনি দু-হাতে দুটো রিভলভার তুলে নিয়ে দুমদুম শুরু হয়ে যাবে। কত ছবিতে জন ওয়েনকে এরকম দেখেছি।

তারপর মনে পড়ল, জন ওয়েন তো বেঁচে নেই। কিছুদিন আগে ক্যানসারে মারা গেছেন। তাহলে কি কেউ ইচ্ছে করে জন ওয়েন সেজেছে? পাশের লোক দুটোও চেনা-চেনা, একজন রবার্ট ডি নিরো আর একজন ক্লিন্ট্ ইস্টউড নয়? প্রত্যেকেই সশস্ত্র, কিশোরটির হাতে একটা রাইফেল। চকচকে খাঁকি প্যান্ট আর সাদা গেঞ্জি পরা সবাই।

প্রথমে ভাবলুম, এখানে কি সিনেমার কোনও শুটিং হবে? আমরা ভুল করে ঢুকে পড়েছি?

আমি ফিসফিস করে জয়তীদিকে জিগ্যেস করলুম, এদের মধ্যে কি কেউ সিনেমার...

জয়তীদি হেসে বললেন, যাঃ!

তবু আমার মনে হল, এরা যেন অতীতের একটা পৃষ্ঠা থেকে উঠে এসেছে। এরকম অস্ত্রধারী আমেরিকানদের তো রাস্তা ঘাটে চলাফেরা করতে আগে কখনও দেখিনি। এরা পুলিশও নয়, কারণ পুলিশ সাদা গেঞ্জি পরে রাস্তায় বেরুবে না। আর তিনজনের সঙ্গেই জন ওয়েন, রবার্ট ডি নিরো আর ক্লিন্ট ইস্টউডের কী আশ্চর্য সাদৃশ্য!

জন ওয়েন প্রথমে ঘাড় ঘুরিয়ে দুই টেবিলের দুরকম ভারতীয়দের দেখলেন। তারপর কিশোরটির,

দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, হোয়াট উইল য়ু হ্যাভ, সন্?

ঠিক সেই রকম গলা, আর এইরকম সংলাপও আমি জন ওয়েন-এর অনেক ছবিতে শুনেছি। নিজের ছেলেকে 'সন্' বলে সম্বোধনটা আমার বেশ ভালো লাগে। বাংলায় আমরা এরকম বলি না। অবশ্য সংস্কৃতে 'বৎস' ছিল।

দীপকদা বললেন, কাছাকাছি বোধহয় শিকারের জায়গা আছে। কাল রাত্তিরে আমরা নিশ্চয়ই শিকারের গুলির শব্দই শুনেছিলুম।

আমি অবশ্য কথাটা খুব একটা বিশ্বাস করতে পারলুম না। কোমরে পিস্তল গুঁজে কেউ শিকারে যায়? এদের তিনজনেরই চেহারা ওয়েস্টার্ন ছবির নায়কের মতন। এমনও তো হতে পারে, কোনও কারণে এই জায়গাটা গত শতাব্দীতে রয়ে গেছে। এই তিনজন আউট ল এসেছে এই শহর দখল করতে, এখুনি এসে পড়বে গ্যারি কুপার কিংবা বার্ট ল্যাঙ্কাস্টারের মতন চেহারার কোনও শেরিফ, তারপর শুরু হয়ে যাবে ডিসুম ডিসুম্!

ক্লিন্ট ইস্টউডের দেখা গেল ভারতীয় মেয়েদের খুব পছন্দ। সে প্রায়ই ত্যারচা চোখে চাইছে জয়তীদির ও মেজদির দিকে। রবার্ট ডি নিরো মনোযোগ দিয়েছে এক প্লেট সসেজে। জন ওয়েন এক আঙুলে টেবিলে টকটক করে কী যেন বাজনা বাজাচ্ছে। আর কিশোরটি তার রাইফেলটি একবার নিজের ডান পাশ আবার বাঁ-পাশে রাখছে।

'লাল ভারতীয়'দের টেবিল থেকে একটি তরুণী মেয়ে উঠে দাঁড়াল। আমাদের ডিঙিয়ে সে ফিল্মের নায়কদের টেবিলটার দিকে চাইল, সে দৃষ্টিতে কী রাগ না বিদ্রূপ না ঘৃণা? মেয়েটি কি ভাবছে, এই লোকগুলোই আমাদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে, ওদের জন্যই আমরা নিজের দেশে পরবাসী। এইবার কি শুরু হবে লড়াই? 'লাল ভারতীয়'-দের কাছেও নিশ্চয়ই লুকানো অস্ত্র আছে। মেয়েটি ওরকম উঠে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে কেন? এবার ও কোনও গালাগালি দেবে?

মেয়েটি বলল, হাই এড্!

রবার্ট ডি নিরো খাওয়া থেকে মুখ তুলে মেয়েটিকে দেখলেন। তাঁর মুখ ভরে গেল ঝলঝলে হাসিতে। চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, হাই জোয়ি। হাউ হ্যাভ য়ু বিন!

সে প্রায় দৌড়ে গিয়ে মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে ফটাফট চুমু খেল তার দুই গালে। মেয়েটির সঙ্গীরা উঠে দাঁড়িয়ে হাত ঝাঁকাল ওর সঙ্গে। তারপর রবার্ট ডি নিরো ওদের নিয়ে এল নিজের টেবিলে অন্যদের সঙ্গে পরিচয় করাবার জন্য। জন ওয়েন মেয়ে দুটির গালে পিতার মতন স্নেহে চুম্বন ছোঁয়ালেন।

তারপর কী একটা কথায় সবাই মিলে এক সঙ্গে হেসে উঠল।

।। ১৭ ।।

আমরা চলেছি একটার পর একটা পাহাড় ডিঙিয়ে, উপত্যকার মাঝখান দিয়ে। প্রশান্ত মহাসাগরের ধারে-ধারে কোস্ট রেঞ্জ, অন্যদিকে কাস্কেড রেঞ্জ আর সিয়েরা নেভাডা পর্বতমালা, এর মাঝখানের উপত্যকাতেই প্রধান জনবসতি।

প্রকৃতি এখানে খুবই উদার আর উন্মুক্ত। আমরা এখানে সমুদ্র দেখিনি বটে কিন্তু মাঝে-মাঝে এক একটা হ্রদ দেখেই সমুদ্র বলে ভ্রম হয়। আর সেই সব হ্রদের নামও কত মজার, গুজ্ লেক, ক্লিয়ার লেক, হনি লেক, পিরামিড লেক, মোজেজ লেক ইত্যাদি। এক সময় এখানে আগ্নেয়গিরিও ছিল, কারণ একটি বিশাল হ্রদের নাম ক্রেটার লেক।

মাঝে-মাঝেই পার হতে হয় নদী। কিন্তু নদীগুলোর নাম জানতে না পারলে বড় অস্বস্তি লাগে। একটা নদীর বুকের ওপর দিয়ে বেয়াদপের মতন গাড়ি চালিয়ে চলে গেলুম, সেই নদীটির নামও জানলুম না, তাকে কোনও ধন্যবাদও দিলুম না, এ বড় অন্যায়। এর মধ্যে একটা নদীর নাম পেলুম

স্নেক। আর বিশাল কলমবিয়া নদীকে চিনতেও কোনও ভুল হওয়ার কথা নয়। পাস্‌কো নামের জায়গাটা ছাড়িয়ে কলমবিয়া নদীর তীরে আমরা একটু থামলুম। আর কোনও কারণে নয়, সেই নদীকে একটু সম্মান জানাবার জন্য।

প্রকৃতির সুন্দর জায়গাগুলিকে এরা আরও বেশি আকর্ষণীয় করে রাখে। কত রকম থাকবার জায়গা আর নানান যানবাহনের সুযোগ। দশ-পনেরো মাইল দূর থেকেই অনেক রকম প্রলুব্ধকর বিজ্ঞপ্তি। এই রকম রয়েছে অনেকগুলি ন্যাশনাল পার্ক আর ঝরনা আর পার্বত্য নিবাসের খবর।

চিলকুইন নামে একটা চমৎকার জায়গায় আমরা মধ্যাহ্নভোজ সেরে আবার যাত্রা শুরু করতেই ক্ল্যাম্যাথ ফল্‌সের অনেক রকম নিশানা দেখা যেতে লাগল পথের পাশে। এটা বেশ নাম করা জলপ্রপাত, ওই নামে, একটা মস্ত বড় হ্রদও আছে। এমন নিবিড় জঙ্গল ঘেরা পথ যে ওই দিকে মন টানে।

দীপকদা জিগ্যেস করলেন, যাবে নাকি ক্ল্যামাথ ফল্‌সে? তবে ওখানে একদিন থাকতে হবে, সব দেখতে অনেক সময় লাগবে।

আমরা সবাই রাজি, কিন্তু একটা ছোট অসুবিধে দেখা দিল। জিয়া আর প্রিয়া নাম্নী বালিকাদুটিকে ডিজ্‌নিল্যান্ড দেখাবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, ওরা সে জন্য অধৈর্য হয়ে উঠেছে। পুরো দুটো দিন কেটে গেছে গাড়িতে, ওই বয়সে সর্বক্ষণ গাড়ির মধ্যে চুপচাপ ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে কেনই বা ভালো লাগবে?

সুতরাং আমরা ঠিক করলুম, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্যালিফোর্নিয়ায় ঢুকে পড়াই ভালো।

আজ শনিবার, তাই পথে গাড়ির ভিড় অনেক বেশি। অনেক গাড়ির মাথায় তাঁবু কিংবা নৌকো চাপানো। কেউ-কেউ গাড়ির সঙ্গে টেনে নিয়ে চলেছে একটা ট্রেলার, অর্থাৎ নিজের শয়নকক্ষটি সঙ্গে নিয়েই বেড়াতে বেরিয়েছে। যেটা অদ্ভুত লাগে, সেটা হল বেশিরভাগ গাড়িই চালাচ্ছে কোনও নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ কিংবা বৃদ্ধা, এরা একলা একলা বেড়াতে যায়, কোনও সঙ্গী জোটেনি। কোনও কোনও গাড়িতে রয়েছে শুধু দুটি বা তিনটি মেয়ে, তাদের কোনও পুরুষ বন্ধু নেই।

ইচ্ছে করেই কি না কে জানে, দীপকদা পথ ভুল করে চলে এলেন ক্ল্যামাথ ফসলের কাছাকাছি। জিয়া আর প্রিয়া ঠিক বুঝতে পেরে আপত্তি জানাল। এত কম বয়েসে নিছক প্রকৃতি মন টানে না। আমরা ক্ল্যামাথ হ্রদের এক পাশে এক চক্কর মেরে আবার অন্য পথ ধরলুম।

পাহাড় থেকে রাস্তা নেমে এল সমতলে। বনরাজিও বিরল হয়ে এল ক্রমশ। জায়গাটার নাম উইড়। নামের সঙ্গে খুব মিল আছে পরিবেশের। দুপাশে খয়েরি রঙের আগাছা শুধু, এই রকমই মাইলের পর মাইল। রীতিমতন এক ঘেয়ে। এইরকম জায়গা দিয়ে যেতে-যেতে ঘুম পেয়ে যায়। শুধু দীপকদার ঘুমোবার উপায় নেই, সারা পথ ওঁকে একাই গাড়ি চালাতে হচ্ছে। যেমন খাওয়া, সেইরকম ঘুম সম্পর্কেও বিশেষ আগ্রহ নেই দীপকদার। সারাদিনের এত ধকলের পর রাত্রে যেখানে আমরা থাকি, সেখানে পৌঁছেও দীপকদা ঘুমের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন না। তখন হাত-পা ছড়িয়ে অন্তত ঘণ্টা দুয়েক আড্ডা না দিলে তাঁর চলে না।

জয়তীদি হঠাৎ বলে উঠলেন, ওই দ্যাখো শাস্তা!

আমরা চমকে উঠলুম। শাস্তা, তার মানে মাউন্ট শাস্তা, তা হলে তো আমরা ক্যালিফোর্নিয়ায় ঢুকে পড়েছি।

আমি জিগ্যেস করলুম, ক্যালিফোর্নিয়ার চেকপোস্ট পড়ল না? কোনও ঝঞ্ঝাট হল না?

আমরা আসবার পথেই বারবার শুনে আসছিলুম, ক্যালিফোর্নিয়ার চেকপোস্টে নাকি অনেক ঝঞ্ঝাট হবে। বাক্স-প্যাঁটরা সব খুলে দেখবে।

কিছুদিন ধরেই কাগজে পত্রে খবরের নায়ক হয়েছে ভূমধ্যসাগরের মাছি, যার সংক্ষিপ্ত না মেড-ফ্লাই। ভূমধ্যসাগর থেকে নাকি এক ঝাঁক দুষ্টপ্রকৃতির মাছি উড়ে এসে এখানকার সব ফল বিষাক্ত করে দিয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যটিরই আর এক নাম অরেঞ্জ স্টেট। এখানকার আঙুর খুব

বিখ্যাত। ক্যালিফোর্নিয়ার ওয়াইন এখন ফরাসি ওয়াইনের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। সুতরাং ওই মাছির উপদ্রবে হইহই পড়ে গেছে এখানে, মাছি দমন করার কতরকম প্রস্তাবই শোনা যাচ্ছে। এমনকী বিখ্যাত কলামনিস্ট আর্ট বুখওয়াল্ডও এক দারুণ মজার রচনা লিখে ফেলেছেন এই মাছি বিষয়ে। যাই হোক, এইসব কারণেই, বাইরের কোনও রাজ্য থেকে আর কোনওরকম বিষাক্ত ফল যাতে এখানে না ঢুকতে পারে, সেই জন্য সীমান্তে খুব কড়াকড়ি চলছে। আমাদের সঙ্গে যে কলা আর আপেল ছিল, তা সব শেষ করে ফেলতে হয়েছে সকালেই। মেজদি বারবার আমাদের বলছিলেন, কলা খাও। কলা খাও, শিগগির।

জয়তীদি বললেন, চেক পোস্ট তো কখন পেরিয়ে এসেছি, তোমরা তখন ঘুমোচ্ছিলে।

—বাক্সটাক্স খোলেনি!

—নাঃ! আমি বললুম আমাদের সঙ্গে ফল টল কিছু নেই, তাই শুনেই ছেড়ে দিল।

আমি বললুম, দেখা যাচ্ছে সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র!

জয়তীদি এমন একটা ভ্রূভঙ্গি করলেন, যার অর্থ, ছেলেমানুষ হয়ে আর অত পাকামি করতে হবে না!

দীপকদা বললেন, দ্যাখো, এবার মাউন্ট শাস্তা খুব ভালো করে দেখা যাচ্ছে।

মাউন্ট শাস্তার চূড়াটি সত্যি বড় সুন্দর। ঠিক মনে হয়, একটা সাদা রঙের টুপি পরে আছে। এই পাহাড়টির উচ্চতা চোদ্দো হাজার ফিটের চেয়ে সামান্য কিছু বেশি। আমরা হিমালয়ের দেশের লোক, আমাদের কাছে চোদ্দ হাজার ফিটের পাহাড় তো নিছক ছেলেমানুষ।

কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ার এই পাহাড়টির বৈশিষ্ট্য এই যে, এর মাথায় সারাবছর বরফ থাকে, সেইজন্য এই গ্রীষ্মেও এর মাথায় সাদা টুপি।

ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যটিকেই অবশ্য চির বসন্তের দেশ বলা যায়। পাহাড়, জঙ্গল এমনকী এক প্রান্তে মরুভূমি থাকলেও ক্যালিফোর্নিয়ার অধিকাংশ জায়গাতেই সারা বছর বড় মনোরম আবহাওয়া, বেশি গরমও নেই, শীতও নেই। গাছপালাও আমাদের অনেকটা চেনা। দুদিকের দুই রাস্তার মাঝখানে চোখে পড়ে দোপাটি ফুলের গাছ। অজস্র ফুল ফুটে থেকে আপনা-আপনি ঝরে যায়।

রাস্তাটা গেছে মাউন্ট শাস্তার পাশ দিয়ে ঘুরে-ঘুরে। এক-এক জায়গা থেকে পাহাড়টিকে এক-এক রকম দেখায়। কোনও সময় বেশ রোগা, কোনও সময় হৃষ্টপুষ্ট। মাথার টুপিটা কখনও গোল, কখনও মেক্সিকানদের মতন, আবার কখনও গান্ধি টুপির মতন। পাহাড়ের কোলে-কোলে নির্জন সবুজ উপত্যকা দেখলেই আমার মন কেমন করে। যেন এইখানে একটা কুটির বেঁধে আমার থেকে যাওয়ার কথা ছিল। চুপচাপ, অনেক দিন। কিন্তু থাকা হয় না, এই সব জায়গা স্মৃতিতে ছবি হয়ে যায়।

খুব ভালো করে মাউন্ট শাস্তাকে দেখবার জন্য আমরা এক জায়গায় থামলুম। খাড়া পাহাড়ের এক পাশ অনেকখানি ঢালু হয়ে নেমে গেছে, নীচে এক জলাশয়, সেটা নদী, না হ্রদ না কোনও বাঁধ তা বোঝবার উপায় নেই। একেবারে জনশূন্য স্থান, শুধু রয়েছে একটা টেলিফোন বুথ আর একটা ময়লা ফেলার জায়গা। স্থানটির রম্যতার জন্য এখানে অনেকেই গাড়ি থামিয়ে কিছুক্ষণ বসতে চাইবে। খাবারদাবারের প্যাকেট ও টিন যেখানে-সেখানে ফেলে যাতে নোংরা করা না হয়, তার জন্য প্রায়ই নোটিশ থাকে যে যেখানে-সেখানে ওই সব ফেললে পাঁচশো ডলার ফাইন হবে। বিশেষ কেউ তা মানে না অবশ্য। এখানে সেখানে বিয়ারের টিন গড়াতে দেখা যায়।

শুরু হল ছবি তোলার পালা। দীপকদা ছবি তোলার ব্যাপারে একজন শিল্পী, তাঁর ক্যামেরায় নানারকম লেন্স, অনেক ভেবে চিন্তে তিনি একখানা দুখানা ছবি তোলেন মাত্র। কিন্তু এদেশের বাচ্চা ছেলেমেয়েরাও ফটাফট ছবি তুলতে পারে। যেমন জিয়ার আছে পোলারয়েড ক্যামেরা, সে পটপট করে শাটার টিপছে আর অমনি হাতে গরম রঙিন ছবি বেরিয়ে আসছে। এমনকী সাত বছরের মেয়ে প্রিয়াও এই ক্যামেরায় ছবি তুলে ফেলল কয়েকখানা।

জয়তীদি বললেন, বড্ড ভালো লাগছে জায়গাটা, তাই না?

দীপকটা বললেন, বেশি ভালো লাগা ভালো নয়। তা হলে আর উঠতে ইচ্ছে করবে না।

মেজদি বললেন, সত্যিই আমার এ জায়গাটা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না।

আমি একটু দূরে বসেছিলুম। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বললুম, সাপ! সাপ! র‍্যাটল স্নেক।

অমনি একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। প্রথমে সবাই নিরাপদ দূরত্বে চলে যাওয়ার পর আবার কাছে এল। র‍্যাটল স্নেকটিকে দেখা গেল না, আমি পুরোপুরি বানিয়ে বলেছি কিনা তা-ও ঠিক বোঝা গেল না। আমি অবশ্য বারবার বলতে লাগলুম, আমি র‍্যাটল স্নেকটার লেজের দিকের শুকনো হাড়ের খটাখট শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেয়েছি।

যাই হোক, সাপের নাম উচ্চারণ করার পর জায়গাটার মাধুর্য অনেকটা নষ্ট হয়ে এল। অবশ্য বেলাও ঢলে এসেছে, আলো শুষে নিচ্ছে আকাশ। আবার শুরু হল যাত্রা।

গাড়ি চেপে যাওয়ায় যদিও শারীরিক পরিশ্রম কিছুই নেই, তবু খিদে পায় ঘনঘন। মনে হয় খাওয়াটাই এক মাত্র কাজ। অন্ধকার নামবার পরই আমাদের মনের মধ্যে একটা খাইখাই রব ওঠে। আমরা কোন শহরে যাওয়ার জন্য থামব, তা আমরা পছন্দ করতে শুরু করি। ইচ্ছে করলে কোনও বড় শহরের মধ্যেই না ঢুকে হাজার দেড়হাজার মাইল চলে যাওয়া যায়। আবার ইচ্ছে করলেই বাইপাস দিয়ে ঢুকে পড়া যায় যে-কোনও শহরে।

দীপকদার গাড়িতে তেল ফুরিয়ে গেছে, তাই ঢুকে পড়লেন একটা শহরে। শহরটির নাম রেডিং। কস্মিনকালেও এ জায়গাটার নাম আগে শুনিনি, কিন্তু এখানেই আমাদের খাদ্য বরাদ্দ ছিল। গাড়ির খিদে ও আমাদের খিদে এক সঙ্গেই মিটিয়ে নেওয়ার জন্য আমরা এখানে নেমে পড়লুম।

কোন দোকানে খাব, এটা ঠিক করাও একটা খেলার মতন। দোকানের সংখ্যা অনেক, সেই জন্যই পছন্দ করা দুষ্কর। এই রেডিং-এর মতন একটা নাম-না-জানা জায়গাতেও পাশাপাশি অন্তত কুড়ি-পঁচিশটা ভোজনালয়। টিপিটিপি বৃষ্টি পড়ছিল বলে আমরা বেশি বাছাই না করে সামনে একটা চিনে দোকান দেখে ঢুকে পড়লুম। এমনিতেই কলাকাতার মানুষদের চিনে খাবারের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা আছে, এখানে এসে আমরা অনেকদিন ওই খাবার খাইনি।

দোকানটিতে ঢুকে প্রায় তাজ্জব হওয়ার মতন অবস্থা। এই ধাধ্ধাড়া গোবিন্দপুরে এত বড় চিনে হোটেল? মনে করুন বেলমুড়ি কিংবা মানকুণ্ডুর মতন জায়গায় পাঁচশো লোকের এক সঙ্গে খাবারের মতন চিনে রেস্তোরাঁ। কলকাতাতেও এত বড় দোকান আজও হয়নি। অবশ্য ক্যালিফোর্নিয়ায় চিনে অধিবাসীর সংখ্যা অনেক এবং চিনের সঙ্গে বর্তমান আঁতাত হওয়ার আগে থেকেই আমেরিকানরা চিনে খাবারের খুব ভক্ত। তা হলেও এত বড় দোকান দেখে চমকে যেতেই হয়।

দোকানটি তিনটি অংশে ভাগ করা, এর মধ্যে যে-যে অংশে মদ পাওয়া যায়, সেখানে বাচ্চাদের প্রবেশ নিষেধ বলে আমরা বসলুম সর্বসাধারণের এলাকায়। সেখানেও অন্তত পঞ্চাশটি টেবিল, কিন্তু প্রায় সবগুলোই খালি। প্রায় রাজকীয় খাতির পেলুম আমরা। একাধিক পরিচারিকা বারবার আমাদের তদারকি করে গেল। খাবারগুলোও বেশ ভালো, তবে আমাদের কলকাতার মতন নয়। কলকাতার চিনে খাবার সত্যিই অপূর্ব।

বিল মেটাবার সময় আমি যথারীতি পুরোনো কায়দায় পকেটে হাত ঢুকিয়ে, 'আমি দিই, অমি দিই', বলতে থাকি, হাতটা আর পকেট থেকে বেরোয় না, তার মধ্যেই জয়তীদি ধমক দিয়ে বলেন, তুমি ছেলে মানুষ, খবরদার দেবে না...। দীপকদাই দিয়ে দেন টাকাটা। আমি কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি, আপনারা কি আমায় একবারও সুযোগ দেবেন না।

খুচরো ফেরত আসবার সময় প্লেটে সাজিয়ে নিয়ে এল সাতখানা বেশ বড় সাইজের করবী ফুলের বিচি। দেখেই চিনতে পারলুম, ওগুলো হল ফরচুন কুকি। এর আগে অন্য কোনও দোকানে ফরচুন

কুকি দেয়নি। ওগুলো আসলে বিস্কুটে তৈরি, ভাঙলে ভেতরে টুকরো কাগজ পাওয়া যায়, তাতে সেদিনের ভাগ্য লেখা থাকে।

ছোটদের দাবি আগে, তাই প্রিয়া প্রথমে একটা তুলে নিয়ে ভাঙল। তাতে লেখা আছে, *তুমি যা স্বপ্ন দেখবে, তাই সত্যি হবে। আমরা হাততালি দিলুম।* এবার খুলল জিয়া। তার ভাগ্যলিপি ঃ আগামী কালকের *দিনটি* তোমার জীবনের একটা চমৎকার *দিন।* শিবাজি রায় পেল ঃ ঘর ছেড়ে বেশিদিন দূরে থেকো না। মেজদিরটা, যা হারিয়ে যায় তার জন্য দুঃখ করে লাভ নেই, নতুন কিছু শিগগির পেয়ে যাবে। জয়তীদির ঃ খুব তাড়াতাড়ি তুমি একটা সুখবর পাবে।

আমারটা অতি সাধারণ এবং খুব সত্যিও বটে ঃ তোমার বন্ধু ভাগ্য খুব ভালো।

দীপকদা হাসতে-হাসতে বললেন, দ্যাখো, আমি কী পেয়েছি! এ যে সত্যিই ভবিষ্যৎবাণী।

আমরা সবাই দীপকদার কাগজটা দেখলুম ঃ যদি আজ কোথাও যাত্রা শুরু করে থাকো, তা হলে মাঝপথে থেমো না, এগিয়ে চল!

দীপকদা বললেন, তার মানে আমাকে রাত্তিরে থামতে বারণ করছে! তা হলে কি সারা রাত গাড়ি চালাব?

এই নিয়ে একটুক্ষণ বিতর্ক হল। দীপকদার ইচ্ছে সারারাত গাড়ি চালিয়ে যতদূর সম্ভব এগিয়ে যাওয়া। জয়তীদি বললেন তোমার স্ট্রেন হবে। মেজদি বললেন, বাচ্চাদের কষ্ট হবে। বাচ্চারা না না বলে উঠল।

শেষ পর্যন্ত ফরচুন কুকির নির্দেশই মান্য করা হবে ঠিক হল। গাড়ির পেছনের দিকে জিয়া আর প্রিয়ার শোওয়ার জায়গা করে দেওয়া হল। আমরা সারারাত গল্প করতে-করতে যাব। আমাদের ঘুমোলে চলবে না।

শিবাজি গাড়িতে উঠেই ঘোষণা করল ঃ চলন্ত গাড়িতে আমি কক্ষনও ঘুমোই না।

বলেই ঘুমিয়ে পড়ল সঙ্গে-সঙ্গে। তারপর চোখ জুড়িয়ে এল মেজদির। একটু বাদে জয়তীদিরই মাথাটা ঝুঁকে এল বুকের ওপরে।

দীপকদা এক মনে, একরকম স্পিডে গাড়ি চালাচ্ছেন, আমি মাঝে-মাঝে ওঁকে সিগারেট এগিয়ে দিচ্ছি আর বাইরের অন্ধকার দেখছি। রাস্তায় অনেক গাড়ি। দূর পাল্লার যাত্রায় অনেকেই নাইট ড্রাইভিং পছন্দ করে। দুদিকের রাস্তায় এক দিকে উজ্জ্বল হেড লাইটের মিছিল, অন্য দিকে লাল ব্যাক লাইট। এ দেশের গুন্ডামি বদমাইশি খুনোখুনি হচ্ছে অহরহ, কিন্তু সারারাত রাস্তায় গাড়ির মধ্যে থাকায় কোনও বিপদ নেই, এটা আশ্চর্য না?

লেখকদের অনেক সুবিধে। আমি অনায়াসে এর পর লিখতে পারতুম যে পেছনের সিটে অন্যরা সবাই ঘুমোলেও আমি সারারাত বীরের মতন জেগে রইলুম দীপকদার পাশে। কেউ অবিশ্বাস করত না।

কিন্তু আসল ব্যাপার হচ্ছে, হঠাৎ এক গুচ্ছ হাসির শব্দে, আমি চমকে উঠলুম এক সঙ্গে। অন্যরা সবাই অনেক আগে জেগে উঠেছে, শুধু আমিই কাত হয়ে এমন ঘুমোচ্ছিলুম যে অনেক ডাকাডাকিতেও উঠিনি। শেষ পর্যন্ত একজন রুমাল পাকিয়ে আমার কানে সুড়সুড়ি দিতেই...।

বাইরে তাকিয়ে দেখি প্রায় ভোর হয়ে এসেছে।

।। ১৮ ।।

লস এঞ্জেলিস শহরটির ডাক নাম এল এ। এরকম একটা জগঝম্প মার্কা শহর সারা দুনিয়ায় আর আছে কিনা সন্দেহ। এটা একটা শহরই না। অনেকগুলো উপনগরী সুতো দিয়ে জুড়ে-জুড়ে তৈরি হয়েছে এই এল এ।

নিউ ইয়র্ক শহর যেমন ওপর দিকে বাড়ছে, উঁচু হতে-হতে প্রায় আকাশ ছুঁয়ে ফেলেছে, লস এঞ্জেলিস বাড়ছে তেমন লম্বায়। এই শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ইচ্ছে মতন ঘুরে বেড়াবার কথা কল্পনাও করা যায় না। এই শহরে পনেরো-কুড়ি বছর ধরে আছেন এমন নাগরিকরাও যখন তখন এ শহরে রাস্তা হারিয়ে ফেলেন। কারুর বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গেলে, শুধু সে বাড়ির ঠিকানা জানাই যথেষ্ট নয়, নিমন্ত্রণকর্তার কাছ থেকে সে বাড়িতে পৌঁছবার নির্দেশ দু-তিনবার শুনে মুখস্ত করে নিতে হয়। রাত আটটায় নেমন্তন্ন, রাত সাড়ে দশটায় পঞ্চাশ-ষাট মাইল ঘোরাঘুরি করে বিধ্বস্ত চেহারায় অতিথি এসে ঢুকলেন, এটাও আশ্চর্য কিছু নয়।

নিউ ইয়র্কের সঙ্গে লস এঞ্জেলিসের তুলনা এসেই পড়ে বারবার। এই দুই শহরের মধ্যে বেশ একটা রেষারেষির ব্যাপার আছে, ঠাট্টা-ইয়ার্কির সম্পর্কও আছে, অনেকটা আমাদের ঘটি-বাঙালের ঝগড়ার মতন। আমাদের ঘটি বাঙাল, ওদের ইস্ট কোস্ট-ওয়েস্ট কোস্ট। এর মধ্যে পূর্ব উপকূল হল ঘটি আর পশ্চিম উপকূল বাঙাল।

কারণ, পূর্ব উপকূল তুলনামূলকভাবে পুরোনো অর্থাৎ বনেদি, আর পশ্চিম উপকূলের শহর টহর তো সেদিনকার ছোকরা। লস এঞ্জেলিস শহরটার নামের উচ্চারণের মধ্যেই যেন আছে টাকার ঝনঝনানি, যদিও নিউ ইয়র্ক শহরেই আছে সেই বিখ্যাত ওয়াল স্ট্রিট, যেখানে চলে ক্যাপিটালিস্ট দুনিয়ার সব বড়-বড় ধন-দৈত্যদের ফাটকা।

সবচেয়ে মজার কথা শুনেছিলুম টেলিভিশনে একটি 'সাবান নাটকে'। (সাবান নাটকের ব্যাপারটা পরে বিস্তৃতভাবে বলা যাবে এখন) সেই নাটকের এক নায়ক (এই সব নাটকে অনেক নায়ক-নায়িকা থাকে) বলছিল, কীরকম মেয়ে তার পছন্দ। সে বলল, তার স্বপ্নের নায়িকা হচ্ছে সেই রকম, যার রূপ হবে ওয়েস্ট কোস্টের মতন, আর মন হবে ইস্ট কোস্টের। এক সাহেবকে এই ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে বলেছিলুম। সে বলল, ব্যাপারটা কী জানো, পশ্চিম উপকূলের মেয়েদের মাথার চুল সত্যিকারের সোনালি হয়, মুখ ও শরীরের ডৌল বেশ কোমল আর নিখুঁত। কিন্তু বুদ্ধি? বুদ্ধিতে নিউ ইয়র্কের মেয়েরা অনেক তীক্ষ্ণ। সুতরাং এই-এই দুটোকে যদি মেলানো যায়...।

শুধু নারী নয়, নগরী হিসেবেও তুলনা করলে নিউ ইয়র্কের তুলনায় এল এ শহরটি দেখতে অনেক বেশি সুন্দর। তবু, আমায় যদি কেউ জিগ্যেস করে এই দুটি শহরের মধ্যে কোনটি আমার বেশি পছন্দ, আমি বিনা দ্বিধায় নিউ ইয়র্কের নাম বলব। নিউ ইয়র্কের অনেক রাস্তা বেশ ভাঙাচোরা, এখানে সেখানে ময়লা পড়ে থাকে, অনেকটা কলকাতা-কলকাতা ভাব, তবু অসাধারণ প্রাণচাঞ্চল্য আছে ওই শহরটির। সেই তুলনায়, এল এ একেবারে ঝকঝকে তকতকে এবং কৃত্রিম।

এল এ শহটির আর একটি দুর্ভাগ্য এই যে, এই শহরটি আমার, আমি একে ভালোবাসি, এইরকম গর্ব করার কেউ নেই। এই শহরটা বারো ভূতের। সবাই আসে এটাকে লুটেপুটে নেওয়ার জন্য। কিন্তু নিউ ইয়র্কের নাগরিকরা তাদের শহরটির জন্য গর্ব বোধ করে। 'আই লাভ এন ওয়াই' এরকম লেখা বড় বোতাম কিনতে পাওয়া যায়, অনেকেই সেরকম বোতাম কিনে বুকে লাগিয়ে ঘোরে। যারা খাঁটি আমেরিকান নয়, যেমন ইহুদি বা কৃষ্ণকায়রা (খাঁটি আমেরিকান হচ্ছে বোলতারা। বোলতা অর্থাৎ ওয়াস্‌প, অর্থাৎ হোয়াইট—আঙ্গলো-স্যাক্সন এবং প্রোটেস্টান্ট) তাদেরও সাহিত্য পড়লে দেখা যায়, তারা নিউ ইয়র্ক শহরটাকে খুব প্রিয় আর নিজস্ব মনে করে। এল এ নিয়ে সেরকম কোনও সাহিত্যও নেই।

লস এঞ্জেলিস বলতেই প্রথমে মনে পড়ে হলিউডের কথা। যদিও এই বিশাল শহরে হলিউড একটা পাড়া মাত্র। দূর থেকে দেখা যায় পাহাড়ের গায়ে হলিউডের নাম খোদাই করা।

হলিউডের প্রতিষ্ঠা নিয়ে একটা বেশ মুখরোচক গল্প আছে। চলচ্চিত্র শিল্পের গোড়ার দিকে আমেরিকান সিনেমার কেন্দ্র ছিল নিউ ইয়র্ক, বড়-বড় কোম্পানিগুলোর অফিস ছিল ওখানেই। সেই যুগের একজন পরিচালক, যান নাম সিসিল বি ডিমিল (যিনি মার্কিনি ভাষায় ঢাউস-ঢাউস হিন্দি

ফিলম বানাবার জন্য বিখ্যাত) একটা ছবির আউটডোর শুটিং-এর জন্য দলবল নিয়ে এসেছিলেন আরিজোনা রাজ্যের একটি জায়গায়। ট্রেন থেকে নেমেই সিসিল বি ডিমিল বললেন, ওরে বাস্ রে, এ কী পাণ্ডববর্জিত জায়গা! উঃ কী গরম! এ যে মরুভূমি। না, না, এখানে শুটিং চলবে না। ট্রেনটা তখনও দাঁড়িয়ে ছিল, সেই ট্রেনেই আবার সবাই হুড়মুড়িয়ে উঠে পড়ল। ডিমিল সদলবলে নামলেন একেবারে ট্রেন শেষ পর্যন্ত যেখানে গিয়ে থামল, সেখানে। সেখানকার আবহাওয়া খুব মনোরম, নাতিশীতোষ্ণ। সমুদ্রের ধারে, সন্ধের পর চমৎকার বাতাস দেয়, এখানে লোকজনের ভিড়ও তেমন নেই। শহরের উপকণ্ঠে একটা নিরিবিলি পাহাড়ি গ্রাম মতন জায়গা বেছে নিয়ে ডিমিল কোম্পানিকে টেলিগ্রাম পাঠালেন, শুটিং-এর খুব ভালো জায়গা পেয়েছি।

সেই গ্রামটির নামই হলিউড। প্রথমে নাকি একটা মাছের গুদাম ভাড়া করে স্টুডিও বানানো হয়েছিল। এখন সেখানে এলাহি কারবার।

একদিন দেখতে গিয়েছিলুম স্টুডিও পাড়া।

এমনি-এমনি তো ঢুকে পড়া যায় না, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। একটি কোম্পানি তাদের স্টুডিও এলাকায় প্রত্যেকদিন ট্যুরের ব্যবস্থা করে। তা বলে সত্যি সত্যি শুটিংও দেখা যায় না কিংবা শুকনো কয়েকটা সেট বা ক্যামেরা দেখিয়েও ছেড়ে দেয় না। এন্টারটেইনমেন্ট ব্যাপারটা এরা ভালো জানে, আপনার কাছ থেকে পয়সা নিলে তা যাতে পুরোপুরি উসুল হয়, সে দিকে এদের নজর আছে। দশ টাকার টিকিটে সারাদিন ধরে এরা কতরকম জিনিস যে দেখায়, তার ইয়ত্তা নেই।

মূল সফরটি হয় একটি ট্রামে। টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকবার পরই একজন জানিয়ে দেবে যে তখন থেকে দেড় কি দু-ঘন্টা বাদে আপনার জন্য সেই ট্রামে জায়গা নির্দিষ্ট থাকবে। এতক্ষণ সময় কিন্তু কোনও বেঞ্চে বসে বাদাম চিবিয়ে কাটাতে হবে না, তারও ব্যবস্থা আছে। আলাদা-আলাদা জায়গায় কয়েকটি নাটকীয় প্রদর্শনী আছে, তার যে-কোনও একটায় ঢুকে পড়া যায়। যেমন একটাতে আছে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের বাড়ি, সেখানে সত্যিকারের জ্যান্ত ভূত ও ভ্যামপায়ার আসে, নানারকম কাণ্ডকারখানা হয়, তারপর শেষে লাগে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন ও হাল্‌কের (মানুষ-দৈত্য) মধ্যে মারামারি। অন্য একটি জায়গায় দেখানো হয় যত রাজ্যের পোষা জন্তু-জানোয়ারের খেলা। আর একটিতে থাকে কোনও ওয়েস্টার্ন ছবির একটি দৃশ্য, ছবি নয়, বাস্তব। এক বাড়ির ছাদ থেকে অন্য বাড়ির ছাদে লাফিয়ে চলে যাচ্ছে নায়ক, নীচ থেকে ভিলেন তাকে গুলি করল, রক্তাক্ত দেহে নায়ক সেই তিনতলা থেকে এক তলায় পড়ে গিয়েও বাঁ-হাতে হাটুর তলা দিয়ে গুলি চালিয়ে দিল। অর্থাৎ এই সব দৃশ্যে যে ট্রিক ফটোগ্রাফি নেই, স্টান্টম্যানদের কৃতিত্ব, দেখিয়ে দেওয়া হল সেটাই।

এইরকম সব নানা ব্যাপার দেখে সময় কাটবে। পুরো এলাকাটা সাজানো কোনও অষ্টাদশ শতাব্দীর শহরের মতন, সেইরকম সব দোকান, সেইরকম সাইন বোর্ড। এরই মধ্যে এক জায়গায় চোখে পড়ে যাবে জ'স ফিলমের নকল হাঙরটি।

এরপর মূল সফর।

ট্রামে চড়লে একজন গাইড নানা রকম রঙ্গকৌতুক করে হলিউডের বিভিন্ন সব মজার ঘটনা শোনাবে। মাঝে-মাঝে ট্রাম থামিয়ে নিয়ে যাবে এক-একটা স্টুডিয়োতে, দেখাবে স্টার ওয়ার ছবির সেট, বিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মেকআপ রুম, কিংবা সুপারম্যান কীভাবে আকাশ দিয়ে উড়ে যায় সেই কায়দা। দর্শকদের মধ্যে দু-একজনকে বেছে নিয়ে তাদেরও উড়িয়ে দেবে।

ট্রামটার যাত্রাপথেও নানা রকম রোমাঞ্চ আছে। একটি নড়বড়ে কাঠের ব্রিজ পার হওয়া মাত্রই ভেঙে পড়ে যাবে ব্রিজটি। কোথাও সামনে জলাশয়, কিন্তু ট্রামটি জলের ওপর দিয়ে চলতে চাইলেই জল দু-পাশে সরে গিয়ে রাস্তা করে দেবে। মোজেস যে-ভাবে দলবল নিয়ে সমুদ্র পার হয়েছিলেন, দেখিয়ে দেবে সেই দৃশ্যটি। কোথাও মুখোমুখি অন্য গাড়ির সঙ্গে কলিশন হতে-হতেও বেঁচে যাওয়া যাবে। কিংবা গাইড বলবে, এবার কিন্তু বৃষ্টি নামবে। সঙ্গে-সঙ্গে ঝুপঝুপ করে প্রবল বর্ষণ। কিংবা

বলবে, ডান পাশে দেখুন উত্তর মেরু।
বরফ তৈরি করা হয়েছে। শেষের দিকে ট্রামটা ঢুকে যায় একটা গুহার মধ্যে, মনে হয় যেন পৃথিবীর পেটের মধ্যে চলে যাচ্ছে। জার্নি টু দা সেন্টার অফ দা আর্থ।

পুরো জায়গাটা যে কত বড়, তা ঠিক ধারণা করা যায় না। কী যেন একটা হিসেব দিয়েছিল, বোধহয় আট-দশ বর্গ কিলোমিটার। এই হল একটা মাত্র স্টুডিয়োর নমুনা।

কন্ডাকটেড ট্যুর আমার কখনও বিশেষ পছন্দ হয় না। কিন্তু এ রকম ট্যুর না নিলে তো হলিউডের স্টুডিয়ো দেখবার অন্য কোনও উপায়ও নেই। আমার সঙ্গে তো ডাস্টিন হফ্‌ম্যান কিংবা এলিজাবেথ টেলরের খাতির নেই যে আমাকে ওদের শুটিং দেখাতে নিয়ে যাবে! টিকিট কেটে এ জিনিস দেখাও একটা সত্যিকারের নতুন অভিজ্ঞতা।

এল এ-র অন্য বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান হল ডিজনিল্যান্ড।

সেখানে গিয়ে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। আমার চেনা যত বাচ্চা ছেলেমেয়ে আছে, তাদের জন্য কষ্ট হয়। আমার বদলে ওদেরই তো আসা উচিত ছিল এখানে।

পুরো ডিজনিল্যান্ডটিকেই একটি স্বপ্নরাজ্য করে রাখা হয়েছে। যন্ত্রপাতির সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে এক অপরূপ রূপকথা।

ডিজনিল্যান্ডের প্রধান আকর্ষণ এর বিশালত্ব। আমেরিকানদের সব কিছুই খুব বড়-বড়। এবং বড় হলেই যে তা আকর্ষণীয় বা সুন্দর হবে, তার কোনও মানে নেই। কিন্তু ডিজনিল্যান্ডের ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন ওঠে না। সতিাই এটা অভাবনীয় রকমের বড় এবং সন্দর।

টিকিট কেটে ঢুকতে হয় এবং সব জায়গাটাই ঘেরা। কিন্তু এরই মধ্যে আছে একাধিক পাহাড়, নিবিড় জঙ্গল, বেশ চওড়া নদীও একাধিক, অনেকগুলি পার্ক, এক একটা শহরের টুকরো এবং বহু মণ্ডপ। এবং পরেও অনেক কিছু দ্রষ্টব্যই মাটির নীচে।

ডিজনিল্যান্ডেও যেতে হয় সকালে, ফিরতে হয় মধ্যরাতে। তাতেও অবশ্য সব কিছু দেখে শেষ করা যায় না।

ডিজনিল্যান্ডের বর্ণনা দিয়ে কোনও লাভ নেই, কেন না, এর কোনওটাই চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না এবং নিজের রুচি অনুযায়ী বেছে নেওয়ার অজস্র দ্রষ্টব্য এবং উপভোগ্য ব্যাপার আছে। যার উত্তেজনা কিংবা বিপদের অভিজ্ঞতা ভালো লাগে, তার জন্যও যেমন আছে ব্যবস্থা, আবার যে ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান বা মহাশূন্য পছন্দ করে, তাকে পাঠিয়ে দেওয়া যায় সেখানে, কেউ ভূতের বাড়িতে গিয়ে অজস্র ভূত-পেত্নি দেখতে পারে, আর যে ভালোবাসে নরম মধুর দৃশ্য বা সঙ্গীত, সে তাও খুঁজে পাবে। অথবা কোনও মণ্ডপে বা ঢুকে চুপচাপ মাঠে বসে থাকতেও তো ভালো লাগতে পারে। এক জায়গা থেকে আব এক জায়গায় যাওয়ার জন্য আছে ঘোড়ায় টানা ট্রাম কিংবা পুরোনো আমলের ছাদখোলা দোতলা বাস, কিংবা আকাশ ট্রেন, সব বিনামূল্যে।

শুধু একটি প্রদর্শনীর কথা বলি, যেটি আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছিল, এটি দেখতে হয় একটি ছোট নৌকোয় চেপে, যেটি আপনা-আপনি চলে। পুরো মণ্ডপের মধ্যে খাল কাটা আছে, তার মধ্য দিয়ে এ রকম যাত্রীবাহী বহু নৌকো চলছে। এখানে দেখা যাবে মানুষের চেয়ে একটু ছোট সাইজের সব পুতুল এবং তাদের বাড়ি ঘর এবং পারিপার্শ্বিক। এই রকম পুতুল নিছক পঞ্চাশ বা একশোটা নয়, হাজার-হাজার। এখানে রয়েছে সমস্ত পৃথিবীর মানুষের আদল, সেই রকম বিভিন্ন দেশের সাজপোশাক, সেই রকম পরিবেশ, এবং অন্তরীক্ষে বাজে প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট জায়গার আলাদা সঙ্গীত। সব মিলিয়ে এমন একটা ব্যাপার যা মনকে একেবারে অভিভূত করে দেয়। এই প্রদর্শনীটির নাম 'ইট্‌স আ স্মল স্মল ওয়ার্লড'। ওই শব্দগুলি দিয়ে একটি গানও বাজে শেষকালে, সেই গানের সুরটি যেন এখনও আমার কানে লেগে আছে।

এল এ শহরে দর্শনীয় ব্যাপার আরও আছে। কিন্তু আমার বুক কেঁপে উঠেছিল একজনকে দেখে।

প্রথম দিন সন্ধেবেলাতেই তাঁকে দেখতে যাই। তাঁর নাম প্রশান্ত মহাসাগর। সব সমুদ্রের চেহারাই মোটামুটি এক রকম। কিন্তু ইনি প্রশান্ত মহাসাগর। সব সমুদ্রের রাজা। জলাধিপতি, এই অনুভূতিতেই শ্রদ্ধা জাগে। মাউন্ট এভারেস্টকেও তো দূর থেকে দেখলে আর পাঁচটা বরফওয়ালা পাহাড়ের মতন দেখায়। তবু, মাউন্ট এভারেস্টের নাম শুনলেই বুক কেঁপে ওঠে না?

সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে একটা সেতু অনেকখানি টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তার মাথায় একটা জেটি। সেখানে অনেকে বেড়াতে যায়। সেখানে যাওয়ার আগে আমি জলের কিনারায় গিয়ে খানিকটা জল আঁজলা করে তুলে প্রশান্ত মহাসাগরকে প্রণাম জানালুম।

।। ১৯ ।।

আমি কেন ফিরে যাব, বলতে পারেন?

যুবকটির তীব্র প্রশ্ন শুনে আমি খানিকটা কাঁচুমাচু হয়ে যাই। এই সব কঠিন প্রশ্ন আমাকে জিগ্যেস করবার কোনও মানে হয়? কে দেশে ফিরে যাবে, কে অন্য দেশে থেকে জীবনে উন্নতি করবে, তার আমি কি জানি। ও সব তাদের নিজস্ব ব্যাপার। আমি অন্যদের সাতে পাঁচে থাকতে চাই না।

তবু যুবকটি আমার কাছে ঘুরে আসছিল বারবার।

বিশাল পার্টি, অন্তত শ' খানেক নারী-পুরুষ তো হবেই। এর মধ্যে কুড়ি পঁচিশ জনের মাত্র বসবার জায়গা আছে। বাকি সবাই দাঁড়িয়ে। আমেরিকান পার্টির মতন ভয়াবহ জিনিস আর নেই। এক সঙ্গে এত মানুষ, সুতরাং সকলের সঙ্গেই সঠিক চেনা হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। তবু এসব জায়গায় একটা অলিখিত নিয়ম আছে, প্রত্যেকের সঙ্গেই ঘুরে-ঘুরে কথা বলতে হবে, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। সে এক হৃদয়হীন ব্যাপার। একজন এসে প্রথমে নিজেব পরিচয় দিয়ে খুবই আন্তরিক গলায় জিগ্যেস করবে, তুমি কোন দেশ থেকে এসেছ, সেখানকার আবহাওয়া কীরকম, তোমাদের ভাষা সমস্যার কীভাবে সমাধান করো, ইত্যাদি। মনে হবে যেন, এইসব বিষয় জানবার জন্য তার কত না আগ্রহ। কিন্তু ঠিক পাঁচ-ছ'মিনিট পরে হঠাৎ 'এক্সকিউজ মি' বলে পট করে মুখ ঘুরিয়ে আর একজনের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দেবে। আর আমাকে চিনতেই পারবে না। এই রকম একের পর এক।

সেই জন্যই, বাধ্য হয়ে কখনও এই সব পার্টিতে যেতে হলে আমি প্রথমেই জায়গা বেছে নিয়ে এক কোণে বসে থাকি, কেউ কাছে এসে কথা বললে তো বলল, কেউ কথা না বললেও আমার জীবনের কোনও ক্ষতি হয় না।

এই পার্টিতে অবশ্য জনা আষ্টেক ভারতীয়ও আছে। শুধু ভারতীয় কজন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে জটলা করলে ভালো দেখায় না বলে তারাও আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। আমি যথারীতি জানলার ধারে একটা কাঠের টুল নিয়ে আসন গেড়ে বসে উত্তম-উত্তম পানীয়ের সদ্ব্যবহার করছি। কারুকে আমার দিকে আসতে দেখলেই চট করে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি জানলার বাইরে। একেই তো ইংরেজি বলতে বলতে চোয়াল ব্যথা হয়ে যায়, তাতে প্রত্যেকের সঙ্গে একই ধরনের কথা বলারও কোনও মানে হয় না।

এই বাঙালি যুবকটি কিন্তু বারবার ধেয়ে আসছে আমার দিকে।

বছরতিরিশেক বয়েস, বেশ স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ, চোখ দুটিতে বুদ্ধি ও মেধার চিহ্ন আছে। সঙ্গে তার স্ত্রী, সেও বেশ সুন্দরী, কথাবার্তা খুব নরম ধরনের। মেয়েটি প্রথমে আমাকে চিনতে পারে। আমার ছোট মাসির মেয়ে টুলটুল ওর বান্ধবী, সেই সূত্রে কয়েকবার আমায় কলকাতায় দেখেছে। এবং, কী আশ্চর্য ব্যাপার, সে নীললোহিতের লেখাটেখাও পড়েছে দু-একটা। সুতরাং, সে একটু উচ্ছ্বাস দেখাল।

তার স্বামী কিন্তু উচ্ছ্বাস-টুচ্ছ্বাসের ধার ধারে না। নীললোহিত-ফিললোহিত বলে কারুর নামও সে শোনেনি। আমি টাটকা কলকাতা থেকে এসেছি, এটাই আকৃষ্ট করল তাকে।

প্রথম আলাপেই ভদ্রলোক বক্রকণ্ঠে জিগ্যেস করলেন, কলকাতাটা সেই একই রকম নরক হয়েই আছে? সেই লোডশেডিং, সেই রাস্তায় ঘাটে নোংরা...

আমি হেসে বললুম, আপনি শেষ কবে কলকাতা দেখেছেন?

—সেই নাইন্টিন সেভেন্টি ওয়ানে।

—তা হলে বিশেষ কিছু বদলেছে বলে মনে হয় না। তবে হাওড়া ব্রিজের কাছে ফ্লাই ওভার হয়ে গেছে, শিয়ালদারটাও শিগগির খুলবে শুনে এসেছি...আর হাওড়ার সাবওয়ে কি আপনারা দেখেছিলেন?

—বুল শিট! ওসব কে শুনতে চাইছে? মানুষের অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়েছে? কলকাতার রাস্তায় একটা লোক মরে পড়ে থাকলে তাকে সরাতে ক'ঘণ্টা লাগে? টুয়েন্টি ফোর আওয়ার্স? ফরটি এইট?

সত্যি কথা বলতে কী আমি কলকাতার রাস্তায় কোনওদিন কোনও মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখিনি। এরকম হয় জানি, কিন্তু আমার চোখ দুটি ভাগ্যবান, এরকম দৃশ্য কোনওদিন সহ্য করতে হয়নি। একদিন দুপুরে শুধু মেট্রোপলিটান বিল্ডিং-এর সামনে একজন লোককে শুয়ে থাকতে দেখেছিলুম, তার মুখের ওপর মাছি উড়ছিল। কাছে গিয়ে দেখেছিলুম সে আসলে একটি অজ্ঞান মাতাল। সেটা কৌতুক দৃশ্য, করুণ কিছু ব্যাপার নয়।

সুতরাং চুপ করে রইলুম।

—কলকাতার মতন একটা এত বড় মেট্রোপলিস, অথচ এখনও সেখানে রাস্তায় লোক পড়ে থাকে, না খেয়ে মানুষ মরে, তার চেয়েও খারাপ আধমরা হয়ে লাখ লাখ লোক বেঁচে থাকে...পৃথিবীর আর কোনও দেশ...ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর...এই সব মাইনর কান্ট্রিজেও এখন এরকম অবস্থা নেই। চিনের কথা তো বাদই দিলুম।

—তা আপনি ঠিকই বলেছেন।

—কেন, কেন এরকম হয়? তার কারণ, পলিটিক্যাল পার্টিগুলো...ওদের কোনও ইডিওলজিই নেই... দেশের কথা কেউ ভাবে না...শুধু বড় বড় কথা বলে, সব ফালতু বাত!

গলার আওয়াজ শুনেই বোঝা যাচ্ছে ভদ্রলোকের পেটে এর মধ্যেই গেলাস চারেক হুইস্কি চলে গেছে। এইরকম সময়ে অনেকের মনেই আদর্শবাদ জেগে ওঠে। দেশের কথা মনে পড়ে। তা পড়ুক। কিন্তু উনি এমনভাবে আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে কথা বলছেন, যেন এইসব দুরবস্থার জন্য আমিই দায়ী।

ভদ্রলোকের স্ত্রী একটু অপ্রস্তুত হয়ে স্বামীকে ফিসফিস করে কী যেন বললেন।

ভদ্রলোক তবু তেড়িয়া হয়ে বললেন, আর কলকাতার টেলিফোন! সেই বর্বর যুগেই আছে না। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে...আর দুমাস টেলিফোন ডেড থাকলেও সাতশো টাকা বিল। আপনারা মশাই মহা ইডিয়েট, যে যার বাড়ির রিসিভারগুলো বাড়ির সামনের রাস্তায় আছড়ে ভেঙে ফেলতে পারেন না?

ভদ্রমহিলা এবার স্বামীর জামা ধরে বললেন, এই তোমাকে মিসেস ওয়াল্টার্স ডাকছেন বললুম না। চলো—

প্রায় টানতে-টানতে তিনি নিয়ে চলে গেলেন স্বামীকে।

কিন্তু দশ মিনিট বাদেই যুবকটি আবার ফিরে এলেন। হাতে আর একটি ভরা গেলাস। চোখ লালচে, মাথার চুল খাড়া হতে শুরু করেছে।

আমাকে ভালো করে দেখে নিয়ে আবার কড়া গলায় জিগ্যেস করলেন, শিবপুর না যাদবপুর?

এই রে, ভদ্রলোক আমাকে প্রথম থেকেই স্বজাতি বলে ভুল করেছেন। প্রবাসে বাঙালি দেখলে চোখকান বুজেই বলে দেওয়া যায় ইঞ্জিনিয়ার। একশো জনের মধ্যে অন্তত আশিজন তো বটেই। আর বাকিরা ডাক্তার কিংবা শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত।

আমি জানালুম যে, আমি ইঞ্জিনিয়ার কিংবা ডাক্তার নই।

—তবে প্রেসিডেন্সির ছাত্র?

—আজ্ঞে না। আমি ইস্কুল ফাইনালই পাশ করেছি তিনবারের চেষ্টায়, তারপর কোনও ক্রমে একটা মফস্সল কলেজে...

—স্টেটসে এসেছেন কেন?

—এই... বলতে পারেন...বেড়াতে।

—টুরিস্ট!

এমন একটা ধিক্কারের সঙ্গে বললেন কথাটা, যেন আমি একটা কেঁচো কিংবা আরশোলা। তারপর আবাব যোগ করলেন, বাপের অনেক পয়সা আছে বুঝি?

আমি বললুম আপনার মতন কোনও বড়লোক বন্ধু এদেশ থেকে তো টিকিট পাঠিয়ে দিতেও পারে। তারপর স্রোতের ফুলের মতন এখানে ওখানে ভেসে বেড়ানো।

মুখের ভাব না বদলেই তিনি বললেন, হ্যাঁ, অনেকেই এরকম টিকিট চায় বটে। আমি দু-বছর আগে আমার এক মামার জন্য টিকিট পাঠিয়ে ছিলুম। আমার বাবা-মাও এসে ঘুরে গেছেন একবার। আমার স্ত্রী...ওর তো প্রত্যেক দু-বছর অন্তর দেশে যাওয়া চাই-ই। গতবার ওর বোনকে সঙ্গে নিয়ে ফিরেছিল। এই ক্যাপিটালিস্ট দেশে আপনারা কী দেখতে আসেন? কতকগুলো বড় বড় বাড়ি আর রাস্তাঘাট, আর ফরসা ফরসা মেয়েছেলে...দেশ থেকে অনেকে এসে যা পায় গপগপ করে খেয়ে নিয়ে যায়.... যত সব হ্যাংলা, বুভুক্ষু পার্টি।

মাতালের ওপর রাগ করা নিয়মবিরুদ্ধ তাই আমি চুপ করে মিটিমিটি হাসতে লাগলুম।

প্রবাসে বাঙালিরা প্রায় সবাই খুবই পরিমিত মদ্যপায়ী। সকলের বাড়িতেই ওসব জিনিসপত্তর মজুত থাকে, কিন্তু নিজেরা এক দু-ঢোঁকের বেশি খান না। একেবারে টিটোটোলারও অনেক দেখা যায়। বিশেষত পার্টিতে মাতাল হওয়া একেবারেই নিয়মবিরুদ্ধ, তাই সেরকম অবস্থায় কোনও বাঙালিকে ক্বচিৎ দেখা যায়। এই যুবকটি যে একটু বেশি পান করে ফেলেছেন, তার কারণ বোধ হয় ওঁর মনের মধ্যে বিশেষ কোনও অস্থিরতা আছে।

ভদ্রলোক আবার বললেন, এদিকে দেশটা দিনদিন গোল্লায় যাচ্ছে...এখানে যখন বেটাচ্ছেলে সাহেবরা জিগ্যেস করে, তোমাদের ইন্ডিয়া এত বড় দেশ। সেখানে ওয়ার্ক-ফিলসফি নেই কেন? কাজ করাটা যে একটা পবিত্র ব্যাপার, সেটা এখনও কেউ বোঝাল না... কী উত্তর দোব। বলি, তোমরা, ক্যাপিস্টলিস্টরাই তো আমাদের দেশটাকে চুষে-চুষে ছিবড়ে করে দিয়েছ...। কী, ঠিক কি না? হ্যাঁ করে বসে আছেন কেন, আমি যা বলছি, তা মাথায় ঢুকছে?

—আপনি তো ঠিকই বলছেন?

—আলবাত ঠিক বলব। বিকজ আই নো-ও-ও-ও। আমি নিজে এক সময় মাঠে ঘাটে ঘুরেছি, ভূমিহীন চাষিদের মধ্যে কাজ করেছি...কিন্তু কী লাভ! সবাই বড় বড় বাকতাল্লা দেয়! শ্রেণিসংগ্রাম! হুঃ! মুখের কথা! আজ অবধি কেউ ধর্মের বিরুদ্ধে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একটাও কথা বলেছে? এমনি-এমনি শ্রেণি-সংগ্রাম হয়? যত সব বামুন কায়েতের লিডারশিপ...

আমি দুবার উদ্দেশ্যমূলকভাবে কাশলুম। কারণ ভদ্রলোক খুব জোরে জোরে বাংলায় কথা বলছেন বলে কাছাকাছি অনেকে অবাক হয়ে ফিরে তাকাচ্ছেন।

এবারও ওঁর স্ত্রী ছুটে এলেন। ভদ্রলোকের জামার হাতা ধরে বললেন, এই, তোমার খাবার প্লেট ফেলে এসেছ...আমাদের বাড়ি যেতে হবে না? চলো, চলো। আজ কিন্তু আমি গাড়ি চালাব।

হুংকার দিয়ে তিনি বললেন, হোয়াই। আমি চালাতে পারব না? আমি ঠিক আছি, আমার কিচ্ছু হয়নি।

যেতে যেতে আমার দিকে একটা বিষাক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তিনি বললেন, ভ্যাড়া! আপনারা সব ভ্যাড়ার পা'ল! সেই জন্যই তো আমাদের নেতাগুলো সব রাখালের টাইপের, তাই একবার বাঁশি বাজাচ্ছে আর একবার ফাঁকা মাঠে লাঠি ঘোরাচ্ছে।

ওঁর স্ত্রী লজ্জিত মুখ করে তাকালেন আমার দিকে।

জয়তীদি এসে জিগ্যেস করলেন, অমুক কী বলছিল তোমাকে? খুব রেগে গেছেন মনে হল। আমি বললুম রেগে গেছেন কিনা জানি না, তবে আমায় কিছু বলছিলেন না, স্বগতোক্তি করছিলেন মনে হল।

জয়তীদি বললেন, ও খুব ব্রিলিয়ান্ট ছেলে জানো তো...এখানে এসে এত কম বয়সে যা উন্নতি করেছে...বড়-বড় কম্পানি থেকে ওকে ডাকাডাকি করে...তবে ওই একটা দোষ, একটু হুইস্কি পেটে পড়লেই চ্যাঁচামেচি শুরু করে দেয়।

—বেশি খাটতে হয় বোধহয়, তাই রিলাক্সেশানের জন্য।

—তোমার দীপঙ্কদার সঙ্গে তো কতবার ওর তর্ক হয়েছে। তবে ওর মনটা খুব ভালো...

জয়তীদি আমার সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলতে পারলেন না। অন্য একজন তাঁকে ডেকে নিয়ে চলে গেল।

আমি যুবকটির কথা ভাবতে লাগলুম। বয়েস তিরিশের কাছাকাছি। দশ বছর কলকাতাতেই যায়নি। তাহলে বিয়ে হল কোথায়? কুড়ি বছর বয়সেই কি বিয়ে করে এসেছিল? অথবা মেয়েটি এসেছিল এদেশে, তারপর দুজনের মন-বিনিময়।

আবার যুবকটি চলে এল আমার দিকে। এবার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়েই। ওঁর স্ত্রী ওঁকে অনবরত কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু নাটকীয় কিছু ঘটে যাওয়ার আশঙ্কায় বেশি জোর করতে পারছেন না।

যুবকটির হাতে আর একটা ভরতি গেলাস। এবার অবস্থা বেশ টলটলায়মান।

এবারও বেশ জোর গলায় সে বলল, শুনুন মশাই, আমার বউ প্রায়ই দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য ন্যাগ করে, কিন্তু আমি কেন ফিরে যাব বলতে পারেন? গিভ মি ওয়ান সিংগ্‌ল সলিড রিজন।

এর কোনও উত্তর হয় না। তাই আমি মুখ নীচু করে সিগারেট ধরাবার জন্য অনেক সময় নিলুম।

উনি আবার বললেন, কেন ফিরে যাব? এখানে আই হ্যাভ ওউন হাউজ...সুইমিং পুল আছে, তিনটে গাড়ি...পৃথিবীর যে-কোনও জায়গায় আমি যখন তখন বেড়াতে যেতে পারি...। দেশে গেলে শালা কেউ আমার কাজের দাম দেবে? নিজেরাই কেউ কাজ করতে জানে না... গভর্নমেন্টের একটা অর্ডার বেরুতে আঠারো মাস...রেড টেপ আর বিউরোক্রেসি...একটা ফালতু চাকরি দেবে, তারপর ফ্ল্যাট খুঁজে পেতে হয়রান...কেন যাব?

হঠাৎ আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। আমি অসহিষ্ণু ভাবে বললুম কে আপনাকে ফিরে যাওয়ার জন্য মাথার দিব্যি দিয়েছে? আপনাদের মতন লোকেরা দেশে ফিরে গিয়ে এটা নেই, সেটা নেই, উঃ কী গরম, উঃ কী গরম, উঃ কী নোংরা, এইসব নিয়ে অনবরত ঘ্যানঘ্যান করেন, তা আমাদের মোটেই শুনতে ভালো লাগে না। আপনারা যেন সবাই এক একটি বাইবেলের প্রডিগ্যাল সন, দেশে ফিরলেই রাজার মতন আদর করতে হবে। আপনাদের বাদ দিয়েও তো দেশটা কোনওক্রমে চলে যাচ্ছে, ডুবে তো যায়নি।

এক তোড়ে বলে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ ভদ্রমহিলার দিকে চোখ পড়ল। তাঁর মুখ থেকে সনির্বন্ধ মিনতি ঝরে পড়ছে। যেন তিনি বলতে চাইছেন, দয়া করে, এই সময় আমার স্বামীর কথায় কিছু মনে করবেন না।

তৎক্ষণাৎ আমি লজ্জিত ও অনুতপ্ত বোধ করলুম।

ভদ্রলোক একটু দুলতে দুলতে বললেন, হুঁ, রাগ আছে তাহলে? বিষ নেই তার কুলোপানা চক্র। দেশে বসে এই রাগ দেখাতে পারেন না? সব ব্যবস্থা চুরমার করে দিতে পারেন না। আমেরিকাতে এসেছেন মজা মারতে?...আমার কথা আলাদা, আই অ্যাম আপ্রিজনার অব ইনডিসিশান...ওয়াক্।

ভদ্রলোক ছুটে চলে গেলেন বাথরুমের দিকে। বুঝলাম, এখন বমি করবেন।

অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন তাঁর স্ত্রী।

পার্টি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এরপর খাবারটাবার নেওয়ার জন্য আমায় উঠে যেতে হল টেবিলের দিকে।

একটু পরে দেখলুম সেই ভদ্রলোক বাথরুম থেকে বেরিয়ে একটা চেয়ারে মাথা হেলান দিয়ে বসে আছেন, চোখ দুটি ওপরের দিকে।

সেরকম দুঃখী, অসহায়, বিভ্রান্ত, করুণ মুখ আমি আর কখনও দেখিনি।

।। ২০ ।।

প্রশান্ত মহাসাগরের বেলাভূমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম বালির ওপর দিয়ে। একটু আগে সারা আকাশ রঙে ভাসিয়ে সূর্যদেব ডুব দিয়েছেন সমুদ্রে, তবু এখনও দিনের আলো আছে। লস এঞ্জেলিসের সূর্যাস্ত একটা বিশেষ দ্রষ্টব্য ব্যাপার। এখানে একটা বিখ্যাত রাস্তারও নাম সানসেট বুলেভার।

এখানে খুব একটা ভিড় নেই। ক্যালিফোর্নিয়ায় ভিড় হয় শীতকালে, যখন এ-দেশের প্রায় সব জায়গাই বরফে ঢাকা থাকে, শুধু ক্যালিফোর্নিয়ায় পাওয়া যায় বসন্তের হাওয়া।

তবে অনেকগুলো ছেলেমেয়ে সার্ফিং করছে জলে। এ এক বিচিত্র খেলা, ঢেউ-এর সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্রমশই সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। এইরকম খেলা চলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, ঠিক যেন পাগলামির মতন। শুনেছি অনেক ছেলেমেয়ে সারারাতই জলে থাকে।

একটা ধপধপে সাদা রঙের ক্যাডিলাক গাড়ি থেকে নেমে একজন মহিলা ধীর পায়ে এগিয়ে আসতে লাগলেন জলের দিকে। ভদ্রমহিলা পরেছেনও সাদা লম্বা স্কার্ট, মাথায় সাদা টুপি, দু-হাতে সাদা রঙের গ্লাভ্স। জলের কাছাকাছি এসে শ্বেতবসনা সুন্দরীটি মাথা থেকে টুপি খুললেন, হাতের গ্লাভ্সও খুলতে লাগলেন। মনে হয়, তিনি সমুদ্রের জলে মুখ ধুতে চান।

টুপি খুলতেই দেখা গেল মহিলার মাথাভরতি সোনালি চুল। বয়েস অন্তত চল্লিশ তো হবেই, তবু এখনও মুখখানা বেশ সুন্দর, চোখের মণিদুটি নীল।

মহিলাকে দেখে জয়তীদি দারুণ চমকে উঠে তাঁর মেজদিকে বললেন, মেজদি, দ্যাখ, দ্যাখ। কে চিনতে পারছিস?

মেজদি প্রথমে একেবারে উলটো দিকে একটা লম্বা লোককে দেখে জিগ্যেস করলেন, কই? কই? কে রে?

আমরাও সবাই উৎসুক হয়ে দেখতে লাগলুম মহিলাকে। চেনা চেনা লাগছে, কিন্তু ঠিক যে কে তা বুঝতে পারছি না।

জয়তীদি ফিসফিস করে বললেন, শার্লি ম্যাকলেইন!

আমরা সবাই তৎক্ষণাৎ চিনতে পারলুম মাত্র দুদিন আগেই আমরা টিভি-তে জ্যাক লেমন-এর সঙ্গে শার্লি ম্যাকলেইনের একটা চমৎকার ফিল্ম দেখেছি। সেই ফিল্মের তুলনায় এখন বয়েসটা বেশি দেখালেও সেই একই মুখ।

হলিউডের শহরে এসে এক জলজ্যান্ত হিরোইনকে দেখতে পাওয়ার রোমাঞ্চই আলাদা। বোম্বাই-এর কোনও হিরোইন একলা সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেলে নিশ্চয়ই ভিড় সামলাবার জন্য

পুলিস ডাকতে হয়, কিন্তু এখানে সেরকম কোনও ব্যাপার নেই। এখানে ফিল্ম স্টারদের কিছুটা স্বাধীনতা আছে মনে হচ্ছে।

শার্লি ম্যাকলেইন পা থেকে জুতো খুলে ফেলে খানিকটা জলে নেমে গেলেন, তারপর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে রইলেন উদাসভাবে।

কয়েকদিন আগেই ন্যাটালি উড নামের আর একজন নায়িকার মর্মান্তিক মৃত্যু সংবাদ আমরা কাগজে পড়েছি। 'ওয়েস্ট সাইড স্টোরি'-তে দারুণ অভিনয় করেছিলেন ন্যাটালি উড। তিনি এখানে একটা ছবির শুটিং এর অবসরে একলা কিছুক্ষণ সময় কাটাবার জন্য একটা ছোট্ট নৌকো নিয়ে ভেসে পড়েছিলেন সমুদ্রে। কিছুক্ষণ বাদে দেখা গেল নৌকোটি ফাঁকা। সমুদ্রে ফাঁকা নৌকো দেখলেই অন্য নৌকো চালকরা বিচলিত হয়ে ওঠে। পরে ন্যাটলি উড-এর জলে ডোবা শরীর উদ্ধার করা হয়েছিল। দুর্ঘটনা না তিনি আত্মহত্যা করেছেন, তা বোঝা গেল না। উনি সাঁতার জানতেন। সার্থকতা অনেক সময় মানুষকে চরম অসুখী করে দেয় বোধহয়। ন্যাটলি উডের পেটে অনেকখানি অ্যালকোহল পাওয়া গিয়েছিল।

আমরা ভাবলুম, ন্যাটলি উড নিশ্চয়ই শার্লি ম্যাকলেইন-এর খুব বান্ধবী ছিলেন, সেই জন্য উনি এখনও সেই দুঃখ ভুলতে পারছেন না।

দীপকদা বললেন, এই রে, এই নায়িকাটিও আবার আত্মহত্যা করবে না তো? অনেকখানি জলে নেমে যাচ্ছে যে।

আমি বললুম, না, না, শার্লি ম্যাকলেইন খুব ভালো মেয়ে। মদটদ খায় না।

মেজদি বললেন, তুমি এমনভাবে বলছ, যেন ও তোমার বান্ধবী?

আমি বললুম, বান্ধবী না হলেও ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ আছে। একদিন অনেকক্ষণ একসঙ্গে থেকেছি।

সকলে আমার দিকে এমনভাবে তাকাল, যেন আমি একটা ডাহা মিথ্যুক। সত্যি কথা সরলভাবে বললে কেউ বিশ্বাস করে না। এরা ভাবছে শার্লি ম্যাকলেইন হলিউডের টপ্ হিরোইনদের একজন, বিরাট বড়লোক, আর আমি কলকাতার একটা ফ্যাফ্যা করে ঘুরে বেড়ানো ছোকরা, আমাদের মধ্যে পরিচয় হওয়া অসম্ভব, কিন্তু এরকম অসম্ভবও সম্ভব হয় মাঝে মাঝে।

আমি বললুম, শার্লি ম্যাকলেইন প্রায়ই কলকাতায় যান। অন্তত দুবার যে গেছেন, তা আমি নিজেই জানি। ডায়মন্ডহারবারের কাছে একটা অনাথ আশ্রম আছে। একজন বিদেশি পাদরি সেই আশ্রমটি চালান। শার্লি ম্যাকলেইন সেই আশ্রমকে অনেক সাহায্য করেন, টাকা তুলে দেন।

এবারে মেজদি এবং শিবাজি দুজনেই স্বীকার করল যে এরকম একটা খবর দেশে থাকতে তারা কাগজে পড়েছে বটে একবার। গ্রান্ড হোটেলে শার্লি ম্যাকলেইন কী যেন একটা ফাংশান করেছিল।

আমি বললুম, একজ্যাক্টলি। সেই ফ্যাংশান উনি করেছিলেন অনাথ আশ্রমের টাকা তোলার জন্য। তারপর নিজে ডায়মন্ডহারবারের সেই আশ্রমেও গেছেন।

দীপকদা বললেন, তোমার সঙ্গে কোথায় দেখা হল? তুমি কি সেই অনাথ আশ্রমে অনাথ বালক হয়ে ছিলে নাকি?

—প্রায় তাই বলতে পারেন। আমার এক মাসতুতো দাদা ওই অনাথ আশ্রমের সঙ্গে খানিকটা যুক্ত। সেই জন্য আমি ওখানে কয়েকবার গেছি। সবচেয়ে বড় কথা এই, কলকাতা থেকে শার্লি ম্যাকলেইন যখন ডায়মন্ডহারবারে যাচ্ছিলেন, তখন সেই গাড়িতে আমি জায়গা পেয়েছিলুম। গাড়িটা প্রায় খালিই যাচ্ছিল, উনিই বললেন, দু-একজন এই গাড়িতে আসুক না। তারপর আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, এই, তুমি এসো। তারপর যেতে-যেতে অনেক গল্প হল।

দীপকদা বলেন, শার্লি ম্যাকলেইন নাচ-গানের ছবিতে অভিনয় করে বটে, কিন্তু এমনিতে খুব তেজি মহিলা। আমি একটা ঘটনা জানি, ওঁর একটা ছবি ইন্ডিয়াতে রিলিজ আটকে দেওয়া হয়েছিল।

তারপর কী একটা উপলক্ষে লন্ডনে ওঁর সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধির দেখা। একগাদা লোকজনের মাঝখানে শার্লি ইন্দিরা গান্ধিকে জিগ্যেস করল, আপনাদের দেশে নাকি ডিমক্রেসি আছে? তাহলে আমার ছবিটা দেখাতে দিচ্ছেন না কেন? ইন্দিরা গান্ধি অপ্রস্তুতের একশেষ। দেশে ফিরেই ছবিটি রিলিজের ব্যবস্থা করে দেন।

জয়তীদি মুচকি হেসে আমার পিঠে একটা ছোট্ট ধাক্কা দিয়ে বললে, তবে তো দেখছি তোমার গার্ল ফ্রেন্ড। যাও কথা বলো।

আমি বললুম, ধ্যাৎ। আমায় উনি চিনতে পারবেন কেন?

মেজদি বোধহয় তখনও পুরোপুরি আমার কথা বিশ্বাস করেননি, তাই বললেন, না, না, ওর কথা বলার দরকার নেই।

শার্লি ম্যাকলেইন স্কার্ট ভিজিয়ে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত জলে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এবার আস্তে আস্তে উঠে এলেন।

তারপরেই সেই চমকপ্রদ ঘটনাটি ঘটল।

শার্লি ম্যাকলেইন কৌতূহলী চোখে আমাদের দলটির দিকে তাকালেন। শাড়িপরা মহিলা দেখলে এ-দেশের মহিলারা বেশ আকৃষ্ট হয়।

শার্লি আমাদের উদ্দেশে বললেন, হাই!

আমাদের মধ্যে জয়তীদিই সবচেয়ে সপ্রতিভ। উনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, হাই।

শার্লি কয়েক পা এগিয়ে এলেন আমাদের দিকে। তারপর আমাদের আর একটু ভালো করে দেখে নিয়ে জিগ্যেস করলেন, বাই এনি চ্যান্‌স, আর ইউ অল ফ্রম খ্যালখাটা?

জয়তীদি বললেন, ইয়া।

এরপর সেই ভুবনমোহিনী সরাসরি আমার মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে জিগ্যেস করলেন, ডিড্‌নচাই মিট য়ু সামহোয়ার বাফোর?

চিত্রতারকার এরকম অত্যাশ্চর্য স্মৃতিশক্তি? এ যে অবিশ্বাস্য। হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে এঁদের দেখা হয়। তবে কি আমার বোঁচা নাক এবং ছোট ছোট কুতকুতে চোখের জন্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অসুন্দর পুরুষ হিসেবে আমায় উনি মনে রেখেছেন?

আমি থতোমতো খেয়ে বললুম, হ্যাঁ, হ্যাঁ আপনার কি ডায়মন্ডহারবার বলে একটা জায়গার কথা মনে আছে? সেখানকার অনাথ আশ্রম...আমি সেবারে আপনার সঙ্গে অনেক কথা বলেছিলাম...

শার্লি বললেন, ডায়মন্ডহারবার। অফ খোর্স। কী চমৎকার নাম। সেই বয়েজ হোম...তার অবস্থা এখন...

কথা বলতে-বলতে থেমে গিয়ে তিনি সকলের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, তোমাদের এখন কি খুব জরুরি কাজ আছে? এসো না আমার বাড়িতে ...কিছুক্ষণ গল্প করা যাবে। আমি ডায়মন্ডহারবারের সেই বয়েজ হোম সম্পর্কে খবরটবর জানতে চাই।

আমি সগর্বে আমার সঙ্গিনী ও সঙ্গীদের দিকে তাকালুম। সব সময় আমায় হেলা তুচ্ছ করো, কিন্তু বেভার্লি হিলস্‌, যেখানে রাজা-রাজড়ারাও সহজে প্রবেশ অধিকার পায় না, সেখানে নেমন্তন্ন জোগাড় করার হিম্মত তোমাদের কারুর আছে?

এক কথায় এরকম নেমন্তন্ন গ্রহণ করা উচিত কি না এই ভেবে দীপকদারা ইতস্তত করছিলেন, কিন্তু শার্লি আমাদের দ্বিধার বিশেষ সুযোগ দিলেন না। মেজদি আর জয়তীদির দিকে এগিয়ে এসে খুব আন্তরিকভাবে বললেন, এসো এসো। বেশিক্ষণ আটকে রাখব না।

জয়তীদির দুই মেয়েকে রেখে আসা হয়েছে দীপকদার এক বোনের বাড়িতে। ওরা খুব মিস করল। আমরা ভাগাভাগি করে দুটি গাড়িতে উঠলুম। এবারও আমার স্থান হল শার্লি ম্যাকলেইনের গাড়িতে। শার্লি নিজেই গাড়ি চালান।

বেভার্লি হিল্‌স-এ আমরা আগেও একবার ঘুরে গেছি। পাহাড়ের গায়ে গায়ে এক-একটা বাড়ি আর নিরিবিলি ঝকঝকে রাস্তা। এর মধ্যে এক-একটা বাড়ি এক-একজন বিখ্যাত স্টারের, কোনটা কার বাড়ি তা অবশ্য বোঝবার উপায় নেই। আগেরবার আমরা কল্পনাই করতে পারিনি যে এই রকম কোনও বাড়িতে ঢুকব।

শার্লি ম্যাকলেইন কতবার বিয়ে করেছেন কিংবা বর্তমানে তাঁর কোনও স্বামী আছে কি না তা আমি জানি না। জিগ্যেস করা যায় না। জয়তীদির বড় মেয়ে জিয়া সব খবর রাখে, সে থাকলে নিশ্চয়ই বলতে পারত। ওঁর বাড়িতে ঢুকে প্রথমেই যেটা নজরে পড়ে, তা হল নির্জনতা। বেশ বড় বাড়ি, সামনে বাগান, কিন্তু কোনও লোকজন চোখে পড়ে না। একটি মাত্র ঘরে আলো জ্বলছে। গেটে কোনও দারোয়ান নেই, সেক্রেটারি ও বডিগার্ড জাতীয় কেউ অভ্যর্থনা করতে ছুটে এল না। এত বড় বাড়িতে এই ধনী মহিলা একা থাকেন নাকি? প্রথমেই মনে হয়, এসব বাড়িতে ডাকাতি করা তো খুব সোজা!

বাড়ির মধ্যে আমাদের দ্বিতীয় চমকটি অপেক্ষা করছিল।

বসবার ঘরটি অতি প্রশস্ত। এক সঙ্গে অন্তত পঞ্চাশজন লোক এঁটে যায়। ফিল্ম স্টারদের বাড়িতে প্রায়ই বড় বড় পার্টি হয়, সেই জন্যই এরকম ঘর দরকার। সেই ঘরের এক কোণে দুজন বেশ বুড়ো লোক গেলাস হাতে নিয়ে প্রায় ফিসফিস করে কথা বলছে। শার্লি ঘরে ঢুকে ওদের দেখতে পেয়ে বললেন, হাই গ্রেগ! হাই অ্যাল!

আমার প্রায় দম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জোগাড়। গ্রেগরি পেক আর অ্যালেক গিনেস। এই দুজনই যে আমার প্রথম যৌবনের হিরো। গ্রেগরি পেকের ছবি এলে পাগলের মতন দেখতে ছুটতাম। আর অ্যালেক গিনেস, সেই ব্রিজ অন দা রিভার কোয়াই-এর নায়ক। পরদার দুই দেবতা জলজ্যান্ত অবস্থায় বসে আছে আমাদের সামনে!

দুজনেই বেশ বুড়ো হয়ে গেছেন। কিছুদিন আগেই 'বয়েজ ফ্রম ব্রাজিল' নামে একটা ফিল্মে গ্রেগরি পেককে বুড়ো অবস্থাতেই দেখেছি, সেইজন্যই চিনতে অসুবিধা হল না। তবে রোমান হলিডের নায়কের সেই হাসিটি এখনও একই রকম আছে মনে হল।

আমাদের সঙ্গে শার্লি ওঁদের পরিচয় করিয়ে দিতে ওঁরা দুজনেই সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু আমাদের দেখে ওরা খুব খুশি হয়েছেন বলে মনে হল না। ওঁরা বোধহয় শান্ত নিরিবিলি সন্ধ্যা কাটাতে চেয়েছিলেন, তার মধ্যে এই ভারতীয় উৎপাত পছন্দ হবে কেন?

গ্রেগরি পেক তাঁর সেই বিখ্যাত গলায় শার্লিকে বললেন, অ্যাল প্যাচিনো আর মেরিল স্ট্রিপ একটুবাদেই আসবে। ওরা কি একটা জরুরি ব্যাপারে মিটিং করতে চায়। তোমাকে ফোন করেছিল, মনে নেই।

শার্লি বললেন, হ্যাঁ, মনে আছে। অ্যাল প্যাচিনো পরে আবার ফোন করে জানিয়েছে যে সে আটটার আগে আসতে পারবে না। তার আগে আমার কলকাতার বন্ধুদের সঙ্গে একটু গল্প করে নিই।

শার্লি সুমধুর টুংটাং রবে একটা ঘণ্টা বাজাতেই সঙ্গে-সঙ্গে একজন জাপানি পরিচারক এসে হাজির হল, তাহলে বাড়িটা একেবারে জনহীন নয়। কিন্তু এরা এরকম নিঃশব্দে থাকে যে বোঝাই যায় না।

শার্লি জিগ্যেস করলেন, আমরা কে কী পানীয় নেব। উনি নিজের জন্য চাইলেন শুধু এপ্রিকেটের রস।

তারপর আমরা গল্প করতে বসলুম।

কিন্তু গল্প ঠিক জমল না। শার্লির অনবরত ফোন আসতে লাগল। উনি উঠে-উঠে ফোন ধরছেন আর কথা থেমে যাচ্ছে। টুকরো টুকরো ফোনের সংলাপ শুনে বুঝতে পারলুম, আরও অনেকে

এ বাড়িতে আজ আসবে। কী একটা ব্যাপারে চিত্র তারকারা বেশ উত্তেজিত।

জয়তীদি আমায় বললেন, এই শোনো, উনি আমাদের ডেকে এনে খুবই ভদ্রতা করেছেন। এখন আমাদের পক্ষে ভদ্রতা হল খুব তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া। এঁরা আজ ব্যস্ত আছেন।

সুতরাং আমরা সবাই এক সঙ্গে উঠে দাঁড়ালুম। শিবাজি সকলের অটোগ্রাফ নিল। শার্লি ম্যাকলেইন বললেন, শিগগিরিই ওঁর একটা শুটিং আছে জাপানে, তখন একবার কলকাতায় যাবেন। তখন আবার নিশ্চয়ই দেখা হবে?

আমরা বললুম, নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই।

বাইরে বেরিয়ে এসে শিবাজি বলল, গ্রেগরি পেক আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করেছে, কলকাতায় কেউ শুনলে বিশ্বাস করবে?

এবার আমার প্রশ্ন ঃ সরলমতি পাঠকপাঠিকারা আমার এই কাহিনীটি বিশ্বাস করছেন তো? এরকমভাবেও যে ভ্রমণ কাহিনি লেখা যায়, তার একটি নমুনা দেখাবার জন্যই এবারেব এই রচনা। পুরো ব্যাপারটাই বানানো। এমনকী শার্লি ম্যাকলেইনের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়েরও ব্যাপারটা গুল। লস এঞ্জেলিসে বেভার্লি হিলে ঘুরে ঘুরে কোনও নায়ক-নায়িকার দর্শন পাওয়া তো দূরে থাকুক, চিনতে পারা যায় এমন কোনও একস্ট্রাকেও আমরা দেখতে পাইনি।

।। ২১ ।।

লস এঞ্জেলিসে আমরা যাঁরা বাড়িতে উঠেছি, ধরা যাক, তাঁর নাম তাপসবাবু। তিনি ছেলেবেলায় কোনও বইতে ক্যালিফোর্নিয়ার একটি সুন্দর বর্ণনা পড়ে ঠিক করেছিলেন, জীবনে কোনও না কোনওদিন ক্যালিফোর্নিয়া দেখতে যাবেনই। তারপর চাকরি জীবনে নানা জায়গা ঘুরতে-ঘুরতে ইউরোপ হয়ে, শেষ পর্যন্ত সেই ক্যালিফোর্নিয়াতেই থিতু হয়ে বসেছেন। এবং তাঁর স্বপ্ন ভঙ্গ হয়নি, তাঁর কল্পনার ক্যালিফোর্নিয়ার সঙ্গে বাস্তবের জায়গাটিও মিলে গেছে।

ইওরোপেও এরকম একজনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, যিনি স্কুল জীবনে মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা 'লাফাং যাত্রা' পড়ে মনে মনে সংকল্প নিয়েছিলেন যে-কোনও উপায়ে একদিন না একদিন তিনিও হিচ হাইকিং করে সারা ইওরোপ ঘুরবেন। আজ তিনি কুড়ি-পঁচিশ বছর ধরে ইওরোপ প্রবাসী। এখন আর হিচ হাইকিং করেন না অবশ্য। নিজের গাড়ি চালিয়েই যখন তখন ফ্রান্স থেকে জার্মানি কিংবা সুইটসারল্যান্ড কিংবা ইতালি চলে যান।

ক্যালিফোর্নিয়ার তাপসবাবুর চেহারা আর পাঁচজন বাঙালিবাবুর মতন হলেও তিনি কিন্তু আর বাঙালি নন। তিনি এখন আমেরিকান। বেশ কয়েক বছর আগেই তিনি পুরোদস্তুর মার্কিন নাগরিকত্ব পেয়েছেন, এখানকার নির্বাচনে ভোট দেন, এখানকার ফুটবল খেলায় তাঁর নিজস্ব প্রিয় দল আছে, সেই দলের জয়ে তিনি উল্লসিত হন, পরাজয়ে মুহ্যমান। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের ব্যাপারে তাঁর কোনও আগ্রহ নেই। ভারতবর্ষ এখন তাঁর পূর্বপুরুষদের দেশ। যেমন অনেক শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান মাঝে-মাঝে পূর্বপুরুষদের দেশ দেখবার জন্য আয়ারল্যান্ডে কিংবা জার্মানিতে কিংবা রাশিয়ায় যায়, সেই রকম তাপসবাবুও ক্বচিৎ কখনও কলকাতায় যাওয়ার কথা ভাবেন। ওঁর স্ত্রী-ও অবশ্য বাংলার মেয়ে। ঝুমুর দেবী পড়াশুনো করতে বিদেশে এসেছিলেন, তারপর চাকরি, তারপর এঁর সঙ্গে পরিচয় এবং বিবাহ। ঝুমুর দেবীর বরং প্রাক্তন স্বদেশ সম্পর্কে টান একটু বেশি মনে হয়। নানা প্রসঙ্গে সেই কথা এসে পড়ে। এই ঝুমুর দেবী আমাদের দীপকদার মাসতুতো কিংবা পিসতুতো বোন।

আবার এর উলটোটাও দেখা যায়। পনেরো-কুড়ি বছর ধরে প্রবাসী বাঙালি দম্পতির হঠাৎ একদিন মনে হয়, আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে, এবার তল্পিতল্পা গুটিয়ে দেশে ফেরা যাক। বিশেষত ছেলেমেয়েরা বড় হতে শুরু করলেই মন এরকম উন্মনা হয়। এ দেশের নিয়ম অনুযায়ী ছেলেমেয়ে আঠারো

বছর বয়সে পা দিলে ঘরছাড়া হয়ে যাবেই। সারা জীবনে আর ক'বার তাদের মুখ দেখতে পাওয়া যাবে সেটাই সন্দেহ। স্বাবলম্বিনী হওয়ার আগেই মেয়ে তার বয় ফ্রেন্ডের সঙ্গে ডেটিং করতে চলে যাবে, সারারাত হয়তো বাড়িই ফিরল না। বাঙালি বাবা-মায়েদের হৃদয় এখনও এটা ঠিক মেনে নিতে পারে না। সুতরাং তার আগে আগেই যদি দেশে ফেরা যায়...। সমস্যা অনেক, এখানকার জীবনযাত্রার মান দেশে ফিরে গিয়ে পাওয়া অসম্ভব। একটা ভদ্রমতন, সম্মানজনক চাকরি পাওয়াও খুব শক্ত, উপযুক্ত বাসস্থান জোগাড় করারও সমস্যা আছে। গুণী সন্তানদের দেশে ফিরিয়ে আনবার জন্য ভারত সরকার অনেক রকম ব্যবস্থা নিয়েছেন বলে শোনা যায়। তবে অবস্থাটা অনেকটা সেই রকম, "খোকন, সত্বর ফিরিয়া আইস। মা শয্যাশায়ী। তুমি যাহা চাহিয়াছিলে তাহাই পাইবে—" এই বিজ্ঞাপন বেরুবার পর খোকন যেদিন সত্যিই বাড়ি ফিরে এল, সেদিন তার পিঠে বাবা-জ্যাঠার লাঠির ঘা পড়তে লাগল দমাদ্দম করে। তবু, একরকম ঝুঁকি নিয়ে স্বামী ফিরে আসতে চাইলেও স্ত্রীর দ্বিধা কাটতে চায় না। অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপ দিতে পুরুষরা যতটা উৎসুক, মেয়েরা ততটা নয়।

অবশ্য, পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের ছোট করবার জন্য এ কথা বলছি না। হিসেবি, কৃপণ, ভীতুর ডিম, পুরুষ মানুষ কি নেই? পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি বেপরোয়া, দুঃসাহসিনী নারীও আমি দেখেছি। আসল কথাটা হল, বিদেশে মেয়েরা অনেকখানি স্বাধীনতা পায়. যতটা সমান অধিকার সেখানে ভোগ করে, যেমন আত্মসম্মান বজায় রেখে চলতে পারে, তেমন তো দেশে ফিরে এসে পারে না। তাই তারা ইতস্তত করে বেশি। অনেক সময় স্বামী-স্ত্রী এ ব্যাপারে একমত, তবু সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব হয়। ছেলেমেয়েদের মতামতেরও তো প্রশ্ন আছে। যেসব শিশুরা এইসব দেশে ভূমিষ্ঠ হয়েছে, এখানেই বেড়ে উঠেছে, এখানকার তুষারের মধ্যে খেলা করেছে, এখানকার স্কুলে বন্ধুবান্ধব পেয়েছে, এখানকার জল হাওয়া রোদে যাদের শরীর গড়ে উঠেছে, তাদের তো এইসব জায়গাই প্রিয় হবে। বাংলার মাটি কিংবা কলকাতার ধুলো সম্পর্কে তো তাদের কোনও নস্টালজিয়া থাকার কথা নয়।

অনেকরকম বাঙালির সঙ্গে দেখা হয় এখানে ঘুরতে-ঘুরতে। একদিন একটা বাড়িতে গেছি। পাশের ঘরে একজনের কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠেছিলুম। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এদেশে এসেছেন নাকি? ঠিক যেন তিন পয়সার পালার সংলাপ শুনছি। পরে আলাপ হল, অজিতেশ নন, তাঁর ভাই মোহিতেশ। একইরকম গলার আওয়াজ, একইরকম সদালাপী ও সুরসিক। তবে দৈর্ঘ্যে অজিতেশের চেয়ে একটু কম। মোহিতেশ একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, পেট্রোল অনুসন্ধানের ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ, একটি আন্তর্জাতিক কোম্পানির উচ্চপদে কাজ করতেন, আমরা থাকতে থাকতেই ওঁর আরও উঁচু পদে প্রমোশন হল। দেশের প্রতি ওঁর আন্তরিক টান আছে, দেশের অবস্থার জন্য উনি গাঢ় দুঃখ বোধ করেন দেখা হলেই এ বিষয়ে আলোচনা হত। ভারতবর্ষের তো এমন দরিদ্র থাকার কোনও কারণ নেই, খাদ্যে ভারত স্বয়ম্ভর, যন্ত্রপাতি উৎপাদনেও কারুর থেকে পিছিয়ে নেই। অভাব শুধু পেট্রোলের, যা ছাড়া আধুনিক সভ্যতা অচল। যত বৈদেশিক মুদ্রা ভারত রোজগার করে, তা সবই খরচ হয়ে যায় শুধু পেট্রোল কেনবার জন্য। মোহিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ভারতেও যথেষ্ট পেট্রোল আছে, কিন্তু তা উদ্ধার করার জন্য যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থা যে কেন গ্রহণ করা হচ্ছে না তা কে জানে। একজন আন্তর্জাতিক পেট্রোল বিশারদের মতে বড়-বড় নদীগুলোর মোহনায় পেট্রোল পাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। সেই অনুযায়ী গঙ্গার মোহনায় নিবিড় অনুসন্ধান হল না কেন? মোহিতেশ আরও বললেন, জানেন ভারত সরকার অনেক সময় আমেরিকা বা কানাডা থেকে বিশেষজ্ঞ নিয়ে যান, তাদের মাইনে হয় ভারতীয় বিজ্ঞানীদের চেয়ে পঁচিশ-তিরিশ গুণ বেশি। এরকম পরিবেশে কাজ হয়? অথচ, অনেক ভারতীয় বিশেষজ্ঞ (যেমন মোহিতেশ নিজেই একজন, একটা আমার সংযোজন) এদেশে অনেক আমেরিকান-কেনেডিয়ানের চেয়ে উঁচু পোস্টে, বেশি মাইনের কাজ করেন।

বিজ্ঞানী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ভালো ছাত্র ছাড়াও আরও অনেক রকম বাঙালির সন্ধান পাওয়া যায় এদেশে। ট্যাক্সি চালক কিংবা হোটেলের পরিচারক হিসেবে কোনও বাঙালিকে দেখলে চমকে উঠি। অনেক ভাগ্যান্বেষী বাঙালি এদেশে এসে ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলেছে। বাঙালি ব্যাবসা করছে শুনলে আমরা এখনও আশ্চর্য হই। কিন্তু আলামোহন দাস ধরনের দু-একজন বাঙালিকেও এদেশে দেখা যায়। অবশ্য পাঞ্জাবি এবং গুজরাতিরাই এ ব্যাপারে অনেক বেশি অগ্রণী।

একজন বাঙালি যুবকের সঙ্গে আলাপ হল এখানে। প্রথম কিছুদিন টুকটাক চাকরি ও নানারকম কষ্ট সহ্য করবার পর এখন তিনি জীবনে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর ব্যাবসা রিয়েল এস্টেটের, অর্থাৎ জমি ও বাড়ি বিক্রি করা। ক্যালিফোর্নিয়ার জনসংখ্যা হু-হু করে বাড়ছে, সেই জন্য বাড়ির খুব চাহিদা। ইনি পতিত জমি উদ্ধার করে সেখানে বাড়ি তৈরি করে বিক্রি করেন। এই ব্যাপারে তাঁর বেশ সুনাম হয়ে গেছে। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা দেশ থেকে যেসব অভিজ্ঞতা নিয়ে যান, তার মধ্যে প্রধান হল ঘুষ দেওয়া। ঘুষের ব্যাপারে বেশ একটা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা আছে। সেখানে ভারতীয়রাও পিছপা হয় না। ওই যুবকটির কাছ থেকে একটা গল্প শুনেছিলুম। উনি এক জায়গায় জমি কিনে অনেকগুলি বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু সেই জায়গাটি বসত বাড়ির উপযুক্ত নয়, এই কারণ দেখিয়ে নগর স্থপতি প্ল্যানটি বানচাল করে দিলেন। তখন উনি নগরীর মেয়রকে প্রস্তাব দিলেন যে আস্ত একটি বাড়ি তাকে উপঢৌকন দেবেন। সঙ্গে সঙ্গে সব প্ল্যান পাস হয়ে গেল। আমেরিকায় সব কিছুই তো বড়-বড়, তাই ঘুষের ব্যাপারটাও ছোটখাটো হলে চলে না। পঞ্চাশ একশো টাকা ঘুষ দিতে গেলে এরা খুব নীতিবাগিশ হয়ে যাবে, কিন্তু এক লাখ টাকা দিলে আনন্দের সঙ্গে লুফে নেবে। ঘুষ নিয়ে ধরা পড়াটা দারুণ অপরাধ। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট কার্টারের ভাই তার দাদার নাম ভাঙিয়ে এক জাপানি কোম্পানির কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছিল, কাগজওয়ালারা সেটা ফাঁস করে দিয়ে বেচারিকে একেবারে নাজেহালের একশেষ করে দিয়েছে।

লস এঞ্জেলিসের অনেক দোকানের বাইরে দুটি বিজ্ঞাপন দেখে আমি বড্ড মজা পেয়েছি। একটি হল, "এখানে খাঁটি ইম্পোর্টেড জিনিসপত্র পাবেন।" আর অন্যটি "আমরা আসল বিদেশি জিনিস রাখি।" ফরেন জিনিসের প্রতি ভারতীয়দের আসক্তি নিয়ে আমরা অনেক ঠাট্টা ইয়ার্কি করি। কার বাড়িতে ক'টা ইম্পোর্টেড গুডস আছে, তাই দিয়ে ঠিক হয় সামাজিক পদমর্যাদা। এইসব ফরেন বা ইম্পোর্টেড গুডস বলতে অধিকাংশ সময়েই বোঝায় আমেরিকান। অথচ খোদ আমেরিকাতেও বিদেশি ও ইম্পোর্টেড জিনিসের প্রলোভন দেখিয়ে বিজ্ঞাপন থাকে। আবার মনে হল, মানুষের চরিত্র সব জায়গাতেই এক।

আমেরিকানদের কাছে এই লোভনীয় বিদেশি দ্রব্য অবশ্য সবই প্রায় জাপানি। বিশেষত জাপানি গাড়ি ও গাড়ির পার্টস।

লস এঞ্জেসিল ছাড়বার আগের দিন আমরা গেলুম সান ডিয়েগোর 'সমুদ্র জগৎ' দেখতে। অনেক দেশ ঘুরে অনেক কিছু দেখতে-দেখতেও এরকম অনুভূতি খুব কমই হয় যে, আঃ, আজ এটা যা দেখলুম, এটা একেবারে অকল্পনীয় ছিল। সান ডিয়েগোতে এসে আমার সেইরকম অনুভূতি হয়েছিল। এ একেবারেই অভাবনীয় এবং সত্যিকারের নতুন।

সান ডিয়েগোতে প্রধান দ্রষ্টব্য দুটি, চিড়িয়াখানা এবং সমুদ্র জগৎ। পুরো একদিনে একটার বেশি দেখা যায় না। সময়াভাবে আমাদের যে-কোনও একটা বেছে নিতে হবে, তাই আমরা 'সমুদ্র জগৎ' যাব ঠিক করলুম। অন্যটি দেখিনি বলে জানি না আমাদের নির্বাচন ঠিক হয়েছিল কি না, কিন্তু যা দেখেছি, তার তুলনা নেই।

লস এঞ্জেলিস থেকে সান ডিয়েগো ঘণ্টাতিনেকের পথ। একদিন সকালে আমরা সবাই মিলে সেজেগুজে বেরিয়ে পড়লুম। জিয়া আর প্রিয়া নামের বালিকা দুটির উৎসাহই বেশি, কারণ, এর মধ্যে দু-একদিন ওদের বাড়িতে রেখে আমরা বড়রা একটু আলাদা ঘোরাঘুরি করেছিলুম। আবার

আমরা সকলে এক সঙ্গে। জয়তীদি যেদিন শাড়ি পরেন সেদিন তাঁর চেহারা একরকম, আবার যেদিন জিন্স পরেন সেদিন একেবারে সম্পূর্ণ অন্যরকম। তা ছাড়া শাড়ি পরলে উনি বেশ নরম মেজাজে থাকেন আর দুঃখী দুঃখী বাংলা গান করেন। আর যেদিন জিন্স পরেন সেদিন একেবারে টম বয়। কোনদিন কোনটা পরবেন, সেটটা অবশ্য ওঁর খেয়ালের ওপর নির্ভর করে। আজ জয়তীদি নিজে জিন্স পরেছেন তো বটেই, ওঁর লাজুক মেজদিকেও ওই পোশাক পরিয়েছেন। মেজদির ধারণা, উনি শাড়ির বদলে জিন্স পরেছেন বলে সারা পৃথিবীর লোক ওঁর দিকে তাকিয়ে আছে। যদিও এখানকার লোকেরা কে কী পোশাক পরল তা নিয়ে ভ্রূক্ষেপও করে না। বাচ্চা মেয়ে দুটি সব সময়ই জিন্স পরে। আর দীপকদার পোশাক তো একটাই। একটা রংচটা জিন্স আর একটা মেটে সিঁদুর রঙের ঈষৎ ছেঁড়া গেঞ্জি। ছ'দিন সাতদিন ধরে দীপকদাকে ওই একই বস্ত্রে দেখা যায়। জয়তীদির ঝাঁজালো অনুরোধে উনি যদি বা কোনও এক সকালে পাট ভাঙা জামা-প্যান্ট পরলেন, কিন্তু বিকেলেই তা ছেড়ে আবার জিন্স ও গেঞ্জিতে প্রত্যাবর্তন। আজ আমি ও শিবাজিও জিন্স পরে ফেলায় আমাদের পুরো দলটাকেই জিন্স পার্টি বলা যায়।

জিন্স নামের এই প্রায় চটের কাপড়ের প্যান্টালুন এক সময় ছিল আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণির পোশাক, এখন বাকি সবাই জিন্স করে, শুধু শ্রমিক শ্রেণি অন্য পোশাকে বাবুয়ানি করে।

প্রশান্ত মহাসাগরের পাশ দিয়ে চমৎকার পথ। দীপকদার গাড়িটি বাতানুকুল, তা সত্ত্বেও আমরা কাচ নামিয়ে দিলুম সমুদ্রের হাওয়া খাওয়ার জন্য। দূর থেকে সান ডিয়েগোকে অলকাপুরীর মতন সুন্দর দেখায়। এক সময় আমাদের গাড়ি এসে থামল সি ওয়ার্ল্ড-এর গেটের সামনে। ডিজনিল্যান্ডের মতন এখানেও দশ টাকার টিকিট কিনে ঢুকলে সারাদিন ধরে সব কিছু যতবার খুশি দেখা যায়।

দেখবার যে কতরকম জিনিস, তার ইয়ত্তা নেই। এখানেও সেই আমেরিকান বিশালতা। অল্পে সন্তুষ্ট হওয়ার জাত এরা নয়। ডিজনিল্যান্ডে যেমন অনেক উদ্দাম কল্পনাকে চাক্ষুষ করা হয়েছে নানারকম যন্ত্রপাতি দিয়ে, এখানে তেমন শুধু জল ও জলজ প্রাণীর খেলা। না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

সমুদ্রের জলকে টেনে আনা হয়েছে অনেকখানি ভেতরে। এক এক জায়গায় বাঁধন দিয়ে সেখানে স্টেডিয়াম বা গ্যালারি বা সিনেমা হলের মতন, সেখানে বসে-বসে প্রতিবার এক-একটি অদ্ভুত জিনিস প্রত্যক্ষ করছি।

ডলফিন বা শুশুক মানুষের পোষ মানে জানতুম, কিন্তু হাঙর? সিন্ধুঘোটক, এমনকী তিমি? মানুষের এই বিস্ময়কর ক্ষমতায় স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। ওয়ালরাস ও ডলফিন নিয়ে নাটক, কালো তিমি মাছের নাচ? এর মধ্যে কোনওটাই কৃত্রিম বা সাজানো নয়। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে এসব দেখতে-দেখতে আমাদের কৌতূহল ও বিস্ময় ক্রমশই বেড়ে যায়। এসব দৃশ্য দেখবার, বর্ণনা করবার নয়। তবে শামুর কথা বলতেই হয়। শামু একটি খুনি তিমির আদরের ডাক নাম। তার ওজন সাত টন না চোদ্দো টন কত যেন। পৃথিবীর বৃহত্তম এবং ভয়ংকরতম প্রাণী। গ্রিক দেবতার মতন রূপবান একজন যুবকের নির্দেশে সে নানান খেলা দেখায় আমাদের, এমনকী একবার হুকুম শুনে জল থেকে তিরিশ-চল্লিশ ফিট উঁচুতে লাফিয়ে উঠে আমাদের অভিবাদন জানায়। যুবকটি তাকে এক বালতি মাছ খেতে দিয়ে আদর করে এবং শামুর পিঠে চড়ে বসে। তারপর সেই অতিকায় তিমি ও গ্রিক দেবতা জলের ওপর দিয়ে চলে যায় রূপকথার জগতে।

এইসব দেখতে-দেখতে আমি জিয়া ও প্রিয়ার দিকে তাকাই। বালিকা দুটির চোখের মুগ্ধতা দেখে বোঝা যায়, ওরা এখানে নেই, ওরা রয়েছে এখন ওদের কল্পলোকে।

॥ ২২ ॥

পৃথিবীটা যে আসলে কত ছোট প্রমাণ পেলুম এক রাতে।

জয়তীদিদের এক আত্মীয়ের আত্মীয়-বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গেছি, প্রচুর লোকজন সেখানে, একতলা-দোতলা জুড়ে নিমন্ত্রিতরা ঘোরাঘুরি করছে। আমি যথারীতি বসে আছি এক কোণে একটা চেয়ারে, হঠাৎ এক সময় একজন কেউ ঘুরে-ঘুরে বলতে লাগল, এখানে নীললোহিত নামে কে আছে? তার ফোন এসেছে।

বিশ্বাস করাই শক্ত আমার পক্ষে। এই অচেনা বাড়িতে আমায় কে ফোন করবে? আমি যে এখানে থাকব, তা তো কারুর জানার কথা নয়। এমনকী এই সন্ধেবেলাতেও আমি দোনামোনা করছিলুম আসব কি না। তাছাড়া এই মাঝরাতে কে আমার খোঁজ করবে?

উঠে গিয়ে ফোন ধরে বললুম, হ্যালো?

প্রথমে একটা হাসির শব্দ। তারপর একটি নারী কণ্ঠ প্রশ্ন করল, কোনও সুন্দরী মেয়ের পাশ থেকে তোমায় উঠে আসতে হল বুঝি? ডিসটার্ব করলুম তো?

শুনেই চিনেছি, আমার বন্ধু বরুণ চৌধুরীর স্ত্রী মীনার গলা।

কলকাতা ছাড়ার কয়েকদিন আগেই ওদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। এর মধ্যে ওদের মার্কিন দেশে বেড়াতে আসা আশ্চর্য কিছু নয়, কিন্তু আমায় এখানে টেলিফোন করা পরমাশ্চর্য ব্যাপার। কারণ, এ বাড়ির টেলিফোন নাম্বার আমি নিজেও জানি না।

তারপর বরুণ চৌধুরী বলল, খুব টোটো করে ঘুরে বেড়াচ্ছ তো, কিন্তু আমরা ঠিক ধরে ফেলেছি।

কথায়-কথায় জানলুম ওরা রয়েছে শ' তিনেক মাইল দূরে মার্সেড শহরে। দিন দু-এক আগে লাস ভেগাস যাওয়ার পথে এসেছে ওখানে, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের ভাই ডাক্তার চিত্ত চট্টোপাধায়ের বাড়িতে। সেখানে আজ সন্ধেবেলা আড্ডা দিতে-দিতে আমার প্রসঙ্গ উঠেছিল। কোথায় আমাকে পাওয়া যেতে পারে? আমি ভ্রাম্যমাণ, আমার কোনও ঠিকানা নেই। কিন্তু আমার সম্পর্কে একটা ব্যাপার অনায়াসে আন্দাজ করা যায়, আমি নিশ্চয়ই পয়সা বাঁচাবার জন্য কোনও হোটেলে উঠব না, কোনও বাঙালির বাড়িতেই আশ্রয় নেব। লস এঞ্জেলিস-এ বাঙালির সংখ্যা কম নয়, ঠিক কোন বাড়িতে আমি উঠব তা বোঝা প্রায় অসম্ভব। তবু ওরা অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। কয়েক জায়গায় ফোন করে নাম জেনেছে আমার আশ্রয়দাতার। সেখানে ফোন করে জেনেছে আমি নেমন্তন্ন খেতে এসেছি এখানে।

টেলিফোনে এমনভাবে ওদের সঙ্গে গল্প হল, যেন এলগিন রোডের সঙ্গে গড়িয়াহাটের আড্ডা।

মিনা ও বরুণ চৌধুরী দুদিন পরে এসে পৌঁছবে লস এঞ্জেলিসে, আর আমাদের কাল সকালেই এ জায়গা ছেড়ে যাওয়ার কথা। জিয়া আর প্রিয়া উতলা হয়ে উঠেছে বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য, তা ছাড়া দীপকদার বিশ্ববিদালয়ের ক্লাস শুরু হয়ে যাবে।

কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ায় এসে সানফ্রান্সিসকো যাওয়া হবে না, এ কি চিন্তা করা যায়? বিশ্বের বিখ্যাত নগরীগুলিকে যদি সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় লাইন দিয়ে দাঁড় করানো যায়, তাহলে অনেক বিচারকই সান ফ্রান্সিসকোকে প্রথম স্থান দেবেন। আমি অবশ্য দেব না, কারণ বিচারক হিসেবে আমি বড্ড খুঁতখুঁতে। এখনও পৃথিবীর যেসব স্থান আমি দেখিনি, আমার মনে হয়, তারা আরও বেশি সুন্দর। সানফ্রান্সিসকো আমার আগে একবার দেখা।

লস এঞ্জেলিস থেকে সানফ্রান্সিসকো যাওয়ার পথে মাঝামাঝি জায়গায় বেকার্সফিল্ড নামে একটা মাঝারি শহর আছে। এখানে থাকেন ডাক্তার মদনগোপাল মুখোপাধ্যায়, তিনি আগে থেকেই কড়ার করে রেখেছেন, তাঁর ওখানে একবার যেতেই হবে।

পরদিন সকালে জয়তীদি ও মেজদিরা গেলেন লস এঞ্জেলিস-এর বাজার উজাড় করে আনতে,

আমি আর দীপকদা আড্ডা দিতে বসলুম। শিবাজি তার অতি প্রিয় একটা ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, বিছানায় শুতে না শুতেই ঘুম।

দীপকদা পদার্থবিজ্ঞানী, কিন্তু আধুনিক সাহিত্য থেকে শুরু করে সমাজতত্ত্ব এমনকী মহাকাশ অভিযান পর্যন্ত নানান বিষয়ে তাঁর উৎসাহ ও পড়াশুনো, সুতরাং তাঁর সঙ্গে আড্ডা দিতে বসলে কখন যে সময় কেটে যায়, বোঝাই যায় না।

বেরুতে-বেরুতে আমাদের অনেক দেরি হয়ে গেল। এক হিসেবে এটা আমাদের উলটো যাত্রা। কানাডা থেকে ক্যালিফোর্নিয়ায় আসবার সময় আমরা সানফ্রান্সিসকোকে পাশ কাটিয়ে লস এঞ্জেলিসে এসেছিলুম। যে পথ দিয়ে আমরা এসেছিলুম, অনেকটা সেই পথ ধরেই ফিরে যাচ্ছি।

বেকার্সফিল্ডে পৌঁছতে কেন যে আমাদের রাত দুটো বেজে গেল তা জানি না। মাত্র আড়াইশো মাইলের ব্যাপার, তাই তাড়া ছিল না। দীপকদা দু-তিনবার কফি খাওয়াবার জন্য গাড়ি থামিয়েছেন। অবশ্য বেকার্সফিল্ডে এসে ঠিকানা খুঁজতেও অনেকটা সময় গেছে। এত রাতে কি কারুর বাড়িতে যাওয়া যায়? পাড়া একেবারে শুনশান। বাড়িগুলো দেখলেই বোঝা যায় বেশ অভিজাত পাড়া। কোনও বাড়িতে আলো জ্বলছে না। এদেশে রাস্তায় কুকুর থাকে না, নইলে এই নিঝুম রাতে আমাদের গাড়ি থেকে নামতে দেখলে নিশ্চয়ই কুকুর তেড়ে আসত।

কিন্তু সন্তর্পণে গিয়ে বেল টেপা মাত্র দরজা খুলে গেল। ডাঃ মুখার্জি আমাদের প্রতীক্ষায় জেগেই ছিলেন। সহাস্য মুখে বললেন, আসুন, আসুন।

ডঃ মদনগোপাল মুখোপাধ্যায় অতি সদালাপী ও অমায়িক মানুষ। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি আমার মদনদা হয়ে গেলেন। অবশ্য নামটা যত ভারিক্কি, সেই তুলনায় বয়েস বেশি নয়। নিম্নচল্লিশেই তিনি ক্যানসার বিশেষজ্ঞ হিসেবে এদেশে যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন।

আমরা অনেকগুলো মানুষ, সকলেরই জন্যই আলাদা-আলাদা ঘরে শোওয়ার ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। এত রাত্রে আর আড্ডা জমবে না, আমরা শুয়ে পড়ার উদ্যোগ করলুম। আমাদের মধ্যে শিবাজিকেই বেছে নিয়ে মদনদা বললেন, দেখবেন, মনের ভুলে যেন জানালা খুলে ফেলবেন না। তা হলেই পুলিশ ছুটে আসবে।

কাছাকাছি কয়লাখনি আছে বলেই বোধহয় লস এঞ্জেলিস-এর তুলনায় বেকার্সফিল্ড একটু গরম। সুতরাং রাত্রে জানলা খুলতে আপত্তি কেন?

মদনদা বুঝিয়ে দিলেন যে প্রত্যেক দরজা-জানালায় বার্গলার্স অ্যালার্ম লাগানো আছে। চোর-ডাকাত কিছু ভাঙবার চেষ্টা করলেই শুধু যে এখানেই সতর্ক ঘণ্টা বেজে উঠবে তা নয়, থানায় একটা বোর্ডে আলো জ্বলে উঠবে, তা দেখে বোঝা যাবে, কোন বাড়িতে হানাদার এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসে যাবে।

এদেশের পুলিশ খুব ভালো দারোয়ানগিরি করতে পারে।

পরদিন বেশ বেলা করে উঠে ঘুরে ঘুরে দেখলুম মদনদার বাড়ি। এর আগে যত বাঙালির বাড়িতে গেছি, এত বড় ও ঝকঝকে তকতকে বাড়ি আর দেখিনি। বাড়ির সঙ্গে আছে বাগান, সুইমিং পুল, টেনিস কোর্ট ইত্যাদি। দুটি বসবার ঘর, যার মধ্যে একটির নাম ফ্যামিলি রুম। অর্থাৎ একটিতে বাইরের লোক এলে বসানো হবে, অন্যটিতে বাড়ির বাচ্চারা খেলবে কিংবা বড়রা টিভি দেখবে। সেইরকম খাবারের ঘরও দুটি। একটি বাইরের লোকদের জন্য বেশি সাজানো, অন্যটি প্রতিদিনের ব্যবহারের জন্য। এছাড়া আছে বার কাউন্টার। ঠিক যেন সিনেমার বাড়ি। বসবার ঘরের কার্পেট এত গভীর যে পা ডুবে যায়।

এইসব বাড়িতে ঘোরাফেরা করতে অস্বস্তি লাগে। কখন যে কোথায় দাগ লেগে যাবে, কিংবা মেঝেতে সিগারেটের ছাই ফেললে কী কেলেঙ্কারি হবে, এই চিন্তাতেই সর্বক্ষণ কাঁটা হয়ে থাকতে হয়। কিন্তু গৃহস্বামী ও গৃহস্বামিনীর ব্যবহারের আন্তরিকতায় এই অস্বস্তি দূর হয়ে যায়। যারা বস্তুর,

চেয়ে মানুষকে বেশি মূল্য দেয়, তাদের কাছে কোনও অসুবিধে নেই। ডলিবউদি চমৎকার হাসিখুশি মানুষ, ওঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে, তাদের নাম মিষ্টি আর মিঠাই। বোঝাই যাচ্ছে, ডলিবউদি সন্দেশ-রসগোল্লা খুব ভালো বানাতে পারেন।

মদনদা খুব ব্যস্ত ডাক্তার হলেও তাঁর নানা রকমের শখ আছে। উনি বিভিন্ন দেশের মুদ্রা ও তলোয়ার সংগ্রহ করেন, বই ও ছবি কেনেন। এ ছাড়া আছে ওঁর গাড়ির শখ। আপাতত ওঁর চারখানা গাড়ি। মার্সিডিজ, ক্যাডিল্যাক, বি এম ডব্লু ও আর একটা কী যেন! নীহাররঞ্জন গুপ্তর রহস্য-উপন্যাসে রাজা মহারাজারা সবসময় ক্যাডিলাক গাড়ি চেপে আসত, সেই ক্যাডিলাকে আমি চাপব ভেবে বললুম, ক্যাডিলাক! ওরেঃ বাবা!

আমার দিকে অন্যরা এমনভাবে তাকাল, যেন আমি একটা ঘোর বাঙাল!

ক্যাডিলাকের তুলনায় মার্সিডিজ বেঞ্জ, বি এম ডব্লু নাকি আরও উঁচু জাতের গাড়ি। বিশেষত যে গাড়িটার নাম আগে শুনিনি, শুনলেও মনে রাখতে পারি না, দুশো চল্লিশ না চারশো আশি কী যেন, সেটা নাকি পৃথিবীর সেরা।

দীপকদা সেই গাড়িটার পিঠে সস্নেহে হাত বুলিয়ে বললেন, বুঝলেন মদনবাবু আমারও খুব গাড়ির শখ। কিন্তু আমি মাস্টার মানুষ, এসব গাড়ি কেনবার কথা ভাবতেই পারি না।

মদনদা ভদ্রতা করে বললেন, বাঃ, আপনিও যে এত বড় পনটিয়াক গাড়িটা এনেছেন, এটা কম কীসে?

আমি গাড়ি বিষয়ে কিছুই বুঝি না। আমার ধারণা, যে গাড়ি থেমে থাকে না, চলে, সেটাই ভালো। শুধু-শুধু বেশি দামের গাড়ি কেনার কী মানে হয় কে জানে। যাই হোক, পর্যায়ক্রমে মদনদার সব গাড়িতেই একবার করে চেপে জীবন ধন্য করে নিয়েছি, বিশেষ তফাত অবশ্য বুঝতে পারিনি।

উন্মুক্ত জায়গায় লোহার ঘোরানো উনুন এনে সন্ধেবেলা বারবিকিউ ডিনার হল। এই ব্যাপারটা দীপকদাও বেশ ভালো পারেন, এডমান্টনে আমাদের একাধিক দিন খাইয়েছেন। পুরুষ রাঁধুনিদের একটা স্বভাব হল, তাঁরা কে কার চেয়ে ভালো রান্না করেন, তার প্রমাণ দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। দীপকদা বারবার বলতে লাগলেন, মদনবাবু, আপনি আঁচটা একটু বেশি করে ফেলেছেন। আর মদনদা বলতে লাগলেন, আরে মশাই, আমি বারবিকিউ করতে-করতে ঝুনো হয়ে গেলুম, যে-কোনও রেস্তোরাঁয় চাকরি পেতে পারি...। শেষ পর্যন্ত ডলিদি বললেন, তোমরা দুজনেই সরো তো, আমি দেখছি।

মদনদা খুব দুর্লভ জাতের ওয়াইন সংগ্রহ করে রেখেছিলেন, ঝলসানো মাংসের সঙ্গে সেই আঙুরের রস যা জমল, তা আর বলার নয়। মেয়েদেরও জোর করে খাওয়ানো হল খানিকটা কবে ওয়াইন, কিংবা খুব একটা জোর করতে হয়নি বোধহয়, প্রথম গেলাসের পর নিজেরাই বাড়িয়ে দিয়েছেন দ্বিতীয় গেলাস। অল্পতেই ওঁদের ফুরফুরে নেশা হয়, একটু পরেই শুরু হয়ে গেল জয়তীদি ও মেজদির গান। প্রথমে 'জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে', তারপর যার যেটা মনে পড়ে। একটু পরে আমরা ছেলেরাও হেঁড়ে গলায় যোগ দিলুম। সত্যিই যেন চাঁদের আলোয় পিকনিক হচ্ছে। অফুরন্ত আনন্দ।

তখনও আমরা বুঝতে পারিনি, মিলিতভাবে এটাই আমাদের শেষ রাত।

মদনদা এক সময় একটা প্রস্তাব দিলেন, কাল থেকে তিনি কয়েকদিনের ছুটি নিচ্ছেন, সবাই মিলে একসঙ্গে কোথাও বেড়াতে গেলে হয় না?

মদনদা ছুটি নিচ্ছেন শুনে আমরা অবাক হলুম। ডাক্তাররা কখনও ছুটি পায় নাকি? মদনদা এখানকার একটি হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত, তাছাড়া তাঁর প্রাইভেট প্রাকটিসের এলাকা বহুদূর বিস্তৃত। চারখানা গাড়ি থাকা সত্ত্বেও তিনি একটি ছোট প্লেন কেনার কথা ভাবছেন। নিজেই চালাবেন। প্লেনে রুগি দেখার অনেক সুবিধে, অনেক সময় বাঁচে।

—সত্যি ছুটি নিচ্ছেন?

মদনদা বললেন যে, অনেকদিন ছুটি নেওয়া হয়নি, কোথাও বেড়াতে যাওয়া হয়নি, সুতরাং তাঁর মন উচাটন হয়ে উঠেছে।

কাছাকাছির মধ্যে দুটির যে-কোনও একটি জায়গায় যাওয়া যায়। লাস ভেগাস কিংবা সানফ্রান্সিসকো। দু-জায়গাই দু-রকম আকর্ষণ। মদনদার ঝোঁক লাস ভেগাসের দিকেই বেশি। শিবাজি প্রচুর সিনেমায় লাস ভেগাস দেখেছে, সে-ও লাফিয়ে উঠল। দীপকদারও অনিচ্ছে নেই। মেজদি দুটো জায়গাতেই যেতে চান।

কিন্তু এই পৃথিবী বিখ্যাত জুয়ার শহরে যেতে আমিই প্রথম আপত্তি তুললাম। আমার মনের মধ্যে একটা বিষম জুয়াড়ি আছে। কিন্তু লাস ভেগাসে জুয়া খেলতে যাব; সে মুরোদ আমার কোথায়? 'যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না'। পকেট গড়ের মাঠ নিয়ে কেউ জুয়ার আসরে যায়? সেই জন্যই আমি এখন মনে-মনে একা-একা জুয়া খেলা পছন্দ করি।

মদনদা বোঝালেন যে, লাস ভেগাসে শুধু জুয়া নয়, নাচগানের অনেকগুলো শো হয়, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা সেখানে আসে। এই তো ফ্রাঙ্ক সিনাত্রা দলবল নিয়ে সেখানে একটা শো করছেন। কিন্তু তাতেও আমি গললুম না, কারণ একেবারে গরিব হয়ে লাস ভেগাসে যাওয়া যায় না। আর জুয়ার শহরে গিয়ে জুয়া খেলব না, শুধু নাচ-গানের আসরে যাব, তারই বা কোন মানে হয়?

লাস ভেগাস যাওয়ার বিরুদ্ধে আর একটা বড় যুক্তি, আমাদের সঙ্গে বাচ্চারা রয়েছে, তারা ওখানে কী করবে? ওই শহর বাচ্চাদের জন্য নয়।

পরদিন বেরিয়ে পড়ল দুটো গাড়ি।

সানফ্রান্সিসকো যাওয়ার আগে, আমরা ঠিক করলুম, একটু মার্সেড ঘুরে যাওয়া হবে। যদি সেখানে মীনা ও বরুণ চৌধুরীকে এখনও পাওয়া যায়। কিন্তু পৌঁছে দেখলুম পাখি উড়ে গেছে। বরুণ ও মীনার উপস্থিতির উত্তাপ এখনও রয়েছে সেখানে, কিন্তু ওরা চলে গেছে লস এঞ্জেলিসে। সেখান থেকে ওদের ধরে আনা যায় না? মাত্র দুশো মাইল, যাওয়া-আসায় বড়জোর ছ'ঘণ্টা লাগবে। ফোন করা হল ওদের, কিন্তু উপায় নেই, ওরা জানাল যে, পরদিনই ওদের এদেশ ছেড়ে যাওয়ার জন্য প্লেনে রিজার্ভেশান হয়ে আছে।

চিত্ত চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর স্ত্রী আলো, দুজনেই ডাক্তার। আমাদের পেয়ে হইহই করে উঠলেন। আমাদের কিছুতেই ছাড়বেন না। চিত্তব বাড়ির সুইমিং পুলের ধারে বসে আড্ডা হল অনেকক্ষণ। এর আগেই আমরা চুপিচুপি ঠিক করে রেখেছি যে, এখানে রাত্ত কাটানো হবে না, আজ রাত্তিরের মধ্যেই সানফ্রান্সিসকো পৌঁছতে হবে।

চিত্ত আর তার স্ত্রীকে অনেক বুঝিয়ে, খাওয়া দাওয়া সেরে আমরা যখন বিদায় নিয়ে বাইরে এসে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি, তখন জয়তীদি বললেন, ওঁরা আর সানফ্রান্সিসকো যাবেন না। ওঁরা এবার বাড়ির দিকে রওনা হবেন।

প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি, এতদূর পরিকল্পনা করে এসে হঠাৎ এরকম সিদ্ধান্ত? কিন্তু, জয়তীদি বললেন, এতদিন ধরে গাড়িতে ঘুরে-ঘুরে ওঁর মেয়েরা ক্লান্ত। কানাডায় ফিরে স্কুলে যাওয়ার আগে দু-একদিন বিশ্রাম নেওয়া দরকার। সানফ্রান্সিসকো ওঁরা আগে দেখেছেন, সুতরাং...বিশেষত আমাদের নিয়ে ঘোরাবার জন্য মদন মুখার্জিকে যখন পাওয়া গেছেই...।

জয়তীদির সঙ্গে আমরা যুক্তিতে হেরে গেলুম। কোনও যুক্তি না থাকলেও অবশ্য উনিই জিততেন। এক একজনের ইচ্ছেটাই যুক্তি। ঠিক হল, ওঁর মেজদি আমাদের সঙ্গেই যাবেন, পরে তাঁকে কানাডায় পাঠিয়ে দিলেই হবে।

একটা ব্যাপারে আমি সাহেব। বিদায় নেওয়ার সময় বেশি বেশি আবেগের বিমোচন আমার পছন্দ হয় না। বাঙালিদের তো আশিবার আসি না বললে বিদায় নেওয়াই হয় না ঠিক মতন। আমি

দীপকদার গাড়ির কাছে গিয়ে সবার দিকে তাকিয়ে শুধু বললুম, আচ্ছা, আবার দেখা হবে। তারপর উঠে পড়লুম মদনদার গাড়িতে।

দুটো গাড়ি দুদিকে চলে গেল।

।। ২৩ ।।

বেশ কয়েক বছর আগে এক মুখচোরা বাঙালি ছোকরা এসেছিল সানফ্রান্সিসকো শহরে। গ্রেহাউন্ড বাস ডিপোতে এসে নেমেছিল সন্ধেবেলা, সঙ্গে একটা মাঝারি ব্যাগ, বলতে গেলে প্রায় সহায়সম্বলহীন, নিছক ভ্রমণের জেদেই সে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

কোনও নির্দিষ্ট থাকার জায়গা না থাকলে সানফ্রান্সিসকো শহরটি সন্ধেবেলা একা পৌঁছবার পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নয়। এই নগরীটি যেমন সুন্দরী তেমনই ভয়ংকরী। গোটা মার্কিন দেশেই অপরূপ সৌন্দর্যের সঙ্গে মিশে আছে নিদারুণ হিংস্রতা। সেই ছেলেটির কোনও থাকার জায়গার ঠিক নেই, পকেটে টাকাপয়সা যৎসামান্য, নতুন শহরে এসে সে ওয়াই এম সি এ-তে ওঠবার চেষ্টা করে। এর থেকে সস্তায় আর কোথাও থাকা যায় না।

ছেলেটি বাস স্টেশনেই টেলিফোন ডিরেক্টরি দেখে ফোন করল ওয়াই এম সি এ-তে। নিদারুণ দুঃসংবাদ, সেখানে একটাও জায়গা খালি নেই, আগামী দু-দিনের মধ্যে কোনও জায়গা পাওয়া যাবে না। নাম লিখিয়ে রাখলে তারপর ঘর পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু আজকের রাত্রিবাস কোথায় হবে?

ব্যাগটি পিঠে ঝুলিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। টিপি-টিপি বৃষ্টি পড়ছে। সেই সঙ্গে ছেলেটির গা ছমছম করছে। বন্দর-শহরে এমনিতেই লুঠেরা-বখেরাবাজ আর খুনে গুন্ডাদের আড্ডা থাকে, তার ওপরে সানফ্রান্সিসকো শহরে আছে একটা বিশাল চিনা উপনিবেশ। দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রহস্য লহরি সিরিজে ভয়াবহ সব চিনে গুন্ডাদের কাহিনি সে পড়েছে, চিনে-খুনিদের ছুরিগুলো হয় সরু লিকলিকে, পিঠে গাঁথলে বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে যায়, যাকে গাঁথা হল, সে কিছু না বুঝেই অক্কা পায়। রাস্তা দিয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে ছেলেটি হাঁটছে আর তার পিঠ শিরশির করছে।

ছেলেটির কাছে একটি মাত্র ঠিকানা আছে। সিটি লাইটস বুক স্টোরের আংশিক মালিক, তার নাম লরেন্স ফের্লিংগেটি। কবি অ্যালেন গিন্সবার্গ এই ঠিকানাটা তাকে দিয়ে বলেছিল, যদি কখনও সানফ্রান্সিসকো যাও, এর সঙ্গে দেখা কোরো। ছেলেটি ভাবল, এখুনি কি একবার ফের্লিংগেটিকে ফোন করা উচিত? কিন্তু ওর কাছে কি আশ্রয় চাওয়া যায়? সাহেবদের বাড়িতে হঠাৎ কোনও অতিথি আসে না, এ দেশে সবই অ্যাপয়েন্টমেন্টে চলে। ছেলেটি লাজুক, তাই সে ফোন করল না, সস্তার হোটেল খুঁজতে লাগল।

একটার পর একটা হোটেলের দরজা থেকে ফিরে যাচ্ছে সে। কোথাও ঘর খালি নেই, কোথাও দাম অতিরিক্ত চড়া। এর মধ্যেই বৃষ্টিতে ভিজে জবজবে হয়ে গেছে সে, ভাগ্যিস সানফ্রান্সিসকোতে তেমন শীত পড়ে না। সারা আকাশ চিরে বিরাট-বিরাট বিদ্যুৎ আর প্রচণ্ড বজ্রের গর্জন হচ্ছে মাঝে-মাঝে, যেন আকাশে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে।

ডাউন টাউন ছাড়িয়ে আসতেই রাস্তা একেবারে ফাঁকা, শুধু গাড়ি, কোনও পথচারী নেই। অচেনা শহরে এক কচি বয়েসের বঙ্গ সন্তান হেঁটে চলছে অসহায়ভাবে। এইরকম অবস্থায় একটা নেশার ভাব হয়, এক সময় সব ভয় কেটে যায়, মনে হয়, যা হয় হোক, চারটে ডাকাত ঝাঁপিয়ে পড়ুক, পেটে ছুরি চালিয়ে দিক, টাকা-পয়সা ব্যাগ-ট্যাগ কেড়ে নিয়ে চলে যাক, কিছু যায় আসে না। দেখা যাক না কে কত মারতে পারে।

দূরে একটা হোটেলের আলো দেখা যাচ্ছে, ছেলেটি এগোচ্ছে সেই দিকে, হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে দাঁড়াল তার সামনে একটা কালো দৈত্য। সাদা ধপধপে দাঁতে হেসে সে বলল, গট্ আ লাইট?

ছেলেটি প্রথমে দারুণ চমকে কেঁপে উঠলেও সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে গেল। এই কালো দৈত্যটি তার পেটে ছুরি মারবে। এই রকমই নিয়ম। বাধা দিয়ে কোনও লাভ নেই, কারণ এই কালো দৈত্যটি ইঁদুরছানার মতন তার টুঁটি চেপে ধরে শূন্যে তুলে লোপালোপি করতে পারে।

ছেলেটি অভিমানভরা কণ্ঠে বলল, আমার কাছে তো দেশলাই নেই?

এই কথাগুলি বলায় এবং তার পরবর্তী উত্তর শোনার মাঝখানে যেন কেটে গেল একযুগ।

এখনও সে মরেনি? নাকি ছুরি চালিয়ে দিয়েছে, সে টের পাচ্ছে না?

কালো দৈত্যটির হাতে সিগারেটের পাকেট, তখনও ছুরি কিংবা রিভলবার দেখা যাচ্ছে না। সে বলল, হোয়াইয়ু গোয়িং, ম্যান।

অল্প দূরে 'হোটেল সিসিল' লেখা বাতি স্তম্ভটি দেখাল ছেলেটি আঙুল তুলে।

কালো দৈত্যটি কী যেন একটু চিন্তা করে বলল, কম্ কম্।

তারপর সে ছেলেটির সঙ্গে-সঙ্গে চলতে লাগল। এতক্ষণেও মরে না যাওয়ায় ছেলেটি বেশ অবাক হয়েছে। কালো মানুষটি তাকে এত দয়া করছে কেন? এত জনশূন্য রাস্তায় তাকে ঝট করে খুন করে ফেললে কেউ তো দেখবার নেই। অন্তত ব্যাগটা তো কেড়ে নিয়ে অনায়াসেই পালাতে পারে।

হোটেলের কাউন্টারে যে ফরসা মেয়েটি বসেছিল তার সঙ্গে কালো লোকটিই প্রথমে কিছুক্ষণ কথা বলল। সে কথার মর্মোদ্ধার করা শক্ত। তবে মনে হচ্ছে, কালো লোকটি ফরসা মেয়েটিকে বেশ অনুরোধ করছে।

একটু বাদে ফরসা মেয়েটি ছেলেটিকে বলল, শোনো আমাদের হোটেলেও জায়গা নেই। এইরকম সময়ে তুমি হোটেল রিজারভেশন ছাডাই সানফ্রান্সিসকো শহরে এসেছ? যাই হোক, তোমার বন্ধুর অনুরোধে একটা ব্যবস্থা করতে পারি, যদি তুমি রাজি থাকে।

ছেলেটি আকাশ থেকে পড়ল। বন্ধু? মাত্র দেড় মিনিট আগে দেখা, পরস্পরের নামও জানে না, এর মধ্যে ওরা বন্ধু হয়ে গেল? এ আবার কী ধরনের চক্রান্ত?

মেয়েটি বলল, একটা ডাব্‌ল বেড রুমে একটা বেড খালি আছে। যে লোকের ঘর, সে এখন নেই, যে-কোনও সময় এসে পডতে পারে, তবে তাকে বলা আছে যে তার ঘরের অন্য বিছানাটি আব একজনকে দেওয়া হতে পারে। তুমি সেটা নিতে রাজি আছ?

অচেনা লোকেরা সঙ্গে রাত্রিবাস? সে কীরকম কে জানে? এই কালো লোকটি কোনও মতলবে নিয়ে তাকে ওই ঘরে ঢোকাচ্ছে? কিন্তু ভাড়া এত অবিশ্বাস্যরকমের সস্তা যে ছেলেটি এক কথায় না বলতে পারল না।

কালো লোকটি কাউন্টারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সে হঠাৎ বলল, হে! ইয়ু লুক সো স্কেয়ার্ড... হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা।

ফরসা মেয়েটি কিন্তু হাসে না। সে বলল, যদি রাজি থাকো, তবে তোমার গাড়িটা পেছন দিকে রেখে এসে রেজিস্টারে নাম লেখো—

গাড়ি ছাড়া, এমনকী ট্যাক্সিও না নিয়ে, পায়ে হেঁটে কেউ সানফ্রান্সিসকো শহরে রাত্তিরবেলা হোটেল খুঁজতে বেরুতে পারে, এ কথা এরা বিশ্বাসই করতে পারবে না। খুনে-ছিনতাইবাজরা সবাই কি আজ ক্যাজুয়াল লিভ নিয়েছে?

ছেলেটি বলল, আমার গাড়ি নেই, কোথায় নাম লিখতে হবে বলো।

কালো লোকটি ঝুঁকে কাউন্টারের ওপাশ থেকে একটা দেশলাই তুলে নিয়ে কী একটা দুর্বোধ্য বিদায় বাক্য বলে হঠাৎ নেমে গেল রাস্তায়। মেয়েটি নিজেই ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে লিফ্‌টে উঠল, সাততলায় একটা ঘরের দরজা খুলে দিয়ে, এতক্ষণ বাদে একটু মুচকি হেসে বলল, হ্যাভ আ নাইস টাইম।

তারপরেই সে প্রায় একটা পাখির মতন উড়ে গেল ফুরুৎ করে।

এরকম অবস্থায় শুধু একটা কথাই মনে হয়, এ কোথায় এসে পড়লুম রে, বাবা!

ঘরটি মাঝারি, মধ্যে টেবিল ল্যাম্প সমেত ছোট টেবিল, দুপাশে দুটো খাট। একটি বিছানা নিভাঁজ পরিচ্ছন্ন, অন্য বিছানাটি এলোমেলো। ওয়ার্ডরোবের দরজাটা হাট করে খোলা, তার মধ্যে কয়েকটা জামা-প্যান্ট আর একটা ওভারকোট ঝুলছে। নীচে একটা সুটকেসও রয়েছে, সেটাও তালাবন্ধ নয় উঁচু হয়ে আছে ডালাটা। এ ঘরের আসল মালিক কীরকম মানুষ কে জানে। ওভারকোটের সাইজ দেখে মনে হচ্ছে বেশ লম্বা-চওড়া। সে যদি এসে বলে তার কোনও জিনিস চুরি গেছে? কিংবা মাঝ রাত্তিরে সে যদি কোনও বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে এসে তাকে বলে, গেট আউট! না, না, গেট আউট তো ভদ্র ভাষা, সে নিশ্চয়ই বলবে, গেট দা হেল আউট অব হিয়ার!

ছেলেটি বিমর্ষভাবে নিজের খাটে বসে জুতো-মোজা খুলে ফেলল। তার মাথায় এখন আকাশপাতাল চিন্তা। রাস্তার কালো লোকটি কেন তাকে এই হোটেলে পৌঁছে দিয়ে থাকবার ব্যবস্থা করে দিল? বিনিময়ে পয়সাকড়ি কিছু চাইল না, একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত নেওয়ার জন্য দাঁড়াল না! ও কি দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ? কাউন্টারের মেয়েটি যাওয়ার সময় মুচকি হেসে গেল কেন? তাকে নিয়ে কোনও মজার খেলা হবে? এঘরের মালিক রাত্তিরবেলা এসে তাকে তুলোধোনা করবে?

বাঙালি ছেলেদের স্বভাব হচ্ছে এই যে, তারা এক কথায় মরে যেতে একটুও ভয় পায় না, কিন্তু মার খাওয়া বড্ড অপছন্দ করে।

ভয়ের সঙ্গে একটা খিদের সম্পর্ক আছে। ছেলেটি যদিও বিকেলবেলা একটা বেশ বড় হ্যামবার্গার আর কফি খেয়েছে, তবু এর মধ্যে তার খিদে পেয়ে গেল। কিন্তু খাবার জন্য তাকে আবার বাইরে যেতে হবে? কোনও দরকার নেই! তার ব্যাগে বিস্কুট, চিজ আর আপেল আছে।

কিন্তু খাওয়ার আগে অন্য একটা কাজের কথা তার মনে পড়ে গেল। সে যে এই শহরে এসেছে তা কেউ জানে না। এখন তো থাকবার জায়গা জুটেছে, এখন শ্রীযুক্ত লরেন্স ফের্লিংগেটির সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা যেতে পারে। রাত আটটাও বাজেনি, বইয়ের দোকান খোলা থাকাই সম্ভব। ঘরেই ফোন আছে, সহজেই সিটি লাইট বুক স্টোরস পেয়ে গেল সে। কিন্তু তার পরই দুঃসবাদ। মিঃ ফের্লিগেটি ইজ নট ইন টাউন! কাল-পরশু ফিরে আসতে পারেন। যাঃ, এ শহরের সঙ্গে ছেলেটির একমাত্র যোগসূত্রও নষ্ট। এখন যদি সে এখান থেকে নিঃশব্দে হারিয়ে যায়, কেউ টেরও পাবে না।

ঘরের সংলগ্ন একটি বারান্দাও আছে। আপেল কামড়াতে-কামড়াতে ছেলেটি খালি পায়ে এসে বারান্দায় দাঁড়াল। এতক্ষণ বাদে তার খেয়াল হল যে প্রায় দু-ঘণ্টা আগে সে সানফ্রান্সিসকোয় পৌঁছলেও নানারকম দুর্ভাবনা নিয়ে এমন ব্যস্ত ছিল যে এ-শহরের কিছুই তার চোখে পড়েনি। এ-শহরের এত নাম সে শুনেছে, কিন্তু এ পর্যন্ত সে দেখেছ শুধু কয়েকটি রাস্তা আর বড় বড় বাড়ি, যা সব শহরেই আছে। এই বারান্দা থেকেও বিশেষ কিছু দেখা যায় না, তবে দূরে দেখা যাচ্ছে একটা উজ্জ্বল আলোর আভা, ওখানে কিছু আছে নিশ্চয়ই। এমন কিছু রাত হয়নি, এখনও সে বেরিয়ে শহরটা ঘুরে দেখে আসতে পারে, এইসব শহর রাত্রিরই শহর, এরা রাতমোহিনী। কিন্তু ছেলেটির আর উৎসাহ নেই,তার বিমর্ষ ভাব কিছুতেই কাটছে না।

যে-কোনও বড় শহরেই একাকিত্ব অতি সাংঘাতিক। যেন দম আটকে ধরে। তা ছাড়াও এই ধরনের অদ্ভুত রাত্রির আশ্রয়ে সে কিছুতেই সুস্থির হতে পারছে না। কল্পনায় ইতিমধ্যে সে তার রুমমেটের প্রায় পঁচিশ রকম চেহারা ভেবে ফেলেছে।

অনেকক্ষণ বাস জার্নি করে এসেছে বলে আজকের রাতটা সে বিশ্রামই নেবে ঠিক করল। সাহেবরা স্লিপিং সুট পরে ঘুমোয়, ছেলেটির তা নেই, তার আছে পাজামা আর পাঞ্জাবি। যদি এই পোশাক দেখেই তার রুমমেট রেগে যায়? কিন্তু কী আর করা যাবে, উপায় তো নেই, সেই পোশাকেই শুয়ে পড়ল সে।

অবশ্য ঘুম আসবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। প্রতি মুহূর্তে সে তার রুমমেটের প্রতীক্ষা করছে।

এই বুঝি দরজায় খুট করে একটা শব্দ হয়। যত রাত বাড়ছে, তত আশঙ্কা বাড়ছে। কারণ বেশি রাতে যে ফিরবে, সে নিশ্চয়ই বদ্ধ মাতাল হয়েই ফিরবে। ওরে বাপ রে, সাহেব-মাতাল, তার একটা কথাও বুঝতে পারা যাবে না...।

ছেলেটি নিজের ওপরেই ক্ষুব্ধ হয়ে ভাবল, দূর ছাই কেন যে নাস্তিক হতে গিয়েছিলাম। নইলে এই সময়টায় তো ভগবানকেও ডাকা যেত উদ্ধার করে দেওয়ার জন্য।

একটু বাদে বাদেই সে উঠে টেব্‌ল ল্যাম্প জ্বেলে ঘড়ি দেখছে। রাত সাড়ে দশটা...বারোটা...পৌনে একটা...দুটো...আড়াইটে...এখনও সে মক্কেলের ফেরার নাম নেই।

ফাঁসির আসামিও তো আগের রাত্রে ঘুমোয়, সেই রকম সে-ও ঘুমিয়ে পড়েছিল একসময়। কী একটা শব্দে ঘুম ভেঙে যেতেই সে চোখ মেলে দেখল সকালের আলোয় ঘর ভরে গেছে। আর তার ঠিক মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক। লোকটি অস্বাভাবিক লম্বা কিন্তু রোগা, চোখ দুটো একেবারে নীল, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, তার হাতে কী একটা অদ্ভুত জিনিস, মেশিনগান-টান কিছু হবে নিশ্চয়।

বোবায় ধরা মানুষের মতন সদ্য ঘুম ভাঙা ছেলেটি ভয়ার্ত আঁ আঁ শব্দ করে উঠে বসল। হাতজোড় করে বাংলায় ক্ষমা চাইতে গেল—।

সেই রোগা লম্বা লোকটি কিন্তু খুবই বিনীতভাবে এবং নরম,পরিচ্ছন্ন ইংরেজিতে বলল, আমি খুব দুঃখিত, তোমার ঘুম ভাঙালুম। আমি জানতুম না আমার ঘরে কেউ আছে, অবশ্য আগে আমায় জানানো হয়েছিল কেউ এসে থাকতে পারে, আমি খুব দুঃখিত, তুমি আবার ঘুমোও আমি কোনও শব্দ করব না...।

লোকটির হাতে মেশিনগান নয়, একটা বেহালার বাক্স!

ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, না, না, আমি আর ঘুমোব না। আপনার যদি কোনও অসুবিধে হয়, আমি তা হলে বাইরে যেতে পারি।

নীল-চক্ষু লোকটি বলল, সে কি, বাইরে যাবে কেন? প্লিজ, তুমি আর একটু ঘুমোও, কিংবা যা খুশি করো, আমার কোনও অসুবিধে নেই। তুমি কি ইজিপ্টের লোক?

ছেলেটি বলল, না আমি ভারতীয়।

লোকটি বলল, দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম, তুমি খুব প্রাচীন কোনও দেশের মানুষ, তোমার ঘুমন্ত মুখে এমন একটা শান্তির ভাব ছিল যা আমাদের নেই।

একটু বাদেই খুব আলাপ হয়ে গেল দুজনের। নীল চক্ষু লোকটি একটি নাইট ক্লাবে বেহালা বাজায়। খুবই নম্র স্বভাবের মানুষ। দিনের বেলা সে ঘুমোয়। সন্ধে থেকে সারারাত সে ঘরে থাকে না। সুতরাং বাঙালি ছেলেটি সারাদিন ঘুরে বেড়াতে পারবে, সন্ধের পর এই ঘরটি তার নিজস্ব হয়ে যাবে।

এরপর দিনচারেক ছিল ছেলেটি ওই শহরে। তার একটুও অসুবিধে হয়নি, কোনও জোচ্চোর খুনে-বদমাইসের পাল্লায় পড়েনি। লরেন্স ফের্লিংগেটির সঙ্গে দেখাও হয়েছিল, খুব খাতির করেছিল। আর তার রুমমেটের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল যে একদিন বিনা পয়সায় নিয়ে গেল নাইট ক্লাবে। সেই কালো দৈত্যটির সঙ্গেও পরে দেখা হয়েছিল, অতিশয় সহৃদয় মানুষ...।

এবার সানফ্রান্সিসকো ঢোকার মুখে আমার মনে পড়েছিল সেই আগের বারের অভিজ্ঞতার কথা। প্রথম রাত্রির ভয়াবহ স্মৃতি। এখন ভাবতে অবশ্য মজা লাগছে, কিন্তু সেদিন যে বেদম ভয় পেয়েছিলুম, তাও তো ঠিক।

এবার সানফ্রান্সিসকোতে প্রবেশ করছি সম্পূর্ণ অন্যভাবে। মদনদার ঝকঝকে নতুন মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়িতে আমরা সবাই মিলে বাংলায় গান গাইতে-গাইতে। যেন আমরা এই শহরটা জয় করতে চলেছি।

।। ২৪ ।।

এবার তাহলে সেই ঘটনাটা লিখি? যে-ঘটনাটার এক চুল এদিক-ওদিক হলেই আমি এতদিনে স্বর্গে গিয়ে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের সঙ্গে বেলের পানা খেতুম কিংবা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিমপাতার রস খেতে খেতে আধুনিক কবিতা বিষয়ে তর্ক করতুম কিংবা কার্ল মার্কসের সঙ্গে চা খেতে-খেতে চিন ও রাশিয়ার ঝগড়া বিষয়ে তাঁর মতামত জেনে নিতুম। কিংবা ওসব কিছুই না করে একালের উর্বশী মেরিলিন মনরোর সাহচর্য লাভে ধন্য হতুম।

কিন্তু একটুর জন্য আমি আমার নামের আগে চন্দ্রবিন্দু বসাবার সেই সুবর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছি।

মদনদাদের সঙ্গে দিন দু-এক তো দারুণ হইচই করে কাটল স্যানফ্রান্সিসকো শহরে। যেমন সুন্দর শহর, তেমনই ঝকঝকে দিন আর নরম রাত্রি। এই শহরটির বৈশিষ্ট্য হল, যে-কোনও দিকে মিনিট পাঁচ দশ গেলেই সমুদ্র চোখে পড়ে। এই শহরে এখনও আছে পুরোনো আমলের ট্রাম, আবার এমন অত্যাধুনিক বহুতল বাড়ি আছে যে দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। শহরের মাঝামাঝি রয়েছে বিরাট চিনে পাড়া, সেখানে গেলে মনে হয় মূল চিন ভূখণ্ডে পৌঁছে গেছি। রাস্তায় টাটকা চিনে শাক সবজি বিক্রি হচ্ছে, সিনেমা হলে চিনে ছবি, ব্যাঙ্কের নাম চিনে ভাষায় লেখা। এখানকার কোনও কোনও চিনে খুবই বড়লোক। একবার শুনেছিলুম কোনও একজন চিনে ব্যাঙ্কার গোটা সানফ্রান্সিসকো শহরটাই কিনতে চেয়েছিল।

নানান দ্বীপের সঙ্গে সানফ্রান্সিসকো শহরটি জোড়া। এখানকার গোল্ডেন গেট ব্রিজ জগদ্বিখ্যাত। এমন নিঁখুত স্মার্ট চেহারার ব্রিজ দেখলে সত্যিই আনন্দ হয়। কোনও প্রয়োজন নেই, তবু এমনি এই ব্রিজে বারবার এপার-ওপার হতে ইচ্ছে করে। যে-দ্বীপটিতে বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয় অধিষ্ঠিত, মূল শহরের সঙ্গে সেই দ্বীপটি একটি সাড়ে আট মাইল লম্বা ব্রিজ দিয়ে জোড়া। অবশ্য এক লাফে সমুদ্রলঙ্ঘনের সময় হনুমান যেমন মাঝখানে একবার এক ডুবো পাহাড়ে একটু পা ছুঁয়েছিল, সেইরকম এই সাড়ে আট মাইল লম্বা ব্রিজটিও একবার এক জায়গায় কিছু পাথরের স্তূপে পশ্চাৎদেশ ঠেকিয়েছে।

একদিন সকালবেলা গিয়েছিলুম বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে। হার্ভার্ড বা ইয়েলের মতন তেমন কুলীন নয় বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়, তবু এর খ্যাতি অন্য কারণে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসেই নানান আন্দোলনের জন্ম হয়েছে, সিভিল রাইট্‌স, উইমেন্‌স লিব্‌, ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রতিবাদ, আণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা বিরোধী মিছিল ইত্যাদি। অনেক হাঙ্গামা হয়েছে এখানে, পুলিশি আক্রমণে অনেক রক্ত ঝরেছে, তবু এখানকার ছাত্রছাত্রীরা অসম সাহস দেখিয়েছে।

আমরা যেদিন গেলুম, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটি। সব দিক অসম্ভব শান্ত। এখানে-সেখানে ঘাসের ওপর অলসভাবে শুয়ে আছে এক জোড়া করে ছেলেমেয়ে, অতিরিক্ত পড়ুয়া কেউ কেউ সাইকেলের পেছনে এক গাদা বইপত্র চাপিয়ে চলেছে লাইব্রেরিতে। আমেরিকার অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসই এত বড় যে ভেতরে বাস চলে, এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে যাওয়ার জন্য। বার্কলের ক্যাম্পাস যেন আরও বড়। কতটা যে বড় তা এক সঙ্গে দেখবার জন্য একটা ব্যবস্থা আছে। মাঝামাঝি একটা জায়গায় আমাদের মনুমেন্টের মতন একটা স্তম্ভ আছে, তার ভেতরে লিফ্‌ট চলে, আট আনার টিকিট কাটলেই ওপরে ওঠা যায়।

ওপরে উঠে শুধু যে চোখ জুড়িয়ে গেল তাই নয়, একটা দীর্ঘশ্বাসও পড়ল। আমাদের দেশে এমন সুন্দর ক্যাম্পাস কোনওদিন হবে না? শান্তিনিকেতনে অনেক গাছপালা আছে, কিন্তু বার্কলে ক্যাম্পাসের বড়-বড় বৃক্ষরাজি ও ফুলের সৌন্দর্য আরও অনেক বেশি। তা ছাড়া পেছনে রয়েছে পাহাড়ের পটভূমি আর তিন দিকে সমুদ্র।

এই প্রসঙ্গে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা একটু বলি। বার্কলে শুধু চোখে দেখেছি কিন্তু সেখানকার

কারুর সঙ্গে আলাপের সুযোগ সেদিন হয়নি। কিন্তু শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে একটা চমকপ্রদ তথ্য জানি। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় হার্ভার্ড-ইয়েলের মতন অভিজ্ঞতা তো নয়ই, পড়াশুনোর কৃতিত্বেও বার্কলের চেয়েও কিছু নীচে। তবু সেই শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসেই বেয়াল্লিশজন নোবেল লরিয়েট অধ্যাপক থাকেন। তাহলে হার্ভার্ড ইয়েল-বার্কেলেতে ওনারা কতজন আছেন কে জানে।

যাই হোক, আমাদের সানফ্রান্সিসকো সফরের পালা এবার ফুরিয়ে এল। সব সুখের দিনই তো একদিন না একদিন শেষ হয়। এবার মদনদারা ফিরে যাবেন, আমাকে একলা যেতে হবে অন্যদিকে।

ওঁরা সবাই মিলে আমায় তুলে দিতে এলেন গ্রে হাউন্ড বাস স্টেশনে। এরা বাস ডিপো বলে না, স্টেশন বলে, ঠিকই বলে। বড় বড় শহরে বাস স্টেশন অনেক রেল স্টেশনের চেয়ে বড়। যাত্রীদের জন্য ওয়েটিং প্লাটফর্মে এক-একটি চেয়ারের হাতলের সঙ্গে ছোট-ছোট টিভি সেট লাগানো আছে, যাতে তাদের সময় কাটাতে অসুবিধে না হয়।

আমার বাসটি এক্ষুনি ছাড়বে। আমি "একেলা এসেছি এই ভবে, একেলাই চলে যেতে হবে" এই গান গাইতে গাইতে উঠে পড়লুম। জানলার কাছে গিয়ে ওঁদের দিকে একটু হাত দেখাতেই বাস চলতে শুরু করল, তারপরই ঢুকে পড়ল অন্ধকার সুড়ঙ্গে। ব্যাস, আবার শুরু হল আমার একাকী ভ্রাম্যমান জীবন।

গ্রে-হাউন্ড বাসের চেহারা বাইরে থেকে এমন শক্তপোক্ত যে কুকুরের বদলে গণ্ডারের সঙ্গেই এর তুলনা দেওয়া উচিত। ভেতরটা অবশ্য শীততাপ এবং শব্দ নিয়ন্ত্রিত, একশো কুড়ি কিলোমিটার বেগে বাস চললেও ভেতরে বসে বিশেষ কিছু টের পাওয়ার উপায় নেই। পেছনে বাথরুম আছে। আপাতত প্রায় বেয়াল্লিশ ঘণ্টা আমাকে এই বাসে থাকতে হবে, সুতরাং আমি ঘাড় ঘুরিয়ে আমার সহযাত্রীদের দেখে নিলুম। জনাআষ্টেক চিনে, জনাপনেরো কালো মানুষ, জনাকুড়িক ফরসা। খয়েরি বলতে আমি একাই। আমার পাশে বসেছে...এখানে আমার খুব লিখতে ইচ্ছে করছিল যে আমার পাশে বসেছে একটা ফুটফুটে সুন্দরী মেয়ে, অধিকাংশ ভ্রমণ কাহিনিতেই যেমন হয়ে থাকে। কিন্তু আমার যা ভাগ্য! আসলে আমার পাশে বসেছে এক বুড়ি মেমসাহেব, যার মাথার উল্‌কো-ঝুল্‌কো চুল দেখলে মনে হয়ে নির্ঘাত উকুন আছে।

বুড়ি মেমদের সঙ্গে আলাপ করার জন্য কোনও চেষ্টা করতে হয় না, এরা নিজেরাই আলাপের জন্য মুখিয়ে থাকে। বুড়োবুড়িরা এদেশে অতি নিঃসঙ্গ, তাদেব কথা শোনবার সময় কারুর নেই, তরুণ সমাজ তাদের পাত্তাই দেয় না। সেইজন্য এরাও নতুন লোক দেখলেই কথায় ফোয়ারা ছুটিয়ে দেয়।

মুশকিল হচ্ছে এই যে, এরাও অনেকেই বার্ধক্যটাকে প্রসন্নভাবে মেনে নিতে পারে না। প্রাণপণে বয়েসটা চাপা দেওয়া চেষ্টা করে যায় শেষ দিন পর্যন্ত। আমার পাশে যে বুড়ি মেমসাহেব বসে আছেন, তিনি নিশ্চয়ই আমার দিদিমার বয়েসি, কিন্তু ঠোঁটে ও গালে উগ্র রং মাখা, পোশাকের রং খুনখারাবি, একটা বিরাট চকোলেট-বার নিয়ে কচরমচর করে খাচ্ছেন। বেশ একটা লাল পেড়ে সাদা খোলের শাড়ি পরিয়ে, চুল টানটান করে আঁচড়ে দিলে এবং মুখে এক খিলি পান গুঁজে দিলে বরং বেশ মানিয়ে যেত।

বুড়ি মেমটির সঙ্গে যেন আমার কতকালের চেনা এই ভঙ্গিতে সে প্রথমেই আমাকে জিগ্যেস করলেন, তুমি কি রিনোতে নামবে?

দু-দিকে ঘাড় নেড়ে আমি বললুম, না।

তিনি বেশ অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন, নামবে না? পঁয়তাল্লিশ মিনিট থামবে?

এবার মুখে কোনও উত্তর না দিয়ে আমি 'সে দেখা যাবে এখন' এই রকম একট ভাব করে কাঁধ ঝাঁকালুম। তারপরই কথাবার্তা থামাবার জন্য খুলে ফেললুম একটা বই।

রিনো শহরটির বিষয়ে আমি জানি। লাস ভেগাস যেমন বিশ্ববিখ্যাত জুয়া খেলার জায়গা, তার

কাছাকাছি এই রিনো শহরটিও জুয়ার জন্য প্রসিদ্ধ। লাস ভেগাসে আমাদের বাস থামবে না, কিন্তু রিনোতে চা খাবার স্টপ আছে। সব রেস্তোরাঁর মধ্যেই জুয়া খেলার যন্ত্র বসানো থাকে, অনেক যাত্রী ওইটুকু সময়ের মধ্যেই ভাগ্য ফেরাবার চেষ্টায় লেগে যায়।

এ কথা ঠিক, আমেরিকার সমস্ত জুয়ার আসরে বুড়িদের সংখ্যারই প্রাধান্য। এটাও তাদের নিঃসঙ্গতা কাটাবার একটা উপায়।

গ্রে-হাউন্ড বাসের ড্রাইভারদের ভাবভঙ্গি উচ্চপদস্থ অফিসারের মতন। খুব সম্ভবত সে রকমই মাইনে পায়। এরা স্বভাব-গম্ভীর ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে না, কিন্তু মাঝে মাঝে বক্তৃতা দেয়। সেজন্য এদের কাছে মাইক্রোফোন থাকে। বক্তৃতায় এরা বাস যাত্রার নিয়মকানুন স্মরণ করিয়ে দেয় এবং মেজাজ প্রসন্ন থাকলে কখনও-কখনও পথের দুপাশের বিশেষ দ্রষ্টব্য জিনিসগুলো সম্পর্কেও দু চার কথা বলে।

অনেকের ধারণা, বাস থাকলেই একজন কন্ডাকটর থাকবে, সেইজন্যই জানিয়ে দিতে চাই যে গ্রে-হাউন্ড বাসে ড্রাইভারই একমাত্র কর্মচারী।

আমাদের বাসটা ছাড়বার একটু বাদে ড্রাইভার মহোদয় যে বক্তৃতাটি দিলেন, তা শুনে তো আমার মাথায় হাত। নতুন নিয়মে বাসে ধূমপায়ী এবং অধূমপায়ী এলাকা ভাগ করা হয়েছে। একদম পেছন দিকের তিনটি রো-তে যারা বসেছে, শুধু তারাই সিগারেট টানার অধিকারী, বাকি সিটের যাত্রীদের ধূমপান নিষিদ্ধ।

আমি তো আগে এই কথাটা চিন্তাই করিনি। তাড়াতাড়ি উঠে সামনে যে-জায়গা পেয়েছি, তাতেই বসে পড়েছি। জায়গাটা অবশ্য ভালোই, সামনের দিকে, ড্রাইভারের কাছাকাছি এবং জানলার পাশে। কিন্তু বিয়াল্লিশ ঘণ্টা সিগারেট না খেয়ে থাকতে হবে? অবশ্য তিন চার ঘণ্টা অন্তর-অন্তর বাস এক-একটি স্টেশনে থামবে, সেখানে নেমে ফুকফুক করে দু-একটা সিগারেট টেনে নেওয়া যায়, কিন্তু তাতে কি আরাম হয়! সিগারেট তো আর শারীরিক ক্ষুধাতৃষ্ণা মেটাবার কোনও খাদ্য-পানীয় নয়, সিগারেট হল মনকে আকাশে ভাসাবার জন্য একটা বায়ু যান। মন যখন চাইবে তখন না পেলে আর পকেটে সিগারেট রাখার কী মানে হয়।

বেশ মনমরা হয়ে গেলুম।

আমার চোখ বইয়ের প্রতি নিবদ্ধ দেখেও বুড়ি মেম একটুবাদে জিগ্যেস করলেন, তুমি মেক্সিকো থেকে এসেছ?

—না।

—সাউথ আমেরিকা?

—না।

—আরব দেশ? ইরান?

—না।

—তুমি কোথা থেকে এসেছ?

—সানফ্রান্সিসকো থেকে।

—ও!

আমি ইচ্ছে করেই ভারতবর্ষের নাম করলুম না, তা হলেই অনেক কথা বলতে হবে। যাকে-তাকে ভারতবর্ষ বিষয়ে জ্ঞান দেওয়ার ইচ্ছে আমার নেই। বুড়ি মেমসাহেবের মুখ থেকে আমি পরিষ্কার জিনের গন্ধ পাচ্ছি। বাস ছাড়বার দেড় ঘণ্টার মধ্যেই উনি দু-বার বাথরুম ঘুরে এসেছেন। খুব সম্ভবত বাথরুমে গিয়ে উনি জিনের বোতলে একটা করে চুমুক দিয়ে আসছেন। আমি যে বাথরুমে গিয়ে সিগারেট টেনে আসব তার উপায় নেই, কারণ ড্রাইভার সাহেব আগেই নিষেধ করে দিয়েছেন, ওটা নাকি বিপজ্জনক।

রিনো শহরের কাছাকাছি আসতেই বুড়ি মেমের কী উৎসাহ। ঝলমলে মুখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এসে গেছে। এসে গেছে। তুমি আমি এক সঙ্গে খেলব। শোনো, এক মেশিনে বেশিক্ষণ খেলতে নেই, কমপিউটার প্রোগ্রামিং করা থাকে, সেই জন্য নানান মেশিনে চান্স নিতে হয়।

রিনোয় আমি নামলাম ঠিকই, কিন্তু চট করে চলে গেলুম উলটোদিকের অন্ধকারে। তারপর একটুবাদে চুপি চুপি একটা কফি কাউন্টারে বসলুম। বুড়ি মেম সাহেবের পাল্লায় পড়ে জুয়া খেলতে হলেই গেছি আর কি। পকেট যে গড়ের মাঠ তা তো ও জানে না।

ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাদে ফিরে এলুম বাসে। বুড়ি মেমসাহেব এখন ফেরেননি। ড্রাইভার যাত্রী সংখ্যা গুণে দেখলেন একজন কম। এইরকম অবস্থায় রেস্তোরাঁয় মাইক্রোফোনে ঘোষণা করে দেওয়া হয় যে অমুক নম্বর বাস এক্ষুনি ছাড়বে, যাত্রীদের শেষ আহ্বান জানানো হচ্ছে।

এর পরেও বুড়ি মেমসাহেব এলেন না। বাস ছেড়ে দিল। তাহলে কি ওঁর এখানেই নেমে যাওয়ার কথা ছিল? সেটা তো বুঝিনি, একটু পরেই আমার নজরে পড়ল, ওপরের র‍্যাকে একটা নীল ব্যাগ রয়েছে, ওটা তো বুড়ি মেমের। তাহলে? আমি উত্তেজিতভাবে উঠে গিয়ে ড্রাইভারকে কথাটা বললুম। তাঁকে বোঝাবার জন্য আমাকে ব্যাপারটা দু-তিনবার বলতে হল। ড্রাইভার ঘাড় ঘুরিয়ে ব্যাগটা একবার দেখে নিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে আমায় বলল, ফরগেট ইট!

আমার কেমন যেন একটা অপরাধ বোধ হল। বুড়ি মেম কি নীল ব্যাগটা ভুল করে ফেলে গেছে? অথবা, এখানে তার নামবার কথা ছিল না, জুয়ায় মেতে গিয়ে ও ওখানেই থেকে গেল। আমি সঙ্গে থাকলে হয়তো ওকে ফিরিয়ে আনতে পারতুম।

এরপর ঘুমিয়ে পড়লুম। মাঝরাত্রে একবার চোখ মেলে দেখলুম এর মধ্যে কোনও এক স্টেশন থেকে একজন মাঝবয়েসি সাহেব উঠে আমার পাশের সিটে বসেছে। কিছুই শেষ পর্যন্ত খালি থাকে না, প্রকৃতি শূন্যতা পছন্দ করে না।

তারপর খানিকটা ঘুম আর খানিকটা জাগরণে কাটতে লাগল সময। এর মধ্যে পাহাড়, গভীর অরণ্য, মরুভূমি পেরিয়ে ছুটতে লাগল বাস। মাঝে একবার ড্রাইভার বদল হয়ে গেল।

সকাল সওয়া ন'টায় বাস থামল সল্টলেক সিটিতে। সেখানে পেছনের সিট থেকে নেমে গেল একজন, অমনি আমি পড়িমড়ি করে ছুটে গিয়ে বসে পড়লুম সেই সিটে। যাক নিশ্চিন্ত আশ্রয় পাওয়া গেছে। নিজেব জিনিসপত্র সেখানে রেখে নামলুম ব্রেকফাস্ট খেতে।

বাস ছাড়ল দশটায়। পাঠক বিশ্বাস করুন, এবার কিন্তু সত্যিই আমার পাশের সিটে এক তরুণী নারী বসেছিল। সে অবশ্য আমার সঙ্গে কথা বলার কোনও চেষ্টাই না করে তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে। আমি আরাম করে একটা সিগারেট ধরালুম। পেছনের দিকের সিটে একটু ঝাঁকুনি লাগে, তা হোক, চলন্ত বাসে যেতে-যেতে সিগারেট খাওয়ার আনন্দই আলাদা।

এর পর দশ মিনিটও কাটেনি, আমার সিগারেটটা সবে মাত্র শেষ হয়েছে, এমন সময় কী যেন হল। আমি সিট থেকে লাফিয়ে উঠে বাসের ছাদে ধাক্কা খেয়ে তারপর লুটিয়ে পড়লুম মাটিতে। প্রথমে মনে হল মরে গেছি। কিন্তু শরীরে কোনও ব্যথা নেই। তারপরই শুনতে পেলুম, তিন-চারজন এক সঙ্গে চিৎকার করছে। হি ইজ ডেড্। হি ইজ ডেড্।

কে মারা গেছে? আমি? কোনও রকমে উঠে দাঁড়ালুম। বাসের সমস্ত লোক চিৎকার করছে, কয়েকজন কাঁদছে। অন্যদের কথায় বুঝতে পারলুম, মারা গেছে ড্রাইভার। উঁকি দিয়ে দেখলুম, ড্রাইভারের শরীর একেবারে ছিন্নভিন্ন, বাসের সামনের দিকটা তুবড়ে ঢুকে এসেছে ভেতরে। কিন্তু ড্রাইভারহীন বাস তখনও চলছে।

হয়তো কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার, কিন্তু মনে হচ্ছিন অনন্তকাল। সারা বাস জুড়ে ভয়ার্ত চিৎকার আরও বেড়ে গেল, কারণ, পরিষ্কার বোঝা গেল, বাসটা রাস্তা ছেড়ে পাশের খাদের দিকে নামছে। কত নীচে আছড়ে পড়বে কিংবা কোথায় ধাক্কা খাবে জানি না। সিনেমায় এইরকম সময় দেখা যায়

দপ করে একটা শব্দ হয়ে পেট্রোল ট্যাঙ্ক ফেটে যায়, তারপরে সমস্ত বাসটায় আগুন জ্বলে। আমার ঠিক ওই সিনেমার দৃশ্যের কথাই মনে হচ্ছিল, প্রতীক্ষা করছিলুম কখন আগুন জ্বলবে।

কিছুতে ধাক্কা লেগে বাসটা উলটে গেল একদিকে, কিন্তু আগুন জ্বলল না। সেই ধাক্কার সময় আমি আবার মাটিতে গড়াগড়ি খেলুম। তখনও মনে হল, মরিনি? বেঁচে আছি? হ্যাঁ, বেঁচেই তো আছি। বাসটা যেদিকে উলটে গেল, আমি ছিলাম তার ওপরের দিকে। কয়েকজনের গায়ের ওপর পড়েছিলুম, আমার ওপর সেই মেয়েটি। অত্যন্ত সাহসিনীর মতন সে আগাগোড়া চুপ করে ছিল। কোনওরকমে এটা সেটা ধরে উঠে দাঁড়ালুম দুজনে। এতক্ষণে অনেকে দমাদ্দম লাথি মারছে বাসের জানলায়। যে-কোনও মুহূর্তে আগুন জ্বলবে। একটা জানলা ভেঙে যেতেই আমরা কয়েকজন লাফিয়ে পড়লুম সেখান থেকে। অত উঁচু থেকে লাফিয়ে পড়ায় আমার একটা গোড়ালি মচকে গেল, সেই আমার প্রথম ব্যথা। তরুণী মেয়েটিকে আমরা কয়েকজন সাহায্য করলুম নামাবার জন্য, তারপর সবাই আগুনের ভয়ে দৌড়ে গিয়ে উঠলুম উলটো দিকের রাস্তায়।

আগুন অবশ্য শেষ পর্যন্ত জ্বলেনি। আমাদের বাসটার সঙ্গে একটা ট্রাকের ধাক্কা লেগেছিল, দুটোই ছিল দুর্দান্ত স্পিডে, সামান্য ধাক্কাই যথেষ্ট। দুই গাড়ির ড্রাইভারই মারা গেছে সঙ্গে-সঙ্গে। ট্রাকটাও উলটে পড়ে আছে একটু দূরে।

দু-তিন মিনিটের মধ্যে যেন মন্ত্রবলে গোটাদশেক পুলিশের গাড়ি-দমকল-অ্যাম্বুলেন্স এসে গেল। আমাদের বাস থেকে যাত্রীদের উদ্ধার কার্য চলছে, আমি দূরে বসে অলস চোখে দেখছি। থ্যাঁতলানো-চ্যাপটানো, হাত-পা ভাঙা এক-একটা শরীর বেরুচ্ছে, বাসের বডি কেটে-কেটে বার করা হচ্ছে। সামনের দিকটায় যাত্রীরাই নিহত ও আহত হয়েছে বেশি।

হঠাৎ আমার একটা সাংঘাতিক উপলব্ধি হল। খানিকটা আগেই আমিও তো সামনের দিকে বসেছিলাম। সিগারেট খাওয়ার টানে পেছনে চলে গিয়েছি। যদি না যেতাম! তাহলে এতক্ষণে আমিও ওই রকম থ্যাঁতলানো একটা শরীর, হাত কিংবা পা নেই...। ভেবেই আমার শিহরন হল।

কে বলে সিগারেটের উপকারিতা নেই? জয় সিগারেট।

তক্ষুনি সিগারেট ধরালুম একটা। কিন্তু আমার হাত কাঁপছে। সিগারেটে কোনও স্বাদ পাচ্ছি না। কপাল থেকে টপটপ করে রক্ত পড়ছে, কপালে যে কেটে গেছে তা খেয়ালই করিনি এতক্ষণ।

আমি মরে যেতে পারতুম, আমি মরে যেতে পারতুম। দশ-বারো মিনিট আগে সামান্য একটা সিদ্ধান্তের জন্য...। যদি পেছনের সিটটা খালি না হত, তাহলে এতক্ষণে এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে আমি একটা লাশ হয়ে যেতাম?

কে যেন বলেছিল মৃত্যুর উপলব্ধি খুব মহান? আমার তো সেরকম হল না? মৃত্যুর অত কাছাকাছি যাওয়ার পর আমি বেশ কিছুক্ষণ যেন বোধহীন, জড়ের মতন হয়ে রইলাম।

।। ২৫ ।।

দুর্ঘটনা তো সব দেশেই হয়। তাদের চরিত্রও মোটামুটি একই রকম। দুর্ঘটনার পরবর্তী অংশটির অভিজ্ঞতাই আলাদা।

আমাদের বাসটি দুর্ঘটনা ঘটাল সকাল দশটার সময়, প্রকাশ্য দিবালোকে এবং অপেক্ষাকৃত নির্জন রাস্তায়। সারারাত আমরা পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে এসেছি, তখন কিছুই হয়নি, অথচ বিপদ ঘটল কিনা নিরাপদ সমতলে। গ্রে-হাউন্ড বাস এমনিতেই খুব নির্ভরযোগ্য, ড্রাইভাররা খুবই অভিজ্ঞ এবং পরে শুনেছিলাম, আমাদের বাসের ড্রাইভারটি টানা পঁচিশ বছর নির্ভুল বাস চালাবার জন্য অতি সম্প্রতি কোম্পানির কাছ থেকে মেডেল পেয়েছিল। কিন্তু সকাল দশটায় গ্রে-হাউন্ড বাসটি একশো কুড়ি কিলোমিটার বেগে যাওয়ার সময় অন্য একটি ট্রাক তার নাকের কাছে ছোট্ট একটি ধাক্কা দিল, সঙ্গে-সঙ্গে দুই ড্রাইভারের শরীরই চিঁড়েচ্যাপটা। একে নিয়তি ছাড়া আর কীই-বা বলা যায়।

আমি প্রাণে বেঁচে যাওয়ার পর উলটো দিকের রাস্তায় ঘাসের ওপর বসে রইলুম। বারবার শরীরের নানা জায়গায় হাত বুলিয়ে দেখছি। চোখ দুটো ঠিক আছে, নাক ঠিক আছে, দুটো হাত, দুটো পা অক্ষতই আছে, মাথার খুলিও উড়ে যায়নি। বাঁ-ভুরুর ওপরে খানিকটা গর্ত হয়েছে। ডান পায়ের গোড়ালি মচকে গেছে, শুধু এইটুকুই যা বোঝা যাচ্ছে।

আমাদের বাসটির বডি কেটে-কেটে নামানো হচ্ছে অন্য যাত্রীদের। কজন নিহত, কজন আহত এখনই বোঝা যাচ্ছে না। অনেকেরই হাত-পা ভাঙা। পুলিশ ও অ্যাম্বুলেন্স এত তাড়াতাড়ি চলে এল কী করে, সেটাই বিস্ময়ের। রাস্তা দিয়ে পুলিশ পেট্রোল অনবরত ঘোরে, তা ছাড়া রাস্তার অন্য যেসব গাড়ি এই দুর্ঘটনা দেখেছে, তারা ওয়্যারলেসে খবর দিয়ে দিয়েছে নিশ্চয়ই, এক মিনিটও সময় নষ্ট হয়নি।

আমাদের দেশে এরকম একটা বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটলেই তারপর যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে আসে হাজার-হাজার মানুষ, তারা ভিড় করে দাঁড়ায় এবং প্রবল চ্যাঁচামেচির মধ্যে তৎক্ষণাৎ দুর্ঘটনা বিষয়ে পাঁচ রকম গল্প তৈরি হয়ে যায়। এখানে দৃশ্যটি একেবারে অন্যরকম। এ-দেশের রাস্তায় মানুয থাকে না, কয়েকটি যাত্রীগাড়ি থেমেছে বটে, কিন্তু তাদের কোনও সাহায্যের দরকার আছে কি না, এইটুকু জেনে নিয়েই চলে যাচ্ছে। এদেশের লোকেরা অকারণে কণ্ঠনালির ব্যবহার করে না। একটুও গোলমাল নেই। আমাদের মতন যেসব যাত্রীরা অনাহত হয়ে বসে আছি এক জায়গায়, সেখানেও সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা. শুধু একটি বাচ্চা ছেলে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদে যাচ্ছে। শিশুটির বয়েস পাঁচ-ছ'বছর, ফুটফুটে চেহারা, ওর সোনালি চুলে রক্ত মাখা। ওর মা একবার আমাদের জানিয়ে দিয়েছে যে ওই রক্ত ওই শিশুটির নয়, অন্য একজন আহত লোকের রক্ত ওর চুলে লেগে গেছে।

অজস্র মেরিপোসা আর খুনো লিলি ফুটে আছে রাস্তার ধারে। সেখানে পা ছড়িয়ে বসে আমি উদ্ধার কার্য দেখছি। শরীর ও মন অবশ হয়ে আছে, দৈবাৎ প্রাণ ফিরে পাওয়ার তীব্র আনন্দও বোধ করছি না।

আমরা যেখানে বসে আছি, সেই রাজ্যটির নাম ওয়াইওমিং। এখানে জনবসতি খুব বেশি নেই। মাইলপনেরো দূরে একটা ছোট শহর আছে, একটু পরেই সেখানকার নাগরিকরা এলেন আমাদের আতিথ্য দিতে। সঙ্গে দু-তিনজন ডাক্তারও এসেছেন। তাঁরা পরীক্ষা করতে লাগলেন আমাদের। গুরুতর আহতদের তো বার করার সঙ্গে-সঙ্গেই অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হাসপাতালে। কিন্তু আমাদের শরীরে সেরকম কিছু আঘাত না লাগলেও মানসিক আঘাত লেগেছে কি না সেটা পরীক্ষা করে দেখতে চান।

একজন বৃদ্ধ ডাক্তার আমার সামনে এসে বললেন, জীবনে তো এরকম অনেক কিছু হয়ই। সুতরাং এখন আর দুশ্চিন্তা করে লাভ নেই।

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালুম।

ডাক্তারটি আবার বললেন, মানুষের জীবন অনেক কিছুই সহ্য করতে পারে, তাই না?

আমি আবার ঘাড় নাড়লুম।

ডাক্তারটি এবার বেশ ধমক দিয়ে বলল, সে সামথিং!

ওঃ হো, ইনি বুঝি ভাবছেন আমি আকস্মিক শক-এ বোবা হয়ে গেছি? সুতরাং জোর করে ঠোঁটে খানিকটা হাসি টেনে এনে বললুম, আই অ্যাম অল রাইট।

আমার পাশের যে তরুণী মেয়েটি আগাগোড়া চুপ করে ছিল, ডাক্তারবাবুটি তাকেও জেরা করলেন ওইভাবে। সে মেয়েটিও শুধু ঘাড় নাড়ছিল। ডাক্তারটি একবার তাকে জিগ্যেস করলেন, তুমি কথা বলে পারো না? মেয়েটি জানাল, অকারণে কথা বলি না।

বিভিন্ন গাড়িতে তোলা হল আমাদের। মাইলপনেরো দূরের শহরটিতে এসে একটা বড় বাড়ির সামনে থামল গাড়িগুলো। সে বাড়ির একতলায় একটা হলঘর. মনে হল থিয়েটার হল, এর মধ্যেই

অনেকগুলো ক্যাম্প খাট পেতে ফেলা হয়েছে। আমাদের বলা হল সেখানে শুয়ে পড়তে। শুয়ে পড়লুম। সঙ্গে-সঙ্গে এল চা আর ডো-নাট। শুধু চা খেয়ে ডো-নাটগুলো রেখে দিলুম। তারপরেই এল কোল্ড ড্রিংক্‌স, পেপ্‌সি আর কোকা কোলার টিন। চায়ের পরেই এটা খেতে হবে? কিন্তু ওরা বলছে বলে খেয়ে নিচ্ছি। মনটা এমনই অবসন্ন যে যে-যা বলছে শুনছি।

তবু খানিকটা বাদে মনে হল, শুধু-শুধু এই দিনের বেলা রুগির মতন খাটে শুয়ে থাকব কেন? অনেক মহিলা আমাদের সেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছেন, আমাদের কার কী দরকার জিগ্যেস করছেন। এর মধ্যে একজন আমার কপালের ক্ষতটা সিল করে দিয়েছেন। আমি খাট থেকে উঠে বাইরে চলে এলুম। এখন আমাদের আবার পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেই তো হয়।

শুনলুম, তার উপায় নেই। টেলিভিশনের লোক, রেডিয়োর লোক, বিমা কোম্পানির লোক, গ্রে-হাউন্ড কোম্পানির লোক এবং পুলিশের কাছে আলাদা-আলাদা বিবৃতি দিতে হবে। একসঙ্গে সবার কাছে একেবারে বলে দিলে চলবে না, কেউ কোনও কিছু গোপন করছে কি না, কিংবা কেউ দুর্ঘটনার সঠিক কারণ সম্পর্কে কোনও আলোকপাত করতে পারে কি না তা জানবার জন্য ওরা নিজেরা গোপনে জেরা করবে। সব মিলিয়ে অনেক সময়ের ব্যাপার।

এরকম দুর্ঘটনা থেকে এদেশে অনেকে প্রচুর টাকা রোজগার করতে পারে। যারা আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত, তারা তো ক্ষতিপূরণ পাবেই। নিহতদের নিকট আত্মীয়রা যেমন খুশি টাকা দাবি করবে। যাদের কোনও বাইরের আঘাত লাগেনি, তারাও মানসিক আঘাত লেগেছে কিংবা গুরুতর কোনও কাজ নষ্ট হয়ে গেছে, এই দাবিতে এক লাখ দু-লাখ টাকা পেতে পারে। সেজন্য অবশ্য মামলা করতে হবে। পশ্চিমবাংলায় দ'খনোদের খুব মামলা করার ব্যাপারে সুনাম আছে, সে হিসেবে আমেরিকানরা প্রায় সবাই খুব দ'খনো। কথায়-কথায় মামলা করে। 'আই উইল স্যু ইউ' এটা একটা কথার লব্‌জ। এমনকি বাবাও যদি ছেলেকে বা মেয়েকে খুব বকাবকি করে, তখন ছেলে-মেয়ে বলতে পারে, ড্যাডি, ইউ আর হর্টিং মাই ফিলিং। সেই অভিযোগেও মামলা হয় এবং প্রমাণিত হলে বাবাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়।

কিন্তু মামলা-মোকদ্দমা করে বড়লোক হওয়ার সাধ আমার একটুও নেই, আমি এখন পালাতে পারলে বাঁচি।

আর একটি হল ঘরে জেরা চলছে। খুব সাজগোজ করা মহিলাদের ভিড়ও বাড়ছে। এক সময় কয়েকজন মহিলা একদিকের একটা টেবলে বিরাট এক ঝুড়ি আপেল এনে রাখলেন। আর কয়েকজন মহিলা আর একটা টেবলে রাখলেন এক ঝুড়ি আইসক্রিমের কাপ। তারপর দুদলই ডাকাডাকি করতে লাগলেন আমাদের।

এক সঙ্গে আপেল আর আইসক্রিম খাব? দুদলের পেড়াপিড়িতে নিতেই হল।

আর একটু পরে এসে গেল মিষ্টি বিস্কুট (এ দেশের ভাষার যার নাম কুকি) এবং ততোধিক মিষ্টি, তলতলে পিঠে (এ দেশে যার নাম পাই)। এ কী রে বাবা, এত সব খেতে হবে নাকি? একটু পরেই জানতে পারলুম যে এই ছোট শহরটির বিভিন্ন মহিলাদের ক্লাবের মধ্যে অতিথি পরায়ণতার একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। দলে-দলে মহিলারা রুজ-লিপস্টিক মেখে, তাঁদের শ্রেষ্ঠ পোশাকটি পরে সাজো-সাজো রবে ছুটে আসছেন দুর্গতদের সেবা করবার জন্য। রোটারি ক্লাব, লায়ন্স ক্লাব, অল মাদারস ক্লাব, সিস্টারস অব চ্যারিটি—এঁরাও নাকি এসে পড়বেন খানিকটা পরেই। অনেকদিন এখানে নাকি এরকম বড় গোছের দুর্ঘটনা ঘটেনি, অনেকদিন এঁরা পরোপকার করবার কোনও সুযোগ না পেয়ে উপোসি ছারপোকা হয়ে আছেন, আজ এমন সুবর্ণসুযোগ কেউ ছাড়তে চান না।

একদিকে পুলিশ-ইনসিওরেন্সের কাছে জেরা চলছে, অন্য দিকে আমরা অনবরত খেয়ে চলেছি। অত খাবার অবশ্য আমার পক্ষে খাওয়া সম্ভব নয়। মহিলারা হাতে একটা কিছু গুঁজে দিচ্ছেন আর

আমি বাইরে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে টপাস করে ফেলে দিচ্ছি। এইভাবেই, দুর্ঘটনার বিভীষিকা মন থেকে মুছে গিয়ে সব কিছুই বেশ হাসির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। আমাদের উপকার করার জন্য সুন্দরী-সুন্দরী মহিলাদের চোখে মুখে কী দারুণ উৎকণ্ঠা। পাঁচ মিনিট অন্তর-অন্তর একজন করে এসে জিগ্যেস করে যাচ্ছেন, তোমার কিছু লাগবে? তুমি কিছু অসুবিধে বোধ করছ? আমার কিছুই চাই না শুনে তাঁরা দারুণ নিরাশ হয়ে চলে যাচ্ছেন।

আমার সহযাত্রীদের মধ্যে দুজন ডাকাতের মতন চেহারার যুবক এক সময় আমার পাশে এসে বসল। এরা খুব সিগারেট খোর, সেইজন্যই এরাও আহত হয়নি। মাথার চুল উস্কোখুস্কো, লালচে চোখ, লম্বা গোঁফ দুজনেরই। খুব গম্ভীরভাবে এরা আমার সঙ্গে স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলতে শুরু করল।

এরকম অভিজ্ঞতা আমার আগেও হয়েছে। এই যুবক দুটি নিশ্চয়ই মেক্সিক্যান। এরা ভারতীয়দের দেখলেই নিজেদের স্বজাতি বলে ভুল করে। আমি দু-হাত নেড়ে বোঝাবার চেষ্টা করলুম যে আমি স্প্যানিশ ভাষা জানি না। ওরা মানতে চায় না। ওদের মুখে ভয়ের ছাপ। এমনও হতে পারে, ওরা বে-আইনিভাবে মেক্সিকো থেকে স্টেট্‌সে ঢুকে পড়েছে। আর ধরা পড়ার সম্ভাবনাও ছিল না, কিন্তু এই দুর্ঘটনার পর পুলিশ জেরা করার সময় ওদের কাছে কাগজপত্র দেখতে চাইবে। আমাকে এর মধ্যে একবার পাসপোর্ট দেখাতে হয়েছে।

ওরা দুজনে একসঙ্গে অনেক কথা বলে যেতে লাগল আমাকে। আমি এক বর্ণ বুঝলুম না, তবু ওরা বলবেই। মহা মুশকিলে পড়া গেল। ওদের দুটি সিগারেট দিয়ে একটুক্ষণের জন্য নিরস্ত করে আমি উঠে গিয়ে পরোপকারী মহিলাদের কয়েকজনকে ইংরিজিতে বলুম, আপনারা কেউ স্প্যানিশ ভাষা জানেন? তাহলে এই লোক দুটির খুব উপকার হয়। ওদের কথা কেউ বুঝতে পারছে না।

ওই মহিলারা কেউ স্প্যানিশ জানেন না বটে, তবে ওঁদের একজনের স্বামীর বন্ধু কিছুদিন মেক্সিকোতে ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ স্বামীর বন্ধুকে ফোন করলেন। এবং সে ভদ্রলোক আসতে রাজি হওয়ায় ভদ্রমহিলা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন তাকে আনতে। পরোপকারের একটা সুযোগ পেয়ে সে মহিলার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, অন্যদের দিকে তিনি একটা গর্বিত দৃষ্টি দিয়ে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে প্রাশান্ জেনারেলের মতন চেহারার একজন মহিলা এসে ঘোষণা করলেন যে অতিথিদের দুপুরের আহারের ভার তিনি নিয়েছেন। অতিথিরা যেন দয়া করে তাঁর পিছু-পিছু আসেন।

এতক্ষণ ধরে এত রকমের খাওয়ার পর এর মধ্যেই আবার দুপুরের খাওয়া? মাত্র একটা বাজে। আমরা কেউ উঠছি না, মহিলা আবার বললেন, দয়া করে আসুন, দেরি করবেন না, খাবার ঠান্ডা হয়ে যাবে।

অগত্যা আমাদের যেতেই হল। খানিকটা হাঁটা পথে আমরা গেলুম আর একটি বাড়িতে। এটাও কারুর ব্যক্তিগত বাড়ি নয়, একটা কোনও প্রতিষ্ঠান। আমরা ঢুকলুম পেছনের দরজা দিয়ে। বিশাল ডাইনিং হলে অনেক টেবল পাতা। আমরা অক্ষত বাসযাত্রী বাইশ-তেইশ জন ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসলুম। আমাদের দেওয়া হল, এক প্লেট ভুট্টা সেদ্ধ, রুটি-মাখন, একটা বোল্ ভরতি সুপ্, তাতে বেশ বড়-বড় মাংসের টুকরো আর একটা আপেল। বেশ পুষ্টিকর খাদ্যই বলতে হবে, কিন্তু কেন জানি না, সে খাবারের মধ্যে আমি জেলখানার গন্ধ পেলুম। অবশ্য এ কথাটা কারুকে বলা যায় না।

ফিরে গিয়ে আবার বসলুম জবানবন্দি দিতে। গ্রে-হাউন্ড কোম্পানি আমাদের জন্য আলাদা একটা বাস আনিয়ে রেখেছে এর মধ্যে, এখানে আমাদের কাজ মিটে গেলেই রওনা করিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু কতক্ষণে মিটবে ঠিক নেই। আমার সহযাত্রীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন অনেক কিছু দাবি করেছে। পুলিশের লোক বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জানতে চায়, দুর্ঘটনার জন্য আসল দোষটা কার। আর ইনশিয়োরেন্সের লোক এই সময় চোখ পাকিয়ে থাকে। অর্থাৎ এর উপরেই অনেক কিছু নির্ভর করছে।

আমি কারুর সাতে-পাঁচে নেই, আমি যা সত্যি কথা তাই বলছি, অর্থাৎ আমি পেছন দিকে বসেছিলুম, আমি কিছু দেখিনি।

সাড়ে তিনটে বাজতে-না-বাজতেই গটগট করে ঢুকলেন আর কয়েকজন মহিলা। আবার আমাদের খাবার খেতে যেতে হবে? আমরা আকাশ থেকে পড়লুম। এর মধ্যে আবার খাবার? এ কি পাগলের কাণ্ড নাকি?

এবার সবাই আমরা একযোগে প্রতিবাদ করলুম। ভদ্রমহিলারাও নাছোড়বান্দা, প্রত্যেকের কাছে গিয়ে বলতে লাগলেন, প্লিজ এসো, তোমাদের খাবার টেবলে দেওয়া হয়ে গেছে, নষ্ট হবে, প্লিজ এসো।

পরস্পরের দিকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে বাধ্য হয়েই যেতে হল আমাদের। এবারেও সেই দুপুরের জায়গাটাতেই। তবে এবারের সেখানকার ডাইনি হলে আরও পঞ্চাশজন নারী পুরুষ বসে আছে। এবারেও আমাদের দেওয়া হল সেই ভুট্টা সেদ্ধ, সেই রুটি-মাখন, সুপ আর আপেল। এ কি, এরা কি ভুলে গেছে নাকি যে আমরা দুপুরে একবার খেয়েছি? অন্য যারা বসে আছে তারা সবাই কী রকম যেন চোখ করে চেয়ে আছে। আমার ঠিক পাশের টেবিলেই বসে আছে খুব লম্বা মতন একটি যুবতি, তার চোখ দুটি ছলোছলো, সে অযাচিতা হয়েই আমাকে বলল, জানো, আমি কবিতা লিখি, কিন্তু আমার কবিতা কেউ পড়ে না। আমার সব কবিতা নদী নিয়ে, ছোট নদী, বড় নদী, লাল নদী, নীল নদী, কিন্তু কেউ পড়ে না।

কথাগুলো শুনে আমার বুক দুরদুর করতে লাগল। আর একজন বলল, একটা বাস উলটে গেছে, তাতে এক হাজার জন লোক মরে গেছে, তাই না? কিংবা দুহাজার? তিন হাজার? চার হাজার? কিছু দূর থেকে কে যেন একটা আপেল ছুড়ে মারল, সেটা দুম করে লাগল দেওয়ালে। তারপর আরও পাঁচ-ছ'টা আপেল এসে পড়ল দেওয়ালের দিকে। অনেকে একসঙ্গে 'হা-হা' করে হেসে উঠল।

আমার এক সহযাত্রী উঠে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলল, ও বয়! দিজ্ আর অল লুনিজ্! বলেই সে দৌড় লাগাল।

তা হলে তো দুপুরে আমার ঠিকই মনে হয়েছিল। এখানকার খাবারে জেলখানার গন্ধ। এটা একটা মানসিক রোগগ্রস্তদের প্রতিষ্ঠান। আমার সহযাত্রীরা সবাই সরে পড়তে লাগল। আমার পাশের লম্বা মেয়েটি তখনও ঝুঁকে পড়ে আমায় কী সব বলছে, আমি যেতে পারছি না। ভয়ে আমার বুক কাঁপছে। একবার যদি এদের মধ্যে আটকে পড়ি, জীবনে বোধহয় আর কখনও বেরুতে পারব না। আমি উঠে দাঁড়াতেই লম্বা মেয়েটি দু-তিনটে আপেল আমার হাতে ঠেসে দিয়ে বলল, এগুলো নাও। আমি বললুম, না, না, আমার চাই না। অন্য টেবল থেকে কয়েকজন আপেল নিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল আমার দিকে।

অন্য দিকে তাকিয়ে দেখি, আমার যেসব সহযাত্রী চলে যাওয়ার চেষ্টা করছিল, মেট্রন-ধরনের মহিলারা তাদের তাড়া করতে-করতে বলছে, এই, যাচ্ছ কোথায়। খেয়ে যাও। না খেয়ে যেতে পারবে না। তাহলে কি ওরাও পাগল। পাগলেরাই আমাদের ডেকে এনেছে।

দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আমি দৌড় মারলুম। সোজা গিয়ে উঠে বসে রইলুম আমাদের জন্য নির্দিষ্ট বাসটায়। বাপরে বাপ, ওয়াইওমিং-এর পাগলদেরও এত পরোপকারের নেশা? নমস্কার ওয়াইওমিং, তোমাকে সারাজীবন মনে থাকবে।

।। ২৬ ।।

নিউ ইয়র্ক শহরে হারিয়ে গেলে কোনও ক্ষতি নেই। যেকোনও সময়ে মাটির নীচে নেমে গেলেই হল, তারপর পাতালরেলে চেপে যেকোনও জায়গায় আবার থেকে মাটির ওপর উঠে পড়লেই চোখ জুড়িয়ে যাবে। এই শহরের যেকোনও জায়গাই দর্শনীয়।

গোটা আমেরিকার মধ্যে একমাত্র নিউ ইয়র্ক শহরে এসেই কলকাতার মানুষরা খুব স্বস্তি বোধ করবে। বেশ চেনা-চেনা লাগবে। রাস্তাঘাট মাঝে-মাঝেই ভাঙা, দু-এক জায়গায় খোদলে জল জমে আছে, পথচলতি লোকেরা খালি সিগারেটের প্যাকেট, কোকাকোলার টিন কিংবা চকলেটের রাংতা যেখানে-সেখানে ছুড়ে ফেলে দেয় অবলীলাক্রমে। অনেক রাস্তাতে কলকাতার মতন ভিড়, নারীপুরুষরা ব্যস্ত সমস্তভাবে হনহন করে হেঁটে যাচ্ছে, কেউ কারুর দিকে না তাকিয়ে। রাস্তায় এত গাড়ি যে মাঝে-মাঝেই ট্রাফিক জ্যাম হয়।

ম্যানহাট্‌ন দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে আমার মনে এমনই কলকাতা-কলকাতা ভাব হয় তা আমি রাস্তার দু-পাশের আশি-নব্বইতলা বাড়িগুলোর কথা ভুলে যাই, দু-ধারের দোকানগুলোতে যেসব ফরেন জিনিস তাও খেয়াল থাকে না, আমি বরং এদিক-ওদিক তাকিয়ে কোনও ষাঁড়, কুষ্ঠরোগী ভিখারি কিংবা উলঙ্গ পাগল খুঁজি।

আমেরিকার আর কোনও শহরেই রাস্তা দিয়ে এত লোক হাঁটে না। ম্যানহাট্‌নের প্রায় সব রাস্তাই যেন মানুষের ভিড়ে গিসগিস করছে। তার একটা কারণ, এখানে গাড়ি পার্ক করা প্রায় একটা অসম্ভব ব্যাপার, অফিসবাবুরা গাড়ি চড়ে এলে, দু-তিন মাইল দূরে গাড়ি রেখে বাকিটা পায়ে হেঁটে আসতে হবে বলে অনেকেই গাড়ি আনে না, ট্রেনে যাতায়াত করে। দ্বিতীয় কারণ, এ শহরে অনেকেরই গাড়ি নেই। এ শহরে অনেক গরিব লোক থাকে। আমাদের কলকাতায় যেমন কোটি-কোটিপতি মাড়োয়ারিরাও আছে আবার ফুটপাথে শুয়ে থাকা গরিবও অসংখ্য, সেই রকমই, নিউ ইয়র্কেও সাহেব-মাড়োয়ারি ও গরিবদের সহাবস্থান চলছে। তবে তফাতের মধ্যে এই যে, এখানকার সাহেব-মাড়োয়ারিরা আমাদের মাড়োয়ারিদের চেয়ে অনেক বেশিগুণ বড়লোক আর গরিবরাও রাস্তায় শোয় না, তারা লম্বা-লম্বা ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকে আর শীতকালে প্রত্যেকের গায়েই একটা ওভারকোট চাপে। এখানকার রাস্তায় ষাঁড় বা উলঙ্গ পাগল নেই বটে কিন্তু গুপ্ত-ভিখিরি আছে। প্রকাশ্যে ভিক্ষে চাইলে পুলিশে ধরে নিয়ে যায়।

এই শহরে এত গরিব তার কারণ প্রচুর বেকার ভাগ্যান্বেষী সারা পৃথিবী থেকেই নিউ ইয়র্কে এসে জোটে। তা ছাড়া, ইহুদি, পোর্টুরিকান, গ্রিক. ইটালিয়ান যারা আগে থেকেই এখানে এসে বসতি নিয়েছিল তাদের দেশোয়ালি ভাইরা এখনও অনবরত আসছে জীবিকার সন্ধানে, কোনও রকমে মাথা গুঁজে থাকছে। এত মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত আছে বলেই এ শহর শিল্প-সংস্কৃতিতে সকলের সেরা। গোটা আমেরিকার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এই নিউ ইয়র্ক। দেখা যাচ্ছে. শিল্প সংস্কৃতির ব্যাপারটা খুব বড়লোক কিংবা খুব গরিবরা সৃষ্টি করতে পারে না। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে।

কোনও গির্জার সিঁড়িতে কিংবা কোনও ফুটপাথের দোকানে বসে থেকে রাস্তায় লোক চলাচল দেখতেও বেশ লাগে। এত বিচিত্র রকমের মানুষ এক সঙ্গে আর কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। নিউ ইয়র্কের মতন স্বাধীন শহরও আর বুঝি নেই। যার যা খুশি করতে পারে। ধুতি, লুঙ্গি, আফ্রিকান জোব্বা কিংবা শুধু জাঙিয়া পরে রাস্তা দিয়ে হাঁটলেও কেউ ভ্রূক্ষেপ করবে না।

শুধু দুটি ব্যাপারে শহরের মেয়র সম্প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। হরে-কৃষ্ণ বৈষ্ণবের দল রাস্তায় যখন খুশি নাচানাচি শুরু করে দিত তাতে ট্রাফিক জ্যাম হয়ে যেত বলে এখন প্রকাশ্য রাস্তায় নৃত্য-গীত নিষিদ্ধ হয়েছে। আর, এখানকার কম-বয়েসি ছেলেমেয়েদের বাতিক ছিল পথে হাঁটবার সময়ও রেডিয়ো বা টেপরেকর্ডার বাজানো। এতই তাদের সঙ্গীতপ্রীতি যে রাস্তায় যেতে-যেতেও গান না শুনলে চলে না। কিন্তু অনেকে মিলে বাজালে তো বিচিত্র এক ক্যাকোফোনির সৃষ্টি হয়, সেই জন্য প্রকাশ্যে রেডিয়ো, টেপরেকর্ডার বাজানোও নিষেধ। এটা সাউন্ড পলিউশন রোধ করবার কারণে।

অবশ্য কমবয়েসি ছেলেমেয়েরা এতেও দমেনি। তাদের পকেটে বা কাঁধের ঝোলায় এখনও রেডিয়ো

রেকর্ডার থাকে, আর দু-কালে লাগানো হেডফোন, অন্যদের বিরক্ত না করে তারা নিজেরা ঠিকই গান শুনতে-শুনতে যায়। এরকম হেডফোন আঁটা ছেলেমেয়ে দেখতে পাওয়া যায় প্রায়ই।

রাস্তায় ঘুরতে-ঘুরতে খিদে পেলেও কোনো অসুবিধে নেই নিউ ইয়র্কে। অজস্র সস্তায় খাবারের দোকান আছে এই শহরে। ড্রাগ, স্টোর, হ্যামবাগরি, জয়েন্ট, পিৎসা হাট, হট ডগ কর্নার ইত্যাদি। ইচ্ছে মতন পৃথিবীর যে-কোনও দেশের খাবারও বেছে নেওয়ার সুবিধে আছে। চিনে-জাপানি-ইটালিয়ান-গ্রিক-ভারতীয়-পাকিস্তানি-তিব্বতি ইত্যাদি। আমার মতন আরও অনেক বাঙালও তো নিউ ইয়র্কে যায়, তাদের দু-একটা কথা জানিয়ে দিচ্ছি। হ্যামবার্গারে কক্ষনো হ্যাম থাকে না, থাকে গো-মাংসের কিমা আর হট ডগের সঙ্গে কুকুরের কোনও সম্পর্ক নেই, ওটা শুয়োরের মাংস আর বিশুদ্ধ সর্ষে বাটার সঙ্গে রুটি। চিনে আর জাপানি খাবার প্রায় একই ভেবে যারা জাপানি দোকানে ঢুকবেন, তারাও ঠকবেন। জাপানি খাবারের দাম বেশি, পরিমাণে কম, স্বাদও ভালো না। মূল জাপানের কথা জানি না, নিউ ইয়র্কের জাপানি দোকানের এই অবস্থা। ভারতীয় দোকানে ঢুকলে আপনি ভারতীয় বলেই ভালো ব্যবহার পাবেন না, এ কথা আগেই বলে রাখছি। সস্তায় ভালো মাংস-রুটি খেতে হলে যাওয়া উচিত গ্রিক দোকানে।

নিউ ইয়র্কের মেয়র আর একটা খুব ভালো আইন জারি করেছেন। ম্যানহাটানে এখন আর ফাঁকা জমি একটুও নেই, থাকলেও আগুন দাম, অথচ জনসংখ্যা প্রত্যেক বছর বাড়ছে, শহরটা ঘিঞ্জি হয়ে যাচ্ছে, সেই তুলনায় পার্ক বা জনসাধারণের বিশ্রামের জায়গা বাড়ছে না। বড়-বড় কোম্পানিগুলো ছোট বাড়ি কিনে নিয়ে সেখানে একশো তলা বাড়ি তুলে ফেলছে। সেই জন্যই এখন নিয়ম হয়েছে, ওই রকম বহুতল বাড়ি তৈরি করতে গেলেই গাড়ি রাখবার জায়গা করতে হবে মাটির নীচে আর এক তলাটা ফাঁকা রাখতে হবে। সেই এক তলার অর্ধেকটায় থাকবে বাগান আর বাকি অর্ধেকটায় খাবারের দোকান। সেখানে যে-কেউ এসে বসতে পারবে। মনে করুন, চৌরঙ্গিতে টাটা ম্যানসন কিংবা চ্যাটার্জি ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারের মতন লম্বা বাড়িগুলোর একতলা থাকবে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। আমাদের মেয়রহীন কলকাতায় এরকম আইন কে জারি করতে পারেন জানি না।

সেইরকমই একটা নতুন বাড়ির নীচের খাবারের দোকানে বসেছিলুম একটা সুপ নিয়ে। পাশেই ফোয়ারা, তলার জলের রঙিন মাছ খেলা করছে, তাই দেখছি। হঠাৎ আমার টেবিলের পাশে একজন কেউ এসে দাঁড়াল, দু-দিকের কোমরে দুটি আঙুল দিয়ে। আস্তে-আস্তে চোখ তুলে তাকিয়ে একটা হাসিমুখ দেখতে পেলুম।

—যামিনীদা!

তিনি বললেন, ওই দিকের টেবিলে বসে অনেকক্ষণ ধরে দেখছি, চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল। তুই সত্যিই তা হলে নীলু?

আমি খুব একটা অবাক হইনি কিন্তু। নিউ ইয়র্কের রাস্তায় কিছুক্ষণ ঘুরলে দু-চারজন বাঙালির সঙ্গে তো দেখা হবেই, চেনা কারুর সঙ্গে দেখা হওয়াও আশ্চর্য কিছু না। লন্ডনের মতন অত না হলেও নিউ ইয়র্কের বাঙালির সংখ্যা নেহাত কম নয়।

আমার পাশের চেয়ার টেনে নিয়ে বসে যামিনীদা বললেন, তুই জ্যান্ত এসেছিস না মরে ভূত হয়ে এসেছিস?

রাস্তায় বাস দুর্ঘটনায় যে সত্যিই মরে যেতে পারতুম, সে কথা চেপে গিয়ে বললুম, বালাই ষাট, মরব কেন? হঠাৎ ওকথা বলছ যে?

—ভাবছিলুম যে আমাদের দেশের বেকাররা আর কতদিন বেঁচে থাকতে পারে?

যামিনীদা ছিলেন কলকাতার কফি হাউসের ইনটেলেকচুয়াল। অনেক বিষয়ে পড়াশুনো। এখনও চেহারাটা বিশেষ বদল হয়নি দেখছি। মেদহীন ঝকঝকে শরীর। ঠোঁটের কোণে এমন একটা হাসি, যাতে মনে হয় সবসময় কিছু একটা উপভোগ করে চলেছেন।

—কবে এসেছিস?

—কাল!

—বাঙালের মতন এর মধ্যেই এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং, ওয়ার্লড ট্রেড সেন্টার, স্ট্যাচু অব লিবার্টি ফিবার্টি সব দেখে নিয়েছিস তো?

উত্তর না দিয়ে আমিও মুচকি হাসলুম। আমিও নানা রকম হাসি দিতে জানি।

—*শোন নিউ ইয়র্কে শুধু একরকমই দেখার জিনিস আছে, তা হল থিয়েটার।* এতরকম *থিয়েটারের* এক্সপেরিমেন্ট আর কোথাও হয় না। এসেছিস যখন, ভালো করে দেখে যা। 'সত্যাগ্রহ' নামে একটা থিয়েটার হচ্ছে, জানিস? দেখলে তোর মাথা ঘুরে যাবে।

আমি একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলুম। যামিনীদা এখনও ইনটেলেকচুয়াল আছেন, নিছক ডলার জমাবার ধান্দায় মজে যাননি।

যামিনীদা বললেন, আর যদি দৃশ্য দেখতে চাস, তা হলে ঠিক সন্ধের একটু আগে ব্রুকলিন ব্রিজের ওপর দাঁড়াবি। *শেষ সূর্যের আলোয় দেখতে পাবি ঠিক যেন সোনা দিয়ে তৈরি* ম্যানহাটান, *ঠিক যেন অমরাবতী। ব্রুকলিন ব্রিজের ওপর সেই বিখ্যাত কবিতাটা পড়েছিস? ওই যে ইয়ের লেখা, কী যেন নাম, ওই যে লোকটা আত্মহত্যা করেছিল...*

—হার্ট ক্রেন।

যামিনীদা ভুরু কুঁচকে তাকালেন আমার দিকে। আমি একখানা সাহেব-কবির নাম বলে ফেলেছি, আন্দাজে কি না বোঝার চেষ্টা করলেন। তারপর হোহো করে হেসে উঠে বললেন, ও, মনে পড়েছে, তুই তো আগেও একবার নিউ ইয়র্কে এসেছিলি, এসব তোর জানা। তাই না? কোথায় উঠেছিস?

আমি গ্রিনিচ ভিলেজের একটা সস্তা হোটেলের নাম বললুম।

—চল, তোর মালপত্তর নিয়ে আসি। তুই আমার ওখানে থাকবি। কিন্তু তোকে রান্না করতে হবে। তোর বউদি গত কাল বোস্টন চলে গেছেন, আমাকেও যেতে হবে দু-একদিনের মধ্যে। তুই একা থাকতে পারবি তো?

—অন্যের বাড়িতে একা থাকার মতন আনন্দের আর কিছু আছে কি?

—আমি গত বছরই একবার কলকাতায় গিয়েছিলুম, সুতরাং কলকাতার খবর মোটামুটি জানি। তোর খোঁজ করেছিলুম, তুই ছিলি না শহরে।

—হয়তো আসামে বা মধ্যপ্রদেশে গিয়েছিলুম।

—সবমসয় টোটো করে ঘুরে বেড়াস বুঝি? চল, উঠে পড়া যাক।

বাইরে বেরিয়ে যামিনীদা একটু থমকে দাঁড়িয়ে কিছু চিন্তা করে বললেন, তুই এক কাজ কর, নীলু, তুই হোটেলে চলে যা। আমাকে দু-একটা কাজ সারতে হবে। তোকে রাত্তিরের দিকে আমি হোটেলে ফোন করব। কিংবা, আমার বাড়ির ঠিকানা দিলে তুই রাস্তা চিনে চলে আসতে পারবি?

আমি বললুম, কেন পারব না? তুমি কোন পাড়ায় থাকো?

—ব্রুকলিনে। তা হলে তাই কর, মালপত্র নিয়ে তুই আমার অ্যাপার্টমেন্টে চলে আয়। বেশি রাত করবি না, রাস্তাঘাট ভালো না, সন্ধে-সন্ধে চলে আসবি। আমি না থাকলেও গণেশ বলে একটা সাউথ ইন্ডিয়ান ছেলে থাকবে। খুব ভালো ছেলে, তাকে তোর কথা বলে রাখব।

এরপর যামিনীদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি সময় কাটাবার জন্য মেট্রোপলিটন মিউজিয়ামে ঢুকে পড়লুম।

নিউ ইয়র্কের মিউজিয়ামগুলোর বর্ণনা দিতে গেলে সাত কাণ্ড রামায়ণ লিখে ফেলতে হয়। সে কাজ জ্ঞানী-গুণীরা করবেন। মেট্রোপলিটান মিউজিয়ামের এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যা অন্য কোনও দেশের মিউজিয়ামে দেখিনি। এখানে প্রতিটি ছবির তলায় লেখা আছে সেই ছবি আঁকার ইতিহাস, সমসাময়িক ঘটনা, সেই ছবি সম্পর্কে তখন কে কী মন্তব্য করেছিলেন ইত্যাদি। মোটেই রসকষহীন

তথ্য নয়, প্রত্যেকটাই পাকা হাতের রচনা এমনই সরস যে না পড়ে উপায় নেই। সেই লেখা পড়বার পর আবার নতুনভাবে ছবিটা দেখতে ইচ্ছে করে। ইম্প্রেশনিস্টদের মাত্র পঁচিশ-ছাব্বিশখানা ছবি দেখতেই আমার ঘণ্টাতিনেক লেগে গেল। এখনও বাকি আছে ঘরের পর ঘর। শত-শত ছবি। আমি অবশ্য একটানা বেশিক্ষণ ধরে শিল্প উপভোগ করায় বিশ্বাস করি না। তিন ঘণ্টা যথেষ্ট।

বিকেল পড়ে গেছে, ফিরে এলুম হোটেলে। বিল চুকিয়ে বেরিয়ে এলুম মালপত্র নিয়ে। ব্রুকলিন ব্রিজ পার হওয়ার সময় একবার মনে করলুম হার্ট ক্রেনের কবিতা, আর একবার দেখে নিলুম যামিনীদা বর্ণিত সোনার ম্যানহাটান। সূর্যাস্তের আলোয় হর্ম্যসারিকে সত্যিই ওরকম দেখায়।

যামিনীদার বাড়িতে রাত্তিরটা খুব জমে গেল। যামিনীদা এরই মধ্যে ভাত-ডাল-বেগুনভাজা আর দু-তিন রকম মাছ রান্নার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। দক্ষিণ ভারতীয় ছেলেটির নাম বোধহয় গণেশন, তাকে বাংলায় গণেশ বলে ডাকা হয়। সে যামিনীদার এখানে থেকে লেখাপড়া করছে। মৃদুভাষী ছেলেটি ইংরিজি মিশিয়ে মোটমুটি বাংলা বলে। গৌতম আর সংঘমিত্রা নামে এক তরুণ দম্পতি এসেছে। শুরু হয়ে গেল তুমুল আড্ডা।

যামিনীদা ওঁর চাকরি জীবনের কয়েকটা ঘটনা বললেন। ওঁর বর্তমান চাকরিটা, আমাদের চোখে বিচিত্র মনে হবে। উনি এখানকার লেবার ইউনিয়নের সেক্রেটারি জাতীয় কিছু। এ দেশের লেবার ইউনিয়ান অসম্ভব শক্তিশালী, ইচ্ছে করলে তারা সারা দেশ কাঁপিয়ে দিতে পারে। ইউনিয়ানের কাজ চালাবার জন্য এরা মাইনে করা প্রফেশনাল লোক রাখে। যামিনীদা বললেন, বুঝলি, এদেশে এসে অনেকদিন সরকারি কাজ করেছি। তারপর এক সময় মনে হল, এবার অন্য দিকটা একটু দেখা যাক তো। তাই শ্রমিকদের দলে ভিড়েছি।

ভাবতে ভালো লাগে যে কলকাতার এক বাঙালির ছেলে মার্কিন দেশের শ্রমিকদের পক্ষ নিয়ে ওদেশের সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়া করে।

খেতে বসে যামিনীদার আর একটা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পেলুম। এতদিন বিদেশে থেকেও উনি বাংলা বলার সময় অনর্থক ইংরিজি মিশিয়ে দেন না, বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির খবর রাখেন, মনে প্রাণে সম্পূর্ণ বাঙালি। কিন্তু খাওয়ার টেবিলে উনি একেবারে সাহেব। টেবিলে এক ফোঁটা জল বা একটা ভাত পড়লে চলবে না তক্ষুনি পরিষ্কার করতে হবে। সাইড ডিসে স্যালাড যেমন তেমন করে দিলে চলবে না, সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতে হবে। আলাদা-আলাদা মাছের ঝোলের জন্য আলাদা আলাদা হাতা চাই। একজন কে যেন ডালের হাতাটা মাছের ঝোলে ডোবাতে উনি একেবারে হায় হায় করে চেঁচিয়ে উঠলেন। ওতে নাকি সব স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। উনি বললেন, বুঝলি না, পরিবেশনটাই তো একটা আর্ট, আমাদের ঠাকুমা-দিদিমারা যখন বড় থালায় বাত পরিবেশন করতেন, কী রকম পরিপাটি করে সাজিয়ে দিতেন...।

আমরা খাওয়া শুরু করেছি, যামিনীদা ঘুরে-ঘুরে পরিদর্শন করছেন, আমি জিগ্যেস করলুম, আপনি বসবেন না?

যামিনীদা, বললেন, না, আমি এসব খাই না, পরে একটা যা হোক বানিয়ে নেব।

—সে কী? আপনি এই ভালো-ভালো মাছ খাবেন না?

—না রে, আমি রাত্তিরে দুটো স্যান্ডুইচ ছাড়া আর কিছু খাই না।

তারপর একটু থেমে, আবার মুচকি হেসে বললেন, আমার কাছে কয়েকটা বাংলা কবিতার বই আছে, কিছু গানের রেকর্ড আছে, মাঝে-মাঝে সেই কবিতাগুলো পড়ি কিংবা গান শুনি, তখন আমি বাংলাদেশে ফিরে যাই মনে-মনে। বাঙালি থাকবার জন্য আমার ভাত কিংবা ইলিশ মাছ খাবার দরকার হয় না।

।। ২৭ ।।

নিউ ইয়র্কের কুইন্‌স পাড়ায় বাঙালিদের একটা উৎসব হচ্ছে শুনতে পেয়ে গেলুম এক সকালবেলা। গিয়ে চমৎকৃত হলুম একেবারে। এ তো শুধু উৎসব নয়, এ যে পুরোপুরি ফাংশান। একটা ইস্কুল বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছে, সেখানে গিসগিস করছে শুধু বাঙালি, এটা যে সাহেবদের দেশ তা বুঝবার কোনও উপায়ই নেই।

মনে হল যেন কানপুর বা জব্বলপুরের কোনও বাঙালি ফাংশানে হাজির হয়েছি। মঞ্চের ওপর গান বাজনা হয়েই চলেছে, একাধিক ঘোষক এক-একরকম ঘোষণা করছেন মাঝে-মাঝে, হঠাৎ হঠাৎ ড্রপ সিন পড়ে যাচ্ছে ভুল করে, মাইক্রোফোনে মাঝে মাঝে চো-ও-ও-ও করে অদ্ভুত আওয়াজ হচ্ছে, কয়েকজন কর্মকর্তা অহেতুক ব্যস্ততায় দৌড়োদৌড়ি করছেন এদিক-ওদিক। এদিকে অডিটোরিয়ামে যুবক-যুবতীরা তো রয়েছেই, তা ছাড়াও আছে মাসি-পিসি, ঠাকুরদা-ঠাকুমারাও, অনেকে বেশ জোরে জোরেই গল্প করছেন ও পাড়া-প্রতিবেশীদের খবর নিচ্ছেন, কাচ্চা-বাচ্চারা ছুটোছুটি করছেন আপন মনে। বেশ কয়েকজন পুরুষ সিগারেট টানতে-টানতে আড্ডা দিচ্ছেন বাইরে দাঁড়িয়ে, মাঝে-মাঝে কে যেন চেঁচিয়ে বলে উঠছে, বড্ড গোলমাল হচ্ছে, আস্তে! আস্তে!

একেবারে পুরোপুরি মফস্‌সলিয় বাঙালিদের ছবি।

গোড়ার দিকে লোকাল আর্টিস্টদের গান ও নাচ টাচ হচ্ছিল, শুনলুম কলকাতা থেকে কয়েকজন ভালো ভালো আসল রেডিয়ো আর্টিস্টও এসেছেন। কারুর-কারুর কথা থেকে জানতে পারলুম। ভূপেন হাজারিকা নাকি এসে ঘুরে গেছেন। তা ছাড়া রয়েছেন সলিল চৌধুরী, পূর্ণদাস বাউল ও তাঁর স্ত্রী, লক্ষ্মীশঙ্কর ও তাঁর সম্প্রদায়, আরও যেন কে কে। একজন সাহিত্যিকও নাকি রয়েছেন। তারপরই মঞ্চে ঘোষণা করা হল, এবারে ভাষণ দেবেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

শুনেই আমার বুকটা ধক করে উঠল। সুনীলদা! সলিল চৌধুরী কিংবা পূর্ণদাস বাউলদের সঙ্গে আমার আলাপই নেই, সুতরাং তাঁরা আমাকে পাত্তা দেবেন কেন? কিন্তু সুনীলদার সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়।

বক্তৃতার ব্যাপারে সুনীলদা চিরদিনের ফাঁকিবাজ। স্টেজে দাঁড়িয়ে তিন-চার মিনিট কী সব এলেবেলে কথা বলেই নেমে এলেন। বসলেন সামনের দিকের একটা চেয়ারে। আমি দৌড়ে গেলুম সেখানে। আরও সহর্ষ বিস্ময়ে দেখলুম, সুনীলদার সঙ্গে স্বাতীদিও রয়েছেন।

সুনীলদাকে চমকে দেওয়ার জন্য একেবারে কানের কাছে মুখ নিয়ে বললুম, ভালো আছেন, সুনীলদা? আমায় চিনতে পারছেন?

সুনীলদা চমকে মুখ ঘুরিয়ে তাকালেন। ভুরু কুঁচকে একটু দেখে নিয়ে বললেন, খানিকটা চেনা চেনা লাগছে। তুমি কে বলো তো?

আমার বুকটা দমে গেল, সঙ্গে-সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। হায়, সময় কী নিষ্ঠুর! সুনীলদা আমায় চিনতে পারলেন না? অথচ এক সময় সুনীলদা আর আমি কত কাছাকাছি ছিলুম, প্রায় হরিহর আত্মা বলতে গেলে। সেই সুনীলদা এখন অনেক দূরে সরে আছেন। পুরোপুরি এস্টাবলিশমেন্টের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন, চেহারাও অনেকটা ভারিক্কি হয়ে গেছে। মুখে খানিকটা উদাসীন ভাব, আমার দিকে তাকিয়ে আছেন কিন্তু যেন আমায় দেখছেন না। যেন আমার মতন ছোটখাটো মানুষদের দিকে তেমন মনোযোগ না দিলেও চলে।

স্বাতীদি কিন্তু ঠিক আগের মতনই আছেন। আন্তরিক উৎসাহের সঙ্গে বললেন, ওমা, নীলু! তুমি কবে এলে? দারুণ ভালো লাগছে তোমায় দেখে। এত সব অচেনা মানুষের মধ্যে হঠাৎ একজন চেনা লোক দেখলে এত ভালো লাগে।

পাশে একটা চেয়ার দেখিয়ে স্বাতীদি বললেন, বসো। তোমার মুখটা শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে কেন? সকালে কিছু খাওনি তুমি?

আমি মুখটা নীচু করলুম। প্রবাসে একাকী ভ্রাম্যমাণ জীবনে হঠাৎ কারুর কাছ থেকে একটা স্নেহের কথা শুনলে চোখে জল এসে যায়। যামিনীদার বাড়িতে ক'দিন একা-একা নিজে রান্না করে খাচ্ছি। কিন্তু রোজ-রোজ কি আর শুধু নিজের জন্য রান্না করতে কারুর ইচ্ছে করে?

এই সময় ঘোষক পরবর্তী নাচের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির জন্য দশ মিনিটের বিরতি চাইলেন। সুনীলদা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলো, বাইরে চা খেয়ে আসি।

তিনজনে চলে এলুম বাইরে। এদেশে মাটির ভাঁড় পাওয়া যায় না, তার বদলে পেপার কাপ। সেই কাগজের ভাঁড়ে তিনটে চা জোগাড় করে আনলুম উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে। চা শেষ হওয়ার পর চারমিনারের প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে সুনীলদাকে জিগ্যেস করলুম, নেবেন?

সুনীলদা এবারে আমার প্রতি একটু উৎসাহ দেখিয়ে বললেন, কোথায় পেলে? আমার তো স্টক শেষ, তাই এখন আমি ক্যামেল খাচ্ছি, অনেকটা এই রকমই?

আমি বললুম, আমার কাছে কয়েক প্যাকেট মাত্র আছে, সাবধানে জমিয়ে রেখেছি, খুব স্পেশাল কারুর সঙ্গে দেখা হলে একটা করে দিই। আপনারা কতদিন হল এসেছেন, সুনীলদা?

—মাসতিনেক হয়ে গেল বোধহয়? এবারে ফিরে গেলেই হয়।

—আপনি এখানে লেকচার টেকচার দিতে এসেছেন বুঝি?

—ধ্যাৎ, লেকচার কে দেয়। এক জায়গায় সত্যজিৎ রায়ের "অরণ্যের দিনরাত্রি" আর "প্রতিদ্বন্দ্বী" দেখানো হল, সেইসঙ্গে আমি বই দুটো বিষয়ে সামান্য দু-চার কথা বলেছি মাত্র, ব্যাস, তাতেই আমার কাজ ফুরিয়ে গেছে। এখন স্রেফ বেড়ানো।

—দেশে থাকতে শুনেছিলুম আপনার কী একটা অপারেশান হয়েছিল?

খুব একটা অগ্রাহ্যের ভাব দেখিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে সুনীলদা বললেন, সে কিছু নয়। তারপর বললেন, কবিতা সিংহও এসেছেন জানো তো?

—কোথায়? এখানে আছেন?

—না, এখন নিউ ইয়র্কে নেই। কবিতা সিংহ এসেছেন আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টারন্যাশনাল রাইটিং প্রোগ্রামের নেমন্তন্ন নিয়ে...আমাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

আরও দু-একটা টুকিটাকি কথার পর জিগ্যেস করলুম আপনার কেমন লাগছে সুনীলদা?

মুখখানা আগের মতন উদাসীন করে উনি বললেন, আমার এবার খুব যে ভালো লাগছে তা বলতে পারি না। তবে স্বাতীর খুব ভালো লাগছে।

সুনীলদা ধুতি-পাঞ্জাবিও পরেননি, আবার সুট-টাই-ও পরেননি। সাধারণ প্যান্ট-শার্ট, সামান্য শীত পড়েছে বলে তার ওপরে একটা পাতলা কোট। স্বাতীদি একটা চওড়া নীল পাড়ের শাড়ি পরেছেন, তার ওপরে রোঁয়া-রোঁয়া তুলোর মতন একটা বেশ জমকালো সোয়েটার। একটু স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে স্বাতীদির, মুখখানা উৎফুল্ল।

—আপনার খুব ভালো লাগছে বুঝি স্বাতীদি।

স্বাতীদি হেসে বললেন, হ্যাঁ। খুব ভালো লাগছে। তাতে আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেছি। জানো, নীলু, আগে আমেরিকা বিষয়ে আমার তেমন আগ্রহই ছিল না। আমেরিকায় বেড়াতে আসার শখও ছিল না। আমার স্বপ্ন ছিল ফ্রান্স। ছেলেবেলা থেকেই ভেবে রেখেছিলুম, একদিন না একদিন ফ্রান্সে যাবই। আর্ট গ্যালারিগুলো দেখব। এবারে সত্যি-সত্যি ফ্রান্সে এসে আমার চোখ জুড়িয়ে গেছে, প্রাণ ভরে গেছে। খুব ভালো ছিলুম প্যারিসে। তারপর প্যারিস থেকে দেশে ফিরে গেলে আমার খুব একটা আপত্তি ছিল না। তারপর ও এখানে একটা নেমন্তন্ন পেল, তখন ভাবলুম একবার ঘুরে আসাই যাক। এখানে এসে কিন্তু অবাক হয়ে গেছি। যত মানুষজনের সঙ্গে মিশছি, ততই ভালো লাগছে।

—দেখবারও অনেক কিছু আছে।

—দেখবার জিনিস তো আছেই। কিন্তু আমেরিকানদের সম্পর্কে আমার আগে অন্যরকম ধারণা

ছিল, একটু অহংকারী আর মাথা মোটা ধরনের। কিন্তু আমি এখানে এসে অল্পবয়সি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশে দেখছি, বেশিরভাগই কী সরল আর সুন্দর, কত রকম বিষয়ে আগ্রহী। এক একজনের হাসি দেখলেই বোঝা যায়, তাদের মনটা কত পরিষ্কার। আমরা বেশ কিছুদিন একটা খুব ছোট জায়গায় থেকেছি। সেটা একটা ইউনিভার্সিটি-টাউন, প্রায় সবাই ছাত্রছাত্রী বা পড়ান। তাদের সঙ্গে মিশে দেখলুম, এমন আন্তরিক ব্যবহার...আমার অনেক বন্ধু হয়ে গেছে...ও কিন্তু বিশেষ কারুর সঙ্গে মেশে না, বেশিরভাগ সময়ই বই মুখে নিয়ে শুয়ে থাকে কিংবা টিভি দেখে।

সুনীলদা বললেন, একটা নতুন দেশে এসে সে দেশের টিভি পরদায় ক'দিন মন দিয়ে দেখলে সেখানকার সমাজ ও মানুষ সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়।

আমি জিগ্যেস করলুম, আপনার কেন ভালো লাগছে না সুনীলদা?

আর একটা সিগারেট ধরিয়ে সুনীলদা বললেন, স্বাতী অনেকটা ঠিকই বলেছে, এদেশের মানুষ-জনের সঙ্গে মিশলে ভালোই লাগে। অনেকেই সরল ও আন্তরিক, বেশ একটা পরোপকারের ঝোঁক আছে। কিন্তু টিভি, রেডিয়ো বা খবরের কাগজে এদেশের সরকারি নীতিগুলো যখন দেখি বা শুনি, তখন রাগে গা জ্বলে যায়। মানুষ হিসেবে আজও আমেরিকানদের বেশ পছন্দ হয়, কিন্তু রাষ্ট্র হিসেবে আমেরিকাকে আমি ঠিক পছন্দ করতে পারি না।

—একটা দেশের অধিকাংশ লোকই যদি ভালো হয় তবে সে দেশের সরকার খারাপ হয় কী করে?

—তাই তো হয় দেখছি। এদেশের লোক কী করে তা মেনে নেয়, তাও বুঝি না। এদেশের নির্বাচন ব্যবস্থাটা আমাদের বোধগম্য হয় না। রীতিমতো বড়লোক না হলে কারুর পক্ষে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দাঁড়ানোই অসম্ভব। রুজভেল্ট-এর পর সত্যিকারের কোনও ভদ্দরলোক এদেশের প্রেসিডেন্ট হয়েছে? কেনেডি ছাড়া? তাও কেনেডির চেহারা ও কথাবার্তায় খানিকটা চাকচিক্য থাকলেও মানুষ হিসেবে তিনি যে খুব সুস্থ ছিলেন না, সেটা তাঁর জীবনীকাররা ফাঁস করে দিয়েছেন জানো তো? এদেশে কত নোবেল লরিয়েট, কত জ্ঞানী-গুণী, কত উদার মানুষ রয়েছে, তবু এদের প্রেসিডেন্ট হয় নিক্সনের মতন খিস্তিবাজ কিংবা রেগনের মতন দ্বিতীয় শ্রেণির এক সিনেমার ভিলেন? এটা একটা ট্রাজিডি নয়! আসলে এদের সরকার চালায় কয়েকটা বড়-বড় ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান, এদেশে যাদের বলে কর্পোরেশন, আমরা যাদের বলি মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি। লাভের জন্য এরা মানুষের রক্ত শুষে নিতেও দ্বিধা করে না। এরাই নিজেদের স্বার্থে পৃথিবীর এক-এক জায়গায় যুদ্ধ লাগায়।

—আপনি বেশ রেগে আছেন দেখছি, সুনীলদা।

—ভারতীয় হিসেবে এই সরকারের অনেক আচার আচরণ দেখলে তোমার, রাগ হতে বাধ্য। রাষ্ট্র হিসেবে ভারতবর্ষকে এরা পাত্তাই দেয় না, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। আমি টানা তিন মাস এদের টিভি দেখেছি, তুমি বিশ্বাস করবে কি, মাত্র একদিন একটা ভারতীয় বিমানের হাইজ্যাকিং ছাড়া আর কোনও দিন একবারও ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটাও খবর দেয়নি। এদের খবর শুনলে মনে হয়, পৃথিবীতে এখন পোল্যান্ড ছাড়া আর কোনও দেশ নেই। সবসময় রুশ বিরোধী প্রচার একেবারে বিরক্তিকর পর্যায়ে চলে গেছে। এমন অবস্থা, এদেশে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের মনেও রুশ জুজুর ভয় দানা বেঁধে যাচ্ছে। এটা কী সুস্থ ব্যাপার? রাশিয়াতেও এরকম প্রচার হয় কি না আমি জানি না। আমি কিন্তু এদেশে বসেই অনুভব করছি, রুশ-মার্কিন যে আণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা চলছে, তাতে রাশিয়ার চেয়ে মার্কিন দেশের দায়িত্বই যেন বেশি। এক একটা আণবিক মিসাইলের জন্য যা খরচ, সেই খরচে তেরো লক্ষ শিশুকে এক বছর খাদ্য দেওয়া যায়। শুধু আমাদের দেশে কেন, এদেশেও অপুষ্টিতে ভোগা শিশু আছে। এদিকে এখন চিনের সঙ্গে এদের খুব ভাব, কারণ চিনের সঙ্গে চুটিয়ে ব্যাবসা চলছে কিনা।

—কিন্তু সুনীলদা, আমি যতদূর জানি, আণবিক অস্ত্রের স্টক পাইল আমেরিকানদের চেয়ে রাশিয়ারই বেশি।

—রাশিয়ার বেশি হলে এরা আরও বেশি রাখতে চায়। আবার এদের যদি একটা দুটো বেশি হয়ে যায়, তখন রাশিয়া আবার বেশি বানাবে। এই রকম করতে করতে পৃথিবীটা এক দিন হঠাৎ দুম ফটাস হয়ে যাবে।

স্বাতীদি বললেন, আমরা সেই যে একটা কোম্পানি অফিসে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলুম—

স্বাতীদিকে থামিয়ে দিয়ে সুনীলদা বললেন, একটা ওইরকম মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি আমাদের অনেককে খেতে নেমন্তন্ন করেছিল, আমাদের দলে কয়েকজন চিনে লেখক লেখিকাও ছিলেন। সে এক এলাহি ব্যাপার। কোম্পানিটির নাম জন্ ডিয়ার কোম্পানি, আমাদের দেশে অনেকে নাম শোনেনি, কারণ আমাদের দেশে এদের ঠাঁই গাড়তে দেওয়া হয়নি। এরা পৃথিবীতে কৃষির যন্ত্রপাতি বানাবার বৃহত্তম কোম্পানি। ট্রাকটর ফ্রাকটর বানায়। এদের অফিস বাড়িটি দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়, বিশ্ববিখ্যাত সব শিল্পীদের আসল ছবি দিয়ে সাজানো, স্বয়ং হেনরি মুরকে ডেকে এনে ভাস্কর্য গড়িয়ে রাখা আছে বাগানে। খাওয়াদাওয়াও হল দারুণ। কথায়-কথায় এই কোম্পানির একজন ডিরেকটর খুব আহ্লাদ করে আমাদের জানালেন যে ইদানীং চিনে এরা কত হাজার কোটি ডলারের যেন কয়েকটা কারখানা বসিয়েছে। তখন আমার মনে হল, এই যে আড়ম্বর ও বিলাসিতা, তার অনেকটাই নিশ্চয়ই সাম্যবাদী চিনকে শোষণ করা টাকায়। সাম্যবাদী চিনও হঠাৎ কেনই বা নিজেদের এখন মার্কিনিদের দিয়ে শোষিত হতে দিচ্ছে, তাই বা কে জানে!

আমি বললুম, যাক গে, ওসব বড়-বড় রাজনীতির ব্যাপার। সুনীলদা আপনার সঙ্গে এখানকার অনেক লেখকদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে নিশ্চয়ই?

স্বাতীদি অনুযোগের সুরে বললেন, দ্যাখো না, ও কারুর সঙ্গে আলাপই করতে চায় না। আজকাল ভীষণ অমিশুকে হয়ে গেছে।

সুনীলদা বললেন, যখন বয়েস কম ছিল, তখন ঝোঁক ছিল বিখ্যাত লেখকদের সঙ্গে আলাপ করব। তাঁদের কথা শুনব। এখানে অনেক ভালো লেখক আছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু আজকাল তাঁদের সঙ্গে কথা বলার উৎসাহ পাই না। ওদের সামনে গেলে একটা হীনমন্যতা জাগে। কারণ কী জানো, ওরা আমাদের বিষয়ে কিছুই জানে না, আমাদের কারুর লেখা পড়েনি। অথচ আমরা এদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানি, অনেক লেখা পড়েছি। এখানে সব আলোচনাই একতরফা হতে বাধ্য। তাতে আমার রুচি নেই। আমি মনে করি, আমাদের বাংলা সাহিত্যের মান এখানকার চেয়ে কোনও অংশে কম নয়, এদের কিছু লেখা খুব ভালো হলেও অধিকাংশ লেখাই তো রাবিশ। এরা যদি বাংলা সাহিত্য পড়তে না চায় তা হলে নিজে গিয়ে সেধে-সেধে কিছু জানবার আগ্রহ আমার একটুও নেই। তার চেয়ে এদেশটা বেড়াবার পক্ষে ভালো, টাকাপয়সা জুটলে কিছুদিনের জন্য বেড়িয়ে যেতে বেশ ভালোই লাগে।

—আপনাকে যদি অনেক টাকা দেওয়া হয়, তাহলে আপনি এদেশে থেকে যাবেন?

—যদি আমায় মাসে এক লাখ ডলারও দেয়, তা হলেও আমি এদেশে থাকব না। যদি আমায় জেলে বন্দি করে রাখে পরের দিনই আমি আত্মহত্যা করব।

সুনীলদার এমন তীব্র মন্তব্য শুনে আমি আর স্বাতীদি দুজনেই হাসতে লাগলুম। তাতে সুনীলদা একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। বেশি বড়-বড় কথা বলা হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে নিজেকে একটু সামলে নিলেন। তারপর নিজেও হাসতে-হাসতে বললেন, আরে বাবা, বাংলায় কিছু লিখতে গেলে আমাকে তো নিজের দেশের মানুষের মধ্যেই থাকতে হবে। নিজের দেশের মানুষকে না জানলে তো কিছু লেখা যায় না।

স্বাতীদি বললেন, আমারও খুব বেশিদিন এসব দেশে থাকবার খুব একটা ইচ্ছে নেই। জানো তো, ও ক্যালঘেরি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরও চার মাস থেকে যাওয়ার একটা প্রস্তাব পেয়েছিল, কিন্তু ও নিতে রাজি হয়নি। ভালোই করেছে। বেড়াতে এসেছি, বেড়িয়ে ফিরে যাব।

সুনীলদা আবার হঠাৎ মেজাজ বদলে কড়া গলায় আমায় জিগ্যেস করলেন, তুমি আমায় এত কথা জিগ্যেস করছ কেন? তুমি কি আমার ইন্টারভিউ নিচ্ছ নাকি?

—না, না, এমনি। এসব কথা আর কাকে জিগ্যেস করব, বলুন?

—এসব আবার কোথাও ছাপিয়ে টাপিয়ে দিও না।

—এখন আবার ফাংশান শুনবেন না একটু রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াবেন? আজ কিন্তু চমৎকার রোদ উঠেছে।

স্বাতীদি খুব উৎসাহের সঙ্গে বললেন, চলো-চলো, সেই ভালো। এইসব গান-বাজনা তো আমরা কলকাতায় রোজই শুনি—।

আমরা তিনজনে বেরিয়ে পড়লুম পথে।

।। ২৮ ।।

এখন নিউ ইয়র্কে রাত দেড়টা, তা বলে কলকাতায় এখন ক'টা বাজে? খুব সম্ভবত দশ ঘন্টার তফাত। অর্থাৎ কলকাতায় এখন বেলা সাড়ে এগারোটা। নিউ ইয়র্কে শনিবার রাত, কলকাতায় এখন রবিবারের দুপুর সবে মাত্র আসছে।

তখন পরিষ্কার দেখতে পেলুম কলকাতায় রবিবারের সকাল-দুপুরের ছবি। প্রত্যেক রবিবার আমাদের একটা আড্ডা আছে। সাধারণত সেই আড্ডাটা সাড়ে এগারোটা-বারোটা থেকেই শুরু হয়, চলে বিকেল পর্যন্ত। কোনও-কোনও দিন সন্ধেও গড়িয়ে যায়। নিয়ম না-মানা, বলগা-ছাড়া আড্ডা।

হঠাৎ আমার ভীষণ মনটা ছট্‌ফট করে উঠল। দূর ছাই, কিচ্ছু ভালো লাগছে না! এই সাহেবদের দেশে আমি কী করছি? আমার এক্ষুনি চলে যেতে ইচ্ছে করছে। জলের মাছকে জলে ফিরিয়ে দিলেই যেমন সে সবচেয়ে সাবলীল থাকে, কলকাতাটা আমার সেই রকম নিজস্ব জলাশয়।

বেশ বড় অ্যাপার্টমেন্ট, তিন খানা শোওয়ার ঘর, একটা মস্ত লিভিং-কাম-ডাইনিং রুম। গৃহস্বামী অনুপস্থিত, আমাকে চাবি দিয়ে গেছেন, সারাদিন ঘুরে ফিরে এখানে রাত্রে চলে আসি।

কিছুতেই ঘুম আসছে না আজ। এক-একবার সব অন্ধকার করে দেখছি বাইরের আলো। আবার হঠাৎ সব ঘরের আলো জ্বেলে দিচ্ছি। কিছুরই অভাব নেই, ফ্রিজ-ঠাসা খাবার, সেলারে অনেক রকম পানীয়, তিনটে ঘরের তিন রকমের বিছানাতেই শুতে পারি, তবু মনে হচ্ছে এক ছুটে কলকাতায় গিয়ে নিজের বালিশে শুয়ে পড়ি।

মন খারাপটা শুরু হয়েছিল বিকেল থেকেই।

নিউ ইয়র্কের মতন পেল্লায় শহরের রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ একজন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় আশ্চর্যের কিছু না। কিন্তু পরপর দুদিন একই লোকের সঙ্গে এখানকাব রাস্তায় দেখা হয়ে যাওয়া সত্যিই অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। আমার কিন্তু সেই রকমই হল।

গতকাল বিকেলে গুগেনহাইম মিউজিয়াম থেকে সবেমাত্র বেরিয়েছি, একজন আমার পিঠে ঘুষি মেরে বলল, হ্যাল্লো, নীলু।

চমকে পেছন ফিরে আমার আক্রমণকাবীকে দেখে আমি খুবই খুশি হলুম। এক একজন মানুষ থাকে, যাদের দেখলেই ভালো লাগে। এই মানুষটি সেইরকম।

ইংরিজি বানানে এর নাম জর্জ, কিন্তু আসল উচ্চারণ ইয়র্গো। এই ইয়র্গো একজন গ্রিক লেখক। কিছুদিন আগে একটা ছোট শহরে এর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। লেখক-টেখকদের সংস্পর্শে যেতে আমার ভয় করে, কারণ সাহিত্য-আলোচনা ফালোচনা আমাদর দ্বারা কিছুতেই হয় না। সাহেব-লেখকদের সম্পর্কে তো আমার আরও ভয়, ওদের সঙ্গে আবার ইংলিশে সাহিত্য আলোচনা করতে হবে, বাপরে!

কিন্তু ইয়র্গোর চেহারায় কিংবা ব্যবহারে একদম সাহিত্যিক-সাহিত্যিক ব্যাপার নেই। বেশ রুক্ষ চেহারা, নাকের নীচে ঝোলা গোঁপ, অতিরিক্ত ধূমপানের জন্যই বোধহয় দাঁত একটু ক্ষয়ে গেছে। গোঁফের ফাঁক দিয়ে ও মিচকি-মিচকি হাসে আর সবসময় মজার কথা বলতে ভালোবাসে। সাহিত্য ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য বহু বিষয়ে ওর টগবগে আগ্রহ। যদিও গ্রিসে ইয়র্গো খুব নাম করা নাট্যকার এবং চলচ্চিত্র-নাট্যকার। নিজের দেশে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়েছে। লেখক হিসেবে ওর খুব সম্মান আছে। পুরো নাম ইয়র্গো কুরটিস।

প্রথম দিন আলাপেই ইয়র্গো আমাকে একটা অদ্ভুত কথা বলে চমকে দিয়েছিল। সেটা ছিল বেশ বড় গোছের একটা সম্মিলন, নানা জাতের লোক, তার মধ্যে সাহেবই বেশি। সবাই সবার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে কথা বলছে, এর মধ্যে ইয়র্গো এক সময় আমার পাশে এসে ওর স্বভাবসিদ্ধ মুচকি হেসে বলল, একটা জিনিস লক্ষ করেছ, নীল্লু? আমরা যারা কালো লোক, আমরা কক্ষনো কোনও পার্টির ঠিক মাঝখানে থাকি না, আস্তে-আস্তে কোনও না কোনও দেওয়ালের দিকে সরে যাই। তুমি দ্যাখো, সব কালো লোকরাই দেওয়ালের পাশে।

আমি চমকে ইয়র্গোর দিকে তাকিয়ে ছিলুম। ও নিজেকে কালো লোক বলছে কেন? গ্রিকরাও তো পুরোপুরি সাহেব। আর ইয়র্গোর গায়ের রং-ও হাতির দাঁতের মতন।

—তুমি নিজেকে কালো বলছ কেন, ইয়র্গো? আমরা ভারতীয়রা কালো হতে পারি, কিন্তু তুমি...

—আরে, কালো মানে তো গরিব! গ্রিকরাও আমেরিকানদের তুলনায় ভীষণ গরিব! সুতরাং তোমরা আমরা সমান। আর গায়ের রং-এর কথা যদি বলো, তা হলেও, ইওরোপের দেশগুলো, যেমন সুইডেন, নরওয়ে, ওয়েস্ট জার্মানি—ওরা গ্রিকদের প্রায় কালোর মতনই অবজ্ঞা করে বুঝলে?

আমি বললুম, তুমি সত্যি আমাকে নতুন কথা শোনালে, ইয়র্গো। আমরা বাঙালিরা এখনও কোনও সুন্দর দেখতে ছেলের বর্ণনা দিই 'গ্রিক যুবকের মতন' কিংবা 'তরুণ গ্রিক দেবতা'।

ও বলল, সে তো তিন হাজার বছর আগেকার গ্রিসের মানুষের কথা তোমরা ভাবো। মুশকিল হচ্ছে কী, সবাই ক্লাসিকাল আমলের গ্রিসের কথা জানে, কিন্তু এখনকার গ্রিসের অবস্থা কেউ জানারও চেষ্টা করে না। আমরা আবার বড়লোক হই, তখন আবার সুন্দর হয়ে যাব। তোমরা ভারতীয়রাও যদি এখন হঠাৎ বড়লোক হয়ে যাও, তাহলেই দ্যাখো, তোমাদের ওই জলপাই রঙের চামড়া নিয়ে ইংরেজিতে কাব্য লেখা হবে, মেমসাহেবরা তোমার পেছনে ছুটোছুটি করবে।...

এ হেন ইয়র্গোকে নিউ ইয়র্কের রাস্তায় হঠাৎ দেখতে পেলে আমার তো ভালো লাগবেই। ইয়র্গো একটি ছোট শহরের মাঝারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে কয়েক মাসের জন্য এখানে এসেছে।

আমি মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে বাংলায় কথা বলি। ও বাংলা এক বর্ণও বোঝে না। কিন্তু আমাকে ও বলেছিল যে বাংলা শব্দ ঝংকার শুনতে ওর ভালো লাগে।

আমি ওর হাত চেপে ধরে বললুম, কী গো ইয়র্গো সাহেব, তুমি কোথা থেকে হঠাৎ এখানে উদয় হলে? আকাশ থেকে খসে পড়লে নাকি?

ইয়র্গো আমার প্রশ্ন বুঝল না বটে কিন্তু উত্তরে বলল, এই নিউ ইয়র্কে কয়েকদিনের জন্য একটু ফুর্তি করতে এসেছি। শুনেছিলুম নিউ ইয়র্কের পথে পথে জুনিপার ফুলের মতন ছড়ানো থাকে সুন্দরী মেয়ে, যেন কারুর দিকে একটু ভুরুর ইশারা করলেই সঙ্গে সঙ্গে আসে। দুদিন ধরে ভুরুর ইশারা করতে-করতে আমার চোখ ব্যথা হয়ে গেল। কই একজনও তো এল না।

ইয়র্গো ভালো ইংরিজি জানে না। ভাঙা-ভাঙা বলে। মাঝে-মাঝে ঠিক শব্দটা খুঁজে না পেয়ে হাওয়ায় হাতড়াতে থাকে।

কোনও সাহেবের মুখে ভাঙা ইংরিজি শুনলে আমার বড্ড আরাম হয়। আমিও তার সঙ্গে বেশ স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারি।

ইয়র্গোর কথা শুনে আমি হাসতে লাগলুম।

ইয়র্গো জিগ্যেস করল, তুমি কোনও বান্ধবী পেয়েছ নিউ ইয়র্কে?

আমি ডান হাতের বুড়ো আঙুল নেড়ে বললুম, লবডঙ্কা।

ইয়র্গো প্রথমে একটা গ্রিক গালাগালি দিল। সেটা নিশ্চয়ই শালার প্রতিশব্দ। তারপর বলল, আমাদের দেশের যেসব লেখকরা এদেশ ঘুরে গিয়ে ভ্রমণ কাহিনি লেখে, সব্বাই ডাহা গুল মারে।

দুঃখের বিষয় এরকম সরস গল্প আমরা বেশিক্ষণ জমাতে পারিনি। কারণ কাল বিকেলে আমাদের দুজনেরই তাড়া ছিল। আমার একটা থিয়েটার দেখতে যাওয়ার কথা, ইয়র্গো কেটে রেখেছে একটা ফরাসি সিনেমার টিকিট। সুতরাং কাছাকাছি এখটা ম্যাকডোনাল্ডের দোকানে ঢুকে আমরা কিছু খেয়ে নিলুম এবং লিখে দিলুম পরস্পরের ঠিকানা।

কিন্তু ঠিকানা খুঁজে যোগাযোগ করবার আগেই আজ সন্ধেবেলা আবার ইয়র্গোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল রাস্তায়। একই থিয়েটার দেখে বেরুলাম দুজনে।

আজ ইয়র্গোর সঙ্গে একটি স্বাস্থ্যবতী যুবতী, ঝলমলে মুখ, ডাগর-ডাগর চোখ, তার স্কার্টে অত্যুজ্জ্বল লাল-নীল ফুল।

ইয়র্গো আর আমি প্রথম বিস্ময় বিনিময় করবার পর সে জিগ্যেস করল, নীল্লু, আজ এর পর তোমার কোনও কাজ আছে? কোথাও যাবার কথা আছে?

আমি কাঁধ ঝাঁকালুম। অর্থাৎ সেরকম কোনও কথা থাকলেও কিছু আসে যায় না।

—তাহলে কিছুক্ষণ কোথাও বসে আড্ডা মারা যাক? হ্যাঁ?

—নিশ্চয়ই!

মেয়েটি পৃথিবীর দুর্বোধ্যতম ভাষায় ইয়র্গোকে কী যেন বলল। ইয়র্গো সেই একই ভাষায় উত্তর দিয়ে তারপর আমাকে আবার মিষ্টি ভাঙা ইংরিজিতে বলল, এই মেয়েটি থাকতে চাইছে না, ওর বাবা ওর সঙ্গে আজ দেখা করতে আসবে বলছে, তা হলে ওকে ছেড়ে দিই, কী বলো।

আমি আর কী বলব, হাসি হাসি মুখ করে তাকিয়ে রইলুম। মেয়েটিও আমার দিকে একঝলক হেসে গুডবাই বলে নেমে গেল মাটির তলায় ট্রেন ধরতে।

কিছুক্ষণ ইয়র্গো আর আমি পাশাপাশি হাঁটবার পর আমি বললুম, এই তো আজ বেশ একটি সুন্দরী সঙ্গিনী পেয়ে গিয়েছিলে দেখছি!

ইয়র্গো দারুণ-বিরক্তির সঙ্গে বলল, দূর দূর! ও তো গ্রিক মেয়ে! এখানে এসে উঠেছি এক গ্রিকের বাড়িতে, নেমন্তন্ন খাচ্ছি গ্রিকদের বাড়িতে, আলাপ হচ্ছে গ্রিক মেয়েদের সঙ্গে...তাহলে আর নিউ ইয়র্কে আসা কেন? এথেন্সেই তো এসব পাওয়া যায়। আমার নাম শুনলে গ্রিক মেয়েরা আমার সঙ্গে প্রেম করতে আসে, নিউ ইয়র্কেও সেই একই ব্যাপার!

আমি যতদূর জানি, বাঙালি লেখকদেরও প্রায় একই অবস্থা। তারাও বিদেশে গেলে বাঙালিদের বাড়িতে ওঠে। বাঙালিদের নানান বাড়িতে নেমন্তন্ন খায়। তবে বাঙালি মেয়েরা লেখকদের নাম শুনে প্রেম করতে আসে কি না তা অবশ্য আমি জানি না। অন্তত আমার কোনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই।

ইয়র্গো জিগ্যেস করল, নিউ ইয়র্ক তোমার কেমন লাগছে?

আমি পাল্টা প্রশ্ন করলুম, কারুর কি খারাপ লাগতে পারে?

ও বলল, ইত ইজ ও গ্রেত্ সিতি...সবসময় জীবন্ত...এত রকমের নাটক...এত ধরনের ফিল্ম...মিউজিক কনসার্ট...আর্ট গ্যালারিগুলো তো আছেই, সব দেখে শেষ করা যায় না...বাত্ আই দোনত লাইক ইত্! ইত ইজ দিপ্রেসিং!

রাস্তায় দুপাশের অতিকায় বাড়িগুলো দেখিয়ে ইয়র্গো আরও কী যেন বলতে গেল, ভাষা না খুঁজে পেয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে, ঠোঁট উলটে বুঝিয়ে দিল।

তারপর থমকে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করল, তুমি কখনও উজো খেয়েছ? আজ দেখলুম এখানকার

দোকানে পাওয়া যায়। দেখেই কেমন মন খারাপ হয়ে গেল। তুমি খাবে?

—উজো কী?

—আমাদের গ্রিসের দেশি মদ। খেয়ে দ্যাখো না একটু।

—কেন খাব না? জানো, আমার মা আমায় ছেলেবেলাতেই শিখিয়ে দিয়েছেন, পরের বাড়িতে গিয়ে এটা খাব না, সেটা খাব না বলতে নেই। যে যা দেবে মুখ বুজে খেয়ে নেবে।

ইয়র্গো এক গাল হেসে বলল, চলো তাহলে।

ম্যানহাটানে বার অসংখ্য। কিন্তু উজো অতি সস্তা দামের পানীয়, বারে বোধহয় সার্ভ করে না। তা ছাড়া আমরা দুজনেই গরিব দেশের মানুষ, ডলারকে ভক্তি করি। বারে বসে পেগের দামে অনেক খরচ পড়ে যাবে।

হাঁটতে-হাঁটতে আমরা গ্রিনিচ্ ভিলেজে এসে পড়েছি। ইয়র্গো সট্ করে এক দোকান থেকে এক বোতল উজো কিনে নিয়ে এল। তারপর বলল, এখানেই কোথাও বসে যেতে হবে। দাঁড়াও ব্যবস্থা করছি।

রাত প্রায় দশটা বাজে। গ্রিনিচ্ ভিলেজের সেই আগেকার রব্রমা এখন আর নেই। বাউণ্ডুলে শিল্পী সাহিত্যিকরা নগর-উন্নয়নকারীদের অত্যাচারে অনেকেই এ পাড়া ছেড়ে পালিয়েছে। তবু এখনও এখানকার পথে বেশ ভিড়।

একটা ফাঁকা ধরনের রেস্তোরাঁর ফুটপাথের টেবিলে বসলুম আমরা। পরিচারিকাকে ডেকে খুব সরলভাবে ইয়র্গো বলল, আমাদের দু-কাপ কফি দাও। আর দুটো কাচের গেলাস দাও। আর বেশ বড় এক জাগ জল দাও। আমরা কফির দাম দেব কিন্তু কফি খাব না। আমরা অন্য জিনিস খাব।

মেয়েটি বিনা বাক্যব্যয়ে কফি, গেলাস ও জল নিয়ে এল। তারপর জিগ্যেস করল, তোমরা কী খাবে?

কাঁধের ঝোলা থেকে বোতলটি বার করে ইয়র্গো গেলাসে ঢালল। আমাকে বলল, প্রথমে নিট্ খেয়ে দ্যাখো। যদি বেশি কড়া লাগে, তাহলে জল মিশিয়ে নিও। তবে তাড়াতাড়ি খেও না কিন্তু, হঠাৎ কিক করে।

পরিচারিকাটি ইয়র্গোর গেলাসটা তুলে নিয়ে ছোট্ট একটা চুমুক দিল। একটুক্ষণ সময় নিয়ে জিনিসটা উপলব্ধি করে সে বলল। হ্যাঁ, খেতে পারো। আমি ঘুরে-ঘুরে আসব, আমাকে একটু-একটু দিও।

আমি প্রথমে সাবধানে চুমুক দিলুম। মোটেই অচেনা লাগল না। উজো একেবারে জলের মতন স্বচ্ছ পানীয়। সাঁওতাল পরগনায় আমি অনেকবার মহুয়া খেয়েছি, স্বাদটা অনেকটা সেই রকমই লাগল। কিংবা গোয়ার কাজু ফেনির মতনও বলা যায়। মেক্সিকোর টাকিলা আমি অনেকবার খেয়েছি, তার চেহারা ও স্বাদও এর কাছাকাছি। জল না মিশিয়েই দুজনে চুমুক দিতে লাগলুম চুকচুক করে।

একটুবাদে ইয়র্গো বলল, তুমি গ্রিসে যাওনি, না? চলে এসো। ছোট-ছোট দ্বীপ...গ্রিসে এলে তুমি বুঝতে পারবে জল কত সুন্দর দেখতে হয়। এই যে নিউ ইয়র্ক শহর, এটা কি মানুষের বসবাসযোগ্য? দেখতে মনে হয় না এটা দৈত্যদের জন্য বানানো হয়েছে? তার বদলে...গ্রিস...মানুষ আর প্রকৃতি সেখানে এখনও এক সঙ্গে মিশে আছে অনেকখানি...অভাব আছে, দারিদ্র্য আছে...কিন্তু এখনও মানুষের মন টাটকা আছে...

ব্যস, অমনি শুরু হয়ে গেল আমার বুকে ব্যথা। কলকাতা শহরের রূপের কোনও খ্যাতি নেই, কিন্তু সে যে বিষম আপন, তাই নিউ ইয়র্কের তুলনায় সেই মুহূর্তে কলকাতাকে মনে হল স্বর্গের মতন প্রিয়। গ্রিসের মতন আমাদের বাংলা হয়তো তত সুন্দর নয়, কিন্তু তারও তো একটা আলাদা রূপ আছে। শুধু বাংলা কেন, গোটা ভারতবর্ষটাই তো আমার। সেই জনম দুখিনী দেশটার জন্য টনটন করতে লাগল হৃৎপিণ্ড।

দুজনে মিলে ফিসফিস করে গল্প করতে লাগলুম দুজনের দেশের। বোতল প্রায় শেষ। আমার

এখন একা থাকতে ইচ্ছে করছে খুব। শেষের দিকে পরিচারিকাটি খুব ঘনঘন এসে চুমুক দিচ্ছিল গেলাসে, আমি তাই ইয়র্গোকে বললুম, এর দিকে ভুরুর ইশারা করলে বোধহয় কাজ হবে। তুমি চেষ্টা করে দ্যাখো না।

ইয়র্গো পরিচারিকাটির নামধাম জিগ্যেস করল। তারপর সে বসে যেতেই বলল, ধুর। ও তো ইটালিয়ান। সবেমাত্র কিছুদিন হল এসেছে। আমাদের গ্রিসেও তো কত ইটালিয়ান মেয়ে কাজ করতে যায়।

হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে ইয়র্গো বলল, আমরা বড্ড সেন্টিমেন্টাল হয়ে যাচ্ছি, না? এটা ছেলেমানুষি হয়ে যাচ্ছে। চলো, অন্য কোথাও যাই, যেখানে অনেক লোক, সেখানে খানিকটা হইচই করব...।

কিন্তু খানিকবাদে আমি ইয়র্গোর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এলুম। ফেরার পর অবশ্য বুঝলুম ভুল করেছি। এক মুহূর্ত স্থির থাকতে পারছি না। কলকাতা যেন বিরাট এক লাটাই গুটিয়ে আমায় ঘুড়ির মতন টানছে। মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে ফিরে যাই। আমার কাছে রিটার্ন টিকিট আছে। বিমান কোম্পানিকে ফোন করব, যদি পরের ফ্লাইটেই জাগয়া পাওয়া যায়। কিন্তু এত রাত্রে...।

শুধু আমার মন নয়, আমার শরীরও যেন কলকাতার জন্য মোচড়াচ্ছে। এখন রোববার সাড়ে এগারোটা, আড্ডাধারীরা যে-যার বেরুচ্ছে বাড়ি থেকে এই সময়। আজ কোথায় আড্ডা? এর বাড়ি, বা ওর বাড়ি, না তার বাড়ি! কিংবা লেকের গাছতলায় চেয়ার টেবিলে।

নিজেই এক সময় হেসে উঠছি। আমি এত সেন্টিমেন্টাল? তা হোক, এখন সম্পূর্ণ একা, যতই সেন্টিমেন্টাল হই, যতই ছেলেমানুষি করি, কেউ তো দেখছে না।

হঠাৎ মনে হল, এখন একটু বাংলায় কথা বললে তবু ভালো লাগবে। অনেক দিন দীপকদা-জয়তীদির সঙ্গে যোগাযোগ নেই। ওঁদের ওখানে এখন কত রাত? যাই হোক, ওঁদের জাগানো যেতে পারে। আমি টেলিফোন তুলে ওঁদের নম্বর ঘোরালুম।

২৯

ইংল্যান্ডের নিসর্গদৃশ্য সম্পর্কে সেখানকার কবি ও শিল্পীরা বরাবরই উচ্ছ্বসিত। রোমান্টিক প্রকৃতি বর্ণনা ইংরেজি কবিতায় যেমন সুন্দর আছে, অন্য ভাষায় তার তুলনা পাওয়া ভার। সেই জন্যই বোধহয় ইংরেজ ঔপনিবেশিকরা আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে এই নতুন দেশে এসে যখন আস্তে-আস্তে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে, তখন ম্যানহাটান দ্বীপ ছাড়িয়ে তার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলি দেখে হয়তো তারা মুগ্ধ ও চমকিত হয়েছিল। সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছিল নিজের দেশের। সেই জন্যই তারা এই এলাকার নাম রাখে নিউ ইংল্যান্ড। ম্যাসাচুসেট্স, রোড আয়ল্যান্ড, কানেটিকাট ইত্যাদি জায়গা এই নিউ ইংল্যান্ডের মধ্যে পড়ে।

সত্যি বড় অপূর্ব এখানকার প্রকৃতি। নিউ ইয়র্ক শহর থেকে ট্রেনে চেপে খানিকটা দূরে গেলেই দুপাশের দৃশ্যে চোখ জুড়িয়ে যায়। খুব যে আহামরি সাংঘাতিক কিছু দ্রষ্টব্য ব্যাপার আছে তা নয়, ছোট-ছোট টিলা, হালকা-হালকা গাছ আর খুদে-খুদে নদী। সৌন্দর্য এটাই যে প্রকৃতিকে এখানে অবিঘ্নিত রাখা হয়েছে, গাছপালাগুলোকে ছেঁটে-ছেঁটে সাজানো হয়নি, নদীগুলো চলেছে আপন মনে। ঝোপঝাড়ে ফুটে আছে অজস্র ফুল। তাদের নামও বেশ মজার, বাটারকাপ, ইন্ডিয়ান পেইন্ট ব্রাশ, লেডিজ স্লিপার, কুইন অ্যানিজ লেস, মারিপোসা লিলি, নিউ ইংল্যান্ড অ্যাস্টর। তাদের কতরকম রং।

একদিন এরকম একটা পথ দিয়ে গাড়িতে যেতে-যেতে আমাকে নদীর ধারের একটা জায়গা আঙুল তুলে দেখিয়ে একজন বলেছিলেন, ওই গাছতলায় আমার এক বান্ধবীর বিয়ে হল কিছুদিন আগে।

আমি জিগ্যেস করলুম, গাছতলায় বিয়ে?

তিনি বললেন, হ্যাঁ। খুব চমৎকার বিয়ে। পাত্র আর পাত্রী ছাড়া আরও আমরা দশ-বারোজন এসেছিলুম সকালবেলা। নদীর ধারে গাছের ছায়ায় বসে প্রথমে ছেলেটি আর মেয়েটি পরস্পরকে উদ্দেশ্য করে একটা করে কবিতা পড়ল। তারপর বরযাত্রী আর কন্যাযাত্রীদের প্রত্যেককেই পড়তে হল নিজেদের পছন্দমতো একটা করে কবিতা। ব্যস, হয়ে গেল বিয়ে।

আমি আকুল, সতৃষ্ণ নয়নে অনেকক্ষণ সেই ছোট্ট নদীর ধারে ছায়াময় জায়গাটির দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়েছিলুম অনেকক্ষণ।

সেই রকমই একটা নিরিবিলি ছিমছাম, সুশ্রী জায়গার নাম স্কারস্‌ডেল। এখানে থাকেন ডঃ অম্বুজ মুখোপাধ্যায় এবং স্নিগ্ধা মুখোপাধ্যায়। অম্বুজ মুখোপাধ্যায় ভারতের বাইরে এসেছিলেন প্রথম যৌবনে, এখন তিনি প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পৌঁছে গেছেন। তিনি অধ্যাপক এবং শান্ত ধরনের মানুষ, চাকরির সময়টুকু ছাড়া বাকি সময়টুকু বাড়িতে বসে শুধু বই পড়েন। কতরকম বই আর পত্রপত্রিকা, তার মধ্যে 'দেশ' এবং অনেক বাংলা বইও আছে। স্নিগ্ধা দেবী তাঁর জীবনের যে ক'টা বছর স্বদেশে কাটিয়েছেন, তার চেয়ে বেশি বছর কেটে গেল বিদেশে। কিন্তু কলকাতার বনেদি বাড়ির মহিলাদের মুখে যে একটা বিশেষ ছাপ থাকে, সে ছাপ তাঁর মুখে এখনও অক্ষুণ্ণ আছে। রূপও ফেটে পড়ছে এখনও।

এঁদের দুই ছেলেমেয়ে হস্টেলে থেকে পড়াশুনো করে। স্নিগ্ধা দেবীও সকালবেলা কয়েক ঘণ্টার জন্য একটা চাকরি করতে যান, ফিরে এসে শিল্পীর মতন যত্ন করে নানারকম রান্নাবাড়া করেন। শুধু নিজেদের জন্য নয়, এঁদের বাড়িতে প্রায়ই অতিথি আসে। এঁরা দু-তিন বছর অন্তর নিয়ম করে একবার দেশে যান।

এইসব বাড়িতে এলে মনে হয়, আমেরিকা আসলে খুব একটা কিছু দূরের দেশ নয়। এক সময় বাঙালিবাবুরা পশ্চিমে চাকরি করতে যেত, পশ্চিম মানে লাহোর, দেরাদুন, মীরাট এই ধরনের জায়গা। তখন সেই সব জায়গাই ছিল বহু দূরে। দু-তিন বছর তাঁরাও বাংলাদেশে আসতেন ছুটি নিয়ে, আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য। সঙ্গে আনতেন প্রচুর রোমাঞ্চকর গল্প, মেওয়া-খোবানি জাতীয় নতুন ধরনের খাদ্য আর স্থানীয় রংচঙে পোশাক।

এখন মস্কো-নিউইয়র্ক-টরোন্টো হয়েছে সেই লাহোর, দেরাদুন, মীরাট।

অম্বুজবাবু ও স্নিগ্ধা দেবীকে পূর্ব উপকূলের বাঙালিরা প্রায় সকলেই চেনে। শুধু বাঙালি কেন, অনেক ভারতীয়রাও, কারণ প্রধানত এঁদেরই উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছে 'টেগোর সোসাইটি'। এই টেগোর সোসাইটির নানান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন বাঙালি-অবাঙালি অনেকেই।

উত্তমকুমার এসে উঠেছিলেন এই বাড়িতে। তা ছাড়া হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা সেন, সুবিনয় রায় প্রমুখ আরও সব অনেক নামকরা মানুষ এবাড়িতে এসে থেকেছেন কিংবা অনুষ্ঠান করে গেছেন। কী একটা সূত্রে যেন সুনীলদা আর স্বাতীদি এখানে অতিথি। সেইজন্য আমারও নেমন্তন্ন হল।

সেইখানে খেলুম ইলিশ মাছ। ইলিশের মতন ইলিশ বটে। কলকাতার বাজারে মাঝে মাঝে এক রকম ইলিশ পাওয়া যায়, তাকে বলে খোকা ইলিশ। সেই অনুযায়ী ওই ইলিশকে বলা যায় মহারাজ ইলিশ। এক একটির ওজন আট-দশ পাউন্ড, চেহারাও অপূর্ব। এই মাছের স্থানীয় নাম শ্যাড়্‌। কিন্তু ইলিশ বলে চিনতে আমাদের কোনও অসুবিধেই হওয়ার কথা নয়। স্বাদ-গন্ধ সবই ঠিকঠাক। নিমন্ত্রিতরা সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। কিন্তু আমার মতন কাঠ-বাঙাল অত চট করে ইলিশকে সার্টিফিকেট দিতে পারে না। স্নিগ্ধা দেবীর রান্না অতি চমৎকার, আর সবই ঠিকঠাক আছে, কিন্তু মাছটা কেমন যেন একটু তুলতুলে ধরনের। পেটিব মাছে সেই তৈলাক্ত তেজি ভাবটা যেন নেই।

এই বাড়িতেই আলাপ হল দুজনের সঙ্গে। একটি মেয়ের নাম প্রীতি, সে আমাদের যাদবপুরের চন্দন সেনগুপ্ত নামে এক সুদর্শন ও মেধাবী যুবকের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। চন্দনকে বেশি দেখা

যায় না, সে খুবই লাজুক, তা ছাড়া নিজের কাজকর্মে খুব ব্যস্ত, সারাদিন অফিস করবার পর সন্ধের সময় সে আবার এক স্কুলে পিয়ানো শিখতে যায়। প্রীতি আগে একটি ট্রাভেল এজেন্সিতে কাজ করত, এখন ছেড়ে দিয়েছে, তাই তার হাতে এখন অনেক সময়। প্রীতি আমাদের বন্ধু, 'দার্শনিক ও পথপ্রদর্শিকা' হয়ে পরে অনেক দ্রষ্টব্য স্থান নিয়ে গেছে।

প্রীতি মেয়েটি গুজরাটি। চন্দনের সঙ্গে নিউ ইয়র্কেই তার পরিচয়। কলকাতায় না এসেই সে তার স্বামীর ভাষা বাংলা পড়তে, লিখতে এবং বলতে শিখে নিয়েছে। আমি অবশ্য আগেও অনেক জায়গায় দেখেছি যে গুজরাটি নারীপুরুষরা অনেহৈ বেশ চট করে বাংলা শিখে নিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে একটা মজার কথা মনে পড়ে গেল। বোম্বাইতে নলিনী মাডগাঁওকর নামে একজন কবি এবং অধ্যাপিকা বাংলা বলতে পারেন তো খুব ভালোই, লেখেনও চমৎকার। এই নলিনী গুজরাটের মেয়ে, এঁর স্বামী বলবন্ত্ মহারাষ্ট্রীয়। এই বলবন্ত্-এর কৃতিত্ব আরও বেশি। ইনি কখনও একটানা কলকাতায় থাকেননি, শান্তিনিকেতন একবার দেখতে গিয়েছেন মাত্র, তবে নিজের শখে ইনি রবীন্দ্রসঙ্গীত এতই ভালো শিখেছেন যে বোম্বাইতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্লাস নেন। বলাই বাহুল্য এঁর ক্লাসের অনেক ছাত্রছাত্রীই বাঙালি। নতুন গান শেখাবার আগে বলবন্ত যখন ছাত্রছাত্রীদের সেই গানটা লিখে নেওয়ার জন্য ডিকটেট করেন, তখন মুশকিল হয় এই যে, অনেক বাঙালি ছাত্রছাত্রীই বাংলা অক্ষর লিখতে পারে না। তারা বলে, স্যার, গানের কথাগুলো আমাদের রোমান স্ক্রিপ্টে লিখিয়ে দিন।

প্রীতি বাংলা শিখেছে নিছক নিজের শখে, কেন-না সে ইচ্ছে করলেই তার স্বামীর সঙ্গে ইংরেজিতে কথাবার্তা চালিয়ে দিতে পারত। তা ছাড়া সে কবিতা ভালোবাসে, গান ভালোবাসে, ছবি ভালোবাসে। সে কখনও শাড়ি পরে, কখনও স্কার্ট, কখনও বা গুজরাটি বা রাজস্থানি পোশাক, কিন্তু কখনও তার পোশাক বেশি জমকালো নয়, বরং তাতে সূক্ষ্ম রুচি মিশে থাকে।

সবচেয়ে আশ্চর্য হল তার ভ্রমণের নেশা। প্রীতি এক সময় ট্র্যাভেল এজেন্সিতে কাজ করত, তখন কম দামে কিংবা বিনা দামে টিকিট পাওয়ার সুযোগ ছিল। এখন সে সুযোগ নেই, তবু তার সেই নেশা রয়ে গেছে। আমরা ভারতবর্ষে বসে ভাবি টোকিও, পিকিং বা কায়রো কত দূরে। কিন্তু নিউ ইয়র্কে এলে মনে হয় সারা পৃথিবীটাই খুব কাছে। এখানকার ছেলেমেয়েদের মুখে প্রায়ই শোনা যায়, এই তো গত মাসে চিনে গিয়েছিলুম, পরশুই আবার ভিয়েনা যেতে হবে, সেখান থেকে ফিরেই আবার ভেনেজুয়েলায়.. । প্রীতি বেড়াতে যায় বিনা উদ্দেশ্যে। তার স্বামীকে যখন অফিসের কাজে কোথাও যেতে হয়, তখন একা একা নিউ ইয়র্কে থাকতে ভালো লাগে না প্রীতির, সে-ও বেরিয়ে পড়ে পৃথিবীর পথে। ইজিপ্ট কিংবা মেক্সিকো কিংবা চিনে সে অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে একলা ঘুরে আসে। তবে এত দেশ ঘুরেও প্রীতি দারুণ ভালোবাসে নিউ ইয়র্ক শহরটিকে। এরকম প্রাণবন্ত শহর নাকি আর একটাও নেই। এ বিষয়ে ঠিক মতামত দিতে পারি না, কেন না আমি আর ও পৃথিবীর কতটুকু দেখেছি।

আমাদের সঙ্গে ডাউন টাউন বেড়াতে এসে ট্রেন থেকে নেমেই প্রীতি একটা বড় গোল বোতাম কিনে নেয়, তাতে লেখা, 'আই লাভ নিউ ইয়র্ক'।

আর একজনের নাম কামাল। তার পুরো নাম মুস্তাফা কামাল ওয়াহিদ, কিন্তু সবাই তাকে কামাল বলেই চেনে, এমনকী তাকে শুধু 'কে' বলে ডাকলেই নাকি চলে। কামাল হচ্ছে সেই ধরনের মানুষ, যার সঙ্গে যে-কারুর মাত্র পাঁচ মিনিট আলাপেই ভাব জমে যায়।

প্রথম আলাপে সাধারণত আমরা সৌজন্যবশত নমস্কার বলে চুপ করে থাকি। এর পর কে কথা শুরু করবে, তাই নিয়ে খানিকক্ষণ দ্বিধা চলে। কিন্তু কামাল ওই সব অযথা আদবকায়দার ধার ধারে না, প্রথম আলাপের সঙ্গে-সঙ্গেই সে আগ্রহী হয়ে পড়ে, সেই মানুষটির কাজকর্ম বিষয়ে জানতে চায়, এবং বিদেশে তার কোনও রকম সাহায্যের দরকার আছে কি না, তাই নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে।

পরোপকার করাটা যেন তার ডাল-ভাত খাওয়ার মতন জীবনযাপনের একটা অতি স্বাভাবিক অঙ্গ।

কামাল চাকুরিজীবী নয়, সে ব্যবসা করে। সে কীসের ব্যবসা করে জিগ্যেস করলেই টপ্‌ করে উত্তর দেবে, আলপিন টু এলিফ্যান্ট যেকোনও কিছুর! এর সরল অর্থ হল, ভারতীয় উপমহাদেশের যেসব জিনিসের চাহিদা আছে আমেরিকায়, সেগুলো সে আনিয়ে বিক্রির ব্যবস্থা করে। যেমন চটের থলে, হ্যান্ডব্যাগ, পাথরের মূর্তি ইত্যাদি। কিন্তু কামালের সঙ্গে কয়েকদিন মেশার পর আমি বুঝতে পেরেছিলুম, খাঁটি ব্যবসায়ী হওয়া ওর দ্বারা কোনওদিন বোধহয় সম্ভব হবে না। কারণ ওর কোনও টাকার লোভই নেই। কিছু একটা করতে হবে, এই জন্য ও এক-একদিন এক-একটা কাজের নেশায় ছোটে। কাজটা আসল নয়, ওই ছোটাতেই ওর আনন্দ। কামাল কোনও নেশা-ভাঙ করে না, পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি মনোযোগ নেই, খায়ও অতি সামান্য। মাঝে-মাঝে সে তার ভবিষ্যৎ কোনও ব্যাবসা থেকে লাখ-লাখ কিংবা কোটি-কোটি টাকা লাভের রঙিন স্বপ্ন শোনায়। একদিন আমি জিগ্যেস করেছিলুম, অত টাকা পেলেই বা তুমি তা নিয়ে কী করবে, কামাল? একটু থমকে গিয়ে ও উত্তর দিল, কাজে লেগে যাবে, অনেকের কাজে লেগে যাবে।

লম্বা, সুগঠিত চেহারা কামালের বয়স বছর পঁয়তিরিশেক হবে। আমি তার নাম দিয়েছি গেছোবাবা। কামালও একজন গ্লোব ট্রটার বা বিশ্ব পথিক। আজ নিউ ইয়র্ক, কাল কলকাতা, পরশু ঢাকা, তারপর কাঠমান্ডু, তারপর লন্ডন, তারপর টরেন্টো, তারপর আবার কলকাতা...এইরকম চলে তার বছরে তিন-চারবার। কিন্তু কামাল ঠিক ভ্রমণকারী নয়, সে নতুন দেশ বা প্রকৃতি দেখবার জন্য ঘোরে না। কিংবা এতবার ঘোরাঘুরিতে ওর ওসব আগেই দেখা হয়ে গেছে বলে এখন আর ওসব দিকে তাকায় না। সে ঘুরে বেড়ায় তার স্বপ্নের ব্যাবসার অছিলায়। কোনও একদিন সে এক কোটি টাকা লাভ করবে, যে টাকাটা, 'অনেকের কাজে লাগবে'।

যে সন্ধেবেলা কামালের সঙ্গে আলাপ, সেদিনই সে ওয়াশিংটন ডি সি থেকে একটানা গাড়ি চালিয়ে এসেছে স্কারসডেলে। আধ ঘণ্টাখানেক গল্প করবার পরই হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বলল, একটা জরুরি কাজের কথা মনে পড়েছে, এক্ষুনি ঘুরে আসছি। চলে গেল চল্লিশ মাইল দূরে। ফিরে আসার পর আমাদের আলোচনায় একটু উঁকি দিয়েই কামাল বুঝল যে আমাদের সিগারেট ফুরিয়ে গেছে, এখানে কোথায় সিগারেট পাওয়া যায়, সেই কথা ভাবছি অমনি আবার বেরিয়ে গেল কামাল, সেই রাত্রে কোথা থেকে যেন নিয়ে এল এক পাহাড় সিগারেট! আমি লক্ষ করলুম, সে পাঁচ মিনিটও এক জায়গায় চুপ করে বসে কথা বলতে পারে না!

খাওয়াদাওয়ার পর সবে আমরা জমিয়ে গল্প করবার জন্য বসেছি, কামাল আবার দপাস করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চলি! সকলের প্রশ্নের উত্তরে সে জানাল সে যে সেই রাত্রেই বস্টন চলে যাবে। সবাই অবাক। স্নিগ্ধা দেবী কামালের রাত্রিবাসের জন্য বিছানার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন পর্যন্ত। কিন্তু কামাল বলল, শুধু-শুধু রাত্তিরটা নষ্ট করে কী লাভ! ভোরের মধ্যে বস্টন পৌঁছে গেলে কাল সকাল থেকেই আবার কাজ করা যাবে!

সত্যি-সত্যি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল কামাল। সারা রাতের যাত্রা। দু-একজন আশঙ্কা প্রকাশ করল, একলা গাড়ি চালাতে-চালাতে ঘুমিয়ে পড়বে না তো! স্নিগ্ধা দেবী বললেন, না, ওর এরকম অভ্যেস আছে। আমারও মনে হল, ঘুমোবে না, চোখ চেয়ে-চেয়েই ও সেই অলীক রঙিন স্বপ্নটা দেখতে-দেখতে রাত্রির অন্ধকার পার হয়ে যাবে।

।। ৩০ ।।

প্রথম দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে মা আর মেয়ে এসে ঢুকছে একটা সদ্য ভাড়া নেওয়া ফ্ল্যাটে। মেয়ের বয়েস সতেরো, রোগা আর লম্বা; মায়ের বয়েস চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে। সবে মোটা হতে শুরু

করেছে শরীর, অসভ্য ধরনের রঙিন মুখখানা দেখলেই তার পেশা মোটামুটি অনুমান করা যায়। আগেকার ফ্ল্যাটের ভাড়া ফাঁকি দিয়ে তারা এই নতুন জায়গায় এসেছে। জিনিসপত্র গোছাবার আগেই মা ক্লান্ত হয়ে হুইস্কি খেতে শুরু করে, হুইস্কি এবং মায়ের প্রতি মেয়ের একই রকম ঘৃণা। এদের কথাবার্তা শুনে মনে হয় এরা খুব ঘনিষ্ঠ ধরনের শত্রু, পরস্পরের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসার তিলমাত্র অস্তিত্ব নেই। বাড়িটি ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারে এক অতি গরিব পাড়ায়, কাছাকাছি রয়েছে কবরখানা, কসাইখানা আর কারখানার চিমনি অনবরত ধোঁয়া ওগরাচ্ছে। ঘরটিও অতি অস্বাস্থ্যকর ও অন্ধকার ও স্যাঁতসেঁতে। যার তুলনা দেওয়া হয়েছে, 'ব্ল্যাক হোল অফ ক্যালকাটা'র সঙ্গে।

একটু পরেই এক চোখে ঠুলি লাগানো জলদস্যুর মতন চেহারার একজন লম্বা লোক এসে হাজির হয়। সে আধা মাতাল ও মায়ের প্রাক্তন প্রেমিক। মা অবাক হয় তার এই প্রেমিককে দেখে। এত তাড়াতাড়ি সে কী করে তার নতুন ঠিকানা খুঁজে বার করল। আর লোকটি অবাক হল মেয়েকে দেখে, কারণ তার প্রেমিকার যে অত বড় মেয়ে আছে তা সে জানত না। মায়ের নাম হেলেন, মেয়ের নাম জো এবং এই লোকটির নাম পিটার।

পিটার বেশ একটা ফুর্তির মুডে আছে, হেলেনকে নিয়ে সে বেরুতে চায় কিংবা জোকে ঘরের বার করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিতে চায়। জো প্রথম দর্শনেই পিটারকে অপছন্দ করেছে এবং সে কিছুতেই ঘরের বাইরে যাবে না। তাদের ওই একখানাই ঘর। হেলেনেরও আজ ওসবের প্রতি উৎসাহ নেই, এমনকী পুরুষ ও যৌন খেলা সে একেবারেই ছেড়ে দেবে বলে ভাবছে। পিটার তখন তাকে একটি ম্যাজিক শব্দ শোনায়, সে হেলেনকে বিয়ে করতে চায়। মা-মেয়ে কেউই প্রথমে একথা বিশ্বাস করে না। জো তার মায়ের সমস্ত দোষের তালিকা দেয় পিটারকে। পিটার তা শুনে হাসে। হেলেনও বলে, তুমি আমায় বিয়ে করবে কী, জানো আমি প্রায় তোমার মায়ের বয়েসি। তাতে পিটার সগর্বে জানায় যে মা-মা ধরনের মহিলাদের কাছ থেকে সে সবচেয়ে বেশি যৌন আনন্দ পায়! পিটারের পকেটে এক গাদা খুচরো টাকা ও অনেক মেয়েমানুষের ছবি। পিটার অবশ্য জলদস্যু নয়, পেশায় সে গাড়ির সেলসম্যান।

পরের দৃশ্যে আমরা মা ও মেয়ের কথা শুনে জানতে পারি যে হেলেনের একবার বিয়ে হয়েছিল, তার স্বামী তাকে ডিভোর্স করেছে অনেক বছর আগেই। জো অবশ্য তার সেই স্বামীর সন্তান নয়। তাদের গ্রামের একটি আধপাগলা লোকের সঙ্গে মাত্র পাঁচ মিনিটের ভুলে জো-র জন্ম। তবে, হেলেনের জীবনে সেটাই প্রথমবার। সেই হিসেবে জো পবিত্রতার সন্তান। জো ভাবে, তা বলে কি সেও পাগল হয়ে যাবে? জো-র খাতায় হেলেন আবিষ্কার করে অনেকগুলো চারকোলে আঁকা ছবি, মেয়ের যে আঁকার এত ভালো হাত মা তা এই প্রথম জানল। মেয়েকে কোনও আর্ট স্কুলে ট্রেনি নেওয়ার কথা সে বলে, কিন্তু মেয়ে রাজি নয়। কারণ মা তো তার পড়াশুনোর ব্যাপারে কোনও দিন মনোযোগ দেয়নি। তাতে মা নির্লজ্জভাবে জানায় যে সে নিজের প্রতি মনোযোগ দিয়েই আর অন্য কিছুর জন্য সময় পায়নি।

জো স্কুল থেকে ফেরার পথে একটি কৃষ্ণাঙ্গ ছেলের সঙ্গে ভাব করে। ছেলেটি ভালো গান করে এবং নৌবিভাগে কাজ করে। ছেলেটি ওদের বাড়িতে ঢোকে না কিন্তু জো-কে কোনও নির্জন জায়গায় নিয়ে যেতে চায়। জো বলে, জানি, তুমি আমার কাছে কী চাও। আমি তা দিতে পারি, কারণ তোমাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। ছেলেটি বলল, তুমি যা ভাবছ, আমি ঠিক তা-ই চাই, সেই সঙ্গে তোমাকে বিয়ে করতেও চাই। এনগেজমেন্ট রিং-ও সে আগেই কিনে রেখেছে। আংটিটা জো-র আঙুলে একটু ঢলঢলে হয়। সে সেটা একটা সুতোয় বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে রাখে।

এর মধ্যে পিটার এসে আবার উপস্থিত হয়। হেলেনকে বিয়ে করার ব্যাপারে সে এখনও সিরিয়াস। হেলেনকে নিয়ে সে বাইরে ফুর্তি করতে যেতে চায়। হেলেন যতক্ষণ সাজপোশাকে ব্যস্ত তখন জো-র সঙ্গে পিটারের কথা কাটাকাটির খেলা চলে। হেলেন এই অবস্থায় মেয়েকে সহ্য করতে পারে না।

সে এখন হনিমুনে যাওয়ার আনন্দে মশগুল, মেয়েকে একলা এখানে রেখে যাওয়ার ব্যাপারে ক্ষণিক মাত্র চিন্তা করে, মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায় কি না একবার ভাবে। হনিমুনে এতবড় মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব শোনামাত্র বাতিল করে দেয় পিটার। হেলেন ও পিটার জো-কে ফেলে রেখেই চলে যায়। তারপর আসে জো-র কৃষ্ণাঙ্গ প্রেমিকটি। সে মনভাঙা জো-কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তার পাশে শুয়ে পড়ে।

পরের দৃশ্যে দেখা গেল জো গর্ভবতী, তার কৃষ্ণাঙ্গ নাবিক প্রেমিকটি তাকে পরিত্যাগ করে সুদূর সমুদ্র যাত্রায় চলে গেছে। জিওফ নামে একটি আর্ট স্কুলের ছাত্র জো-র সঙ্গে থাকে। জিওফ একটু মেয়েলি ধরনের, তার মেয়েদের সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ নেই, সে কেক বানাতে পারে, ঘর পরিষ্কার করতে জানে, সে জো-র সেবা করে। এরকমভাবে এক সঙ্গে থাকতে-থাকতে ওদের মধ্যে একধরনের ভালোবাসা জন্মে যায়। জিওফ গর্ভবতী অবস্থাতেই জো-কে বিয়ে করে তার সন্তানের একটা পরিচয় দিতে চায়, জো এই দয়া নিতে রাজি হয় না। এমনকী সেই কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেটির খোঁজখবর করতেও তার সম্মানে বাধে। সেই ছেলেটির প্রতি তার কোন রাগ নেই, সে যে সুন্দর গান গাইত সেই কথাই তার মনে পড়ে।

জো-র যখন খুব অ্যাডভান্সড অবস্থা, সেই সময় এসে হাজির হয় তার মা হেলেন। বলা বাহুল্য, ফুর্তি শেষের পর পিটার তাকে পরিত্যাগ করেছে। সে জন্য অবশ্য হেলেনের আপসোস নেই, সে আগের মতোই চপলমতি, সে বারবার বলে, ইট ওয়াজ গুড হোয়াইল ইট লাস্টেড। মেয়ের বাচ্চা হওয়ার সময় সে মা হিসেবে সত্যিকারের দায়িত্ব নিয়ে সাহায্য করবার আশ্বাস দেয়। তার আগে বাক্যবাণের জ্বালায় সে জিওফ-কে তাড়িয়ে দেয়, কারণ এরম অ-পুরুষ পুরুষের সান্নিধ্য তার সহ্য হয় না। হেলেন তার ভবিষ্যৎ নাতি বা নাতনির জন্য অনেক খেলনাটেলনা কিনে আনে, কিন্তু যখন শোনে তার মেয়ের প্রেমিক ছিল কৃষ্ণাঙ্গ এবং বাচ্চাটার রং-ও কালো হতে পারে, তখন সে বিতৃষ্ণায় আবার মেয়েকে ছেড়ে চলে যায়।

নিঃসঙ্গ গর্ভবতী কুমারী জো খালি ঘরের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে একটি ছেলে-ভুলোনো ছড়া বলতে থাকে আস্তে-আস্তে।

এই হল 'আ টেস্ট অফ হানি' নাটকের কাহিনি। শেলাগ ডেলানি নামে একটি উনিশ বছরের ব্রিটিশ চাকুরে-মেয়ে এই নাটকটি রচনা করেছিল। এক সময় স্ট্রাটফোর্ডের থিয়েটার রয়ালে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল। ইংল্যান্ডের অ্যাংরি ইয়ংম্যানদের পর শেলাগ ডেলানিকে বলা হয়েছে রাগি যুবতি। এখন নাটকটি চলছে ব্রডওয়ের সেঞ্চুরি থিয়েটারে। পাঁচটি মাত্র চরিত্রের একটি পরীক্ষামূলক নাটক, তাও প্রচুর দর্শক টানে। নাটকটির কাহিনি আমি বিস্তৃতভাবে লিখলুম একটি আধুনিক নাটকের পরিপূর্ণ পরিচয় দেওয়ার জন্য। আমাদের কাছে এর বিষয়বস্তু খুবই ডিকাডেন্ট মনে হবে। এখানে যেন জীবনের সমস্ত মূল্যবোধই মূল্যহীন। তবে একটা কথা মনে রাখা দরকার, আমাদের দেশে যেমন গরিবদুঃখীদের নিয়ে প্রগতিশীল নাট্যরচিত হয়, সেই রকম এই নাটকের পাত্রপাত্রীও পশ্চিমি সমাজের একেবারে নীচের তলার গরিবদুঃখী। প্রসঙ্গত এটাও উল্লেখযোগ্য যে এই নাটকে দৃশ্যত কোনওরকম অশ্লীলতা এমনকী সামান্য যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ দৃশ্যও নেই। দু-ঘণ্টার নাটকটি টানটান হয়ে জমে যায় শুধু এর তীক্ষ্ণ সংলাপের জন্য।

লংএকার থিয়েটারে চলছে মার্কমেডফ্-এর লেখা একটি অদ্ভুত নাটক 'চিলড্রেন অফ এ লেসার গড'। নির্বাক ছায়াছবির মতন এটাও যেন নির্বাক নাটক। এই নাটকটি গড়ে উঠেছে মূকবধিরদের জন্য এক শিক্ষাকেন্দ্রের এক ছাত্রী ও তার শিক্ষককে নিয়ে। শিক্ষকটি কথা বলতে পারে। কিন্তু সে তার ওই ছাত্রীর সঙ্গে কথা বলে হাতের আঙুলের ভাষায়। আমরা দর্শকরা কেউ ওই আঙুল-ভাষা বুঝি না। তবু আস্তে আস্তে জমে ওঠে নাট্য কৌতূহল। আমরা বোবাদের জগতকে অপূর্ণ, অসমাপ্ত, অক্ষম বলে মনে করি, কিন্তু ক্রমে-ক্রমে নাট্যকার দেখিয়ে দেন যে বোবাদের চোখে এই তথাকথিত

সুস্থ জগতেও কত অপূর্ণতা, কত ব্যর্থতা।

আশ্চর্য, এই রকম নাটকও দর্শক টানে। পশ্চিমি দেশগুলিতে নাটক দেখা একটা উচ্চস্তরের সামাজিক কাজ। যাঁরা নিজেদের শিক্ষিত ও রুচিবান বলে মনে করেন, তারা নিয়ম করে নাটক দেখতে যান। নাটক দেখার দিনে তাঁরা বেশ যত্ন নিয়ে সাজগোজ করেন, এতে নাকি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রতি বিশেষ সম্মান জানানো হয়। এই জন্যই অনেক সিনেমা হল খালি থাকে কিন্তু যেকোনও ভালো নাটকের টিকিট পাওয়াই মুশকিল। নাটকের টিকিটের দামও সাংঘাতিক, খুব কম করেও তিরিশ-পঁয়তিরিশ ডলার, অর্থাৎ আমাদের টাকার হিসেবে প্রায় তিনশো-সাড়ে তিনশো টাকা। ওদের টাকার হিসেবেও যদি ধরি, তা হলেও তিরিশ-পঁয়তিরিশ টাকা দিয়ে কজন আমাদের দেশে থিয়েটার দেখতে যাবে?

নাটকের টিকিট কিছু সস্তায় পাওয়ারও একটা ব্যবস্থা আছে। ব্রডওয়ে পাড়ার মাঝখানে একটা ছোট পার্কে একটা টিকিট কাউন্টার আছে। ও পাড়ার সব থিয়েটারেরই কিছু টিকিট বিক্রি হয় ওইখান থেকে, দাম অর্ধেক বা তিন চতুর্থাংশ। ভোরবেলা থেকে সেখানে লম্বা লাইন পড়ে। সংঘমিত্রা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে আমাদের খুব ভাব হয়ে গেছে নিউ ইয়র্কে। নকশাল আন্দোলনের সময় কলকাতার অনেক বাবা-মা চেষ্টাচরিত্র করে তাদের ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বিলেত-আমেরিকায়। সংঘমিত্রা সেই রকমই একজন' কিছুদিন লন্ডনে পড়াশুনো করে তারপর বেশ কিছুদিন নিউ ইয়র্কে আছে। নাটক ও চলচ্চিত্র বিষয়ে তার খুব আগ্রহ। এই সংঘমিত্রাই আমাদের ওই সস্তায় টিকিট কাটার জায়গাটির সন্ধান দেয় এবং আমাদের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে সে নাটক নির্বাচনেও সাহায্য করে।

টিকিটের দাম বিষয়ে একটি চমকপ্রদ সংবাদ এখানে উল্লেখ না করে পারছি না: চার্লস ডিকেন্সের নিকোলাস নিক্‌লবি উপন্যাসটির নাট্যরূপ দিয়ে একটি ব্রিটিশ দল অভিনয় করছে ব্রডওয়েতে। নাটকটি চলবে টানা সাড়ে আট ঘণ্টা এবং এর টিকিটের দাম একশো ডলার অর্থাৎ ন'শো কুড়ি টাকা। সাড়ে আট ঘণ্টা নাটক দেখার সুযোগ আর জীবনে ঘটবে না বলে বুক ঠুকে গিয়েছিলাম টিকিট কিনতে। কাউন্টারে গিয়ে শুনলুম আগামী দেড় মাস হাউস ফুল। এক মাস দশ দিন পরের একটা শো-র দুখানা টিকিট পাওয়া যেতে পারে বটে, তাও পার্শিয়াল ভিউ, অর্থাৎ কোনও থামের আড়ালে বসে দেখতে হবে। নমস্কার ঠুকে চলে এলুম সেখান থেকে।

সবাই জানে, আমেরিকানরা সদা ব্যস্ত জাতি। অথচ তারা সাড়ে আট ঘণ্টার নাটকও ধৈর্য ধরে দেখতে জানে!

এই 'নিকোলাস নিক্‌লবি'ই কিন্তু ব্রডওয়ের দীর্ঘতম নাটক নয়। সংবাদপত্রে এই সম্পর্কে আলোচনায় দেখলুম, কয়েক বছর আগে আর একটা নাটক হয়ে গেছে, যার নাম 'দা লাইফ অ্যান্ড ডেথ্ অফ জোসেফ স্ট্যালিন', সেটির দৈর্ঘ্য ছিল সাড়ে বারো ঘণ্টা। তার টিকিটের দাম কত ছিল কে জানে।

নিউ ইয়র্কের নাট্য আন্দোলন নানা ভাগে বিভক্ত। ব্রডওয়েতে দেখানো হয়, তথাকথিত কমার্শিয়াল নাটক। এ ছাড়া আছে অফ্-ব্রডওয়ে, অফ-অফ ব্রডওয়ে। যেখানে চলে নানা রকম পরীক্ষা। অফ্-ব্রডওয়ের একটি সাড়া জাগানো নাটকের নাম সত্যাগ্রহ। নাটকটি ইংরেজিতে হলেও এর গানগুলি সব সংস্কৃত ভাষায়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে অর্জুনের দ্বিধা ও গীতার জন্ম, দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধিজির সত্যাগ্রহ আন্দোলন, মার্টিন লুথার কিং-এর অহিংস প্রতিরোধ ইত্যাদি নিয়ে গড়ে উঠেছে নাটকটি। টিকিট সংগ্রহের ঝঞ্ঝাটে নাটকটি শেষ পর্যন্ত আমার দেখা হয়ে উঠল না। তবে যামিনীদার মুখে শুনেছি এর সঙ্গীতের প্রয়োগ নাকি অপূর্ব।

ব্রডওয়ের পেশাদারি দলের নাটকগুলি দর্শক টানে জমজমাট। অভিনয় দিয়ে এবং প্রোডাকশনের চাকচিক্যে। নাটকগুলির বিষয়বস্তুও বিচিত্র ধরনের। যেমন একটি নাটকের নাম 'টেকসাসের শ্রেষ্ঠ ছোট্ট বেশ্যালয়', আবার আর একটি নাটকের নাম 'ইভিটা'। এর মধ্যে প্রথমটি দেখার সুযোগ আমার হয়নি, দ্বিতীয়টি দেখেছি। তার বিষয়বস্তুই অভিনব। ইভাপেরন-এর নায়িকা, যিনি নিজেও পরে

কিছুদিনের জন্য রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। সামান্য নীচু অবস্থায় থেকে এক মহিলার উত্থানের কাহিনিই এর উপজীব্য, এর মধ্যে এসেছে দক্ষিণ আমেরিকার সেই দেশটির জন জাগরণ ও বিপ্লব-উত্থান। সেগুলি মাঝে-মাঝে দেখানো হয়েছে টুকরো-টুকরো চলচ্চিত্রে, অনেকটা ডকুমেন্টরির কায়দায়। নাটকটি দেখতে-দেখতে মনে হয়েছিল, এই যদি পেশাদারি নাটক হয়, তা হলে আমাদের দেশের শৌখিন নাটক অনেক পিছনে পড়ে আছে।

থিয়েটার হলগুলি তাদের প্রাচীনত্ব যথাযথ বজায় রাখবার খুব চেষ্টা করে। আধুনিক সিনেমা হলগুলিতে অনেক রকম কায়দা, কিন্তু থিয়েটার হল যেন এখনও পঞ্চাশ বা একশো বছর পুরোনো অবস্থায় রয়ে গেছে। এরা সহজে ঐতিহ্য বদলাতে চায় না। তবে এই ধরনের প্রাচীন চেহারার মঞ্চ ও অডিটোরিয়ামেও ইনফ্রারেড লিসনিং সিস্‌টেম চালু করা হয়েছে, যার জন্য মঞ্চে মাইক্রোফোন ঝুলতে দেখা যায় না, আর যেকোনও জায়গায় বসলেই কুশীলবদের কণ্ঠস্বর একই রকম শুনতে পাওয়া যায়।

ব্রডওয়ের আসল কৃতিত্ব তার মিউজিক্যালস্‌গুলিতে। এমন সুচারু ও দক্ষ মিউজিক্যালস আর কোনও দেশে দেখা যায় না। আমি আর যেসব নাটক দেখেছি, তার মধ্যে এরকম একটি মিউজিক্যালের কথা বলি। নাটকটির নাম 'কোরাস লাইন' অসম্ভব জনপ্রিয় এবং অনেকগুলি পুরস্কার পেয়েছে। এর বিষয়বস্তু খুব সামান্য। একটি নাটকের কোরাস নাচ-গানের দৃশ্যের জন্য কয়েকজন নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রী নেওয়া হবে। এর জন্য দরখাস্ত পড়েছে অসংখ্য, তার মধ্যে থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ জন ছেলে মেয়েকে ডেকে ইন্টারভিউ নেওয়া হচ্ছে। এইটুকুই গল্প। কত সামান্য এই চাকরি, তার জন্যই দেশের দূরদূরান্ত থেকে এসেছে যুবক-যুবতিরা, কেউ-কেউ অসাধারণ রূপসি ও রূপবান, কেউ এসেছে বাড়ি থেকে পালিয়ে, কেউ এসেছে খুবই গরিব ঘর থেকে, কেউ-কেউ এসেছে ভবিষ্যতে নায়ক বা নায়িকা হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে, কেউ এসেছে অসুখী সংসার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। এসেছে একটি জাপানি মেয়ে, দু-তিনটি কৃষ্ণাঙ্গ ছেলে-মেয়ে। পঞ্চাশ জনের মধ্যে নেওয়া হবে মাত্র চার-পাঁচ জনকে, কে-কে হবে সেই সৌভাগ্যবান ও সৌভাগ্যবতী তা নিয়ে উৎকণ্ঠা থেকে যায় আগাগোড়া, পরীক্ষকদের কাছে কেউ-কেউ আপ্রাণভাবে নেচে কুদে গেয়ে তাদের প্রতিভা প্রমাণের চেষ্টা করে, কেউ হঠাৎ নার্ভাস হয়ে পড়ে। এরই মধ্যে ফুটে ওঠে তাদের জীবনের রেখাচিত্র। সমস্ত সংলাপই গানে। নাটকটি দেখতে-দেখতে ধন্য-ধন্য করতে হয় এর পরিচালককে, যিনি এতগুলি নামহীন চরিত্রের প্রত্যেকেই জীবন্ত করে তুলতে পেরেছেন।

এই প্রসঙ্গ শেষ করার আগে আর একটি খবর দেওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। ইংরাজিতে যাঁদের বলে 'ফিল্‌ম বাফ্' আর বাংলায় বলে 'সিনেমা আঁতেল' তাঁরা নিশ্চয়ই ক্লদেৎ কোলবার্টের নাম শুনেছেন। নির্বাক চলচ্চিত্র যুগে তিনি ছিলেন খুব নাম করা নায়িকা। সবাক যুগেও কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করে তিনি হারিয়ে যান। ক্লদেৎ কোলবার্ট বেঁচে আছেন কি না তাই জানে না এখন অনেকে। সেই ক্লদেৎ কোলবার্ট এক কাণ্ড ঘটিয়েছেন। ইনি মঞ্চেও প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী ছিলেন, ব্রডওয়েতে প্রথম মঞ্চ নাটকে নায়িকা হন ১৯২৭ সালে। তাহলেই ভাবুন, এর এখন কত বয়স হতে পারে। সেই ক্লদেৎ কোলবার্ট এতদিন বাদে 'আ ট্যালেন্ট ফর মার্ডার' নাটকে নেমে অভিয়ের জোরে হইহই ফেলে দিয়েছেন। প্রতিদিন সে নাটক হাউস ফুল। এই রকমই আর একজন লরিন বাক্‌কল ছিলেন আগেকার দিনের নায়িকা, ক্যাসাব্লাঙ্কা ছবিতে অপূর্ব অভিনয় করেছিলেন, ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন হামফ্রি বোগার্টের স্ত্রী। সে হামফ্রি বোগার্ট কবে মারা গেছেন, সেই সব সিনেমার যুগও কবে শেষ হয়ে গেছে, তবু নতুনভাবে মঞ্চে নেমে লরিন বাক্‌বল এখন জনপ্রিয় নায়িকা। অনুমান করুন তো, আমাদের চন্দ্রাবতী দেবী বা কানন দেবী কোন নাটকের নায়িকা হয়েছেন, আর সেই নাটক দেখার জন্য কলকাতার লোক রোজ ছুটে যাচ্ছে।

॥ ৩১ ॥

একজনের নাম শক্তি, অন্য জনের নাম ধ্রুব। এঁরা দুজনে বেশ বন্ধু, কিন্তু সম্প্রতি একটা ব্যাপারে দুজনে রয়েছেন দুই বিপরীত মেরুতে। শক্তি অনেকদিন 'ফরেন'-এ কাটাবার পর এক সময় ভাবলেন, যথেষ্ট হয়েছে। কলকাতার টানে, বাড়ির লোকজনের টানে, এবং হয়তো দেশের টানে তিনি একদিন আমেরিকা ছেড়ে ফিরে গেলেন কলকাতায়। চাকরি পেতেও অসুবিধে হয়নি। কিন্তু একবছর থাকবার পর ফিরে এসেছেন। নিউ ইয়র্কের বাঙালি মহলে এখন শক্তিই প্রধান আলোচ্য বিষয়। একজন আরেকজনের সঙ্গে দেখা হলেই বলে ওঠে, জানো, শক্তি ফিরে এসেছে? এর অবধারিত উত্তরটি শোনা যায়, জানতুম আসতেই হবে!

নিউ ইয়র্ক শহরের উপকণ্ঠেই নিউ জার্সি। সেখানকার বাঙালিদের একটি ক্লাব আছে। সেই ক্লাবের কয়েকজন সদস্য এক সন্ধেবেলা আমাকে ডেকেছিলেন আড্ডা মারার জন্য। নিউ জার্সিতে অনেক বাঙালি। একজনের বাড়িতে কাঁচা লঙ্কা ফুরিয়ে গেলে প্রতিবেশী বাঙালির বাড়ি থেকে চেয়ে আনা যায়। সেই আড্ডাতেই দেখা হল শক্তি ও ধ্রুবর সঙ্গে। শক্তিকে নিয়েই আলোচনা চলল অনেকক্ষণ। আমি একবার জিগ্যেস করলুম, থাকতে পারলেন না? কী অসুবিধে হল? শক্তি একটু লাজুক হেসে বললেন, নাঃ! কিছুতেই পারা গেল না। ট্রাম-বাসের ভিড়, মশা, লোডশেডিং এসবও আমি গ্রাহ্য করিনি, কিন্তু অফিসের পরিবেশটাই এমন যে টেকা যায় না।

আমেরিকায় চাকরি করার যোগ্যতা হিসেবে সরকারের কাছ থেকে গ্রিন কার্ড পাওয়া যায়। সেই গ্রিন কার্ড যারা পেয়েছে, তারা একবছর দু-বছর অনুপস্থিত থাকলেও ফিরে এসে আবার চাকরি পেতে পারে। তাই শক্তির কোনও অসুবিধে হবে না এখানে।

পাশেই বসে আছেন ধ্রুব। তাঁর সুঠাম, বলিষ্ঠ চেহারা। চিবুকে দৃঢ়তার ছাপ আছে। ধ্রুব এখানে ভালো চাকরি করেন, বেশ সচ্ছল অবস্থা, তবু তিনি হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেসব ছেড়েছুড়ে তিনি দেশে ফিরে যাবেন। তাঁর পরিচিত বন্ধুবান্ধবরা শুধু যে অবাক হয়েছে তাই-ই নয়, সবাই শক্তির দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছে, এতেও তোমার শিক্ষা হল না? তুমিও সেই একই ভুল করবে? কেউ বা ঠাট্টা করে বলে, যাক না, গোঁয়ারের মতন যেতে চাইছে যাক। জানি তো বছর ঘুরতে-না-ঘুরতেই আবার দৌড়ে ফিরে আসবে।

ধ্রুব কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অবহেলার সঙ্গে বললেন, আমায় ওসব কথা বলে কোনও লাভ নেই। আমি অনেক ভেবে চিন্তেই যাচ্ছি। গ্রিন কার্ড ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে যাব। আমি বুড়ো বয়েসে একা-একা সেন্ট্রাল পার্কে ঘুরে বেড়াব না।

আমার দিকে ফিরে ধ্রুব জিগ্যেস করলেন, আপনি বলুন তো, আমি দেশে গিয়ে থাকতে পারব না?

আমি আমতা-আমতা করলুম। এইসব সিদ্ধান্ত এমনই ব্যক্তিগত যে অন্যের পরামর্শ কোনও কাজে লাগে না।

আড্ডা হচ্ছিল যাঁর বাড়িতে, তাঁর নাম ভবানী মুখার্জি, বেশ সুপুরুষ ও সুরসিক যুবা। এই ভবানীর সঙ্গে আমার আগে পরিচয় ছিল না। কিন্তু কথায়-কথায় বেরিয়ে পড়ল যে ওঁর দাদা নারায়ণ মুখার্জি আমার অনেকদিনের চেনা। নারায়ণকে আমরা কলকাতায় ফরাসি ভাষাবিদ বলে জানি। ওঁদের ছোট ভাই, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গায়ক পিনাকী মুখার্জির কথাও অনেক শুনেছি। একবার এইরকম চেনাশুনো বেরিয়ে পড়লেই কথাবার্তা অনেক সহজ হয়ে যায়।

ভবানীর স্ত্রীর দাম আলোলিকা, এঁর রূপ ও ব্যবহারের মধ্যে বেশ একটা সঙ্গতি আছে। খুবই সুশ্রী ও কোমল। ইনি একজন লেখিকা এবং এখানকার বাচ্চাদের নিয়ে নাচ-গান ও নাটক করান। এঁদের বাড়ির পরিবেশটি চমৎকার। এসেছেন আরও কয়েকজন।

রাত্রি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আড্ডা বেশ জমতে লাগল। তবে প্রায়ই ঘুরে-ঘুরে প্রসঙ্গ উঠতে লাগল শক্তি আর ধ্রুবের প্রত্যাবর্তন ও প্রস্থানের ব্যাপারটা। শক্তির মুখে খানিকটা লজ্জিত অস্বস্তির ভাব আর ধ্রুবর মুখে জেদ।

উত্তমকুমারের মার্কিন দেশ সফর নিয়ে অনেক মাজার মজার গল্প বলছিলেন ভবানী। এঁদের সকলের কথা থেকেই একটা জিনিস ফুটে উঠেছিল যে উত্তমকুমারের ভদ্র ব্যবহারে সবাই মুগ্ধ হয়েছেন। কোনও চিত্রতারকার কাছ থেকে এরকম ব্যবহার যেন আশা করা যায় না।

কথায়-কথায় ভবানী আমায় জিগ্যেস করলেন যে, উত্তমকুমার তো এখান থেকে নায়েগ্রা ফল্‌স দেখতে গিয়েছিলেন, আপনি যাবেন না?

আমি বললুম, নায়েগ্রা বোধহয় এমনিতে এমন কিছু দ্রষ্টব্য স্থান নয়। তবে উত্তমকুমার যখন দেখেছেন, তখন নিশ্চয়ই আমারও দেখা উচিত।

ভবানী সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, তা হলে আমার বোন ওখানে থাকে, আপনি ওখানেই উঠবেন।

আলোলিকা বললেন, আমি এক্ষুনি টুনুকে ফোন করে দিচ্ছি।

আমি বললুম, না, না, এক্ষুনি দরকার নেই। কবে যাব, তার ঠিক নেই।

—আপনি কবে কোথায় যাবেন, এখনও কিছু প্ল্যান করেননি?

আমি বললুম, ওই একটা জিনিসই করা হয়ে ওঠেনি।

এবারে ধ্রুব জিগ্যেস করলেন, আপনি কাল কী করছেন?

আমি বললাম, জানি না তো।

ধ্রুব বললেন, আমার কোম্পানি আমাকে নতুন গাড়ি দিয়েছে। আমার তেলের খরচ লাগে না। কাল আমার কোনও কাজ নেই। আপনি কাল যদি কোথাও বেড়াতে যেতে চান, নিয়ে যেতে পারি।

আমি বললুম, এ যে আকাশ থেকে একটা হিরের টুকরো খসে পড়ার মতন প্রস্তাব। কিন্তু কোথায়, যাওয়া হবে?

—আপনি আটলান্টিক সিটিতে গেছেন কখনও?

—আমি আটলান্টিক সিটির নামই শুনিনি। সেখানে কী আছে?

—চলুন, ভালো লাগবে?

তক্ষুনি প্রোগ্রাম হয়ে গেল। অনেকেই বেড়াতে যাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী। কিন্তু সপ্তাহের মাঝখানে কাজের দিন বলে অনেকেরই অসুবিধে। ভবানী যেতে পারবেন না, তাঁর অফিসের কাজ আছে। কিন্তু আলোলিকার খুব আগ্রহ।

কে যেন একজন বললেন, ধ্রুবর সঙ্গে যাচ্ছেন, খুব সাবধান। ও কিন্তু গাড়ির ড্যাসবোর্ডে রিভলবার রাখে।

ধ্রুব বললেন, এখনও রাখিনি, তবে রাখবার ইচ্ছে আছে। আমায় এদেশে কেউ অপমান করলে আমি তাকে ছাড়ব না।

সে রাত্রে বাড়িতে ফিরে মনটা খুব ভালো হয়ে গেল। নায়েগ্রা যাওয়ার কোনও পরিকল্পনা ছিল না। অথচ একটা ব্যবস্থা হয়ে গেল কত সহজ। সদ্য পরিচিত একজন গাড়িতে আটলান্টিক সিটি নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিল। একেই আমাদের ভাষায় বলে পূর্বজন্মের সুকৃতির ফল। সাহেবরা পূর্ব জন্ম মানে না, তবু তারাও এরকম কোনও ব্যাপার বিশ্বাস করে। সাউন্ড অফ মিউজিকে জুলি অ্যান্ড্রুজ একটা গান গেয়েছিল, আমার অল্প বয়েসে নিশ্চয়ই আমি কোনও ভালো কাজ করেছিলুম, এখন তার ফল পেলুম।

পরের দিন আমাদের গাড়িতে যাত্রী সংখ্যা একটু বেড়ে গেল। অম্বুজ মুখার্জির বাড়িতে প্রীতি নামে যে মেয়েটির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সে যেতে চায়। এবং তার সঙ্গে ছোট্টিমা নামে তার এক বান্ধবী। এই ছোট্টিমা বাঙালি মেয়ে, মুখচোরা স্বভাবের। এবং আলোলিকা তো আছেনই।

মহিলারা বসলেন পেছনে আমি আর ধ্রুব সামনে। ধ্রুবর পুরো নাম ধ্রুব কুণ্ডু। তার ব্যবহারে বেশ একটা বনেদিয়ানা আছে, কথার মধ্যে আত্মপ্রত্যয়ের সুর। যাওয়ার পথে একটা গ্যাস স্টেশনে ঢুকে সে বলল ট্যাঙ্ক ভরতি করে দিতে। কী একটা কারণে অ্যাটেনড্যান্ট একটু দেরি করছিল, ধ্রুব গাড়ি থেকে নেমে তাঁকে প্রচণ্ড এক ধমক লাগালেন। বাঙালি হয়েও তাঁর এত সাহস যে সাহেবদের দেশে তিনি সাহেব জাতিকে এমন ধমক দিতে পারেন। ধ্রুব এদেশে আছেন পুরো ডাঁটের সঙ্গে, তিনি এদেশ ছেড়ে যাচ্ছে স্বেচ্ছায়।

এক সময় ধ্রুব আমাকে জিগ্যেস করলেন, আচ্ছা, আমার তো এদেশে কোনও কিছুরই অভাব নেই, তবু আমি দেশে ফিরে যেতে চাই কেন বলুন তো?

আমি বললুম, অনেকের কাছে বন্ধুবান্ধব, কলকাতার নিজস্ব আড্ডার টানই বেশি মনে হয় বোধহয়—

—ঠিক তা-ও নয়, আমার অনেক বন্ধুবান্ধব এদেশে। ইন ফ্যাকট আমাদের ব্যাচের অনেক ছেলেই এদেশে চলে এসেছে। এদেশে আড্ডা দেওয়ারও কোনও অসুবিধে নেই।

—তা হলে কেন যাচ্ছেন। আপনিই বলুন।

—যাচ্ছি আমার যেতে ইচ্ছে করছে বলে। আমি জানি, আর বেশিদিন থাকলে, ফেরা যাবে না। এখানে শেকড় গজিয়ে যাবে।

নিউ ইয়র্ক শহর থেকে আটলান্টিক সিটি শ' দেড়েক মাইল দূর। প্রশস্ত, নতুন রাস্তা। আড়াই ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেলুম। শহরে ঢুকবার মুখেই বাতাসে পেলুম সামুদ্রিক গন্ধ। শহরটি একেবারে সমুদ্রের ওপরেই! আগে এখানে ছোটখাটো শহর ছিল, এখন সেটিকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। এখানে তৈরি হচ্ছে বিরাট একটি জুয়া খেলা ও প্রমোদ কেন্দ্র।

আমেরিকার পশ্চিম দিকে লাস্ ভেগাস জুয়া ও ফুর্তির জন্য জগৎবিখ্যাত। পূর্বদিকে সে রকম কিছু ছিল না। সেই অভাব পূরণ করার জন্যই গড়ে তোলা হচ্ছে আটলান্টিক সিটিকে। এখন সব বাড়িগুলো সম্পূর্ণ হয়নি। তবে যা হয়েছে তা-ই এলাহি জগঝম্প ব্যাপার। এক-একটা হলের মধ্যে অন্তত দু-তিন হাজার লোক একসঙ্গে বসে জুয়া খেলতে পারে। শুধু একতলায় নয়। অনবরত এসকেলেটর চলছে, তা দিয়ে ওপরে উঠে গেলে দোতলা তিনতলাতেও প্রায় একই ব্যাপার। এরকম পরপর অনেকগুলো বাড়ি। জুয়া খেলার পদ্ধতিও আছে নানারকম, মেশিন-জুয়া, ব্ল্যাক-জ্যাক, রুলেৎ, ডাইস, তাস! শনি-রবিবারেই এখানে ভিড় বেশি হয়। আমরা এসেছি সপ্তাহের মাঝখানে, তাও লোক কম নয়। তবে অধিকাংশই বুড়ো-বুড়ি, এবং বুড়ির সংখ্যাই বেশি। জুয়াড়ি বুড়ি মানেই পাগলিনীর মতন চেহারা। একসঙ্গে হাজার-হাজার উন্মাদিনী দেখাও একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।

আমরা তো খেলতে আসিনি, আমরা দেখতে এসেছি। দেখার জিনিসও অনেক আছে। রয়েছে নীল জল বিধৌত চমৎকার বেলাভূমি, অনেক নাচ-গানের আসর। উপহার দ্রব্যের অনেক দোকান।

নিছক লঘু কৌতুকেই আমি বললুম, একবার একটু চেষ্টা করে দেখিই না।

নতুন খেলুড়েদের পক্ষে মেশিনই প্রশস্ত। অনেক রকম মেশিন আছে, কোনওটায় পাঁচ পয়সা ফেলতে হয়, কোনওটায় দশ পয়সা, কোনওটাতে সিকি, কোনওটাতে টাকা। আমি একটা খালি মতন মেশিন দেখে তাতে একটা কোয়ার্টার অর্থাৎ সিকি ফেললুম। তারপর একটা অলৌকিক কাণ্ড হল। মেশিনটায় ঝকঝকাং শব্দ হতে-হতে অনবরত পয়সা পড়তে লাগল নীচে। পড়ছে-তো-পড়ছেই। মেশিনটা খারাপ হয়ে গেল নাকি। পয়সার একটা স্তূপ জমে যাওয়ার পর মেশিনটা থামল।

ধ্রুব বললেন, আপনি একশোটা পেয়েছেন।

একটা সিকির বদলে একশো? এ যে সাংঘাতিক ব্যাপার। চার আনা দিয়ে পঁচিশ টাকা। সেই স্তূপ থেকে একটা সিকি তুলে নিয়ে আমি ফেললুম পাশের মেশিনটায়।

আবার সেই একই ব্যাপার। ঝকাং-ঝকাং শব্দ ও পয়সা বর্ষণ। আবার একশো সিকি।

আমার বুক ধড়াস-ধড়াস করছে।

আলোলিকা বললেন, বিগিনার্স লাক। আপনি আর খেলবেন না।

কথাটা আমার মোটেই পছন্দ হল না। মেশিনের কি চোখ আছে না মন আছে যে বুঝতে পারবে আমি নতুন খেলতে এসেছি? আজ আমার ভাগ্য ফেরাবার দিন।

কিন্তু এত খুচরো পয়সা নেবো কী করে? কোর্টের পকেটেও তো রাখা যাবে না।

মাঝে-মাঝে এক-এক জায়গায় শক্ত কাগজের গেলাস রাখা আছে। সেখান থেকে একটা গেলাস এনে ধ্রুব আমাকে বললেন, পয়সাগুলো এতে ভরে নিন। কাছেই কাউন্টার আছে, আপনি খুচরো বদলে টাকা করে আনতে পারেন।

কিন্তু ততক্ষণে আর একটা মেশিনের দিকে আমার চোখ পড়ে গেছে। তাতে লেখা পাঁচটা সিকি একসঙ্গে দিলে পাঁচ হাজার পাওয়া যাবে।

গেলাসটা নিয়ে গিয়ে সেই মেশিনে পাঁচটা সিকি ফেলে উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলুম। মেশিনটা নিঃশব্দে রইল। বেমালুম হজম করে ফেলল। আবার ফেললুম পাঁচটা, আবার সেই একই ব্যাপার। তা হলে আমার পাঁচ হাজারের জন্য আর লোভ করা উচিত নয়।

তার পাশের মেশিনটাতেই অন্য প্রলোভন। এখানে এক ডলার ফেললে পাঁচ হাজার ডলার পর্যন্ত আসবে। এতো সুবর্ণসুযোগ। একবার পাঁচ হাজার ডলার পেলেই আমার অনেক সমস্যা মিটে যায়। আরও কত জায়গায় নিশ্চিন্তে বেড়াতে পারব।

সিকিগুলো সব দলে টাকা করে নিয়ে এলুম।

এই ডলার মেশিনটাও টপটপ টাকা খেয়ে ফেলে। কোনও শব্দ করে না। আমি মনে মনে হিসেব করলুম, যদি পঞ্চাশ ডলার ফেলেও পাঁচ হাজার ডলার পাই, তাতেও তো আমার দারুণ লাভ। পঞ্চাশ বারের মধ্যে আমার ভাগ্য ফিরবে না? তার মধ্যে মেশিনের একবার না একবার দয়া হবে নিশ্চয়ই।

পঞ্চাশ ডলার ফেলতে আমার পনেরো মিনিটও লাগল না। এ মেশিন মহা পেটুক। কিছু বার করে না। আমার সঙ্গের মহিলারা আমার অনবরত বারণ করে চলেছেন। আমি কর্ণপাত করছি না। পাঁচ হাজার ডলারের দাম যে আমার মতন বেকারের কাছে কতখানি তা ওরা কী বুঝবে।

এই সময় এক বৃদ্ধ আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, ওহে ছোকরা, এক মেশিনে বেশিক্ষণ খেললে লাক নষ্ট হয়ে যায়। মেশিন পালটে-পালটে খেলতে হয়।

সেই শুনে আমি যেই সেখান থেকে সরে গেলুম, অমনি সেখানে সেই বৃদ্ধটি ডলার ফেলতে লাগল। তিনবার ফেলার পরই মেশিন শুরু করল ঝকাং-ঝকাং আওয়াজ ও ডলার বৃষ্টি। আমি হাঁ। আর তিনবার ফেললেন ওই টাকা তো আমারই ভাগ্যে ছিল।

পাঁচ হাজার নয় অবশ্য, সেই বৃদ্ধ পেল পাঁচশো ডলার। কাঁটাটা কোথায় যায় তার ওপর নির্ভর করে কত টাকা পড়বে। পাঁচশো টাকা কুড়িয়ে নিতে-নিতে বৃদ্ধটি আমার দিকে চেয়ে একখানা দুষ্টুমির হাসি হাসল।

আমার তখন মাথায় রক্ত চড়ে গেছে। আমি খেলতে লাগলুম একটা ছেড়ে আর একটা মেশিনে। তারপর রুলেৎ খেলায়। তারপর তাসের বাজিতে। আমার পকেটে নিজের যা ছিল তাও নিঃশেষ। আমি মেয়েদের কাছে ধার দেওয়ার জন্য ঝুলোঝুলি করতে লাগলুম।

ওরা না, না করতে লাগল সমস্বরে। প্রীতি বলল, কত সুন্দর-সুন্দর মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আপনি তাদের পর্যন্ত দেখছেন না। এত খেলার নেশা?

আমি রক্তচক্ষে বললুম, টাকা দেবে কিনা বলো।

ধ্রুব কিছুই না বলে মুচকি-মুচকি হাসছেন আর মাঝে-মাঝে নিজেও খেলে যাচ্ছেন এখানে সেখানে। ধ্রুবর ঠিক করাই আছে ঠিক পঁচিশ ডলার খেলবেন, তাতে হার জিৎ যাই হোক।

শেষ পর্যন্ত মেয়েরা আমাকে প্রায় জোর করেই টেনে নিয়ে এলেন বাইরে।

প্রীতি আমাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, কী হয়েছিল আপনার?

শূন্য পকেটে হাত ঢুকিয়ে আমি দীর্ঘকাল ফেলে বললুম, আমি সত্যিই পাগল হয়ে গিয়েছিলুম, তাই না।

।। ৩২ ।।

শীত বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে, এর মধ্যে দুদিন তুষারপাত হয়ে গেল। পাতলা কোটে আর চলছে না, এবার আমার একটা ওভারকোট দরকার।

বঙ্গসন্তানের পক্ষে ওভারকোট একটা অত্যুক্তি বিশেষ। কিংবা অবাস্তব জিনিসও বলা যায়। দু-মাস, ছ'মাসের জন্য কলকাতা থেকে যারা পশ্চিম গোলার্ধে বেড়াতে যায়, তারা সাধারণত চেনাশুনো, বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার নিয়ে আসে। আমার সে সুযোগ ঘটেনি। খুব একটা চেষ্টাও করিনি, কারণ আমি এদেশে এসেছি ঘোর গ্রীষ্মে কলকাতা থেকে ওভারকোট নিয়ে এলে সারা গ্রীষ্ম ও শরৎকাল আমাকে অকারণে সেই বোঝা বইতে হত।

সুতরাং আমাকে একটা ওভারকোট কিনতে হবে।

একটা ভদ্রগোছের গরম কাপড়ের ওভারকোটের দাম অন্তত আড়াইশো ডলার। এ ছাড়া সিনথেটিক জিনিসের হাওয়া বন্ধ-করা, শীত জব্দ-করা একরকমের জ্যাকেট পাওয়া যায় কিছু সস্তায়। সেগুলোতেও কাজ চলে বটে, কিন্তু কাউ বয়, মোটর রেসিং-এর চ্যাম্পিয়ন কিংবা ব্যাঙ্ক ডাকাতদের মতন যাদের চেহারা তাদের গায়েই ওই জিনিস মানায়। আমি ওই রকম জ্যাকেট পরলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেই হাসব।

অতএব আমি একটা ওভারকোট কিনে ফেললুম। সেটা দেখতে বেশ জমকালো ও প্রথাসম্মত। প্রথম-প্রথম অনেকেই দেখে বলত, এই ওভারকোটটা নতুন কিনলে বুঝি। বাঃ, বেশ সুন্দর দেখতে তো। কাপড়টাও বেশ ভালো। যথেষ্ট গরম হয়, তাই না?

আমি যদি বলতুম, নিউ ইয়র্ক তথা আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ দোকান (কেউ-কেউ বলে সারা পৃথিবীও) মেসি থেকে তিনশো ছিয়াত্তর ডলার দিয়ে এটা কিনেছি, তা হলে বোধহয় কেউ অবিশ্বাস করত না এখানে। কিন্তু কলকাতায় আমার বন্ধুবান্ধবরা ঠিক ধরে ফেলত। তারা ভুরু তুলে বলত, এঃ। তুই দু-পয়সার খদ্দের, তুই কিনেছিস পৌনে চারশো ডলার দিয়ে ওভারকোট। বললেই হল।

আসলে, আমি ওই চমৎকার ওভারকোটটা কিনেছি মাত্র দশ ডলার দিয়ে। কী করে অত সস্তার পেলুম, সে রহস্য আমি একটু পরেই খুলে বলছি।

এ দেশে দোকানের নাম নিয়ে চাল মারার খুব রেওয়াজ আছে। কারুর বাড়িতে নতুন কোনও জিনিস দেখলেই সেটা কোন দোকান থেকে কেনা সেটাও শুনিয়ে দেবে। অর্থাৎ কোনও বিখ্যাত দোকান। জিনিসের দামও দোকান অনুযায়ী বদলায়। প্রায় একই জিনিস কোনও সাধারণ দোকানে যা দাম, বিখ্যাত দোকানে দাম তার দ্বিগুণ। মেয়েরা এইসব বিখ্যাত দোকানগুলোর দাম খুব মুখস্থ রাখে। আবার বেশ সস্তারও দোকান আছে যেমন কে-মার্ট। এই কে-মার্ট দোকান এদেশের প্রায় প্রত্যেক শহরেই একটা করে আছে। এইসব দোকানে জুতোর ফিতে থেকে টিভি রেফ্রিজারেটার সবই পাওয়া যায়। দাম এমনিতেই সস্তা তারপর প্রায়ই লেগে থাকে 'সেল'। 'সেল'-এর সময় জিনিসের দাম অর্ধেক কমে যায়। সেইজন্যই হিসেবি গৃহিণীরা প্রায়ই সন্ধের দিকে একবার কে-মার্ট ঘুরে যায়। কোন দিন কোন জিনিসের 'সেল' দিচ্ছে দেখবার জন্য। ক্যালিফোর্নিয়ার মোহিতেশ ব্যানার্জি বলেছিলেন, 'কে-মার্ট হল বাঙালি মেয়েদের নাইট ক্লাব।'

আমি কিন্তু আমার ওভারকোটটা কে-মার্ট থেকেও কিনিনি। কারণ কে-মার্টেও সস্তার একটা সীমা

আছে, সেখানে তিনশো ডলারের জিনিস দেড়শো ডলারে দিতে পারে বড় জোর, দশ ডলারে তো দেবে না।

আরও এক রকমের দোকান আছে, যেগুলোর নাম বাজেট স্টোর, নেক্স্ট টু নিউ, সেকেন্ডস, র‍্যাগ-স্টক এই ধরনের। এই সব দোকানে ছাত্র-ছাত্রীরাই বেশি যায়, আর মধ্যবিত্তরা সেখানে যায় লুকিয়ে, ঘোর দুপুরবেলা, যখন অন্য কেউ দেখবে না। আর ভারতীয়রা তো অতি মাত্রায় হিপোক্রিট, তারা মরলেও স্বীকার করবে না যে কেউ কোনওদিন ওই সব দোকান থেকে জিনিস কিনেছে। সেই হিসেবে আমিই বোধহয় প্রথম ভারতীয় যে ওই রকম দোকানের ক্রেতা হল। সোজা বাংলায় ওগুলো হল সেকেন্ড হ্যান্ড জিনিসের দোকান।

সেরকম একটি বাজেট স্টোরে ঢুকে আমার তো চোখ ছানাবড়া হওয়ার উপক্রম। কতরকমের জিনিস, আর দাম কি অবিশ্বাস্য সস্তা। একটা সিল্কের সার্টের দাম দু-ডলার, একটা লিভাইজ জিনস-এর দাম তিন ডলার, পাঁচ ডলারে একটা জ্যাকেট। দশ ডলারের একটা বইয়ের দাম এক সিকি, একজোড়া বরফের জুতোর দাম দেড় টাকা। ইচ্ছে হয় সব কিছু কিনে নিই।

সব জিনিসই যে ব্যবহৃত তা নয়। কিছু-কিছু জিনিস নতুনও আছে। যেসব পোশাকের ফ্যাশান বদলে গেছে, অনেক বড় দোকান সেই সব পোশাক লট ধরে জলের দরে বিক্রি করে দেয়। যেমন ধরা যাক, হাত কাটা, সামনে-খোলা সোয়েটার, এর আর ফ্যাশান নেই ইদানীং, বড়-বড় রাস্তার নাম করা সব দোকানে মাথা খুঁড়লেও সেরকম সোয়েটার খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু বাজেট স্টোরে সেই রকম সোয়েটার সারি-সারি ঝুলছে।

অনেক পরিবার তাদের বাড়ির অব্যবহৃত জিনিসপত্র স্যালভেশান আর্মিকে দান করে দেয়। যেমন, কোনও মহিলার স্বামী তাকে ছেড়ে শহরের অন্য প্রান্তে অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে বসবাস করছে কিংবা কোনও ভদ্রলোকের স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে গিয়ে সিনেমার অভিনেত্রী হয়েছে, এই সব প্রাক্তন স্বামী বা স্ত্রীর জামাকাপড় এরা জমিয়ে রাখে না বেশি দিন, বিক্রিও করে না, দান করে দেয় কোনও সেবা প্রতিষ্ঠানকে। এরা যখন গৃহত্যাগ করে, তখন সব জিনিসপত্র নিয়ে যায় না, শুধু গয়নাগাটি আর দু-একটা জরুরি পোশাক একটা ছোট সুটকেসে ভরে বেরিয়ে যায়। সেবা প্রতিষ্ঠানগুলি সেইসব বিনা পয়সায় পাওয়া জিনিসগুলো এইসব দোকান মারফৎ বিক্রি করে। স্বাস্থ্য ব্যাপারে খুঁতখুঁতে বলে আগে এরা ভালোভাবে সব কিছু জীবাণুমুক্ত করে নেয়। ঘনঘন ফ্যাশান বদলাবার কারণে বাতিল জামা কাপড়ের সংখ্যা এত বেশি, তাই দামও এরকম সস্তা।

অপরের ব্যবহৃত রুমাল বা অন্তর্বাস ব্যবহার করা সম্পর্কে আমার আপত্তি আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু অন্যের ব্যবহার করা ওভারকোট গায়ে দেওয়ার ব্যাপারে আমার কোনও শুচিবাই নেই। আমেরিকার একজন বিখ্যাত কবি একবার আমার ব্যবহৃত টুথব্রাশ দিয়ে দিব্যি অবলীলাক্রমে দাঁত মেজেছিলেন। এটা আমাদের কাছে অকল্পনীয়। কিন্তু সেই কবি বলেছিলেন, ভালো করে ধুয়ে নিলে সব কিছুই নাকি ব্যবহারযোগ্য হয়।

আমাকে বাজেট স্টোরে চিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল উরুগুয়ের এক লেখক বন্ধু। তার নাম পেপে। পেপে অতি সুসজ্জিত ও সুপুরুষ। সে একগাদা জামা-প্যান্ট-কোট কিনে ফেলল। তিনটে বেশ বড় বোঁচকা হয়ে গেল। আমি পেপে-কে জিগ্যেস করলুম, তুমি এত পোশাক নিয়ে কী করবে? পেপে বলল, আমার স্বভাব কি জানো, পরি আর না পরি, আমার ওয়ার্ডরোবে অনেক জামাকাপড় ঝুলিয়ে রাখতে খুব ভালো লাগে।

আমি অবশ্য ওভারকোট ছাড়া অন্য জিনিসপত্রে আর লোভ করলুম না, কারণ অনেক ঘোরাঘুরি করতে হবে, বেশি জিনিসপত্র বইবার ঝামেলা নিতে চাই না।

ওভারকোটটা পরে একটু ঘোরাঘুরি করতেই নিজেকে বেশ সাহেব-সাহেব মনে হল। ওভারকোটের পকেটে দু-হাত ঢুকিয়ে দিলে হাঁটার স্টাইল পালটে যায়। আমার এই ওভারকোটটায় প্রায় সাত-আটটা

পকেট। প্রথম দিন ভালোভাবে দেখিনি, দ্বিতীয় দিনে সবকটি পকেটে তদন্ত করতে আমি পেয়ে গেলুম কিছু খুচরো পয়সা, কয়েকটা কাগজ আর দুটো লাল-পাথরের দুল। এই দুল জোড়া হাতে নিয়ে আমি বিমূঢ় হয়ে গেলুম। ওভারকোটটা যে কোনও পুরুষের তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সেই কোটের পকেটে মেয়েলি দুল কেন? এ যে রহস্য-কাহিনির মতন।

দুল দুটো সোনালি হলেও সোনার নয়, পাথর দুটোও দামি মনে হয় না, এগুলোকে এদেশে বলে কস্টিউম জুয়েলারি। রহস্য কাহিনি বানাবার প্রতিভা আমার নেই, কিন্তু দুল দুটো নিয়ে আমি বেশ চিন্তায় পড়ে গেলুম। আমার কোটের ভূতপূর্ব মালিক কীরকম লোক ছিল? সে ডাকাত নিশ্চয়ই না, তার পকেটে এত সস্তার দুল কেন? তা হলে কি সে ছিল খুব প্রেমিক ধরনের? কিংবা খুনি?

টিউব ট্রেনে যেতে-যেতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম। হঠাৎ ভাবলুম, কোথায় যাচ্ছি? এ যে আমার গন্তব্যের উলটোদিক। পরের স্টেশনেই নেমে ওপরে উঠে দেখলুম ফিফ্‌থ অ্যাভিনিউ আর ফিফটি নাইন্‌থ স্ট্রিটের মুখে এসেছি। এ-পাড়ায় তো আমার কোনও দরকার নেই, এখানে এলুম কেন? এ তো বড়লোকের পাড়া। ওভারকোটের ভূতপূর্ব মালিক কি এ পাড়াতেই থাকত?

সেন্ট্রাল পার্কের গা ঘেঁষে হাঁটতে লাগলুম ধীর পায়ে। মিহিন তুষারপাতে হচ্ছে, তার ওপর জুতোর দাগ ফেলতে বেশ লাগে। ওভারকোটের সঙ্গে একটা টুপিও দিয়েছে, সেটা পরে নিলুম মাথায়। এখন মনে হচ্ছে সিগারেটের বদলে একটা পাইপ ধরাতে পারলে বেশ হত।

হাঁটতে-হাঁটতে চলে এলুম প্লাজা হোটেলের কাছে। এই হোটেলের সামনে যতবারই এসেছি একটা অভিনব দৃশ্যের দিকে চোখ আটকে যায়। লাইন করে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটি ফিটন। যে দেশে এখন মোটরগাড়িতে-মোটরগাড়িতে ধুল পরিমাণ, সেখানে এখনও কয়েকটি ঘোড়ায় টানা গাড়ি টিকিয়ে রাখার চেষ্টা সত্যি বেশ মজার।

আমি একবার ভাবলুম, প্লাজা হোটেলে ঢুকে একটু চা-টা খেয়ে তারপর একটা ফিটন গাড়ি ভাড়া করে সেন্ট্রাল পার্কে এক চক্কর ঘুরে এলে কেমন হয়?

পরক্ষণেই ভাবলুম, আমার কি মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেছে? আমি কি সাহারাব জমিদার যে প্লাজা হোটেলে চা খাওয়ার শখ হয়েছে? ভেতরে ঢুকলেই কুচ করে গলা কেটে নেবে। আর ফিটন গাড়ির ভাড়া ট্যাক্সি ভাড়ার প্রায় কুড়ি গুণ বেশি। এদেশে এসে আমি ট্যাক্সি চড়ারই সাহস পাই না। হঠাৎ আমার মাথায় এরকম উটকো খেয়াল আসছে কেন?

ছেলেবেলায় 'ওভারকোট' নামে কার যেন একটা গল্প পড়েছিলুম, খুব সম্ভবত নিকোলাই গোগোল-এর। আমারও কি সেই রকম কিছু হল নাকি? ওভারকোটের আগেকার মালিকের ভূত ভর করছে আমার ওপর? নইলে এরকম বড়লোকি হুজুগ মনে আসছে কেন? দশ টাকা দিয়ে ওভারকোট কিনে শেষ পর্যন্ত কি আমি সর্বস্বান্ত হব, না জেলে যাব?

ঝাঁ করে একটা বাসে চেপে চলে এলুম গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল স্টেশনের কাছে। এখান থেকে আবার অন্য ট্রেন ধরতে হবে। কিন্তু বেশ খিদে পেয়েছে, একটা কিছু না খেলে চলে না। স্টেশনের সামনেই ঠ্যালাগাড়িতে নানারকম মুখরোচক খাবার বিক্রি করে। মাইওনেজ সহযোগে কয়েকটি চিংড়ি মাছের বড়া ও এক কাপ কফি খেলুম। এক ডলার ষাট সেন্ট দিতে হবে। দুটি ডলারের নোট বাড়িয়ে দিতে দোকানের মালিকানি জিগ্যেস করল, তুমি খুচরো দিতে পারো?

আমি বললুম, হ্যাঁ, পারি।

বলেই হাত ঢুকিয়ে দিলুম ওভারকোটের চার নম্বর পকেটে। খুচরোগুলো তুলে আনবার পরই আমি একটা বিষম খেলুম।

তখন মনে পড়ল, এই পয়সাগুলো আমার নয়। ওভারকোটের আগের মালিকের। এ পয়সা কি আমার নেওয়া উচিত? আগের মালিক কি এরকম রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঠ্যালাগাড়ির দোকানের খাবার খাওয়া অনুমোদন করত? আমি কি ওভারকোটটার অপমান করছি?

ধুত, এসব কুসংস্কারের কোনও মানে হয় না ভেবে সে-দোকানের দাম চুকিয়ে দিয়ে চলে এলুম। কিন্তু মনের মধ্যে খচখচ করতে লাগল। খুচরো পয়সাগুলো বোধহয় আমার ফেরত দেওয়া উচিত। লাল পাথরের দুল জোড়া নিয়েই বা আমি কী করব? কিন্তু এসব ফেরত দেবই বা কাকে? পকেটে যে কাগজপত্রগুলো পাওয়া গেছে, সেগুলো অতি সাধারণ, কয়েকটা হোটেলের চেক অর্থাৎ বিল।

জিনিসগুলো একমাত্র ফেরত দেওয়া যায় যে-দোকান থেকে আমি কোটটি কিনেছি, সে-দোকানের মালিককে। আমি শুধু কোটটাই কিনেছি, তার সঙ্গে এক জোড়া দুল আর কিছু খুচরো পয়সা তো ফাউ হিসেবে আমার প্রাপ্য নয়। কিন্তু এইটথ স্ট্রিটের সেই দোকানে আবার যেতে আসতেই আমার যা খরচ পড়বে, তাতে কোটটির দাম বেশ বেড়ে যাবে। তা ছাড়া এই সামান্য জিনিস ফেরত দিতে গেলে দোকানের মালিক যদি আমার প্রতি একটা হুংকার দেয়? তিনশো ডলারের ওভারকোট মাত্র দশ ডলারে যারা বিক্রি করে, তারা সামান্য কিছু খুচরো আর দুটো ঝুটো পাথরের দুল ফেরত নিতে রীতিমতন অপমানিত বোধ করতে পারেন।

কলকাতা হলে কোনও সমস্যাই ছিল না। কোনও ভিখিরিকে দিয়ে দিতুম পয়সাগুলো, আর রাস্তায় যেসব ছেলেমেয়েরা শুয়ে থাকে, তাদের মাথার কাছে দুল দুটো ফেলে দিয়ে বিবেকের দায় থেকে মুক্ত হয়ে পারতুম। কিন্তু ওদের খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

বেজার মুখ করে স্টেশনে ঢুকে আমার নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মে গিয়ে একটা ট্রেনে চেপে বসলুম। সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে ঠিক করেছিলুম, কোনও ফাঁকা জায়গা দেখে ট্রেনের জানলা দিয়ে দুল জোড়া ছুড়ে ফেলে দেব। ট্রেনে উঠবার পর বুঝতে পারলুম সেটা সম্ভব হয়। এয়ার কনডিশন্ড ট্রেন, সব জানলাই পুরো কাচ দিয়ে ঢাকা, শীতকালে কেউ জানলা খোলার কথা কল্পনাও করে না।

ট্রেনটা মোটামুটি ফাঁকাই ছিল, দুটি স্টেশন যাওয়ার পর একজন লোক ঠিক আমার মুখোমুখি আসনটিতে এসে বসল। বছর চল্লিশেক বয়েস, বেশ হাসিখুশি মানুষটি।

কয়েকবার আমার আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে লোকটি উচ্ছল গলায় বলল, হাউডি!

আমি বললুম, হ্যাল্লো।

—মনে হচ্ছে আজ রাত্তিরে আবার বরফ পড়বে, তাই না?

—তাই তো মনে হচ্ছে।

—আজ খেলায় কারা জিতেছে বলতে পারো?

—আমি ঠিক বলতে পারছি না।

এইরকম খাজুরে আলাপ কিছুক্ষণ চলল। এর আগে কোনও পুরুষ মানুষ ট্রেনে আমার সঙ্গে যেচে কথা বলেনি। নিউ ইয়র্কের নাগরিকদের স্বভাবই হল ঠোঁট বন্ধ করে রাখা। ট্রেনে উঠেই তারা মুখের সামনে একটা কাগজ মেলে ধরে অথবা চোখ বন্ধ করে থাকে। কথাবার্তা কদাচিৎ শোনা যায়।

আজ এই লোকটি যে আমার প্রতি মনোযোগ দিয়েছে, তা নিশ্চয়ই আমার ওভারকোটের জন্য। সাধারণত ট্রেনে উঠে সকলেই ওভারকোটটা খুলে ভাঁজ করে পাশে রাখে, আমি অন্যমনস্কভাবে সেটা গায়েই পরে আছি।

এটা টিউব ট্রেন নয়, মফস্বলে যাওয়ার ট্রেন। এতে চেকার ওঠে। একটু বাদেই চেকার মহাশয় এসে টিকিট দেখতে চাইলেন। আমার রিটার্ন টিকিট কাটা ছিল সেটা বার করে দিলুম।

চেকার একগাল হেসে বললেন, তুমি ভুল ট্রেনে উঠেছ। এটা তো অন্য দিকে যাচ্ছে।

আমি আকাশ থেকে পড়লুম। এরকম ভুল তো আমার হয় না। টিপে-টিপে পয়সা খরচ করতে হচ্ছে, এরকম ভুল মানেই তো গচ্চা। সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়ালুম, যত দূরে যাব ততই ক্ষতি।

চেকার খুব সহৃদয়ভাবে আমাকে বলল, তা হলে এই ভাড়াটা দিয়ে দাও।

ট্রেনটি আবার এক্সপ্রেস, পরপর চারটি স্টেশন ছেড়ে দিয়ে তারপর থামল। বেশ সুন্দর, নির্জন

একটা স্টেশন। কিন্তু স্টেশনটিকে দেখেই আমার গা জ্বলে গেল। এখানে আমায় কে এনেছে, নিশ্চয়ই এই ওভারকোটের মালিকের ভূত আমাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে এসেছে। এখানে তার কে ছিল? প্রেমিকা? যার জন্য এই দুল কিনেছিল সাহেবটি?

ওভারব্রিজ পেরিয়ে অন্যদিকে গিয়ে টিকিট কাটতে হবে। দুপুর বেলা টিকিটের দাম সস্তা থাকে, কিন্তু এখন সন্ধে ছ'টা, এখন টিকিটের দাম বেশি। উপায় নেই, ফিরতে তো হবেই।

ফেরার ট্রেন আসতে কুড়ি মিনিট দেরি, বসলুম গিয়ে টিকিট ঘর সংলগ্ন ওয়েটিং রুমে। আমিই একমাত্র যাত্রী এখানকার। টিকিট বিক্রয়িত্রী রমণীটি দু-তিনবার কৌতূহলী চোখে তাকাল আমার দিকে। ওভারকোটটা ওর চেনা-চেনা লাগছে নিশ্চয়ই। এই মেয়েটিই আমার পূর্বসুরির প্রেমিকা ছিল নাকি?

ট্রেন আসার শব্দ পেয়ে উঠে দাঁড়ালুম। বেপরোয়াভাবে দুল দুটো আর কাগজপত্রগুলো বেঞ্চের ওপর ফেলে রেখে ছুটে গিয়ে উঠে পড়লুম ট্রেনে। প্রতি মুহূর্তে ভয় হচ্ছিল, মেয়েটি বুঝি ছুটে আসবে আমায় ধরতে। ট্রেন ছাড়ার পর আমার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

ভুল ট্রেন ভাড়ার গচ্চা গেল প্রায় সতেরো ডলার। অর্থাৎ এখন ওভারকোটটার দাম পড়ল সাতাশ ডলার। অনেকটা ভদ্রমতন দাম, এরপর আর আগেকার মালিককে নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনও মানে হয় না।

।। ৩৩ ।।

হঠাৎ একদিন ঠিক করলুম ওয়াশিংটন ডি সি ঘুরে আসা যাক। এলোমেলো ভ্রমণে যদি শেষ পর্যন্ত ওয়াশিংটন ডি সি না যাওয়া হয় তা হলে বড় দুঃখের ব্যাপার হবে। রাজধানী বলে নয়, আমেরিকায় বেড়াতে এসে ওয়াশিংটন ডি সি-র স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউট না দেখে ফিরে যাওয়া একটা অমার্জনীয় অপরাধ।

বন্ধুরা আমাকে বাস স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে গেল। ওয়াইওমিঙে আমার সেই সাংঘাতিক বাস দুর্ঘটনার কথা শুনে নিউ ইয়র্কে অনেকে বলেছিলেন, তুমি আবার বাসে ঘোরাঘুরি করছ, তোমার ভয় করে না? এর উত্তরে সেই পুরোনো কথাটাই বলতে হয়, রোজ কয়েক লক্ষ লোক তো বিছানায় শুয়ে মরে যাচ্ছে, তাহলে তো বিছানায় শুতেই মানুষের ভয় পাওয়া উচিত।

নিউ ইয়র্ক থেকে ওয়াশিংটনের বাস এক ঘণ্টা অন্তর ছাড়ে। ঘণ্টাপাঁচেকের জার্নি। আমি অ্যাকসিডেন্টে পড়েছিলুম বটে তবু গ্রে-হাউন্ড বাস সার্ভিসের মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করতে হয়। কাঁটায়-কাঁটায় ঠিক সময়ে বাস ছাড়ে, আর হাজার মাইল পেরিয়েও অবিকল নির্দিষ্ট সময় পৌঁছোয়।

আমি পৌঁছোতে পাঁচ মিনিট দেরি করে ফেলেছি বলে পরবর্তী বাসের জন্য পঞ্চান্ন মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। সময় কাটাবার কোনও সমস্যা নেই। প্রত্যেক বাস স্টেশনেই আছে সস্তার খাবার দোকান। তার চেয়েও সস্তা চাইলে মেশিন থেকেই পাওয়া যায় ঠান্ডা ও গরম পানীয় এবং নানান ধরনের স্ন্যাক্স। একটা বাস স্টেশনের মেশিন থেকে আমি চিকেন সুপ পর্যন্ত পেয়েছিলুম, বেশ সুস্বাদু আর জিভে-গরম। সেদিন সত্যি খুব অবাক হয়েছিলুম। এদেশের এসব ছোটখাটো ব্যাপারই বেশি বিস্ময়কর।

আগে গেলুম একটা টেলিফোন করতে। ওয়াশিংটন ডি সি-তে রমেন পাইনের বাড়িতে আমার আশ্রয় নেওয়ার কথা, তাঁকে জানিয়ে দিতে হবে আমার বাসের সময় বদলে যাওয়ার কথা। কিন্তু টেলিফোন বুথগুলোর কাছে একটা দৃশ্য দেখে থমকে গেলুম।

একটি মেয়ে তার বয়েস ষোলো সতেরোর বেশি নয়, মাটিতে বসে পড়ে নিঃশব্দে শরীর মুচড়ে-মুচড়ে কাঁদছে অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে, আর একটি আঠারো-উনিশ বছরের ছেলে ফিসফিস করে খুব আন্তরিকভাবে তাকে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছে। মেয়েটি পরে আছে একটা গাঢ় হলুদ রঙের স্কার্ট, তার মাথার চুল সম্পূর্ণ সোনালি। আর ছেলেটি পরে আছে একটা নীল কর্ডের ট্রাউজার্স আর

সাদা গেঞ্জি, তার চোখ দুটি নীল, তাকে দেখতে অবিকল অল্পবয়েসি অ্যান্টনি পারকিন্‌সের মতন। ছেলেটি একবার করে একটা টেলিফোনের রিসিভার হুক থেকে নামিয়ে জোর করে মেয়েটির হাতে দিচ্ছে, আর মেয়েটি ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে সেটা। দেওয়ালে ধাক্কা লেগে টেলিফোনটি ঝুলছে কর্ডে। একবার মেয়েটি নো-ও-ও-ও বলে এত জোরে টেলিফোনটি ছুড়ে দিল যে তার অর্ধেকটা ভেঙে উড়ে গেল।

কাছাকাছি দশ-বারোটা টেলিফোন বুথ। তিন-চারজন নারীপুরুষ অন্য বুথগুলোতে নির্বিকারভাবে ফোন করে যাচ্ছে, কেউ ওদের দিকে একবারও তাকাচ্ছে না। বোধহয় তাকাবার নিয়মও নয়। এমনকী ওরা কেন একটি টেলিফোন ভেঙে ফেলছে, সে ব্যাপারেও কেউ আপত্তি জানাতে আসছে না।

কিন্তু আমার ছোটখাটো বাঙালি হৃদয় ওরকম নির্বিকার থাকতে পারে না। কান্নার দৃশ্য আমি একেবারেই সহ্য করতে পারি না। ফট করে আমার নিজেরও কান্না পেয়ে যায় ক্যাবলার মতন। ওই ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটি কাঁদছে কেন অমন বুক উজাড় করে? কী ওর দুঃখ?

ওদের পাশে দাঁড়িয়ে এখন আমার পক্ষে টেলিফোন করা সম্ভব নয়। আমি ওখান থেকে সরে গেলুম। একেবারে দূরেও চলে যেতে পারলুম না। একটা কোকাকোলা মেশিনের আড়ালে এমনভাবে দাঁড়ালুম যেখান থেকে ওদের দেখা যায়। দৃশ্যটা একই রকম। ছেলেটি বারবার মেয়েটিকে অনুরোধ করছে কোথাও টেলিফোন করার জন্য, মেয়েটি কিছুতেই টেলিফোন করবে না, সে এক-একবার রেগে উঠছে, আবার অঝোরে কাঁদছে। আমি মেয়েটির মুখ ভালো করে দেখতে পাচ্ছি না, তার মুখ দেওয়ালের দিকে।

প্রথমেই মনে হয়, এরা দুজনে নিশ্চয়ই বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। এটা এখানকার নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। হাজার-হাজার ছেলেমেয়ে বাড়ি ছেড়ে নিরুদ্দেশে চলে যায়। এই নিয়ে কত নাটক, কত সিনেমা হয়েছে। কিন্তু কখনও তো কোনও ছেলেমেয়েকে কাঁদতে কিংবা পরাজয় স্বীকার করতে দেখিনি। আমেরিকান যৌবন সবসময় দুঃসাহসের পতাকা তুলে ধরে থাকে। এই মেয়েটি কাঁদছে যেন বুক নিঙড়ে নিঙড়ে। আর ছেলেটির মুখেও একটা অপরাধী-অপরাধী ভাব।

এক সময় মেয়েটি উঠে দাঁড়াল, ছেলেটি তার কাঁধ ধরল। কয়েকপা মাত্র এগিয়েই মেয়েটি কান্নায় ভেঙে পড়ল আবার। আবার সে মাটিতে বসে পড়ল। এবারে আমি তার মুখ দেখতে পেয়েছি চোখের জলে একেবারে মাখামাখি। মুখখানা যেন কোনও বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা। মাথা ভরতি ওরকম সোনালি চুলের জন্যই মনে হয় মেয়েটি যেন এই পৃথিবীর নয়। অন্য কোনও গ্রহ-ট্রহ থেকে এসেছে। মেয়েটির শরীরের নিখুঁত গড়নের তুলনায় ওর কোমরের কাছটা যেন একটু স্ফীত। খুব সম্ভব মেয়েটি গর্ভবতী। এই বয়েসের ছেলে মেয়ের বিবাহ কিংবা একসঙ্গে থাকা তো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। এরা যৌবনের একটুও বাজে খরচ করতে চায় না।

মনে হয়, ওরা দুজনে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে, হয়তো দূরের কোনও শহরে থাকত, নিউ ইয়র্কে এসে টাকাপয়সা সব ফুরিয়ে ফেলেছে, তার ওপরে এই বিপদ। টাকাপয়সা না থাকলে নিউ ইয়র্কের মতন বড় শহর বড় নির্দয়। ছেলেটি কি মেয়েটিকে বলছে ওর বাবা-মা-র কাছে ফোন করে সাহায্য চাইতে? ছেলেটি নিজে তো ফোন করছে না।

এই রকম অবস্থায় সাধারণত সবাই ছেলেটিকেই দোষ দেয়। সবাই বলবে, বদমাস ছেলে, একটা কাঁচাবয়েসি মেয়েকে ভুলিয়ে ভালিয়ে এনে এখন এই অবস্থায় ফেলেছে। কিন্তু ছেলেটি মেয়েটির চেয়েও অনেক বেশি রূপবান, এমন সরল আর নিষ্পাপ মুখ আমি আগে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ছেলেটি কোনও ভুল করতে পারে, কিন্তু ওর মনে কোনও কু-মতলব থাকতে পারে না। তা ছাড়া, এই সব ব্যাপারে ছেলে আর মেয়ের দায়িত্ব সমান। এদেশে ষোলো বছরের মেয়ে কচি খুকি নয়, তারা ছেলেদের সঙ্গে সব ব্যাপারে কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে চলে।

এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকলে মনে হয় সবাই আমাকে দেখছে। কাছাকাছি অনেক বসবার জায়গা থাকলেও আমি কোকাকোলা মেশিনের পাশে দাঁড়িয়ে আছি কেন? আমি পয়সা ফেলে একটা কোকাকোলার টিন বার করে অন্য দিকে চলে গেলুম।

ওদের জন্য আমার মন কেমন করতে লাগল। বাস স্টেশনে কত লোক, কেউ ওদের একটা কথা জিগ্যেস করছে না। এরা ব্যক্তি স্বাধীনতাকে অত্যন্ত সম্মান দেয়, কিন্তু আমার মনে হল তারও একটা সীমা থাকা দরকার। ওই বয়েসের দুটি বিভ্রান্ত ছেলে-মেয়ে, এখন কারুর কাছ থেকে সামান্য একটা সান্ত্বনা বা সহানুভূতির কথা শুনলেই অনেক ভরসা পায়। দারুণ কোনও মানসিক সংকটে না পড়লে আমেরিকার মেয়ে প্রকাশ্যে কিছুতেই কাঁদবে না।

আমার নিজেকে খুব অসহায় বোধ হল। আমি কি কিছু করতে পারি? সব সময়েই মনে হয় আমি বিদেশি। আমার আর সাধ্য কতটুকু? তা ছাড়া আমি কিছু বলতে গেলেই যদি ওরা আমার দিকে সন্দেহের চোখে তাকায়?

বেশিক্ষণ দূরে থাকতে পারলুম না। তা ছাড়া আমায় তো টেলিফোন করতেই হবে।

এখন সেই একই দৃশ্য। সেই রকম ভাবেই কেঁদে চলেছে মেয়েটি, ছেলেটিও তার পাশে বসে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে যাচ্ছে। তবে এমনিই এদের শিক্ষা যে মেয়েটির কান্নায় ফোঁপানি ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই, ছেলেটিও কথা বলছে যথা সম্ভব নিম্ন স্বরে। তিন-চারজন নারীপুরুষ ওদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে টেলিফোন করে যাচ্ছে। এদের এই নির্লিপ্ততা এক-এক সময় আমার হৃদয়হীনতা বলে মনে হয়।

টেলিফোন করতে-করতে আমি আসলে কান খাড়া রাখলুম ওদের দিকে। যদি ওদের একটি কথাও শুনতে পাওয়া যায়। শুধু শুনতে পেলুম ছেলেটি বলছে, প্লিজ, রোজি, প্লিজ, প্লিজ...। আর মেয়েটির শরীর দুলে-দুলে উঠছে কান্নায়। আমার মনে হল, এই পুরো বাস স্টেশনের এমনকী বাইরেও আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে গেছে একটি সপ্তদশী মেয়ের কান্না।

টেলিফোনে কথাবার্তা সেরে আমি আবার একটি যন্ত্র থেকে এক গেলাস কফি নিলুম। আমার বাস ছাড়তে আরও তেইশ মিনিট বাকি। এদিকে-ওদিকে জোড়ায়-জোড়ায় নারী-পুরুষ গল্প করছে, কেউ হাসছে, এক বৃদ্ধা মহিলাকে সম্ভবত তার ছেলে ও ছেলেব বউ (কিংবা মেয়েজামাইও হতে পারে) চুমু খাচ্ছে দুদিকের গালে, মাইক্রোফোনে নানান জায়গার বাস আগমন-নির্গমনের কথা ঘোষিত হচ্ছে, অনেক গেটে যাত্রীদের লাইন পড়েছে, ছুটোছুটি করছে দুটি শিশু....জীবন চলেছে জীবনের নিয়মে। এখানেই একটি মেয়ে যে বুক ভাসিয়ে কঁদে যাচ্ছে, সেদিকে কারুর খেয়াল নেই।

আমার আর একটা ঘটনা মনে পড়ল। সেটাও আর একটা বাস স্টেশনের। সেখানে বাস বদলের কারণে ঘণ্টা দু-এক অপেক্ষা করার ব্যাপার ছিল। সময় কাটাবার জন্য কেউ কেউ টিভি দেখে। কেউ কেউ ঘুমোয়। আমি একটা বই পড়ছিলুম। আমার হ্যান্ডব্যাগটা আমার পায়ের কাছে রাখা। মাঝে মাঝে সেদিকে নজর রাখছি। বন্ধুবান্ধবের মুখে শুনেছি আজকাল স্টেশন থেকে ব্যাগ-ট্যাগ চুরি যাওয়া আশ্চর্য কিছু নয়, যদিও আগে এরকম ছিঁচকে চোর ছিল না।

একটি তিন-চার বছরের ফুটফুটে বাচ্চা মেয়ে দৌড়োদৌড়ি করছে ওয়েটিং রুমে। এক-একবার সে এসে আপন খেয়ালে টানাটানি করছে আমার হ্যান্ডব্যাগটা। আমি মুখ তুলে সস্নেহ হাসি দিচ্ছি। পাশের সিট থেকে মা ধমকাচ্ছে মেয়েকে। মেয়েটির মাথায় বেশ বড় একটা ব্যান্ডেজ বাঁধা। যা দুষ্টু মেয়ে, নিশ্চয়ই আছাড় খেয়ে মাথা ফাটিয়েছে। মেয়েটি একবার আমার ব্যাগটা খুলে ফেলবার চেষ্টা করতেই ওর মা বেশ জোরে বকুনি দিল।

আমি মুখ ফিরিয়ে ভদ্রতা করে বললুম, থাক, থাক। কিছু হয়নি। ও তো খেলা করছে। ওর মাথায় অতবড় ব্যান্ডেজ কেন?

মহিলা তীব্র গলায় বললেন, ওর বাবা ওকে মেরেছে। ওর বাবা মাতাল, বর্বর, নরপশু।

আমি চমকে গেলুম। অপরিচিতি লোককে তো কেউ এভাবে এসব কথা বলে না। ভালো করে তাকিয়ে দেখলুম, ভদ্রমহিলার বয়েস বছর পঁয়তিরিশেক হবে, সাজ পোশাকে কোনও মনোযোগ দেননি, চুল এলোমেলো, চোখ দুটো ফোলাফোলা। কোলে আর একটা বাচ্চা।

ভদ্রমহিলা আবার বললেন, ওর বাবা আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে। হি জাস্ট কিক্ড আস আউট লাইক অ্যানিম্যালস, ডিডন্‌ট গিভ আস আ নিকল...একটা পয়সা দেয়নি, স্রেফ মারতে-মারতে বার করে দিয়েছে।

আমি হতবাক। এতো আমাদের রাধার মা। আমার ছোট মাসির বাড়িতে বাসন মাজার কাজ করত রাধার মা। একদিন তার জীবন কাহিনি শুনেছিলুম। চব্বিশ পরগনার এক গ্রামে তার বিয়ে হয়েছিল। তিনটি বাচ্চা হয় তার, তিনটিই মেয়ে, সেই অপরাধে তার স্বামী তাকে বাচ্চা সমেত মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। কলকাতার অনেক বাড়ির দাসী রাঁধুনীই স্বামী বিতাড়িত। এদেশেও তা হলে রাধার মায়েরা আছে। এদেশে অবশ্য মামলা-মোকদ্দমা করে স্বামীর কাছ থেকে মোটা খোরপোশ আদায় করা যায়। কিন্তু মামলা করতে গেলেও তো খরচ লাগে। এই মহিলা তো দেখছি নিঃসম্বল, ইনি কী করে মামলা করবেন? মেয়েরা সব দেশেই এখনও অসহায়।

আমার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে মহিলা কেঁদে ফেললেন। সেদিনও আমি খুব অসহায় বোধ করেছিলুম। আমি তাঁকে কী সাহায্য করতে পারি? দশ-কুড়ি ডলার দিয়ে তো সাহায্য করা যায় না। তার বেশি সামর্থ্যও আমার নেই। বাচ্চা দুটিকে নিয়ে ভদ্রমহিলা কোথায় চলেছে তা জিগ্যেস করার সাহসও আমি পাইনি। শুধুই মহিলাকে বলেছিলুম, আমি কফি খেতে যাচ্ছি, তোমার বা তোমার বাচ্চাদের জন্য কি কিছু এনে দিতে পারি? তিনি তাঁর বড় মেয়েকে একটি চকলেট বার নেওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন শুধু।

...আমার বাস ছাড়তে আর সাত মিনিট দেরি আছে। পাঁচ মিনিট আগে লাইনে দাঁড়াতে হবে। ওই সপ্তদশী মেয়েটি আর কতক্ষণ কাঁদবে?

টেলিফোন বুথের দিকে ওদের আবার দেখতে গেলুম। ছেলেটি আর মেয়েটি ওখানে নেই। ওরা যেখানে বসে ছিল সেখানে এখনও কয়েকটি চোখের জলের ফোঁটা রয়েছে। ঠিক যেন রক্ত।

কোথায় গেল ওরা। একটু খুঁজতেই পেয়ে গেলুম, এক কোণের দিকে একটা বেঞ্চে বসে আছে ওরা। মেয়েটি সম্ভবত এখনও কাঁদছে, সে দু-বাহুর মধ্যে ঢেকে রেখেছে মুখ। ছেলেটি নার্ভাস ভাবে সিগারেট টানছে ঘনঘন, তার একটা হাত মেয়েটির পিঠে।

এখান থেকে এর মধ্যে অনেক জায়গায় বাস ছাড়ছে। ওরা বাস স্টেশনে এসেছিল কেন, কোথাও যাওয়ার জন্য? ওদের কাছে কি বাস ভাড়াও নেই?

আমি যা ভাবছি, হয়তো সেসব কিছুই ঠিক নয়। ওদের সমস্যা বোধহয় অন্য। কিন্তু মেয়েটির কান্নাটা তো সত্যি।

আমি বাসে উঠে গেলুম, আর ওদের দেখা গেল না। জানি না ওরা এরপর কী করবে। অনেকক্ষণ ওদের দুজনের জন্য আমার বুক টনটন করতে লাগল।

॥ ৩৪ ॥

রাত সাড়ে ন'টা আন্দাজ ওয়াশিংটন ডি সি বাস স্টেশনে পৌঁছতেই পরিচিত, সুদর্শন, দীর্ঘকায় মানুষটিকে দেখতে পেলুম। ভারী একটা ওভারকোট পরা, ফরসা গায়ের রং, মাথায় একটা টুপি থাকলেই সাহেব মনে হত। বাঁ হাতে বড় ব্যান্ডেজ বাঁধা। ইনি রমেন পাইন, কলকাতার টিভি দর্শকদের নিশ্চয়ই মনে আছে এঁর কথা।

রমেনদা তাঁর সুস্থ হাতটি দিয়ে আমার সুটকেসটি তুলে নিতে যাচ্ছিলেন, আমি বললুম, আরে, ছাড়ুন, ছাড়ুন। আপনার হাতে কী হল? অতবড় ব্যান্ডেজ?

রমেনদা নির্লিপ্তভাবে বললেন, এই একটু পড়ে গিয়ে ফ্রাকচার হয়েছে। এমন কিছু না।

—আপনি এক হাতে গাড়ি চালাবেন নাকি?

—কেন, তুমি ভয় পাচ্ছ?

আমি হেসে বললুম, না। আমার ভয় পাওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। কারণ, আমি জেনে গেছি, গাড়ির অ্যাক্সিডেন্টে আমার মৃত্যু। আমি ভাবছিলুম আপনার অসুবিধের কথা।

বাইরে ছিপছিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। সূচ ফোটানো ঠান্ডা বাতাস। আমার হাত জমে আসছে, এবারে এক জোড়া গ্লাভস আর না কিনলেই নয়।

রাস্তা পেরিয়ে এসে একটু দূরে পার্ক করা লাল রঙের গাড়িটায় উঠে বসলুম। সিনেমায় স্টান্টম্যানদের কায়দায় রমেনদা হুস করে দারুণ স্পিডে গাড়ি চালিয়ে দিলেন।

ওয়াশিংটন ডি সি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী হলেও জায়গাটি ছোট। এখানে যারা কাজ করে, তারা অনেকেই থাকে এর বাইরে। রমেনদা থাকেন ভার্জিনিয়ায়। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা বাইরের শীত থেকে রমেনদার অ্যাপার্টমেন্টের উষ্ণতায় পৌঁছে গেলুম। এই উষ্ণতা শুধু আবহাওয়ার নয়, আন্তরিকতারও।

অনেকদিন বাদে আমি বেশ একটা বাড়ি-বাড়ি পরিবেশ পেলুম। এর আগে যেসব বাঙালি পরিবারে গেছি, প্রায় সব জায়গাতেই স্বামী-স্ত্রীর সংসার ও একটি বাচ্চা, বড় জোর দুটি। তারা সন্ধে একটু গাঢ় হলেই শুতে চলে যায়, তারপর থেকে বাড়ি একেবারে চুপচাপ। রমেনদার দুটি মেয়েই বেশ বড় হয়েছে, ওদের ছেলেটিও অনেক রাত জাগে, সবাই মিলে এক সঙ্গে বসে আড্ডা দেওয়া যায়। ওদের ছেলে রঞ্জন অবশ্য একটাও কথা বলে না, সে শুধু দেখে, আর মজার কথা শুনলে হাসে।

জুলি বউদির বোধহয় দুটি নয়, আটখানা হাত। একই সঙ্গে তিনি রান্না করছেন, জামাকাপড় কাচছেন, বিছানা পাতছেন, চা-কফি বানাচ্ছেন, ছেলেকে খাবার দিচ্ছেন, আমাদের জন্য বাদাম ও বরফ এনে দিচ্ছেন, অথচ এইসব কাজ করতে-করতেও আমাদের সঙ্গে বসে হাসিমুখে গল্পও করছেন। এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। জুলি বউদির আরও নানান গুণপনার পরিচয় আমি আস্তে-আস্তে পেতে থাকি।

রমেনদা-জুলি বউদি এখানে সাত-আট বছর কাটিয়ে দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। কলকাতাতেই থাকবেন ভেবেছিলেন, আমেরিকায় আর ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। টানা চার বছর কলকাতায় ছিলেন চাকরি জীবনের নানান দলাদলির সঙ্গে যুদ্ধ করে। শেষ পর্যন্ত আবার এদেশে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছেন। সে যাই হোক, কৈশোরের শেষ দিকটায় চার বছর কলকাতায় কাটানো ও পড়াশুনো করার ফলে ওঁদের দুই মেয়ে বাংলা তো শিখেছে বটেই, বাঙালি হিসেবে আত্মমর্যাদাবোধও এসেছে। আবার শৈশব ও যৌবনে আমেরিকায় এসেছে বলে ওরা অনেক ব্যাপারে স্বাবলম্বী ও জড়তাহীন। অর্থাৎ দু-দেশেরই গুণ বর্তেছে ওদের মধ্যে। মেয়ে দুটির নাম মুনু আর মোম।

আমরা পৌঁছনোর পরই রমেনদা পোশাক পালটে পাঞ্জাবি আর পাজামা পরে ফেললেন। তারপর বললেন, বুঝলে নীললোহিত, তুমি আসবে বলে আমি অফিস থেকে ছুটি নিয়ে ফেলেছি। কদিন আর কোথাও বেরুব না, শুধু আড্ডা হবে।

প্রথম রাতে আড্ডা চলল প্রায় রাত দুটো পর্যন্ত। পরদিন আমরা চা খেলুম সকাল দশটায়। তারপর আবার আড্ডা। রমেনদা আগে থেকেই যে কত রকম খাদ্য পানীয় এনে জমিয়ে রেখেছেন, তার ঠিক নেই। মুনু আর মোম কলেজে পড়ে আবার চাকরিও করে, সারাদিন ধরেই তারা ব্যস্ত। কেউ ভোরে বেরিয়ে যাচ্ছে দুপুরে ফিরছে, কেউ দুপুরে বেরুচ্ছে, অন্য জন বেরুবার পর আর একজন ফিরছে, এই রকম চলতে থাকে রাত পর্যন্ত। এবাড়ির দুটি গাড়ির মধ্যে কে কোনটা নিয়ে কখন যাচ্ছে, তার হিসেব রাখতে হয় জুলি বউদিকে। কারণ, টুকিটাকি জিনিসপত্র কেনার জন্য তাঁকে প্রায়ই গাড়ি নিয়ে বেরুতে হয়।

রমেনদার মেজাজটা অনেকটা জমিদার ধরনের। যখন ছুটি নিয়েছেন, তখন আর বাড়ি থেকে বেরুবার কোনও মানে হয় না। বসবার ঘরে পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকবেন আর বারবার চা, কফি ও অন্যান্য জিনিসের হুকুম করবেন। আজকালকার স্বামীরা অবশ্য বউদের হুকুম করার সাহস পায় না, বউদের ভুরু তোলা কিংবা ঝাঁজালো কথা শোনার ভয়ে সব সময় তটস্থ থাকাই বিংশ শতাব্দীর বাঙালি যুবকদের নিয়তি। অবশ্য বাড়িতে কুমারী কন্যা থাকলে স্নেহময় পিতার পক্ষে তাদের যেকোনও হুকুম করা যায়, মেয়েরা সাধারণত বাবার খুব বাধ্য হয়।

রমেনদা কিন্তু অকুতোভয়। তাঁর দুটি বড়-বড় মেয়ে থাকলেও তিনি মেয়েদেরও হুকুম করেন, বউকেও হুকুম করেন। জুলি বউদি আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, দেখেছো ও নিজে কোনও কাজ করবে না। সব সময় হুকুম। আমার যদিও ধারণা হয় যে, জুলি বউদি স্বামীকে দিয়ে কোনও কাজ করাতে ভরসাও পান না। ওর বদ্ধমূল বিশ্বাস যে, রমেনদা নিজের হাতে এক গেলাস জল গড়াতে গেলেও হয় মেঝেতে জল ফেলে কার্পেট ভেজাবেন অথবা গেলাসটা ভাঙবেন।

এডমান্টনে দীপকদা বলেছিলেন, আমাদের দেশের লোকদের সবচেয়ে সুখ কীসে জানো? খাবার পরে থালাটা রেখে উঠে যেতে পারে। আর এই দেশে আমাদের খাওয়ার পরে লঙ্গরখানার ভিখিরির মতন এঁটো থালাখানা হাতে নিয়ে উঠে যেতে হয়, তক্ষুনি গিয়ে থালাবাসন মাজতে হয়।

সত্যি কথা, এদেশে, সব জায়গাতেই ওই এক নিয়ম দেখেছি। এমনকী নিমন্ত্রিত অতিথিদেরও নিজের থালা ধুয়ে দেওয়াই প্রথা। একমাত্র রমেনদাকেই দেখলুম এ ব্যাপারে তোয়াক্কা করেন না। খাওয়ার পরে বেমালুম এঁটো থালা টেবিলে রেখে উঠে যান। একবার রমেনদাকে এ ব্যাপারটা উল্লেখ করায় রমেনদা বললেন, আরে যাও, যাও ওসব থালাবাসন মাজায় আমি বিশ্বাস করি না। আমেরিকায় এসেছি বলে কি মাথাটাও বিকিয়ে দিয়েছি নাকি?

ওঁর দুই মেয়ে এই কথা শুনে খলখলিয়ে হাসে। মেয়েরা এই ব্যাপারে বাবাকে সস্নেহ প্রশ্রয় দেয়।

দু-দিন টানা আড্ডা মারার পর আমি একটু উসখুস করতে লাগলাম। আড্ডার চেয়ে প্রিয় জিনিস আমারও কিছু নেই। বাছা-বাছা দ্রষ্টব্য স্থানগুলো আমায় দেখতেই হবে, এরকমও কোনও ঝোঁক আমার নেই। অনেক কিছুই তো ছবিতে দেখা যায়। নতুন কোথাও এসে সেই জায়গাটা অনুভব করাই আসল ব্যাপার। কিন্তু স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউট? সেখানে একবার না গেলে যে মনে ক্ষোভ থেকে যাবে।

একবার মিনমিন করে এই প্রসঙ্গ তুলতেই রমেনদা উদারভাবে বললেন, হবে, হবে। অত ব্যস্ততা কীসের?

জুলি বউদি রান্নাঘর থেকে বললেন, ওর কথা শুনলে তোমার আর কোনওদিনই যাওয়া হবে না, নীলু। আমি বরং নিয়ে যাব তোমাকে।

পরদিন সকাল দশটায় জুলি বউদি আমায় স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউটের স্পেস মিউজিয়ামের দরজায় ছেড়ে দিয়ে বললেন, তুমি ঘুরে-ঘুরে দ্যাখো, তোমায় আমি আবার বিকেল ছ'টার সময় তুলে নিয়ে যাব এখান থেকে।

স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউট শুধু একটা বাড়িতে আবদ্ধ নয়, বিশাল একটি পাড়া জুড়ে এই ব্যাপার। একটি মাত্র হিসেব দিলে এই এলাহি কারবারের কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যাবে। এখানে যতগুলি দেখবার জিনিস আছে, তার প্রত্যেকটির সামনে যদি মাত্র এক মিনিট করে দাঁড়ানো যায়, তাহলেই সময় লাগবে আড়াই বছর।

সুতরাং কারুর পক্ষেই পুরোটা দেখা সম্ভব নয়। যার যাতে আগ্রহ, সে শুধু সেই অংশটুকু দেখে। তার মধ্যে স্পেস মিউজিয়াম অবশ্য দ্রষ্টব্য। আকাশ ও মহাকাশ বিষয়ে এমন বিপুল সম্ভার পৃথিবীর আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। এখানে সবই গোটা-গোটা ব্যাপার। চার্লস লিন্ডবার্গ যে প্লেনটি

চেপে প্রথম আটলান্টিক পাড়ি দিয়েছিলেন, সেটা অটুট অবস্থায় রয়েছে এখানে। যেসব রকেট মহাশূন্য থেকে ফিরে এসেছে, সেরকম কয়েকটি রাখা আছে। এগুলো দেখলেই রোমাঞ্চ লাগে। নীল আমস্ট্রং যে যানটি চেপে চাঁদে নেমেছিলেন, দেখলুম সেটাও। শুধু এই প্রদর্শনী ভবনটিই যে কত বিরাট, তা ঠিক বলে বোঝানো যাবে না। মানুষের আকাশে ওড়ার প্রথম চেষ্টা থেকে আধুনিকতম আবিষ্কার পর্যন্ত দেখানো হয়েছে স্তরে-স্তরে। কোথাও রয়েছে প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এক-একটি দৃশ্যের মডেল। আমরা অবশ্য প্রদর্শনীর মডেল বলতেই ভাবি কৃষ্ণনগরের ছোট-ছোট পুতুল। এখানে সবই জীবন-প্রমাণ সাইজের, কোথাও তার চেয়েও বড়।

একটি ফিলমের কথাই বলি। এরকম ফিল্ম দেখার অভিজ্ঞতা আমার জীবনে আগে হয়নি। এখানে নানান বৈজ্ঞানিক ব্যাপার নিয়ে বিশেষ প্রক্রিয়ার তোলা ফিল্ম দেখবার ব্যবস্থা আছে, আমার মাত্র দুটিই দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। নির্দিষ্ট সময়ে টিকিট কেটে লাইন দিয়ে ঢুকলুম। বসবার ব্যবস্থা বেশ উঁচু গ্যালারির মতন। ছবি দেখার পরদা অন্তত ছ' গুণ বড়। অর্থাৎ একটি হাতি, বা নারকেল গাছ বা ছোট ডাকোটা প্লেনকে দেখা যায় তাদের অবিকল আকারে। একটা বাংলো বাড়ির ছবি ঠিক সেই বাড়িটিরই সমান। প্রথম ফিল্মটি হচ্ছে একটি আগেকার দিনের চারটি ডানাওয়ালা, প্রপেলার সমেত বিমানের অ্যাডভেঞ্চার। বিমানটি যখন একটা নির্জন নদীর খাতে ঘুরতে-ঘুরতে পড়ে যাচ্ছিল, তখন আমি আঁতকে উঠে আমার চেয়ারের হাতল শক্ত করে চেপে ধরেছিলুম। যেন আমিই সেই বিমানে বসে আছি। আমিই পড়ে যাচ্ছি। সত্যিকারের বিমান যাত্রায় আমার কখনও এরকম ভয় হয়নি।

আর একটি ছবি পৃথিবীতে জীবনবৈচিত্র্য বিষয়ে। এই ছবির নির্মাতার ভারতবর্ষ সম্পর্কে দুর্বলতা আছে, কারণ বারবার ভারতবর্ষের ছবি ফিরে-ফিরে আসছিল আর আমি উৎফুল্ল হচ্ছিলুম। ছবির কলাকৌশলে আমি নিজেই যেন উপস্থিত হচ্ছিলাম ভারতবর্ষের গঙ্গাতীরে।

ওয়াশিংটন ডি সি-তে যিনি বেড়াতে যাবেন তিনি এই ফিল্মগুলি না দেখলে এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হবেন।

এর পাশাপাশি আছে মুদ্রার বিবর্তনের প্রদর্শনী, অস্ত্রের বিবর্তন, প্রাণীতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব ভাস্কর্য চিত্রকলা ইত্যাদি। আমি দুর্দিনে শুধু ওই আকাশযান ও অভিব্যক্তিমূলক চিত্রকলার প্রদর্শনী দেখে উঠতে পেরেছি।

স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিট্‌উটের পুরো পাড়াটা বাইরে থেকে ঘুরে দেখতেও ভালো লাগে। মনে হয় যেন প্রাচীন রোমের কোনও অভিজাত এলাকায় এসে পড়েছি, বাড়িগুলি এই রকম। এদের অনেক টাকা পৃথিবীর যে-কোনও প্রান্ত থেকে দুর্লভতম শিল্প সামগ্রী সংগ্রহ করতে এরা সদা-উৎসাহী।

এ সম্পর্কে এটি কাহিনি আছে। একবার এই সংস্থার কর্তৃপক্ষ আগাগোড়া সোনা দিয়ে একটি মূর্তি গড়িয়ে রাখার সংকল্প করলেন। সেইজন্য তাঁরা আমেরিকার সবচেয়ে বিখ্যাত ভাস্করের কাছে জানতে চাইলেন, তাঁর ইচ্ছে মতন পারিশ্রমিক পেলে তিনি খাঁটি সোনার কোনও ভাস্কর্য গড়তে পারবেন কি না। ভাস্করটি উত্তর দিয়েছিলেন, কেন পারব না, নিশ্চয়ই পারব। তবে তৈরি করার পর আমি মূর্তিটি কালো রং করে দেব।

প্রথম দিন জুলি বউদি এলেন আমাকে তুলে নিতে। বাড়ি ফেরার পথে জুলি বউদি বললেন, একটু মাছ কিনতে হবে, তুমি যাবে আমার সঙ্গে মাছের দোকানে?

ভাগ্যিস রাজি হয়েছিলুম, তাই আর একটা নতুন জিনিস দেখা হয়ে গেল। অবশ্য বাজারে যেতে আমার সব সময়ই ভালো লাগে।

এ দেশের সব গ্রসারি স্টোরেই মাছ পাওয়া যায়। নানা রকমের মাছ, কুচো মাছ, কাটা মাছ, বড়-বড় আস্ত মাছ, আধ সেদ্ধ মাছ, কিন্তু সবই ফ্রোজেন। বরফে জমিয়ে কাঠ। বাড়িতে এনে সেগুলো অনেকক্ষণ ধরে থ করার পর রাঁধতে হয়।

কিন্তু জুলি বউদি আমায় নিয়ে এলেন টাট্‌কা মাছের বাজারে। এ-এক অপূর্ব বাজার, এখানে

প্রত্যেকটি দোকানই ভাসমান। বন্দরের জেটির চার পাশ ঘিরে রয়েছে অনেকগুলো লঞ্চ। সেই সব লঞ্চের বারান্দা কিংবা সামনে পেতে রাখা পাটাতনেই বিক্রি হচ্ছে মাছ। খুব ছেলেবেলায় দেখা পদ্মার বুকে ইলিশ মাছের নৌকোগুলোর কথা মনে পড়ল। এখানেও এক-এক দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে এক-একটা ছোকরা হাঁকাহাঁকি করছে, এদিকে আসুন এদিকে ভালো মাছ, টাটকা মাছ।

মাছ অনেক রকম, ভেটকির মতন, কাতলার মতন, পার্শের মতন, বান মাছের মতন, আড় মাছের মতন। সবই কিন্তু মতন, আসল নয়, এগুলো সামুদ্রিক মাছ। আরও নানা রকম অদ্ভুত চেহারায় মাছ, যার সঙ্গে আমাদের চেনা কোনও মাছই মেলে না। সামুদ্রিক জীবজন্তুও বিক্রি হচ্ছে মনে হয়। একমাত্র চিংড়িটাই আসল। তবে বাগদা বা গলদা নয়, কলকাতার বাজারে যাকে বলে চাবড়া চিংড়ি, সেগুলোই রয়েছে। অর্থাৎ সাদা রঙের চিংড়ি।

জুলি বউদি অনেক চিংড়ি কিনলেন। এক দোকানে বেশ বড়-বড় কাঁকড়া রয়েছে, তা দেখে জুলি বউদির চোখ চকচক করে উঠল। আমায় জিগ্যেস করলেন, তুমি কাঁকড়া খাও, নীলু?

আমি হুতোমের অনুকরণে উত্তর দিলুম, জলচরের মধ্যে নৌকো, খেচরের মধ্যে ঘুড়ি আর চতুষ্পদের মধ্যে খাট ছাড়া আমি সবই খাই।

জুলি বউদি মুখ ম্লান করে বললেন, আমিও কাঁকড়া খুব ভালোবাসি, আমার ছেলেমেয়েরাও ভালোবাসে, কিন্তু মুশকিল হয়েছে কি জানো, তোমার রমেনদা নিজে তো কাঁকড়া খায়ই না, বাড়িতে রান্না হলেও সে গন্ধ সহ্য করতে পারে না।

একটু চিন্তা করে জুলি বউদি আবার বললেন, এক কাজ করলে হয়। কাঁকড়া নিয়ে তো যাই। ও বাথরুমে ঢুকলে রান্না করে ফেলব। ও বাথরুমে ঢুকলে অন্তত এক ঘণ্টা লাগে, তার মধ্যে রান্না হয়ে যাবে। তারপর...তারপরও ও যদি এবার বাড়ি থেকে বেরোয়, তখন আমরা চট করে খেয়ে নেব। কী বলো? ঘরে রুম ফ্রেশনার ছড়িয়ে দেব, তাহলে ও আর গন্ধ পাবে না।

সেই রকমই হল। কাঁকড়া কিনে নিয়ে যাওয়া হল, রমেনদা স্নান করতে ঢুকলে রান্নাও সেরে ফেলা হল। কিন্তু খাওয়া হবে কী করে? রমেনদার অফিস ছুটি, ওঁর তো বাড়ি থেকে বেরুবার কোনও প্রয়োজনও নেই, ইচ্ছেও নেই। জুলি বউদি মাঝে-মাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছেন, মেয়েরা মায়ের সঙ্গে চোখাচোখি করছে, কিন্তু রমেনদার বাইরে বেরুবার কোনও লক্ষণই নেই।

জুলি বউদি একবার জিগ্যেস করলেন, তুমি ড্রিংকস বা সিগারেট কিনতে যাবে না?

রমেনদা গম্ভীরভাবে বললেন, আমার সব স্টক আছে।

ঘণ্টাখানেক বাদে একটা টেলিফোন এল। ওঁদের এক মেয়ে ফোন করছে ইউনিভার্সিটি থেকে। তার গাড়িটা খারাপ হয়ে গেছে। এখন সে কী করবে?

রমেনদা দারুণ বিরক্ত হয়ে উঠলেন। এখন তাঁকে যেতেই হবে। তিনি না গেলে গাড়ি সারাবার কোনও ব্যবস্থা করা যাবে না।

রমেনদা বললেন, এই জন্যই আমি আমেরিকান গাড়িগুলো একদম পছন্দ করি না। এর চেয়ে আমাদের দেশের অ্যামবাসেডর গাড়ি কত ভালো। পানের দোকানেও পার্টস পাওয়া যায়, যে কেউ সারিয়ে দিতে পারে। এখানে গাড়ি খারাপ হলেই খরচের রাম ধাক্কা।

অন্য গাড়িটা নিয়ে রমেনদা বেরিয়ে গেলেন। আমরা অমনি তাড়াতাড়ি কচর মচর করে কাঁকড়া খেয়ে নিলুম। যে মেয়েটি আত্মত্যাগ করল, তার জন্য কিছুটা রেখে দেওয়া হল আলাদা করে। সে পরের দিন কোনও এক সুযোগে খেয়ে নেবে। রমেনদা ফেরার আগেই ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে ফেলা হল সব কিছু।

রমেনদা ফিরলেন অনেকটা প্রসন্ন মুখে। গাড়িটার বিশেষ কিছু হয়নি, স্টার্ট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল শুধু, আবার ঠিক হয়ে গেছে।

এবার আমায় অফিসিয়ালি খেতে বসতে হল রমেনদার সঙ্গে। কিন্তু আমি আর খাব কী করে,

পেটে আর জায়গা নেই। খাবারগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছি শুধু।

রমেনদা মুখ তুলে বললেন, কী যে আজে-বাজে রান্না করো, ও বেচারি খেতেই পারছে না। ভালো কিছু করতে পারো না? এখানে ভালো কাঁকড়া পাওয়া যায়, কাল কাঁকড়া এনে নীললোহিতকে খাইয়ো!

রমেনদা এবার জুলি বউদির দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন।

।। ৩৫ ।।

কয়েকদিন বেশ এক টানা আড্ডা হল। এলেন আরও বাঙালিরা। সন্ধের পর জমল গান ও কাব্য-টাব্য পাঠ। তারপর একদিন সকালবেলা রমেনদা গা ঝাড়া দিয়ে বললেন, চলো, নীললোহিত, তোমায় একটা মনে রাখবার মতন জায়গা দেখিয়ে আনি।

ওঁদের দুই মেয়ে মুনু আর মোম ইচ্ছে থাকলেও যেতে পারবে না। কারণ ওদের ক্লাস আছে। বেলাবেলি বেশ মিষ্টি রোদে আমরা বেরিয়ে পড়লুম, সঙ্গে কফির ফ্লাস্ক আর ফলটল। রাস্তার দু-পাশে ঝুরোঝুরো বরফ পড়ে আছে, মাঝে-মাঝে দু'এক পশলা তুষারপাত হয়ে যাচ্ছে। গাড়ি চলেছে নির্জন প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে। মাঝে-মাঝে দু-একটা ছোট গ্রাম, যা শহরও বলা যায়। এই ছোট্ট গ্রাম-শহরগুলোই যেন এক-একটা স্বাস্থ্যকর বেড়াবার জায়গা, এখানে বড়-বড় কয়েকটা হোটেল আর পর্যটকদের আকর্ষণ করার জন্য লোভনীয় বিজ্ঞাপন। বড় শহরের টানটান করা জীবন থেকে বেরিয়ে এসে দু-চার দিনের জন্য এই পাহাড়ের কোলে আর জঙ্গলের পাশে কয়েকদিন কাটিয়ে যাওয়া বেশ চমৎকার ব্যাপার। কয়েক ঘণ্টা মাত্র গাড়ির যাত্রা।

যেতে যেতে রমেনদা এক সময় বললেন, এদেশে আমি কোন জিনিসটা খুব মিস করি জানো? মনে করো খুব একটা বৃষ্টির দিন, তার মধ্যে বেরিয়ে পড়লুম, সুবর্ণরেখা কিংবা রূপনারায়ণ নদীর ধারে একটা ছোট চায়ের দোকান, সেখানে বসে বসে মুড়ি, তেলেভাজা আর কাঁচা লঙ্কা খেতে-খেতে বৃষ্টি দেখা। সে আনন্দ এ দেশে পাওয়ার উপায় নেই।

বুঝলুম রমেনদার মধ্যে এখনও একটা বেশ রোমান্টিক মন রয়ে গেছে। এই ধরনের লোকরা প্রায়ই দুঃখ পায়।

নদীর ধারে ছোট্ট চায়ের দোকান নয় অবশ্য, আমরা মধ্যাহ্নভোজ সারতে ঢুকলুম বার্গার কিং-এ। ম্যাকডোনালড্‌স-এ যেমন কফি ও আলুভাজা বিখ্যাত, বার্গার কিং-এর হ্যাম বার্গারের স্বাদে ও চেহারায় বেশ বিশেষত্ব আছে। এক-একটি দোতলা হ্যামবার্গার একা খেয়ে প্রায় শেষ করা যায় না।

এই দোকানে একটা বিজ্ঞপ্তিতে দেখলুম যে কোনও কোকাকোলার ছিপিতে বিশেষ একটা চিহ্ন থাকলে আর একটি কোকাকোলা বিনামূল্যে পাওয়া যাবে। আমরা তিনটি কোকাকোলা নিয়েছিলুম, তিনটিতে সেই চিহ্ন। নিয়ে এলুম বিনে পয়সায় তিনটে। সেগুলোর ছিপিতেও আবার সেই চিহ্ন। এ তো মহা মুশকিল। এত কোকাকোলা নিয়ে আমরা কী করব? এক সঙ্গে এত তো খাওয়া যায় না। শেষের তিনটি কোকাকোলার বোতলের ছিপি আর আমরা ভয়ে খুললুম না, সঙ্গে নিয়ে চললুম গাড়িতে।

ক্রমশ রাস্তা জনবিরল হয়ে আসছে। পাশে কোথাও ফসলের খেত, কোথাও বা জঙ্গল। এখানে জঙ্গলের মধ্যেও কিন্তু মানুষ থাকে, অবশ্য তারা জংলি নয়। এক এক সময় দেখতে পাই এই জঙ্গলের রাস্তা দিয়েই চলেছে স্কুলের বাস, মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে আছে মায়েরা, তাদের বাচ্চারা বাস থেকে নেমেই ছুটে যাচ্ছে মায়ের কাছে। এক কালে এই অঞ্চলে রেড ইন্ডিয়ানদের ঘন বসতি ছিল, এখন আর একজনও চোখে পড়ে না।

আরও একটু দূর যাওয়ার পর চোখে পড়ল ব্লু রিজ পর্বতমালা। দূর থেকে সব পাহাড়কেই

দেখতে এক রকম। কিন্তু এই ব্লু রিজ পর্বতমালা পৃথিবীর প্রাচীনতমদের মধ্যে একটি। এর বয়েস প্রায় একশো কোটি বছর। আমাদের হিমালয় এর তুলনায় ছেলে মানুষ। আল্পস বা অ্যান্ডিজও এর চেয়ে বয়েসে ছোট। এই পৃথিবীতে যখন কোনও জন্তুজানোয়ার ছিল না, ঝোপঝাড় বা বৃক্ষও জন্মায়নি, সেই আদিম যুগে এই প্রস্তুতস্তূপ দানা বেঁধেছে।

এই ব্লু রিজ পর্বতমালার গায়েই আছে বিখ্যাত শেনানডোয়াহ উপত্যকা এবং শেনানডোয়াহ ন্যাশনাল পার্ক। কিন্তু আমাদের গন্তব্য সেদিকে নয়। আমরা যাচ্ছি একটা গুহা দেখতে। গুহা অবশ্য কিছুই বোঝা যায় না। লুরে ক্যাভার্ন সারা পৃথিবীর বিখ্যাত দ্রষ্টব্য স্থানগুলির অন্যতম।

বিকেল-বিকেল আমরা পৌঁছোলুম সেখানে। ওপরটা দেখলে কিছুই বোঝবার উপায় নেই। গোটাকয়েক দোকান, জিনিসপত্রের ও খাবারদাবারের। টিকিট কেটে লিফটে নামতে হয় নীচে।

রমেদারা অনেকবার দেখেছেন বলে নীচে নামবেন না, তাঁরা ওপরেই রয়ে গেলেন। আটজনের একটা দলে আমি জায়গা পেলুম, সেই দলে রয়েছেন আর একজন বাঙালি মহিলা। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন একজন গাইড, আমি আবার ওই বাঙালি মহিলার গাইড।

মাটির অনেক নীচের গুহায় ঘুটঘুটে অন্ধকার থাকবার কথা। কিন্তু কোথাও-কোথাও সেই অন্ধকার অবিকৃত রাখা রয়েছে, আবার কোথাও-কোথাও ব্যবস্থা করা হয়েছে লুকানো আলোর। এমনই চমৎকার ব্যবস্থা যে কোথাও আলোর নগ্ন বাল্‌ব বা টিউব দেখতে পাওয়া যায় না, যেন অনৈসর্গিক এক দীপ্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

প্রকৃতি দেবী চল্লিশ কোটি বছর ধরে শিল্পীর মতন খোদাই করে নির্মাণ করেছেন এই লুরে ক্যাভার্ন। মাটির অনেক নীচে যেন এক অমরাবতী। দেখতে-দেখতে বিস্ময়ে চোখ জুড়িয়ে আসে।

বারবার বাঙালি মেয়েটি আমাকে জিগ্যেস করতে লাগলেন, সত্যিই। এসব মানুষে তৈরি করেনি? এমনি-এমনি হয়েছে?

আমার তখন মনে হয়, মানুষ এখনও এত সুন্দর স্থাপত্য নির্মাণ করতে শেখেনি। যেমন আকাশের অনেক রকম রং দেখি, কোনও শিল্পীর তুলিতে আজও তো যথাযথ সেইরকম রং দেখলুম না।

পৃথিবীতে যখন বিপুল উত্থানপতন চলছিল, সেই সময় সৃষ্টি হয় এই বিশাল গুহাটি। প্রায় এক বর্গ মাইল। এর মধ্যে চাপা পড়ে গিয়েছিল কিছু জল ও বাতাস। সেই জল ও বাতাসের তুলি ও বাটালিতে তৈরি হয়েছে নানা রকম রঙের ডিজাইন এবং অনেকরকম আকার। কোথাও মনে হয় পাতা আছে একটা সিংহাসন, কোথাও উঠে গেছে বিরাট মন্দিরের মহান কারুকার্য করা থাম। নিউ ইয়র্ক শহরটিকে দূর থেকে যেরকম দেখায়, একজায়গায় দেওয়ালে ফুটে উঠেছে অবিকল সেই রকম একটি মডেল। এক জায়গায় রয়েছে যেন সদ্য ভাজা একটা ডিমের পোচ, অবশ্য সেটা রক পাখির ডিম হতে হবে। এক জায়গা পুরোপুরি একটা গির্জায় অভ্যন্তরের মতন, সেই জায়গাটির নামও দেওয়া হয়েছে "ক্যাথিড্রাল"। সেখানে রাখা আছে একটি অর্গান, তাতে একটু ঝংকার তুললেই গমগম করে এক অপূর্ব রাগিণীর সৃষ্টি হয়।

খানিকটা ঘুরতে-ঘুরতে শরীরে রোমাঞ্চ লাগে। মনে হয়, আমরা যেন দেবতাদের গোপন আস্তানায় হঠাৎ এসে হাজির হয়েছি। এখানে জোরে কথা বলতে ইচ্ছে করে না, মনে হয়, তা হলে এর পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যাবে।

মাঝে-মাঝে কাকচক্ষু জল জমে আছে। তার মধ্যে পড়ে আছে প্রচুর পয়সা। এদেশের লোকরা পবিত্র জল দেখলে মানত করে পয়সা দেয়, আমাদের দেশে যেরকম লোকে গঙ্গায় পয়সা ছুড়ে দেয়। এক-এক জায়গায় দেখলুম, খুচরো পয়সায় প্রায় দশ বারো-হাজার টাকা হবে। নীচু হয়ে হাত বাড়ালেই সে পয়সা তুলে আনা যায়। কিন্তু কেউ নেয় না। আমাদের মহিলা গাইডটি বললেন, বছরের শেষে এরকম প্রায় সত্তর-আশি হাজার ডলার পাওয়া যায়, সে টাকা দিয়ে দেওয়া হয় কোনও অনাথ আশ্রমকে।

যদিও একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান প্রথমে এই গুহাটি "আবিষ্কার" করে এবং এখন তারাই এটা পরিচালনা করছে, তবু এই বিস্ময়কর গুহাটির অস্তিত্ব জানা ছিল রেড ইন্ডিয়ানদের। এর মধ্যে একটি রেড ইন্ডিয়ান কিশোরের কঙ্কাল পাওয়া গেছে। দূর অতীতে কোনও একদিন সে এই গুহায় ঢুকে পথ হারিয়ে ফেলেছিল।

আর একটি জায়গায় পাওয়া গেছে কিছু পোড়া কাঠকয়লা ও জন্তুর হাড়। সম্ভবত রেড ইন্ডিয়ানদের একটি ছোট দল এখানে লুকিয়ে ছিল এক সময় তারা রান্নাবান্না করে খেয়েছে।

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের লোকেরা দৈবাৎ দেখতে পায় যে এক জায়গায় মাটি ফুঁড়ে ঠান্ডা হাওয়া বেরুচ্ছে। তখন জায়গাটি অনেকখানি খুঁড়ে ফেলে তারা দেখতে পায় তাদের স্বপ্নের অতীত এক বিশাল প্রাকৃতিক রাজপ্রাসাদ। এখানকার বাতাস এতই ঠান্ডা যে সেই বাতাস নিয়ে সে যুগে প্রথম এয়ার কন্ডিশানিং ব্যবস্থা চালাবার চেষ্টা হয়েছিল।

এখনও লুরে ক্যাভার্নের পরিচালনা সেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হাতেই এবং তারা লাভও করে নিশ্চয়ই। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তারা এই অতল গুহায় কোনও রেস্তোরাঁ বসায়নি। বিরাট চিৎকারের গানবাজনার ব্যবস্থা করেনি এবং প্রকৃতির ওপর খোদকারি করে আরও সুন্দর করবার চেষ্টা করেনি। তারা পুরো জায়গাটিকে নিখুঁত অবিকল রাখার ব্যবস্থা করেছে।

আমাদের দেশে এরকম সুবৃহৎ কিংবা অপূর্ব সৌন্দর্যময় গুহা কোথাও আছে কি না আমি জানি না। হয়তো এখনও সেরকম আবিষ্কৃত হয়নি। তবে ছোট আকারের যেগুলি আছে, সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থার কথা ভাবলেই হৃৎকম্প হয়। মধ্যপ্রদেশের পাঁচমারিতে আমি এর থেকে অনেক ছোট হলেও একটা চমৎকার গুহা দেখেছিলুম। আমাদের দেশের যে-কোনও প্রাকৃতিক বিস্ময়কর জায়গাতেই তো একটা মন্দির বানিয়ে তোলা হবেই। আর মন্দির মানেই নোংরা আবর্জনা, দুর্গন্ধ। ওই পাঁচমারিতেই এক জায়গায় পাথরের বুকে রোদবৃষ্টি বাতাসের ভাস্কর্যে একটি মহাদেবের ছবির আদল ফুটে উঠেছিল। এরকম একটা জিনিসকে যেমন আছে ঠিক তেমনটি রাখলেই যে সৌন্দর্য খোলে, সেটা অনেকেই বোঝে না। সেই মহাদেব মূর্তিটির গায়ে বিকট হলুদ আর নীল রং বুলিয়ে দিয়েছে কেউ, মাথায় আবার একটা সাপ এঁকে দিয়েছে। ফলে, সেটার দিকে আর তাকানোই যায় না।

লুরে ক্যাভার্নের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরলেও ক্লান্তি লাগে না। গাইডের কাছ ছাড়া হয়ে পথ হারিয়ে ফেললে খুবই বিপদের সম্ভাবনা। এক-একবার আমার লোভ হচ্ছিল অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে যাই। তারপর বহুকাল পরে সেই রেড ইন্ডিয়ান কিশোরটির মতন এই ভারতীয়টির হাড়গোড় অন্যরা খুঁজে পাবে।

তা অবশ্য হল না, ওপরে উঠে এলুম যথা সময়ে।

বাড়ি ফিরলুম ঘোর সন্ধের পর। একটু পরেই টেলিফোন বেজে উঠল। রমেন দা ধরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমায় ডাকছে।

আবার বিস্ময়। টেলিফোন করছে কামাল। নিউ ইয়র্কের কাছে স্কারসডেলে ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল একদিন। কামালের জানার কথা নয় যে আমি এখানে এসেছি। এসে কার বাড়িতে উঠেছি তা তো কেউ জানে না। তবু কোন মন্ত্রবলে কামাল ঠিক এখানে টেলিফোন করেছে।

কামাল বলল, একি, তুমি নিউ ইয়র্ক থেকে বস্টনে না এসেই ওয়াশিংটন ডি সি-তে চলে গেলে যে? ওটা তো উলটো দিকে? না, না, ওসব চলবে না। শিগগির বস্টনে চলে এসো। কালই—।

।। ৩৬ ।।

একটা আশি-নব্বই বছরের অট্টালিকা ইওরোপের মানদণ্ডে এই তো সেদিনকার, আর মার্কিন দেশের

বিচারে রীতিমতন প্রাচীন। অনেক হাইওয়ের পাশে পাশে নির্দেশ থাকে, কাছেই একটা ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য স্থান, দেখবার জন্য এখানে থামুন। কয়েকবার থেমে বেশ ঠকেছি। এইখানে সত্তর বছর আগে প্রথম ঘোড়ার গাড়ি ও মোটর গাড়ির রেস হয়েছিল, কিংবা 'নব্বই বছর আগে এইখানে অমুক চন্দ্র অমুক প্রথম ঘুড়িতে চেপে শূন্যে উঠেছিল', এইরকম। আমরা পাঁচ-সাতশো বছরের কম কিছু হলে তাকে ঠিক ইতিহাস বলে মানতে চাই না। কিন্তু অত বছর আগে আমেরিকান নামে কোনও জাতই ছিল না পৃথিবীতে।

এ দেশের তুলনায় বস্টন বেশ বনেদি শহর। এখানেই রয়েছে এ দেশের শ্রেষ্ঠ দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হার্ভার্ড এবং এম আই টি। দু-একটি পাড়া দেখলে চমকে উঠতে হয়। মনে হয় মার্কিন দেশ তো নয়, হঠাৎ যেন লন্ডনে চলে এসেছি। বাড়িগুলির শ্রী-ছাদ একেবারে ব্রিটিশ ধরনের। আমেরিকার নতুন শহর মানেই অতি ঝকঝকে চকচকে ঢাউস-ঢাউস সড়কে ভরতি। কিন্তু বস্টনে এখনও কিছু সরু-সরু রাস্তা আছে, কলেজ-পাড়ায় সেরকম কোনও রাস্তায় গেলে আমাদের মনে পড়তে পারে কলকাতার কলেজ স্ট্রিটের কথা। মানুষের অভ্যেসই হল নতুন অভিজ্ঞতার সঙ্গে পুরোনোকে মিলিয়ে দেখা। এক-একজন মহিলা থাকেন যাঁরা কোনও নতুন লোক দেখলেই বলেন, একে ঠিক ছোট বউদির ভাইয়ের মতন দেখতে না? কিংবা, আমাদের পাড়ার দর্জির মতন, কিংবা সঞ্জয় গান্ধির মতন, কিংবা উত্তমকুমারের ছোট ভাইয়ের মতন।

হয়তো বস্টনের কলেজ পাড়ার সেই রাস্তার সঙ্গে কলকাতার কলেজ স্ট্রিটের কোনও মিল অ-কলকাতাবাসী কারুর চোখে পড়বে না। কিন্তু আমরা মিল খুঁজে পাই। মনে হয় যেন ছাত্র-ছাত্রীদের স্বভাবও একইরকম।

বাস স্টেশন থেকে কামাল নিয়ে এল তার বাড়িতে। সেখানে এসে পেয়ে গেলুম চমৎকার এক আড্ডার পরিবেশ। ব্যবসায়ী কথাটার সঙ্গে বোহেমিয়ান চরিত্রটি কিছুতেই মেলানো যায় না। কিন্তু কামালকে বলা যায় সত্যিকারের বোহেমিয়ান ব্যবসায়ী। তার পায়ের তলায় সর্ষে, সে প্রায়ই সারা দুনিয়া টোটো করে ঘুরে বেড়ায়, তার মুখে সব সময় নানারকম ব্যবসার পরিকল্পনা, কিন্তু আসলে সে রয়েছে একটা স্বপ্নের জগতে।

কামালের সঙ্গে থাকে তার ভাগ্নে খুসনুদ। এই খুসনুদ কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্সের ছাত্র, এখন এখানে পড়াশুনো করতে এসেছে, তার মুখে এখনও লেগে আছে কৈশোরের শ্রী। এক-একটা মুখ থাকে, যা প্রথম দেখলেই খুব ভালো লেগে যায়। খুস্‌নুদের মুখখানা সেই ধরনের। সবসময় একটা দুষ্টু দষ্টু হাসি লেগে আছে ঠোঁটে। পড়াশুনোতে সে খুবই ভালো আবার হাসিমুখে সে যে কত রকম কাজ করতে পারে তার ঠিক নেই। এই চা বানাচ্ছে সকলের জন্য, কিংবা ডিম সেদ্ধ করে ফেলল ডজনখানেক, আবার ধাঁ-করে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে মাখন কিংবা চাল কিনে আনতে।

এই খুস্‌নুদের মাকে আমি কলকাতায় দেখেছি। কোনও-কোনও মানুষকে সময় স্পর্শ করতে ভয় পায়। ওর রয়েছে সেই রকম স্থির লাবণ্য।

বসবার ঘরে বসে আছেন সলিল চৌধুরী। নিউ ইয়র্কের বাঙালিদের অনুষ্ঠানে তাঁকে ক্ষণেকের তরে দেখেছিলুম। এখানে তাঁকে খুব কাছাকাছি দেখার সৌভাগ্য অর্জন করলুম। একটি দক্ষিণ ভারতীয় তরুণীও রয়েছে সেখানে, সে সেতার বাজায়। আধুনিক সঙ্গীত জগতে সলিল চৌধুরী যে কত বড় প্রতিভা এ মেয়েটি বোধহয় তা ঠিক জানে না, তাই সে অকুতোভয়ে ওঁর সঙ্গে তর্কে মেতে উঠেছে। তরুণীটি শুধু বিশুদ্ধ রাগ সঙ্গীতের অনুরাগিনী। তর্কের বিষয়বস্তু হল, সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা। তরুণীটির বক্তব্য, বিশুদ্ধ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সকলের জন্য নয়, ইনিসিয়েটেড বা অনুপ্রাণিতদের জন্য। প্রকৃত সমঝদার ছাড়া এই সঙ্গীতের বিশুদ্ধতা রক্ষা পাবে না। আর সলিল চৌধুরী বলতে লাগলেন, সমস্ত মানুষ, সাধারণ গরিব-দুঃখী মানুষের কাছেও সঙ্গীতকে পৌঁছতে হবে। অন্তত পৌঁছবার চেষ্টা করতে হবে।

এ তর্কের কোনও মীমাংসা নেই, তাই আমি চুপ করে বসে-বসে শুনতে লাগলুম। অবশ্য তর্কযুদ্ধ

তো নয়, নিজের নিজের মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা. তাই ওঁদের দুজনেরই যুক্তিগুলো শুনতে বেশ লাগছিল।

প্রথম দিনের আড্ডা শেষ হল প্রায় রাত দুটোয়। পরের দিন দুপুর থেকেই একটা পিকনিকের আবহাওয়া শুরু হয়ে গেল। বাইরে অবিশ্রান্ত বরফ পড়ছে। ঠিক আমাদের দিনে খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা খুব জমে। তারই কাছাকাছি কিছু একটা বিকল্প রান্না হবে, এক-এক জন এক-একটা রান্না করবে। অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্টের ইংরেজি প্রবাদ হল অধিক পাচকে তরকারি নষ্ট। সুতরাং আমি রান্না টান্নার ব্যাপার থেকে দূরে রইলুম।

আস্তে আস্তে চড়ুইভাতির দলটাও বেশ বড় হল। খুস্‌নুদ ডেকে আনল তার বন্ধুদের। এসেছে সলিল চৌধুরীর ছেলে বাবুন। এই সপ্রতিভ যুবকটি নিউ ইয়র্ক সাউন্ড রেকর্ডিং-এর ব্যাপারে পড়াশুনো করছে, এখন বোস্টনে এসেছে বেড়াতে। ডেকে আনা হল শর্মিলা বসুকে। নেতাজি পরিবারের মেয়ে শর্মিলা শরৎ বোসের পৌত্রী, যেমন রূপসি, তেমন বিদূষী আবার তেমনই ভালো রবীন্দ্র সঙ্গীত গায়। খুব ঠান্ডা স্বরে আস্তে-আস্তে কথা বলে শর্মিলা, কিন্তু কুটুস-কুটুস করে মাঝে-মাঝে বেশ মজার মন্তব্যও করে।

শর্মিলা আলাদা অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে থাকে, সে জন্য প্রায়ই তাকে নিজের রান্না করতে হয়। সেই জন্য সেও পিকনিকের রান্নার ঝামেলায় গেল না। সে আলাদা বসে টিভি খুলে একটা মহাজাগতিক বিষয়ের অনুষ্ঠান দেখতে লাগল খুব মন দিয়ে। একটু বাদেই সে নিজেও নিমগ্ন হয়ে গেল মহাকাশে।

কামালের বাড়িতে ঘরের সংখ্যা অনেক, কিন্তু একটিমাত্র ঘরেই তিনখানা টিভি। এর কারণ শুধু কামালই জানে।

আর একটি মেয়ের নাম মহুয়া মুখার্জি। এর মুখে বাংলা শুনলে যেন কেমন-কেমন লাগে। মনে হয় যেন লক্ষ্ণৌ কিংবা দেরাদুনের প্রবাসী বাঙালি পরিবারের মেয়ে। তা কিন্তু নয়। মহুয়া প্রায় জন্ম থেকেই আছে ভারতবর্ষের বাইরে, বাবা-মায়ের সঙ্গে কাটিয়েছে, বিভিন্ন দেশের ভারতীয় দূতাবাসে. এখনও ওর বাবা-মা রয়েছেন ভিয়েনায়, ইন্দ্রাণী এখানে এসেছে পড়াশুনো সমাপ্ত করতে।

অনেক দেশ ঘোরার জন্য অনেকগুলো ভাষা শিখেছে মহুয়া। কলকাতার সঙ্গে তার যোগাযোগ ক্ষীণ হওয়া সত্ত্বেও সে বাংলা শিখেছে নিজের চেষ্টায়। সে একটু সচেতন উচ্চারণে পরিষ্কার বাংলা বলে। আমি তাকে জিগ্যেস করলুম! তুমি কেন বাংলা শিখলে, মহুয়া?

সে অবাক হয়ে উত্তর দিল, বাঃ, বাংলা না শিখলে এরকম একটা সুন্দর ভাষা থেকে বঞ্চিত থাকতুম যে।

সত্যি কথা বলতে কী, মহুয়ার মতন একটি সরল, তেজস্বিনী মেয়ের সঙ্গে আগাগোড়া ইংরেজিতে কথা বলতে হলে আমি বেশ দুঃখিতই হতুম।

আরও এলেন একটি বাঙালি দম্পতি এবং আর কয়েকজন, কিন্তু সকলের সঙ্গে আর সেরকম আলাপ পরিচয়ের সুযোগ হল না।

সদা ব্যস্ত কামালকে মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছি, আবার হঠাৎ-হঠাৎ সে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে! তার কত কাজ। এরই মধ্যে অন্তত পঞ্চাশ জায়গায় তাকে দেখা করতে যেতে হবে, এবং প্রত্যেক জায়গাতেই সে ঠিক সময়ে ঘুরে আসে। দক্ষিণ ভারতীয় মেয়েটি আজই চলে যাবে। তাকে পৌঁছে দিয়ে আসে এয়ারপোর্টে, আবার আমাদের আড্ডাতেও তাকে দু-পাঁচ মিনিটের জন্য বসতে হবে কিংবা রান্নার সাহায্যের জন্য কুচিয়ে দিতে হবে পেঁয়াজ। আবার আমাদের নিয়ে সে শহরটা দেখিয়ে আনতে চায়। রাস্তার ধারের কোনও দোকানে বসে কফি খাওয়াও দরকার। এত সব কাজকর্ম নিয়ে কামাল যেন প্রত্যেক দিনের চব্বিশ ঘন্টাকে টেনে আটচল্লিশ ঘণ্টা লম্বা করে ফেলে।

মামা ভাগ্নের সংসারটি খুস্‌নুদই চালায় বোঝা গেল। স্বপ্ন-পাগল মামাটিকে খানিকটা সামলে রাখার দায়িত্বও তার। এদের সংসারটি খুব মজার। ব্রেকফাস্ট খেতে বসে মনে পড়ে নুন নেই, তখনি একজন গাড়ি নিযে ছুটে যায় নুন কিনতে। মাছ ভাজার জন্য উনুনে প্যান চাপাবার পর দেখা যায়

তেলের শিশি শূন্য। আবার একজন ছুটল দোকানে। কিন্তু বাড়ির যত লোকই আসুক, সকলেই সুস্বাগতম, সকলকেই বলা হবে, আরে, বসো-বসো। এখানে খেয়ে যাও আজ!

বাঙালির আড্ডা মানে জায়গা ছেড়ে নড়া নেই। রান্না ঘরেই আমরা যে-যার এক-একটি চেয়ার নিয়ে বসে গেছি। কামালই এক সময় আমাদের জোর করে তুলল। শহরটা এক চক্কর ঘুরিয়ে দেখাবে।

তার স্টেশন ওয়াগানটিই তার দ্বিতীয় সংসার। এতে থাকে তার জামাকাপড়, সংক্ষিপ্ত বিছানা, কাগজ-টাগজ আর ব্যাবসার জিনিসপত্র। এটা নিয়ে সে প্রায় অর্ধেক আমেরিকা চষে বেড়ায়। সেই সব জিনিস টিনিস টেনে নামিয়ে সে আমাদের জন্য জায়গা করে দিল। তারপর হুস করে ছেড়ে দিল গাড়ি।

কামালকে গাইড হিসেবে নিলে দুমিনিটে তাজমহলে দেখা হয়ে যায়, এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং দেখতে লাগবে এক মিনিট, গ্র্যান্ড কেনিয়ান দেখা হয়ে যাবে তিন মিনিটে. আর মাউন্ট এভারেস্ট ঘুরে আসতে বড়জোর পাঁচ মিনিট লাগতে পারে।

চলন্ত গাড়ি থেকেই সে বলতে লাগল, ওই স্যাখো এম আই টি, ওই যে হার্ভার্ড আর এটা কী যেন, খুব বিখ্যাত জায়গা এখন নাম মনে পড়ছে না, আর ওইটা হল—।

সলিল চৌধুরীই এক সময় বললেন, ওহে মুস্তাফা, এবারে একটু থামাও তো। কোথাও একটু চুপ করে দাঁড়াই।

গাড়ি চলছিল একটা.পার্কের পাশ দিয়ে, সেখানেই ব্রেক কষে কামাল বলল, এই পার্কে যাবেন?

নামা হল সেখানেই। প্রায় সন্ধে হয়ে এসেছে, বরফ পড়া বন্ধ হয়ে দারুণ ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। সেই জন্য পার্কটি এখন জনবিরল।

সেই পার্কে পা দিয়েই আমার মনে পড়ল ভের্লেনের কবিতাঃ 'শীতের নির্জন পার্ক, চতুর্দিকে ছড়ানো তুষার/দুটি ছায়ামূর্তি এইমাত্র হল পার।' সত্যিই বরফ ছড়িয়ে আছে এখানে-সেখানে। পার্কের মাঝখানের হ্রদটির জলও প্রায় অর্ধেকটা জমে শক্ত হয়ে গেছে। শনশনে হাওয়া লেগে কাঁদছে উইলো গাছগুলো। নিষ্পত্র চেরিগাছগুলোর ডালে এমন থোকা-থোকা বরফ জমে শক্ত হয়ে গেছে। শনশনে হাওয়া লেগে কাঁদছে উইলো গাছগুলো। নিষ্পত্র চেরিগাছগুলোর ডালে এমন থোকা-থোকা বরফ জমে আছে যে ঠিক মনে হয় ফুল।

হঠাৎ আমার খেয়াল হল, আমরা সবাই গরম জামাকাপড় পরে এসেছি। কিন্তু কামালের গায়ে শুধু একটা জামা। আমি ওভারকোট আনতে ভুলে গেছি। পরে আছি অন্য একটা জ্যাকেট, তাতেই আমার শীত লাগছে। আস্তে আস্তে কাঁপুনি দিচ্ছে শরীরে। আর কামাল শুধু একটা জামা পরে দাঁড়িয়ে আছে কী করে?

আমি জিগ্যেস করলুম, কী ব্যাপার, তুমি কোট-ফোট আনোনি?

বুকের ওপর দুহাত আড়াআড়ি রেখে কামাল বলল, ঠিক আছে। আমার অত শীত লাগে না।

আমার এরকম অবস্থা হলে আমি দৌড়ে গিয়ে গাড়িতে উঠতুম। কারণ গাড়ির ভেতরটা গরম। কিন্তু কামাল সত্যি দাঁড়িয়ে রইল। ক্যামেরা বার করে ছবি তুলতে লাগল অনেকে, তখনও কামাল শীতে কাঁপছে না।

আমাদেরই গরজে আমরা ফিরে এলুম গাড়ির উষ্ণতায়। এবার প্রস্তাব উঠল, গরম কফি খাওয়ার।

সলিল চৌধুরী বললেন, তার সঙ্গে যদি গরম গরম পেঁয়াজি কিংবা ফুলুরি পাওয়া যেত, তা হলে আরও ভালো হত।

কামাল বলল, চলুন, সেরকম জিনিসই খাওয়াব।

শহর ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা দূরে একটা নিরিবিলি দোকানের সামনে গাড়ি থামাল কামাল। পরিষ্কার, ঝকঝকে বেশ বড় দোকান, কিন্তু এখন প্রায় ফাঁকা। কাউন্টারে একজন মহিলা। খাদ্যতালিকা দেখে কোনটা যে কী তা আমরা ঠিক বুঝতে পারি না, কিন্তু খুসনুদ সব জানে। সে অর্ডার দিয়ে দিল

চটপট। কামাল গাড়ি পার্ক করে এল একটু পরে। তার মধ্যেই অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে দেখে সে নিজে আবার একটা কিছু যোগ করে দিল।

ছোট্ট-ছোট্ট বেতের ঝুড়িতে এল পকৌড়ার মতন একটা কিছু। বেশ সুস্বাদু। তারপর চিংড়ি মাছ ভাজা। কফির স্বাদও উত্তম। গল্প জমে গেল আমাদের।

এক সময় দেখি টেবিলের ওপরে কতকগুলো ছাপানো কাগজ পড়ে আছে। এই দোকানের পরিচারিকাদের ব্যবহারের কিংবা খাদ্যের গুণাগুণ কিংবা অন্য কোন বিষয়ে যদি খদ্দেরদের কোনও অভিযোগ থাকে, তবে তা জানাবার জন্যই এই ফর্ম। খাদ্য বিষয়ে আমাদের কোনও অভিযোগ নেই, কিন্তু আমরা সকলেই একমত হলুম যে এই দোকানটির বাইরের চাকচিক্যের তুলনায় বাথরুমটি বেশ নোংরা। আমেরিকানদের পরিচ্ছন্নতার বাতিক আছে তারা বাথরুম-সজাগ এবং জলের ব্যবহারে অকৃপণ। সুতরাং এরকম অপরিচ্ছন্ন বাথরুম সত্যিই ব্যতিক্রম। অভিযোগ জানাবার সুযোগ পেলেই কিছুটা লিখে দিতে ইচ্ছে করে। তাই সেই ছাপানো ফর্মে আমরা বাথরুম বিষয়ে খুব কড়া করে লিখলুম।

তারপর সবাই মিলে উঠে যখন বেরিয়ে যাচ্ছি তখন কাউন্টারের মহিলাটি এমন মিষ্টি করে হাসল যে আমার মাথা ঘুরে গেল। বিনা পয়সায় এমন মিষ্টি হাসি কজন দেয়? অন্যরা বেরিয়ে যাচ্ছে, আমি থমকে দাঁড়িয়ে বললুম, আমি আসছি।

টেবিলের কাছে ফিরে গিয়ে সেই অভিযোগ পত্রটি তুলে নিয়ে ছিঁড়ে ফেললুম। জীবনে আর কোনও দিন আমি এই রেস্তোরাঁয় হয়তো আসব না; শুধু-শুধু এরকম একটা বাজে অভিযোগ লিখে যাওয়ার কোনও মানে হয় না।

বেরুবার সময় মেয়েটি আর একবার সেই রকম হাসি দিয়ে ধন্য করে দিল আমাকে। ইস্ট কোস্টের মেয়েদের হাসির খ্যাতি আমি ওয়েস্ট কোস্টেই শুনে এসেছিলুম, এই প্রথম তার চাক্ষুষ প্রমাণ পেলুম।

।। ৩৭ ।।

এবারে একটা ক্যামেরা না কিনলেই নয়। এত জায়গায় ঘোরাঘুরি করছি, এসব ছবিতে ধরে রাখলে পরে সে সব ছবির দিকে তাকিয়ে বেশ দীর্ঘশ্বাস ফেলা যাবে। সকলেই সে রকম করে। যেকোনও বিখ্যাত জায়গাতে গেলেই দেখি অন্য সবাই ক্যামেরা বার করে ঝিলিক মারতে শুরু করেছে। আমার ক্যামেরা নেই, তাই একটু বোকাবোকা লাগে। শুধু তাই নয়, অন্য কারুর ক্যামেরার ফোকাসের মধ্যে ঘোরাফেরা করছি কি না, সে ভেবেও সন্ত্রস্ত থাকতে হয়। আমার মতন এলেবেলে লোকের ছবি অন্য কেউ তুলবেই বা কেন।

আমি অনেক পাহাড়ে-জঙ্গলে গেছি বটে, কিন্তু বন্দুক পিস্তল বা ক্যামেরা কখনও ব্যবহার করিনি। সঙ্গে অতিরিক্ত কোনও জিনিসপত্র রাখার অভ্যেসই আমার নেই।

বেশ ছেলেবেলায় আমার বন্ধু আশু আমায় একবার ছবি তোলার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিল। তার ছিল ক্যামেরার নেশা, তার নিজেরও ছিল বেশ দামি-দামি কয়েকটা ক্যামেরা। আমাকে হাত পাকাবার জন্য সে একটা বক্স ক্যামেরা দিয়েছিল। আমি তা দিয়ে মনুমেন্ট, ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল, দক্ষিণেশ্বরের মন্দির ইত্যাদি তুলেছিলাম সারা দিন ঘুরে. পরে দেখা গেল, বারো খানা ফিল্মের একটাও ওঠেনি। এটা নাকি ব্যর্থতার একটা বিশ্ব রেকর্ড। একেবারে নভিসরাও বক্স ক্যামেরায় বারো খানার মধ্যে ছ'খানা তুলতে পারে। সেই থেকে আমি আর ক্যামেরায় হাত দিইনি।

কিন্তু বিদেশে ঘোরাঘুরির সময় একটা ক্যামেরার অভাব খুবই বোধ করতে লাগলুম। মাস তিনেক ধরে দোনামনা করার পর একদিন ভাবলুম, নাঃ, এবারে একটা কিনতেই হয়।

ছবি তোলার ব্যাপারটা আজকাল অনেক সহজ হয়ে এসেছে। অ্যাপারচার, ফোকাস ঠিক করা,

আলো মাপামাপির দরকার হয় না। কিংবা হয়তো এখনও দরকার হয়, কিন্তু আন্তর্জাতিক ফটোগ্রাফি প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার পাওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তো আমার নেই, কোনও রকম কাজ চালানো ছবি তোলার জন্য অনেক সহজ ক্যামেরা বেরিয়েছে।

সবচেয়ে সহজ হচ্ছে পোলারয়েড ক্যামেরা। চোখের সামনে ক্যামেরাটি ধরে শাটার টেপো, আর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসবে ছবি, একেবারে হাতে গরম। দোকানে যাওয়ার ঝঞ্ঝাটও নেই। কিন্তু এ ক্যামেরা এদেশে একেবারে বাচ্চারা ব্যবহার করে। জয়তীদি-দীপকদার ছ'বছরের মেয়ে ছুটকি এই ক্যামেরায় পটাপট ছবি তুলত। সুতরাং রাস্তায়-ঘাটে ওই রকম ক্যামেরা আমার হাতে দেখলে লোকে হাসবে।

সস্তায় আরও নানা ধরনের ইনস্টোম্যাটিক ক্যামেরা পাওয়া যায়, যাতে ছবি তোলা খুবই অনায়াসের ব্যাপার, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে সে রকম ক্যামেরা দেশে নিয়ে গেলে একেবারে অকেজো হয়ে যাবে। ওদের ফিলম্ বা ব্যাটারি আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। আজকাল অধিকাংশ ক্যামেরাতেই নানা রকম ব্যাটারির কারসাজি থাকে।

বিখ্যাত দামি যেসব ক্যামেরার নাম শুনলে আমাদের দেশের অনেক শৌখিন ফটোগ্রাফারের চোখ চকচক করে ওঠে, সেরকম কোনও ক্যামেরা কেনার সাধ্যও আমার নেই, ইচ্ছেও নেই। এখনকার পরিচিতরা আমায় পরামর্শ দিয়েছিল, মাঝারি দামের মধ্যে মজবুত ক্যামেরা যদি কিনতে চাও, তা হলে ইন্ডিয়ান দোকান থেকে কিনো। কারণ, ওরা বলতে পারবে, কোন ক্যামেরার ফিলম্ বা ব্যাটারি দেশে পাওয়া যাবে, দরকার হলে মেরামতও করা যাবে।

গিয়েছিলুম নিউ ইয়র্কের সেরকম একাধিক দোকানে। এদেশের "ইন্ডিয়ান" দোকানগুলির প্রায় অধিকাংশেরই মালিক পাকিস্তানি। এত দূর দেশে ভারতীয় ও পাকিস্তানিরা অনেক ব্যাপারেই একরকম। সবাই যে ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ, সেই একাত্মতা এখানে এলে ভালো করে বোঝা যায়।

কিন্তু ওই সব "ইন্ডিয়ান" দোকানে মাঝারি বলেই যে-সব ক্যামেরা আমাকে দেখিয়েছে, তার দাম আমার পকেটের সাধ্যের বাইরে। পারলে হয়তো আমি অতি সস্তায় কোনও সেকেন্ডহ্যান্ড ক্যামেরাই কিনে ফেলতুম, কিন্তু যেহেতু ওভারকোট আর ক্যামেরা এক নয়, তাই ঠিক ভরসা হয় না তবে, ওয়াশিংটনে থাকবার সময় একটা ক্যামেরার দোকানে অবিশ্বাস্য রকমের রিডাকশান সেল-এর বিজ্ঞাপন দেখে ঢুকে পড়েছিলুম। কোনও জিনিস দোকানে বেশি দিন জমে গেলেই এরা এরকম করে। সুতরাং রমেনদার কাছ থেকে নৈতিক সমর্থন নিয়ে নতুনের প্রায় অর্ধেক দামে কিনে ফেললুম একখানা ক্যামেরা। অলিমপাস টু। ছোট্টখাট্টো স্মার্ট চেহারা, কলকবজায় বিশেষ ঝামেলা নেই, এমনকী ভুল-প্রতিষেধক কয়েকটি ব্যবস্থাও আছে। দোকানদারের কাছ থেকেই শিখে নিলুম নিয়মকানুন। সেই সঙ্গে পেলুম আরও অনেক ছাপানো কাগজপত্র, যা পড়লে প্রচুর জ্ঞানলাভ হয়। মোদ্দা কথা, এ ক্যামেরায় অন্ধও ছবি তুলতে পারে।

পৃথিবীর ঠিক উলটো দিকে বলেই এ দেশে অনেক ব্যাপারও উলটো। আমাদের দেশে কালো সাদা ছবিরই চল এখনও বেশি, রঙিন ছবির ফিল্‌মের দামও বেশি আর পরিস্ফুটন ও ছাপানোতেও অনেক ঝকমারি। আর এ দেশে সাদা-কালো ফিল্‌ম অতি দুর্লভ, যদি বা পাওয়াও যায়, তার ডেভেলপিং প্রিন্টিং-এর খরচ রঙিনের চেয়ে অনেক বেশি, অনেক জায়গায় সাদা কালো ছবি ফোটানো ও ছাপানোর ব্যবস্থাই নেই। সুতরাং আমি ভরে নিলুম রঙিন ফিল্‌ম।

একটা ক্যামেরা হাতে থাকার সুবিধে এই যে রাস্তায় ঘাটে যখন তখন এক চোখ টেপা যায়। ভদ্রসমাজে এক চোখ টেপার অধিকার শুধু ফটোগ্রাফারদেরই আছে। তাছাড়া এক গাদা লোকের সামনে হঠাৎ ঝপাং করে হাঁটু গেড়ে বসা যায়, কোনও বিখ্যাত দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়ে একটা ক্যামেরা খুলে অনায়াসেই কাছাকাছি লোকদের সরে দাঁড়াতে বলতে পারা যায়।

প্রথম দফায় অতি উৎসাহে বারোখানা ছবি তুলে ফেললুম মাত্র দুদিনে। নদীর ছবি, গাছের ছবি,

সূর্যাস্তের ছবি, পার্কে সুন্দরী মেয়েদের নাচের ছবি, অর্থাৎ যা-যা তুলতে হয় আর কি। এদেশে অনেক ক্যামেরার দোকানে একদিনের মধ্যেই, এমনকী এক ঘণ্টার মধ্যে নেগেটিভ ফোটানো ও ছাপানো হয়ে যায়। সেরকম এক দোকানে আমার রোলটি জমা দিয়ে এলুম।

পরদিন ছবি আনতে গিয়েই চমক। কাউন্টারে দাঁড়িয়ে এক ভাবুক ও দার্শনিক চেহারার যুবক। আমার রসিদ দেখাতেই সে অনেকগুলি খামের মধ্য থেকে আমার খামটি খুঁজে বার করে আনল। তারপর সেটি খুলে সে ছবিগুলো দেখতে লাগল গভীর মনোযোগ দিয়ে। ছবিগুলো সে দেখে আর এক একবার আমার মুখের দিকে তাকায়। আস্তে-আস্তে তার ললাটে ফুটে ওঠে বিস্ময় ও চিন্তার ঢেউ।

আমার বুক ধড়াস-ধড়াস করতে লাগল। ব্যাপার কী, এবারেও কি আমার একটাও ছবি ওঠেনি? জাপানের বিখ্যাত অলিমপাস টু ক্যামেরা দিয়েও কি এতখানি ব্যর্থতা সম্ভব? কিংবা, আমি এমনই ভালো ছবি তুলে ফেলেছি যে এই যুবকটি বিশ্বাসই করতে পারছে না।

ছেলেটি অস্ফুটভাবে বলল, স্ট্রেঞ্জ! ভেরি স্ট্রেঞ্জ!

আমি আবার ফাঁপরে পড়লুম। না হয় আমার ছবিগুলো খারাপ হয়েছে, কিংবা একটাও ওঠেনি, তাতে স্ট্রেঞ্জ বলার কী আছে?

আমি পকেটে হাত দিয়ে বললুম, কত দিতে হবে?

ছেলেটি বলল, তোমার ক্যামেরাটা একটু দেখতে পারি কি?

আমি ঝোলা থেকে ক্যামেরাটা বার করে দিলুম ওর হাতে। সে ক্যামেরাটা নেড়ে চেড়ে, ভেতরটা খুলে দেখে বলল, এটা তো ঠিকই আছে মনে হচ্ছে।

আমি এবারে বুক ঠুকে জিগ্যেস করলুম, আমার ছবিগুলো ঠিক নেই বুঝি?

সে খানিকটা ইতস্তত করে বলল না, মানে, ছবিগুলো ঠিকই আছে, কিন্তু রঙের ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না, তুমি বরং নিজেই দ্যাখো।

আমি খামটা টেনে নিয়ে ছবিগুলো ছড়িয়ে ফেললুম। অদ্ভুত ব্যাপার! অলৌকিক! আমার তোলা নদী, গাছ, সূর্যাস্ত, পার্কে মেয়েদের নাচ—সবই উঠেছে। সবাইকেই চেনা যায়, কিন্তু সকলেরই রং শুধু হলদে! গাছ-নদী-মেয়েরা তো বটেই, এমনকী সূর্যাস্ত পর্যন্ত হলুদ। আজকালকার রঙিন ছবিতে লাল-নীল-গোলাপি ইত্যাদি সব রংই ফোটে, আমার ছবি শুধু হলুদ কেন?

যুবকটির মুখের দিকে তাকাতেই সে বলল, আমি আগে কখনও এরকম দেখিনি। ঠিক বিশ্বাসই করতে পারছি না।

আমাদের দেশে ব্যাঙ্কের চেক ফেরত দেওয়ার সময় যেমন একটি ছাপানো কাগজ দেয়, অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটাতে টিক দেওয়া থাকে। এরাও ছবি ছাপানোর সঙ্গে দেয় সেই রকম একটা ছাপানো কাগজ, কিন্তু আমারটাতে কোনও ছাপানো কারণেই দাগ দেওয়া নেই, তলায় হাতে লেখা আছে। সম্ভবত রোলটা ক্যামেরায় ভরার সময় কিছু গণ্ডগোল হয়ে থাকবে। অর্থাৎ আমার ছবির খুঁতের আসল কারণটা এরা ধরতে পারেনি, ব্যাপারটা অভিনব।

ছেলেটি অপরাধীর মতন বলল, হয় সব রং আসবে, অথবা ছবিগুলো কালো হয়ে যাবে, কিন্তু শুধু হলদে রংটা কী করে এলে...

কিছুকাল আগে এটা স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ফিল্ম খুব হইচই তুলেছিল। ফিল্মটির নাম 'আই অ্যাম কিউরিয়াস—ইয়োলো'। টাইম সাপ্তাহিকে ছবিটির সমালোচনার হেডিং দেওয়া হয়েছিল, 'আই অ্যাম ফিউরিয়াস—রেড।' এই হলদে ছবিগুলো দেখে আমারও টাইম পত্রিকার সমালোচকের মতন মনের অবস্থা। পল গগ্যাঁ হলদে রঙের মেয়ে এঁকেছেন। কিন্তু ফটোতে শুধু হলদে রঙের মেয়ে যে এত খারাপ দেখায় তা আমি কি আগে জানতুম! হলদে রঙের গাছও অতি বিকট ব্যাপার।

আমি বললুম, ওসব আমি জানি না। তোমরা আবার ভালো করে প্রিন্ট করে দাও।

ছেলেটি বিনীতভাবে বলল, তোমার এই নেগেটিভে নতুন করে প্রিন্ট করলে আর ভালো করা যাবে না। তুমি বরং আর একটা রোল তুলে দিয়ে যাও, সেটা আমরা বিনা পয়সায় করে দেব।

কিন্তু ততদিনে সেই শহর ছেড়ে আমি চলে গেছি।

তা বলে আমি হতোদ্যম হয়ে ছবি তোলায় ইস্তফা দিলুম না, আবার নতুন রোল ভরে নিলুম ক্যামেরায়। আবার ছবি তুলতে লাগলুম ঝপাঝপ।

দ্বিতীয় রোলটি ডেভেলপ করতে দিলুম বস্টনে। এবারে আর কোনওরকম এদিক ওদিক নয়, সবক'টি ছবিই উঠেছে। সেটা আমার কৃতিত্ব না হোক, জাপানি ক্যামেরার কৃতিত্ব তো বটেই। লাল-নীল-সবুজ-হলদে সব রংগুলোও ঠিকঠাক। তবে ছবিগুলো একটু ঝাপসা-ঝাপসা, কিন্তু সে দোষ আমার নয়, সব সময় ঝিরিঝিরি বরফ পড়লে আমি কী করব? দোষটা আকাশের।

সুতরাং ছবি তোলার ব্যাপারে আমার বেশ একটা আত্মবিশ্বাস জন্মে গেল। এখন আমি মাটিতে শুয়ে কিংবা রেলিং-এর ওপরে দাঁড়িয়ে নতুন নতুন কায়দায় অস্থিরকে শাশ্বত করে রাখি। অন্ধকারেও পরোয়া নেই, ফ্ল্যাশ আছে। এমন স্পর্শকাতর শাটার যে একটু আঙুলের ছোঁয়া লাগতে না লাগতেই সেটা পড়ে যায়। ফলে আমার বুট জুতোর ছবি, আমার বাঁ-হাতের তিনটি আঙুলের ছবি, গাড়ির চাকার অর্ধেকটার ছবি, এমনকী নিছক শূন্যতার ছবিও উঠে গেল বেশ কয়েকটা। এ হল নিউ ওয়েভ ফটোগ্রাফি! কোনও বিখ্যাত ফটোগ্রাফার শুধু একজোড়া বুট জুতোর ছবি তোলার কথা কখনও স্বপ্নেও ভেবেছে? ভ্যান গঘ্ সেই কবে বুট জুতোর ছবি এঁকেছিলেন, তারপর এতদিন পরে আমি সেরকম ছবি ক্যামেরায় তুললুম।

বস্টন থেকে আবার ফিরে এসেছি নিউ ইয়র্কে। গত মাসের নিউ ইয়র্ক ছিল শুধু আমার নিজের চোখে দেখা, এবারে ক্যামেরার চোখে। আগেরবারে আমি ছিলুম স্বাধীন, যখন যেখানে খুশি গেছি। এবারে আমার মধ্যে একটু বেশ ট্যুরিস্টের মতন ভাব এসেছে, অবশ্য-দ্রষ্টব্য স্থানগুলো আর না দেখলেই নয়।

যেমন এর আগে যতবার নিউ ইয়র্কে এসেছি, কোনওবারই স্ট্যাচু অব লিবার্টি দেখা হয়নি। ওই মর্মর মহিলাটিকে দূর থেকেই স্তুতি জানিয়েছি। কিন্তু এবারে মনে হল, ওর কাছে গিয়ে আমার নিজের হাতে ছবি তোলা অবশ্য কর্তব্য।

কাছাকাছি যাওয়ার ঝামেলা আছে। হাডসন নদীর ওপর একটা ছোট দ্বীপে আছে ওই বিশ্ববিখ্যাত মূর্তিটি। ম্যানহাটানের হৃৎপিণ্ডের কাছে একটা পার্ক, সেখান থেকেও দূরবিনে দেখা যায়, অথবা ফেরি স্টিমারে কাছাকাছি যাওয়া যায়। আমি এসে পড়েছি রবিবারে, ফেরির জন্য লম্বা লাইন। কিছুক্ষণ একটা বেঞ্চে বসে রইলুম। একবার গেলুম একটা দোকানে কফি-হ্যামবার্গার খেয়ে আসতে, তখনও লাইন খুব বড়। অত বড় লাইনে দাঁড়াবার ধৈর্য আমার নেই। এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছি।

হঠাৎ খেয়াল হল, ক্যামেরা? যাঃ! সেটা তো নেই। এর মধ্যে কোথায় যেন ফেলে এসেছি। কোথায়? যে-বেঞ্চটায় বসেছিলুম একটু আগে, সেখানে নিশ্চয়ই। দৌড়োতে-দৌড়তে গেলুম সেদিকে।

কাছাকাছি গিয়েই একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল। যাক, পাওয়া গেছে। এক জোড়া তরুণ দম্পতি দাঁড়িয়ে আছে, স্বামীটির হাতে আমার ক্যামেরা, তার স্ত্রী নদীর দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে পোজ দিয়ে আছে। তা তুলছে তুলুক না। আমি ঠিকানা জেনে নিয়ে পরে ওদের ছবির কপি পাঠিয়ে দেব।

ওরা দু-তিনখানা ছবি তোলার পর আমি কাছ ঘেঁসে দাঁড়ালুম। স্বামীটি আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাতেই আমি হেসে বললুম, ভুল করে আমার ক্যামেরাটা ফেলে গিয়েছিলুম, অলিমপাস টু।

ছেলেটি ততোধিক ভুরু কুঁচকে বলল, কী বলছ? কার ক্যামেরা?

আমি বললুম, তোমার হাতে অলিমপাস টু দেখছি, মানে আমিও আমারটা ফেলে গেছি, ওটা কি তোমার?

ছেলেটি বলল, নিশ্চয়ই।

বলেই সে একটা অতি সুদৃশ্য কেসের মধ্যে ক্যামেরাটা ভরে ফেলল। তা হলে কি আমি আমারটা এখানে ফেলিনি? স্টিমার ফেরির কাউন্টারের কাছে? ওখানে একবার খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম।

আবার দৌড়োলুম সেদিকে। সেখানেও একজন লোকের হাতে অলিমপাস টু। এবারে সতর্ক হয়ে জিগ্যেস করলুম, আমি এখানে একটা ক্যামেরা ফেলে গেছি, এই খানিকটা আগে।

লোকটি কোনও উত্তর না দিয়ে নিজের ক্যামেরাটা লুকিয়ে ফেলল।

সেই লাইনে আরও দু-তিন জনের হাতে আমি দেখলুম ওই একই ক্যামেরা। এখানেও নিশ্চয়ই ফিফ্‌টি পারসেন্ট রিডাকশন সেল দিচ্ছে।

শেষ চেষ্টা হিসেবে গেলুম কফির দোকানে। তার কাউন্টারের ওপর জ্বলজ্বল করছে আর একটা অলিমপাস টু। আমি অবশ্য কাউন্টারে দাঁড়াইনি, টেবিলে বসেছিলুম, তবে ওখানে ক্যামেরাটা গেল কী করে? কোনও সহৃদয় লোক বোধহয় ওটা পেয়ে এখানে রেখে গেছে।

দোকানদারকে কিছু জিগ্যেস না করে ক্যামেরাটা তুলে নিয়েই বেরিয়ে গেলুম গটগট করে। ঠিক সেই মুহূর্তে বাথরুম থেকে একটা লোক বেরিয়ে কী যেন বলতে লাগল, আমি আর তাতে কান না দিয়ে হাঁটতে লাগলুম জোরে জোরে। একেবারে পার্ক ছেড়ে বাস স্টপের দিকে।

পরের দিন সেই ছবির রোল ডেভেলপ করে আবার একটি সাংঘাতিক চমক। ওর একটা ছবিও আমার তোলা নয়। সব অচেনা নারী পুরুষ ও অদেখা দৃশ্য।

কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে ভাবলুম, কী আর করা যাবে!

মানুষের জীবনটাই নশ্বর, নিছক কিছু ছবি আমার তোলা কিংবা অন্য কারুর, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আর কী হবে!

।। ৩৮ ।।

নিউ ইয়র্কে সারা বছর ধরেই আন্তর্জাতিক ফিল্‌ম ফেসটিভাল চলছে বললে বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। অসংখ্য সিনেমা হল, তাতে দেখানো হয় সারা পৃথিবীর বাছাই করা চলচ্চিত্র। এ ছাড়া বিভিন্ন মিউজিয়াম ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে থাকে বিখ্যাত পরিচালকদের রেট্রোসপেকটিভ। আর প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের আছে নিজস্ব অডিটোরিয়াম ও সারা বছরব্যাপী নির্বাচিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনী। সেখানে টিকিটের দাম সস্তা এবং বাইরের লোকেরও সেখানে প্রবেশের কোনও বাধা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা শুধু আমেরিকান ছবি দেখে না, তারা দেখে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রগুলি।

আমেরিকান সিনেমার এখন বেশ খারাপ অবস্থা চলছে। হলিউড একসময় রোমান্স ও হাইড্রামার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিল। সেই সব বিষয়বস্তু এখন আর চলে না। বীভৎস রকমের হিংস্রতা কিংবা যৌনতার বাড়াবাড়ি দেখিয়ে কিছুদিন বাজার মাৎ করার চেষ্টা চলেছিল, এখন তাও পুরোনো হয়ে গেছে। 'স্টার ওয়ারস' খুব চলেছিল কল্প-বিজ্ঞানের চাকচিক্যের জন্য, কিন্তু তার পরের ছবি, 'এম্পায়ার স্ট্রাইকস ব্যাক' তত বেশি দর্শক টানতে পারেনি। সেই ফর্মুলায় 'সুপার ম্যান' বেশ চললেও, 'সুপার ম্যান টু' একঘেয়ে লেগেছে। অনেকদিন পর 'রেইডারস অফ দা লস্ট আর্ক' নামে একটা ভয়াবহ শিহরণ-জাগানো ছবি আবার বক্স-অফিস ফাটিয়েছে। এর বিষয়বস্তু খানিকটা অলৌকিক, খানিকটা কল্প-বিজ্ঞান আর অনেকটাই হিংস্রতা। যতক্ষণ ছবিটা চলে ততক্ষণ কাঁটা হয়ে বসে থাকতে হয়, আমি তো বেশ কয়েক জায়গায় চোখ বুজে ফেলেছি। মানুষের মুখ মোমের মতন গলে যাচ্ছে, এই দৃশ্য কি দেখা যায়?

হলিউডের ছবির সম্মান বর্তমানে হুহু করে নেমে যাচ্ছে। খুব বড় কোনও পরিচালক নেই, সিরিয়াস ফিল্মের সংখ্যা খুবই কম। 'রেড্‌স', 'র‍্যাগ টাইম' ইত্যাদি কিছু সিরিয়াস ধরনের চেষ্টা দেখেও মন ভরল না। 'ফ্রেঞ্চ লিউটেনান্টস্‌ উয়োম্যান' সম্প্রতিকালের একটি বিখ্যাত উপন্যাস, তার চিত্ররূপ

দেখেও হতাশ হলুম। এর চিত্রনাট্য লিখেছেন বিখ্যাত নাট্যকার হ্যারল্ড পিন্টার। পিন্টার অতিরিক্ত কায়দা করতে গিয়ে ছবিটির রস নষ্ট করলেন। গল্পটি গত শতাব্দীর একটি প্রেমকাহিনি, পিন্টার তাঁর চিত্রনাট্যে মাঝে-মাঝে ইন্টার কাট করে এই ফিল্মের নায়ক-নায়িকাদের ব্যক্তি জীবনের টুকরো দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতে চাইলেন, প্রেমের সমস্যা এ যুগেও একরকম। তবে এই ছবির নায়িকা হিসেবে মেরিল স্ট্রিপ অসাধারণ। মেরিল স্ট্রিপ এই দশকের প্রধান আবিষ্কার। ভারতীয় দর্শকরাও অনেকে মেরিল স্ট্রিপকে চেনেন নিশ্চয়ই, 'ক্রেমার ভার্সাস ক্রেমার'-এর নায়িকাকে মনে নেই?

বর্তমান কালের ছবির যখন এরকম দৈন্য দশা চলে, তখন হঠাৎ-হঠাৎ পুরোনো আমলের কিছু-কিছু ছবি আবার জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পুরোনো কোনও অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে নিয়ে হুজুগ ওঠে। যেমন, দু-এক বছর ধরে খুব শোনা যাচ্ছে, হামফ্রি বোগার্ট অসাধারণ অভিনেতা ছিলেন, তাঁর জীবৎকালে তাঁর প্রতিভার ঠিক সম্মান দেওয়া হয়নি। সমস্ত শহরগুলিতে দেখানো হচ্ছে হামফ্রি বোগার্টের পুরোনো ছবি। আফ্রিকান কুইন, কাসাব্লাঙ্কা, স্যাব্রিনা ইত্যাদি। ছেলে-ছোকরারা বোগার্টের অনুকরণে কথা বলছে ঠোঁট চেপে। আমি হামফ্রি বোগার্টের ভক্ত, এই সুযোগে তাঁর অনেক পুরোনো ছবি দেখে নিলুম। জন ওয়েন-কেও এইভাবে এখন সম্মান দেখানো হচ্ছে। সেই তুলনায় চার্লি চ্যাপলিন আর তেমন জনপ্রিয় নেই মনে হল। চার্লির 'লাইম লাইট' দেখতে গিয়ে দেখি হল ফাঁকা।

ফ্রান্স, জার্মানি, পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, জাপান, সুইডেন, ইটালি ইত্যাদি যেসব দেশের চলচ্চিত্রের বিশেষ খ্যাতি আছে, সেসব দেশের ভালো-ভালো ছবি আমেরিকায় বসে অনায়াসেই দেখা যায়। চলচ্চিত্রের ওপর এ দেশে কোনোরকম সরকারি নিয়ন্ত্রণই নেই, এমনকী সেনসরশিপও নেই, তাই এখানকার প্রদর্শকরা পৃথিবীর যেকোনও দেশ থেকে ভালো ছবি এনে দেখাতে পারে। এমনকী, চিন ও রাশিয়ার ফিল্মও দেখার সুযোগ আছে।

একটি রাশিয়ান ফিল্মের কথা এখানে বলতে চাই। আইজেনস্টাইন পুড়ভকিনের যুগ কেটে গেছে কবে, সম্প্রতিকালের রুশ চলচ্চিত্র সম্পর্কে আমাদের খুব একটা উচ্চ ধারণা নেই। কারণ, ভারতে বসে আমরা যেসব রাশিয়ান ফিল্ম দেখি, সেগুলি হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘটনা, নয় হালকা-অ্যাডভেঞ্চার ধরনের এবং কয়েকটি শেকসপিয়রের পুনর্নির্মাণ। কিন্তু আমেরিকায় বসে আমি একটি অসাধারণ রুশ ছবি দেখলুম।

ছবিটি বছর দশেকের পুরোনো, নাম সোলারিস। আন্দ্রেই টারকোভস্কি পরিচালিত কল্প-বিজ্ঞান কাহিনি। আমার মতে, এ যাবৎ আমেরিকা যতগুলো বিজ্ঞানভিত্তিক চলচ্চিত্র তুলেছে, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল স্ট্যানলি কুবরিক পরিচালিত 'স্পেসঅডিসি'। আর এই 'সোলারি' যেন সেই 'স্পেস অডিসি'রই যোগ্য প্রত্যুত্তর। মহাকাশ অভিযানে রাশিয়া অনেক এগিয়ে থাকলেও এই ছবিতে সেসব নিয়ে কোনও বাড়াবাড়ি করা হয়নি। চোখ ধাঁধানো কৃত্রিম রকেট-ফকেটও নেই, বরং এই ছবিতে মিশেছে বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শন। দূর মহাশূন্যে সোলারিস নামে অজ্ঞাত ভয়ঙ্কর সমুদ্রেব কাছাকাছি এক শূন্যযানে বসে কয়েকজন মানুষ অভিভূত হয়ে যাচ্ছে তাদের মনে রহস্যময় শক্তি অনুভব করে।

ফরাসি ছবি প্রায় সবই দেখা যায় এদেশে। বোধহয় ফরাসিরা প্রত্যেক ছবিতেই ইংরেজি সাব-টাইটল বসিয়ে দেয় এ দেশের বিশাল বাজার পাওয়ার জন্য। ফরাসি ফিল্ম মাত্রই ভালো নয়। কিছু ছবি বেশ বাজে। তবে মাঝারি ধরনের ঝকঝকে তকতকে ছবি তুলতে ফরাসিরা বেশ দক্ষ। সেই সব ছবির বেশ চাহিদা আছে এদেশে। এর পাশাপাশি ত্রুফো, গদার, রেনে'র ছবিও বেশ চলে। ত্রুফোর 'গার্ল নেক্সট ডোর' ছবির জন্য একমাস আগে থেকে টিকিট কাটতে হয়।

কায়দাকানুনের ব্যাপারে ফরাসি পরিচালকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি টেক্কা দেন অ্যালাঁ রেনে। এর একটি ছবি দেখলুম, যার নামটিতে বেশ মজা আছে। মঁনক্ল দা মেরিক অর্থাৎ 'আমার আমেরিকান কাকা'। আমেরিকার দর্শকদের কথা ভেবেই এইরকম নামে দেওয়া কি না, সেরকম সন্দেহ জাগতে পারে। কারণ এ ছবিতে আমেরিকার ছিটেফোঁটাও নেই, আমেরিকান কাকার কোনও চরিত্রও নেই,

ফরাসী নারী-পুরুষদেরই গল্প, শুধু একটি লোক বারদুয়েক বলেছে যে তার এক কাকা আমেরিকায় গিয়ে খুব উন্নতি করেছে। ফিল্‌মটি প্রায় প্রবন্ধ ঘেঁষা, এমনকী এতে ফরাসি জীববিজ্ঞানী আঁরি লেওরির কয়েকটি তত্ত্ব এবং পরীক্ষাও দেখানো হয়েছে। সাদা ইঁদুর ও খাঁচার বন্দি বাঁদরের সঙ্গে মানুষের যে কত মিল, তা ফুটে উঠেছে এক একটা সংকট মুহূর্তে। ছবিটি শেষ পর্যন্ত সার্থক হয়ে ওঠে পরিচালকের মুনশিয়ানায়। এই ধরনের ছবি দেখলে একরকমের আরাম হয়, মনে হয়, চলচ্চিত্র জগতে তবু কেউ-কেউ এখনও নতুন ধরনের চিন্তা করছে।

কিছু-কিছু ছবি দেখলেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে হয়, এইসব ছবি অন্তত বিংশ শতাব্দীর মধ্যে ভারতবর্ষে দেখাবার কোনও সম্ভাবনাই নেই। কোনও-কোনও চলচ্চিত্র-উৎসবে দু-চারটে দেখানো হতে পারে। সেইসব সময় টিকিটের জন্য হুড়োহুড়ি ও হ্যাংলামির কথাও সবাই জানে। সাধারণ ভারতীয় দর্শক এইসব ছবি দেখার যোগ্য নয়, কারণ, এর মধ্যে নগ্ন নারী ও পুরুষেরা আছে, সুতরাং আর সব গুণ নষ্ট। এইরকমই একটি ফিল্‌ম হল 'টিন ড্রাম'। যদিও আমেরিকায় অস্কার পেয়েছে, তবু চলচ্চিত্র হিসেবে খুব উচ্চাঙ্গের বলে আমার মনে হয়নি। কিন্তু এর আকর্ষণ অন্য, এটি গুনটার গ্রাস-এর নোবেল পুরস্কারজয়ী উপন্যাসের চিত্ররূপ। পরিচাল ভল্‌কার শ্লোনড্রফ্‌ মোটামুটি বর্ণনামূলক চিত্ররূপ দিয়ে গেছেন।

টিন ড্রামের গল্প নিশ্চয়ই অনেকেই জানেন। তিন বছরের একটি পোলিশ ছেলে অস্কার বড়দের জগৎ যৌন-লাম্পট্য, হিংস্রতা ও হিটলারের নাজিবাদের উত্থান দেখে তিক্ত হয়ে আর বড় হয়ে উঠতে চায়নি। তার শরীর সেখানেই থেমে ছিল। ক্রমে তার বয়েস বাড়ল কিন্তু তার শরীরটা তিন বছরেই রয়ে গেল। তার গলায় ঝোলে একটা টিনের ড্রাম, মন খারাপ হলে সেটা সে বাজায়, মন খারাপ হলে সে এমন একটা চিৎকার করে যাতে সব কাচ ভেঙে যায়। তার মা ও বাবা দুজনেই ব্যভিচারী। হিটলারের দাপটে সমস্ত জার্মান জাতটাই মানসিক রোগী। অস্কার এর মধ্যে দিয়ে রেখে যাচ্ছে তার নিজস্ব বামন-প্রতিবাদ। কাহিনির অভিনবত্বই মনকে দারুণ স্পর্শ করে এবং পরিচালক এর সাহিত্যরূপটা যথাযথ রাখবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এর যৌন দৃশ্যগুলো দেখলে গা শিউরে ওঠে। তিন বছরের ছেলের ভূমিকা তো প্রায় ওই বয়েসি কোনও শিশুকে দিয়েই করানো হয়েছে, সেই শিশু যখন একটি সতেরো বছরের মেয়ের সঙ্গে যৌন সহবাস করতে যায়, তখন আমি মনে-মনে আতঙ্কিত হয়ে ভাবি, সত্যিই কি সবটা দেখাবে? আভাসে সারবে না? কিন্তু এরা সবটাই দেখিয়ে দেয়।

আমাদের দেশের সাধারণ সিনেমা-দর্শকদের ধারণা আছে যে আমেরিকান সিনেমায় বুঝি খুব অসভ্য ব্যাপার থাকে। এটা এক সময়ে হয়তো সত্যি ছিল, কিন্তু এখন নেই, আমেরিকানরা ও ব্যাপারে বেশ পিছিয়ে পড়েছে। আমেরিকানরা ভেতরে-ভেতরে আসলে রক্ষণশীল ও গোঁড়া, খানিকটা ভণ্ডও বটে। আমরা এক সময় নিরামিষ বাংলা ছবির পাশাপাশি আমেরিকান ছবিতে চুম্বন, খানিকটা নগ্ন বুক ও উরুর ঝলক দেখে রোমাঞ্চিত হতুম, বেশিরভাগ আমেরিকান ছবি এখনও সেই স্তরেই আছে। কিন্তু জার্মান, ইটালিয়ান, ফরাসিরা এখন আর কিছুই বাদ রাখছে না। সেইসঙ্গে যোগ দিয়েছে জাপানিরা। হাঙ্গেরিয়ান ছবিতেও নগ্নতা জল-ভাত। এক হাঙ্গেরিয়ান লেখক দম্পতি সত্যজিতের 'অরণ্যের দিনরাত্রি' দেখে মহাবিস্ময়ে আমাকে বলেছিল, সে কি এতগুলো ছেলে-মেয়ে এতক্ষণ একসঙ্গে রইল, কেউ কারুকে চুমু খেল না, একবারও জড়িয়ে ধরল না?

আমেরিকায় সরকারি সেন্সরশিপ উঠে গেলেও প্রযোজকদের নিজস্ব একটা স্তর-বিন্যাসের ব্যবস্থা আছে। প্রযোজক সংস্থা ছবিগুলো সম্পর্কে আগে থেকে জনসাধারণকে জানিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে। অর্থাৎ কোন ছবি সপরিবারে দেখার যোগ্য, কোন ছবি নয়। বিভিন্ন স্তরের ছবির নির্দেশ দেওয়া থাকে। যেমন, কোনও ছবির পরিচয় পত্রে লেখা থাকে পি জি, অর্থাৎ পেরেন্টাল গাইডেন্স, অর্থাৎ সে ছবি বাচ্চাদের দেখা উচিত কি না তা বাবা-মা বুঝবেন। 'আর' মার্কা অর্থাৎ রেসট্রিকটেড।

ষোলো বছরের কম ছেলেমেয়েদের এই ছবি না দেখাই কাম্য। এর পরেরটি হল 'এক্স', তা অবশ্যই প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য। শুধু যৌন দৃশ্যের জন্যই নয়, বিষয়বস্তুর জন্যও।

এর পরেও আছে 'ডবল্ এক্স'। সেগুলো একেবারেই হার্ড কোর পর্নোগ্রাফি। আমি আগেই বলেছি, এদেশের ভদ্র-শিক্ষিত লোকরা তো বটেই, এমনকী ছাত্র-ছাত্রীরাও ওইসব ছবি দেখে পছন্দ করে না। সেই জন্যই ডবল এক্স ছবির বাজার মোটেই ভালো নয়। তবু যে ওইসব ছবি তৈরি হচ্ছে, তার কারণ ওগুলো তোলার খরচ খুব কম। পাহাড়, সমুদ্র বা ঘোড়া ছোটানোর আউটডোর শুটিং তো দরকার হয় না, কয়েকখানা শরীর পেলেই কাজ চলে যায়। ওইসব ছবির বেশিরভাগ দর্শকই নাকি বিদেশি ট্যুরিস্টরা। বিদেশে গিয়ে অনেকেই একটু-আধটু দুষ্টুমি করতে চায়।

এক বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন রঙ্গালয়ে (বিজু থিয়েটার) একই দিনে দুটি ছবি ছিল। ইটালির পাওলো পাসোলিনির 'অ্যারেবিয়ান নাইটস' আর গ্রিফিথ্-এর বহু পুরোনো ছবি বার্থ অব আ নেশান। পাসোলিনির অ্যারেবিয়ান নাইটস এক্স মার্কা ছবি, তা ছাড়াও এর রগরগে যৌন দৃশ্যের কথা অনেক পত্র-পত্রিকায় লেখা হয়েছে। সুতরাং ধরেই নিয়েছিলুম, অ্যারেবিয়ান নাইটসের টিকিটের জন্য বিরাট লাইন পড়বে, এমনকী মারামারিও হতে পারে। টিকিট কাটতে গিয়ে আমি অবাক। গ্রিফিথ-এর ছবির জন্যই লাইন অনেক বড়। বার্থ অফ আ নেশান ১৯১৫ সালের ছবি, তা দেখার জন্য একালের যুবক-যুবতিদের এত উৎসাহ সত্যি বিস্ময়কর। একটি যুবককে আমি জিগ্যেস করলুম, তোমরা অ্যারেবিয়ান নাইটস দেখতে আগ্রহী হলে না? সে বলল, ওই ছবিটা সম্পর্কে আগেই কাগজে পড়েছি, বুঝেছি, এমন কিছু দেখবার মতন নয়।

এই রকমই অভিজ্ঞতা হয়েছিল আরেকবার। এটা বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, তার বাইরে।

পাশাপাশি দুটো সিনেমা হলের একটিতে হচ্ছে 'বডি হিট', অন্যটিতে 'ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট লাইক ডে অ্যান্ড নাইট'। প্রথম ছবিটির অনেকখানি পরিচয় আছে তার নামের মধ্যে। এক ধনী ব্যবসায়ী তরুণী স্ত্রী তার শরীরের অত্যধিক উত্তাপের তাড়নায় গোপন প্রেমিককে নিয়মিত শয়ন কক্ষে নিয়ে আসে। তারপর তারা দু-জনে মিলে স্বামীটিকে খুন করে ইত্যাদি। অর্থাৎ যৌনতা ও রহস্যকাহিনি মেশানো। এক্স মার্কা ছবি। আর দ্বিতীয়টি একটি জার্মান ছবি, বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতার এক অংশগ্রহণকারীর মানসিক ঝড় ও অতিরিক্ত আত্মগরিমার বিশ্লেষণ। এই দ্বিতীয় ছবিটি লোকে উৎসাহ নিয়ে দেখছে, আলোচনা করছে। আর প্রথম ছবিটির হলে মাত্র পঁচিশ তিরিশজন দর্শক, টিকিটের দাম কমিয়ে দিয়েও তারা লোক টানতে পারছে না।

সেন্সর ব্যবস্থা তুলে দিয়ে এই একটা লাভ হয়েছে, নিষিদ্ধ দৃশ্য বলতে এখন আর কিছু নেই, সেইজন্যই শুধু ওই ধরনের দৃশ্য দেখবাব জন্যই কেউ এখন আর সিনেমা হলে যাওয়ার আগ্রহ বোধ করে না।

॥ ৩৯ ॥

একদিন বিকেলবেলা ভাবলুম, তা হলে নায়েগ্রাটা ঘুরে আসা যাক। এত কাছে এসে একবার নায়েগ্রা দর্শন না করে চলে যাওয়ার কোনও মানে হয় না।

কাছে মানে অবশ্য তিনশো সাড়ে তিনশো মাইল। কলকাতা থেকে জলপাইগুড়ি যেমন কাছেই। বাসে লাগে ছ-সাত ঘণ্টা। কেটে ফেললুম রাত্তিরের বাসের টিকিট। ঝাঁকুনিহীন রাস্তা, নিশ্চিন্তে ঘুমোনো যায়, ভোরবেলা চোখ মেলেই দেখলুম বাফেলা পৌঁছে গেছি।

প্রথমবার জব্বলপুর যাওয়ার সময় আমার ধারণা ছিল, ট্রেন থেকে নেমেই মার্বেল রক দেখতে পাব। কিন্তু জব্বলপুর স্টেশন থেকে কোনও পাহাড়ই দেখতে পাওয়া যায় না, মার্বেল রক দেখতে হয় নৌকোয় চেপে। সেই রকমই, আমার মনে বোধহয় এই রকম একটা ছবি ছিল যে বাফেলো

স্টেশনে পৌঁছতে-না-পৌঁছতেই শুনতে পাব বিশাল জলপ্রপাতের শব্দ, বাতাসে উড়বে জলকণা, আকাশে আঁকা থাকবে রামধনু।

বলাই বাহুল্য, সেসব কিছুই দেখলুম না, বাফেলো বাস স্টেশনটি অন্য আর পাঁচটি স্টেশনেরই মতন। বরং একটু যেন নিষ্প্রাণ।

কোনও নতুন জায়গায় পৌঁছলে কিছুক্ষণ একটা অনিশ্চয়তার অস্বস্তি থাকে। এখানে অবশ্য আমার তা নেই। নিউ জার্সি থেকে ভবানী আর আলোলিকা আগেই এখানে ওঁদের আত্মীয় কল্লোল আর টুনুকে খবর দিয়ে রেখেছেন। আমার সঙ্গেও কল্লোলের একবার টেলিফোনে কথা হয়েছিল, সুতরাং সবই ঠিকঠাক। তবে, কার কাছে যেন শুনেছিলুম, কল্লোল একটু ঘুমকাতুরে, খুব ভোরে তাকে বাস স্টেশনে উপস্থিত হতে বলা একটা নিষ্ঠুরতা। আমি পৌঁছেছি ভোর সাড়ে পাঁচটায়। এক্ষুনি কল্লোলকে ফোন না করে আমি কফি আর হট ডগ নিয়ে বসে গেলুম এক জায়গায়। তারপর সময় আর কাটতেই চায় না। একটা স্থানীয় সংবাদপত্র টেনে নিলুম। এইসব স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিতে এত বেশি স্থানীয় খবর থাকে যে তাতে বাইরের লোক কোনও রস পায় না। বাফেলা শহরের ট্রাফিক জ্যাম নিয়ে এক পৃষ্ঠা জোড়া আলোচনা পড়ে আমার কী লাভ! কিংবা এখানকার পুরোনো জেলখানাটি ভেঙে আধুনিক ধরনের জেলখানা ভবন বানানো হবে কি না সে সম্পর্কে আলোচনা। আমি এখানে দু-এক দিনের বেশি থাকব না। ট্রাফিক জ্যামে ভোগবার ভয় আমার নেই কিংবা এখানকার জেলখানায় পদার্পণ করার গৌরবময় সুযোগও বোধহয় আমার জুটবে না।

সাতটা পনেরোর সময় যখন বাইরে বেশ চড়া রোদ উঠেছে, তখন আমি ফোন করলুম কল্লোলকে। সে বলল, নীললোহিত, তুমি এসে গেছ। দাঁড়াও, আমি এক্ষুনি আসছি। বাস স্টেশন থেকে ওদের বাড়ি যথেষ্ট দূরে। তবু সে প্রায় কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে গেল ঝড়ের বেগে। দেখলেই বোঝা যায়, সে সদ্য বিছানা ছেড়ে উঠেই কোনও ক্রমে জামা-প্যান্ট গলিয়ে চলে এসেছে! চোখ এখনও ভালো করে খোলেইনি।

কল্লোলকে আমি আগে কখনও দেখিনি, কিন্তু প্রথম দেখেই চেনা-চেনা লাগল। পাতলা, মজবুত শরীর, মুখে হালকা দাড়ি। ওর চেহারাতেই যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ছাপ আছে। ঠিক তাই, কল্লোল বসু যাদবপুরের ইঞ্জিনিয়ার। আমি নিজে যদিও কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকবার যোগ্যতাই অর্জন করতে পারিনি, তবু বন্ধুবান্ধবদের পয়সায় চা-খাবার জন্য কলাকাতা-যাদবপুর-রবীন্দ্রভারতী ইত্যাদি সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিনেই গেছি। সেই জন্য ছাত্রদের আলাদা-আলাদা টাইপগুলো জানি।

কল্লোলকে যদিও এখনও ছাত্র-ছাত্র দেখায়, কিন্তু আসলে সে এখানে খুব দায়িত্বপূর্ণ কাজ করে। তার এখানকার কোম্পানি তাকে প্রায়ই চিনে পাঠায় বিশেষজ্ঞ হিসেবে।

গাড়ি ছেড়ে দেওয়ার পর কল্লোল বলল, বুঝলে ভাই, নীলু, প্রত্যেকদিন ভোরবেলা আমায় চাকরির জন্য দৌড়োতে হয়। এ দেশের চাকরিতে বড্ড খাটিয়ে মারে। আজ আমার ছুটির দিন, সেই জন্য বিছানা থেকে উঠতেই ইচ্ছে করছিল না।

আমি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলুম, আমাকে থামিয়ে দিয়ে সে বলল, না, কিন্তু-কিন্তু করবার কিছুই নেই, আমাদের এখানে কেউ এলে আমরা খুব খুশি হই, খুব চুটিয়ে আড্ডা দিই।

আর কিছুক্ষণ যেতে-যেতেই ওর সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেল। বেরিয়ে পড়ল অনেক চেনা শুনো। ওর দুজন বন্ধু আমারও বন্ধু। তাদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল আন্দামান যাওয়ার পথে জাহাজে।

কল্লোল আমায় জিগ্যেস করল, তুমি তো এদেশের অনেক জায়গায় ঘুরছ। কেমন লাগছে?

এক কথায় এর উত্তর দেওয়া যায় না। আর যদি একটামাত্র শব্দেই উত্তর দিতে হয়, তা হলে বলতে হয়, ভালোই।

কল্লোল বলল, আমাদের মতন এত বেশিদিন থাকতে হলে ভালো লাগত না।

আমি চমকে উঠে বললুম, কেন, তোমার ভালো লাগে না?

—আমি তো প্রায়ই ফিরে যাওয়ার স্বপ্ন দেখি!

এটা খুবই আশ্চর্যের কথা। কারণ, কল্লোলের দাদা-বউদি, বাবা-মা সবাই থাকেন এখানে। একই বাড়িতে নয়, কাছাকাছি। বলতে গেলে গোটা পরিবারটাই এ দেশে। সবাই সুপ্রতিষ্ঠিত। তবু তার মন দেশের জন্য ব্যাকুল, এটা বিস্ময়কর তো বটেই।

বাফেলো শহরটি তেমন সুদৃশ্য নয়। কেমন যেন ন্যাড়া-ন্যাড়া ভাব। কল্লোলরা থাকে শহর ছাড়িয়ে খানিকটা বাইরে, ওদের রাস্তার নাম প্যারাডাইজ রোড, এই নামটিকে খুবই উচ্চাকাঙ্ক্ষী বলা যায়। কিন্তু ওদের বাড়িটি চমৎকার। বাড়িটি নতুন কেনা হয়েছে, এখনও বেশি আসবাবপত্র আসেনি। এইরকম বাড়িই আমার দেখতে ভালো লাগে, বেশ একটা খোলামেলা ভাব পাওয়া যায়। অত্যধিক জিনিসপত্রে ঠাসা বাড়িগুলোতে ঢুকলে যেন দম বন্ধ হয়ে আসে।

দরজা খুলে দিল কল্লোলের স্ত্রী টুনু। তাকে দেখে চমকে উঠলুম। ঠিক মনে হয় আগে দেখেছি। দেশপ্রিয় পার্কের সামনে কিংবা সার্দান এভিনিউ ধরে রঙিন ছাতা মাথায় এরকম একটি যুবতিকে কি আমি হাঁটতে দেখিনি? কিংবা ছবিতে দেখেছি? দক্ষিণ কলকাতার সুন্দরী বললেই এইরকম চেহারায় একটি মেয়ের কথা মনে পড়ে।

কল্লোল তার স্ত্রীকে বলল, তুমি একে চা-টা খাওয়াও, আমি ততক্ষণে আর একটু ঘুমিয়ে নিই!

টুনু শুধু উজ্জ্বল রূপসি নয়, তার বেশ একটা ব্যক্তিত্ব আছে। খুব সুন্দর গল্প বলতে পারে সে। লুচি ভাজতে-ভাজতে সে আমায় অনেক গল্প শোনাল। সত্যিই সে দক্ষিণ কলকাতার একটি বিখ্যাত পরিবারের মেয়ে। অনেক ভাইবোনের সঙ্গে সে মানুষ হয়েছে, সেই সব স্মৃতি তার মনে এখনও জ্বলজ্বল করে। তার মায়ের অনেক কথা সে এমন চমৎকারভাবে বর্ণনা করল যে আমার মনে হল, টুনু যদি লিখত, তা হলে সে নিখুঁত চরিত্র সৃষ্টি করতে পারত।

টুনুর যে মানুষের চরিত্র পর্যবেক্ষণ করার বিশেষ ক্ষমতা আছে, তার পরিচয় পরে আরও পেয়েছি। আমরা যাদের কাছাকাছি যাওয়ার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না, যেমন কোনও নামকরা সাহিত্যিক বা সিনেমা পরিচালক বা অভিনেতা-অভিনেত্রী বা গায়ক-গায়িকা, তাঁদের অনেককেই এরা বেশ ভালো চেনে। যাঁরা নিউ ইয়র্কে বেড়াতে আসেন, তাঁরা অনেকেই একবার নায়েগ্রা দেখবার জন্য বাফেলো ঘুরে যান। তাঁদের আতিথ্য দেয় কল্লোল বা তার দাদা কুশল। কলকাতা থেকে কখনও নাটকের দল বা গানের দলও নিয়ে যায় এরা। মৃণাল সেন, উত্তমকুমার, শর্মিলা ঠাকুর, স্মিতা পাতিলের মতন সব খ্যাতিমানরা এখানে এসে থেকেছেন শুনেই তো আমি রোমাঞ্চিত বোধ করলুম। ভাগ্যিস নেহাত চেনাশুনোর জোরে আমিও এখানে জায়গা পেয়ে গেছি!

বিখ্যাত লোকদের নানান দুর্বলতাও বেশ লক্ষ্য করে দেখেছে টুনু। স্মিতা পাতিলের বেশি বেশি বিদ্যা জাহিরপনা কিংবা শর্মিলা ঠাকুরের মেমসাহেবির নানা কাহিনি শুনে আমি বেশ কৌতুক বোধ করি।

দুপুরবেলা কল্লোলের দাদা-বৌদি এসে পড়ায় আরও জমাট আড্ডা জমে গেল। কলকাতা থেকে কত দূরে এই বাফেলো, কিন্তু আড্ডাটা ঠিক কলকাতার মতন।

কুশলের খুব ঝোঁক সিনেমার দিকে। সে বাংলা সিনেমার অনেক খবর রাখে, একটা মুভি ক্যামেরা কিনেছে। কোনও একদিন সে নিজেই একটা ফিল্ম তুলবে।

এইবার তো একবার নায়েগ্রা দেখতে যেতেই হয়। কিন্তু কে নিয়ে যাবে? কল্লোল বলল,আমি নিয়ে যাচ্ছি, কুশল বলল, না, না, তুই থাক আমি নিয়ে যাচ্ছি। অর্থাৎ দুজনের কারুর খুব ইচ্ছে নেই। কল্লোলের বউদি কিংবা টুনু যে যাবে না, তা তারা আগেই বলে দিয়েছে। এই অনিচ্ছে খুব স্বাভাবিক। আমার বন্ধু পার্থসারথি চৌধুরি এক সময় ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন দার্জিলিং-এ। কলকাতা থেকে যারাই বেড়াতে যেত সকলেই বায়না ধরত টাইগার হিলে বিখ্যাত সূর্যোদয় দেখার। এইভাবে দু'বছরে অন্তত পঞ্চাশ বার টাইগার হিলে গিয়ে সূর্য ওঠা দেখতে হয়েছে তাঁকে। আমিই তো তাঁর সঙ্গে

অন্তত তিনবার গেছি। তার ফলে টাইগার হিলে সূর্যোদয়ের ব্যাপারটা নিশ্চয়ই খুব বীভৎস ও বিকট মনে হয় এখন তাঁর কাছে। কেন যে লোকে ভোরবেলা উঠে ওই জিনিস দেখবার জন্য ছোটে।

নায়েগ্রা সম্পর্কেও কল্লোলদের এই রকমই মনোভাব হবে নিশ্চয়ই।

আমি সঙ্কুচিত বোধ করলুম একটু। বেশ তো আড্ডা হচ্ছে, এই আড্ডা ভেঙে নায়েগ্রা কি দেখতেই হবে? না দেখলেই বা ক্ষতি কী? ছবি টবিতে তো অনেকবার দেখা আছে।

কিন্তু আমাকে বফেলোতে এসেও নায়েগ্রা না দেখে ফিরে যাওয়ার রেকর্ড করতে দিতে ওরা রাজি নয়। এবং অতিরিক্ত ভদ্রতা দেখিয়ে দুই ভাই-ই এক সঙ্গে যেতে উদ্যত হল, আমার আপত্তি তারা শুনল না।

ওদের বাড়ি থেকে নায়েগ্রা প্রায় দশ-বারো মাইল দূরে। কিংবা কিছু বেশিও হতে পারে। গুঁড়ো-গুঁড়ো বৃষ্টির মধ্যে আমাদের গাড়ি ছুটে চলল, জলপ্রপাতের দিকে।

নায়েগ্রা নদীতে আমেরিকা ও কানাডার সীমানা। নদীটি যেখানে প্রপাতিত হয়েছে, সেই মুখের কাছটাতেই একটা দ্বীপ, ফলে প্রপাতটি দু-ভাগ হয়ে গেছে। এক দিকেরটি আমেরিকার, অন্য দিকেরটি কানাডার। তবে এই একটা ব্যাপারে কানাডা জিতে আছে, তাদের দিকের নায়েগ্রাই বিশাল এবং আসল দর্শনীয়। শুধু আমেরিকান দিকটি দেখে ফিরে এলে কিছুই প্রায় দেখা হয় না।

আগে ভারতীয়দের কানাডায় যাওয়ার ব্যাপারে কোনও বাধা ছিল না। এই যাত্রার প্রথমে আমিই তো কানাডায় ঢুকেছি বিনা বাধায়। কিন্তু এর মধ্যে খালিস্তান আন্দোলনকারী একদল শিখ কানাডায় রাজনৈতিক আশ্রয় চাওয়ার ফলে কানাডার সরকার এখন ভারতীয়দেরও বিনা ভিসায় কানাডা সীমান্ত পার হতে দেয় না। আমি অবশ্য এই সব খবর টবর জেনে আগেই ওয়াশিংটন ডি সি থেকে ভিসা করিয়ে এসেছি।

বিশাল ব্রিজ পেরিয়ে চলে এলুম কানাডার দিকে। কল্লোল ও কাজলের ভিসার দরকার নেই, কারণ ওরা আমেরিকায় বসবাসকারী। জলপ্রপাতটির দিকে এগোতে-এগোতে আমি একটু-একটু নিরাশ হলুম। মানুষের দাপটে প্রকৃতির মহিমা এখানে খর্ব হয়ে গেছে। আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে ডঃ লিভিংস্টোন যেদিন প্রথম ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত আবিষ্কার করেন, তাঁর সেই বিস্ময়ের কথা আমরা একটু-একটু অনুমান করতে পারি। একদিন এখানেও নিশ্চয়ই জঙ্গল টঙ্গল ছিল, তার মধ্যে এই এক নদীর বিরাট অধঃপতন নিশ্চয়ই সবাইকে চমকে দিত। কিন্তু এখন এই জলপ্রপাতকে উপলক্ষ করে গড়ে উঠেছে রীতিমতন এক বাণিজ্য কেন্দ্র। প্রচুর দোকানপাট, হোটেল, টাওয়ারে উঠে দেখবার ব্যবস্থা, রাত্তিরবেলা আলোকসম্পাত, আরও কত কাণ্ড! প্রকৃতি নিয়ে এমন ব্যবসাদারি আমার পছন্দ হয় না। হোটেল-ফোটেল থাকবেই জানি, কিন্তু কিছুটা দূরে সেসব করা যেত না? অন্তত এক মাইল ফাঁকা জায়গা দিয়ে হেঁটে হঠাৎ দেখতে পেলে কত বেশি ভালো লাগত! তার বদলে গাড়ি চেপেই উপস্থিত হলুম একেবারে নায়েগ্রার গায়ের ওপর।

আমরা ইস্কুলের ভূগোলে 'নায়েগ্রা' নামটাই পড়েছি, কিন্তু বানান অনুযায়ী এর সঠিক উচ্চারণ বোধহয় 'নায়েগ্রী' কিংবা 'নায়েগারা'। আমরা অবশ্য নায়েগ্রাই বলব। প্রথম দর্শনে এর বিশালত্ব সত্যিই বুকে ধাক্কা মারে। আমরা ছেলেবেলায় রাঁচির হুড্রু জলপ্রপাত দেখে মুগ্ধ হয়েছি। হঠাৎ সেই হুড্রুর কথা মনে পড়ায় একটু দুঃখ হয়। হুড্রুও বেশ জমকালো জলপ্রপাত ছিল, এখন শুকিয়ে গেছে, কেন তা কে জানে! নায়েগ্রা যাতে শুকিয়ে না যায়, সেজন্য অবশ্য দুই দেশের সরকার আগেই চুক্তি করে রেখেছে, জলবিদ্যুতের জন্য কেউই নির্দিষ্ট পরিমাণ জলের বেশি টানতে পারবে না।

কল্লোল ও কাজল জানাল যে নায়েগ্রা জলপ্রপাতের একেবারে তলা পর্যন্ত নৌকোয় যাওয়ার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু এখন শীত পড়ে যাওয়ায় সেই নৌকো সার্ভিস বন্ধ আছে। আর কিছুদিন পরে এই জলপ্রপাতটিই বরফে জমে যাবে প্রায় সবটা। এখন আর একরকমভাবে খুব কাছাকাছি গিয়ে দেখা যায়। সেখানে আমার যাওয়া উচিত।

ওরা দুই ভাই আমার জন্য অনেক স্বার্থত্যাগ করেছে, কিন্তু সেই পর্যন্ত আর কেউ সঙ্গে যেতে রাজি হল না। ওরা আমাকে ব্যবস্থাটা বুঝিয়ে দিয়ে ওপরে অপেক্ষা করতে লাগল।

পাথর কেটে বিরাট সুড়ঙ্গ বানিয়ে ফেলা হয়েছে। সেখানে নামতে হয় লিফটে। তারপর ভাড়া করা ওয়াটার প্রুফ ও জুতো পরে যেতে হয় এক ল্যাবিরিনথের মধ্য দিয়ে। এখানেই সাহেব জাতির কারিকুরি। অত বড় সাংঘাতিক এক জলপ্রপাতের একেবারে মাঝখানে নিয়ে যায় দর্শকদের। হাত বাড়ালেই জল ছোঁয়া যায়। অবশ্য জল ছুঁতে গেলে আর রক্ষে নেই, প্রচণ্ড ঝাপটে টেনে নিয়ে যাবে কিংবা হাত ভেঙে দেবে।

এখানে সঙ্গী হিসেবে এক বাঙালি দম্পতিকে পেয়ে আমার বেশ সুবিধেই হল। বেশ বাংলায় গল্প করতে-করতে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে দেখা গেল বিভিন্ন সুড়ঙ্গ থেকে বিভিন্ন রকমের এই বিশাল ব্যাপারটি। ওপরে উঠে আসবার পর আমাদের খুশি করবার জন্যই যেন কুয়াশা কেটে গিয়ে বেরিয়ে এল রামধনু। বেশ ছবি-টবিও তোলা হল।

ফেরার পথে কল্লোল হঠাৎ জিগ্যেস করল, নীলু, তুমি এবারে পুজো সংখ্যাগুলো পড়েছ; তোমার সঙ্গে কিছু আছে?

আমি বললুম, না, আমি তো চার পাঁচ মাস ধরে ঘোরাঘুরি করছি। এ বছরই প্রথম একটাও বাংলা পুজো সংখ্যা চোখে দেখিনি।

কল্লোল বলল, জানো, আমি যখন প্রথম এদেশে প্লেন থেকে নামি, আমার হাতে ছিল দু-তিনটে মোটা-মোটা পুজো সংখ্যা। বেরুবার সঙ্গে-সঙ্গে পুজো সংখ্যা না পড়লে আমার ভাত হজম হত না। তারপর প্রথম কয়েক বছর দেশ থেকে পুজো সংখ্যা আনাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকতুম। এখন...সবকিছু বদলে গেছে...বছরের পর বছর কেটে যায়, একটাও পুজো সংখ্যা চোখে দেখি না! মানুষ এভাবেও বদলে যায়।

।। ৪০ ।।

বসে আছি ক্লিভল্যান্ড বাস স্টেশনে। এই শহরে আমার চেনাশুনো কেউ নেই, তাই এখানে আর থাকা হবে না। যদিও ক্লিভল্যান্ডে বাঙালির সংখ্যা অনেক, বেশ ধূমধাম করে দুর্গাপুজো হয় শুনেছি।

আমি যদিও এদেশের দুর্গাপুজো দেখিনি একটাও, তবে অনেক গল্প শুনেছি। যুক্তরাষ্ট্রের সব বড় শহরেই বাঙালির দুর্গাপুজো হয়, কোনও-কোনও শহরে একাধিক। এখানকার বাঙালিরা পুজোর ব্যাপারটা বেশ আধুনিক করে নিয়েছে। পঞ্জিকার তোয়াক্কা করে না। যেহেতু ছুটি পাওয়ার কোনও উপায় নেই, তাই পশ্চিমবাংলার দুর্গাপুজোর দিনের কাছাকাছি কোনও শনি বা রবিবারে পুজো হয় এখানে। চারদিন ধরে নয়, একদিনেই। কোথাও নাকি পুজো হয় মোট চার ঘণ্টা, প্রথম ঘণ্টায় সপ্তমী আর চতুর্থ ঘণ্টায় বিজয়ার কোলাকুলি। শাস্ত্রকাররা তো বলেই দিয়েছেন, প্রবাসে নিয়ম নাস্তি।

আমার ইচ্ছে এখন শিকাগো যাওয়ার। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে নিউ ইয়র্কের দিকে আসার পর আমার শিকাগোর দিকে ফিরে যাওয়াটা অনেকের কাছে পাগলামি মনে হতে পারে। কিন্তু বাসের সিজ্‌ন টিকিট কেটে নিয়েছি, এখন এত বড় দেশটার যেখানে খুশি যেতে পারি। আমার আর অতিরিক্ত ভাড়া লাগে না।

চোখে কালো চশমা, হাতে একটা ছড়ি, মাথার চুল লালচে রঙের একজন প্রৌঢ় বলশালী সাহেব আমার পাশে এসে বসলেন। তারপর পকেট থেকে সিগারেট দেশলাই বার করে ধরাতে গিয়ে দেশলাই-এর পাতাটা পড়ে গেল মাটিতে। লোকটি নীচু হয়ে হাতড়ে-হাতড়ে দেশলাইটি খুঁজতে লাগলেন, কিন্তু ঠিক সেটা ছুঁতে পারছেন না। আমি দেশলাইটি তুলে দিলুম ওঁর হাতে।

লোকটি বললেন, থ্যাঙ্কস্! আচ্ছা বলো তো, পাঁচ নম্বর গেটে যে বাসটি দাঁড়িয়ে আছে, সেটা কি ডেট্রয়েটের?

আমি বললুম, না। ও বাসটা তো দেখছি সল্টলেক যাচ্ছে।

প্রৌঢ়টি বললেন, আমার বাসটা যে কোন গেটে আসবে, কখন ছাড়বে কিছুই বুঝতে পারছি না। আজকাল এই এক ফ্যাশান হয়েছে। অ্যানাউন্স করে না, বাস টাইমিং টিভি-তে দেখায়। তাতে আমার মতন লোকের কী সুবিধে হয়?

এবারে লক্ষ করলুম, লোকটির হাতের ছড়িটি সাদা রঙের। অর্থাৎ লোকটি অন্ধ।

সত্যিই তো, এখন অনেক জায়গাতেই টিভি-তে বাসের খবরাখবর দেখা যায় শুধু। তাতে আমাদের সুবিধে হলেও অন্ধদের কথা তো চিন্তা করা হয়নি।

আমি বললুম, আপনি কোথায় যাবেন? আমি জেনে দিতে পারি?

তুমি আমার জন্য এটুকু কষ্ট করবে? দ্যাট্স অফুলি কাইন্ড অফ্ ইউ!

ঘুরে এসে জানালুম, ওঁর ডেট্রয়েটের বাস ছাড়তে আরও ঠিক এক ঘণ্টা বাকি আছে। পাঁচ নম্বর গেটেই বাস ছাড়বে।

ভদ্রলোক আবার প্রচুর ধন্যবাদ জানিয়ে তারপব জিগ্যেস করলেন, তুমি কি ব্রিটিশ? তোমার উচ্চারণ শুনে মনে হচ্ছে—

আমি চমৎকৃত হলুম। আমার টুটো-ফুটো ইংরেজি শুনে এরকম কমপ্লিমেন্ট আগে আর কেউ দেয়নি।

—না আমি ভারতীয়। এ দেশের ভারতীয় নয়, ভারতের ভারতীয়।

লোকটি একটু চিন্তা করে বলল, তোমাদের ভারত এক সময় ব্রিটিশ কলোনি ছিল না? আমার মনে আছে, আমার গ্রান্ডফাদার তোমাদের দেশের খুব প্রশংসা করতেন। উনি ওঁর বাবার সঙ্গে আয়ারল্যান্ড ছেড়ে চলে এসেছিলেন এখানে। ওঁদের খুব রাগ ছিল ব্রিটিশদের ওপর।

—আপনারা আইরিশ?

—না, না, আমি আইরিশ নই। আমি অ্যামেরিকান। আমার পূর্বপুরুষ ছিল আইরিশ। অবশ্য, আয়ারল্যান্ড সম্পর্কে আমার মনে একটু দুর্বলতা আছে ঠিকই। এখন যে আয়ারল্যান্ডে মারামারি চলছে, সে জন্য আমি কনসার্নড হয়ে পড়ি মাঝে-মাঝে।

—আপনি সিস্টার নিবেদিতার নাম শুনেছেন?

—সে কে?

—আগে নাম ছিল মিস্ মার্গারেট নোবল। তিনি আমাদের দেশে গিয়ে হিন্দু হয়েছিলেন. আমাদের দেশের জন্য অনেক কাজ করেছেন।

—না, শুনিনি। আমি অনেক কিছুই জানি না। আমি বেশি লেখাপড়া জানা লোক নই। সারাজীবন কাজ করেছি একটা এক্সপ্লোসিভ ফ্যাক্টরিতে। এমনকী আয়ারল্যান্ড আমি কখনও দেখিনি। ঠাকুরদার কাছে গল্প শুনেছি শুধু। ভেবেছিলুম রিটায়ার করার পর সারা পৃথিবী ঘুরতে বেরুব, তখন একবার আয়ারল্যান্ডেও যাব। কিন্তু দু-বছর আগে অ্যাকসিডেন্ট হল, তাতে চোখ দুটো গেল। কোম্পানি অনেক টাকা দিয়েছে অবশ্য, কিন্তু আয়ারল্যান্ড আর আমার দেখা হবে না। তবে ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ, তিনি শুধু চোখ দুটো নিয়ে আমার প্রাণটা তো বাঁচিয়ে রেখেছেন—

বুঝলুম, ভদ্রলোক কথা বলতে ভালোবাসেন। চোখাচোখি হওয়ার সম্ভাবনা নেই বলে সব কথা না শুনলেও চলে। শুধু মাঝে-মাঝে হুঁ-হাঁ দিয়ে গেলেই হল। আমি সন্তর্পণে একটা গল্পের বই খুলতে যাচ্ছিলুম, এমন সময় তিনি জিগ্যেস করলেন, আচ্ছা বলো তো, অন্ধ হয়ে থাকার চেয়ে কি একেবারে মরে যাওয়া ভালো ছিল?

এরকম অদ্ভুত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। সুতরাং আমতা-আমতা করে ধোঁয়াটেভাবে বললুম, সেটা নির্ভর করে, কে কতটা জীবনকে ভালোবাসে—

ভদ্রলোক বললেন. আমি জীবনকে খুবই ভালোবাসি। শুধু বেঁচে থাকাই খুব সুন্দর। যখন কম

বয়স ছিল, তখন মনে হত, মৃত্যুটা কিছুই না, যে-কোনো সময় মরে গেলেই হয়। কিন্তু এখন বুঝতে পারি, মৃত্যুকে যতক্ষণ দূরে সরিয়ে রাখা যায়, ততই ভালো। তা ছাড়া, জানো, অন্ধ হলে এমন অনেক কিছু দেখতে পাওয়া যায় যা আমি আগে দেখিনি।

—যেমন?

—আমার স্ত্রী অ্যালাবামার মেয়ে। অ্যালাবামা কোথায় জানো?

—দক্ষিণ অঞ্চলে।

—এখানে কি কাছাকাছি কোনও নিগ্রো অর্থাৎ কালো লোক বসে আছে?

—আমি নিজেই তো কুচকুচে কালো।

—ভারতীয় কালো নয়, আমেরিকান কালো?

—না, এখানে আর কেউ বসে নেই।

—আমার স্ত্রী ওই কালোদের একদম দেখতে পারে না। আমার নিজেরও কিছু প্রেজুডিস ছিল। আমার মেয়ে একটা কালো ছেলের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করত, আমার ছেলের বন্ধুরা তাকে খুব ঠ্যাঙাল। তাতে আমরা খুশিই হয়েছিলাম। এখন বুঝতে পারি। মাই গড়, হোয়াট স্টুপিডিটি! মানুষের গায়ের রঙে কী আসে যায়? চোখ থাকতে সেটা বুঝতে পারিনি, সেজন্য এখন আমার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে।

এত সরল ব্যাখ্যা শুনে আমি ঠিক সন্তুষ্ট হতে পারলুম না। আমি কালো লোক বলেই কি লোকটি আমায় খুশি করার জন্য এই কথা বললেন? অবশ্য ওঁর গলায় বেশ একটা আন্তরিকতা আছে।

লোকটি আসলে খুব সরলই। এর পরেও উনি এমন সব সাদামাটা কথা বলতে লাগলেন, যা আসলে খুব সার সত্য হলেও সেসব কথা আমরা আজকাল আর মুখে আলোচনা করি না। যেমন এর পরেই তিনি বললেন, আগে আমার খুব টিভি দেখার বাতিক ছিল। কারখানা থেকে বাড়ি ফিরেই আঠার মতন চোখ আটকে রাখতুম টিভি'র পরদায়। এখন আর টিভি দেখি না। তবে রেডিও শুনি। মাই গড়, চারদিকে শুধু যুদ্ধের খবর আর খুনোখুনি। জীবন এত মূল্যবান, তবু মানুষ মানুষকে মারে কেন? ভগবান আমাদের জীবন দিয়েছেন, অথচ মানুষই তা নষ্ট করে দেয়।

এত সাদাসিধে আমেরিকানের সঙ্গে আগে আমার পরিচয় হয়নি। সুতরাং খানিকটা কৌতুকের সঙ্গেই আমি ওঁর কথা শুনতে লাগলুম।

হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে উনি আমায় জিগ্যেস করলেন, তুমি কি রিপাবলিক্যান?

আমি বললুম, আপনি ভুল করছেন, আমি এদেশের নাগরিক নই, বেড়াতে এসেছি মাত্র।

ভদ্রলোক আমার উত্তর গ্রাহ্য না করে বললেন, এই যে রেগান্, তুমি একে সাপোর্ট করো? মাই গড, এ তো দেশটার সর্বনাশ করে ছাড়বে। তুমি জানো, এবারের বাজেটে শিক্ষার জন্য টাকা কমিয়ে দিয়ে সেই টাকা ঢালছে অস্ত্র বানাবার জন্য। ইস্কুলের ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের খাবারের খরচ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছে। মাই গড, এ লোকটা কি বাচ্চাদেরও ভালোবাসে না? এ কি চায়, ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ায় চর্চা ছেড়ে দিয়ে সবাই সেনাবাহিনীতে নাম লেখাবে?

এরকম আলোচনায় অংশগ্রহণ করা আমার পক্ষে রীতিবিরুদ্ধ হবে বলে আমি চুপ করে রইলুম।

ভদ্রলোক আবার বললেন, আমি কালকেই খবরে শুনলুম, নেভাডায় মাটির নীচে আবার একটি আণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। এসব কীসের জন্য, বলতে পারো? আমরা আমেরিকানরা শান্তিতে থাকতে চাই। তুমি জানো নিশ্চয়ই, আমাদের সংবিধানে আছে আমরা কোনোদিনই অন্য দেশ আক্রমণ করব না। এটা আমি জানতুম না, রেডিয়োতেই একজন বলল। পেন্টাগানে কতকগুলো বাজপাখি বসে আছে, তাদের ডানায় ভর দিয়ে পৃথিবীটাকে ক্ষতবিক্ষত করে দেওয়ার জন্য উড়ে চলেছে এই রিপাবলিকান রেগন! এটা আমি একদিন স্বপ্নে দেখলুম, জানো! মাই গড়, ক্যালিফোর্নিয়ায় একটা যুদ্ধ-বিরোধী শান্তি মিছিলের ওপর পুলিশ হামলা করেছে। এ রকম কথা আগে কখনও শুনেছ?

ভদ্রলোক তাঁর একটা হাত তুলে মাথার চুলে বুলোতে লাগলেন। কালো চশমা-পরা চোখ দুটি আমার দিকে ফিরিয়ে বললেন, আমি যে কারখানায় এতদিন কাজ করেছি, সেখানে অস্ত্র বানানো হয়। আমি নিজেও এতদিন তা বানিয়েছি। সেইসব অস্ত্র পৃথিবীর অন্য অন্য দেশে যায়। এখন আমি বুঝতে পারছি, আমার মতন আরও কত মানুষ অন্ধ হয়, মানুষের হাত-পা ভাঙে, প্রাণও যায়। মাই গড এটা এতদিন আমি খেয়াল করিনি, আমি এত বোকা ছিলাম!

তারপর ধরা গলায় তিনি বললেন, ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ, তিনি আমায় অন্ধ করেছেন বলেই এখন আমি এসব বুঝতে পারছি। আসলে, যাদের চোখ আছে, তারাই বেশি অন্ধ। তাই না, তুমি এ কথা মানো না?

আমি বললুম, আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগল। আমার বাস এসে গেছে, আমি এবার উঠি?

—যুবক, তুমি কোথায় যাচ্ছ জিগ্যেস করতে পারি?

—আপাতত শিকাগো শহরে।

—যদি সময় পাও, পরশুদিন একবার ডেট্রয়েটে এসো। সেদিন ওখান থেকে আর একটা শান্তি মিছিল বেরুবে। তাতে যোগ দেওয়ার জন্যই আমি যাচ্ছি।

প্রৌঢ় এবারে তাঁর একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে। আমি সেই হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলুম। সেই হাতখানি বেশ আত্মীয়ের মতন উষ্ণ।

॥ ৪১ ॥

শিকাগো শহরের নামটির মধ্যেই একটা রোমাঞ্চ আছে। বাল্যকাল থেকেই আমাদের কাছে এই শহরটির সঙ্গে দুটি নাম জড়িত। স্বামী বিবেকানন্দ এবং আল্ কাপন। অবশ্য বাংলায় স্কুল পাঠ্য বিবেকানন্দ-জীবনীতে এখনও এই শহরটির নাম চিকাগো কেন লেখা হয় তা জানি না। আর এযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দস্যু আল্ কাপনের অনেক রোমহর্ষক কীর্তির কথাও আমরা নানান বইতে পড়েছি, ফিল্মেও দেখেছি।

অনেকদিন আগে প্রথমবার শিকাগো শহরে পা দেওয়ার মুহূর্তেও আমার ধারণা ছিল, এই শহরের পথেঘাটে বুঝি সব সময় মাফিয়ারা গুলিগোলা করছে। প্রথম দিনের অভিজ্ঞতায় আমার সেই ধারণা খানিকটা সমর্থিতও হয়েছিল। সেবারে উঠেছিলুম ডাউন টাউনে ওয়াই এম সি এ হস্টেলে। দুপুরবেলা খাবারের সন্ধানে সেখান থেকে সদ্য বেরিয়েছি, সাউথ ওয়াবাশ নামে রাস্তার ওপরে হঠাৎ দুদল লোক একটা খণ্ডযুদ্ধ শুরু করে দিল। ঠিক দু-মিনিটের মধ্যে এসে গেল পুলিশের গাড়ি, ততক্ষণে রাস্তা ফাঁকা, শুধু মাঝখানে পড়ে আছে একজন ছুরিবিদ্ধ মানুষ।

আমি এমনই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলুম যে পালাবার কথাও মনে পড়েনি। দাঁড়িয়ে ছিলুম দেওয়াল সেঁটে। একজন পুলিশ আড়চোখে কয়েকবার আমাকে দেখেও কিছু বলেনি অবশ্য। বোধহয় আমাকে ধর্তব্য বলেই মনে করেনি।

কোনও শহরে এসেই এরকম একটা প্রথম অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই সুখকর নয়। কিন্তু আরও কয়েকদিন কাটিয়ে দেওয়ার পর ওরকম দ্বিতীয় ঘটনা কিন্তু আমার আর চোখে পড়েনি। পরে আমার মনে হয়েছিল, শিকাগো শহর ওই ছোট্ট ঘটনাটি মঞ্চস্থ করেছিল বোধহয় শুধু আমাকেই ভয় পাইয়ে দেওয়ার জন্য। নইলে, এরকম একটা দৃশ্য কলকাতা, দিল্লি, বোম্বাইতেও এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। মানুষ তো সব জায়গাতেই মানুষকে ছুরি মারছে, নইলে ছুরির ব্যাবসা চলবে কেন?

শিকাগো শহরকে আসলে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। অন্যান্য বড় শহরের মতনই এই শহরটি হিংস্র, তার বেশি কিছু নয়। এক সময় বোধহয় হিংস্রতর ছিল, কিন্তু সেই আল্ কাপনদের দিন আর নেই, এখনকার দিনের মাফিয়াদের কায়দা অনেক সূক্ষ্ম হয়েছে, পথেঘাটে যখন তখন খুনোখুনির দরকার হয় না।

শিকাগো শহরের একটা উগ্র সৌন্দর্যও আছে। আমেরিকার একদিকে নিউ ইয়র্ক অন্যদিকে লস এঞ্জেলিস, মাঝখানে এই শিকাগো। দুই প্রান্তের দুটি শহরের তুলনায় শিকাগো-ও কিছুতেই কম যায় না। নিউ ইয়র্ক আর লস এঞ্জেলিস দুটিই সমুদ্র-উপকূলবর্তী, শিকাগোর কাছে সমুদ্র নেই বটে, তবে আছে লেক মিশিগান। এই হ্রদটিও সমুদ্র-প্রতিম, এর বুকে রীতিমতন জাহাজ চলে।

দৈর্ঘ্যে-প্রস্থেও শিকাগো বাড়ছে এবং ওপরদিকেও মাথা চাড়া দিচ্ছে। সিয়ার্স কোম্পানির বাড়ি যার নাম সিয়ার্স টাওয়ার, সেটা নাকি বর্তমান পৃথিবীর উচ্চতম হর্ম্য। আরও অনেক লম্বা-লম্বা বাড়ি দেখতে গিয়ে ঘাড় অনেকখানি পেছনে হেলে যায। এর মধ্যে দু-একটি বিশাল বাড়ির নকশা তৈরি করেছেন বাংলাদেশের একজন স্থপতি। কোনও বাঙালির এমন কৃতিত্বের কথা জেনে আমার গর্ব হয়।

আগের বারে সফরে এসে আমি শিকাগোয় এত লম্বা বাড়ির ছড়াছড়ি দেখিনি। লেক মিশিগানের ধার দিয়ে বেড়াতে-বেড়াতে ঠিক জলের বুক থেকে উঠে যাওয়া এক-একটি প্রাসাদ দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাই। সত্যি জলের ওপরে বাড়ি, কলকাতার অনেক মাল্টি স্টোরিড বিল্ডিং-এর যেমন নীচের তলাটায় শুধু গাড়ি থাকে, এখানে সেবকম রয়েছে মোটরবোট।

আকাশের অবস্থা ভালো নয়। প্রায়ই গুঁড়ো-গুঁড়ো বরফ পড়ছে। শিকাগোর তুষার ঝড় বিখ্যাত, একবার শুরু হলে আর থামতে চায় না। খবরের কাগজে প্রায়ই সেরকম ঝড়ের পূর্বাভাসের কথা জানাচ্ছে। আমার ইচ্ছে শুধু শিকাগোর আর্ট গ্যালারিগুলো দেখে শেষ করা। কিন্তু তা-ও সম্ভব হবে কি না জানি না।

মদনদা যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর বন্ধু গৌতম গুপ্তর সঙ্গে। উঠেছি সেই গৌতম গুপ্তর বাড়িতে। শহরতলিতে সুন্দর নিজস্ব বাড়ি। স্বামী-স্ত্রী ও দুটি ছেলেমেয়ের ছিমছাম সংসার। আমি এখানে চমৎকার আরামে আছি, শুধু একটাই অসুবিধে, এখান থেকে মধ্য শহর বেশ দূরে। আমি সপ্তাহের মাঝখানে এসে পড়ে খুব ভুল করেছি। সারা সপ্তাহ এখানে সবাই খুব ব্যস্ত থাকে, বেরিয়ে যেতে হয় কাক-ডাকা ভোরে, আর সন্ধেবেলা পরিশ্রান্ত হয়ে ফেরার পর আর কারুর বেরুবার উৎসাহ থাকে না। তবে গৌতমবাবু দু-এক সন্ধে আমাকে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছিলেন বলে আমি খুব লজ্জা পাচ্ছিলুম।

দুপুরের দিকে আমি একাই শহরে যাই ট্রেনে চেপে। এখানকার ট্রেনকে যদি আমাদের ট্রাম বলে গণ্য করা যায তা হলে ভাড়া খুব বেশি। পাঁচ-ছ' ডলার। আমার মতন পকেট-ঠনঠনদের বেশ গায়ে লাগে। এখানে অনেক দোকানের সেলে পাঁচ-ছ' ডলারে একটা জামা কিনতে পাওয়া যায়। সুতরাং ট্রাম ভাড়া একটা জামার দামের সমান?

একদিন দুপুরে বউদির হাতের অতীব সুস্বাদু রান্না খেয়ে সবে মশলা চিবুচ্ছি, এমন সময় বাইরের দরজায় একটা গাড়ি থামল। তারপর এ বাড়ির বেলই বেজে উঠল। বউদি দরজা খুলতেই একটি আঠারো-উনিশ বছরের বাঙালি তরুণ ভেতরে এসে বলল, উঃ রাস্তা খুঁজতে-খুঁজতে হয়রান। যা ঘুরতে হয়েছে না।

ছেলেটিকে আমিও চিনি না, বউদিও চেনেন না।

সে আবার আমার দিকে চেয়ে বললেন, চলুন, চলুন, ব্যাগ গুছিয়ে নিন। আমি বেশি দেরি করতে পারব না।

আমি অবাক হয়ে বললুম, আমায় যেতে হবে? কোথায়?

ছেলেটি একটু ধমকের সুরে বলল, কোথায় মানে? আমাদের বাড়িতে।

আমি আমতা-আমতা করে বললুম, না, মানে, আমি তো আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না। তা ছাড়া আমি এখানে তো বেশ ভালোই আছি।

ছেলেটি বলল, এখানে আপনি ভালো নেই, তা কি আমি বলেছি? এই বউদি নিশ্চয়ই আপনাকে

অনেক যত্ন করেছেন। অনেক যত্ন তো পেয়েছেন, এবারে আমাদের ওখানে চলুন।

তারপর বউদির দিকে ফিরে সে বলল, কি বউদি, বলুন! আপনার এখানে তো ক'দিন রইলই। এবার নীলুদার কয়েকটা দিন আমাদের কাছে থাকা উচিত নয়?

বউটি বললেন, আপনাকে তো চিনতে পারলুম না।

ছেলেটি বলল, আমার নাম বললেও আমায় চিনতে পারবেন না। তা ছাড়া নাম দিয়ে কী দরকার? মনে করুন আমি একজন মানুষ। আমার সঙ্গে যেতে আপনার আপত্তি আছে নীলুদা?

আমি বললুম, না, না, আপত্তি থাকবে কেন? তবে ঠিক বুঝতে পারছি না কোথায় যেতে হবে।

ছেলেটি এবার আমার দিকে চোখ পাকিয়ে বলল, মনে করুন আপনাকে আমি কিড্‌ন্যাপ করে নিয়ে যাচ্ছি। তারপর আপনার বাড়ির কাছ থেকে র‍্যানসম দাবি করব। কত চাওয়া যায় বলুন তো?

আমি বললুম, আমার বাড়ির লোক বলবে, ওকে যদি আর কখনও না ফেরত পাঠাও তা হলে বরং দু-চার পয়সা দিতে পারি।

ছেলেটি হাহা করে হেসে উঠল।

ছেলেটিকে প্রথম দর্শনেই আমার দারুণ ভালো লেগে গিয়েছিল। ওর মুখে সারল্য আর দুষ্টুমি সমানভাবে মিশে আছে।

সে আবার বলল, আমি কিন্তু সত্যিই আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছি। আমার দাদা বলল, নীললোহিত এসে শিকাগো শহরে থাকবে অথচ আমাদের বাড়িতে একবারও আসবে না? যা তো, ধরে নিয়ে আয়।

—তোমার দাদা কে ভাই?

—সুব্রত চৌধুরি।

এবারে আমার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। এই সুব্রত চৌধুরিকেও আমি কখনও চোখে দেখিনি বটে, তবে দু-একবার টেলিফোনে কথা হয়েছে। আমার এক বন্ধুর বন্ধু। কিন্তু শুনেছিলুম যে সে এখন পড়াশুনো নিয়ে খুব ব্যস্ত, তাই শিকাগোতে এসে তার সঙ্গে যোগাযোগ করিনি। আমি শিকাগোতে এসে যে গৌতম গুপ্তর বাড়িতে উঠেছি, সে খবর ওরা পেল কী করে কে জানে?

বউদির কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আমি আমার পোটলাপুঁটলি নিয়ে উঠলুম ছেলেটির গাড়িতে। গাড়ি ছাড়বার পর আমি জিগ্যেস করলুম, আমার নাম নীলু, তোমার নামটা এবারে জানতে পারি কি?

সে বলল, আমার নাম টুটুল। হোল ওয়ার্লড আমাকে এই নামে চেনে।

আমি বললুম, তা তো বটেই। এই নাম আমি কত জায়গায় শুনে এসেছি।

—আমি যেতে-যেতে কয়েকবার রাস্তা ভুল করব, পুলিশ টিকিটও দিতে পারে, তবে ভয় নেই, অ্যাকসিডেন্ট হবে না। আমি খুব ভালো গাড়ি চালাই।

—আমার অ্যাকসিডেন্টের কোনও ভয় নেই। গোটা একটা বাস উলটে গেলেও আমি অক্ষত থেকেছি। একবার আমি একটা প্লেনে উঠতে পারিনি সময়ের অভাবে, সেই প্লেনটাই দুর্ঘটনায় পড়ে চুরমার হয়ে যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আমি অমর।

টুটুল হোহো করে হেসে উঠে বলল, যাক বাঁচা গেল। আমি ভেবেছিলুম, আপনি গম্ভীর লোক। আমি গম্ভীর লোকদের বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারি না।

—আমি কিন্তু একবার কথা বলতে শুরু করলে আর থামি না। আমায় জোর করে থামাতে হয়।

গাড়িটা প্রায় একটা মাঠের মধ্যে পৌঁছে গিয়ে থামল। টুটুল বলল, এইবার কোন দিকে? দেখা যাক, ম্যাপে কী বলে!

টুটুলের চেহারাটা এতই বাচ্চা যে ওর লাইসেন্স আছে কি না তাতেই সন্দেহ হতে পারে। আমার

অবশ্য এরকম উলটোপালটা গাড়ি চালানো বেশ ভালোই লাগে। সবাই কি পৃথিবীর সব কিছু ঠিকঠাক নির্ভুলভাবে চালিয়ে যাবে?

অবশ্য খুব বেশি ঘুরতে হল না, বিকেলের মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলুম ওদের বাড়িতে। আলাদা বাড়ি না, অ্যাপার্টমেন্ট, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকার একেবারে গায়েই বলতে গেলে। মিশিগান হ্রদও খুবই কাছে।

অ্যাপার্টমেন্টে আপাতত আর কেউ নেই। মাঝখানের বসবার ঘরটি দেখলে মনে হয় এই মাত্র যেন এখানে খুব তুমুল আড্ডা চলছিল, হঠাৎ সবাই এক সঙ্গে উঠে গেছে।

টুটুল এরই মধ্যে আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসে বলল, শোনো, নীলুদা, তুমি কী-কী দেখতে চাও সব ছকে ফ্যালো। তোমাকে আমরা প্রত্যেকটি জিনিস ঘুরে দেখিয়ে দেব। তুমি গঙ্গানগর নাম শুনেছ?

—গঙ্গানগর?

—শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত সাহেবরা গঙ্গা নাম দিয়ে একটা নতুন শহর বানাচ্ছে। সেটা আমি ছাড়া তোমায় আর কেউ দেখাতে পারবে না।

—বাঃ, খুব চমৎকার।

—এখন তুমি একটু একা থাকো। ইচ্ছে হলে কিচেনে গিয়ে চা-টা বানিয়ে নিতে পারো। খিদে পেলে ফ্রিজ খুলে দেখে নিও কী পাও। আর হুইস্কি টুইস্কি পান করতে চাইলে তাও পেয়ে যাবে। এবাড়িতে আমরা কেউ ড্রিংক করি না, তবে অতিথিদের জন্য সব রাখি। আমি এখন একটু ঘুরে আসছি, আমার ক্লাস আছে।

বলেই সে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল। একটি অপরিচিত বাড়িতে আমি সম্পূর্ণ একা। প্রথমে একটু অস্বস্তি লাগলেও সেটা কাটিয়ে ফেললুম।

আরাম কেদারায় বসে বইটই পড়ছি, এমন সময় দরজায় খুটখুট শব্দ হল। কেউ যেন খুব সন্তর্পণে তালা খুলছে। এই রে, চোরটোর নয়তো। শরীরে একটা শিহরন খেলে গেল।

দরজা খুলে ঢুকল একজন বলিষ্ঠকায় তরুণ। আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, আপনিই কি সুব্রত চৌধুরি?

তরুণটি বলল, না। আমার নাম বাবলু। আপনি নীলুদা তো? টুটুল আপনাকে ঠিক মতন নিয়ে এসেছে, কোনও অসুবিধে হয়নি?

আমি বললুম, না, না। খুব মজাসে গল্প করতে-করতে এসেছি।

—ও খুব ভালো গাড়ি চালায়, তবে রাস্তা ভুলে যায়। আপনি কিছু খেয়েছেন? খাবার বানিয়ে দেব।

—না, না, আমার খিদে পায়নি। দুপুরে খুব ভারী লাঞ্চ খেয়েছি।

বাবুল তবু চা তৈরি করে ফেলল। তারপর খুব কাঁচুমাচুভাবে বলল, আপনার কি একটু একা থাকতে কষ্ট হবে? আমি এতক্ষণ চাকরি করে এলুম, এবার একটা ক্লাস করতে যাব। টুক করে ঘুরে আসব, অ্যাঁ?

আবার আমি একা। আধঘণ্টা বাদে আবার দরজায় সেই রকম খুটখাট শব্দ। আমি ভাবছি, এবার কি টুটুল ফিরল, না অন্য কেউ?

দরজা খুলে প্রথমে ঢুকল একটি মেয়ে। মাথায় কোঁকড়া চুল, মুখখানা প্রতিমার মুখের মতন। আমায় দেখে সে একটু থমকে গেল। তারপর ঢুকল একজন ফরসা চেহারার যুবক, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা।

আমি জিগ্যেস করলুম কাকে চাই? আপনারা ঠিক বাড়িতে এসেছেন তো?

ফরসা যুবকটি হেসে বলল, আপনিই নিশ্চয়ই নীললোহিত? আমার নাম পিন্টু।

আমি বললুম, টুটুল, বাবলু, পিন্টু। বাঃ, খুব চমৎকার নাম। কিন্তু এর মধ্যে সুব্রত চৌধুরি কে?

পিন্টু বলল, আমিই। আর এ আমার স্ত্রী প্রভাতি।

প্রভাতি বলল, ও মা, এই নীললোহিত? আমি ভেবেছিলুম বুঝি ভারিক্কি চেহারার কোনও লোক হবে।

পিন্টু বলল, আজ কার ভাত রাঁধার টার্ন?

প্রভাতি বলল, তোমার।

—কিন্তু আমার যে রাত্তিরে একটা ক্লাস আছে।

—তা হলে ভাতটা আমি করে দিচ্ছি। বাবলু এসে মাংস রাঁধবে।

একটু বাদেই আবার বেরুতে হবে। সুব্রত পুরো পোশাক ছাড়ল না। চায়ের কাপ নিয়ে বসে সে বলল, আপনার কোনও অসুবিধা হবে না। আমরা সবাই পড়ি আবার চাকরিও করি। তবে পালা করে একজন আপনাকে সঙ্গ দেব। আর রাত্তিরে আড্ডা হবে একসঙ্গে। তারপর শনিবার-রবিবার এলে তো খুব বেড়ানো যাবে কেমন?

আমি বললুম, আমার একা থাকা নিয়ে আপনারা চিন্তা করবেন না। আমি মাঝে-মাঝে একাই বাইরে থেকে ঘুরে আসব।

সুব্রত বলল, একা ঘুরবেন? গাড়ি ছাড়া? দেখুন, এই জানলার কাছে আসুন।

সুব্রত জানলার পরদা সরাল। বাইরে অঝোর ধারায় বরফ পড়ছে। এর মধ্যে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ানোর কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

চমৎকার এদের সংসারটি। একটা মেসের ঘর বলে মনে হতে পারত। কিন্তু প্রভাতি থাকায় পারিবারিক আবহাওয়াটা বজায় আছে। প্রভাতিও বলতে গেলে বাচ্চা মেয়ে, মাত্র কিছুদিন আগে তার বিয়ে হয়েছে, তার দুই দেওর তাকে নানান ছুতোয় রাগিয়ে দেয় মাঝে-মাঝে।

এ দেশে পড়াশুনোর শেষ নেই। মধ্য বয়েসেও অনেকেই ছাত্র থাকে। এদের মধ্যে সুব্রত ইঞ্জিনিয়ার ও খুব বড় চাকরি করে, তবু সে আরও দু-একটি কোর্স নিয়ে যোগ্যতা বাড়াচ্ছে। তার ছোট দুই ভাইকে সে একে-একে আনিয়েছে দেশ থেকে। ওদের আরও দুই দাদা থাকেন এ দেশে।

পিন্টু-বাবলু-টুটুল আর প্রভাতি যেমন অতিথিবৎসল আর পরোপকারী তেমনি লাজুক। ওরা নিজেদের বিষয়ে কিছু বলে না, কিন্তু দুদিনেই বুঝতে পারলুম, শিকাগোতে কোনও ভারতীয় কোনও বিপদে পড়লে ওরা নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করবার জন্য ছুটে যায়। কার থাকার জায়গা নেই, কে হঠাৎ এয়ারপোর্টে এসে পড়েছে কিন্তু গাড়ি পাচ্ছে না, সবই ব্যবস্থা করা যেন ওদের দায়িত্ব। শুধু ভারতীয় কেন, বাংলাদেশেরও অনেকে এসে থেকে যায় ওদের কাছে।

সকালে উঠে আমি বসবার ঘরে একটা চেয়ারে বসি। ওরা তিন ভাই আর প্রভাতি দাবা খেলার মতন কখনও দুজন থাকে দুজন বেরিয়ে যায়। কখনও একজন একটা আইটেম রান্না করে চলে যায়, আর একজন এসে অন্য কিছু রান্না করে। এরই ফাঁকে-ফাঁকে আড্ডা। আমিই শুধু কনস্ট্যান্ট ফ্যাক্টর।

তারপর এল শনিবার। আজ সবার ছুটি। আজ তো বেড়াতে যেতেই হবে। কিন্তু সারাদিনই ছুটি যখন, তখন তাড়াহুড়োর তো কিছু নেই। কাপের পর কাপ চা খেয়ে যাচ্ছি। ভাইদের মধ্যে বাবুল নিঃশব্দ কর্মী। আড্ডার ফাঁকে-ফাঁকে সে সংসারের অনেক কাজ সেরে ফেলে। আবার বাইরেও ঘুরে আসে। টুটুল সবচেয়ে ছোট ভাই এবং আদরের, তাকে বিশেষ কাজ দেওয়া হয় না। আর সুব্রত এই পরিবারের কর্তা হিসেবে চেয়ারে বসে নানান রকম নির্দেশ দিতে ভালোবাসে।

হঠাৎ এক সময় খেয়াল করলুম সন্ধে হয়ে গেছে। সারাদিন আমরা একভাবে বসে আড্ডা দিয়েছি। বাইরে বরফ পড়ছে অঝোরে। এখন আর বেরুবার কোনও মানে হয় না। আমারও খুব একটা গরজ নেই। ঠিক হল, পরদিন আমরা খুব ভোরে উঠে তৈরি হব।

পরের দিন রবিবার। সেদিন আমরা ঘুম ভেঙে প্রথম কাপ চা খেলুম দুপুর সাড়ে বারোটায়। আজও বরফ পড়ার বিরাম নেই। কে আর এই দুর্যোগে বেরুতে চায়।

এর মধ্যে আমি যেন ওদের আত্মীয় হয়ে গেছি। বাইরে বরফ আর ঠান্ডা, তার চেয়ে ঘরের মধ্যেকার আন্তরিকতা ও আড্ডার উষ্ণতা অনেক বেশি উপভোগ্য।

।। ৪২ ।।

নিউ ইয়র্কে আমার স্কুলের বন্ধু সূর্যর সঙ্গে দেখা হয়েছিল দৈবাৎ এক পার্টিতে। সে যে এদেশে আছে আমি জানতুম না, অনেকদিন ওর সঙ্গে যোগাযোগই নেই। কিন্তু স্কুলের বন্ধুদের কেউ কখনও ভোলে না। সুটটাই পরা লম্বা-চওড়া বলিষ্ঠকায় মানুষকে দেখেও আমি তার মুখে আদল পেলুম আমার সহপাঠী এক কিশোরের। তার কাছে গিয়ে কাঁধে চাপড় মেরে বলেছিলুম, সূর্য না? সূর্যও সঙ্গে-সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে বলেছিল, নীলু? তুই?

আমার চেয়েও সূর্যই বেশি অবাক হয়েছিল। কারণ আমাকে ও কোনওদিন নিউ ইয়র্কে দেখবে, এরকম ওর সুদূরতম কল্পনাতেও ছিল না। আমার সহপাঠীদের মধ্যে অনেকেই জীবনে যথেষ্ট উন্নতি করেছে, সূর্য নিজেও একজন ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু ওরা সবাই জানে, শুধু আমারই কিছু হল না, লেখাপড়াতেও সুবিধে করতে পারিনি, চাকরির ব্যাপারেও গাড্ডু পাওয়া, আমি এখনও একটা ভ্যাগাবন্ডই রয়ে গেছি।

স্কুলের বন্ধুর সঙ্গে ফর্মালিটির ব্যাপার নেই। সুতরাং অন্য কেউ এ পর্যন্ত যে কথা জিগ্যেস করেনি, সূর্য সরাসরি তাই জানতে চাইল, তুই এদেশে কী করে এলি রে নীলু? তোকে কে পাঠাল?

আমি বললুম, সুব্রতকে চিনতিস তো? সেই সুব্রতর মামার বিরাট ট্রাভেল এজেন্সি আছে। কেন জানি না, উনি আমায় খুব ভালোবাসেন। উনি আমায় বিনে পয়সায় একটা রিটার্ন টিকিট দিয়েছেন। আর দিয়েছিলেন দুশো ডলার। তাই নিয়ে ভেসে পড়েছি। তারপর এর-ওর বাড়িতে থাকছি। একদম টাকা ফুরিয়ে গেলে রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে ভিক্ষে করি। হরে কৃষ্ণ হরে রাম গানটা এখানে বেশ চলে, সবাই পয়সা দেয়।

আমার কথাটা কতটা সত্যি আর কতটা ইয়ার্কি তা সূর্য হয়তো ঠিক বুঝল না। কিন্তু সে খুব আফসোস করতে লাগল। কারণ, পরের দিন সকালেই সে নাইজিরিয়া চলে যাবে। আমার সঙ্গে সময় কাটাতে পারবে না।

যাই হোক, সেই রাত্রে সূর্য আমাকে একটা চাবি দিয়েছিল। বলেছিল, তুই যদি কখনও শিকাগোর দিকে যাস, তাহলে আমার বাড়িতে একবার যাস। ছোট্ট জায়গা, কিন্তু তোর ভালো লাগবে। তুই ওখানে যতদিন ইচ্ছে থাকতে পারিস। আমার স্টোরে দেখবি চাল-ডাল মজুত আছে প্রচুর, দেশ থেকে আনা আচার আছে। তুই রান্না করে খাবি। মাসদেড়েক পরেই আমি ফিরে আসব—।

আমি বলেছিলুম, তুই চাবি দিচ্ছিস, যদি আমার ওদিকে না যাওয়া হয়?

সূর্য বলেছিল, তাতে কোনও অসুবিধে নেই। চাবিটা তুই একটা খামে ভরে আমার ঠিকানায় পোস্ট করে দিবি। আর যদি যাস তো ফেরার সময় চাবিটা আমার লেটার বক্সে রেখে আসবি।

সূর্যর সেই চাবিটা এতদিন আমার পকেটেই রয়ে গেছে। শিকাগোতে এসে দোনামনা করতে লাগলুম, যাব কি যাব না। নিউ ইয়র্কে সেই দেখা হওয়ার পর মাস দেড়েক কেটে গেছে, এর মধ্যে সূর্য ফিরে আসতেও পারে। তাহলে একটা চান্স নেওয়া যাক। সূর্যকে পেলে কয়েকদিন বেশ চুটিয়ে ছেলেবেলার গল্প করা যাবে।

সিভার র‍্যাপিডস একটা ছোট্ট শহর। দোকানপাট বা রাস্তার বহর দেখলে অবশ্য ছোট্টত্ব বোঝবার উপায় নেই। কয়েকটি দোকান সত্যিই বিরাট। কিন্তু মার্কিন দেশের সিভার র‍্যাপিডস-এর চেয়ে বড় শহর অন্তত দুশোটা আছে।

সূর্য তার বাড়ির অবস্থান বেশ ভালো করেই বুঝিয়ে দিয়েছিল। সুতরাং খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না। একটি বিরাট জলাশয়ের প্রান্তে একটি দশতলা অ্যাপার্টমেন্ট হাউস। বাড়িটিতে প্রায় চারশো অ্যাপার্টমেন্ট আছে। পুরো একটি পাড়াই বলা যায়। এই বাড়ির মধ্যেই রয়েছে দুটি ঢাকা সুইমিং পুল, যেখানে শীতকালেও সাঁতার কাটা যায়, দুটি টেনিস কোর্ট, তা ছাড়া সনা বাথ্ ও নানারকম খেলার ব্যবস্থা ও লাইব্রেরি। ইউনিভার্সিটির অনেক ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপক থাকেন এখানে।

সূর্য এখনও ফেরেনি। একতলার অফিস ঘরে খোঁজ নিয়ে জানলুম। তারপর তাদের জানিয়ে আমি চলে এলুম সূর্যর ঘরের দিকে। ওর অ্যাপার্টমেন্ট আটতলায়। চাবি খোলার আগেই শুনতে পেলুম। ঘরের মধ্যে কারা যেন বেশ জোরে-জোরে কথা বলছে। তাহলে কি অন্য কেউ আছে? কিন্তু আমি এসে পড়েছি, এখন তো ফিরে যেতে পারব না। কয়েকবার বেল দিলুম, কেউ দরজা খুলল না। অথচ ভেতরে কথাবার্তা চলছেই। যা থাকে কপালে বলে ঘুরিয়ে দিলুম চাবি।

প্রথমে বসবার ঘর। সেখানে কেউ নেই। পাশে রান্নাঘর। উঁকি দিলুম সেখানে, কারুকে দেখতে পাওয়া গেল না। কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে পাশের শয়ন কক্ষ থেকে। কয়েকবার সে দরজায় ঠকঠক করলুম, তাও কেউ সাড়া দিল না। তারপর সেই দরজাটা ঠেলে খুলে ফেলতেই রহস্যটা বোঝা গেল। টিভি-টা খোলা রয়েছে।

হ্যাঁ, ইস্কুল-জীবনেও সূর্য বেশ ভুলোমনা ছেলে ছিল বটে, এখানে এসেও শোধরায়নি। যাওয়ার সময় টিভি বন্ধ করতে ভুলে গেছে, দেড় মাস ধরে সেটা একটানা চলছে। দেশে ফিরে গিয়ে সূর্যর মাকে জানাতে হবে এ কথা।

সূর্যর অ্যাপার্টমেন্টটা বেশ বড়, একলা মানুষের পক্ষে অঢেল জায়গা। তার শয়নকক্ষের জানলা দিয়ে দেখা যায় সেই জলাশয়টি, আর বসবার ঘরের জানলা দিয়ে দেখা যায় একটা জঙ্গল।

সূর্যর ভাঁড়ারেও অনেক জিনিস মজুত আছে, চাল-ডাল-আলু-পেঁয়াজ, সূর্যমুখী তেল, আর নানা রকম গুঁড়ো মশলা, হলুদ-লঙ্কা-জিরে আরও কত কী। আর কিছু না হোক আমি খিচুড়ি খেয়েই বেশ কিছুদিন এখানে চালিয়ে দিতে পারব।

হিসেব করে দেখলুম, আমি প্রায় পাঁচ মাস ধরে ইউরোপ, কানাডা ও আমেরিকায় চরকি বাজির মতন ঘুরছি। এখন এখানে কয়েকদিন একেবারে চুপচাপ বিশ্রাম নিলে মন্দ হয় না। এই শহরে আমায় কেউ চেনে না। আমিও কারুকেই চিনি না। সুতরাং এখানে আমার হবে অজ্ঞাতবাস।

প্রথম দুদিন একলা এই অ্যাপার্টমেন্ট-এ কাটিয়ে দিলুম। একবারের জন্যও বাইরে পা দিইনি। অবশ্য ঠিক একলা নয়, টেলিভিশন আছে সর্বক্ষণের সঙ্গী। প্রথম এসে সেই যে এক ডেকচি খিচুড়ি রেঁধেছি, চারবেলা ধরে তা-ই খাচ্ছি। ফ্রিজে রাখা খিচুড়ি জমে একেবারে শক্ত হয়ে যায়। তার থেকে এক স্লাইস কেটে নিই, ঠিক যেন মনে হয় খিচুড়ির কেক। সেটার সঙ্গে একটু জল মিশিয়ে গরম করে নিলেই হল। খাবারটা আমি বিছানায় শুয়ে-শুয়েই সেরে নিই। রাত্তিরবেলা টিভি-তে সলিড গোল্ড অনুষ্ঠানে নর্তকীদের নাচ, আমি বিছানায় অর্ধেক হেলান দিয়ে শোওয়া, হাতে খাবারের পাত্র—রোমান সম্রাটের সঙ্গে আমার তফাত কী? ছবিটাকে আর একটু নিখুঁত করার জন্য আমি এতে একটা সুরার পাত্র যোগ করতে চেয়েছিলুম, কিন্তু সূর্যর ঘরে ওয়াইন-জাতীয় কিছু নেই, আছে মস্ত বড় কোকাকোলার বোতল। তার থেকেই ঢেলে নিই গেলাসে, কেউ যদি ছবি তোলে তাহলে এই কোকাকোলাকেই রাম মনে হবে।

তৃতীয় দিন সকালে প্রাণটা একটু আনচান করতে লাগল। আর কিছু নয়, ডিমের জন্য। পশ্চিমি সভ্যতা আমাদের প্রত্যেক দিন সকালে ডিম খাওয়ার বদ অভ্যেস ধরিয়ে দিয়েছে। তা ছাড়া খিচুড়ির সঙ্গে ডিম ভাজা অতি উপাদেয়।

আসবার দিন কাছেই একটা শপিং মল দেখে এসেছিলুম। নিজের গাড়ি না থাকলে এখন বেশি দূরে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। কাল সন্ধে থেকে তুষারপাত থামলেও রাস্তায় জমে আছে

বরফ। তা ছাড়া, তুষারপাতের সময়ই শীত একটু কম থাকে, রোদ উঠলেই কনকনে শীত। ধরাচুড়ো সব পরে নিয়ে বেরুলাম। কাছেই একটা ব্যাঙ্কের মাথায় তাপাঙ্ক নির্দেশক ঘড়ি আছে। সেখানে দেখলুম, শূন্যের নীচে সাত ডিগ্রি নেমেছে। এই তো সবে শুরু। এখনও ক্রিসমাসের একুশ দিন বাকি। এই সব অঞ্চলে শূন্যের নীচে তিরিশ পর্যন্ত নেমে যায়।

শপিং মলে গিয়েই একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল। সামনেই একটা ছোটখাটো ভিড়, মানুষজন গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি এর আগে এ দেশের কোথাও কোনও রাস্তায় এরকম গোল হয়ে দাঁড়ানো ভিড় দেখিনি। এদেশের রাস্তায় পকেটমার ধরা পড়ে না, গাড়ির অ্যাকসিডেন্ট হলেও অন্য কেউ গ্রাহ্য করে না, এমনকী কেউ কারুকে খুন করলেও অন্যরা ফিরে না তাকিয়ে সোজা হেঁটে যায়।

এগিয়ে গিয়ে উঁকি মেরে আরও অবাক হলুম। ভিড়ের মাঝখানে একটা বিরাট শিংওয়ালা হরিণ। হরিণটির একটা পা কোনও কারণে জখম হয়েছে, উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেও সে পারছে না। আমাদের দেশের এরকম একটা ব্যাপার হলে সবাই উত্তেজিতভাবে চ্যাঁচামেচি করত, এখানে জনতা একেবারে নিস্তব্ধ। আমি একজন বয়স্ক লোককে ফিসফিস করে জিগ্যেস করলুম ঘটনাটা কী? উনি আমাকে সংক্ষেপে জানিয়ে দিলেন।

কাছাকাছি কোনও জঙ্গল থেকে এই হরিণটা হঠাৎ শহরে চলে এসেছে। দিনের আলোয় এরকমভাবে কোনও হরিণকে কেউ আগে কখনও আসতে দেখেনি। হরিণটা কেন এসে পড়েছে কে জানে! কিন্তু শপিং মলের সামনে অজস্র গাড়ির সামনে পড়ে সে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। এদিকে-ওদিকে ছুটতে শুরু করে। গাড়ির চালকরা ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ওরই দোষে একটা গাড়ির সঙ্গে ওর ধাক্কা লেগেছে।

হরিণটার টানা-টানা কাজল আঁকা চোখ, মাথায় শিং-এর ডালপালা, গায়ের চামড়া হলুদ আর সবুজ মেলানো। অতবড় শরীরটা নিয়ে সে অসহায়ভাবে তাকাচ্ছে।

এ দেশের মানুষ হরিণ খুব ভালোবাসে। গোটা আমেরিকা জুড়ে সরীসৃপের মতন অসংখ্য রাস্তা, তার অনেক রাস্তাই গেছে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। সেসব রাস্তায় যেতে-যেতে অনেক বোর্ড দেখেছি, কশান! ডিয়ার ক্রসিং। সেই সব জায়গা দিয়ে সাবধানে, আস্তে গাড়ি চালানো নিয়ম। একদিন রাত্তিরবেলা দীপকদাদের সঙ্গে গাড়িতে আসতে-আসতে হেড লাইটের আলোয় এরকম একটা হরিণকে রাস্তা পার হতেও দেখেছিলুম। কিন্তু শহরের মোটর গাড়ির জঙ্গলের মধ্যে এরকম একটি বন্য হরিণকে কেমন যেন করুণ আর বেমানান লাগে।

হরিণ মারার ব্যাপারে অনেক বিধিনিষেধ আছে। অথচ আহত হরিণটিকে জঙ্গলে কী করে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, তাই বা কে জানে। পুলিশ এসে গেছে, নানান রকম জল্পনাকল্পনা চলছে। হরিণটা এত জোর শিং ঝাঁকাচ্ছে যে কাছে গিয়ে ওকে ধরাও খুব শক্ত। এদেশের যা ব্যাপার, হয়তো বিশাল এক ক্রেন এনে হরিণটাকে তুলে নিয়ে যাবে। সে দৃশ্য দেখবার জন্য আমি আর সেখানে দাঁড়ালুম না।

সূর্যর অ্যাপার্টমেন্টে থাকার সময় আমার আর একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল।

প্রথম দিন ডিম ভাজতে গিয়েই ঘরের মধ্যে কোথায় যেন বেশ জোরে প্যাঁক করে একটা শব্দ হল। একলা ঘরে এরকম কোনও শব্দ শুনলে চমকে উঠতেই হয়। আওয়াজটা এমন যেন কোনও দুষ্টু ছেলে লুকিয়ে থেকে তালপাতার সানাই বাজাচ্ছে। আরও দু-বার ওইরকম প্যাঁক প্যাঁক হতেই কারণটা আন্দাজ করতে পারলুম।

আমার আনাড়ি হাতে ডিম ভাজার জন্য তেল ঢালতে গিয়ে সসপ্যানে একটু বেশি তেল পড়ে গেছে। গ্যাসের আঁচটাও বেশি। তাই ধোঁয়া হয়েছে। ওই প্যাঁকটা হচ্ছে স্মোক অ্যালার্ম। এইসব বড়-বড় বাড়িতে আগুন লাগার খুব ভয়। তাই একটু ধোঁয়া উঠলেই সাবধান করে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

স্মোক অ্যালার্ম যন্ত্রটা আমি আগে দেখেছি। কিন্তু এই অ্যাপার্টমেন্টে সেটা কোথায়? খুঁজে দেখলুম, বসবার ঘরের আর শোওয়ার ঘরের দেওয়ালে দুটো সেই গোল যন্ত্র লাগানো আছে।

ধোঁয়া যতক্ষণ না বেরুবে ততক্ষণ মাঝে-মাঝেই এরকম প্যাঁকপ্যাঁক চলবে। শীতের জন্য জানলা খোলার কোনও উপায় নেই। কে যেন আমায় বলেছিল, জল ছিটিয়ে দিলে ওই প্যাঁকপ্যাঁকানি বন্ধ হয়। কিন্তু জল ছিটাতে আমি সাহস না করে ফ্রিজ থেকে বরফের ট্রে বার করে একটা যন্ত্রের ওপর চেপে ধরলুম। তাতে সাময়িকভাবে সে শান্ত হল।

কিন্তু ততক্ষণে আমার ভয় ঢুকে গেছে। আজই আমি ডিম কিনতে গিয়ে এক দোকানে বেশ টাটকা বাঁশপাতা মাছ দেখতে পেয়ে লোভের বশে কিনে এনেছি। এদেশে এসে বহুদিন কুচো মাছ খাইনি। ভেবেছিলুম মাছ ভাজা খাব।

কিন্তু ধোঁয়াহীন মাছ ভাজা কী করে সম্ভব, তা তো আমি জানি না।

একদিন বাদ দিয়ে পরের দিন ভরসা করে শুরু করলুম মাছ ভাজতে। আঁচ খুব কম, তেলও দিয়েছি যৎসামান্য। বরফের ট্রে চেপে ধরলুম, কোনও কাজ হল না। ডিমের ধোঁয়া যদি বা সহ্য করেছে, মাছের ধোঁয়া কিছুতেই সহ্য করছে না।

দরজায় কে যেন বেল দিল। আমি দরজা খুলতেই একজন কৃষ্ণকায় লোক রাগি মুখে ঘরের মধ্যে ঢুকে এসে বলল, হোয়াটস হ্যাপেনিং?

আমি তাকে ব্যাপারটা বোঝাতে যেতেই সে পুরোটা না শুনে দু-দেওয়াল থেকে টপটপ যন্ত্র দুটো খুলে ফেলল। তারপর সে-দুটো টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে আর কোনও কথা না বলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তারপর আওয়াজ একেবারেই বন্ধ।

আমি মনে-মনে বললুম, কে-হে তুমি উপকারী বন্ধু?

এরপর আমি নিশ্চিন্তে মাছ ভাজলুম। ঘর ধোঁয়ায় ভরতি হয়ে গেল। কিন্তু কেউ আর প্যাঁকপ্যাঁক করল না।

দু-তিনদিন নিশ্চিন্তে কাটল। তারপর হঠাৎ একদিন মাঝরাত্তিরে আমি আঁতকে উঠলুম। দুটি যন্ত্রই পর্যায়ক্রমে প্যাঁকপ্যাঁক শুরু করেছে। আমি ধড়মড় করে উঠে বসলুম। সত্যি কি তাহলে ঘরে আগুন লেগেছে?

সমস্ত অ্যাপার্টমেন্টটা খুঁজে দেখলুম তন্নতন্ন করে। কোথাও আগুন নেই, ধোঁয়া নেই, কোনও আলো জ্বলছে না। কোনও গরম-জলের কলও খোলা নেই। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলুম না। সারারাত ওইরকমই চলল। আমার চোখের পাতা এক হল না।

সকালবেলা খালি পায়েই সেই যন্ত্রদুটো নিয়ে ছুটলুম একতলার অফিসে। সেখানকার তরুণীটিকে খুব উত্তেজিতভাবে এই অলৌকিক ঘটনাটা বোঝাতে যাচ্ছিলাম, তরুণীটি খুব শান্তভাবে বলল, ও, ব্যাটারি ফুরিয়ে গেছে। তারপর সে আরেকটু ব্যাখ্যা করল, ব্যাটারি ফুরিয়ে গেলে এরকম আওয়াজ করে জানিয়ে দেয়।

ধন্য, বাবা যন্ত্র। আমরা তো জানতুম, ব্যাটারি ফুরিয়ে গেলে সব জিনিসই চুপ মেরে যায়। মরা ব্যাটারির এমন ডাক আমি আগে কখনও শুনিনি।

।। ৪৩ ।।

এদেশে এখনও ভগবানের বেশ জনপ্রিয়তা আছে। ভগবানের তল্পিবাহকরাও বেশ জোরদার। টিভিতে প্রত্যেক রবিবার সকালে যে-কোনও চ্যানেলে খুললেই শোনা যায় পাদরিদের বক্তৃতা। আজকাল আর অনেকেই কষ্ট করে রবিবার সকালে গিরজায় যেতে চায় না, তাই টিভি-তেই শোনানো হয় পাদরিদের সারমান।

সকাল মানে অবশ্য সাড়ে ন'টা-দশটা। শনিবার রাত্তিরে পার্টি সেরে রবিবার এর চেয়ে আগে কেউ ঘুম থেকে উঠবে না। ভোরে ওঠে বাচ্চারা। তাই ভোর থেকে শুরু হয় ছোটদের জন্য চমৎকার সব মনোহরী অনুষ্ঠান। তারপর একটু বেলা হলে বাচ্চারা টিভি ছেড়ে যখন খেলতে যাবে, বাবা-মায়েরা বিছানায় শুয়ে দিনের প্রথম কাপ চা বা কফিতে চুমুক দিয়ে সবে মাত্র টিভি-র দিকে তাকাবে, অমনি চোখের সামনে ভেসে উঠবে পাদরিদের মুখ।

পাদরিদের বক্তৃতা সাধারণত অন্তহীন হয়। গল্পে আছে, এক পাদরি তার সুদীর্ঘ বক্তৃতা শেষ করার পর বলেছিলেন, দুঃখিত, আমার হাতে ঘড়ি নেই, তাই বুঝতে পারিনি এতটা সময় কেটে গেছে। তখন শ্রোতাদের একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, দেওয়ালে তো ক্যালেন্ডার রয়েছে, সেটাও দেখেননি?

টিভি-র মতন চাক্ষুষ-মাধ্যমে লম্বা বক্তৃতা সাধারণত দেখানো হয় না। কিন্তু পাদরিদের বক্তৃতা চল্লিশ-পঞ্চাশ মিনিটের কম হবে, এ তো ভাবাই যায় না। সেই জন্য টিভি-র পাদরিরা সকলেই অত্যন্ত জবরদস্ত বক্তা, কথার মায়াজাল বোনায় দক্ষতা অসাধারণ এবং উচ্চাঙ্গের অভিনেতাদের মতন তাঁদের কণ্ঠস্বরও নাটকীয়ভাবে ওঠে-নামে।

আমি নিজেই টিভি-তে এরকম দু-একজন পাদরির বক্তৃতা একটুখানি শোনবার পরই মন্ত্রমুগ্ধের মতন আটকে গেছি। চোখ সরাতে পারিনি। বক্তৃতার মধ্যে ধর্মের নাম গন্ধও নেই, বিষয়বস্তু হচ্ছে বিশ্বশান্তি। ইতিহাস ও সাহিত্য থেকে অজস্র উদাহরণ টেনে আনছেন তিনি, পৃথিবী যে এক অনিবার্য ধ্বংসের দিকে এগোচ্ছে তাও মর্মন্তুদভাবে বুঝিয়ে দিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁর সার কথা, ভগবান যিশুর শরণ নিলে এইসব সমস্যাই মিটে যাবে, এমনকী অ্যাটম বোমাও ব্যর্থ হতে বাধ্য। এ যেন নদীর ঢেউ দেখাতে-দেখাতে সটকে শেখানো।

ভগবানের সঙ্গে ডারউইন সাহেবেরও নতুন করে ঝগড়া লেগেছে। ডারউইনের বিবর্তনবাদ ধর্মীয় সৃষ্টিতত্ত্বের একেবারে গোড়ায় কোপ বসিয়ে দিয়েছে গত শতাব্দীতে। ডারউইনের মৃত্যু শতবার্ষিকীর বছরে বাইবেলপন্থীরা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছেন। তাঁদের দাবি, যেসব স্কুল-কলেজে ডারউইনের বিবর্তনবাদ পড়ানো হয়, সেখানে বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বও পড়াতে হবে। যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা দুটো দিকই যাচাই করতে পারে। অনেক স্টেটে এই নিয়ে মামলা হয়েছে, টিভি-তেও এর প্রচার খুব জোরদার। আশ্চর্যের ব্যাপার এই, এই প্রচারে কয়েকজন বৈজ্ঞানিককেও দেখা যায়। তাঁদের বক্তব্য, ডারউইনের মতবাদ অকাট্য নয়, সুতরাং ধর্মীয় তত্ত্বই বা অগ্রাহ্য করা হবে কেন?

বিজ্ঞানের ডিগ্রি থাকলেই বৈজ্ঞানিক হওয়া যায় না। বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্ব যদি কারুর ঠিক খেয়াল না থাকে, তবে আমি একটু মনে করিয়ে দিচ্ছি। পশু-পাখি, তরু-লতাসমেত সব কিছু এবং মানুষকে ভগবান আস্ত-আস্ত ভাবে সৃষ্টি করেছেন মাত্র ছ'দিনে।' সপ্তম শতাব্দীর এক আর্চ বিশপ বাইবেল থেকে হিসেব করে দেখিয়েছিলেন যে, ভগবানের এই সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন হয়েছিল ঠিক খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার চার সালে। সপ্তদশ শতাব্দীতে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ জন লাইটফুট এই হিসেবটি আরও নিখুঁত করেছিলেন। তাঁর মতে প্রথম মানুষের জন্ম হয়েছিল ঠিক খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার চার বছরের তেইশে অক্টোবর সকাল নটার সময়। অর্থাৎ মানুষের ইতিহাস মাত্র ছ-হাজার বছরের। সুসভ্য, সুশিক্ষিত, ইংরেজি-জানা ভদ্রলোকেরা এখনও যে এই মতের সমর্থনে বক্তৃতা করতে পারে, তা নিজের কানে না শুনলে বিশ্বাসই করতুম না আমি। ঈশ্বর বিশ্বাস যে মূককেও বাচাল করে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা ধরেই টিভি চলে, তার মধ্যে অন্তত এই ধরনের ধর্মীয় প্রচার খুব সামান্য সময় জুড়ে থাকে। তবে যেটুকু সময় নেয়, তা খুব দামি সময়, অর্থাৎ যে-সময় সকলেই টিভি খোলে। এখানকার টিভি-র সিংহভাগ জুড়ে থাকে খেলা। তাও বিশেষ একটি খেলায় যে-খেলার নাম ফুটবল বটে, কিন্তু আমরা যাকে ফুটবল বলে জানি, তা নয়। এই ফুটবল খেলায় পায়ের থেকে

হাতের ব্যবহার বেশি, খেলোয়াড়দের শরীরে থাকে বর্ম, মুখে লোহার মুখোশ। বিদেশিদের পক্ষে এ খেলার রস পাওয়া শক্ত। আমি কয়েকবার স্টেডিয়ামে ফুটবল খেলা দেখতে গেছি, কিন্তু নিয়মকানুন ঠিক মাথায় ঢোকেনি। সারা মাঠে যখন দারুণ উত্তেজনা, দর্শকরা উত্তাল, আমি তখন বরফের মতন শীতল ও স্থির।

আমেরিকান টিভি'র সঙ্গে সরকারের কোনও সংস্রব নেই। প্রধান তিনটি জাতীয় নেটওয়ার্ক হল আমেরিকান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন, সেন্ট্রাল ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন আর ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন—এরা নানা রকম অনুষ্ঠান বানায়। আর আছে অসংখ্য স্থানীয় অনুষ্ঠান। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আপনি বালুরঘাট কিংবা ঘাটাল কিংবা চুঁচুড়োয় বসে আপনার টিভি-তে আপনি চুঁচুড়োর আশেপাশের ঘটনা অনর্গল দেখতে পাবেন। সেই সঙ্গে জাতীয় অনুষ্ঠানও দেখবেন। বালুরঘাটের বাসিন্দা টিভি-তে দেখবেন বালুরঘাটের নানা অনুষ্ঠান, সেই সঙ্গে জাতীয় অনুষ্ঠান। ছোটখাটো জায়গায় স্থানীয় অনুষ্ঠানেরই প্রাধান্য। আমেরিকানরা বিশ্বপ্রেমিক যত না, তার চেয়ে বেশি অঞ্চল-প্রেমিক। ওখানকার স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ভূগোল ক্লাসে পৃথিবীর মানচিত্রের আগে পাড়ার মানচিত্র আঁকতে শেখে।

তিনটি জাতীয় নেটওয়ার্কের মধ্যে প্রতিযোগিতা আসে কে কত চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান করতে পারে। সরকারি ব্যাপাব তো নয়। সব কিছুই ব্যাবসায় ভিত্তিক। স্থানীয় কেন্দ্রগুলো কার কাছ থেকে কোন অনুষ্ঠান কিনবে তার ওপর নির্ভর করে ওদের ক্ষতি বৃদ্ধি। এই রকম প্রতিযোগিতা আছে বলেই অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্যের শেষ নেই।

এই সব অনুষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা সোপ অপেরার। সংক্ষেপে সোপ। অভিধানে এখনো সোপ-এর অর্থ সাবান হলেও এখানকার খবরের কাজে 'সোপ' শব্দে একরকম টিভি'র নাটক বোঝায়, যার সঙ্গে অপেরার কোন সম্পর্ক নেই। সাবানেরও কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। এগুলো হচ্ছে টিভি-র ধারাবাহিক নাটক, এর কোনও শেষ নেই। এর কাহিনির কোনও মাথামুণ্ডু নেই, নতুন-নতুন চরিত্র আর ঘটনা এনে বছরের পর বছর ধরে চলে। এই সব নাটক কিন্তু সপ্তাহে একদিন নয়, প্রত্যেকদিন। রবিবার বা বিশেষ ছুটির দিন বাদে। এবং প্রত্যেকদিন এরকম ধারাবাহিক নাটক মাত্র একখানা নয়, অন্তত পাঁচ খানা। তাহলে কী বিপুল লোকলশকর আর উদ্যম লাগে এগুলো তৈরি করতে, ভাবতে গেলে থ হয়ে যেতে হয়। খোদ আমেরিকায় এই সব সোপ অপেরা সিনেমার চেয়ে অনেক বেশি জনপ্রিয়। এক সময় সাবান কোম্পানিগুলো বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভর করে এই সব নাটক শুরু হয়েছিল বলেই সোপ নামটি চালু হয়ে গেছে। এখন অবশ্য অন্য সব বিজ্ঞাপনদাতাই এরকম ধারাবাহিক, প্যাচপেচে সেন্টিমেন্টাল, কিছুটা রহস্য মেশানো নাটক বানায়। ইদানীং এইসব নাটকের মধ্যে 'ডালাস' জনপ্রিয়তার শীর্ষে।

এখানকার ঘরে বসে বসে টিভি দেখাই আমার একমাত্র কাজ। এ শহরে আমার চেনা কেউ নেই, সুতরাং কোথাও ঘুরে বেড়াবার প্রশ্ন নেই। গাড়ি না থাকলে এই শীতে পথে ঘোরাঘুরির প্রশ্ন ওঠে না। সুতরাং টিভি-তেই আমি বিশ্বদর্শন করতে চাইলুম। অবশ্য আমেরিকান টিভি-তে বিশ্বদর্শন খুব সহজসাধ্য নয়। এরা নিজেদের নিয়ে বড় বেশি মগ্ন। এমনকী যাকে এরা বলে 'বিশ্ব সংবাদ' তাতেও পৃথিবীর যে-সব দেশ বা ঘটনায় আমেরিকান স্বার্থ জড়িত, শুধু সে সবই দেখাবে। এদের বিশ্ব সংবাদ দেখলে মনে হয় পৃথিবীতে ভারতবর্ষ নামে কোনও দেশ নেই। আর চিন নামে হঠাৎ একটা নতুন দেশ গজিয়ে উঠেছে। খবরেরও মাঝে-মাঝে থাকে বিজ্ঞাপন। আরব দেশে প্রচণ্ড একটি বোমার বিস্ফোরণের পরই কাট। তিন চারটি ছেলে-মেয়ে নাচতে-নাচতে একরকম মাখনের জয়গান গেয়ে গেল। তারপরই আবার যুদ্ধের দৃশ্য।

বিজ্ঞাপনের দৃশ্য থেকেও অবশ্য একটা দেশের রুচির অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। আমেরিকানদের আমরা গরু ও শুয়োরখোর জাতি বলে জানি। কিন্তু ইদানীং নানা বিজ্ঞাপনে গোমাংস ও শূকর মাংসের বিরুদ্ধে প্রচার চলছে। তার মানে এরা ভারতীয় জীবনযাত্রার মান আদর্শ মনে করছে তা নয়। শারীরিক

পরিশ্রম নেই বলে ব্লাড-প্রেসার ও কোলস্টোরল ভীতি এদের সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। এতকাল এদেশে মুরগি ছিল গরিবের খাদ্য ও অবজ্ঞার বস্তু, এখন রব উঠেছে মুরগি খাও, মাছ খাও, সবুজ শাকসবজি খাও! হেলথ ফুড নামে নিছক নিরামিষ খাদ্যের দোকানও চলছে খুব। আর এসেছে বিকল্পের যুগ। বেশি কফি খেলে নাকি ক্ষতি হয়, তাই কফির বদলে ডি-ক্যাফিনেটেড কফি। সে বস্তু আমি দু-একবার খেয়ে দেখেছি, অতি অখাদ্য। ভাগ্যিস চায়ের বিকল্প ওরা এখনও তৈরি করেনি। সেই রকম, মাখনের বদলে মার্জারিন, সিগারেটের বদলে তামাকহীন সিগারেট। অ্যালকোহল বর্জিত বিয়ার। মদের বিজ্ঞাপন তো চোখেই পড়ে না, তার বদলে দেখা যায় দুধের বিজ্ঞাপন। একটা ছবি প্রায়ই দেখায়, ধপধপে সাদা একটা দুধের নদী বয়ে চলেছে। সে দৃশ্য দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

বিজ্ঞাপনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মজা লেগেছিল একটা কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে। মার্কিনদেশে এখন ছাত্রছাত্রীদের বাধ্যতামূলক সমর শিক্ষা নেই, অনেক ছেলেমেয়েই আজকাল আর সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে আগ্রহী নয়। সেইজন্য সরকার থেকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় লোভনীয় শর্তে ছেলেমেয়েদের সৈন্যবাহিনীতে আকৃষ্ট করবার জন্য। গান গেয়ে গেয়ে বলা হয়, এসো, এসো যোগ দাও, কত ভালো মাইনে, কত ভালো খাবার, কত সুন্দর পরিবেশ ইত্যাদি-ইত্যাদি। দুর্ধর্ষ আমেরিকান টমির যে চিত্র অনেকের মনে আঁকা আছে, তার সঙ্গে কি এই বিজ্ঞাপন একটুও মেলে?

টিভি বিজ্ঞাপনের সবচেয়ে অশ্লীল দিক হল টাকার ঝনঝনানি। সারাদিন ধরে যে কতবার টাকা কথাটা উচ্চারিত হয় তার ঠিক নেই, টাকা পাইয়ে দেওয়ার কতরকম প্রলোভন, এমনকী সত্যি-সত্যি টাকা হাতে গুঁজে দেওয়ার দৃশ্যও দেখা যাবে দিনের মধ্যে পাঁচ সাতবার। কত সামান্য কারণে লোকে হাজার-হাজার টাকা পেয়ে যায়। বড়-বড় কোম্পানিগুলো নির্বাচিত দর্শকদের সামনে ধাঁধা প্রতিযোগিতা চালায়।

আমেরিকান টিভি কিন্তু সব মিলিয়ে বেশ নীতিবাগিশ। মরাল মেজরিটির চাপেই হোক বা যে-কারণেই হোক, যৌন দৃশ্য টিভি-তে একেবারে নিষিদ্ধ। সাধারণ অনুষ্ঠানে তো বটেই এমনকী কোনও বিজ্ঞাপনচিত্রেও নগ্নতা কিংবা নারীর উন্মুক্ত বক্ষদেশ দেখানো হয় না। তবে চুম্বন যেহেতু চা-জলখাবারের মতন, তাই সেই দৃশ্য দেখা যায় মুহুর্মুহু। সোপ অপেরায় প্রতি পাঁচ মিনিটে একটি করে দীর্ঘস্থায়ী চুম্বন দৃশ্য থাকবেই। আর লগ্নতার পরিবর্তে যা দেখানো হয়, তাও বেশ বিরক্তিকর। একই রকম স্বল্পবাস ঝাঁক-ঝাঁক মেয়ে, যাদের ঠিক মানুষ মনে হয় না। মনে হয় পুতুল। টিভি-তে যেসব সিনেমা দেখানো হয় তাও নিরামিষ ধরনের। অবশ্য কেবল কানেকশন নামে এর একটি ব্যাপার আছে। যাতে একটি চ্যানেলে চব্বিশ ঘন্টাই একটার পর একটা সিনেমা দেখা যায়, তাতে সব রকম ফিলমই থাকে এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের উপযোগী ফিল্‌ম দেখানো হয় বেশি রাত্রে। কানাডার টিভি-তে এই ব্যাপারটি আরও মজার। সেখানকার অনুষ্ঠান ইংরেজি এবং ফরাসি এই দুই ভাষায় হয়, এর মধ্যে ইংরেজি অনুষ্ঠান যৌন দৃশ্য বিরহিত, কিন্তু ফরাসি অনুষ্ঠানে সবই চলে।

সিরিয়াস ধরনের অনুষ্ঠানও কিছু-কিছু থাকে এবং সেগুলি খুবই সুচিন্তিত। দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ডেকে এনে নানান বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা। শুধু বক্তৃতা নয়, অজস্র উদাহরণ ছবি সমেত। এ দেশটার একটা গুণ স্বীকার করতেই হবে। আমেরিকায় বসে আমেরিকাকে যত খুশি গালাগালি দেওয়া যায়। এদেশের প্রেসিডেন্ট কিংবা শাসক দল সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা টিভি-তে শোনা যায় অহরহ। সাধারণ মানুষকে ইন্টারভিউ করেও এক-একজন খুব নাম করে ফেলে। যেমন ডনেহু-র টকশো খুব জনপ্রিয়। তবে এইসব গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাঝখানেও এমনই ঘনঘন বিজ্ঞাপনের বাহুল্য থাকে যে সুর কেটে যায়। আসলে, বিজ্ঞাপনের মাঝখানের জায়গাগুলো ভরাট করার জন্যই যেন অন্য অনুষ্ঠান।

তবে এইসব বিজ্ঞাপনদাতাদের একটা গুণ আছে। ছোটদের অনুষ্ঠানের মাঝখানে শুধু ছোটদের ব্যবহার্য জিনিসের বিজ্ঞাপন এবং সেগুলো এমনই সুন্দর ও মজাদার, যে সেগুলোও আলাদাভাবে

দর্শনীয়। এখানকার টিভি-তে ছোটদের অনুষ্ঠানগুলির কোনও তুলনা নেই। এর মধ্যে মাপেট শো তো জগৎবিখ্যাত এবং ছোটবড় সকলের প্রিয়।

ব্যাবসায়িক টিভি-র পাশাপাশি একটি চ্যানেলে সম্পূর্ণ অব্যাবসায়িক অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। এর নাম পাবলিক ব্রডকাস্টিং সিস্টেম। এতে একটাও বিজ্ঞাপন নেই এবং নিছক স্থূল রুচি বা ভাঁড়ামোর কোনও অনুষ্ঠানও এতে থাকে না, জাঙিয়া পরা পুতুল মেয়েদের নাচও নেই। এই অনুষ্ঠানগুলি চলে বিভিন্ন কোম্পানির চাঁদায়, তাদের নাম উল্লেখ থাকে শুধু। অনেক বিদেশি অনুষ্ঠানও ওরা ধার করে কিংবা কিনে আনে। এই চ্যানেলেই মাঝে-মাঝে দেখা যায় ভারতীয় চলচ্চিত্র। মহাকাশ বিষয়ে কার্ল সেগানের 'কসমস' নামে বিখ্যাত অনুষ্ঠানটিও দেখা যায় এই চ্যানেলেই। ক্লাসিক সাহিত্যের চিত্ররূপও প্রায়ই দেখানো হয়। তবু পাবলিক ব্রডকাস্টিং সিস্টেম-এর অনেক অনুষ্ঠান দেখাবার পর একঘেয়ে লাগতে শুরু করে। মনে হয় যেন বড্ড বেশি জ্ঞানের কথা বলছে।

এবং এতগুলো চ্যানেল, এত অনুষ্ঠান বৈচিত্র্য, এত সিনেমা সত্ত্বেও কোনও এক সময় টিভি-র নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়েও কোনও একটা অনুষ্ঠানও মনঃপূত হয় না। তখন ইচ্ছে করে টিভি বাক্সটাকে জোরে একটা লাথি কষাই। এই জন্যই একটি টিভি প্রস্তুতকারক কোম্পানি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, উই অফার কিক্-প্রুফ সেট্স।

॥ ৪৪ ॥

অন্য কারুর বাড়িতে একা কয়েকদিন থাকলে মনে হয় আমিও যেন একজন অন্য মানুষ হয়ে গেছি। এই ঘরের কোথায় কী জিনিসপত্র আছে আমি জানি না। এক একবার এক একটা কিছু আবিষ্কার করি। সূর্যর অ্যাপার্টমেন্টে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার খুঁজতে যেয়ে আমি পেয়ে গেলুম তিনখানা ভিডিও খেলনা। তাই নিয়ে কিছুক্ষণ সময় কাটল। টিভি-তে ভিডিয়ো খেলনা খেলতে-খেলতে আমার মনে হয় আমি অন্য গ্রহের মানুষ।

মাঝে-মাঝে অন্য লোকেরা টেলিফোন করে। প্রথমেই আমাকে সূর্য ভেবে নিয়ে কথা বলতে শুরু করে। এক-এক সময় আমার ইচ্ছে হয় সূর্য সেজে উত্তরও দিতে। কোনও মেয়ে ফোন করলে হয়তো সেরকম করতুমও, কিন্তু সূর্যকে শুধু পুরুষরাই ডাকে।

সূর্যর ঘরে পত্রপত্রিকাই বেশি, বই খুব কম। আজকাল এই এক রকম কালচার তৈরি হয়েছে! ছেলেমেয়েরা অনেক রকম পত্রপত্রিকা পড়েই সব বিষয়ে জেনে যায়, সাহিত্য পড়ে না। ক্লাসিক্স তো পড়েই না।

একখানা বই পেলুম সেটাও সাংবাদিকতা ঘেঁষা। তবে বইটি চমৎকার। বইটির নাম 'শ্লাউচিং টুয়ার্ডস বেথেলহেম', লেখিকা শ্রীমতী জোন ভিভিয়ন। শ্রীমতী বলা বোধহয় ঠিক হল না ইনি কুমারীও না, বিবাহিতাও না, অর্থাৎ মিস্ কিংবা মিসেস নন, এম এস। বাংলায় এর প্রতিশব্দ বোধহয় এখনও তৈরি হয়নি।

বইটি নোটবুক ধরনের। এতে আছে কিছু কিছু সাম্প্রতিক ঘটনা ও বিশেষ কয়েকটি ব্যক্তি সম্পর্কে স্কেচ। সাধারণ বিবরণ নয়। বেশ অন্তর্ভেদী চরিত্র-চিত্রণ, ভাষাও খুব গম্ভীর। এই বইটিতে আমি এক নকশাল নেতার সন্ধান পেয়ে চমকে উঠলুম। না লেখাটি ভারতীয় কোনও বিপ্লবী সম্পর্কে নয়, আমেরিকান নকশাল নেতা মাইকেল ল্যাসকি সম্পর্কে। আমাদের দেশে যেমন সি পি আই (এম এল) দল আছে, এ দেশেও সেইরকম আছে সি পি উ এস এ (এম-এল) দল। আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টি অনেক পুরোনো। এখন তা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। এর মধ্যে এই এম-এল গোষ্ঠী পুরোনো আদি কমিউনিস্ট পার্টিকে 'শোধনবাদী বুর্জোয়া ক্লিক' মনে করে। অবিকল আমাদের দেশের মতন।

দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় ওয়াট্স শহরে একটি বইয়ের দোকানে এই দলের শাখা অফিস। দোকানটির নাম, 'ওয়ার্কার্স ইন্টারন্যাশনাল বুক স্টোর', ভেতরে মস্ত বড় কাস্তে হাতুড়ি মার্কা পতাকা ও মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে-তুং-এর ছবি। কমরেড ল্যাসকি এই দলের জেনারাল সেক্রেটারি, তিনি ওই দোকান চালান ও 'পিপ্‌লস ভয়েস' ও ' রেড ফ্ল্যাগ' নামে দুটি পত্রিকা বার করেন। আমেরিকায় 'শ্রমিক অভ্যুত্থান"-ই এঁদের লক্ষ্য।

জোন্ ভিভিয়ন যখন মাইকেল ল্যাসকির সাক্ষাৎকার নিতে যান, তখন তিনি ওই মেয়েটিকে এফ বি আই এর এজেন্ট ভেবেছিলেন। তবু তিনি সাক্ষাৎকারটি দিতে রাজি হন, কারণ এই বাজারি কাগজে এইসব লেখা বেরুলে জনগণ এই বিপ্লবী পার্টি সম্পর্কে বেশি করে জানবে। ল্যাসকির ধারণা, মার্কিন সরকার যে-কোনওদিন তাঁদের পার্টিকে নিষিদ্ধ করবে। পার্টি ওয়ার্কারদের মারধোর, কারাবাস, এমনকী গুপ্ত-হত্যার জন্য তৈরি থাকতে বলেছেন। অবশ্য, এঁরাও অন্যরকমভাবে তৈরি আছেন, এদের পার্টি অফিসে, অর্থাৎ ওই বইয়ের দোকানের পেছনে রাখা আছে কয়েকটি শট্‌গান ও রিভলবার। আমেরিকায় অস্ত্র রাখা বেআইনি নয়।

লেখাটি পড়বার পর লক্ষ করলুম, এর রচনাকাল ১৯৬৭। আমাদের দেশেও মোটামুটি ওই সময়েই নকশাল আন্দোলন শুরু হয়েছিল না? ল্যাসকি সাহেবের বয়েস তখন ছিল ছাব্বিশ, এখন তিনি কোথায় আছেন জানি না।

লেখাটি পড়তে-পড়তে আমার একটা পুরোনো কথা মনে পড়ল। আগেরবার নিউ ইয়র্কে গ্রিনিচ্ ভিলেজে এক বাউন্ডুলেদের আড্ডায় একদিন নানারকম গান হচ্ছিল, এক সময় কয়েকজন 'ইন্টারন্যাশনাল' শুরু করতেই আমিও গলা মিলিয়েছিলুম। ছাত্র জীবনে ওই গান আমরা অনেক গেয়েছি তাই মুখস্ত। ওদের তারপর আমি ওই গানের বাংলা ভাষা, "জাগো, জাগো সর্বহারা" (সম্ভবত নজরুলের অনুবাদ) গেয়ে শোনালুম।

সেই আড্ডায় উপস্থিত ছিল কবি অ্যালেন গিন্‌সবার্গ। সে আমাকে পরে আড়ালে বলল, 'ওহে নীলু চন্দর, আমরা এই গান গাইছি বটে, কিন্তু তুমি যেন আর অন্য কোথাও গেও না। তুমি বিদেশি, তোমার পেছনে গোয়েন্দা লেগে যেতে পারে। তোমার ভিসাও বাতিল করে দিতে পারে। আমি অবাক হয়ে বলেছিলুম, কেন? ইট্স আ ফ্রি কান্ট্রি। এখানে কোনওরকম গান গাওয়ার নিষেধ আছে নাকি? অ্যালেন বলেছিল, গানের জন্য তো কিছু বলবে না, অন্য কোনও ছুতোয় তোমাকে জ্বালাতন করবে। জানো তো, শালারা (অ্যালেন অবশ্য শালা বলেনি, অন্য গুরুতর গালাগালি দিয়েছিল) সব সময় কমুনিস্ট-জুজু খোঁজে!

সেই সময়ে নিজের দেশে অ্যালেন গিন্‌সবার্গ বামপন্থী হিসেবে পরিচিত ছিল। যে-কোনও জায়গায় সুযোগ পেলেই সে আমেরিকার সরকার ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করেছে। কিন্তু সে কমিউনিস্ট নয়, কারণ, সে অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে বিশ্বাসী, সমকামী এবং চরম বাক স্বাধীনতাপন্থী। চেকোশ্লোভাকিয়া সফরে গিয়ে সে বিতাড়িত হয়েছিল, কারণ সেখানে সে বাক স্বাধীনতার পক্ষে বক্তৃতা দিয়েছিল। আবার পোল্যান্ডে পেয়েছিল বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে সংবর্ধনা।

অ্যালেন জাতে ইহুদি। কুখ্যাত ইহুদি-হন্তা আইখম্যান যখন ধরা পড়ে এবং তাকে কীরকম শাস্তি দেওয়া হবে এই নিয়ে যখন জল্পনাকল্পনা চলছিল, তখন অ্যালেন বলেছিল, কোনও শাস্তি না দিয়ে আইখম্যানকে জেরুজালেম শহরের মেয়র করে দেওয়া উচিত। ইহুদিদের সেবা করলেই ওর পাপ-মুক্তি হবে।

এবারে অনেক চেষ্টা করেও আমি অ্যালেন গিন্‌সবার্গের দেখা পেলুম না। গেছোবাবার মতন সে যে কখন উত্তরে কখন দক্ষিণে যায় তার আর ঠিক নেই। আমি যখন ক্যালিফোর্নিয়ায়, সে তখন কলোরোডোতে, আমি নিউ ইয়র্ক ছেড়ে শিকাগোয় আসবার পরই খবর পেলুম সে নিউ ইয়র্কে কবিতা পড়তে গেছে।

অ্যালেনের সেই নিউ ইয়র্কের কবিতা পাঠের বিবরণ পড়লুম 'টাইম' সাপ্তাহিকে। প্রতিবেদক বেশ-ঠাট্টা ইয়ার্কি করেছে। বিদ্রুপের সঙ্গে বলেছে যে সেই বিপ্লবী কবি এখন ঠান্ডা হয়ে গেছে, পোশাক ভদ্রলোকের মতন, গলায় টাই পর্যন্ত বেঁধেছে, কবিতাগুলোও শান্ত আর ভদ্র ধরনের। টিভি-র ছবি তোলার সময় আলোর ফোকাস ঠিক মতন তার মুখে পড়ছে কি না সে ব্যাপারেও খেয়াল আছে টনটনে ইত্যাদি।

অ্যালেনের টাইপরা ছবি দেখে আমি প্রথমে অবাক হয়েছিলুম। কলকাতার রাস্তায় সে পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে ঘুরে বেড়াতো আর নিউ ইয়র্কের রাস্তায় মৃতবন্ধুর ট্রাউজার্স আর গেঞ্জি পরে, গালভরতি দাড়ি।

পরে ভেবে দেখলুম, এটাই তো স্বাভাবিক। যে বয়েসে যা মানায়। অ্যালেন গিন্‌সবার্গের বয়েস এখন প্রায় ষাট, এখন তো সুস্থির হওয়ারই সময়। একবার নিউ ইয়র্কের এক কাব্য পাঠের আসরে কয়েকজন চিৎকার করে বলেছিল, আপনার এসব কবিতার মানে কী? মানে বুঝিয়ে দিন। অ্যালেন জামা-প্যান্টের সব বোতাম খুলে মঞ্চের ওপর সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে বলেছিল, এই হল আমার কবিতার মানে। আর একবার অ্যারিজোনায় এক সমালোচকের নাকে ঘুঁষি মেরে বলেছিল, এবারে আমার কবিতার মানে বুঝলে তো? এসব তার ছোকরা বয়েসের কথা। এখনও সে যদি এরকম কিছু করে, তবে সেটা হবে অত্যন্ত ভাল্‌গার ব্যাপার, বুড়ো মানুষের খোকামি। এখন সে শান্ত হয়েছে, তার কবিতাও অনেক ঘন সংঘবদ্ধ হয়েছে।

এখানকার প্রথাসিদ্ধ লেখক যাঁরা, অর্থাৎ যাঁরা কলেজে পড়ান। কিংবা ফাউন্ডেশানের টাকা নিয়ে সাহিত্যচর্চা করেন, তাঁরা অ্যালেন গিন্‌সবার্গকে পছন্দ করেন না কেউ। নাম শুনলেই তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন। এরকম দু-একজনের কাছে আমি অ্যালেনের খোঁজ করতে গিয়েই এ ব্যাপারটা টের পেয়েছি। কেউ কেউ ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছে, ও অ্যালেন? দ্যাখো গিয়ে সে বোধহয় আগামীবার মার্কিন প্রেসিডেন্টের পদে দাঁড়াবার জন্য তৈরি হচ্ছে।

এই ঈর্ষার কারণ অ্যালেনের অসাধারণ জনপ্রিয়তা। এখনও সে কবিতা পাঠ করতে দাঁড়ালে অল্পবয়েসি ছেলেমেয়েরা মুগ্ধ হয়ে শোনে। তার কবিতার লাইন অনেকেই কথায়-কথায় মুখস্থ বলে। বিশুদ্ধ কবিতা রচনা থেকে অ্যালেন কখনও সরে যায়নি।

খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে এখানকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য সভায় গেলুম একদিন। সকলের জন্য দ্বার অবারিত। এখানকার সব বিশ্ববিদ্যালয়েই নিয়মিত লেখকদের ডেকে এনে সাহিত্য সভা করে। এটা লেখকদের একটা উপার্জনের পথও বটে।

এই সভাটিতে জনাপাঁচেক মাঝারি ধরনের লেখক ছিলেন। তার মধ্যে দুজনের নাম আমার পূর্ব পরিচিত। ভ্যান্‌স বুর্জালি এবং ডনাল্ড যাস্টিস। যথাক্রমে উপন্যাস ও কবিতা লেখার জন্য এঁরা দুজনেই পুলিটজার পুরস্কার পেয়েছেন। অর্থাৎ আমাদের দেশের আকাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকদের সমতুল্য। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল ইদানীংকালের উপন্যাস ও ছোটগল্পের গতিপ্রকৃতি।

কিন্তু কথাবার্তা শুনে আমার চোখ ছানাবড়া হওয়ার উপক্রম।

পাঁচজন লেখক উপন্যাস-গল্প সম্পর্কে দুচারটে মামুলি কথা বলার পরই তাঁরা শুরু করে দিলেন তাঁদের ট্রেডের নিজস্ব কথাবার্তা। অর্থাৎ বই ছাপার আজকাল কত ঝামেলা, প্রকাশকরা কতরকম গণ্ডগোল করে, ঠিক মতন টাকাকড়ির হিসেব দেয় না, সুপার মার্কেটগুলোতে শুধু সস্তা চটকদার বইগুলোই সাজিয়ে রাখে, সিরিয়াস বই রাখতেই চায় না, বড় বড় পত্র-পত্রিকায় সমালোচনা বার করা দিন দিন শক্ত হয়ে উঠছে, আর এই হতচ্ছাড়া টিভি কোম্পানিগুলো কত লোককে টক শো-তে ডাকে। লেখকদের ডাকে না ইত্যাদি ইত্যাদি।

ও হরি, তা হলে সাহেব লেখকদেরও এই অবস্থা! ইংরেজিতে কথা বললেও আমার মনে হচ্ছিল এরা সবাই বাঙালি লেখক! আমরা যে ভাবতুম, সাহেব মানেই বড় লোক আর তাদের হাজার

রকম সুবিধে! মহারাষ্ট্রের লেখকদের ধারণা হিন্দি লেখকদের অবস্থা ভালো, হিন্দি লেখকরা ভাবে বাঙালি লেখকদের অবস্থা ভালো, বাঙালি লেখকরা ভাবে ইংরেজিতে যারা লেখে একমাত্র তারাই স্বর্গসুখের অধিকারী। আসলে, ইংরেজিতেই দু-পাঁচজন লেখকই খুব বেশি বিত্তবান, তা-ও তারা থ্রিলার কিংবা হোটেল-এয়ারপোর্ট জাতীয় জিনিস লেখে। বাদবাকি সব লেখকদেরই চাকরি করতে হয় এবং প্রকাশকদের সঙ্গে ঠান্ডা লড়াই চালাতে হয়। পৃথিবীতে সব দেশের লেখকদেরই কি এই অবস্থা? একমাত্র সুইডেনের এক লেখকের মুখে শুনেছিলুম, তাঁর কোনও নালিশ নেই। তাঁর দেশের সরকার লেখকদের যে সম্মানের ব্যবস্থা করেছে, তার চেয়ে বেশি আর কিছু চাওয়া যায় না। সেখানকার লাইব্রেরি থেকে যেসব লেখকদের বই পাঠকরা নেয়, তার জন্যও সেই লেখকরা রয়ালটি পান।

আমেরিকায় একটি তরুণ কবিদের কাব্য পাঠের আসরেও আমি এই ধরনের আলোচনা শুনেছিলুম। বড় বড় পত্রিকায় কবিতা ছাপানো কত শক্ত, সেরকম ভালো কাগজই বা কোথায়, বড় শহরের তুলনায় ছোট শহরের কবিরা তেমন পাত্তা পায় না সম্পাদকদের কাছে ইত্যাদি। এ যে অবিকল কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের কথাবার্তা!

এক সময় আমি আমেরিকান সাহিত্যের বেশ ভক্ত ছিলুম। কিন্তু সল বেলোর পর সেরকম কোনও বড় লেখকের আর সন্ধান পাইনি। তাও সল বেলোকেও প্রকৃত অর্থে আন্তর্জাতিক লেখক বলা চলে কিনা সন্দেহ, তাঁর লেখা বড্ড বেশিরকম আমেরিকান। বিশেষত ইহুদি প্রথা ও সমাজ ঘেঁষা ডিটেইলসের প্রাবল্য এক এক সময় বিরক্তি ধরিয়ে দেয়। জন আপডাইকের র‍্যাবিট সিরিজের লেখাগুলো একসময়ে ভালো লেগেছিল, এখন তার লেখায় এত বেশি রগরগে যৌন ব্যাপার থাকে যে মনে হয় এসব তো ছেলেমানুষি ব্যাপার! এহ বাহ্য, আগে কহো আর! আপডাইকের একটি ভ্রমণ কাহিনি পড়েও বেশ হতাশ হলুম। কোনও ঔপন্যাসিক যখন ভ্রমণ কাহিনি লেখেন, তখন বোঝা যায় তাঁর চিন্তার ব্যাপকতা ও ভাষার ওপর দখল কতখানি। আপডাইক শুধু ইয়ার্কি-ঠাট্টা করেছেন। মেয়ে গাইডের সঙ্গে শোওয়া যায় কি যায় না, এই চিন্তা যেন পাশ্চাত্য লেখকদের একটা ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে, কত লোকের ভ্রমণ কাহিনিতেই যে এটা পড়তে হয়! এমনকী গুন্টার গ্রাসও এই কাণ্ড করেছেন। আপডাইক রাশিয়া সম্পর্কে লিখতে গিয়ে সেখানকার সুটকেস কত খারাপ এই নিয়ে বাজে রসিকতা করেছেন আগাগোড়া।

একজন কালো-লেখিকা গল্প পড়ে শোনালেন একদিন। লেখিকাটি ইদানীং বেশ নাম করেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে খাতির করে এনেছে। সে গল্প শুনে আমার মনে হল, বাংলা ভাষায় এরকম গল্প অনেক আগেই ঢের লেখা হয়ে গেছে। সদ্য নাম করা আরও অনেকের লেখা পড়তে-পড়তে আমি ভাবি, এসব কী লিখছে এরা, এর চেয়ে বাংলা সাহিত্যে অনেক ভালো লেখা হচ্ছে।

কী জানি, আমার আবার বাংলা-বাংলা বাতিক হয়ে গেল কি না।

।। ৪৫ ।।

কয়েকদিন ধরেই আমি খাঁচার মধ্যে বদ্ধ সিংহের মতন ছটফট করছি ঘরের মধ্যে। অবিরাম তুষারপাতের জন্য পায়ে হেঁটে বাইরে বেরুবার কোনও উপায় নেই। এ শহরে আমার কোনও বন্ধু নেই যে আমায় তার গাড়িতে কোথাও লিফ্ট দেবে। এমন পয়সাও নেই যে টেলিফোনে ট্যাক্সি ডাকতে পারি। সুতরাং আমি বন্দি।

অবশ্য আমার চেহারার সঙ্গে সিংহের কোনওই মিলই নেই। সত্যের খাতিরে খাঁচায় বন্দি বাঁদরের সঙ্গেই আমার উপমা দেওয়া উচিত। কিন্তু চেহারা যতই খারাপ হোক, কেই-ই বা নিজেকে বাঁদরের সঙ্গে তুলনা দিতে চায়, হলই বা বাঁদর আমাদের পূর্বপুরুষ!

তাপাঙ্ক নেমে গেছে শূন্যের নীচে কুড়ি-বাইশে। রাস্তার দুপাশে দু-তিন ফুট বরফ জমে আছে।

গাড়ি চলাচলের জন্য অবশ্য রাস্তার মাঝখানটা কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর পরিষ্কার করে বালি ছড়িয়ে দেওয়া হয়। রাস্তার ওই কালোত্বটুকু বাদ দিলে বাকি সবই সাদা ধপধপে। বাড়ির মাথায় বরফ, গির্জার চূড়ায় বরফ, পাইন গাছগুলি বরফে ঢাকা। ছোট-ছোট নদী ও হ্রদগুলোও জমে গেছে। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে এই শ্বেত দৃশ্যপট দেখতে দেখতে এখন আমার একঘেয়ে লাগে।

আমি যে কেন এখানে পড়ে আছি তা আমি নিজেই জানি না। সঙ্গে রিটার্ন টিকিট আছে, যে-কোনও মুহূর্তে ফিরে যেতে পারি। এক-একদিন খুব মন কেমন করে, আবার ভাবি, ফিরে গেলেই তো ফুরিয়ে গেল, আর তো আসা হবে না। দেশে তো কেউ আমার জন্য পায়েসের বাটি সাজিয়ে প্রতীক্ষা করে নেই। তা ছাড়া, মনের মধ্যে মাঝে-মাঝে একটা কাঁটার খোঁচা টের পাই, একটা বিশেষ জায়গা এখনও আমার দেখা হয়নি। সে জায়গাটা আমি দেখতে চাই না, অথচ না দেখেও ফিরে যেতে পারছি না।

আমি যে এখানে আছি, আমার অনুপস্থিত আশ্রয়দাতা তা জানেই না। সূর্যর ফিরে আসার কথা ছিল এতদিনে, কিন্তু ফেরেনি।

আমিও ওর নাইজিরিয়ার ঠিকানাটা নিয়ে রাখিনি, তাই চিঠি লিখতে বা টেলিফোন করতে পারছি না। এখানে অবশ্য আমার খরচ লাগছে না প্রায় কিছুই। সূর্যর ভাঁড়ারের চাল-ডাল এখনও ফুরোয়নি। আমি দিব্যি খিচুড়ি খেয়ে চালিয়ে দিচ্ছি।

এ শহরে কজন বাঙালি আছে তা টেলিফোন গাইড দেখে অনায়াসেই বার করা যায়। যেহেতু সূর্যর ঘরে পাঠ্য বই বিশেষ নেই তাই মাঝে মাঝে আমি টেলিফোন বইখানাই পড়ি, এই পুঁচকে শহরের টেলিফোন গাইড বইটি কলকাতার টেলিফোন গাইডের চেয়েও মোটা। পড়তে-পড়তে আমি একজন মুখার্জি, দুজন দাস, একজন সরকার, একজন মিস রায়চৌধুরীর সন্ধান পেলুম। মুসলমান নামও বেশ কয়েকটি আছে, এরা পৃথিবীর অনেক দেশেরই অধিবাসী হতে পারে, কিন্তু বাঙালি মুসলমানের নাম দেখলে আমি চিনতে পারি। একজন প্যালেস্টিনিয় গেরিলার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল, তার নাম আখমেদ, এক ইরানি মহিলাকে চিনি যার নাম তাহেরে সফরজাদে, এক মিশরি নাট্যকারকে চিনি যার নাম হ্যনি এলকাডি। এরকম নাম বাঙালি মুসলমানদের হয় না, কিন্তু সিরাজুল ইসলাম কিংবা রফিকুল আলম নির্ঘাত বাঙালি।

ছাপার অক্ষরে বাঙালিদের সন্ধান পেলেও আমার কোনও সুবিধে হল না। আমার চরিত্রে এই দোষ আছে, অচেনা লোকের সঙ্গে যেচে ভাব জমাতে পারি না। অনেকে বেশ পারে, তাদের আমি ঈর্ষা করি।

এই রকমভাবে কয়েকটা দিন কেটে যাওয়ার পর এসে গেলেন আমার উদ্ধারকর্তা।

সূর্যর ঘরে টেলিফোন প্রায়ই বাজে, নানান বিদেশি কণ্ঠ ওর খোঁজ নেয়। মাঝে-মাঝে আমি টেলিফোন ধরিও না, আপনমনে রুনুরুনু করে বেজে যায়। এক সকালে পরপর তিনবার টেলিফোন বাজতে আমি বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে রিসিভার তুলে গম্ভীর গলায় বললুম, হ্যালো?

ওপাশ থেকে একটি অকপট বাঙাল ভাষায় শোনা গেল, সূর্য্যভাইডি, ফ্যারা হইল কবে? শরীল-টরিল ভালো আছেনি?

আমি বললুম, সূর্য এখনও ফেরেনি! কবে ফিরবে জানি না।

—আপনে কেডা?

—আমি সূর্যর বন্ধু। নিউ ইয়র্কে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, ও আমাকে ওর এই অ্যাপার্টমেন্টের চাবি দিয়ে গেছে।

—এ শহরে বাঙালি আইল অথচ আমি জানি না, এ তো বড় তাজ্জব কথা! কী নাম আপনের?

—আজ্ঞে, নীললোহিত।

—এ আবার কেমনধারা নাম! পদবি কী?

—ধরে নিন আমার পদবি লোহিত!

—ধইরা নেব? পদবি কি ধরার জিনিস? এ তো বাপ, ঠাকুরদার ব্যাপার। লোহিত পদবি জন্মে শুনি নাই।

—মেদিনীপুরের লোকেদের খাঁড়া, ধাড়া, বাঘ, হাতি এইরকম পদবি হয় না? তাহলে লোহিত হতে বাধা কী?

—ব্যাপারটা তেমন সুবিধার ঠ্যাকতাছে না। আপনে মশায় বার্গলার না তো? সূর্যির ঘরে অইন্য মানুষ। আপনি কী উদ্দেশ্যে আইছেন এখানে? কোথায় চাকরি পাইছেন?

—চাকরি পাইনি, বেড়াতে এসেছি।

—বেড়াইতে? এই ডিসেম্বর মাসে? খুবই সন্দেহজনক! আপনে ঘরেই থাকেন, বাইরাবেন না, আমি উইদিন ফিফ্‌টিন মিনিটস্‌ আইতাছি।

আমি বেশ সন্তুষ্টচিত্তেই ভদ্রলোকের প্রতীক্ষা করতে লাগলুম। বিদেশে এসেও যে লোক এমনভাবে বাঙাল ভাষাটি আঁকড়ে রেখেছে সে মহাশয় ব্যক্তি নিশ্চয়ই।

কাঁটায়-কাঁটায় ঠিক পনেরো মিনিটের মাথায় এসে হাজির হলেন ভদ্রলোক। দরজা খুলে আমি একটু চমকেই উঠলুম, বাঙাল ভাষা শুনলেই একজন ঢিলেঢালা গোছের মানুষের চেহারা মনে আসে। কিন্তু প্রথম দর্শনে এঁকে দেখে প্রায় সাহেব মনে হয়। টকটকে গৌরবর্ণ, বেশ দীর্ঘকায়, নিখুঁত সুট-টাই পরা, বয়েসে প্রায় প্রৌঢ়ই বলা চলে।

তীক্ষ্ণ নজরে প্রথমে আমার আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করে তিনি ঘরে ঢুকে এলেন, চতুর্দিকে ঘুরে সবকিছু যাচাই করে দেখে তিনি বললেন, বার্গলারির কোনও প্রুফ তো দ্যাখতে পাইতেছি না। আমার নাম শম্ভু মুখার্জি, আমি এখানে সকল বাঙালি সন্তানের লোকাল গার্জিয়ান। রহস্যময় আগন্তুক, আপনে কেডা সেইটা খুইল্যা কন্‌ তো!

আমি হাসতে-হাসতে সংক্ষেপে আমার পরিচয় জানালুম।

শম্ভু মুখার্জি নীরবে সবটা শুনে বললেন লালন ফকিরের একটা গান আছে জানো? মনের মতন পাগল খুঁইজে পাইলাম না! এই এতদিনে আমি পাইছি, একখান পাগল! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ,

তারপর তাঁর বিশাল হাত দিয়ে আমার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে আবার বললেন, পাগল না হইলে কেউ এই ধাদ্ধারা গোবিন্দপুরে ডিসেম্বর মাসে আসে, না একা-একা ঘরের মধ্যে বইস্যা থাকে? এখন চলো আমার সঙ্গে ধড়া-চূড়া পইরা নাও! ওভারকোট আছে তো, নাকি তাও নাই?

সেদিনটা সারাদিনই আমি কাটিয়ে দিলাম শম্ভু মুখার্জির বাড়ি। সিডার র‍্যাপিড্‌স-এর উপকণ্ঠে ওঁদের সুদৃশ্য নিজস্ব গৃহ, সেখানে ঢুকলেই বোঝা যায় ওঁরা এখানকার পুরোনো বাসিন্দা। শুনলাম, এদেশে ওঁদের কেটে গেছে উনিশ বছর। শম্ভু মুখার্জি বিশালদেহী পুরুষ হলেও তাঁর স্ত্রী বিনতা বেশ ছোট্টখাটো হাসিখুশি। বিনতাবউদি পুরো ঘটি, একটিও বাঙাল কথা বলেন না। এই দম্পতিটি নিঃসন্তান। রামকৃষ্ণ মিশনের দুটি গরিব ছাত্রের পড়াশুনোর খরচ চালাবার জন্য এঁরা নিয়মিত টাকা পাঠান।

শম্ভু মুখার্জি কাছাকাছি এক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউক্লিয়ার ফিজিক্‌সের অধ্যাপক। রীতিমতন পণ্ডিত মানুষ। আবার অবসর সময়ে ছবি আঁকেন। বিনতা বউদিও পড়ান একটি বিকলাঙ্গের স্কুলে, যা মাইনে পান তা সেই স্কুলকেই দান করেন।

এসব কথা আমি জানতে পারলুম আস্তে আস্তে অন্যদের মুখে। আমার খেয়ালই ছিল না যে আজ রবিবার। ছুটিছাটার দিনে অনেকেই আসে এ বাড়িতে আড্ডা দিতে। শুধু বাঙালিরা নয়, যে-কোনও ভারতীয়রই এ বাড়িটি একটি আড্ডাস্থল। যে-কোনও ভারতীয় ছাত্র যদি হঠাৎ বিপদে পড়ে কিংবা কোনও সেমেস্টারে অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ না পায়, তাহলে শম্ভু মুখার্জি দম্পতি অতি গোপনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দের তাদের দিকে।

বিনতা বউদি রান্না করতে এবং খাওয়াতে ভালোবাসেন। আর শম্ভুদা ভালোবাসেন তাস খেলায় হেরে যেতে এবং সেই উপলক্ষে কৃত্রিম রাগারাগি করতে। একটু বেলা পড়তেই এসে হাজির হল নির্মল সরকার, অনন্য দাস, সুধীর পটনায়ক, সিরাজুল ইসলাম, সুরেশ যোশী। তাস খেলায় হেরে গিয়ে শম্ভুদা সবাইকে কাঠ বাঙাল ভাষায় গালাগাল দেন। এই দিলদরিয়া আড্ডাবাজ মানুষটিকে দেখতে-দেখতে আমার মনে হয়, ইস, সৈয়দ মুজতবা আলি যদি এঁকে দেখতেন, তাহলে কী দুর্দান্ত একটা চরিত্র বানিয়ে ফেলতে পারতেন।

আমার অনুমান নির্ভুল, সিরাজুল ইসলাম আর রফিকুল আলম দুজনেই বাঙালি, একজন পশ্চিম বাংলার, অন্যজন বাংলাদেশের। এর মধ্যে রফিকুল আমায় চেপে ধরল, আপনি একা একা কাটাচ্ছেন কেন? আমার ওখানে চলে আসুন। আরও অনেকেই এই প্রস্তাব দিল, শম্ভুদা বিনতাবউদি তো বটেই। কিন্তু আমি রাজি হলুম না। আসলে একা থাকতে আমার ভালোই লাগে। আমি সাধুসন্ন্যাসী নই। দিনের পর দিন নির্জনতা সহ্য করতে পারি না ঠিকই, কিন্তু দিনের কিছুটা অংশ শুধু নিজের মুখোমুখি বসে থাকাটা আমি বেশ উপভোগ করি।

সূর্যর অ্যাপার্টমেন্টেই রয়ে গেলুম বটে, কিন্তু প্রতিদিনই কারুর না কারুর বাড়িতে নেমন্তন্ন লেগেই রইল। সকলেরই গাড়ি আছে, আমায় নিয়ে যায়, পৌঁছে দেয়।

প্রচণ্ড শীতেও এখানকার অফিস-কাছারি-দোকানপাট সবই খোলা থাকে, তবে বেশিদূর ঘোরাঘুরি বা বেড়ানোর ব্যাপার বন্ধ হয়ে যায়। কিছু ডাকাবুকো সাহেবের কথা আলাদা, এই শীতেও তারা পাহাড়ে যায় স্কি করতে। বেশিরভাগ ভারতীয়েরই এমন শখ নেই। তারা কাছাকাছি আড্ডা দিতে যায়। এই শীতের সময় হাইওয়েতে রাত্তিরবেলা যদি গাড়ি খারাপ হয়ে যায়, তাহলে ধনেপ্রাণে মৃত্যু অসম্ভব কিছু না। কাগজে এরকম খবর মাঝে মাঝেই বেরোয়।

শীতের মধ্যে বেরুবার ঝক্কি-ঝামেলাটা বেশ বিরক্তিকর। বাইরে বরফ পড়লেও বাড়ির মধ্যে গরম, স্রেফ একটা গেঞ্জি পরে কাটিয়ে দেওয়া যায়। বাইরে বেরুতে হলে সেই গেঞ্জির ওপরে পরতে হবে শার্ট, তারপর সোয়েটার বা জ্যাকেট, তার ওপরে ওভারকোট, হাতে চামড়ার দস্তানা, মাথায় টুপি, পায়ে গরম মোজা আর লম্বা জুতো। এতসব মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য, শুধু বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠতে হবে—ওই কয়েক পা যাওয়ার জন্য এত সতর্কতা। গাড়ির মধ্যে আবার গরম। যে বাড়িতে পৌঁছব, সে বাড়িও গরম। সেখানে গিয়েই আবার সব খুলে ফেলতে হবে।

পরের শনিবার সন্ধেবেলা শম্ভুদার বাড়িতে বিরাট পার্টি হল। সর্বভারতীয় সম্মেলন তো বটেই, কয়েকজন সাহেব-মেমও এসেছে। এই পার্টিতে হল আমার এক নতুন অভিজ্ঞতা। এখানেই আমি প্রথম সাক্ষাৎ পেলুম একটু শিক্ষিত, শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান বেকার যুবকের।

আমি অল্প কয়েকমাস আগে ভারত থেকে এসেছি এবং শিগগিরই ভারতে ফিরে যাব শুনে এই যুবকটি বেশ আগ্রহের সঙ্গে আলাপ করতে লাগল আমার সঙ্গে। ছেলেটিকে সবাই ডিক্ বলে ডাকছিল। (বাংলা রামা-শ্যামা-যদুর ইংরেজি হল টম-ডিক অ্যান্ড হ্যারি। আজকাল বাঙালিদের মধ্যে, রাম-শ্যাম-যদু নামে বিশেষ শোনা যায় না, কিন্তু এদেশে টম-ডিক-হ্যারি এখনও অজস্র) ডিকের বয়স তিরিশের কাছাকাছি, মাঝারি উচ্চতা, মাথায় চুল কোঁকড়া। অধিকাংশ আমেরিকানের মুখেই একটা অহংকারী আত্মপ্রত্যয়ের ভাব থাকে, সেই তুলনায় এর মুখখানি বেশ বিনীত আর তৈলাক্ত। সেই দেখেই আমার সন্দেহ করা উচিত ছিল, কিন্তু ছেলেটি আমায় পরিচয় দিল যে সে টিভি-তে সোপ-অপেরার স্ক্রিপ্ট লেখে, ছোটখাটো ভূমিকায় অভিনয়ও করে।

ডিক খুব সিনেমায় উৎসাহী, পৃথিবীর মধ্যে ভারতেই সবচেয়ে বেশি সিনেমা তৈরি হয় কেন, সে সম্পর্কে ওর খুব কৌতূহল। আমি আবার এই সব ব্যাপার খুবই কম জানি। হুঁ-হাঁ দিয়ে কাজ চালাতে লাগলুম। ডিক বাংলা ফিলম্ সম্পর্কেও কিছু খবর রাখে। কথায়-কথায় ও আমায় জিগ্যেস করল, তুমি সত্যজিৎ রায়কে চেনো? তিনি তো ক্যালকাটা বেজ্‌ড, তাই না? তোমার সঙ্গে আলাপ আছে নিশ্চয়ই?

সত্যজিৎ রায় পৃথিবীবিখ্যাত মানুষ, আমাদের কাছে অনেক দূরের লোক। দূর থেকে তাঁকে দু-একবার দেখেছি বটে কিন্তু কখনও কথা বলার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারিনি। কিন্তু এই সব ক্ষেত্রে একটু আধটু মিথ্যে কথা বলার লোভ সংবরণ করা শক্ত। আমি সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বললুম, হ্যাঁ হ্যাঁ চিনি।

ছেলেটিও তৎক্ষণাৎ বলল, তুমি সত্যজিৎ রায়কে বলে ওঁর কোনও ফিল্মে আমার একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে পরো।

এবার আমার আকাশ থেকে পড়ার মতন অবস্থা। চাকরি? সত্যজিৎ রায়ের কাছে? আমি তার ব্যবস্থা করে দেব? আমতা-আমতা করে বললুম, মানে, সত্যজিৎ রায়ের নিজস্ব ইউনিট আছে, তা ছাড়া দেশবিদেশের অনেকেই ওঁর সঙ্গে কাজ কবার জন্য উন্মুখ শুনেছি, সেইজন্য সুযোগ পাওয়া খুবই শক্ত।

তুমি তাহলে অন্য কোনও বাংলা ছবিতে আমার একটা কাজ জোগাড় করে দিতে পারবে? আমার কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আছে, আমার বেশি টাকা চাই না, আমি কষ্ট করেও থাকতে পারব।

আমি মনে মনে ভাবলুম, বাংলা সিনেমার যা দুরবস্থার কথা শুনেছি, অনেক টেকনিশিয়ানই খেতে পায় না, সেখানে একজন আমেরিকান পোষা তো অসম্ভব ব্যাপার। তা ছাড়া এক বর্ণ বাংলা-না-জানা সাহেব নিয়ে বাংলা সিনেমা করবেই বা কী?

ডিক বলল, তোমায় আমার বায়োডাটা আর কিছু কিছু ক্রেডেনশিয়ালস্ দিয়ে দিতে পারি, তুমি যদি ইন্ডিয়াতে আমার জন্য একটা চাকরির চেষ্টা করো—

আমি একটা অছিলা দেখিয়ে উঠে পড়লুম তার পাশ থেকে, তবু সে সঙ্গ ছাড়ে না। বারবার ওই একই কথা বলতে লাগল।

অনেক রাত্তিরে পার্টির বেশিরভাগ লোক চলে যাওয়ার পর শম্ভুদার সঙ্গে আমরা কয়েকজন বসলুম জমিয়ে আড্ডা দিতে। বিনতাবউদি জিগ্যেস করলেন, ওই ডিক তোমাকে এত কথা কী বলছিল?

আমি বললুম, আমার কাছে চাকরি চাইছিল। ভেবে দেখুন ব্যাপারটা, ভারতে কোটি কোটি বেকার, আমি স্বয়ং বেকার, আর আমার কাছেই কিনা চাকরি চাইছে একজন আমেরিকান।

বিনতাবউদি বললেন, এখন এদেশেও ষোলো পার্সেন্ট বেকার।

সিরাজুল বলল, সাবধান, ও কিন্তু সুযোগ পেলেই টাকা ধার চাইবে। আমার কাছ থেকে পঁচিশ ডলার নিয়েছে।

শম্ভুদা বললেন, ছেলেটা খুব কষ্টে পড়েছে। একটা কলেজে চাকরি করত, কী কারণে যেন চাকরি গেছে, আমাদের ইউনিভার্সিটিতে আপাতত কোনও পোস্ট খালি নেই, আমি চেষ্টা করছি ওর জন্য...ওর বউটাও পালিয়েছে ওকে ছেড়ে, একটা আট বছরের ছেলেকে নিয়ে ও ট্রেলার হাউসে থাকে, খুব টানাটানির মধ্যে পড়েছে—

আমি বললুম, ও যে বলছিল, টিভি-র নাটকের স্ক্রিপ্ট লেখে, অভিনয় করে?

শম্ভুদা বললেন, ধুৎ! সে সব বাজে কথা। কয়েকটা স্ক্রিপ্ট পাঠিয়েছে, একটাও নেয়নি ওরা। দু-একটা কমার্শিয়ালে শুধু মুখ দেখানো অভিনয় করেছে, তাতে কী হয়!

পরদিন সকালেই ডিক আমার কাছে এসে হাজির। সঙ্গে একগাদা কাগজপত্র। ওর নানান যোগ্যতার সার্টিফিকেটের কপি। বারবার বলতে লাগল ইনিয়ে বিনিয়ে, ইন্ডিয়াতে গিয়ে কাজ করার খুব ইচ্ছে, তুমি যদি একটা কাজ জোগাড় করে দিতে পারো, মাইনে বেশি চাই না, অন্তত তিনশো ডলার হলেই আমি চালিয়ে নিতে পারব—।

তিনশো ডলার ও দেশে খুবই সামান্য টাকা, মাস চালানো কঠিন। কিন্তু ভারতীয় মুদ্রায় তা সাতাশ শো টাকা। অত টাকা এদেশে কজন রোজগার করে!

এ ক্ষেত্রে নিরুপায় হয়ে আমায় মিথ্যে স্তোকবাক্য দিতেই হল, হ্যাঁ হ্যাঁ, চেষ্টা করব, আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করব তোমার জন্য—।

।। ৪৬ ।।

আর কয়েকদিন পরেই ক্রিসমাস। চতুর্দিকে সাজো-সাজো রব। প্রত্যেক পরিবারে পুজোর বাজার চলছে পুরোদমে। কয়েকদিন তুষারপাত বন্ধ আছে, বরফ-ঠিকরানো রোদ্দুরে অতিরিক্ত ঝলমল করছে প্রকৃতি। এই যে বরফ জমে আছে এখন, এই বরফ গলতে শুরু করবে সেই মার্চ-এপ্রিলে। কিন্তু ততদিন আমি থাকব না। আমার মনের মধ্যে যাই-যাই রব উঠে গেছে। ঠিক করে ফেলেছি, ক্রিসমাস আর থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বরের উৎসব দেখেই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাব।

বাইরে অত ঠান্ডা, কিন্তু কাল রাতে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল দারুণ গরমে। ঘামে ভিজে গিয়েছিল সারা শরীর। বিছানা ছেড়ে উঠে সেন্ট্রাল হিটিং ব্যবস্থা একেবারে বন্ধ করে রেখেছিলুম কিছুক্ষণের জন্য। সারাক্ষণ কৃত্রিম গরম বাতাস ঢোকানো হচ্ছে ঘরে, এক-এক সময় শরীরে খুব অস্বস্তি হয়, তখন মনে হয়, এর চেয়ে ঠান্ডায় কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে আসাও ভালো। কাল রাত দুটোর সময় আমি ঠান্ডা জলে স্নান করেছিলুম।

সকালে ভাবছিলুম, আজ একটু পায়ে হেঁটে ঘুরে আসব। এমন সময় মুখার্জিদার ফোন এল।

—ওহে নীলুচন্দর, ঘুম ভাঙছে? চা খাওয়া হইছে?

—গুড মর্নিং মুখার্জিদা। অ্যাম অ্যাট ইওর সার্ভিস।

—বইস্যা বইস্যা কী করত্যাছো?

—সিম্‌পলি ডে ড্রিমিং!

—আমি ডে ময়েন যাইত্যাছি, একখান লেকচার আছে। যাবা নাকি আমার লগে?

—ডে ময়েন?

—হ, ভালো জায়গা। বি রেডি উইদিন হ্যাফ অ্যাওয়ার। আই'ল পিক ইউ আপ!

ফোন ছেড়ে আমি ঝিম মেরে বসে রইলুম কিছুক্ষণ। আমার নিয়তি!

ভেবেছিলুম আমেরিকার আর যেখানেই যাই, আয়ওয়া শহরে যাব না। ও জায়গাটা আমার নিষিদ্ধ এলাকা। কিন্তু ডে ময়েন যেতে হলে আয়ওয়া শহরের পাশ দিয়েই যেতে হবে। আমার নিয়তিই আমাকে টেনে এনেছে এই পর্যন্ত। মুখার্জিদার প্রস্তাবটি যে প্রত্যাখ্যান করব, সেরকম মনের জোরও নেই।

মুখার্জিদার দুটি গাড়ির মধ্যে আজ এনেছেন মার্সিডিজ বেঞ্জখানা। ঝকঝকে নতুন। মুখার্জিদার চেহারাটিও পাক্কা সাহেবের মতন, ইংরেজিও বলেন দারুণ চোস্ত। এই লোকটির মুখে একেবারে নিপাট বাঙাল ভাষা শুনলে কেমন যেন অস্বস্তি লাগে। মুখার্জিদা মদটদ খান না এবং গাড়ি চালাবার সবরকম নিয়মকানুন মেনে চলেন। মুখার্জিদার পাশে বসলেই সিট বেল্ট বাঁধতে হয়।

হাইওয়েতে পড়বার পর মুখার্জিদা জিগ্যেস করলেন, কী বেরাদর, আইজ মুখখান বাঙলার পাঁচের মতন গম্ভীর কইর‍্যা আছো ক্যান?

আমি একটু চমকে উঠে বললুম, কই না তো?

—দ্যাশের জন্য মন কান্দে?

—আপনার কাঁদে না?

—না রে ভাইডি। আমার কোনও দ্যাশ নাই। সে দুঃখের কথা আর কী কমু।

এরপর কিছুক্ষণ আমি মুখার্জিদাকে একলাই কথা বলতে দিলুম। আমার আজ সত্যিই আড্ডার মুড নেই। রোড সাইন দেখে বুঝতে পারছি, আয়ওয়া সিটি আর বেশি দূরে নেই। সব হাইওয়ের চেহারাই এক, সুতরাং চেনা কিছুই চোখে পড়ছে না।

হঠাৎ মন ঠিক করে ফেললুম। মুখার্জিদাকে বললুম, দাদা, একটা কথা বলব? আপনি ডে ময়েন থেকে কখন ফিরবেন?

—সাতটা আটটা হবে। ক্যান, তোমার তাড়া আছে নাকি?

—না। সেজন্য নয়। আপনি বরং এক কাজ করুন। আমাকে আওয়া সিটিতে নামিয়ে দিয়ে যান। ফেরার সময় আবার আমায় তুলে নিয়ে যাবেন। ডে ময়েন শহরে আমার চেনাশুনো কেউ নেই, আপনার বক্তৃতা শুনেও আমি কিছুই বুঝতে পারব না। সেরকম বিদ্যাবুদ্ধি আমার নেই। বরং আয়ওয়া শহরটা ঘুরে দেখি।

মুখার্জিদা দারুণ অবাক হয়ে বললেন, আয়ওয়া সিটি? সেখানে দেখার আছেটা কী? পুঁইচকা একখান শহর, ল্যাজা নেই মুড়া নাই। ডে ময়েন অনেক বড়, ভালো ভালো দোকানপাট আছে...

—না দাদা, আমি এখানেই নামব।

—আয়ওয়া সিটিতে চেনা কেউ আছে?

—হয়তো চেনা কারুকে পাব না। কিন্তু জায়গাটা আমার খুব চেনা। গাছ-পালা, বাড়ি-ঘরগুলোকে চিনি।

মুখার্জিদা নিরাশ হয়ে বললেন, যাবা না আমার লগে? আমি একলা একলা যামু? চলো না ভাইডি, অনেক কিছু খাওয়ামু। ওয়াইল্ড রাইস খাইছ কখনও?

তবু আমি নেমে পড়লুম প্রায় জোর করে। ওয়াইল্ড রাইসের লোভ দেখিয়ে কোনও কাজ হল না, ওই চালের ভাত আমি অনেকবার খেয়েছি। এ একরকম বুনো ধান, কেউ চাষ করে না, জলা জায়গায় জন্মায়, লাল ইন্ডিয়ানরা খুঁজে আনে। লম্বা লম্বা চাল হয়, একটু হলদে ধরনের। তাতে অপূর্ব সুন্দর একটা গন্ধ। আশ্চর্য ব্যাপার, এই আয়ওয়া শহরেই প্রথম একজন ওয়াইল্ড রাইস রেঁধে খাইয়েছিল আমায়।

ঠিক হল, ইউনিভার্সিটির ইউনিয়ানের রেস্তোরাঁ থেকে ঠিক রাত আটটার সময় মুখার্জিদা আমায় তুলে নিয়ে যাবেন ফেরার সময়।

অনেক দিন আগে এই ছোট্ট শহরে আমি এক বছর থেকেছি। এখানকার রাস্তার প্রতিটি ধুলোও আমার চেনা, যদিও এদেশের রাস্তায় ধুলো থাকে না। তা ছাড়া আমার ধারণা ঠিক নয়, যে শহরটাকে আমি চিনতুম, সেটা আর নেই। এদেশে সব কিছুই বড় দ্রুত বদলায়। তখন আয়ওয়া সিটি ছিল একটা ছোট্ট, ছিমছাম নিরিবিলি শহর, অধিকাংশ বাড়িই কাঠের দোতলা। এখন সেসব বাড়ি আর প্রায় চোখেই পড়ে না, এদিকে সেদিকে বড় বড় বাড়ি। চারদিকে ছিল ছোট ছোট পাহাড় আর নিবিড় জঙ্গল, এখন পাহাড়ের গায়ে গায়েও বাড়ি উঠেছে, জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বড় বড় রাস্তা। দোকান ছিল মাত্র দু-তিনটে, এখন রীতিমতন একখানা ডাউন টাউন, সেখানে সার সার দোকান ও ট্যাভার্ন। যেখানে ছিল বাস স্টেশন, সেটা ভেঙে সেখানে গড়ে উঠেছে সুদৃশ্য শপিং মল। সেখানে, এমনকী একটা ভারতীয় জিনিসপত্রেরও দোকান রয়েছে দেখছি।

রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালুম অনেকক্ষণ। একটা লোকও আমায় চেনে না। আগে রাস্তায় বেরুলেই দু-তিনজন অন্তর একজন মুখ-চেনা চোখে পড়ত। মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে জিগ্যেস করত, হাই!

শুধু আয়ওয়া নদীটি একই রকম আছে। রোগা, কালো জল। নদীর দুপাশের দৃশ্য বদলে গেছে, সেই নির্জনতা আর নেই, নতুন ব্রিজও তৈরি হয়েছে গোটাতিনেক, তবু নদীটিকে চেনা লাগল। তার কিনারে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করলুম, নদী, তুমি কেমন আছো? আমায় চিনতে পারো?

এই নদীর ধার দিয়ে বিকেলবেলা আমি আর মার্গারিট হাঁটতুম। এই রকম শীতের বেলায়। এখনও যেমন, তখনও তেমন নদীর জলে ভাসত চাঁইচাঁই বরফ, কোথাও কোথাও একেবারে শক্ত হয়ে জমে যাওয়া। দুধারে পপলার গাছের সারি। হাঁটতে-হাঁটতে মার্গারিট আমায় শোনাতো ফরাসি ভাষা, আমি ওকে শেখাতুম বাংলা। আমি জানি না, এর ফরাসি কী? জ্য ন সে পা। তাড়াতাড়িতে বলতে হয়, জ্যান্সেপা! এভার বলো, জ্য পাঁঝ্ দঁক, জ্য সুই! আমি চিন্তা করি, তাই আমি বেঁচে আছি।

মার্গারিটের ফরাসি ঠোঁটে বাংলা শোনাতো বড় মধুর। আ-মি সসেজ কাবো! আ-মি জ-ল কাবো! আ-মি চু-মু কাবো! স-ব কাবো? হাউ অ্যাবসার্ড! ইউ সুইট!

একেবারে পাগলি ছিল মেয়েটা। কবিতা পাগল। দিনরাত কবিতা-তন্ময়। যে কোনও দৃশ্য, যে কোনও ঘটনা দেখলেই জিগ্যেস করত, বলো তো, কার কবিতায় ঠিক এরকম আছে?

আমি কি অত পারি? আমার তো অত কবিতা জ্ঞান নেই। সুতরাং ও-ই শোনাত আমাকে। আমার ঘরে পাশাপাশি বসে ও আমাকে গিয়ম্ অ্যাপোলোনিয়েরের কবিতা পড়ে শোনাতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অ্যাপোলিনিয়েরের একটি কবিতায় দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রণয় কাহিনির উল্লেখ থাকায় ও বলেছিল, তুমি আমায় কালিদাসের শকুন্তলা শোনাও! শুধু কাহিনিটা বললে হবে না, কালিদাসের রচনা ওকে পড়ে শোনাতে হবে। দেশ থেকে বাংলা কালিদাস গ্রন্থাবলী আনিয়ে দিনের পর দিন আমার অক্ষম ইংরেজিতে ওকে অনুবাদ করে শুনিয়েছি।

যে বাড়িটায় আমি থাকতুম, খুব ইচ্ছে হল সেই বাড়িটা দেখবার। ঠিকানা এখনও মুখস্ত আছে। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল বাড়িটার নাম ক্যাপিটল। তার চারদিকে চারটে রাস্তা। আমার বাড়ি ছিল তিন শো তিন নম্বর সাউথ ক্যাপিটলে। এক বছর যেখানে থেকেছি, সেই রাস্তা ভুলে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তবু আমি পথ চিনতে পারছি না। সাউথ ক্যাপিটল রাস্তাটা ধরে হাঁটতে হাঁটতেও দিশেহারা হয়ে যাই। এ যে সব কিছুই অন্যরকম। আমার বাড়িটা গেল কোথায়? আমার বাড়িটা ছিল রেল স্টেশনের দিকে। পথ চলতি দু-একজন ছাত্রকে রেল স্টেশনের কথা জিগ্যেস করলে তাঁরা চিন্তিত মুখে থমকে থাকে। রেলস্টেশন? কখনো এর কথা শুনিনি তো? ছাত্র মানেই নতুন আবাসিক, তাই চেনে না। এবার জিগ্যেস করলুম একজন বয়স্ক লোককে। তিনি বললেন, রেলস্টেশন? হ্যাঁ ছিল বটে এককালে। এখন তো সেটাতে আর কিছু হয় না। এখান থেকে রেল উঠে গেছে।

কোনও শহর থেকে রেলস্টেশন উঠে যাওয়ার কথা কেউ আগে শুনেছে? আমরা তো জানি নতুন নতুন রেলস্টেশন হয়, পুরোনোরা উঠে যায় না। আমেরিকাতে ট্রেন ব্যাপারটাই এখন মুমূর্ষু।

অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর বুঝতে পারলুম, সাউথ ক্যাপিটলের অর্ধেকটা আছে, আর বাকি অর্ধেকটা উধাও হয়ে গেছে। সেই রাস্তা ও সেখানকার সব বাড়ি ঘর ভেঙে-গুঁড়িয়ে সেখানে উঠেছে অনেকগুলো মাল্টিস্টোরিড অ্যাপার্টমেন্ট হাউস। সেই বাড়িটিতে আমার প্রথম যৌবনের অনেক স্মৃতি ছিল। বাড়িটি আর ইহলোকে নেই, মার্গারিটও নেই।

মার্গারিট থাকত হস্টেলে অর্থাৎ ডর্মে। সেই সময় ছাত্র ও ছাত্রীদের আলাদা আলাদ ডর্ম ছিল, এখন তারা ইচ্ছে করলে একসঙ্গেই থাকতে পারে।

এক একদিন রাত একটা দেড়টায় আমি মার্গারিটকে ওর ডর্মে পৌঁছে দিতে আসতুম। প্রায় কাছাকাছি আসবার পর ও বলত, এবার তুমি একলা ফিরবে? চলো, আমি তোমায় খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আসি।

আমি যতই বারণ করি, সে পাগলি কিছুতেই শুনবে না। জোর করে আসবেই! অনেকখানি চলে আসে। তখন আমি পুরুষ হয়ে সেই নিশুতি রাতে একটি যুবতীকে কী করে একলা ছেড়ে দিই। আবার আমি ফিরে যাই ওর সঙ্গে! আবার ও আমাকে এগিয়ে দিতে চায়। প্রথম যৌবনের সেই সব উলটো-পালটা খেলা।

মার্গারিটের মনটা ছিল জলের মতন স্বচ্ছ। টাকাপয়সার কোনও হিসেবই বুঝত না। যে কেউ চাইলে ওর যা কিছু সম্বল এক কথায় দিতে দিতে পারত। এমন প্রায়ই হয়েছে, আমাদের দুজনের কাছে একটাও পয়সা নেই, ঘরে কোনও খাবার নেই, আমরা খালি পেটে কবিতা পড়ে কাটিয়েছি। খিদের জ্বালা খুব অসহ্য হলে ঠিক খাওয়ার সময় কোনও বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি, যাতে সে কিছু খেতে বলে। আমাদের বাড়ির নীচের তলাতেই থাকত পোল্যান্ডের একটি ছেলে, নাম ক্রিস্তফ, সে খুবই ভালো মানুষ, কিন্তু একটু কৃপণ স্বভাবের! আমি আর মার্গারিট দুজনে মিলে যে কত কৌশলে ক্রিস্তফের ঘাড় ভেঙেছি।

একদিন তিনজন দৈত্যাকার কালো মানুষকে মার্গারিট নিয়ে এসেছিল আমার ঘরে। তারা নাকি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে। আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলুম, ওরা বদ্ধ মাতাল আর ওদের মতলব খুব খারাপ। মার্গারিটকে সে কথা বললে ও বিশ্বাসই করতে চায় না। ওর ধারণা, পৃথিবীতে কোনও খারাপ মানুষ নেই।

সেই রকমই কোনও লোককে বেশি-বেশি বিশ্বাস করায় মার্গারিটের কিছু একটা সাংঘাতিক পরিণতি হয়েছিল। তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। আমাকে সেই ঘটনার পূর্ণ বিবরণ কেউ জানায়নি। পল এঙ্গেল বলেছিলেন, সে বড় মর্মান্তিক ব্যাপার, সে তোমার শুনে কাজ নেই।

আমি আয়ওয়া শহরে আসতে চাইনি, কারণ আমি ভেবেছিলুম, মার্গারিটের স্মৃতির কষ্ট আমি সইতে পারব না। কিন্তু একলা-একলা অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করার পর আমি হঠাৎ উপলব্ধি করলুম, কই, তেমন তো কষ্ট হচ্ছে না? আমি তো সব কিছুই স্বাভাবিকভাবে নিতে পারছি। তবে কি আমার হৃদয় খুব কঠিন? সময়ের ব্যবধান কি এতখানি ভুলিয়ে দিতে পারে? ভুলিনি কিছুই, কিন্তু দুঃখের বদলে মার্গারিটের স্মৃতি আমার কাছে মধুর হয়ে আসছে।

|| ৪৭ ||

এই শহরটির অনেক কিছু বদলে গেলেও একজন মানুষ বদলায়নি। তাঁকে দেখার পর আমি দারুণ চমকে উঠেছিলুম। মানুষের শরীর এত অবিচলিত থাকতে পারে?

রাস্তার টেলিফোন বুথ থেকে টেলিফোন করলুম পল এঙ্গেলকে। প্রথমে তিনি অবাক হয়ে দু-তিনবার বললেন কে? কে? তারপর আমায় চিনতে পেরে জিগ্যেস করলেন, তুমি কোথা থেকে কথা বলছ, কলকাতা? দিল্লি? লন্ডন?

আমি যখন বললুম এই আয়ওয়া শহর থেকেই, তখন পল একটা বিরাট লম্বাভাবে বললেন, হো-য়া-ট? তুমি এক্ষুনি আমার বাড়ি চলে এলো। না, না, তুমি নিজে আসতে পারবে না। তুমি কোথায় আছ? সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকো, আমি তোমায় তুলে আনছি।

শীতের জন্য বেশিক্ষণ রাস্তায় থাকা যায় না, সেই জন্য আমি মাঝে-মাঝেই কোনও-না-কোনও দোকানে ঢুকে শরীর গরম করে নিচ্ছিলুম। এখানকার দোকানে কিছু না কিনেও ঘুরে বেড়ালে কেউ কিচ্ছু বলে না। এখন আমি রয়েছি বুক স্টোরে। আগেই বলেছি, আয়ওয়া শহরটি খুবই ছোট, ধরা যাক মানকুণ্ডু কিংবা সোনারপুরের মতন। তবু 'এখানকার মতন এত বড় বইয়ের দোকান সম্ভবত কলকাতা শহরেও একটি নেই।

পল এঙ্গেল মানুষটি বড় অদ্ভুত। ইনি নিজে একজন কবি, খুব একটা উঁচু জাতের নন যদিও, আমেরিকার আধুনিক কবিদের চোখে ইনি, ধরা যাক, কালিদাস রায়। কিন্তু, পল এঙ্গেল সাহিত্যকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসেন। ওঁর মতে, পৃথিবীর সমস্ত সাহিত্যিকরাই এক জাতির লোক এবং সবাই, সবাই-এর আত্মীয়। সেইজন্য উনি প্রতি বছর একটা আত্মীয় সমাবেশ ঘটান এই ছোট শহরে। প্রধানত ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় উনি চালু করেছেন ইন্টার ন্যাশনাল রাইটিং প্রোগ্রাম। সেই প্রোগ্রামে পৃথিবীর নানান দেশের লেখকদের নেমন্তন্ন করে এনে এখানে অতিথি করে রাখা হয় তিন-চার মাস। চিন, রাশিয়া, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি থেকেও লেখকরা আসেন প্রতি বছর। ভারত থেকেও অনেক লেখক এসেছেন, বাংলা থেকে বিভিন্ন বছরে এসেছেন শঙ্খ ঘোষ, জ্যোতির্ময় দত্ত, সৈয়দ মুজতবা সিরাজ প্রমুখ। পলের সঙ্গে আমার আলাপ হয় কলকাতায় বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের মাঠে। অনেক বছর আগে।

পল একটা স্টেশন ওয়াগন নিয়ে এসে হাজির হলেন সাত মিনিটের মধ্যে। তাঁকে দেখে আমি তাজ্জব। হিসেব মতন পলের বয়স এখন হওয়া উচিত বাহাত্তর, কিন্তু আমি অনেকদিন আগে যেরকম

দেখেছিলুম, চেহারাটা এখনও ঠিক সেইরকমই আছে, দীর্ঘকায় মানুষটির শরীরে বার্ধক্যের ছাপ লাগেনি। আমাকে দেখে দ্রুত এগিয়ে এসে সোজা জাপটে ধরলেন। চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন হোয়াট আ প্লেজান্ট সারপ্রাইজ।

তারপর জিগ্যেস করলেন, তোমার লাগেজ কোথায়?

আমি লাজুক মুখে বললুম, কিছু নেই সঙ্গে!

—তার মানে?

—আমি ঘুরতে-ঘুরতে আসছি। থেমে-থেমে আপাতত আসছি সিডার র‍্যাপিডসের এক বন্ধুর বাড়ি থেকে। আয়ওয়া আসব কি না ভাবছিলুম। অবশ্য তোমার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতুম ঠিকই—

পল চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর নরমভাবে বললেন, মার্গারিট ম্যাডিউ?

আমি ঘাড় নাড়লুম।

পল বললেন, আমারও মনে আছে মেয়েটিকে। বড্ড সরল ছিল। এত সরল মানুষের বোধহয় আর জায়গা নেই এ পৃথিবীতে। পৃথিবীটা দিন-দিন যেন আরও নিষ্ঠুর হয়ে যাচ্ছে। চলো। গাড়িতে ওঠো।

আঁয়ওয়া নদীর ধার দিয়ে এসে পলের গাড়ি একটা টিলার ওপরে উঠল। দুপাশে জঙ্গল। ঢেউ খেলানো টিলার পর টিলা চলে গেছে, তারই একটার ওপরে পলের নতুন বাড়ি। আগের বার আমি যখন এখানে আসি তখন পল ছিল এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক, তার বাড়িটিও ছিল মাঝারি মডেস্ট ধরনের। রিটায়ার করার পর পল এই বাড়িটি কিনেছে, এটা বেশ বড় আর ছড়ানো, সঙ্গে সুইমিং পুল আছে। পল এঙ্গেল এদেশের একজন সচ্ছল মধ্যবিত্ত আমেরিকান, কিন্তু তার তুলনায় আমি আমেরিকা-কানাডার অনেক বাঙালির এর চেয়ে ঢের বড় বাড়ি দেখেছি। পলের দুখানি অতি সাধারণ গাড়ি, এর চেয়ে প্রবাসী বাঙালিরা আরও চাকচিক্যময় গাড়ির মালিক।

বাড়ির মতন পলের স্ত্রীও নতুন। এই নতুন স্ত্রীর নাম হুয়ালিং, ইনি একজন চিনে মহিলা এবং লেখিকা। চিনে এবং ইংরেজি এই দুই ভাষাতেই লেখেন। হুয়ালিং খুবই হাস্যঝলমলে নারী এবং ব্যবহারে উষ্ণতা আছে। আমার হাত চেপে ধরে বললেন, তোমার কথা পলের মুখে অনেকবার শুনেছি।

তারপর একটু দুষ্টু হেসে হুয়ালিং বললেন, পল আজকাল বড্ড বেশি পুরোনো গল্প বলে।

পল অট্টহাস্য করে বললেন, তা হলেই বুঝতে পারছ, তোমাকে বিয়ে করার আগের দিনগুলো কত ভালো ছিল।

হুয়ালিং-এর বয়েস নিশ্চয়ই পঞ্চাশের বেশি, কারণ তাঁর আগের পক্ষের দুটি সাবালিকা মেয়ে আছে। কিন্তু হুয়ালিং-এর গায়ের ত্বক বালিকার মতন মসৃণ। শুনেছি চিনেদের নাকি দেরিতে জরা আসে।

পলেরও আগের পক্ষের দুটি মেয়ে। আমি চিনতুম তাদের। খবর নিয়ে জানলুম, বিয়ে করে তারা দুজনেই এখন বিদেশে থাকে। পলের ছোট মেয়ে সেরার সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব ছিল। এই ক'বছরের মধ্যেই সে মোট চারবার বিয়ে করেছে।

পলের আগের পক্ষের স্ত্রী মেরির সঙ্গে ছিল আমার দারুণ ভাব। কারণ, প্রথম দিন আমি তাকে ভুল করে মা বলে ডেকে ফেলেছিলুম। এদেশে কোনও মহিলাকে মা বলা একটা দারুণ অপরাধ। আমি সবে প্রথম দিন এসেছি, কাঠ বাঙাল ইংরেজি আদবকায়দা জানি না। একজন বয়স্কা মহিলাকে কী বলে ডাকব ভেবে পাইনি। এদেশে সবাই সবার নাম ধরে ডাকে কিন্তু আমার বাধো-বাধো লাগছিল, তাই সম্বোধন করেছিলুম মাদার বলে। মেরি অবশ্য রাগেনি। হেসেই খুন হয়েছিল সে ডাক শুনে।

তারপর কত লোকের কাছে যে আমার সেই বাঙালত্বের গল্প শুনিয়ে আমায় নাজেহাল করেছে! তবে, মেরি আমায় ডেকে-ডেকে খাওয়াত প্রায়ই।

মেরি ছিল পাগলি। কখন যে রেগে উঠবে তার ঠিক নেই। একবার ক্রিস-মাসের রাতে সে আমাদের উপোস করিয়ে রেখেছিল। সেদিনই টিভি-তে সে কলকাতা সম্পর্কে একটা তথ্যচিত্র দেখাচ্ছিল এখানে। আমরা সবে খেতে বসেছি এমন সময় মেরি অগ্নিমূর্তি হয়ে এসে বললে, কলকাতায় কত মানুষ খেতে পায় না, কত মানুষ সারা রাস্তায় শুয়ে থাকে, আর তোমরা এখানে বসে-বসে এত খাবার খাচ্ছ? তোমাদের লজ্জা করে না? এই বলে সে খাবারের পাত্রগুলো তুলে-তুলে আছড়ে ফেলেছিল মেঝেতে।

মেরি এখন বেঁচে নেই। মেরির একটা শখ ছিল বাদুড়ের ছবি জমানো। পৃথিবীর নানান জাতের বাদুড়ের প্রায় হাজার খানেক ছবি ছিল তার। আমায় সে বলেছিল ভারতীয় বাদুড়ের ছবি পাঠাতে। আমি পাঠাতে পারিনি। আমার চেনা ফটোগ্রাফারদের বাদুড়ের ছবির কথা বললেই তারা শুধু হেসেছে।

হুয়ালিং যতই আমেরিকায় বসবাস করে আধুনিকা হোক, তাঁর শরীরে আছে প্রাচ্য দেশীয় রক্ত, একটু-একটু সংস্কারও রয়ে গেছে। এরই মধ্যে এক ফাঁকে তিনি জানিয়ে দিলেন যে, পলের স্ত্রী মারা যাওয়ার পর এবং তিনি নিজেও বিধবা হওয়ার পর তারপর তাঁদের বিয়ে হয়েছে। আমি পলের আগেকার স্ত্রীকে চিনতুম বলেই বোধহয় আমাকে এই কথা জানাবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন তিনি।

পল একটু জোরে কথা বলেন, দারুণ জোরে-জোরে হাসেন, তাঁর হাঁটার সময়ে কাঠের ফ্লোরে দুপদুপ শব্দ হয়। একে বলবে বাহাত্তুরে?

পল পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন বেশ কয়েকবার, কলকাতাতেও এসেছেন দু-বার। হুইস্কির বোতল খুলে শুরু করলেন কলকাতার গল্প। সেই যে গঙ্গার ধারে বার্নিং ঘাট, সেখানে রবীন্দ্রনাথ টেগোরকে ক্রিমেট করা হয়েছিল, কী যেন সেই জায়গাটার নাম?

—নিমতলা।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। স্পষ্ট মনে আছে। গঙ্গা নদী, জানো তো হুয়ালিং, আমাদের মিসিসিপির চেয়েও চওড়া, অবশ্য তোমাদের ইয়াংসিকিয়াং আরও বড়, কিন্তু গঙ্গা হচ্ছে হোলি রিভার, সেখানে একবার ডিপ নিলেই সব পাপ কেটে যায়—

হুয়ালিং বললেন, জানি।

—নিউ ইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্কের মতন কলকাতার মাঝখানে একটা হিউজ এরিয়া আছে, কী যেন নাম, না, না, বোলো না, মনে পড়েছে, মইডান! তাই না। তার পাশের রাস্তাটার নাম চৌরিঙ্ঘি। ঠিক বলিনি? আর একটা রাস্তা, যেখানে কফি হাউস আছে, সেই কফি হাউসে ইয়াং রাইটাররা যায়, খুব ক্রাউডেড রাস্তা, অনেক বইয়ের দোকান, রেলিং-এর গায়ে পুরোনো বইয়ের দোকান।

আমি বললুম, পল, তোমার তো আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি।

হুয়ালিং আবার দুষ্টু হাসি দিয়ে বললেন, জানো তো, পল এই কথাটা শুনতে খুব ভালোবাসে।

—কোন কথাটা?

—এই যে, 'তোমার তো আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি!'

পল বললেন, লোকে কি আমায় খুশি করার জন্য মিথ্যে কথা বলে? আমার মেমারি তো সত্যিই ফ্যানটাসটিক।

—কিন্তু এই সব গল্প যে আমরা আগে অনেকবার শুনেছি।

—তাহলে শোনো, নীললোহিতের সঙ্গে আমার এখানকার গল্প বলি। নীলু, তোমার মনে আছে সেই ভ্যান অ্যালেনের পোশাকের ঘটনা।

আমি বললুম, সে কখনও ভোলা যায়?

—চলো, কাল তোমায় অনেক জায়গায় নিয়ে যাব।

—কাল? আমার যে আজই ফিরে যাওয়ার কথা?

—আয়ওয়া থেকে তুমি আজই ফিরে যাবে? তুমি কি ক্রেজি হয়ে গেছ নাকি?

হুয়ালিং জিগ্যেস করলেন, ভ্যান অ্যালেনের গল্পটা কী? সেটা তো আগে শুনিনি।

পল বললেন, তুমি তো ভ্যান অ্যালেকে চেনো। একদিন তার বাড়িতে গেছি আকাশের তারা দেখতে—

হুয়ালিং বাধা দিয়ে বললেন, তুমি চুপ করো, গল্পটা নীললোহিতকে বলতে দাও।

ভ্যান অ্যালেন আয়ওয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত মানুষ। নোবেল প্রাইজ পাওয়া বিজ্ঞানী। তাঁর অনেক মৌলিক আবিষ্কার আছে। আকাশে তিনি একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড আবিষ্কার করেছেন, তার নামই দেওয়া হয়েছে ভ্যান অ্যালেন'স বেল্ট।

এই ভ্যান অ্যালেন পল এঙ্গেলের বন্ধু। আগেরবার পল আমাকে প্রায়ই নিয়ে যেতেন ভ্যান অ্যালেনের বাড়ি। অত বড় বিজ্ঞানী, কিন্তু নিরহঙ্কার মাটির মানুষ তিনি। আমাদের তিনি আকাশের নক্ষত্রজগৎ দেখাতেন আর জটিল বিজ্ঞানের কথা এমন সরলভাবে বোঝাতেন যে আমার মতন মূর্খও তা অনেকটা বুঝে যেত।

একদিন সেই রকম নক্ষত্র দেখা চলছে, চমৎকার চাঁদনি রাত। ভ্যান অ্যালেনের বাড়িতে সেদিন কেউ নেই। আমাদের খাওয়া হয়নি। হঠাৎ তিনি বললেন, চলো, আজ সবাই মিলে বাইরে কোথায় খেয়ে আসি। তারপর তিনি মাইল পঞ্চাশেক দূরের একটা রেস্তোরাঁর নাম করে বললেন, ওখানকার হাঙ্গেরিয়ান গুলাশ্‌ খুব ভালো হয় শুনেছি। আর স্যালাড দেয় পঁচিশ রকম।

এ প্রস্তাব শুনে পল খুব একটা উৎসাহ দেখালেন না। আমার দিকে কয়েকবার তাকিয়ে তিনি বন্ধুকে বললেন, ভ্যান, ইউ নো, দেয়ার ইজ আ লিট্‌ল প্রবলেম।

সমস্যাটা আমি তৎক্ষণাৎ বুঝে গেলুম। গ্রীষ্মকাল, আমি পরে ছিলুম হাওয়ায় শার্ট, ট্রাউজার্স আর চটি। কোনও-কোনও রেস্তোরাঁয় তখনকার দিনে পুরোদস্তুর পোশাক পরে যাওয়ার নিয়ম ছিল। টাইটা অনেকে বর্জন করলেও ডিনারের সময় জ্যাকেট পরা অবশ্য পালনীয়। আমার জন্য ওঁদের যাওয়া হবে না ভেবে আমার দারুণ অস্বস্তি লাগছিল।

বড় বৈজ্ঞানিকরা এই সব ছোটখাটো সমস্যা চট করে বুঝতে পারেন না। ভ্যান অ্যালেন বারবার জিগ্যেস করতে লাগলেন, কেন, কেন, কী হয়েছে? কী প্রবলেম?

পল তাঁকে কয়েকবার অন্য কোনও ছোট রেস্তোরাঁর নাম বলার পর শেষ পর্যন্ত আসল কথাটা খুলেই বললেন। তা হলে আমাকে আবার বাড়ি গিয়ে পোশাক পরে আসতে হয়, আমার বাড়ি উলটো দিকে কুড়ি মাইল।

ভ্যান অ্যালেন বললেন, তাতে কী হয়েছে, আমাদের এই তরুণ ভারতীয় বন্ধুটি দৈর্ঘ্যেপ্রস্থে তো আমারই সমান। আমার জুতো ওর পায়ে লেগে যাবে।

এই বলে তিনি তক্ষুনি নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে আমায় দিলেন ওঁর জুতো-মোজা আর কোট। হাওয়াই শার্টের ওপর কেউ জ্যাকেট পরে না, সেই জন্য আমার হাওয়াই শার্টটাই গুঁজে নিলুম প্যান্টে। জামা গুঁজে পরার পর বেল্ট না পরলে চলে না। একটা বেল্টও পেয়ে গেলুম। সেটা সবে কোমরে গলিয়েছি এমন সময় পল দারুণ বিস্ময়ে বলে উঠলেন, নীলু, নীলু, তুমি কি জানো, তোমার কোমরে এখন ভ্যান অ্যালেনস বেল্ট?

গল্পটা শুনে খুব আসলেন হুয়ালিং। এই রকম আরও অনেক গল্পে সন্ধে ঘনিয়ে এল। শীতের বেলা, দেখতে-দেখতে অন্ধকার হয়ে যায়। আমি ওঠবার কথা বলতেই পল আবার এক ধমক দিলেন। বললেন, এখানে অনেক দেশের লেখকরা এসে আছেন। আজ এ বাড়িতে পার্টি আছে, সবাই আসবে। তুমি থাকো, তোমার সঙ্গে ওদের আলাপ করিয়ে দেব।

থাকতেই হল। সাড়ে ছ'টা বাজতে-না-বাজতেই আসতে লাগলেন লেখক লেখিকারা। বিভিন্ন রকম চেহারা, কত রকম তাদের পোশাকের বৈচিত্র্য। এদের মাঝখানে আমি এক হংস মধ্যে বকো যথা।

হঠাৎ দেখি শাড়ি পরা এক মহিলা। দারুণ জমকালো সাজসজ্জার জন্য প্রথমটায় চিনতে পারিনি। তারপরই বুঝলাম কবিতা সিংহ।

আমি ছুটে গিয়ে বললুম, কবিতাদি!

॥ ৪৮ ॥

পল এঙ্গেলের অনুরোধে আমি কয়েকদিন থেকে গেলুম আয়ওয়ায়। এ যাত্রায় এই প্রথম আমার কোনও সাহেবের আতিথ্য গ্রহণ। গত কয়েক মাস আমি শুধু বাঙালিদের বাড়িতেই কাটিয়েছি নানা জায়গায়, কখনও পুরোনো বন্ধুদের বাড়িতে, কোথাও বা নতুন বন্ধুত্ব পাতিয়ে। আগেরবার যখন আমি এদেশে এসেছিলুম, তখন বেশিরভাগ সময় সাহেবদের সঙ্গেই কাটিয়েছি, বাঙালিদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল খুব কম।

মুখার্জিদাকে সেই রাত্তিরেই খবর দিয়ে দেওয়া হল, পরের দিন গাড়ি পাঠিয়ে সিডার র‍্যাপিডস থেকে আনানো হল আমার সুটকেস। আয়ওয়াতে আমি জায়গা পেলুম ইউনিভার্সিটি গেস্ট হাউসে। মফস্বল শহরের এই ছোট বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথিশালায় ঘর আছে প্রায় ষাট-সত্তরটা, ব্যবস্থা প্রায় হোটেলের মতন, তবে আমাকে পয়সা দিতে হবে না এই যা!

আমার চারতলার ঘরের জানলা দিয়ে দেখা যায় আয়ওয়া নদী। এই নদীটি মোটেই দেখতে সুন্দর নয়। কিন্তু একে সুদৃশ্য করার চেষ্টা করা হয়েছে অনেকভাবে, কিছুদূর অন্তর-অন্তর এক-একটা সেতু, প্রত্যেকটিরই গঠন আলাদা, আর দুপাশে লাগানো হয়েছে নানারকম গাছ। উইলো, পপলার, চেরি এই সব গাছ চিনতে পারি, এক-একটা গাছ দেখলে দেবদারু মনে হয়। সেগুলো আসলে সাইপ্রেস। অ্যামস্টারডামে এই সাইপ্রেস গাছ অনেক দেখেছি। ভ্যান গঁঘের ছবিতেও অহরহ দেখা যায়।

আর আছে নানারকম বুনো ফুল। আমি আগে থেকেই জানি এ দেশে হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় বুনো ফুলের গন্ধ খোঁজা নিরাপদ নয়। কী একটা ফুল নাকের কাছে এনে ঘ্রাণ নিলেই হে ফিভার নামে এক উৎকট জ্বর হবেই। সুতরাং ফুল দেখতে হয় দূর থেকে। অবশ্য ফুলের দিন এখন নয়, এখন সবই বরফে ঢাকা।

আয়ওয়া শহরটিকে বলা চলে যৌবনের শহর। যেহেতু ইউনিভার্সিটিই এখানে প্রধান ব্যাপার, তাই রাস্তায়-ঘাটে, দোকানে-বাজারে, সিনেমা-রেস্তোরাঁয় শুধু তরুণ তরুণী। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ক্বচিৎ দেখা যায়, আর শিশু তো অতি দুর্লভ বস্তু।

আস্তে-আস্তে কয়েকজন লেখক-লেখিকার সঙ্গে পরিচয় হল। কবিতা সিংহ একদিন আমায় নেমন্তন্ন করে খাওয়ালেন। কবিতাদি আছেন মে ফ্লাওয়ার নামে একটি বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে, এলসা ক্রস নামে একটি মেক্সিকান কবির সঙ্গে অ্যাপার্টমেন্ট ভাগাভাগি করে। কবিতাদি তাঁর ঘরটা চমৎকার সাজিয়েছেন নদীর ধার থেকে কুড়িয়ে আনা নানারকম গাছের ডাল আর লতাপাতা দিয়ে, নিজের হাতে আঁকা কয়েকটা ছবিও লাগিয়েছেন দেওয়ালে।

কবিতাদির চেহারাটিও এই শীতের দেশে এসে আরও সুন্দর হয়েছে। কাশ্মীরি মেয়েদের মতন একটা পোশাক পরেছেন, তার ওপর নতুন ঝকঝকে ওভারকোট, মাথায় কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল, ঠিক যেন মেমসাহেব।

যত্ন করে রান্না করেছেন নানারকম পদ। খেতে বসে কবিতাদি বললেন, তোমায় দেখে কী দারুণ চমকে গিয়েছিলুম, নীলু। তোমায় এখানে দেখতে পাব, আশাই করিনি। তুমি তো একটা উড়নচণ্ডী আমি জানি, পায়ে হেঁটে-হেঁটেই কলকাতা থেকে এই পর্যন্ত চলে এলে নাকি?

আমি বললুম, হেঁটে আসব কেন? যোগবিদ্যা শিখে নিয়েছি তো, তাই আমি এখন ইচ্ছে করলেই হাওয়ায় উড়তে পারি।

কবিতাদি একটু হেসে বললেন, জানো তো সুনীল আর স্বাতীও এখানে এসেছে। ওরা অবশ্য এখন নেই, কোথায় যেন বেড়াতে গেছে।

আমি বললুম, আমার সঙ্গে নিউ ইয়র্কে একবার দেখা হয়েছিল, তখন ওঁরা আপনার কথা বলেছিলেন। আপনার এখানে কেমন লাগছে, কবিতাদি?

কবিতাদি বললেন, কী ভালো যে লাগছে, তা তোমায় কী বলব। কত দেশের লেখক-লেখিকাদের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে, কতরকম মানুষ, পল আর হুয়ালিং আশ্চর্য ভালো মানুষ। কী চমৎকার একটা লম্বা ছুটি বলো তো? এটা যেন একটা দৈব উপহার। এ এমন ছুটি, যাতে ইচ্ছে মতন অনেক কাজ করতে ইচ্ছে করে। জানো তো, আমি রোজ লাইব্রেরিতে গিয়ে অনেক কিছু নোট নিই। এমন মন দিয়ে পড়াশুনো করতে পারিনি অনেকদিন। আর একটা দারুণ খবর তোমায় শোনাচ্ছি, নীলু! এখানকার পুরোনো খবরের কাগজ ঘাঁটতে-ঘাঁটতে আমি আবিষ্কার করলুম, রবীন্দ্রনাথ একবার এসেছিলেন এই শহরে। এই খবর আমি আগে কোথাও পড়িনি। কোনও রবীন্দ্র গবেষক জানে না।

আমি বললুম, সত্যি তো। আমিও এ খবর কখনও শুনিনি। তবে ডিলান টমাস এসেছিলেন শুনেছি। ডিলান টমাসকে কবিতা পড়ার জন্য এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, তিনি বদ্ধ মাতাল অবস্থায় ট্রেন থেকে প্ল্যাটফর্মে আছাড় খেয়ে পড়ে যান। পরদিন সেইরকম মাতাল অবস্থায়ই তাঁকে ট্রেনে তুলে দেওয়া হয়।

কবিতাদি বললেন, আয়ওয়া জায়গাটা ছোট হলে কী হবে, পৃথিবীর সব দেশের লেখকরা এখানে আসেন। আমার তো ইচ্ছে করে এখানে অনেকদিন থেকে যাই, তবে ছেলেমেয়েদের জন্য মাঝে খুব মন কেমন করে। সপ্তাহে একখানা অন্তত চিঠি না পেলে এমন ছটফট করি...।

কবিতাদির অ্যাপার্টমেন্ট-সঙ্গিনী ভারী অদ্ভুত মেয়ে। ছোট্টখাট্টো মিষ্টি চেহারা, মুখে সব সময় হাসি লেগে আছে, কথা বলে নরম গলায়। মেক্সিকোতে এই এলসা ক্রুসের কবি হিসেবে বেশ নাম আছে। ওর সঙ্গেও আলাপ হল। এলসা এরই মধ্যে দুবার বিয়ে ও দুবার ডিভোর্স করেছে, দুটি ছেলেমেয়ে আছে তার। আধুনিক সাহিত্যিকদের মতন এক সময় সে প্রচুর মদ খেত, সিগারেট-গাঁজা টানত। মেক্সিকোতে পিয়োটি নামে আরও একটি মারাত্মক নেশার দ্রব্য আছে, তাও সে চেখে দেখেছে। কিন্তু শুধু অতৃপ্তি আর বিপর্যয়ই পেয়েছে তার বদলে। এখন সে শান্তির সন্ধানে মহারাষ্ট্রীয় গুরু স্বামী মুক্তানন্দের শিষ্যা হয়েছে। এলসা এখন কোনওরকম নেশা করে না, নিরামিষ খায়। তার ঘরে তার গুরুর ছবি, আর শিবঠাকুরের ছবি। শুধু নিজেই সে গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে ক্ষান্ত হয়নি, হিন্দুত্ব প্রচারের ব্রতও নিয়েছে। এখানেও সে আধ্যাত্মিক বিষয়ের ক্লাস নেয়।

অমন মিষ্টি একটি মেয়ের সঙ্গে একদিন আলাপের পরেই আমি তাকে এড়িয়ে-এড়িয়ে চলতে লাগলুম, পাছে সে আমাকেও হিন্দু বানিয়ে ফেলে!

প্রায় কুড়িজন লেখক লেখিকা এসেছেন এখানে, তার মধ্যে মূল চিন থেকেই তিন-চারজন। এঁদের মধ্যে প্রধান হলেন মাদাম ডিংলিং। এই মাদাম ডিংলিংকে দেখতে অবিকল আমার দিদিমার মতন। তফাত শুধু এই, ইনি শাড়ি পরে না, পরেন পাজামা আর কুর্তা। বয়েস প্রায় চুয়াত্তর, শুনেছি শরীরে ক্যানসার রোগ বাসা বেঁধেছে, তবু কী অসাধারণ এঁর জীবনীশক্তি, দিব্যি পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ান। দেখা হলেই মাথা ঝাঁকিয়ে তুরতুর করে অনেক কথা বলে যান, তার এক বর্ণও আমি বুঝি না। মাদাম ডিংলিং ইংরিজির ই-ও জানেন না। কিন্তু যখন আমার গায়ে ওঁর স্নেহময় হাতখানি রাখেন, তখন একটা আত্মীয়তা টের পাই।

মাদাম ডিংলিং এক সময় বিপ্লবের ডাকে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন, তখন তিনি সতেরো বছরের যুবতি। তারপর তিনি জীবনের ঘূর্ণাবর্তে কত জায়গায় যে গিয়েছেন এবং থেকেছেন তার

ঠিক নেই। তিনি ছিলেন মাও সে-তুং ও প্রখ্যাত লেখক লু সুনের বান্ধবী। চিয়াং কাইসেকের আমলে তিনি দীর্ঘকাল জেল খেটেছেন। তারপর চিনের বিপ্লব ঘটে যাওয়ার পর তিনি গণ্য হন প্রথম সারির লেখিকা হিসেবে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় তাঁকে আবার জেল খাটতে হয়, সে বড় সাংঘাতিক কারাবাস, তিনি যাতে লিখতে না পারেন সেজন্য এক চিলতে কাগজও দেওয়া হয়নি তাঁকে, তাঁকে কাজ দেওয়া হয়েছিল মুরগি পালন করার। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ভুল ভ্রান্তি যাবতীয় দায়দায়িত্ব এখন গ্যাং অব ফোর-এর নামে চালালেও, মাদাম ডিংলিং-এর মতে, মাও সে-তুং-এরও যথেষ্ট দায়িত্ব ছিল। মাদাম ডিংলিং পরিষ্কার ভাষায় বলেন, তাঁর শ্রদ্ধেয় বন্ধু মাও সে-তুং-এর সেই সময়কার ভুলে চিনের অগ্রগতি অন্তত দশ বছর পিছিয়ে গেছে। এই ভুলের সমালোচনা করেছিলেন বলেই তিনি বন্দি হয়েছিলেন।

এখন মাদাম ডিংলিং চিনের প্রধান লেখিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর এক একটি বইয়ের প্রথম সংস্করণ ছাপা হয় কয়েক লক্ষ, তিনি কোনও জনসভায় গেলে মানুষের ভিড় ভেঙে পড়ে।

মাদাম ডিংলিং দুবার বিয়ে করেছিলেন। বর্তমানে তিনি এক অবিবাহিত পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে থাকেন। সেই চিনা ভদ্রলোকও এসেছেন এখানে, তিনি খুব ভাঙা-ভাঙা ইংরিজি জানেন। মাদাম ডিংলিং-এর কথা তিনি অনুবাদ করে বুঝিয়ে দেন। ভারতবর্ষের প্রতি মাদাম ডিংলিং-এর খুব শ্রদ্ধা, উনি রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়েছেন ও পছন্দ করেছেন। আরও দু-একজন বাঙালি লেখকের সঙ্গে ওঁর দেখা হয়েছে পিকিং-এ কিন্তু এমনভাবে সেই নাম উচ্চারণ করলেন যে আমি কিছুতেই ধরতে পারলুম না তাঁরা কে। মনোজ বসু, মৈত্রেয়ী দেবী হতে পারেন।

একটা ব্যাপারে আমার খুব মজা লাগছিল, উনি ভারতের প্রসঙ্গ উঠলেই বলেন, উঃ কী প্রাচীন তোমাদের সভ্যতা। তোমাদের গান শুনলেই বোঝা যায় কয়েক হাজার বছরের সাধনা ও ঝংকার মিশে আছে তার মধ্যে।

আমরা মনে করি চিনের সভ্যতাই খুব প্রাচীন, আর চিনেরা মনে করে ভারতীয় সভ্যতা খুব প্রাচীন। মাদাম ডিংলিং কট্টর সাম্যবাদী কিন্তু প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর বিপুল শ্রদ্ধা।

আমি মাদাম ডিংলিং-র অটোগ্রাফ নিলুম। তারপর বললুম, আপনার ঠিকানাটাও দিন, যদি কোনওদিন চিনে যাই আপনার সঙ্গে দেখা করব। মাদাম ডিংলিং চিনে ভাষায় নাম সই করলেন, তাঁর সঙ্গী তলায় ইংরেজিতে ঠিকানা লিখলেন শুধু বেইজিং। বললেন, বেইজিং-এ গিয়ে যেকোনও লোককে জিগ্যেস করলেই মাদাম ডিংলিং-এর সন্ধান দিয়ে দেবে।

এরপর, মাদাম ডিংলিং ঠিক আমার দিদিমার মতনই ভঙ্গিতে রসিকতা করে বললেন, আমার আয়ু বোধহয় আর বেশিদিন নেই। তবু, তুমি যদি আসো, সেই অপেক্ষায় আমি বেঁচে থাকব।

আর একজন দক্ষিণ আফ্রিকার কালো লেখকের সঙ্গে আলাপ হল, তার নাম সিপো। ঠিক আলাপ বলা যায় না, এক তরফা কথা। সিপো-র মুখে একটা তিক্ততার ছাপ। মধ্যবয়েসি এই শিক্ষিত মানুষটির সর্ব অঙ্গে অপমানের জ্বালা। সব সময় সেটা প্রকাশ না করে পারেন না। শুধু গায়ের রঙের জন্য এঁরা নিজের দেশে থেকে প্রতিনিয়ত নির্যাতিত হচ্ছেন। সিকো বললেন, সাহিত্য? সাহিত্য আমাদের জীবন মরণের প্রশ্ন। আমরা কালো লোক, তাই আমাদের দেশে আমাদের কোনও কিছু লেখার অধিকার নেই। কোনও বই ছাপলে আমাদের শ্বেতাঙ্গ সরকার সেই বই বাজেয়াপ্ত করে, লেখককে জেলে ভরে, প্রেসের মালিককে শাস্তি দেয়। তবু আমরা লিখে যাচ্ছি।

নাইজিরিয়ার লেখক এনডুবিসির চোখ দুটো সব সময় লাল টকটকে। একদিন সকালবেলা তাকে একজন জিগ্যেস করল, এই সাত সকালেই তুমি নেশা করে বসে আছ? দৈত্যের মতন বলশালী চেহারার মানুষটি শিশুর মতন সরলভাবে হেসে বলল, না। স্বাধীনতার আগে ব্রিটিশের জেলে আমার পা দুটো বেঁধে উলটো করে ঝুলিয়ে রেখেছিল সারাদিন। সেই থেকে আমার চোখ এরকম হয়ে গেছে। এনডুবিসি এক ফোঁটা মদ্য পান করে না।

আমি হোটেল-মোটেলে খাই বলে কবিতাদি আমায় প্রায়ই নেমন্তন্ন করতে লাগলেন। একদিন তাঁর ঘরে দেখা পেলুম স্থানীয় দুটি বাঙালির। রঞ্জিত চ্যাটার্জি আর রবীন ঘোষাল। দুজনেই যাদবপুরের ছাত্র ছিল। রঞ্জিত বিয়ে করেছে ভাবনা নামে একটি অতি শান্ত ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী গুজরাটি মেয়েকে। রঞ্জিত আর রবীন দুজনেই চাকরিও করে আবার পড়াশুনো ও গবেষণা চালাচ্ছে। কবিতাদিকে আর আমাকে পেয়ে এরা আনন্দিত হয়েছে ঠিকই, আবার মনের মধ্যে সর্বক্ষণ একটা অস্বস্তি। ভালো করে আড্ডা দিতেও পারছে না। পরদিন ভোরবেলাই কাজে দৌড়োতে হবে। দুজনেই বারবার বলতে লাগল, আপনারা তো বেশ মজায় আছেন কবিতাদি। আমাদের এরা যে কী খাটিয়ে মারে তা জানেন না। একটুও বিশ্রাম নেই, সর্বক্ষণ কাজ, কাজ আর কাজ।

এই কাজ আর ব্যস্ততার কথা আমেরিকার সর্বত্র শোনা যায়। শব্দ দুটো আমার কানে নতুন লাগে। দেশে থাকতে তো এই দুটো শব্দ প্রায় শোনাই যায় না।

॥ ৪৯ ॥

কদিন বাদে আবার ফিরে এলুম সূর্যর অ্যাপার্টমেন্টে। মুখার্জিদা ক্রিসমাসের আগের রাতে তাঁর বাড়িতে নেমন্তন্ন করে রেখেছিলেন আগে থেকেই। এবং বলে রেখেছিলেন, আয়ওয়া থেকে আমি যেদিন ফিরব, সেদিন ওঁকে খবর দিলেই উনি আমাকে গাড়ি করে নিয়ে আসবেন।

কিন্তু মুখার্জিদাকে আর জ্বালাতন করিনি, বাসেই চলে এলাম। বাস স্টেশন থেকে সুটকেসটা হাতে ঝুলিয়ে হেঁটেই চলে এলুম বাড়িতে। এর মধ্যে শীত অনেকটা সহ্য হয়ে গেছে। মাঝে-মাঝে মাথায় টুপি পরতে ভুলে যাই। তবে গ্লাভ্‌স না পরলে চলে না, আঙুল গুলো কয়েক মিনিটে অবশ হয়ে যায়।

অ্যাপার্টমেন্টের দরজার চাবি খুলতে গিয়ে মনে হল, কী যেন নেই। কী নেই?

সঙ্গে-সঙ্গে দুম করে কেউ যেন একটা ঘুসি মারল আমার বুকে। মাথার মধ্যে বজ্রপাত হল। আমার কাঁধের ঝোলা ব্যাগটা?

বাস থেকে নামার সময় সুটকেসটা ঠিকই নিয়েছি পেছন থেকে, কিন্তু ঝোলা ব্যাগটা রেখেছিলুম, মাথার ওপর র‍্যাকে, সেটার কথা একদম মনে পড়েনি।

ইচ্ছে হল, তক্ষুনি দৌড়ে চলে যাই কিন্তু দৌড়ে কোনও লাভ নেই, গ্রে হাউন্ড বাস এই দশ মিনিটে অন্তত দশ মাইল দূরে চলে গেছে।

দৌড়ে টেলিফোনের কাছে যেতে গিয়ে আমি ডাইনিং টেবিলে খুব জোর একটা ধাক্কা খেলুম। কিন্তু তখন ব্যথা বোধ করারও সময় নেই। টেলিফোনের পাশেই দেওয়ালে-সাঁটা একটা কাগজে সূর্য কতকগুলো জরুরি টেলিফোন নাম্বার লিখে রেখেছে। তার মধ্যে গ্রে হাউন্ড বাস স্টেশনের নম্বর নেই। সূর্য ভালো চাকরি করে, সে সব সময় প্লেনেই যাতায়াত করে নিশ্চয়ই। সুতরাং টেলিফোন গাইড ঘাঁটতে হল।

তারপর টেলিফোনের বোতাম টিপেই আমি ব্যস্তভাবে জিগ্যেস করলুম, আয়ওয়া থেকে যে-বাসটি একটু আগে এসেছিল, সেটা কি ছেড়ে গেছে?

ওপাশ থেকে একটি মেয়ের ঠান্ডা গলা ভেসে এল, আয়ওয়া থেকে কোন বাস? কত নম্বর? কুড়ি মিনিটের মধ্যে দুটি বাস এসেছে!

নম্বর? এই রে, বাসের নম্বরটা তো খেয়াল করিনি। টিকিটে নম্বর লেখা থাকে না, এক টিকিটে যেকোনও বাসে চড়া যায়। দূরপাল্লার বাসে উঠলে বাসের নম্বর মনে রাখা খুবই দরকার কারণ মাঝে-মাঝে নামতে হয়, তখন অনেক বাসের মধ্যে নিজের বাসটি খুঁজে নিতে হয়। কিন্তু এসেছি মাত্র এক স্টেশন, সেইজন্য মাথা ঘামাইনি।

আমি ব্যাকুলভাবে বললুম, দেখুন, আমি একটা হ্যান্ডব্যাগ ফেলে এসেছি, খুবই দরকারি সব জিনিস আছে, সেটা না পেলে আমি খুবই বিপদে পড়ে যাব—।

ওপার থেকে মহিলাটি বলল, আয়ওয়া থেকে আসা একটি বাস এখনও দাঁড়িয়ে আছে, আপনি একটু ধরুন, আমি দেখে আসছি। কী রঙের ব্যাগ ছিল?

—খয়েরি রঙের, ভেতরে একটা ক্যামেরা, আর আমার প্লেনের টিকিট, তিন প্যাকেট ক্যামেল সিগারেট আর...

মহিলাটি একটুবাদে লাইনে ফিরে এসে বললেন, না। ও বাসে ওরকম কোনও ব্যাগ নেই। আগের বাসটি ছেড়ে গেছে।

—তা হলে কী হবে?

মহিলাটি নির্লিপ্ত গলায় বললেন, আপনার ঠিকানাটা বলুন, সন্ধান পেলে আপনার বাড়িতে পাঠিয়ে দেব।

—বাসটা ছেড়ে চলে গেছে, আর কী করে সন্ধান পাবেন?

—বাসটা কোথাকার ছিল?

—নিউ ইয়র্কের।

—তা হলে এরপর শিকাগোয় থামবে। সেখানে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি।

—দয়া করে যদি একটু বিশেষ চেষ্টা করেন। ওই ব্যাগটির মধ্যে আমার প্লেনের টিকিট আছে, ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটের—

—নিশ্চয়ই চেষ্টা করব।

টেলিফোন রেখে আমি নিঝুম হয়ে বসে রইলুম। যেন আমি সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি। ব্যাগটা যদি না পাওয়া যায়, তা হলে আমি ফিরব কী করে? আমার টিকিট...।

তাড়াতাড়ি সুটকেসটা খুললুম। উলটে ফেলে দিলুম সব জিনিসপত্র। যাক, পাসপোর্টটা আছে। অনেকদিন পাসপোর্ট দরকার হয়নি। তাই বার করিনি। প্লেনের টিকিটটা কেন সুটকেসে রাখিনি? হ্যান্ডব্যাগটা যে হারাবে তা কি জানতুম? আমার শেষ সম্বল আর ছাপ্পান্নটি ডলার, তাও ওই ঝোলার মধ্যে, আমার মানিব্যাগ বা পার্স ব্যবহার করার অভ্যেস নেই, টাকা রাখি বইয়ের মধ্যে। আজ যদি ওভারকোটের পকেটেও রাখতুম।

ক্যামেরা ট্যামেরা গেছে তার দুঃখ নেই, কিন্তু প্লেনের টিকিটটা গেছে বলেই খুব অসহায়বোধ করতে লাগলুম। ওটার জন্য সবসময় মনে একটা জোর ছিল, যখন খুশি ফিরে যাওয়ার স্বাধীনতা ছিল।

বাসটা শিকাগো পৌঁছতে চার-পাঁচ ঘণ্টা লাগবে, তার আগে কিছুই জানা যাবে না। এই সময়টা কীভাবে কাটাব? অনর্থক বসে-বসে চিন্তা করে তো লাভ নেই, তাই আমি শুয়ে পড়লুম। ওভারকোট কিংবা জুতো মোজাও খুলতে ইচ্ছে করল না। মনের যদি একটা সুইচ থাকত, তা হলে এখন সেটা অফ করে দিতুম। কিংবা সেরকম কোনও ঘুমের ওষুধ, যা খেলে এক নিমেষে ঘুমিয়ে পড়া যায়। ভীষণ রাগ হচ্ছে নিজের ওপর। এরকম ভুল যে করে তার বেঁচে থাকার অধিকার নেই। ব্যাগটা যদি ফেরত না পাই, তা হলে কত রকম যে ঝামেলায় পড়ব, তা ভাবতেই পারছি না।

ফেরত পাব কী? আগে জানতুম, এদেশে কোনও কিছুই হারায় না। এটা ডাকাতদের দেশ, এখানে কেউ ছিঁচকে চুরি করে না। কিন্তু সেই সুদিন আর নেই। নিউ ইয়র্কে একটি মেয়ের হাত থেকে ব্যাগ ছিনতাই-এর ঘটনা তো আমি নিজের চোখেই দেখেছি।

মুখার্জিদাকে ফোন করা উচিত। উনি এদেশে এতদিন আছেন, উনি নিশ্চয়ই জানবেন কীভাবে খোঁজখবর করতে হয়। কিন্তু নিজের দীনতার কথা বা নির্বুদ্ধিতার কথা কি সাধ করে অন্য কারুকে জানাতে ইচ্ছে করে?

খবরের কাগজ খুললুম। কিছুতেই মন বসে না। টিভি খুললুম, সব কিছুই উৎকট বাঁদরামো মনে হচ্ছে। মনের মধ্যে ঢংঢং করে অবিরাম বাজছে একটিই প্রশ্ন, যদি ফেরত না পাই? যদি ফেরত না পাই?

ওভারকোটের সব ক'টা পকেট উলটে দিলুম। অনেক খুচরো পয়সা জমে আছে। ডাইম আর কোয়ার্টারগুলো আলাদা করে সাজিয়ে নিলুম। সব মিলিয়ে আট ডলার পঁচাত্তর সেন্ট, আরও খুচরো এক সেন্ট আছে কুড়ি-পঁচিশটা। এই এখন আমার যথা সর্বস্ব! কথাটা উপলব্ধি করামাত্র খিদে পেয়ে গেল।

ঠিক পাঁচ ঘণ্টা পরে ফোন করলুম স্থানীয় বাস স্টেশনে। এবারে ফোন ধরেছে একজন পুরুষ:

—আমার হ্যান্ডব্যাগটার কোনও খবর পেয়েছেন?

—কীসের হ্যান্ডব্যাগ?

—দেখুন, আমি আয়ওয়া থেকে...

—আয়ওয়ার বাস এখনও আসেনি, আধঘণ্টা পরে আসবে।

—না, শুনুন, অনুগ্রহ করে আমার ব্যাপারটা শুনুন—।

ডিউটি বদলে গেছে, আগের মহিলাটি নেই, এই পুরুষটি আমার ঘটনা কিছুই জানেন না। সব কিছু শোনার পর বললেন, না, শিকাগো থেকে কোনও খবর তো আসেনি, একটু আগেই একটা ফোন এসেছিল, কোনও হ্যান্ডব্যাগের কথা বলেনি—।

—দয়া করে ওদের যদি আর একবার জানান। হ্যান্ডব্যাগটাতে আমার খুবই দরকারি জিনিসপত্র আছে।

—আপনি নিজেই শিকাগো বাস স্টেশনে ফোন করতে পারেন।

—দেখুন, আমি বিদেশি, ভারতবর্ষীয়, যদি একটু সাহায্য করেন, আমি বাসের নম্বরও জানি না, আমি অতি নির্বোধের মতন কাজটি করেছি বটে, কিন্তু ব্যাগটা খুঁজে পাওয়া আমার খুবই দরকার।

আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, লোকটি অন্য একটা টেলিফোন তুলে আর কারুর সঙ্গে কথা বলছে, আমার কথা শুনছেই না।

আমি তবু নাছোড়বান্দার মতন বকবক করে যেতে লাগলুম। লোকটি এক সময় বলল, আপনার নাম ঠিকানা বলুন, খোঁজ পেলে জানাব।

—আপনার আগে যিনি ডিউটিতে ছিলেন, তিনি সব জানেন। আমার নাম এই...

—ও, হ্যাঁ, একটা স্লিপ লেখা আছে দেখছি। আপনার ব্যাগটার বর্ণনা দিন, আপনার ফোন নম্বর দিন, কোনও খবর পেলে নিজেরাই জানাব। হ্যাঁ, শিকাগো আর নিউ ইয়র্কে খবর দিচ্ছি।

একটি বিনিদ্র রাত্রি কাটাবার পর পরদিন সকালে মুখার্জিদাকে সব ব্যাপারটা খুলে বলতেই হল।

মুখার্জিদা তাঁর বাড়ি থেকে সব মিলিয়ে প্রায় গোটা পনেরো ফোন করলেন। তাতেও বিশেষ কিছু সুরাহা হল না। আমার বিমান কোম্পানির কাছ থেকে জানা গেল যে আমার জন্য একটা ডুপ্লিকেট টিকিট ইস্যু করানো যেতে পারে কিন্তু তার আগে, যেখান থেকে আমার টিকিট ইস্যু করা হয়েছে, অর্থাৎ কলকাতা অফিস থেকে আগে খবরাখবর আনতে হবে। তার জন্য সময় লাগবে।

মুখার্জিদা আমায় উপদেশ দিলেন যে, হয় আমার কোনও ট্রাভেল এজেন্টের শরনাপন্ন হওয়া উচিত কিংবা নিজেই শিকাগো গিয়ে যেন তদবির শুরু করি। আজকাল কোনও কাজই তাড়াতাড়ি হয় না।

ট্রাভেল এজেন্টের কাছে গেলে তাকে পয়সা দিতে হবে, আর শিকাগো যাওয়ার ভাড়াও আমার কাছে নেই। মুখার্জিদা এতটা জানেন না। সে কথা আমি মুখ ফুটে বলতেও পারলুম না।

বাস স্টেশন থেকে আমার হ্যান্ডব্যাগ সম্পর্কে কোনও নতুন খবর পাওয়া গেল না। নিউ ইয়র্ক বা শিকাগোতেও সেরকম কোনও ব্যাগ জমা পড়েনি।

দ্বিতীয় দিন কেটে যাওয়ার পর আমি নিশ্চিন্ত হলুম যে আমার ঝোলা ব্যাগ অন্য কারুর ঘাড়কে পছন্দ করে ফেলেছে। এদেশের ছেলেমেয়েরা ঘনঘন বিয়ে বদলায়, আমার ব্যাগেরও সেরকম শখ জেগেছে নিশ্চয়ই। নইলে, ওর গায়ে আমার ঠিকানা লেখা ছিল, অনায়াসেই ফিরে আসতে পারত।

মুখার্জিদা অতিশয় সহৃদয় মানুষ, কিন্তু মরে গেলেও আমি তাঁর কাছ থেকে টাকা ধার চাইতে পারব না। এর আগেই কয়েক জায়গায় গল্প শুনেছি, আমাদের দেশ থেকে কেউ-কেউ এদেশে বেড়াতে এসে জিনিসপত্র কেনাকাটির লোভে এখানকার কারুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যায়, দেশে ফিরে তার মা-বাবা বা বাড়ির লোককে ভারতীয় মুদ্রায় ধার শোধ করে দেবে। তারপর দেশে ফিরে অনেকেই সে কথা বেমালুম ভুলে যায়। আমাকেও যদি এরা সেরকম ভাবেন?

তা ছাড়া দেশে ফিরে সঙ্গে-সঙ্গে শোধ দেওয়ার সামর্থ্যও আমার নেই। এদিকে ডুপ্লিকেট টিকিটের ব্যাপারেও কোনও ভরসা পাচ্ছি না।

কিন্তু খুচরো ন'ডলারে আমার আর কতদিন চলবে? সূর্যর ভাঁড়ারের চাল-ডাল ধ্বংস করতে করতে প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। চিনি ছিল না। চা খাওয়ার জন্য একদিন চিনি কিনতেই হল। এদেশের দোকানে কম-ওজনের কিছু পাওয়া যায় না। চিনির প্যাকেট দু-পাউন্ডের। অগত্যা কিনতেই হল। তারপরেই অবশ্য মনে হল, ম্যাকডোনাল্ডের দোকানে কফি খেতে গেলে টেবিলের ওপর অজস্র ছোট-ছোট চিনির প্যাকেট পড়ে থাকে। তার যত খুশি নেওয়া যায়। ষাট সেন্ট দিয়ে এক কাপ কফি খেতে গিয়ে ওভারকোটের পকেট ভরতি বিনে পয়সার চিনি নিয়ে আসলেই হত। এই সব ভালো-ভালো বুদ্ধি পরে মাথায় আসে।

রাত্তিরবেলা খুব মন খারাপ লাগছিল। অনেকক্ষণ দোনামনা করার পর কানাডার দীপকদাকে একটা ফোন করলুম।

ফোন ধরলেন জয়তীদি। খানিকটা অবাক হয়ে বললেন, কী ব্যাপার, এত রাত্তিরে টেলিফোন? অনেকদিন তোমার পাত্তাই নেই। আমরা ভাবছিলুম, তুমি হারিয়ে গেলে কি না। সেই যে তোমার বাস অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল, তারপর থেকে তো তোমার আর কোনও খবরই পাইনি।

আমি কাঁচুমাচুভাবে বললুম, জয়তীদি, দীপকদা আছেন? ওঁর সঙ্গে আমার একটা দরকার আছে।

—তোমার দীপকদা তো নেই। একটা কনফারেন্সে গেছেন, ভ্যাঙ্কুবারে। তিন দিন পরে ফিরবেন।

আমি নিরাশভাবে বললুম, নেই?

—কেন, কী দরকার? আমাকে বলা যায় না?

—না, মানে, আমার প্লেনের টিকিটটা হারিয়ে ফেলেছি। দীপকদার তো এক বন্ধুর ট্র্যাভেল এজেন্সি আছে শুনেছিলুম। উনি যদি সেই বন্ধুকে বলে আমার একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারতেন।

জয়তীদি উদ্দাম ঝর্নার মতন হাসতে হাসতে বললেন, টিকিট হারিয়ে ফেলেছ? অ্যাঁ? বেশ হয়েছে? টিকিট হারালে কি আবার বিনা পয়সায় টিকিট পাওয়া যায় নাকি? তুমি পাগল। সে কেউ দেবে না। এখন কী হবে? থাকো, ওই মিড ওয়েস্টে বন্দি হয়ে? ওখানে চাষ বাস শুরু করো। তোমার আর দেশে ফেরা হবে না।

এদিকে আমার এই করুণ অবস্থা আর জয়তীদি মোটেই সেটাকে কোন গুরুত্বই দিচ্ছেন না। খালি ঠাট্টাইয়ার্কি করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত আমি বললুম, ঠিক আছে, জয়তীদি তিনদিন পর দীপকদা ফিরলে আমি আবার ফোন করব।

রিসিভার রেখে দিয়ে আরও দমে গেলুম। এই হৃদয়হীনা রমণীর সঙ্গে কোনওদিন কথা বলব না। এই বিশাল দেশে যে আমি কপর্দক শূন্য, তা উনি বুঝলেন না। পুরুষ মানুষরা হঠাৎ অসহায় অবস্থায় পড়লে মেয়েরা সেই ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করে। দীপকদা আবার এখন বাড়ি নেই। উনি থাকলে একটা কিছু ব্যবস্থা করতেনই। এই তিনদিন আমি কী করে কাটাব?

রাত মাত্র ন'টা। কিছুই করতে ইচ্ছে করছে না। খিদে পেয়েছে, কিন্তু বিছানা ছেড়ে উঠে দুটি চাল-ডাল ফুটিয়ে নেওয়ারও উৎসাহ নেই। খালি মনে হচ্ছে, আমার মুক্তি নেই, আমার মুক্তি নেই।

এই কটা মাসে কত রকম মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। অনেকের কাছ থেকেই আশাতীত সহৃদয়তা পেয়েছি। এদেশের বাঙালিরা অনেকেই বেশ স্বচ্ছল। হাজার খানেক ডলার দিয়ে কয়েকজন অবশ্যই আমাকে সাহায্য করতে পারেন। সূর্যর টেলিফোন যত খুশি ব্যবহার করতে পারি, যদি টেলিফোন তুলে কারুর কাছে চাই...। কিন্তু টেলিফোন করতে হাত ওঠে না। কারুর কাছে টাকা চাওয়া, ওঃ সে যে এক অবাস্তব শক্ত কাজ। বারবার মনে পড়ছে মাইকেলের একটা লাইন, "প্রবাসে দৈবের বশে জীবতারা যদি খসে..."

পরদিন বেলা এগারোটায় একটা ফোন এল। সাহেবের গলা শুনে ধক করে উঠল আমার বুক। তবে কি ফিরে এল আমার ব্যাগ?

সাহেবটি জিগ্যেস করল, তোমার নাম নীললোহিত?

আমি সোৎসাহে বললুম, হ্যাঁ। আপনি বাস স্টেশন থেকে বলছেন?

লোকটি বলল, না আমি বলছি এয়ারপোর্ট থেকে। তোমার নামে একজন...লেট্স সী, খুব শক্ত নাম, মিসেস জ-য়া-টি স-রো-সো-য়া-টি একটি প্লেনের টিকিট পাঠিয়েছেন। কানাডার এড্মান্টনের। তোমার ফ্লাইট বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। তুমি এখানকার কাউন্টারে এলেই টিকিট পেয়ে যাবে।

আমি তখনও বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা। টিকিট পাঠিয়েছে? আমার জন্য? কানাডা থেকে? জয়াটি কে? ওঃ হো জয়তী সরস্বতী। জয়তীদি, জয়তীদি!

॥ ৫০ ॥

ডেনভার এয়ারপোর্ট থেকে প্লেন বদল করে যেতে হবে এডমান্টনে। মাঝখানে হাতে রয়েছে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা সময়।

এয়ারপোর্টের বাইরে বেরিয়ে যে শহরটা ঘুরে দেখে আসব তার উপায় নেই। পকেট ঢনঢন। কলোরাডো রাজ্যটিই অতি মনোরম। ছোট-ছোট পাহাড়, নিবিড় জঙ্গল আর নদীমাতৃক এই রাজ্যটির সৌন্দর্যের খ্যাতি আছে সারা পৃথিবীতে। আমার কলোরাডো ঘুরে দেখার খুব ইচ্ছে ছিল, হল না।

আর কয়েক ঘণ্টা বাদে আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে চলে যাব, আর কোনওদিন এখানে আবার আসব কি না কে জানে। হাতে সময় আছে, তাই হিসেব করতে বসলুম, কী-কী দেখা বাকি থেকে গেল এ যাত্রায়।

কাছেই গ্র্যান্ড কেনিয়ান। এই বিশ্ববিখ্যাত উপত্যকাটি সত্যিই প্রকৃতির এক মহান বিস্ময়। যারা এ দেশ ভ্রমণ করতে আসে, তাদের দ্রষ্টব্য তালিকায় প্রথমেই গ্র্যান্ড কেনিয়ানের নাম থাকে। আমি ছবিতে, চলচ্চিত্রে অনেকবার গ্র্যান্ড কেনিয়ান দেখেছি, কিন্তু দু-দুবার এসেও চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্য হল না। প্রথমবার ভেবেছিলুম, অনেকদিন তো থাকব, কোন এক সময় দেখে নিলেই হবে। তারপর হঠাৎ ফিরে গেছি। এবারে পাঁচটা মাস কেটে গেল ঝড়ের বেগে, এখন আমি সর্বস্বান্ত। অবশ্য পয়সা থাকলেও এই শীতের মধ্যে গ্র্যান্ড কেনিয়ান দেখা সম্ভব হত না।

অ্যারিজোনার মরুভূমি দেখে গতবার খুব ভালো লেগেছিল। এ এক অন্যরকম মরুভূমি। আগাগোড়া রুক্ষ নয়, মধ্যে মধ্যে রয়েছে অসংখ্য বিরাট ক্যাকটাস। এই সাউয়ারো ক্যাকটাসগুলো এক-একটা দোতলা-তিনতলা বাড়ির সমান উঁচু। অপূর্ব সেই দৃশ্য। ইচ্ছে ছিল সেখানে একবার যাব।

টেক্সাসের দিকে তো যাওয়াই হল না। ওয়েস্টার্ন ছবিতে কতবার যে টেক্সাস দেখেছি, সেখানে আমার পায়ের চিহ্ন পড়ল না। যদিও জিন্স আর গেঞ্জি কিনে রেখেছিলুম। রেড ইন্ডিয়ানদের একটা এনক্লেভ-ও আমার দেখে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল।

আমেরিকার যে চারটি রাজ্যকে সাদার্ন স্টেট্স বলে, সেখানে কখনও যাইনি। এরা এখনও নাকি কালো লোকদের ওপর খড়্গহস্ত, কত নৃশংসভাবে যে এখানে নিগ্রোদের খুন করা হয়েছে তার ঠিক নেই। অথচ, এই দক্ষিণ রাজ্যের নাগরিকরাই তাদের ভদ্রতার জন্য বিখ্যাত।

যাওয়া হল না পাশের রাজ্য মেক্সিকো-তে। যদিও সেখানকার দু-একজন বন্ধু নেমন্তন্ন করে রেখেছিল। কিউবা দেখারও একটা অদম্য শখ রয়ে গেছে আমার মনে। এক সময় ফিদেল কাস্ত্রো ছিল আমার হিরো। হেমিংওয়ের লেখা কিউবার অনেক বর্ণনা পড়েও মন টেনেছে। এই ডেনভার এয়ারপোর্ট থেকে কিউবাগামী বিমানের জন্য ঘোষণা শুনতে পেলুম কয়েকবার। কিন্তু আমার যাওয়ার উপায় নেই।

দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতে যাওয়া খুবই শক্ত আমি জানি। আমাদের দেশ থেকে কেউ, বিনা কাজে, শুধু ভ্রমণের জন্য ওখানে গেছে, এমন শুনিনি। তবু ব্রাজিল, উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা, পেরু এইসব রোমাঞ্চকর নামগুলি আমায় হাতছানি দেয়।

বসে-বসে এইসব ভাবতে-ভাবতে আমি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটি পদ্যে নিজস্ব সুর দিয়ে গুন-গুন করে গাইতে লাগলুমঃ

ইচ্ছা সম্যক্ জগর্দশনে
কিন্তু পাথেয় নাস্তি
দু-পায়ে শিক্লি, মন উড়ু উড়ু
এ কী দৈবের শাস্তি।

বেশিক্ষণ এ গানটা গাওয়া গেল না, কারণ সুরটা তেমন জুতসই রকমের করুণ হয়নি। তাই এরপর আমি গাইতে শুরু করলুম দ্বিজেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভাইয়ের লেখা ঃ

কী পাইনি
তার হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজি...

কিন্তু একলা বসে-বসে গান গেয়ে তো বেশি সময় কাটানো যায় না। তাই উঠে পায়চারি করতে লাগলুম খানিকটা। ডেনভার এয়ারপোর্টটি বিরাট, এখানে রয়েছে অজস্র দোকানপাট, ওপর তলায় একটা ছোটখাটো মিউজিয়াম পর্যন্ত রয়েছে। অনেক খাবার দোকান, কিন্তু আমি বাইরে থেকে দেখেই চক্ষু সার্থক করছি।

সিডার র‍্যাপিডস্ ছেড়ে আসতে হয়েছে খুবই তাড়াহুড়োর মধ্যে। মুখার্জিদা এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়েছে এবং বারবার জিগ্যেস করেছেন, তোর ব্যাগ হারাইছে, পয়সাকড়ি ঠিক আছে তো? অসুবিধা থাকলে লুকাইস না, খুইল্যা ক। লজ্জার কিছু নাই, আমি তোরে বেনিফিট অব ডাউটে দুই-তিনশো ডলার ধার দিতে পারি।

আমি জোর দিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিলুম, না, না, আমার কোনও অসুবিধে নেই।

মুখার্জিদার পরামর্শে স্থানীয় পুলিশস্টেশনে একটা ডায়েরি করিয়ে এসেছি আমার ব্যাগ হারাবার বিষয়ে। প্লেনের টিকিট পুনরুদ্ধার করতে হলে এটা নাকি দরকার। সূর্যকে সব খবর জানিয়ে একটা চিঠি লিখে রেখে এসেছি। জয়তীদি হঠাৎ কেন টিকিট পাঠিয়ে দিলেন তা জানবার জন্য দু-বার ওঁকে টেলিফোন করেছিলুম। বাড়িতে পাইনি। ওঁর ছোট মেয়ে ছুটকি কিছুই বলতে পারেনি। যাই হোক, টিকিট নষ্ট করার কোনও মানে হয় না বলে আবার যাত্রা শুরু করে দিয়েছি।

অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ করেছিলুম, দুটি শাড়ি পরা মেয়ে ও একটি ধুতি পরা ছেলে হাতে কয়েকটি বই নিয়ে ব্যস্ত যাত্রীদের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কী সব বোঝাচ্ছে। ছেলেমেয়ে তিনজনেরই পায়ে চটি। এটা অবিশ্বাস্য লাগে। বাইরে প্রচণ্ড ঠান্ডা হলেও বিমানবন্দরের মধ্যে স্বাভাবিক উত্তাপ। কিন্তু ওরা তো কখনও বিমানবন্দরের বাইরেও যাবে, তখন কি চটি পড়ে বরফের ওপর দিয়ে হাঁটবে?

মেয়ে দুটি পরে আছে সাধারণ ছাপা শাড়ি, ছেলেটির গায়ে গেরুয়া রঙের চাদর। তার মস্তক মুণ্ডিত, মাঝখানে একটি টিকি। ওদের চিনতে ভুল হয় না। ওরা কৃষ্ণ কনসাসনেস-এর স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকা। ওরা চাঁদা তোলে না, যতদূর জানি, এ দেশে রাস্তায় ঘাটে চাঁদা তোলা নিষিদ্ধ, ওরা নিজস্ব প্রকাশনীর বই বিক্রি করতে চাইছে। উদ্দেশ্য শুধু বই বিক্রি নয়, বৈষ্ণব দর্শনের সম্প্রচার।

ভগবৎ দর্শন বা ধর্মের ব্যাপারটা আমি কিছু বুঝি না, কোনও আগ্রহ নেই। বিরাগও নেই, ও

ব্যাপারে আমি উদাসীন। কিন্তু দূর থেকে ওদের দেখতে-দেখতে আমি ভাবছিলুম, কোন টানে ওরা ধর্মের কাছে এতখানি নিবেদন করতে পেরেছে নিজেদের। তিনটি আমেরিকান ছেলেমেয়ে। বয়েস তিরিশের বেশি নয়, এই ডিসেম্বরের সন্ধেবেলা কতরকম আমোদ প্রমোদেই তো সময় কাটাতে পারত। তার বদলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে নিরলসভাবে এয়ারপোর্টের এ মাথা থেকে ও মাথা হেঁটে চলেছে, জাঁদরেল চেহারার অতিশয় ব্যস্ত মানুষদের বোঝাতে চাইছে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা। এ পর্যন্ত একটা বইও বিক্রি হতে দেখিনি। কেউ ওদের কথা মন দিয়ে শুনছেও না। তবু ওদের ধৈর্য নষ্ট হচ্ছে না। যে-কোনও কাজেই এমন নিঃস্বার্থ নিষ্ঠা দেখলে শ্রদ্ধা জাগেই।

আমি যদিও ধুতি পরে নেই, তবু আমার মুখে একটা দুর্মর বাঙালি ছাপ আছে নিশ্চয়ই। ওদের মধ্যে দুটি ছেলেমেয়ে ঘুরতে-ঘুরতে এক সময় আমাকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল। মুখে ফুটে উঠল আগ্রহের হাসি। কাছে এগিয়ে এসে ছেলেটি পরিষ্কার বাংলায় আমায় জিগ্যেস করল, আপনি কি কলকাতা থেকে আসছেন?

আমি মাথা নেড়ে হাঁ বলতেই ছেলেটি আমার হাতে দুখানি বই দিয়ে বলল, আপনি এই বই দুটি দেখেছেন? অবশ্য এসব আপনার পড়া আছে নিশ্চয়ই।

একটি বেদের সংকলন আর একটি গীতার অনুবাদ। ছাপা ও কাগজ অতি চমৎকার, মলাট বেশি রংচঙে অনেকটা আমাদের ক্যালেন্ডারের ছবির মতন।

বই দুটি নাড়তে-চাড়তে আমার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। এরা কি ভাবে বাঙালি মাত্রেই বেদ-উপনিষদ-গীতা পড়েছে? আমি রাজশেখর বসুর অনুবাদে গীতা পড়েও কিছুই বুঝতে পারিনি, বড্ড খটখটে লেগেছে। আর বেদ? আমার মতন ম্লেচ্ছের কি বেদ পড়ার অধিকার আছে?

আমি বললুম, বাঙালি হলেও আমি এসব পড়িনি, অনেক বাঙালিই পড়েনি।

ছেলেটি বলল, তা আমরা জানি। সকলে পড়ে না। কিন্তু বিশ্বে শান্তি আনতে হলে এইসব পবিত্র পুস্তক কি আবার নতুন করে পড়া উচিত নয়?

আমি বললুম, বাঃ, আপনার বাংলা অ্যাকসেন্ট তো চমৎকার!

কথাটা বলে আমি বেশ শ্লাঘা বোধ করলুম। সাহেবদের কাছ থেকে আমাদের ইংরিজি উচ্চারণ সম্পর্কে নানারকম মন্তব্য শুনতে হয়, কোনও সাহেবের বাংলা উচ্চারণ সম্পর্কে মতামত দেওয়ার সুযোগ তো সহজে পাওয়া যায় না।

ছেলেটি লজ্জা পেয়ে বলল, না, না, আমি বাংলা তত ভালো জানি না। বাংলা খুব সুন্দর ভাষা।

আমি কলকাতায় ইস্‌কনের সাহেব বোষ্টম-বোষ্টমি অনেক দেখেছি, ওঁদের প্রধান কেন্দ্র মায়াপুরেও গেছি বেড়াতে, কিন্তু কখনও ওঁদের কারুর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়নি। এই প্রথম সেই সম্প্রদায়ের দুজনের সঙ্গে আলাপ হল ডেনভার বিমানবন্দরে।

ছেলেটি বলল তার নাম মাধব দাস। আর মেয়েটির নাম বিনোদিনী। পূর্বাশ্রমে নিশ্চয়ই ওদের অন্য নাম ছিল। অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে ওরা ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল, তাই গল্প করতে লাগল আমার পাশে বসে। মেয়েটির মতন এমন লাজুক আমেরিকান মেয়ে আমি আগে আর কখনও একজনও দেখিনি। সে কোনও কথা বলে না, শুধু হাসি-হাসি মুখ করে তাকিয়ে থাকে।

ছেলেটি অনেক কিছু জানে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামকৃষ্ণ, কেশব সেন এই সব নাম বলে যেতে লাগল টপটপ। এক সময় সে আমাকে জিগ্যেস করল, তুমি বলতে পারো, ব্রহ্মধর্মে এক সময় বৈষ্ণবদের প্রভাব বাড়ল কী করে?

আমি আবার ইতিহাসে খুব কাঁচা। আমাদের দেশের নাইনটিন্‌থ সেঞ্চুরির ইতিহাস প্রায় কিছুই জানি না। দেবেন ঠাকুর আর বিদ্যাসাগরের মধ্যে কে বয়েসে বড়, তা আমার গুলিয়ে যায়। কেশব সেন খ্রিস্টান ছিলেন না ব্রাহ্ম ছিলেন, সে সম্পর্কে আমার স্পষ্ট ধারণা নেই। সুনীলদা এই সব বিষয় নিয়ে একটা ঢাউস বই লিখেছেন, তিনি থাকলে এই সাবজেক্টে একটা লম্বা লেকচার দিতেন নিশ্চয়ই।

আমি আমতা-আমতা করে বললুম, ভাই, আমি ঠিক বলতে পারছি না। আপনি কলকাতায় গিয়ে যেকোনও বাংলার এম-একে জিগ্যেস করলেই উত্তর পেয়ে যাবেন।

ছেলেটি নিজেই আমাকে অনেক কিছু বোঝাল। তার মতে ভক্তিই হচ্ছে মুক্তির উপায়। শুদ্ধ ভক্তি মানুষের মনকে একেবারে পরিচ্ছন্ন করে দেয়, ইত্যাদি, ইত্যাদি...। আমি খুব মন দিয়ে শুনছি না বুঝতে পেরেই এক সময় উঠে পড়ল সে। যাওয়ার সময় আমি তাকে বই দুটো ফেরত দিতে যেতেই সে বলল, না, না, ও বই আপনার জন্য। আপনি রাখুন।

আমি যতই বলি যে এই বই দিয়ে আমি কী করব, সে কিছুতেই শুনতে চায় না।

আমি তখন বললুম, দেখুন, কিছু মনে করবেন না, আপনারা তো এই বই বিক্রি করছেন—

আমাকে থামিয়ে দিয়ে সে বলল, না, আমরা বিক্রি করছি না। তবে কেউ যদি আমাদের সাহায্যের জন্য কিছু দেয়, তবে আমরা খুশি হয়েই নেব।

আমি বললুম, আমাদের তো গোনা গাঁথা ফরেন এক্সচেঞ্জ নিয়ে এদেশে আসতে হয়, সুতরাং আমার পক্ষে এখন কিছুই দেওয়া সম্ভব নয়। কলকাতায় দেখা হলে কিছু দিতে পারি নিশ্চয়ই—

ছেলেটি বলল, আপনাকে কিছুই দিতে হবে না। আপনি রাখুন বই দুটি, অবসর সময়ে পড়বেন। কিংবা অন্য কোনও উৎসাহী ব্যক্তিকে দিয়ে দেবেন।

ওরা চলে যাওয়ার পর আমি একখানা বইয়ের খাতা ওল্টাচ্ছি, একটু পরে ফিরে এল সেই মেয়েটি। হাতে একটি ছোট কাগজের বাক্স।

নম্র হেসে মেয়েটি বলল, প্রসাদ। আপনার জন্য।

আমি হাত পেতে নিলুম। সেই বাক্সের মধ্যে কয়েকখানা পুরি আর আলু ভাজা আর খানিকটা মিষ্টি। আমি বহুদিন কোনও পূজা-আচ্চার জায়গায় যাইনি, তাই প্রসাদও খাইনি। কিন্তু পয়সার অভাবে আমি অনেকক্ষণ খিদে চেপে বসেছিলুম। সেই ঠান্ডা পুরি আর আলু ভাজাই অমৃত মনে হল আমার কাছে। চোখের নিমেষে শেষ করে ফেললুম। ওরা কী করে বুঝল যে আমার এমন খিদে পেয়েছে?

খানিক বাদে ফিরে এল আবার মাধব দাস। আমাকে একটা কাগজ দিয়ে বলল, এতে আমাদের মন্দিরগুলির একটা তালিকা আছে। এইসব জায়গায় গেলে আপনি আমাদের মন্দিরে থাকতে পারবেন আর প্রসাদ পাবেন।

ডেনভারে ইস্কনের মস্ত বড় মন্দির আছে। তা ছাড়া সারা আমেরিকা-কানাডা জুড়ে যে এদের এতগুলো আশ্রম, এ সম্পর্কে আমার কোনও ধারণাই ছিল না। অন্তত আশি-পঁচাশিটা! গোটা আমেরিকাটাকেই ওরা হিন্দু করে ফেলবে নাকি?

কিন্তু সেই মুহূর্তে ওদের সম্পর্কে আমার কোনও ঠাট্টাইয়ার্কি করতে ইচ্ছে হল না। ওরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বারবার আমায় সাহায্য করতে আসছে। ওদের তো বিন্দুমাত্র স্বার্থ নেই। আমি বরং কৃতজ্ঞতাই অনুভব করলুম।

আমার চোখ অনেকক্ষণ ওদেরই অনুসরণ করতে লাগল। গ্রে ফ্লানেল সুট পরা অতিশয় কেজো, গম্ভীর চেহারার, বিশালকায় আমেরিকান পুরুষদের কাছে ওরা হিন্দু ধর্মের বই বিক্রি করার অনলস চেষ্টা করে যাচ্ছে। শাড়ি পরা শ্বেতাঙ্গিনী যুবতি ও গেরুয়া চাদর পরা মার্কিন যুবককে দেখে অন্যরা যেন শিউরে উঠছে, কারুর কারুর মুখে ফুটে উঠছে গভীর অবজ্ঞার ভাব। ওই ছেলে-মেয়েরা কিন্তু বিরক্ত হচ্ছে না, রেগেও যাচ্ছে না। এত কম বয়েসে এতখানি ধৈর্য ওরা আয়ত্ত করল কী করে?

তারপর এক সময় আমার প্লেনের ডাক পড়ল। ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি এগিয়ে গেলুম সিকিউরিটি কাউন্টারের দিকে। ডেনভারের মতন সিকিউরিটির কড়াকড়ি আমি পৃথিবীর আর কোনও বিমানবন্দরে দেখিনি। পকেটের সব খুচরো পয়সা, হাতের ঘড়ি, চাবি, কোমরের বেল্ট পর্যন্ত জমা দিতে হয়। এক আধ টুকরো ধাতু সঙ্গে নিয়ে সিকিউরিটি বেরিয়ার পার পাওয়া যায় না কিছুতে। কিউবার পলাতকদের জন্যই নাকি এত সতর্কতা।

বিমানটা রানওয়ে দিয়ে ছুটতে শুরু করতেই মনে পড়ল, এবারের মতন আমায় এদেশ থেকে

বিদায় নিতে হচ্ছে এখানেই। আর হাজার চেষ্টা করেও ফিরে আসা যাবে না। ভিসায় ছাপ পড়ে গেছে। সেজন্য কোনও দুঃখ হচ্ছে না, চোখের সামনে যেন দেখতে পাচ্ছি ভবিতব্যের উন্মুক্ত দ্বার।

।। ৫১ ।।

এডমান্টন বিমানবন্দরে চেনা কারুকে পাব এমন আশা করিনি। দীপকদা নেই, জয়তীদি তো মেয়েদের বাড়িতে ফেলে রেখে এতদূরে আসতে পারেন না। যাওয়ার ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে। ট্যাক্সি নেওয়ার জন্য কোনও প্রশ্নই ওঠে না। এখান থেকে দীপকদার বাড়ি অনেক দূর, প্রকৃতপক্ষে ওঁরা থাকেন অন্য একটি শহরে। এখান থেকে দীপকদাদের বাড়ির যা ট্যাক্সি ভাড়া হবে, সে টাকায় কলকাতা থেকে দার্জিলিং-এর প্রথম শ্রেণির ট্রেন ভাড়া হয়ে যায়। সে টাকা আমার নেই-ও, প্রথমে বেয়ারিং হয়ে জয়তীদির কাছে উপস্থিত হওয়ার কোনও মানে হয় না। আমার কাছে যা খুচরো পয়সা আছে, তাতে কোনওক্রমে বাসভাড়া কুলিয়ে যাবে। একটা সুবিধে এই, এই বিদেশ বিভুঁই-এ দু-একবার বোকা বনে গেলেও কেউ তো তার সাক্ষী থাকছে না।

ইমিগ্রেশান কাউন্টারে প্রথমেই খানিকটা নাকানিচোবানি খাওয়াল আমাকে। মধ্যবয়স্ক সাহেবটি যেন আমাকে নিয়ে ইঁদুর-বেড়াল খেলতে চায়। মুখে মিটিমিটি হাসি আর নানান প্রশ্নঃ তুমি তো কয়েক মাস আগেই একবার এডমান্টনে এসেছিলে দেখছি। আবার কেন এলে? এখানে এমনকী দ্রষ্টব্য বস্তু আছে? কার বাড়িতে উঠবে? সে তোমার কে হয়? সে কি তোমায় রিসিভ করতে এয়ারপোর্টে এসেছে? তুমি দেশে কী চাকরি করো? ইত্যাদি-ইত্যাদি।

টোরোন্টোয় পাঞ্জাবি শরণার্থীদের নিয়ে নানান গোলমালের কথা কাগজে পড়েছি। ভারতীয় আগন্তুকদের কানাডার সরকার এখন বেশ সন্দেহের চোখে দেখছে। এর মধ্যে ভারতীয়দের জন্য ভিসা ব্যবস্থা চালু হয়েছে। আমার কাছে যদিও মাল্টিপল এনট্রি ভিসা আছে তবু আমার বুক ঢিপঢিপ করছে। যদি রিটার্ন টিকিট দেখতে চায়? সাময়িক ভ্রমণকারীদের কাছে রিটার্ন টিকিট না থাকলে যে এরা ঢুকতেই দেয় না, সেটা তো আমার আগে মনে পড়েনি।

সাহেবটি যে আমায় আটকাতে চায়, তার ভাবভঙ্গি দেখে তা ঠিক মনে হয় না। যেন আমায় নিয়ে খানিকটা মশকরা করাই তার উদ্দেশ্য। সে আমায় জিগ্যেস করে, আমি আগে কখনও তুষারপাত দেখেছি কি না। আরও সব অবাস্তব প্রশ্ন। শেষ পর্যন্ত আমি দেওয়ালে-পিঠ-দেওয়া বেড়ালের মতন ফ্যাঁস করে বললুম, যেতে দেবেন কি না বলুন, না হলে আমি এক্ষুনি ফিরে যাচ্ছি। নেহাৎ আমার এক আত্মীয় এখানে ক্রিসমাসের নেমন্তন্ন করেছেন তাই এসেছি।

সাহেবটি এবারে ভুরু তুলে বলল, ও, ক্রিসমাস? ঠিক আছে যাও, আরও দিন পনেরো থেকে যাও, মেরি ক্রিসমাস!

সে আমার পাসপোর্টে ছাপ মেরে দিল, টিকিট দেখতে চাইল না। ততক্ষণে আমার গেঞ্জি ঘামে ভিজে গেছে।

বাইরে বেরিয়েই দেখি একটি পরিচিত মুখ। ভট্টাচার্যি সাহেব। আদি ও অকৃত্রিম বাংলা হাসি দিয়ে তিনি জিগ্যেস করলেন, কী ব্যাপার, এত দেরি হল কেন?

—বিমলবাবু আপনি?

—কী করব, দীপক সরস্বতী নেই এখানে, জয়তী বলল...আমারও এদিকে একটা কাজ ছিল...।—আপনি কষ্ট করে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন, আমার জন্য।

—আরে মশাই, থামুন তো! খুব ভালো সময় এসেছেন, চমৎকার শীত পড়েছে, জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে।

আমি আগেরবার এসেছিলুম বেশ গরমকালে। তখনও বিমলবাবু বলেছিলেন, খুব ভালো সময়ে এসেছেন। অর্থাৎ জীবনের সব অবস্থা থেকেই বিমলবাবু আনন্দ খুঁজে নিতে জানেন। গল্প করতে-করতে পৌঁছে গেলুম বাড়ি।

জয়তীদি জিগ্যেস করলেন, ফ্লাইট লেট ছিল? তোমার দেরি দেখে আমি ভাবছিলুম, টিকিটটা ঠিক পেলে কি না!

—আপনি হঠাৎ টিকিটটা পাঠালেন কেন, জয়তীদি?

—তুমি শুধু-শুধু ওখানে বসে থেকে কী করতে? টিকিট হারিয়েছে। টাকা পয়সাও সব হারিয়েছে নিশ্চয়ই?

মেয়েদের কিছু একটা ইন্সটিংক্ট থাকে, যাতে তারা ঠিক বুঝতে পারে। আমি হেসে বললুম, টাকাপয়সা আর বিশেষ কিছু ছিলও না। এবারে বাড়ি ফিরে যাব ভাবছিলুম, এর মধ্যে টিকিটটা হারিয়ে গেল।

জয়তীদি বললেন, বেশ হয়েছে। আমাদের বাড়িতে থাকো, রান্না করবে, বাসন মাজবে, বাচ্চাদের দেখাশুনো করবে, তার বদলে কিছু মাইনে পাবে।

—আমায় যে মাত্র পনেরো দিনের ভিসা দিয়েছে এবারে?

—তবে তো আরও ভালো। ভিসা ফুরিয়ে যাওয়ার পর যদি ধরা পড়ো, তাহলে জেল খাটবে। তারপর একদিন এদের খরচেই হয়তো দেশে ফিরে যাবে। কানাডার জেলখানা খুব ভালো, দেখো।

—বাঃ, তাহলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হলেই তো ভালো।

পরদিনই ফিরে এলেন দীপকদা। আমি তাঁকে দরজা খুলে দিলুম। আমায় দেখে তিনি যেন ভূত দেখলেন।

—কী ব্যাপার। তুমি?

আমি যতদূর সম্ভব মন-গলানো হাসি দিয়ে বললুম, এই তো, আবার চলে এলুম।

—আবার এডমান্টনে? এই শীতের মধ্যে? জানো, আর কয়েকদিনের মধ্যেই শূন্যের নীচে তিরিশ-চল্লিশ হয়ে যাবে? এখন ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে গেলে বরং তোমার ভালো লাগত।

—ভেতরে আসুন, দীপকদা, তারপর সব কথা বলছি।

দীপকদা দুপদাপ করে পায়ের বরফ ঝাড়লেন, ভেতরে ঢুকে হাতের গ্লাভস খুলে ফেলে বললেন, উঃ, এই সময়টায় ঘোরাফেরা করা এক ঝকমারি। বাড়ির বাইরে থাকতে একটুও ইচ্ছে করে না। তাই একদিন আগেই ফিরে এলুম।

দুই মেয়ে ছুটে এল বাবার কাছে। জয়তীদি সাড়া দিলেন রান্নাঘর থেকে। আমি কিছুক্ষণের জন্য এই দাম্পত্য দৃশ্যটি থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে চলে গেলুম টিভি'র ঘরে।

খানিক পরে যখন দেখা হল, ততক্ষণে দীপকদা আমার ব্যাপারটা সব শুনে ফেলেছেন। উনিও জয়তীদির মতন গম্ভীরভাবে বললেন, দ্যাখো, আমার গিন্নি টিকিট পাঠিয়ে তোমাকে ইউ এস থেকে নিয়ে এসেছেন বটে, কিন্তু এখান থেকে ভারতবর্ষে তোমাকে টিকিট কেটে ফেরত পাঠাবার ক্ষমতা আমাদের নেই। সে অনেক টাকার ধাক্কা। তা ছাড়া এই উইন্টারে রিসার্ভেশন পাওয়াই শক্ত। গিন্নি তোমায় যে এখানে আনিয়েছেন, ভেবো না, সেটা তোমাকে দয়া দেখাবার জন্য। এর মধ্যে বিশেষ স্বার্থ আছে। আমাদের একজন কাজের লোকের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আমি সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকব, জয়তীও ইউনিভার্সিটিতে কোর্স নিয়েছে। জানো তো, এদেশে যা আগুন লাগার ভয়, কক্ষনো বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের একা বাড়িতে রাখা চলে না। বেবি সিটারেরও সাংঘাতিক খরচ। সুতরাং তোমায় আমরা থাকা-খাওয়ার বিনিময়ে রাখতে পারি।

আমি বললুম, শুধুই থাকা-খাওয়া? বিড়িটিড়ি খাওয়ার জন্য কিছু অন্তত হাত খরচ দেবেন না? আর বছরে দুবার জামাকাপড়?

দীপকদা বললেন, আমার অনেক পুরোনো জামা-টামা আছে, সেজন্য চিন্তা নেই। হাত খরচের কথাটা বিবেচনা করতে হবে।

জয়তীদি বললেন, না, না, ওর হাতে পয়সা দেওয়া ঠিক নয়। যখন তখন সব জিনিস হারিয়ে ফেলে। বিড়িটিড়ি কিংবা ওর নেশার জিনিস যা লাগে তা আমরাই কিনে দেব।

আমি বললুম, আমি কিন্তু মাছ ছাড়া ভাত খেতে পারি না।

দীপকদা বললেন, ওসব চলবে না। গরু-শুয়োর যা দেব, তাই সোনামুখ করে খেতে হবে।

জয়তীদি বললেন, ভাত? আমরা মোটে সপ্তাহে একদিন ভাত খাই।

আমি বললুম, ইস জয়তীদি, আপনারা কি গরিব। আমরা কিন্তু কলকাতায় প্রত্যেকদিনেই ভাত খাই আর মাছের দাম খুব বেশি হলেও কুচো মাছ অন্তত জুটে যায়। আপনাদের গরু-শুয়োরের মতন অখাদ্য খেয়ে বেঁচে থাকতে হয়।

জিয়া আর ছুটকি এতটা বাংলা বোঝে না, ওরা আমাদের এই কথোপকথনের মর্ম টের পেল না।

দু'দিন বাদেই ক্রিসমাস। বৈঠকখানায় শোভা পাচ্ছে ক্রিসমাস টি। সারাদিন ধরেই ঘুরে ফিরে, সেটাকে সাজানো চলছে। এটাই নিয়ম, ক্রিসমাস ট্রি সাজাতে হয় অন্তত দিন দশেক আগে থেকে, অনেকটা দুর্গা পুজোর প্রস্তুতির মতন। সুপার মার্কেটগুলোর সামনে ডাঁই করা থাকে ঝাউগাছের টুকরো যার যেমন পছন্দ সেইরকম ছোট বড় এক একটা টুকরো কিনে নিয়ে যায়।

ক্রিসমাস ইভ-এ দীপকদাদের নেমন্তন্ন আছে ওঁদের এক পাঞ্জাবি বন্ধুর বাড়িতে। অনেকদিন আগে থেকেই ঠিক করা। এইসব পার্টিতে একজন অতিরিক্ত লোককে নিয়ে যাওয়া মোটেই অসঙ্গত নয়। সুতরাং দীপকদা ধরেই নিয়েছিলেন, আমি যাব। কিন্তু আমি শেষ মুহূর্তে বেঁকে বসুলম।

মনটা কীরকম ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে, এখন একগাদা অচেনা মানুষের মধ্যে গিয়ে ভদ্রতার হাসি হাসতে আমার ইচ্ছে করছে না। অনেকেই জিগ্যেস করবে, আমি দ্বিতীয়বার কেন এডমান্টনে এলুম? কী উত্তর দেব!

দীপকদা অনেক অনুরোধ করলেন, জয়তীদি বকুনি-দিলেন পর্যন্ত। মেয়েরা বললো, চলো, চলো, তবু আমি অনড় রইলুম। আমি বললুম, আপনারা ঘুরে আসুন রাত দুটো-তিনটে যাই বাজুক। আমি ঘুমোব না, দরজা খুলে দেব।

বাড়ি ফাঁকা হয়ে যেতেই আমি বেশ আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলুম। গৃহস্বামীর সেলার থেকে বার করে আনলুম এক বোতল ইটালিয়ান ড্রাই ওয়াইন। দুটি গেলাসে সেই ওয়াইন ঢেলে, দু-হাতে গ্লাস দুটো তুলে ঠোকাঠুকি করে বললুম, চিয়ার্স।

এক-এক সময় নিজেকেই নিজের সান্নিধ্য দিতে বেশ লাগে।

দুরকম গলার আওয়াজ করে আমি কথাও বলতে লাগলুম নিজের সঙ্গে। যেন সত্যিই আমার বুকের মধ্যে দুটি সত্তা আছে, তারা বেশ পরস্পরবিরোধী যুক্তিও ফাঁদতে পারে।

জানলার পরদা সরিয়ে দিতেই দেখতে পেলুম এক অপরূপ দৃশ্য। খুব পাতলা, পালকের মতন তুষারপাত হচ্ছে। কিংবা যেন খসে পড়ছে চাঁদের বুড়ির চরকার তুলো। আকাশ ঠিক দেখা যাচ্ছে না, তবু যেন মনে হচ্ছে আজ একটা নীল রঙের চাঁদ উঠেছে। পৃথিবী অদ্ভুত নিঃশব্দ।

বেশ তরতরিয়ে কেটে যেতে লাগল সময়। একটুও নিঃসঙ্গতা বোধ হল না। গোঁফ গজাবার পর থেকেই আমি প্রত্যেক ক্রিসমাস ইভের রাত্রিই বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে প্রচুর হই হুল্লা করে কাটিয়েছি। এই প্রথম এমন বিশেষ দিনে আমার একা এই রাত্রিযাপন। বেশ উপভোগ করতে লাগলুম ব্যাপার।

টিভি খোলাই ছিল, কিন্তু সেদিকে চোখ ছিল না বিশেষ। ঠিক রাত বারোটা বাজার সময় ঘোষণা করতেই আমার খেয়াল হল। এদেশের পার্টিতে এই সময় আলো নিবিয়ে দেওয়া হয়, যার যাকে ইচ্ছে চুমু খেতে পারে। আমিও নিবিয়ে দিলুম আলো, নিজের ডান হাতে সশব্দে একটা চুমু খেলুম। তারপর গৃহসজ্জার বেলুনগুলো একটার পর একটা ফাটাতে লাগলুম জ্বলন্ত সিগারেট দিয়ে।

তার একটু পরেই টেলিফোন বাজল। নিশ্চয়ই দীপকদা চেক করতে চাইছেন আমি ঘুমিয়ে পড়েছি কিনা। দৌড়ে গিয়ে ফোন ধরলুম। তারপরই পেলুম পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ খবর।

সিডার র‍্যাপিডসম থেকে ফোন করছে সূর্য। সে বলল, সে গতকালই ফিরে এসেছে, ফিরে এসে আমার চিঠি পেয়েছে আর মুখার্জিদার কাছ থেকে সব শুনেছে। আমি কেন আর দু-একদিন

থেকে এলুম না এখানে! এডমান্টনে বুঝি বিরাট পার্টি আছে? আমাকে বুঝি পার্টি ছেড়ে এসে ফোন ধরতে হল?

আমি বললুম, হ্যাঁ, এ বাড়িতে খুব জমজমাট পার্টি চলছে। তোর কী খবর বল!

প্রায় মিনিটি পাঁচেক এলেবেলে সংলাপের পর সূর্য বলল, তোর ব্যাগটা ফেরত এসেছে। গ্রে হাউন্ড বাস ডিপো থেকে ফোন করেছিল, আমি গিয়ে নিয়ে এসেছি।

আমি বললুম, ব্যাগ? আমার? এতদিন বাদে?

সূর্য বলল, হ্যাঁ, ওটা নাকি শিকাগোতে পড়ে ছিল। আজই এসেছে এখানে।

—আমার ব্যাগ? তুই ঠিক বলছিস? তার মধ্যে আমার প্লেনের টিকিট আছে? ক্যামেরা? একটা বইয়ের মধ্যে টাকা—

—সব আছে। কিছুই খোয়া যায়নি।

—সূর্য আমার ব্যাগটা কে ফেরত দিল বল তো? তাহলে কি সত্যিই ভগবান টগবান বলে কিছু আছে নাকি?

—ভগবান থাকলেও তোর মতন পাষণ্ডকে দয়া করবে কেন? তবে গ্রে হাউন্ড কোম্পানি ভগবানের চেয়ে কম এফিসিয়েন্ট নয়।

এরপর এমন সব ঘটনা ঘটতে লাগল যা এক মুহূর্তের জন্য খুব আনন্দের, পর মুহূর্তে দারুণ বিষাদের।

রাত তিনটের সময় দীপকদারা ফিরতেই তো সুখবরটা দিলুম। পরদিন বিকেলেই ব্যাগটা পৌঁছে গেল। দীপকদা বললেন, তোমার টিকিটটা দাও, আমার এজেন্টকে বলে দেখি, সিট জোগাড় করে দিতে পারবে কি না। এই শীতে খুব রাশ থাকে।

টিকিটটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ উলটে পালটে দেখে দীপকদা বললেন, এটা ফিরে পাওয়া না-পাওয়া সমান। এটাকে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিতে পারো।

আমি আঁতকে উঠে বললুম, কেন?

দীপকদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তুমি কী বলো তো? জীবনে কি এই প্রথম প্লেনে চাপছ? টিকিটটা একবার পড়েও দ্যাখোনি?

কাঁচুমাচু গলায় বললুম, কী হয়েছে বলুন তো দীপকদা? কিছুই বুঝতে পারছি না। টিকিটটা চলবে না? কিন্তু এটা তো রাউন্ড ট্রিপের...

—এটা তো আউট ডেটেড টিকিট। তোমাকে চিপ কনসেশানাল রেটের রিটার্ন টিকিট দিয়েছে, এটা মাত্র চার মাস ভ্যালিড। এতে তোমার জার্নির তারিখ উল্লেখ করা আছে, তারপর পাঁচ মাসের বেশি কেটে গেছে। এখন এ টিকিট চলবে না। তুমি এই সামান্য জিনিসটাও আগে খেয়াল করোনি?

।। ৫২ ।।

বিলেত দেশটা যেমন মাটির, সেইরকম ঐশ্বর্যের দেশ আমেরিকা-কানাডাতেও দারিদ্র্যের ছায়া উঁকি মারে মাঝে-মাঝে। অস্ত্রশস্ত্র ও পেট্রোল ছাড়া অন্যান্য অনেক ব্যাবসাতেই মন্দা চলছে। যখন তখন লোক ছাঁটাই হয়। বেকারের সংখ্যাও বাড়ছে দিন-দিন, আমার উচিত নয় এদেশে সেই বেকারদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

আমার টিকিটটা যদিও বাতিল হয়ে গেছে, আবার নতুন টিকিট কেনার প্রশ্নই ওঠে না, তবু আমার ফিরে যাওয়ার একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে।

দেশে যিনি আমায় টিকিটটা দিয়েছিলেন, তিনি অবশ্য বলেই দিয়েছিলেন যে ওটা নির্দিষ্ট চার মাসের টিকিট, খুব সস্তা বলেই এ রকম সময় বাঁধা। তবে, কোনও কারণে সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়ে ম্যানেজ করা যেতে পারে।

সে কথা দীপকদাকে জানাতেই দীপকদা গম্ভীরভাবে বললেন, সেটা সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগে জানাতে হয় কোম্পানিকে। একবার সময় পার হয়ে গেলে আর কিছু করবার উপায় নেই। এখন চুপচাপ বসে থাকো!

আমি বললুম, তা হলে কি একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকব? না একটু-একটু চিন্তা করব?

দীপকদা বললেন, যত ইচ্ছে চিন্তা করতে পারো, কোনও লাভ হবে না।

পুরো দাম দিয়ে কেনা আন্তর্জাতিক বিমান টিকিটের অনেক সুবিধে। সিট কনফার্মড করেও নির্দিষ্ট দিনে ফ্লাইট ধরতে না গেলেও টিকিট নষ্ট হয় না। এক বছর ধরে টিকিটটা ঘুম পাড়িয়ে কাছে রেখে দেওয়া যায়। ইচ্ছে করলেই এয়ারলাইনস বদল করা যায়। যাওয়ার সময় ইওরোপ হয়ে গিয়ে ফেরার সময় জাপান ঘুরে আসতে পারে যাত্রীরা। আমারটা খুব সস্তা বলেই তার তিন অবস্থা। যাওয়া-আসা একই পথে, এয়ার লাইনস বদলাবার উপায় নেই আর সময়সীমা চার মাস।

আমার সনির্বন্ধ অনুরোধে দীপকদা তাঁর ট্রাভেল এজেন্টকে ফোন করলেন। ইনি একজন ভারতীয় ব্যবসায়ী। ইনি বললেন, আমার টিকিটটা একেবারেই অচল, তবে তিনি সস্তায় আমায় আর একটা টিকিট দিতে পারেন, তার দামটা ভারতে ফিরে গিয়ে দিলেও চলবে, যদি দীপকদা আমার জামিন থাকেন।

এ বার্তা শুনে আমি বললুম, হোপলেস! ফিরে গিয়ে অত টাকা দিতে হলে আমার ব্যাঙ্ক ডাকাতি করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। নভিস ডাকাত হিসেবে আমি নির্ঘাত ধরা পড়ে যাব। তাহলে তো দেখছি আপনার বাড়িতেই আমায় কাজের লোক হয়ে যেতে হচ্ছে।

এবারে ফোন করা হল এক সাহেব এজেন্টকে। সাহেব খানিকটা ভরসা দিয়ে বললেন, যদি কোনও ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিতে পারো, তা হলে চেষ্টা করা যেতে পারে।

আমি উল্লসিত হয়ে বললুম, ব্যাস, তাহলে তো হয়েই গেল। ডাক্তারের সার্টিফিকেট জোগাড় করা এমন কী আর শক্ত।

দীপকদা ধমক দিয়ে বললেন, কে তোমায় সার্টিফিকেট দেবে শুনি? তোমার কি সত্যি অসুখ হয়েছে? তোমার কী অসুখ হয়েছে শুনি?

আমি সগর্বে বললুম অসুখ? আমার অসুখ হবে কেন? আমার একেবারে লোহার মতন স্বাস্থ্য।

—তবে? এ কি ইন্ডিয়া পেয়েছ যে অফিসের ছুটি নিতে হলেই পাড়ার ডাক্তারকে দু-পাঁচ টাকা দিলেই সার্টিফিকেট পাবে? এ দেশে কেউ ফল্‌স সার্টিফিকেট দেয় না। ধরা পড়লে সে ডাক্তারের লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া হয় সঙ্গে সঙ্গে।

আমি বললুম, কিন্তু অনেক বাঙালি ডাক্তারও তো আছেন এ দেশে।

দীপকদা বললেন, তাঁদের তো আরও বেশি অসুবিধে! বিদেশে কাজ করছেন, ধরা পড়ার ভয় তাঁদের আরও বেশি থাকবে। এটাই তো স্বাভাবিক। কোনও বাঙালি ডাক্তারকে এরকম অনুরোধ করে অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলাই অনুচিত।

—তা হলে কী হবে?

—যেরকম অবস্থায় ছিলে, সে রকমই থাকবে।

রয়ে গেলাম নিশ্চেষ্টভাবে দু-তিনদিন। তারপর একদিনেই পরপর দুটি কাচের গেলাস পড়ে গেল আমার হাত থেকে। দীপকদা ও জয়তীদি দুজনেই ভুরু তুলে তাকালেন আমার দিকে। এ রকম কাজের লোককে কতদিন রাখা নিরাপদ সে সম্পর্কে ওঁদের মনে সংশয় দেখা দিয়েছে।

বাধ্য হয়েই দীপকদা ফোন করলেন আরও কয়েক জায়গায়। শেষ পর্যন্ত দু-হাজার মাইল দূরের এক সহৃদয় ডাক্তার, তাঁর নাম জানাতে চাই না, একখানা সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দিতে রাজি হলেন। সেটা হাতে পাওয়ার পর দেখা গেল, আমার পায়ের শিরায় থ্রম্বোসিস হয়েছে বলে সেই ডাক্তার মহোদয় সন্দেহ করছেন। এই অবস্থায় আমায় একদম চলাফেরা করা বাঞ্ছনীয় নয়।

এ নাকি এমন এক অসুখ, যা বাইরে থেকে দেখে বোঝবার উপায় নেই। পরীক্ষা করলেও সহজে ধরা পড়ে না।

দীপকদা বললেন যাও, চুপচাপ শুয়ে থাকো। মেডিক্যাল বোর্ড যদি তোমায় পরীক্ষা করতে চায়, তা হলে পুরো থ্রম্বোসিস রোগীর মতন হাবভাব করতে হবে কিন্তু।

আমি মনে-মনে চিন্তা করতে লাগলুম, কোনও নাটকে বা সিনেমায় আমি কোনও থ্রম্বোসিস রোগীর অভিনয় দেখেছি কি না। খুঁড়িয়ে হাঁটতে হবে? কিংবা ওয়েস্টার্ন ছবিতে পায়ে গুলি খাওয়া নায়ক যেরকম বুকে হেঁটে-হেঁটে এগোয় সেরকম...

সাহেব এজেন্ট সেই ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখে খুশি হয়ে বললেন, বাঃ বেশ, এই তো চাই। এতেই কাজ হয়ে যাবে। কিন্তু—

আমি ভয়ার্ত গলায় জিজ্ঞেস করলুম, আবার কিন্তু?

সাহেব বললেন, এরকম অসুস্থ লোককে তো প্লেনে তোলা যায় না। এবারে ফিট সার্টিফিকেট নিয়ে আসুন। এটা কোনও সমস্যাই নয়। আমি যে ফিট আছি তাতে তো কোনও সন্দেহই নেই। শুধু হাঁটা কেন, আমি লাফিয়ে, দৌড়ে, এমনকী নেচেও আমার ফিটনেস দেখাতে পারি যে-কোনও ডাক্তারের সামনে।

দীপকদার এক বন্ধু ডাক্তার অবশ্য সে সব পরীক্ষা নিলেন না। বরং একদিন নেমন্তন্ন করে খাইয়ে তারপর সার্টিফিকেট দিয়ে দিলেন।

সব দেখে এজেন্ট সাহেব বললেন, হ্যাঁ, মনে হচ্ছে আর কোনও গণ্ডগোল নেই। এবারে আমি ভ্যাঙ্কুবারে বিমান কোম্পানির কাছে সব কিছু পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তারপর আবার প্রতীক্ষা। এবং প্রতীক্ষার অবসানে সুসংবাদে।

দুদিন বাদেই জানা গেল যে আমার টিকিট মঞ্জুর হয়ে গেছে। এখন যে-কোনওদিন আমি যাত্রা করতে পারি।

এবারে সত্যিই আমার আনন্দে নৃত্য করা উচিত। এতদিনের আশানিবাশার দ্বন্দ্ব মিটে গেল। কিন্তু এবারেও হরিষের পরেই বিষাদ। বিমান কোম্পানি আর একটি দুঃসংবাদও পাঠিয়েছে। আমার আর মাঝপথে কোথাও থামা চলবে না। কানাডা থেকেই সোজা ভারতে ফিরতে হবে।

আমি আর্তনাদ করে বললুম, সে কী! আমার যে রোমে নেমন্তন্ন আছে। সেখানে গেলে আমার একটাও পয়সা লাগবে না। আমার বন্ধু ভাস্কর বারবার টেলিফোন করে বলেছে ফেরার পথে একবার লন্ডনে নামতে। আমি লন্ডনে যেতে না পারলেও ও সপরিবারে রোমে এসে আমার সঙ্গে যোগ দিয়ে সারা ইওরোপ ঘুরবে। তা ছাড়া আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত আমায় বিশেষ স্নেহ করেন, তিনি বলে রেখেছেন পশ্চিম জার্মানির উল্‌মে ওঁর বাড়িতে একবার অবশ্যই যেতে। সেসব হবে না!

আমি বললুম, আমার টিকিটে তো রোমের স্টপ ওভার আছেই। সেখানে তো আমাকে নামতে দিতে বাধ্য।

এজেন্টমশাই মুচকি হেসে মাথা নেড়ে বললেন, উহুঁ! ও কথা আর এখন খাটবে না। কোম্পানি জানিয়েছে যে, উনি একবার যখন ও রকম গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তখন আর ঝুঁকি নেওয়া একেবারেই উচিত হবে না। কোথাও থামলে যদি আবার সেই অসুখ হয়, তা হলে কে দায়ী হবে? সুতরাং ওঁকে এখন আমরা সরাসরি দেশে ফিরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই।

—কিন্তু আমার তো ওরকম অসুখ, মানে ইয়ে, আমি বলছিলুম যে...

—ব্যাস, ব্যাস আর ও কথা উচ্চারণও করবেন না। দুদিন পরের ফ্লাইটেই একটা সিট খালি পাওয়া যাচ্ছে, তাতেই চড়ে বসুন।

বাংলার পাঁচের মতন মুখ করে ফিরে এলুম বাড়ি। জয়তীদি বললেন, কী, সব ঠিকঠাক হয়ে গেল, এখনও মন ভালো হচ্ছে না?

আমি বললুম, কোথায় সব ঠিক হল। শীতকালের ইওরোপ খানিকটা দেখে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। ভাস্কর কিংবা আলোকরঞ্জন তো আমার টিকিটের বিচিত্র ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন না। ওঁরা ভাববেন, আমি শীতের ভয়ে তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে গেলুম।

রাত্তিরবেলা খাওয়ার টেবিলে আমরা অনেকক্ষণ চুপচাপ। এক সময় জয়তীদি মুখ তুলে বললেন, সত্যি তুমি পরশু চলে যাচ্ছ? তোমার মন খারাপ হয়ে গেছে বুঝতে পারছি। টিকিট যখন ঠিক হয়ে গেছে, তখন অত তাড়াহুড়ো করার কী আছে? বরং আর ক'টা দিন থেকে যাও।

আমি বললুম, রোমেই নামা হবে না, তা হলে আর শুধু-শুধু এই পচা এডমান্টনে আর বেশিদিন থেকে কী হবে?

জয়তীদি বললেন, এডমান্টন পচা? তুমি ভারী অকৃতজ্ঞ তো?

—এখন এই বরফ-ঢাকা এডমান্টনে আর কী করবার আছে আমার?

দীপকদা বললেন, তোমার যাওয়ার কোনও ঠিক-ঠিকানাই ছিল না, কোনওমতে টিকিটের ব্যবস্থা করে দিলুম, তার জন্য একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দিলে না।

আমি মুখ গোঁজ করে বললুম, কত স্বপ্ন দেখেছি ইটালি যাওয়ার। রোম, ভেনিস।

দীপকদা আর জয়তীদি হাসি মুখে পরস্পরের দিকে তাকালেন। তারপর জয়তীদি বললেন, আচ্ছা, এক কাজ করো। তোমাকে তো অ্যামস্টারডমে নেমে প্লেন বদল করতেই হবে। সেখানে নেমে তুমি তোমার এই প্লেনের টিকিটটা ছুঁড়ে ফেলে দাও।

—তারপর?

—তারপর সেখান থেকে কলকাতার আর একটা নতুন টিকিট কেটে নাও!

—টিকিট কেটে যাব মানে? টাকা?

—সে টাকাটা আমরা তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি!

দীপকদা মুখ নীচু করে বললেন, হ্যাঁ, সে টাকাটা আমরা তোমাকে কোনওক্রমে জোগাড় করে দিতে পারব মনে হয়। তুমি ছেলেমানুষ, মন খারাপ করে আছ যখন।

আমি স্তম্ভিত হয়ে একটুক্ষণ বসে রইলুম। এ আমি কী শুনছি? মানুষের কাছ থেকে এতখানি ভালো ব্যবহার পাবার উপযুক্ত কী করেছি আমি? কিছুই তো না! জয়তীদি বললেন, ব্যাস, আর গোমড়া মুখে থেকো না। আমার মেয়েরা তোমার দিকে তাকাতেই ভয় পাচ্ছে। সব ঠিক হয়ে গেল তো!

দীপকদা বললেন, অ্যামস্টারডাম থেকে তোমার ফেরার টিকিট আমি এখান থেকেই কেটে দিতে পারি। কোথায় কোথায় স্টপওভার চাও বলো।

আমি এক গাল হেসে বললুম, কোথাও চাইনি। এই যে আপনারা আমাকে অফারটা দিলেন, এতেই তো আমার স্বর্গ দেখা হয়ে গেল।

—না, না, আমরা সিরিয়াসলি বলছি।

—জয়তীদি, লন্ডন, উলম্ কিংবা রোম, এইসব জায়গাগুলোতো পালিয়ে যাচ্ছে না। পরে আবার কোনওবার এসে দেখলেই হবে। একেবারেই সব দেখে নিতে হবে, তার তো কোনও মানে নেই। আমি অত পেটুক নই।

এর পরের তৃতীয় দিন ভোরবেলা পড়ে গেল সাজো-সাজো রব। দীপকদারা সবাই আমাকে পৌঁছে দিতে যাবেন এয়ারপোর্টে। জিয়া আর প্রিয়াও জামাকাপড় পরে তৈরি। অত ভোরেই জয়তীদি ব্রেকফাস্ট বানাতে বসে গেলেন। আমি যত বলি যে এত সকালে আমি কিছু খেতে পারি না, তা ছাড়া প্লেনে তো খাবার দেবেই, তবু তিনি শুনলেন না।

যেন বরফের সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে রাস্তা। ভালো করে আলো ফোটেনি। তার ওপর আবার তুষারপাত শুরু হয়ে গেছে। সামনের বা দুপাশের কিছুই ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। দীপকদা হেডলাইট জ্বেলে গাড়ি চালাচ্ছেন, এর মধ্যে একবার গাড়ি খারাপ হয়ে গেলে আর কোনও উপায় নেই। সবচেয়ে মজা লাগে কারখানার চিমনির ধোঁয়াগুলো দেখতে। এ ধোঁয়া উড়ে পালাতে পারে না, চিমনির একটু ওপরেই মেঘ হয়ে জমে থাকে।

দীপকদাদের বাড়ি সেন্ট এলবার্টে। সেটা ছাড়িয়ে এডমান্টন শহরে ঢোকার আগে সাসকাচুয়ান

নদী পার হতে হয়। সেই নদী এখন বরফের সড়ক। ব্রিজের দুপাশেও থোকা-থোকা বরফ ঝুলছে। এরকম সাদা রঙের পৃথিবী আগে কখন দেখিনি, ভবিষ্যতে আর কখনও দেখব কি না কে জানে!

এয়ারপোর্টের ভেতরের চেহারাটা একেবারে অন্যরকম। এত সকালেও সেখানে প্রচুর লোক, ভেতরটা আলোয় ঝলমল করছে। কফি আর হট ডগ ভাজার গন্ধ ম ম করছে বাতাসে।

বিদায় বাক্যটি যত সংক্ষিপ্ত হয় ততই শুনতে ভালো লাগে। প্রথমে মালপত্র চেক ইন করে কিছুক্ষণ আমরা গল্প করতে লাগলুম একটা বেঞ্চে বসে। তারপর যখন সিকিউরিটির ডাক হতে লাগল বারবার, শেষ মুহূর্তে আমি কিছু না বলে দৌড়ে গেলুম সেদিকে।

সুড়ঙ্গ পথটিতে ঢোকার আগে আমি পেছন ফিরে হাত নেড়ে বললুম, আবার দেখা হবে!

এডমান্টন থেকে টরেন্টো চার ঘণ্টার পথ। স্রেফ ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলুম। টরেন্টো থেকে বড় বিমান এক লাফে পার হয়ে যাবে অ্যাটলান্টিক। তার আগে বিমান বন্দরে ছ'ঘণ্টার অপেক্ষা।

আগেই ব্যবস্থা করা ছিল, এডমান্টনের দিলীপবাবুর এক আত্মীয় এসে আমায় নিয়ে গেলেন এয়ারপোর্ট থেকে। সেখানে তাঁর স্ত্রী চটপট ভাত আর মাছের ঝোল রেঁধে খাইয়ে দিলেন। আরও কয়েকজন বাঙালির সঙ্গে আলাপ হল সেখানে। কোনও রকম উদ্বেগ নেই, বেশ নিশ্চিন্তে ঢিলেঢালাভাবে সময়টা কাটিয়ে দিয়ে আবার ফিরে এলুম টরোন্টো এয়ারপোর্টে।

এরপর সোজা অ্যামস্টারডাম। বারো না চোদ্দো ঘণ্টার ব্যাপার। আমার একটুও মন খারাপ লাগছে না, বরং একটা অস্থিরতা বোধ করছি। কখন পৌঁছব, কখন পৌঁছব। সুদীর্ঘ জেট যাত্রায় দিনরাত্রির হিসেব গুলিয়ে যায়, কখন ঘুম, কখন জাগরণ তার ঠিক থাকে না। আসবার পথে প্লেনের নানারকম যাত্রীদের লক্ষ করে কত আনন্দ পেয়েছি, ফেরার পথে কারুর সম্পর্কেই কোনও আগ্রহ নেই। বিরক্তি ভোলবার জন্য এরা বারবার খাবার দেয়, আবার সেই খাবার দেখলেই বিরক্ত লাগে।

সব মিলিয়ে প্রায় তেত্রিশ ঘণ্টা বাদে দিল্লি পৌঁছলুম আর একটি ভোরবেলা। ল্যান্ডিং-এর আগে প্লেনের জানালা দিয়ে ভারতবর্ষের মাটি দেখতে পেয়েই বুকের মধ্যে বেশ আরাম হল। ওই মাটির ওপরে আমি শক্ত পায়ে দাঁড়াতে পারি।

যে-কোনও দেশেই বিমান থেকে প্রথমে নামার সময় খানিকটা অস্বস্তি লাগে, নিজেকে আগন্তুক মনে হয়। কিন্তু দেশে ফিরলেই মনে হয়, ওই তো একটু দূরেই আমার বাড়ি। যদিও দিল্লির জানুয়ারির শীত বেশ বিখ্যাত। কিন্তু আমার গরম লাগল, ওভারকোট খুলে হাতে নিতে হল।

প্রচুর মানুষের ভিড়, ঠ্যালাঠেলি, কুলিদের ফিশফাশ, বকশিস-লোভী চোখ, তবু বেশ সাবলীল বোধ করতে লাগলুম। কাঁধ দুটো আর টানটান রাখার দরকার নেই। এখানে যে-কোনও লোকের সঙ্গে দরকার হলে ধমকে কথা বলতে পারি।

এত ভোরেও আমার জন্য মিহির রায়চৌধুরি এসে দাঁড়িয়ে আছে। আমার টেলিগ্রামটি ঠিক সময়ে পৌঁছেছে দেখে আমি ভারতীয় ডাক বিভাগের কৃতিত্বে চমৎকৃত হলুম। এই ক'মাসেই দেশটা বেশ বদলে গেছে দেখছি। কাস্টমসে কোনও গণ্ডগোল হল না, বাইরে বেরিয়ে ট্যাক্সিওয়ালা বেশি ভাড়া চাইল না, এ যে দেখি বিস্ময়ের পর বিস্ময়।

মিহিরের সঙ্গে এয়ারপোর্টের বাইরে দাঁড়িয়ে মাটির খুড়িতে গরম-গরম চা খেলুম দু'কাপ। তারপর ভাবলুম, এত তাড়াতাড়ি কলকাতায় ফিরে কী হবে? এইরকম সুন্দর শীতকালে একবার সাঁওতাল পরগনা ঘুরে গেলে মন্দ হয় না।
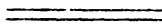
রাশিয়া ভ্রমণ

মস্কো বিমানবন্দরে পা দিলুম খুব ভোরবেলায়। সারা রাত প্রায় জেগেই কাটাতে হয়েছে। কলকাতা থেকে এরোফ্লোট বিমানে চেপেছিলুম বিকেলবেলা, তারপর বোম্বে, করাচি আর তাসকেন্টে বিমানটি মাটি ছুঁয়েছিল, আমাদেরও নামতে হয়েছিল দুবার। তার মধ্যে শেষ রাতে তাসকেন্টে নেমে আমি ঝোলা থেকে একটা সোয়েটার বার করে পরে নিয়েছিলুম। রাশিয়ার ঠান্ডা সম্পর্কে অনেকেই ভয় দেখিয়েছিল আগে থেকে, কিন্তু আমি খুব একটা শীত-কাতুরে নই, তা ছাড়া কিছুদিন আগেই ডিসেম্বর-জানুয়ারির ক্যানাডার তুষারের রাজ্য ঘুরে এসেছি, সুতরাং মে মাসের রাশিয়াকে ডরাব কেন? অবশ্য সঙ্গে একটা পাতলা ওভারকোটও এনেছি।

বিমানে রাত্তিরটা বেশ গল্প-গুজবেই কেটে গেছে। সহযাত্রী পেয়েছিলুম দুই বাঙালি তরুণকে। একজনের নাম সুবোধ রায়, সে মস্কোতে আছে প্রায় সাত-আট বছর, উচ্চশিক্ষার্থে। কিছুদিনের জন্য কলকাতায় ছুটি কাটিয়ে ফিরে যাচ্ছে আবার। সুবোধ খুব দিলদরিয়া ধরনের, উচ্ছ্বাসপ্রবণ এবং আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। অন্যজনের নাম অসিতবরণ দে, সে প্রায় চোদ্দো বছর বাদে চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে কলকাতা-দর্শনে এসেছিল। সে একটু চাপা ও লাজুক স্বভাবের। আমরা তিনজনে মিলে মস্কো-প্রাহা-কলকাতার নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আড্ডা দিয়ে যাচ্ছিলুম। সন্ধে থেকে মাঝেমধ্যেই আমাদের খাদ্যপানীয় পরিবেশন করা হচ্ছিল, বিমানযাত্রার একঘেয়েমি কাটাবার জন্যই বোধহয় ওরা অত ঘন ঘন খাবার দেয়, কিন্তু অত কি খাওয়া যায়? শেষবারের খাবার আমি প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়েছিলুম।

মস্কোয় নামার পর অসিতবরণ দে চলে গেল ট্রানজিট লাউঞ্জের দিকে, আমি আর সুবোধ পাশপোর্ট হাতে করে এগোলুম নিষ্ক্রমণের পথে।

সুবোধ জিগ্যেস করল, আপনাকে কি কেউ নিতে আসবে?

আমি বললুম, সেই রকমই তো কথা আছে। কিন্তু এত ভোরে...

সুবোধ বলল, কেউ না এলেও ক্ষতি নেই, আমি তো আছি। আমি আপনাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেব।

মস্কো বিমানবন্দরটি বিশাল, কিন্তু প্রায় নিঝুম। এত সকালে একটিই মাত্র ফ্লাইট এসেছে। ইমিগ্রেশান ও কাস্টমস বেরিয়ার পার হওয়া মাত্রই একটি বাইশ-তেইশ বছরের ছিপছিপে যুবক আমার কাছে এসে পরিষ্কার ইংরিজি উচ্চারণে আমার নাম বলে জিগ্যেস করল, আপনিই কি তিনি?

আমি হ্যাঁ বলাতেই সে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, আমার নাম সারগেই স্ট্রোকান, আমি আপনার জন্যই এসেছি।

এত লোকজনের মধ্যে সে প্রথমেই আমাকে চিনল কী করে? খুব সম্ভবত ছবি দেখে সে আমার চেহারাটা মুখস্থ করেছে। আমি তার সঙ্গে সুবোধ রায়ের আলাপ করিয়ে দিলুম।

সারগেই স্ট্রোকান একটা ঠেলাগাড়ি জোগাড় করে এনে তাতে আমাদের বাক্স-প্যাঁটরাগুলো চাপাল, তারপর সেটা নিয়ে এগোবার চেষ্টা করতেই উলটে পড়ে গেল সবকিছু। সারগেই স্ট্রোকান লজ্জা পেয়ে সংকুচিতভাবে বলল, আমি খুব দুঃখিত, আমি কোনওরকম গাড়িই ঠিকঠাক চালাতে পারি না!

তাতে আমি খুব আশ্বস্ত বোধ করলুম। যে-খুব তুখোড় ধরনের লোক সবকিছুই নিখুঁতভাবে করতে পারে, কখনও যাদের জীবনে নিজস্ব ভুলের জন্য লজ্জা পাওয়ার অবকাশ ঘটে না, সেই সব মানুষদের আমি বেশ ভয় পাই। এবার আমরা তিনজনেই হাত লাগিয়ে গাড়িটিকে নিয়ে এলুম বিমানবন্দরের বাইরে।. একটা ট্যাক্সি ডেকে মালপত্র তোলা হল।

এবারে আমি ওভারকোটটা গায়ে চাপিয়ে নিলুম। খুব যে শীত করছে তা নয়। জানলা দিয়ে আমি উৎসুকভাবে দেখতে লাগলুম বাইরের দৃশ্য।

যে-কোনও নতুন দেশে এলেই প্রথমটায় একটা রোমাঞ্চ হয়। সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে কৌতূহল, আগ্রহ পুষে রেখেছি কতদিন ধরে। আমরা একটা দেশকে সবচেয়ে ভালো করে চিনি তার সাহিত্যের মধ্য দিয়ে। এই সেই টলস্টয়, পুশকিন, ডস্টেয়ভ্স্কি, গোর্কি, মায়াকভ্স্কি-র দেশ। পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম একটি দেশে প্রোলেতারিয়েতরা শোষণমুক্ত সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে, এই দেশটি দেখবার জন্য আমি অনেকদিন থেকেই ব্যগ্র হয়েছিলুম, অকস্মাৎ আমন্ত্রণ পেয়ে খুবই পুলকিত বোধ করেছি।

আমি পূর্ব ইউরোপের কোনও দেশেই আগে আসিনি। এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপের কতটা তফাত তাও দেখতে চাইছিলুম। এখন অবশ্য সেরকম কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। বিমানবন্দর থেকে মস্কো শহর বেশ দূরে, এখন পথের দু-পাশে শুধুই উন্মুক্ত প্রান্তর, মাঝে-মাঝে গাছপালা। আজ এপ্রিল মাসের শেষ দিন, কিন্তু শীতের চিহ্ন এখনও মুছে যায়নি, এখানে সেখানে চোখে পড়ে বরফ-গলা জল।

রাস্তার পাশে একটি ভাস্কর্যের দিকে হাত দেখিয়ে সুবোধ বলল, এই পর্যন্ত হিটলারের বাহিনী এসে থেমে গিয়েছিল।

আমি চমকে উঠলুম। মস্কো নগরীর আশেপাশে কত ঐতিহাসিক স্মৃতি ছড়িয়ে আছে। ১৯৪১-এর ডিসেম্বর মাসে এই অঞ্চলে কী সাংঘাতিক যুদ্ধ হয়েছিল, সারা পৃথিবী আতঙ্কে ভেবেছিল মস্কো বুঝি যায়-যায়, শেষ পর্যন্ত রেড আর্মির বীরত্বের কাছে দারুণভাবে হেরে যায় নাতসিরা। আজ তার আর কোনও চিহ্নই নেই। কয়েকটি বলিষ্ঠ পুরুষের মূর্তি আকাশের দিকে মুঠি তুলে আছে। তার পেছনেই বড়-বড় গাছ, নিঃশব্দ।

মস্কো শহরের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে মস্কোভা নদী। এমন কিছু বড় নদী নয়। সেই নদী বেরিয়ে পৌঁছে গেলুম আমার জন্য নির্দিষ্ট হোটেলে। এটির নাম হোটেল ইউক্রাইনিয়া। এর ভবনটি যেমন প্রকাণ্ড তেমনি জমকালো ধরনের। নীচের দিকটা অতি প্রশস্ত, তার পর ধাপে-ধাপে ছোট হতে-হতে ওপরের দিকে উঠেছে। একেবারে চূড়োর কাছটা গির্জাশীর্ষের মতন। অবিকল এই এক ডিজাইনের বাড়ি মস্কো শহরে চার-পাঁচটি আছে, অনেক দূর থেকে দেখতে পাওয়া যায়।

সুবোধ রায় এখান থেকে বিদায় নেবে, তাকে যেতে হবে আরও খানিকটা দূরে। সে সেরগেই স্ট্রোকান-কে জিগ্যেস করল, আপনাদের কী প্রোগাম বলুন? আমরা এখানকার বাঙালিরা সুনীলদাকে নিয়ে কয়েকদিন বসতে চাই।

সেরগেই স্ট্রোকান বলল, তা তো সম্ভব হবে না। আমরা ওঁকে ডেকে এনেছি, আমাদের প্রত্যেকদিনের ঠাসা প্রোগ্রাম আছে। তার মধ্যে তো সময় করা যাবে না! আপনারা ইন্ডিয়াতে গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করবেন।

কিন্তু সুবোধ এত সহজে কিছু মেনে নেবার পাত্র নয়।

সে বলল, সন্ধের পর তো আপনাদের আব কিছু করবার থাকবে না। তখন আমরা এসে ওঁকে নিয়ে যাব, আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাব। আজকের দিনটা থাক, কাল সন্ধ্যেবেলা আমি এসে—

সেরগেই স্ট্রোকান বলল, কাল দুপুরেই আমরা লেনিনগ্রাড চলে যাচ্ছি।

যাই হোক, ঠিক হল যে নানা জায়গায় ঘুরে আমি আবার দিন দশেক বাদে ফিরে আসব মস্কোতে।

তখন এখানকার বাঙালিদের সঙ্গে দেখা হবে। সুবোধ আমাদের দু'জনকেই তার কার্ড দিল, যাতে ফিরে এসেই আমরা ওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি।

হোটেলের ভেতরে এসে পাসপোর্ট জমা দিয়ে নামটাম লেখাতে খুব বেশি সময় লাগল না। আমার জন্য ঘর নির্ধারিত হল সতেরো তলায়। হোটেলের লাউঞ্জটি পুরোনো আমলের মতন বেশ জমকালোভাবে সাজানো। খুব উঁচু সিলিং, আলোগুলো ঝাড়-লণ্ঠনের মতন। লিফটটি দেখেও আমি চমৎকৃত হলুম, একেবারে আদিকালের ঢাউস লিফট, পেতলের কারুকার্য করা দরজা, ভেতরে অন্তত জনা কুড়ি লোক অনায়াসে এঁটে যায়। এ-রকম লিফট আমি আগে দেখেছিলুম রোমের ভ্যাটিকানে।

সুটকেস সমেত আমাকে আমার ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে সেরগেই স্ত্রোকান বলল, আপনি এখন একটু বিশ্রাম নিন। আমি আবার সাড়ে নটার সময় আসব।

ওভারকোট ও জুতো-মোজা খুলে ফেললুম তাড়াতাড়ি। বেশিক্ষণ মোজা পরে থাকলে আমার অস্বস্তি লাগে। সেই গতকাল দুপুর থেকে এসব পরে আছি। খালি পায়ে এসে দাঁড়ালুম জানলার ধারে। একটু দূরেই নদী। এই নদীর দু-পার আগাগোড়া পাথর দিয়ে বাঁধানো। জানলার কাচ খুলে বাইরে মুখ ঝুঁকিয়ে টাটকা হাওয়া বুকে টেনে নিলুম অনেকখানি। একটা গভীর বিস্ময়বোধ এখনও আমাকে আপ্লুত করে আছে। সত্যি আমি রাশিয়াতে এসেছি!

মাত্র সাতটা বাজে। কলকাতায় এ সময় ঘুম থেকেই উঠি না। দীর্ঘ বিমানযাত্রা ও রাত্রি জাগরণ সত্ত্বেও শরীরে কোনও ক্লান্তি বোধ নেই। ইচ্ছে করলে এখন ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়ে নেওয়া যায়। ধপধপে সাদা চাদর পাতা নরম বিছানায় শুয়ে পড়লুম বটে, কিন্তু একটা নতুন দেশে এসেই কি ঘুমিয়ে পড়া সম্ভব?

ঘরখানি যে-কোনও দেশের দামি হোটেল ঘরের মতন। টিভি, টেলিফোন, রাইটিং টেবল, ড্রেসিং টেবল, এক পাশে ওয়ার্ডরোব ও সংলগ্ন বাথরুম। উঠে টিভি চালিয়ে দিলুম। রুশ ভাষা এক বর্ণ বুঝি না। মনে হল খবর পড়া হচ্ছে। তার মধ্যে এক জায়গায় ইন্দিরা গান্ধির নাম শুনে চমকে উঠলুম। কী হয়েছে ইন্দিরা গান্ধির? তারপর শুরু হল বাচ্চাদের জন্য অনুষ্ঠান।

আধ ঘণ্টা শুয়ে থেকেও বুঝলুম ঘুম আসবার কোনও আশা নেই। তার চেয়ে বরং দাড়ি কামানো, স্নান ইত্যাদি সেরে ফেলা যাক। এইসব পর্ব চুকিয়ে, পোশাক পালটিয়ে আমি ফিটফাট হয়ে আবার দাঁড়ালুম জানলার ধারে। এত উঁচু থেকে রাস্তার মানুষজনকে ছোট-ছোট দেখায়। নদীর ওপর দিয়ে স্টিম লঞ্চ যাচ্ছে। এখান থেকে যে দৃশ্য আমি দেখছি, তাতে অন্যান্য সাহেবি শহরের সঙ্গে মস্কোর কোনও তফাত নেই।

একটু পরেই সারগেই স্ত্রোকান এসে পড়ল। সে বেশ ব্যস্তভাবে বলল, আপনি তৈরি তো? চলুন, আগে ব্রেক ফাস্ট খেয়ে আসি।

আমি বললুম, আগে একটু বসুন। আপনার সঙ্গে ভালো করে আলাপ করে নিই।

সারগেই বলল, আপনি যে-ক'দিন আমাদের দেশে থাকবেন, আমিই সব জায়গায় আপনাকে নিয়ে যাব। সুতরাং আলাপ তো হবেই।

আমি বললুম, তবু একটু বসুন।

যুবকটির চোখের মণি দুটো নীলচে, মুখটি বুদ্ধিদীপ্ত এবং সারল্য মাখানো। তার গায়ে একটা খয়েরি রঙের চামড়ার জ্যাকেট। আমি তাকে একটা সিগারেট দিতে চাইলে বলল যে কিছুদিন আগে সে সিগারেট ছেড়ে দিয়েছে, কারণ সিগারেট খেলে ক্যানসার হয়। সেই সঙ্গে সে যোগ করল, অবশ্য সোভিয়েত দেশে এখনও অনেকেই সিগারেট খায়।

আমি জিগ্যেস করলুম, আপনি আমার সম্পর্কে কী কী জানেন?

সে গড়গড় করে অনেক কিছু বলে গেল। বুঝলুম যে কলকাতার কনসুলেট থেকে পাঠানো আমার বায়োডাটা সে ভালো ছাত্রের মতন মুখস্থ করে নিয়েছে।

আমি হেসে বললুম, বাঃ সবই তো জেনে ফেলেছেন দেখছি। এবারে আপনার সম্বন্ধে কিছু বলুন!

সারগেই স্ট্রোকানের জন্ম ইউক্রাইনে, উচ্চশিক্ষার জন্য সে মস্কো চলে আসে। পড়াশুনো শেষ করার পর সে কিছুদিন সামরিক বাহিনীতে ট্রেইনিং নিয়েছে, এখন নভোস্তি প্রেস এজেন্সিতে ইন্ডিয়া ডেস্কে সে অনুবাদকের কাজ নিয়েছে। তার বয়েস বাইশ এবং সে বিবাহিত।

একটু হেসে সে যোগ করল, আমিও কবিতা লিখি। তবে আমার কবিতা বিশেষ কোনও জায়গায় ছাপা হয়নি।

তারপর সে জিগ্যেস করল, আমি আপনাকে কি মিস্টার গঙ্গোপাধ্যায় বলব? কিংবা যদি সুনীলজি বলি? ইন্ডিয়াতে তো অনেকেই এইভাবে ডাকে!

—তুমি জানলে কী করে?

—আমি ইন্ডিয়াতে গেছি। প্রায় এক বছর ছিলাম!

সারগেই স্ট্রোকান ভারত ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হতে চায় বলে সে তামিল ভাষা শিখেছে। এবং সেই ভাষাজ্ঞান ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য সে ভারতবর্ষ ঘুরে এসেছে। সে তামিলনাড়ু, কেরালা, বোম্বাই, দিল্লি দেখেছে, কলকাতার দিকে যায়নি।

আমি মনে-মনে একবার ভাবলুম, ওদের ইন্ডিয়া ডেস্কে নিশ্চয়ই বাংলা জানা ছেলেও আছে। সেরকম একজনকে কেন পাঠাল না আমার সঙ্গী হওয়ার জন্য? পরক্ষণে সেই ভাবনাটা বাতিল করে দিলুম। এই যুবকটিকে আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। বাংলা জানা বা না জানায় কী আসে যায়!

ঠিক হল, সে আমাকে সুনীলজি বলবে, আমি তাকে শুধু সারগেই বলে ডাকব। এর পর নীচে নেমে এলুম ব্রেক ফাস্ট খেতে।

এ হোটেলের ডাইনিং হলটাও বিশাল। ব্রেক ফাস্ট খাওয়ার দু-রকম পদ্ধতি। টেবিলে বসে মেনিউ কার্ড দেখে ইচ্ছে মতন অর্ডার দেওয়া যায়। আর একদিকে আছে সেল্‌ফ সার্ভিস। আমরা দ্বিতীয় দিকেই গেলুম। এখানে পনেরো-কুড়ি রকম খাবার সাজানো রয়েছে, তিন রুবল দিয়ে টিকিট কাটলে ইচ্ছে মতন যা খুশি নেওয়া যায়।

আমি একটা ডিম সেদ্ধ, একজোড়া সসেজ ও এক পিস টোস্ট নিয়ে টেবিলে বসতেই সারগেই বলল, এ কী সুনীলজি, এত কম নিলেন? আরও কত কী রয়েছে, স্যালামি, বেকন, হ্যাম, মিট বল, ম্যাস্‌ড পোটাটো, চিজ, আমাদের অনেকরকম চিজ আছে, ট্রাই করুন!

আমি খুব একটা ভোজনরসিক নই, বিশেষত সকালের দিকে মোটেই বেশি খেতে ইচ্ছে করে না। তবু সারগেই আরও কিছু খাদ্য জোর করে এনে দিল আমার প্লেটে। কাছাকাছি টেবলগুলোতে যারা বসে আছে, তারা অধিকাংশই বিদেশি; ইংরিজি, ফরাসি ও জার্মান ভাষা শুনতে পাচ্ছি। এই হোটেলটি প্রধানত বিদেশিদেরই জন্য।

দশটার সময় বেরিয়ে এলুম হোটেল থেকে। এবারে আর ট্যাক্সি নয়, সারগেই-র অফিস থেকে গাড়ি এসেছে। এই গাড়ি সারাদিন আমাদের সঙ্গে থাকবে।

সারগেই বলল, চলুন, সুনীলজি, আগে রেড স্কোয়ার দেখে আসি। রেড স্কোয়ার না দেখলে মস্কো শহর অনুভবই করা যায় না।

আমি তাতে সম্মতি জানালুম।

মস্কো শহরে আধুনিক কায়দায় বিরাট বিরাট বহুতল বাড়ি যেমন উঠেছে, তেমনি পুরোনো আমলের প্রাসাদ রয়ে গেছে অনেক। রাস্তার দু-পাশে বাতিস্তম্ভগুলোতে লোকেরা এক জোড়া করে লাল পতাকা লাগাচ্ছে, দু-দিন মে-ডের উৎসব, সেজন্য। ঝকঝক করছে রোদ। চওড়া চওড়া রাস্তা, ট্রাফিক ব্যবস্থা অতি সুশৃঙ্খল, কোথাও জ্যামে পড়তে হল না। তবে, পশ্চিমি কোনও বড় শহরের তুলনায় মস্কোতে

গাড়ির সংখ্যা যেন কিছু কম। বাস স্টপগুলিতে রয়েছে অপেক্ষমাণ মানুষ, অনেক লোক পায়ে হেঁটেও যাচ্ছে, এটা দেখলে স্বস্তি লাগে। আমেরিকার অনেক শহরে গাড়ি ছাড়া একজনও পথচারী দেখা যায় না, কেন যেন ভূতুড়ে-ভূতুড়ে মনে হয়।

মস্কো শহরটি তেমন ঘিঞ্জি নয়। মাঝে মাঝেই পার্ক রয়েছে, তাতে নানারকম ভাস্কর্য। ব্রোঞ্জ ও পাথরের মূর্তিগুলি দৃষ্টি টেনে নেয়। খুবই বলিষ্ঠ কাজ। লেনিনের মূর্তি ছাড়াও বিখ্যাত সব সাহিত্যিক ও কবিদের মূর্তিও আছে। একটি অতি জীবন্ত মূর্তির নাম, সর্বহারার অস্ত্র ঃ খোয়া পাথর।

যেতে-যেতে বলশয় থিয়েটার দেখে আমার হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফিয়ে উঠল। এই সেই বিখ্যাত নাট্যশালা! আমি সারগেইকে বললুম, এখানে একটা ব্যালে কিংবা অপেরা দেখার সুযোগ পাব কী?

সারগেই বলল, এখন তো টুরিস্ট সিজন, টিকিট পাওয়া খুব শক্ত, তবু আমি চেষ্টা করব!

রেড স্কোয়ারে যাওয়ার আগে আমরা পুরো ক্রেমলিন এলাকাটায় একটা চক্কর দিলুম। এই অঞ্চলে আধুনিক বাড়ি বেশি চোখে পড়ে না, প্রাচীন ভাবটি অক্ষুণ্ণ আছে। ক্রেমলিন প্রাসাদের পেছন দিকে একটি পার্ক, সেখানে নামলুম আগে। এই পার্কের মধ্যেই একটি ঘেরা জায়গায় জ্বলছে অমরজ্যোতি। যুদ্ধের সময় দেশকে রক্ষা করার জন্য যারা প্রাণ দিয়েছে, তাদের স্মরণে জ্বলে এই অনির্বাণ আলোর শিখা। আমি সেখানে গিয়ে দাঁড়ালুম আমার শ্রদ্ধা জানাতে। অনেকেই এই আলোর শিখা দেখতে এসেছে, তার মধ্যে দেখলুম দু-জোড়া নব-বিবাহিত দম্পতিকে। যুবতী দুটির সাদা পোশাক ও দীর্ঘ ওড়না দেখলেই বোঝা যায় তারা সদ্য বিবাহের অনুষ্ঠান সেরেই এখানে এসেছে। সারগেইকে জিগ্যেস করে জানলুম, অনেক নব-দম্পতিই এখানে আসে। বিবাহের আনন্দ উৎসবের মাঝখানে শহিদ বেদিতে মাল্যদান আমাদের কাছে একটু আশ্চর্য মনে হতে পারে, কিন্তু সোভিয়েত নাগরিকদের কাছে এর বিশেষ তাৎপর্য আছে। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রায় দু-কোটি মানুষ প্রাণ দিয়েছে, যখন এখানে জনসংখ্যাই ছিল কুড়ি কোটি! অর্থাৎ প্রায় প্রত্যেকটি পরিবার থেকেই একজন দুজন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কিংবা পঙ্গু হয়েছে।

আমি সারগেইকে মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলুম, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় তো তুমি জন্মাওনি। তোমাদের পরিবারের কেউ কি...

সে সংক্ষিপ্তভাবে বলল, হ্যাঁ।

গাড়িতে ফিরে এসে আবার খানিকটা চক্কর দিলুম। চার দিকেই অসংখ্য ফুল। এর মধ্যে বেশি করে চোখে পড়ে টিউলিপ। এত বৈচিত্র্যময় টিউলিপ আমি আগে কখনও দেখিনি। গাঢ় লাল রঙের টিউলিপের সঙ্গে পূর্ব পরিচয় ছিল, এখানে দেখলুম হলুদ এবং তুষার-শুভ্র টিউলিপের ঝাড়ও রয়েছে। বাগানগুলি খুব যত্ন করে সাজানো। ফরাসি দেশের মতন বেশি বেশি যত্নের চিহ্ন প্রকট নয়, বরং বেশ স্বাভাবিক।

সারগেই বলল, আপনি ভাগ্যবান, আপনি খুব ভালো সময়ে এসেছেন। কয়েকদিন আগেও এখানে যখন-তখন বৃষ্টি হচ্ছিল। দুদিন ধরে আকাশ পরিষ্কার। সেজন্য টিউলিপও এত বেশি ফুটেছে।

রেড স্কোয়ারে যাওয়ার জন্য গাড়িটা বাইরে রেখে খানিকটা হেঁটে যেতে হয়। ঢালু রাস্তা ধরে আমরা ওপরের দিকে উঠে এলুম।

তারপর রেড স্কোয়ারে পা দিয়েই মনে হল, এ জায়গাটা তো আমার খুব চেনা!

॥ ২ ॥

অসংখ্য ছবিতে এবং চলচ্চিত্রে রেড স্কোয়ার দেখেছি। বিভিন্ন দিক থেকে। সুতরাং রেড স্কোয়ারে প্রথম পা দিয়ে তো খুব চেনা মনে হবেই। সারা বছর ধরেই রেড স্কোয়ারে নানান উৎসব ও জমায়েত হয়। আসন্ন মে দিবসের উৎসবের জন্য আজ রেড স্কোয়ারকে বহু পতাকা ও ছবি দিয়ে সাজানো

হয়েছে। সারগেই কিছু বলবার আগেই আমি একটি চতুষ্কোণ ভবনের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললুম, ওইটা তো সেই মাস্যালিয়াম, যেখানে লেনিনের দেহ রাখা আছে?

ক্রেমলিন প্রাসাদের উত্তর-পূর্ব দিকে এই প্রশস্ত চত্বরের নাম রেড স্কোয়ার। আমরা যেদিক দিয়ে ঢুকলুম, সেদিক দিয়ে প্রথমেই পড়ে সেন্ট বেসিলস ক্যাথিড্রাল। ষোড়শ শতাব্দীতে তৈরি এই বিচিত্র আকারের ও নানা রঙের গির্জাটি রাশিয়ান স্থাপত্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই গির্জার গম্বুজের সংখ্যা ন'টি, প্রত্যেকটিই বিভিন্ন আকৃতির। চমৎকার দেখতে এই গির্জাটিতে খানিকটা যেন বার্মিজ স্থাপত্যের ছাপ আছে বলে মনে হল, কিংবা আমার ভুলও হতে পারে।

সেই গির্জার পাশ দিয়ে একটু এগোলেই ডান পাশে একটা উঁচু বেদির মতন, জারদের আমলে এটা ছিল বধ্যভূমি, সম্রাটদের ইচ্ছাক্রমে যাকে তাকে ওখানে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া হত, এখন সেখানে ফুলের মালার স্তূপ।

ক্রেমলিন প্রাসাদের সিংহদ্বারের কাছেই যে সুউচ্চ গম্বুজ, যার চূড়ায় রয়েছে একটি বিশাল তারা, সেই গম্বুজটিই মস্কো শহরের প্রতীক চিহ্ন বলা যায়। সেই গম্বুজে দিনে দু-বার ঘণ্টাধ্বনি হয়। সেই ধ্বনিতে শোনা যায় 'ইন্টারন্যাশনাল' গানের সুর।

রেড স্কোয়ারে অসংখ্য মানুষ অপেক্ষা করছে সেই ঘণ্টাধ্বনি শোনবার জন্য। অধিকাংশই টুরিস্ট, এদের মধ্যে আমেরিকান টুরিস্টদের আলাদা করে চেনা যায়। অত্যন্ত সুসজ্জিত কয়েকজন পুলিশ সেই ভিড়ের শৃঙ্খলা রক্ষা করছে। সেই পুলিশদের মুখগুলি খুবই গম্ভীর। পুলিশের পোশাক পরে থাকলে বোধহয় হাসি নিষেধ।

লেনিন সমাধিভবনের সামনে বিরাট লম্বা লাইন। সারগেই জিগ্যেস করল, আপনি ভেতরে যেতে চান?

অতবড় লম্বা লাইনে দাঁড়ানোর বাসনা আমার হল না. আমি বললুম, না, থাক।

সারগেই বলল, এখন শুধু জায়গাটা দেখে নিই, পরে তো এখানে বারবার আসতে হবেই।

রেড স্কোয়ারের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত হেঁটে গেলুম দুজনে। চত্বরটি কব্‌ল স্টোন বা খোয়া পাথরে বাঁধানো, প্রাচীন কালে যেমন ছিল, সেইরকমই রয়েছে। সত্যি কথা বলতে কী, ছবিতে বা সিনেমায় রেড স্কোয়ারকে যত বিশাল মনে হয়, আসলে কিন্তু তত বড় লাগল না। কল্পনার থেকে বাস্তব সবসময়েই একটু ছোট।

ক্রেমলিন কথাটার মানেই হল দুর্গ। দেয়াল ঘেরা এই অঞ্চলটাই আদি মস্কো, তারপর একে কেন্দ্র করে শহরটা ছড়িয়েছে। এর চারপাশ দিয়েই বেরিয়েছে বড় বড় রাস্তা। এবারে আমরা অন্য একটা রাস্তা ধরে শহর দেখতে দেখতে পৌঁছলুম নভোস্তি প্রেস এজেন্সির কার্যালয়ে।

রাশিয়ান ভাষায় হরফ অনেকগুলিই রোমান হরফের মতন হলেও উচ্চারণে প্রায় কোনও মিলই নেই। রোমান হরফ দেখা চেনা চেনা মনে হলেও রাশিয়ান ভাষা আমরা পড়তে পারি না। সেই জন্যই নভোস্তি প্রেস এজেন্সির আদ্যক্ষর এন পি এ নয়, এ পি এন। এই এ পি এন্-এর আমন্ত্রণেই আমি এদেশে অতিথি হয়ে এসেছি।

এ পি এন-এর অফিস ভবনটি প্রকাণ্ড। ঢোকার মুখে কড়া পাহারার ববস্থা। সোভিয়েত দেশ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য পরিবেশনের দায়িত্ব এই সংস্থার। সারা পৃথিবীতে রয়েছে এঁদের শাখা, বহু সাময়িক পত্র-পত্রিকা এঁরা পরিচালনা করেন।

সারগেই অনেক সিঁড়ি ঘুরিয়ে আমায় একটি প্রশস্ত কক্ষে এনে বসাল। তারপর পাশের দফতরের এক মহিলা কর্মীকে আমাদের আগমনবার্তা জানিয়ে আমার কাছে এসে বলল, এক্ষুনি যিনি আসবেন, তিনি হলেন ওর বস্। তিনি এই দফতরের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তিনি স্বয়ং আসছেন আমার সঙ্গে কথা বলতে! সারগেই-এর গলায় খানিকটা উত্তেজনার আভাস। নতুন চাকরিতে ঢুকেছে, তাই বস্ সম্পর্কে ওর বেশ একটা ভয়-ভয় সমীহের ভাব আছে বলে মনে হল।

এক মিনিট পরেই যিনি ঘরে ঢুকলেন, তিনি একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক। বেশ হাসিখুশি মুখের ভাব, তাঁকে দেখে মোটেই ভয় জাগে না। এঁর নাম সোয়ার্টস ইগর আলেকসেভিচ্, ইনি এশিয়া বিভাগের উপ-পরিচালক।

সোয়ার্টস সাহেবকে দেখে আমি সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াতেই তিনি প্রফুল্ল গলায় বললেন, বসুন, বসুন! আপনার বিমানযাত্রা ক্লান্তিকর হয়নি তো? এখানে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?

সোয়ার্টস সাহেব একাধিকবার ভারতে এসেছেন, বেশ কিছুদিন দিল্লিতে থেকে গেছেন. সুতরাং আলাপ-পরিচয়ে প্রাথমিক জড়তাটা সহজেই কাটিয়ে ওঠা গেল।

তিনি আমাকে জিগ্যেস করলেন, আপনি এ দেশে এসে কী কী দেখতে চান বলুন?

আমি বললুম, আমি প্রধানত ভ্রমণকারী, তথ্য সংগ্রাহক নই। আপনাদের দেশে এসেছি, যা যা দেখবার সুযোগ পাব তাই-ই দেখব, আলাদাভাবে কোনও বিশেষ ব্যাপারে কৌতূহল নিয়ে আসিনি।

তিনি বললেন, এক হিসেবে আপনি খুব ভালো সময়েই এসেছেন, আবার খুব খারাপ সময়েও বটে। ভালো, তার কারণ আবহাওয়া এখন চমৎকার। তবে মুশকিল হচ্ছে এখন পরপর ছুটির দিন। তাই অনেক কিছুই বন্ধ থাকবে। তবু যতটা সম্ভব বেশি কিছু দেখাবার জন্য আপনার একটি সফর পরিকল্পনা আমরা তৈরি করে রেখেছি। আপনি ইচ্ছে মতন ঘুরুন, এই সারগেই ছেলেটি আপনার সঙ্গে থাকবে, বিশেষ কিছু ইচ্ছে হলে ওকে জানাবেন। যা জানতে চান জিগ্যেস করবেন। আপনাকে কয়েকটা বইপত্র দিচ্ছি। পড়ে দেখতে পারেন—

মাঝপথে কথা থামিয়ে সোয়ার্টস জিগ্যেস করলেন, চা না কফি খাবেন? চা তো আপনাদের দেশের মতন ভালো নয়।

সকাল থেকে আমি দু-কাপ চা খেয়েছি, তাতে আমি চায়ের কোনও স্বাদই পাইনি। সুতরাং বললুম, কফি!

এ পি এন ভবন থেকে বেরিয়ে আমাদের পরবর্তী গন্তব্য মস্কো রাইটার্স ইউনিয়ান।

অনেক কিছু সম্পর্কেই আমাদের একটা পূর্ব ধারণা গড়ে ওঠে। সোভিয়েত দেশের রাইটার্স ইউনিয়ন সম্পর্কে এত বেশি প্রচার ও অপপ্রচার আগে শুনেছি বা পড়েছি যে এই প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে আমার মনে একটা ধাঁধার ভাব ছিল। সরকারি আওতায় কোনও লেখক সমিতি পরিচালনার ব্যাপারটা আমাদের ঠিক যেন মনঃপূত হয় না।

মস্কো লেখক সমিতির কার্যালয়টি কেমন হবে, সে সম্পর্কে আমার মনে আগে থেকেই একটা ছবি আঁকা ছিল। সরকারি বাড়ি, চৌকো চৌকো ঘ . শ্রীহীন দেওয়াল, নেতাদের ছবি, মস্ত বড় টেবিলের চারপাশে শক্ত শক্ত চেয়ার, সব মিলিয়ে গম্ভীর গম্ভীর ব্যাপার। কিন্তু লেখক সমিতি-তে এসে আমি অবাক হলুম। বস্তুত, মস্কোতে পৌঁছে এই প্রথম আমার একটি গভীর বিস্ময় ও আনন্দের ব্যাপার ঘটল।

বিপ্লব-পূর্বকালের কোনও এক ধনাঢ্য মহিলার বিলাস-মহলটিতেই এখন লেখক সমিতির ঘাঁটি। বাড়িটি অপূর্ব। লোহার গেট পেরিয়ে একটি প্রশস্ত চত্বর. পাশে কয়েকটি ছোট-ছোট কটেজ, তারপর সামনের প্রাসাদের মধ্যে অনেকগুলি ঘর, নানারকম গলিপথ ও সুড়ঙ্গ; যেন কোনও গুপ্তপথ দিয়ে আমরা একবার মাটির নীচে নেমে গেলুম আবার ওপরে উঠলুম। একজন মহিলার সঙ্গে আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল, তাকে খুঁজে বার করতেই খানিকটা সময় লেগে গেল। আমাদের খানিকটা দেরি হয়ে গিয়েছিল, তবু তিনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

দেখামাত্র তিনি হেসে জিগ্যেস করলেন, কেমন আছেন? আবার দেখা হল।

এঁর নাম মারিয়াম সোলগানিক, ইনি একজন নামকরা লেখিকা এবং লেখক সমিতির পরিচালকদের মধ্যে একজন, ঠিক কোন পদ অলংকৃত করেছেন তা আমার জানা হয়নি। ধারালো, ঝকঝকে পাতলা চেহারা, ইংরেজি বলেন অতি মসৃণভাবে। কিছুদিন আগেই উনি কলকাতা ঘুরে গেছেন, তখন একটি

চা-চক্রে দেখা হয়েছিল, ওঁকে আমার মনে আছে, কিন্তু আমাকেও যে উনি চিনতে পারবেন, সেটা খুব আশ্চর্য কথা!

শ্রীমতী মারিয়াম সোলগানিক বললেন, চলুন, চা খেতে-খেতে গল্প করা যাক।

সারগেই বলল, আমরা দুপুরে লাঞ্চ খাইনি, আপনাদের এখানে খাওয়াটা সেরে নিতে চাই।

শ্রীমতী মারিয়াম সোলগানিক আবার আমাদের সেই বাড়ির ভেতরকার গুপ্তপথ দিয়ে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে নিয়ে চললেন। পুরোনো আমলের বাড়িতে এইরকম পথ থাকে। উনি বললেন, আমরা আসলে পেছন দিক দিয়ে যাচ্ছি, সামনের দিক দিয়ে অনেক সহজে যাওয়া যায়।

কাঠের ফ্লোর লাগানো একটা বড় হলঘরে এসে পৌঁছলুম, যেটা নির্ঘাৎ এক সময়ে নাচ ঘর ছিল। এক পাশ দিয়ে একটা কারুকার্য করা ঘোরানো সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরের দিকে। এখানে অনেকগুলো টেবিল সাজানো, কিন্তু সবই শূন্য। দুঃখের বিষয় সেখানে আমাদের খাওয়া হল না, লাঞ্চ আওয়ার পেরিয়ে গেছে বলে সার্ভিস বন্ধ।

শ্রীমতী মারিয়াম সোলগানিক বললেন, তা হলে আর কী করা যাবে, চলুন চা-ই খাওয়া যাক।

আর একটি বড় ঘরে এসে পৌঁছলুম আমরা। এই ঘরখানিও খুব দৃষ্টিনন্দন। সমস্ত দেওয়ালে নানারকম ছবি আঁকা, অধিকাংশই কাঁচা হাতের। লেখকরা আড্ডা দিতে-দিতে যার যা খুশি দেয়ালে আঁকেন। শ্রীমতী সোলগানিক বললেন, এর মধ্যে অনেক ছবিতে উত্তর প্রত্যুত্তর আছে। অর্থাৎ একজন লেখক একটা কিছু ছবি এঁকেছেন, অন্য কোনও লেখক পাশে আর একটা ছবি এঁকে উত্তর দেন তার।

আমি জিগ্যেস করলুম, লেখকদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হয় না?

—কেন হবে না? প্রায়ই হয়। সব দেশেই লেখকরা তো একই জাতের।

—এখানে কখনও লেখকদের মধ্যে ঘুসাঘুসি হয়েছে?

উনি হেসে বললেন, না। লেখকদের মধ্যে মতবিরোধটা কাগজে-কলমে হওয়াই ভালো।

লেখক ইউনিয়ন একটি স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠান। লেনিন ঠিক করে দিয়েছিলেন যে প্রত্যেক প্রকাশক লেখকদের রয়ালটির একটা অংশ এই ইউনিয়ানকে দিতে বাধ্য থাকবে। এমন সমস্ত প্রকাশনালয়ই সরকার পরিচালিত, তারা প্রত্যেকেই টাকা দেয়। সেই টাকায় এই ইউনিয়ানের খরচ চলে। লেখকরা এখানে আড্ডা, শস্তায় খাওয়া-দাওয়া, সুরাপান ও আলাপ-আলোচনা করতে আসেন। নতুন সদস্য নেওয়ার আগে এখানকার কমিটি সেই লেখকের গুণাগুণ আলোচনা করে দেখে। চেষ্টা করেও কেউ-কেউ এখানকার সদস্য হতে পারেননি, এমন নজিরও আছে। এই লেখক সমিতির পরিচালনায় সারাদেশে আছে অনেকগুলি রাইটার্স হোম, সেগুলি সাধারণত স্বাস্থ্যকর, নিরিবিলি জায়গায়, সদস্য লেখকরা সেই সব রাইটার্স হোমে গিয়ে এক মাস দু-মাস থেকে লিখতে পারেন, নামমাত্র খরচে।

আমি জিগ্যেস করলুম, মনে করুন, কোনও একজন লেখক এই রকম একটা রাইটার্স হোমে গেল, আপনাদের খরচে থেকে এল একমাস, কিন্তু এক লাইনও লিখল না, অর্থাৎ কোনও লেখা তার মাথায় এল না, তা হলে কী হবে?

শ্রীমতী সোলগানিক বললেন, একজন লেখক লিখবেন কি লিখবেন না, সেটা তাঁর ইচ্ছে। তাতে আমাদের কী বলবার আছে?

লেখক সমিতির থেকে লেখকদের আরও নানারকম সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। তার মধ্যে একটা হল অনুবাদের ব্যবস্থা করা। অনুবাদের ব্যাপারটা সোভিয়েত দেশে একটা এলাহি কারবার।

শ্রীমতী সোলগানিক বললেন, আপনাদের ভারতবর্ষে যেমন ভাষা সমস্যা আছে, আমাদেরও সেইরকম ছিল। আমরা সেই সমস্যা সমাধান করে ফেলেছি অনুবাদের মাধ্যমে।

সোভিয়েত ইউনিয়ানে প্রধান ভাষা ৭৭টি। এই প্রত্যেকটি ভাষায়ই আলাদা সাহিত্য আছে। এই সব ভাষার উল্লেখযোগ্য লেখা অনূদিত হচ্ছে আঞ্চলিক ভাষায়, আবার রাশিয়ান ভাষায় লেখাও অনূদিত

হচ্ছে আঞ্চলিক ভাষায়। তার ফলে একজন আঞ্চলিক ভাষার লেখকও অনায়াসেই সমস্ত সোভিয়েত রাশিয়ায় পরিচিত হতে পারে। পৃথিবীর অন্যান্য ভাষা থেকেও অবিরাম অনুবাদ চলছে। অনেক আমেরিকান লেখক সোভিয়েত রাশিয়ায় বেশ জনপ্রিয়। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের এক একটি বইয়ের অনুবাদ ছাপা হয় প্রায় পাঁচ লক্ষ করে। রবীন্দ্র রচনাবলিও পাঁচ লক্ষ ছাপা হয়েছে ও অতি দ্রুত ফুরিয়ে গেছে।

বিপ্লবের আগে থেকেই জাতিগতভাবে রাশিয়ানরা দারুণ পড়ুয়া। সম্প্রতিকালের ইউনেস্কোর রিপোর্টেও প্রকাশ যে সারা পৃথিবীতে সোভিয়েত দেশের নাগরিকরাই সবচেয়ে বেশি বই পড়ে। এক হাজার জন শিক্ষিত লোকের মধ্যে ৯৯০ জনেরই বই কেনার অভ্যেস আছে।

আমি বললুম, রাশিয়ানরা খুব বেশি পড়ে তা জানতুম, কিন্তু তারা যে এত অনুবাদও পড়ে, এটা খুব আশ্চর্য ব্যাপার!

শ্রীমতী সোলগানিক আমাকে সংশোধন করে দিয়ে বললেন, রাশিয়ান নয়। বলুন সোভিয়েত পিপ্‌ল।

এ কথা ঠিক। আমরা সবসময় রাশিয়া বা রাশিয়ান বললেও সোভিয়েত ইউনিয়ানে এখন নানান জাতির সমন্বয় এবং এর সীমানাও রাশিয়াকে ছাড়িয়ে অনেকখানি। মূল রুশ ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগ দিয়েছে অন্য অনেকগুলি স্টেট, এখন মোট ১৫টি স্টেট নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ান। এমন অনেক স্টেট আছে, যেমন টাশকেন্ট কিংবা ল্যাটভিয়া, যেখানকার ভাষা ও সংস্কৃতি রুশদের থেকে অনেক আলাদা। তারা রাশিয়ান নয়, কিন্তু সোভিয়েত নাগরিক।

কিন্তু বাংলায় এখনও আমরা চলিত ভাষায় সোভিয়েত ইউনিয়ানকে রাশিয়া বলি; সোভিয়েত অধিবাসীর বদলে রাশিয়ান।

শ্রীমতী সোলগানিক মৃদু হাস্যে বললেন, মনে করবেন না যে আমাদের এখানে একবারে ব্ল্যাক মার্কেট নেই! আছে। আমাদের দেশে বই আর অপেরার টিকিটের ব্ল্যাক মার্কেট হয়।

কথাটা বলার সময় তাঁর কণ্ঠে বেশ গর্ব মিশে গেল! তা তো হওয়ারই কথা।

শ্রীমতী সোলগানিক আমাকে জিগ্যেস করলেন, কোন কোন সোভিয়েত লেখকের কথা আমি পড়েছি!

আমি লজ্জিতভাবে বললুম, প্রায় কিছুই পড়িনি।

রুশ মহৎ লেখকদের রচনা আমাদের অবশ্য পাঠ্য, টলস্টয়-ডস্টয়েভ্‌স্কি-টুর্গেনিভ-এর উপন্যাস আমরা কৈশোর বয়সে থেকে বারবার পড়েছি, গভীর মুগ্ধতা নিয়ে, পুশকিন থেকে ব্লক-মায়াকভ্‌স্কির কবিতাও পড়েছি। কিন্তু তারপর সোভিয়েত আমলের লেখকদের সম্পর্কে আমরা, অন্তত আমি, প্রায় অজ্ঞই বলা চলে। সলোকভ ছাড়া আর কোনও নামই চট করে মনে পড়ে না। তার কারণ, আমাদের মিডিয়াগুলি পশ্চিম-শাসিত। ইংরেজি ভাষার প্রতি দাসত্বের জন্য আমরা সবসময় ইংল্যান্ড-আমেরিকার মুখাপেক্ষী। টাইম-নিউজউইক যাকে বিশ্ব সংবাদ বলে সেগুলিকেই আমরা মনে করি সাম্প্রতিক বিশ্বের উল্লেখযোগ্য খবর। ওরা পাস্তেরনাক বা সোলঝেনিৎসিনকে নিয়ে শোরগোল শুরু করলে তারপর আমরা ওই লেখকদের কথা জানতে পারি এবং তাদের লেখা পড়তে আগ্রহী হই। এমনকী ইয়েভতুশেংকো ও ভজনেসেন্‌স্কির মতন আধুনিক কালের কবিদের কথাও জেনেছি ওই একই উপায়ে। ওঁদের মার্কিন দেশ সফরের সময় খুব হইচই হয়েছিল বলে। আধুনিক সোভিয়েত লেখকদের প্রতিনিধিত্বমূলক লেখার ভালো ইংরিজি অনুবাদ আমরা সরাসরি বইয়ের দোকানে পাই না। কনসুলেট থেকে মাঝে মাঝে দু-চারটি বই বাড়িতে পাই, সেগুলিকে মনে হয় প্রচারমূলক, পড়তে ইচ্ছে করে না।

এক কাপ চা আগেই ফুরিয়ে গেছে, এরপর নিলাম এক বোতল করে মিনারাল ওয়াটার। সারগেই

আমাকে বোঝাল যে এই মিনারাল ওয়াটার পেটের পক্ষে খুব ভালো। শ্রীমতী সোলগানিক বললেন, বেশি খাবেন না যেন!

আড্ডা বেশ জমে উঠেছিল। আরও অনেকক্ষণ চলতে পারত। কিন্তু শ্রীমতী সোলগানিকের অন্য কাজ আছে। তিনি বললেন, আবার পরে একদিন আসবেন, আবার গল্প হবে।

বিদায় নেওয়ার সময় তিনি জিগ্যেস করলেন, আপনাদের লেখক সমিতি সম্পর্কে কিছু জানা হল না। আপনাদের সমিতি কীভাবে চলে?

আমি বললুম, আমাদের কোনও লেখক সমিতি নেই।

তিনি অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, লেখকদের কোনওরকম ইউনিয়ান নেই?

আমাকে আবার বলতে হল, না। কোনওরকম ইউনিয়ান নেই।

বাঙালি লেখকদের কোনও ইউনিয়নের কথা আমি আগে চিন্তা করিনি। এখন মনে হল, মস্কোর মতন আমাদেরও লেখকদের একটা মিলনস্থান থাকলে বেশ হত! তাহলে মল্লিক প্যালেস কিংবা কুচবিহারের রাজার বাড়ি কিংবা ভাওয়ালের রানির বাড়ি কি সরকার আমাদের দিত? সে আশা দুরাশা! সোভিয়েত ইউনিয়ানের লেখকদের সম্মান অনেক বেশি।

গেটের বাইরে এসে আমাদের গাড়িটি খুঁজে পাওয়া গেল না। সারগেই বলল, আমি তো ভেবেছিলুম আমরা এখানে খেয়ে নেব, তাই ড্রাইভারকেও খেয়ে আসতে বলেছিলুম, সাড়ে চারটের মধ্যে ফেরার কথা। দেখি, গাড়িটা বোধহয় অন্য কোথাও রেখেছে। সুনীলজি, আপনি এই পার্কটায় ততক্ষণ বসুন।

এটাকে ঠিক পার্ক বলা যায় না, রেলিং ঘেরা খানিকটা জায়গা, কয়েকটি বেঞ্চ আর ঘাস-চটা মাটি। দুটি বাচ্চাকে নিয়ে এক বৃদ্ধা বসে আছেন একদিকে। আমি আর একটি বেঞ্চে বসলুম। বাচ্চাগুলি খেলতে-খেলতে একবার আমার কাছে চলে এল। ভাষা জানি না, তাই ওদের সঙ্গে কোনও কথা বলতে পারলুম না, কিন্তু তারা আমায় কী যেন বলছে। বৃদ্ধা দেখছেন আমাকে। মনে হয় দিদিমা এসেছেন তাঁর নাতি-নাতনি নিয়ে। তিনিও আমায় কিছু বললেন, একটি বর্ণও বুঝলুম না। হাত নেড়ে হাসিমুখে আমার অজ্ঞতার কথা জানালুম।

সেই বৃদ্ধা বাচ্চা দুটিকে ডেকে পার্ক থেকে বেরিয়ে যেতেই ঝড় উঠল। প্রথমে ধুলোর ঘূর্ণি, তারপর উড়ে এল অসংখ্য শুকনো পাতা, তারপরই বৃষ্টি।

সারগেই ছুটতে-ছুটতে ফিরে এল। তার উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা। সে বলল, গাড়িটা খুঁজে পাচ্ছি না! এদিকে বৃষ্টি এসে গেল!

বৃষ্টির ফোঁটাগুলো খুব বড়-বড়। একটুক্ষণ থাকলেই ভিজে যাব। পার্ক থেকে বেরিয়ে আমি পাশের একটা বাড়ির দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দাঁড়ালুম। অত্যন্ত শীতের দেশ বলে এসব জায়গায় প্রায় সব বাড়িতেই দুটো করে দরজা থাকে। প্রথমে একটা ভারী কাঠের দরজা। তারপর একটু ফাঁক দিয়ে একটা কাচের দরজা। আমি ওই মাঝখানের জায়গাটায় দাঁড়ালুম। কার বাড়ি জানি না। কাচের দরজা দিয়ে দেখে মনে হয় কোনও ডাক্তারের চেম্বার। কাচের দরজাটা তালাবন্ধ, ভেতরে কেউ নেই।

সারগেই আবার গাড়ি খুঁজতে গেছে। খানিকক্ষণ সেইভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর আমি আবার বাইরে বেরুতেই শীতের চাবুক খেলুম। বৃষ্টি এবং শনশনে হাওয়ায় তাপমাত্রা হঠাৎ অনেক নেমে গেছে, আমি তাড়াতাড়ি আবার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে এলুম। আমাদের দেশে এইরকমভাবে কারুর বাড়িতে ঢুকলে নিশ্চয়ই কেউ এসে কড়া গলায় বলত, কী চাই মশাই? এখানে কী করছেন? এদেশে এরকম কেউ বলে না। তবু অস্বস্তি বোধহয়।

সারগেই আবার এসে খুবই লজ্জিতভাবে কাঁচুমাচু গলায় জানাল যে গাড়িটা কোথাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ গাড়িটাকে সে এখানেই রাখতে বলেছে...।

আমি তাকে বললুম, তুমি বৃষ্টিতে ভিজছ কেন? তুমি এখানে দাঁড়াও আমার সঙ্গে। গাড়িটা এসে পড়বে নিশ্চয়ই।

সারগেই সে কথা শুনল না। বৃষ্টি মাথায় করে সে আবার ছুটে গেল। আমি শীত কাটাবার জন্য একটার পর একটা সিগারেট টানতে লাগলুম।

গাড়িটা এল প্রায় চল্লিশ মিনিট পর। সারগেই-এর এত বেশি ব্যস্ততার কারণ, কোনও একটা জায়গায় গিয়ে খোঁজ নিতে হবে যে আজ সন্ধেবেলা কোনও ব্যালে বা অপেরার থিয়েটারের টিকিট পাওয়া যাবে কি না, সেখানে পৌঁছতে দেরি হয়ে যাচ্ছে।

গাড়ি চলবার পর সারগেই বলল, ড্রাইভার দেরি করে আসার যে কারণ জানাল, তা প্রায় একটা ডিটেকটিভ বই-এর মতন!

আমি বললুম, তাই নাকি?

সারগেই বলল, ড্রাইভার খেয়ে ফিরে আসছিল... এমন সময় রাস্তায় একটা ঘটনা ঘটে। একটা চোর চুরি করে দৌড়ে পালাচ্ছিল, এমন সময় পুলিশ এই গাড়িটাকে থামিয়ে উঠে পড়ে সেই চোরটাকে ধরবার জন্য।

—তারপর চোরটা ধরা পড়েছে?

—বলছে তো ধরা পড়েছে।

ড্রাইভার ইংরেজি বোঝে না। তবু এখন সে ঘাড় ফিরিয়ে রুশ ভাষায় অনেক কিছু বলতে লাগল সারগেইকে।

সারগেই আমাকে বলল, তা হলেই বুঝতে পারছেন, সুনীলজি। আমাদের দেশেও চোর আছে!

ওর বলার ভঙ্গিতে হো-হো করে হেসে উঠলুম।

নির্দিষ্ট স্থানটিতে এ পি এন-এর একজন প্রতিনিধি তখনও অপেক্ষা করছিলেন আমাদের জন্য। ব্যালের টিকিট পাওয়া যায়নি। অপেরার টিকিট পাওয়া গেছে। তবে বলশয় থিয়েটারে নয়, ক্রেমলিন থিয়েটারে।

প্রায় সাড়ে পাঁচটা বাজে। মাঝখানে এক ঘণ্টা সময় আছে। সারগেই প্রস্তাব জানাল, এই সময়টায় আমরা কিছু খেয়ে নিতে পারি। সকালে ব্রেক ফাস্ট বেশ হেভি হয়েছিল বলে আমার তখনও খিদে পায়নি। সারগেই বলল যে, অপেরা দেখে বেরুবার পর অনেক দেরি হয়ে যাবে, তখন খাবার পাওয়া যাবে না। তাতেও আমি তখন খেতে রাজি হলুম না। পেট ভরতি থাকলে ঘোরাঘুরি করতে মন লাগে না।

হোটেলে ফিরে মুখ-হাত ধুয়ে এক পেয়ালা করে কফি খেয়ে বেরিয়ে পড়লুম দুজনে। আসলে সময় বেশি হাতে নেই। ক্রেমলিন থিয়েটার ক্রেমলিন প্রাসাদের মধ্যে, সেদিকে ঢুকতে হয় অন্য এক রাস্তা দিয়ে। এবং গেটের সামনে লম্বা লাইন। কোনওরকম হ্যান্ড-ব্যাগ বা ছাতা-টাতা নিয়ে ভেতরে ঢোকার নিয়ম নেই। সারগেই এর হাতে একটা ব্যাগ ছিল, দ্বাররক্ষী তাকে আটকাল। সেই ব্যাগটা তাকে জমা রেখে আসতে হল বেশ খানিকটা দূরে।

ক্রেমলিন এলাকার মধ্যে অনেকগুলি প্রাসাদ ও গির্জা আছে। থিয়েটার বাড়িটি নতুন। একবারে অত্যাধুনিক কায়দায় তৈরি। নতুনত্বের একটা দীপ্তি ঠিকরে বেরুচ্ছে। শ্বেত পাথরের মেঝে যেন কাচের মতন স্বচ্ছ। মার্কিন দেশে আমি অনেক বড় থিয়েটার হল দেখেছি, তবুও আমি এই থিয়েটার হলটি দেখে মুগ্ধ হলুম।

আমরা ভেতরে ঢুকে আসন খুঁজে বসবার সঙ্গে-সঙ্গে অপেরা শুরু হয়ে গেল।

॥ ৩ ॥

অপেরাটির নাম, অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, 'রাজার নব বধূ'। ষোড়শ শতকের আইভান দা টেরিব্‌ল-এর আমলের ঘটনা, একটি বিয়োগান্তক প্রণয় কাহিনী। সারগেই আমাকে সংক্ষেপে বিষয়টি বুঝিয়ে দিল, যদিও অপেরা-তে কাহিনির ভূমিকা যৎসামান্য।

আমি প্রথমেই সবিস্ময়ে লক্ষ করলুম মঞ্চসজ্জা। প্রোসেনিয়ামটি প্রকাণ্ড, ধরা যাক আমাদের রবীন্দ্র সদনের প্রায় আড়াই গুণ, মাঝে মাঝেই প্রায় শ'খানেক অভিনেতা-অভিনেত্রী এক সঙ্গে মঞ্চে থাকছেন, তবু মঞ্চটিকে ভিড়ে ভারাক্রান্ত মনে হচ্ছে না। মঞ্চের ঠিক মাঝখানে একটি মহীরুহ। অসংখ্য ডালপালা ছড়ানো আস্ত একখানা জলজ্যান্ত গাছকে কী করে মঞ্চের ওপরে স্থাপন করা গেল তা ভেবে আমি অবাক হচ্ছিলুম, তারপর খুব নজর করে বুঝলুম, গাছটি সত্যিকারের না, সিনথেটিক, অতি সূক্ষ্ম মাকড়সার জালের মতন তার দিয়ে ডালগুলো ওপর থেকে বাঁধা, তবে তা বোঝা খুবই শক্ত। মঞ্চে এত বড় গাছ আমি আগে কখনও দেখিনি।

মঞ্চের পেছনে বাঁ-দিকে একটা রাস্তা, মনে হয় অনেক দূর থেকে লোকেরা হেঁটে আসছে। মঞ্চের ডেপ্‌থ্ সত্যিই অতখানি না কোনও মায়া সৃষ্টি করা হয়েছে তা আমি ঠিক ধরতে পারলুম না।

আমরা বসেছি সামনের দিকে দামি আসনে। প্রেক্ষাগৃহটি পরিপূর্ণ। মনে হয় যেন পুরুষের চেয়ে মহিলা-দর্শকের সংখ্যা অনেক বেশি। তিন-চারজন করে মহিলা এক সঙ্গে এসে বসেছেন, সঙ্গে কোনও পুরুষ নেই। এমনকী কোনও-কোনও মহিলা একাও এসেছেন বোঝা যায়, কেন না, বিরতির সময়েও কারুর সঙ্গে কোনও কথা বলছেন না। আমাদের পাশেই বসেছেন দুই অসম বয়েসের নারী, ওঁরা এক সঙ্গে এসেছেন, খুব সম্ভবত মাসি-বোনঝির মতন সম্পর্ক। এই ব্যাপারটি একটু অভিনব লাগল, কেন-না, পশ্চিমি দেশগুলিতে দেখেছি, পুরুষ-বন্ধু বা স্বামী ছাড়া মেয়েদের একা-একা সিনেমা-থিয়েটার দেখার প্রথা নেই।

অপেরাটির নট-নটী বা গায়ক-গায়িকাদের নাম আমি জানি না, সারগেই একটা স্মারক পুস্তিকা এনে দিয়েছে বটে, কিন্তু তা সবই রুশ ভাষায় লেখা। তবে সারগেই জানাল, রানির ভূমিকায় যিনি গাইছেন, তিনি খুবই বিখ্যাত এবং এই অপেরাটি খুব জনপ্রিয়, কয়েকশো রাত চলছে।

প্রথম অঙ্কের বিরতির সময় আমি বাইরে গেলুম সিগারেট টানতে। প্যাকেটটি খোলা মাত্র একজন লোক এসে হাত বাড়িয়ে কিছু বললেন। বুঝলুম সিগারেট চাইছেন। আমি ভারতীয় সিগারেট নিয়ে গেছি, সাগ্রহে প্যাকেটটি বাড়িয়ে দিয়ে বললুম, দেখুন, আপনার ভালো লাগে কি না। ভদ্রলোক ইংরিজি জানেন না, তবে সিগারেট ধরিয়ে তিনি তাঁর মাতৃভাষায় যা বললেন, তাতে অনুমান করলুম তার পছন্দ হয়েছে।

দ্বিতীয় অঙ্কের বিরতির সময় সারগেই আমাকে নিয়ে এল দোতলায়। এখানে রয়েছে একটি ছোট রেস্তোরাঁ, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা। এখানে পাওয়া যায় কয়েক রকমের স্যান্ডউইচ আর গরম-গরম সসেজ ভাজা, বিয়ার আর ছোট-ছোট ওয়াইনের বোতল। ভাগ্যিস আগেই ডিনার খেয়ে নিইনি, তাই এখন এই হালকা ধরনের সুখাদ্য দিয়ে নৈশভোজ সেরে নেওয়া গেল।

তৃতীয় অঙ্কটি আমি আর তেমন উপভোগ করতে পারলুম না, আমার ঘুম এসে গেল। ক্রেমলিন প্রাসাদের অভ্যন্তরে সুরম্য থিয়েটার হলে বিখ্যাত রুশ অপেরা দেখতে-দেখতে ঘুমিয়ে পড়া খুবই লজ্জার কথা! এরকম সুযোগ ক'জন পায়? কিন্তু ঘুম এসে গেলে আমি কী করব? ভাষা এক বর্ণ বুঝছি না, অপেরার হাই-পিচের গান বেশিক্ষণ উপভোগ করার মতন পাশ্চাত্য সঙ্গীতের জ্ঞানও আমার নেই। ক'জন সাহেব ভীমসেন যোশীর গান ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনতে পারে? আমি থুতনিতে চিমটি কাটলুম, হাতের লোম টানলুম, বাঁ-হাতের কড়ে আঙুল বেঁকিয়ে ফেললুম, কিছুতেই কিছু হয় না। ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন, এইরকম অবস্থায় ঘুম তাড়ানো কত শক্ত। আশেপাশের লোকরা

হয়তো আমাকে দেখছে ঢুলে-ঢুলে পড়তে। শেষ পর্যন্ত মাথা হেলান দিয়ে দু-হাতের তালুতে মুখ অনেকখানি ঢেকে গভীর মনোযোগের ভঙ্গি করে রইলুম। কে জানে নাক ডেকেছিল কি না!

আশ্চর্য ব্যাপার, শো শেষ হওয়ার পর বাইরে আসতেই ঘুম একেবারে হাওয়া।

গাড়িটা আগেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, সারগেই জিগ্যেস করলো, সুনীলজি, হেঁটে যাবেন? এখান থেকে হোটেল খুব দূর নয়।

আমি তক্ষুনি রাজি। হেঁটে না ঘুরলে কোনও শহরই ভালো করে চেনা যায় না। রাত মোটে পৌনে দশটা। টিপি-টিপি বৃষ্টি পড়ছে, কিন্তু শীত খুব বেশি নয়। ওভারকোটের পকেটে দু-হাত ভরে সাহেবি কায়দায় হাঁটতে লাগলুম।

অন্যান্য পশ্চিমি বড় শহরের তুলনায় মস্কোর রাত্তিরের রাস্তার চাকচিক্য, স্বাভাবিক কারণেই, অনেক কম। রাস্তায় আলো যথেষ্ট আছে, কিন্তু প্যারিস-লন্ডন-নিউ ইয়র্কের রাস্তায় যে অসংখ্য দোকানপাট আর বিজ্ঞাপনের রঙিন ঝলমলে আলো, তা এখানে নেই। সোভিয়েত দেশে কোথাও বিজ্ঞাপন নেই, কারণ সমস্ত ব্যাবসাই এদেশে সরকার-পরিচালিত, সুতরাং পণ্যদ্রব্যের ভালো-মন্দ প্রমাণ করার বিজ্ঞাপন-প্রতিযোগিতার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

মিনিট কুড়ির মধ্যেই পৌঁছে গেলুম হোটেলে। দরজার কাছ থেকে সারগেই বিদায় নিল। তাকে যেতে হবে অনেক দূরে।

হোটেলের প্রত্যেক তলায় একজন করে মহিলা বসে থাকেন। হোটেল থেকে আমাকে একটা কার্ড দেওয়া হয়েছে, সেটা জমা দিলে ঘরের চাবি পাওয়া যায়। আমার হাতে চাবিটি তুলে দেওয়ার সময় প্রবীণ মহিলাটি মিষ্টি হেসে কত কী বললেন, হায়, কিছুই বুঝতে পারলুম না। আমি ঘাড় নেড়ে বললুম, পাসিবো, পাসিবো, অর্থাৎ ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।

ঘরে এসে জামা-কাপড় ছাড়ার পর বেশ চাঞ্চল্য বোধ করলুম। এত তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ব? মাত্র রাত দশটায় ঘুমোনো আমার পক্ষে অসম্ভব। অপেরা দেখতে-দেখতে যে ঘুম ভর করেছিল, তা একেবারে উপে গেছে! বাইরের আকাশ পুরোপুরি অন্ধকার নয়। এখন আড্ডা মারতে ইচ্ছে করছে। ঘরে একটা টেলিফোন আছে, তারও তো ব্যবহার করা দরকার। দেশ থেকে মণীন্দ্র রায় লিখে দিয়েছেন ননী ভৌমিকের ঠিকানা। কিন্তু ফোন নাম্বার দেননি। নবনীতা দেবসেন তাঁর এক বান্ধবীর জন্য একটি উপহারের পুঁটুলি পাঠিয়ে দিয়েছেন, সঙ্গে আছে সেই বান্ধবীর ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার। বান্ধবীর নাম সায়েলা।

অপারেটরকে প্রথমে জিগ্যেস করলুম, তিনি আমাকে ননী ভৌমিকের ফোন নাম্বার জোগাড় করে দিতে পারেন কি না। তিনি বোধহয় আমার ইংরেজি বুঝতে পারলেন না। তারপর আমি সায়েলার টেলিফোন নাম্বার দিয়ে লাইন ধরে দিতে বললুম।

ওপাশে শোনা গেল একটি পুরুষকণ্ঠ। তিনি বললেন যে সায়েলা এখন একটু ব্যস্ত আছেন, তাঁর সঙ্গে আমার কী দরকার এবং আমি কে?

সায়েলা-কে আমি কখনও চোখে দেখিনি, শুধু এইটুকু জানি, তিনি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রবীণ নেতা শ্রীপাদ অমৃতপাদ ডাঙ্গে-র কন্যা। আমি পুরুষকণ্ঠটিকে নবনীতা দেবসেন-এর উপহার বিষয়ে জানালুম। তিনি প্রথমে একটুক্ষণ নবনীতা দেবসেন কে তা চিনতে পারলেন না। আমি নানারকম উচ্চারণে নব্‌নীটা, নবওনী-ই-টা এইরকমভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলুম। তাতে বিশেষ কিছু সুবিধে হল না। আমি কালই লেনিনগ্রাড চলে যাব, ফিরব দশদিন বাদে, সুতরাং উপহারটা কাল সকালের মধ্যেই পৌঁছে দিলে আমার পক্ষে সুবিধে হয়। তখন তিনি বললেন যে তাঁর বাড়ি আমার হোটেলের খুবই কাছে, এই রাত্তিরেই তিনি এলে আমার কোনও আপত্তি আছে কি না।

আমি শুনে উৎফুল্ল হলুম। যাক তবু একজনের সঙ্গে গল্প করা যাবে।

মিনিট দশেকের মধ্যেই তিনি পৌঁছে গেলেন, পুরোদস্তুর সায়েবি কেতায় সজ্জিত একজন মধ্যবয়স্ক

ব্যক্তি। তাঁর নাম রাজা আলি। তিনি বললেন যে তাঁর স্ত্রী নবনীতা দেবসেনকে খুব ভালোই চেনেন, তিনিও এখন মনে করতে পেরেছেন, নবনীতা এই তো কিছুদিন আগে মস্কো ঘুরে গেলেন।

পুঁটুলিটি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে আমি জিগ্যেস করলুম, আপনি এদেশে কতদিন আছেন?

তিনি আঠারো... কুড়ি বছর, কী জানি, আই লস্ট কাউন্ট!

কিন্তু রাজা আলির সঙ্গে আমার আড্ডা জমল না। তিনি গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, আমিও তেমন তুখোড় কথাবাজ নই। তিনি একবার শুধু জিগ্যেস করলেন, আমি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে চিনি কি না। তারপর চুপ। আমি কোনও প্রশ্ন করলে উনি মনোসিলেবলে উত্তর দেন। কিন্তু আমি তো ওঁর ইন্টারভিউ নিতে আসিনি। তা ছাড়া ডাঙ্গে সাহেবের জামাই-কে ঠিক কী কী প্রশ্ন করা যায়, তাও মনে এল না। সুতরাং উনি নিঃশব্দে বসে পাইপ টানতে লাগলেন, আমি টেবিলের কাচটি দেখতে লাগলুম গভীর মনোযোগ দিয়ে।

এক সময় উনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আচ্ছা, এবার আমি চলি।

আমি বললুম, শুভ রাত্রি।

হোটেলের অত কাছে ওঁদের বাড়ি অথচ আমাকে একবার চা খাওয়ারও নেমন্তন্ন করলেন না। এটা একটু অস্বাভাবিক, সাধারণত সবাই বলেন। অবশ্য রাজা আলি কুড়ি বছর ধরে মস্কোতে কী করেন তাও আমার জানা হয়নি।

তারপর বিছানায় শুয়েও আর ঘুম আসে না। আলো নিভিয়ে ছটফট করতে লাগলুম। ঘুম না-আসার একটা কারণ হল বালিশ। এমন পেল্লায় বালিশ আমি জীবনে দেখিনি। আমাদের সাধারণ ব্যবহার্য বালিশ তিনখানা জোড়া দিলে যা হয়। যেমন মোটা, তেমনি চওড়া। এ শুধু মাথায় দেওয়ার বালিশ নয়, কাঁধ পর্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে। বালিশ বাদ দিয়ে শুলেও ফাঁকাফাঁকা লাগে। চোখ মেলে রেখে অনুভব করতে লাগলুম, পৃথিবীর ঘূর্ণন, রাত্রি গড়িয়ে যাচ্ছে গভীরতর রাত্তিরের দিকে।

শেষ রাতে নিশ্চয়ই ঘুম এসেছিল, তবু জেগে উঠলুম বেশ সকাল সকাল। উঠেই চায়ের অভাব বোধ করলুম। আমরা সবাই অভ্যেসের দাস, ঘুম থেকে উঠেই এক কাপ চা না পেলে সারাদিনের জীবনযাত্রা শুরু করতে পারি না। চা পাব কোথায়? আমার কাছে এক কোপেকও নেই। যখন যা দরকার তা সারগেই কিনে দিচ্ছে। এ দেশের হোটেলে রুম সার্ভিসের ব্যবস্থা আছে কি না জানি না। নিজের ইচ্ছে মতন হোটেল থেকে কিছু কিনে তারপর বিলে সই করার অধিকার আমার আছে কি না তা-ই বা কে জানে!

সেরকম স্মার্ট লোক হলে নিশ্চয়ই হোটেলের রিসেপশানে ফোন করে একটা কিছু ব্যবস্থা করে ফেলত। কিন্তু আমি এসব ব্যাপারে একেবারেই তৎপর নই। মুখটুখ ধুয়ে একখানা বই হাতে করে সারগেই-এর প্রতীক্ষা করতে লাগলুম।

ন'টা আন্দাজ দরজায় করাঘাত। দরজা খুলেই দেখি তিন বঙ্গীয় যুবক-যুবতী। এদের মধ্যে একজন আমার সেই বিমানযাত্রার সঙ্গী সুবোধ রায়, অন্য দুজনের নাম সুজিত বসু ও সঙ্ঘমিত্রা দাশগুপ্ত। আমি একলা রয়েছি বলে ওরা সঙ্গ দিতে এসেছে।

সুবোধ জিগ্যেস করল, আপনার ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয়েছে?

আমি বললুম, ব্রেকফাস্টের জন্য ব্যস্ততা নেই, তবে এক কাপ চা জোগাড় করতে পারলে মন্দ হত না।

সুবোধ শুধু যে খুব বিদ্বান তাই-ই নয়, তার ব্যবহারও খুব ব্যক্তিত্বপূর্ণ। সে বলল, শুধু চা কেন, এই ঘরে বসেই আমরা ব্রেকফাস্ট খাব, আমরাও খেয়ে আসিনি। হাঁকডাক দিয়ে তক্ষুনি সেসব ব্যবস্থা করে ফেলল। এক গাদা হ্যামবার্গার ও স্যান্ডউইচ এবং চায়ের অর্ডার দেওয়ার পর দ্বিতীয় চিন্তায় সে আবার বলল, আপনি রাশিয়ান শ্যাম্পেন খাননি তো? এক বোতল শ্যাম্পেনেরও অর্ডার দেওয়া যাক।

সকাল বেলাতে শ্যাম্পেন? আমি ক্ষীণ আপত্তি জানালেও সুবোধ পাত্তাই দিল না।

সুজিত বসু কবিতা লেখে এবং ফিজিক্সে পি-এইচ ডি করছে। সঙ্ঘমিত্রাও পি-এইচ ডি করছে সাইকোলজিতে, সাহিত্য খুব ভালোবাসে। লাজুকতা ভাঙতে একটু সময় লাগল। তারপরেই আড্ডা জমে গেল।

শ্যাম্পেনের বোতল খোলার কায়দাটা রপ্ত করতে হয়। আনাড়ি হাতে ছুটন্ত ছিপি জানলার কাচ ভাঙতে পারে, কারুর চোখেটোখে লাগলে গুরুতর ক্ষতিও হয়ে যেতে পারে। সুতরাং শ্যাম্পেনের বোতল খোলার সম্মান ওরা আমাকে দিতে চাইলেও আমি তা প্রত্যাখ্যান করলুম। সুবোধ নিজেই খুলল খুব সাবলীলভাবে। সকালবেলা চা-পানের আগেই সুরার গেলাসে চুমুক দেওয়ার অভিজ্ঞতা আমার জীবনে এই প্রথম।

আমাদের খাওয়াদাওয়ার মধ্য পথে সারগেই এসে হাজির। আমি তখনই বাইরে বেরুবার পোশাক পরে প্রস্তুত হয়ে নেই দেখে সারগেই বেশ ব্যস্তভাবে বলল, এ কী! আপনি এখনও তৈরি হননি? আমাদের যে সাড়ে দশটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে!

সুবোধ আড্ডার মেজাজে বলল, বসুন, বসুন, সাড়ে দশটার এখন অনেক দেরি।

সুবোধ, সুজিত, সঙ্ঘমিত্রা তিনজনই রুশ ভাষা বেশ ভালো জানে। আমাদের ক্রেমলিন যেতে হবে শুনে ওরা বলল, সে তো গাড়িতে মাত্র আট-দশ মিনিটের রাস্তা। মস্কোতে ট্রাফিক জ্যাম প্রায় হয় না বললেই চলে, সুতরাং ব্যস্ত হওয়ার কী আছে?

সারগেই তবু ছটফট করতে লাগল। অতএব আমি তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে নিয়ে কোট-প্যান্টালুন পরে নিলুম। সারগেই-এর আপত্তি সত্ত্বেও খাদ্য-পানীয়র সব দাম মিটিয়ে দিল সুবোধ। লেনিনগ্রাড থেকে ফিরে ওদের সঙ্গে আবার দেখা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম আমরা দুজনে।

আজ অন্য গাড়ি, যিনি চালাচ্ছেন, তাঁর ফরসা, গোলগাল হাসি-খুশি চেহারা, অনেকটা অভিনেতা পিটার উস্তিনভের মতন। সারগেই এঁর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিল, ইনি এক বর্ণ ইংরেজি জানেন না, করমর্দনের পর আমাকে একটি রুশ সিগারেট দিলেন, বিনিময়ে আমিও উপহার দিলুম এক প্যাকেট ভারতীয় সিগারেট।

গাড়ি চলতে শুরু করার পর সারগেই আমাকে জিগ্যেস করল, সুনীলজি, কাল রাত্তিরে কোনও অসুবিধে হয়নি তো? ভালো ঘুম হয়েছিল তো?

আমি মজা করার জন্য বললুম, কাল রাত্তিরে আমার ঘরে একজন অতিথি এসেছিল।

সারগেই রীতিমতন চমকে গেল। জিগ্যেস করল, অতিথি এসেছিল, আপনার হোটেলের ঘরে? কী করে এল?

আমি বললুম, সম্ভবত হেঁটেই এসেছিল।

—আপনার চেনা কেউ?

—না। জীবনে আগে কখনও দেখিনি।

—সে কি? কে এসেছিল? কেন এসেছিল?

তখন আমি হাসতে-হাসতে পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলুম। ভারতীয় কমিউনিস্ট নেতা এস এ ডাঙ্গের নাম সারগেই শুনেছে।

আমরা আজ ক্রেমলিনের প্রধান প্রবেশ পথের বাইরে একটা শিকল-ঘেরা জায়গায় এসে দাঁড়ালুম। এখানে খুব কড়া সিকিউরিটি ব্যবস্থা। এর ভেতরেই সোভিয়েত সরকারি দফতর। এখানে দাঁড়িয়েই ১৯১৮ সালের ১২ মার্চ লেনিন মস্কোকে বিশ্বের প্রথম শ্রমিক- কৃষক রাষ্ট্রের রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন।

ঠিক সাড়ে দশটায় ভেতর থেকে দুজন লোক বেরিয়ে এসে আঙুলের ইশারায় আমাদের ডাকল। সারগেই বলল, দেখলেন তো, সুনীলজি, ঠিক ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে সাড়ে দশটায় আমাদের ডাকা

হল। এক মিনিট দেরি হলে ওঁরা ফিরে যেতেন, আমাদের আর ঢোকা হত না। সেই জন্যই আমি আপনাকে তাড়া দিচ্ছিলুম।

সিকিউরিটির দুই ব্যক্তি আমাদের নিয়ে চলল ভেতরে। আমরা যাচ্ছি লেনিনের বাসভবন দেখতে। বিপ্লবের আগে দুশো বছর অবশ্য মস্কো রাশিয়ার রাজধানী ছিল না, তাহলেও ক্রেমলিনের প্রাসাদই ছিল চিরকাল রাজ-ক্ষমতার প্রতীক। এই প্রাসাদের একটি অংশে লেনিন তাঁর এক বোন ও স্ত্রী স্ক্রুপকায়াকে নিয়ে থাকতেন।

লেনিনের জীবনযাত্রা ছিল সাদামাটা। তাঁর ব্যবহৃত থালা-বাসন, পোশাক-পরিচ্ছদ, চেয়ার-টেবিল সবই অবিকল রাখা আছে। রয়েছে লেনিনের পুস্তক-সংগ্রহ। রান্নাঘর ও শয়নকক্ষ ছাড়া বসবার ঘর তিনখানি। লেনিনের লেখার টেবিলের ওপর রয়েছে একটি মূর্তি, এটি তাঁর খুব প্রিয় ছিল। ডারউইন সাহেবের ইভোলিউশান তত্ত্ব বিষয়ক বইয়ের ওপর বসে আছে একটি বাঁদর, তাঁর হাতে একটি মানুষের মাথার খুলি, বাঁদরটি খুব চিন্তিতভাবে সেদিকে চেয়ে আছে।

লেনিনের বাসস্থানে ঘুরতে-ঘুরতে আমার একটা ঘটনা মনে পড়ায় দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। প্রখ্যাত ইংরেজ লেখক এইচ জি ওয়েল্স এইখানে এসেছিলেন লেনিনের সঙ্গে দেখা করতে। লেনিন তাঁকে বুঝিয়েছিলেন যে যুদ্ধবিধ্বস্ত সোভিয়েত দেশের দ্রুত উন্নতি ঘটাবার একমাত্র উপায় সারা দেশে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া। GOELRO নামে যে বিদ্যুৎ পরিকল্পনা হয়েছিল তার লক্ষ্য ছিল বিদ্যুতের উৎপাদন আগামী দশ বছরের মধ্যে দশ গুণ বাড়িয়ে ফেলা, বড়-বড় নদীগুলোর ওপর নতুন তিরিশটি পাওয়ার স্টেশন স্থাপন করা।

লেনিনের এই পরিকল্পনাকে এইচ জি ওয়েল্সের মনে হয়েছিল অসম্ভব; তিনি লেনিনকে আখ্যা দিয়েছিলেন, "দা ড্রিমার ইন দা ক্রেমলিন"। লেনিনের স্বপ্ন কিন্তু সফল হয়েছিল। বলশয় থিয়েটারে এক সভায় তিনি বলেছিলেন, "কমিউনিজম্ ইজ সোভিয়েট পাওয়ার প্লাস দা ইলেকট্রিফিকেশন অফ দা হোল কান্ট্রি।" হায়, আমাদের পশ্চিমবাংলা তথা ভারতবর্ষে বিদ্যুতের কী অবস্থা! উৎপাদন বৃদ্ধির বদলে ক্রমশই আরও কমে যাচ্ছে।

ক্রেমলিন প্রাসাদের এই অংশে যখন লেনিন বাস করতে আসেন, তখনই তার স্বাস্থ্য ভালো নয়। ১৯১৮ সালে তাকে মেরে ফেলার একটা চেষ্টা হয়েছিল, সেই আঘাত পুরোপুরি সারেনি। তাই নিয়েই তিনি নতুন রাষ্ট্র গড়ার প্রচণ্ড পরিশ্রম করতেন, তার ফলে বিপ্লবের পর ছ'বছরের মধ্যেই তিনি মারা যান।

ক্রেমলিন থেকে বেরিয়ে আমরা গেলুম মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন ছুটি, তাই ভেতরে যাওয়া হল না। গাড়িতে চার দিকটা একটা চক্কর দিয়ে এলুম। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ভবনটি বিশাল ও সুদৃশ্য, আধুনিক স্থাপত্যের একটা উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে যেসব রাস্তা, তাতে রয়েছে সার-সার আপেল গাছ, এখন ছোট-ছোট আপেল ফলে আছে। আমাদের স্কুল-কলেজগুলোর পাশে অন্তত পেয়ারা গাছ লাগাবার কথাও কেউ চিন্তা করে না কেন?

বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাটি সুবিশাল। সামনে মস্ত বড় চত্বর। তার পরে মস্কোভা নদী। অনেকগুলি টুরিস্ট বাস এসেছে, অর্থাৎ মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ও রীতিমতন একটি দ্রষ্টব্য ব্যাপার।

আমরা নদীর ধারে এসে দাঁড়ালুম। এই জায়গাটি বেশ উঁচু, এখান থেকে মস্কো শহর অনেকখানি দেখা যায়। নদীর পার ঢালু হয়ে অনেকখানি নেমে গেছে, মাঝে-মাঝে বেশ জঙ্গলের মতন। স্বাস্থ্য-উন্নতিকামীরা অনেকে সেখানে গেঞ্জি-জাঙ্গিয়া পরে দৌড়চ্ছে। কয়েক জোড়া নব-বিবাহিত দম্পতিকে দেখলুম, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নিয়ে এসেছে। আবহাওয়া ভালো বলে বোধহয় এখন বিয়ের ধুম পড়ে গেছে। বরযাত্রীরা এখানে সঙ্গে করে এনেছে শ্যাম্পেনের বোতল, গেলাস ছাড়াই সবাই বোতল থেকে চুমুক দিচ্ছে। এরই মধ্যে দু-এক জনের অবস্থা বেশ টলটলায়মান মতন মনে হল।

নদীর ধার দিয়ে হাঁটলুম খানিকক্ষণ। এক সময়ে চোখে পড়ল একটি ছোট, পরিত্যক্ত গির্জা। গেটে তালা বন্ধ, বোঝা যায়, বহুদিন অব্যবহৃত।

আরও একটু বেড়াবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সময় নেই। লেনিনগ্রাডের প্লেন ধরতে হবে।

হোটেলে ফিরে এসে আমরা লাঞ্চ সেরে নিলুম। সারগেই নিজে ইউক্রাইনের ছেলে। ও বলল, সুনীলজি, আপনি ইউক্রাইনিয়ান বর্স খেয়েছেন? খেয়ে দেখবেন?

আমি সবরকম খাবারই চেখে দেখতে রাজি। বেশ একখানা বড় জামবাটি ভরতি সুপ এল, তার মধ্যে নানারকম মাংসের টুকরো ও সবজি। এইরকম একটু সুপ খেলেই পেট ভরে যায়।

খাওয়া সেরেই সুটকেস নিয়ে ছুট দিলুম এয়ারপোর্টের দিকে। এটা ইন্টারনাল এয়ারপোর্ট। ছুটির মরশুম বলে প্রচণ্ড ভিড়। মস্কো ছেড়ে অনেকেই এখন বেড়াতে যাচ্ছে। সারগেই এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে আমাকে ভি আই পি লাউঞ্জে নিয়ে গিয়ে বসাল। সেখানে মাত্র আমরা দুজন। এরকম জায়গায় বসতে কীরকম অস্বস্তি লাগে!

আরও খাতির করে আমাদের দুজনকেই প্রথমে তোলা হল বিমানে। আমার সুটকেসটা বুক না করিয়ে রেখে দেওয়া হল এয়ার হোস্টেসদের হেপাজতে, যাতে পৌঁছবার পর মাল খালাসের জন্য অপেক্ষা করতে না হয়। সিকিউরিটি চেকের সময় একটা বেশ মজা হল। পৃথিবীর সব বিমান বন্দরেই আজকাল এই ব্যবস্থা আছে। একটা মেটাল ডেটেকটার যন্ত্র সারা গায়ে বুলোয় অথবা একটা জায়গা পার হয়ে যেতে হয়, সন্দেহজনক কিছু থাকলে প্যাঁক-প্যাঁক শব্দ হতে থাকে। একজন মহিলা এখানে সিকিউরিটি চেক করছেন। আমার গায়ে যন্ত্রটা ছোঁয়াতেই প্যাঁক-প্যাঁক শব্দ করে উঠল। পকেটে খুচরো পয়সা কিংবা কোমরের বেল্টের মুখটার জন্যও অনেক সময় এই শব্দ হয়। আমার পকেটে পয়সা নেই, বেল্টটা খুলে ফেললুম, তবু যন্ত্রটা ছোঁয়াতেই আবার সেই শব্দ। আমি গায়ের কোটটা খুলে ফেললুম, তবুও শব্দ থামে না। এবারে মহিলাটি হাত দিয়ে আমার গা টিপেটুপে দেখলেন, সন্দেহজনক কিছু নেই। তবে কি যন্ত্রটা খারাপ হয়ে গেল? তিনি নিজের গায়ে যন্ত্রটা বোলালেন, কোনও শব্দ নেই, সারগেই-এর শরীরে বোলালেন, তখনও নিঃশব্দ। কিন্তু আমার গায়ে ছোঁয়াতেই আবার বেশ জোরে প্যাঁক-প্যাঁক করে ডাকতে লাগল।

একে কী বলা যায়, যন্ত্রের কৌতুক ছাড়া?

॥ ৪ ॥

মস্কো থেকে লেনিনগ্রাড দু-ঘণ্টার বিমান পথ। ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে এসে দেখলুম লবিতে প্রচণ্ড ভিড়, নানারকম ভাষায় কলস্বর। আমাদের জন্য দুটি ঘর অবশ্য আগে থেকেই বুক করা ছিল, ভিড় ঠেলে কাউন্টারে পৌঁছতেই ব্যবস্থা হয়ে গেল।

বিখ্যাত নেভা নদীর ধারেই এই হোটেল লেনিনগ্রাড। খুবই বড় হোটেল এবং অত্যাধুনিক কায়দার। অর্থাৎ সবকিছুই চৌকো কিংবা রেক্টানগুলার। গত শতাব্দী পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় সব দেশেরই স্থাপত্যে গম্বুজ, খিলান, গোল গোল থাম দেখা যেত, আধুনিক স্থাপত্যে এসবের কোনও স্থান নেই। মস্কোর হোটেলটিতে তবু খনিকটা পুরোনো-পুরোনো ভাব ছিল. কিন্তু এই হোটেলটি একেবারে ঝকঝকে সাম্প্রতিক ধরনের। এখানকার লিফটগুলি স্বয়ংক্রিয়।

আট তলার ওপর সারগেই আর আমি পাশাপাশি দুটো ঘর পেয়েছি। সামনের জানলাটার পরদা সরাতেই অপূর্ব দৃশ্য। নেভা নদীর দু-পাশে সুন্দর গড়নের সব প্রাসাদের সারি। দূরে-দূরে দেখা যায় গির্জার চূড়া! নেভা নদী বেশ প্রশস্ত, অনায়াসেই জাহাজ যেতে পারে। এখান থেকে সমুদ্র বেশি দূরে নয়।

নিজের ঘরে জিনিসপত্র রেখে এসে সারগেই আমাকে জিগ্যেস করল, সুনীলজি, ক্লান্ত?

মাত্র দু-ঘণ্টা প্লেন জার্নিতে ক্লান্ত হব কেন? তা ছাড়া শীতের দেশে এমনিতেই ক্লান্তি বোধ কম হয়।

আমি বললুম, না, না, চলো, বেরুবে নাকি?

সারগেই বলল, আমি লেনিনগ্রাডে আগে আসিনি। চলুন, খানিকটা হেঁটে শহরটাকে অনুভব করে আসি।

পোশাক না বদলেই বেরিয়ে পড়লুম। হোটেলের গেটের সামনে ভিড় আরও বেড়েছে। অনেকেই বোধহয় জায়গা পায়নি। আগামীকাল মে-দিবসের মিছিল দেখবার জন্যই বাইরে থেকে বহু টুরিস্ট আসছে।

নেভা নদীর ধার দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে একটা ছোট ব্রিজ পেরিয়ে এলুম। এই শহরের মধ্যে দিয়ে অনেকগুলি খাল এসে নেভা নদীতে পড়েছে। আমাদের হোটেলটি সেরকম একটি মোহানার কাছেই। বিশাল বিশাল বারোক স্টাইলের অট্টালিকা দেখলেই বোঝা যায়, এগুলি জার-এর আমলে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বাড়ি ছিল, এখন বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়।

লেনিনগ্রাডের ইতিহাস আমরা সবাই কিছু-কিছু জানি। এই শহরের বয়েস কলকাতার চেয়েও কিছু কম। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পিটার দা গ্রেট এখানে এই বন্দর-শহরটির পত্তন করে রুশ সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন। তখন এর নাম ছিল সেন্ট পিটার্সবার্গ। সুপরিকল্পিতভাবে অভিজাতদের জন্যই গড়া হয়েছিল নগরীটি। ডেকে আনা হয়েছিল ইউরোপের বিখ্যাত স্থপতিদের। চওড়া চওড়া রাস্তা, বড়-বড় পার্ক ঘিরে জমকালো সব বাড়ি। মাঝে-মাঝে খাল কেটে জলপথেরও ব্যবস্থা। এই শহরের পথে-পথে ঘুরে বেড়ালে চোখের আরাম হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় এই শহরটির নাম পালটে যায়। সেন্ট পিটার্সবার্গের বার্গ অংশটুকু জার্মান ভাষা, তার মানে দুর্গ। সুতরাং এ শহরের নতুন নাম হল পেট্রোগ্রাড। বিপ্লবের প্রধান কেন্দ্রও ছিল এই শহর। ১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যুর পর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য পেট্রোগ্রাড নাম আবার বদল করা হয়।

হাঁটতে বেশ ভালোই লাগছে, শীত বেশি নেই। এইসব শীতের দেশে সন্ধ্যাগুলো খুব লম্বা হয়। এখন সাড়ে সাতটা বাজে, কলকাতায় এখন রীতিমতন অন্ধকার, লোডশেডিং হলে তো কথাই নেই, আর এখানে বেশ পরিষ্কার আলো। এইরকমই চলবে প্রায় ন'টা পর্যন্ত।

মোহানার মুখে একটা থেমে-থাকা জাহাজ দেখিয়ে সারগেই জিগ্যেস করল, সুনীলজি, এই জাহাজটার কথা জানেন? এই হচ্ছে বিখ্যাত অরোরা।

আমি ব্যাট্‌লশিপ পোটেমকিনের কথা জানি, অরোরার নাম আগে শুনিনি।

সারগেই জানাল যে, এই অরোরা থেকেই বিপ্লবের সংকেত দিয়ে প্রথম তোপধ্বনি হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের সব স্কুলের ছেলে-মেয়েরাও এর নাম জানে। এখন জাহাজটিকে একটি মিউজিয়াম হিসেবে এখানে রাখা হয়েছে। যে-কেউ ভেতরে ঢুকে দেখতে পারে। তবে পাঁচটার মধ্যে আসতে হবে।

আমি সারগেইকে সামনে দাঁড় করিয়ে অরোরার একটি ছবি তুললুম। তারপর আর একটু বেড়িয়ে ফিরে এলুম হোটেলে। সারগেইকে এখন কিছু ফোনটোন করতে হবে। এখানকার এ পি এন অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করা, কাল সকালে মে-দিবস প্যারেড দেখতে যাওয়ার জন্য ট্যাক্সি ঠিক করা ইত্যাদির ব্যবস্থা করবার জন্য সে চলে গেল। আমি জানলার কাছে চেয়ার টেনে বসে রইলুম চুপচাপ। নদীতীরের বাড়িগুলিতে আস্তে আস্তে ফুটে উঠছে আলোকসজ্জা।

হঠাৎ এক সময় আমার শরীরে রোমাঞ্চ হল। এই সেই সেন্ট পিটাসবার্গ, এখানকার রাস্তা দিয়ে ডস্টয়েভ্‌স্কি হেঁটেছেন! নিকোলাই গোগোল এখানে ইতিহাসের মাস্টারি করতে-করতে একদিন বুঝেছিলেন, সাহিত্যই তাঁর মুক্তির পথ; পুশকিন লিখেছিলেন তাঁর প্রথম উপন্যাস, একটি নিগ্রোকে

নিয়ে। সাহিত্য জগতের বিশাল বিশাল বনস্পতিদের স্মৃতিজড়িত সেই শহরে আমি বসে আছি?

অনেকক্ষণ বসে রইলুম জানলার ধারে। যেন একটা ঘোরের মধ্যে। খানিকবাদে ফিরে এল সারগেই। কাঁচুমাচু মুখে জানাল, ট্যাক্সি জোগাড় করা গেল না কিছুতেই। কাল মে ডে'র প্যারেডের জন্য অনেক রাস্তাতেই ট্রাফিক বন্ধ থাকবে, কোনও ট্যাক্সিই উইনটার প্যালেসে পৌঁছতে পারবে না। সুনীলজি, আপনি হেঁটে যেতে পারবেন তো?

সারগেই-এর মুখে সুনীলজি ডাক শুনে প্রত্যেকবারই আমার মজা লাগে। বাঙালিদের মধ্যে জি ব্যবহার করার রেওয়াজ নেই। উত্তর ভারত ও পশ্চিম ভারতে ওই ডাক চলে। আমি অবশ্য সারগেইকে নিরস্ত করি না। ওর মুখে ওই ডাক বেশ মিষ্টি লাগে, আমার এক মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুর কথা মনে পড়ে।

হোটেল লেনিনগ্রাডের বিভিন্ন তলায় টুরিস্টদের মনোরঞ্জনের জন্য নানা ধরনের রেস্তোরাঁ আছে। তার মধ্যে দু-একটিতে গান-বাজনা, নাচেরও ব্যবস্থা রয়েছে, আমরা ঘুরে ঘুরে সব ক'টি দেখে নিয়ে মাঝারি ধরনের একটিতে নৈশভোজ সেরে নিলুম।

আমার দরজার কাছে এসে যখন শুভরাত্রি বলে বিদায় নিতে গেল সারগেই, আমি ওর দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললুম, আমায় কিছু পয়সা দেবে?

সারগেই অবাক।

আমি হাসতে-হাসতে বললুম, সকালবেলা তোমার আগেই যদি আমাব ঘুম ভাঙে তাহলে আমি এক কাপ চা কিনে খেতে চাই!

সারগেই ব্যস্ত হয়ে বললেন, আপনার যখনই দরকার হবে আমাকে ডাকবেন। এমনকী মাঝরাত্তিরেও দরকার হলে ডাকবেন বিনাদ্বিধায়।

তবু আমি নাছোড়বান্দার মতন ওর কাছ থেকে এক রুবল্ আদায় করলুম।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে আমার সহজে ঘুম এল না। কাল রাতে মস্কো ছিল নতুন জায়গা, আজ আবার নতুন জায়গায় এসেছি, বিছানার সঙ্গে দু-এক রাত্তির ভাব না জমলে ভালো ঘুম হয় না। আমার এই ঘরটি ডাব্‌ল বেড। ঘরের দুপাশে দুটি বিছানা পাতা। আমি একবার এক বিছানায় আর একবার অন্য বিছানায় শুতে লাগলুম। যেন আমি একাই দুজন মানুষ।

কাচের জানালায় পরদা টানিনি বলে ভোরের প্রথম আলো চোখে পড়ামাত্র ঘুম ভেঙে গেল। ঘড়িতে অবশ্য খুব ভোর নয়, পৌনে আটটা বাজে, কিন্তু বাইরে আবছা আবছা অন্ধকার রয়েছে এখনও। পাজামা-পাঞ্জাবি আর চটি পরেই বেরিয়ে এলুম ঘরের বাইরে। আমাদের ফ্লোরের এক প্রান্তে একটি ছোট রেস্তোরাঁ আগেই দেখে রেখেছিলুম, সেখানে এসে দেখলুম, সেটি সদ্য খুলেছে, একজন বৃদ্ধা বসে আছেন কাউন্টারে। আমিই প্রথম খদ্দের।

বৃদ্ধা মহিলা হেসে রাশিয়ান ভাষায় আমায় সুপ্রভাত জানালেন, আমি জানালুম ইংরেজিতে। প্রথমে এক কাপ চা নিলুম, তার স্বাদ আমার মনঃপূত হল না, তারপর এক কাপ কফি নিয়ে স্বাদটা বেশ ভালো লাগল।

ফিরে এসে দিনের প্রথম সিগারেটটি উপভোগ করার পর বেজে উঠল টেলিফোন। সারগেই বলল, সুনীলজি, এবার বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ুন, আমাদের সাড়ে আটটার মধ্যেই বেরিয়ে পড়তে হবে। ব্রেকফাস্ট বাইরে কোথাও খেয়ে নেব।

আমি বললুম, আমি তো তৈরি!

আজ আকাশ সামান্য মেঘলা। গরম জলে স্নান সেরে নেওয়ার ফলে শরীরটা বেশ তরতাজা লাগছে। এখন আমি পাঁচ-দশ মাইল অনায়াসে হেঁটে যেতে পারি।

নেভা নদী পার হওয়ার সময় ব্রিজের মাঝখানে একবার দাঁড়ালুম। যে-কোনও নতুন নদী প্রথমবার পার হওয়ার সময় বেশ কিছুক্ষণ নদীর সৌন্দর্য না দেখে আমার যেতে ইচ্ছে করে না। তাড়াহুড়ো

করে, অন্যমনস্কভাবে কোনও নদী পার হওয়া উচিত নয়। সমস্ত জলেরই চরিত্র আলাদা।

আমরা ছেলেবেলায় ভূগোলে পড়েছিলুম যে এই নেভা নদীর জল বছরে চার-পাঁচ মাস জমাট বরফ হয়ে থাকে। নদীর মোহানাতেও এত বরফ জমে যে জাহাজ ঢুকতে পারে না। এখন কিন্তু জলের প্রবাহ বেশ স্বাস্থ্যবান।

সারগেই জিগ্যেস করল, আপনি জলের দিকে তাকিয়ে কী দেখছেন?

আমি বললুম, কিছুই না। এমনিই, জল দেখতে আমার ভালো লাগে।

সারগেই বললেন, নদীর স্রোতের সঙ্গে মানুষের জীবনের একটা মিল আছে, না? দুটোই বয়ে চলেছে, আমরা শুধু ওপরের দিকটা দেখতে পাই, গভীরতা চোখে পড়ে না—

আমি হাসলুম। আমার অবশ্য এরকম কোনও কথা মনে পড়ে না। সারগেই এখনও ছেলেমানুষ, ও বোধহয় সবকিছুই উপমা দিয়ে দেখতে ভালোবাসে।

ব্রিজ পার হওয়ার পর বড় একটা স্কোয়ার। রাস্তা চলে গেছে নানা দিকে। সারগেই নিজের রাস্তা চেনে না। পুলিশদের জিগ্যেস করে করে এগুতে লাগলুম। ক্রমেই দেখা গেল, রাস্তার দুপাশে বহু গাড়ি থেমে আছে, কোথাও কোথাও রাস্তার মাঝখানে বড় বড় গাড়ি দাঁড় করিয়ে ট্রাফিক চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দলে দলে মিলিশিয়া পাহারা দিচ্ছে সেখানে। আমরা পরিচয়পত্র দেখিয়ে এক একটা বাধা পার হতে লাগলুম।

মস্কোয় যেমন ক্রেমলিন, লেনিনগ্রাডে প্রায় সেই রকমই হচ্ছে উইন্টার প্যালেস। এক সময় আমরা সেখানে পৌঁছে গেলুম। একটি বিশাল চত্বরের চার পাশ ঘিরেই সুরম্য সব প্রাসাদ। এইখান থেকেই মে দিবসের শোভাযাত্রা শুরু হবে। একদিকে কাঠের গ্যালারি করা আছে আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য। ঠিক দশটার সময় উৎসব শুরু হবে, গ্যালারির বাইরে দাঁড়িয়ে আছে বহু মানুষ। দেয়াল ঘেঁষে রয়েছে অনেক ছোট ছোট দোকান। কফি, চা, ঠান্ডা পানীয়, স্যান্ডউইচ, সসেজ, আলুর চপ, ডোনাট ইত্যাদি পাওয়া যাচ্ছে। এইসব টুকিটাকি খাবার খেয়ে আমরা ব্রেকফাস্ট সেরে নিলুম। হঠাৎ টিপি টিপি বৃষ্টি হতেই শীত বেড়ে গেল। শীত তাড়াবার জন্য কফি খেতে লাগলুম ঘন-ঘন।

একটা জিনিস লক্ষ করলুম, সমবেত দর্শকদের মধ্যে প্রায় সবাই বয়স্ক পুরুষ ও মহিলা, সঙ্গে বাচ্চা বা কিশোর-কিশোরীরাও আছে, কিন্তু যুবক-যুবতী একজনও নেই। একটু পরেই এর কারণ বুঝেছিলুম।

গ্যালারিতে ভিড় হয়ে যাচ্ছে দেখে আমরা আমাদের আমন্ত্রণপত্র দেখিয়ে নির্দিষ্ট গেট দিয়ে ঢুকে এলুম ভেতরে। যে অংশটায় আমাদের আসন, সেখানে সবাই মনে হল বিদেশি। অনেকেরই হাতে টিভি ক্যামেরা, মুভি ক্যামেরা। পৃথিবীর বহুদেশের মানুষ রয়েছে, কিন্তু ভারতীয় আর একজনও চোখে পড়ল না।

মাঝে এক পশলা বেশ জোর বৃষ্টি হয়ে গেল। আমি ওভারকোট এনেছি বটে, কিন্তু মাথার টুপি কিংবা দস্তানা আনিনি। এত ঠান্ডা লাগছে যে কোটের পকেট থেকে হাত বার করতে পারছি না। অন্য সকলেরই গলায় টাই বা স্কার্ফ জড়ানো। ১৯৬৩ সালে মার্কিন দেশের একটি ছোট শহরে আমি গলা থেকে টাই খুলে রাস্তায় ছুড়ে ফেলে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, জীবনে আর কখনও টাই পরব না। এখন মনে হল, একটা অন্তত মাফ্‌লার আনলে মন্দ হত না!

ঠিক দশটার সময় দেখা গেল ময়দানের এক প্রান্ত দিয়ে একটি শোভাযাত্রা ঢুকছে। তাদের হাতে নানারকম পতাকা ও ছবি। কয়েক মিনিটের মধ্যে চত্বরটি পূর্ণ হয়ে গেল। শোনা গেল অনেক ধরনের যন্ত্র-সঙ্গীত। চতুর্দিক থেকে মাইক্রোফোনে ধ্বনি উঠল, রুশ ভাষায়, শ্রমিক ও কৃষক ঐক্য, হু-র-রা! অমনি সমবেত কণ্ঠ বলে উঠল, হু-র-রা!

তারপর শোভাযাত্রার স্রোত বইতেই লাগল। অতি সুন্দর বর্ণময় দৃশ্য! প্রথম দিকে এল সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান-বাহিনীর প্রতিনিধিরা, তারপর নানারকম কল-কারখানার কর্মী, স্কুল-কলেজের

ছাত্র-ছাত্রী, কৃষক, বুদ্ধিজীবী। এরা প্রায় সবাই তরুণ-তরুণী। প্রান্তর পূর্ণ হয়ে গেলে একদল গান গাইতে-গাইতে বেরিয়ে যাচ্ছে, বিপরীত দিক থেকে ঢেউ-এর পর ঢেউ আসছে। মাইক্রোফোনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নাম ঘোষণা করে বলা হচ্ছে হু-র-রা!

মে-দিবসের মিছিল সম্পর্কে আমার একটা ভুল ধারণা ছিল। আমি ভেবেছিলুম এখানে কামান-বন্দুক-মিসাইলেরও প্রদর্শনী হয়। সেসব কিছু না! সকলে একরকম পোশাক পরেও আসেনি, সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিরা ছাড়া। এখানে এসেছে সবাই ছুটির উৎসবের মেজাজে, পোশাকেও নানারকম বৈচিত্র্য। অনেকেই বেশ সাজগোজ করে এসেছে।

যৌবনের এই আনন্দময় দৃশ্যের তুলনা হয় না। এই মিছিলে কোনও ধরাবাঁধা নিয়মের কড়াকড়ি নেই। হাস্যময় তরুণ-তরুণীরা গান গাইতে-গাইতে আসছে, জয়ধ্বনি দিচ্ছে, আবার চলে যাচ্ছে। এই যৌবন জলতরঙ্গের যেন শেষ নেই।

শীতের মধ্যে টানা দেড় ঘণ্টা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম। আরও কতক্ষণ চলবে কে জানে!

সারগেই একসময় জিগ্যেস করল, সুনীলজি, এবার যাবেন, না আরও দেখবেন?

শেষ হওয়ার আগেই চলে যাওয়া উচিত কি না আমি মনে-মনে ভাবছিলুম। সারগেই-র প্রশ্ন শুনে বললুম, এবারে গেলে মন্দ হয় না।

গ্যালারি থেকে নেমে আমরা চলে এলুম রাস্তায়। এখান দিয়েও মিছিল চলছে। একই মিছিল ভেদ করে অন্যদিকে যাওয়ার উপায় নেই. তা সঙ্গতও নয়। একমাত্র উপায় এই মিছিলে যোগ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে যাওয়া। তাই করলুম।

ছাত্রজীবনে আমি কলকাতায় কয়েকবার মে-দিবসের মিছিলে যোগ দিয়েছিলুম বটে, কিন্তু কোনওদিন কি স্বপ্নেও ভেবেছি যে একদিন রাশিয়ায় মে-দিবসের মিছিলে আমি অংশগ্রহণ করব? এ এক বিচিত্র অনুভূতি! কেউ আমার দিকে কৌতূহলী চোখে তাকাচ্ছে না, দু-একটা বাচ্চা ছেলে ছাড়া।

সেই মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে চলে এলুম নেভা নদী পর্যন্ত। এবারে দেখলুম, এক একটা দল মিছিল ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে যার যার বাড়ির দিকে। সুতরাং আমরাও যেতে পারি।

আমাদের পাশে পাশে একটা ছোট দল যেতে লাগল নানারকম গান গাইতে-গাইতে ও হাসাহাসি করতে-করতে। গানের সুর শুনে মনে হয় কোনও পল্লিগীতি। মনে হয় খুব চেনা।

দুপুরে খেয়েদেয়ে একখানা ঘুম দেওয়ার জন্য খুব মন কেমন করছিল। কিন্তু তার উপায় নেই। তিনটের সময়েই আর একটা প্রোগ্রাম আছে। এখন বাসে করে যেতে হবে মাইল তিরিশেক দূরে, পুশকিন শহরে।

॥ ৫ ॥

আমাদের হোটেলের ব্যবস্থাপনাতেই তিন-চারটি বাস ছাড়ল পুশকিন শহরের উদ্দেশ্যে। আমি আর সারগেই আমাদের জন্য নির্দিষ্ট বাসে উঠে বসলুম। একটি ফুটফুটে তরুণী মেয়ে আমাদের গাইড। সে একটি মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে রাস্তার দু-ধারের বর্ণনা দিতে লাগল। আমি কিছুক্ষণ নিসর্গ দেখায় মন দিলুম। খুব একটা দেখবার কিছু নেই। মস্কোতে যেমন, লেনিনগ্রাডেও তাই, শহরের উপান্তে অসংখ্য ফ্ল্যাট বাড়ি। সোভিয়েত দেশের নতুন সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিককে বাসস্থান দেওয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এখানে নাকি প্রতি পাঁচ মিনিটে একটা করে নতুন ফ্ল্যাট তৈরি হয়ে যাচ্ছে।

শহর ছাড়াবার পর বৃক্ষবিরল সমতলভূমি। মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট বসতি ও কল-কারখানা। এমন কোনও সুন্দর দৃশ্য চোখে পড়ল না, যার কথা বাড়িতে চিঠি লিখে জানানো যায়। বাইরের থেকে চোখ ফিরিয়ে আমি বাসের যাত্রীদের লক্ষ করতে লাগলুম।

প্রায় সকলেই বিদেশি ভ্রমণকারী। বুলগেরিয়ান, জার্মান, ফ্রেঞ্চ, আমেরিকান। এর মধ্যে একজন আমেরিকান ভদ্রলোক বিশেষ দ্রষ্টব্য। এই প্রৌঢ় লোকটি লম্বায় সাড়ে ছ'ফিটের বেশি তো হবেনই, বসা-অবস্থাতেই তাঁকে গাইড-মেয়েটির সমান মনে হচ্ছে। এক একজন দুর্ভাগা মানুষের ফিসফিস করে কথা বলার ক্ষমতা থাকে না, এই ব্যক্তিটি সেরকম। ইনি এঁর স্ত্রীর সঙ্গে যে নিভৃত আলাপ করছেন, তাও যেন মাইক্রোফোনে প্রচারিত হচ্ছে। এই কম্বুকণ্ঠ ব্যক্তিটির নাম, আমি মনে মনে রাখলুম, মিঃ গোলায়াথ। ওল্ড টেস্টামেন্টের ডেভিড যার সঙ্গে লড়াই করেছিল। মিঃ গোলায়াথের নাক, ঠোঁট, চোখ সবই বড়-বড়, ভুরু দুটি এত মোটা যে মুখখানাকে সবসময়েই বিস্মিত মনে হয়। এঁর স্ত্রী বেশ ছোট্টখাট্টো এবং মৃদুভাষী। আমার ঠিক সামনেই বসে আছে এক ফরাসি দম্পতি, তবে আজকালকার কেতা অনুযায়ী ওদের বোধহয় বিয়ে হয়নি, তাই প্রেম খুব গভীর, অন্য কারুর দিকে তাকাবার ফুরসত পর্যন্ত নেই। অন্যান্য যাত্রীরা সাধারণ টুরিস্টের মতন, আমি ছাড়া আর সবাই বেশ সুসজ্জিত।

মিঃ গোলায়াথ গাইড-মেয়েটিকে নানান প্রশ্ন করছেন। বাসে ওঠবার পরেই তিনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, আটাশ বছর আগে তিনি একবার লেনিনগ্রাডে এসেছিলেন, সেই স্মৃতি তাঁর কিছু-কিছু মনে আছে। গাইড-মেয়েটির বয়েস আটাশের অনেক কম, অত আগের কথা তার জানবার কথা নয়। তা ছাড়া উত্তর দেওয়ার সময় ঠিক ইংরিজি শব্দটা খোঁজবার জন্য সে প্রায়ই মাথা ঝাঁকিয়ে হেসে ফেলছে, অন্য কোনও যাত্রী তাকে সাহায্য করছে বাক্যটি শেষ করতে। মিঃ গোলায়াথের কথাবার্তা আর ভাবভঙ্গি দেখে অনেকেই মজা পাচ্ছে বেশ।

মিনিট চল্লিশেক-এর মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলুম পুশকিনে। বাস থেকে নেমেই বোঝা গেল এটি একটি প্রাসাদপুরী। এককালের রাজা-রাজড়াদের বিলাস ভবন। পিটার দা গ্রেট এবং বিখ্যাত রানি ক্যাথরিনের-স্মৃতি-বিজড়িত। আগে এই জায়গাটির অন্য নাম ছিল; পুশকিন এখানে লেখাপড়া করেছেন এবং তাঁর কৈশোর ও প্রথম যৌবন এখানে কাটিয়েছেন বলে এখন তাঁর নামেই শহরটি নামাঙ্কিত। রাশিয়ায় কবি-সাহিত্যিকদের নামে অনেক শহরেরই নাম রাখা হয়েছে।

পুশকিনের কথা ভাবলেই আমার বায়রনের কথা মনে পড়ে। রোমান্টিকতায় ও জীবনযাপনে দুজনের অনেকটা মিল আছে। দুজনেই লিখেছেন গাথাকাব্য। অবশ্য লেখক হিসেবে পুশকিনের প্রভাব অনেক ব্যাপক। অভিজাত ঘরের সন্তান হয়েও পুশকিন অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে এবং স্বাধীনতার সপক্ষে কলম ধরেছেন। এজন্য তাঁকে নির্বাসনের যাতনা সহ্য করতে হয়েছিল। তাঁর লেখা 'ইউজেন ওনেজেন'-কে বলা হয় রুশ ভাষার প্রথম উপন্যাস। পুশকিনের 'ইস্কাবনের রানি' নামের গল্পটি অনেক বাঙালি পাঠকের কাছেই পরিচিত। পুশকিনের অপূর্ব কাব্যময় ভাষায় আমি মুগ্ধ হয়েছি এক সময়।

প্রেমের ব্যাপারেও পুশকিন বায়রনকে টেক্কা দিয়েছিলেন। বত্রিশ বছর বয়েসে পুশকিন এক অসাধারণ রূপসি মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন, যে পুশকিনের নিজের ভাষাতেই তাঁর জীবনের ১১৩ নম্বর নারী। সেই নারীও তার চরিত্র নিয়ে খেলা করতে ভালোবাসত, এবং, এবং সেই কারণেই কয়েক বছরের মধ্যেই এক ডুয়েল লড়তে গিয়ে পুশকিন প্রাণ হারান।

আমরা অপেক্ষা করতে লাগলুম রাজপ্রাসাদটির সামনে। কুড়ি-পঁচিশ জনের এক-একটি ব্যাচকে ভেতরে ঢোকানো হচ্ছে। বাইরে থেকেই প্রাসাদটিকে বেশ জমকালো দেখায়, মিশ্রিত রাশিয়ান বারোক স্থাপত্যের একটি বৃহৎ নিদর্শন। ক্যামেরা বার করে ছবি তুলে ফেললুম কয়েকটা।

ভেতরে ঢুকে আমাদের আর এক জোড়া করে জুতো পরতে হল। প্রতিটি কক্ষের মেঝেতেই অতি মূল্যবান সব কাঠের কাজ আছে, বাইরের জুতো পরে তার ওপর দিয়ে এত লোক হাঁটলে সেসব অচিরেই নষ্ট হয়ে যাবে। আবার এদেশে খালি পায়ে হাঁটার কথা কল্পনাও করা যায় না, সেই জন্য এখানে আলাদা কাপড়ের জুতো রাখা আছে অনেক। সেইগুলো পায়ে গলিয়ে নিতে হবে।

আমার কৌতূহল হল, আমাদের মিঃ গোলায়াথের পায়ের মাপের জুতো পাওয়া যাবে কি? তাও পাওয়া গেল এক জোড়া।

প্রাসাদটির প্রতিটি কক্ষের বর্ণনা আমি দেব না। সম্রাট-বাদশাদের বিলাস ভবন যে-রকম হয় এটিও প্রায় সেইরকমই। এই প্রাসাদের মধ্যেই রয়েছে দুটি গির্জা, অসংখ্য ঘরের মধ্যে কোনওটি রাজা-রানির শয়নঘর, কোনওটি বিকেলে বসবার ঘর, কোনওটি সকালের, কোনওটি বিদেশি অতিথিদের জন্য, কোনওটি একলা একলা খাওয়ার জন্য, কোনওটি বেশি লোকের সঙ্গে ভোজসভার জন্য, কোনওটি আকাশ দেখবার জন্য, কোনওটি বই পড়বার জন্য ইত্যাদি। এ ছাড়া চোখ ধাঁধানো নাচঘর।

এখানকার দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা আমি বলব। প্রজাদের শোষণ করা টাকায় এক সময় রাজাবাদশাদের হুকুমে অনেক প্রাসাদ এবং শিল্পকীর্তি রচিত হয়েছে। কিন্তু সেজন্য রাজা-বাদশাদের আলাদা কোনও কৃতিত্ব নেই। কৃতিত্ব হচ্ছে সেইসব স্থপতি ও শিল্পীদের, যাঁরা ওইসবের পরিকল্পনা ও নির্মাণ করেছেন। তাজমহলের জন্য শাজাহান শুধু হুকুম দিয়েছেন আর রাজকোষ খুলে দিয়েছেন। তাঁর কি স্থাপত্য সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিল? সেইরকম খাজুরাহো বা কোনারক দেখতে গিয়েও আমরা শুধু শুনি সেগুলি,কোন রাজার আমলে তৈরি, শিল্পীদের নাম কেউ মনেও রাখেনি। এখানে কিন্তু রুশ গবেষকরা খুঁজে-খুঁজে বার করেছেন শিল্পীদের নাম, গাইডরা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে যখন আমাদের বিভিন্ন শিল্প-সৌন্দর্য দেখাচ্ছিলেন, তখন প্রতিটি ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছিলেন আসল শিল্পীদের নাম। মূল প্রাসাদটির স্থপতি বারতোলোমিও রাস্টভেল্লি। নাম শুনে মনে হয় ইটালিয়ান।

আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল সোভিয়েত সরকারের ঐতিহ্যপ্রীতি। এ দেশের অভিজাততন্ত্র একেবারে মুছে ফেলা হলেও আগেকার দিনের প্রাসাদ, মূর্তি, স্তম্ভ কিছুও নষ্ট করা হয়নি, সব অবিকৃত রাখা হয়েছে। শুধু তাই-ই নয়, এই প্রাসাদটিও অর্ধেকটা নাতসিরা ধ্বংস করে দিয়েছিল, নাতসিরা এই শহরটি অধিকার করে এখানে থেকেও গেছে অনেকদিন, তখন যা খুশি ভাঙচুর করেছে। এখানকার মানুষ আবার পরম যত্নে সেইসব ভাঙা অংশের পুনরুদ্ধার করছে। যেমন তেমন মেরামত নয়, হুবহু আগের মতন। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, আমরা দেখলুম, এখনও শিল্পীরা ছবি দেখে-দেখে এক-একটা ঘর ঠিক আগের মতন অবস্থায় ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করে যাচ্ছে। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে আটত্রিশ বছর আগে।

ঘুরতে-ঘুরতে আরও একটি ব্যাপারে চমকিত হলুম। আমাদের সহযাত্রী মিঃ গোলায়াথের কথাবার্তা শুনে বাসের মধ্যে অনেকেই মুখ টিপে হাসছিলুম, কিন্তু এখন দেখা গেল, ওই দৈত্যকারের লোকটি কিন্তু একজন শিল্প-বিশেষজ্ঞ! বিভিন্ন ঘরে যেসব ছবি আছে, অনেক শিল্পীর নামই অপরিচিত, সেসব ছবি দেখে কিন্তু ওই ভদ্রলোক শিল্পীদের নাম, রঙের ব্যবহারের বিশেষত্ব, রীতি, শিল্প-ইতিহাস বলে যাচ্ছিলেন গড়-গড় করে, গাইডরাও অতশত জানে না।

প্রাসাদ সফর শেষ হওয়ার পর অনেকেই গেল পার্শ্ববর্তী পুশকিন-সংগ্রহশালা দেখতে। আমার আর ইচ্ছে হল না। মিউজিয়ম বা এই ধরনের বড়-বড় বাড়ি হেঁটে-হেঁটে ঘুরতে বেশ ক্লান্তি লাগে। সামনের বাগানে একটা বেঞ্চে বসে পড়ে আমি সারগেইকে জিগ্যেস করলুম, আজ আর কোথাও যাওয়ার নেই তো?

সারগেই বলল, নাঃ, আজ আর কিছু নেই। ছুটির দিন বলে এখানকার এ পি এন দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি, জানি না ওরা কিছু ঠিক করে রেখেছিল কি না!

আমি বললুম, আর কিছু থাকলেও আজ আর আমি যেতুম না।

বলেই আমি দুবার হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো করে উঠলুম। সকালে বৃষ্টিতে ভিজে ঠান্ডা লেগে গেছে।

বাস ছাড়ার সময়টা আগেই বলে দেওয়া হয়েছিল। নির্দিষ্ট সময়ে সবাই সেখানে জড় হয়ে গেল। বাসটা চলতে শুরু করার খানিকক্ষণ পরে কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগতে লাগল, কীসের যেন

অভাব বোধ করছি। আরও একটু পরে একজন যাত্রী উঠে দাঁড়িয়ে উত্তেজিতভাবে গাইড মেয়েটিকে কী যেন বললে। মেয়েটিও খুব বিচলিতভাবে কথা বলতে লাগল ড্রাইভারের সঙ্গে। কিছু যেন একটা ঘটেছে।

আমি সারগেইকে জিগ্যেস করলুম, কী ব্যাপার?

সারগেই হাসতে-হাসতে বলল, সেই লম্বা আমেরিকান ভদ্রলোক মিসিং। তিনি আর তাঁর স্ত্রী বাসে ওঠেননি।

সেইজন্যই এতক্ষণ এত নিস্তব্ধ মনে হচ্ছিল বাসটাকে।

এখন কী করা যাবে তাই নিয়ে একটা সংশয় দেখা দিল। বাসটা প্রায় দশ-বারো মাইল চলে এসেছে, এদিকে আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে। অনেকেই ক্লান্ত, এখন আবার বাসটা অতদূরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে? একজন বলল, আরও তো কয়েকটি বাস রয়েছে, ভদ্রলোক নিশ্চয়ই অন্য বাসে চলে আসবেন। গাইড মেয়েটি বলল, সবক'টি বাসই তো ভরতি, অন্য কোনও বাস ওঁদের নেবে কিনা সন্দেহ! একজন বললে, কেউ বিপদে পড়লেও নেবে না? আর একজন বলল, অন্য বাসও তো ছেড়ে দেবে, উনি যদি কোথাও ঘুমিয়ে পড়ে থাকেন? পরে আর ফেরবার উপায় নেই। আর একজন বলল, আমি ভদ্রলোককে একবার দেখেছিলুম, একটা সুভেনিরের দোকানে কেনাকাটা করতে।

শেষ পর্যন্ত গাইড-মেয়েটি বলল, আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত। বাসটির মুখ ফেরানো হল।

আবার সেই প্রাসাদের কাছাকাছি এসে দেখা গেল সস্ত্রীক মিঃ গোলায়াথ রাস্তায় একটি স্টেশন ওয়াগনের ড্রাইভারের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। সম্ভবত উনি গাড়িটি ভাড়া করতে চাইছেন, কিংবা গাড়িটা একেবারে কিনে ফেলার প্রস্তাব দেওয়াও বিচিত্র নয়।

আমাদের বাসের একজন যাত্রীও ভদ্রলোককে কোনও অভিযোগ জানাল না। গাইড-মেয়েটি হাসিমুখে বলল, আমরাই ভুল করে আপনাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম।

বাসে উঠে সেই দৈত্যাকার, বজ্রকণ্ঠ মানুষটি শিশুর মতন সরল মুখ করে অত্যন্ত বিনীতভাবে বললেন, আপনাদের অসুবিধে ঘটাবার জন্য আমি দুঃখিত। দোষ আমারই।

এই ছোট্ট ঘটনাটি দেখে আমার মনে হল, সোভিয়েত দেশের সাধারণ মানুষ আমেরিকার সাধারণ মানুষের প্রতি কোনও বিদ্বেষ ভাব পোষণ করে না। সব দেশের সাধারণ মানুষই তো সমান।

সন্ধেবেলা হোটেলে ফিরে আমি আরও কয়েকবার হাঁচতে লাগলুম। সারগেই বলল, দাঁড়ান, আপনার জন্য ওষুধ আনছি।

সে এনে হাজির করল এক বোতল ভদ্‌কা।

এ দেশে এসে এখনও এ দেশের জাতীয় পানীয় আস্বাদ করা হয়নি বটে। আমি গেলাস ধুয়ে নিয়ে এলুম। ভদ্‌কার জন্য খুব ছোট-ছোট গেলাস লাগে, কিন্তু তা আর পাচ্ছি কোথায়? সারগেই আমাকে বোঝাতে লাগল ভদ্‌কা জিনিসটা কী ও কতরকম হয়। আমি শুনে গেলুম বাধা না দিয়ে। রাশিয়ান ও পোলিশ ভদ্‌কা ইউরোপের সব জায়গাতেই পাওয়া যায়, আমেরিকাতেও পাওয়া যায়, এমনকী কলকাতাতেও জোগাড় করা অসম্ভব কিছু না। ও আমার অনেকবার চেখে দেখা আছে।

ভদ্‌কা এক ঢোঁকে গলায় ঢেলে দেওয়ার নিয়ম। প্রথম গেলাসটি নেওয়ার পর সারগেই আমাকে বলল, সুনীলজি, সাবধানে খাবেন, এ জিনিস খুব কড়া। আমি তো ইন্ডিয়াতে গেছি, আমি দেখেছি ইন্ডিয়ানরা বেশি ড্রিংক করতে পারে না।

আমি সুন্দরবনের হাঁড়িয়া, সাঁওতাল পরগনার মহুয়া, খালাসি-টোলার এক নম্বর, পার্বত্য চট্টগ্রামের চার চোঁয়ানি, মেক্সিকোর টাকিলা, গ্রিসের উজো খেয়ে দেখেছি, সেই সবের তুলনায় এই ভদ্‌কা আমার তেমন কড়া মনে হল না।

সারগেই অবশ্য বেশ সাবধানী সুরাপায়ী। একটা দুটো খেয়েই বলল, আমার যথেষ্ট হয়েছে। সারগেই-এর খানিকটা স্বাস্থ্যবাতিক আছে। ও আমাকে বলল, এক সময় আমি খুব সিগারেট খেতুম,

খুব ড্রিংক করতুম, এখন ছেড়ে দিয়েছি। সে কথা শুনে আমি হেসে খুন। বাইশ বছরের ছেলে, কবেই বা ধরল, কবেই বা ছাড়ল?

গেলাসের পর গেলাস উড়িয়ে আমি বোতলটা শেষ করে ফেললুম এক সময়। খুব একটা বেশি কিছু নয়। এইসব ভদ্‌কার বোতলের ছিপি খুব পাতলা। একবার খুললে আর লাগাবার ব্যবস্থা নেই। অর্থাৎ এই বোতল খুলে একবারেই শেষ করে দেওয়া নিয়ম!

সারগেই বিদায় নেওয়ার পর আমি কিছুক্ষণ বইটই পড়লুম। আজও সহজে ঘুম এল না। ঘুমের আবার এ কী ব্যাপার হল? অবশ্য রাত্তিরে ঘুম না হলে আমি ব্যতিব্যস্ত হই না, বরং নিজেকে নিয়ে অনেকক্ষণ সময় কাটানো যায়।

মে-দিবস উপলক্ষে এখানে পর পর দুদিন ছুটি। সারগেই এ পি এন অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছে না, তবে আগে থেকেই আজকের অন্য একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে আছে।

হোটেল থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে রেলওয়ে স্টেশনে মাত্র পাঁচ মিনিটে পৌঁছে গিয়ে বুঝলুম, ট্যাক্সি না নিলেও চলত। এটির নাম ফিনল্যান্ড স্টেশন, এখান থেকে সরাসরি ট্রেন ফিনল্যান্ড যায়। সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে আত্মগোপন করতে হলে লেনিন ফিনল্যান্ডে চলে যেতেন। আমরা অবশ্য ততদূর যাব না, আমাদের গন্তব্য পঁচিশ মাইল দূরে কোমারোয়া নামে একটি ছোট্ট জায়গা।

এখন বেলা এগারোটা, লোকাল ট্রেনে বেশি ভিড় নেই। ভারতীয় উপমহাদেশ ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও বোধ হয় ট্রেন আজকাল জনপ্রিয় নয়। আমরা একটা ফাঁকা কামরায় উঠে বসলুম। সারগেই শোনাল তার ভারতীয় রেলযাত্রার অভিজ্ঞতার কাহিনী। একবার তাকে বোম্বে থেকে নাগপুর যেতে হয়েছিল, হঠাৎ সেই সময় তার খুব জ্বর হয়েছে। ট্রেনে রিজার্ভেশন নেই। অসহ্য ভিড়ের মধ্যে সারারাত কাটাবার সময় তার মনে হয়েছিল, সে বুঝি হঠাৎ মরেই যাবে।

অবশ্য সারগেই-এর বর্ণনার মধ্যে কোনও তিক্ততা ছিল না। সে জানে, ভারতবর্ষ অত্যধিক জনসংখ্যার চাপে ভুগছে। সেই তুলনায় সোভিয়েত রাশিয়ায় জনসংখ্যা কমতির দিকে।

চলন্ত ট্রেনে হঠাৎ এক সময় মাইক্রোফোনে অনেকক্ষণ ধরে কী সব ঘোষণা হতে লাগল। আমি সারগেইকে জিগ্যেস করলুম, কী বলছে? সারগেই বলল, ও চাকরির খবর। রেলে কতগুলো চাকরি খালি আছে, কত মাইনে, কী কী সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে তাই জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যদি যাত্রীদের মধ্যে কেউ ওইসব চাকরি নিতে উৎসাহিত হয়।

আমি হতবাক! রেলে চাকরি খালি? লোক পাওয়া যাচ্ছে না, যাত্রীদের অনুরোধ করা হচ্ছে? আমাদের দেশে রেলের চাকরিতে দশটা পোস্ট-এর জন্য বিজ্ঞাপন দিলে অন্তত দশ হাজার দরখাস্ত পড়ে না? আমরা সবাই একই পৃথিবীর মানুষ?

কাল রাত্তিরেই আমি একবার ১৯৮৩ সালের ইয়ার-বুকে সোভিয়েত নাগরিকদের চাকরির অবস্থার কথা পড়ছিলুম। এ দেশের প্রত্যেক মানুষের কাজ পাওয়ার অধিকার আছে। নতুন সংবিধান অনুযায়ী ইচ্ছে মতন চাকরি বেছে নেওয়ার অধিকারও হয়েছে। গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর প্রত্যেকের চাকরি বাঁধা। ১৯৩০ সালের পর থেকে এদেশে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ উঠে গেছে। ইদানীং পনেরো থেকে পঁচিশ লাখ চাকরি খালি যায়, লোক পাওয়া যায় না।

এটা একটা দারুণ উন্নতির প্রমাণ। যে-সমাজে প্রতিটি মানুষই কাজের অধিকার পায়, সে সমাজে সবাই সসম্মানে বাঁচতে পারে। ইংল্যান্ড-আমেরিকাতে এখন বেকারিত্ব প্রকট। আমেরিকায় বর্তমানে বেকারের সংখ্যা শতকরা ১৬ জনের বেশি। অবশ্য, এই সঙ্গে এ কথাও বলা দরকার, ইংল্যান্ড-আমেরিকা-কানাডার মতন সোভিয়েত রাশিয়াকে বহিরাগতদের চাপ সহ্য করতে হয় না। বহিরাগতদের জন্যই ইংল্যান্ডে বর্ণ-সমস্যা এবং বেকার সমস্যা পাশাপাশি চলছে। আমেরিকা বা কানাডার যে-কোনও ছোট শহরেও কালো মানুষ, চিনে, আরব, ভারতীয় চেহারার নতুন নাগরিক দেখা যায়। রাশিয়ায় সে সমস্যা নেই।

ছোট-ছোট স্টেশন আসছে যাচ্ছে, লোকজনের ওঠা-নামা খুবই কম। খানিকবাদেই আমাদের জায়গাটায় পৌঁছে গেলুম। বেশ একটা পরিচ্ছন্ন গ্রামের মতন। আমরা যাব এখানকার একটি রাইটার্স হোমে। স্টেশনের একজনকে জিগ্যেস করে সারগেই পথ-নির্দেশ জেনে নিল।

গাছের ছায়া-ফেলা পথ ধরে আমরা হাঁটতে লাগলুম। দুপাশে শান্ত-নির্জন বাড়ি। অধিকাংশ বাড়িই তালা দেওয়া, কোনও-কোনও বাড়িতে কুকুর রয়েছে দেখলুম, অর্থাৎ মানুষও রয়েছে। নিজস্ব ব্যবহারের জন্য এদেশে ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখা নিষিদ্ধ নয়। গ্রামের দিকে অনেকেরই ডাচাউ বা কানট্রি হাউস থাকে। ছুটিছাটায় বেড়াতে আসে।

আমরা যে-লেখকের সঙ্গে দেখা করতে চলেছি, তাঁর পরিচয় বেশ অভিনব। সোভিয়েত দেশের উত্তরাঞ্চলে, আর্কটিক ওশানের কাছে, বরফের রাজ্যে, চুকচা নামে একটি উপজাতির বাস। জনসংখ্যা মাত্র পনেরো হাজার। কিছুদিন আগে পর্যন্তও এই চুকচাদের কোনও লিখিত ভাষা ছিল না। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন যেহেতু মাতৃভাষায় শিক্ষাদানে বিশ্বাসী, তাই চুকচাদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য তাদের ভাষার একটা লিখিত রূপ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এবং এক জেনারেশনেই তাদের মধ্যে একজন লেখক সারাদেশে যশস্বী হয়েছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রেষ্ঠ গল্প সংকলনেও আমি এঁর লেখা দেখেছি।

মধ্যবয়স্ক এই লেখকটির নাম রিথিউ ইউরি সারগেইভিচ। ইনি পৃথিবীর অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন, কলকাতাতেও এসেছেন।

রাইটার্স হোম একটি বেশ বড় বাড়ি। তাতে আলাদা আলাদা অ্যাপার্টমেন্ট, সেখানে এসে লেখকরা থাকতে পারেন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা, টাইপ-রাইটার ও টেলিফোন আছে, খরচ নামমাত্র। রিথিউ সারগেইভিচ আমাদের নিয়ে তাঁর লেখার ঘরে বসিয়ে বললেন, হ্যাঁ, কলকাতার কথা আমার মনে আছে, কলকাতায় বেশ প্রাণ আছে।

ইনি ইংরিজি জানেন না। সারগেই আমাদের দো-ভাষী। নিজের মাতৃভাষা ছাড়াও ইনি অবশ্য রুশ ভাষা ভালোই জানেন, ইচ্ছে করলেই রুশ ভাষায় লিখতেও পারেন, কিন্তু নিজেদের ভাষাকে সমৃদ্ধ করার জন্য সেই ভাষাতেই লিখে যেতে চান। তাতে অবশ্য প্রচারের অসুবিধে কিছু নেই। কারণ লেখামাত্র অনুবাদ হয়ে যায়। যে-ভাষার সমগ্র জনসংখ্যাই মাত্র পনেরো হাজার, সেই ভাষার একজন লেখক হয়েও ইনি লেখাটাকেই জীবিকা করতে পেরেছেন, লেনিনগ্রাড শহরে এঁর নিজস্ব একটি অ্যাপার্টমেন্ট আছে। সংসার-খরচের জন্য চিন্তা করতে হয় না। ইচ্ছেমতন ভ্রমণ করতে পারেন।

বিদেশি কোনও লেখকের সঙ্গে কথা বলতে আমার অনেক ক্ষেত্রেই বেশ অসুবিধে হয়। ওঁরা আমাদের লেখাটেখা সম্পর্কে কিছুই জানেন না, বাংলা ভাষার অস্তিত্ব সম্পর্কেই অনেকের স্পষ্ট ধারণা নেই। অথচ আমরা ওদের সম্পর্কে মোটামুটি জানি। রিথিউ সারগেইভিচেরও একটি ছোট গল্প অন্তত আমার আগেই পড়া আছে। একটি ছেলেকে নিয়ে গল্প, তার বাবা নৌকো নিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরতে যেত, ছেলেটি অপেক্ষা করত কবে বাবা আসবে, কবে বাবা আসবে। একবার বাবা ফিরে এল না। সবাই ধরে নিল সে সমুদ্রে নৌকোডুবি হয়ে মারা গেছে। কয়েক বছর পরে ছেলেটি তার বাবাকে অন্য একটি শহরে দেখতে পায়, কিন্তু সে কথা সে তার মাকে জানাল না। সেটাই তার জীবনের প্রথম গোপন কথা।

একটি গল্প পড়েই সেই লেখকের রচনাভঙ্গি সম্পর্কে খানিকটা ধারণা করা যায়; কিন্তু আমার সম্পর্কে উনি কী ধারণা করবেন?

যাই হোক, খানিকক্ষণ গল্প-টল্প হল। আমি ওঁকে ওঁর লেখার বিষয়বস্তু নিয়ে টুকিটাকি কয়েকটা প্রশ্ন করলুম। উনি ওঁর স্বজাতির নানান লোক-কাহিনি, গ্রাম্য জীবন বিষয়েই বেশি লিখতে চান। অবশ্য আধুনিক শহুরে জীবন নিয়েও কিছু-কিছু লিখেছেন। রুশ ক্লাসিকাল সাহিত্য ওঁর বেশ ভালোই পড়া আছে।

এক সময় উনি নিজেই চা তৈরি করে খাওয়ালেন।

আমি জিগ্যেস করলুম, এইরকম নির্জনবাসে কি আপনার লেখার বেশি সুবিধে হয়?

উনি বললেন, শহরে অনেক লোকজন, নানারকম আকর্ষণ। বাড়ির লোকজনের জন্যও সময় দিতে হয়। এরকম কোনও ফাঁকা জায়গায় বেশ কয়েকদিন থাকলে কল্পনাশক্তি বাড়ে। এই জায়গাটা বেশ সুন্দর। খুব কাছেই সমুদ্র। লেখায় মন না বসলে আমি সমুদ্রের ধারে হাঁটতে যাই।

আমি চমকে উঠে বললুম, কাছেই সমুদ্র? আমরা ঘুরে আসতে পারি?

উনি কোট ও টুপি পরে বাইরে এসে আমাদের সমুদ্রের দিকের পথটা দেখিয়ে দিলেন। দু-একটা ছবি তোলার পর আমরা উষ্ণ করমর্দন করে বিদায় নিলুম।

দুপাশে প্রায় বনের মতন। রাস্তাটা এক জায়গায় অনেকখানি ঢালু হয়ে নীচে নেমে গেছে। সারগেই জিগ্যেস করলো, সুনীলজি, আর যাবেন? ফেরার সময় কিন্তু এতখানি খাড়া উঠতে হবে!

আমি বললুম, এত কাছে সমুদ্র, তবু দেখব না? চলো, চলো!

সেই ঢালু পথ ধরে প্রায় ছুটতে-ছুটতে নেমে এসেই দেখতে পেলাম বেলাভূমি। অনেকদিন বাদে সমুদ্র দর্শন হল। আমার অভিজ্ঞতায় আর একটি নতুন সমুদ্র, এর নাম বালটিক উপসাগর।

দুপুরবেলা সমুদ্র তীর একেবারে নির্জন। আমি এগিয়ে গিয়ে জলে হাত রাখলুম। অচেনা জল সব সময়েই ছুঁতে ভালো লাগে।

॥ ৬ ॥

একে ছুটির দিন, তার ওপর বৃষ্টি পড়ছে। এখন কোথাও যাওয়ার নেই, বসে-বসে আলস্য করতেই ইচ্ছে করে। বেশ বেলা করে দুপুরের খাওয়া সেরে নিয়ে আমি আর সারগেই বসে আছি হোটেলের দোতলার লবিতে। সামনের দেওয়ালটি পুরো কাচের তৈরি। সেই জন্য এখানে বসে-বসেই নিভা নদীর ওপর বৃষ্টিপাতের দৃশ্য উপভোগ করা যায়।

বৃষ্টির জন্য অনেকেই বাইরে বেরুতে পারেনি। এখানকার আবহাওয়া বেশ উপভোগ্য হলেও বৃষ্টি পড়লেই কনকনে শীত পড়ে। এখন মে মাস। কলকাতায় অসহ্য গরম, আর এখানে আমি কোট, সোয়েটার পরে বসে আছি।

সারগেই জিগ্যেস করল, সুনীলজি, বৃষ্টি থামলে বিকেলে কোথায় যাওয়া যায়?

আমি বললুম, লেনিনগ্রাডে এসে আমি আর যাই দেখি বা না দেখি, হারমিটেজ মিউজিয়াম দেখবই!

সারগেই বলল, হ্যাঁ, ওই মিউজিয়াম তো নিশ্চয়ই দেখব। কালকেও সময় আছে।

লবিতে আর যে ক'জন লোক বসে আছে, তাদের মধ্যে একজন ভারতীয়। সেই দিকে আঙুল তুলে সারগেই জিগ্যেস করল, ওই ইন্ডিয়ান ভদ্রলোক কি বেঙ্গলি?

ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আগে দু-একবার চোখাচোখি হয়েছে, উনি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। এটাই স্বাভাবিক। প্রবাসে সবসময় বিদেশি ভাষা বলতে-বলতে কখনও হঠাৎ মাতৃভাষায় কথা বলার সুযোগ পেলে বেশ আরাম হয়। কিন্তু একজন ভারতীয়ের সঙ্গে আর একজন ভারতীয়ের দেখা হলেই সে সুখ পাওয়া যায় না। ওই ভদ্রলোকটি দক্ষিণ ভারতের কোনও রাজ্যের, আমরা পরস্পরের ভাষা একবর্ণ বুঝব না। কথা বলতে হবে কষ্টকল্পিত ইংরিজিতেই।

আমি সারগেইকে বললুম, উনি দক্ষিণ ভারতীয়, তবে কোন রাজ্যের তা জানি না।

সারগেই উঠে গিয়ে ভদ্রলোককে তামিল ভাষায় কী যেন জিগ্যেস করল। তিনি প্রায় ভূত দেখার মতন চমকে উঠলেন।

সারগেই ভদ্রলোককে ডেকে নিয়ে এল আমাদের টেবিলে। আনন্দের আতিশয্যে ভদ্রলোক অনেক

গল্প জুড়ে দিলেন সারগেই-এর সঙ্গে। আমি বোবা হয়ে বসে রইলুম।

তারপর সারগেই আমার সঙ্গে ওঁর আলাপ করিয়ে দিল। ভদ্রলোকের নাম শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্যীয়ম, তিনি অঙ্কের পণ্ডিত, ক্যানাডার কোনও শহরে অধ্যাপনা করেন। লেনিনগ্রাডের বিশ্ববিদ্যালয়ে দেড় মাসের জন্য একটি সেমিনারে যোগ দিতে এসেছেন। তিনি নিরামিষ খান বলে খাবারদাবারে কিছু অসুবিধে হচ্ছে এবং একাকিত্ব ভোগ করছেন। সারগেইকে পেয়ে তিনি উচ্ছ্বসিত।

সারগেই-এর মুখে আমার পরিচয় শুনে তিনি জানালেন যে তিনিও কবিতা লেখেন। তাঁর তামিল ভাষায় লেখা কবিতার ইংরেজি অনুবাদও তাঁর সঙ্গেই আছে। হাত-ব্যাগ খুলে তিনি সাইক্লোস্টাইল করা কবিতা বার করে দিলেন।

সেই কবিতা কয়েক লাইন পড়েই আমি চোখ তুলে নিলুম। ধর্মীয় বিষয়বস্তু ও উচ্চ দার্শনিকভাবের ব্যাপার, খটোমটো ইংরেজিতে লেখা। এই ধরনের রচনা সম্পর্কে আমি কোনও আগ্রহ বোধ করি না।

সারগেই ও শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্যীয়ম গল্প করতে লাগলেন। আমি চুপ করে বসে রইলুম খানিকক্ষণ। তারপর ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলুম নিজের ঘরে।

ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়েই চলেছে। নিভা নদীটি বেশ চওড়া, বৃষ্টিতে তাকে বেশ উচ্ছল দেখাচ্ছে। সব নদীই নিশ্চয়ই বৃষ্টি পছন্দ করে। বৃষ্টি তো নদীর খাদ্য। মাঝে মাঝে লঞ্চ যাচ্ছে। এসব দেশে কাঠের নৌকো উঠে গেছে বহুদিন, তবু কল্পনায় আমি যেন একটা নিঃসঙ্গ পাল তোলা নৌকো দেখতে পাই। এই পাশ্চাত্য নগরীতে বসেও আমার মন চলে যায় পদ্মানদীর প্রান্তে।

প্রকৃতির কোনও সুন্দর দৃশ্য পাঁচ-দশ মিনিটের বেশি দেখা ঠিক নয়। তাতে সমগ্রের বদলে অংশের দিকে চোখ চলে যায়। জানলার কাছ থেকে সরে এসে আমি টিভি খুললুম। মোট তিনটি চ্যানেল। একটিতে হচ্ছে একটি ছোটদের ফিল্ম। একটিতে হচ্ছে কনসার্ট, আর একটিতে খেলাধুলো। এরা গান-বাজনা খুব ভালোবাসে। যখনই টিভি খুলি, তখনই কোনও-কোনও চ্যানেলে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত শুনতে পাই। রুশ ভাষায় যখন খবর হয়, তখন ভাষা বুঝতে না পারলেও মাঝে-মাঝে ইন্ডিয়া, ইন্দিরা গান্ধি, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব এইসব শব্দ কানে আছে। প্রায় প্রতিদিনই ভারতের উল্লেখ, এটা খুব আশ্চর্য ব্যাপার। পশ্চিমি দেশগুলিতে সপ্তাহের পর সপ্তাহ টিভি খবর শুনলে মনে হয় ভারত নামে কোনও দেশেরই অস্তিত্ব নেই পৃথিবীতে।

হঠাৎ মনে হল তিন-চারদিন আমি কোনও খবরের কাগজ পড়িনি। ইংরিজি কাগজ এখানে বেশ দুর্লভ, খোঁজও করিনি আমি। কিন্তু কয়েকদিন খবরের কাগজ না পড়ায় আমার শরীর বা আত্মার কোনও ক্ষতি হয়েছে বলে তো মনে হয় না।

খানিকবাদে সারগেই এসে দুষ্টু হেসে বলল, ওই দক্ষিণ ভারতীয় ভদ্রলোক সন্ধেবেলা আপনার ঘরে এসে কিছু কবিতা পড়ে শোনাতে চান। আপনি কি ইন্টারেস্টেড?

আমি বললুম, সন্ধেবেলা তো আমরা হোটেলে থাকব না!

—সন্ধেবেলা কোথায় যাব?

—কোনও পার্কে বসে আকাশ দেখব!

সারগেই হো-হো করে হেসে উঠল। তারপর বলল, তামিল ভাষাতে এখন অনেক ভালো কবিতা লেখা হয়। কিন্তু এই ভদ্রলোক খুব প্রাচীনপন্থী।

আমি বললুম, বহুদিন দেশের বাইরে আছেন, তাই আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে যোগ নেই।

তখন সারগেই আমায় কিছু-কিছু আধুনিক তামিল কবিতা তর্জমা করে শোনাল। সেগুলো বেশ লাগল আমার।

আমি বললুম, তুমিও তো কবিতা লেখো। এবারে কিছু কবিতা শোনাও!

প্রথমে বেশ লজ্জা পেয়ে গেল সারগেই। এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু আমি ছাড়ব কেন?

শেষ পর্যন্ত কিছু-কিছু লাইন শোনাতে লাগল। ওর বেশ কল্পনাশক্তি আছে। ভারত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়েও কিছু কবিতা লিখেছে সারগেই। তার মধ্যে একটি কবিতার বিষয়বস্তু হচ্ছে ঘুঁটে। ভারতের গ্রামে-গঞ্জে-শহরের দেওয়ালে-দেওয়ালে দেখতে পাওয়া যায় ঘুঁটে। সেইসব ঘুঁটের মধ্যে যে পাঁচটা আঙুলের ছাপ পড়ে, সেটাই আকৃষ্ট করেছে সারগেইকে। যেন ওপরের দিকে বাড়ানো হাজার-হাজার হাত। নীরব, অথচ কিছু বলতে চায়।

সারগেই-এর কবিতা কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, এখনও কোনও বই বেরোয়নি। বই বার করা সহজ নয়। আমাদের দেশে তরুণ কবিরা অনেকেই নিজের খরচে বই ছাপে। কিংবা অনেক ছোট প্রকাশক আছে, তাদের মধ্যে যদি কেউ ইচ্ছে করে তো ছাপিয়ে দিতে পারে। এ দেশে ব্যক্তিগত মালিকানায় কোনও প্রকাশনালয় নেই। কবিরা তাদের পাণ্ডুলিপি জমা দেয় সরকারি প্রকাশনালয়ে। সেখানকার বিশেষজ্ঞরা যদি মনোনীত করেন, তবে বই ছাপা হয়। সেজন্য সময় লাগে। অবশ্য পত্র-পত্রিকাতে লেখার সময়ই যদি কারুর কবিতা খুব বিখ্যাত হয়ে যায়, তবে তার বই নিশ্চয়ই ছাপা হয় তাড়াতাড়ি। ইয়েফতুশেংকোর খ্যাতি যখন আমাদের কাছে পৌঁছেছে তখন তার বয়েস কুড়ি-একুশ।

পরদিন আমরা গেলুম একটি যুব পত্রিকার দফতরে। ঠিকানা খুঁজে পেতে খানিকটা ঝামেলা হল। তার ফলে অবশ্য লেনিনগ্রাড শহরটি অনেকখানি দেখা হয়ে গেল।

গত মহাযুদ্ধে এই লেনিনগ্রাড শহরে যে সাংঘাতিক লড়াই হয়েছিল এবং এখানকার নাগরিকরা অসীম সাহস আর মনোবল দেখিয়েছিল, তা যুদ্ধের ইতিহাসে চিরকাল লেখা থাকবে। নাতসি বাহিনী এই শহরটি অবরুদ্ধ করে রেখেছিল ৯০০ দিন, তবু লেনিনগ্রাডের পতন হয়নি। নিয়মিত বোমা ও কামানের গোলা বর্ষণ হয়েছে, স্থলপথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার ফলে খাদ্যদ্রব্য ফুরিয়ে গিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত অনেকে নাকি কুকুর-বেড়াল পর্যন্ত খেয়েছে, তবু এখানকার নাগরিকরা নাতসি বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। শুধু অনাহারেই সেবার ছ'লক্ষ নারী-পুরুষের মৃত্যু হয়েছিল।

সেই যুদ্ধের কোনও চিহ্নই এখন নেই। কোনও ধ্বংসস্তূপ চোখে পড়ে না। বড়-বড় পার্ক, সুন্দর সুন্দর বাড়ি, চওড়া রাস্তা ও মাঝে-মাঝেই দৃষ্টি কেড়ে নেবার মতন ভাস্কর্য। লেনিনগ্রাডের নাগরিকরাও বেশ সুসজ্জিত, অনেক মহিলার অঙ্গে ফ্যাসনেব্‌ল পোশাক, জিন্‌স পরিহিত যুবকদেরও দেখা যায়।

লেনিনগ্রাডে কিছু কিছু পুরোনো পাড়াও রয়েছে। এখানকার বাড়িগুলো ব্যারাকবাড়ির মতন; রাস্তা দিয়ে ট্রাম চলে, ট্রাম লাইন থাকলেই সেইসব রাস্তা কিছুটা ভাঙা ভাঙা হয়। এখানে সেখানে জল জমে থাকে। এই এলাকায় বেশ একটা কলকাতার সঙ্গে মিল খুঁজে পেলুম। নিউ ইয়র্ক শহরেও বেশ কয়েকটা রাস্তা আছে এরকম, ভাঙা-ভাঙা, পাশে জঞ্জাল জমে থাকা, ও মানুষের ভিড় দেখে কলকাতার কথা মনে পড়েছিল আমার। পৃথিবীর যেখানেই যাই, কলকাতার সঙ্গে মিল খুঁজি।

যুব পত্রিকাটির অফিস কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ঠিক রাস্তায় এসেছি, ঠিক নম্বরের বাড়ির সামনে এসেছি, কিন্তু সেখানে কোনও পত্রিকা অফিস নেই। সারগেই একটুতেই নার্ভাস হয়ে যায়, সে ছোটাছুটি করতে লাগল। এদেশে সবাই খুব ঘড়ির কাঁটা মেনে চলে। আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় পার হয়ে যাচ্ছে। সারগেই একটা টেলিফোন বুথে ঢুকে টেলিফোন গাইড দেখে ঠিকানাটা চেক করে এল। ঠিকই আছে, তা হলে পত্রিকার অফিসটা গেল কোথায়? রাস্তায় দু-একজন পথচারীকে জিগ্যেস করা হল, তাঁরা কোনও সাহায্য করতে পারলেন না। দু-একজন মনে হল পত্রিকাটির নামই শোনেননি। রাস্তায় এ সময় অধিকাংশই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, তারা যুব-পত্রিকা পড়েন না।

শেষ পর্যন্ত হদিশ পাওয়া গেল। আমাদের কাছে যে ঠিকানা লেখা আছে, ঠিক তার পাশের বাড়িতেই পত্রিকা অফিসটি কিছুদিন আগে উঠে গেছে। আমরা সে বাড়ির সামনে দিয়েই কয়েকবার ঘুরে গেছি। শীতের মধ্যেই সারগেই-এর কপালে প্রায় ঘাম জমে গিয়েছিল, এবারে সে নিশ্চিন্ত হল।

পত্রিকাটির নাম "অরোরা"। সারা দেশের স্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েরা এখানে লেখা পাঠাতে পারে। এইরকম পত্রিকা থেকেই নতুন-নতুন সাহিত্য-প্রতিভার সন্ধান পাওয়া যায়। এঁদের নিজস্ব প্রেস আছে, প্রচার সংখ্যা আড়াই লক্ষ'র বেশি।

কলেজ জীবনে আমিও কৃত্তিবাস নামে একটি কবিতা-পত্রিকা সম্পাদনা করেছি, প্রথম দিকে বেশ কয়েক বছর তাতে শুধু তরুণ লেখকদের রচনা ছাপা হত, এবং আমাদের মুদ্রণ সংখ্যা কোনওক্রমে টেনেটুনে এক সময় আড়াই হাজার পর্যন্ত উঠেছিল। সে পত্রিকা চালাবার জন্য আমাদের কখনও কখনও ভিক্ষে পর্যন্ত করতে হত। বন্ধু-বান্ধবরাই ঘাড়ে করে সে পত্রিকা পৌঁছে দিত স্টলে স্টলে, লেখকদের সম্মান-দক্ষিণা দেওয়ার প্রশ্নই ছিল না। শিল্পীরাও বিনা পয়সায় এঁকে দিতেন মলাট। সেই জন্যই এখানকার যুব পত্রিকার পরিচালনা ব্যবস্থা জানবার জন্য আমার আগ্রহ ছিল।

এ দেশে পত্রিকার খরচ তোলার ব্যাপারে বিজ্ঞাপনের জন্য ঘোরাঘুরি ও হ্যাংলামির প্রয়োজন হয় না, ছাপার খরচ জোগাড় করার দুশ্চিন্তা নেই। কারণ সরকারই এর পৃষ্ঠপোষক। সোভিয়েত ইউনিয়ানে যে-কোনও পত্র-পত্রিকায় কোনও লেখা ছাপা হলেই লেখককে টাকা দেওয়া হয়। পত্রিকার প্রচার সংখ্যা অনুযায়ী টাকার অঙ্ক বাড়ে কমে। এদেশের একটি বহুল প্রচারিত পত্রিকায় একটি মাত্র ছোট গল্প লিখে সাত-আট হাজার টাকা (আমাদের হিসেবে) পাওয়া আশ্চর্য কিছু নয়। পত্র-পত্রিকার সংখ্যা অনেক, সেই জন্য যার কিছুমাত্র সাহিত্য-প্রতিভা আছে, তার পক্ষেই আত্মপ্রকাশের সুযোগ পাওয়া সহজ।

অরোরা পত্রিকার সম্পাদক কিন্তু অল্পবয়েসি যুবক নয়। টাক-মাথা একজন ভদ্রলোক। তিনি ইংরিজি জানেন না, কথাবার্তা চলছিল সারগেই-এর মাধ্যমে। নানান আলাপ-আলোচনার পর আমি জিগ্যেস করলুম, আপনারা যে রচনা নির্বাচন করেন, তার কি কোনও গাইড লাইন আছে? আপনারা কি বিষয়বস্তু ঠিক করে দেন?

তিনি হেসে বললেন, না, যার যা খুশি লিখতে পারে? তবে, আমাদের তরুণ লেখকরা সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের জন্য, শ্রমিক-কৃষক ঐক্য, সম-ভ্রাতৃত্ব, বিশ্বশান্তি এসব বিষয়েই লেখে।

আমি বললুম, সে তো বটেই। সব কবিই এসব চায়। কিন্তু তরুণ বয়েসে একটা বিদ্রোহের মনোভাব থাকে, বিশেষত আগেকার লেখকরা যা লিখেছেন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ থাকে, কোনও-কোনও মূল্যবোধকে ভাঙতেও চায়।

তিনি বললেন, সেরকম কেউ এখানে লেখে না।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, সে কী! এখানে তরুণ লেখকদের মধ্যে অন্য কোনও বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা, কিংবা ফর্ম ভাঙার ঝোঁক নেই?

তিনি বললেন, কেউ সেরকম লিখলে আমরা তাদের চিঠি লিখে জানাই কোথায় কোথায় ভুল হচ্ছে, তাদের পরামর্শ দিই।

আমি বললুম, কাল রাত্রেই আমি বেল্লা আখমাদুলিনা-র একটি কবিতা পড়েছি, তার নাম 'সামথিং এল্স', চমৎকার কবিতা! এই কবিতাটির সেরকম কোনও বিষয়বস্তুই নেই, কবিতা লিখতে না পারার দুঃখ নিয়ে লেখা। এটাই তো একটা নতুন ফর্ম, পুরোনো ফর্মের প্রতিবাদ!

সম্পাদক মশাই আবার জোর দিয়ে বললেন, আমাদের নতুন লেখকরা যাতে আদর্শবাদ, সম-ভ্রাতৃত্ব, বিশ্বশান্তি নিয়ে লেখে, সেটাই আমরা চাই...

সম্পাদক মশাইয়ের দৃষ্টিভঙ্গি আমার ঠিক মনঃপূত হল না। যেন তিনি একটি উঁচু আসনে বসে তরুণ লেখকদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছেন। অবশ্য এমনও হতে পারে, ভাষার ব্যবধানের জন্য আমরা পরস্পরের বক্তব্য ঠিক বোঝাতে পারিনি।

চা খেয়ে আমরা বিদায় নেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালুম। আমাদের পাশেই আর একজন অত্যন্ত রূপবান যুবক আগাগোড়া চুপ করে বসেছিল। আমি ভেবেছিলুম সে ইংরেজি জানে না। তার সঙ্গে

করমর্দন করতে যেতেই সে নিখুঁত ইংরেজি উচ্চারণে বলল, চলুন, আমি আপনাকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিচ্ছি।

এই যুবকটি এখানকার এ পি এন অফিসের একজন কর্মী। এত সুন্দর চেহারা, ওকে চলচ্চিত্রের নায়ক হলেই যেন মানাত। ওর ব্যবহারও খুবই ভদ্র। সে আমাকে জিগ্যেস করল, লেনিনগ্রাড আপনার কেমন লাগল?

আমি বললুম, খুবই তো ভালো লাগছে। মে-দিবসের প্যারেড দেখে মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু এত বড় শহর, এখানে কত কী দেখার আছে, কিন্তু অনেক কিছুই দেখা হল না। তাই একটা অতৃপ্তি থেকে যাচ্ছে।

যুবকটি বলল, নিশ্চয়ই এখানে অনেক কিছু দেখবার আছে। তবে এখন ছুটির সময় চলছে, তা ছাড়া বৃষ্টি পড়ছে।

সারগেই বলল, আজ সন্ধেবেলাতেই আমাদের চলে যেতে হবে।

আমি বললুম, হারমিটেজ মিউজিয়াম কিন্তু দেখতেই হবে।

ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে তাই রাস্তায় দাঁড়িয়ে গল্প করা সম্ভব নয়। আমরা একটা ট্যাক্সি ধরে নিলুম।

হারমিটেজ মিউজিয়ামটিকে কেউ-কেউ ফরাসি কায়দায় 'অ্যারমিতাঝ' বলে। আমি 'অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী' স্মরণ করে চট করে বিদেশি উচ্চারণেব অনুকরণে সাহস পাই না, ইংরিজিতে সন্তুষ্ট থাকি।

এই হারমিটেজ মিউজিয়াম উইন্টার প্যালেসের সংলগ্ন, সেটাও এখন মিউজিয়াম। এই দুটি প্রাসাদ মিলে যে মিউজিয়াম তা বিশ্বে বৃহত্তম। এর পুরোটা সাতদিনেও দেখে শেষ করা বোধহয় সম্ভব নয়, আমাদের হাতে আছে মাত্র কয়েক ঘণ্টা।

সারগেই বলল, এই মিউজিয়ামে অনেক ভারতীয় ঐতিহাসিক জিনিসপত্তর আছে শুনেছি, চলুন আগে সেগুলো দেখে নিই।

আমি বললুম, সারগেই, আমি ইন্ডোলজিস্ট নই। আমাদের দেশেই যা ঐতিহাসিক পুরাকীর্তি আছে, তার অনেক কিছুই এখনও দেখা হয়নি। বিদেশে এসে ভারতীয় ঐতিহাসিক নিদর্শন দেখার আগ্রহ আমার নেই। এত বড় মিউজিয়ামে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করতে গেলে ক্লান্ত হয়ে যাব। আমি কি দেখব তা আগেই ঠিক করে রেখেছি। আমি জানি, ফরাসি ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পীদের কিছু ভালো কালেকশান আছে এখানে, আমি শুধু সেগুলিই দেখতে চাই, যা পৃথিবীর আর অন্য কোথাও দেখা যাবে না।

সারগেই একটু কৌতূহলী চোখে তাকাল আমার দিকে। তারপর জিগ্যেস করল, ফরাসি ছবি সম্পর্কে আপনাদের আগ্রহ হল কী করে? আপনারা কি আপনাদের দেশে ওরিজিনাল ছবি দেখতে পান?

আমি হেসে বললুম, না, আমরা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাই। আমাদের দেশে যারা ফিল্মে উৎসাহী, বার্গমান, ফেলিনি, গদার, বনুয়েল, ওয়াইদা, কুরোশোওয়া-র নাম তাদের মুখে-মুখে, তাদের সব ছবির কাহিনি ও ট্রিটমেন্টের অভিনবত্ব তাদের মুখস্থ, যদিও ওঁদের ফিল্ম দেখার সুযোগ নেই। কালেভদ্রে যে দু-চারটি ছবি দেখানো হয় তাও দশ-পনেরো বছরের পুরোনো। যারা শিল্প ভালোবাসে, তারা মাতিস্, পিকাসো, ব্রাক্, রুয়ো, মার্ক শাগাল-এর নামে প্রায় উন্মাদ, যদিও ওঁদের ওরিজিনাল ছবি প্রায় কেউ-ই দেখেনি। কিন্তু সেটা কি দোষের? আমাদের গরিব দেশ বলে পৃথিবীর শিল্প-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ফসলগুলি আমাদের কাছে পৌঁছয় না। কিন্তু শ্রেষ্ঠ জিনিস সম্পর্কে আমাদের যে আগ্রহ ও কৌতূহল আছে, সেটা কি কম কথা?

সারগেই বলল, সত্যি খুব আশ্চর্য ব্যাপার!

মিউজিয়ামে ঢুকে অন্যান্য ভালো ভালো জিনিস বাদ দিয়ে আমরা চলে এলুম ছবির ঘরের দিকে। জারদের আমলেই মূল্যবান ছবির সংগ্রহ শুরু হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নাতসিরা তস্করবৃত্তি

করে নানান দেশ থেকে যেসব বিখ্যাত ছবি নিজেরা কুক্ষিগত করে রেখেছিল, বার্লিন জয়ের পর রেড আর্মি তার অনেকগুলি দখল করে নেয়। সব মিলিয়ে এখানে বহু ছবির দুর্লভ সমাবেশ।

ঘুরতে-ঘুরতে আমি চমৎকৃত হয়ে গেলুম সারগেই-এর ছবি সম্পর্কে জ্ঞান দেখে। মাত্র বাইশ বছর তার বয়েস, কিন্তু সে গত শতাব্দীর ছবির জগতের নানান আন্দোলন, প্রত্যেক শিল্পীর আলাদা বৈশিষ্ট্যের কথা জানে। আমার থেকে অনেক বেশিই জানে। আমার নজর এড়িয়ে যাচ্ছিল, সে আমাকে ডেকে দুই দেয়াল ভরতি দেগা-র অনেকগুলি ছবি দেখাল। মোনে ও মানে-র ছবি বোঝাল আলাদা করে। আমি দেখতে চাইছিলুম ক্যান্ডিনস্কির ছবি, তার খোঁজে সে ঘুরতে লাগল এঘর ওঘর।

এইসব ছবি বিশেষ মূল্যবান এই কারণে যে এইসব ছবির প্রিন্টও খুব দুর্লভ।

সারগেই একবার আমাকে ডেকে জিগ্যেস করল, আপনার টিনটেরেট্টোর ছবি ভালো লাগে না? এই দেখুন—

আমার মজা লাগল। একটি কিশোরপাঠ্য গোয়েন্দা কাহিনি লিখে আমাদের দেশে টিনটেরোট্টোকে নতুন করে জনপ্রিয় করেছেন সত্যজিৎ রায়। এখানে টিনটেরেট্টোর একাধিক ছবি আছে। তার মধ্যে একটি আবার যিশুর!

কখন দু-ঘণ্টা পার হয়ে গেছে খেয়ালই করিনি। সারগেই আমাকে মাঝে মাঝে তাড়া দিচ্ছে, আমাদের সন্ধের সময় ট্রেন ধরতে হবে। আরও অনেক ছবি দেখা বাকি, সেইজন্য একটু দ্রুত পা চালাতে হল। এক সময় একটি নারীর ভাস্কর্য দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। শিল্পীর নাম আমার চেনা নয়। কিন্তু মূর্তিটি অপূর্ব!

তারপর এক সময় আমি সারগেইকে হারিয়ে ফেললুম।

॥ ৭ ॥

এত বড় মিউজিয়ামের মধ্যে কাউকে হারিয়ে ফেললে খুঁজে বার করা শক্ত। সারগেইকে দেখতে না পেয়ে আমি ভাবলুম এই সুযোগে আরও বেশি করে হারিয়ে যাওয়া যাবে, তাহলে আরও বেশিক্ষণ ছবি দেখা যাবে। সন্ধেবেলা ট্রেন ধরতে হবে বলে সারগেই তাড়া দিচ্ছিল, ঠিক ক'টার সময় ট্রেন তা আমি জানি না।

আর দু-একটা ঘর ঘোরার পর আমার মনের মধ্যে খচখচ করতে লাগল। সারগেই একটুতেই নার্ভাস হয়ে যায়। এতক্ষণ ও আমায় কোথায় খোঁজাখুঁজি করছে কে জানে! আমাদের বেরিয়ে পড়বার কথা ছিল, ও নিশ্চয়ই আমার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছে।

মিউজিয়াম থেকে বাইরে এসে দেখি সেখানেও সারগেই নেই। ফাঁকা রাস্তা, শন-শন করে হাওয়া দিচ্ছে। ওভারকোটের কলার তুলে পকেটে দু-হাত গুঁজে আমি পায়চারি করতে লাগলুম। অচিরেই আমি অন্তর্হিত হয়ে গেলুম লেনিনগ্রাড থেকে। এখন আমি কায়রোর রাস্তায়। কেন হঠাৎ কায়রোর কথা মনে পড়ল তা কে জানে, কায়রোতে আমি গেছি অনেককাল আগে, এবং লেনিনগ্রাডের সঙ্গে কায়রোর কোনওরকম মিল নেই।

কায়রোতে একদিন আমি হোটেলের রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলুম, ঠিকানাটাও মনে ছিল না। একজন ট্রাফিক কনস্টেবলের কাছে গিয়ে জিগ্যেস করেছিলুম সে আমায় কোনও সাহায্য করতে পারবে কি না! পুলিশটি কোনও উত্তর না দিয়ে আমার হাত ধরে টানতে-টানতে নিয়ে চলল। আমি তো হতভম্ব। ডিউটির সময় তার সঙ্গে কথা বলে আমি অপরাধ করে ফেলেছি? সেইজন্য সে আমায় গ্রেপ্তার করল? পুলিশটি আমায় নিয়ে এল একটি দর্জির দোকানের সামনে এবং দর্জিকে ডেকে কী সব বলল। তখন ব্যাপারটা পরিষ্কার হল, ওই দর্জি ইংরিজি জানে, সে আমায় সাহায্য করবে। ততক্ষণে সে রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম শুরু হয়ে গেছে।

আমি আবার লেনিনগ্রাডে ফিরে এলুম। এখানে রাস্তা হারাবার কোনও আশঙ্কা নেই। নদীর ধার দিয়ে হেঁটে গেলে আমার হোটেল খুঁজে পাবই। কিন্তু সারগেই গেল কোথায়?

মিনিট দশেক বাদে সারগেই বেরিয়ে এল। উদ্‌ভ্রান্তের মতন চেহারা, রীতিমতন হাঁপাচ্ছে সে। আমার কাছে এসে ফুঃ করে মুখ দিয়ে বিরাট নিশ্বাস ছেড়ে সে বলল, সুনীলজি, কী হয়েছিল! আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

আমি মুচকি হেসে বললুম, আমি ইচ্ছে করেই তোমার কাছ থেকে লুকিয়ে পড়েছিলুম। তোমার সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ পর দেখা হলে আমরা ট্রেন মিস করতুম, তা হলে ভালোই হত, আরও দু-একদিন থেকে যাওয়া যেত লেনিনগ্রাডে। আমার আজই লেনিনগ্রাড ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না।

সারগেই বলল, আমাদের যেসব প্রোগ্রাম করা আছে। ট্রেনের টিকিট, হোটেল বুকিং, অ্যাপয়েন্টমেন্টস!

আমি বললুম, চলো।

সারগেই একবার মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে দেখতে না পেয়ে আবার ভেতরে ঢুকেছিল, তারপর প্রায় দৌড়ে গোটা মিউজিয়ামটাতেই আমাকে খুঁজে দেখে এসেছে।

হোটেলে ফিরে আমরা তৈরি হয়ে নিলুম তাড়াতাড়ি।

শীতের দেশে এলে মোটাসোটা জামাকাপড় আনতে হয়, তাই আমার সুটকেসটি বেশ ভারী। যাতে বইতে না হয় সেজন্য তলায় চাকা লাগানো। স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম দিয়ে আমি সুটকেসটার টিকি ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছি আর ঘর্ঘর-ঘর্ঘর শব্দ হচ্ছে, লোকজনরা ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে। যদি অন্যদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তা হলে আর চাকা লাগাবার মানে কী? সুটকেসটা আমি তুলে নিলাম।

আমাদের দেশের রেল স্টেশনগুলিতে মৌমাছির ভন্‌ভনের মতন সবসময় একটানা একটা আওয়াজ শোনা যায়। শ্বেতাঙ্গ জাতিরা প্রকাশ্য স্থানে নীরবতা পছন্দ করে। এত বড় স্টেশন, এত মানুষ, অথচ প্রায় কোনও শব্দই নেই। হকারদের চ্যাঁচামেচির তো কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

কিছু-কিছু মানুষ স্বভাবেই ব্যস্তবাগীশ। ট্রেন বা প্লেন ধরতে হলে সারাদিন ধরে তাদের উৎকণ্ঠা থাকে। যদি ঠিক সময় পৌঁছনো না যায়, রাস্তা জ্যাম হয়, এইজন্য তারা রওনা হয় অনেক আগে। সারগেইও অনেকটা সেইরকমের। আমাদের ট্রেন ছাড়তে এখনও পুরো এক ঘণ্টা বাকি।

রাত্রির ট্রেনে সকলেরই শুয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা। আমাদের কুপেতে চারটে বার্থ। অন্য দুজন এখনও এসে পৌঁছয়নি। প্রতিটি বার্থেই রয়েছে বেশ পুরু তোষকের বিছানা ও কম্বল। এই কুপের মধ্যে ধূমপান নিষিদ্ধ, তার জন্য বাইরে আলাদা জায়গা আছে।

ট্রেন ছাড়ার কয়েক মিনিট আগে অন্য দুজন যাত্রী এসে পৌঁছল। যাত্রী নয়, যাত্রিনী, দুজনেরই বয়েস তিরিশের মধ্যে, বেশ সুসজ্জিত। এরা কি দুই বোন, না দুই বান্ধবী? বোঝবার কোনও উপায় নেই। সারগেই-এর সঙ্গে তারা রুশ ভাষায় মামুলি দু-একটা কথা বলল মাত্র, গল্প করার কোনও উৎসাহ দেখাল না, দুজনে দুটি বই খুলে বসল।

চলন্ত ট্রেনের জানলা দিয়ে আমি তাকিয়ে রইলুম বাইরে। প্রায় সাড়ে আটটা বাজে, কিন্তু বাইরে কোনও অন্ধকার নেই। লেনিনগ্রাড শহর হোয়াইট নাইটসের জন্য বিখ্যাত, যে সময় সারা রাতে অন্ধকার নামে না। এখন অবশ্য সে সময় আসেনি।

একটু বাদে একজন যুবতী সারগেইকে কিছু বলতেই সারগেই আমাকে জানাল, চলুন সুনীলজি, আমরা একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াই।

আমরা বাইরে যেতেই মেয়ে দুটি দরজা বন্ধ করে দিল। বুঝলুম ওরা রাত্রির জন্য পোশাক বদলে নিচ্ছে। আমাদের অবশ্য পোশাক বদলাবার প্রশ্ন নেই, যা পরে আছি, সেই সুদ্ধুই শুয়ে পড়ব। সারগেইকে প্রথম দিন যে চামড়ার কোটটা পরতে দেখেছি সেটা আর সে ছাড়েনি।

বাইরে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাতেই অন্য একজন লোক এসে আমার কাছ থেকে একটা সিগারেট চাইল। আগেও কয়েকবার আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে। এটা বেশ মজার লাগে। আমার

সিগারেট ফুরিয়ে গেল আমিও নিশ্চয় যে-কোনও একজনের কাছ থেকে সিগারেট চাইতে পারি বিনা দ্বিধায়।

লোকটি কিছু জিগ্যেস করল আমাকে। সারগেই অনুবাদ করে বোঝাল যে, লোকটি জানতে চাইছে, আমি কি এদেশে নতুন এসেছি, আমার এ দেশ কেমন লাগছে?

অনুবাদে আড্ডা জমে না, কুপের দরজা খুলতেই আমরা চলে এলুম ভেতরে। যুবতী দুটি পোশাক বদল করে আবার বই খুলে বসেছে। আমার হ্যান্ডব্যাগে কোনও বই নেই। তখন সুটকেস খোলা এক বিড়ম্বনা।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। তারপর এক সময় একটি মেয়ে সারগেইকে কিছু বলতেই সে আমায় জানাল, সুনীলজি, এখন আলো নিবিয়ে দিলে আপনার কোনও আপত্তি আছে?

আমি বললুম, না, না, আপত্তি কেন থাকবে?

যদিও এত তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ার কোনও বাসনা আমার ছিল না। ইচ্ছে করছিল কিছুটা গল্পগুজব করতে। মেয়ে দুটির সঙ্গে কথা বলার উপায় নেই। ভাষা জানি না। সারগেই নব বিবাহিত যুবক, অন্য মেয়েদের প্রতি তার বোধহয় কোনও ঔৎসুক্য নেই এখন।

ট্রেনে আমার ভালো ঘুম আসে না। সারারাত ধরে আমি প্রায় তিনশো স্বপ্ন দেখলুম। একটি প্রকাণ্ড স্বপ্নমালা বলা যায়।

সকাল বেলা কোনও স্টেশন থেকে চা বা কফি কেনার দরকার হয় না। যে মহিলা কন্ডাকটর গার্ড কাল রাত্রে আমাদের টিকিট পরীক্ষা করতে এসেছিলেন, তিনিই সকালবেলা নিজে হাতে করে আমাদের জন্য কফি নিয়ে এলেন। এই কফির দাম বোধহয় টিকিটের মধ্যেই ধরা থাকে।

সকালবেলা যুবতী দুটি মুখ খুলল, টুকিটুকি প্রশ্ন করতে লাগল আমাদের। দেখা গেল, এদের মধ্যে একজন ইংরিজি জানে। যাঃ, তা হলে তো এর সঙ্গে অনায়াসেই ভাব জমানো যেত। কিন্তু এখন আব সময় নেই, রিগা স্টেশন প্রায় এসে গেছে।

এক একজন লোককে দেখলেই মনে হয় বেশ সুরসিক। এ পি এন-এর যে প্রতিনিধি আমাদের রিসিভ করতে এসেছেন স্টেশনে, তাঁর মুখখানাও সেরকম। ছাতা হাতে ছিপছিপে চেহারার ভদ্রলোক আমাকে বললেন, আপনি যে ক'দিন এখানে থাকবেন, আপনার খুব টাইট প্রোগ্রাম, সব জায়গাতেই যেতে হবে, বিশ্রামের সুযোগ পাবেন না। এখন হোটেলে গিয়ে একটু বিশ্রাম করে নিন, দশটার সময় আমরা আবার আসব।

আমি কিন্তু ক্লান্ত বোধ করছি না একটুও। শরীরটা বেশ হালকা হালকা লাগছে। গ্রীষ্মকালে ঠান্ডা মিহি বাতাসের স্পর্শ, তার আমেজই আলাদা।

হোটেল ল্যাটভিয়া বেশ আধুনিক কায়দার হোটেল, কিন্তু এর সামনে নদী নেই। সাততলার ওপরের ঘর থেকে দেখতে পাওয়া যায় সামনের ব্যস্ত রাস্তা ও একটি বিশাল গির্জার অঙ্গন।

ল্যাটভিয়া রাশিয়ার মধ্যে নয়, একটি স্বতন্ত্র রাজ্য, সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত একটি রাষ্ট্র। অবশ্য রাশিয়ার সঙ্গে এর সম্পর্ক খুবই নিবিড়, এখানকার প্রধান কবি জ্যানিস রেইনিস-এর ভাষায় "মুক্ত রাশিয়ার মধ্যে মুক্ত ল্যাটভিয়া।"

ল্যাটভিয়ার জনসংখ্যা মাত্র পঁচিশ লক্ষ, আমাদের পশ্চিমবাংলার অনেক জেলার জনসংখ্যাই এর চেয়ে বেশি। তবু এই ছোট রাজ্যটি নিয়েই ইতিহাসে অনেক রকম রাজনৈতিক খেলা চলেছে। মধ্য শতাব্দীতে এই ল্যাটভিয়া ছিল জার্মান ফিউডালদের শাসনে। তখন দমন ও অত্যাচার ছিল চরম। ল্যাটভিয়ানরা মূলত ছিল লুথেরান, তাদের ওপর জোর করে ক্যাথলিক মতবাদ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হত। দোম ক্যাথিড্রালের সামনের ময়দানে ক্যাথলিক সাধুরা শত-শত লোককে ধর্মদ্বেষের নামে পুড়িয়ে মেরেছে। সেই সময় জার্মানদের চোখে ল্যাটভিয়ানরা ছিল দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে রাশিয়ান সম্রাট পিটার দা গ্রেট-এর বিজয়ীবাহিনী ল্যাটভিয়াকে রুশ

সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করে নেয়। সেই সময় রিগা হয়ে ওঠে রাশিয়ার একটি প্রধান বন্দর। জারদের আমলে ল্যাটভিয়ার ব্যবসায়ী শ্রেণির সমৃদ্ধি হয়েছিল বটে, কিন্তু শ্রমিক-কৃষকদের অবস্থা বিশেষ কিছু বদলায়নি।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মান সম্রাট কাইজার ল্যাটভিয়াকে আবার দখল করে নেবার লোভ করেছিল। ব্যাবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র এবং কাঁচা মাল সরবরাহের জন্য ল্যাটভিয়ার গুরুত্ব ছিল। এখানকার বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক মহলের টান ছিল রুশ বিপ্লবীদের দিকে। অক্টোবর রিভোলিউশানে অনেক ল্যাটভিয়ান যুবকও অংশগ্রহণ করেছিল। সামরিক জার্মান অবরোধের বিরুদ্ধে ল্যাটভিয়ান রাইফেলম্যানরা বিদ্রোহ শুরু করে দেয়। ১৯১৮ সালের ডিসেম্বরে ল্যাটভিয়া নিজেকে স্বাধীন সোভিয়েত রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে।

কিন্তু পাঁচ মাস পরেই ল্যাটভিয়াতে আবার পালা বদল শুরু হয়। জার্মানির সহযোগিতায় ল্যাটভিয়ার সোভিয়েত-বিরোধী হোয়াইট গার্ডরা আবার ক্ষমতা দখল করে নেয়। তারপর সুদীর্ঘকাল ধরে ল্যাটভিয়াতে বিপর্যয় চলতে থাকে, এই রাজ্যটি আবার সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ফিরে আসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়, সে ইতিহাস অনেকেরই জানা।

একটা জিনিস এখানে এসে বারবার মনে হচ্ছে, পুরোনো ঐতিহ্য রক্ষায় সোভিয়েত নাগরিকরা খুবই তৎপর। লেনিনগ্রাডের মতন রিগা শহরেও প্রচণ্ড তাণ্ডব চলেছিল, এখন তার কোনও চিহ্নই নেই। শুধু তাই নয়, বোমার আঘাতে যেসব ঐতিহাসিক অট্টালিকা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, সেখানে কিন্তু নতুন বাড়ি ওঠেনি, অবিকল আগের বাড়িটাই পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।

রিগা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন সুদৃশ্য শহর। হোটেল থেকে বেরিয়ে আমরা প্রথমে শহরটা ঘুরে দেখতে বেরুলুম, শহরটা দেখতে তো সুন্দর বটেই, তা ছাড়া আমার আর একটি অনুভূতিও হল, আমি এখানে খুব সহজ ও সাবলীল বোধ করছি। কোনও নতুন জায়গায় গেলে কাঁধ দুটো একটু উঁচু হয়ে থাকে। কে কী ভাবছে, কেউ আমাকে লক্ষ করছে কি না, কোনও আদবকায়দায় ভুল করে ফেললুম কি না, এইসব ভেবে সবসময় একটা সতর্ক ভাব বজায় রাখতে হয়। এখানে সেই ব্যাপারটা নেই। যে-কোনও অচেনা লোকের সামনে দাঁড়ালেই একটা পারস্পরিক তরঙ্গ বিনিময় হয়। অর্থাৎ সে আমাকে প্রথম দর্শনেই অপছন্দ করছে কি না তা আমরা বুঝে যাই। এখানে শুধু রিগায় নয়, লেনিনগ্রাড ও মস্কোতেও সেই তরঙ্গ বিনিময় বেশ সন্তোষজনক। যে-কোনও লোকের সঙ্গেই কথা বললে বোঝা যায়, ভারতীয়দের সম্পর্কে এখানে কোনও বিরূপ মনোভাব বা অবজ্ঞার ভাব নেই।

রিগা শহরের কেন্দ্রে রয়েছে তিন ল্যাটভিয়ান রাইফেলম্যান-এর ভাস্কর্য। বিপ্লবের সময়ে এরাই প্রথমে এগিয়ে যায়, সেই সম্মানে এদের মূর্তি বসানো রয়েছে। শহরের যে-কোনও জায়গা থেকে দেখা যায় প্রাচীন দোম ক্যাথিড্রালের চূড়া। এখন এই ক্যাথিড্রালটিকে অর্গান রিসাইটালের কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

শহরের মাঝখানে একটি খুব পুরোনো পাড়াকে অবিকৃত রাখা হয়েছে। সরু সরু গলি, ছোট ছোট দোতলা বাড়ি, খোয়া পাথরের চত্বর। আমার সঙ্গীদের কাছে শুনলুম, পুরোনো ইউরোপের পটভূমিকায় যেসব সিনেমা তোলা হয় তার অনেকগুলিরই শুটিং-এর জন্য পরিচালকরা রিগা শহরে আসেন।

এই পাড়ারই একটি ছোট রেস্তোরাঁয় আমরা গেলুম কফি খেতে। এই রেস্তোরাঁর নাম 'ড্রপ', গেটের কাছে কোট জমা রাখতে হয়, ভেতরটা অন্ধকার-অন্ধকার। টেবিলে টেবিলে মোমবাতি জ্বলছে। এই দোকানটির কফি নাকি খুব বিখ্যাত, ছেলে-ছোকরারা খুব আসে এখানে।

কালো গাউন পরা দীর্ঘকায়া এক যুবতী এল আমাদের কাছে অর্ডার নিতে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার প্রায় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতন অবস্থা। আমি যদি এই শহরের নাগরিক হতুম, তা হলে ওই রেস্তোরাঁয় নিশ্চয়ই রোজ কফি খেতে আসতুম।

সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা গেলুম নদীর ধারে। যে-কোনও শহরে এলেই আমার একবার নদী দেখে নিতে ইচ্ছে করে। এখানকার নদীর নাম ডাংগোভা। নদীটি তেমন প্রশস্ত নয়, তবু এর ওপরে একাধিক সেতু, দূরের একটি সেতু বেশ আধুনিক কায়দার।

এই নদীর ধার থেকে শহরটাকে অনেকখানি দেখা যায়। শুধু প্রাচীন বাড়ি নয়, নতুন বাড়িও উঠেছে অনেক। মস্কোতে হোটেল ইউক্রাইনের বাড়িটি যেরকম, সেরকম একটি বাড়ি এই শহরেও দূর থেকে চোখে পড়ে। স্তালিন আমলে এই ধরনের কিছু বাড়ি তৈরি হয়েছিল।

কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর আমরা এলুম একটি হোটেলে, দুপুরের আহার সেরে নেবার জন্য। হোটেলটির নাম 'ব্লু উইন্ড'। এখানে আমরা এ পি এন-এর নিমন্ত্রিত অতিথি। এ পি এন-এর স্থানীয় শাখার কর্তা এবং আরও কয়েকজন এসেছেন।

এই হোটেলটিও পুরোনো কায়দায় সজ্জিত। চাপা আলো। বড়-বড় পিঠ-উঁচু চেয়ার। চেয়ারগুলি ঠিকমতন সাজাতে গিয়ে একটা চেয়ার উলটে পড়ে গেল সশব্দে। এই ব্যাপারটা বেশ পছন্দ হল আমার। সবকিছু ঠিকঠাক চলার মধ্যে একটা কিছু হঠাৎ গণ্ডগোল হয়ে গেলে বেশ হয়। সবাই আমরা ভদ্র-মার্জিত ব্যবহার করছিলুম, এর মধ্যে একটা চেয়ার পড়ে যাওয়ায় সবাই একসঙ্গে চুপ।

সব সাজিয়ে ঠিকঠাক করে বসা হল। তবু তক্ষুনি খাবারের অর্ডার দেওয়া যাচ্ছে না। নিমন্ত্রণ কর্তাদের একজন বললেন, আমরা আর একজনের জন্য অপেক্ষা করছি, তিনি এক্ষুনি এসে যাবেন।

তখনও আমি জানি না, একটা বেশ চমক অপেক্ষা করছে আমার জন্য।

॥ ৮ ॥

একজন শীর্ণকায় প্রৌঢ় ব্যক্তি এলেন একটু পরে। চেহারা দেখলেই বোঝা যায় অধ্যাপক। গাড়িঘটিত কারণে দেরি হয়ে যাওয়ার জন্য সকলের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে তিনি আমার দিকে ফিরে পরিষ্কার বাংলায় বললেন, নমস্কার, কেমন আছেন?

সুদূর রিগা শহরে বসে একজন ল্যাট্‌ভিয়ান অধ্যাপকের মুখে বাংলা ভাষা শুনলে রোমাঞ্চিত হতেই হয়।

এঁর নাম ভিক্‌টর ইভবুলিস, ইনি ল্যাটভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। কোনও সরকারি প্রয়োজনে বাংলা শেখেননি। শিখেছেন নিজের আগ্রহে, মূল বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথ পড়বার জন্য।

আলেকজান্ডারের গুরু তাঁকে বলেছিলেন, তুমি যেখানে যাও, যত কিছুই দেখো, শেষ পর্যন্ত দেখবে মানুষের চেয়ে বিস্ময়কর আর কিছুই নেই! ছোট্ট দেশ ল্যাটভিয়া, যার জনসংখ্যাই মাত্র পঁচিশ লাখ, সেখানকার একজন মানুষ প্রাচ্যের কবি রবীন্দ্রনাথের লেখা পাঠ করবার জন্য বাংলার মতন একটি দুরূহ ভাষা শিখেছেন নিজের চেষ্টায়, এটা বিস্ময়কর নয়?

খাওয়ার ফাঁকে-ফাঁকে নানারকম গল্প হতে লাগল। আজ একেবারে ফুল কোর্স লাঞ্চ। সুপ্ দিয়ে আরম্ভ, সুইট ডিস দিয়ে শেষ, সঙ্গে ওয়াইন। এখানকার খাবারে প্রথম দিকে থাকে দু-একটি কোল্ড ডিস, অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের চিজ, হ্যাম, স্মোক্‌ড ফিস, কয়েক রকমের স্যালাড। তারপর আসে মেইন ডিস বা হট্ ডিস, রোস্ট চিকেন বা বিফের নানারকম রূপান্তর, বড়-বড় মাছও পাওয়া যায়।

অধ্যাপক ইভবুলিস মাঝে-মাঝে আমার সঙ্গে বাংলায় কথা বলছেন, অন্যদের সঙ্গে কখনও ইংরিজিতে, কখনও রাশিয়ানে; এ ছাড়া তিনি ফরাসি ও জার্মান জানেন, তাঁর মাতৃভাষা ল্যাটভিয়ান। ইনি মাতৃভাষায় রবীন্দ্রনাথের ওপর বই লিখেছেন, পরে তা রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে। কিছুদিনের জন্য শান্তিনিকেতনেও থেকে গেছেন কয়েক বছর আগে, কলকাতা সম্পর্কে ওঁর অভিজ্ঞতা বেশ মজার। উনি যখন কলকাতায় আসেন, সেই বছরেই কলকাতায় বন্যা হয়েছিল, তিন-চারদিন পথঘাট ও অনেক বাড়িই বেশ খানিকটা জলের তলায় ছিল।

অন্যরা আমাদের কথাবার্তা কৌতূহলের সঙ্গে শুনছিলেন, একজন জানতে চাইলেন, আচ্ছা, তোমাদের কলকাতাতেই তো মেট্রো-রেল হচ্ছে?

এই নিয়ে এই প্রশ্ন আমি তিনবার শুনলুম বিভিন্ন জায়গায়। কলকাতার উল্লেখ শুনেই কেউ কেউ এই কথাটা জিগ্যেস করেন। যেন এটাই কলকাতার একমাত্র পরিচয়। পৃথিবীর বহু শহরেই মেট্রো রেল আছে, সুতরাং কলকাতায় মেট্রো-রেল হওয়া এমন কী বিশেষ সংবাদ?

পালটা প্রশ্ন করে আমি ব্যাপারটা জেনে নিলুম। আসলে, কলকাতা সম্পর্কে বিশেষ কিছুই কেউ জানে না। তবে আমাদের মেট্রো রেলের প্রাথমিক স্তরে সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা এসে নানারকম সুপারিশ করেছেন, মস্কো শহরের মাটির সঙ্গে কলকাতার মাটির খানিকটা মিল আছে বলে কোন ধরনের পাতাল রেল এখানে উপযোগী হবে, সে ব্যাপারে সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা পরিকল্পনায় সাহায্য করেছেন, সেই খবর এখানকার পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। সুতরাং কলকাতা সম্পর্কে অনেকে শুধু ওই সংবাদটাই জানে।

আমি বললুম, কলকাতায় বন্যা হয়েছিল শুনে আপনারা ভাবছেন পাতাল রেল চালু হওয়ার পর আবার যদি বন্যা হয়, তখন কী হবে? তখন কী যে হবে, তা আমিও জানি না!

অধ্যাপক ইভবুলিস বললেন, কলকাতার যানবাহনে অনেক গোলমাল, আলোর ব্যবস্থা বড়ই খারাপ...।

বাংলাভাষা-প্রেমিক এই ল্যাটভিয়ান অধ্যাপক কলকাতায় এসে যে অনেক অসুবিধে ভোগ করেছেন তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তাঁর কণ্ঠে দুঃখের সুর ছিল, অভিযোগের নয়।

আমাকে আরও চমকে দিয়ে তিনি এরপরেই বললেন, আপনাদের 'দেশ' পত্রিকা আমি মাঝে মাঝে পড়ি। দেশ পত্রিকায় আমার সম্পর্কে লেখা হয়েছে, সে সংখ্যাটিও আমার কাছে আছে।

বেশ কয়েক বছর আগে অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী এসেছিলেন এই রিগা শহরে, অধ্যাপক ইভবুলিসের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। রিগা-র অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন দেশ পত্রিকার সাহিত্য সংখ্যায়, সে লেখাটি আমিও পড়েছিলাম, তবে অনেকদিন আগের কথা, ভালো মনে নেই।

অধ্যাপক ইভবুলিস তাঁর বাড়িতে সন্ধেবেলা আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন। দুপুরে হোটেলে খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে এবং বিকেলবেলা শহরটায় খানিকটা ঘোরাঘুরি করে তারপর যখন নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি, তখন সারগেই বলল, একটু দাঁড়ান, সুনীলজি!

দৌড়ে সে কোথায় চলে গেল, একটু বাদেই সে ফিরে এল কয়েকটি ফুল নিয়ে। তুষারশুভ্র কয়েকটি টিউলিপ ফুল, সেলোফিন কাগজে সুন্দর করে মোড়া। সারগেই বলল, অধ্যাপকের স্ত্রীর হাতে আপনি এটা দেবেন।

এর আগে রাস্তায় অনেককেই আমি এরকম ফুল হাতে নিয়ে যেতে দেখেছি। বড় বড় মোড়ে ফুলের দোকান। এদেশে কারুর বাড়িতে দেখা করতে গেলেই ফুল নিয়ে যাওয়া প্রথা। বিমান-যাত্রীদেরও আমি ফুল নিয়ে নামতে দেখেছি, প্রিয়জনের সঙ্গে প্রথম দেখা হতেই আগে তার হাতে ফুল তুলে দেয়। গাদাগুচ্ছের ফুল নয়, একটি বা দুটি বা তিনটি।

সোভিয়েত দেশে প্রত্যেক শহরেরই বাইরের দিকে প্রচুর ফ্ল্যাট বাড়ি উঠছে। প্রায় একই রকম চেহারা। সারা দেশের প্রতিটি পরিবারকে ফ্ল্যাট দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন সরকার, সে তো এক বিস্ময়কর, বিরাট কর্মযজ্ঞের ব্যাপার।

সারগেই আগে কখনও রিগা শহরে আসেনি, তার পক্ষে ঠিকানা খুঁজে বার করা কঠিন হত, তাই এ পি এন-এর একজন প্রতিনিধি নিয়ে এলেন আমাদের। তবু যাতে আমাদের চিনতে অসুবিধে না হয় সেইজন্য অধ্যাপক ইভবুলিস নিজেই দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁর বাড়ির সামনের রাস্তায়।

স্বাভাবিক কারণেই এইসব ফ্ল্যাটবাড়িগুলি বহুতল। ছোট-ছোট লিফট, এক সঙ্গে তিনজনের বেশি

ধরে না। একজনকে অপেক্ষা করতে হবে, অধ্যাপক ইভবুলিস নিজেই দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের আগে তুলে দিলেন।

আগেই শুনেছিলুম, অধ্যাপকের স্ত্রী মাদাম আর্তা দুমপেই একজন নামকরা ভাস্কর। দরজা যিনি খুললেন, তিনি একজন সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী রমণী, যৌবন এখনও উত্তীর্ণ হয়নি। আমি তাঁর হাতে ফুল তুলে দিতেই তিনি সহাস্যে আমাদের ভেতরে আহ্বান জানালেন।

প্রথমেই আমরা দেখতে গেলুম তাঁর স্টুডিও। সেখানে পা দেওয়া মাত্র ডানদিকের একটি মূর্তি দেখিয়ে অধ্যাপক ইভবুলিস জিগ্যেস করলেন, এটা কার, চিনতে পারেন?

আর একটি চমক। মূর্তিটি রবীন্দ্রনাথের।

ঘরে ছোট-বড় অনেক ভাস্কর্যের প্লাস্টার কাস্টিং রয়েছে, কিছু-কিছু মূর্তি অসমাপ্ত। বাস্তবানুগ কাজও যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে অনেক বিমূর্ত কাজ, নানান আকারের নারী মূর্তিও রয়েছে অনেক। কাজগুলির মধ্যে বলিষ্ঠতার সঙ্গে মিশে আছে কাব্য সুষমা। বেশ বড় একটা হল ভরতি মূর্তিগুলি ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগলুম আমরা।

ঘরটির ছাদ সাধারণ ঘরের চেয়ে অন্তত দ্বিগুণ উঁচুতে, ওপরের স্কাই লাইট দিয়ে আসছে প্রচুর আলো। একজন শিল্পীর স্টুডিও-র পক্ষে একেবারে আদর্শ। সাধারণ ফ্ল্যাট বাড়ির কোনও অ্যাপার্টমেন্ট কি এই রকম হয়!

এ বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ করতেই অধ্যাপক ইভবুলিস বললেন, তাঁদের সরকার তাঁদের জন্য বিশেষ সুবিধে দিয়েছে, স্বামী ও স্ত্রীর জন্য দুটি আলাদা অ্যাপার্টমেন্ট বরাদ্দ করে তারপর দুটিকে একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এত বড় একটি অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া পঁচিশ রুব্‌ল। টাকার হিসেবে সাড়ে তিনশো টাকার কাছাকাছি। কলকাতায় এরকম একটি ফ্ল্যাটের ভাড়া হবে অন্তত তিন হাজার টাকা, আমেরিকার কোনও ছোটখাটো শহরে আট-ন'শো ডলার তো হবেই। সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯২৮ সাল থেকে নাকি বাড়ি ভাড়া বাড়েনি। সরকারি ফ্ল্যাটের ভাড়া লাগে মাইনের শতকরা তিন টাকা। গ্যাসের জন্য খরচ ষোলো কোপেক। টেলিফোনের জন্য প্রতি মাসে বাঁধা দু-রুব্‌ল পঞ্চাশ কোপেক, তাতে যত ইচ্ছে লোকাল কল করা যায়। এক রুবলের ক্রয়-ক্ষমতার আন্দাজ খানিকটা এই ভাবে বোঝা যেতে পারে, এক রুবলে দশ কিলো আলু কিংবা এগারোটা ডিম কিনতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ এক কিলো আলু আর একটা ডিমের দাম প্রায় সমান। সরকার নিয়ন্ত্রিত বলে সারা বছরের জিনিসপত্রের দাম কখনও বাড়ে-কমে না।

সোভিয়েত ইউনিয়নে যে-কোনও ব্যক্তির নিম্নতম আয় দুশো রুবলের কিছু কম, মার্কিন দেশে সাড়ে আটশো ডলার, আর আমাদের দেশে নিম্নতম আয় বলে তো কিছুই নেই, শতকরা পঞ্চাশ জনেরই তো সারা বছরে রোজগারের কোনও ঠিক-ঠিকানাই থাকে না—তবু তারা বেঁচে থাকে।

মাদাম আর্তা দুমপেই খুবই খ্যাতনাম্নী ভাস্কর। তিনি বড় বড় মূর্তি গড়ার জন্য সরকারের কাছ থেকে ডাক পেয়েছেন অনেকবার। রিগা শহরের কোথায় কোন মূর্তি বসানো হবে, সে ব্যাপারে যে উপদেষ্টা কমিটি আছে, তিনি তার সদস্যা। এসব ছাড়াও তিনি নিজের শখেই ভাস্কর্যের কাজ করেছেন অনেক, তার নিয়মিত প্রদর্শনী হয় স্বদেশে ও বিদেশে। উনি ব্রোঞ্জ এবং পাথরের কাজ করেন। ওঁর কবজিতে নিশ্চয়ই খুব জোর আছে, কিন্তু মুখের হাসিটি বড় সরল।

ওঁদের একটি সন্তান। ষোলো-সতেরো বছরের সেই ছেলেটিকে ডেকে আলাপ করিয়ে দিলেন আমার সঙ্গে। মাদাম আর্তা দুমপেই নিজে ইংরেজি জানেন না। তবে ওঁদের ছেলে ইংরিজি শিখছে। তিনি ছেলেকে বললেন, খোকা, তুই এঁর সঙ্গে ইংরিজিতে কথা বল-না!

কিন্তু ছেলেটি বেশ লাজুক, এই বয়েসের ছেলেরা যেমন হয়, সে দু-একটা কথা বলে ঘাড় নীচু করে রইল। এঁদের সংসারটি দেখে বেশ ভালো লাগে, স্বামী পণ্ডিত ও অধ্যাপক, সবসময়

বইপত্তরের মধ্যে ডুবে আছেন, স্ত্রী কঠিন পাথর কেটে সৃষ্টি করছেন শিল্প, একটিমাত্র ছেলে এখন পড়াশুনো নিয়ে ব্যস্ত।

ভিক্টর ইভবুলিস রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষ খবর রাখেন না। অবশ্য সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে চেনেন। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে ওঁর যথেষ্ট জ্ঞান আছে। এবং এ বিষয়ে ওঁর একটি থিয়োরিও আছে। ওঁর ধারণা ভারতীয় সাহিত্য ইওরোপীয় সাহিত্যকে নানাভাবে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করেছে। ইন্ডিয়ান ইনফ্লুয়েন্স অন ওয়েস্টার্ন লিটারচোর, এই শিরোনামে ওঁর বিস্তৃত প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছে আছে। অথচ, আমরা এর উলটোটাই ভাবি।

'দেশ' পত্রিকার সেই পুরোনো সাহিত্য সংখ্যাটি তিনি জমিয়ে রেখেছেন সযত্নে। ভূদেব চৌধুরীর প্রবন্ধটি দেখিয়ে আপশোশ করে উনি বললেন, এই দেখুন, আমার স্ত্রীর করা রবীন্দ্রনাথের মূর্তিটির একটি ছবি এতে ছাপা হয়েছিল, কিন্তু পুরোটা নয়। অর্ধেক। এতে মূর্তিটি ঠিক বোঝা যায় না।

আমারও আপশোশ হল, আমি ক্যামেরাটা ভুল করে ফেলে এসেছি হোটেলে। এই মূর্তিগুলির এবং এই সুন্দর পরিবারটির অনেক ছবি তোলা যেত।

স্বামী-স্ত্রী মিলে আমাকে অনেকগুলি ছবি, বই ও নানান লেখার জেরক্স কপি উপহার দিলেন।

মাদাম্ আর্তা দুমপেই আমাদের খাওয়ালেনও খুব। ইনি একজন রন্ধন শিল্পীও বটে। নানান রকম খাবার করেছেন, তার মধ্যে মাংসের টুকরো, সবজি ও চিজ ফুটিয়ে একটা রান্নার স্বাদ অতি অপূর্ব।

বিদায় নেবার সময় ভিক্টর ইভবুলিস আমাকে বললেন, আমার এই ফ্ল্যাটে আপনিই দ্বিতীয় বাঙালি এলেন। এর আগে যিনি এসেছিলেন, তাঁকে আপনি নিশ্চয়ই চিনবেন না। তিনি লেখক নন, কিন্তু আমার খুব বন্ধু হয়ে গিয়েছিলেন।

যে-কোনও বাঙালিকে আমার পক্ষে চেনা নিশ্চয়ই সম্ভব নয়, তবু আশ্চর্যের ব্যাপার, সেই প্রথম বাঙালিটিকে আমি চিনতে পারলুম। এঁর নাম উদয় চট্টোপাধ্যায়, খড়্গপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক, সাহিত্যপ্রেমিক, নিজেও কবিতা লেখেন। প্রবাসে এসে চেনা কারুব কথা শুনলে ভালো লাগে।

রাত্তিরে হোটেলে ফিরে সারগেই-এব সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছি, হঠাৎ এক সময় সে লাফিয়ে উঠল। এই যাঃ, দারুণ ভুল হয়ে গেছে তো!

আমি জিগ্যেস করলুম, কী হল?

দারুণ চিন্তিতভাবে সারগেই বলল, আমাকে এক্ষুনি একবার রেল স্টেশনে যেতে হবে। ট্রেনে কন্ডাকটর গার্ড আমাদের টিকিট পরীক্ষা করতে নিয়েছিল, সেই টিকিট তো আর ফেরত দেয়নি! আমাকে টাকা-পয়সার হিসেব রাখতে হবে, টিকিটের কাউন্টার পার্ট না দেখালে অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট আমাকে ধরবে!

আমি জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলুম, বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশ কালো। বললুম, এই রাত্তিরে তোমাকে আবার দৌড়োতে হবে স্টেশনে? সে তো বেশ দূরে!

সারগেই ক্ষুণ্ণভাবে বলল, যেতেই হবে, সুনীলজি। মহিলাটির উচিত ছিল না নিজে থেকেই আমাদের টিকিট ফেরত দেওয়া? সেটাই তো নিয়ম।

আমি জিগ্যেস করলুম, আমি যাব তোমার সঙ্গে?

সারগেই বলল, না, না, আপনি গিয়ে কী করবেন? আমার কতক্ষণ লাগবে তার ঠিক নেই। আজ রাত্তিরের ট্রেন যদি ছেড়ে চলে যায়, তাহলে হয়তো ওই মহিলাকে আর পাবই না।

সারগেই ব্যস্তসমস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল।

তারপর আমি ঘণ্টাখানেক বই পড়লুম। ভিক্টর ইভবুলিসের বাড়িতে খানিকটা ভদ্‌কা ও ব্র্যান্ডি পান করেছিলুম, তার প্রভাবেই কিনা জানি না, বেশ গরম লাগছে। উঠে খুলে দিলুম সব জানলা।

রিগা শহরে লেনিনগ্রাদের চেয়ে শীত অনেক কম। তবু বাইরে বেরুবার সময় গরম কোট সঙ্গে

রাখতে হয়, এখানে যখন-তখন বৃষ্টি নামে, বৃষ্টির পর শীত-শীত লাগে বেশ। মাঝে-মাঝে বেশ অসুবিধে হয়। রাস্তায় শীত, সেজন্য ফুলহাতা জামা, সোয়েটার, কোট ইত্যাদি পরে বেরুতে হয়, তারপর কোনও হোটেল বা অফিস বা বাড়িতে ঢুকলেই গরম লাগে, কারণ সেসব জায়গাতে সেন্ট্রাল হিটিং। ওভারকোট খুলে রাখা যায়, কিন্তু সোয়েটার ইত্যাদি তো খোলা যায় না। এক এক সময় আমার কপালে ঘাম বেরিয়ে যায়। সারগেই-এর কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই, সেই যে চামড়ার জ্যাকেটটা তাকে প্রথম দিন পরতে দেখেছি, তারপর সেটা আর ও একদিনও খোলেনি।

সারগেই এখনও ফেরেনি? বেরিয়ে গিয়ে পাশের ঘরে টোকা মারলুম। কোনও সাড়া নেই।

আবার খানিকটা বই পড়ার চেষ্টা করলুম, কিন্তু মন বসছে না। এখনও গরম লাগছে। সেন্ট্রাল হিটিং কমানো-বাড়ানোর ব্যবস্থা এক এক জায়গায় এক এক রকম। এ ঘরে সেই ব্যবস্থাটা যে ঠিক কোথায় খুঁজে পেলুম না। জানলা দিয়ে কোনও হাওয়া আসছে না।

এক এক সময় হোটেলের বন্ধ ঘরের মধ্যে বড় অস্থির লাগে। শুধু বই পড়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই। ঘুমও আসছে না। আমি ভাবলুম, এখন টাটকা বাতাসের মধ্যে খানিকক্ষণ ঘুরে এলে কেমন হয়?

শার্ট-প্যান্ট পরাই ছিল, ওভারকোট নিয়ে, পায়ে জুতো গলিয়ে বেরিয়ে পড়লুম হোটেল থেকে। রাস্তায় কিছু লোকজন এখনও হাঁটাহাঁটি করছে। আমি গির্জার বাগানটা কোনাকুনি পার হয়ে চলে এলুম অন্য রাস্তায়। আমার ইচ্ছে নদীর ধারে যাওয়া। হোটেলের রাস্তা হারিয়ে ফেলার কোনও সম্ভাবনা নেই। রিগা শহরে উঁচু বাড়ির সংখ্যা খুব কম, পেছন ফিরে তাকালেই আমাদের হোটেলের আলো দেখতে পাওয়া যায়।

অচেনা শহর, এখানকার ভাষাও আমার সম্পূর্ণ অজানা। এখানে ইংরিজি জানা লোকের সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু আমার আড়ষ্ট বোধ হচ্ছে না, গা ছমছম করছে না। সহজাত অনুভূতি দিয়েই ভয়কে টের পাওয়া যায়। আজকাল পশ্চিমের অধিকাংশ শহরই খুব হিংস্র, রাত্তিরবেলা একা একা চলাফেরা করা রীতিমতন বিপজ্জনক। কিন্তু সকাল থেকে রিগা শহরে কয়েকবার ঘুরেই আমার মনে হয়েছে, এখানে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিয়ে বিশেষ চিন্তার প্রয়োজন নেই।

যে পথ দিয়ে আমি এখন হাঁটছি, সে পথটি রীতিমতন জনবিরল। মাঝে-মাঝে দু-একটি লোক আমার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। একটু বাদে আমি পরিবেশের কথা ভুলে গেলুম। ওভারকোটের পকেটে এক হাত, অন্য হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, মাথা নীচু, গুনগুন করে সুর ভাঁজছি, "আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন, বাতাসে..."।

এখন আমি পৃথিবীর যে-কোনও শহরের, যে-কোনও রাস্তার, যে-কোনও একজন মানুষ।

॥ ৯ ॥

ভলেন্টিন রাসপুটিনের জন্ম ১৯৩৭ সালে, রাশিয়ান ফেডারেশানে। খ্যাতিমান লেখক। এঁর একটি অতি বিখ্যাত গল্পের নাম "ফরাসি শিক্ষা"। গল্পটি এই রকম ঃ

একটি এগারো বছরের ছেলে গ্রাম থেকে শহরে যাচ্ছে পড়াশুনো করতে। ছেলেটির মা বিধবা, ওরা তিন ভাই বোন, ছেলেটিই সবচেয়ে বড়। ওদের অভাবের সংসার। সময়টা হল ১৯৪৮ সাল, যুদ্ধ-পরবর্তী সংকটকাল তখনও চলছে, খাদ্যদ্রব্যের খুব অভাব। গ্রামের স্কুলে ছেলেটি ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়েছে, অন্যান্য ছেলেদের মধ্যে সে-ই ছিল সবচেয়ে মেধাবী। স্কুল লাইব্রেরির সব বই সে পড়ে ফেলেছে। স্টেট লটারি-লোন সার্টিফিকেট-এর খবর ছাপা হলে গ্রামের লোকেরা সেই ছাপা কাগজ ওই ছেলেটির কাছে নিয়ে আসত, কারণ সে ঠিকঠাক পড়ে দিতে পারে। সেই জন্যই গ্রামের প্রবীণরা তার মাকে বলত, তোমার এ ছেলেটির বেশ মাথা আছে। একে আরও পড়াও!

সেই জন্যই মা কষ্ট করেও ছেলেকে আরও লেখাপড়া শেখাবার জন্য পাঠালেন শহরে। গ্রাম থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে একটি ছোট শহর। একটি বাড়ির একখানা ছোট ঘরে স্থান পেল সে, সপ্তাহে একবার তার মা একজন লোকের হাত দিয়ে কিছু খাবার পাঠান। খাবার মানে রুটি আর আলু। তাও ও বাড়ির অন্য ছেলেরা চুরি করে নেয় তার খাবার, সপ্তাহের মাঝখানেই ফুরিয়ে যায় তার রুটি আর আলু, তারপর শুধু খিদে, শুধু খিদে।

কয়েক সপ্তাহ বাদে একবার মা দেখতে এলেন ছেলেকে। ছেলেটি কিছুতেই বুঝতে দিল না যে সে কোনওরকম কষ্টে আছে। সে হাসিমুখে মাকে কত রকম মজার গল্প শোনাল। তারপর মা যখন বিদায় নিচ্ছেন, সে আর থাকতে পারল না, গাড়ির পেছন-পেছন ছুটতে-ছুটতে কাঁদতে লাগল হাপুস নয়নে। মা গাড়ি থামিয়ে বললেন, তোর জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে আয়। ছেলেটি তখন উলটো দিকে দৌড় দিল।

স্কুল থেকে ফিরে সন্ধেবেলা সে শুধু বাড়ির কথা ভাবে। ইচ্ছে করে বাড়ি ফিরে যেতে। আবার সে ভাবে, তাকে লেখাপড়া শিখতেই হবে। খালি পেট নিয়ে সে বই খুলে বসে।

গ্রামের স্কুলের ভালো ছেলে কিন্তু শহরে এসে তেমন সুবিধে করতে পারল না। অন্য সাবজেক্টগুলো কোনওক্রমে ম্যানেজ করলেও ফরাসি ভাষার ক্লাসে সে একেবারে নাজেহাল হয়ে যায়। তার গ্রাম্য উচ্চারণে তো অদ্ভুত শোনায়। ফরাসি যিনি পড়ান, তিনি একটি পঁচিশ বছরের তরুণী, তার নাম লিদিয়া মিখাইলোভনা। এই ছেলেটির ফরাসি উচ্চারণ শুনে তিনি শিউরে উঠে চোখ বুজে ফেলেন।

খিদের চোটে ছেলেটির মাথা ঘোরে, মাঝে-মাঝে একটু দুধ খেতে ইচ্ছে করে। তাদের গ্রামে তবু নানারকম ফলমূল পাওয়া যেত, এখানে কিছুই পাওয়া যায় না। নদীতে মাছ ধরার জন্য সারাদিন ছিপ ফেলে বসে থেকে তিনটি পুঁটি মাছ পায় মাত্র। পাড়ার ছেলেরা তাকে খেলতে ডাকে, কিন্তু তার যেতে ইচ্ছে করে না।

একদিন তাকে এ বাড়িরই একটি ছেলে জিগ্যেস করল, তুই 'ফায়ার্স' খেলতে যাবি।

ছেলেটি জিগ্যেস করল, সেটা কী খেলা?

—পয়সা দিয়ে খেলতে হয়।

—আমার তো পয়সা নেই।

তবু ছেলেটি তাকে নিয়ে যায়। বাড়ির পেছনে ঝোপঝাড় ও ছোট একটি টিলা পেরিয়ে একটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে জড়ো হয়েছে কয়েকটি ছেলে। তারা মাটিতে পয়সা সাজিয়ে দূর থেকে পাথরের টুকরো ছুড়ে একরকম খেলা খেলে, যে ঠিকমতন লাগাতে পারবে, সে পয়সাগুলো জিতবে। কয়েকটা উঁচু ক্লাসের ছেলেও রয়েছে এখানে। তাদের মধ্যে একটি ছেলের নাম ভাডিক, সে বেশ লম্বা-চওড়া। সে-ই ওদের নেতা।

এই ছেলেটি কয়েকদিন ধরে খেলাটা লক্ষ করল। তার মনে হল, এটা খুব শক্ত নয়। তারও খেলতে ইচ্ছে হয়। আর কিছুর জন্য নয়; এখান থেকে কিছু পয়সা জিতলে সে দুধ কিনে খেতে পারবে। মায়ের কাছে সে টাকা চাইতে পারে না, কারণ সে জানে, তাদের পরিবার খুব কষ্টে আছে, তা ছাড়া এ বছর ফসল ভালো হয়নি। মায়ের কাছে টাকা নেই বলেই তো মা বাড়ির তৈরি রুটি পাঠিয়ে দেন। তবু মা একবার রুটি আর আলুর নীচে পাঠিয়ে দিলেন একটা পাঁচ রুবলের নোট। ছেলেটি সেই টাকা নিয়ে জুয়া খেলতে গেল।

ছেলেটি খুব সাবধানে কম কম খুচরা পয়সা দিয়ে খেলে। প্রথম দু-তিন দিন সে হারল। তারপর জেতার জন্য মরিয়া হয়ে সে বার করল পাথর ছোঁড়ার একটা নতুন কায়দা। এবার জিততে লাগল সে। তবে সে বেশি লোভ করে না। এক রুবল জিতলেই খেলা ছেড়ে চলে যায়। বাজারে গিয়ে সেই টাকায় দুধ কিনে খায়।

পর পর কয়েকদিন এরকম জেতার পর সেই ভাডিক ওকে চেপে ধরে বলল, কী ব্যাপার!

তুই চালাকি পেয়েছিস, রোজ জিতে চলে যাবি? আজ তোকে শেষ পর্যন্ত খেলতেই হবে।

ছেলেটি বলল, আমাকে যে পড়তে যেতে হবে। সেই জন্য আমি বেশিক্ষণ খেলি না।

অন্য ছেলেরা ঠাট্টা করতে লাগল। তাকে বাধ্য করল শেষ পর্যন্ত খেলতে। একবার সে একটা বড় খেলা জিততেই ভাডিক পা দিয়ে চেপে ধরল পয়সাগুলো। ছেলেটি পয়সা তুলতে যেতেই ভাডিক বলল, নিচ্ছিস যে, তোর তো লাগেনি!

ছেলেটি বলল, হ্যাঁ লেগেছে, নিশ্চয়ই লেগেছে। একটা পয়সা উলটে গেছে।

ভাডিক তাকে এক ধাক্কা দিয়ে বলল, আমি বলছি লাগেনি!

ছেলেটি আবার তার দাবি জানাতেই তিন-চারজন মিলে মারতে লাগল তাকে। কেড়ে নিল তার পয়সা। ছেলেটি ওদের সঙ্গে মারামারিতে পারবে না। দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে ছোট টিলাটির ওপর উঠে সে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, হ্যাঁ, আমার লেগেছিল! লেগেছিল! তোরা চুরি করেছিস!

ভাডিক চেঁচিয়ে বলল, তুই খুন হতে চাস?

পরদিন সকালে ছেলেটি দেখল, তার নাকটা ফুলে আলু হয়ে গেছে, চোখের নীচে কালশিটে, কপালে ক্ষত, মুখখানা একেবারে বীভৎস। কী করে স্কুলে যাবে এই অবস্থায়? তবু যেতেই হবে। কারুর কারুর নাক কি এমনিতেই আলুর মতন বড় হয় না? স্কুলে গিয়ে সে মুখ ঢেকে বসে রইল।

কিন্তু প্রথম ক্লাসটাই ফরাসির। লিদিয়া মিখাইলোভনা প্রত্যেক ছাত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে গুড মর্নিং বলেন। এই ছেলেটির কাছে এসে তিনি জিগ্যেস করলেন, তোমার কী হয়েছে?

ছেলেটি বলল, আমি আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়েছিলুম।

ফরাসি শিক্ষিকা বললেন, ইস, খুব লেগেছে দেখছি!

পেছন থেকে একটি ছাত্র বলে দিল, মোটেই পড়ে যায়নি, মিস, ও জুয়া খেলতে গিয়ে মারামারি করেছে।

মিস কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বললেন, তুমি ছুটির পরে থেকে যাবে।

ছেলেটি ভাবল, মিস নিশ্চয়ই হেডমাস্টারের কাছে নালিশ করবেন। তা হলে স্কুল ছেড়ে চলে যেতে হবে! না, না, সে কিছুতেই বাড়ি ফিরে যেতে পারবে না।

ছুটির পর একটা ফাঁকা ক্লাসরুমে ডেকে নিয়ে গিয়ে লিদিয়া মিখাইলোভনা জিগ্যেস করলেন, তুমি জুয়া খেলো, সত্যি? জেতো না হারো? জেতো? বাঃ, এটা একটা ভালো কথা অন্তত। অনেক টাকা জিতেছ? কী করবে সে টাকা দিয়ে? বই কিনবে? কেক কিনবে?

ছেলেটি বলল, আমি মাত্র এক রুবল জিতেছিলাম।

—এক রুবল? মোটে এক রুবল! তা দিয়ে কী করবে?

—দুধ কিনব।

এই কথা শুনে মিস কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। মিসের তন্বী শরীর, সূক্ষ্ম, শহুরে ধরনের পোশাক, তাঁর নিশ্বাস দিয়ে সুগন্ধ বেরোয়। তিনি অঙ্ক বা ভূগোল পড়ান না। তিনি পড়ান রহস্যময় ফরাসি ভাষা, সেইজন্য তাঁকেও রহস্যময়ী মনে হয়।

মিসের কাছে ছেলেটি প্রতিজ্ঞা করল, সে আর জুয়া খেলবে না। কিন্তু সময়টা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। এ বছর আবার খরা, মা কম-কম আলু পাঠাচ্ছেন। সারাক্ষণ ছেলেটির পেটে ধিকিধিকি করে জ্বলে খিদে। পকেটে আলু নিয়ে সে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, কোথাও একটু আগুন জ্বেলে সে আলু পুড়িয়ে খায়।

শেষ পর্যন্ত আবার সে জুয়ার আড্ডায় গেল, দুদিন বাদে সেখানে সে আবার মার খেল। পরের দিন ঠোঁট, নাক ফোলা অবস্থায় গেল স্কুলে। এমনিতেই তার ফরাসি উচ্চারণ খারাপ, ফোলা ঠোঁটের ফরাসি শুনে লিদিয়া মিখাইলোভনা কানে হাত চাপা দিয়ে বললেন, থামো-থামো!

এবার তিনি ঠিক করলেন, ছেলেটিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পড়াবেন। সারাদিন ছেলেটির

বুক দুরুদুর করে। মিসের বাড়ি ঝকঝকে তকতকে, সেখানে সে কোথায় কী ভেঙে ফেলবে! সে এক কোণে গুটিসুটি মেরে বসে থাকে। লিদিয়া মিখাইলোভনা একটা সাদামাটা হাউস ফ্রক আর গরম ফেল্টের চটি পরে হাঁটেন আস্তে আস্তে, সবকিছুই ছেলেটির কাছে অন্য রকম মনে হয়।

একদিন ছেলেটিকে খেয়ে যেতে বললেন লিদিয়া। ছেলেটি যদিও দারুণ ক্ষুধার্ত, তবু লজ্জায় মরে গেল সে। লিদিয়া মিখাইলোভনা কি সাধারণ মানুষের মতন খাবার খান? তিনি তো সব দিক থেকে অসাধারণ। ছেলেটি কিছুতেই খাওয়ার টেবিলে বসতে রাজি হল না, ছুটে পালিয়ে গেল।

তারপর একদিন ওই ছেলেটির নামে এল একটা পার্সেল। ছেলেটি অবাক। তার মা ছাড়া তাকে আর কে কী পাঠাবে? অথচ মা তো গ্রামের লোকদের হাত দিয়ে জিনিস পাঠান, ডাকে পাঠিয়ে পয়সা নষ্ট করবেন কেন? দারুণ কৌতূহলে ছেলেটি স্কুলের সিঁড়ির নীচে বসে পার্সেলটি খুলল। সুন্দর কাগজের মোড়ক খুলতে বেরিয়ে পড়ল ম্যাকারোনি। মা কোথা থেকে এত দামি জিনিস পেল? কাঁচাই খেতে শুরু করল সেই ম্যাকারোনি, সেগুলোর তলায় সে দেখতে পেল, দুটো বড়-বড় সাদা মিছরি আর দুটি কেক! এবারে সে বুঝতে পারল। এ জিনিস তার মা পাঠাতেই পারেন না! মা হঠাৎ এত বড়লোক হয়ে গেলে নিশ্চয়ই চিঠি লিখে জানাতেন।

তক্ষুনি সবসুদ্ধু প্যাকেট বন্ধ করে সে ছুটে গেল ফরাসি শিক্ষিকার বাড়িতে। তিনি প্রথমে খুব অবাক হওয়ার ভান করলেন। তারপর লজ্জা পেয়ে জিগ্যেস করলেন, তুমি কী করে বুঝলে, আমিই পাঠিয়েছি? ছেলেটি বলল, তার কারণ, আমরা বাড়িতে কোনওদিন ম্যাকারোনি বা কেক খাইনি। মা এসব জিনিসের কথা জানেই না।

ছেলেটি জোর করে প্যাকেটটা ফেরত দিয়ে গেল। মিসের হাজার অনুরোধও সে নিজে রাজি হল না। সে ভেতরে ভেতরে কাঁপছিল, যদি খিদের বশে হঠাৎ রাজি হয়ে যায়! সে দৌড়ে পালাল।

পড়ানো কিন্তু বন্ধ হল না। আর কোনওদিন সেই পার্সেলের কথা ওঠেনি। ছেলেটি ফরাসি শিখে গেল কিছুদিনের মধ্যেই।

একদিন মিস জিগ্যেস করলেন, তুমি আর আগের মতন পয়সা নিয়ে খেলো না? ছেলেটি বলল, সে তো এখন বিকেলবেলা এখানেই আটকে থাকে। খেলবে কী করে?

মিস জিগ্যেস করলেন, তোমাদের ওই খেলাটার নিয়মটা কী? ছেলেবেলায় আমিও খেলতুম। ভাবছি সেই একইরকম খেলা কি না। তুমি আমাকে বলো না, ভয় কী?

ছেলেটি খেলার নিয়মকানুন জানাল। মিস বললেন, না, আমরা খেলতুম অন্য খেলা। তুমি সেই খেলা খেলবে আমার সঙ্গে?

ছেলেটি অবাক। সে যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

লিদিয়া মিখাইলোভনা বললেন, কেন, মাস্টারমশাইরা কি মানুষ নয়? আমার কি খেলতে ইচ্ছে করে না? আমি একা একা থাকি, আমার বাড়ি অনেক দূরের এক শহরে, আমি ছেলেবেলায় খুব দুষ্টু ছিলুম, এখনও আমার ইচ্ছে করে খেলতে, মাঝে-মাঝে লাফাতে... কিন্তু পাশেই থাকেন হেডমাস্টার...

তারপর দুজনে খেলতে শুরু করল। পয়সা দিয়ে খেলা। একটু পরে ছেলেটি বুঝতে পারল, মিস তাকে ইচ্ছে করে জিতিয়ে দিতে চাইছে। তখন সে রেগে গিয়ে বলল, আমি খেলব না। মিস এবারে সত্যিকারের খেলা খেলতে লাগলেন।

এর পরদিন থেকে ফরাসি পড়া হয় কুড়ি পঁচিশ মিনিট, তারপরেই শুরু হয় খেলা। কোনওদিন ছেলেটি জেতে, কখনও মিস। মাঝে-মাঝে দুজনে ঠিক সমবয়স্কের মতন ঝগড়া করে। দুজনেই দুজনকে খেলার কৃতিত্বে হারাবার চেষ্টা করে। এমনকী মিস মাঝে-মাঝে চোট্টামি করেও জিতবার চেষ্টা করে...

এর মাঝখানে হঠাৎ একদিন এক হুঙ্কার শোনা গেল। হেডমাস্টার! ছাত্র ও শিক্ষিকা তখন হাঁটু

গেড়ে মুখোমুখি বসে পয়সা গোনা নিয়ে ঝগড়া করছিল। হেডমাস্টার আগে কয়েকবার দরজায় টোকা দিয়েছেন, ওরা শুনতেই পায়নি। তিনি তাই দরজা ঠেলে ঢুকে পড়েছেন। তিনি বিস্ফারিত চোখে বললেন, ছাত্রের সঙ্গে পয়সা নিয়ে খেলা... জুয়া? এমন অন্যায়, এমন পাপ, এমন বিকৃতি...

তিনদিন পরে লিদিয়া মিখাইলোভনা স্কুল ছেড়ে চলে গেলেন। যাওয়ার আগে তিনি ছেলেটিকে বলে গেলেন, তুমি পড়াশুনো চালিয়ে যেও, তোমাকে ওরা কিছু শাস্তি দেবে না, সব দোষ আমি নিজে নিয়েছি...।

কিছুদিন পরে, মধ্য শীতে, ছেলেটির নামে আর একটি পার্সেল এল। তার মধ্যে অনেক ম্যাকারোনি আর তিনটি লাল রঙের আপেল। এর আগে ওইরকম আপেল ছেলেটি শুধু ছবিতেই দেখেছে।

গল্পটিতে ছেলেটির কোনও নাম নেই। ১৯৪৮ সালে লেখকেরও বয়েস ছিল এগারো। খুবই সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাময় গল্প।

আর একটি গল্পের নাম "চিন্তা"। লেখকের নাম ভাসিলি শুকশিন, এঁর জন্ম ১৯২৯ সালে, মৃত্যু ১৯৭৪। গল্পটি এইরকম ঃ

রাত্তিরে ঠিক ঘুমোবার সময় শুরু হয় এই উপদ্রব। সারাদিন খেটেখুটে সবাই যখন বিশ্রাম নেবে, সেই সময় রাস্তা দিয়ে দৈত্যের মতন চেহারার নিক মালাশকিন বিকট সুরে তার আকরডিয়ন বাজাতে-বাজাতে যাবে। সেই বাজনায় একটুও সুর নেই, যেন অসুরের চিৎকার। যে যতই আপত্তি করুক নিক মালাশকিন বুক ফুলিয়ে চলে। এর বিরুদ্ধে কোনও আইন আছে? আমার অধিকার আছে বাজনা বাজাবার।

যৌথ খামারের চেয়ারম্যান মাতভেই রিয়াজানতসেভ-এর বাড়ি একটা তেরাস্তার মোড়ে। গলি থেকে যখন নিক বাজাতে-বাজাতে আসে, তখনও শোনা যায়, যখন সে মোড় পেরিয়ে যায় তখন বেশি করে শোনা যায়। সে বাজনা শুনেই মাতভেই বিছানায় উঠে বসে বলে, ব্যাটাকে কাল দেখে নেব! যে-কোনও উপায়ে ওকে আমি যৌথ খামার থেকে তাড়াব!

পরের দিন সে কিছুই করে না অবশ্য। নিককে দেকলে রাগে গজরায় শুধু। আবার রাত্তিরবেলা মাতভেই বলে, ব্যাটাকে যদি কালই না তাড়াই তো কী বলেছি!

মাতভেই-এর আর ঘুম আসে না। সে সিগারেট ধরায়। আকাশ-পাতাল চিন্তা করে।

সেই রকমই এক রাত্তিরে, নিকের বাজনায় তার মেজাজে খিচড়ে গেছে, আর ঘুম আসছে না, মাঝ আকাশে উঠেছে চাঁদ, বাতাসে বুনো বুনো গন্ধ, এমন সময় মাতভেই-এর মনে পড়ে গেল আর একটি রাত্তিরের কথা। সেটা ছিল গাঢ় অন্ধকার রাত, তার ছোট ভাই কুঝমার সে-রাতে হঠাৎ নিশ্বাসের কষ্ট শুরু হয়েছিল। কুঝমা সারাদিন খাড়া রোদে মাঠে ঘোড়া-গরু চরাতে গিয়েছিল, কয়েকবার ঝরনার ঠান্ডা জল খেয়েছে, তাই রাত্তিরে ওই কাণ্ড! মাতভেই-এর বয়েস তখন তেরো, তার বাবা তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে বললেন, সবচেয়ে দ্রুতগামী ঘোড়াটা নিয়ে সামনের গ্রাম থেকে খানিকটা দুধ আনতে। গরম দুধ খাওয়াতে পারলে কুঝমা সেরে যাবে। মাতভেই ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল। অন্ধকার রাত, সামনে কিছু দেখা যায় না, তবু তার ঘোড়া যেন মাটি ছুঁচ্ছে না, বাতাসে ভাসছে। সে তার ভাইয়ের কথা ভাবছে না, সে আকাশ দেখছে না, পৃথিবীর কথা মনে নেই, শুধু তার কানে যে বাতাসের আওয়াজ সেটাই সে অনুভব করছে। তার শরীরে প্রচণ্ড গতির উল্লাস।

দুধ নিয়ে সে ঠিক সময়ে ফিরে এসেছিল, কিন্তু তার ভাই বাঁচেনি।

আকরডিয়নের বিকট সুর শুনে সেই রাতটার কথা মনে পড়ল কেন? তারপর সাতচল্লিশ বছর কেটে গেছে। আরও কত রাতই তো গেছে। তার বিয়ে হল, যৌথ খামার তৈরি হল, তারপর যুদ্ধ এল। অতীতের মধ্যে সবকিছু মিশে গেছে। সে তার কর্তব্য পালন করে গেছে। তাকে বলা হল যৌথ খামারে যোগ দিতে, সে যোগ দিল। বিয়ের সময় হলে বিয়ে করল। সন্তানের জন্ম দিল। যুদ্ধ এল, সে যুদ্ধ করতে গেল, ফিরে এল আহত হয়ে। তারপর সবাই বলল, মাতভেই, তোমাকে

চেয়ারম্যান হতে হবে। সে হয়েও গেল। কাজ, কাজ আর কাজ, সারা জীবন শুধু কাজ। যুদ্ধও একটা কাজ। তার আনন্দ, উত্তেজনা, দুঃখ সবই কাজকে ঘিরে। লোকে যখন ভালোবাসার কথা বলে সে অবাক হয়ে যায়। সে জানে পৃথিবীতে ভালোবাসা বলে একটা জিনিস আছে, ভালোবাসা নিয়ে গান হয়, লোকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কাঁদে, এমনকী একজন আরেকজনকে গুলিও করে। এই যে নিক, সেও কিনা বলে একটা মেয়ের প্রেমে পড়েছে, তাকে খুশি করবার জন্যই রোজ রাতে বাজনা বাজায়। মাতভেই কি কখনও কারুকে ভালোবেসেছে?

সে তার বউ আলিওনাকে ধাক্কা দিয়ে জাগাল। এই ওঠো, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

বউ ঘুম চোখে ব্যস্ত হয়ে বলল, কি হয়েছে?

—তুমি কি কখনও ভালোবেসেছ? আমাকে কিংবা অন্য কারুকে?

—আজ বেশি মদ গিলেছ তুমি?

—মোটেই না! যা জিগ্যেস করছি উত্তর দাও। আমাকে তুমি ভালোবেসেছিলে? না এ সবই অভ্যেস? এই বিয়েটিয়ে, একসঙ্গে থাকা।

একটু সময় নেওয়ার পর বউ বলল, নিশ্চয়ই ভালোবেসেছিলুম। মনে নেই, মিক করোলিয়ভ আমায় বিয়ে করার জন্য কত ঝুলোজুলি করেছে, কিন্তু তার বদলে আমি তোমাকে—

—ঠিক আছে, ঘুমোও!

—কাল গরুগুলোকে মাঠে নিয়ে যেও। কাল আমি অন্য মেয়েদের সঙ্গে জাম পাড়তে যাব।

—কোন জমিতে? খামারের জমিতে যদি যাও, তোমাদের সবাইকে দশ রুবল করে ফাইন করে দেব!

আবার মাতভেই ভাবে, সেই রাতটার কথা মনে পড়ল কেন? সেই ঘোড়া ছুটিয়ে দুধ আনতে যাওয়া, তার ভাইয়ের মৃত্যু। এত বছর পরে!

আবার শোনা যাচ্ছে নিক-এর বাজনা। সে ফিরে আসছে। সে তার প্রেমিকাকে খুশি করতে চায়। অথচ এই বাজনা শুনলে মাতভেই-এর গায়ে জ্বালা ধরায়।

এবার সে ভাবল একটি সকালের কথা। সে খালি পায়ে ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটছে। সবুজের কোমলতা আর ঠান্ডা শিশির লাগছে তার পায়ে. বিছানায় বসে মাতভেই যেন সত্যিই সেই ঠান্ডাটা অনুভব করল।

তারপর সে ভাবল মৃত্যুর কথা। ঠিক ভয় হল না বরং বিস্ময়। একদিন সব শেষ হয়ে যাবে, তাকে নিয়ে যাওয়া হবে কবরে, তারপরেও পৃথিবী ঠিকঠাক চলবে। বড়জোর দশ-পনেরো বছর তার কথা মনে রাখবে কেউ-কেউ। সে বউকে জাগাল।

—এই শোনো, তুমি কি মৃত্যুকে ভয় পাও?

—এই লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

—যা জিগ্যেস করছি, বলো না।

—কে না পরকালের ঘণ্টার কথা ভাবলে ভয় পায়?

—আমি ভয় পাই না!

—তা হলে ঘুমোও! এত চিন্তার কী আছে?

—তুমি ঘুমোও!

আবার মনে পড়ল সেই রাতটার কথা, সেই ঘোড়ার তীব্র গতি, সেই উল্লাস...। মনে পড়লেই মনটা একটা মিষ্টি অনুভূতিতে ছেয়ে যায়। জীবনের একটা কিছু আছে, যা ছাড়তে ইচ্ছে করে না, ছাড়বার চিন্তা করলে চোখে জল আসে।

তারপর এক রাত্তিরে সে নিকের বাজনার প্রতীক্ষায় বসে রইল। সিগারেট টানতে-টানতে অপেক্ষা

করতে লাগল, কিন্তু কোনও শব্দ নেই। রাত্রি একেবারে শুনশান। অপেক্ষা করতে-করতে সারারাত কেটে গেল, নিক এল না।

ভোর হতেই বউকে জাগিয়ে সে জিগ্যেস করল, ছেলেটা অসুস্থ নাকি?

বউ বলল, ওর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। এই রোববার বিয়ে।

সেদিন মাতভেই নিজেই নিকের সঙ্গে দেখা করে জানতে চাইল, কী ব্যাপার, তুমি আর বাজনা বাজাচ্ছ না?

নিক একগাল হেসে বলল, আর আপনাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাব না। নিনা আমায় বিয়ে করতে রাজি হয়ে গেছে।

মাতভেই বিরক্ত হয়ে ভাবল, অত হাসির কী আছে? দু'দিন বাদেই তো নিনা তোর নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে। ওদের বংশটাই ওরকম!

সাতদিন কেটে গেল। রাত্রিগুলো এখন নিস্তব্ধ। কিন্তু মাতভেই-এর আর ঘুম আসেনি। সে উঠে সিগারেট খায়। এক চুমুক হালকা মদ খায়। উঠে বাইরে আসে। সিঁড়ির ওপর বসে থাকে। সমস্ত গ্রাম জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে। বড় বেশি নিস্তব্ধতা।

বেল্লা আখমাদুলিনার জন্ম ১৯৩৭ সাল। তাঁর একটি কবিতার নাম "অন্য কিছু"ঃ

আমার এ কী হল, প্রায় গোটা বছর
আমি লিখতে পারিনি একটিও কবিতা
আমার ওষ্ঠে এই যে বোঝা আমি বয়ে বেড়াচ্ছি
এই বধিরতা—বিষম ভারী হয়ে চেপে বসছে আমার ওপর।
কিন্তু... তুমি বলবে... এই তো বেশ একটা স্তবক
চারটে লাইন, ছন্দ এবং মিলও ঠিকঠাক।
কিন্তু সেটা কথা নয়। এসব তো আমি অনেকদিন ধরে শিখেছি।
শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে কবিতার মতন লাইন তৈরি করা।

এ তো অভ্যাস... আমার এক ধরনের দক্ষতা।
এরকম লেখায় কিছু আসে যায় না। তবে কী, হে ভগবান!
কী যেন বেরিয়ে এসেছিল তখন? মাত্র একটি লাইন তো নয়
অন্য কিছু। কী সেই অন্য কিছু, একেবারে ভুলে গেছি!
সেই যে অন্য কিছু, কেন তার এত কুণ্ঠা।
কখনও সাহসী হলে, বেরিয়ে এসেছিল উজ্জ্বল স্বরের মতন
আমার ওষ্ঠের ওপর নেমে এসেছিল হাসির রেখা হয়ে
অথবা আকস্মিক কান্না—কোনটা চেয়েছিল বেছে নিতে?

ইউন্না মরিটস-এর জন্ম ১৯৩৭-এ। তাঁর একটি নামহীন কবিতা এই রকম ঃ

ঠিক টুং টাং বা ঢং ঢং নয়
নয় একটা দোয়েলের ডাক
একটু কান্না, একটু ঝলকানি, নয় দীর্ঘশ্বাসও
আঙুর খেতের মেঘলা সুখের মধ্যে যেন ছুঁয়ে আছে
অথবা লেবু গাছে বাতাসের শিরশিরানির মধ্যে ফুটে ওঠে।

আমি শুনতে পাই মধ্য রাতে, শুনি খুব ভোরে
গুমোট ও গরমের উন্মুক্ত প্রান্তরে এবং আমার দরজার বাইরে শীতে
এটা কীসের শব্দ? আমি জানতে চাই, কে এত পবিত্র ও নিষ্পাপ
যে তার আত্মার ভেতর থেকে এমন স্বর তুলে আনতে পারে?

সেই শব্দ আমার কাছে আসে যখন নৌকোয়, অথবা চলন্ত ট্রেনে
এমনকী যখন রুটির দোকানে যাই তখনও আসে আমার পিছু পিছু
তার খোঁজে আমি কাটিয়ে দিলুম আমার কিশোরী জীবন
তারপর আর ফেরার পথ নেই, এদিকে সম্পূর্ণ নিঃসম্বল।
গতকাল আমার এক বন্ধু বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছে
তাকে জানিয়েছে এক ধূর্ত খবর-শিকারি
আমার আত্মা নাকি একেবারে ঝড়-বিধ্বস্ত হয়ে গেছে
কী একটা শব্দ আমাকে বেঁধে রেখেছে চিরকালের মতন।

রাজ জেগে আমি যে কয়েকটি গল্প ও কবিতা পড়লুম, সেগুলোর ভাবার্থ তুলে দিলুম এখানে। এগুলি ষাট ও সত্তরের দশকে লেখা। এগুলি থেকে সাম্প্রতিক সোভিয়েত সাহিত্যের খানিকটা ধারণা পাওয়া যায়।

এই লেখাগুলি আমি পড়লুম "ল্যান্ড অফ দা সোভিয়েটস ইন ভার্স অ্যান্ড প্রোজ" দু-খণ্ড থেকে। প্রকাশক প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স! বই দুটি এতই সুমুদ্রিত যে হাতে নিয়ে আদর করতে ইচ্ছে করে। আগাগোড়া আর্ট পেপারে ছাপা, ভেতরে চমৎকার চমৎকার ছবি।

॥ ১০ ॥

সকালবেলা সারগেইকে আমি জিগ্যেস করলুম, আজ কী কী প্রোগ্রাম আছে বলো!

সারগেই পকেট থেকে কাগজ বার করে দেখে বলল, অপেরা পরিচালক ও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে আলোচনা, রাইটার্স ইউনিয়ানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট, এ পি এন অফিসে সাক্ষাৎকার, আর্ট এক্সিবিশান দেখা...

আমি অস্ফুটকণ্ঠে বললুম, বাবাঃ, এ যে রীতিমতন ভি আই পি'র মতন ব্যাপার, সারাদিন একটুও বিশ্রাম নেই। এক একদিন ইচ্ছে করে কিছু না করে চুপ করে বসে থাকতে।

আজ বৃষ্টি নেই, শীতও কম, ঝকঝকে রোদ, একটা পার্কে বসে পায়রাদের ওড়াউড়ি দেখলে বেশ হত। এখানকার পায়রাগুলো বেশ স্বাস্থ্যবান ও স্বাস্থ্যবতী। মস্কোতে কাক দেখে চিনতে পারিনি এত মোটা, রংও কুচকুচে কালো নয়।

আমি সারগেইকে বললুম, সবক'টা জায়গাতেই যেতে হবে? দু-একটা বাদ দিলে হয় না?

সারগেই চোখ বড় বড় করে বলল, না! সব জায়গায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে, লোকজন অপেক্ষা করবে।

সারগেই নিজেই রিগা শহরে এই প্রথম এসেছে। এখানকার সবকিছু জানা সম্পর্কে ওরও আগ্রহ আছে। হোটেলে ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা দিনের কর্ম শুরু করার জন্য বেরিয়ে পড়লুম।

একটা বেশ পুরোনো থিয়েটার হলের একটি ঘরে একজন নাট্য-পরিচালক ও কয়েকজন মঞ্চকর্মী ও অভিনেতা-অভিনেত্রী অপেক্ষা করছিলেন, তাঁদের সঙ্গে আলাপ করা গেল কিছুক্ষণ। নাটক ও অপেরা সম্পর্কে সোভিয়েত জনগণের অত্যুৎসাহের কথা আমরা জানি। এ দেশের ফিল্ম খুব একটা উচ্চাঙ্গের নয়। আইজেনস্টাইন-পুডভকিন-চেরকাশভের কথা মনে রেখেও বলা যায়, সাম্প্রতিক দু-চারটি

সোভিয়েত ফিল্ম বেশ উচ্চমানের হলেও অধিকাংশ ফিল্ম মোটা দাগের, শিল্পকলা বা উপভোগ্যতা দুটোই কম। এদেশের টিভি অনুষ্ঠানও তেমন আকর্ষণীয় নয়, এঁরাই কয়েকজন বললেন। নাটক আর অপেরা কিন্তু উচ্চমান বজায় রেখে গেছে। রিগার নাটক মাঝে-মাঝে বিদেশ সফরেও যায়। এক একটি নাটক অনেকদিন চলে। সফল নাট্যকারদের রোজগারও খুব ভালো।

আমি বললুম, নাটক সম্পর্কে আলোচনা না করে নাটক দেখা অনেক বেশি ফলপ্রসূ নয়?

ওরা বললেন, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

পরে আমাকে একটি নাটক দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলেন ওঁরা।

রাইটার্স ইউনিয়ানে গিয়ে কয়েকটি চমকপ্রদ তথ্য জানতে পারলুম। এঁদের বাড়িটি অবশ্য মস্কোর রাইটার্স ইউনিয়ানের মতন অমন বনেদি বাড়ি নয়। এখানকার সেক্রেটারি বললেন, ল্যাটভিয়াতে ২০০ জন লেখক আছেন, লেখাটাই যাঁদের জীবিকা! ল্যাটভিয়ার জনসংখ্যা মাত্র পঁচিশ লক্ষ, সেখানে দুশো লেখক? আরও জানলুম যে এখানে সঙ্গীত রচয়িতা ও সঙ্গীত সমালোচক আছে ৭০ জন, এবং শিল্পীর সংখ্যা ৭০০। এঁরা সবাই ইউনিয়ানের সদস্য। এর বাইরেও শখের লেখকশিল্পী আছেন, যাঁদের মূল জীবিকা অন্য কিছু।

এই তথ্যের বিস্ময় আমাকে অনেকক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখল। একটা জাতি কতখানি শিল্পসাহিত্য প্রেমিক হলে সেখানে এতগুলি লেখক-শিল্পী-সঙ্গীতজ্ঞ থাকতে পারে! পঁচিশ লক্ষ জনসংখ্যার প্রত্যেকেই শিক্ষিত বলে ধরে নিচ্ছি, তা হলেও তাদের মধ্যে এত লেখক শিল্পীর সমাবেশ প্রায় অবিশ্বাস্য মনে হয়। অথচ সত্যি। ল্যাটভিয়ান ভাষায় সাহিত্যচর্চার বয়েসও বেশি নয়। একশো বছর আগেও এদেশের অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর ছিল।

সেক্রেটারি মশাই বললেন, কিছু বছর আগে একটা সংস্কৃত অভিধান হাতে পেয়ে আমরা চমকে উঠেছিলুম। কিছু কিছু সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে আমাদের মিল আছে।

ল্যাটভিয়ানরা লাটিন জাতি, তাঁদের ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত।

আমি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললুম, আপনাদের এক সহোদরা ভাষার প্রতিনিধি হিসেবে আমি এসেছি, আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

বসন্তকালে রিগা শহরে একটি আর্ট ফেস্টিভাল হয়। দোম ক্যাথিড্রালের সামনের প্রকাণ্ড চত্বরে তরুণ শিল্পীরা তাদের যার যার ছবি, ওয়াটার কালার, ট্যাপেস্ট্রি, পোস্টার, সেরামিক দ্রব্য ইত্যাদি যার যেরকম খুশি সাজিয়ে নিয়ে বসে। অনেকটা প্যারিসের Salon des inde'pedants-এর মতন। হাঁটতে-হাঁটতে সেখান দিয়ে যেতে-যেতে দেখলুম সেই শিল্পমেলার প্রস্তুতি চলছে। কয়েকজন তরুণ-তরুণী বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে ছবি টাঙাচ্ছে। মেলাটা শুরু হতে কয়েকদিন দেরি আছে, ততদিন আমার এখানে থাকা হবে না।

শুনলুম যে, এখানে ছবি প্রদর্শন করবার জন্য কোনও সিলেকশন কমিটি নেই। কোনওরকম বিধিনিষেধ নেই। প্যারিসের মেলার মতনই এখানেও ছবি রাখবার শর্ত একটাই, কোনও শর্তই থাকবে না! ছবির গুণাগুণ নির্ধারণের জন্যও থাকে না কোনও বিচারক; বিচারক হল দর্শকরা। তারা ইচ্ছে হলে কিনবে, অথবা কিনবে না!

শিল্পমেলাটি দেখা হবে না বলেই দেখতে গেলুম একটি শিল্প প্রদর্শনী। আমাদের হোটেলের কাছেই একটি বড় হলে রিগার তরুণ শিল্পীদের বার্ষিক প্রদর্শনী চলছে, টিকিট কেটে ঢুকতে হয়।

প্রায় শ'দেড়েক ছবি ও কিছু ভাস্কর্য। সবচেয়ে যেটা অবাক লাগল, তা হল এতগুলি ছবির মধ্যে একটি ছবিও তথাকথিত রিয়েলিস্টিক নয়। ক্রুশ্চভের আমলে কলকাতায় সোভিয়েত শিল্পীদের ছবির প্রদর্শনী দেখেছিলুম, তার অধিকাংশ ছবিই আমাদের পছন্দ হয়নি। সেসব বেশিরভাগ ছবিই ছিল ফটোগ্রাফিক, চড়া রং ও হাইলাইটের ব্যবহার, শিল্পের বিস্ময় ছিল খুবই কম। এখানে, এখানকার তরুণ ছেলেমেয়েদের ছবিতে দেখতে পাচ্ছি রহস্যময়তার দিকে ঝোঁক। মানুষের মূর্তি যেতে চাইছে

বিমূর্ততার দিকে। কিছু-কিছু ছবি অবশ্য ইম্প্রেশানিস্টদের কপির মতন।

ঘণ্টাদুয়েক সেই শিল্প প্রদর্শনীতে বেশ কাটল।

এরপর গেলুম এ পি এন অফিসে। আজ ৫ মে, কোনও কারণে এখানে ছুটি। তবু ছুটির দিনেই আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য দফতরে এসেছেন কয়েকজন। যে সুরসিক ব্যক্তিটি রেল স্টেশনে আমাদের অভ্যর্থনা করতে গিয়েছিলেন, তিনিই এখানকার অফিস প্রধান।

তিনি জিগ্যেস করলেন, খুব ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে তো?

আমি হাসলুম।

তিনি বললেন, আমাদের কাজ হচ্ছে আপনাকে যত বেশি জায়গা সম্ভব ঘুরিয়ে দেখানো। মনে হচ্ছে আপনার কিছু-কিছু সময় ফাঁকা যাচ্ছে, সেখানে আরও দু-একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঢুকিয়ে দিতে হবে।

আমি বললুম, দা মোর দা মেরিয়ার!

ছুটির দিন অফিস-অফিস ভাব নেই, পরিবেশটা অনেকটা আড্ডার মতন। ওঁদের কাছে শুনতে লাগলুম ল্যাটভিয়ার অতীত ইতিহাস।

আমি জিগ্যেস করলুম, আচ্ছা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত তো ল্যাটভিয়ায় অনেকরকম বিপর্যয় গেছে, এখানকার মানুষজনকে বহুরকম কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু এখন রাস্তাঘাটে যাদের দেখি, সকলেই বেশ স্বাস্থ্যবান, খুশি-খুশি চেহারা, শিল্প-সাহিত্যে এখানকার মানুষদের এত আগ্রহ, এত তাড়াতাড়ি এরকম উন্নতি কী করে সম্ভব হল?

ওঁদের একজন বললেন, মানুষের প্রাণশক্তি! মানুষ সব পারে!

আমি আবার বললুম, আমার আর একটি কৌতূহলের নিবৃত্তি করুন তো! সোভিয়েত দেশে এসে দেখছি, থিয়েটারে-অপেরায়, ট্রেনে, রাস্তায়, রেস্তোরাঁয়, মেয়েরা আলাদা বসে, একসঙ্গে এক জোড়া নাড়ী পুরুষের বদলে আলাদা নারী, আলাদা পুরুষ দেখতে পাই, এর কারণ কী? নারী-পুরুষের মেলামেশার নিশ্চয়ই কোনও বিধিনিষেধ নেই, তবু পুরুষ সঙ্গীহীন যুবতীদের এত বেশি সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যায় কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আরও অনেক প্রশ্ন এসে যায়।

সোভিয়েত ইউনিয়ানে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার, শিক্ষার ক্ষেত্রে, জীবিকার ক্ষেত্রে, সাংস্কৃতিক জীবনের ক্ষেত্রে। পশ্চিমি দেশগুলিতে মেয়েরা এতখানি স্বাধীনতা ও সমান অধিকার এখনও পায়নি। কিন্তু এই সমান মর্যাদাও অনেক সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

বাড়ির বাইরে মেয়েরা পুরুষদের সমান অধিকার অর্জন করলেও, নিজের সংসারে কি সেই অধিকার পাওয়া সম্ভব? স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই সমান মাইনের এবং সমান পরিশ্রমের চাকরি করে। কিন্তু বাড়ি ফিরে আসার পরও কি দুজনে সব কাজ সমানভাবে ভাগ করে নিতে পারে? মেয়েদের রান্নাঘরে ঢুকতেই হয়। বাচ্চাদেরও দেখাশুনো করতেই হয়, সে সময়টায় তার স্বামী টিভি দেখে কিংবা গল্পের বই খুলে বসে বা পাড়ার ক্লাবে খেলতে যায়। আজকাল অনেক স্বামী রান্না বা বাসন মাজার কাজে স্ত্রীকে সাহায্য করে। কিন্তু তা সাহায্য মাত্র, সব কাজ সমানভাবে ভাগ করে নেওয়া অসম্ভব। বাড়িতে কোনও অতিথি এলে স্বামীর মুখ দিয়ে অমনি বেরিয়ে পড়বে, ওগো, দু-কাপ চা করে দাও তো! যেন এটা শুধু মেয়েদেরই কাজ। তা ছাড়া, যাকে বলে সংসার চালানো, ভাঁড়ার ঘর ভরতি রাখা ও জামাকাপড়ের হিসেব রাখা ও দায়িত্ব মেয়েদেরই নিতে হয়।

ধরা যাক, এসব দায়িত্বও পুরুষরা সমানভাবে ভাগ করে নিল। কিন্তু শিশুপালন পুরুষের পক্ষে পুরোপুরি সম্ভব নয়। কোনও মা-ই এ দায়িত্ব পুরুষদের ওপর ছেড়ে দিতে চাইবেও না। সুতরাং বাইরের জগতে সমান অধিকারপ্রাপ্তা মেয়েদের বেশি পরিশ্রম করতে হয় নিজের সংসারে। এই কারণে খিটিমিটি বাধে, তারপর মন কষাকষি, তার পরেই ডিভোর্স।

সোভিয়েত ইউনিয়ানে ডিভোর্সের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। রিগা শহরে শতকরা ৫০টি পরিবারেই ডিভোর্স হয়।

আলোকপ্রাপ্তা মেয়েরা বিয়ের পরেও চাকরি ছাড়তে চায় না। শুধু টাকা পয়সার জন্য নয়, মেয়েরা চায় না শুধু পারিবারিক জীবনে আবদ্ধ থাকতে। তারা চায় সমাজের কাজেও নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে, গোষ্ঠীজীবনে তারা নিজেরাও প্রত্যেকে কিছু দিতে চায়, তারা চায় নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিবেশ।

সম্পূর্ণ সমান অধিকার পাওয়ার পর তারা আর যে-কোনও ভাবে পুরুষের চেয়ে বেশি পরিশ্রম বা বেশি দায়িত্ব নেওয়াটা বরদাস্ত করতে পারে না। এর ফলে জন্মহার সাংঘাতিকভাবে কমে যাচ্ছে। বেশি সন্তানের জন্ম দেওয়া মানেই মেয়েদের বেশিদিনের জন্য বাড়িতে আটকে থাকা, বেশি দায়িত্ব, বেশি কাজ। সেইজন্য অধিকাংশ পরিবারেই আজকাল একটি মাত্র সন্তান। এদেশে দুটি সন্তান আছে এমন পরিবারের সংখ্যা যত, একটিও সন্তান নেই এমন পরিবারের সংখ্যাও তত। তিনটি সন্তান আছে, এমন পরিবার শতকরা মাত্র একটি। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, সোভিয়েত ইউনিয়ানের এখন জনসংখ্যা কমতির দিকে। বেশি সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্য দম্পতিদের প্রতি সরকারি তরফ থেকে নানারকম উৎসাহ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। একগাদা কাচ্চাবাচ্চার মা হলে এদেশে সে সোনার মেডেল পাবে!

ছেলেদের তুলনায় মেয়েরাই এদেশে ডিভোর্স চায় বেশি। তার কারণ মেয়েদের নিরাপত্তার কোনও অভাব নেই। প্রত্যেক মেয়েই চাকরি পাবে এবং আলাদা থাকলে নিজস্ব ফ্ল্যাটও পাবে।

মেয়েদের সমান অধিকার আর পরিবার প্রথা, এই দুটিকে যেন আর খাপ খাওয়ানো যাচ্ছে না। এর একটা সুষ্ঠু সমাধানের জন্য সমাজতাত্ত্বিকদের নতুন করে ভাবতে হবে। পশ্চিমি দেশগুলিতে তো ছেলেমেয়েরা আজকাল বিয়েই করতে চাইছে না। সেইজন্য পারিবারিক বন্ধনও থাকছে না। ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেও বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা বাড়ছে, এবং সন্তান সংখ্যা কমছে। শুধু বড় শহরে নয়, গ্রামেও। উন্নত দেশগুলিতে এখন সত্যিকারের গ্রাম বলতে কিছু নেই, গ্রামের জীবনযাত্রাও শহুরে ধাঁচের।

সেইজন্যই পথে বা ট্রেনে বা থিয়েটারে আলাদা-আলাদা নারীদের দেখা যায়, যারা হয় কুমারী অথবা বিবাহ-ভগ্না। নারী-পুরুষের সমান অধিকারের ফল যদি হয় নারী ও পুরুষের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যাওয়া, তবে সেটাও তো খুব ভয়াবহ হবে।

আড্ডার মাঝখানে একটু চায়ের আয়োজন করা হল। স্পিরিট ল্যাম্পে গরম জল ফুটিয়ে তার মধ্যে ফেলে দেওয়া হল চায়ের পাতা। এদেশে এসে একদিনও ভালো চা খাইনি, এই চা-ও যথারীতি বিস্বাদ। ভারত নাকি সোভিয়েত ইউনিয়ানকে অনেক চা বিক্রি করে, আমরা ওদের এত খারাপ চা দিই কেন?

ওঁদের একজন বললেন যে, তিনি সদ্য কানাডা ঘুরে এসেছেন, সেখান থেকে নিয়ে এসেছেন এই চা।

অর্থাৎ আমি বিশিষ্ট অতিথি বলেই তিনি কানাডা থেকে সযত্নে নিয়ে আসা স্পেশাল চা পান করাচ্ছেন আমাকে। এর আগে এক জায়গায় শুনেছিলুম, জর্জিয়াতেও নাকি চা হয়। আমার সব ভূগোলের জ্ঞান গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আমরা তো জানতুম, ভারত বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা বার্মা চিন ছাড়া আর কোথাও চা হয় না। এখন শুনেছি জর্জিয়ান চা, ক্যানাডিয়ান চা, এসব কী? যাই হোক, আমি বঙ্গবাসী, আমার বাড়ি থেকে দার্জিলিং বেশি দূরে নয়, আমার কাছে এঁদের এই কালচে তরলপদার্থ মোটেই চা পদবাচ্য নয়।

রাত্তিরবেলা থিয়েটারটি বেশ উপভোগ্য হল। আমাদের বসতে দেওয়া হয়েছিল একটি সংরক্ষিত বক্সে। দারুণ খাতিরের ব্যাপার। ওখানে বসতে পান শুধু নগরপাল এবং সোভিয়েত ডেপুটিরা। বক্সটির

সংলগ্ন একটি ছোটঘর, সেখানে আছে ওভারকোট ইত্যাদি ঝুলিয়ে রাখার জায়গা আর ধূমপানের ব্যবস্থা। আমি আর সারগেই দোতলার বক্সে বসেছি, নীচ থেকে দর্শকরা কৌতূহলের সঙ্গে তাকিয়ে-তাকিয়ে আমায় দেখছে। আমাকে আফ্রিকার কোনও দেশের রাষ্ট্রপতি ভাবছে কি না কে জানে!

প্রেক্ষাগৃহটি দর্শকে পরিপূর্ণ। নাটকের কাহিনি ঐতিহাসিক পটভূমিকার, প্রচণ্ড শীতে এক বরফঝরা মধ্য রাত্রে একজন আগন্তুক এসে আশ্রয় চেয়েছে একটি গ্রামের বাড়িতে। জমিদারের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে, পালিয়ে এসেছে লোকটি, গ্রামের লোকদের জমিদারের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ করতে চায়, কিন্তু দেখা গেল যে-বাড়িতে সে আশ্রয় নিয়েছে, সে বাড়ির কর্ত্রী তার পূর্ব প্রণয়িনী। এই ব্যাপারটা টের পেয়ে গিয়ে বাড়ির কর্তা বারবার মদের দোকানে চলে গিয়ে ধুম মাতাল হয়ে পড়ে ইত্যাদি। কাহিনিটি অনেকটা আন্দাজে বুঝলুম, কারণ নাটকটি ল্যাটভিয়ান ভাষায় বলে সারগেইও বুঝতে পারছিল না। তবে অভিনয়ে ও মঞ্চসজ্জায় বেশ জমজমাট।

নাটক দেখে ফেরার পথে আমরা আর গাড়ি নিলুম না, হাঁটতে লাগলুম। পথে অনেক মানুষজন। আমাদের কোনও তাড়া নেই। আমরা গল্প করতে-করতে আস্তে-আস্তে হাঁটছি।

হঠাৎ একজন লোক আমার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। লোকটির চোখমুখ দেখে মনে হয় কিঞ্চিৎ-অধিক ভদ্‌কা সেবন হয়েছে।

লোকটি জিগ্যেস করল, হিন্দি?

বুঝলুম সে জানতে চাইছে আমি ভারতীয় কি না। আমি মাথা নাড়লুম।

লোকটি হাসিমুখে আমার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, হিন্দি-রুশী বায় বায় (ভাই ভাই)।

॥ ১১ ॥

এইখানে একদিন লক্ষ লক্ষ মানুষকে পশুতে পরিণত করা হয়েছিল। এইখানে একদিন নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের বন্দি করে রাখা হয়েছিল খোঁয়াড়ে। শক্ত সমর্থ পুরুষদের মুখের রক্ত তুলে খাটানো হত সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত। সন্তানের সামনে থেকে ভাইকে জোর করে টেনে নিয়ে যাওয়া হত, তারা আর ফিরত না। সভ্য, শিক্ষিত, শ্বেতাঙ্গ মানুষ দিনের পর দিন না খেয়ে থেকেছে, নিজের মলমূত্রের মধ্যে শুয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছে। এইখানে বয়ে গেছে নররক্তের স্রোত। এই মাটিতে মিশে আছে এক লক্ষেরও বেশি নারী-পুরুষের শব।

এইখানে ছিল হিটলারের নাতসি বাহিনীর অধীনে ইহুদি কনসেনট্রেশান ক্যাম্প।

রিগা শহর থেকে মাইল চল্লিশেক দূরে এই এলাকাটির নাম সালাসপিলস। তিনদিকে নিবিড় বন। তার মাঝখানে বিশাল উন্মুক্ত চত্বর। সেই কনসেনট্রেশান ক্যাম্পের কোনও চিহ্নই এখন আর এখানে নেই; বরং জায়গাটি দেখতে বড়ই সুন্দর। খুব যত্নে এই এলাকাটি সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

গাড়ি থেকে নামার পর দু-ধারে বৃক্ষ সারি সমন্বিত একটি প্রশস্ত পথ ধরে অনেকখানি হেঁটে আসতে হয়। তারপর চোখে পড়ে একটি অতিকায় স্মৃতিসৌধ। এখানে রাখা আছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বহু ছবি ও নানান ইতিহাস-চিহ্ন। এই ভবনটি পার হয়ে এলে প্রকাণ্ড চত্বরটিতে এসে দাঁড়াতে হয়। আগাগোড়া কংক্রিটে বাঁধানো। এই চত্বরটি অন্তত দশখানা গ্রাউন্ডের সমান। হিটলারি আমলের কাঁটাতারের বেড়া ও বন্দি নিবাসগুলো নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়েছে, তার জায়গায় রয়েছে কয়েকটি মহান, গম্ভীর ভাস্কর্য। মূর্তিগুলি এইরকমঃ প্রথমে দেখা যাচ্ছে অত্যাচারিত মানুষ মাটিতে পড়ে আছে। আর একটু এগোলে দেখা যায় তারা আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়াচ্ছে। তারপর তাদের প্রতিরোধের ভঙ্গি। একেবারে শেষ দিকে দেখা যায় সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে মা। তার পাশে বিজয়ী

পুরুষ, যে বজ্রমুষ্টি, তুলে ধরেছে আকাশের দিকে। এরপর অরণ্যের সবুজ দেওয়াল। মূর্তিগুলি লাইফ সাইজের দু-তিন গুণ বড়।

হিটলারি বাহিনীর কনসেনট্রেশান ক্যাম্পের নানান কাহিনি আমরা পড়েছি। পোলান্ডের কুখ্যাত গ্যাস চেম্বার নিয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে। ফিলম তোলা হয়েছে। রিগার এই সালাসপিল্‌স বা কনসেনট্রেশান ক্যাম্পের কথাও অনেকের কাছে ইদানীং সুপরিচিত, ফ্রেডরিক ফরসাইথের অতি জনপ্রিয় উপন্যাস "ওডেসা ফাইল"-এর মূল পটভূমিকা হল এই জায়গা। সেই উপন্যাসে এখানকার ক্যাম্পের নৃশংস অত্যাচারের অতি জীবন্ত বর্ণনা আছে।

এ পি এন-এর একজন প্রতিনিধি এসেছেন আমাদের সঙ্গে। তিনি আমাদের চত্বরটির এক পাশে টেনে নিয়ে গিয়ে বললেন, এইখানে একটা পুকুর ছিল। পুকুরটি কী করে কাটা হয়েছিল শুনবেন? এখানকার নাতসি কর্তার শখ হল, তিনি পুকুরে মাছ ধরবেন। তার জন্য পুকুর কাটানো দরকার। সে কাজের জন্য তো বন্দিরা আছেই। কিন্তু নাতসি কর্তার আরও উৎকট খেয়াল হল এই যে পুকুর খোঁড়ার জন্য বন্দিদের খন্তা-কোদাল কিছু দেওয়া হবে না। খালি হাতে, নোখ দিয়ে মাটি খুঁড়তে হবে। হাজার হাজার বন্দিদের লাগিয়ে দেওয়া হল সেই কাজে, তাদের পেছনে স্টেনগান হাতে প্রহরীরা। এইভাবেই একটা পুরো পুকুর কাটা হল।

একটু থেমে তিনি বললেন, অবশ্য নাতসি কর্তার মাছ ধরার শখ শেষ পর্যন্ত মেটেনি। সেই পুকুরের মাছ বড় হওয়ার আগেই নাতসিবাহিনী পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

আর এক পাশে রয়েছে একটি ডোবা। ভদ্রলোক বললেন, এই ডোবাটা কী কাজে ব্যবহার করা হত শুনুন। ছোট ছোট শিশুদের গা থেকে সব রক্ত টেনে বার করে নেওয়া হত সিরিঞ্জের সাহায্যে, তারপর সেইসব মৃত শিশুদের ছুড়ে ফেলে দেওয়া হত এই ডোবায়!

আমি চোখ বুজলুম, ফিসফিস করে বললুম, যাক, আর বলবেন না। আর শুনতে চাই না।

চত্বরটির প্রান্তে এসে আমি নিবিড় বনের দিকে তাকিয়ে রইলুম। এই গাঢ় সবুজের দিকে দৃষ্টি মেলে আস্তে আস্তে মন ভালো হয়ে যায়। নাতসিবাহিনী যখন চোখের পলক পর্যন্ত না ফেলে শত-শত মানুষ খুন করেছে, তখনও তো এখানে এই অরণ্য ছিল! কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে যাদের হত্যা করা হয়েছে, তারা কিন্তু প্রতিপক্ষের সৈনিক নয়, তারা সবাই নিরীহ সাধারণ মানুষ। তাদের অপরাধ, তারা ইহুদি। অবশ্য লাটভিয়ানদেরও নাতসিরা ক্রীতদাসের মতনই গণ্য করত। গত যুদ্ধে এই ছোট্ট দেশটিতে নিহত হয়েছে তিন লক্ষ সাধারণ মানুষ, আর দু-লক্ষ আশি হাজার নারী-পুরুষকে দাস-শ্রমিক হিসেবে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল জার্মানিতে। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশই যুদ্ধের শিকার। হিটলারের ইচ্ছে ছিল, গোটা দেশটাতে শুধু খাঁটি জার্মান রক্তের মানুষরাই বসবাস করবে।

সারগেইও আগে কোনও কনসেনট্রেশান ক্যাম্প দেখেনি। তার মুখখানা থমথমে। আমরা তিনজনে নিঃশব্দে এদিক-ওদিক ঘুরছি।

আমরা ছাড়াও এখানে অনেক দর্শনার্থী এসেছে। এসেছে গাড়ি ভরতি করে স্কুলের ছেলেমেয়েরা। এসেছে মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। সকলেরই হাতে ফুল। মে মাসের এই সময়টা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মে মাসের ন'তারিখে সোভিয়েত বাহিনী চূড়ান্ত জয়লাভ করেছিল।

ফিরতে গিয়ে এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। দৃশ্যটি দেখে আমার মতন কঠোর হৃদয় মানুষেরও চোখ জ্বালা করে উঠল। যে-জায়গাটিতে শিশুদের হত্যা করা হত, সেখানে রয়েছে একটি চিত্র-বিচিত্র স্মৃতিবেদি। সেখানে ভিড় করে আছে এখানকার স্কুলের ছেলেমেয়েরা। নানান রকমের রঙিন তাদের পোশাক, সরল সৌন্দর্যময় স্বাস্থ্যবান মুখ। তারা শুধু ফুল আনেনি, তারা এনেছে লজেন্স, চকোলেট, অনেক খেলনা। সেগুলো তারা বেদির ওপরে সাজিয়ে রাখছে। চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বছর আগে যেসব শিশুরা প্রাণ দিয়েছে, তাদের জন্য চকোলেট খেলনা উপহার এনেছে আজকের দিনের শিশুরা।

নাতসি অত্যাচারের ফোটোগ্রাফিক দলিল দেখার আর ইচ্ছে হল না আমার। ফিরে এসে উঠে বসুলম গাড়িতে। কিছুক্ষণ চুপচাপ চলবার পর এ পি এন-এর প্রতিনিধি ভদ্রলোকটি বললেন, চলুন, এর পরেই যেখানে যাওয়ার কথা ছিল, সেখানে পরে যাব, তার আগে একটু সমুদ্র দেখে আসা যাক।

আধ ঘণ্টা গাড়ি যাত্রার পর আমরা যেখানে পৌঁছলাম, সে জায়গাটিকে আমাদের দীঘার সঙ্গে তুলনা করা যায়। জায়গাটির নাম জুরমালা বিচ। রিগা শহর থেকে লোকে এখানে ছুটি কাটাতে সমুদ্রে স্নান করতে আসে। জায়গাটি মাছ ধরারও একটি বড় কেন্দ্র। মাছ ধরা ল্যাটভিয়ানদের একটি প্রধান জীবিকা।

এখানে যে জলরাশি দেখছি, সেটি আমার পূর্বে দেখা বালটিক সাগর। এই সমুদ্রে নাকি প্রচুর মাছ। কয়েক বছর হল এখানে নতুন করে ঝাঁকে-ঝাঁকে কড মাছের সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে। এখানে মাছ ধরা পড়ে জনসংখ্যার মাথাপিছু ২৩২ কিলোগ্রাম বছরে। এখানকার লোকের খাদ্য তালিকায় দু-তিনরকম মাছ থাকে প্রায়ই।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গ বা ওড়িশাও ঠিক এই রকমই সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল, এবং বঙ্গোপসাগরেও মাছের অভাব নেই, তবু আমাদের এই অঞ্চলে মাছের কত আকাল!

সমুদ্র তীরে কিছুক্ষণ বসে রইলুম আমরা। জলে একজনও স্নানার্থী নেই। যদিও মে মাস। তবু এখানে এখনও শীতকাল। আর কয়েকটা দিন পরেই স্নানের পরব শুরু হবে। সেই জন্যই এখানে অধিকাংশ বাড়ি এখন ফাঁকা। বড়-বড় হোটেলের বদলে এখানে কো-অপারেটিভের বাড়ি কিংবা বিভিন্ন ইউনিয়ানের হলিডে হোম রয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা এখানে ছুটি কাটাবার জন্য নামমাত্র ভাড়ায় থাকতে পারে। লেখক সমিতিরও একটি তিনতলা বাড়ি রয়েছে। তবে, একজন লেখকও এই সময়ে এখানে আসেননি।

সমুদ্রের ধারে খানিকক্ষণ বসে থাকার পর আমি জিগ্যেস করলুম, এই সমুদ্রের ওপারে কোন দেশ?

আমাদের সঙ্গী বললেন, ঠিক ওপারেই সুইডেন। দূরত্ব হবে দুশো মাইলের মতন। সুইডেন থেকে পাওয়ার বোটে চেপে কেউ কেউ এদিকে চলেও আসে।

আমি চোখ সংকুচিত করে চেষ্টা করলুম, ওপারের সুইডেন দেখতে পাওয়া যায় কিনা!

আমাদের সঙ্গী মৃদু হেসে বললেন, তা কখনও সম্ভব? মানুষের দৃষ্টিশক্তির তো একটা সীমা আছে!

আমি বললুম, না তো! মানুষ ইচ্ছে করলে লক্ষ-লক্ষ মাইল দূরের জিনিসও দেখতে পারে। সেরকম কয়েকটা জিনিস আমরা রোজই দেখি। কী কী বলুন তো?

তিনি একটু অবাক হতেই আমি হেসে বললুম, এটা অনেকটা ছোটদের ধাঁধার মতন হয়ে গেল, তাই না? আমরা চাঁদ, সূর্য দেখতে পাই। আকাশের এমন অনেক তারা আমরা দেখি যেগুলি কোটি কোটি মাইল দূরের।

সমুদ্রকূল ছেড়ে আমরা জুরমালা শহরটিতে দু-এক চক্কর দিলুম। ছোট শহর। আপাতত জনসমাগম কম বলে খানিকটা ঘুমন্ত মনে হল।

ফেরার পথে রাস্তাটি সুন্দর। দুপাশে বড়-বড় গাছ। সারগেই আমাকে জিগ্যেস করল, সুনীলজি, এটা আমাদের সোভিয়েত গাড়ি। আমাদের গাড়ি কেমন লাগছে আপনার?

আমি বললুম, আমি মোটর গাড়ির কলকবজা কিছুটা বুঝি না। এই গাড়িটা চলছে ঠিকঠাক, দেখতে-শুনতেও ভালো, সুতরাং ভালোই বলতে হবে!

সারগেই জিগ্যেস করল, আপনি তো অনেক আমেরিকান গাড়ি দেখেছেন, সেগুলো কি এর চেয়ে ভালো?

আমি বললুম, মোটর গাড়ির তুলনামূলক বিচার করার ক্ষমতা আমার নেই। তবে একটা জিনিস বলতে পারি, আমেরিকানরা বানায় ঢাউস ঢাউস গাড়ি, কিন্তু অনেক আমেরিকানই আজকাল কিনতে চায় জাপানি বা ফরাসি বা জার্মান ছোট-ছোট গাড়ি। তোমাদের সোভিয়েত গাড়িগুলো খুব বড়ও নয়, খুব ছোটও নয়, মাঝারি আকারের।

—আপনাদের দেশেও তো গাড়ি তৈরি হয়।

—হ্যাঁ। আমরা ভারতীয় গাড়ি চড়ি। তবে আমাদের গাড়ির একটা মজা আছে। অন্য দেশের গাড়ি প্রতি বছরই ক্রমশ ভালো হয়, বেশি মজবুত হয়, গাড়িতে নতুন-নতুন জিনিস জুড়ে দেওয়া হয় আর দাম কমাবার চেষ্টা হয়। আর আমাদের দেশের গাড়ি প্রতি বছরই খারাপ হয়, সেইসঙ্গে দামও বাড়ে।

—আপনাদের প্রধানমন্ত্রীর ছেলেও তো একটা গাড়ি বানাবার কোম্পানি খুলেছিল...

সারগেই ইন্ডিয়া ডেস্কে কাজ করে, সে ভারত সম্পর্কে অনেক খবর রাখে। গাড়ি সম্পর্কে আলোচনা চালাতে আর আমার ইচ্ছে হল না। মাটিতে নীচের সমস্ত পেট্রোল ফুরিয়ে গেলে পৃথিবীর থেকে যদি মোটরগাড়ি নামে ব্যাপারটা উঠেই যায়, তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। তখন আমরা আবার ঘোড়ায় চাপব। মনে-মনে আমি যেন অশ্বারোহীদের শতাব্দীগুলিতে প্রায়ই ফিরে গিয়ে বেশ আরাম পাই।

মাঝপথে আমরা থামলুম একটি কৃষি খামারে। সেখানকার পরিচালক অপেক্ষা করছিলেন আমাদের জন্য।

এটি একটি সরকারি খামার। এখানে খামার আছে দু-রকম। অনেক জায়গায় চাষিরা নিজেদের সব জমি মিলিয়ে সমবায় প্রথায় যৌথ খামার করেছেন। আর কোথাও-কোথাও সরকারই জমি অধিগ্রহণ করে কৃষকদের দিয়ে চাষ করাচ্ছেন। উৎপাদন অনুযায়ী চাষিদের আয়।

এ সম্পর্কে আগে থেকেই কিছুটা ধারণা ছিল বলে চমকে গেলুম না এখাকার চাষিদের সচ্ছলতা দেখে। সোভিয়েত রাশিয়ায় এসে আমি গরিব চাষি দেখব, এমন তো আশঙ্কাও করিনি। আমাদের দেশে চাষি, মজুর, জেলে, মুচি, কুমোরদের এমনই অবস্থা যে ওইসব শব্দগুলো উচ্চারণ করলেই ছেঁড়া কাপড়, খালি গা, হত-দরিদ্র চেহারার মানুষের ছবি ফুটে ওঠে। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য বহু দেশেই জীবনযাপনের একটা নিম্নতম মানই আমাদের চেয়ে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। সেসব দেশে চাষি-মজুর-মুচিরাও ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকে, ঘরে টেলিভিশান আছে, কারুর-কারুর নিজস্ব মোটর গাড়ি থাকাও কিছুই আশ্চর্যের নয়।

এখানকার এই সরকারি খামারটি সুপরিচালিত। শুধু চাষবাস ছাড়াও এখানে হাঁস-মুরগি পালন, গরুর দুধের কারবারও হয়। কৃষকদের এই কলোনিটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। নিজস্ব দোকানপাট ছাড়াও আমোদপ্রমোদেরও ব্যবস্থা আছে।

আমি মাঠের চাষ দেখতে গেলুম না, কালোনিটিই ঘুরে-ঘুরে দেখলুম। বেশ নিরিবিলি, শান্ত জায়গাটি। প্রথম দিকে তৈরি হয়েছিল দোতলা বাড়ি, তার একতলা-দোতলায় দুটি করে পরিবার থাকে। এখন তৈরি হচ্ছে লম্বা-লম্বা ফ্ল্যাট বাড়ি। কিছু-কিছু একতলা বাড়িও আছে, সেখানকার সংলগ্ন জমিতে নিজস্ব শাক-সবজি ফলানো যায়।

ডিপার্টমেন্ট স্টোর্সের সামনে কয়েকখানি গাড়ি দাঁড়িয়ে। কৃষকেরা বাজার করতে এসেছেন। মহিলারা সুসজ্জিত। এক জায়গায় একজন বলিষ্ঠকায় কৃষক একটি গাড়িতে বোঝাই করছেন ভুট্টা। তাঁর পায়ের গামবুট জলকাদা মাখা, নীল রঙের ঢোলা পোশাকেও নোংরা লেগেছে। বিকেলবেলা ইনি স্নান-টান করে, পোশাক বদলে হয়তো বউকে নিয়ে সিনেমা দেখতে যাবেন।

এই খামারের পরিচালক আমাদের ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে সবকিছু বোঝাচ্ছিলেন। এক সময়ে তিনি বললেন, আমি ভারতে গিয়েছিলুম। পশ্চিমবাংলাতেও গেছি। আমাদের তুলনায় আপনাদের চাষিরা

ভাগ্যবান। তারা বছরে দুবার চাষ করতে পারে। আমরা তো আবহাওয়ার জন্য বছরে একবারের বেশি চাষ করতে পারিই না!

আমি মনে মনে হাসলুম। সোভিয়েত চাষিরা পাকা বাড়িতে থাকে, গাড়ি চাপে, বউকে নিয়ে নাচতে কিংবা সিনেমা দেখতে কিংবা দেশ ভ্রমণে যায়। আর ভারতীয় ভাগ্যবান চাষি, যারা বছরে দুবার চাষ করে, তারা সারা বছর পেট ভরে খেতে পায় না, পাকা বাড়িতে থাকার দুঃস্বপ্ন তারাও দেখে না!

॥ ১২ ॥

দেশ-এর মতন একটা বিশাল ভারী জিনিস সবসময় পিঠে বহন করা খুব শক্ত। আমি ভারতবর্ষে জন্মেছি, জন্মসূত্রে আমি ভারতীয় এবং ভারতবাসী হিসেবে আমি যথেষ্ট সন্তুষ্ট। কিন্তু সর্বক্ষণই কি আমি ভারতবাসী? আমি যখন কোনও রাস্তা দিয়ে একা হেঁটে যাই, তখন আমি শুধুই একজন মানুষ, এমনকী সেই রকম অনেক সময় আমি লেখকও নই, কারুর পিতা বা সন্তান নই, নেহাতই নামহীন একজন। মানুষ যখন অন্য মানুষের কাছাকাছি আসে তখনই তার একটা পরিচয়ের দরকার হয়।

বিদেশে গেলে কিন্তু সব সময়ই ভারতীয় সেজে থাকতে হয়। সেই জন্য মাঝে-মাঝে পিঠ ব্যথা করে। এখানে যার সঙ্গেই দেখা হবে, সে-ই আমাকে ভারতের একজন প্রতিনিধি বলে ধরে নেবে। আমি যদি ঘন-ঘন চোখ পিট পিট করি, তাহলে অনেকে ভাবতে পারে যে সব ভারতীয়েরই এরকম স্বভাব! অনেকেই তো এখানে সামনাসামনি কোনও ভারতীয়কে আগে দেখেনি। ভারতীয়রা যে কত বিচিত্র ও অদ্ভুত হয় তা অন্যরা কী করে বুঝবে? আমরা দু-দিকে মাথা নেড়ে 'না' বোঝাই, আবার এই ভারতেরই দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষ দুদিকে মাথা নেড়ে বোঝায় 'হ্যাঁ'। ভারতবর্ষেই বহু মানুষ ঘোর নিরামিষাশী, গো-হত্যাকে মহা পাপ মনে করে। আবার ভারতেরই বহু লোক মাছ ধরে জীবিকা অর্জন করে, উৎসবে পাঁঠা বলি দেয়, পরবের সময় পবিত্র জ্ঞানে গো-মাংস ভক্ষণ করে। এই ভারতবর্ষেই কোটি কোটি লোককে এখনও গ্রামের বাইরের দিকে থাকতে হয়, তারা অস্পৃশ্য, তারা তথাকথিত ভদ্রলোকদের কুয়ো থেকে জল তুলতে গেলে মার খায়। আমি তবে কোন ভারতবর্ষের প্রতিনিধি?

বিদেশে এসে ভারতের গৌরব বৃদ্ধিই আমার দায়িত্ব। কিন্তু আমি তো আমার দেশের সবকিছু পছন্দ করি না। আমাদের শাসক শ্রেণির বোকামি, ভারতীয় চরিত্রের ভণ্ডামি, সামাজিক বৈষম্য, এসব কথা বিদেশে এসে গোপন করে যেতে হবে?

প্রায় দিন দশেক সারগেই-এর সঙ্গে একসঙ্গে ঘোরাফেরা করছি, আমি ওকে লক্ষ করছি ভালো করে। সে একজন সোভিয়েত যুবক, বছর দেড়েক সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করেছে, এখন বিদেশ দফতরে কাজ করে। এই সব শুনলে যে ছবিটি ভেসে ওঠে তা কিন্তু তার চরিত্রের সঙ্গে মেলে না। সে আসলে বেশ নরম স্বভাবের মানুষ, শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে উৎসাহী, খুব একটা প্র্যাকটিক্যাল বা কেজো ধাঁচের নয়। আমাদের দেশের বা পৃথিবীর যে-কোনও দেশের একজন তরুণ কবির সঙ্গে তার চরিত্রের বিশেষ কিছুই অমিল নেই।

সারগেই অবশ্য তার দেশ সম্পর্কে খুব গর্বিত। প্রায়ই সে তার দেশের সঙ্গে ইউরোপের অন্যান্য দেশ বা আমেরিকার তুলনা করে এবং আমার মতামত জানতে চায়।

বিকেল বেলা ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটিতে এসে আমার এইসব কথা মনে পড়ছিল। এখানে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হচ্ছে আমাকে নিয়েই। বন্ধু রাষ্ট্র ভারত থেকে আমি অতিথি হয়ে এখানে এসেছি, তাই রিগা শহরের বন্ধু পরিষদ সংবর্ধনা জানাচ্ছে আমাকে। আমার পক্ষে এক অস্বস্তিকর অবস্থা। এখন আমার পিঠের ওপর গোটা ভারতবর্ষ।

কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথি এসেছেন। তিনটি মেয়ে লোক-উৎসবের পোশাক পরে, অর্গান বাজিয়ে একটি গান গাইল আমাকে উদ্দেশ্য করে। গান শেষ হওয়ার পর আমি উঠে দাঁড়িয়ে কোমর ঝুঁকিয়ে মেয়ে তিনটিকে ধন্যবাদ জানালুম। ভেতরে-ভেতরে কিন্তু আমি ঘামছি। কারণ, শেষকালে আমায় একটি বক্তৃতা দিতে হবে। এসব জায়গায় কীরকম বক্তৃতা দিতে হয় সে সম্পর্কে আমার কোনও ধারণাই নেই।

সারগেই উঠে দাঁড়িয়ে মুখস্থ করা ভঙ্গিতে আমার পরিচয় জানাল। তারপর একে একে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের। অধ্যাপক ইভবুলিসও এসেছেন, তাঁর হাতে 'দেশ' পত্রিকার সেই সাহিত্য সংখ্যাটি, যাতে রিগা শহর সম্পর্কে অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরীর রচনাটি ছাপা হয়েছে। রচনাটির নাম "দূরের বন্ধু"।

ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটির সভাপতি এবং আরও দু-একজন ভাষণ দিলেন ভারতীয় অতিথিটিকে স্বাগত জানিয়ে। তাঁদের কণ্ঠস্বরে আমি যেন সামান্য ক্লান্তির সুর লক্ষ করলাম। বিদেশি অতিথি এলে প্রত্যেকবারই তাঁদের খুব সম্ভবত এই একই কথা বলতে হয়। এক ঘণ্টার আলাপ-পরিচয়ে—পরস্পরের ভাষা আলাদা—মানুষে-মানুষে বন্ধুত্ব হওয়া সম্ভব নয়। সেই জন্য ধরাবাঁধা কথা দিয়ে আলাপ চালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কী!

সমিতির পক্ষ থেকে আমাকে কিছু উপহার দেওয়া হল। লোকসঙ্গীতের একটি রেকর্ড, একটি ছোট মূর্তি এবং ল্যাটভিয়ার একটি পতাকা। এবারে আমার ভাষণ দেওয়ার পালা। উঠে দাঁড়িয়ে গলা খাঁকারি দিয়ে আমি বললুম, আপনাদের এই মহান দেশে আসতে পাওয়ার সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য বোধ করছি। আপনাদের জন্য আমি সঙ্গে কোনও উপহার আনতে পারিনি, কিন্তু এনেছি উষ্ণ বন্ধুত্ব এবং আর দেশের শুভেচ্ছা!

এবারে একটু থামলুম, সারগেই আমার কথা অনুবাদ করে দিতে লাগল। সেই সুযোগে আমি আর একখানা বেশ সারগর্ভ বাক্য ভেবে নিলুম। ক্রমশ দেখলুম, দোভাষীর মাধ্যমে বক্তৃতা করা খুব একটা শক্ত কিছু নয়। ভেবে নেওয়ার যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়। তা ছাড়া আমি যা বলছি তার সঠিক অনুবাদ হচ্ছে কি না তা-ও বোঝবার উপায় নেই। অনুবাদের সুবিধের জন্য সরল এবং প্রথাসম্মত বাক্য বলাই ভালো।

অনুষ্ঠান শেষে বাইরে বেরিয়ে এসে সারগেই-কে জিগ্যেস করলুম, আমি পাস করেছি তো?

সারগেই বলল, কীসের?

আমি বললুম, মহান ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হিসেবে তোমাদের এই মহান সোভিয়েত দেশে আমি যে বক্তৃতাটি দিলুম, সেটা ঠিকঠাক হয়েছে তো!

সারগেই হো হো করে হেসে উঠল। তারপর বলল, এইসব অনুষ্ঠান তো খানিকটা ফর্মাল হবেই। আপনার ভালো লাগেনি?

আমি বললুম, নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে। সবচেয়ে ভালো লেগেছে ওখানকার কফি। যে-মহিলা কফি বানাচ্ছিলেন, আমি লক্ষ করছিলুম, তাঁর হাতের আঙুলগুলো কী সুন্দর। অস্ফুট চাঁপা ফুলের মতন। ওই হাতের গুণেই কফি অত সুন্দর হয়েছে।

আমরা দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে লাগলুম। রিগা শহরে আজই আমাদের শেষ দিন। সন্ধেবেলা একটি কনসার্ট শুনতে যাওয়ার কথা আছে। মাঝখানের সময়টা ঘুরে বেড়ানো যায়। এখানে এসে আমরা গাড়ি নিয়েছি খুব কম। একটু হাঁটলেই পৌঁছে যাওয়া যায় নদীর ধারে। এই ক'দিনেই আমি শহরটির মূল কেন্দ্রটি, ইংরেজিতে যাকে বলে ডাউন-টাউন, বেশ চিনে গেছি।

খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর সারগেই বলল, আমাকে একবার এ পি এন দফতরে যেতে হবে প্লেনের টিকিট কাটবার জন্য। আপনি কি আমার সঙ্গে সেখানে যাবেন না এখানে অপেক্ষা করবেন?

আমি একটা পার্কের মধ্যে ঢুকে পড়লুম। নিজের দেশে বিকেলবেলা কোনও পার্কের বেঞ্চে

বসে অলস সময় কাটাবার সুযোগ আজকাল আমি পাই না। তিন দিকের রাস্তা দিয়ে ব্যস্ত হয়ে মানুষজন হাঁটাহাঁটি করছে, তাদের মাঝখানে চুপচাপ বসে থাকা এক চমৎকার বিলাসিতা।

সব গাছেরই নতুন পাতা গজাচ্ছে, চারদিক তাই উজ্জ্বল সবুজ। পার্কে নানানরকম ফুলের মেলা, অধিকাংশ ফুলেরই নাম জানি না। তবে টিউলিপ-ই বেশি, বিভিন্ন রঙের, লাল, হলুদ, সাদা। আর একটি ফুল চিনতে পারলুম। রডোডেনড্রন। প্যারিসে, অসীম রায় তাঁর বাড়ির বাগানে এই ফুল চিনিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যদিও লিখেছেন, "উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেনড্রন গুচ্ছ", কিন্তু আমি আমাদের দেশে এ ফুল কোথাও দেখিনি। উত্তরবঙ্গে, কার্শিয়াং-কালিম্পং-এর দিকে এই ফুল অনেক ফোটে বলে শুনেছি। কিন্তু আমার দেখা হয়নি।

কাছেই রাস্তায় একটা দোকানের সামনে বেশ ভিড়। পথ চলতি লোকেরা সেখানে থেমে গিয়ে কিছু কিনছে। সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ একটা কথা আমার মনে পড়ল। প্রায় দিন দশেক হল আমি নিজস্ব একটি পয়সাও খরচ করিনি। সাবালক হওয়ার পর, অসুস্থ হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকা ছাড়া, আর কখনও আমার এই অবস্থা হয়নি। আমার যা কিছু প্রয়োজন, তা সবই সারগেই কিনে দিচ্ছে। তার ফলে, আমার হঠাৎ কিছু কেনার ইচ্ছে হলেও মুখ ফুটে সে কথা সারগেই-কে বলতে পারি না। এরা আমাকে নেমন্তন্ন করে এনেছে বলে কি আমার নিজস্ব পয়সাও খরচ করতে দেবে না? এরপর আমার প্যারিস ও লন্ডনে যাওয়ার কথা আছে বলে সঙ্গে কিছু ফরেন এক্সচেঞ্জ নিয়ে এসেছি। এখানকার বড়-বড় হোটেলে ডলার বা পাউন্ড দিয়ে জিনিসপত্র কেনা যায়। আমি দু-একবার সেইসব দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের পকেটে হাত দিয়ে কিছু কেনার প্রস্তাব করতেই সারগেই অতি ব্যস্ত হয়ে বলেছে, না, না, আপনি পয়সা খরচ করবেন না। আপনার কী চাই বলুন না। ফলে, সেসব জিনিস আর আমার কেনাই হয়নি। আসলে হোটেলে স্কচ হুইস্কি দেখে আমার মাঝে-মাঝে বাসনা জেগেছে। কিন্তু সারগেই-এর মতন একটা বাচ্চা ছেলে আমাকে মদ কিনে দেবে, এ আমি মেনে নিতে পারি না। তাই সংযম দেখিয়ে আমি হুইস্কি পানের বাসনা দমন করে যাচ্ছি। সারগেই অবশ্য মাঝে-মাঝে ঠান্ডা কাটাবার ওষুধ হিসেবে ভডকা বা ব্র্যান্ডি এনে দেয় আমাকে।

একটা বেশ ফুরফুরে খুশিয়ালি বাতাস দিচ্ছে। এ দেশে এখন বসন্তকাল। এ দেশে কি পাখি কম? সেরকম পাখি তো চোখে পড়েনি। আমাদের মতন গরম দেশেই বোধহয় পাখি বেশি থাকে। শালিখ, চড়াই, ছাতারে, কাক, চিল আর শকুন, এই কটা পাখি তো কলকাতা শহরে সর্বক্ষণ থাকে। এ ছাড়া, বুলবুলি, টিয়া, দোয়েল এবং বকও প্রায়ই দেখা যায়। এখানে সেরকম পাখি নেই।

সন্ধেবেলার অনুষ্ঠানটি খুবই উপভোগ্য। বস্তুত এ পর্যন্ত যে ক'টি থিয়েটার বা অপেরা দেখেছি, সেগুলির চেয়ে এই অনুষ্ঠানটি আমার ভালো লাগল বেশি। এখানে ভাষারও অসুবিধে নেই।

অনুষ্ঠানটি ঠিক বাজনার কনসার্ট নয়, বরং নাচই বেশি। বিভিন্ন এলাকায় যে খুব প্রতিষ্ঠান আছে তাদের নাচের দলগুলির একটা প্রতিযোগিতার মতন হচ্ছে এখানে। অন্তত পঁচিশ-ছাব্বিশটি দল এসেছে এরকম। সবাই তরুণ-তরুণী বা কিশোর-কিশোরী। মঞ্চের নেপথ্যে বাজনা বাজছে, আর এক একটি দল এসে নাচ দেখিয়ে যাচ্ছে। বাজনাও অনেকরকম, নাচও অনেক রকম।

ঠিক বর্ণনা করে বোঝানো যাবে না সেই নাচ কত সুন্দর। ট্রাডিশনাল বা পুরোনো নানান উৎসবের পোশাক পরে এসেছে ছেলেমেয়েরা, কত তার রং, কত তার বৈচিত্র্য। কোনও-কোনও নাচ ওয়ালজের মতন মৃদু লয়ের, কোনও-কোনও নাচ ফক্স ট্রটের মতন দ্রুত। কোনওটি নিভৃত প্রণয়ের, কোনওটি যুদ্ধযাত্রার। যে দলের নাচ বেশি ভালো হচ্ছে, দর্শকরা বেশ হাততালি দিয়ে মঞ্চে আবার ফিরিয়ে আনছে তাদের, তারা দ্বিতীয়বার নাচ দেখাচ্ছে।

প্রায় আড়াই ঘন্টা ধরে আমি দেখে গেলুম সেই দৃশ্যের ঐশ্বর্য। আজকালকার প্যান্ট-শার্ট আর স্কার্টের চেয়ে আগেকার পোশাক কত সুন্দর ছিল! দেখতে দেখতে মাঝে-মাঝে আমার মন খারাপও লাগছিল। নিজের দেশের কথা মনে পড়ে। এরকম স্বাস্থ্যবান, হাস্যোজ্জ্বল ছেলেমেয়ে কোথায় আমাদের

দেশে? আমাদের যুবক-যুবতীদের মধ্যে গোষ্ঠীনাচের কোনও চলনই নেই। অথচ এরকম নাচে শরীর আর মন দুটোই ভালো হয়ে যায়।

সব মিলিয়ে প্রায় পাঁচশো জন যুবক-যুবতীর নাচের ব্যবস্থা হয়েছে এই সন্ধেবেলা। সমান সংখ্যক ছেলে ও মেয়ে। মেয়েরা যে শুধু স্বাস্থ্যবতী তাই-ই নয়, ল্যাটভিয়ান মেয়েরা বেশ সুন্দরী। অন্যান্য দর্শকদের সঙ্গে মিশে গিয়ে আমিও আমার পছন্দমতন নাচের পর প্রবল হাততালি দিতে লাগলুম।

যে-কোনও অনুষ্ঠানের শেষেই সারগেই আমার মতামত জানতে চায়। হল থেকে বেরিয়ে সে জিগ্যেস করল, সুনীলজি, আপনার কেমন লাগল?

এর মধ্যে আমি আরও দু-চারটি রুশ শব্দ শিখে নিয়েছি। আমি জোর দিয়ে বললুম, খারাসো, খারাসো! (ভালো, খুব ভালো!) তারপর ফরাসিতে বললুম, ত্রে বিয়াঁ। তারপর ইংরিজি, হিন্দি ও বাংলায় ওই কথাগুলিই আবার বললুম।

সারগেই বলল, মনে করুন, কোনও এক এঞ্জেল এসে আপনাকে বলল, তুমি একটা মাত্র কিছু চাও। যা চাইবে তাই-ই পাবে। তাহলে, সুনীলজি, আপনি কী চাইবেন!

আমি প্রশ্নটা ফিরিয়ে দিয়ে বললুম, এরকম হলে তুমি কী চাইবে শুনি?

সারগেই বলল, আমি চাইব, সময়। জীবনে এত সব ভালো ভালো জিনিস আছে। সব কিছু ভালোভাবে উপভোগ করবার জন্য আরও অনেক সময় চাই!

আমি নিজে কী চাইব সে বিষয়ে মনঃস্থির করতে পারলুম না। হয়তো আমার কিচ্ছুই চাইবার নেই। জীবনটা যেভাবে চলছে তাই তো বেশ। ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার একদম মাথা ঘামাতে ইচ্ছে করে না। ভবিষ্যৎ যত অনিশ্চিত, তত রহস্যময়। আমি দীর্ঘজীবন কামনা করি না এইজন্য, যদি তাতে এ জীবনটা পুরোনো হয়ে যায়।

॥ ১৩ ॥

কিয়েভ শহরে পৌঁছে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। হোটেলের ঘরটি আমার পছন্দ হয়নি, বেশ ছোট ঘর, অন্ধকার-অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে, হিটিং ব্যবস্থা ঠিক মতন কাজ করছে না বোধহয়। একটি মাত্র জানলা, সে জানালা দিয়ে দেখবার কিছু নেই। চোখে পড়ে একটা কারখানা মতন জায়গায় উঠোন, সেখানে পড়ে আছে কিছু ভাঙাচোরা জিনিস।

সুটকেসটা ঘরের মাঝখানে নামিয়ে রেখে আমি অপ্রসন্ন মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম চুপ করে। তারপর আপন মনেই হেসে উঠলুম হো হো করে। অবস্থা বিশেষে মানুষের মানসিকতার কত পরিবর্তনই হয়!

আমি জীবনে কত সস্তার হোটেলেই না থেকেছি, ক্যানিং-এ টিনের ঘরে দেড় টাকা সিট ভাড়া দিয়ে হাটুরে লোকদের সঙ্গে পাশাপাশি ঘুমিয়েছি, বেলপাহাড়িতে একই খাটিয়া দুজনে ভাগাভাগি করে রাত কাটিয়ে দিয়েছি আকাশের নীচে, হায়দ্রাবাদ রেল স্টেশনে একটা কম্বলের অভাবে সারারাত শীতে ঠকঠক করে কেঁপেছি, সেই আমারই হোটেলের ঘর নিয়ে খুঁতখুঁতুনি? এই ঘরটি তেমন কিছু খারাপ নয়, আসলে লেনিনগ্রাড ও রিগায় দারুণ আরামদায়ক হোটেলে থেকে এসে আমার প্রত্যাশা বেড়ে গেছে। বেশি আদর পেয়ে-পেয়ে আমার পায়াভারী হয়েছে! আমি নিজের খরচে বেড়াতে এলে এর চেয়ে অনেক খারাপ হোটেলে আমায় উঠতে হত।

এ ঘরে পৌঁছে দেওয়ার সময় সারগেই অবশ্য বারবার দুঃখ প্রকাশ করে গেছে। কিয়েভ শহরে এখন টুরিস্টদের সাংঘাতিক ভিড়, অনেক চেষ্টা করেও এর চেয়ে ভালো ঘর জোগাড় করা যায়নি। এই হোটেলটি বেশ বড়, এর নাম হোটেল নিপ্রো, এর পেছন দিকের দুটি ঘর কোনওক্রমে পাওয়া গেছে আমাদের জন্য।

মনে-মনে এসব সান্ত্বনা বাক্য নাড়াচাড়া করবার পরও কিন্তু আমার মন ভালো হল না। ঘর যেমনই হোক, জানলা দিয়ে রাস্তাঘাট দেখা গেলেই আমি খুশি হতাম। কিয়েভ শহরটি যে বড়ই সুন্দর!

এয়ার পোর্ট থেকে আসতে আসতেই এই শহরের অনেকখানি দেখে মুগ্ধ হয়েছি। এমন সবুজ শহর আমি আগে কখনও দেখিনি। মনে হয় পুরো শহরটাই একটা উদ্যান, বাড়িঘরগুলি গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে। রাস্তার দুপাশের গাছগুলিতে ফুটে আছে থোকা-থোকা চেস্টনাট ফুল। লন্ডন শহরে এইরকম চেস্টনাট ফুল ফোটে, প্যারিসেও দেখেছি কিন্তু এ দেশে এসে এই ফুল আগে চোখে পড়েনি। এর আগে যে তিনটি শহর দেখেছি, সেই তিনটিই সমতল, কিয়েভ কিন্তু ঢেউ খেলানো, ছোট-ছোট টিলা এদিক-ওদিক তাকালেই চোখে পড়ে, শহরের মাঝখান দিয়েই বয়ে চলেছে বিশাল নিপার নদী।

এরকম সুন্দর শহরে এসে হোটেলের ঘরে বসে থাকার কোনও মানে হয় না। সারগেইকে এখানকার অফিসের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। তা ছাড়া সে তার স্ত্রীকে ফোন করবে। আমার সঙ্গে টানা দিন দশেক ঘুরছে, এর মধ্যে তার স্ত্রীর সঙ্গে কোনও যোগাযোগই নেই। আমি একলাই বেরিয়ে পড়লুম বাইরে। পথঘাট না চিনলেও ঠিক যে-পথ দিয়ে যাব, সেই পথ দিয়ে ফিরে আসব।

আমাদের হোটেলের খুব কাছেই অক্টোবর রেভেলিউশান স্কোয়ার। এই স্থানটি বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী। এখানে অনেক রক্ত গড়িয়েছে। অথচ এখন এই জায়গাটি এতই মনোরম যে এখানে এসে দাঁড়ালেই একটা চমৎকার অনুভূতি হয়। চতুর্দিকেই ফুলের বাগান, একদিকে বিশাল চত্বরের একপাশে উঠে গেছে থাক থাক সিঁড়ি, তার ওপরে লেনিনের সুদৃশ্য মূর্তি।

ইউক্রাইনের রাজধানী কিয়েভ শহরটি প্রায় দেড় হাজার বছরের পুরোনো। বেশ কিছুদিন প্রাচীন রাশিয়ার রাজধানী ছিল এই কিয়েভ। পরে সেই রাশিয়া ভেঙে তিনটি জাতি হয়, রাশিয়ান, ইউক্রাইনিয়ান ও বিয়েলো রাশিয়ান। এখানকার মাটি এত উর্বর যে ইউক্রাইনকে বলা যায় এক বিশাল শস্য ভাণ্ডার। যন্ত্রশিল্পেও এ রাজ্যটি এখন খুবই উন্নত।

এত সৌন্দর্য ও সবুজের সমারোহ দেখে কল্পনা করাই শক্ত যে এখানে একদিন কী সাংঘাতিক যুদ্ধকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। দু-বছর এই শহরটি নাতসিরা অধিকার করেছিল, এখানকার ঘরবাড়ি ধ্বংস করেছে, মিউজিয়ামগুলি লুট করেছে এবং দু-লক্ষ নাগরিককে হত্যা করেছে। অবরোধমুক্ত করে ইউক্রানিয়ান বিজয়ী বাহিনী যখন এখানে প্রবেশ করে তখন নাকি তাদের মনে হয়েছিল, এটা একটা মৃতের নগরী।

এখানে আসবার আগেই আমি ইউক্রাইন ও কিয়েভ সম্পর্কে কিছু-কিছু পড়ে নিয়েছি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাহিনিগুলির মধ্যে একটি কাহিনি যেমনই মর্মন্তুদ তেমনই সেটি মানুষের অপরাজেয় মনোভাবের একটি মহান দৃষ্টান্ত।

ঘটনাটি এইরকম ঃ

কিয়েভে ডায়নামো টিম নামে একটি বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় দল ছিল। যুদ্ধের সময় এই দলের অনেক খেলোয়াড় প্রতিরোধ বাহিনীতে যোগ দেয়। এই দলের একজন প্রধান খেলোয়াড় মাকার গনচারেংকো একদিন আহত হয়ে নাতসিদের হাতে ধরা পড়েন। নাতসিদের মধ্যে অনেকে তাঁকে চিনতে পেরেছিল। নাতসিরা তখন আহ্বান জানাল ডায়নামো টিমের সঙ্গে তাদের একটি ফুটবল ম্যাচ হোক। নাতসিদের মধ্যেও অনেক প্রফেশনাল খেলোয়াড় ছিল।

ডায়নামো টিমের খেলোয়াড় কয়েকজন আগেই ধরা পড়েছিল, কয়েকজন ছিল অবরুদ্ধ নগরীতেই। তারা বুঝতে পারল, এই ম্যাচ মানে মৃত্যু-খেলা। এই খেলায় জিতলে প্রাণে বাঁচার কোনও আশাই নেই। খেলা শুরুর আগে ড্রেসিং রুমে ঢুকে রেফারি বলে গেল, মনে রেখো, দু-দলের একটাই জনধ্বনি, তা হল, "হাইল হিটলার"।

দু-দল দাঁড়াল মাঠের মাঝখানে। ইউক্রানিয়ান খেলোয়াড়রা তাদের জাতীয় জনধ্বনিই দিল। তাদের পরনে লাল পোশাক। তবু নাতসিরা কিছু বলল না। তারা ধরেই নিয়েছিল ডায়নামো টিম তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই পারবে না। ডায়নামো টিমের ছেলেরা অনেকদিন ভালো করে খেতে পায়নি, রুগ্ণ চেহারা, প্র্যাকটিসও নেই বহুদিন।

প্রথম অর্ধে খেলার ফলাফল হল ৩—২, জার্মানরা এক গোলে এগিয়ে। বিরতির পর ডায়নামো টিমের ছেলেরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে নিল। খেলা হচ্ছে খেলা! খেলতে নামলে জেতার চেষ্টা করতেই হবে, টিমের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতেই হবে, তার ফলে মৃত্যুদণ্ড হোক আর যাই হোক। রেফারি তাদের পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে ঢুকতেই দিচ্ছে না, সেখানে গেলেই অফ সাইড বলে দিচ্ছে। গোল করতে গেলে অনেক দূর থেকে শট মারতে হবে। তবু তারা জয়ের শপথ নিল।

খেলার শেষে ৫—৩ গোলে জয়ী হল ডায়নামো টিম। সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিয়ে যাওয়া হল কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে এবং তাদের এক এক করে হত্যা করা হল। গানচারেংকো প্রায় অলৌকিকভাবে সেই ক্যাম্প থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকেই জানা গেছে এই কাহিনি। সেই অসাধারণ সাহসী ফুটবল খেলোয়াড়দের নামে এখন রয়েছে একটি বিরাট স্মৃতিস্তম্ভ।

কিয়েভ শহরটিতে এরকম অনেক স্মৃতিস্তম্ভ, মিউজিয়াম, গির্জা ও পার্ক আছে। পুরো শহরটাই বেড়াবার জন্য, কাজকর্মের জন্য নয় মনে হয়। যদিও ইউক্রাইনের রাজধানী হিসেবে এটি একটি ব্যস্ত শহর নিশ্চয়ই, এখন জনসংখ্যা ১৬ লক্ষ।

সারগেই এই ইউক্রাইনেরই ছেলে। কিয়েভ শহরে নয়, ওর বাড়ি প্রায় দুশো মাইল দূরে। স্কুল শেষ করার পর সারগেই প্রথমে পড়তে এসেছিল কিয়েভ বিশ্ববিদ্যালয়ে। তারপর মত বদলে চলে যায় মস্কোতে। এখন সারগেই খুব মস্কোর ভক্ত। মস্কো আর লেনিনগ্রাড শহরের মধ্যে খানিকটা প্রতিযোগিতার ভাব আছে, যেমন মার্কিন দেশে আছে নিউ ইয়র্ক আর লস এঞ্জেলিসে। সারগেই-এর মতে মস্কো অনেক বেশি জীবন্ত।

সন্ধেবেলা সারগেই আমাকে খাওয়াল ইউক্রাইনের নিজস্ব কিছু খাবার। বর্স সুপ তো আগেই খেয়েছি, তা ছাড়া এখানকার সসেজেও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, আরও নানান রকম রান্না। সবচেয়ে অবাক হলুম এখানকার ভদ্‌কা দেখে। সিলকরা বোতলের মধ্যে ভাসছে দুটি আস্ত শুকনো লঙ্কা। গেলাসে ঢেলে খানিকটা পান করে দেখলুম জিনিসটা রীতিমতন ঝাল। এর আগে আমি কখনও ঝাল মদ আস্বাদ করিনি। আমার অবশ্য খেতে বেশ ভালোই লাগল।

কিয়েভে আমাদের প্রথম অ্যাপয়েন্টমেন্ট গত মহাযুদ্ধের দুই বীর সেনানীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার। পরদিন সকালে গেলুম এ পি এন অফিসে নির্দিষ্ট সময়ে। সে অফিসে পা দিয়ে প্রথমেই যে কারণে অবাক হতে হয় তা হল পরিচ্ছন্নতা। সমস্ত অফিসটা একেবারে ঝকঝক করছে, যেন গতকালই তৈরি হয়েছে। দেওয়ালে কাঠের প্যানেল, তার পালিশ একেবারে আয়নার মতন। এ দেশে অনেক জায়গাতেই খুব উচ্চাঙ্গের কাঠের কাজ দেখেছি।

একটু পরেই দুজন প্রাক্তন সেনানী এসে উপস্থিত হলেন, তাঁরা জাতীয় বীর হিসেবে স্বীকৃত। তাঁরা পরিধান করে আছেন পুরোদস্তুর সামরিক পোশাক, বুকের দু-দিকে অনেকগুলি পদক ও স্ট্রাইপ। দুজনেরই এখন যথেষ্ট বয়েস হয়েছে।

ওঁদের সামনে বসে আমি ভাবলুম, এবার নিশ্চয়ই মজা হবে। বৃদ্ধেরা সাধারণত একটু বেশি কথা বলতে ভালোবাসেন, এবং নিজের কথাও বেশি বলতে চান। দুই বৃদ্ধ একসঙ্গে বলতে শুরু করলে, নিশ্চয়ই একজন অন্যজনকে মাঝে-মাঝেই থামিয়ে দিয়ে বলবেন, আরে তুই চুপ কর! শোন না, তখন আমি কী করেছিলুম! অন্যজন বলবেন, আরে তুই তো ওখানে ছিলিই না, আমার স্পষ্ট মনে আছে...।

বাস্তবে কিন্তু সেরকম কিছুই হল না। এই দুই বীর সেনানীই অত্যন্ত বিনয়ী। এঁরা প্রথমেই বললেন, দেশরক্ষার জন্য প্রত্যেকেই প্রাণপণে যুদ্ধ করে, আমরা বেশি কিছু করিনি।

তবু বললুম, তবু আপনাদের অভিজ্ঞতার কথা বলুন।

এঁদের একজনের নাম আইভানোভস্কি অ্যান্ড্রিউ ইনি ছিলেন বিমান বাহিনীর মেজর জেনারেল। অন্যজন হলেন সুখভ কনস্টানটিন, ইনি ছিলেন স্থল বাহিনীতে।

১৯৪৩ সালের ৬ নভেম্বর নাতসি বাহিনী ভেদ করে সোভিয়েতে সৈনিকরা কিয়েভ নগরীতে ঢোকে। তারপর এখানকার পথে পথে লড়াই হয়। সেই বাহিনীতে ছিলেন জেনারেল সুখভ কনস্টানটিন, তাঁরা অসম সাহসের সঙ্গে নাতসি বাহিনীকে নিপার নদীর ওপারে ঠেলে নিয়ে যান। ম্যাপ দেখিয়ে এই শহরের তখনকার প্রতিরোধ ব্যবস্থা বোঝাতে এক জায়গায় থেমে গিয়ে তিনি বললেন, এবারে অ্যান্ড্রিউ তুমি বলো, তুমি তো এর পরের অংশ ভালো জানো।

মেজর জেনারেল অ্যান্ড্রিউ শোনাতে লাগলেন, সেই সময় বিমান বাহিনী কীভাবে স্থলযুদ্ধকে সাপোর্ট দিয়েছিল। তিনি নিজের কীর্তির কথা না বলে তার এক মৃত সহযোদ্ধার কথা বেশি বলতে লাগলেন, যিনি প্রাণ তুচ্ছ করে এতবার শত্রু এলাকায় ঢুকে পড়েছিলেন যে তাঁর সম্পর্কে নানান কাহিনি প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল।

কথায় কথায় জানা গেল যে, এই দুই বীর যোদ্ধাই লেখক। একজন কবিতা লেখেন, অন্যজন গল্প। ইউক্রাইনিয়ান ভাষায় কয়েকটি পত্রপত্রিকাও সঙ্গে নিয়ে এসেছেন, তাতে ওদের সম্পর্কে লেখা ছাপা হয়েছে। সেই লেখা থেকে কিছু কিছু অংশ পড়ে শোনালেন ওঁরা। আমাকে কয়েকটি বইপত্র দিলেন, পরে পড়ে দেখার জন্য। আমি যে ইউক্রাইনিয়ান ভাষা একবর্ণও বুঝি না, সে কথা ওঁরা শুনলেন না। ভালোবেসে ওইসব বইপত্র আমাকে দিলেন নিজেদের নাম সই করে।

ওঁদের দুজনের কোথাও লাঞ্চের নেমন্তন্ন আছে, এবারে ওঁদের উঠতে হবে। আমি বললুম, এত বড় যোদ্ধাদের আমি কখনও কাছাকাছি দেখিনি। আপনাদের গল্প শুনে আমি রোমাঞ্চিত বোধ করছিলুম।

ওঁরা বললেন, যুদ্ধ জিনিসটা মোটেই ভালো নয়। এসো, আমরা সবাই মিলে আশা করি, পৃথিবীতে আর কোনওদিন কোনও যুদ্ধ যেন না হয়।

ওঁরা দুজনে ইংরিজি একেবারেই জানেন না। কথাবার্তা বলছিল সারগেই-এর অনুবাদের মাধ্যমে। আমার পরিচয় শুনে ওঁরা শেষকালে বললেন, এবারে তোমার একটা কবিতা শোনাও। তোমার নিজের মাতৃভাষায় শোনাও। তুমি কী ভাষায় লেখো?

আমি বললুম, বাংলায়। কিন্তু সে ভাষা তো আপনারা বুঝতে পারবেন না কিছুই।

ওঁরা বললেন, তবু শোনাও। আমরা বাংলা ভাষা কখনও শুনিনি। কীরকম শুনতে লাগে দেখি!

ঠিক সেই মুহূর্তে আমার নিজের কোনও কবিতাই মনে পড়ল না। তা ছাড়া আমি ভাবলুম, এঁরা শুনতে চাইছেন বাংলা ভাষার শব্দঝংকার, সুতরাং সেরকম কোনও ঝংকারময় কবিতা বলাই ঠিক হবে। এরকম ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দুঃসময় কবিতাটি একেবারে আদর্শ।

সুতরাং আমি আবৃত্তি করলুম—যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে, সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি অন্ধ, বন্ধ না করো না পাখা...।

ওরা দুজনেই বেশ তারিফ করে বললেন, বাঃ, বেশ সুন্দর, এর মানে কী?

এবারে আমি প্রমাদ গুনলুম। অনুবাদ করার পক্ষে রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটি আবার খুবই শক্ত। যাই হোক, আক্ষরিক অনুবাদ না হলেই বা কী আসে যায়!

আমি বললুম, এটা একটা পাখি সম্পর্কে ... ফিনিক্স পাখি ... জানেন নিশ্চয়ই যে পাখি বারবার আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আবার পুনর্জীবন পায় ...।

আমাদের সামনে রয়েছে একটা টেপ রেকর্ডার। ভবিষ্যতে যদি কেউ আমাদের এই আলোচনা নিয়ে গবেষণা করতে চায়, তা হলে বাংলা কবিতার এই অংশটি নিয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাবে।

॥ ১৪ ॥

কিয়েভে এসে প্রথম ওভারকোট খুলে ফেলতে পারলুম।। ফুরফুরে বাতাসে বেশ উপভোগ্য ঠান্ডা, একটা পাতলা গরম জামা গায়ে দিলেই চলে যায়। মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এখানে প্রকৃতই বসন্ত। মে মাসের ৯ তারিখ এখানে জাতীয় বিজয় দিবসের ছুটি, সমস্ত অফিস-কাছারি বন্ধ, পথে পথে উৎসব-মনা নারী-পুরুষের ভিড়। রাস্তায় পা দিলেই মনটা ভালো হয়ে যায়। এমন "ফুল্ল-কুসুমিত দ্রুমদল শোভিনী" শহর আগে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। যে দিকে তাকাই সেদিকেই পার্ক চোখে পড়ে। রাস্তাগুলি চড়াই-উতরাই। দু'পাশের বাড়িগুলিও সুদৃশ্য এবং মিউজিয়ামের সংখ্যাও প্রায় অগুন্তি। কোনটা ছেড়ে যে কোনটাকে দেখি তা-ই ঠিক করতে পারি না।

আজ ছুটির দিন বলে আমাদের কোথাও কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই। ব্রেকফাস্ট খাওয়ার পর বেড়াতে-বেড়াতে গিয়ে আমরা কিছুক্ষণ বসে রইলুম একটা পার্কে। মস্ত বড়-বড় গাছ, নানারকমের ফুল, মাঝে মাঝে চমৎকার ভাস্কর্য। ছুটির দিন বলে অনেক লোক এসেছে, কিন্তু কোনও গোলমাল নেই, বেশ শান্ত নির্জন পরিবেশ।

আমি খুব একটা প্রকৃতিপ্রেমিক নই। উদ্যানের চেয়ে অরণ্য আমাকে বেশি টানে। শোভার চেয়ে রহস্যময়তা। তবে "দা সিক্রেট লাইফ অফ প্ল্যান্টস" নামে একটি বই পড়ার পর সব গাছপালাকেই শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছি। যে-কোনও বড় বৃক্ষের সামনে দাঁড়ালেই মনে হয় সেই মহাদ্রুম আমার আপাদমস্তক লক্ষ করছেন।

পার্কটি একটি উঁচু টিলার ওপর। যেখানটা সবচেয়ে উঁচু, সেখান থেকে দেখা যায় বিস্তীর্ণ উপত্যকা, তার মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে নিপার নদী। বিশ্ববিখ্যাত নদীগুলির মধ্যে এই নদী একটি।

অন্যান্য শহরের নদী দেখিয়ে সারগেই আমাকে জিগ্যেস করেছে, এই নদী কি আপনাদের গঙ্গার চেয়ে বড়?

প্রত্যেকবারই আমি বলেছি, না হে, সারগেই ভায়া, নদী দেখিয়ে আমাকে চমকানো খুব শক্ত। আমি নদী নালার দেশেরই মানুষ। তুমি তো পদ্মা কিংবা ব্রহ্মপুত্র দ্যাখোনি!

নিপার নদী দেখে আমার মুগ্ধতা স্বীকার করতেই হল। শুধু বিশাল নয়, এই নদীর একটা আলাদা সৌন্দর্য আছে।

সারগেই বলল, চলুন, আমরা নিপার নদীতে বেড়াতে যাই।

অতি উত্তম প্রস্তাব। একটা বাস ধরে আমরা চলে এলুম স্টিমার ঘাটায়। এখানে অনেকগুলি সুদৃশ্য স্টিমার বা বড় মোটরবোট রয়েছে, প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর ছাড়ে। বহু লোক এসেছে আজ এখানে ছুটি কাটাতে। লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কেটে আমরা একটি বোটে চড়ে বসলুম।

বোটটি বেশ চওড়া, ভেতরে বসবার বন্দোবস্তও বেশ ভালো। কিন্তু ভেতরের পরিবেশটি তেমন জমজমাট নয়, চালকের কেমন যেন একটা দায়সারা ভাব। আমস্টারডাম, প্যারিসে আমি এরকম জলযানে নদী ভ্রমণ করেছি, সেখানে গাইডরা নানারকম ঠাট্টা-রসিকতা করতে করতে দু-পারের দৃশ্য দেখায়, সেইসঙ্গে ইতিহাস শুনিয়ে দেয়। যাত্রীরাও অনেক কৌতুক করে, সময়টা যে কোথা থেকে কেটে যায় তা বোঝাই যায় না। এখানেও সেই রকম কিছু আশা করেছিলুম। নদী পরিভ্রমণের ব্যবস্থা যখন আছেই, তখন আয়োজনটি সর্বাঙ্গসুন্দর করা উচিত।

বোটটি ছাড়ামাত্র তীব্র বেগে চলতে লাগল। এত দ্রুত গতি ঠিক যেন ছুটির দিনের মেজাজের

সঙ্গে খাপ খায় না, বাইরের দৃশ্যও ভালো করে দেখা যায় না।

কিয়েভ শহরটি সারগেই-এর আগে থেকেই চেনা, সে আমাকে ধারাভাষ্য দিয়ে যেতে লাগল। নদীর ডানপাশটি বেশি সবুজ ও বেশ উঁচু, সেখানে দেখতে পেলুম একটি টিলার ওপর সুবিশাল একটি মূর্তি। কিন্তু বোটের প্রকাণ্ড গতির জন্য সেটিকে প্রাণভরে দেখা গেল না, ছবি তোলারও সুবিধে হল না।

নদীর অন্যদিকে চোখে পড়ে একটি সদ্য গড়ে ওঠা উপনগরী। অসংখ্য ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরি হচ্ছে সেখানে।

নিপার নদীর সঙ্গে পদ্মার খানিকটা মিল আছে। কোথাও কোথাও এই নদী খুব চওড়া হয়ে গেছে এবং মাঝখানে চড়া পড়েছে। ঝোপঝাড় ও গাছপালাও গজিয়ে গেছে সেইসব চড়ায়। ছোট ছোট নৌকো নিয়ে অনেকে সেই চড়ায় এসেছে পিকনিক করতে। সেই দৃশ্য দেখে লোভ হয়, ওরকম কোনও জায়গায় নেমে পড়ি, কোনও একটা পিকনিক পার্টির সঙ্গে যোগ দিই।

আমি সারগেইকে জিগ্যেস করলুম, এখানকার লোক কি নিজস্ব নৌকো রাখতে পারে? এরকম ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখার নিয়ম আছে?

সারগেই বলল, কেন নৌকো রাখতে পারবে না? ব্যক্তিগত সম্পত্তি মানে কী? আমার জামাটা একটা ব্যক্তিগত সম্পত্তি। আমার উপার্জন দিয়ে আমি একটা গাড়ি বা নৌকো কিনতে পারি, সেটা আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। আমার বাড়ির সামনে যদি খানিকটা জমি থাকে, সেখানে আমি আলু পেঁয়াজের চাষ করে তা বাজারে বিক্রি করতে পারি। আমি যদি নিজে কোনও মেশিন বানাই, তাহলে বাড়িতে সেই মেশিন বসিয়ে কিছু উৎপন্ন করার অধিকারও আমার আছে। কিন্তু আমি আর তিন-চারজন লোককে খাটাতে পারি না। কারণ, অপরের শ্রম থেকে লাভ করার অধিকার কারুর নেই। যে-পরিবারে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ভালো চাকরি করে, তারা টাকা জমিয়ে অনায়াসেই একটা গাড়ি বা নৌকো কিনতে পারে।

নদীর চড়ায় এরকম শত শত পিকনিকের দল দেখতে পেলুম। কেউ কারুর কাছাকাছি নয়, সবাই আলাদা আলাদা জায়গা খুঁজে নিয়েছে।

ভালো করে দেখবার জন্য আমি দু-একবার ওপরের ডেকে এসে দাঁড়াবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু এমন হুহু হাওয়া যে সেখানে এক মিনিট তিষ্ঠোবার উপায় নেই, মনে হয় যেন হাতের আঙুলগুলো জমে যাচ্ছে, ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে নাকের ডগাটা।

এক ঘণ্টার মধ্যে আমাদের মোটরবোট অনেকখানি এলাকা চক্কর দিয়ে ফিরে এল ঘাটে। এইরকম ভ্রমণও অনেকের কাছে ভালো লাগতে পারে, কিন্তু এমনভাবে নদী দেখা আমার মনঃপূত নয়। ইচ্ছে রইল, আবার কোনও একদিন নিপার নদীর কাছে ফিরে এসে একটা পালতোলা নৌকোয় বেড়াব।

আজ এখানে জাতীয় ছুটির দিন বলে অনেক দোকানপাটই বন্ধ। আমাদের হোটেলের বেশ কিছু কর্মচারীও ছুটি নিয়েছে। ঠিক সময়ে না গেলে খাবারদাবার পাওয়া যাবে না। দুপুরবেলা একটু দেরি করে এসে আমরা আহার্য পছন্দ করার কোনও সুযোগ পাইনি। তাই সন্ধে হতে না হতেই আমরা গিয়ে বসলুম ডাইনিং হলে।

হোটেলে এখন প্রচুর বিদেশি ভ্রমণকারীর ভিড়। সোভিয়েত সরকারের 'ইন টুরিস্ট' নামে দপ্তর এখন বাইরে থেকে বহু টুরিস্টদের আসবার জন্য নানারকম সুযোগসুবিধে দিচ্ছে এবং টুরিস্টদের সবদিক ঘুরিয়ে দেখাবারও ব্যবস্থা করেছে। টুরিস্টদের মধ্যে আমেরিকানই বেশি।

আমাদের পাশের টেবিলে একজন প্রৌঢ় বিদেশি একা একা বসে খাচ্ছিলেন, এক সময় আমার চোখের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, ইংরেজি বলতে পারো?

আমি হেসে ঘাড় নেড়ে বললুম, একটু একটু।

প্রৌঢ় বিদেশিটি বললেন, তোমাদের টেবিলে যোগ দিতে পারি?

অজানা কোনও শহরে গিয়ে হোটেলে বসে-বসে একা একা খাবার খাওয়া যে কী বিড়ম্বনার ব্যাপার সে অভিজ্ঞতা আমার আছে। আমি সাগ্রহে তাঁকে আমাদের টেবিলে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালুম।

ইনি কানাডিয়ান, এসেছিলেন তীর্থ দর্শনে। শ'খানেক বছর আগে এঁর পূর্বপুরুষ এই ইউক্রাইন থেকেই পাড়ি দিয়েছিলেন কানাডায়। ইনি এসেছেন তাঁর প্রাক্তন মাতৃভূমি (অথবা পিতৃভূমি) পুনর্দর্শনে।

আমি কানাডায় গিয়ে শুনেছিলুম যে এডমান্টন ও ক্যালঘেরি শহরের মাঝামাঝি কোথাও ইউক্রাইনিয়াদের বিরাট বসতি আছে। সেইজন্য আন্দাজে ঢিল মেরে জিগ্যেস করলুম, আপনি কি এডমান্টনের কাছাকাছি কোথাও থাকেন?

ভদ্রলোক প্রায় লাফিয়ে উঠে বললেন, তুমি এডমান্টন চেনো? গিয়েছ সেখানে? কবে গিয়েছিলে?

বেশ গল্প জমে গেল। এই ভদ্রলোক কানাডার কিছু ভারতীয়কে চেনেন, তাঁদের নাম বললেন, আমি অবশ্য তাঁদের একজনকেও চিনি না।

সারগেই যে-কোনও কারণেই হোক, এই লোকটিকে বেশি পাত্তা দিল না। আমি পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পরেও সে চুপ করে রইল। এই লোকটি দু-তিনটি ইউক্রাইনিয়ান গান শোনাবার চেষ্টা করে সারগেইকে জিগ্যেস করলেন, তুমি এই গানগুলি জানো?

প্রায় একশো বছরের পুরোনো অপ্রচলিত গান, সারগেই জানবে কী করে? ইনি ইউক্রাইনিয়ান ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করলে সারগেই উত্তর দিল ইংরিজিতে, সম্ভবত ওই ভাষাও তার বোধগম্য নয়।

রাত্তিরের দিকে আবার শহরটা খানিকটা ঘুরে এসে সারগেই আর আমি গেলুম যে-যার ঘরের দিকে। রাত্তির মোটে দশটা, এরই মধ্যে হোটেলটি প্রায় নিঃশব্দ! অনেক আলো নিবে গেছে।

হোটেলের প্রত্যেক ফ্লোরে একজন মহিলা থাকেন, যাঁর কাছে চাবি জমা থাকে। বেশির ভাগ হোটেলেই দেখেছি বৃদ্ধারাই এই কাজ করেন। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর সকলেই সরকারের কাছ থেকে বার্ধক্যভাতা পায়। অতিরিক্ত রোজগারের জন্য বুড়োবুড়িরা আবার পার্টটাইম চাকরিও নিতে পারেন। ঘর ঝাঁট দেওয়া, রাস্তা পরিষ্কার করা, হোটেলে রাত্তিরের ডিউটি, এইসব কাজেই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের দেখতে পাওয়া যায় বেশি। এক-এক সময় একটু নিষ্ঠুর লাগে, শারীরিক পরিশ্রমের কাজেও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের লাগানো হয় দেখে। শুধু সোভিয়েত দেশেই নয়, অন্যান্য অনেক পাশ্চাত্য দেশেই এই অবস্থা। উপায়ই বা কী? সকলেই যদি শিক্ষার সুযোগ পায়, মোটামুটি শিক্ষা লাভের পর সকলেই যদি চাকরি পেতে পারে, তাহলে বাথরুম পরিষ্কার, হোটেলে বাসন মাজার কাজের লোক পাওয়া যাবে কী করে? একজন অফিস কর্মচারী আর একজন নর্মদা পরিষ্কারকের মাইনে সমান হলেও সবাই চাইবে অফিসের কাজটাই নিতে। জোর করে কারুর ওপর কোনও কাজ চাপিয়ে দেওয়া যায় না। সোভিয়েত দেশের নতুন সংবিধানেও প্রত্যেক নাগরিকেরই চাকরি নির্বাচনের অধিকার আছে। একমাত্র বুড়োবুড়িদের জন্যই ভালো চাকরির সুযোগ বেশি নেই।

আজ হোটেলের অনেকেই ছুটি নিয়েছে, কিন্তু আমার ফ্লোরের এই বৃদ্ধা রাত জেগে বসে একটা বই পড়ছেন।

ইংরেজি বলে কোনও লাভ নেই, তাই আমি হাত বাড়িয়ে চাবিটা নিয়ে পরিষ্কার বাংলায় বললুম, কেমন আছেন, দিদিমা? তোমার কোনও কষ্ট হচ্ছে না তো? বাড়িতে তোমার জন্য কেউ প্রতীক্ষা করে নেই তো?

দিদিমাও হেসে ফেলে তাঁর ভাষায় কী যেন সব বলে গেলেন, তার মধ্যে একটা শব্দ যেন 'শুভমস্তু'র মতন শোনাল। যেন উনি আমাকে আশীর্বাদ করছেন।

॥ ১৫ ॥

আজ সকাল থেকেই সারগেই-এর চোখমুখে একটা চাপা উত্তেজনা লক্ষ করছি। আজ যাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা করতে যাওয়ার কথা, তাঁর কাছে যাওয়ার আগ্রহ সারগেই-এরই যেন খুব বেশি। ওলেস হনচার ইউক্রাইন তথা সোভিয়েত রাশিয়ার একজন প্রথম সারির লেখক, তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিও পেয়েছেন।

সারগেই বলল, এই ওলেস হনচারের লেখা পড়ে কলেজ জীবনে আমরা মুগ্ধ হয়েছি, কত রাত জেগে পড়েছি তাঁর বই, মনে মনে তাঁকে পুজো করেছি, দূর থেকে তাঁকে দু-একবার দেখলেও কাছে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য কোনওদিন হবে এমন কল্পনাও করিনি। আজ সেই বিখ্যাত লেখকের সামনাসামনি গিয়ে বসব, একথা ভাবতেই আমার এমন হচ্ছে...। সুনীলজি, আপনি আমার মনের অবস্থাটা বুঝতে পারছেন!

আমি হাসিমুখে বললুম, হ্যাঁ।

স্কুল-কলেজে পড়ার সময় আমি ছিলুম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দারুণ ভক্ত। পাড়ার লাইব্রেরি থেকে তাঁর সমস্ত বই পড়ে শেষ করেছিলুম। খুব ইচ্ছে করত, তাঁকে একবার চোখে দেখব। কলেজ জীবনে এসে কফি হাউসে আড্ডা মারতে গিয়ে জানতে পারলুম, কাছেই "পরিচয়" পত্রিকার অফিস, সেখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মাঝে-মাঝে আসেন। পর পর কয়েকদিন "পরিচয়" পত্রিকার অফিস বাড়ির সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলুম, কিন্তু দেখা মিলল না। ভরসা করে একদিন ঢুকেই পড়লুম "পরিচয়" অফিসে। সেদিন সেখানে সত্যিই মানিকবাবু উপস্থিত ছিলেন। আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ভাবছিলুম, এই কালোমতন গম্ভীর চেহারার মানুষটির হাত দিয়েই এইরকম সব জটিল লেখা বেরিয়েছে? আমার বন্ধু দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় মানিকবাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল, কিন্তু আমি একটি কথাও বলতে পারিনি তাঁকে। মানিকবাবু বোধহয় ভেবেছিলেন, আমি বোবা!

ওলেস হনচার কিয়েভের শান্তি কমিটির সভাপতি, তাঁর সঙ্গে দেখা হবে সেই অফিসেই।

ওলেস হনচার-এর জন্ম ইউক্রাইন-এর একটি গ্রামে, ১৯১৮ সালে। শৈলবে মাতৃহীন, তিনি দিদিমার কাছে মানুষ। ছাত্রজীবনে লেখালেখি শুরু। কিছুদিন সাংবাদিকতা করার পর অধ্যাপনা শুরু করলেন। কয়েকটি গল্প, একটি উপন্যাস প্রকাশিত হল। কিন্তু সেগুলি এমন কিছু না। তারপর একটি বিরাট ঘটনা ঘটল। সেই ঘটনার নাম যুদ্ধ। হনচার-এর নিজের ভাষায়, "দা ওয়ার ওভারটুক মি ইন দা লাইব্রেরি।" অতিশয় পড়ুয়া মানুষটিকে যেতে হল যুদ্ধে। যুদ্ধ থেকে ফেরার পর তিনি যেন অন্য মানুষ হয়ে গেলেন, তাঁর প্রত্যেকটি লেখাই মর্মস্পর্শী। তাঁর "দা স্টান্ডার্ড বেয়ারার্স" নামে ট্রিলজি অত্যন্ত বিখ্যাত হয়েছে। তারপর দীর্ঘকাল ধরে তিনি সমান জনপ্রিয় হয়ে আছেন। সোভিয়েত দেশের সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার—লেনিন পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।

এ পি এন-এর একজন প্রতিনিধি এসে আমাদের নিয়ে গেলেন নির্দিষ্ট সময়ে। শান্তি কমিটির সভাকক্ষটি বেশ প্রশস্ত, ধপধপে সাদা দেওয়াল, একটি গোল টেবিল ও অনেকগুলি চেয়ার। ওলেস হনচার আগেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন, হাসিমুখে অত্যন্ত সৌজন্যের সঙ্গে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। প্রথম দর্শনেই তাঁকে আমার ভালো লেগে গেল। এক একজন মানুষের মুখের মধ্যে ভারী সুন্দর প্রসন্নতা থাকে, তাঁদের সামনে দাঁড়ালে কোনও আড়ষ্টতা বোধহয় না।

আমি একজন ভারতীয় এই কথাই তাঁকে জানানো হয়েছিল, আমি যে একজন বাঙালি তা তিনি

জানতেন না। সারগেই-এর মুখে আমার পরিচয় জেনে তিনি বললেন, কী আশ্চর্য। তোমাকে উপহার দেওয়ার জন্য আমি যে বইটি নিয়ে এসেছি, তার দ্বিতীয় পৃষ্ঠাতেই বেঙ্গল-এর কথা আছে।

আমি জিগ্যেস করলুম, ইউক্রাইনের মানুষ কি বাংলার কথা কিছু জানে?

ওলেস হনচার বললেন, তেমন কিছু জানে না, তবে একটা রোমান্টিক ধারণা আছে। বাংলা হল সেই সুদুর দেশ যেখানে আমাদের হাঁসেরা শীত কাটাতে যায়। সেই বাংলা হল কবিদের দেশ, চিরবসন্তের দেশ।

বলতে-বলতে তিনি ভুরু নাচিয়ে হাসলেন, আমিও হাসলুম। অর্থাৎ প্রকৃত সত্য তিনি জানেন, আর বুঝিয়ে বলার দরকার নেই।

এরপর নানা বিষয়ে আড্ডা হতে লাগল। সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর কোনও গোঁড়ামি নেই, তাঁর মন সংস্কারমুক্ত। কথায়-কথায় তিনি বললেন, কোনও লেখকেরই উচিত নয় নিজেকে বা অন্য লেখকদের ধারণার পুনরাবৃত্তি করা, তাতে শিল্পের তৃপ্তি পাওয়া যায় না। সময়ের ধারাবাহিকতা ও ঐতিহাসিক পটভূমিকায় সবসময় মানুষকে দেখা উচিত। শিল্পী তাঁর বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে চান, অথচ শিল্পের স্বভাবই হল অনবরত পরিবর্তন। সাহিত্যে এই দুই বিপরীত শক্তি মিলেমিশে থাকে।

অনেক মার্কসবাদী তাত্ত্বিক সাহিত্য সম্পর্কে যেসব রস-কষহীন ফতোয়া জারি করেন তার চেয়ে এই ধরনের একজন সৃষ্টিশীল সাহিত্যিকের সঙ্গে কথা বললে প্রগতি-সাহিত্য সম্পর্কে অনেক বেশি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়।

আমি জিগ্যেস করলুম, আপনি যে উপন্যাসগুলি লেখেন, তার বিষয়বস্তু কি আগেই ভেবেচিন্তে ঠিক করেন, না হঠাৎ মাথায় আসে?

তিনি বললেন, মনের প্রক্রিয়া বড় জটিল। কী করে যে কোন বিষয়টা মনে ধাক্কা দেবে, তা বলা যায় না। যুদ্ধের সময় আমি নোট রাখতুম, মৃত বা জীবিত কমরেডদের কথা অন্যাদের জানানো আমার কর্তব্য বলে মনে করতুম। তারপর আরও অনেক বিষয় নিয়ে লিখেছি।

কথায়-কথায় ওলেস হনচার জানালেন যে তিনি আমেরিকা ভ্রমণ করে এসেছেন, সেখানকার চওড়া-চওড়া বহুদূর পর্যন্ত একটানা সোজা রাস্তাগুলি দেখে এক-এক সময় তাঁর কল্পনাশক্তি বিস্তৃত হয়েছে।

আমি আবার জিগ্যেস করলুম, আপনি একজন সৃষ্টিশীল লেখক, এবং আপনি এখানকার শান্তি কমিটির সভাপতি। লেখা ছাড়া অন্যান্য কাজে মন দিতে বা সময় দিতে আপনার অসুবিধে হয় না?

তিনি একটু হেসে বললেন, এখানকার কাজ খুব বেশি নয়। সব শিল্পীদের কিছুটা সামাজিক ভূমিকা নিতে হয়। না, আমার সময়ের অভাব হয় না। বিশ্বশান্তি সম্পর্কে তোমার কী অভিমত?

আমি বললুম, আমরা তৃতীয় বিশ্বের নাগরিক, আমাদের মতামতের কী মূল্য আছে? আমরা তো কামানের খাদ্য!

তিনি বললেন, সব মানুষেরই মতামতের মূল্য আছে। প্রতিবাদ জানানো একটা নৈতিক অধিকার। যুদ্ধ যে কত ভয়াবহ, কী সাংঘাতিক অপচয়, তা আমরা মর্মে-মর্মে বুঝেছি। তাই আমরা সত্যিই চাই না, পৃথিবীতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হোক।

আমি বললুম, সে কথা আমি বিশ্বাস করি। অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করার জন্য আপনাদের দেশ বেশি উদ্যোগী, আপনাদের প্রয়াস আন্তরিক।

এরপর কফি ও কেক-পেস্ট্রি এসে গেল।

ওলেস হনচার ইংরেজি জানেন না। কিংবা জানলেও বলেন না। কথাবার্তা হচ্ছিল সারগেই-এর অনুবাদের মাধ্যমে। আমাদের আলোচনা যখন শেষ তখন সারগেই জানাল যে সে ওয়েলস হনচারের

কত ভক্ত, তাঁর কত বই পড়েছে। ছাত্র বয়েস থেকে তাঁকে কাছাকাছি দেখবার জন্য কত উদ্‌গ্রীব।

বিখ্যাত লেখকটি তখন তাঁর ওই তরুণ ভক্তটির সঙ্গে ওঁদের নিজস্ব ভাষায় নানারকম কৌতুক করতে লাগলেন, যা আমি কিছুই বুঝলুম না।

ওলেস হনচার আমাকে তাঁর যে বইটি উপহার দিলেন, সেটির নাম "দা সোর অফ লাভ।" ইংরেজি অনুবাদটি বেরিয়েছে মস্কো থেকে। উপন্যাসটি পড়ে আমি বুঝতে পারলুম, ওলেস হনচারের বর্ণনাভঙ্গি বেশ কাব্যময় এবং একটা রোমান্টিক সুর আছে।

সেই বইতে বাংলাদেশ সম্পর্কে প্রসঙ্গটি আমি এখানে তুলে দিচ্ছি।

কৃষ্ণসাগরের তীরে একটি ছোট শহর। সেখানে একটি নার্সদের ট্রেনিং কলেজ। সেখানকার একজন শিক্ষিকা রেড ক্রসের কাজ নিয়ে দূর বিদেশে গিয়েছিলেন। তরুণী নার্সরা তাদের ওই প্রিয় শিক্ষিকার কাছে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা শুনতে চাইছে। তারা বলছে, "আমাদের বলুন সেই সোনার বাংলার কথা, যেখানে আমাদের হাঁসেরা শীত কাটাতে যায়!

"সে তো কবিদের দেশ, চিরকালীন প্রেমের দেশ, চিরবসন্তের দেশ, সেখানকার মানুষরা কৃষ্ণ-চক্ষু, তাদের হাসিতে আছে জাদু, সেখানকার মেয়েদের বাহু রাজহংসীর গলার মতন, সেইসব হাতের ভঙ্গিমা দেখে সাপেরাও মোহিত হয়ে যায় ... সেখানে নৃত্যরতা নারীরা, অপূর্ব ছন্দ, যেন জিপসি..."

কিন্তু শিক্ষিকাটি কোনও কথাই বললেন না। তাঁর চোখ বেদনার্ত। ছাত্রীরা যা বলছে, তাঁর অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁর মনে পড়ছে শত শত ক্ষুধার্ত শিশুর হাত, রক্তশূন্য চেহারার মায়েরা, করুণ চোখে তারা ভিক্ষে চাইছে, চাইছে বেঁচে থাকার জন্য সাহায্য ... রেড ক্রসের কর্মীরা সারা দিনরাত পরিশ্রম করলেনও ভিড়ের শেষ নেই ... তিনি সবসময় এত পরিশ্রান্ত থাকতেন যে বাংলার অন্য সৌন্দর্য দেখার অবকাশই পাননি ...

এর পরে আমরা গেলুম একটা পত্রিকা দফতরে।

ইউক্রাইনের জনসংখ্যা পাঁচ কোটি। আমাদের পশ্চিমবাংলার জনসংখ্যার সমান। ইউক্রাইনিয়ানদের সাহিত্য-প্রীতি খুব বেশি। বাঙালিরাও সাহিত্য-প্রীতির জন্য বিখ্যাত। তবে তফাত হচ্ছে এই যে, ইউক্রাইনে শতকরা সবাই প্রায় শিক্ষিত এবং এখানকার অধিবাসীরা খুবই সচ্ছল। আর পশ্চিমবাংলায় শিক্ষিতের হার শতকরা পঁয়ত্রিশজন আর শতকরা পঞ্চাশজন সারা বছর দুবেলা পেটভরে খেতে পায় না।

ইউক্রাইনের সাহিত্য বাঙালিদের কাচে খুব বেশি পরিচিত নয়। তবে ইউক্রাইনের বিখ্যাত লেখক শেভচেংকোর জীবন নিয়ে একটি নাটক বাংলায় রচনা করেছেন মন্মথ রায়, কলকাতায় সেটি অভিনীতও হয়েছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি যখন কিয়েভ শহরে গিয়েছিলেন, সেখানে এক জনসভায় তিনি মন্মথ রায়ের ওই নাটকটির কথা উল্লেখ করেছিলেন, দুই দেশের সাংস্কৃতিক বন্ধনের উদাহরণ হিসেবে।

নাট্যকার মন্মথ রায় এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির ওই সুকীর্তিটির জন্য বাঙালি হিসেবে আমি বেশ খাতির পেতে লাগলুম।

পত্রিকাটির নাম "সেস্‌ভিট"। অনুবাদের ওপরে এঁরা খুব জোর দেন। পত্রিকাটির সহযোগী সম্পাদক ডঃ ওলেগ মিকিটেংকো জানালেন যে তাঁরা বাংলা সাহিত্য থেকে বেশ কিছু অনুবাদ প্রকাশ করেছেন—রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুভায মুখোপাধ্যায় এরকম অনেকের, আরও অনুবাদ প্রকাশ করতে আগ্রহী, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে বাংলা বই সংগ্রহ করা।

"সেস্‌ভিট" পত্রিকাটির ইউক্রাইনিয়ান ভাষায় প্রচারসংখ্যা আড়াই লক্ষ। সোভিয়েত ইউনিয়ানে এসে কিছুদিন ঘোরাঘুরি করলেই বোঝা যায় যে সমৃদ্ধ রুশ ভাষা প্রত্যেকটি সোভিয়েত রাজ্যের মধ্যে যোগাযোগের ভাষা হলেও প্রতিটি রাজ্যের নিজস্ব ভাষার উন্নতির জন্যও প্রচুর জোর দেওয়া

হয়। অর্থাৎ রুশ ভাষা দিয়ে অন্য ভাষাগুলিকে গ্রাস করবার কোনও চেষ্টা নেই। আঞ্চলিক সাহিত্য ও সংস্কৃতিগুলি যদি সমানভাবে গুরুত্ব পায় তা হলে একটা বড় দেশের মধ্যে অসন্তোষ বা বিভেদকামী শক্তি দানা বাঁধে না।

কিয়েভে আমাদের সফরসূচী প্রায় শেষ। মাত্র বারো দিন আগে আমি সোভিয়েত ভূমিতে পা দিয়েছি কিন্তু এর মধ্যে এত বেশি স্থান বদল ও বিভিন্নরকম মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়েছে যে মনে হয় যেন কতদিন কেটে গেছে। সেই তুলনায় কিয়েভ শহরে অবশ্য তত বেশি ঠাসা প্রোগ্রাম ছিল না, ছুটির মেজাজে ইচ্ছেমতন ঘুরে বেড়াবার অনেক সুযোগ পাওয়া গেছে, এই রমণীয় শহরটি ভালোভাবে উপভোগ করা গেছে।

আগামীকাল ফিরে যেতে হবে মস্কোতে।

॥ ১৬ ॥

কিয়েভ শহরে আধুনিক বাড়িগুলির ফাঁকে-ফাঁকেই চোখে পড়ে এক-একটি গির্জা। এ শহরে যে কত গির্জা, আর মনাস্টারি, তার যেন ইয়ত্তা নেই। অনেকগুলিই বেশ প্রাচীন।

এখানকার সব গির্জাই সযত্নে সংরক্ষিত। বড়-বড় গির্জাগুলিতে কনসার্ট হল বা সংগ্রহশালা তৈরি করা হয়েছে। ধর্মীয় কারণে গির্জার ব্যবহার অবশ্য এখন সব দেশেই কমে গেছে, সাম্যবাদী আদর্শে তো ধর্মের কোনও স্থানই নেই। সোভিয়েত ইউনিয়ানে যদিও ধর্মচর্চার স্বাধীনতা আছে। ইউ এস এস আর-এর সংবিধান অনুযায়ী যে-কোনও নাগরিকই নিজ রুচি অনুযায়ী ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে পারে অথবা নাস্তিকতা প্রচারও করতে পারে।

অন্য কোনও শহরে আমি গির্জায় জনসমাগম লক্ষ করিনি। কিন্তু রবিবার সকালে কিয়েভের রাস্তায় ঘুরতে-ঘুরতে ট্রিনিটি গেটওয়ে চার্চের সামনে বেশ ভিড় দেখতে পেলুম। ভ্রমণকারীদের কাছেও পুরোনো গির্জাগুলি অবশ্য দ্রষ্টব্যস্থান। কিন্তু এত লোকজন সবাইকেই ভ্রমণকারী মনে হল না। ভেতরে ঢুকে দেখলুম প্রচুর মোমবাতি জ্বালানো হয়েছে এবং রীতিমতন সারমন দিচ্ছেন একজন বয়স্ক পাদরি। ভক্তিভরে বসে শুনছেন বেশ কিছু নারী-পুরুষ। সামনের দরজার বাইরে কয়েকজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বসে আছেন, তাঁদের সামনে বিছানো কাপড়ের টুকরোর ওপরে খুচরো পয়সা। হয়তো আমাদের দেশের মতনই তীর্থস্থানে ভিক্ষা যাচ্ঞা করা এখানেও কোনও ধর্মীয় আচারের অঙ্গ। এলাহাবাদের কুম্ভমেলায় আমি এক বিখ্যাত অধ্যাপককে ভিক্ষে করতে দেখেছিলুম।

সারগেই-কে আমি জিগ্যেস করলুম, তোমাদের ইউক্রাইনে তো এখনও অনেকে ধর্মকর্ম মানে দেখছি।

সারগেই বলল, পুরোনোরা এখনও কেউ-কেউ মানে। অল্প-বয়েসিরা এ নিয়ে মাথা ঘামায় না।

দরজার কাছে যেসব বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের দেখেছি তাঁদের বয়েস অক্টোবর বিপ্লবের চেয়ে নিশ্চিত অনেক বেশি।

ভারতবর্ষ তো ধর্মের ডিপো। সেইজন্য বিদেশিরা যে-কোনও ভারতীয়কেই মনে করে খুব ধর্মপরায়ণ। এখানে আমাকে দু-তিনজন জিগ্যেস করেছে, আমি হিন্দু না মুসলমান।

এর উত্তরে আমাকে বলতে হয় যে আমার জন্ম একটি হিন্দু পরিবারে, কিন্তু কোনও ধর্মমতেই আমার বিশ্বাস নেই।

এ কথা শুনে কেউ-কেউ যেন সামান্য একটু অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়েছে আমার দিকে। তখন আমাকে আবার বলতে হয়েছে যে ভারতবর্ষে নাস্তিকতার ট্র্যাডিশানও অনেক দিনের। স্বয়ং গৌতম বুদ্ধই তো একটা নাস্তিকতার ধর্ম প্রচার করে গেছে। সে যাই হোক, আমি হিন্দু বা মুসলমান

তা জানতে চাইছেন কেন। তাতে কী আসে যায়? আপনাদের তো ধর্ম সম্পর্কে আগ্রহ থাকার কথা নয়!

একজন অধ্যাপক বলেছিলেন, হিন্দু ধর্মের দর্শনটি তাঁর ভালো লাগে।

পাছে ওই দর্শন বিষয়ে আলোচনা চালাতে হয় তাই আমি তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করেছি।

আমি ধর্ম মানি বা না-ই মানি, পুরোনো গির্জাগুলির দূরাগত ঘণ্টাধ্বনি বড় সুমধুর লাগে। অধিকাংশ গির্জাই যুগ যুগ ধরে প্রচুর হিংস্রতার কেন্দ্রস্থল, অথচ ভেতরের শিল্পকর্ম অপূর্ব।

কিয়েভ ছেড়ে আমরা সারারাত ট্রেন জার্নি করে ফিরে এলুম মস্কোতে। উঠলুম আবার সেই হোটেল ইউক্রাইনিয়াতে। এবারে আমার ঘরটি তেইশ তলায়। সারগেই আমাকে ঠিক দেড় ঘণ্টা সময় দিল, এর মধ্যে সে একবার বাড়ি ঘুরে আসবে। তারপর আজ অনেক কাজ, অনেক ঘোরাঘুরি।

এক কাপ চা খেয়ে বাথরুমে গিয়ে দেখলুম কলে জল নেই। খবর নিয়ে জানা গেল যে, কিছু একটা যান্ত্রিক গোলোযোগে সারা হোটেলেই জল বন্ধ, মেরামতি কাজ চলছে, যাক, তাহলে আজ আর স্নানটানের ঝামেলায় যেতে হবে না। পুরোদস্তুর পোশাক পরেই শুয়ে পড়লুম বিছানায়। সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল টেলিফোন।

বিদেশ বিভুঁইয়ে টেলিফোনে পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনলেই ভালো লাগে। আমি ফিরেছি কিনা সেই খোঁজ নেওয়ার জন্য টেলিফোন করছে সুবোধ যায়। এখানকার বাঙালিদের সে খবর দিয়ে রেখেছে, আজ সন্ধেবেলা একটা আড্ডার আসর বসানো হবে।

সুবোধ বলল, অনেক তো ঘোরাঘুরি করে এলেন, আজকের দিনটা ছুটি নিন, আজ সারাদিন আমাদের সঙ্গে কাটান।

আমি বললুম, আজ তো অনেকগুলো অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে শুনেছি। এঁদের অতিথি হয়ে এসেছি, এঁদের প্রোগ্রাম তো ঠিক রাখতেই হবে। আবার তোমাদের সঙ্গেও আড্ডা দিতে ইচ্ছে করছে খুব। তুমি সারগেই-এর সঙ্গে কথা বলে যা হয় একটা ব্যবস্থা করো।

সারগেই ফিরে আসবার পর আমি ওকে সুবোধ রায়ের বার্তা জানালুম। সারগেই বিশেষ পাত্তা দিল না। বলল, বাঙালিদের সঙ্গে আপনি কলকাতায় ফিরে আড্ডা দেবেন, এখানে অনেক কাজ আছে।

এক প্রস্থ ভারী ব্রেকফাস্ট খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। প্রথমেই যেতে হবে এ পি এন দফতরে। এশিয়া বিভাগের ডেপুটি হেড সোয়ার্টস সাহেবের সঙ্গে দেখা হল আবার। সহাস্য মুখে তিনি জিগ্যেস করলেন, কী কী দেখলেন, কেমন লাগল বলুন!

আমি বললুম, আপনাদের এত বিরাট দেশ, সেই তুলনায় তো কিছুই দেখা হয়নি! খুবই অতৃপ্তি রয়ে গেল!

তিনি বললেন, আমাদের এত বড় দেশ, আমরা নিজেরাই বা তার কতখানি দেখতে পাই। আপনাদের ভারতবর্ষ তো অনেক বড়, আপনি কি গোটা ভারতবর্ষ ঘুরেছেন?

আমি বললুম, না। তবে যে-কোনও দেশেই নেটিভদের চেয়ে বাইরের ভ্রমণকারীরা অনেক বেশি ঘুরে দেখে যায়।

তিনি বললেন, আপনার সঙ্গে আমাদের যে ছেলেটি গিয়েছিল, সে আপনার ঠিক যত্ন নিয়েছিল তো?

সারগেই কাছে বসে থাকলে আমি নিশ্চিত কিছুটা ইয়ার্কি-ঠাট্টা করতুম। কিন্তু সারগেই অন্য কোথাও গেছে। সেইজন্য আমি বললুম, সারগেই ছেলেটি সত্যিই ভালো, ওর ব্যবহার খুবই আন্তরিক। আমায় কোনওরকম অসুবিধে বোধ করতে দেয়নি। যতগুলো জায়গা আমি দেখেছি, মুগ্ধ হয়েছি।

সোয়ার্টস সাহেব বললেন, আপনি আশা করি আবাব আসবেন।

ওখানে আর দুজনের সঙ্গে দেখা হল, তাঁদের দুজনের সঙ্গেই কলকাতার সম্পর্ক আছে। ওঁদের একজন কলকাতার সোভিয়েত দূতাবাসে কাজ করেন, আর একজন শিগগিরই ভাইস কনসাল হিসেবে কলকাতায় যাবেন।

সোয়ার্টস সাহেব আমাকে পৌঁছে দিলেন নীচের সিঁড়ি পর্যন্ত। আমাকে উপহার দিলেন এক প্যাকেট রুশ সিগারেট ও কয়েকটি বই।

এই বাড়িটির কাছেই রাদুগা পাবলিশার্সের অফিস। এই প্রকাশনীর কাছ থেকে আমি আগে চিঠিপত্র পেয়েছি, এঁদের সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, সুতরাং ওখানে একবার যাওয়ার ইচ্ছে আমার ছিলই, সারগেই অ্যাপয়েন্টমেন্টও করে রেখেছে।

মস্কোর প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স তথা প্রগতি প্রকাশনী বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য থেকে রুশ ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ করেন এবং সোভিয়েত সাহিত্য পৃথিবীর বহু ভাষায়। রাদুগা পাবলিশার্সও তাঁদের সহযোগী হিসেবে স্থাপিত হয়েছে। বাংলা ভাষা থেকে রুশ ভাষায় অনূদিত অনেকগুলি বই দেখলুম। এঁরা আধুনিক বাংলা গল্পের একটি সংকলনও প্রকাশ করছেন, সেই সংকলনটির নাম "রাতপাখি"।

রুশ ও অন্যান্য সোভিয়েত ভাষার বিখ্যাত কয়েকটি রচনার বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ দেখে মুগ্ধ হলুম। যেমন সুন্দর ছাপা, তেমন সুন্দর কাগজ, অনুবাদও বেশ ঝরঝরে। সুমুদ্রিত, সুবাঁধাই বই হাতে নিলেই ভালো লাগে। অনুবাদে সাহিত্যের অবদান-প্রদানের ব্যাপারে সোভিয়েত রাশিয়ায় যে বিশাল কর্মযজ্ঞ চলছে, তেমনটি আর পৃথিবীর কোথাও নেই। ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কেও এঁদের যথেষ্ট আগ্রহ ও যত্ন আছে।

ফরেন লিটরেচার বিভাগের চিফ এডিটর জর্জ এ আনদ্জাপারিদ্জ-এর সঙ্গে আলাপ হল। প্রথমেই অবাক হলুম এর মুখের ইংরিজি শুনে! খাঁটি ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট। এখানে যাঁরা ইংরিজি শেখে তাঁদের এক-একজনের ইংরিজি এক এক রকম। আমেরিকান অ্যাকসেন্টও বেশ শোনা যায়। ভারতীয় অ্যাকসেন্টে ইংরিজি বলতেও শুনেছি দু-একজনকে।

জর্জ অবশ্য ইংরিজি সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ। ইনি মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বিখ্যাত সব ইংরেজ লেখকদের বিচার করে নিবন্ধ গ্রন্থ লিখেছেন। রাদুগা পাবলিশার্স ইংরিজিতেও অনেক বই প্রকাশ করেন। সেইসব বই অনেকগুলি উপহার দিতে চাইলেন আমাকে। বই পেলে আমি সবসময়েই খুশি হই, কিন্তু বিমানযাত্রায় বই বহন করা বেশ অসুবিধেজনক। আমি অনুরোধ করলুম, বইগুলি ডাকে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য।

এখান থেকে আমি প্যারিস যাব শুনে জর্জ সকৌতুকে ভুরু নাচিয়ে বললেন, প্যারিসে ...বি গুড!

কথায় কথায় আমি জিগ্যেস করলুম, এই যে এতসব চমৎকার-চমৎকার বাংলা অনুবাদ আপনারা প্রকাশ করেছেন, এগুলো কলকাতায় পাওয়া যায় না কেন? আমার তো চোখে পড়ে না!

জর্জ বললেন, এইসব বই বিক্রি করার ব্যবস্থা ঠিকমতন গড়ে ওঠেনি, চেষ্টা করা হচ্ছে।

আমি বললুম যে, আমরা ছেলেবেলায় প্রচুর সস্তা দামে সোভিয়েত বই দেখেছি, কলকাতার পথে পথে বিক্রি হয়েছে। এখন আর তেমন দেখা যায় না। রুশ ক্লাসিকাল সাহিত্য সম্পর্কে বাঙালি পাঠকদের খুবই আগ্রহ আছে। টলস্টয়, পুশকিন, টুর্গেনেভ, ডস্টয়েভস্কি, গোর্কি প্রমুখ লেখকদের লেখা যদি সস্তায় সঠিক অনুবাদে পাওয়া যায় তাহলে বাঙালি পাঠকরা নিশ্চয়ই কিনবে। একালের লেখকদেরও রচনা অনেকেই পড়তে চায়।

এর পরে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল "ফরেন লিটরেচার" পত্রিকা দফতরে। সেই পত্রিকায় আমার কয়েকটি গল্পের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, কিঞ্চিৎ দক্ষিণাও পাওনা আছে। কিন্তু টেলিফোনে ওদের সঙ্গে এখনও যোগাযোগ করা যায়নি।

সারগেই বলল, চলুন, তার আগে আমরা লাঞ্চ খেয়ে নিই, আজ আপনাকে খুব ভালো করে খাওয়াতে হবে।

আমি আঁতকে উঠে বললুম, আমি কোনওদিনই তো খারাপ খাইনি, আজ হঠাৎ খুব ভালো করে খাওয়াবার মানে কী? রোজ যা খাই, তার বেশি তো খেতে পারব না!

সারগেই বলল, আপনি কাল চলে যাবেন, সেই জন্য আজ আপনাকে স্পেশাল কোনও জায়গায় খাওয়াতে চাই। সঙ্গে আমার এক বন্ধু থাকবে, তার সঙ্গে আলাপ করে আপনার ভালো লাগবে।

গাড়ি নিয়ে প্রায় গোটা মস্কো শহরটা পেরিয়ে এলাম আমরা। শহরের প্রান্ত এলাকায় সব দিকেই প্রচুর নতুন ফ্ল্যাট বাড়ি উঠেছে, পাড়াগুলি একইরকম দেখতে। মাঝখানে চওড়া চওড়া রাস্তা। একটা বাস স্টপে দাঁড়িয়ে ছিলেন সারগেই-এর বন্ধু, আমাদের দেরির জন্য তিনি ঘন-ঘন ঘড়ি দেখছিলেন।

আলাপ হল, এর নাম পারপারা আনাতোলি আনতোলিয়েভিচ। বিখ্যাত "মস্কোভা" পত্রিকায় ইনি কবিতা বিভাগের সম্পাদক। প্রথমে একটু নিরাশ হলুম, পারপারা একেবারেই ইংরিজি জানেন না, সুতরাং এঁর সঙ্গে সরাসরি কথা বলা যাবে না। যদিও ব্যাপারটি অতিশয় গর্ব করার মতন। রুশ ভাষার একজন কবি ও সম্পাদক, তিনি বিদেশি ভাষা শেখার জন্য সময় ব্যয় করেননি। যেহেতু রুশ ভাষা খুবই উন্নত, তাই এই ভাষা জানলেই বিশ্বের সমস্ত সাহিত্য সম্ভারের স্বাদ পাওয়া যায়। আমি যদি শুধু বাংলা ভাষায় সব কাজ চালাতে পারতুম, তাহলে নিশ্চয়ই গর্ব বোধ করতুম।

প্রায় আধঘণ্টা ধরে চলল রেস্তোরাঁ খোঁজাখুঁজি। কোনওটাই ওঁদের দুজনের ঠিক পছন্দ হয় না। তারপর এক সময় পারপারা বললেন, চলো, তোমাদের এক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি, যদি সে জায়গাটা খোলা থাকে, তাহলে তোমাদের নিশ্চয়ই ভালো লাগবে।

সৌভাগ্যবশত জায়গাটা খোলাই পাওয়া গেল। সেখানে পৌঁছে আমি পারপারার কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করলুম। শুধু খাওয়ার জন্যই নয়, আর একটি চমৎকার জায়গা দেখা হল।

জায়গাটা হল আর্টিস্ট ইউনিয়ান। রাইটার্স ইউনিয়ান আগেই দেখেছি, শিল্পীদের মিলন স্থানটিও খুবই সুন্দর। পুরোনো আমলের বাড়ি, কাঠের সিঁড়ি, দেওয়ালে কাঠের কারুকাজ। খাবারের জন্য আমরা যে বড় ঘরটিতে এলুম, সে ঘরটি যেন একশো বছর আগেকার কায়দায় সাজানো। পরিবেশের গুণেই মনটা ভালো হয়ে যায়।

আমরা একটু দেরি করে এসেছি, লোকজন এখন কম। পারপারা বোধহয় একেবারে রান্না ঘরে চলে গিয়ে খাবারের অর্ডার দিয়ে এলেন। তারপর এক বোতল ভদ্‌কা নিয়ে বসে বললেন, আসুন, আগে খিদে বাড়িয়ে নেওয়া যাক।

॥ ১৭ ॥

দোভাষীর মারফত বক্তৃতা দেওয়া চলতে পারে, সাক্ষাৎকার নেওয়াও সম্ভব, কিন্তু এইভাবে আড্ডা দেওয়া যায় না। বিশেষত খাওয়ার টেবিলে। আমরা রয়েছি তিনজন, এরমধ্যে পারপারা যা বলছে সারগেই আমাকে তা অনুবাদ করে শোনাচ্ছে। আমি যা যা উত্তর দিচ্ছি, সারগেই-কে তা আবার অনুবাদ করতে হচ্ছে। পারপারা আমার দিকে তাকিয়ে কোনও মজার কথা বললে সারগেই তা শুনে হাসছে, আমি তখন বোকাবোকা মুখ করে তাকিয়ে থাকি, তারপর অনুবাদ শুনে হাসতে হয়। গণ্ডারকে কাতুকুতু দিলে সে নাকি সাতদিন পরে হাসে, এ যেন অনেকটা সেই ব্যাপার। সারগেই নিজে কোনও কথা বলতে চাইলে একবার বলে রুশ ভাষায়, আর একবার আমার দিকে ফিরে ইংরিজিতে।

খানিকটা ভদ্‌কা পানের পর অবশ্য অনুবাদের ঝামেলা অনেকটা চুকে যায়। তখন আমি পারপারার কথা সরাসরি অনেকটা বুঝতে পারি। ইশারা-ইঙ্গিতেও অনেকটা কাজ চলে। সারগেই খাদ্য-পানীয় দুটোই কম খায়, স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সতর্ক; ওর চেহারা বেশ ছিপছিপে, তবু ওর ধারণা মোটা হয়ে যাচ্ছে। কয়েকদিন আগেই সারগেই আমাকে বলেছিল, খুব শীতের সময় বাড়ি থেকে কম বেরুনো হয়, বসে-বসেই সময় কাটাতে হয় বেশি, তাই শীতের পর তার ট্রাউজার্সের কোমর আঁট হয়ে যায়।

পারপারা বেশ দিলদরিয়া ধরনের মানুষ, এবং খুবই কবিতাপ্রেমিক। কবিতা প্রসঙ্গে নানা কথা বলতে বলতে ভদ্‌কা পান চলতে লাগল। সেইসঙ্গে নানারকম খাদ্য। লেনিনগ্রাদে আমি একদিন ক্যাভিয়ের সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলুম, সেদিন হোটেলে ক্যাভিয়ের বিশেষ ছিল না। তারপর আমি অন্যত্র ক্যাভিয়ের খেয়েছি, কিন্তু আজ সারগেই আমাকে আশ মিটিয়ে ক্যাভিয়ের খাওয়াবে ঠিক করেছে। দু-প্লেট ক্যাভিয়ের আনানো হয়েছে, এবং তা শুধু আমাকেই খেতে হবে। আমি কালো রঙের ক্যাভিয়েরই আগে দেখেছি, কমলা রঙেরও যে হয় আগে জানতুম না।

যতদূর জানি, কাস্পিয়ান হ্রদের স্টার্জন মাছের পেটেই শুধু এরকম ডিম হয়। মাছগুলি বিরাট বিরাট, সেই তুলনায় ডিমের পরিমাণ কম। সেই জন্যই এই ডিমের দাম খুব বেশি। সারা পৃথিবীতেই ক্যাভিয়ের একটি অতি শৌখিন খাবার হিসেবে পরিচিত। তবে এই মাছের ডিমই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ কি না, তা আমি বলতে পারি না, এটা ব্যক্তিগত রুচির প্রশ্ন, তা ছাড়া আস্বাদ রপ্ত করারও একটা ব্যাপার আছে। অনেক বাঙালিই হয়তো বলবেন, পদ্মার ইলিশের ডিমের কোনও তুলনা নেই। অবশ্য স্টার্জন মাছের এই ডিমের বৈশিষ্ট্য হল এর দানাগুলো বড়-বড়, এবং ভেতরটা রসাল। ক্যাভিয়ের আমার বেশ প্রিয়, কিন্তু তা বলে দু-প্লেট খেতে হবে? পারপারা আর সারগেই বলতে লাগল, আপনারা দেশে তো এ জিনিস পাবেন না, আপনি খান, আমরা তো প্রায়ই খেতে পারি।

আমি বললুম, আপনারা আমার দেশে আসুন, ইলিশ মাছের ডিম খাওয়াব!

ইলিশ মাছ কীরকম দেখতে হয়, তা ওরা দুজনেই জানে না। ইলিশ নিয়ে বুদ্ধদেব বসুর কবিতা আছে, তা দু-লাইন শুনিয়ে মাছটির বর্ণনা দিলুম, তারপর বললুম, ইলিশ মাছ খুব বড় হয় না বটে, কিন্তু ডিম হয় অনেকখানি করে।

পারপারা কখনও ভারতে আসেননি, আসবার খুব ইচ্ছে আছে। ওঁর শুধু শখ হিমালয় পাহাড় দেখা। আমি বললুম, কলকাতায় চলে আসুন, আমি দার্জিলিং নিয়ে যাব। দার্জিলিং-এর নাম শুনেছেন?

ওরা দুজনেই বলল, দার্জিলিং তো বিশ্ববিখ্যাত জায়গা।

মাঝে মাঝে টুকটাক কবিতা সম্পর্কে আলোচনা, পরিবেশটি হল শিল্পীদের মিলনকেন্দ্র এবং নানারকম সুখাদ্য, সব মিলিয়ে দুপুরটি কাটল চমৎকার। পারপারা কারুকার্য করা খাপ সমেত একটা ছোট ছুরি দিলেন আমাকে। বললেন, আমার বন্ধুত্বের চিহ্ন হিসেবে এই সামান্য জিনিসটি আপনাকে নিতে হবে!

আমি অভিভূত হয়ে গেলুম একেবারে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার পরিচয়! আমার কাছে দেওয়ার মতন কিছুই ছিল না। আমি লজ্জিতভাবে সেকথা জানাতেই পারপারা বললেন, আমি যখন আপনার দেশে যাব, তখন নিশ্চয়ই কিছু নিয়ে আসব আপনার কাছ থেকে।

বিদায় নেওয়ার সময় পারপারা আনাতোলি আনতোলিয়েভিচ্ খুব আন্তরিকভাবে আমার হাতে ধরে ঝাঁকুনি দিলেন। ভাষার ব্যবধান থাকলেও দুজন মানুষের কাছাকাছি আসতে যে বাধা হয় না, আবার তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

আরও কয়েকটি জায়গা ঘুরে হোটেলে ফিরে দেখি সুবোধ রায় বসে আছে। সে সারগেইকে বলল, অনেক লোক অপেক্ষা করছে, সুনীলদাকে না নিয়ে গেলে চলবেই না।

আমাদের সারাদিনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট মোটামুটি শেষ, তাই সারগেই আপত্তি জানাল না। সুবোধ সারগেইকেও নেমতন্ন জানাল, কিন্তু সারগেই নিজের বাড়ি ফিরে যেতে চায়। ও বেশ কয়েকদিন বাড়িছাড়া, সেইজন্য আমিও ওকে ফিরে যেতে বললুম। সরকারি গাড়িও ছেড়ে দিতে হল।

সুবোধরা থাকে বহু দূরে। দুজনে হাঁটতে-হাঁটতে ট্যাক্সি খুঁজতে লাগলুম। সন্ধে প্রায় সাতটা বাজে। সন্ধে না বলে বিকেল বলাই ভালো, কারণ আকাশে যথেষ্ট আলো রয়েছে। সুবোধ জানাল যে এই সময়ে ট্যাক্সি পাওয়া মুশকিল। রাস্তায় অফিস ফেরত ভিড়।

কিছুক্ষণ চেষ্টা করেও ট্যাক্সি পাওয়া গেল না। হাঁটতে বেশ ভালোই লাগছে, কিন্তু হেঁটে অতদূর যাওয়া যাবে না। সুবোধ বলল, মেট্রোতে যেতে আপনার আপত্তি আছে? কিছুটা এগিয়ে যাওয়া যায়।

আপত্তির তো কোনও প্রশ্নই ওঠে না, আমি সাগ্রহে রাজি হলুম। সরকারি অতিথি হলে সবসময় গাড়ি চড়ে ঘুরতে হয়। এর আগে একদিন ক্রেমলিন থেকে ফেরার পথে শর্টকাট করার জন্য একটা মেট্রো স্টেশনে নেমে উলটো দিকের রাস্তায় উঠেছিলুম, আজ প্রথম মস্কোর মেট্রোতে চাপার সুযোগ হল।

পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশের ভূ-নিম্ন ট্রেন দেখেছি আমি, মস্কোর মেট্রো আমার কাছে শ্রেষ্ঠ মনে হয়েছে। স্টেশনগুলির বিরাটত্ব এবং সৌন্দর্য এই দুটোই একসঙ্গে বিস্মিত করে। স্টেশনগুলি নিছক ফাংকশনাল নয়, নানারকম ভাস্কর্য ও আলোর বাহার দিয়ে সাজানো। গ্রানাইট ও মার্বেল পাথরে রয়েছে শিল্পীদের হাতের স্পর্শ।

মস্কোর মেট্রো রেল তৈরি শুরু হয়েছিল পঞ্চাশ বছরেরও বেশি আগে। এখন এই শহরেই ১১৫টি স্টেশন এবং লাইন পাতা আছে ১৯৩ কিলোমিটার জুড়ে।

মেট্রো রেলে বেশ খানিকটা পথ আসবার পর আবার ওপরে উঠে সুবোধ গাড়ি জোগাড় করে ফেলল। ননী ভৌমিককে নিয়ে যাওয়ার কথা আছে, তিনি বাড়িতে অপেক্ষা করছেন।

এখনকার পাঠকরা অনেকেই হয়তো ননী ভৌমিকের লেখা পড়েননি, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল দুর্ধর্ষ ছোটগল্প লেখক হিসেবে। তাঁর "ধান কানা" নামে একটি গল্পের বই পড়ে আমার ছাত্র বয়েসে মুগ্ধ হয়েছি। তারও আগে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর একটি গল্পের বই প্রকাশিত হয়েছিল। খুব বেশি লেখেননি তিনি। বহুকাল ধরেই মস্কোতে আছেন অনুবাদের কাজ নিয়ে।

ননী ভৌমিক তৈরি হয়েই ছিলেন, কিন্তু আমাদের দেখে বললেন, আপনারা এসেছেন, কিছু দিয়ে তো আতিথ্য করতেই হবে।

সুবোধ বলল, না ননীদা চলুন, অন্য অনেকে অপেক্ষা করছে। আমরা খুব দেরি করে ফেলেছি!

তবু খুব চটপট একটা করে ভদ্‌কা পান করা গেল। ননী ভৌমিকের ছেলে সদ্য মিলিটারি সার্ভিস শেষ করে এসেছে, আলাপ হল তার সঙ্গে। সে এখন বেশ লম্বা-চওড়া জোয়ান, এই ছেলেটিই একবার অল্প বয়সে কলকাতায় এসে হারিয়ে গিয়েছিল, গল্প শুনেছি।

ননী ভৌমিককে আমি কলকাতায় দেখেছি দু-একবার, কিন্তু ভালো পরিচয় ছিল না। গাড়িতে যেতে যেতে বললুম, আপনি দুর্দান্ত সব গল্প লিখেছেন, এখন আর লেখেন না কেন? আমাদের অনুরোধ, আবার লিখুন। উনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, নাঃ, আমার দ্বারা আর লেখা হবে না। আমার লেখা শেষ হয়ে গেছে!

গাড়ি যেখানে থামল, সেই পাড়ায় অনেক বিদেশি ছাত্র-ছাত্রী দেখতে পেলুম, কালো রঙের যুবক-যুবতী অনেক। কাছেই প্যাট্রিস লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয়। বহু দেশ থেকে ছেলেমেয়েরা এখানে পড়তে আসে। কাছাকাছি অনেকগুলি হস্টেল।

সুবোধের অ্যাপার্টমেন্টে জড়ো হয়েছে অনেক বাঙালি নারী-পুরুষ। অনেকেই ছাত্রছাত্রী। সুজিত আর সংঘমিত্রার সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছিল। ওদের কেউ-কেউ এক-একটা জিনিস রান্না করে এনেছে, সব মিলিয়ে অনেক খাবার। সুবোধ সাজিয়ে রেখেছে শ্যাম্পেন ও ভদ্‌কার বোতল। সুবোধকে কারা যেন একটা বড় অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দিয়েছিল, কিন্তু আমি তা নাকচ করে দিয়েছি. আমার এইরকম ঘরোয়া আসরই পছন্দ। অবিলম্বে আড্ডা জমে গেল।

শ্যাম্পেনের গেলাস শেষ হতে না হতেই কেউ ঢেলে দিচ্ছে আবার, আমি মনে মনে একটু

ভয় পাচ্ছি। দুপুর থেকেই যথেষ্ট ভদ্কা সেবন হয়েছে, এবার হঠাৎ না জ্ঞানটা চলে যায়। কিন্তু ননী ভৌমিক আমাকে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন। কয়েকজন আমাকে অনুরোধ জানাল কবিতা পড়ে শোনাবার জন্য। ফাঁকি দেওয়ার জন্য আমি বললুম, কোনও কবিতার বই তো সঙ্গে আনিনি! কোথা থেকে বেরিয়ে পড়ল গোটা দু-এক কবিতার বই। এই সুদূর মস্কোতেও কেউ বাংলা কবিতার বই সঙ্গে করে এনেছে, এটা দেখে আমার মনটা বেশ ভিজে ভিজে হয়ে গেল।

উপস্থিত যুবক-যুবতীদের মধ্যে দু-একজন বেশ ভালো গান করে। শুরু হয়ে গেল গান। প্রায় সবই রবীন্দ্রসঙ্গীত। ভাগ্যিস রবীন্দ্রনাথ এতগুলো গান লিখে গিয়েছিলেন, নইলে বাঙালি জাতটার কী অবস্থা হত। রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া আমাদের আর কোনও গানই নেই!

রাত্রি বাড়ছে আর বারবার মনে পড়ছে আমাকে কাল ভোরেই এয়ারপোর্ট ছুটতে হবে। হুস করে, যেন চোখের নিমেষে কেটে গেল দুটি সপ্তাহ। বাঙালিরা অনেকেই বলতে লাগলেন, মস্কোতে আপনি বড্ড কম দিন থাকলেন, এখানে আপনার আরও কয়েকটা দিন কাটিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

আমি বললুম, সে যাই হোক, শেষ সন্ধেটি আমার চমৎকার কাটল।

অনেক রাতে ট্যাক্সিতে আমায় হোটেলে পৌঁছে দিয়ে গেল সুবোধ আর কয়েকজন। জামা-প্যান্ট না ছেড়েই ঘুমিয়ে পড়লুম আমি। ঠিক যেন পরের মুহূর্তেই ঝনঝন করে বেজে উঠল টেলিফোন।

না, এক মুহূর্ত নয়, এর মধ্যে রাত কেটে গেছে। হোটেলের অপারেটর আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে যে আমার প্লেন ধরতে হবে। এই ব্যবস্থাটা কে করে গেল? নিশ্চয়ই সুবোধ। এভাবে জাগিয়ে না দিলে হয়তো আমার ঘুম ভাঙত না। সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে, আর মোটেই সময় নেই।

বাক্স গুছোবার কোনও ব্যাপার নেই, জামা-কাপড় যেখানে যা ছড়িয়েছিল সব দলামোচা করে ভরে দিলুম। পাশপোর্ট আর টিকিট ঠিক থাকলেই হল। এয়ারপোর্টে কি আমাকে একাই যেতে হবে?

মোজা পায়ে দিয়ে জুতোর ফিতে বাঁধতে শুরু করেছি, এমন সময় সারগেই এসে হাজির। ওর বাড়ি অনেক দূরে, ওকে আরও অনেক ভোরে উঠতে হয়েছে।

এয়ারপোর্টে পৌঁছে বেশি সময় পাওয়া গেল না। সিকিউরিটি চেকের ডাক পড়ে গেল। সারগেই-এর ধারণা ছিল ওর পরিচয়পত্র দেখালে ওকে সিকিউরিটি এলাকার মধ্যে ঢুকতে দেবে, তা হলে আরও কিছুক্ষণ কথা বলা যাবে। কিন্তু গম্ভীর চেহারার রক্ষীরা অনুরোধ করলেও ফল হল না কিছু। সুতরাং আমাদের বিদায়পর্ব হল অতি সংক্ষিপ্ত। সারগেই আমার হাত জড়িয়ে ধরে বলল, সুনীলজি, মনে রাখবেন আমাদের কথা, চিঠি লিখবেন, আবার কখনও এদেশে এলে ফোন করবেন...

আমি বললুম, নিশ্চয় মনে থাকবে তোমার কথা। আমাদের দেশে কখনও এলে নিশ্চয়ই খবর দিও!

তারপরেই আমি চলে গেলুম চোখের আড়ালে।

উপসংহার

সোভিয়েত ইউনিয়ান একটি বিরাট দেশ। কত বিরাট তার খানিকটা ভৌগোলিক আভাস দিচ্ছি: এই যুক্তরাষ্ট্রটি অস্ট্রেলিয়ার তিন গুণ, দক্ষিণ আমেরিকার চেয়ে বেশ বড়, আফ্রিকার চেয়ে কিছুটা ছোট। অর্থাৎ দেশ নয়, প্রায় মহাদেশ বলা যায়। একটি ট্রেন যদি সারাদিন দু-হাজার কিলোমিটার যায় তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়ানের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছতে ওই ট্রেনটির এক মাস সময় লাগবে। এই দেশের পশ্চিম অঞ্চলে যখন সন্ধ্যা, পূর্ব প্রান্তে তখন ভোরের আলো ফুটে ওঠে। এ দেশে নদী আছে দশ হাজার, হ্রদের সংখ্যা পাঁচশো, এর মধ্যে কাস্পিয়ান হ্রদ এমনি প্রকাণ্ড যে সেটি সমুদ্র

নামেই পরিচিত। ইউরোপের সবচেয়ে বড় নদী ভোল্‌গা এসে পড়েছে এই কাস্পিয়ান হ্রদে। জনসংখ্যা সাড়ে ছাব্বিশ কোটি। উনআশিটি ভাষায় এখানে সাহিত্য রচিত হয়।

এই বিশাল দেশের অতি সামান্যই আমি দেখেছি। মোট চোদ্দো দিনের সফর, চারটি শহরে। তবু যতটুকু আমি দেখেছি, তাতেই মুগ্ধ হয়েছি। ভ্রমণকারী হিসেবে এদেশে এসে যথেষ্ট আনন্দ পাওয়া যায়। যেমন রয়েছে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য তেমনই আছে প্রচুর ঐতিহ্যময় শিল্পসম্ভার। যে কটি শহর আমি দেখেছি, তার মধ্যে একমাত্র মস্কোই খুব জনবহুল (লোকসংখ্যা বিরাশি লক্ষের বেশি) এবং সেইজন্যই বোধহয় মস্কোর অধিকাংশ অঞ্চল সেরকম কিছু সুদৃশ্য নয়। কিন্তু অন্যান্য শহরগুলি খুবই সুসজ্জিত, পথঘাট অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন এবং নগর পরিকল্পনায় শিল্পরুচি আছে।

মস্কো থেকে প্যারিস যাওয়ার পথে আমার সঙ্গে একজন ভারতীয় যুবকের আলাপ হয়। যুবকটি চার বছর পশ্চিম জার্মানি ও চোদ্দো বছর ধরে মার্কিন দেশে আছে, ভাবভঙ্গি সবই সাহেবি ধরনের। আমি সদ্য সোভিয়েত ইউনিয়ান দেখে আসছি শুনে যে জিগ্যেস করল, আপনার কেমন লাগল? দেখার মতন কিছু আছে? আমি তো কয়েকবার যাব-যাব ভেবেও শেষ পর্যন্ত যাইনি!

আমি বললুম, দেখার মতন কিছু আছে কি না সেটা নির্ভর করে আপনি ঠিক কী কী দেখতে চান তার ওপরে। আমার তো বেশ ভালোই লাগল। অনেক ভুল ধারণা ভেঙে গেছে, অনেক কিছু নতুনভাবে জানলুম।

যুবকটি ফস করে বলে বসল, ওদের দেশে তো ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলে কিছু নেই।

আমি বললুম, আমি ভারতীয়। ব্যক্তি-স্বাধীনতা কাকে বলে তা আমি জানি না। কারণ, ক্ষুধার্ত মানুষের কোনও ব্যক্তি-স্বাধীনতা থাকে না। শুধু দু-বেলা খেয়ে পরে বেঁচে থাকার চিন্তা থেকেই যারা মুক্ত হতে পারেনি, তারা কোনওরকমেই স্বাধীন নয়। সোভিয়েত দেশে আমি কোনও ক্ষুধার্ত মানুষ দেখিনি। রাস্তায়-ঘাটে আমি কোনও রুগ্‌ণ চেহারার, ছেঁড়া-খোঁড়া জামা কাপড় পরা, ভিখিরি ধরনের মানুষ দেখিনি। লন্ডন-নিউ ইয়র্কে কিন্তু সেরকম লোক দেখা যায়।

যুবকটি বক্রভাবে জানাল, আপনি কি সব দেখেছেন? আপনাকে যেটুকু দেখানো হয়েছে সেটাই দেখেছেন। ওদেশের লোক কি ইচ্ছেমতন তাদের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে?

আমি বললুম না, আমি সব দেখিনি। ঘুরেছি মাত্র কয়েকটি শহর। কিন্তু সেই শহরগুলিতে যখন যেখানে ইচ্ছে গেছি, কয়েক জায়গাতে একা একাই ঘুরে বেড়িয়েছি। কিন্তু কোথাও একটিও সেরকম অভাবগ্রস্ত মানুষের চেহারা আমার চোখে পড়েনি। ওদেশের সবাই ইচ্ছেমতন মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে কি না জানি না, কারণ আমি তাদের মনের মধ্যে ডুব দিয়ে দেখিনি। অধিকাংশ লোকই ইংরিজি জানে না, সেই জন্য রাস্তার সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়নি। তবে কোথাও কোনও বিক্ষোভের চিহ্ন আমার নজরে পড়েনি। বেশ ভালোভাবেই জীবনপ্রবাহ চলছে। এই তো মনে হল!

যুবকটি বলল, আরে মশাই, আমি নিজে না গেলেও আমার অনেক কলিগ্ সোভিয়েত রাশিয়ায় গেছে, তাদের মুখে শুনেছি, বইপত্রেও পড়েছি, ওদের দেশে কিছু পাওয়া যায় না। ইচ্ছেমতন খাবারদাবার পাওয়া যায় না, সন্ধে কাটাবার কোনও ব্যবস্থা নেই ... ওদেশে আপনার কি কিছুই খারাপ লাগেনি?

আমি মুচকি হেসে বললুম, হ্যাঁ, একটা জিনিস খুব খারাপ লেগেছে। তা হল ওদের চা একেবারে বিস্বাদ।

আমি মুখের সামনে একটি পত্রিকা তুলে আলোচনা বন্ধ করে দিলুম। এর সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। নানারকম প্রচার ও ভুল ধারণা মিশে রয়েছে এর মাথায়। আমার নিজেরও কিছু ভুল ধারণা ছিল।

পশ্চিমি দেশের যে-কোনও বড় শহরের সব রাস্তাই নানারকম দোকানপাটে একেবারে মোড়া থাকে। থরে-থরে সাজানো থাকে হাজার রকমের ভোগ্যপণ্য। সোভিয়েত দেশের শহরগুলিতে সেরকম দোকানের সংখ্যা কম। প্রয়োজনীয় দ্রব্য অবশ্য সবই পাওয়া যায়। কিয়েভ শহরের বাজারেও আমি ঢুকেছিলুম। প্যারিসের একটি বাজারে ঢুকে একবার আমার চোখ প্রায় কপালে ওঠার উপক্রম হয়েছিল, অন্তত তিরিশ রকমের মাংস, পঁচিশ রকমের মাছ, আর আনাজপত্তর যে কত তার ইয়ত্তা নেই। ফরাসিরা ভোজনবিলাসী, তবে সে দেশেও গরিব আছে, সেই গরিবরা নিশ্চয়ই তিরিশ রকমের মাংস আর পঁচিশ রকমের মাছ কখনও খেয়ে দেখেনি। কিয়েভের বাজারে খাবারদাবারের বৈচিত্র্য বিশেষ ছিল না। তবে ভাত, রুটি, আলু, মাছ, মাংস নিশ্চয়ই ওখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়, সেজন্য সকলেরই স্বাস্থ্য ভালো। ভারতীয় হিসেবে এটাই আমার যথেষ্ট বলে মনে হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে একটা মজার ঘটনা মনে পড়ল। কিয়েভের রাস্তায় এক ভদ্রলোক বাজার করে ফিরছিলেন, একজন বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা হঠাৎ সেই লোকটিকে থামিয়ে কি যেন জিগ্যেস করলেন। ভদ্রলোকটি কী যেন বলে হাত তুলে একটা দিক দেখালেন, ভদ্রমহিলা দ্রুত হেঁটে গেলেন সেদিকে! আমি সারগেই-কে জিগ্যেস করলুম, ভদ্রমহিলা কী জিগ্যেস করছিলেন? সারগেই বলল, ওই ভদ্রলোক শশা কিনেছেন, নতুন শশা উঠেছে তো! তাই বৃদ্ধা মহিলা জিগ্যেস করলেন, কোন বাজারে শশা পাওয়া যাচ্ছে!

আমাদের দেশে শশা অবশ্য এমন কিছু লোভনীয় জিনিস নয় যে লোককে ডেকে জিগ্যেস করতে হবে, কোথায় শশা পাওয়া যাচ্ছে। সোভিয়েত দেশে শশা নিশ্চয়ই প্রিয় খাদ্য।

সোভিয়েত দেশ সমাজতন্ত্রের পিতৃভূমি। অনেক প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে লড়াই করে এবং নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সেই দেশটি এখন একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছে। আমার ধারণা, সমাজতন্ত্রই ইতিহাসের নিয়তি, পৃথিবীর যদি আয়ু থাকে, তাহলে পৃথিবীটা সেইদিকেই এগোবে। সেই সমাজতন্ত্র একটি অতবড় দেশে কীভাবে কার্যকর হয়েছে তা দেখার কৌতূহল ছিল অনেকদিন ধরেই। যেটুকু আমি দেখেছি, তাতে আমি সমালোচনার কিছু পাইনি। এ দেশে সকলেই কাজ পায়, সকলেই বাসস্থান পায়, বৃদ্ধ বয়সে অনাহারের দুশ্চিন্তা নেই, শিক্ষার সুযোগ আছে সকলের, চিকিৎসার জন্য অর্থ ব্যয় করতে হয় না, জিনিসপত্রের দাম বাড়ে না। আমাদের চোখে এত বড় একটা দেশের সরকারের পক্ষে এগুলিই তো দারুণ কৃতিত্বের ব্যাপার। রাস্তা-ঘাটে মানুষজনকে দেখে অসন্তুষ্ট, গোমড়ামুখোও মনে হয়নি। তবে সরকারের নানান কীর্তি সম্পর্কে দেশের কিছু কিছু মানুষের আপত্তি বা প্রতিবাদ তো থাকতেই পারে। তারা কীভাবে কিংবা কতদূর পর্যন্ত সেই প্রতিবাদ জানাতে পারে তা আমি জানি না।

বাইরে থেকে গিয়ে, ওদেশের সিকিউরিটি ব্যবস্থার কড়াকড়ি প্রথম প্রথম আমাদের চোখে লাগে। ওদের পুলিশের নাম মিলিশিয়া, তারা সবাই অতি গম্ভীর। প্রত্যেক হোটেলে গিয়েই পাশপোর্ট ও ভিসা ফর্ম জমা দিতে হয়, অন্যান্য দেশে এ ব্যবস্থা দেখিনি। অবশ্য, সোভিয়েত ব্যবস্থাকে বানচাল করে দেওয়ার জন্য নানান রকম চেষ্টা হয়েছে, একাধিকবার এই রাষ্ট্র আক্রান্ত হয়েছে, সেইজন্য বাইরের শত্রুর হাত থেকে সাবধান হওয়ার জন্য এঁদের তো ব্যবস্থা নিতেই হবে। শুনেছি, আগে কড়াকড়ি অনেক বেশি ছিল, এখন তা ক্রমশ শিথিল হচ্ছে, এখন পৃথিবীর সব দেশ থেকে প্রচুর ভ্রমণকারী আসছে।

আমাদের দেশ সম্পর্কে সোভিয়েত দেশের বুদ্ধিজীবীদের, এমনকী সাধারণ মানুষদেরও যথেষ্ট কৌতূহল ও আকর্ষণ আছে বোঝা যায়। অন্যান্য পশ্চিমি দেশগুলিতে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ও রহস্যবাদ সম্পর্কে মাঝে মাঝে আগ্রহ জাগে বটে, কিন্তু আধুনিক ভারতীয় শিল্প-সাহিত্য বা সংস্কৃতি সম্পর্কে তেমন কোনও উৎসাহ দেখা যায় না। সোভিয়েত দেশে রবীন্দ্রনাথ যতখানি জনপ্রিয়, তেমন আর

বোধহয় পৃথিবীর অন্য কোনও দেশেই নয়। আধুনিক সাহিত্যেরও অনুবাদ হচ্ছে। রাস্তার সাধারণ মানুষদের দেখে আমার মনে হয়েছে, যদিও ভাষার ব্যবধানের জন্য ভাব বিনিময় করা যাচ্ছে না, তবু ভারতীয় হিসেবে আমার পরিচয় পেয়ে তারা বন্ধুত্ব জানাতে চেয়েছে।

একটা দেশের শাসন ব্যবস্থাকে বদলানো মানেই সে দেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, প্রথাবাহিত আচার-আচরণ একেবারে মুছে ফেলা নয়। অনেকের ধারণা এই যে, বিপ্লবের পর সোভিয়েত দেশ সেখানকার পুরোনো সবকিছু একেবারে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। গিয়ে দেখলুম, ব্যাপারটা ঠিক উলটো। ওদেশে শুধু শোষকদের চিহ্ন ও ব্যবস্থাগুলি ছাড়া পুরোনো সব কিছুকেই বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চলছে। পুরোনো শিল্পসামগ্রী, পুরোনো রাজপ্রাসাদ, গির্জা, পুরোনো সংস্কৃতি, গান-বাজনা এসব সংরক্ষণ বা পুনরুদ্ধারের জন্য বিপুল উদ্যম নিয়োজিত। এদেশে অনেকেই এখনও বিয়ের সময় নববধূকে আগেকার দিনের মতন সাজে দেখতে ভালোবাসে। পল্লিগীতি এবং লোকনৃত্য সম্পর্কে অনেকেরই বেশ মায়া আছে। পারিবারিক বন্ধন এখনও অনেকটা অক্ষুণ্ণ আছে। এদেশের গল্প-উপন্যাস পড়লে বা ফিল্ম দেখলে বোঝা যায়, মা-বাবার সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদের সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হয়ে যায়নি।

দু-সপ্তাহের মধ্যে একদিনও আমার খবরের কাগজ পড়ার সুযোগ হয়নি। ইংরিজি ভাষার পত্রিকা পাওয়া যায় না, কিংবা পাওয়া গেলেও চোখে পড়েনি। খবরের কাগজ থেকে দেশের একটা দৈনন্দিন চিত্র ফুটে ওঠে। সুতরাং, ওদেশে প্রতিদিন কীরকম খুন-জখম, চুরি-ডাকাতি হয় তা আমার জানা হয়নি। এত বড় দেশটায় যে ওরকম কিছুই ঘটে না, তা তো হতেই পারে না। সামাজিক পরিবেশ অনুযায়ী মানুষের চরিত্র গঠিত হয় ঠিকই, তবু জটিল মনস্তাত্ত্বিক কারণে কিছু কিছু মানুষের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা দেখা দেবেই। বিলাসের পরিবেশে থেকেও যেমন কিছু-কিছু লোক সন্ন্যাসী হয়ে যায়, সেইরকম সামাজিক বৈষম্য না থাকলেও কিছু-কিছু লোক ডাকাত বা খুনি হতে পারে। চাক্ষুষ কোনও প্রমাণ না পেলে আমার নিশ্চিত ধারণা, সোভিয়েত দেশে এরকম অপরাধের সংখ্যা কম। এটা অনুভবের ব্যাপার। পশ্চিমি দেশগুলিতে নিরাপত্তার কথা সবসময় চিন্তা করতে হয়। এখানে আমি যে ক'দিন ঘুরেছি সেরকম কোনও কথা মনে পড়েনি। এখানকার ভারতীয়দের মুখেও শুনেছি যে এখানে রাত-বিরেতে পথ চলতেও ভয়ের কিছু নেই।

এটাও অনুভব করেছি যে বিশ্বশান্তির জন্য এদেশের মানুষ সত্যিকারের আগ্রহী। যুদ্ধের আগুনে সাংঘাতিকভাবে দগ্ধ হয়ে এরা যুদ্ধকে ঘৃণা করতে শিখেছে। ইউরোপ আমেরিকায় সাধারণ মানুষও নিশ্চিত যুদ্ধ চায় না। তবু মারাত্মক অস্ত্র প্রতিযোগিতায় কোটি-কোটি টাকা অনর্থক খরচ হচ্ছে। একটি সাধারণ অ্যাটম বোমা বানাতে যা খরচ তাতে তেরো লক্ষ শিশুর এক বছরের ভরণপোষণ হয়ে যায়। আমাদের মতন তৃতীয় বিশ্বে প্রতি ঘণ্টায় চারশো সত্তর জন মানুষ অনাহারে কিংবা অনাহারজনিত রোগে মরছে। অথচ আণবিক অস্ত্রের জন্য ওই বিপুল অর্থের অপচয়...এই কথা ভাবলেই মাথা ঘুরতে থাকে, মনে হয় কয়েকটা পাগল পৃথিবীটা ধ্বংস করতে চলেছে! তবে এ কথাও স্বীকার করতে হবে, অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করবার জন্য যে ক'বার শীর্ষ সম্মেলন হয়েছে, তাতে সোভিয়েত দেশ বেশি আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছে।

সোভিয়েত রাশিয়ার সাহিত্য-ছবি-ভাস্কর্য আর শিল্প সুষমামণ্ডিত নয়, এরকম ধারণা অনেকেরই আছে, আমারও ছিল। সোস্যালিস্ট রিয়েলিজম মানে ধরাবাঁধা একঘেয়েমি, ট্র্যাক্টর চালানো আর মেয়েরা কত দক্ষতার সঙ্গে ক্রেন তৈরি করছে কিংবা খামারে কত উৎপাদন হচ্ছে এইসব। গোড়ার দিকে এই ধরনের গল্প-উপন্যাস অনেক লেখা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেই সব ধারণা কবেই পালটে গেছে। জীবনেরও বহুমুখীনতা এবং মনের জটিল রহস্যকে বাদ দিলে শিল্প-সাহিত্য কিছুই হয় না। এ দেশের লেখক, শিল্পী বা নীতি-নির্ধারকরা এখন তা যথেষ্টই বোঝেন! ইউ এস এস আর-এর ১৯৮৩ সালের ইয়ার-বুকে স্পষ্ট লিখে দেওয়া হয়েছে—"Socialist realism is not a cut-and-dried recipe

for artists and writers; it does not prescribe subjects or themes. It rejects neither conventions nor the grotesque, nor the use of symbolism. .... Socialist realism means a truthful depiction of reality in a concrete historical situation, in its revolutionary development. It accepts everything that is valuable in past and present world culture, and rejects everything that isolates art from life and the individual from society."

এই সংজ্ঞা অনেক ব্যাপক। সেই জন্যই আধুনিক অনেক সোভিয়েত লেখকের গল্প-উপন্যাস-কবিতা পড়ে শিল্পের আস্বাদ পাওয়া যায়। আধুনিক ছবিতেও চোখে পড়ে অনেক পরীক্ষা। জীবনের মতন শিল্পও পরিবর্তনশীল।

সোভিয়েত দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় আমি যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি।

চিত্রনাট্য

রাধাকৃষ্ণ

পর্দা জুড়ে লেখা :

কৃষ্ণ যেমন কোটি কোটি ভারতবাসীর কাছে ভগবানের প্রত্যক্ষরূপ, সেইরকম চিরকালের জননীদের কাছে কৃষ্ণ এক অতি আদরের সন্তান। তিনি যোদ্ধা, তিনি গ্রামের রাখাল। মানুষেরই মতন তাঁর স্নেহ, মমতা, প্রেম, অভিমান ও ক্রোধের প্রকাশ। শিষ্টের পালন এবং অত্যাচারী-দুর্জনের দমনের জন্য তিনি যুগে যুগে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন।

এই চলচ্চিত্রটি সেই আদর্শেই রচিত।

পৌরাণিক রাধাকৃষ্ণ আখ্যানের সঙ্গে এই কাহিনীর কোনো যোগ নেই।

দৃশ্য : ১

[এ অন্ধকার। এরই মধ্যে মৃদু গুঞ্জনের শব্দ এবং ক্রমে তা কোলাহলের রূপ নিল। তারই মধ্যে বলিষ্ঠ কণ্ঠে শোনা গেল :]

. চুপ করুন—চুপ করুন—শান্ত হোন—

[গেরুয়াধারী এক সাধুকে দেখা গেল একটা উঁচু মঞ্চে দাঁড়িয়ে। তার পেছনে লাল শালুতে লেখা :]

: শান্ত হোন। শান্ত হোন।

[আস্তে আস্তে কোলাহল কমে এল। সাধু তখন দর্শকদের বলছেন :]

: ভগবানের নামগান শুনতে গেলে অত চ্যাঁচামেচি করলে কি চলে! অবশ্য আপনারাও এক একজন সাক্ষাৎ ভগবান—নরনারায়ণ!

[একথা বলার পর সাধু করজোড়ে দর্শকদের নমস্কার করলেন। ইতিমধ্যে এক ঢুলি ঢোলক বাজাতে শুরু করায়, সাধু বিরক্ত হয়ে তাকে বলে :]

. চুপ কর হারামজাদা! আগেই তোকে ঢোল বাজাতে কে বলেছে?

[সাধু আবার করজোড়ে দর্শকদের নমস্কার করে বলে :]

. : আমি সন্দীপন ঠাকুরের সন্তান। আমার নাম সান্দীপনি। আমাকে মুনি বা ঋষি যা হোক কিছু বলতে পারেন। আমার নিবাস—না, সাধুসন্তদের নিবাস বলা বারণ। কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, হিমালয় সব জায়গাতেই আমার বাস। যাই হোক, আজ আমি আপনাদের কাছে কৃষ্ণের কথা শোনাতে এসেছি। কারণ, ওই কৃষ্ণের সঙ্গে আমার অনেকদিনের একটা সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্কের

কথা আপনারা পরে ঠিকই জানতে পারবেন। যাক গিয়ে নরনারায়ণগণ, এবার আমার কথা শুরু করি।

[আচমকা আবার কোলাহল শুরু হয়ে যায়। সাধু তখন চেঁচিয়ে বলে :]

: শুনুন, শুনুন সবাই!

[ঢালী তখন ঢোলকে সুর ভাঁজছে। সান্দীপনী সাধু গানের ভঙ্গীতে জানায় :]

: মরার আগে মুখে যেমন দিলে গঙ্গাজল

স্বর্গে যাবার আশা কারো হয় না নিষ্ফল।

[ঢালী তখনও বাজিয়ে চলেছে তার ঢোলক। আর তার সাথে সাধুও গান ধরে :]

: মরার আগে মুখে যেমন দিলে গঙ্গাজল

স্বর্গে যাবার আশা কারো হয় না নিষ্ফল।

তেমনি এই বায়োস্কোপখানি দেখিলে মন দিয়া

সর্বপাপের মুক্তি হবে, সোজা যাবেন স্বর্গেতে চলিয়া।

জয় জয় গোপাল বল, জয় জয় গোবিন্দ বল

জয় জয় গোপাল বল, জয় জয় গোবিন্দ বল।

[গানেব সাথে সাথে পর্দায় এবার দেখা গেল :]

রেণু ফিল্মস্-এর প্রথম নিবেদন
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে
বিপ্লব রায়চৌধুরীর রঙ্গিন ছবি

।। রাধাকৃষ্ণ ।।

[সান্দীপনী সাধু ঢালীর সুরে তাল মিলিয়ে নাচতে শুরু করে। ঢালীও এবার যোগ দেয় নাচে। আর তাতে এবার যোগ দেয় কাঁসিদার। সাধু এবার নাচ থামিয়ে কোমর দুলিয়ে গায়:]

: আছেন যারা মা জননী, জানেন ভালো করে
আছেন যারা মা জননী, জানেন ভালো করে
আপনার খোকা খিদে পেলে কেমন চিৎকার করে
আহা কেমন চিৎকার করে।

[ঢালী আর কাঁসিদার নাচতে থাকে বাজনার তালে তালে :]

: আমাদের এই খোকা কৃষ্ণ তেমনই চেঁচায়
আমাদের এই খোকা কৃষ্ণ তেমনই চেঁচায়
হাত পা ছুঁড়ে কাঁদে আবার জগত নাচায়
জয় জয় মুরারি বলো, জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ বলো।

[এবার পর্দায় দেখা যায় পুরনো দিনের কিছু রঙ্গিন ছবি। বাজনা তখনও চলছে

ক) মাথায় ঝুটি বাঁধা হামাগুড়ি দিচ্ছে গোপাল। হাতে মোয়া

খ) মা যশোদার কোলে গোপাল

গ) বাঁশী হাতে গোপাল

এর পরেই দেখা যায় অভিনেতা-অভিনেত্রী ও বাকী শিল্পীদের নাম।

সাধু সান্দীপনী আবার হাসতে হাসতে গান শুরু করে ।]

: আজও যেমন খোকারা সব ফুটবল খেলতে যায়
কৃষ্ণ খেলে দাঁড়িয়ে—বান্দা, গরুও চরায়
চুরি করেও খায় কানু, বড় দস্যি ছেলে
একালে ছেলেরা কি খায় না তেমন সুযোগ পেলে?

[ঢালী আর কাঁসিদার নাচছে বাজনা বাজাতে বাজাতে। সাধু গাইছে :]

: মহাশয় ও মা ঠাকুরণ সবারে জানাই
মহাশয় ও মা ঠাকুরণ সবারে জানাই
ছোট ছেলে অতশত দোষ ধরতে নাই।

[আবার পর্দা জুড়ে ভেসে ওঠে রঙ্গিন আরোও কিছু ছবি।

ক) যশোদা কানুর পেছনে দৌড়চ্ছেন

খ) কানু মাঠে গরু চরাচ্ছে। হাতে বাঁশী

গ) কানু সুবল সুদাম সুমঙ্গল-এর সাথে খেলছে।

এরপব চলচ্চিত্রের কলাকুশলীদেব নামের তালিকা।

আবার কিছু পুরনো ছবি; সবই কানুর দুষ্টুমি আর মা যশোদার হয়রানিকে নিয়ে। কী দুর্ভোগই না পোয়াতে হয় কানুকে নিয়ে।

এরপর বাকি কলাকুশলীদেব নামের তালিকা।

এমন সময় হঠাৎই একটা বোমা ফাটাব শব্দ। সাধু চমকে চারপাশে তাকায়। আবাব ঢালীর ঢোলক বেজে ওঠে। শুরু হয় কাসব ঘণ্টা। ওবা দুজনে নাচতে শুরু করে। সাধুও শুরু করে গান :]

: ছিল যখন রাজার আমাল গরীব দুঃখী প্রজা
ছিল যখন রাজার আমাল গরীব দুঃখী প্রজা
কারুর মাথায় সোনার ঝালর, কারুর ঘাড়ে বোঝা
কারুর মাথায় সোনার ঝালর, কারুর ঘাড়ে বোঝা
আজো তেমন আছে অনেক শোষক অত্যাচারী
আজো তেমন আছে অনেক শোষক অত্যাচারী
কেউ বা পাড়ায় পথের ধুলোয় কেউ বা হাঁকায় গাড়ি।

[ঢালী বাজনা থামিয়ে চারপাশে তাকায়। তারপর আকাশে আকাশে। দূরে—শোনা গেল শঙ্খধ্বনি এবং প্রায় সাথে সাথেই বিমানেব গর্জন।

সাধু গাইছে :]

শোনো অত্যাচারী তোমার দিন ঘনালো এবার
শোনো অত্যাচারী তোমার দিন ঘনালো এবার
(আরে) যেমনভাবে দুষ্ট দুর্জন খতম হল সেবার।

[আবাব কিছু পুবনো রঙিন ছবি পর্দায় ভেসে ওঠে।

ক) কংস বধেব ছবি

খ) কালীয় দমনেব ছবি

গ) কুরুক্ষেত্রেব যুদ্ধে কানু

এমন সময় কিছু শ্লোগানও শোনা গেল। নির্বিকার সাধু গাইছে :]

: তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে
তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে
তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে

[গানের শেষ অংশে পর্দায় দেখা গেল। কৃতজ্ঞতা স্বীকার—যাঁরা এই ছবি তুলতে কোনও না কোনভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের নাম।

এবপর ঢালী আর কাঁসিদারকে দেখা গেল। তারা এবার বাজনা এবং নাচ দুইই থামায়। সাধু এবার সরাসরি দর্শকদের বলেন :]

: আসলে, সেদিনও যেমন পুব দিকে সূর্য উঠতো, আজও তাই উঠছে। আজও পৃথিবী ঘুরছে, পাখি ডাকছে, নদীতে জল বইছে। ...বিশ্বাস করুন, ঠিক

সেইরকম আমাদের কৃষ্ণ আজও আছে, রাধাও আছে। কৃষ্ণ তো আমার খুব কাছেই আছে। তবে ওকে দেখবার আগে, ওর কথা কিছু শুনুন। সে সব কথা বলা বা শোনা দুইই অমৃত সমান।

[পর্দায় দেখতে পাচ্ছি, যেন ট্রেনের জানলার ফাঁক দিয়ে, পথঘাট গাছগাছালি পেছনে সরে যাচ্ছে। পাহাড়, জঙ্গল, নদী। গ্রাম থেকে গ্রামান্তর। চলন্ত ট্রেনের শব্দকে ছাপিয়ে সাধু সান্দীপনীর গলা শোনা যায় :]

: আজ থেকে অল্প কিছুদিন আগেকার কথা। জমিদারদের রাজত্ব তখনও দেশ থেকে যায়নি। সারাজীবন কৃষ্ণকে ডেকে ডেকে আমার যখন উন্মাদ অবস্থা। আমার আদরের কানুর খোঁজে আমি সারা দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছি। ঘুরতে ঘুরতে আমি তখন একটা ছোট গ্রামের পাশে ডেরা বেঁধেছি! এটা সেই গ্রামের কথা।

দৃশ্য : ২

[পর্দায় গ্রামাঞ্চলের টুকরো টুকরো দৃশ্য। যেমন

ক) কারুর বউ হয়তো বা তার বাড়ি উঠান ঝাঁট দিচ্ছে

খ) ছোট ছেলেরা ডাংগুলি খেলছে

গ) কোন বউ হয়তো বা পুকুরঘাটে বাসন মাজছে (এই বিন্দা)

ঘ) আরেকজন জল তুলছে কুয়ো থেকে (এ যশোদা)

ঙ) কুঁড়ে ঘরের ছাদ ছাইছে কোন এক পুরুষ (এ নন্দ)

চ) একপাল হাঁস প্যাঁক প্যাঁক করাতে করতে পুকুরে নামছে

ছ) বেশ কিছু মেয়ে হাসতে হাসতে কথা বলতে বলাতে নদীতে চান করছে

দূরে একটা গরুর মাথা দেখা গেল। সে দিব্যি ঘাড় দুলিয়ে জাবর কাটছে। এবার দেখা গেল একটা নয়, একপাল গরু ধুলো উড়িয়ে চলেছে মাঠের দিকে। সাধু সান্দীপনী গরুগুলোর দিকে তাকিয়ে বলে]

. ইস্, চ্-চ্ চ্, গরুগুলোর কী চেহারা হয়েছে! সেই ক্যালেণ্ডারের ছবির মত একটা গরুও আর আজকাল দেখা যায় না। বড় দুঃখ হয়।

[একপাল গরু মাঠে ঘাস খাচ্ছে। আর রাখালেরা -- তারাও গাছগাছালীর ছায়ায় বসে দুপুরবেলার খাওয়া সেরে নিচ্ছে। এদেরি মধ্যে একজন (এ বলাই) দূরে যেন কাউকে দেখতে পেয়ে বলে ওঠে.]

: কানু! এই কানু! খাবি না? তাড়াতাড়ি আয়!

[এতক্ষণে কানুকে দেখা গেল। কানুকে ঠিক না, তার পেছন দিকটা। সে তখন দিব্যি আরামে মূত্রত্যাগে ব্যস্ত-- খানকয়েক গরুর মাঝখানে। বলাই আবার চেঁচিয়ে ডাকে : খেয়ে যা।

কানু এবার সেই অবস্থাতেই মাথা ঘুরিয়ে বলে :]

যাচ্ছি, যাচ্ছি, এত চ্যাঁচাবার কী হলো?

[সেই মাঠের একপাশে এক বিশাল গাছের নীচে সাধুর কুঁড়েঘর। সান্দীপনী তার দাওয়ায় বসে। মুখে মৃদু হাসি। সেই হাসি নিয়েই তিনি দর্শকদের জানালেন :]

এই আমাদের কানু। দেখেছেন? দেখুন না দেখুন। লজ্জার কিছু নেই। উনি এখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিচ্ছেন!

[ঢুলী বসেছিল কুঁড়েঘরের একপাশে। সে তার ঢোলে দিব্যি একটা বোল তুলে তারই সুরে সুর মিলিয়ে গেয়ে ওঠে :]

: ওরে রে কানু!

তুমি শুধুই খেয়েছিলে ননী,

তুমি কি শুধুই বংশীধারী?

তুমি কি শুধুই শ্যাম নটবর,

মোহে ছিলে শুধু ব্রজেরই নারী?

[এতক্ষণে সান্দীপনীর টনক নড়ে। সে ঢুলীকে প্রায় মুখ ভেংচিয়ে বলে :]

: চোপ! তোকে আবার ফোড়ং কাটতে কে বলেছে শুনি? যা বলবার আমি বলবো।

[সাধু! সাধু! তিনি এবার তাঁর দৃষ্টি মেলে দিলেন দূরে গোচারণক্ষেত্রে!]

দৃশ্য : ৩

[পর্দা জুড়ে একজোড়া হাত। পাঞ্জা লড়ছে। জোড় লড়াই। ক্যামেরা পেছিয়ে যাওয়ায় দেখা গেল একটা হাত কানুর, অন্যটা সুমঙ্গলেব। দুজনেই লড়ে যাচ্ছে। সমান সমান। নাকি সুমঙ্গলই জিতে যাচ্ছে। পর্দায় আবার একজোড়া হাত। কানুর গলা শোনা গেল:]

: তুই কি আর পাঞ্জা লড়বি রে!

: দেখাই যাক না।

[সুমঙ্গলের গলা। বোধ হয় জিতেই গেল। ঠিক তাই, সুমঙ্গলই জিততে চলেছে। সে কানুকে প্রায় কাবু করে হাসি হাসি মুখে বলে :]

: এবার সামলা কানু!

[কানু হারার মুখে। সে পেছনে তাকিয়ে দেখে সুবল দাঁড়িয়ে তার পেছনে, তটস্থ। কানু কানুই। সে সুবলেব দিকে চেয়ে চোখ টেপে।

সুবল বলাই তখন ওদের দুজনকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। কানুর ইশারায় সুবল হঠাৎই এবং আচমকা সুমঙ্গলের ঘাড়েব ওপর পড়ে। এই সুযোগে কানুও সুমঙ্গলের হাত মাটিতে কাত করে বলে ওঠে:]

: মাত্! মাত্!

: এটা হবে না। এই সুবলটা আমার পিঠের ওপর পড়ে গেল।

[বলাইও সুমঙ্গলের হ'য়ে বলে :]

: সত্যিই তো।

[কানু তখন তার ডান হাত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলে :]

: ওসব আমি জানি না, আমি মাত্ করে দিয়েছি। চোখে ধুলো পড়লো কি পিঠে মানুষ পড়লো, সে আমার দেখার দরকার নেই।

[সুমঙ্গলও ছাড়বার পাত্তর নয়। সে আবার তার হাত এগিয়ে দিয়ে বলে :]

: বেশ তো, তাহলে আরেকবার হোক।

[কানু উঠে দাঁড়িয়ে বলে :]

: সব সময় আরেকবার, আরেকবার। কাল তো দুবার গাছে চড়লি, তিনবার সাঁতার কাটলি—কেউ পারলি আমার সঙ্গে?

দৃশ্য : ৪

[গ্রামেরই একটা একচালা। তার সদর দরজার সামনে করতাল হাতে সাধু সান্দীপনী। সে করতালে বোল তুলে বলে :]

: জয় হোক! জয় হোক! রোহিণী মা বাড়ি আছো?

[রোহিণী হাতে এক মুঠো চাল নিয়ে বাইরে আসে। সঙ্গে ঋষি। রোহিণী সাধুর ঝুলিতে চাল দিয়ে বলে :]

: বলাই-কানুরা তো আপনার আশ্রমের সামনেই গরু চরাতে যায়। ওদের দিকে একটু নজর রাখবেন। বড় পাজি হয়েছে সব।

[সাধু হেসে বলে :]

: সবাই নয় গো, সবাই নয়। ওদের মধ্যে কানুটাই বেশি দুষ্টু হয়েছে।

: এই কানুর জন্যেই আমার বেশি চিন্তা। ওর যে কি হবে?

: তোমার চিন্তা তো হবেই। কিন্তু রোহিণী মা, তোমার মনের কথা মনেই রেখো। সব কিছু এখন বলবার দরকার নেই। এখন জানলে বড় কষ্ট পাবে কানু। সময় আসুক, তখন সবই প্রকাশ হয়ে যাবে।

[রোহিণী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে :]

: বড় চিন্তা হয় যে। এইভাবে আর কতদিন যাবে? কবে যে আমাদের দুর্দশা ঘুচবে?

: সময় আসবে, ঠিকই আসবে। অত্যাচার আর অনাচারের রাজত্ব কি চিরকাল চলতে পারে?

দৃশ্য : ৫

[পর্দায় খরাকবলিত রুক্ষ মাঠের দৃশ্য। তারই মধ্যে একজোড়া গলা শোনা গেল।]

: বৈশাখ চলে গেল, জ্যৈষ্ঠ এল। এর মধ্যে এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই।

: পরপর তিনবছর এরকম চলছে। মাঠ ঘাট ফেটে চৌচির।

[শতধা বিদীর্ণ মাঠের মধ্যেই দেখা গেল দুজনকে। বদন আর লোচন। তাদের চেহারা বিধ্বস্ত। মুখে চিন্তার ছাপ। পরনে শতছিদ্র ধুতি। এই খরা। গালেও খোঁচা খোঁচা দাড়ি বেশ কিছুদিন কামানো হয়নি। বদন বলে:]

: এমন খরা জন্মে দেখিনি। দেশ জুড়ে এবার আকাল পড়ে যাবে।

: শুধু ভাল আছে ঐ গোয়ালাপাড়ার লোকেরা। ওদের দুধ ঘি-র ব্যবসা ঠিকই চলছে।

: তাই বা কতদিন চলবে। লোকের পেটে ভাত না থাকলে আর ঘি ছানা খাবে কে?

: কেন? জমিদারবাবুরা খাবে, ওদের পুষ্যি পুত্তুররা খাবে।

: বৃষ্টির দেবতা আমাদের ওপর রুষ্ট হয়েছেন। আগে প্রতি বছর ইন্দ্রদেবতার পুজো হত কত ধুমধাম করে।

: আজকালকার ছেলেছোকরাদের আর পুজো-আচ্চায় মন নেই। কিসে যে দেশের ভাল হবে, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

: চলো না, একবার ঘোষপাড়ার দিকে যাই, যদি ইন্দ্র পুজোটা আবার চালু করা যায়।

: তাই চল।

দৃশ্য : ৬

[মাঠে গরু চড়ে বেড়াচ্ছে। রাখালেরা সামাল দিচ্ছে তাদের। দূর থেকে তাদেরি একজন, মদন, সামনে আসে। সুদাম দাঁড়িয়েছিল তার গরুর পাশে। সুদাম এবার মদনকে প্রশ্ন করে :]

: কি হয়েছে তোর? আজ চরাতে আসিস নি যে?

: আজ ভোরে আমাদের একটা গরু মারা গেছে। কানু বসেছিল তার গরুর পিঠে। সুদামের পাশেই। এবার সে প্রশ্ন করে মদনকে·

: সে কি! কি হয়েছিল?

: কাল সারাদিন ঠিকই ছিল। রাত্রে কিছু খেলো না। কোঁক কোঁক শব্দ করছিল। জাবরও কাটছিল না। মুখ দিয়ে সুতোর মত লালা ঝরছিল। ভোর রাতে শেষ পর্যন্ত মারা গেল।

[বলাই এসে যোগ দিয়েছে জটলায়। সে বলে .]

: এই অসুখটার নাম 'পশ্চিমে উড়ি'। কঠিন অসুখ। কিন্তু এখন মহাজনকে কি বলবি? সে বোধ হয় জমিদারের পেয়ারের লোক।

· ওখান থেকেই আসছি। মহাজন সব শুনে আমাকে বেদম পেটালো। যতই বলি আমার কোনও দোষ নেই...আপনাদের গরু চরিয়েই বেঁচে আছি, —নিজেদের থেকেও গরুদের আমরা বেশি যত্ন করি। কিছুতেই কিছু শুনলো না।

[কানু মনোযোগ দিয়ে সব শুনছে। মদন তখনও থামেনি]

: বললো,—আমরা নাকি চোর। দুধ চুরি করি।

সুদাম : আমরা চোর?

সুমঙ্গল : শেষ পর্যন্ত কি হলো?

মদন : কি আবার হবে। আমার বুড়ো বাপকে ধরে নিয়ে গেছে। গরুর দাম উসুল না হওয়া পর্যন্ত মহাজনের ক্ষেতে বেগার খাটতে হবে।

বলাই : কিন্তু কেন? তোদের দোষটা কোথায়?

মদন : আমরা যে চোর। তাছাড়া গরু নাকি মায়ের মতো। ওদের সেই মাকে আমরা নাকি যত্ন না করে মেরে ফেলেছি।

[কানু এবার হেসে ওঠে। হেসে হেসেই মোক্ষম কথাটি বলে :]

: ঠিকই বলেছে। গরুই ওদের মা। আর যাই হোক, এ শ্লা ঠিক কথা, এমন লোকেরা কখনও মানুষের বাচ্চা হতে পারে না।

: তাহলে এখন কি করি, কানু?

: কি আবার করবি। সব তছনছ করে না ফেলা পর্যন্ত কিস্‌-স্যু হবে না!

দৃশ্য : ৭

[দুপুর গড়িয়ে বিকেল। এক বৃদ্ধ নারী বাড়ির দাওয়ায় বসে। শূন্য দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে। যেন মরা ইলিশের চোখ। আর এক বৃদ্ধাকে দেখা গেল। সে তার লাঠিতে ভর দিয়ে ক্যামেরার দিকেই এগিয়ে আসছে। নিরুদ্দেশভাবে। কোনও এক ফাঁক দিয়ে দেখা গেল রাস্তার ধারেই এক কুঁড়েঘরের পাশে কাঁদছে একটি শিশু। রুগ্ন এক বৃদ্ধ, মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি মুখে হাত দিয়ে হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সামনের শুকনো খটখটে মাঠের দিকে। আদিগন্ত বিস্তৃত ধূসর গ্রামাঞ্চল। এই সময়ে নারীকণ্ঠে শোনা গেল:]

শোন শোন মা লক্ষ্মী, দোষ নিও না।

[ভাঙা কুঁড়ে ঘরের ভেতর থেকে দেখা যাচ্ছে বিধ্বস্ত গ্রাম। নারী কণ্ঠে গান :]

শোন শোন, মা লক্ষ্মী, দোষ নিও না।

—মাগো দোষ নিও না।

[দুজন মবদ হাতুড়ি পিটিয়ে পাথর ভাঙছে।]

মা লক্ষ্মী, মা লক্ষ্মী দোষ নিও না।

নিদাঘ তপ্ত আকাশে উদ্দাম উল্লাসে উড়ছে

অফুরন্ত খাবারের আয়োজনে তৃপ্ত শকুনেরা

[একক নাবীকণ্ঠ পরিণত হল সমবেত সঙ্গীতে।]

শোন শোন মা লক্ষ্মী, দোষ নিও না।

মাগো দোষ নিও না।

[কোন এক গৃহবধূকে দেখা গেল মাটির উওপ্ত হাঁড়ি থেকে শেষ ভাতটুকু খুঁটিয়ে খুঁটিযে বার করছে: যতটুকু পাওয়া যায়, যেটুকু পাওয়া যায়। তাই সে রাখছে এনামেল করা থালায়। এবার বধূটির মুখে। একমুঠো ভাত সে মুখে নিল। আর নিল লঙ্কা। কাঁচা লঙ্কা। ক্যামেরা থালায়। থালায় কিছু ভাত আব শুকিয়ে খাক্ হয়ে যাওয়া কাঁচা লঙ্কা। এবার দেখছি ললিতাকে। ললিতা নাটমন্দিরের মেঝে জল দিয়ে পরিষ্কার করছে। সে গাইছে]

ধুয়ে দিলাম পা দুখানি নিজের চক্ষের জলে।

[রাধা ছিল কাছাকাছি। সে একটা নারকেল ভেঙে দেবীর পদতলে তার জলে ঢেলে দিয়ে গাইল]

মুছে দিলাম যতন করে বুকেরই আঁচলে।

[চন্দ্রাবলী আলপনা দিচ্ছিল। সে গাইল .]

পেতে দিলাম সাধের আসন স্বপন দিয়ে বোনা।

[গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে এবাব সবাইকেই দেখা যাচ্ছে একসাথে। ললিতা-রাধা-চন্দ্রাবলী। তারা গাইছে]

শোন শোন মা লক্ষ্মী, দোষ নিও না।

মাগো, দোষ নিও না।

[শীণা রুগ্না এক জননী তার শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে। ক্ষুধার্ত শিশু তার দাবী পয়োধরের শেষ বিন্দু। নিঃসহায় মৃতপ্রায় মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সে শুষে নিচ্ছে তার জীবনীশক্তি! কতটুকু বোঝে সে! ঐ তো, এবার দেখতে পাচ্ছি, একদল ছেলেকে। তারা বাঁশের খাটিয়ায় বয়ে নিয়ে চলেছে—চলেছে শ্মশানের দিকে। মৃতদেহ আন্দোলিত হচ্ছে তাদের কাঁধে। বেহালার ছড়ে করুণ মূর্চ্ছনা। আরেক কুঁড়েঘরের উনুন জ্বলছে। তার লেলিহান শিখা বৃথা প্রত্যাশায় দুর্বার। গান শোনা গেল :]

তোমার দয়ায় আঁধার ঘরে জ্বলে চাঁদের বাতি।

[বৃন্দা ছোট শরায় কিছু দুধ নিয়ে উনুনে চড়ায়। মাঝে মাঝে তাতে ফুঁ দেয়। মুখে জমে ওঠে বিন্দু বিন্দু ঘাম। গান শোনা যাচ্ছে :]

সেই আশাতেই আমরা সবাই খাটি দিবস রাতি

[বিশাখা বসে বসে ননী তৈরি করছে। গান :]

তবু কেন ভুলে যাও মা, এই গাঁয়ে আসো না।

[রাধা তার কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে আসে। তার মাথায় ননী ঘিয়ের হাঁড়ি। গান :]

শোন শোন মা লক্ষী, দোষ নিও না,

মাগো দোষ নিও না।

[একদল মেয়ে। তারাও চলেছে হাটে। তাদেরও মাথায় হাঁড়ি। শীর্ণ এক কাঠুরে কাঠ কাটছিল। সে এক ঝলকে দেখে মেয়ের দলকে। তার পাশেই বসে আছে তারই রুগ্ন সন্তান। মেয়েরা সারি দিয়ে চলেছে আমবাগানেব ভেতর দিয়ে। সবার সামনে বৃন্দা। সে গাইছে :]

অন্নচিন্তা বড় চিন্তা দুমুঠো যেন জোটে

ঘরে যেন সবার মুখে একটু হাসি ফোটে।

আর তো কিছু চাই না মাগো, চাই না রূপো সোনা।

[অন্য মেয়েরাও এবার গানে যোগ দেয়।]

শোন শোন মা লক্ষী, দোষ নিও না।

মাগো দোষ নিও না।

[কানু শুয়েছিল আমবাগানেরই এক গাছের নীচে। গান শুনে উঠে বসে তাকিয়ে দেখে. পরম রমণীয়রা চলেছে। চলেছে নদীর দিকে। ওপারের হাটে। ললিতা গাইছে :]

তোমার রূপের মতন ফসল ছিল জমিন ছেয়ে।

কোথায় তুমি লুকিয়ে গেলে, আকাল এলো ধেয়ে।

রাজার ঘরে বন্দী হলে, আমরা বুঝি কেউ না?

[কানু তাকিয়ে আছে। গান শুনছে। সবাই এবার গায় :]

শোন শোন মা লক্ষী, দোষ নিও না।

মাগো দোষ নিও না।

[মেয়ের দল দূরে সরে গেছে ঘাটের কাছে। গানের শেষ কটি লাইন মিলিয়ে যায় ধীরে :]

মা লক্ষী, মা লক্ষী দোষ নিও না,

শোন শোন মা লক্ষী, দোষ নিও না।

মাগো দোষ নিও না।

[কানু কাছাকাছি কাউকে জিগ্যেস করে :]

: গোপপাড়ার মেয়েরা হাটে যাচ্ছে, নারে?

সুবল : বলাই ছিল অদূরেই। তারা একে একে উত্তর দেয়

: হ্যাঁ, আজ হাটবার না!

: তা তুই এখন আবার হাটে যাবি নাকি?

[কানু উঠে দাঁড়িয়ে বলে :]

: তাই ভাবছি বলাইদা, একবার ঘুরে এলে হয়।

দৃশ্য : ৮

[নদীর এপার থেকে দেখা যাচ্ছে ওপারে একদল লোক নৌকো থেকে ঘাটে নামছে। তারা নেমে চলেছে হাটের দিকে।

কানুও বসে নেই। সে তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে নামলো আর এক নৌকো থেকে। ওরাও যাবে হাটে। পেছন থেকে বাধ সাধলো মাঝি :]

: কি হলো, পালিয়ে যাচ্ছিস যে? পারানি দিয়ে গেলি না?

[মাস্তান কানু রুখে দাঁড়িয়ে বলে তার সঙ্গীদের :]

: আমাদের কাছে পয়সা চাইছে। ওর সাহস তো কম নয়।

[তারপর সরাসরি মাঝিকে বলে :]

: তোমার নৌকো ডুবিয়ে দেব কিন্তু।

[সুমঙ্গল মাঝিকে শুনিয়ে দেয় :]

: সেদিন তোমার নৌকো মাঝনদীতে ডুবে গিয়েছিল না। সেই নৌকো কারা তুলে দিয়েছিল? এর মধ্যে ভুলে মেরে দিয়েছ?

দৃশ্য : ৯

[হাট। নরক-গুলজার। বেচা-কেনা চলছে। দরাদরি হচ্ছে। সওদা চলে যাচ্ছে এ হাত থেকে ও হাতে।

এরি মধ্যে দেখা গেল গোপ-পাড়ার মেয়েদের। তারা এক দোকানীকে বিক্রি করে দিচ্ছে ঘি-ননী—যা তারা এনেছে। দোকানের আসল মালিক ক্যাশবাসকো সামনে নিয়ে বসে। তার পাশে বসে আরেকজন তাবিয়ে তারিয়ে মেয়েদের দেখছেন আর তার সাথে প্রকৃত সমঝদারের মত হুঁকোয় টান দিচ্ছেন।

মালিক তার বন্ধুকে বলে :]

: গোপপাড়ার মেয়েগুলো মহাচালু। মালপত্তর বেচবার জন্যে সব সময় শুধু বাড়ির সুন্দরী ডবকা বৌদেরই পাঠায়!

[বৃন্দা দোকানের সহকারীর সাথে ঝগড়ায় নামে :]

: এই, এই! আবার পাল্লা ঝোঁকাচ্ছিস! আমার চোখকে ফাঁকি দিবি!

: কোথায় ঝোঁকালাম। এই দ্যাখ না।

[ললিতাও চুপ থাকার মেয়ে নয়। সে বলে :]

: আমরা ঠিকই দেখেছি। আমাদের দিকে ড্যাবড্যাবিয়ে না থেকে পাল্লার দিকে ভাল করে দ্যাখ।

[অন্য মেয়েরা খলখলিয়ে হেসে ওঠে। একমাত্র রাধা ছাড়া। রাধার পাশেই আরেক দোকানী তার পসরা বিক্রি করছে। মালিক এবার বলে :]

: মেয়েগুলো দেখতে সুন্দর হলে কি হবে, জিভে কি ধার।

[সমঝদার হুঁকোয় টান দিয়ে বলে :]

: আহা, অমন সুন্দরীদের কাছে ঠকেও আনন্দ!

[হরি তো হ, কানু এসে হাজির হয় সেখানে। সঙ্গে তার সুবল-সুদাম-সুমঙ্গল। বিশাখা কানুকে জিগ্যেস করে :]

: ছানা কিনবে নাকি গো?

[কানু এক নজর বিশাখাকে দেখে পাকা ওস্তাদের মত চোখ মারে আর,—হাসতে হাসতে চলে যায়। বিশাখা বিষিয়ে বলে :]

: আ, মরণ আমার!

[সান্দীপনী সাধু মজা দেখছিল। এবার দর্শকদের বলে :]

: দেখলেন! ছিঁচকে চোর হয়ে গেছে ছেলেটা। আবার হতভম্ব পেয়ারাওলা:

: জিনিষ কিনলে দাম দিতে হবে না?

: কিনলাম কোথায়? তুমিই তো বললে খেয়ে দেখতে, তাই খেয়ে দেখলুম। এও ঠিক, তুমি সত্যিই ঠিক কথা বলেছ।

[তারপর বন্ধুদের সাক্ষী মেনে বলে :]

: তোরাই বল, দামের কথা একবারও বলেছে?

সুদাম : না, একবারও বলেনি।

সুবল : আমরা দামের কথা একবারও শুনিনি।

[এবার পেয়ারাওলা উঠে দাঁড়ায়। রুখে দাঁড়ায়। কানু বলে :]

তাছাড়া, জিগ্যেস করলুম, আরেকটা করে নেব? তুমি নিজেই বললে নিতে।

: আমি কি দানছত্তর খুলে বসেছি নাকি? সবাইকে বিনি মাগনায় পেয়ারা খাওয়াবো! ওসব চালাকি ছাড়ো! দাম দিয়ে যাও।

সুমঙ্গল : ফের দাম দাম করছো। ভারী তো দাম!

কানু : ঠিক আছে। সামনের হাটবার এসে দাম দিয়ে যাবো।

[সকলে যাবার পথে পা বাড়ায়। পেয়ারাওলা সক্রোধে ক্ষেদোক্তি করে :]

: পয়সা নেই, তবে পেয়ারা খাওয়ার শখ কেন? যত্তসব চোরের দল!

[কানু ঘুরে দাঁড়িয়ে শাসায় :]

: এই, ওকথা বলবে না। তাহলে মালশুদ্ধ পুরো বড়িটাই তুলে নিয়ে যাব।

[পেয়ারাওলা এবার ঝুড়ি থেকে তুলে নেয় পেয়ারাকাটার ছুরি। স্বয়ং কানুকে তুড়ি মেরে বলে :]

: নাও দেখি, কত বড় হিম্মৎ!

: পারবে? গায়ের জোরে পারবে?

[সুবল সুদাম সুমঙ্গল আর কানু চারদিকে পেয়ারাওলাকে ঘিরে ধরে। কানু সামনাসামনি। সুবল মন্তব্য করে :]

: লোকটার সাহস তো কম নয়?

সুমঙ্গল : হাতটা মুচড়ে ভেঙ্গে দেব নাকি?

সুদাম : ছেড়ে দে, ছেড়ে দে। মরে যাবে একেবারে।

[কানু আরও দু'পা এগিয়ে আসে পেয়ারাওলার দিকে। চোখে জ্বলছে আগুন। পেয়ারাওলা বেসামাল। যা হয়ে থাকে, লোক জমে গেছে চারপাশে—তামাশা দেখতে। কানু পেয়ারাওলার চিবুক নাড়া দিয়ে বলে :]

: ও রকম যখন তখন ছুরি তুলে কথা বলতে নেই, বুঝলে?

[পেয়ারাওলা ছুরি হাতছাড়া করে আর হাতজোড় করে নিরুপায় নরম গলায় বলে :]

: আমার ঘাট হয়েছে, মাপ চাইছি। তোমাদের দাম দিতে হবে না।

সুবল : আমরা গরু চরাই, পয়সা পাবো কোথায়?

[মাঝে মধ্যে একটু ভালমন্দ জিনিষ খেতে হাটে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে সাধু সান্দীপনী। সঙ্গে তার দুই চ্যালা—ঢুলী আর কাঁসিদার। এগিয়ে আসছে ক্যামেরার দিকে। এক দোকানী পেয়ারা বিক্রি করছে। সে হাঁকছে :]

: নিয়ে যান... নিয়ে যান... দারুণ পেয়ারা মুখে দিয়ে দেখুন—একেবারে রসকদম্ব।

[আবার কানু। সে এসে দাঁড়ায় পেয়ারাওলার কাছে।]

: খেয়ে দেখুন না... একেবারে রসকদম্ব।

: তাই নাকি? খেয়ে দেখবো?

[কানু ঝুড়ি থেকে বেছে বেছে বার করে যথার্থই রসকদম্ব চার চারটে পেয়ারা। সুবল, সুদাম আর সুমঙ্গলকে তিনটে দিয়ে নিজে কয়েক কামড় দিয়ে তৃপ্তিতে বলে :]

: ঠিকই বলেছে। খুব মিষ্টি। আরেকটা করে নেব নাকি?

[চটজলদি এমন খরিদ্দার পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা। খুশিতে পেয়ারাওলা বলে :]

: নিন না। এ হলো কাশীর পেয়ারা। সব বাছাই করা মাল।

[কানু এবার আবও চারটে রসকদম্ব বেছে সাঙ্গপাঙ্গদের তার ভাগ দিয়ে উল্টোপথ ধরে বলে :]

: চল।

[পেয়ারাওলা অবাক। বলে কি!]

: ওকি? দাম দিয়ে যাও।

[কানু ঘুরে দাঁড়ায়। খুব সহজ ভাবেই, সরল শিশুর মতই পাল্টা প্রশ্ন করে :]

: দাম? দাম দিতে হবে?

[ইচ্ছে হয়,—এই আর কি।]

: বলছি তো, দাম দিতে হবে না।

[পেছন থেকে সুমঙ্গল বলে, কি আব করা :]

: চল, চল। ও যখন দাম নেবেই না বলছে। তখন আর আমরা জোর করি কেন?

[কানুও কি কম! সে এবার আদুরে গলায় বলে :]

: বিনে পয়সায় যখন, তখন আরেকটা করে হবে নাকি?

[সরবে হেসে ওঠে। কৌতূহলী তামাসা দেখার সকলে। দৃশ্যান্তর।]

দৃশ্য : ১০

[নদী বয়ে চলেছে। তার কুলকুল শব্দ। পশ্চিমে অস্তগামী সূর্য। নদীতে পালতোলা নৌকো—মাঝদরিয়ায়। তাতে মধ্যমণি কানু। তাকে ঘিরে সুবল সুদাম সুমঙ্গল। সকলে রসকদম্বের, যা হওয়া উচিত, সদ্ব্যবহারে বিভোর। মাঝি বৈঠা টানছে। কানুর পেয়ারা খতম। ও ঝুলি থেকে বার করে ওর সাধের বাঁশী। বাঁশীতে ফুঁ দেয়। মিষ্টি সুরে. বলা চলে, সুরভিত হয় চারদিক। সুদাম, সুবল, সুমঙ্গলও এবার তাদের বাঁশী বার করে। কানু এবার তার বাঁশী থামায়। সুবল সুদাম সুমঙ্গল একসাথে বাঁশী বাজানো শুরু করে। বেসুরে। তারা বাঁশী থামায়। কানু মুচকি হেসে আবার তার বাঁশীতে ফুঁ দেয়। সুরে বিভোর মাঝি বৈঠা টানতে থাকে। দৃশ্যান্তর।]

দৃশ্য : ১১

[রাত্রি। কানুর ছোট্ট কুটীরে লম্ফ জ্বলছে। নন্দ চারপাইয়ায় বসে নিজেকে বাতাস করছে হাতপাখা দিয়ে। কিছুক্ষণ পর মেঝের দিকে চোখ নামায়। সেখানে সটান শুয়ে কানু। গভীর ঘুমে মগ্ন। যশোদা কানুর পাশে বসে তাঁর আঁচল দিয়ে কানুর শরীরে জমে ওঠা ঘাম মুছিয়ে দেন। নন্দ ঠাট্টা করে বলেন :]

: তোমার যত্নের চোটে ছেলেটার ঘুম ভেঙ্গে যাবে এবার।

[যশোদা মৃদু হেসে বলেন :]

: এখন ডাকাত পড়লেও ছেলের ঘুম ভাঙবে না। সারাদিন যা বদমাইসি করে বেড়ায়!

[যশোদা কানুর মাথায় চুলে হাত বুলিয়ে দেন। নন্দ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন হাতপাখা চালাতে চালাতেই বলেন :]

: কানুর জন্যে বড় চিন্তা হয়। যা বাড়বাড়ন্ত। জমিদারের নজরে পড়লে ওকে ঠিক বেগার খাটাতে নিয়ে যাবে।

: ওসব অলক্ষুণে কথা বোল না। আমার প্রাণ থাকতেও আমি কানুকেমাটি কাটতে পাঠাতে পারবো না।

শুধু কি মাটি কাটা। পাথরও ভাঙতে হয়।

[কানু ঘুমের মধ্যেই একটু এপাশ ওপাশ করে। যশোদা কানুর গায়ে হাত রেখে বলেন :]

: ভগবান ওকে রক্ষা করবেন।

[নন্দ হাতপাখা থামিয়ে, যেন হঠাৎই কিছু মনে পড়ে গেছে এমনভাবে বলেন :]

: যাই হোক। তোমাকে বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম। পরশুদিন আশপাশের সবগ্রাম মিলিয়ে ইন্দ্রপুজো করা হবে। কিছু নাড়ুটাড়ু বানিয়ে রেখো।

দৃশ্য : ১২

[ভোর হয়েছে গোপ পাড়ায়। মেয়েরা শাঁখ বাজিয়ে স্বাগত জানাচ্ছে জবাকুসুম শঙ্কাসং দীপ্তদ্যুতি সূর্যদেবকে।

মন্দিরে দেবীর পায়ের কাছে রাখা আছে জলপূর্ণ ঘট, কোষাকুষি, ফলফুল সাজানো কুলো। কাঁসর ঘণ্টা শোনা গেল।

মেয়েরা উলুধ্বনি দিয়ে দেবীকে বরণ করল। মেয়েদের মধ্যে আছে রাধা, বৃন্দা, ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী, মন্দাকিনী ও আরও পনেরো-কুড়ি জন গ্রামের মহিলা। তাদের কেউ শাঁখ বাজাচ্ছে, কেউবা কাঁসরঘণ্টা।

দেবী বন্দনা শেষ করে মেয়েরা গ্রামের পথে নেমে আসে। বৃন্দা সবার আগে। তার মাথায় জলে পরিপূর্ণ কলসী। বৃন্দা ক্যামেরার দিকে গান করতে করতে এগিয়ে আসে—ক্যামেরা পেছোতে থাকে।]

সাধের বোন গো, মেঘারানি
কোথায় তোমার ঝরঝরানি?
সাধের বোন গো মেঘারানি,
কোথায় তোমার ঝরঝরানি?
ছোট ভুঁইতে চিনচিনানি
বড় ভুঁইতে আজলা খানিক

[মেয়েরা একে একে এগিয়ে যায়। তাদের মাথায় ইন্দ্রপুজোর নানারকম উপচার। বৃন্দা গাইছে :]

মেঘারানি, ও মেঘারানি
মেঘারানি, ও মেঘারানি।

[এবার অন্যান্যরাও অংশ নেয় গানে :]

সাধের বোন গো, মেঘারানি
কোথায় তোমার ঝরঝরানি?
সাধের বোন গো মেঘারানি,
কোথায় তোমার ঝরঝরানি?

[মেয়েরা গ্রামের মাঠের দিকে এগিয়ে আসে।]

ছোট ভুঁইতে চিনচিনানি
বড় ভুঁইতে আজলা খানিক।
মেঘারানি, ও মেঘারানি
মেঘারানি, ও মেঘারানি

[ঘোষপাড়ার ভেতব দিয়ে যাবার সময় যশোদা ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে উলুধ্বনি দেন। তাঁর পেছনে ঘোষপাড়ার অন্যান্যবা। ঐ একই পথে এবার আসে বিদ্যা—উলুধ্বনি দিয়ে জল ছিটোতে ছিটোতে। ঘোষপাড়ার আরও অন্যান্যরা এসে জমা হয়।

তাদের সবাইকে ছাপিয়ে পর্দায় দেখা যায় সমগ্র ঘোষপাড়াকে। দূরে মাঠে ইন্দ্রপুজোর আয়োজন সম্পূর্ণ। মাস্তুলে উড়ছে ইন্দ্রের বিজয়কেতন। সবাই এগিয়ে যায় সেদিকে। পুরুষেরাও কেউ বসে নেই। তারাও অংশ নেয় ইন্দ্রপূজায়। নদীর পার ধরে তারাও এগিয়ে যায় মাঠের দিকে।

ক্যামেরা ফিরে আসে ললিতায়। ললিতা গান গাইতে গাইতে চলেছে :]

মেঘারানির ঘরখানি পাথরের মাঝে।
মাঝদুপুরে টাপুর-টুপুর
ঝমঝমানি সাঁঝে।

[আমবাগানের ডালপালার ফাঁকফোকর দিয়ে মেয়েদের দলকে দেখা যাচ্ছে। তাবাও সুর করে গায়:]

মেঘারানির ঘরখানি পাথরের মাঝে।
মাঝদুপুরে টাপুর-টুপুর
ঝমঝমানি সাঁঝে।

[নির্মেঘ নীল আকাশ। আর তারই মাঝে ইন্দ্রের বিজয়কেতন। ললিতা গায় :]

কালা মেঘ, ধলা মেঘ, বাড়ি আছো কি?

গোলায় আছে বীজ ধান, বুনতে পারো কি?

[বিশাখা এবার এগিয়ে এসে শেষ কথাটি গায় :]

বুনতে পারো কি?

[গোপপাড়ার মেয়েরা সকলে মিলে গায় :]

কোথায় তোমার ঝরঝরানি

ছোট ভুঁইতে চিনচিনানি

মেঘারানি, ও মেঘারানি

মেঘারানি, ও মেঘারানি

[ক্যামেরা কেতন থেকে নেমে আসে মাস্তুলের পাদদেশে। সেখানে সংস্থাপিত হয়েছে পবিত্র জলপূর্ণ কলসী ও অন্যান্য সামগ্রী। দুবার উলুধ্বনি হয়। পূজা প্রাঙ্গণ। পুরোহিত তাঁর পূজার আয়োজন সম্পূর্ণ করছেন। তাঁকে সাহায্য করছেন আয়ান ঘোষ আরও দু-একজন। কেউবা মাটিতে পুঁতছে ধূপবাতি। কেউবা বারকোষে সাজাচ্ছেন মিষ্টান্ন ও অন্যান্য ফল।

গ্রামের সমস্ত মানুষ এসে যোগ দিচ্ছে এই ইন্দ্রপূজায়।

বিশাখাকে দেখা যাচ্ছে। সে গান গাইছে :]

সাধের বোন গো মেঘারানি

বাতাস নিভায় পিদিমখানি।

[কানু তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে মাঠের এককোণে বসে। এতক্ষণে তাদের দেখতে পাওয়া গেল। তারা গান শুনছে।]

সাধের বোন গো মেঘারানি

বাতাস নিভায় পিদিমখানি।

খালে বিলে খলখলানি,

ছল ছল করে কলসখানি।

[নানাদিক থেকে গ্রামের লোকেরা আসছে। একদিকের পথ ধরে আসছে গোপপাড়ার মেয়েরা আর অন্যদিক থেকে ঘোষপাড়ার।]

মেঘারানি, ও মেঘারানি,

মেঘারানি, ও মেঘারানি,

সাধের বোন গো মেঘারানি

কোথায় তোমার ঝরঝরানি

[গানের ধ্বনি আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায় দূরে। কানু তার দলকে জিগ্যেস করে :]

: বেশ তো কয়েক বছর পুজোটুজো বন্ধ ছিল, আবার এসব শুরু হলো কেন?

[সুদাম দিব্যি ফোড়ং কেটে জবাব দেয় :]

: সবাই বলাবলি করছে যে ইন্দ্রদেব রেগে গেছেন। পুজো না দিলে তিনি বৃষ্টি দেবেন না।

[ইন্দ্র দেবে না বৃষ্টি! কানু হেসে ওঠে সুদামের কথায়। সে বলে :]

: দারুণ মজার কথা তো? পুজো দিলেই বৃষ্টি হবে? কচু আর ঘেঁচু হবে। তার চেয়ে সবাই মিলে নদী থেকে খাল কেটে আনলে সারা বছরই চাষবাস করা যেত। তা চল তো দেখি, পুজো কেমন জমেছে। দেখেশুনে তো মনেই হচ্ছে না যে গ্রামে আকাল পড়েছে।

[পূজাপ্রাঙ্গণ। গ্রামের লোকেরা মাঝে মধ্যে উঠে এসে পুরোহিতকে প্রণাম করে প্রণামী দিচ্ছে থালায়। পুরোহিত নির্বিকার। তিনি বাঁ হাতে হাতপাখায় হাওয়া খাচ্ছেন, ডান হাতে এধার ওধার প্রয়োজনমত চুলকে নিচ্ছেন, নতুবা তাঁর টিকিকে সুবিধেমত পাক দিচ্ছেন। আর মনে মনে হিসেব কষছেন : কত পড়লো প্রণামীতে।

এমন সময়ে সেখানে হাজির হয় সদলবলে কানু। কানু জিগ্যেস করে বলাইকে :]

: ঐ পয়সাগুলো কে পাবে? ইন্দ্র দেবতা, না ঐ বামুন পুরুত।

: দক্ষিণার পয়সা পূজারি বামুনই পায়।

: বাঃ, বেশ মজা তো! আমিও পূজারি হতে পারতুম।

: তুই কি বামুন নাকি?

: এই সুবল, পুরুতকে ফুরুৎ করে জিগ্যেস করে আয়তো, যে আকাশের ঠাকুর দেবতার কি জাত? তারাও কি বামুন। না হলে, শুধু বামুনরা ডাকলেই দেবতারা শুনবে, আমরা ডাকলে শুনবে না পুরোহিত সমবেত সবাইকে জানায় :

: সকলেরই দক্ষিণা দেওয়া হয়ে গেছে তো? এবার সবাই হাত জোড় করে বসে পড়ো। আমি এবার ইন্দ্রদেবকে আহ্বান করবো।

[পুরোহিতের সহকারী প্রণামীর টাকাপয়সা তুলে নিতে ব্যস্ত। চারপাশে অন্য সকলে হাত জোড় করে বসে পড়ে। পুরোহিত এবার তাঁর নয়নযুগল মুদ্রিত করে ইন্দ্রদেবকে আহ্বান জানান তাঁর মন্ত্র মারফৎ। থাবকোষে প্রভূত এবং বিবিধ মিষ্টান্ন দেখে কানু বলে :]

. কত ভাল ভাল খাবার জিনিষ দেখেছিস। দেখেই আমার ক্ষিদে বেড়ে যাচ্ছে।

[সুদাম চোখ বুজে দাঁড়িয়েছিল করজোড়ে। কানুর কথায় তাকে জবাব দেয় :]

: তুই কি রে! দেবতার ভোগে লোভ করতে নেই।

: একলা একজন দেবতা অত খাবার খেতে পারবে? তাছাড়া যদি বৃষ্টি নেমে যায়, খাবারগুলো নষ্ট হয়ে যাবে না?

[বলাই এবার উত্তর দেয় :]

: চুপ কর কানু, আস্তে।

[সামনে থাবকোষে মিষ্টান্ন। কিন্তু পুরুত মশাইয়ের মন্ত্র যেন আর শেষ হতে চায় না। কানু বলে:]

: আর কতক্ষণ রে বাবা। ইন্দ্র কখন আসবে রে?

[কথায় চিঁড়ে না ভিজুক, পুরুতমশাই ভিজলেন। তিনি তাঁর মন্ত্রে ক্ষান্তি দিয়ে কলসীর জল ঢেলে দিলেন ইন্দ্রের বিজয়কেতনের নিচে এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন। তাঁর দেখাদেখি অন্যেরাও দিব্যি চোখ বুজে প্রণাম জানালেন ইন্দ্র দেবতাকে। কানু একটু এধার-ওধার দেখে এগিয়ে যায় মাস্তুলের তলায়। এক খাবলায় তুলে নেয় মুঠো ভর্তি মিষ্টি এবং তা মুহূর্তেই চালান করে দেয় মুখে। সুবল সুদাম চোখ খুলে কানুর কাণ্ডকারখানা দেখে ভয় পায়, বলাই লজ্জিত। কানু আবার আর এক খাবলা চালান করে। রাধা আর বৃন্দা কানুর কাণ্ড দেখে অবাক! গাঁয়েরই

একজন, বদন, কানুকে চেঁচিয়ে বলে :]

: ওকি হচ্ছে কানু? সব পুজো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে।

: আমি এসব পুজোফুজো মানি না।

[গ্রামের সকলে সন্ত্রস্ত। তারা রুখে দাঁড়ায়। নন্দ বলেন :]

: কানু! কি সর্বনাশ! ওকি করছিস?

[সমবেত জনতায় শুরু হয় মৃদু গুঞ্জন। পুরোহিত ঘোষণা করলেন :]

: একি হলো? পুজো যে শেষ করতে পারলাম না।

[কানু তার জবাব দেয় :]

: রাখো তোমার পুজো। এই আমি ইন্দ্রের পতাকা তুলে ফেললাম। ইন্দ্র যদি রাগ করে বৃষ্টি না দেন, আমরা নদী থেকে খাল কেটে জল নিয়ে আসব। সুবল, সুদাম, সুমঙ্গল, সব রাখালেরা, আমি কানু হুকুম দিচ্ছি, তোমরা চলে এসো, যার যত ইচ্ছে খাবার খাও।

[কানুর কথায় চারদিকে হুল্লোড় লেগে যায়। মেয়েরা ভয় পেয়ে পালাতে শুরু করে। রাধা তার দূতী বৃন্দাকে জিগেস করে :]

: হ্যাঁরে বৃন্দা, কে এই কানু?

[বৃন্দা রাধার কানে কানে উত্তর দেয়—সভয়ে। আয়ান ঘোষ নন্দর সামনে এসে দাঁড়ায়। চোখ রাঙায়। মাতা যশোদা দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। রোহিণীও আসে। বলাইও যোগ দেয় এদের সাথে।

সাধু সান্দীপনী ঘাপটি মেরে ছিলেন এদেরি মাঝখানে। কানুকে একপলকে আপাদমস্তক দেখে দর্শকদের জানান :]

: কি বুঝলেন? সর্বনেশে ডাকাত হয়েছে ছেলেটা!

দৃশ্য : ১৩

[গভীর রাত্রি। প্রদীপ জ্বলছে শামাদানে। যথারীতি কানু ঘুমিয়ে আছে মেঝেতে। দরজায় নন্দর গলা শোনা গেল :]

: কানু!

[নন্দ এবার দরজা থেকে ভেতরে ঢুকে আবার ডাকলেন :]

: কানু!

[কানু ঘুমিয়ে। নন্দ কানুর দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। যশোদা উঠানে বসে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। নন্দ এসে যশোদার পাশে বসে বললেন :]

: সারাদিন পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছে। হারামজাদা কোন ফাঁকে যে এসে শুয়ে পড়েছে, টেরও পাইনি। ...সত্যি ঘুমিয়েছে, না মটকা মেরে পড়ে আছে কে জানে।

[যশোদা আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বলেন :]

: আজ থাক। আজ ওকে আর কিছু বলো না। ছেলেমানুষ, ঘুমিয়ে পড়েছে।

: মোটেই ছেলেমানুষ নেই এখন। যথেষ্ট বড় হয়েছে। ওকে এবার শাসন করা দরকার।

: ও বড় জেদী ছেলে। বকাঝকা করলে যদি রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। আর ফিরে না আসে?

: তোমার জন্যেই তো ছেলে এত আস্কারা পেয়েছে। আদর দিয়ে দিয়ে ছেলেকে একেবারে মাথায় তুলেছ। অন্যায় করলে তার শাস্তি পাবে না? আজ এতবড় একটা সাংঘাতিক কাণ্ড করলো?...

[নন্দর কথা তখনও শেষ হয়নি। তারই মাঝখানে দূর থেকে ভেসে এল মেঘের গর্জন। নন্দ হতচকিত। যশোদাও অবাক। তাঁরা দুজনেই চোখ তুলে তাকালেন আকাশের দিকে। যশোদা উঠে দাঁড়ায়। উঠে দাঁড়ায় নন্দও। অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। মেঘাবৃত আকাশ থেকে অঝোরে শুরু হয়েছে বারিবর্ষণ। বৃষ্টি। বহু আকাঙ্ক্ষিত বৃষ্টি! যশোদার মুখ উদ্ভাসিত। আনন্দে। নন্দর মুখ উদ্ভাসিত। আনন্দে। পরমানন্দে।]

: বৃষ্টি! ...আজই বৃষ্টি নামলো।

[নন্দ ধীর পদক্ষেপে উঠান থেকে সিঁড়ি ভেঙ্গে নেমে আসেন আঙ্গিনায়। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আকাশে দু'বাহু তুলে আবাহন করেন বৃষ্টিকে। যশোদা নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। আঙ্গিনায় নেমে এসে নন্দকে জড়িয়ে ধরে কল্যাণী সুখদায়িনী স্ত্রীর মতই অনুযোগ করে বলেন :]

: ওগো, কি করছো কি? বৃষ্টিতে ভিজছো কেন? বৃষ্টিতে ভিজছো কেন?

[নন্দও গভীর আবেশে জড়িয়ে ধরেন যশোদাকে। এবং কম্পিত অথচ ধীর, সুতীব্র আবেগে অথচ ভাবলেশহীন, গম্ভীর অথচ কৌতুকে উচ্চারণ করেন :]

: তুমিও তো।

দৃশ্য : ১৪

[বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। এখন রাত্রি। রোহিণী বলাইকে ঘুম থেকে ঠেলে তোলে :]

: বলাই! ও বলাই! ওঠ বাবা! দ্যাখ দ্যাখ বৃষ্টি নেমেছে দ্যাখ। ওঠ! দ্যাখ, কি জোরে বৃষ্টি হচ্ছে দ্যাখ!

[বলাই চোখ কচলে ঘুম থেকে ওঠে। আনন্দের আতিশয্যে রোহিণী আপ্লুত :]

: বৃষ্টি নেমেছে রে বলাই! ইন্দ্রপুজো লণ্ডভণ্ড হলেও বৃষ্টি নেমেছে দ্যাখ।

[বলাই-এর কাঁচাঘুম সম্ভবত ভেঙ্গেছে। তার মাথায় খাল কাটার দুর্ভাবনা। তবু সে বলে :]

: বৃষ্টি না হলে কানুকে নদী থেকে খাল কেটে জল আনতে হোত। ব্যাটা বেঁচে গেলো।

দৃশ্য : ১৫

[রাত্রির শেষে সকাল। গরু চরছে মাঠে। রাখালেরা গাছের নীচে বসে। সবাই খুশি —বৃষ্টিতে। শুধু সুদাম দাঁড়িয়ে। তার গরুর পিঠে হাত রেখে সে গান ধরে :]

ও...ও...ও

[রাখালবাজ কানু হাতে বাঁশি। সে তাকায় সুদামের দিকে। সুদাম গাইছে :]

ও...ও...ও

ধবলী আমার গাই

তার গুণের শেষ নাই

[সুমঙ্গল এবার উঠে দাঁড়ায়। রুখে দাঁড়ায় :]

: ধবলী ওর নয়।

[কানু এবার তাকায় সুমঙ্গলের দিকে। সুমঙ্গলও গানে উত্তর দিচ্ছে : যেন বা জমেছে কবির লড়াই।]

: তুই জানিস কানাই।

[এবার বলাই ছাড়া আর সকলে গানে যোগ দেয়]

: তুই জানিস কানাই,

: তুই জানিস কানাই।

[বাসব ঢোলক বাজাচ্ছে। মদন ওর খাবার কাঁসার থালাকে চকিতে কাঁসরে পরিণত করে। বাজাতে শুরু করে কাঁসর। সকলেই বসে। সুদাম এগিয়ে এসে জিগ্যেস করে :]

ধবলী আমার নয়? তবে বুঝি তোর বাবার?

[সুমঙ্গল উত্তর দেয় :]

আমারও নয়, তোরও নয়, ও বাবার বাবার।

[আর সকলে যোগ দেয়। গানের ধুয়া তারা পেয়ে গেছে :]

আমারও নয়, তোরও নয়, ও বাবার বাবার।

(বলি) আমারও নয়, তোরও নয়, ও বাবার বাবার।

[সুদাম গানেই প্রশ্ন করে চিতেন]

সে আবার কে?

এই আকাশ বাতাস নদীর মালিক যিনি?

[সুমঙ্গলের পরচিতেন :]

ভুল বুঝলি ওরে গাধা।

[সুবল তাকায় সুমঙ্গলের দিকে। এবার নেচে নেচেই বলে :]

আমি সে কথা বলিনি।

[বাকীরা ধুয়াকে সুর দিয়ে গায় :]

আমি সে কথা বলিনি

আমি সে কথা বলিনি

[কানু মজা দেখছিল। মজা নয় রগড়। সে প্রশ্ন করে :]

তবে কি ভাই বলতে চাস,

বল না সোজাসুজি।

[সুবল স্বচ্ছন্দে ছন্দেই উত্তর দেয় :]

আমরা ভাই সোজা মানুষ

সোজা কথাটাই বুঝি।

[এবার সবাই মিলে গায় : সবাইকেই দেখতে পাচ্ছি]

আমরা ভাই সোজা মানুষ

সোজা কথাটাই বুঝি

আমরা ভাই সোজা মানুষ

সোজা কথাটাই বুঝি

[বাসব ঢোলকে বোল তোলে। সুমঙ্গল গানের জবাবে গানের উত্তর দেয় :]

এই যে আমি, এই যে তুমি,

আমরা নিজেই নিজের মালিক নয়।

[সমবেত সঙ্গীত ধ্বনিত হল:]

আমরা নিজেই নিজের মালিক নয়। আমরা নিজেই নিজের মালিক নয়।

[সুবল উত্তর দেয়]

বড় খাঁটি কথা বলেছিস, একবারে সুনিশ্চয়।

[কানু সবকিছু দেখছে। মনে মনে ভাবছে, জল তো হয়েছে কাল রাতে, কিন্তু আজকের জল কে জানে কোথায় গড়ায়! সুমঙ্গল গায় :]

সবার মালিক একজনই হয়

স্বয়ং যিনি ভগবান

[সুবল করজোড়ে তাঁকে নমস্কার জানিয়ে গায়:]

তাঁকে প্রণাম

[বাকি সকলে করজোড়ে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে গায় :]

তাঁকে প্রণাম

[সুমঙ্গল এবার গান ধরে :]

তবে তিনি আমাদের

মাঝে মাঝেই ভুলে যান।

[আর সকলে গায়:]

মাঝে মাঝেই ভুলে যান

মাঝে মাঝেই ভুলে যান

[রঘু রাখাল এবার একলাই গায় :]

সবই তো দান তাঁরই

[সুদাম এবার উদ্দাম। সে জোরগলায় চিতেন ছোঁড়ে:]

তবে কেন...

তবে কেন জমিদারের পাইক করে খবরদারি?

[আর সকলে ঐকতানে যোগ দেয় :]

তবে কেন জমিদারের পাইক করে খবরদারি?

[কাঁসিদার মদন বাজনা না থামিয়ে তাকায় সুমঙ্গলের দিকে। সুবল সুদাম মদন বাসব আর সুমঙ্গল—অন্য রাখালদের কেন্দ্রবিন্দু আজ এরাই। এরাই নাচছে, গাইছে, বাজনা বাজাচ্ছে। সুমঙ্গল নাচতে নাচতে গায় :]

আজ যদি তোকে ধরে নিয়ে যায়, তুই খাটবি বেগার কার?

ভগবানের না জমিদারের বল দেখি এবার?

[আর সকলের ঐকতার, বৃন্দগান:]

ভগবানের না জমিদারের বল দেখি এবার?

ভগবানের না জমিদারের বল দেখি এবার?

[সুদাম এবার গায় :]

কেন ও কথা মনে করালি

কেন ও কথা মনে করালি, ভুলে যা, ভুলে যা।

[সুমঙ্গল নাচ থামিয়ে তর্জনী তুলে গর্জে ওঠে :]

আমরা ভুললেও, ভুলবে নাকো

নদীর ওপারের রাজা।

[সুবল গায়.]

আমরা ভুললেও

[মদন গায়

ভুলবে নাকো

রাখাল গায়:

নদীর ওপারের রাজা।

[বাসব গায়]

আমরা ভুললেও

[অন্য রাখাল গণেশ গায়:]

আমরা ভুললেও

[আবেক রাখাল শিবু গায়:]

ভুলতে নাকো

[ঘনাই. সেও রাখাল, গায়:]

নদীর ওপারের রাজা।

[কানু এবার তার বাঁশরিতে ফুঁ দেয়। স্বরগ্রামের প্রথম চারেই সীমাবদ্ধ। সুমঙ্গল নাচতে শুরু করে। কানুর বাঁশরিতে খেলা করে স্বরগ্রামের দ্বিতীয় চার স্বর। সুবল, ঘনাই, শিবু, গণেশ সকলে মিলে নাচছে আর গাইছে:]

তবুও তো এমন কিছু আছে,

এই যেমন, বাপমায়ের ভালোবাসা, ভাইবোনের স্নেহ,

কোনোদিন কেউ পাবে না কাড়তে—

[সুমঙ্গল একাই সম্মতি জানিয়ে গায়:]

এতে নাই কোনো সন্দেহ

[আর সকলে নাচতে নাচতেই গায়:]

এতে নাই কোনো সন্দেহ

এতে নাই কোনো সন্দেহ।

[সুবল যেন নতুন করে বল পেয়েছে। সে গায়:]

এসবও তো দিয়েছেন ভগবানই।

[ঘনাই তাতে সম্মতি জানায়:]

আমি এই কথাটা খুবই জানি

[সুমঙ্গল অমঙ্গলের আশঙ্কায় গায় :]

তবে চাবুক খেয়ে মরিস যদি

তাহলে হায়, কি হবে ঐ সবে?

[সুবল দুর্বল নয়। তবু? সে সুর ধরে:]

অলুক্ষুণে কথা বলিস না

সবাইকে একদিন তো মরতে হবে।

[আর সকলে যোগ দেয় বৃন্দগানে.]

অলুক্ষুণে কথা বলিস না,

সবাইকে একদিন তো মরতে হবে।

ও ভাই মরতে হবে

ও ভাই মরতে হবে।

[নাচ থামিয়ে রঘু ঈষৎ লঘু সুরেই বলে.]

তা তো ঠিকই।

[সুমঙ্গল অমঙ্গল নয়, কিন্তু আশ্বাস চায়। সে গায়:]

তবে তার আগে তো চাই কিছুদিন

বাঁচার মতো বাঁচা

[গণেশ বেশ হুঁশিয়ার। সে সাবধানে গানেই জানায়:]

ফাঁসকলে পা দিলেই-রে ভাই বন্ধ হবো খাঁচায়।

[আবার সকলের বৃন্দগান.]

ফাঁসকলে পা দিলেই-রে ভাই বন্ধ হবো খাঁচায়

ফাঁসকলে পা দিলেই-রে ভাই বন্ধ হবো খাঁচায়।

[কানু সুরে সুর মিলিয়ে বলে:]

এই কথাটা বলেছিস তুই ঠিক।

[সুমঙ্গল আশার বাণী শোনায়:]

বাঁচার জন্য মানুষ ছোটে কত না দিকবিদিক।

[সুদাম তাতে যোগ করে]

বাঁচাব জন্য দীনদুঃখীও প্রাণপণে উঠে দাঁড়ায়।

[সুমঙ্গল মোক্ষম কথাটি বলে গানে:]

বাঁচার জন্য কানা-খোঁড়াও চাঁদের পানে হাত বাড়ায়।

[আর সকলে নাচতে নাচতে ধুয়া ধরে:]

বাঁচার জন্য কানা-খোঁড়াও চাঁদের পানে হাত বাড়ায়

বাঁচার জন্য কানা-খোঁড়াও চাঁদের পানে হাত বাড়ায়।

[ওই গানের পর ঢোলকে দুটো বোল তুলে সবাই শান্ত হয়। কানু এবার মাথা দুলিয়ে, কোমরে দুহাত রেখে নির্ভীক গলায় গায়:]

এই কথাটা ঠিক বলেছিস

চাই কিছুদিন বাঁচার মতো বাঁচা।

[বাসব সম্মতি জানায়।]

: ঠিক বলেছিস।

[এবার সবাই এইসব গোপ বালকেরা জমিয়ে বসে পড়ে ঘাসের জাজিমে। কানু বলে.]

: চল না আমরা একটা যাত্রার দল খুলি।

গান গেয়ে ঘুরে বেড়াবো আর সকলের মনে আগুন জ্বালিয়ে দেব।

[সুমঙ্গল সম্মতি জানিয়ে বলে]

: হ্যাঁ। ভালোই তো।

সুদাম : এতে আমারও মত আছে। কিন্তু তাহলে এই গরুগুলো চরাবে কে?

[কানুর নজর অন্যদিকে। সে চকিতে উঠে দাঁড়ায়:]

: আরে! ওদিকে দ্যাখ, ওদিকে দ্যাখ।

[কানুর মত আর সকলে উঠে দাঁড়ায়। আর দেখতে পায় একটা গরু হঠাতই ক্ষেপে গেছে। অন্য গরুগুলো তার ভয়ে দিকশূন্য হয়ে এদিক ওদিক ছুট লাগিয়েছে। কানু বলে:]

: সুদাম তোর গরুটা ক্ষেপে গেছে রে। ওটাকে এক্ষুনি সামলানো দরকার। না হলে সব গরুগুলোই ক্ষেপে যাবে।

[সুদাম কিছুটা ভয় পেয়ে জানান দেয়:]

: এখন ধরতে গেলে গুঁতিয়ে শেষ করে দেবে যে!

[কানুর সে কথায় কান নেই। সে এগিয়ে যায়। সুবল তাকে সাবধান করে বলে:]

: এই কানু, যাস না। এখন যাস না।

[কানু মাস্তান। কানু রংবাজ। কানু বেপরোয়া। সে থোড়াই কেয়ার করে অন্য কারুকে। সে দৃপ্ত পায়ে এগিয়ে যায় গরুটার দিকে। সুদাম স্থাণু। দেখছে কানুকে।

অদূরেই ছিল সাধু সন্দীপনী ও তাঁর শিষ্যরা। তারাও সব দেখেশুনে উঠে দাঁড়ায়। সাধু দেখছে, কানু ছুটছে গরুটার পেছনে, কিন্তু দৌড়েও ধরতে পারছে না গরুটাকে। সুদাম সুমঙ্গল বলাই গণেশ ঘনাই তটস্থ হয়ে দেখছে সবাই। সুমঙ্গল দুপা এগিয়ে যায়। কানু ধরে ফেলেছে গরুটাকে। চারদিক থেকে গাঁয়ের আরও চার-পাঁচজন এসে ভিড় জমায় মাঠের পাশে। তারা দেখছে লড়াই।

কানু চেষ্টা করছে ক্ষিপ্ত গরুকে শায়েস্তা করতে,—কিন্তু পারছে না। কানু ভূপতিত হয় বারবার। আর ততবার উঠে দাঁড়ায়।

হবি তো হ, ঠিক সেই সময়েই রাধা তার সখীদের নিয়ে স্নান সেরে ফিরে যাচ্ছিল নিজেদের কুটিরে। কিন্তু এমন জবর লড়াই না দেখে পারা যায়! অন্যদের মত তারাও দেখতে থাকে কানুকে।

কানুকে রীতিমত হিমশিম—আবার দৌড়তে থাকে গরুর পেছনে।

গ্রামের যে যেখানে ছিল, সবাই আস্তে আস্তে জমায়েৎ হয় মাঠের চারপাশে। নন্দও এসেছেন খবর পেয়ে, সঙ্গে বলাই।

রাধা রুদ্ধশ্বাসে দেখছে। রাধা দেখছে রংদার কে! মাস্তান কানুকে! এই যায় সেই যায় অবস্থা। আর কানুও তেমন। ছাড়বার পাত্তর নয়। ক্ষত বিক্ষত, তবুও ও গরুকে যেন আজ ওর বাগে আনা চাই-ই চাই! এতোই বা কী প্রয়োজন—ভাবে শঙ্কিত সাধু সান্দীপনী। কিন্তু কানু আমাদের কানুই—হার শব্দটা ওর জানা নেই।

সুবল আর অন্যান্যরাও দেখছে।

কানুর এই লড়াই।

রাধাও দেখছে। নিষ্পলক।

ভিড়েব মধ্যে থেকে বলাই চেঁচিয়ে ডাকে:]

: কানু! চলে আয়! চলে আয়!

[কানুর কানে সে কথা ঢোকে না। সে সমানে চালিয়ে যায় তার লড়াই।

যশোদা, বিদ্যা, বোহিণী আর অন্যান্যরা এসে জড়ো হয়।

কানু যেনবা এক সংগ্রামে নেমেছে। মরণপণ সংগ্রাম। চকিতে ও একবার জনসমুদ্রে চোখ বোলায়। দৃষ্টি স্থিতি পায় একটি বিন্দুতে। আবাব শুরু হয় সংগ্রাম। অজান্তেই তার চঞ্চল চোখ স্থিরনেত্র হয় সেই বিন্দুতে। বিন্দু নয়, সিন্ধু।

রাধা।

কানু সরাসরি তাকায় রাধার দিকে। চুলোয় যাক মরণপণ সংগ্রাম। রাধার চোখে চোখ রাখে কানু। আর গরু? সে এই সুযোগে সময় মতোই পালিয়ে যায় কানুর নাগালের বাইরে।

রাধার চোখ আটকে গেছে কানুর চোখে। রাধা চোখ নামায়, লজ্জায়।

সম্বিৎ ফিরে পায় কানু! সে আবার ধাওয়া করে গরুকে। চোখে ধরা পড়ার মত মেয়ে যদি সত্যি সত্যিই চোখে পড়ে, কোন মাস্তান তার সুযোগ ছাড়ে?

রাধা আবার চোখ তুলে তাকায়।

শঙ্কিত যশোদা চেঁচিয়ে বলে.]

: তোমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছ কী?

: কানুকে ধর না সবাই মিলে।

[একি রাধার চোখের জাদু। কানু নতুন উদ্যমে গরুটিকে বাগিয়ে ধরে। তার শিং দুটো কানুর শক্ত হাতে বাঁধা। সে স্থির। সুবল, সুমঙ্গল, বলাই সবাই দৌড়ে এগিয়ে আসে এবং ধরাশায়ী করে গরুটিকে। সাধু সান্দীপনীও এগিয়ে আসে।

বিধ্বস্ত কানু এবার বসে পড়ে মাটিতে। আবার চোখ চালায় রাধার পানে।

রাধা আর তার সখীরা কানুকে সপ্রশংস দেখে। পৌরুষ দৃপ্ত কানুকে।

কানুর চোখে শুধুই রাধা। রাধা বাঁধা পড়েছে কানুর চোখে।

সান্দীপনী সাধু প্রথমে দেখে কানুকে আর তারপর কানুর দৃষ্টি অনুসরণ করে রাধাকে। রাধা অনিচ্ছার দুস্তর বাধা পেরিয়ে এবার বৃন্দা আর অন্য সখীদের নিয়ে নিস্পৃহ পা বাড়ায় বাড়ির দিকে।

কানু জানে সে মোটেই হ্যালাফ্যালা নয়, তবু কি আর করা! সে ফ্যালফ্যালিয়ে দেখে রাধার চলে যাওয়া।

সাধু সান্দীপনী সবই লক্ষ্য করেছে। সে এবার কানুর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে দর্শকদের বলে.]

: এই মাটি করেছে! ছোঁড়াটা আবার মেয়েছেলের দিকে তাকায় যে!....অনেক গুণ হয়েছে দেখছি!

দৃশ্য : ১৬

[দিগন্তে অস্তগামী সূর্য। পাখীরা ফিরে চলেছে নীড়ে। নদীর ঘাটে নৌকো বাঁধা। কানু শুয়ে আছে গলুইয়ে। আরেক প্রান্তে বৃদ্ধ মাঝি জাল বুনছে। আর মাঝে মধ্যে কানুকে দেখছে।

কানু চিন্তায় বিভোর। আকাশকুসুম ভাবছে। পাশ ফিরে নদীর জলে হাত নামায়। নদী বয়ে চলেছে। স্রোতস্বিনী। কানুর চিন্তাও তাই। বৃদ্ধ মাঝি কানুকে:]

: বাড়ি যা কানু। এখুনি সন্ধ্যা হয়ে যাবে।

[কানুব আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে গলে যাচ্ছে জল। কানু জল নিয়ে খেলা করে। বেশ কিছু পরে মাঝির কথার উত্তর দেয়:]

: হোক না সন্ধ্যে। একদিন যদি সন্ধ্যাতারা একটু আগে ফোটে, তাহলে কী আকাশের খুব কষ্ট হবে?

[কানুর হেঁয়ালি সে বোঝে না।

বৃদ্ধ মাঝি জাল বোনা থামিয়ে কানুকে প্রশ্ন করে:]

: আজ তোকে কেমন যেন মনে হচ্ছে। তখন থেকে কেমনতর কথা বকে চলেছিস।

[জল থেকে হাত তুলে নিয়ে কানু এবার চিৎ হয়ে শোয়। মাথার নিচে হাত রেখে এবার বলে]

: একদিন সূর্য্য যদি একটু আগে ওঠে তাহলে কী পদ্মফুলের আপত্তি হতে পারে?

[নির্ঘাত মাথা খারাপ হয়েছে কানুর। মাঝি সস্নেহে জিগ্যেস করে:]

: কি হয়েছে বলতো তোর? আবোল তাবোল বকছিস কেন?

[কানু মৃদু হেসে উত্তর দেয়। উত্তর তো একটাই। সে বলে:]

: আমার খুব অসুখ করেছে গো।

দৃশ্য : ১৭

[আমবাগান।

একটা বড় গাছের শাখা-প্রশাখা থেকে উড়ে যায় এক ঝাঁক পাখী। একটা কাঠবেড়ালি এদিক ওদিক তাকিয়ে গাছের গুঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠে। প্রজাপতি উড়ছে। ডালপালা লতাপাতার ফাঁক দিয়ে আলোছায়ার খেলা।

আমগাছের আড়াল থেকে দেখতে পাচ্ছি কানুকে। কানু বসে বসে মাটিতে আঁচড় কাটছে। জানিনা, আঁচড় না আলপনা, আলপনা নাকি কল্পনার রেখাচিত্র। গাছে একটা পাখি ডেকে ওঠে।

কানু চোখ তুলে তাকায়। আর তখনি শুনতে পায় শুকনো পাতার ওপর পায় চলার শব্দ। কানু মুখ ঘুরিয়ে সেদিকে তাকায়, এবং সঙ্গতকারণেই চমকে ওঠে।

দূরে মরালগামিনী রাধা। সদ্যস্নাতা রাধা, বৃন্দা, ললিতা ও বিশাখা এই তিন সখীপরিবৃতা হয়ে কোমরে গাগরি নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। খানিক যাওয়ার পর যে যার পথ ধরে। কানুকে চট করে উঠে নিজেকে লুকিয়ে ফেলে একটা গাছের আড়ালে।

আমবাগানের মাঝ দিয়ে রাধা চলেছে একলা। একলা এবং আনমনা। নিজেই হঠাৎ গুনগুনিয়ে ওঠে:]

আমি যদি পাখি হতাম রে,

তোকে নিয়ে যেতাম রে ভিনদেশে।

ও নদীরে, হাড় কালো হলো আমার

তোকে ভালোবেসে।

[কানু এক গাছের আড়াল থেকে পালায় আরেক গাছের আড়ালে—তার চোখের নজর রাধাতেই নজরবন্দি। রাধা গান করতে করতে এগিয়ে এসেছে কানুর কাছাকাছি। কানু আবার পালায় আরেক গাছের আড়ালে। রাধাকে দেখবে সে, কিন্তু রাধা যেন তাকে দেখতে না পায়! উন্মনা উদাস রাধা আমবাগান ছাড়িয়ে ধীরে মিলিয়ে যায় দূরে। কানু তাকিয়েই থাকে। গাছের আড়াল থেকে বাইরে এসে তাকিয়েই থাকে।]

দৃশ্য : ১৮

[সাধু সান্দীপনীর আশ্রম। ঢালী বোল তুলছে তার ঢোলকে। সান্দীপনী সাধু ভাত খেতে খেতে দর্শকদেব জানায়:]

কি আর বলিব আমি

সে দুই আসরে কৈল জরজর

হইল অন্তরগামী॥

সব কলেবর কাঁপে থরথর,

ধরনে না যায় চিত

কি করি কি করি বুঝিতে না পারি

শুনহ পরাণ মিত॥

কহে চণ্ডীদাসে বাশুলি আদেশে

সেই সে নবীন বালা।

তার দরশনে বাড়িল দ্বিগুণে

পরশে ঘুচিবে জ্বালা॥

[সাধু সান্দীপনী অল্প একটু হাসে।]

দৃশ্য : ১৯

[সকাল।

গোচারণ ভূমিতে রাখালেরা। সুবল আর সুমঙ্গল কানুর সামনে এসে দাঁড়ায়। সুমঙ্গল কানুকে জিগ্যেস করে:]

: তোর কি হয়েছে রে কানু? একা একা চুপ করে বসে আছিস কেন?

[কানু বসে পড়ে মাটিতে। গাছের নীচে। সে বলে:]

: আমার গরু চরাতে ইচ্ছে করছে না।

সুবল : কেন? শরীর খারাপ হয়নি তো?

: আচ্ছা তোরা কি বলতে পারিস, সেদিন গরুর সাথে লড়াইয়ের সময় যাকে দেখেছি, আবার কালকে আম বাগানে যাকে দেখলাম—সে কে?

: কাকে দেখেছিস তুই?

সুমঙ্গল : এই রে, কানু হারামজাদা মজেছে। নিশ্চয়ই গোপ পাড়ার কোনো মেয়েকে দেখেছে।

সুবল : তা হতে পারে। আমিও অনেকবার দেখেছি। ও পাড়ার মেয়েরা ঐ পথ দিয়েই স্নান করতে যায়। এদিক দিয়ে হাটেও তো যায়।

সুমঙ্গল : কয়েকজন একেবারে আগুনের ভাটা।

কানু : আমি দেখেছি হয় তো, কিন্তু এমনভাবে দেখিনি। তাছাড়া ওর মত সুন্দর আর কেউ নেই।

সুমঙ্গল : ও পাড়ার বৌ-ঝিদের দিকে নজর দিস না কানু। মেরে একেবারে তক্তা করে দেবে।

সুবল : কেন? মারবে কেন? আমি তো কোনো দোষ করিনি। তাছাড়া, আমার যখন চোখ আছে তখন দেখার অধিকারও আছে।

[এই বলে কানু চলে যায়। সম্ভবতা গ্রামের দিকেই। সুবল সাবধান করে .]

: এই কানু, গ্রামের দিকে যাস না এখন--খুব ধরপাকড় হচ্ছে।

দৃশ্য : ২০

[জমিদারের দুই দশাসই পেয়াদা ধরে নিতে এসেছে গ্রামের মানুষ-জনকে। তাদের মধ্যে রয়েছে বলাই আর হরিমোহন। একজন গ্রামবাসী পেয়াদাদের অনুরোধ জানায়.]

: আমায় আজ ছেড়ে দাও, আজকের দিনটা ছেড়ে দাও, বাড়িতে ছেলের বড় অসুখ। আমি সামনের সপ্তাহে ঠিক যাবো।

[একজন পেয়াদা তাকে ছড়ির বাড়ি মেরে বলে :]

: যাকেই ধরি, সে ব্যাটাই বলে ছেলের অসুখ, নয়তো বউ-এর অসুখ। কাজের নাম শুনলে সকলেরই অসুখ!

[পেয়াদা দুজন খেদিয়ে নিয়ে চলে গ্রামবাসীদের।

নন্দ ভয়ে ভয়ে তার বাড়ির পেছন থেকে উঁকি মারে।

উঠোনে পড়ে রয়েছে ভাঙ্গা হাঁড়িকুরি। তার মাঝে চিবুকে হাত রেখে বসে আছেন চিন্তিতা যশোদা।

নন্দ এবার বাইরে এসে বলেন :]

: ধরা পড়লেই হয়েছিলো আর কি! খাটিয়ে খাটিয়ে মুখের রক্ত বার করে দেয় একেবারে।

: হঠাৎ হঠাৎ এসে এইরকম জোর করে ধরে নিয়ে যাবে, এর কোনও প্রতিকার নেই?

[নন্দ হাঁড়িকুরি কুড়োতে কুড়োতে বলে :]

এর আবার প্রতিকার কী? জমিদার চাইলেই আমাদের বেগার খাটতে হবে। বংশের পর বংশ এরকমই চলে আসছে। একটা কথা বললেই পিঠে চাবুক মারার হুকুম হয়।

কানুর জন্য বড় চিন্তা হয়।

কানু এখন বড় হয়েছে, ওকেও যেতে হবে।

আচ্ছা। কানুকে যদি ওরা রাস্তায় ধরে? আমার খুব ভয় হচ্ছে।

দৃশ্য : ২১

[সকাল। নদীর ঘাট।

কানু একটা গাছের আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে ঘাটের দিকে দেখছে। আর নাই বা কেন?

রাধা নেমেছে জলে। চান করতে। তার সাথে জলে নেমেছে বৃন্দা, ললিতা, বিশাখা আর চন্দ্রাবলী। ঘাটে রাখা রয়েছে তাদের কলসী। টুপ করে রাধা জলে ডুব দেয়।

কানু দেখছিল পরম রমণীয় রাধাকে। রাধা এবার জল থেকে মাথা তোলে, চোখে মুখে জলের ছিটে দেয়। মুখ পরিষ্কাব করে।

কানু দেখছে। দু চোখ ভরে।

রাধা জলের স্রোতে হাত বোলায়। আঙুল দিয়ে খেলা করে।

বিশাখা চান করতে করতে বলে :]

: চারিদিকে কি রকম থমথমে ভাব। নদীতে একটাও নৌকা দেখতে পাচ্ছি না।

[বৃন্দা জল থেকে উঠে ঘাটে বসে পা মুছছিল। সে বলে :]

: সত্যি। আমার কেমন যেন ভয় ভয় করছে।

[রাধা প্রশ্ন করে :]

: কেন রে। কিসের ভয়?

[ললিতা উত্তর দেয় .]

: দিনকাল বড় খারাপ। গাঁয়ে আবার অত্যাচার শুরু হয়েছে। আজ ও পাড়ায় খুব ধর-পাকড় হচ্ছে।

[রাধা আবাব ডুব দেয জলে। বৃন্দা বলে :]

· আমাদের গায়েও যদি গুণ্ডাগুলো হাত দেয়, তখন কি হবে?

[বিশাখা বলে :]

: কি! আমাদের গায়ে হাত দেবে? দিয়ে দেখুক না একবার।

[চন্দ্রাবলী তাতে মোটেই আশ্বস্ত নয়। সে সভয়ে তাকায় দূরে।]

দৃশ্য : ২২

[সেইদিন। আমবাগান। রাধা আর তার সখীরা কথা বলতে বলতে কলসী কাঁখে ফিরে যাচ্ছে। আমবাগানের ভেতব দিয়ে। কথা শেষ। বৃন্দা, বিশাখা, ললিতা একপথ দিয়ে চলে যায়। চন্দ্রাবলী অন্য পথে যায়। রাধা একলা এগিয়ে আসে ক্যামেরার দিকে। কানু এসে লুকিয়ে ছিল একটা আমগাছের পেছনে। রাধা এগিয়ে আসছে। সে কানুকে দেখতে পায়নি। বাধা কাছাকাছি আসতে কানু আচমকা তার পথ আটকে দাঁড়ায়। হতচকিত রাধা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

বিমোহিত কানু সতৃষ্ণ নয়নে নিরাভরণ রাধাকে নিরীক্ষণ করে সরল প্রশ্ন করে :]

: তোমার নাম কি?

[রাধা বিরক্ত হয়। কিছুটা ভয় পায়। সে বলে :]

: আমার নাম জেনে কি হবে? আমাকে যেতে দাও।

[কানু দু'হাত তুলে বলে :]

যাও না। এই একটাই কি পথ নাকি?

[রাধা অন্য পথ ধরতে কানু আবার তার সামনে এসে পথরোধ করে।

রাধা এবার বলে :]

· কেন আমাকে বিরক্ত করছো। আমরা এই পথ দিয়ে এতকাল যাই। কেউ কখনো উৎপাত করে নি। কি চাই তোমার?

[কানু চিবুকে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলে :]

: তোমার রূপ।

[রাধা সভয়ে মিনতি জানায় .]

: আমাকে একলা পেয়ে কেন এরকম করছো?

[কানু এবার রাধার দিকে এক পা এগিয়ে যায়। রাধা ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায় দু পা। কানু বলে ·]

: আমাকে ভয় পাচ্ছ কেন? আমি কি বাঘ না ভালুক?

: আমি জানি তোমার গায়ে ডাকাতের মত জোর। কিন্তু তাই বলে। আমাকে অপমান কোরো না।

: আমার সঙ্গে একটু কথা বললে, কী এমন ক্ষতি হবে তোমার?

: ছি ছি। তোমার এত সাহস? তুমি কি চাও আমি এ পথ দিয়ে আসা যাওয়া বন্ধ করি?

: না না। আসা যাওয়া বন্ধ করবে কেন? এ পথ তো আমার একার নয়।

: তবে আমাকে যেতে দাও। আমাকে আর কখনো বিরক্ত কোরো না।

[এবার কানু পথ থেকে সরে দাঁড়ায়। রাধা চলে যায়। কানু চেয়ে থাকে সেদিকে। দূরে সুবলের গলা শোনা গেল :]

: এই কানু!

[কানু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে। খানকয়েক গাছের পেছনে সুবল দাঁড়িয়ে। সুবল এবার কানুর সামনে এসে বলে]

: তুই যাকে দেখে মজেছিস, তাকে চিনতে পেরেছিস?

: না। কিন্তু বল, এতো সুন্দর কেউ হয়? তুই চিনিস ওকে?

: তুই বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে চাস্। ওর নাম রাধা। গোপপাড়ার আয়ান ঘোষের বউ। তাছাড়া ওর বাবা বৃষভানু খুব বড়লোক। আর তুই সামান্য এক রাখাল।

: আমি রাখাল হই আর যাই হই, আমি ইচ্ছে করলে সব গ্রাম তছনছ করে দিতে পারি। আমাকে বড়লোক দেখাস না।

[এই বলে কানু অন্য পথে পা বাড়ায়। যাবার আগে পেছন ফিরে সুবলকে বলে :]

: ওর জন্য আমি সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারি।

[সুবল কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বলে :]

: তুই ওর কথা ভুলে যা কানু। ওর যে বিয়ে হয়ে গেছে—তাছাড়া আয়ান ঘোষের অনেক ক্ষমতা।

[কানু দৃপ্তকণ্ঠে উচ্চারণ করে :]

: আমি মানি না... আমি কিছু মানি না...

দৃশ্য : ২৩

[আকাশে মেঘ জমেছে। ঝড়ো হাওয়া বইছে হু হু করে। নুয়ে পড়ছে গাছ-গাছালী। তারই মাঝে শোনা গেল গরুর ডাক। হাঁসের ডাক। গ্রামের লোকেরা যে যার বাড়ি ফিরে আসছে তাড়াতাড়ি। ঝড় এলো বোলে। রাখালেবা গরু চরিয়ে ফিরে আসছে গোয়ালে।

ধুলোর ঝড়ে শুকনো পাতা উড়ছে।

পাক খাচ্ছে ঘূর্ণিতে।

কুঁড়ে ঘরের ছাদের ফুটো দেখা গেল, শুরু হয়েছে বারিবর্ষণ।

বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ভিজে যাচ্ছে গ্রামের পথ ঘাট।

নন্দর কুটির। বাইরে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা। উঠোনে বসে যশোদা আর রোহিণী। যশোদা কুলোয় চাল বাছতে বাছতে চিন্তিত ভাবে রোহিণীকে বলে :]

: এত ঝড় বৃষ্টি। কানুটা এখনো ফিরলো না।

: তা ভিজুক না একটু বৃষ্টিতে, ক্ষতি কি?

[যশোদা কুলো থেকে মুখ তুলে চায়। সে বলে :]

: কিন্তু ওকে আবার জমিদারের পেয়াদারা ধরে নিয়ে গেল না তো?

: না। আমি জানি কানু ধরা পড়েনি। আর তাছাড়া পড়লই বা ধরা।

. কৈ বলাইকে ধরে নিয়ে গেছে বলে ত আমি কাঁদুনি গাইছি না।

: তোমার মনটা বড় শক্ত দিদি।

: শক্ত না হলে ছেলেগুলো মানুষ হবে না যশোদা। ওদের মধ্যে অনেক ক্ষমতা আছে। আঁচলে বেঁধে রেখে কানুকে নষ্ট করিস না।

[যশোদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে :]

: কিছুদিন ধরে কেমন যেন মনমরা হয়ে গেছে ছেলেটা। বেশী কথা বলে না। খেতেও চায় না। কোথায় যেন অনেক রাত পর্যন্ত একা একা ঘুরে বেড়ায়।

[রোহিণী কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে যশোদার দিকে। তারপর কিছু ভেবে বলে :]

: কানু এলে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিস।

[কানু এখন আমবাগানে। ঊর্ধ্ববাহু হয়ে আরামে ভিজছে বৃষ্টিতে। শুষে নিচ্ছে বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটা নিজের শরীরে।

নিজের আশ্রমেব নিচে বসে সাধু সান্দীপনী ছড়া কাটে :]

: ঝর ঝর জলধর—ধার

ঝঞ্ঝা পবন বিথার॥

ঝলকত দামিনী মালা,

ঝম্প্ররি ভৈ গেল বালা॥

ঝন ঝন বজর-নিশান,

ঝাঁপি রহত দুহুঁ কান॥

দৃশ্য : ২৪

[রাত্রি। নিস্তব্ধ চরাচর। শুধু অবিশ্রান্ত ধারাপাতের শব্দ।

কানু শুয়ে আছে মেঝেতে।

বাইরে আঙ্গিনায় একটা ভাঙ্গা কলসী। জলে প্রায় ভর্তি হয়ে এসেছে। একটা ছোট ছেলের কান্নার শব্দ শোনা গেল।

কানু শুয়ে আছে—কিন্তু সজাগ। জানলার বাইরে তার দৃষ্টি। কানু শুয়ে শুয়ে বৃষ্টি দেখছে।

সে সচকিত হল। শোনা গেল একটা কুকুরের ডাক।]

দৃশ্য : ২৫

[সেই একই রাত্রি। হরিমোহনের একচালা। প্রদীপ জ্বলছে। হরিমোহন ক্যামেরার দিকে পেছন ফিরে খাটে বসে। তার সারা পিঠ জুড়ে চাবুকের দাগ। বিদ্যা তার ওপর গরম জলের সেঁক দিতে দিতে বলে.]

: তুমি আর তর্ক কোরো না। জানোই তো ওরা কত নিষ্ঠুর।

[হবিমোহন কোনও উত্তর দেয় না। তার চোখে মুখে অপমানের ছাপ। কিছুক্ষণ চুপচাপ। হঠাৎই হরিমোহন বলে·]

: উঃ লাগছে, লাগছে, আস্তে দাও।

[বিদ্যা হাত তুলে নেয়। তারপর আবার সেঁক দিতে দিতে বলে:]

: সন্ধ্যেবেলা রোহিণী দিদি এসেছিল—তোমার কাছে ছেলের খবর নিতে।

: না। বলাই মার খায় নি। তবে ওকে আটকে রেখেছে। অমন সুন্দর স্বাস্থ্য

. সে কি! কি করেছে ও?

: গায়ে খুব জোর। মুখ বুঁজে একাই তিনজনের কাজ করে। এই ওর দোষ। যারাই একটু জোয়ান মদ্দ সকলকেই জমিদারের লোকেরা রেখে দিয়েছে। কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওদের ছাড়বে না।

[বিদ্যা সেঁক দেওয়া বন্ধ করে। গরমজলের বাটি নিয়ে খাট থেকে নেমে পড়ে। গবমজলের বাটি ঘরেব এক কোণে বেখে বলে]

: শেষ পর্যন্ত তোমাকে মাটি কাটার কাজ করতে হচ্ছে। কপালে এও ছিলো।

[হরিমোহন শুতে শুতে উত্তর দেয়:]

: কী আর করবো। আশেপাশের দশটা গ্রামের লোক সেখানে মুখ বুজে বেগার খাটছে। রাজি না হলেই তো ঘরদোর জ্বালিয়ে দেবে।

[বিদ্যা ঘাড় ঘুরিয়ে বলে:]

: চলো না, আমরা দূরে কোথাও চলে যাই।

: কোথায় যাবে? অত্যাচার কোথায় নেই?

: কবে ওই পুকুর কাটা শেষ হবে জানো?

: শেষ আবার কী? পুকুর কাটা শেষ হলে পাথর ভাঙ্গা আছে। পাথর ভাঙ্গা শেষ হলে রাস্তা কাটা আছে—গাছ কাটা আছে—খাল কাটা আছে—বেগার খাটার শেষ আছে নাকি?

[বিদ্যা দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্বামীর দিকে তাকায়। হরিমোহন এখন শান্তিতে ঘুমোতে চায়। সে বলে:]

: বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ো। কাল আবার ভোরে উঠে ছুটতে হবে। দেরী হলেই তো পেয়াদা এসে হাজির হবে।

: এভাবে বেগার খেটে সংসার চালাবে কি করে? উপোস করে মরতে হবে যে।

: আমরা বেঁচে আছি কোথায় যে আবার মরবো?

দৃশ্য : ২৬

[সকাল। গোচারণ ভূমিতে গাছ-গাছালী দেখতে পাচ্ছি। দেখছি একটা বিশাল গাছের গুঁড়ি। কানু সবাইকে সাবধান করে বলে:]

: সাবধান। সবাই সরে যাও।

[একটা বর্শা সজোরে এসে বিঁধলো একটা পড়ে থাকা গাছের গুঁড়িতে। রাখালেরা এসে ভিড় জমালো তার চারপাশে। ঠিক জায়গাতেই লেগেছে। কানু এসে বর্শাটা বার করে নিল দুহাত দিয়ে টেনে। এবার সে তাক করছে আরেকটা গাছের গুঁড়িতে। তার গায়ে খড়ি দিয়ে আঁকা আছে ছোট্ট একটা বৃত্ত। বর্শাটা যেন তার মধ্যে গিয়ে বেঁধে। কানু তাক করে ছুঁড়লো তার বর্শা। বর্শা বিঁধলো ঠিকই, কিন্তু বৃত্তের বাইরে। কানু সেটা খুলে আবার চেষ্টা করে। এবারেও বাইরে। সুবল বলে:]

: এই কানু, আজ তোর টিপ্ নষ্ট হয়ে গেছে।

[কানু ছাড়বার পাত্র নয়। সে তার চেষ্টা চালিয়ে যায়। আবার ছোঁড়ে বর্শা। হলো না। আবার একবার। বারবার। নাঃ, আজ সত্যিই তার দিন নয়। সুমঙ্গল বলে:]

: একবারও ঠিক জায়গায় ছুঁড়তে পারছিস না।

[ক্ষিপ্ত কানু রাগত স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে :]

: পারছি না তো, পারছি না। তাতে কার কি! রাখ তোদের বল্লম।

দৃশ্য : ২৭

[নদীর ঘাটে খানকয়েক নৌকো বাঁধা। মাঝিরা মগ দিয়ে গলুই থেকে জল ছেঁচে বার করছে। গ্রামের মানুষজন এসে ভিড় জমিয়েছে নৌকোর চারপাশে। তারা ব্যস্ত হয়ে উঠছে—নদীর ওপারে যাবার জন্য। আজই হাটবার। কানু বসে আছে কিছু দূরে। একলা। বিমনা। সাধু সান্দীপনীও উপস্থিত। সঙ্গে তার দুই শিষ্য। তারা নৌকোর দিকে এগোচ্ছে। যাবার সময় তারা কানুকে দেখে ভুরু কোঁচকায়। কানু বসে আছে। কানু বসে ঘাসের শিস্ চিবোচ্ছে। সাধু সান্দীপনী নৌকোয় উঠতে উঠতে বলে:]

: চলো গো মাঝি, তাড়াতাড়ি পার করে দাও। ওদিকে হাট বসে যাবে এখনি।

[কানু চেয়ে চেয়ে দেখছে নৌকোকে। ঢালীও দেখছে কানুকে। ঢালী তার ঢোলকে চাঁটি দিয়ে সুর তুলে গাইতে শুরু করে। নৌকো ঘাট ছাড়ছে। ঢালী গাইছে :]

গৃহমাঝে রাধা
কাননেতে রাধা
রাধাময় সব দেখি।
শয়নে স্বপনে
ভোজনে গমনে
রাধারে দেখিয়া আঁখি॥
প্রেমেতে রাধিকা

স্নেহেতে রাধিকা

রাধিকা আরতি পাশে।

রাধারে ভজিয়া

রাধাকান্ত নাম

পাইয়াছি অনেক আশে॥

[সাধু সান্দীপনী ঢালীকে ধমক দেয়:]

: বদমাইস কোথাকার!

[তারপর দর্শকদের বলেন:]

: আপনারা দেখেছেন ত, ব্যাটা কিরকম পেকেছে। ...অসভ্য!

[কানু বসেই আছে। বসে বসে মাটিতে আঁক কাটছে। কিছু দূরেই ঘাট। ঘাটে শশব্যস্ত মানুষজনেরা। ওপারে যাবে তারা। নৌকো ছেড়ে দেয়। বেহালা বাজছে। আবহ সঙ্গীত। নদীর জলে খড়কুটোর সাথে ভেসে চলেছে বিচ্ছিন্ন কিছু ডালপালা। নদীর ঘাটে নৌকো বাঁধা। আবহসঙ্গীতের সাথে সুর মিলিয়ে এবার গান শোনা গেল। বৃন্দা গাইছে:]

দোলে দোলে দোলেরে, ওই নৌকা দোলে।

[গোপ পাড়ার মেয়েরা আসছে ঘাযে। তাদের মাথায় নবনীত-নদীর পনীরের পসরা। বৃন্দা গাইছে:]

দোলে দোলে দোলেরে, ওই নৌকা দোলে।

[ক্যামেরা দূরে সরে গেছে। দেখা যাচ্ছে নদীর পার ধরে মেয়েরা এগিয়ে আসছে নদীর ঘাটেব দিকে। বৃন্দা গাইছে:]

আকাশ দোলে, বাতাস দোলে,

আকাশ দোলে, বাতাস দোলে,

হিয়া অঙ্গ দোলেরে।

ওই নৌকা দোলে।

[দেখা দেল নদীর ঘাটে। সেখানে বাঁধা রয়েছে খান কয়েক নৌকো। ক্যামেরা স্থির হয় একটি নৌকোয়। এবার সকলে গানে যোগ দেয়:]

দোলে দোলে দোলেরে, ওই নৌকা দোলে॥

[কানু এখনও একই ভাবে বসে। তার কানে গান ভেসে আসছে:]

দোলে দোলে দোলেরে, ওই নৌকা দোলে॥

[মেয়েরা নদীর পার ধরে এগিয়ে আসছে ঘাটের দিকে। দূরে দেখা যাচ্ছে একটা নৌকো চলেছে ওপারে। রাধাও আছে এই দলে। সে ইতিউতি চেয়ে নজরচোর কানুকে দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। ভুরু কোঁচকায়।

কানু বসেই আছে। বিমনা।

এবার ললিতা গান শুরু করে:]

শ্রাবণ মাসে ভরা গাঙে

আগের নৌকা পিছে টানে।

[রাধা আবার হাঁটতে শুরু করে। ললিতা গাইছে:]

শ্রাবণ মাসে ভরা গাঙে

আগের নৌকা পিছে টানে।

[এবার শুধুই ললিতাকে দেখছি। সে গাইছে:]

হালের মাঝি আলো-আঁধারে ভোলেরে—

[ক্যামেরা পিছিয়ে যায়। পর্দার বাঁদিক থেকে মেয়ের দল এগিয়ে আসছে। মধ্যিখানে নদীর ঘাট। সেখানে নৌকো বাঁধা। আর ডানদিকে দূরে বসে শুনছে কানু। ললিতা গাইছে:]

হালের মাঝি আলো-আঁধার ভোলেরে।

ওই নৌকা দোলে।

[মেয়েরা ঘাটের কাছাকাছি এসে গেছে। কানুর নজর নদীর ঘাটে। ঐ তো, মেয়েরা এসে পৌঁছেছে ঘাটে। কানু মেয়ের দলকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়ায় চকিতে। মেয়েরা গাইছে :]

দোলে দোলে দোলেরে, ওই নৌকা দোলে—

দোলে দোলে দোলেরে, ওই নৌকা দোলে।।

[মেয়েরা ঘাটে এসে একে একে নৌকোয় ওঠে। রাধাও ওঠে। নৌকো দুলছে বাধা নৌকোয় বসে। কানু দাঁড়িয়ে আছে। চেয়ে আছে ঘাটের পানে। সতৃষ্ণ নয়নে। নৌকো দুলছে। বৃন্দা গাইছে:]

দোলাও আরো জোরে দোলাও

লাজ লজ্জা সবই খোলাও।

[নৌকো ছেড়ে দেয়।

নদী বয়ে চলেছে। বৃন্দার গানও শেষ হয় না। বহতা নদীর সাথে বৃন্দাকে দেখা যায়, সে গাইছে:]

দোলাও আরো জোরে দোলাও

লাজ লজ্জা সবই খোলাও।

[বৃদ্ধ মাঝি অবাক হয়ে তাকায় বৃন্দার দিকে। বলে কি? বৃন্দা তখন গাইছে]

ঝাঁপ দেবো মাঝ নদীর কোলে রে।

[রাধা বসে খেলা করছে নদীর জলে হাত ডুবিয়ে। বৃন্দ সঙ্গীত:]

ঝাঁপ দেবো মাঝ নদীর কোলেরে—

ওই নৌকা দোলে।

দোলে দোলে দোলেরে, ওই নৌকা দোলে।

দোলে দোলে দোলেরে, ওই নৌকা দোলে।

[চকিতে কানুর মাথায় এক ধান্দা এসে যায়। তাইতো। সে এগিয়ে আসে ঘাটে। বৃন্দ সঙ্গীত ধীরে ধীরে দূরে সরে যায়।]

আকাশ দোলে, বাতাস দোলে,

আকাশ দোলে, বাতাস দোলে,

হিয়া অঙ্গ দোলে রে,

ওই নৌকা দোলে।

[ঘাটে বাঁধা একটা খালি নৌকোয় কানু উঠে বসে। সে একলা। কানু নৌকো বাইতে শুরু করে। গান মিলিয়ে যায় ওপারে।]

দোলে দোলে দোলেরে, ওই নৌকা দোলে।

দোলে দোলে দোলেরে, ওই নৌকা দোলে।

দৃশ্য : ২৮

[গোচারণ ভূমি। গরু চরছে। রাখালেরা গাছের নীচে বসে মুড়ি চিবোচ্ছে। সুবল আর সুমঙ্গল কাছাকাছি বসে। সুমঙ্গল বলে :]

: হঠাৎ, কানুটা কেমন যেন বদলে গেছে!

: চারিদিকে এত অশান্তি, বলাইদাকে ধরে নিয়ে গেছে, আমাদেরও যে কোনো দিন ধরে নিয়ে যেতে পারে, অথচ কানুর কোনও হুঁশই নেই। এসব পাগলামি ছাড়া আর কী?

[এবার সুদাম মন্তব্য করে:]

: ও বুঝছে না, ও আরেক অশান্তি ডেকে আনছে।

[মদন প্রশ্ন তোলে :]

: কেউ যদি ইচ্ছে করে আগুনে হাত পোড়ায়, তাতে আর কী করার আছে?

[বাসব তার বদলা বলে.]

: কিন্তু কানু বদলে গেলে চলবে না। ওর উপর আমাদের অনেক ভরসা।

সুমঙ্গল : এর একটা সুরাহা করা দরকার।

সুবল : ওকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু ও জেদী ছেলে, কারোর কথাই ও শুনবে না।

সুদাম : ব্যাপারটা কি জানিস? ছোট ছোট হাত বাড়িয়ে বিরাট আকাশকে ধরবার চেষ্টা করছে ও।

মদন : যাই হোক, আমরা কিন্তু কিছুতেই জামিদারের কাছে ধরা দেবো না। কিছুতেই বেগার খাটতে যাবো না। এখন থেকে আমাদের একটু সাবধানে থাকা উচিত।

দৃশ্য : ২৯

[এবার ঘরে ফেরার পালা। নদীর ঘাটে সন্ধে নেমে আসছে ধীরে। আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিম দিগন্তে।

হাটের কাছে কানু বসে আছে নদীর ঘাটে। সে মাথায় একটা ফেট্টি বেঁধে নিয়েছে। কানু বোধ হয় অপেক্ষা করছে। আর এই অবসরে কোঁচড় থেকে নিয়ে মুড়ি খাচ্ছে। গ্রামের মানুষেরা ওপারে ফিরছে নৌকোয়। বৃদ্ধ মাঝি হাটের দিকে তাকিয়ে হতাশ হয়ে বলে:]

: কী হলো রে বাবা, গোপ পাড়ার মেয়েগুলো এখনও আসে না দেখছি। কারা যে এত ঘি-ছানা কিনছে কে জানে।

[সবজান্তা কানু তাকে মিথ্যে জেনেও জানান দেয় :]

: গোপপাড়ার মেয়েরা অনেক আগেই তো চলে গেছে। তুমি নিজেই হাট থেকে দেরী করে ফিরলে দাদু।

: সে কি রে! আমি তো গেলাম আর এলাম। তাছাড়া, ওরা যে আমার নৌকাতেই ফিরবে বলেছিলো। এখন কি করি?

: কি আর করবে? বাড়ি ফিরে যাও। ওপারে যাবার আর কেউ বাকী নেই।

[বৃদ্ধ মাঝি এবার নৌকো ছেড়ে দেয়। ক্ষেদোক্তি করে :]

: বড় লোকসান হয়ে গেলো আজ। ফের সেই এক হপ্তা পরে হাট। সকালে উঠে যে কার মুখ দেখেছিলাম।

[কানু এবার চেঁচিয়ে তার সরল মন্তব্যের শর ছোঁড়ে বৃদ্ধ মাঝিকে :]

: তোমার লোকসানটা আবার কোথায় হলো শুনি। এই তো দুপুরে মেয়েগুলোকে ওপার থেকে নিয়ে এলে।...এই বুড়ো বয়সেও তোমার কিন্তু রস কমেনি দাদু।

[মাঝিও শাসিয়ে চেঁচায়:]

: চুপ কর্, বদমাইস কোথাকার।

[কানু হেসে ওঠে।

দুর থেকে দেখা যাচ্ছে : এ গ্রামের লোকেরা নদীর পার ধরে নিজের গ্রামে ফিবে যাচ্ছে। আর গোপপাডাব মেয়েরা সওদা শেষ করে খলবলিয়ে ফিরে আসছে ঘাটের দিকে। কানু বসে আছে ঘাটে। মুড়ি চিবোচ্ছে মহানন্দে। এইবাব।

বৃদ্ধ মাঝি চলেছে ওপারে। খালি নৌকো নিয়ে।

মেয়েবা ঘাটে পৌঁছে এধার-ওধার দেখে। তাদের নৌকো তো নেই। তাছাড়া ঘাটে বাঁধা ছোট্ট একটা নৌকো। একটাই। তার মাঝিকেও দেখছি পেছন থেকে। আসলে কানুই। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। বৃন্দার গলা .]

: সে কিরে রাধা, আমাদের নৌকাটা গেল কোথায়?

[রাধার গলা শোনা গেল :]

: আমরা তো অপেক্ষা করতে বলেছিলাম।

[কানু পেছন ফিবে বসে। সে এবার উত্তর দেয়:]

: তোমাদের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে এই তো চলে গেলো বুড়ো মাঝি। বেচারার লোকসানও হলো আজ।

[চন্দ্রাবলী শঙ্কিত প্রশ্ন করে :]

: এখন কী হবে?

[বিশাখার নিরুপায় উত্তর :]

: ঘাটে তো এখন ঐ একটাই ছোট নৌকো দেখছি।

[ললিতা পেছন ফেরা কানুকে দেখিয়ে বলে :]

: ওরই নৌকো মনে হচ্ছে।

[রাধা ছোট নৌকোর মাঝিকে অনুরোধ জানায় :]

: এই যে শুনছো, আমাদের একটু পার করে দেবে?

[কানু সেইভাবে অন্যদিকে তাকিয়ে উত্তর দেয়।]

: কেন দেবো না? আমি কি এমনি বসে আছি নাকি। তবে আমার এপারের নৌকো, ওপার যেতে বেশী ভাড়া লাগবে।

[মেয়েরা আবার ইতিউতি চায়। যদিবা অন্য নৌকো পায়। কানু এসব দেখছে না। সে তাড়া লাগায়।]

: যাবে ত তাড়াতাড়ি চলো। এক্ষুনি সন্ধে হয়ে যাবে।

[নিরুপায় রাধা অন্যদের বলে .]

: দেরী করে লাভ নেই, চল্ এই নৌকোতেই উঠে পড়ি।

[রাধা এগিয়ে যায় নৌকোর দিকে। পেছন পেছন তার সখীরাও। বৃন্দা মাঝিকে মুখিয়ে বলে:]

: একটা পচা ভাঙা নৌকো, তার আবার ভাড়া বেশী।

[কানুর যেন কোনও তাড়া নেই। সে মুড়ি চিবোচ্ছে। অল্পই আর বাকি। ললিতার গলা শোনা গেল।]

: যা বলেছিস। আগে ভালোয় ভালোয় ওপারে পৌঁছাই, তারপর ভাড়া দেবো!

[কানু হঠাৎই মুখ ফিরিয়ে বলে ·]

: আরে, কী করছো কী!

[এতক্ষণে দেখা গেল রাধা আগবাড়িয়ে উঠে বসেছে নৌকোয়। সঙ্গে তার হাঁড়ি-কলসী। তার পেছন পেছন আবোও দু তিনজন নৌকোয় উঠতে চলেছে। কানু নৌকোর দিকে এগিয়ে এসে বলে ·]

: কী করছো সব। সবাই মিলে উঠে আমার নাও ডুবিয়ে দেবে নাকি?

[কানু বাকি সব সখীকে সরিয়ে দিয়ে নৌকোয় চেপে ঘাট থেকে নৌকো সরিয়ে তাদের সবিনয়ে জানায়]

: আমার ভাঙা নাওয়ে একজনের বেশী জায়গা হয় না।

[রাধা কানুকে চিনতে পেরে উঠে দাঁড়ায় নৌকোয়। অন্য সব সখীরা ঘাটে দাঁড়িয়ে জটলা পাকায়। বাধা বাগতস্বরে কানুকে হুকুম দেয় ·]

: আমি যাবো না। আমাকে এক্ষুনি নামিয়ে দাও।

: আরে বোসো বোসো। নাও ডুবে যাবে যে। দেখই না আমি কেমন নাও চালাই।

[এই বলে কানু দাঁড় টানতে থাকে। নৌকো এগিয়ে চলে তরতরিয়ে। ঘাটে দাঁড়িয়ে একজন অন্যাকে প্রশ্ন করে]

: ঐ মাঝিটা কে রে? ওকে আগে কোনোদিন দেখিনি ত!

[বিশাখা চন্দ্রাবলীব কানে কানে কি যেন বলে। বৃন্দারও কানে তা পৌঁছে গেছে। সে বলে·]

: এইটুকু ছেলে, তার এত সাহস!

[ললিতা শেষ প্রশ্ন করে .]

: কিন্তু, আমরা এখানে কতক্ষণ অপেক্ষা করবো?

দৃশ্য : ৩০

[সন্ধে হয়ে এসেছে। কানু নৌকোয় দাঁড় টানছে। তার শব্দ হচ্ছে। নৌকো পৌঁছে গেছে মাঝ দরিয়ায়। বাধা মুখ নিচু করে বসে আছে। হাঁটুতে চিবুক ঠেকিয়ে। তার পায়ের কাছে খানকয়েক খালি কলসী। কানু তাব মাথা থেকে পট্টিটা খুলতে খুলতে বলে :]

: তুমি মুখ নীচু করে বসে আছো কেন, একবার তাকাও না আমার দিকে।

[অচঞ্চলা রাধা। নির্বিকার। কানু মিনতি জানায় :]

: আমি কী এমন দোষ করেছি, যে আমার সঙ্গে কথাও বলবে না।

[রাধা এবার কথা বলে। গলায় ঘৃণা মিশিয়ে বিরক্ত রাধা বলে :]

: ছিঃ! তুমি আমার এমন অশান্তি করছো কেন বল তো কানু?

: এই তো, তুমি আমার নামও জানো। অথচ এমন ভাব দেখাও যেন আমি একটা মানুষই না।

: তুমি এরকম ভাবে আমাকে একলা নিয়ে চলে এলে কেন?

: তোমাকে নিয়ে আমি পালিয়ে যাবো।

: কী আবোল-তাবোল বকছো। গ্রামের আর কোনো ছেলে ত আমাদের সঙ্গে এরকম ভাবে কথা বলে না। তুমি এরকম পাগলামি করছো কেন?

: আমার পাগলামির জন্য তুমিই দায়ী।

: আমি তোমার কী করেছি?

: তুমি আমায় সর্বস্বান্ত করেছো।

: আমি সখীদের সঙ্গে হাটের পথে যাই আসি। কোনদিন তো অন্য কারুর পানে তাকাইনি। তুমি মিথ্যেই আমাকে দোষ দিচ্ছ। আর তাছাড়া আমি তোমায় সর্বস্বান্ত করবো কেন আর পাগলই বা করবো কি করে?

[কানু এবার জল থেকে দাঁড় তুলে তা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করে :]

: হ্যাঁ, তুমিই আমাকে পাগল করেছো। আমবাগানের পথে সেদিন তুমি কেন অমন করে চোখ দিয়ে হেসেছিলে? কেন তোমাকে দেখতে এত সুন্দর। তোমার যাতায়াতের পথের পাশে কতদিন দাঁড়িয়ে থেকেছি, তুমি ভ্রুক্ষেপও করো না। আসলে তুমি দেখতে ঠিকই পাও, আর আমাকে দেখেই না তুমি সেদিন চুল বাঁধার ভঙ্গী করে দু'হাত ওপরে তুলেছিলে? সে তো আমাকে পাগল করার জন্যেই। আরেকবার মুখ মোছার ভান করে তুমি তোমার বুকের রেশমী আঁচল সরালে, সেও তো আমাকে তোমার অতি সুন্দর দুটি পয়োধর দেখাবার জন্যে। তাই না?

. ছি ছি ছি, তোমার মতিচ্ছন্ন হয়েছে।

[নৌকো এখনও মাঝদরিয়ায়। কানু দাঁড় হাতে রেখে আরাম করে নৌকোয় বসে বলে:]

: যদি তাই হয়, তাহলে আমাকে সারিয়ে তোলার উপায়ও তোমার হাতে।

: কী সে উপায়?

[উপায়? কানু আদুরে আব্দার করে :]

: এসো, তুমি আমার বুকে এসো!

[একথা শুনে রাধা লজ্জায় চোখ নামায়। তার কর্ণমূল ও গালে রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়লো। মুখ যেন কুমকুম মাখানো স্থলকমল। তার দু-চোখে অশ্রুধারা। কানু রাধাকে বলে :]

: তুমি যখন স্নান করে ফেরো, তোমার চুল থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরে, তাই দেখে মনে হয়, যেন চাঁদের ভয়ে অন্ধকার কাঁদছে। তোমার বুকের ওপর ভিজে কাপড়... ঠিক যেন... ঠিক যেন দুটো সোনার বাটি উল্টো করে বসানো। কিংবা...

[রাধা এবার সর্বাঙ্গ বসনে ভাল করে ঢেকে হাতে মুখ রেখে বলে :]

: চুপ করো কানু। কেন আমাকে এসব কথা বলছো? আমি তোমার থেকে বয়সে বড়। তাছাড়া সম্পর্কে তোমার আত্মীয়।

: ইস্, সাত জন্মে দেখা নেই, সে আবার আত্মীয়। তুমি আমাদের বাড়িতে এসেছো কখনো।

: কারুর বাড়িতে যাওয়া আমার নিষেধ।

: তবে? আর বয়সের কথা বলছো, সুন্দরের কোনো বয়স আছে নাকি?

: আত্মীয়তা যদি নাও মানো, তাহলেও একথা তো মানবে যে আমি পরের বউ।

[একথা বলে রাধা ভেঙে পড়ে কান্নায়। কানু স্থির নেত্র রাধাতে। ক্রন্দনরতা রাধা কানুকে মিনতি জানায় :]

: আমার এমনিতেই অনেক কষ্ট, তুমি আর আমাকে কষ্ট দিও না।

: রাধা, তুমি যার বাড়িতে বউ হয়ে আছো, তা থাকো। কিন্তু এখানে তো এটা কারো বাড়ি নয়। এখানে মাথার ওপরে আকাশ, চারিদিকে কোনো দেয়াল নেই। এই যে আকাশ বাতাস দশদিক, এখানে আমার মনে হয়, আমিই সবকিছুর অধিপতি। রাজা। এখানে তুমি আমার।

[চমকে তাকায় রাধা কানুর দিকে। চোখে বাধ-না-মানা জল। ঠিক এমনি সময়ে ঘন মেঘে ঢাকা আকাশে শোনা গেল বজ্র নির্ঘোষ। শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছে রাধা প্রশ্ন করে :]

: তুমি কিসের রাজা? তুমি চোর। তুমি চোরের মতন আমাকে চুরি করে নিয়ে যেতে চাইছো।

: আমি মোটেই চোর নয়। আসলে তুমিই চোর।

: আমি চোর? তুমি আমাকে এমন কথা বলতে পারলে? আমি কোনোদিন কিছু চুরি করিনি। তুমি সবাইকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো।

: তুমি অনেক কিছু চুরি করেছো। তুমি বড় ঘরের মেয়ে। তোমাদের পক্ষে চুরি করা অনেক সহজ। গরিবেরা আর কি চুরি করবে?—তার চেয়ে তোমরাই বেশি চুরি করো। বিশেষ করে তুমি।

: কি বলছো তুমি। কেন আমার নামে নিন্দে করছো?

[দুষ্টু হেসে কানু তার জবাব দেয় :]

: নিশ্চয়ই করবো। একশোবার করবো। শোনো, তুমি শ্রীমতী রাধা একটি মস্ত বড় চোর। শোনো রাধা, চাঁদের কিরণ চুরি করে তুমি তোমার হাসিতে রাখোনি?

রাধা ব্রীড়াবনতা। দুষ্টু কানু মিষ্টি হেসে বলে :

: সোনার রং চুরি করে রেখেছো নিজের গায়। হরিণের কাছ থেকে চুরি করেছ তার চোখ, মদনের ধনুকটা চুরি করে রেখে দিয়েছ তোমার ভুরুর মাঝখানে। মরালীকে নিঃশেষ করে তৈরি করেছ তোমার গলা আর কোকিলের সুর চুরি করে রেখেছো তাতে। সুমেরু পাহাড়ের চূড়া তোমার বুকে।

[শেষ কথা শুনে লজ্জিতা রাধা তার বুকের আঁচল টেনে কানুকে মিনতি জানায় :]

: না। এভাবে কথা বলো না।

: কেন বলবো না?

: একদিক লজ্জায় রাঙামুখ রাধা। অন্যদিকে কানু। সে অনর্গল বলে চলেছে:

: সিংহের কাছ থেকে তুমি চুরি করেছ তার কোমরের খাঁজ। কলাগাছ গুঁড়ি তোমার উরুতে। তম্বুরা চুরি করে রেখেছো নিতম্বে। আর পদ্মফুলের কোমলতা রেখেছো তোমার পায়ে। একসঙ্গে এতোগুলো চুরি আর কে করতে পারে? আকাশে পুঞ্জীভূত কালো মেঘ। প্রচণ্ড ঝড়ের সম্ভাবনার প্রস্তুতি। এবং তারই বজ্রনির্ঘোষ শোনা গেল। বিদ্যুতের ঝলকানি। সব কিছু উপেক্ষা করে কানু তার শেষ অনুযোগ জানায় :

: তার থেকেও বড় কথা, তুমি চুরি করেছো আমার মন। এর পরেও তুমি আমাকে চোর বলবে?

[আবার চমকে উঠল বিদ্যুতের ঝলাকানি। ঝড়ের পূর্বাভাস। নৌকো দুলছে প্রচণ্ড বাতাসে। রাধা চারদিকে তাকিয়ে সভয়ে বলে :]

: আমার ভয় করছে।

[কানু দাঁড় থামায়। বীর বিক্রমে বলে :]

: কিসের ভয়! আমি তো আছি। তুমি আমার কাছে এসো।

: না, না, তা হয় না।

. তুমি এতটুকুও দয়া করবে না?

: তুমি আমাকে আর কষ্ট দিও না।

[কানু উঠে দাঁড়ায়। নদী ফুলে উঠছে ঝড়ের আগাম আভাসে :]

: একি! তুমি নৌকো বাইছো না কেন? নৌকো দুলছে যে! আমাকে জোর করে তুলে এনে এখন তুমিই আমাকে মাঝনদীতে ডুবিয়ে দিতে চাইছো?

[সত্যি সত্যিই ঝড় উঠেছে। সাথে বিদ্যুতের ঝলকানি। নদীতে উত্তুঙ্গ ঢেউ। নৌকো দুলছে মাঝদরিয়ায়। কানু বলে]

: ডুবতে গেলে মাঝ নদীতেই ডোবা ভালো।

না কানু, আমি ডুবতে চাই না। কেন ডুববো?

: ডুবলে দুজনেই ডুববো। বাঁচলে আমরা দুজনেই বাঁচবো।

[রাধা নৌকো আঁকড়ে বসে। নৌকো কাত হয়ে পড়েছে একদিকে। সকাতরে রাধা বলে]

: এই, এই, নৌকাটা কাত হয়ে যাচ্ছে যে!

: নাওটা বেশী ভারি হয়ে গেছে। এত জিনিসপত্র থাকলে আজ আর পাড়ে পৌঁছানো যাবে না। সব ফেলে দাও জলে।

: শুধু তো কয়েকটা ফাঁকা কলসী।

: নিজে বাঁচতে চাও, না ওগুলো রাখতে চাও?

[আবার আকাশের বুকে বিদ্যুৎ চমক। বজ্রপাতের শব্দ। ভীতা রাধা বলে :]

: দিচ্ছি দিচ্ছি।

[রাধা একটা কলসী নদীতে ফেলে দেয়। কানু এগিয়ে এসে অন্যটাও ফেলে দেয় নদীতে। তারপর রাধার সর্বাঙ্গে নজর চালিয়ে বলে :]

: উঁহুঃ, এখনো ভারি ভারি লাগছে। গায়ের গয়নাগুলোও ফেলে দাও।

[এই বলে সে ফিরে এসে বসে নিজের জায়গায়। রাধা চমকে তাকায় কানুর পানে। বিস্ময়ে সে বলে :]

: কী বলছো! সামান্য এই গয়না!

[নৌকো দুলছে। কানু রাধার নজর কেড়ে বলে :]

: এই দেখ, নাওয়ের ফুটো দিয়ে জল ঢুকছে। এখনো তো তবু বৃষ্টি নামেনি।

[সত্যিই একটা ছোট্ট ফুটো দিয়ে নৌকোয় জল ঢুকছে। কানু বলে :]

: চটপট সব ফেলে দাও। নাও উল্টে গেলে ঐ সামান্য গয়নাই অনেক ভারি ঠেকবে।

[রাধা তার গায়ের গয়না খুলতে শুরু করে। কানু দেখছে। রাধা একে একে সব গয়নাই নদীতে ফেলতে শুরু করে। ঝড়েব ঘূর্ণীতে নৌকো ঘুরপাক খায় মাঝদরিয়ায়। কানু রাধাকে সর্তক করে বলে :]

: এখনো ভারি ভারি লাগছে।

[কিন্তু দুষ্টু কানু তাতেও ঠিক সন্তুষ্ট নয়। সে কপট দুশ্চিন্তার সঙ্গে বলল :]

: উঁহু. এখনো যেন নাওটা ভারি ঠেকছে।

রাধা বললো : দামি যা কিছু ছিল সবই তো ফেলে দিয়েছি।

: না তো! সব তো দাওনি। ঐ যে তোমার গলায় রয়েছে মুক্তোর মালা। বাজুতে সোনার তাগা। কোমরের গোঠ, পায়ের মল। ওগুলোও কি কম ভারি নাকি? দেখো, আমি রাখাল, আমার কিছুই নেই। তোমার এতো কিছু আছে বলেই এত জ্বালা।

[রাধা গা থেকে একটি একটি করে অলংকার খুলতে খুলতে পরম মায়াভরে বলে :]

: এগুলো সবই ফেলে দিতে হবে।

: তা তো হবেই।

[সব অলংকার টুপ টুপ করে খসে পড়ল নদীর জলে। তবু নৌকো টলমল করে। কানু বলল :]

: এখনো কিন্তু নাওটা ভারি ঠেকছে।

[সম্পূর্ণ নিরাভরণ মরিয়া রাধা এবার গলায় মিনতি মিশিয়ে অনুযোগ করো :]

: কেন ভয় দেখাচ্ছো। যা ছিল সবই তো ফেলে দিয়েছি। আর কী ফেলবো।

: না, সব তো দাওনি।

: দিই নি? আর কী বাকি আছে?

: কেন, তোমার লজ্জা।

[মেঘ ডাকার প্রচণ্ড শব্দ। বিদ্যুতের ঝলকানি। বিস্ময়ে বিমূঢ় রাধা ভয়ে আতঙ্কে সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়ে কানুকে আঁকড়ে ধরে। ঢেউ এসে ভেঙ্গে পড়ছে নৌকোর গায়ে। নৌকো দুলছে। কানুও রাধাকে জড়িয়ে ধরে আপন বুকে। তারপর স্বান্ত্বনা দেয় রাধাকে:]

: এই ভাবে যদি ধরে থাকো, তাহলে তোমাকে যে কোনো নদী পার করে দিতে পারি।

[রাধা তার চিবুক রাখে কানুর কাঁধে। প্রচণ্ড বাতাসে তার চুল উড়ছে। রাধার চোখে জল। সে কানুর কাছে জানতে চায় :]

: আমি প্রাণের ভয়ে যদি তোমাকে একবার ধরি, তাতে কি কোনো পাপ হয়?

: পাপ পুণ্যের কথা অন্য লোক ভাবে, ওসব আমার মাথাতেই আসে না।

: কানু, তুমি আমার এ কী করলে?

[কানু বসে আছে রাধাকে কোলে নিয়ে। আবার বজ্রপাত। আর সাথে ঝোড়ো হাওয়া। কানু বলে:]

: এসো, এবার দুজনে এক সঙ্গে ডুবি।

[সাধু সান্দীপনী নদীর এপারে ঘাটে দাঁড়িয়ে। ক্যামেরা তারও পেছনে। দূরে মাঝদরিয়াতে নৌকো উল্টে গেল। রাধাকে একহাতে জড়িয়ে ধরে কানু সাঁতার কেটে এপারে আসছে। মরকত মণি দিয়ে গড়া তবণীর মত কানু আর বুকের ওপর রাধা কোন এক অজানা দেশের শ্বেতহংসী। সান্দীপনী সাধু ঘুরে প্রথমে দেখলেন ক্যামেরা। সারা পর্দা জুড়ে তাঁর মুখ। তিনি মৃদু হেসে দর্শকদের জানালেন:]

: একেই বলে লীলা... মানে লীলাখেলা আর কি!

দৃশ্য : ৩১

[আয়ান ঘোষের বাড়ির সামনে সন্ধে উতরে গেছে। ঝড়ও থেমেছে। বন্ধ সদর দরজায় মৃদু টোকা।

আয়ান ঘোষের বোন মন্দাকিনী এগিয়ে এসে দরজা খুলে দেখে : রাধা ফিরে এসেছে এতক্ষণে। তার সর্বাঙ্গ ভিজে। মন্দাকিনী জিগ্যেস করে :]

: ওমা, এতক্ষণ কোথায় ছিলি বউ? সবাই চিন্তা করছি তোর জন্য। ...একি!...

[এবার বিস্ময়ে মন্দাকিনী বলে :]

: সারা গা ভেজা, মাথা ভর্তি জল...। আজকে ঝড় হয়েছিল বটে, কিন্তু বৃষ্টি তো পড়েনি!

[রাধা এবার তার কান্নাভেজা চোখ তুলে মন্দাকিনীর দিকে নির্বাক তাকায়। মন্দাকিনী দেখে, রাধাব গা শুধু ভেজা নয়, সে নিরাভরণ। রাধার গলায় হাত বুলিয়ে শুধোয় .]

: আরে! তোর গয়নাগুলো কোথায় গেল? হার, দুল কিছুই নেই। কী হয়েছে কী?

[রাধা নিবাক। মন্দাকিনী আবার জিগ্যেস করে ·]

: চুপ করে রয়েছিস কেন? ডাকাত-টাকাত ধরেছিলো নাকি?

[রাধা তাকায় মন্দাকিনীর দিকে। কথা নয়, শুধু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। মন্দাকিনী চমকে বলে:]

: অ্যাঁ!

[তারপর পরের প্রশ্ন

কোথায়? এক্ষুনি দাদাকে ডাকছি, কার এত সাহস আছে যে আয়ান ঘোষের বউ-এর গায়ে হাত দেয়?

[এবার রাধা বলে :]

: না... না... ডাকাত না। ডাকাত না।

: তবে কে? চোর?

[রাধা প্রায় হ্যাঁ বলতে গিয়ে বলে :]

: না, না, চোর না।

: কী বলছিস, মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না। কে নিয়েছে তোর গয়না? এই সন্ধে বেলা কোথায় ডুব দিতে গিয়েছিলি? ঠিকমত উত্তর দিচ্ছিস না কেন?

[রাধার দু'চোখে জল। সে কান্নায় ভেঙে পড়ে ডুকরে ওঠে :]

: দিদি...

: কাঁদছিস কেন? সব খুলে বল্ আমাকে, ভয় নেই।

: আমি ডুবে গিয়েছিলাম... বিশ্বাস করো, আমি ডুবে গিয়েছিলাম।

[মন্দাকিনীর সন্দেহ হয়। সে জেরা করে :]

: মিথ্যা কথা বলছিস, ডুবে যাবার পর আবার বেঁচে উঠে ফিরে এসেছিস তুই! কী কাণ্ড করে এসেছিস আজ?

[রাধার দু'নয়নে অশ্রু প্লাবন। মন্দাকিনী শুনিয়ে যায় :]

: আমি এক্ষুনি গিয়ে দাদাকে বলছি।

[রাধা চোখের জল মোছে। সংযত করে নিজেকে।]

দৃশ্য : ৩২

[রাত্রি। আয়ান ঘোষের শোবার ঘর। সে খাটে বসে হুঁকো খাচ্ছে। রাধা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। তার দৃষ্টি আনত। আয়ান বলে :]

: তুমি বড়লোকের মেয়ে, আমাদের বাড়িতে তোমাকে অনেক খাটতে হয়, তোমার কষ্ট হয় জানি।

: না, আমার কষ্ট হয় না।

[আয়ান তার হুঁকোতে লম্বা একটা টান দিয়ে বলে :]

: তুমি তো জানোই যে, আমার বিয়ে করার কোনো ইচ্ছে ছিলো না। জোর করে সবাই মিলে আমার বিয়ে দিলে? তোমার বাবা বললেন, তোমার কুষ্ঠীর সঙ্গে আমার কুষ্ঠীর যা মিল, তাকেই বলে রাজযোটক। একমাত্র আমার সঙ্গেই তোমার বিয়ে হতে পারে।

[রাধা শুনছে।]

তাই, তুমি মনে রেখো যে, আমাকে বিয়ে করে তোমার সুখী হওয়া না হওয়া, সবই তোমার নিয়তি।

[আয়ান আরও জানায়

: তোমাকে হাটে যেতে হয়, মাথায় করে জিনিস বইতে হয়। ...চিরকাল আমাদের বৌয়েরা এই কাজই করে এসেছে। কিন্তু কাল থেকে তোমাকে আর হাটে যেতে হবে না।

[রাধা চোখ তোলে। দেখে আয়ানকে। আয়ান যুক্তি দিয়ে বোঝায় :]

: বাড়ির বাইরে বেশীক্ষণ থাকলে তোমার যদি কোনো দুর্নাম রটে, তাহলে তোমার মা-বাবাই বেশি দুঃখ পাবেন। সেজন্য, কাল থেকে তুমি বাড়ির বাইরেই আর বেরিও না।

[রাধা তার স্বামী আয়ানের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে অস্ফুটে বলে ।]

. আচ্ছা।

দৃশ্য : ৩৩

[গভীর রাত্রি। একটা গাছের নীচে বেদীতে বসে কানু বাঁশি বাজাচ্ছে।

রোহিণী তার ঘরে জানলা খুলে বাইরে উঁকি মারে। সে দেখে কানু বাঁশি বাজাচ্ছে।

কানুকে দেখে রোহিণীর কান্না আসে।

সে চিন্তায় বিভোর।

হরিমোহন শুয়েছিলেন বিছানায়।

তিনি জিগ্যেস করেন]

এত রাতে আবার বাঁশি বাজাচ্ছে কে?

[হরিমোহনের স্ত্রী বিদ্যা প্রদীপ নিবিয়ে উত্তর দেন]

কানু। বেশ বাজাচ্ছে, না?

. সারাদিন বেগার খেটে, আধপেটা খেয়ে. আমার আর কিছুই ভালো লাগে না।

[বিদ্যা এগিয়ে খাটে বসতে বসতে বলে]

আমি কিছু সময়ের জন্য অন্তত খিদেটা ভুলে গিয়েছিলাম।

[কানুর বাঁশি বেজেই চলেছে।

বদন তার ঘরে বিছানায় জ্বরে কাতরাচ্ছে। বদনের বউ তার মাথায় ঠাণ্ডা জলপট্টি দিতে দিতে পাখা করছে। প্রদীপ জ্বলছে। দূর থেকে ভেসে আসছে বাঁশির করুণ মূর্ছনা। বদনের বউ এবার বদনের কপালে হাত দিয়ে জ্বর অনুমান করতে চেষ্টা করে। সে বলে]

ইস, কপালটা একেবারে পুড়ে যাচ্ছে। কী যে করি।

[বদন কাতরায়। আবার নতুন করে মাথায় জলপট্টি দিতে দিতে বলে]

এমন পশুর মতন কেউ মারে।

জমিদারের মার কি এই প্রথম?

খুব কষ্ট হচ্ছে, না? তুমি কথা বোলো না।

[বদন জ্বরের ঘোরে জিগ্যেস করে]

আমি মরে গেলে, তোমার কি হবে?

অমন অলুক্ষুণে কথা বোলো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

জল। একটু জল দাও।

[কানুর বাঁশি শোনা যাচ্ছে।

যশোদা তার ঘরে বিছানায় শুয়ে কানুর চিন্তা করছেন। কানুর বাঁশি শুনছেন। নন্দও শুয়ে। তাঁর দুচোখ খোলা। চিন্তিত তিনিও।

যশোদা বলেন]

কানুর বোধ হয় রাখালের কাজ আর ভালো লাগছে না। রোজ ওর বন্ধুরাই

গরুগুলোকে চরিয়ে দিয়ে যায়।

: কী করবে তাহলে? আমার মত ক্ষেতে জন খাটবে?

[কিছুক্ষণ চিন্তা করে যশোদা উত্তর দেন]

: আমাদের যে চাষের জমিটা তুমি মহাজনকে বন্ধক দিয়েছিলে, সেটা উদ্ধার করা যায় না? তাহলে কানু চাষবাস নিয়েই থাকতো। একটু আয়ও হতো।

[নন্দ তাকালেন যশোদার দিকে। বললেন :]

: দেখি। মহাজনের বাড়ি তো আর কাছে নয়। যাবো একদিন।

দৃশ্য : ৩৪

সকাল। বদনের বাড়ির সামনে জনসমাগমে মৃদু গুঞ্জন। প্রত্যেক মুখই বিষাদক্লিষ্ট। তাদের মধ্যে কারুর চোখে জলের ধারা।

বদনকে এবার দেখা গেল। সে বাড়ির বাইরে উঠোনে একটা খাটে শুয়ে। তার দু'নয়ন মুদ্রিত। সে মৃত।

বদনের বউ নির্বাক। চোখে কোনও জল নেই। কেঁদে কেঁদে কালরাত্রেই তা শেষ হয়ে গেছে। গ্রামের কিছু এয়োতী তাকে ঘিরে বসে। এদের মধ্যে আছে বিদ্যা, রোহিণী এবং আরও কয়েকজন।

বদনের মৃতদেহ। কিছু মাছি উড়ছে। সাধু সান্দীপনী গ্রামের পথ দিয়ে এদিকেই আসছে। এবার সে দাঁড়ায়। তার নজর পড়ে অন্য আরেকটা জটলায়। তাতে আছে সুবল সুমঙ্গল বাসব মদন সুদাম অন্য অন্য রাখালেরা। কানু আসতে এরা সবাই তাকে ছেঁকে ধরে। সবার আগে সুবলই জানায়:

: কানু। বদন কাকা মারা গেছেন। আজ আমরা কেউ গরু চরাতে যাবো না। তুইও আমাদের সঙ্গে শ্মশানে চল।

: মারাই যখন গেছে, তখন আর কী করতে পারি। তোরা শ্মশানে যা। আমার ওসব ভালো লাগে না।

এই বলে কানু কেটে পড়ে।

সাধু সান্দীপনী কানুর এই কথায় রুষ্ট হন, তার ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হন। কানু তখন হনহনিয়ে চলেছে অন্যপথে। সুবল সুমঙ্গল নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে মৃতদেহের দিকে এগোয়।

সাধু সান্দীপনীর দূরদৃষ্টি কানুতে।

দৃশ্য : ৩৫

[আমবাগানে কানু একা। তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে বালি পড়ছে। কানু আবার তা মুঠিভর তুলে আবার ছেড়ে দেয়। আবার।

আনমনা কানু অপেক্ষা করছে রাধার জন্যে। রাধা তার সখীদের নিয়ে এই পথেই ফিরে যায়।

আজ আমবাগান ফাঁকা। কেউ নেই। দূরে দেখা যাচ্ছে বদনের মৃতদেহ বয়ে নিয়ে চলেছে রাখালেরা। কানু অধৈর্য হয়ে চারদিকে তাকায়। শুকনো পাতায় কাদের যেন পায়ের শব্দ। দূরে দেখা গেল সখীদের। ললিতা, বৃন্দা, চন্দ্রাবলী আর বিশাখা। তারা স্নান সেরে ফিরে আসছে।

কানু উঠে দাঁড়ায়। আবার লক্ষ্য করে। না, রাধা নেই। কানু চিন্তিত। তার হাতের মুঠি শক্ত।

অধৈর্য কানু মুঠি খুলে ছুঁড়ে ফেলে মাটিতে। বালি।]

দৃশ্য : ৩৬

[বিকেল। আয়ান ঘোষের বাড়ি। রাধা তার নিজের ঘরে। তার ধাইমা বলে :]

: তোর কী হয়েছে বলতো?

[রাধা দূরে দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে আছে তার জানালার কাছে। বাইরে থেকে মনে হচ্ছে রাধা বন্দিনী—জানালাব গরাদে। রাধার পরনে গৈরিক রং-এর চওড়া লাল পেড়ে শাড়ি। তার দুচোখে জল। নিরুত্তর রাধাকে ধাই মা আবার প্রশ্ন করে :]

: ক'দিন ধরেই দেখছি, তুই ভালো করে খাস না, আমার কাছে চুল বাঁধতেও আসিস না। এমন শুকনো দড়ির মত চেহারা করছিস কেন?

[রাধার দুচোখে অশ্রুধারা। সে বলে :]

: বুড়ি মা, আমার মরণ হয় না কেন?

[ধাইমা রাধাকে জোর করে নিজের দিকে ফিরিয়ে বলে :]

: বালাই ষাট, তুই আবার মরতে যাবি কোন দুঃখে।

: মরণ ছাড়া আমার আর গতি নেই।

: যুবতী মেয়ের তো মরণ অনেক রকম। দেখি, তুই কোন মরণে মরছিস!

[রাধা তার চোখের জল মোছে। ধাইমা তাকে খুঁটিয়ে দেখে জিগ্যেস করে :]

: কোন হতচ্ছাড়া তোকে এমন করলো রে?

দৃশ্য : ৩৭

[আজ হাটবার। হাট বসেছে। দোকানীরা বসেছে তাদের সওদা সাজিয়ে। দূরে দেখা গেল কানু আসছে। পর্দা জুড়ে কানু। সে এক দোকানীকে বলে :]

: শোনো, তোমার সাথে আমার কথা আছে।

[এবার দোকানীকে দেখা গেল। সে আর কেউ নয়, বৃন্দা। বৃন্দার পাশে তার অন্য সখীরা। রাধা নেই। বৃন্দা চোখ বড় বড় করে কানুকে দেখে। অবাক হয়ে প্রশ্ন করে :]

কার সাথে কথা আছে? আমার সাথে?

: এখানে আর কে আছে? আমি তোমাকেই তো ডাকছি।

[বৃন্দা উঠে দাঁড়ায়। কানু আর বৃন্দা এখন মুখোমুখি। বৃন্দা বলে :]

: বেশ, কী কথা বলো। আমার কাজ পড়ে আছে তাড়াতাড়ি করো।

রাধার কী হয়েছে? ওকে আর হাটে দেখি না, ঘাটে দেখি না, কোথাও দেখতে পাই না কেন?

: ওকে আর কোনোদিন দেখতে পাবে না। ও ভীষণ ভয় পেয়েছে।

: কাকে ভয় পেয়েছে? কিসের ভয়?

: কিসের ভয় পেয়েছে জানো না? বাঘের ভয় পেয়েছে। ভয়ে আধমরা হয়ে গেছে।

: তোমাদের সাথে ওর দেখা হবে?

: সে সব খোঁজে তোমার দরকার কী? শোনো, রাধা পরের ঘরের বউ, তুমি ওর অশান্তি আর বাড়িও না।

[কানু কিছু একটা ভেবে বলে :]

: তোমাদের সঙ্গে দেখা হলে বোলো যে আমার অশান্তি কম না।

: আচ্ছা আচ্ছা সে বলবোখন, এখন তুমি বিদায় হও দেখি। হাটের মাঝে দাঁড়িয়ে আমাদের কলঙ্ক আর বাড়িও না।

[বৃন্দা তার পসরার পেছনে বসে পড়ে। তাকায় কানুর দিকে। সে ফিরে চলেছে। ললিতা মন্তব্য করে :]

. যাই বলিস, এক হাতে কখনো তালি বাজে না। যেদিনই ছোঁড়াটা ওকে নৌকোয় নিয়ে পালালো, সেদিন ও ডুবেছে।

বিশাখা : এ আবার কেমনতর কথা বলছিস? রাধা ডুবতে যাবে কেন?

চন্দ্রাবলী : সেই ডোবার স্বাদ তোরা কি জানিস! যদি ডুবতে চায়, তোরা বাঁচাতে পারবি?

বৃন্দা : বেচারি রাধা! ওর ঘরেও দুঃখ, বাইরেও দুঃখ।

[সাধু সান্দীপনীও এখানে। এই হাটে। সে সুর করে বলে :]

পীরিতি পীরিতি

কি রীতি মূরতি

হৃদয়ে লাগিল সে।

পরাণ ছাড়িলে

পীরিতি না ছাড়ে,

পীরিতি গড়িল কে?

দৃশ্য : ৩৮

[আমবাগান। কানু। একা। বাঁশি বাজাচ্ছে। আমবাগানে কানু একা বাঁশি বাজাচ্ছে।]

দৃশ্য : ৩৯

[রাত্রি। আয়ান ঘোষের বাড়ি।

রাধা জানালার ধারে একাকিনী বসে। তন্ময়। বাঁশির সুর ভেসে আসছে বাতাসে। রাধা নিষ্পলক চেয়ে আছে বাইরে। তার শরীর অবশ। সাদা শাড়িতে রাধা যেন বিমূর্ত বেদনা।

মন্দাকিনী দরজার বাইরে থেকে রাধাকে দেখে। উন্মনা রাধা। সে চলে যায়। রাধা এখন পাথর প্রতিমা। আর তার মন? বহুদূরে।

ধাই মার গলা শোনা গেল :]

: রাধা... ও রাধা মা!

[রাধা সম্বিৎ ফিরে পায়। ধাই মা এবার দরজার কাছে এসে বলে :]

: বুঝেছি মা বুঝেছি। আমিও কয়েকদিন ধরে শুনতে পাচ্ছি। অনেক রাত্তির পর্যন্ত আমবাগানে বসে বাঁশি বাজায় ছোঁড়াটা। ...এখন চল দেখি, দুটি মুখে দিবি চল।

দৃশ্য : ৪০

[সেই একই রাত। নন্দ ঘোষের কুটির। সবাই ঘুমিয়ে। দুটি প্রাণী ছাড়া। যশোদা আর নন্দ। যশোদা বলে :]

: ছেলেটা যে কত রাত পর্যন্ত বাইরে বাইরে ঘোরে বড় চিন্তা হয়।

: শুনেছি ও কোথায় নাকি বসে বসে বাঁশি বাজায়। না, ওর ভালো লাগে যখন বাজাক না।

[যশোদা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। বাঁশির সুর এখানে এসে পৌঁছয় না। যশোদা জিগ্যেস করেন.]

: মহাজনের কাছে গিয়েছিলে নাকি?

: হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। ও জমির আশা ছেড়ে দাও।

: কেন?

: কোনো প্রমাণ নেই। তাছাড়া যে কাগজে আমি টিপছাপ দিয়েছিলাম তাতে নাকি এই কথা লেখা আছে যে জমিটা আমি মহাজনকে বিক্রী করে দিয়েছি।

[এ কথা শুনে যশোদা খাটে উঠে বসে বলেন :]

: তার মানে? তুমি মাসে মাসে বন্ধকীর দেনা শোধ করলে যে!

: বললাম তো, কোনো প্রমাণ নেই। ওদের সাথে আমরা পেরে উঠবো না যশোদা।

[ঠিক এই সময়ে সুমঙ্গলের গলা শোনা গেল। সে চেঁচিয়ে ডাকছে .]

. কানু! কানু! একবার বাইরে আয় তো।

[নন্দ উঠে বসেন খাটে। উত্তর দেন :]

: কে? দাঁড়াও যাচ্ছি।

[শঙ্কিত। যশোদা প্রশ্ন করেন :]

: আবার জমিদারের পেয়াদা এলো নাকি?

[নন্দ সদর দরজা খুলে প্রশ্ন করেন :]

. কি ব্যাপার? এত রাতে...

[বাইরে সুমঙ্গল সুদাম আর সুবল। তারা শঙ্কিত। সুমঙ্গল জানায় .]

: বিরাট ব্যাপার হয়েছে নন্দ কাকা, বদন কাকার বউ গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

. অ্যাঁ, সে কি!

সুবল : আপনি চলুন কাকা।

: জানতুম, এরকম একটা কিছু হবেই।

[দূর থেকে ভেসে আসছে কান্নার শব্দ।]

দৃশ্য : ৪১

[সেই রাত। কানুর বাঁশি শোনা যাচ্ছে। সাধু সান্দীপনী তাঁর আশ্রমের দাওয়ায় চুল্লী জ্বালিয়ে বসে আছেন। সঙ্গে তাঁর দুই শিষ্য। তাদের একজন সাধুকে বলে :]

: চলুন আমরা অন্য গ্রামে চলে যাই। এই গ্রামে মড়ক লেগেছে।

: সারা দেশেই মড়ক লাগবে। ক্ষিদের জ্বালা বড় জ্বালা। সবাই তো আর আমাদের মত ভিক্ষে করতে পারবে না।

[দ্বিতীয়জন মুখ নিচু করে বসে আছে। কানুর বাঁশির শব্দ শোনা যাচ্ছে। সাধু সান্দীপনী বিরক্তি নিয়ে বলেন :]

: উফ্, এই সময়ে কানুটা বাঁশি বাজিয়ে চলেছে? আরে বাবা আগুনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকলেই কি আর আগুনের হাত থেকে বাঁচা যায়?

দৃশ্য : ৪২

[রাত। বাঁশি তখনও বাজছে।

রাধা তার বিছানায় উঠে বসে। সাদা শাড়ি। রাধা বেছে নেয় নীল রং-এর শাড়ি। সাবধানে সে বদলে নেয় নিজেকে। আয়ান ঘোষ তাঁর ঘরে নিদ্রিত। বাঁশি বাজছে। মন্দাকিনীও নিদ্রিতা। বাঁশি বাজছে। আর ধাই মা। সেও ঘুমোচ্ছে। রাধা পা টিপে সদর দরজায় এসে খুব সাবধানে দরজা খোলে। নিঃশব্দে।]

দৃশ্য : ৪৩

[রাত। কানু বাঁশি বাজাচ্ছে। একা। তন্ময়। আনমনা। জ্যোৎস্নালোকিত আমবাগান। দূরে দেখা গেল রাধা আসছে। নীলাম্বরী রাধা। রাধাকে দেখতে পেয়ে কানু বাঁশি থামায়। চমকে ওঠে। রাধা কাছে এসে প্রশ্ন করে]

: তুমি এত রাত পর্যন্ত আমাকে বিরক্ত করছো কেন? তুমি এত নিষ্ঠুর? আমার গায়ে কলঙ্ক লেপে তোমার কি লাভ?

[কানু উঠে দাঁড়ায়। সে পাল্টা প্রশ্ন রাখে :]

: তুমি নিজে তো পাগল হয়েছো, আমাকেও পাগল করছো কেন?

[কানু এগিয়ে যায় রাধার সামনাসামনি। রাধা এক পা পিছিয়ে যায়। কানু প্রশ্ন করে :]

: তুমি পিছিয়ে যাচ্ছো কেন? পায়ের কাছে একটা পোকা এলেও মানুষ তার দিকে দেখে। আমি কি পোকা মাকড়ের থেকেও অধম?

: এই রাত্তিরে... সব লজ্জা-ভয় তুচ্ছ করে আমি ছুটে এসেছি... সে কি কোনো পোকা মাকড়ের জন্য?

[কানুর মুখ এবার উদ্ভাসিত।]

: তাহলে, আমরা এ দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাই।

: না। তা হয় না। আমাকে বোঝো না কেন?

: আমার দিকে তাকিয়ে দেখো।

: আমার আর চোখ নেই, আমি অন্ধ।

: আমার কথা মনে পড়ে না তোমার?

: আমার মন নেই আমার বুকটা একটা শূন্য খাঁচা।

[কানু রাধার হাত চেপে ধরে মিনতি জানায় :]

: তুমি চলে যেও না, অনেক সাধনা করে তোমাকে পেয়েছি।

: আমাকে ছুঁয়ো না ...আমার কষ্ট হয়।

[রাধা তার হাত ছাড়িয়ে নেয়। কানু অনুনয় করে :]

: তাহলে তোমার পায়ের কাছে বসতে দাও।

: আমার আর পাপের বোঝা বাড়িও না, কানু।

: ধুলো আর কাদাই যার পাওনা, সে আর বেশি কি পাবে?

[রাধার চোখ ভিজে আসে। সে বলে :]

: ও কথা বোলো না, ও কথা বোলো না। তুমিই আমার সব, আমার সব।

: কি বললে?

[কানুর হাত থেকে বাঁশি পড়ে যায় মাটিতে। মাটিতে বাঁশি পড়ে আছে। তার থেকে বেরিয়ে আসছে সুর। বাঁশি বাজছে। কানুর গলায় কেউ যেন গাইছে .]

শুন রাধে এই রস
আমি যে তোমার বশ,
তোমা বিনে নাহি নয় মনে।
জপিতে তোমার নাম
ধৈর্য না ধরে প্রাণ
তুয়া রূপ করিয়া ধেয়ানে।

[বাঁশি বেজেই চলেছে। রাধার গলায় কেউ যেন গাইছে :]

: কি মোহিনী জানো বন্ধু, কি মোহিনী জানো।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা জেন॥
রাতি কৈলু দিবস, দিবস কৈলু রাতি।
বুঝিতে নারিলু বন্ধু তোমার পীরিতি॥

[কানুর চোখ রাধার চোখে বিভোর। কানু রাধার চোখে চেয়ে দু'হাত দিয়ে রাধার চিবুক ধরে। দূরে কানুর গলায় গান]

এস এস বঁধু এস, আধ আঁচরে বোসো,
আমি নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।
আমার অনেক দিবসে মনের মানসে
তোমা ধনে মিলাইলো বিধি॥

[পর্দায় রাধা-কানুর বেশবাস বদলে গেছে। রাধা হাত রাখে কানুর হাতে। দূরে রাধার গলায় গান:]

কালিয়া বরণখানি, আমার মাথার বেণী
আঁচল ঢাকিয়া রাখি বুকে
দিয়া চাঁদ মুখে মুখ পুরিব মনের সুখ
যে বলে সে বলুক পাপ লোকে

[ক্যামেরা কানুর পেছনে। কানু মুখ নামায়। কানু তার ঠোঁট রাখে রাধার দুটি ঠোঁটে। কানুর হাত এগিয়ে আসে পর্দার ডানদিক থেকে। বাঁদিক থেকে রাধার। তারা মিলিত হয়।

রাধা কানুর অন্য বেশবাস। কানু রাধা বসে আছে মুখোমুখি। কানু রাধাকে কাছে টেনে নেয়। দূরে কানুর গলায় গান .]

বঁধু হে, ছাড়িয়া নাহিক দিব।
হিয়ার মাঝারে রাখিব তোমারে
সদাই দেখিতে পাব॥

[রাধার গলায় গান। পর্দায় দেখছি সে কানুর কাঁধে মাথা রেখে বসে।]

কি আর বলিব আমি,

জীবনে মরণে জনমে জনমে

প্রাণনাথ হইও তুমি।

[আমবাগানে দুজনে।

রাধার পদযুগলে কানু হাত বোলাচ্ছে। আদর করছে। রাধা কানুর হাত ধরে আছে। কানু কনুইয়ে হাত রেখে আধশোয়া। অন্য হাত রাধার পায়ে।]

পীরিতি পীরিতি সব জন কহে

পীরিতি সহজ কথা।

বৃক্ষের ফল নহে তো পীরিতি

নাহি মিলে যথা তথা ২

[আবার অন্য সাজে রাধা আর কানু। আমবাগানে রাধা হাঁটুতে চিবুক ঠেকিয়ে বসে।]

: নব রে নব রে নব নব ঘনশ্যাম,

তোমার পীরিতখানি অতি অনুপম।

তোমার পীরিতি বন্ধু, সুখ সাগরের মাঝ,

তাহাতে ডুবিল মোর কুল শীল লাজ॥

[কানু হাত দিয়ে রাধার পিঠে আদর জানাচ্ছে।]

ওগো সুন্দরী আমারে কহিছ কি?

তোমার পীরিতি ভাবিতে ভাবিতে

বিভোর হইয়াছি॥

[আমবাগান। কানু শুয়ে আছে। সে রাধাকে টেনে নেয় কাছে। রাধা কানুকে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মাথা রাখে।]

কি দিব কি দিব বন্ধু মনে করি আমি।

যে ধন তোমারে দিব সে ধন আমার তুমি॥

তুমি যে আমার বন্ধু, আমি যে তোমার।

তোমার ধন তোমাকে দিব কি যাবে আমার॥

[কানু চকিতে উঠে পড়ে। রাধাকে তার বুক থেকে সরিয়ে শুইয়ে দেয় পাশে। তারপর নিজে রাধার ওপর শোয়। রাধা চোখ বোজে। তার দুচোখের দুকোণে ক্ষীণ অশ্রু রেখা। কানু দেখছে রাধাকে।

রাধার দুহাত মাটিতে। কানুর হাত রাধার হাত ধরে। ওপর থেকে ফুল পড়তে থাকে তাদের মিলিত হাতে। একের পর এক। হঠাৎই চারদিক আলোতে বিভাসিত হয়। আবার অন্ধকার। ফুল পড়তেই থাকে তাদের হাতে। তাদের শরীরে। আবার চারদিক আলোকিত। আবার অন্ধকার। ফুলে ফুলে রাধা কানু ঢাকা পড়ে যায়।]

দৃশ্য : ৪৪

[গভীর রাত্রি। মন্দাকিনী আয়ান ঘোষের বাড়ির বন্ধ দরজায় টোকা দিতে আয়ান জিগ্যেস করে :]

: কি হয়েছে?

: তোমাকে কতদিন বলেছি, তুমি বিশ্বাস করনি। দ্যাখো এসে, এত রাতে বউ ঘরে নেই।

: তুই ঠিক দেখেছিস?

: তুমি নিজের চোখে দেখবে এসো।

: চল।

[দুজন এগিয়ে যায় রাধার ঘরের দিকে। সেখানে বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে সন্ত্রস্ত বুড়ি ধাই মা। মন্দাকিনী বলে :]

: দেখেছো।

: হ্যাঁ।

[দুজনে বারান্দা থেকে বেরিয়ে আসে। আয়ান সদর দরজার দিকে তাকায়। দরজায় খিল দেওয়া নেই। আয়ান দরজা খুলে বাইরে এসে বলে :]

: আমি আসছি

: আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।

[আয়ান মুখ ঘুরিয়ে দৃঢ় এবং সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয় :]

: না।

দৃশ্য : ৪৫

[সেই রাত। আমবাগানে কানু ধীর পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়ায়। দৃষ্টি শঙ্কিত এবং দূরে নিবদ্ধ।

ভালবাসায় আশ্লেষে বিহ্বল রাধা বাড়িতে ফিরে যাচ্ছে। বিশ্ব চরাচরে আপাতত কোন কিছুতেই তার কোনও নজর নেই।

কিন্তু আয়ান। সে চলে এসেছে গ্রাম ছাড়িয়ে। একই পথে রাধাও ফিরে চলেছে। আয়ান একটু এগোবার পরই দেখতে পায় রাধাকে। থমকে সে দাঁড়িয়ে পড়ে। রাধা সামনাসামনি এসেও দেখতে পায় না তার স্বামীকে। আয়ান স্পষ্ট উচ্চারণ করে :]

: দাঁড়াও।

[রাধার মনের অবস্থা তখন কোনও কিছু শোনার নয়। আরো জোরে আয়ান বলে :]

: দাঁড়াও।

[এবারে রাধা চমকে ফিরে তাকায়। পাখীর পালকের মত হাল্কা গলায় জিগ্যেস করে :]

: কে?

[আয়ান সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে রাধাকে। রাধা নিশ্চল। রাধা নির্বাক। রাধা নির্ভার। আয়ানের সমস্ত শরীর ধীরে পরিবর্তিত হতে থেকে ক্রোধের অগ্নিমূর্তিতে।]

দৃশ্য : ৪৬

[সকাল। রাধা পাল্কিতে উঠছে। দুচোখে জলের ধারা। বেহারারা পাল্কি তুলে নেয় কাঁধে। তাদের পেছনে দুজন লোক আর ধাই মা।

পাল্কি এগিয়ে চলে গাঁয়ের পথ ধরে। অদূরে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আয়ান আর মন্দাকিনী। আর তাছাড়াও কিছু কৌতূহলী পাড়া-প্রতিবেশী।

আয়ান খানিকক্ষণ পাল্কিটাকে দেখে ঘরে ঢুকে যায়।

পাল্কি গ্রাম ছাড়িয়ে এগিয়ে চলেছে। রাধা চুপিসারে তার ভেতরে। চোখের জল বাধা মানছে না। আবার সেই আমবাগান। রাধা চোখের জল মুখে বাইরে তাকায়। সেই আমবাগান।

পাল্কি চলেছে এগিয়ে। বেহারার ডাক শোনা যাচ্ছে : হুম হুমা! হুম হুমা! দৃষ্টির বাইরে সরে সরে যাচ্ছে আমবাগান। সেই আমবাগান। রাধা গুমরে কেঁদে ওঠে পাল্কির ভেতরে।

সুবল, সুদাম আর মদন গরু চরাচ্ছে মাঠে। তাদের চোখে পড়ে পাল্কি আর তার ভেতরে কে ও? রাধা না? সুদাম বলে :]

: রাধাকে নিশ্চয়ই বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছে। এরকমটা যে হবে, এ আমি আগেই জানতাম।

[মদন উত্তর দেয় .]

: এবার যদি কানুর হুঁস হয়

[এমন সময় দূরে সুমঙ্গলের গলা শোনা গেল।]

: এই মদন, সুবল...

[ডাকতে ডাকতে সুমঙ্গল এগিয়ে আসে। সুবল জিগ্যেস করে .]

: কি হয়েছে? অমন ছুটতে ছুটতে আসছিস কেন?

: আবার জমিদারের পেয়াদা এসেছে।

[জমিদারের ছেলের বিয়ে। সবাইকে সেজন্য একশো টাকা নজরানা দিতে হবে। না দিতে পারলেই ধরে নিয়ে যাচ্ছে।]

সুবল : এ-ক-শো. টাকা। আমাদের গ্রামের লোকেরা একশো টাকা কোথায় পাবে?

: সেজন্যই তো সবাই পালাচ্ছে। চল আমরাও পালাই। দেরী করিস না।

দৃশ্য : ৪৭

[চারদিকে ধূ ধূ করছে বালি। সূর্য অস্ত যাচ্ছে পশ্চিম আকাশে। সান্দীপনী সাধু বসে আছে সূর্যাস্তের দিকে মুখ করে। ধ্যানে নিমগ্ন। একবার চোখ খুলে দেখলেন প্রকৃতিকে। তাঁর মুখে শান্তির ছায়া। হঠাৎই সঙ্কুচিত হল তাঁর চোখ। ও কে? দূরে কে যেন যায়! কানু চলেছে আপন মনে। বালির ধুলো উড়িয়ে। সূর্যাস্তের দিকে তাকিয়ে কানু দাঁড়ায়। কানুর দৃষ্টি নিবদ্ধ সূর্যাস্তে। কানুর চুল এলোমেলো। মুখ চিন্তাক্লিষ্ট। ভারাক্রান্ত। সান্দীপনী সাধু কানুকে কিছুক্ষণ দেখলেন। তারপর মুখে সামান্য হাসি আর চোখে কৌতুকের ঝিলিক এনে সরাসরি দর্শকদের জানালেন :]

: কে বলে পীরিতি ভালো?

হাসিতে হাসিতে পীরিতি করিয়া

কাঁদিতে জনম গেল।

দৃশ্য : ৪৮

[রাত্রি। সান্দীপনী সাধুর আশ্রম। সামনে আগুন জ্বলছে। রোহিণী এসেছে সাধুর সঙ্গে দেখা করতে। সে আগুনের পাশে বসে বলে :]

: সাধুবাবা, আপনি মুখ বুজে থাকলে কি করে চলবে? আপনাকে সবাই মানে।

আপনি কানুকে একটু শাসন করুন।

: আমি তো সংসারের কোনও ব্যাপারে মাথা ঘামাই না। তাছাড়া জানোই তো, শাসন করে সব কিছু হয় না।

: কিন্তু এভাবে তো আর চলতে পারে না। গ্রামের কত লোক, এমনকি আমার ছেলেও জমিদারের বাড়ি বেগার খেটে মরছে—আর কানুর কোন হুঁসই নেই। ওর ওপর আমাদের কত আশা ছিল। কিন্তু ও একেবারেই মুখ ফিরিয়ে বসে আছে! শুধু পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

: সত্যি। পাপাচারে দেশটা রসাতলে যেতে বসেছে। এই সময় সকলেরই সচেতন হওয়া দরকার। আসলে একজন কাউকে শক্ত হাতে হাল ধরার জন্যে এগিয়ে আসা উচিত।

: আপনার এই কথাটা সকলকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। সংসারের ভালোর জন্যে আপনার মাথা না ঘামালে চলবে না। আপনিও তো এই সংসারের একজন।

[সান্দীপনী সাধু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উত্তর দেয়।]

: ঠিকই বলেছ তুমি। একটু চিন্তা করে দেখি, কি করা যায়। তুমি এখন এসো। অনেক রাত হয়ে গেছে।

[সাধুর দুজন ভক্ত অদূরেই রুটি বানাচ্ছিল। তারা এবার তাকায় সাধুর দিকে। সান্দীপনী তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন।]

: শুনলি কি বলে গেল। কথাটা মনে রাখিস। আমাদেরও মাথা ঘামাতে হবে।

[আবার সরাসরি দর্শকদের দিকে তাকিয়ে বলেন।]

: এই মেয়ে জাতটার সঙ্গে সত্যিই পেরে ওঠা মুস্কিল। দেখলেন তো, আমাদেরও কি রকম জ্ঞান দিয়ে গেল।

দৃশ্য : ৪৯

[রাত্রি। সুবল, সুদাম আর অন্য রাখালেরা আমবাগানে বসে আছে আগুনের চারপাশে। তারা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে। সুবল বলছে।]

: এমনভাবে জোর করে যদি খাজনা আদায় করা হয়, নজরানা দিতে হয়, বেগার খেতে মরতে হয়,—তাহলে আমরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো।

মদন : আবার শুনছি কোন এক মহাজন নাকি লোক ধরে ধরে বেগার ও...ও...ও খাটার জন্যে অন্য রাজ্যেও পাঠিয়ে দিচ্ছে। সেখানে নাকি রেললাইন না রাস্তা বানাবার কাজ হবে।

সুমঙ্গল : সব পুরুষ মানুষদেরই যদি বেগার খাটতে যেতে হয়, তাহলে গ্রাম শুদ্ধু সবাইকে না খেতে পেয়ে মরতে হবে।

বাসব : এখন আমরা কি করব? কতদিন আর পালিয়ে পালিয়ে বেড়াব?

শিবু : তবু আমরা ধরা দেব না।

সুদাম : এই সময়ে কানু থাকলে আমরা মনে একটু জোর পেতাম।

মদন : ঠিক বলেছিস। কানুর এখন ওসব প্রেমট্রেম করা চলবে না।

সুবল : কিন্তু কানুর ঐ এক কথা।—আগে রাধা, তারপর সব কিছু। ছেলেটার বদনামের ভয়ও নেই।

বাসব : কিন্তু এখন রাধা রাধা করেই বা কী লাভ? কানু কি বৃষভানুর বাড়ি গিয়ে হাজির হবে নাকি?

সুদাম : ওরা বড়লোক, আমাদের মত গরিবদের ওরা বাড়িতে ঢুকতেই দেবে না।

সুবল : ও যা ছেলে। দরকার হলে দরজা ভেঙ্গে ঢুকে পড়বে।

সুদাম : তা ও পারে। আর এই জন্যেই তো ওকে আমাদের দরকার।

সুবল : কিন্তু ওকে বোঝায় কার সাধ্যি?

সুমঙ্গল : একটা কিছু মতলব করলে হয় না? কোন রকমে একবার যদি আমরা কানুর সাথে রাধার দেখা করিয়ে দিতে পারি, তারপর নিশ্চয়ই ও আমাদের কথা শুনবে।

সুদাম : একটা কিছু বুদ্ধি বার করতেই হবে।

দৃশ্য : ৫০

[সকাল। বঘু প্রায় গোটা পঞ্চাশ ছেলেমেয়েদের ব্যায়াম শেখাচ্ছে,—তারা লাইনে দাঁড়িয়ে বঘুর কথামত ব্যায়াম করছে। সুবলও বসে আছে—তবে একপাশে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে দেখা গেল কানুকে। সুবল দৌড়ে গিয়ে কানুকে বলল]

: এই কানু, শুনে যা, দারুণ খবর আছে।

কানু থমকে দাঁড়ায়। পাল্টা প্রশ্ন করে :

: কি খবর?

সুবল কাছে এসে, প্রায় যেন কানে কানেই বলে:

: তোকে যদি রাধার সাথে দেখা করিয়ে দিই, তুই আমায় কী দিবি?

কানুর মুখ স্বতোৎসারিত উজ্জ্বল। প্রশ্ন করে:

: সত্যি? কখন?

: আমি আর সুদাম বৃষভানুর বাড়িতে গিয়েছিলাম। নিজেদের যাত্রাদলের ছেলে বলে পরিচয় দিয়ে অনেক কষ্টে রাজি করিয়েছি।

: কি?

. কাল রাতে আমরা সবাই বৃষভানুর বাড়িতে পালা গানা গাইতে যাব। তুই বাঁশি বাজাবি। আজকের মধ্যে আমাদেরও তৈরি হয়ে নিতে হবে।

: কিন্তু রাধাকে দেখতে পাবো তো?

দৃশ্য : ৫১

[রাত। বৃষভানুর বাড়ির চত্বরে আসর বসেছে। তার একদিকে মঞ্চ। ঢাকের শব্দ শোনা গেল।

অন্যদিকে বৃষভানুর বাড়ির লোকেরা বসে। তার একদিকে মেয়েদের মাঝখানে বসে রাধা। রাধার একপাশে তার সখী, অন্যপাশে বুড়ি ধাই মা।

বৃষভানু বসে আছেন সামনের সারিতে। আরোও দর্শক এধার ওধার। বৃষভানু তাঁর পায়ে বসা একজনকে বললেন :]

: খেলা বেশ জমেছে, কি বলো?

[অন্যজন ঘাড় নেড়ে সায় দিলে বৃষভানু আবার বলেন :]

: দেখো দেখো, পরের খেলাটা দেখো।

[একজন রাখাল শুয়োর সেজে হঠাৎ চেঁচিয়ে হাজির হয় মঞ্চে। সে ছোটাছুটি শুরু করে দেয়।

রাধা বড় বড় চোখে খেলা দেখে। দেখছে অন্যেরাও। তারাও রাধার মত চমকে উঠেছে। শুয়োরটা তার দুটো দাঁত উঁচিয়ে মঞ্চে এধার ওধার দাপাদাপি করে বেড়ায়। মাঝে মাঝে মঞ্চের মেঝেতে দাঁত ঘষতে থাকে। সে ক্ষিপ্ত।

বৃষভানু তাঁর পাশের জনকে জানায় :]

: বরাহ অবতার। বুঝেছো তো। ভালই সেজেছে, না?

[ক্ষিপ্ত শুয়োর ছুটে বেড়াচ্ছে মঞ্চে। সে মঞ্চের মেঝেকে দাঁত দিয়ে কুটি কুটি করে ফেলতে চায়। সাবাস! সাবাস! দর্শকেরা হাততালি দেয়। শুয়োর-বেশী রাখাল এবার উঠে দাঁড়ায় এবং দর্শকদের নমস্কার করে। বৃষভানু বলেন :]

: সাধু, সাধু, বেশ হয়েছে। আমরা সবাই খুশি হয়েছি। এবার তোমরা খাওয়া দাওয়া করে বাড়ি যাও। তোমাদের অনেক দূর যেতে হবে।

[শুয়োর-বেশী রাখাল এবার সবিনয়ে নিবেদন করে :]

: আমাদের আর একটি মাত্র খেলা বাকি আছে। তাতে শুধু একটা গান শুনবেন। সেটা দেখাতে পারি?

: বেশ দেখাও। চটপট শেষ করো!

[মদন দাঁড়িয়েছিল সবাইয়ের মাঝখানে মঞ্চের এক কোণে। ওর হাতে কর্তাল। সে দৌড়ে এসে দাঁড়ায় মঞ্চের মাঝখানে এবং শুরু করে কর্তাল বাজাতে। কানু তার বাঁশিতে ফুঁ দেয়। সকলেই কিছু না কিছু বাজাচ্ছে। কানু ছাড়া আরোও দুজন বাঁশি বাজাচ্ছে। বাসব বাজাচ্ছে ঢোলক আর অন্য একজন তাসা। ওরা সবাই পর্দার আড়ালে।

রাধা অবাক হোয়ে দেখছে।

সুদাম মঞ্চে এসে দাঁড়ায় মদনের পাশে। সে গান ধরে :]

বুকের মাঝে লুকায়ে আছে
একটা ছোটো পাখি।
বুকের মাঝে লুকায়ে আছে
একটা ছোটো পাখি।
কেউ জানে না কেউ বোঝে না।
কেউ জানে না কেউ বোঝে না,
অতি গোপন রাখি।

[কানু ছাড়া বাকি সকলে এবারে মঞ্চে প্রবেশ করে। একে একে। বাজনা বাজাতে বাজাতে তারাও গানে যোগ দেয় :]

বুকের মাঝে লুকায়ে আছে
একটা ছোটো পাখি।

বুকের মাঝে লুকায়ে আছে

একটা ছোটো পাখি।

[বৃষভানু খুব খুশি। সমবেত সঙ্গীত চলছে।]

কেউ জানে না কেউ বোঝে না

কেউ জানে না কেউ বোঝে না

অতি গোপন রাখি।

[রাখালেরা এবার গোল হয়ে মঞ্চ পরিক্রমা করতে করতে গায়]

বুকের মাঝে লুকায়ে আছে

একটা ছোটো পাখি

বুকের মাঝে লুকায়ে আছে

[রাধা শুনছে। একাগ্র মনে। সুদাম এবার নাচতে নাচতে একা গায়]

সে পাখিতে খায় যে শুধু

ভালোবাসার ঘৃত মধু।

[কানু এসে ঢোকে মঞ্চে। মঞ্চের মাঝখানে। বাঁশি বাজাচ্ছে সে। সবাই ধুয়া গায়]

সে পাখিতে খায় যে শুধু

ভালোবাসার ঘৃত মধু।

[রাধা টানটান হোয়ে বসে। কানুকে চিনতে পারা যাচ্ছে না। সুদাম আবার গায় :]

সে পাখিতে খায় যে শুধু

ভালোবাসায় ঘৃত মধু।

[গানের তালে তালে সেও দুলছে। তার চোখ রাধাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সুদাম গাইছে]

অভিমানে উড়াল দিলে

অভিমানে উড়াল দিলে।

[রাধা দেখতে পেয়েছে কানুকে। কানুই কি? মঞ্চের মাঝখানে? সুদাম গাইছে]

জীবনটা যে হয় ফাঁকি।

[রাখালেরা বাজনা বাজাতে বাজাতে কানুকে ঘিরে নাচতে থাকে। গাইতে থাকে একসাথে]

বুকের মাঝে লুকায়ে আছে

একটা ছোটো পাখি

বুকের মাঝে লুকায়ে আছে।

[দর্শকদের মাঝখানে এক বৃদ্ধ মাথা দোলাচ্ছেন। সুরের তালে তালে। রাধা চেয়ে আছে কানুর দিকে।

কানু বাঁশি বাজাচ্ছে।

একজন তাসা পেটাচ্ছে।

কানু তার বাঁশিতে সুর তুলে চলেছে।

রাধা এতক্ষণে চিনতে পেরেছে কানুকে। এবার সে চোখ বন্ধ করে। বৃদ্ধ মাথা দুলিয়ে চলেছেন। সুদাম গায়]

আমায় কেউ চিনলো কিনা

আমায় কেউ চিনলো কিনা

[কানু বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে গানের তালে তালে দুলছে। সুদাম গাইছে :]

কেমন করে জানি—

জানি শুধু বেনে পাখির

সুরের ভাষাখানি।

[রাধা এবার চোখ খোলে। চোখ মেলে তাকায়। দেখে কানুকে। সবাই শেষ পদটি গায়।]

হায়, সুরের ভাষাখানি।

আমার কেউ চিনলো কিনা

কেমন করে জানি?

পাখি শুধু চেনে পাখির

সুরের ভাষাখানি

হায় সুরের ভাষাখানি

[কানু মাঝখানে। সুদাম এবার নাচতে নাচতে গায়.]

তোমার পাখি, আমার পাখি।

যখন করে ডাকাডাকি

[রাধা সুদাম গায়]

তোমার পাখি, আমার পাখি।

[মঞ্চের মাঝখানে কানু।]

যখন করে ডাকাডাকি।

কোন সরমে কোন মরমে।

[রাধা দেখছে কানুকে। সুদাম গায় :]

কোন সরমে কোন মরমে।

তখন দূরে থাকি।

[কানু দোলা বন্ধ করে স্থির হয়। সে দেখছে রাধাকে। সবাই মিলে কানুকে ঘিরে গায় :]

বুকের মাঝে লুকায়ে 'আছে

একটা ছোটো পাখি।

[রাধা উঠে পড়ে। পা বাড়ায় অন্দরমহলে· ধাই মাও তার সাথে উঠে চলে যায়। বৃন্দ সংগীত.]

বুকের মাঝে লুকায়ে আছে

একটা ছোটো পাখি।

[গানের তালে তালে বৃষভানুও মাথা দোলান।]

কেউ জানে না কেউ বোঝে না।

[রাধা তার নিজের ঘরে বিধ্বস্ত অবস্থায় ঢুকে খাটে শুয়ে পড়ে। তার দুচোখে জলের প্লাবন। দূরে মঞ্চ থেকে গান ভেসে আসছে।]

কেউ জানে না কেউ বোঝে না।

অতি গোপন রাখি।

বুকের মাঝে লুকায়ে আছে

একটা ছোটো পাখি।

[ধাই মা এসে দাঁড়ায় রাধার মাথার কাছে। ভেতর বাড়ি থেকে এক পরিচারক এসে বৃষভানুর কানে কী যে বলে। বৃষভানু শোনেন।]

বুকের মাঝে লুকায়ে আছে

একটা ছোটো পাখি।

বুকের মাঝে লুকায়ে আছে।

[বৃষভানু উঠে দাঁড়ান। সাথে সাথেই গান বন্ধ হয়। বন্ধ হয় নাচ ও বাজনা। বৃষভানু এগিয়ে যান ভেতরবাড়ির দিকে।

মঞ্চে রাখালেরা হতবাক।

দর্শকেরা যে যার আসন থেকে উঠে পড়ে।

কানু বুঝতে চেষ্টা করে।]

দৃশ্য : ৫২

[সেই রাত। রাধা তার বিছানায় শায়িতা। সে জ্ঞান হারিয়েছে।

রাধার নয়ন মুদ্রিত। দাই মা হাতপাখা দিয়ে রাধাকে বাতাস করছে। আরেকজন পরিচারিকা রাধার মাথায় ধরে জল ঢালছে।

বৃষভানু দরজার কাছে এসে দেখে সবকিছু। তারপর বলে]

তোমরা কাছাকাছি থেকো। নজর রেখো। আমি যাচ্ছি ডাক্তার আনতে

[বৃষভানু চলে যায়।

অজ্ঞান রাধা তার শয্যায় শায়িতা।

মঞ্চের ওপর রাখালেরা নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করছে। কানু তাদের থামিয়ে সুবলকে জিগ্যেস করে]

ব্যাপারটা কী হলো?

কিছুই তো বুঝতে পারছি না। হঠাৎ কেমন সব থমথমে হয়ে গেলো।

সুদাম ঐযে, একজন কেউ আসছে—ওকে জিগ্যেস করলে হয় না?

[অদূরে এক নারী মূর্তি। সুদাম তাকেই শুধোয়]

এই যে একটা কথা শুনে যাও না।

[নারীমূর্তি এগিয়ে আসে। দেখা গেল সে আর কেউ না, কোনও পরিচারিকা নয়, সে স্বয়ং বিশাখা। তাকে দেখে সুবল অবাক হয়ে বলে]

. ও মা, তুমি! তুমি এখানে?

আর তোমরাই বা এখানে কেন? মরবার জন্যে পাখা গজিয়েছে বুঝি?

সুদাম : তোমাকে পেয়ে ভালই হলো। ভেতরে গিয়ে একটু বলো, আমাদের খুব খিদে পেয়েছে যে। এত কষ্ট করে খেলা দেখালাম।

: আজ আর খাবার টাবার হবে না। ভালোয় ভালোয় চলে যাও। রাধার খুব অসুখ।

কানু : কি হয়েছে? কী অসুখ?

: তা জেনে তোমার কি দরকার?

[সুবল কিছু একটা চিন্তা করে। বিশাখা চলে যেতে যেতেই উত্তর দেয়:]

: আর তোমাদেরও বলিহারি। ঐ কানুকে এখানে আনার কি দরকার ছিল?

সুবল : শোন। তুমি ভেতরে গিয়ে বলো যে অমি একবার রুগীকে দেখতে চাই। আমি কিছু কিছু ওষুধ জানি। আমাকে একবার সুযোগ দিতে দোষ কি?

[বিশাখা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ফিরে তাকায়। সে শুধোয়:]

. তোমার মতলবখানা কী?

: আমি সত্যি কিছু ওষুধ জানি। তুমি ভেতরে গিয়ে বলো।

[বিশাখা তড়িতে কিছু চিন্তা করে ভেতর-বাড়িতে চলে যায়। বিস্মিত কানু সুবলকে দেখে। সুবল অন্যদের সাবধান করে বলে]

· তোরা চুপ করে এখানে বসে থাকবি।

[কানু অন্যদিকে মুখ ফেরায়।]

দৃশ্য : ৫৩

[সুবল রাধার শোবার ঘরে। সে চিন্তিত বৃষভানুকে সভয়ে নিবেদন করে·]

আমি বেশি সময় নেবো না। তবে এ ঘরে অন্য কোন লোক থাকলে আমার মন্ত্র খাটবে না। আপনাদের একটু আড়ালে যেতে হবে।

: সবাইকে যেতে হবে? ঐ বিশাখা বা ধাই মা থাক্ না।

না হুজুর, তাতে মন্ত্র কমজোরি হয়ে যাবে। আপনারা নির্ভয়ে বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করুন। আমাকে একবার সুযোগ দিন।

: বেশ, সবাই চলে এসো। ও একবার দেখুক।

[সবাই একে একে বাইরে যায়। সবশেষে রাধাকে একবার দেখে বৃষভানুও বাইরে যান। রাধার মুখ ও অবয়ব পদায়। সুবল এগিয়ে গিয়ে দরজায় খিল দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে রাধাকে দেখে। মূর্ছিতা রাধা। শায়িতা। সুবল রাধার কাছে এসে তার মাথার কাছে হাঁটু মুড়ে বসে রাধার কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বলে.]

· কেউ বিছানায় শুয়ে কাঁদে, কেউ ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে। কিন্তু চোখের জল এক।

[রাধা নিস্পন্দ। সুবল এবার বলে:]

: জীবনটা বড় ছোট। আর যারা ভালোবাসে তাদের সময়ও আরও তাড়াতাড়ি চলে যায়। রাধা, তুমি সময় নষ্ট কোরো না।

[রাধার অধর কেঁপে ওঠে। সুবল বলে:]

: চোখ খোলো। তাকাও। কানু, তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। রাধার চোখের পাতা কাঁপে।

: তুমি কি কানুকে ভুলে গেছো? তোমার মত কানুরও যে খুব অসুখ করেছে।

[রাধা চোখ খোলে। ভাষাহীন দুটি চোখ। সুবল একটু হেসে বলে:]

: আমি কানুর বন্ধু সুবল। চিনতে পারছো না?

[এতক্ষণে রাধা সাড়া দেয়। সে শুধোয়:]

: কেন আমাকে দুঃখ দিতে এসেছো?

: তুমি নিজের দুঃখটাই বড় করে দেখছো, কানুর দুঃখটা দেখলে না?

[রাধা মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে জানায়:]

: ওকে চলে যেতে বলে দাও। আর কোনোদিন ওকে দেখতে চাই না।

: তুমি এত নিষ্ঠুর?

: হ্যাঁ। তোমরা যাও। আর কখনো এসো না।

: ঠিক বলছো?

. হ্যাঁ ঠিক ঠিক।

[সুবল উঠে দাঁড়ায়।]

: আচ্ছা চলে যাচ্ছি, কানুকে এই কথাই বলবো।

[এই বলে সুবল ঘুরে দাঁড়ায়। ঘর ছেড়ে বাইরে যাবে সে। রাধা পিছু ডাকে:]

: দাঁড়াও।

[সুবল পেছনে ফিরে তাকায়। রাধা এবার সুর বদলিয়ে মিনতি জানায়:]

: আমাকে এখানে ফেলে রেখে কোথায় চলে যাচ্ছো? আমাকে তোমরা ছেড়ে যেও না।

[সুবল একপা এগিয়ে আসে রাধার দিকে। রাধা প্রশ্ন করে:]

: কানু যদি এত ভালবাসে তাহলে এখানে থেকে আমাকে জোর করে কেড়ে নিয়ে যেতে পারে না?

[সুবল এবার বসে রাধার পাশে। সে বলে:]

: চুপ করো, চুপ করো। ওরকমভাবে যাওয়া যায় না।

: তবে কিভাবে যাবো? তুমি বলে দাও।

: তুমি পারবে? ঠিক পারবে?

: হ্যাঁ পারবো। সব পারবো।

: এক কাজ করো, চারদিন পরই অমাবস্যা, সেই রাতে তুমি নদীর ধারে আসতে পারবে?

: পারবো। আমি ঠিক পারবো।

: একটা প্রদীপ জ্বেলে রেখো। কানু ঠিক আসবে। এখন দাও তো, তোমার কোনো চিহ্ন দাও, কানুকে দেখাবো।

দৃশ্য : ৫৪

[সেই একই রাত। ভোর হতে সবে শুরু করেছে। নন্দ ঘোষের কুটির। পেশীবহুল এক হাত নন্দ ঘোষের দরজায় মুষ্টাঘাত করে চলেছে।

তন্দ্রালু চোখে নন্দ ঘোষ উঠে এসে দরজা খোলেন। সাথে সাথেই একদল গুণ্ডা তাকে ধরে বাড়ির বাহিরে রাস্তার ওপর ফেলে দেয়।

আরেকজন তাঁর টুঁটি চেপে ধরে। এরা সব জমিদারের ভাড়া করা গুণ্ডা। চামচা। তারা নন্দকে মারতে উদ্যত হয়।

বিস্মিত নন্দ প্রশ্ন করেন.]

: ওকি, আমাকে মারছো কেন?

[ক্যামেরা অন্য বাড়িব দরজায়। সেখানেও চলছে মুষ্টাঘাত। দরজা খোলে লোচন। তাকেও জমিদারের লোকেরা হিঁচড়ে বাব করে বাইরে। ফেলে দেয় রাস্তায়। আবেক বাড়ির দরজা। এ সেই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি।

রোহিণী তার বাড়িতে ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে। জমিদারের গুণ্ডারা এখানেও। তারা সব তছনছ করে লণ্ডভণ্ড করছে আসবাবপত্র। শঙ্কিতা রোহিণী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে।

বড় ময়দানের মাঝখানে গ্রামের সবলোককে ধরে আনা হয়েছে। ধরে এনেছে ভাড়া করা গুণ্ডারা। তারা দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। কারুর কারুর হাতে মশাল জ্বলছে। সবাইকে শুনিয়ে একজন ঘোষণা করে.]

: তোমরা গত দু'বছরে কেউ খাজনা দাওনি। যারা চাষ করো তারা ফসলের ভাগ দাওনি। যারা ধার নিয়েছো তার সুদের পয়সা দাওনি। কাজের জন্য ডাকলে তোমরা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াও। তাই, জমিদারের হুকুমে তোমাদের বন্দী করা হল। এখন বলো, গ্রামের জোয়ান ছেলেরা সব কোথায়? যদি সত্যি কথা না বলো, তাহলে এই মুহূর্তে সমস্ত গ্রাম জ্বালিয়ে দেবো।

[একজন গুণ্ডা ভীত লোচনের দিকে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে]

: কোথায় তোর ছেলে? কোথায় পালিয়েছে?

: আমি জানি না। সত্যি জানি না।

[গুণ্ডাটা এক ধাক্কায় লোচনকে মাটিতে শুইয়ে দেয়। বিধ্বস্ত লোচন মাটিতে। তার বুকের ওপর পা দিয়ে দাঁড়িয়ে সেই গুণ্ডা।

সাধু সান্দীপনীও জমিদারের এই অত্যাচাব দেখতে হাজির হয়েছে। সে বিক্ষুব্ধ। সে ক্রোধান্বিত। সে সরাসরি দর্শকদেব দিকে তাকিয়ে বলেন।]

অত্যাচারের এই রূপ
দিনরাত এতো দুখ
সত্য, ত্রেতা, দাপর, কলি একই আচরণ॥
মন বলে হায় হায়
ধ্যানেতে মন না যায়
আর কবে হবে বলুন কংসের নিধন॥

দৃশ্য : ৫৫

[সেই একই রাত। আমবাগানে জনাবারো ছায়ামূর্তি কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছে। মাঝে মাঝে ঢোলকের বোল শোনা যাচ্ছে। ছায়ামূর্তিরা কাছে আসতে বোঝা গেল, এরা কানু আর তার সঙ্গীসাথীরা। কানু সুবলকে বলে]

: সুবল, ওকে বলে দিস এই হারটা কিন্তু আমি ফেরত দেবো না। এটা আমার কাছে চিহ্ন হিসেবে থাকবে।

: আর ত কদিন পরেই তোর সাথে দেখা হবে। তুই নিজেই বলিস।

সুদাম : আচ্ছা কানু, তোর জন্য আমরা যে এত কষ্ট করলাম, তা আমাদের কিছু দিবি না তুই?

কানু : সত্যি, তোরা আমাকে কত ভালবাসিস। কিন্তু আমি যে বড় গরিব, কী দিই বলতো তোদের?

[ঠিক এমনি সময়ে শোনা গেল সাধু সান্দীপনীর গলা। তিনি জিগ্যেস করছেন]

: কে যাচ্ছো তোমরা? একটু এদিকে শুনে যাও তো।

[কানুর দল থমকে দাঁড়ায়। কানু বলে:]

: সাধুবাবার গলা না?

[কিছু দূরেই সাধুর আশ্রম। সাধু আগুনের সামনে বসে। তিনি আবার শুধোন]

: আমার কথা শুনতো পাচ্ছো না? তাড়াতাড়ি এদিকে এসো।

[কানু দলের সবাইকে বলে.]

: চল তো, কি বলে দেখি।

[ওরা সাধুর আশ্রমের দিকে এগোয়। কাছে আসতে সাধু সান্দীপনী বলেন]

: আমি শুধু কানুর সঙ্গে কথা বলবো। আর সবাই দূরে থাকো।

[কানুর সঙ্গীসাথীরা দাঁড়িয়ে পড়ে। সাধু সান্দীপনী বলেন:]

: কি হলো? এদিকে শুনে যাও কানু।

[কানু এগিয়ে যায় সাধুর দিকে। সাধু অন্যদের বলেন:]

: তোমরা আরও দূরে গিয়ে দাঁড়াও।

[তারা আরও পিছিয়ে যায়। কানু সাধুর সামনে এসে জিগ্যেস করে]

: কি বলছেন?

: বোসো।

[কানু বসে। সাধু সান্দীপনী কানুকে গভীর মনোযোগ দিয়ে নিরীক্ষণ করে বলেন:]

: তোমার সাথে আমার এমন কিছু কথা আছে যা অন্য কারোর সামনে বলা যাবে না।

: কি কথা?

: বলছি। কিন্তু তার আগে আমাকে বলো তো, মানুষের জীবনটা বড় না, প্রেম ভালবাসা বড়?

[কানু নির্বাক। এমন বেয়াড়া প্রশ্ন সে জীবনে শোনেনি। আর তা এই সাধুর মুখে। একি সর্বজ্ঞ।]

: চুপ করে আছিস কেন?

: ভালবাসা না থাকলে জীবনের কোনো মানেই নেই।

: আমার বেঁচে থাকাটা কে আটকাচ্ছে? সে সাধ্য কারোর নেই। কিন্তু হঠাৎ এসব প্রশ্ন করছেন কেন?

: তুই স্বার্থপর। শুধু নিজের বেঁচে থাকার কথাটাই ভাবছিস। চারিদিকে কি চলছে, তা দেখতে পাচ্ছিস না? সামান্য একজন নারীর জন্য তুই মেতে আছিস?

[কানু এবার উত্তপ্ত। সে কঠিন স্বরে উত্তর দেয়:]

: সে সামান্য নয়।

: ঠিক আছে, মানলাম। কিন্তু প্রলয়, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ কিংবা বিপ্লবের সময় মানুষের নিজের সাধ আহ্লাদ কিছুদিনের জন্য ছুটি দিতে হয়। একথা জানিস না? চারিদিকে এত অবিচার আর তুই পুরুষ মানুষ হয়ে মুখ ঘুরিয়ে বসে আছিস।

: হঠাৎ আমাকেই শুধু এসব কথা বলছেন কেন?

: কারণ, তোর দিকে অনেকে আশা করে চেয়ে আছে। তোর বুদ্ধি আছে বুকে বল আছে, সাহস আছে। তোকে সবাই মানে। তাই তোকেই অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। তোকে নেতা হতে হবে।

: ওসব নেতা ফেতা আমি হতে চাই না। আমি রাখাল হয়েই থাকতে চাই।

: তুই কি পাগল হয়েছিস? গ্রামের পর গ্রাম জ্বলে যাচ্ছে, অত্যাচার চরমে উঠেছে। আর তুই এর মধ্যে বসে বাঁশি বাজিয়ে প্রেম করবি আর রাখালি করবি! এখন তোর কাজ হলো সবাইকে নিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা।

[কানু তাকায় সাধু সান্দীপনীর দিকে। এ কিসের আহ্বান।]

ওসব আমি পারবো না। অন্য কেউ করুক। ওসব বড় বড় জ্ঞানের কথা আমি শুনতে চাই না। আমি চল্লাম।

[কানু উঠে দাঁড়ায়। চলে যাবার জন্যে।]

: দাঁড়াও।

[সাধু সান্দীপনীও উঠে দাঁড়ান।]

: কুলাঙ্গার, কাপুরুষ, তোর লজ্জা করে না? তোর বাপ মা কতদিন ধরে জমিদারের হাতে বন্দী হয়ে বেগার খেটে মরছে। বেঁচে আছে কিনা তাও জানি না।

: এসব আবার কি বলছেন আপনি?

: যা বলছি ঠিকই বলছি। নন্দ আর যশোদা তোকে পালন করেছে। তোর আসল বাপ মা বসুদেব আর দেবকী। তুই জন্মাবার পর থেকেই ওরা বন্দী।

[বিস্ময়ে হতভম্ব কানু। সে প্রশ্ন করে:]

: এসব কী আজগুবি কথা বলছেন? এ হতেই পারে না।

: আজগুবি নয়। এটাই সত্যি। ওদের এই শাস্তির কারণ ওরা ছিলো বিদ্রোহী। আর বাপ মায়ের অপমানের প্রতিশোধ যে ছেলে না নেয়, সে কি মানুষ?

[কানু সাধুর দিকে এগিয়ে তার গলা টিপে ধরে বলে:]

শোনো সাধু, এসব যদি মিথ্যে কথা হয়, আমাকে ক্ষ্যাপাবার জন্য যদি তুমি এসব গল্প ছড়াও, তাহলে তোমাকে আমি....

[কানুর ধাক্কায় সাধু তখন মাটিতে। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে ব্যঙ্গ করে বলেন:]

: ভারী বীরপুরুষ! যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে অত্যাচারীদের সামনে গিয়ে গায়ের জোর দেখা। আমি সব সত্যি বলছি কিনা, তা রোহিণীকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবি। ঐ রোহিণী তোর আরেকজন মা।

[কানু কিছুই বুঝতে পারছে না। সে এবার হতবাক। সাধু সান্দীপনীর সামনে নির্বাক কানু। সান্দীপনী আদেশ করেন]

: যা। বিদ্রোহীর ছেলে তুই—অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোরও বিদ্রোহ করা উচিত।

[কানুর চোখে জল। সে সাধুকে প্রশ্ন করে:]

: এতকাল যাকে মা বলে ডেকে এসেছি, সে আমার নিজের মা নয়?

[সাধু সান্দীপনী কানুর দুকাঁধে হাত রেখে তাকে আশ্বস্ত করেন:]

: তাতে কি হয়েছে, কানু?

[সাধু আবেদন জানায়:]

: একজনের বদলে তুই অনেক মা পেয়েছিস। সারা দেশ জুড়েই তোর মায়েরা রয়েছেন। তারা কত দুঃখী! তাদের দুঃখ ঘোচাবার ভার নে তুই।

দৃশ্য : ৫৬

[সেই রাত। গ্রামের মাঝে ময়দান। সেখানে জড়ো করা হয়েছে গ্রামের মানুষদের। কানুর হুঙ্কার শোনা গেল।]

: খবরদার। কেউ এক চুলও নড়বে না।

[কানু দাঁড়িয়ে ময়দানের একপ্রান্তে। উঁচু জমিতে। তার চোখের সামনে গ্রামের লোকেদের হাত বাঁধা হচ্ছে পেছনে। তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জমিদারের কাছে। কয়েকজন গুণ্ডা বাড়িতে বাড়িতে মশাল দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে। সবাই ফিরে তাকায়। কানু তার সঙ্গীদের আদেশ দেয়:]

: সকলের হাতের দড়ি খুলে দাও।

[গুণ্ডাদের সর্দার কানুকে দেখে প্রশ্ন করে:]

এ আবার কোন্ মাতব্বর এলো? হুঁঃ।

[তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে সে অন্য গুণ্ডাদের বলে:]

: যা ওদের সবকটাকে ধরে নিয়ে আয়।

[রুখে দাঁড়ায় কানু। সে জলদগম্ভীর স্বরে বলে:]

: দাঁড়াও। আমার গায়ে হাত দেবার আগে একটা কথা শুনে নাও। তোমরা পাঁচজন। আর আমরা শত মানুষ—আজ থেকে আর কেউ অত্যাচার সইবে না। তোমরা লড়তে এলে আমরা পাঁচ দশ জন প্রাণ দেবো কিন্তু কেউ বন্দী হবে না, তোমরাও খতম হবে।

[জমিদারের গুণ্ডারা কানুকে ধরতে এলে কানু হুকুম দেয়:]

: ধরো ব্যাটাদের।

[গ্রামের সমস্ত মানুষ, যাদের পিছমোড়া করে বাঁধা হয়েছিল তারা এখন মুক্ত। তারা দলে দলে এগিয়ে এসে গুণ্ডাদের আর তাদের সর্দারকে বেঁধে ফেলে। নন্দ কানুর দিকে চেয়ে আছেন বিস্ময়ে।

কানুর সঙ্গীসাথীরা জমিদারের গুণ্ডার দলকে এক করে এগিয়ে দেয় কানুর দিকে। কানু এবার তাদের প্রশ্ন করে:]

: কী? আমাদের ধরবে? ধরে রাখতে পারবে না। মারবে আমাদের? মেরে ফেলতে পারবে না। যদি বাঁচতে চাও তো আমাদের সঙ্গে হাত মেলাও।

[রোহিণী দৌড়ে আসে। কানু গ্রামবাসীদের শুনিয়ে বলে:]

: এখন শোনো সবাই। আমার হুকুম। আজ থেকে কেউ বেগার খাটতে যাবে না।

[গ্রামবাসীরা কানুর দিকে তাকিয়ে। তারা শুনছে।]

: আজ থেকে কেউ খাজনা দেবে না। চাষের ভাগ দেবে না। টাকার সুদ দেবে না।

[কানু এবার ঘোষণা করে:]

: দরকার হলে আমরা লড়াই করবো। এইভাবে কুকুরের মত মরার চেয়ে লড়াই করে মরা অনেক ভালো।

[গাঁয়ের মুখ্যুসুখ্যু মানুষ। এমন কথা তারা শোনেনি এর আগে। কানুর বলা শেষ হয়নি।]

: আমি বলে দিচ্ছি, যারা আমার কথা মানবে না----আমি তাদের ক্ষমা করবো না। আর যারা মানবে—তাদের আমি দেখবো।

[কানু এবার বক্তা। এবং নিঃসন্দেহে প্রধান বক্তা।]

: আমরা যদি এক হই —তাহলে আমরা জিতবোই। আমরা একসাথে হাত মেলালে পাহাড় ভেঙ্গে সমান করে দেবো।

এইভাবে অপমানের জীবন আমরা আর কাটাবো না। আর একদিনও আমরা অত্যাচার সহ্য করবো না। কি? রাজী?

[সমস্ত গ্রামবাসী একস্বরে তার জবাব দিল।]

: রাজি....রাজি...রাজি।

[কানু তখন তাদের আদেশ দেয়:]

: যাও তোমরা। আশেপাশের সব গ্রামে এক্ষুনি খবর পাঠিয়ে দাও—কাল থেকে আমাদের যুদ্ধ শুরু। সবাইকে আমাদের সঙ্গে চাই।

[বিস্মিত গ্রামবাসীরা শুনছে।]

: আমরা সমস্ত বেগার খাটা লোকেদের, সমস্ত বন্দীদের মুক্ত করে দেবো। এই পৃথিবীতে আমাদের সকলের অধিকার আছে—এবার থেকে আমরা নতুন করে বাঁচবো।

দৃশ্য : ৫৭

[সকাল। বিধ্বস্ত অগ্নিদগ্ধ গ্রাম। কানু এগিয়ে আসছে। তার পেছনে সমস্ত গ্রামবাসীরা। কানু এবার দাঁড়ায়।

যশোদা, নন্দ, রোহিণী, বিদ্যা সকলে কানুকে ঘিরে দাঁড়ায়। ক্রন্দনবতা যশোদা কানুকে জড়িয়ে ধরে বলেন :]

. আমি তোকে ছেড়ে থাকতে পারবো না কানু। কিছুতেই পারবো না।

[কানু মাকে জড়িয়ে ধরে।]

: দেখো, আমি আবার ফিরে আসবো। তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো।

[যশোদার কান্না থামে না। রোহিণীর চোখে জল। সে যশোদাকে সান্ত্বনা দেয় :]

: ওকে যেতে দে যশোদা। ওকে আটকাস না। কানু আজ আর তোর একার ছেলে নয় রে। ও ঠিক জিতবে, দেখিস।

[কানু রোহিণীকে একপলক দেখে। কানুর চোখেও জল। রোহিণী যশোদাকে কাছে টেনে নিয়ে কানুকে বলেন :]

: যা কানু, যা। দেরী করিস না।

[যশোদা রোহিণীকে জড়িয়ে ধরেন।

নন্দ কানুকে জিগ্যেস করেন :]

: আমাকে তুই সঙ্গে নিবি না?

: না বাবা, তোমার বয়স হয়েছে। তুমি মাকে দেখো। বড় মাকেও দেখো।

[গাঁয়ের অন্য মেয়েরাও রয়েছে। তারা গ্রামের পথের দুধারে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে। কেউ বা শাঁখ বাজাচ্ছে। কেউ উলুধ্বনি দিচ্ছে। কয়েকজন চোখের জল মুছছে।

গ্রামের যত যুবক, সবাই এগিয়ে চলেছে কানুর সাথে। কেউ পেছন ফিরে শেষবারের মত তাদের মায়েদের দেখে নিচ্ছে। তাঁদের চোখেও জল।

পথের একধারে সাধু সান্দীপনী।

কানু কয়েক কদম এগিয়ে তাঁকে দেখে থমকে দাঁড়ায়। সাধু সান্দীপনী মুচকি মুচকি হাসছেন। কানুর চোখের জল বাধা মানছে না। তবু সে দুর্বার।

সাধু সান্দীপনী কানুকে সস্নেহে বলেন :]

ছিঃ...। এখন চোখের জল ফেলতে নেই, কানু। তাহলে যে অন্যরাও দুর্বল হয়ে পড়বে।

কানুর চোখে জল।

কানু আর তার পেছনে হাজার জোয়ান। নিজের গ্রাম ছাড়িয়ে তারা অন্য গ্রামের সীমানায়। কানুর পাশে সুবল। কানু সুবলকে বলে :

: সুবল তুই গ্রামে থাকবি। এখানকার দেখাশুনার ভার তোর উপর রইলো। মাঝে মাঝে আমি লোক পাঠিয়ে খবর নেবো।

: বেশ। তুই যা বলবি তাই হবে।

: তাহলে এবার আমরা রওনা দিই। অন্য গ্রামের লোকেরা এতক্ষণে রওনা দিয়ে দিয়েছে।

: কিন্তু, তুই রাধার জন্য কিছু বলে গেলি না? ও যে অপেক্ষা করে থাকবে।

: তাকে বলিস, আমি ঠিক সময়ের মধ্যেই ফিরে আসবো। কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না। দূর থেকে নদীর ধারে প্রদীপের আলো দেখে আমি ঠিক তাকে চিনতে পারবো।

[কানু এবার সুবলের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তার হাজার নওজোয়ানকে হুকুম দেয়।]

: চলো সবাই।

দৃশ্য : ৫৮

[ক্যামেরা মাথার ওপরে। ওপর থেকে দেখছি। চারপাশ থেকে হাজার হাজাব গ্রামবাসী কাতারে কাতারে এগিয়ে চলেছে। তাদের কণ্ঠস্বরে জেহাদ। তাদের হাতে তীর, ধনুক, বর্শা। তাদেব মুখে বিজয়ীর প্রতিচ্ছবি।

নদীব পাব ধরে এগিয়ে চলেছে একটা দল। হাজার হাজাব গ্রামবাসী সেই দলে। দলেব নেতা কানু। সে সামনে।

ক্যামেরা এবার নেমে এসেছে। পর্দায় দেখতে পাচ্ছি হাজার হাজাব গ্রামবাসীর দৃঢ় পদক্ষেপ।

সামনে নালা। একে একে সবাই সেটা লাফিয়ে পার হলো। পর্দায় শুধু পায়েব ছবি।

এবার দেখছি কানু এগিয়ে আসছে। তার পেছনে গ্রামবাসীরা। তাদের বজ্রমুষ্টি আকাশে। তাবা শ্লোগান দিচ্ছে।

আবেক দিক থেকে এগিয়ে আসছে আরও এক হাজাব মানুষেব মিছিল। তাদেব সামনে বলাই।

কানুর মিছিল মিশে গেল বলাইয়েব মিছিলে। উত্তাল জনতা।

তার পেছনে সূর্য তখন প্রায় অস্তমিত। তিনজন জমিদারকে তারা আজ পাকড়াও করেছে। তাদের হাত পিছমোড়া করে বাঁধা।

বিপ্লবী বৃন্দ সংগীত।

তারই মধ্যে কানুর বজ্রগম্ভীব হুঙ্কার।

: এগিয়ে চলো।

দৃশ্য : ৫৯

[অমাবস্যার রাত।

অন্ধকারে দূর থেকে দেখা যাচ্ছে হাজার মশালের মিছিল এগিয়ে আসছে দুদিক থেকে। শুনতে পাচ্ছি সংগ্রামী বৃন্দসংগীত। দুটো দল এসে এক জায়গায় মিলিত হলো। হঠাৎই বিপ্লবী বৃন্দসঙ্গীত করুণ সংগীতে পরিণত হলো।

অন্ধকারে দেখা গেল রাধাকে। সে ভীরু পায়ে এগিয়ে আসছে। তাব দুটি হাতে ধরা ছোট্ট একটা প্রদীপ। তার শিখা কাঁপছে।

প্রদীপের কম্পিত শিখা।

রাধা নিশ্চল।

শুনতে পাচ্ছি বহু রমণীব বিলাপধ্বনি।]

দৃশ্য : ৬০

[সকাল। সংগ্রামী বৃন্দসংগীত।

দূর থেকে কানু এগিয়ে আসছে। তার পেছনে উত্তাল জনসমুদ্র। তাদেব বজ্রমুষ্টি আকাশে।

ধানক্ষেতের পাশ দিয়ে আরেকটা দল এগিয়ে আসছে। তাদেব মধ্যে শৃঙ্খলিত এক জমিদার। তারাও কানুর মিছিলে মিশে যায়। কুচকাওয়াজ দিতে দিতে দুটি দল এক হোয়ে এগোতে থাকে। তারা হেঁটেই পার হয় এক নদী। দলের পেছনে দেখা যায় জনাদশেক শৃঙ্খলিত জমিদার। বিপ্লবী বৃন্দসংগীত।

কানুর পাশে পাশে বলাইও হাঁটছে।

কানু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে তাব দলকে সাবধান করে হুঙ্কাব দেয়।

: কেউ পিছন ফিরে তাকাবে না। এগিয়ে চলো।

[কানুর মুখে এখন খোঁচা খোঁচা দাড়ি।]

দৃশ্য : ৬১

[রাত্রি। সংগ্রামী বৃন্দসংগীত আবার বদলে যায়। করুণ সংগীতে। রাধা অন্ধকারে দণ্ডায়মান। পাথর প্রতিমা। তার দুচোখ থেকে অবিরল বয়ে চলেছে অশ্রুধারা। তার গলায় ফুলের মালা। রাধার পায়ের কাছে প্রদীপ জ্বলছে। একটি নয়। একাধিক। করুণ সঙ্গীত শেষ হয় সংগ্রামী বৃন্দসংগীতে।

অন্ধকারে আবার দেখা যায় লক্ষ লক্ষ মানুষের মিছিলের হাতে জ্বলছে মশাল। এ মিছিল শেষ হবার নয়। এ মশাল নেববার নয়।]

দৃশ্য : ৬২

[দ্বিপ্রহর। সংগ্রামী বৃন্দসংগীত। মানুষের মিছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষের মিছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখ। প্রতিটি মুখে অযত্নের ছাপ। কিন্তু আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ়। প্রতিটি মুখ বিজয়ী প্রতিজ্ঞায় প্রদীপ্ত।

লক্ষ লক্ষ মানুষের পা। তারা জোর কদমে হেঁটে চলেছে গ্রাম থেকে গ্রামে। প্রতিটি পা, প্রতিটি পদক্ষেপ বলিষ্ঠ। যোজনের পর যোজন জয়ের পর প্রতিটি পা ধুলায় ধূসরিত। পেছনে ধ্বনিত হচ্ছে সংগ্রামী বৃন্দসংগীত।]

দৃশ্য : ৬৩

[রাত্রি। করুণ সঙ্গীত। বহু রমণীর বিলাপ ধ্বনি।

পর্দায় দেখছি একটি প্রদীপ। ক্যামেরা পিছিয়ে আসতে থাকে। পর্দায় দেখছি প্রদীপ--প্রদীপ -প্রদীপ। শত শত প্রদীপ জ্বলছে।

সেই শতসহস্র প্রদীপের মাঝখানে রাধা। রাধার গলায় ফুলের মালা। পরনে লাল শাড়ি। রাধার চোখের দৃষ্টি দূরে, বহুদূরে নিবদ্ধ। তার দুচোখে জলের ধারা।]

দৃশ্য : ৬৪

[রাত্রি। সংগ্রামী বৃন্দসংগীত স্তব্ধ। একটা মাত্র মশাল জ্বলছে। ক্যামেরা পিছিয়ে আসে। পর্দায় উদ্ভাসিত হয় হাজার হাজার মশাল। সংগ্রামী জোয়ানেরা বনের মাঝখানে। কানু একটা উঁচু টিলার ওপর বসে। সে জোয়ানদের বলে।]

: আমার আজ অনেক দূর থেকে বন্ধু সুবল এসেছে। আগে তার সাথে কথা বলে নিই, তারপর তোমাদের সঙ্গে আলোচনায় বসবো।

[সুবল বসেছিল কাছেই। কানু এরপর সুবলের দিকে ফিরে জিগেস করে ।]

: তোরা সবাই কেমন আছিস সুবল?

[সুবল শুধু ঘাড় নাড়ে। সে নির্বাক বিস্ময়ে দেখছে কানুকে। কানু আবার বলে :]

: কি দেখছিস হাঁ করে? জানিস, আমরা কত জমিদারকে বন্দী করেছি।

অনেক অত্যাচারীকে মেরে ফেলেছি। আমাদের একটুও হাত কাঁপেনি। আমরা যেখানেই গেছি সব বন্দীদের মুক্ত করে দিয়েছি। বেগার খাটা বন্ধ করে দিয়েছি।

[সুবল নির্বাক। সে দেখছে কানুকে। কানুর এ কোন রূপ, এ তার বোধের বাইরে।]

: তবু আমাদের যাত্রা শেষ হয়নি। এখনো আরও কত অত্যাচারী আছে। জানিসই তো, ওরা সব রক্তবীজের বংশধর—একজনকে মারলে হাজারজন জন্মায়। এখনো কত কাজ।

[সুবল এবার কথা বলে। সে বলে :]

: তুমি আমাদের নেতা হয়েছো। এবার আমাদের দুঃখ কষ্ট নিশ্চয়ই ঘুচবে। এতে আমাদের কত আনন্দ। তাই একবার আমাদের গ্রামে চলো, তোমাকে নিয়ে আমরা উৎসব করবো।

: না। এখন আর গ্রামে যাবার সময় নেই।

: গ্রামে যাবে না তুমি? সবাই যে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

: কি করে যাই বলতো? ওখানকার নদী, গাছপালা, এমনকি প্রতিটি ধুলোও আমার চেনা। ওখানকার জন্য আমার মন কাঁদে। কিন্তু আমার আর ফেরার পথ নেই।

: একথা কেন বলছো?

: আমি কি আবার মাঠে গিয়ে গরু চরাতে পারবো? আবার কি গাছের নীচে বসে বাঁশি বাজাতে পারবো? তোদের মত ধুলোয় গড়াগড়ি খেতে পারবো? আমি এখন নেতা। নেতার পক্ষে কি এসব মানায়। তাহলে যে আমাদের বিদ্রোহ দুর্বল হয়ে যাবে।

: কানু, তুমিও তা হলে অন্যসব নেতাদের মতনই হবে?

: না সুবল তুই বুঝবি না। এখন আমার কত চিন্তা। আমাদের শত্রুরা যখন তখন আক্রমণ করতে পারে। তাছাড়া...তাছাড়া... মানুষের পেটে খাবার নেই...এখন সবাই মুক্তির আনন্দে দিশেহারা হয়ে আছে, কিন্তু ওদের যখন খিদে পাবে? যখন খিদে পাবে?

।সুবল কানুর কথা শুনছে। কানুর দিকে তাকিয়ে সায় দিয়ে মাথাও নাড়ছে। কিন্তু মানে না। সে তার তূণ থেকে শেষ বাণটি ছোঁড়ে।

আর রাধা?

।কানু তাকায় সুবলের দিকে।

হঠাৎ পর্দায় দূর থেকে দেখা যায় অপেক্ষমাণ রাধা। নদীর তীরে। চারপাশে হাজার হাজার প্রদীপ। ক্যামেরা এগোতে থাকে রাধার দিকে। সম্পূর্ণ পর্দা জুড়ে রাধা। সুবলের গলা শোনা যায়।

: রাধা যে তোর জন্য রাতের পর রাত অপেক্ষা করে থাকে? তার সঙ্গেও আর দেখা করবি না? তাকে যে কথা দেওয়া হয়েছিলো...

।পর্দা জুড়ে বিষাদ প্রতিমা রাধার মুখ। কানুর গলা।

: সুবল রাধা যে আর আমাকে চিনতে পারবে না? আমি তো আর সেই কানু নেই। তবুও আমার মনের মধ্যে ঠিকই আছে, সেই সুন্দরের প্রতিমাকে কি কখনো ভোলা যায়। রাধাকে বলিস, তার সেই কানু হারিয়ে গেছে।

।মশাল। একটা জ্বলছে। সংগ্রামী বৃন্দসংগীত।।

দৃশ্য : ৬৫

।দ্বিপ্রহর। সাধু সান্দীপনী গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে। ধীরে বৃন্দসংগীত মিলিয়ে যায়। সাধু সান্দীপনী দর্শকদের বলেন।

: দেখলেন তো। কী অত্যাচার। হাজার হাজার মানুষের দুঃখের কাছে নিজের দুঃখ কষ্ট যেন কিছুই না। আসলে নেতা হতে গেলে এরকমই আত্মত্যাগের প্রয়োজন। তাই কানুকে আমার প্রণাম....একটু দাঁড়ান। কানুর কথা আরেকটু বাকী রয়ে গেছে।

কানুর বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছিল কিনা জানি না, কিন্তু একটা খবর

আমার কাছে পৌঁছেছে। কিছুদিন আগে এক আততায়ীর বন্দুকের গুলিতে কানু প্রাণ হারিয়েছে।

[হঠাৎ গুলির শব্দ সাধু সান্দীপনী চমকে ওঠেন। তারপর আবার দর্শকদের বলেন:]

: কিছুদিন আগে এক আততায়ীর বন্দুকের গুলিতে কানু প্রাণ হারিয়েছে।

[কানুর একটা ছবি দেওয়ালে টাঙানো। তার চারদিকে মোটা কালো দাগ টানা। ছবিতে একটা সাদা ফুলের মালা। ছবির নীচে ধূপ জ্বলছে। সাধুর গলা শোনা গেল :]

: আসুন, আমরা সবাই মিলে এই বিদ্রোহীকে প্রণাম করি।

[সংগ্রামী বৃন্দসংগীত শোনা গেল। পর্দায় ভেসে উঠলো :]

এত বলি কাহিনীর হলো সমাপন,

রাধাকৃষ্ণ নামগান করো সর্বক্ষণ॥

অহিংসা

সংলাপ : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

মূল কাহিনী : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

Scene-1

মাঠের আলপথ ধরে একজন গ্রাম্য বধূ হেঁটে চলেছে। সাধারণ ডুরে শাড়ি পরা, হাতে একগুচ্ছ ফুল। মুখখানা দুশ্চিন্তা ও বিষাদমাখা। সে হাঁটছে বেশ জোরে জোরে। এর নাম মিনতি।

Cut to

Scene-2

ওই একই আলপথ দিয়ে আরও চার-পাঁচজন নারী-পুরুষ হেঁটে আসছে। দু পাশে বিস্তীর্ণ মাঠ। ফসলের চিহ্ন নেই। প্রথমে লং শটে এদের সামনের দিকে দেখা যায়। তারপর পেছন দিক থেকে। তখন শোনা যায় মৃদু গান। দূরে কোথাও ভজন গান হচ্ছে। এই সব নারী-পুরুষদের চোখ দিয়ে দেখা যায় সদানন্দ সাধুর আশ্রম।

Cut to

Scene-3

সদানন্দ সাধুর আশ্রমের ক্লোজআপ। সময় বিকেল। মূল আশ্রমের তিন-চারখানা ঘর। পেছনে গাছপালা। একপাশে বাধাই নদী। সেই নদীর ধারে একটা টিনের চালা, চারপাশ খোলা, মেঝেতে মাদুর পাতা। তাতে বসে আছে কুড়ি পঁচিশজন মানুষ। পুরুষ ও নারীরা আলাদাভাবে বসেছে। কিছু লোক মাদুরে স্থান পায়নি, বসে আছে চালার বাইরে মাটিতে হাঁটুগেড়ে।

সদানন্দ সাধু বসে আছে উচ্চাসনে। একটা সাদা কাপড় ঢাকা চৌকিতে। গৌরবর্ণ, বিশালকায় পুরুষ, খানিকটা ভুঁড়ি আছে কিন্তু মাথায় জটা নেই। মুখে দাড়ি-গোঁফ নেই। খালি গায়ে, শুধু একটা পাতলা গেরুয়া চাদর জড়ানো।

সামনেই একজন মধ্যবয়স্ক মানুষ, চোখ বুজে, খঞ্জনি বাজিয়ে গান গাইছে।

Cut to

Scene-4

সদানন্দের মুখের Close up। মুখে উদাসীন ভাব। গানের দিকে মন নেই, একবার তাকালেন নদীর দিকে।

Cut to

Scene-5

সদানন্দের চৌকির একপাশে দাঁড়িয়ে আছে বিপিন। সে এই আশ্রমের ম্যানেজার। ধূর্ত, কূটবুদ্ধিসম্পন্ন মুখ। সে মনে মনে গুনছে, আজ কতজন ভক্ত এসেছে। তার হাতে একটা প্রণামীর বাক্স।

মিনতি নামের মহিলাটি ও অন্য কয়েকজন এই সময় আশ্রমে পৌঁছোল।

Cut to

Scene-6

মিনতি ও অন্য কয়েকজন একপাশ দিয়ে এসে সদানন্দ সাধুর পায়ে ফুল দিল। সদানন্দ নির্বিকার।

অন্যরা ফিরে গিয়ে বসার জায়গা খুঁজে নিলেও মিনতি দাঁড়িয়ে রইল চৌকির পাশে। তার চক্ষু ছলছল করছে।

গান থেমে গেল। বিপিন ভুরু কুঁচকে মিনতির দিকে তাকিয়ে ছিল, এবার সে তাকে ধমক দিল।

বিপিন : তোমাদের কী আক্কেল গা? গানের মাঝখানে এইভাবে আসতে আছে? আবার দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

মিনতি : আমি প্রভুকে একটা কথা বলব।

বিপিন : এখন নয়। যাও, বসো গে। এখন প্রভু উপদেশ দেবেন।

মিনতি ধীরে ধীরে চলে যায়। চালার বাইরে গিয়ে বসে। সেখানে গনগনে রোদ। অন্য মহিলাদের মুখে ঘাম গড়াচ্ছে।

Cut to

Scene-7

সদানন্দ সাধুর *Point of View*। তিনি ভক্তমণ্ডলীর দিকে চোখ বুলোচ্ছেন। সবাই উৎকর্ণ হয়ে আছে তাঁর উপদেশ শোনার জন্য।

সদানন্দ : মেয়েদের গায়ে বড় রোদ লাগছে, বিপিন।

বিপিন : কী করব, প্রভু!

সদানন্দ : ছায়ার ব্যবস্থা করে দাও।

বিপিন : নিশ্চয়ই দেব। কালকেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

সদানন্দ সামান্য হাসলেন। সদানন্দের সঙ্গে কথা বলার সময় বিপিনের মুখের ভাব বদলে যায়। একেবারে ভক্তিতে গদগদ। হাত দুটি জোড় করে থাকে।

সদানন্দ : নদীতে এবার অনেক আগেই জল এসে গেল!

Cut to

Scene-8

যে-লোকটি গান গাইছিল, তার নাম শ্রীধর। সে হাত জোড় করে আছে।

শ্রীধর : চার-বাদলা নেমে গেছে আজ্ঞা!

সদানন্দ : চার-বাদলা?

বিপিন : এদের ধারণা, প্রতি বছর প্রথম চারবার বৃষ্টি হলেই রাধাই নদীতে হুড়হুড় করে জল নেমে আসে।

সদানন্দ : চারবার? একবারও তো ঝমঝমিয়ে নামেনি!

বিপিন : প্রভু, এরা গুনে দেখে। ওই চারবার হলেই হল!

শ্রীধর : চার-বাদলা হলেই বর্ষা!

সদানন্দ ভুরু কুঁচকে শ্রীধরের দিকে তাকাল। খানিকটা ধমকের সুরে বলল:

সদানন্দ : চারবার কেন, চব্বিশবার বৃষ্টি হলেও বৈশাখ মাসের শেষে বর্ষা নামতে পারে না। প্রকৃতির একটা নিয়ম আছে। নিশ্চয়ই বাঁধ থেকে জল ছেড়েছে! কখনও এই নদীর ধার দিয়ে হেঁটে হেঁটে গিয়ে দেখেছ, এই নদী কোন্ নদীতে পড়েছে? নদীর ধার দিয়ে একলা-একলা হাঁটলে শুধু নদী দেখা নয়, নিজেকেও চেনা যায়।

Cut to

Scene-9

মিনতি নামের সেই রমণীটি উঠে দাঁড়িয়েছে। সে ব্যাকুলভাবে বলল

মিনতি : প্রভু, আমার খোকাটার কী হবে?

বিপিন : এই, চুপ চুপ! গুরুদেবের কথার মাঝখানে কেউ কথা বলবে না!

মিনতি : আমার খোকাটা...আপনি বাঁচিয়ে দেন...ওর বাপ এখানে নাই।

বিপিন : আঃ, ওসব কথা এখানে কেন? প্রভু সকলের জন্য উপদেশ দেন।

সদানন্দ কথা থামিয়ে মিনতির দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর হাতছানি দিয়ে বললেন এদিকে এসো।

মিনতি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

পাশ থেকে একজন বলল, যাও না, প্রভু ডাকছেন।

মিনতি কাঁদতে কাঁদতেই দৌড়ে এসে সদানন্দের পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে যেতেই বিপিন তাকে বাধা দিতে গেল। সদানন্দ হাত তুলে তাকে নিষেধ করল।

সদানন্দ : তোমার ছেলের কী হয়েছে, মা?

মিনতি : চারদিন ধরে ধুম জ্বর। ...তবাস লেগেছে. কিছু খাওয়ালেই বমি করে..

সদানন্দ : কবিরাজ কিংবা ডাক্তার দেখাও। আমি কী করব, আমি তো চিকিৎসক নই।

মিনতি : আপনি একবার ছুঁয়ে দিলেই সে সেরে উঠবে। আশ্রমে ছোট ছেলেমেয়েদের আনা নিষেধ, না হলে তাকে কোলে করে নিয়ে আসতাম। প্রভু, দয়া করুন। যদি একবার আমার

বিপিন : কী বলছিস তুই? প্রভু কখনও কোনো গৃহস্থ বাড়িতে যান?

মিনতি : আমি আশ্রমের বাইরে তাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব।

সদানন্দ : মা, আমার সেরকম কোনো অলৌকিক ক্ষমতা নেই। মানুষের কতরকম রোগ-ব্যাধি হয়, তা আমি কী করে সারাব? আমি মানুষের মনে কিছুটা শান্তি এনে দেবার চেষ্টা করি।

পাশ থেকে একটি ফুল তুলে সে দু'বার হাত বুলোল। তারপর এগিয়ে দিল মিনতির দিকে।

সদানন্দ : এটা তোমার খোকার মাথায় ছুঁইয়ে দিও। ওষুধ খাওয়াতে ভুলো না।

Cut to

Scene-10

মেঠো পথ দিয়ে একটা পালকি আসছে। আট বেহারার পালকি, জরির ঝালর দেওয়া। দেখলেই

বোঝা যায় কোনো জমিদারের পালকি। হুম হুম শব্দ করে সেটা আসছে আশ্রমের দিকে।

আকাশে সূর্য ঢলে পড়েছে।

Cut to

Scene-11

সদানন্দ উপদেশ দিয়ে চলেছে

সদানন্দ . মানুষের জীবনে মাঝে মাঝে খরা আসে, আবার মাঝে মাঝে জীবনটাকে মনে হয় ভরা বর্ষার নদীর মতন। অনেক নদীতে জোয়ার-ভাটা থাকে, আবার অনেক নদী শুধুই একমুখী। তবে সব নদীরই যোগ সমুদ্রের সঙ্গে। এক নদী আর এক নদীতে পড়ে। তারপর আর এক নদী... সবক'টি নদীর জল মিলেমিশে ধায় সমুদ্রের দিকে। এই যে রাধাই নদী, একটুখানি ছোট্ট নদী, সমুদ্রের কথা জানেই না, তবু এর জলও অন্য নদী দিয়ে সমুদ্রে যাবেই। এই যে এখানকার কত মানুষ সমুদ্র দেখেনি, নিজেকে ছোট মনে করে, মনে ক্ষুদ্র, অসহায়, অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু আসলে সব মানুষই ..

Cut to

Scene-12

পালকিটা খানিকটা এগিয়ে এসেছে। দু'পাশে পর্দা ফেলা, ভেতরে কারা আছে বোঝা যাচ্ছে না। একবার শুধু একগাদা কাচের চুড়ি পরা একটা ফর্সা মেয়েলি হাত পর্দা ফাঁক করে কিছু একটা ফেলে দিল।

পালকিটা পৌঁছে গেল আশ্রমে

Cut to

Scene-13

সদানন্দের কথা থেমে গেছে। সে এবং আর সকলেই তাকিয়ে আছে পালকির দিকে। বিপিনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

Long Shot-এ দেখা গেল পালকিটা গিয়ে থামল আশ্রমের পেছন দিকে।

বিপিন রাজাসাহেব এসেছেন! রাজাসাহেব আপনাকে দর্শন করতে এসেছেন প্রভু!

সদানন্দ হুঁ।

বিপিন তাহলে এখানে আজকের মতন থাক তাহলে?

সদানন্দ ওঁকে এখানেই আসতে বলো!

বিপিন অ্যাঁ? এখানে? মানে, উনি তো..

সদানন্দ বলো গিয়ে, আমি এখানেই আছি!

রাজাসাহেবের মতন মানী লোক, যাঁর দানে এই আশ্রম চলছে, তাঁকে এখানে পাঁচজনের মধ্যে ডাকার প্রস্তাব বিপিন একেবারেই পছন্দ করে না। তবু সে তার প্রতিবাদ জানাল না।

প্রণামীর বাক্সটা খুলে সদানন্দের একধারে রেখে সে দ্রুত চলে গেল আশ্রমের দিকে।

ভক্তরা একে একে এসে প্রণাম করতে লাগল সদানন্দের পা ছুঁয়ে। কেউ কেউ টাকা-পয়সা ফেলতে লাগল প্রণামীর বাক্সে। সদানন্দ উদাসীন। সে প্রণাম নিচ্ছে বটে, কিন্তু কারুকে আশীর্বাদ জানাচ্ছে না।

Cut to

Scene-14

আশ্রমেব দিকে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে বিপিন। একজন মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোকেব সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়। এব নাম উমা।

বিপিন মহীগডেব বাজাসাহেব এসেছেন। ঠিক মতন বসিযেছ তো?

উমা (ঈষৎ শ্লেষেব সঙ্গে) বাজাসাহেব তো আসেননি। বাজপুত্তুব।

বিপিন একা? না সঙ্গে কেউ আছে?

উমা তুমি নিজেই দেখো গিযে।

Cut to

Scene-15

আশ্রমেব প্রাঙ্গণ। পালকিটা একপাশে নামানো। পালকিবাহকবা গামছা দিযে ঘাম মুছছে।

পাশেব বাবান্দাব উদ্বিগ্নভাবে দাঁডিযে আছে এক যুবক। কোঁচানো ধুতি ও সিল্কেব পাঞ্জাবি পবা, মুখে অনাচাবেব ছাপ। ঘন ঘন সিগাবেট টানছে। এই যুবকই বাজপুত্র অর্থাৎ স্থানীয় জমিদাবেব ছেলে, এব নাম নাবাযণ।

পালকিব পর্দা তোলা। ভেতবে অস্পষ্টভাবে এক বমণীব আভাস।

নাবাযণ বসে আছো কেন? বেবিযে এসো-

প্রথমে বমণীটি একটি পা বাব কবে। সে পাযে হাই হিল জুতো। তাবপব ক্রমশ নামে সাখা থা খুব সাজগোজ কবা এক যুবতী। মাথায ফুলেব মালা।

বাইবে এসে দাঁডিযে ঘাড ঘুবিযে চাবপাশটা দেখে মুখে মিটিমিটি হাসি।

নারাযণ তাডাতাডি এই ঘবেব মধ্যে চলে যাও।

যুবতীটি সে কথা গ্রাহ্য কবল না। এগিযে গেল গাছপালাব দিকে

নাবাযণ এই! ওদিকে না।

মেযেটি এগিযে যেতে থাকে। সেই দিক থেকে আসে বিভূতি। সে বিস্ফাবিত চোখে মেযেটিকে দেখে।

Cut to

Scene-16

আশ্রমেব একটি ঘব। খাটেব ওপব সাদা চাদব পাতা। একটি আবাম কেদাবা আব কযেকটি মোডা

বিভূতি দাঁডিযে আছে, নাবাযণ আবাম কেদাবায। সিগাবেটেব ছাই ফেলছে মাটিতে।

বিভূতি আগে থেকে যদি একটু খবব দিতেন

নারায়ণ খবব দেব কী কবে? দরকারই হত না, ওকে বাডিতে ফিবিযে দেবাব কথা ছিল। কিন্তু কিছুতেই বাডি যাবে না জেদ ধবেছে'

বিভূতি তা বলে লোকজনেব সামনে দিযে সবাই দেখল

নারায়ণ ওকে তো কেউ দেখেনি। কযেকটা দিন বাখুন, তাবপব আমি ব্যবস্থা কববো

বিভূতি . মেয়েটি এখানে থাকলেই জানাজানি হয়ে যাবে... লোককে কী বোঝাব

নারায়ণ : সে দায়িত্ব আপনার। একটা কিছু বুদ্ধি বার করতে পারবেন না?

(নারায়ণ উঠে বিভূতির কাছে চলে এল। তার কাঁধে হাত দিয়ে বলল:)

নারায়ণ . পাশের আমবাগানটা...আশ্রমের সঙ্গে জুড়ে নিতে চেয়েছিলেন। আমি বাবাকে বলে...দলিলে আপনার নাম থাকবে

বিভূতি : এ আশ্রমের সবকিছুই তো আপনাদের দয়ায়! তবে কি রাত্তির বেলা যদি আসতেন, তখন বাইরেব ভক্তরা কেউ থাকে না...ঠিক আছে, কয়েকটা দিনের তো ব্যাপার, একটু আড়াল করে রাখতে হবে...আপনি হাত-পা ধুয়ে নিন, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করছি,... প্রভু এখনই এসে পড়বেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলুন—

নারাযণ অর্ধেক সিগারেট মাটিতে ছুঁড়ে ফেলল।

নারায়ণ . না, না, আমি থাকতে পারব না। আমাকে এক্ষুনি চলে যেতে হবে। গুরুদেবের সঙ্গে আমার কথা বলার দরকার নেই। সব ভার আপনার ওপর—

পালাবার ভঙ্গিতে সে দ্রুত বেরিয়ে যায়।

বিভূতি মাটি থেকে সিগারেটের টুকরোটা তুলে নিয়ে ফেলে দিল জানালা দিয়ে।

Cut to

Scene-17

ভক্তরা বিদায় নিয়েছে। সদানন্দ একা হেঁটে আসছেন। আধো অন্ধকার। আশ্রমের একটি ঘরের বারান্দায় একটি লণ্ঠন জ্বলছে।

একটি গাছে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই মেয়েটি।

সদানন্দ এক পলক তাকালেন, কিন্তু লক্ষ্য করলেন না।

কয়েক পা গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে আবার মুখ ফেরালেন। এবার মেয়েটিকে দেখলেন ভালো করে। তাঁর ভুরু কুচকে গেল বিরক্তিতে।

সদানন্দ কে গা তুমি? কী করছ এখানে?

যুবতী : চুপ! আমি কেউ না।

সদানন্দ কয়েক মুহূর্তে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, মুখে ফুটে উঠল বিরক্তি ও রাগ।

সদানন্দ : এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন বাছা? ঘরে গিয়ে বসো!

যুবতী : (নেশায় জড়ানো গলা) আমি যদি এখানে দাঁড়িয়ে থাকি, তোমার কী?

তারপর সে হিল-তোলা জুতো ঠকঠকিয়ে এগিয়ে এল। বেসামাল পদক্ষেপ। কাছে এসে টাল সামলাবার জন্য সদানন্দের গায়ে ভর দিল।

যুবতী : তুমিই সাধুজি, না?

মদের গন্ধ পেয়ে সদানন্দ নাক কোঁচকালেন। একটু সরে যাবার চেষ্টা করলেন। যুবতীটি সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরল।

যুবতী : শোনো, 'আমি কেউ না' বললাম না এক্ষুনি তোমাকে, তা সত্যি নয়! আমি মাধবী গো, মাধবীলতা, লতাটি কেটে বাদ দিয়েছি।

সদানন্দ : সরে দাঁড়াও!

যুবতী খিলখিল করে হেসে উঠল। সদানন্দর গলা ধরে ঝুলে পড়তে চাইল। সদানন্দ সেই হাতের বাঁধন জোর করে খুলে, নিষ্ঠুরের মতো জোরে ধাক্কা মেরে মাধবীলতাকে ফেলে দিল মাটিতে। তারপর চলে গেল নিজের ঘরের দিকে।

Cut to

Scene-18

মাধবীলতা মাটিতে পড়ে ছটফটিয়ে গড়াচ্ছে আর ডুকবে কাঁদছে।

Cut to

Scene-19

পালকিতে উঠতে যাচ্ছে নারায়ণ। সেই কান্না শুনে দৌড়ে এল।

Cut to

Scene-20

তার মধ্যেই বিপিন পৌঁছে গেছে সেখানে।

বিপিন : একী, একী, চুপ চুপ!

নারায়ণ : এসব কী ন্যাকামি হচ্ছে? উঠে বোস্!

মাধবীলতা : সাধুজি, আমায় মেরেছে। ঠেলে ফেলে দিয়েছে!

বিপিন : চ্যাঁচামেচি করলে আরও কেলেঙ্কারি হবে।

মাধবীলতা : আমি এখানে থাকব না। আমাকে নিয়ে চলো।

নারায়ণ : তখন বাড়ি পৌঁছে দেবার কথা বললাম...এখন এতদূর এসে..

মাধবীলতা : বাড়িতে যাব না! অন্য কোথাও যাব!

নারায়ণ : আর কোন্ চুলোর দোরে নিয়ে যাব?

নারায়ণ আর বিভূতি জোর করে মাধবীলতাকে তুলে ঘরের দিকে নিয়ে গেল। সে তখনও কাঁদছে।

Cut to

Scene-21

খাটের ওপর জোড়াসনে বসে আছেন সদানন্দ।

একটা হুঁকো কল্কেতে ফুঁ দিতে ঘরে ঢুকল বিপিন। সদানন্দের সামনেই হুঁকোতে দু'বার টান দিয়ে সে সেটা এগিয়ে দিল সদানন্দের দিকে।

সদানন্দ বিপিনের দিকে তাঁর চোখ চেয়ে [illegible]লেন।

বিপিন : রাজাসাহেব আসেননি প্রভু। নারায়ণবাবু একটি নিরাশ্রয় মেয়েকে আশ্রমে ভর্তি করে দিতে এসেছেন।

সদানন্দ : নিরাশ্রয় মেয়ে? সব নিরাশ্রয় মেয়েই নারাণের কাছে গিয়ে ধর্না দেয়!

বিপিন: এই মেয়েটির সত্যই কেউ নেই।

সদানন্দ : এই নিয়ে ক'জন হল? গত বৈশাখ মাসেও একজন...

বিপিন : তাকে তো বিদায় করে দেওয়া হয়েছে প্রভু! কোনো গোলমাল হয়নি।

সদানন্দ : তুই কী ভেবেছিস বিপিন? এক বড়লোকের লম্পট ছেলে একের পর এক মেয়েকে নষ্ট করবে, তাদের আশ্রয় দেবার জন্য আমরা এই আশ্রম খুলেছি? ছিঃ!

ধমক খেয়েও একটুও বিচলিত হল না বিপিন। হাসল।

বিপিন : তুই এত মাথা গরম করিস কেন সদা? নারাণবাবুদের চটালে কি আশ্রম চালানো যায়? তুই যা ভাবছিস, তা ঠিক নয়। মেয়েটা সত্যিই ভালো। নারাণবাবু চলে গেলেন বলে তখন থেকে অঘোরে কাঁদছে!

সদানন্দ : মেয়েটাকে গছিয়ে দিয়ে নারাণ পালিয়েছে? আর নিতে আসবে না।

বিপিন : আসবে, আসবে। হয়তো কাল বা পরশু। বড় জোর তিন-চারদিন। এই কটা দিন একটু রয়ে সয়ে কাটিয়ে দে! দোহাই তোর! আর কেউ হলে কি আশ্রমে উঠতে দিতাম? রাজাসাহেবের ছেলে, দু'দিন পর নিজে সব কিছুর মালিক হবে। ওকে তো চটানো যায় না। তুই বল, যায়?

সদানন্দ : বড়লোকের পা-চাটা আর টাকা রোজগারের ফন্দি আঁটবার জন্য আশ্রম করেছিলি বিপিন? তাহলে ব্যবসা করলেই হত।

বিপিন হাত জোড় করে নকল ভক্তিভাব দেখাল।

বিপিন : এ ব্যবসাই বা মন্দ কি প্রভু?

সদানন্দ : আবার তামাশা হচ্ছে? দিন দিন তুই যে কী ব্যাপার করে তুলছিস, আমার অসহ্য লাগে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে আশ্রম করা হয়েছিল, সব চুলোয় গেছে। তোর খালি টাকা টাকা টাকা! টাকা ছাড়া কিছু হয় না বলছিলি, টাকা তো যথেষ্ট হয়েছে, আর কেন? এবার আসল কাজে মন দে না ভাই, এসব ছেড়ে দে! আর টাকাই যদি তোর বড় হয়, তুই থাক তোর আশ্রম নিয়ে, আমি চলে যাই! দিন দিন আমার মনের শান্তি নষ্ট হচ্ছে! আমার আর সয় না!

বিপিন : তুই কি ভাবিস, টাকার লোভে আমি রোজগারের ফন্দি আঁটি? এসব আমার নিজের জন্য?

সদানন্দ : কিন্তু সব সময় টাকার চিন্তা করলে আদর্শ বজায় রাখা যায় না। মনের শুদ্ধতা নষ্ট হয়ে যায়!

বিপিন : ওসব বড় বড় কথা গ্রামের লোকেদের শোনাস। আমার উপর লেকচার ঝাড়বি না। টাকা ছাড়া কিছু হয়? টাকার অভাবে আদর্শ টাদর্শ সব মাথায় ওঠে! কত লোক আশ্রমে এসে থাকতে চায়, আরও ঘর তোলা দরকার। সে জন্য টাকা লাগবে না? পাশের আমবাগানটা কেনা দরকার, কে টাকা দেবে? তুই শুধু আদর্শই জানিস সদা, কিসে কী হয় তা জানিস না। আশ্রমটা আরও বড় করতে গেলে...

সদানন্দ : বেশি বড় করার দরকারটাই বা কী?

বিপিন : সব জিনিস নিজের নিয়মেই বড় হয়। ভেবে দ্যাখ, এই যে আশ্রমটা হয়েছে, এতগুলো লোক আশ্রমে বাস করছে... দলে দলে লোক একটু শান্তি পাবার জন্য তোর উপদেশ শুনে যাচ্ছে....আমি ফন্দি না আঁটলে এটুকুও কি হত? রাস্তায় রাস্তায় চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে ফেললেও কেউ তোর কথা শুনত না। ভাল উদ্দেশ্যে দুটো মিথ্যে কথা, একটু ভড়ং, এসবে দোষ হয় না!

সদানন্দ : তা বলে একটা লম্পটের কুকীর্তির প্রশ্রয় দিতে হবে?

বিপিন : নারাণবাবু একটা মেয়েকে বার করে এনেছে, তাতে আমাদের কী? আমরা আশ্রমে উঠতে দিলেও বার করে আনত মেয়েটাকে, না দিলেও আনত। আমরা শুধু এই সুযোগে আশ্রমের কিছুটা উন্নতি করে নিচ্ছি! তোকে এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না, তুই তোর কাজ করে যা, আমি আমার কাজ করে যাচ্ছি। একদিন দেখবি, এই আশ্রমের নাম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে!

সদানন্দ : হুঃ! আশ্রমের নাম সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে যাবার জন্য আমার তো আর ঘুম আসছে না!

বিপিন : ঘুম তোর খুব আসে! শালা, মোষের মতন ঘুমোস তো সারা রাত। দিব্যি আরামে রয়েছিস। তোর মতন শুয়ে বসে কাটাতে পারলে আমারও ঘুম আসতো। তামাকটা দে!

সদানন্দ : তুই এখন এখান থেকে চলে যা বিপিন! এরপর আমি মেজাজ ঠিক রাখতে পারব না।

বিপিন : এক পেট খেয়ে একটা লম্বা ঘুম দিন প্রভু, তাহলেই মেজাজ ঠিক হয়ে যাবে।

Cut to

Scene-22

গভীর রাত্রি। নদীর জলে দোল খাচ্ছে চাঁদ। আশ্রমে কোথাও বাতি জ্বলছে না। দূরে শেয়াল ডাকছে।

Cut to

Scene-23

সদানন্দের ঘর। মশারির মধ্যে চিৎ হয়ে ঘুমিয়ে আছে সদানন্দ।

Cut to

Scene-24

বাইরের দৃশ্য। একটু একটু করে ভোরের আলো ফুটছে। দৃশ্যমান হচ্ছে পৃথিবী।

Cut to

Scene-25

সদানন্দের ঘর। খোলা জানালা দিয়ে আলো এসে পড়ছে।

ঘুমের ঘোরে সদানন্দ পাশ ফিরল। আগে দেখা যায়নি, এখন দেখা গেল, সেই বিছানাতেই একপাশে গুটিসুটি মেরে ঘুমিয়ে আছে মাধবীলতা। হাতদুটি বুকের কাছে জড়ো করা।

মাধবীলতার গায়ে হাত পড়তেই সদানন্দ চমকে জেগে উঠল। ধড়মড় করে উঠে বসে গভীর বিস্ময়ে দেখতে লাগল মাধবীলতাকে। তারপর দেখল, দরজায় খিল দেওয়া।

মাধবীলতা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। একটু দ্বিধা করে সদানন্দ মাধবীলতার কপাল থেকে চুল সরিয়ে দিল প্রথমে। গায়ে চাদর টেনে দিল।

তারপরেও তাকিয়েই রইল। মাধবীলতা জাগছে না দেখে, সে যেন পুতুল খেলার ভঙ্গিতে আলতো করে তার মাথা চাপড়ে দিতে লাগল।

মাধবীলতা চোখ মেলে তাকাল। ব্যস্ত হল না, ভয় পেল না। সরল চোখের দৃষ্টি।

সদানন্দ : তুমি কখন এ বিছানায় এলে?

মাধবীলতা উত্তর দিল না।

সদানন্দ : তুমি কেন এ ঘরে এসেছ?

মাধবীলতা তবু চুপ, একই রকম দৃষ্টি।

সদানন্দ : কে তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে?

এর পরেই সদানন্দ দু'হাতে পাঁজাকোলা করে মাধবীলতাকে তুলে নিল বিছানা থেকে। প্রথমে মনে হল, সে তাকে খাট থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে নিচে। তারপরেই সে মাধবীলতার বুকে মুখ গুঁজে আদর করতে লাগল।

Cut to

Scene-26

একা একা নদীর পাড় দিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতন হাঁটছে সদানন্দ। এক জায়গায় থামল। সেখানে কিছু ঘাসফুল ফুটে আছে। সদানন্দ সেখানে হাঁটু গেড়ে বসে প্রথমে ফুলগুলোর ওপর হাত বোলাল। তারপর পট পট করে সেগুলো ছিঁড়তে লাগল।

Cut to

Scene-27

একটা গাছের গুঁড়িতে বসে আছে সদানন্দ। আশ্রমের দিক থেকে হেঁটে আসছে বিভূতি। তার দু'হাতে দু'গেলাস চা। কাছে এসে একটা গেলাস সে বাড়িয়ে দিল সদানন্দের দিকে।

বিভূতি : এখন মেজাজ ভাল হয়ে গেছে তো?

সদানন্দ : এসব কী শুরু করেছিস তুই?

বিভূতি : আরে বাবা সকালবেলাই আবার ঝগড়া শুরু করবি নাকি?

সদানন্দ : তোকে জবাবদিহি করতে হবে। তুই আমাকে কি ঘুস দিতে চাস? নাকি পরীক্ষা করছিস?

বিভূতি : তোকে পরীক্ষা করব আমি? তুই ওরকম কত ভোগের দ্রব্য ত্যাগ করে চলে এসেছিস! সদানন্দস্বামী অনেক উচ্চমার্গের লোক, তা আমি সত্যিই মানি।

সদানন্দ : শোন বিভূতি...

বিভূতি : আগে তুই আমার কথাটা শোন। তুই এখনও বড় ছেলেমানুষ আছিস, কথায় কথায় রাগিস কেন? তোর ঘরে মেয়েটাকে পাঠিয়েছি...আর কোথায় রাখতাম বল তো? প্রথম এসেছে, কেউ কিছু জানে না, তোর কাছেই সবচেয়ে নিরাপদ...সেই জন্যই আমার কোনও ভাবনা হয়নি।

সদানন্দ চায়ে চুমুক দিতে লাগল।

বিপিন : মেয়েটা বড় চঞ্চল, অস্থির, মনটাও উতলা হয়ে আছে। তোর কাছাকাছি থাকলে, তোর মুখে দুটো কথা শুনলে ওর মন শান্ত হবে।

চায়ের গেলাসটা নামিয়ে রেখে সদানন্দ হনহন করে এগিয়ে গেল নদীর দিকে।

Cut to

Scene-28

নদীতে বারবার ডুব দিচ্ছে সদানন্দ। প্রচণ্ড আলোড়িত হচ্ছে জল। তারপর কোমর জলে দাঁড়িয়ে সে মন্ত্র পড়তে লাগল।

Cut to

Scene-29

ভিজে কাপড়ে, খালি গায়ে, আশ্রমে নিজের ঘরে ফিরে এল সদানন্দ। বারান্দায় একটা মাদুরে বসে আছে মাধবী। তার সামনে একটা গেলাসে চা, আর প্লেটে কিছু খাবার। মাধবী কিছুই স্পর্শ করেনি। হাঁটুর ওপর থুতনি। দৃষ্টি সুদূরে।

সদানন্দ : এখানে একা বসে আছ?

উত্তর না পেয়ে সদানন্দ ভেতরে চলে গেল কাপড় বদলাতে। মাধবী বসেই রইল, দূরে শোনা যাচ্ছে একটা অস্পষ্ট গান।

অতি দ্রুত শুকনো কাপড় পরে ফিরে এল সদানন্দ। প্রথমে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থেকে, তারপর কাছে এসে বসল। মাধবীর গালে আঙুল দিয়ে একটা দাগ কাটল।

সদানন্দ : কিছুই খাওনি দেখছি। খাও, আমার সামনে খাও।

মাধবী : খিদে পায়নি।

সদানন্দ : কাল রাত্রে খেয়েছিলে কিছু?

উত্তর না দিয়ে মাধবী দু'দিকে মাথা নাড়ল।

সদানন্দ : তাহলে খেয়ে নাও কিছু। চা-টা বোধহয় জুড়িয়ে গেছে, গরম করে দিতে বলব।

মাধবী : না, কিছু খাব না। বমি হয়ে যাবে!

মাধবী একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে সদানন্দের দিকে।

সদানন্দ : তোমার বাড়ি কোথায়, মাধবী?

মাধবী : যেখানেই হোক না, তোমার তাতে কী?

সদানন্দ : এমন কাজ কেন করলে মাধবী? কেন বাড়ি ছেড়ে এলে? দু'দিন পরে ওই নারাণচন্দ্র যখন তোমায় ফেলে পালাবে, তখন কী করবে তুমি? একটা ভুলের জন্য সমস্ত জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে! এমন ছেলেমানুষী কেউ করে?

একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মাধবীর চোখে ফুটে উঠল ভয়ঙ্কর রাগ। প্রথমে খাবারের প্লেট, তারপর চায়ের কাপ ছুঁড়ে মারল সদানন্দের দিকে। তাতেও না থেমে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল সদানন্দের ওপর। আঁচড়ে কামড়ে রক্তাক্ত করে দিল।

সদানন্দ একেবারে স্থির।

একটু পরে সে সদানন্দের কোলে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল ফুলে ফুলে। সদানন্দ তাকে কাঁদতে দিল। হাত বাড়িয়ে একটা গেরুয়া কাপড় নিয়ে নিজের শরীর থেকে খাবার, চা ও রক্ত মুছতে লাগল।

মাধবী একটু শান্ত হতেই সদানন্দ বলল স্নিগ্ধ স্বরে

সদানন্দ : ওঠো মাধবী, তোমার কোনও ভয় নেই।

মাধবী আরও জোরে আঁকড়ে ধরল সদানন্দকে। সদানন্দ তার পিঠে হাত রাখল।

সদানন্দ : ভয় নেই, ভয় নেই, আমি সব ঠিক করে দেব! মুখ তোলো! উঠে বসো।

মাধবী এবার অশ্রুভেজা মুখ তুলে আঁচল দিয়ে মুছতে লাগল।

সদানন্দ : আশ্রমে অনেক মেয়ে থাকে। চলো, তোমাকে তাদের কাছে দিয়ে আসি।

মাধবী সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

মাধবী : চলুন।

সদানন্দ : আগে মুখ ধুয়ে কাপড়টা বদলে এসো। গালে তোমার সন্দেশ লেগে আছে। কাপড়ে চায়ের দাগ।

মাধবী ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

Cut to

Scene-30

আশ্রমেব ভেতর দিকে পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছে সদানন্দ ও মাধবী। আশ্রমের বাসিন্দা বিভিন্ন নারী-পুরুষ। কেউ কেউ চোখ বুজে জপতপ করছে। কেউ উঠোন নিকোচ্ছে, সদানন্দকে দেখে সবাই তটস্থ!

Cut to

Scene-31

আশ্রমের একটি কুটিব। এখানে থাকে বত্নাবলী। সে যুবতী, আর তাব প্রৌঢ়া পিসি উমা। বাইরেব দাওযায় বসে বত্নাবলী ফুলের মালা গাঁথছে আব গুনগুন কবে গান গাইছে। তাব পিসি ঘবের ভেতব থেকে কথা বলছে তার সঙ্গে।

উমা : *(Off voice)* কী লো রত্নী, এখনও চান করতে গেলি না?

রত্নাবলী: যাচ্ছি গো, যাচ্ছি!

উমা : *(Off voice)* রোজ রোজ পইপই করে বলি, ভোরে উঠে স্নান সেরে নিবি, মেয়েমানুষের বেশি বেলায় স্নান করতে নেই। পুজোয় বসবি কখন?

রত্নাবলী: এই দ্যাখো! তোমার বকুনি শুনতে গিয়ে আমার হাতে ছুঁচ ফুটে গেল!

রত্নাবলীর এক আঙুলে বক্তবিন্দু। সে আঙুলটা মুখে পুরে দিল।

Cut to

Scene-32

সেই কুটিব প্রাঙ্গণে সদানন্দ।

সদানন্দ : উমা!

ঘব থেকে বেরিয়ে উমা দরজাব কাছে দাঁড়াল। রত্নাবলীও ফুলটুল ছড়িয়ে ফেলে উঠে পড়ল। তাবপর একটা কার্পেটের আসন পেতে দিল গুরুদেবের জন্য।

সদানন্দ তাতে বসে চোখের ইঙ্গিতে মাধবীকেও বসতে বলল পাশে। মাধবী দাঁড়িয়েই রইল।

সদানন্দ : এই মেয়েটি আজ আশ্রমে ভর্তি হল। মেয়েটির কেউ নেই উমা!

রত্নাবলীব মুখ : সে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে।

উমার মুখ : তার দৃষ্টিতে সন্দেহ ও অপছন্দ।

সদানন্দ : ও এখানে থাকবে। তোমরা ওর দেখাশুনোর ভার নেবে।

উমা কোনও উত্তর দিল না। তার চোখে নানান প্রশ্ন।

সদানন্দ : (প্রচণ্ড ধমক দিয়ে) তুমি কী ভাবছ, উমা?

উমা কেঁপে উঠল। তারপর সে গুরুদেবের পায়ের কাছে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর্তকণ্ঠে বারবার বলতে লাগল, আমায় ক্ষমা করুন!

মাধবীর মুখ : সবিস্ময়ে দেখছে এই দৃশ্য।

সদানন্দ : উঠে বসো উমা।

উমা মুখ তুলে কাতরভাবে তাকাল। হাত জোড় করা।

সদানন্দ : মনকে সংযত রেখো। মন হচ্ছে ঘরের মতন। ধুলোবালি এসে জমা হয়। ঝাঁট দিয়ে সে-সব সাফ করে রাখতে হয় সবসময়, নইলে ঘরখানা যেমন আবর্জনায় ভরে ওঠে, তেমনি মনও কুচিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

উমা হাত জোড় করে কাঁপছে।

আরও দশ-বারোজন নারী-পুরুষ জমায়েত হয়েছে উঠোনে।

সদানন্দ এই মেয়েটিকে তোমাদের জিম্মায় রেখে গেলাম। তোমরা ওকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নেবে।

সকলেরই হাত জোড় করা।

Cut to

Scene-33

ভোর। মহেশ চৌধুরি নামে একজন মাঝবয়সী লোক নৌকোয় চেপে নদী পেরিয়ে আসছে। তার পোশাক অতি সাধারণ। ঠেঙো ধুতি ও ফতুয়া। নৌকোটি চালাচ্ছে এক মাঝি, মহেশ দাঁড়িয়ে আছে, হাততালি দিতে দিতে, মাথা নেড়ে নিঃশব্দে গান গাইছে।

খেয়া নৌকোটি এপারে ভিড়লে মহেশ পয়সা দিতে গেল, মাঝিটি কিছুতেই নেবে না। সংলাপের প্রয়োজন নেই। কিছুটা দূর থেকে দৃশ্যটি দেখা যায়।

Cut to

Scene-34

সদানন্দ নদীর ধার দিয়ে হাঁটছে, একটু দূর থেকে তাকে অনুসরণ করছে মহেশ।

সদানন্দ একটা গাছের গুঁড়িতে বসতেই কাছে এসে দাঁড়াল মহেশ। সদানন্দ একবার তাকে দেখে চোখ নামিয়ে নিল। মহেশ মাটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে সদানন্দের পায়ে মাথা ঠেকাল। সদানন্দের মুখে বিরক্তির চিহ্ন।

সদানন্দ কে, মহেশ?

মহেশ উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করল।

মহেশ প্রভু!

সদানন্দ এই সাতসকালে কী মনে করে?

মহেশ মনে বড় জ্বালা প্রভু। বড় কষ্ট পেয়েছি সারা রাত। তাই ভাবলাম, ভোরবেলা প্রভুর চরণ দর্শন করে...

সদানন্দ তোমায় না আশ্রমে আসতে বারণ করে দেওয়া হয়েছে?

মহেশ . তবু না এসে পারি না প্রভু!

সদানন্দ : বটে? তোমার মতন আর দু-একটি ভক্ত জুটলেই আশ্রম ছেড়ে আমায় বনে-জঙ্গলে পালাতে হবে।

মহেশ : এ কথা কেন বলছেন প্রভু। আপনি বনে-জঙ্গলে গেলেও আমি সেখানেই যাব।

সদানন্দ : বটে, বটে? তোমার আসল মতলবটা কী বলো তো শুনি?

মহেশ : চরণে ঠাঁই চাই প্রভু। মনে শান্তি চাই!

সদানন্দ : শুনেছি, গ্রামের লোকদের তুমিই অনেক উপদেশ দাও, তাদের নিয়ে আসর বসাও, আমাকে তোমার প্রয়োজন কী?

মহেশ : (জিভ কেটে, নিজের দু'কান ধরে) আমি কি উপদেশ দেব, আমার কি তেমন বিদ্যে-বুদ্ধি আছে, না উপলব্ধি হয়েছে! আপনার কাছ থেকে যে-টুকু শুনেছি, তাই ওদের সরল ভাষায় বুঝিয়ে বলি!

সদানন্দ অন্যদিকে মুখ ফেরাল।

মহেশ : বিভূতিবাবু আমায় দেখলে রাগ করেন। কেন যে আমাকে আসতে বারণ করেন, আজও বুঝলাম না। এই আকাশ, বাতাস, সমুদ্র, নদী যেমন সব মানুষের জন্য, তেমনি সদ্‌গুরুও কি সকল ভক্তের জন্য নয়?

সদানন্দ : তোমার ছেলে এ তল্লাটে চাষী-মজুরদের খেপিয়ে বেড়ায়। জমিদারের বিরুদ্ধে উসকানি দেয়। জমিদারের দানেই এই আশ্রম। তাকে কি বিভূতি চটাতে পারে?

মহেশ : ছেলেকে তো আমি কিছু শেখাইনি প্রভু। তা ছাড়া সে এখন জেলে!

সদানন্দ : সে এখনও ছাড়া পায়নি?

মহেশ : আজ্ঞে না। ও কি আর কোনওদিন ছাড়া পাবে!

সদানন্দ : অ্যাঁ? সে কি কথা! ছাড়া পাবে বইকি! দু'দিন পরেই ছাড়া পাবে। ভেবো না!

মহেশ : আপনি একথা বলছেন প্রভু? আপনার এত দয়া? মহেশ আবার সদানন্দের পায়ে আছড়ে পড়ল।

Cut to

Scene-35

আবার একটি পালকি আসছে। তার থেকে নামল নারায়ণ। এবার তার পরনে সাহেবি পোশাক। মুখে আগেরই মতন অস্থির ভাব।

বিভূতি এসে তাকে স্বাগত জানাল।

এই দৃশ্যেও সংলাপের প্রয়োজন নেই।

Cut to

Scene-36

সদানন্দর ঘর। সদানন্দ চৌকিতে বসা। নারায়ণের জন্য একটা চেয়ার আনা হয়েছে। সদানন্দের মুখ প্রসন্ন। বিভূতি একপাশে দাঁড়িয়ে আছে।

সদানন্দ : তোমার বাড়ির সব কুশল তো?

নারায়ণ : আজ্ঞে হ্যাঁ।

সদানন্দ : মাধবীতলাকে নিয়ে যেতে চাও? যদি সে রাজি থাকে, আজই তাকে নিয়ে যেতে পারো।

বিভূতি : মাধবীর এখানে বেশ মন বসে গেছে প্রভু। সবার সঙ্গে মিলেমিশে আছে।

নারায়ণ : আরও কয়েকটা দিন যদি রাখা যায়...ওদিকে খানিকটা অসুবিধে হয়েছে।

বিভূতি : এখানে ওর থাকার কোনও অসুবিধে নেই। কেউ কোনও গোলমাল করেনি, প্রভু যা বলেছেন, সবই মেনে নিয়েছে।

সদানন্দ : ওরা দু'জনে যা চায়...থাকতে চায় থাকবে, না হয়ে চলে যাবে...তুমি এক কাজ করো না নারায়ণ। মাধবীলতাকে নিয়ে নদীর ধারে চলে যাও, নিরিবিলিতে কথা বলো, ওর মন বুঝে দেখো।

নারায়ণ . নদীর ধারে?

সদানন্দ : এদিকটাতেই বেড়াতে ভাল লাগবে।

নারায়ণ উঠে দাঁড়াল। বিভূতি বিস্মিতভাবে তাকিয়ে বইল সদানন্দেব দিকে।

Cut to

Scene-37

সদানন্দর ঘর : কয়েক ঘণ্টা পর। সদানন্দ জোরে জোরে গীতা পাঠ করছে। বিভূতি এসে ঢুকলো।

সদানন্দ গীতার এই অংশটার আমি একটা ব্যাখ্যা তৈরি করেছি। তুই একটু শুনবি।

বিভূতি এখন গীতা বাখ। তুই মাধবীকে নদীর ধারে পাঠিয়ে দিলি?

সদানন্দ দেব না কেন? ওরা দুটিতে মনের কথা বলবে না?

বিভূতি যদি নারাণবাবু ওখান থেকেই মাধবীকে নিয়ে চলে যেত?

সদানন্দ বিচিত্রভাবে হাসল।

বিভূতি : ওবা দু'আড়াই ঘণ্টা একসঙ্গে ছিল। নারাণবাবু সেখান থেকেই ফিরে চলে গেছে। মাধবী কী বলেছে নারাণবাবুকে?

সদানন্দ : ওদের মধ্যে কী কথা হয়েছে, আমি কী করে জানব?

বিভূতি : তুই জানবি না? তোর পাতানো মেয়ে.. বাবা বলে ডাকে না তোকে?

সদানন্দ : পাতানো মেয়ে আবার কীসের?

বিভূতি হুঁ হুঁ কবে বিশ্রীভাবে হেসে উঠল।

সদানন্দ : হাসলি যে? কী ভাবছিস তুই!

বিভূতি : আমি কিছুই ভাবছি না।

বিভূতি বিদায় নিতে উদ্যত হয়েও ফিরে তাকাল।

বিভূতি মাধবীকে তবে ফিরিয়ে দিয়ে আসি কালকে?

সদানন্দ কোথায়?

বিভূতি যেখান থেকে এসেছে। ওর মামার বাড়ি।

সদানন্দ : না, এইখানেই থাকবে মাধবী। কোথাও যাবে না।

বিভূতি : কেন মিছে বালির ঘর বাঁধছ বাবা? রাজপুত্তুরকে ছেড়ে ও মেয়ে তোমার দিকে ঝুঁকতে যাবে কেন? গুরু সেজে বড় জোর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে, আদর করে গালটা টিপে দিতে পারো! তার বেশি কিছু—

সদানন্দ : বিপিন! তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে?

বিভূতি : আমার মাথা খারাপ হতে যাবে কেন? হয়েছে তোর! কচি একটা মেয়ে দেখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলে গেছিস! ঢং করে উমাদের কাছে ওকে পাঠাতে গেলি কেন, নিজের কাছে রাখলেই হত। বুকে করে—

সদানন্দ দ্রুত এগিয়ে এসে বিভূতির হাত চেপে ধরল

সদানন্দ : তুই কি এসব কথা মাধবীকেও বলেছিস?

বিপিন : ভয় নেই, তোর প্রেমের পথে কাঁটা হয়ে থাকব না। আমি সরে যাব।

সদানন্দ : তোর মনটা...তোর অসুখ হয়েছে বিপিন। সুস্থ অবস্থায় তুই এসব বলতে পারতিস না।

বিপিন : হাত ছাড়! আমার হাতটা লোহা দিয়ে তৈরি নয়! জোর করে হাত ছাড়িয়ে বিপিন চলে গেল।

Cut to

Scene-38

আশ্রমের বাইরের চালাঘরে সদানন্দ। সামনে ভক্তবৃন্দ। শ্রীধর কীর্তন গাইছে। নারী পুরুষদের মধ্যে দেখা যায় মিনতিকে। চোখ বুজে গান শুনছে। দু'চোখে জলের ধারা। একেবারে পিছন দিকে বসে আছে মাধবী।

Long Shot-এ দেখা যায় দূরে মহেশের সঙ্গে তর্কাতর্কি হচ্ছে বিপিনের। মহেশ ফিরে চলে গেল।

Cut to

Scene-39

সদানন্দের ঘরে চৌকিতে পা ঝুলিয়ে বসে আছে মাধবী। তার চোখ দিয়ে টস টস করে জল পড়ছে। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে সদানন্দ।

সদানন্দ : তোমার কী হয়েছে মাধু? কীসের কষ্ট?

মাধবী প্রবলভাবে দু'দিকে মাথা নাড়ে।

সদানন্দ : আমাকে বলো। তোমাকে কেউ কিছু বলেছে?

মাধবী আবার মাথা নাড়ল।

সদানন্দ : তোমাকে তো বলেইছি, তুমি যখন খুশি আমার এখানে চলে আসতে পারো

দরজা দিয়ে মুখ বাড়াল বিপিন। সে দেখল, সদানন্দ মাধবীলতার থুতনি ধরে আছে।

বিপিন : ও! আচ্ছা, আমি পরে আসছি!

সদানন্দ : এসো, ভেতরে এসো বিপিন। মাধবীর বোধহয় এখানে আর থাকতে ভাল লাগছে না। ক'দিন ধরেই ওর মন খারাপ হয়ে আছে। রাত্রে ঘুমোতে পারে না।

বিপিন : (বিদ্রুপের সুরে) তাই নাকি?

সদানন্দ : কী বললি?

বিপিন : না, না, অন্য কথা ভাবছিলাম। হ্যাঁ, মাধবীর কী হয়েছে?

সদানন্দ : ওকেই জিজ্ঞেস কর?

মাধবী আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

বিপিন : এখানে থাকতে তোমার ভাল লাগছে না মাধবী?

মাধবী : লাগছে। কিন্তু মাঝে মাঝে মনটা খারাপ হয়ে যায়!

বিপিন : কীসের জন্য মন খারাপ?

মাধবী : জানি না।

বিপিন ও সদানন্দ পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকে।

সদানন্দ : বাড়ির জন্য?

বিপিন : ওর আপনজন বলতে তো বিশেষ কেউ নেই। এক মামা, সে-ও ভাল ব্যবহার করে না।

মাধবী উঠে গিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে থাকে

বিপিন : আশ্রমে আটকা পড়ে গেছে কিনা। আসবার পর থেকে একদিনও তো কোথাও যায়নি। ক'দিন বাইরে থেকে ঘুরে এলে বোধহয় ভাল লাগত। যাবে মাধবী?

মাধবী : কোথায়?

বিপিন : নারাণবাবু আমায় নেমন্তন্ন করেছেন পরশু। যাবে আমার সঙ্গে মহীগড়ে? বেশ জায়গাটা

মাধবী : (প্রবলভাবে মাথা দুলিয়ে) না!

বিপিন ও সদানন্দ আবার পরস্পরের দিকে তাকায়।

দুজনের মুখেই স্বস্তির ভাব।

বিপিন : এদিককার কিছুও তো দেখা হয়নি। নদীর ওধারে অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে। আমরা দুজনে যাব প্রভু?

সদানন্দ : যাও না!

Cut to

Scene-37

মাধবী আর বিপিন নদীর ধারে এসে খেয়া নৌকোয় ওঠে। এখন কৌতুকোচ্ছল মাধবীকে দেখে বোঝাই যায় না, একটু আগে সে কাঁদছিল।

Cut to

Scene-38

আশ্রমের ভেতরের দৃশ্য। সবাই নানা কাজে ব্যস্ত। কেউ রান্না করছে, কেউ পাথরে চন্দনকাঠ ঘষছে। কেউ কাপড় শুকতে দিচ্ছে উনুনে। মাধবীকে দেখা যাচ্ছে না।

উমা ও রত্নাবলীর ঘর।

উমা : মাধবী কোথায় রে?

রত্নাবলী : কী জানি! এই সময় প্রায় রোজই তো কোথায় যেন চলে যায়।

উমা : সে কি! ও কি এখানকার রাস্তাঘাট চেনে? একাই যায়?

রত্নাবলী : না। বিপিনবাবুর সঙ্গে!

সে বেশ জোরে হেসে ওঠে। উমার চোখে ভর্ৎসনা ফুটে ওঠে।

উমা : অত হাসির কী আছে?

Cut to

Scene-39

খেয়া নৌকোটা নদীর ওপার থেকে আসছে। বিপিন দাঁড়িয়ে, মাধবী বসা। নৌকোটা ঘাটে এসে লাগে, মাধবী উঠে দাঁড়াতেই সেটা দুলে ওঠে। ভয় পেয়ে মাধবী বিপিনের হাত চেপে ধরে।

বিপিন আগে নামে। হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে সে মাধবীকে নামতে সাহায্য করে। মাধবীর কোমর ধরতে হয়।

দুরে একটা গাছের গুঁড়িতে বসে আছে সদানন্দ। তার *Point of view* থেকেই দেখা যায় দৃশ্যটি।

মাধবী আর বিপিন এগিয়ে আসে। মাধবী সদানন্দের সঙ্গে কথা না বলে মুখ নিচু করে এগিয়ে যায়। বিপিন সদানন্দের সামনে এসে দাঁড়ায়।

বিপিন : নিশিপুরে যে ভাঙা গড়টা আছে, ওকে দেখিয়ে নিয়ে এলাম। একটু বাইরে নিয়ে গেলে ভাল থাকে। কান্নাকাটি করে না।

সদানন্দ : ভালোই তো। নিয়ে যাবি মাঝে মাঝে।

বিপিন : আশ্রমেও ওর বেশ মন বসে গেছে।

সদানন্দ : হুঁ!

বিপিন : সদা, তোর সঙ্গে একটা বিষয়ে আলোচনা করার ছিল। ভেতরে তোর ঘরে গিয়ে বসবি?

সদানন্দ : এখানেই বল না!

একটু দুরে আশ্রমের দুজন লোককে হাঁটতে দেখে সে তাড়াতাড়ি হাত জোড় করে মুখের ভাব বদলে ফেলে।

বিপিন : প্রভু, যদি অনুমতি করেন, তাহলে আমাদের আশ্রমে প্রতি বছর একটা মেলা বসালে কেমন হয়?

সদানন্দ : (উদাসীনভাবে) মেলা? কীসের জন্য?

বিপিন : রাখি পূর্ণিমার সময় যদি একটা মেলা বসানো যায়, দোকানপাট হবে, অনেক লোকজন আসবে, অন্তত তিনদিন, যাত্রা পালাও হতে পারে।

সদানন্দ : মেলা বসিয়ে কী হবে?

বিপিন : চতুর্দিক থেকে কত লোক আসবে, তাতে আমাদের আশ্রমের নাম প্রচার হবে।

সদানন্দ : প্রচারেরই বা কী দরকার?

বিপিন : বাঃ, প্রচার না করলে আশ্রম বড় হবে কী করে, প্রভু! আপনার ভক্তের সংখ্যা অনেক বাড়বে।

সদানন্দ : আশ্রম আরও বড় করতেই বা হবে কেন? এই তো বেশ আছে।

বিপিন এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে। কাছাকাছি কেউ নেই।

বিপিন : মাঝে মাঝে তোর কী হয় বল তো? মাথায় কিছু ঢোকে না? কীসে নিজের ভাল হয়, তা একটা শিশুও বোঝে।

Cut to

Scene-40

আকাশ কালো হয়ে মেঘ ডাকছে। এখনি বৃষ্টি শুরু হবে। সদানন্দের কুটিরের দিকে হেঁটে আসছে মাধবী। তার হাতে একটা শ্বেতপাথরের গেলাস। ওপরটা চাপা দেওয়া।

Cut to

Scene-41

ঘরের মধ্যে প্রদীপ জ্বালা। শাস্ত্র পাঠ করছেন সদানন্দ। মাধবী ঢুকল, তার টের পেলেও সদানন্দ মুখ তুলে তাকালেন না। পাঠ করেই চললেন।

মাধবী : আপনার জন্য শরবত এনেছি।

সদানন্দ : শরবত? কেন?

মাধবী : গাছ থেকে কয়েকটা পাকা বেল পাড়া হয়েছে। রত্নাবলী শরবত বানাল। বিপিনবাবু বললেন, যাও, আগে গুরুদেবকে দিয়ে এসো।

সদানন্দ : তোমায় পাঠাল?

হাত বাড়িয়ে গেলাসটা নিয়েও চুমুক দিলেন না, রেখে দিলেন পাশে।

সদানন্দ : বিপিনের সঙ্গে তোমার বেশ ভাব হয়েছে, তাই না?

মাধবী : হ্যাঁ। বেশ লোক উনি। আমায় খুব স্নেহ করেন।

সদানন্দ : আশ্রমে থাকতে তোমার এখন ভাল লাগছে?

মাধবী : তা লাগছে। ভাল সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

সদানন্দ : কীরকম?

মাধবী : এই যাতে সময় কাটে...আশ্রমের কাজকর্ম কিছু কিছু পারি, ঘুরে বেড়াতেও যাই

সদানন্দ : বেশ তো!

মাধবী : আপনি আমায় আশ্রমের উদ্দেশ্যের কথা বলেছিলেন, ঠিক বুঝতে পারিনি। বিপিনবাবু ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

সদানন্দ : কী বলেছেন বিপিনবাবু?

মাধবী : কীভাবে সুখে-শান্তিতে বেঁচে থাকা যায়, মানুষকে তাই বুঝিয়ে দেওয়া। ধর্মের মধ্যে যে বিকার এসেছে তা সংশোধন করা, সমাজজীবনে যাতে সকলেই সুবিচার পায়

সদানন্দ : হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি! জীবন, ধর্ম, সমাজ, সেবা, এই সবের জন্য বড় বড় কাজ করা আশ্রমের উদ্দেশ্য!

মাধবী : এভাবে বলছেন যে! তাই-ই কি উদ্দেশ্য নয় আশ্রমের?

সদানন্দ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মাধবীর দিকে। তারপর চুমুক দিলেন শরবতের গেলাসে।

সদানন্দ : হ্যাঁ, মোটামুটি তাই। তবে আমাদের ক্ষমতা কতটুকু? তবু চেষ্টা করে যেতে হবে...এই চেষ্টাটাই আসল...তার জন্য নিজেকে তৈরি করে নিতে হয়, সেটা তোমাকে পরে একদিন বুঝিয়ে দেব।

সদানন্দ বইয়ের পৃষ্ঠা ওল্টাতে লাগলেন।

মাধবী : আমি আপনার পা টিপে দেব?

ভুরু কুঁচকে সদানন্দ মাধবীর দিকে তাকালেন।

মাধবী : বিপিনবাবু বলছিলেন, আপনার একটু সেবা করতে। আপনি নাকি কারুর সেবা-যত্ন নেন না, বড় কষ্ট হয় আপনার—

সদানন্দ : না, পা টিপতে হবে না। বৃষ্টি আসছে, তুমি এবার যাও মাধবী।

মাধবী তবু দাঁড়িয়ে রইল। এই সময় খুব জোরে মেঘ ডাকল। তার সঙ্গে যেন সুর মিলিয়ে সদানন্দ গর্জন করে উঠলেন—

সদানন্দ : দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও।

Cut to

Scene-42

অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। তার মধ্যে দৌড়ে যাচ্ছে মাধবী।

Cut to

Scene-43

পরদিন দুপুর

সদানন্দের কুটির। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে মাধবী।

মাধবী : আপনি আমায় ডেকেছেন?

সদানন্দ : হ্যাঁ। না ডাকলে বুঝি তুমি আর আসতে না? কাছে এসো- -

মাধবী কয়েক পা এগিয়ে আসতেই সদানন্দ তাকে বুকে টেনে জড়িয়ে ধরলেন। মাধবীর শরীর আড়ষ্ট।

সদানন্দ : তুমি আমায় ভয় পাও মাধবী?

মাধবী : না।

মাধবীকে বুকে রেখে তার সারা শরীরে হাত বুলিয়ে একটুক্ষণ আদর করলেন সদানন্দ। মাধবীর দিক থেকে কোনও সাড়া নেই বুঝে সরিয়ে দিলেন দূরে।

সদানন্দ : কাল তোমায় বকেছিলাম বুঝি?

মাধবী : হ্যাঁ, কাল যে কেন হঠাৎ অত রেগে গেলেন

সদানন্দ : ওটা ঠিক রাগ নয়। তুমি আমার সেবা করতে চেয়েছিলে, কী সেবা করবে বলো তো!

মাধবী : আপনি যা বলবেন

সদানন্দের সারা মুখে দুষ্টুমির হাসি ছড়িয়ে পড়ল।

সদানন্দ : যা বলব তাই?

(একটু থেমে)

তাহলে আমার পাকা চুল বেছে দাও!

মাধবী কাছে এসে তাঁর মাথায় হাত দিলে সদানন্দ তাকে মাটিতে বসে পড়ার ইঙ্গিত কবেন। তারপর তিনি শুয়ে পড়লেন মাধবীর কোলে মাথা দিয়ে।

কিন্তু তিনি শান্তভাবে শুয়ে থাকতে পারলেন না। ছটফট করতে লাগলেন, একবার উপুড় হলেন। আবার সোজা হয়ে এক হাতে জড়িয়ে ধরলেন মাধবীর কোমর। একেবারে তাঁর মুখের কাছে মাধবীর দুই স্তন।

সদানন্দ তাকে নিচু হওয়ার জন্য টানলেন।

তারপরই তিনি ছিটকে সরে গেলেন দূরে। গড়াগড়ি দিতে লাগলেন মেঝেতে। মুখ তুলে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন মাধবীর দিকে।

সদানন্দ : তুমি কে?

মাধবী কোনও উত্তর দিল না। তার চোখে কৌতূহল।

সদানন্দ উঠে দাঁড়িয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন।

সদানন্দ : তুমি নিজের ঘরে যাও মাধবী!

মাধবী আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। সদানন্দর সারা মুখ কুঁচকে গেছে। যেন শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা।

একটুক্ষণ সেইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে তিনি চলে এলেন জানালার কাছে।

সদানন্দ : বিপিন! বিপিন!

Cut to

Scene-44

বিপিন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে। তখনও সদানন্দের ডাক শোনা যাচ্ছে। বিপিন দরজার কাছে এসে দাঁড়াতেই সদানন্দ তার হাত ধরে টেনে আনলেন ভেতরে।

সদানন্দ : তুই কি আমার সর্বনাশ করতে চাস বিপিন?

বিপিন : কেন, কী হয়েছে?

সদানন্দ : তুই মেয়েটাকে পাঠাচ্ছিস আমার কাছে। আমার এতদিনের সাধনা বিফলে যাবে?

বিপিন : দুটোই একসঙ্গে চলতে পারে।

সদানন্দ : শুধু একটা মেয়ের জন্য... শুধু একটা মেয়ের জন্য...আমার মনের মধ্যে যে এতখানি অন্ধকার জমে আছে আমি নিজেই জানতাম না। এক এক সময় সেই অন্ধকারটা বেরিয়ে এসে রাক্ষসের মতন আমাকেই গিলে ফেলতে চায়। আমি নিজেই যদি তলিয়ে যাই, তাহলে সাধারণ মানুষকে এই দুঃখকষ্টময় জীবনের ঊর্ধ্বে ওঠার পথ দেখাব কী করে?

বিপিন : তুই একটা সামান্য ব্যাপারকে এত গুরুত্ব দিচ্ছিস কেন? সবাই ধরে নিয়েছে মাধবী তোর প্রিয় শিষ্যা...এতে দোষের কিছু নেই...

সদানন্দ : চুপ! আজ থেকে সাতদিন কেউ আমার কাছে আসবে না, আমি কারুর সঙ্গে দেখা করব না...

বিপিন : পাগলামি করিস না সদা

সদানন্দ : আমাকে কঠোর সাধনা করতে হবে, নিজের মুখোমুখি হতে হবে, দেখি সেই অন্ধকার দৈত্যটার শক্তি কতখানি

বিপিন : মাঝে মাঝে তোর মাথায় কী যে চাপে...এখন আশ্রম জমে উঠেছে, কত মানুষ আসছে, তুই কারুর সঙ্গে দেখা করবি না তা কী হয়?

সদানন্দ : কেউ আসবে না আমার কাছে

বিপিন : মেলার কথা বলছিলাম, সেটা যত তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করা যায়...সম্ভব হলে এ মাসেই

সদানন্দ : মেলা হবে না!

বিপিন : অবুঝের মতন কথা বলিস না। মেলা বসানো বিশেষ দরকার...হাজার হাজার মানুষ তোকে দর্শন করতে আসবে...এটা খুব ভালভাবে প্ল্যান করতে হবে

সদানন্দ : বলছি তো, মেলা হবে না! আগামী সাতদিন আমি তোরও মুখদর্শন করতে চাই না!

Cut to

Scene-45

হরিণের চামড়ার আসনে যোগাসনে বসে আছেন সদানন্দ।

Cut to

Scene-46

প্রায় সন্ধে হয়ে এসেছে। আকাশে শেষ সূর্যাস্তের আলো। নৌকো থেকে নামল মহেশ চৌধুরি। আরও দু-চারজন লোক তার সঙ্গে আসতে চাইছিল, সে হাত নেড়ে নিষেধ করতে লাগল তাদের।

Long Shot-এ দেখা যায়, মহেশ চৌধুরি আশ্রমের কয়েকজন লোককে কী যেন জিজ্ঞেস করছে, কেউ কেউ মাথা নাড়ছে, কেউ কোনও উত্তর দিচ্ছে না।

Cut to

Scene-47

মহেশ ও বিপিন মুখোমুখি।

বিপিন : হঠাৎ এখানে কী মনে করে?

মহেশ : একবার প্রভুর দর্শন পেতে এসেছি।

বিপিন : প্রভু সাতদিন কারুকেই দর্শন দেবেন না।

মহেশ : সেই কথা শুনেই তো এসেছি। প্রভু তো পাথরের দেবতা নন। কোনও ভক্ত যদি ব্যাকুলভাবে ছুটে আসে, তাকেও কি তিনি দর্শন দেবেন না?

বিপিন : ওসব ছেঁদো কথা রাখুন। দেখা হবে না

মহেশ : বিপিনবাবু, আপনি দয়া করে একবার প্রভুকে গিয়ে বলুন, আমি প্রভুর জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করব। জীবন বিসর্জন দিতেও রাজি আছি। প্রভু নিশ্চয়ই আমাকে ডেকে পাঠাবেন।

বিপিন : কে আপনাকে সর্বস্ব ত্যাগ করতে, জীবন বিসর্জন দিতে সেধেছে মশাই? কেন আসেন আপনি আশ্রমে! যান যান, বেরিয়ে যান আমার আশ্রম থেকে!

Cut to

Scene-48

গভীর রাত। আশ্রমের সবাই ঘুমন্ত। শুধু একটা জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে আলোর রেখা। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে কেউ একজন হেঁটে আসছে। একটা গাছতলায় কে বসে পড়ল। তখন দেখা গেল, সে মহেশ চৌধুরি।

Cut to

Scene-49

ভোর হচ্ছে। বৃষ্টি শুরু হয়েছে কিছু আগে। আশ্রমের দু-একজন দৌড়োদৌড়ি করছে বৃষ্টির মধ্যে। গাছতলায় বসে ভিজছে মহেশ চৌধুরি।

Cut to

Scene-50

সদানন্দের কুটির। চিত হয়ে ঘুমোচ্ছেন সদানন্দ।

Cut to

Scene-51

বৃষ্টিতে স্থির হয়ে বসে ভিজছে মহেশ। দৃশ্যটা বদলে যায়। বৃষ্টি থেমে ঝলমলে রোদ উঠেছে, তাতে একইরকম সোজা হয়ে বসে আছে মহেশ। আস্তে আস্তে তাকে ঘিরে কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমছে। উমা, রত্নাবলী, মাধবীও আছে তাদের মধ্যে। একসময় ভিড় ঠেলে এসে দাঁড়াল বিপিন। দাঁতে ব্যথার জন্য তার মুখে একটা কম্ফর্টার জড়ানো।

বিপিন : এখানে কি নাটক হচ্ছে?

মহেশ উত্তর না দিয়ে হাসল।

বিপিন : আপনি এখানে বসে আছেন কী জন্য? উঠুন, বাড়ি যান!

মহেশ : একবার প্রভুর চরণ দর্শন করতে না দিলে আমি উঠব না।

বিপিন : তাহলে আপনাকে সাতদিন বসে থাকতে হবে।

মহেশ : তাই থাকব!

বিপিন : এ আপনার কীরকম বেয়াড়া ধরনের ভক্তি মশাই? প্রভুর চরণ দর্শনের জন্য আপনি ব্যাকুল, প্রভুর আদেশ অমান্য করতেও আপনার বাধবে না?

মহেশ : এ আদেশ আমার জন্য নয়।

মাধবী এগিয়ে এল।

মাধবী : আপনি এ কথা বলছেন কেন? উনি বলেছেন, সাতদিন কারুর সঙ্গে কথা বলবেন না, কারুর মুখদর্শনও করবেন না। একমনে সাধনা করবেন। তবু আপনি জেদ ধরেছেন কেন?

মহেশ : আমি প্রভুর একনিষ্ঠ ভক্ত। আমার চোখে তিনি জীবন্ত দেবতা। আমার ডাকে উনি সাড়া না দিয়ে পারবেন? যদি সাড়া না দেন, তাহলে বুঝতে হবে আমার ভক্তি এখনও সম্পূর্ণ হয়নি!

মাধবী : আরও তো ভক্ত আছে। উনি কারুকেই কাছে যেতে দিচ্ছেন না!

মহেশ : আমি দূর থেকে, আড়াল থেকে একবার দর্শন করেই চলে আসব।

মাধবী : সত্যি তা সম্ভব না

মহেশ : তাহলে সাতদিনই বসে থাকব এখানে।

Cut to

Scene-52

মহেশকে গোল করে ভিড় আরও বেড়েছে। মহেশের সামনে কয়েকটি প্লেটে খাবার সাজানো। মহেশ কিছুই ছোঁয়নি।

মহেশের ভাগনে শশধরের সঙ্গে মহেশের স্ত্রী ছুটে আসছে। স্বামীর সামনে সে আছড়ে পড়ল।

মহেশের স্ত্রী: আমার ছেলে...তার চিন্তায় রাত্তিরে আমার ঘুম হয় না, তার ওপরে তুমি...বাড়িঘর ছেড়ে এখানে...তোমরা বাপ-ছেলেতে মিলে কি আমায় দগ্ধে দগ্ধে মারবে? এ কী পাগলামি শুরু করেছ! চলো, বাড়ি চলো!

মহেশ : চিন্তা করো না! আমি ঠিক সময়ে বাড়ি ফিরে যাব।

স্ত্রী : ঠিক সময়ে মানে? এখানে বসে তুমি রোদ্দুরে পুড়ছ, বৃষ্টিতে ভিজছ, মানুষের শরীরে এতটা সহ্য হয়?

শশধর : মামা, কাল রাত্তির থেকে মামিও কিছু খায়নি। এক ফোঁটা ঘুমোয়নি।

স্ত্রী : তুমি যদি এক্ষুনি না ফিরে চলো, তাহলে আমি মাথা কুটে মরব

মহেশের স্ত্রী তার চুড়ি-পরা হাত কপালে ঠুকতে থাকে। কপাল কেটে বেরিয়ে আসে রক্তের ধারা। রত্নাবলী শিউরে উঠে মুখ চাপা দেয়। মাধবী এগিয়ে এসে সেই মহিলাকে নিবৃত্ত করে রক্ত মুছে দেয়।

মহেশ : কেন এত উতলা হচ্ছ? জানো তো, আমার কথায় কখনও নড়চড় হয় না।

স্ত্রী : শুধু আমার বেলায় হয়। আমাকে তুমি কোনও কথাই দাও না। আমাকে মানুষ বলেই গণ্য করো না। ছেলের জন্যই বা তুমি কী করেছ? তুমি না গেলে আমিও এখানে বসে থাকব।

Cut to

Scene-53

দিন থেকে রাত হয়েছে। আবার অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। সেই বৃষ্টিতে ভিজছে মহেশ আর তার স্ত্রী। মহেশ চোখ চেয়ে আছে, তার স্ত্রীর চক্ষু বোজা, দুলছে একটু একটু।

একটু দূরে একটা দাওয়ায় বসে আছে শশধর, শীতে কাঁপছে। সেখানে এসে দাঁড়াল বিপিন।

বিপিন : এইরকমই চলবে?

শশধর : কী করি বলুন!

বিপিন : শশধর, তুমি ওদের জোর করে তুলে নিয়ে যেতে পারো না?

শশধর : আমার কি সে জোর আছে? মামা-মামির আশ্রয়ে থাকি, তাদের দয়ায় খাই-পরি। বর্ষাকালে এ কী ঠান্ডা মশাই, অ্যাঁ? এ কী শালার শীতকাল নাকি?

বিপিন : আমি একটা চাদর এনে দিচ্ছি!

Cut to

Scene-54

বৃষ্টি পড়েই চলেছে। শশধর দৌড়ে এসে একটা ছাতা মেলে ধবে মহেশেব মাথার ওপর।

মহেশ : আমার লাগবে না, তোর মামির মাথায় দে!

স্ত্রী : কেন? কাল রাত্তির থেকে বৃষ্টিতে ভিজছ। ছাতা ধরলে দোষ কী?

মহেশ : সে তুমি বুঝবে না।

স্ত্রী : আমি কিছুই বুঝি না। তাহলে আমিই বা ছাতা নেব কেন? আমারও দরকাব নেই। তুই ওদিকে গিয়ে বোস রে শশা!

মহেশ : সতীত্ব দেখাচ্ছ! সারাটা জীবন তুমি আমায় জ্বালিয়ে গেলে। আমার শনিগ্রহ তুমি। আমার সব ব্যাপারে তোমার বাহাদুরি করা চাই। হাঙ্গামা করা চাই। যদি শান্তি পাবার জন্য আমি গাছতলায় ধন্না দিয়ে পড়ে থাকি, তোমার তাতে কী? স্বামীভক্তি দেখানো হচ্ছে...স্বামীর একটা কথা শুনবে না...কী অদ্ভুত সতী রে আমার!

বাত্রি ভোব হল। দুপুব, বিকেল। বৃষ্টি পড়েই চলেছে। মহেশের স্ত্রীব চক্ষু দুটি লাল। দুজনেরই পোশাক কাদায় মাখামাখি। খাবার একই বকম পড়ে আছে। বৃষ্টি একটু থামলেই আবাব ভিড জমে যায়। মাধবী কাছে এসে দাঁড়াল।

মাধবী : আপনি কিছুতেই উঠবেন না?

মহেশ দু'দিকে মাথা দোলাল।

মাধবী : মাথা খাবাপ হয়ে থাকে, অন্য কোথাও গিয়ে পাগলামি করুন না! আমরা আপনার কাছে কী অপরাধ করেছি?

মহেশ : অপরাধ? অপরাধের কী হল মা?

মাধবী : আমাদেব এত কষ্ট দিচ্ছেন কেন? এটা তো হাট নয়, আশ্রম। দেখুন তো চেয়ে কত লোক জমতে শুরু করেছে! এর মধ্যে আশ্রমের কাজ হবে কী করে, আমরাই বা থাকি কী করে? একটু শান্তি পাবে বলে যারা আশ্রমে আসে .

মহেশ : তোমাদের অসুবিধে হচ্ছে? আমি ওদেব চলে যেতে বলছি

মহেশ চৌধুবি হাত জোড় কবে সকলকে চলে যেতে বলল। লোকেবা তবু গেল না। একটু দূবে সবে গেল মাত্র।

Cut to

Scene-55

মহেশেব স্ত্রী জ্বরের ঘোরে বিড়বিড় করছে, আর দুলছে। মহেশ তাব কপালে হাত দিয়ে দেখল।

মহেশ : এত জ্বব, তবু তুমি বাড়ি যাবে না? এখন গিয়ে শুয়ে থাকো লক্ষ্মীটি!

ওব স্ত্রী দু'দিকে মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল।

মহেশ : ঠিক আছে, চলো বিভূতির মা, আমিও যাচ্ছি?

স্ত্রী : সে কী! চলে যাবে? সাধুজির চরণ দর্শন না করেই? প্রতিজ্ঞা ভাঙবে?

মহেশ : কী করব? নারীহত্যার পাতক তো হতে পাবি না! তোমার এত জ্বর—

স্ত্রী : আমার জন্যও তোমার এত চিন্তা? আমি বাঁচি বা মরি, তোমার মতন সাধুপুরুষের তাতে কী আসে যায়! তুমি যেতে চাও যাও, আমি এখন যাব না!

মহেশ : আমি চলে গেলেও তুমি একা বসে থাকবে?

স্ত্রী : তা ছাড়া আর উপায় কী? এখন উঠে গেলেই তুমি চিরকাল আমায় দুষবে। বলবে, আমার জন্য তুমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছিলে

মহেশ : তোমায় দুষব?

স্ত্রী : দুষবে না?

মহেশ : আমি নিজেই তো উঠে যেতে চাচ্ছি, তোমায় দুষব কেন?

স্ত্রী : দেখো, ওসব মারপ্যাঁচ আমার সঙ্গে চলবে না। রাস্তার লোককে ওসব বুঝিয়ো।

নিজেই যে চলে যেতে চাইছ, সে কার জন্য? বাড়ি গিয়ে যে ছটফট করবে, সেটা তলে তলে কাকে দক্ষাবে শুনি? তোমায় চিনতে তো আমার বাকি নেই। তুমি হলে... তুমি হলে

স্ত্রী কান্নায় ভেঙে পড়তেই মহেশ তার মাথায় হাত রেখে সান্ত্বনা দেয়। দূর থেকে মাধবী এগিয়ে আসে।

মাধবী : চলুন, আপনারা সাধুজির চরণ দর্শন করবেন।

মহেশ : অনুমতি দিয়েছেন? শুনেছেন আমার প্রার্থনা?

মাধবী : প্রণাম করেই চলে আসবেন কিন্তু। কথাবার্তা বলে জ্বালাতন করবেন না।

মহেশ উঠে দাঁড়িয়ে গা থেকে নোংরা ঝেড়ে ফেলে। স্ত্রীব হাত ধরে তুলতে

চায়। স্ত্রী মাথা নাড়ে।

স্ত্রী : আমি তো ওঁকে দর্শন করতে আসিনি। দূর থেকেই প্রণাম জানাচ্ছি। *Cut to*

Scene-56

সদানন্দ বসে আছে চৌকির ওপর। পাশে দাঁড়িয়ে মাধবী। দরজার চৌকাঠের কাছে মহেশ।

সদানন্দ : এর মানে কী? আমি না বলে দিয়েছি, সাতদিন কেউ আমার দর্শন পাবে না!

মাধবী : (ফিসফিস করে) আপনার পায়ে ধরছি, রাগ করবেন না, অনেক ব্যাপার হয়ে গেছে, পরে বলব আপনাকে...এই ভদ্রলোককে শুধু একবার প্রণাম করে যেতে দিন। দেবেন না?

সদানন্দ : বেশ!

মাধবী : আসুন, প্রণাম করে যান।

মহেশ : না। প্রভু আমায় ডাকেননি, এই মেয়েটি আমায় ফাঁকি দিয়ে এনেছে। না জেনে আপনার কাছে এ কী অপরাধ করলাম প্রভু। আপনি ডাকেননি জানলে আমি তো আসতাম না!

সদানন্দ : তাই নাকি? তা এখন কী করবে?

মহেশ : ফিরে যাচ্ছি প্রভু। আপনি নিজে ডাকলে এসে প্রণাম করে যাব।

মাধবী : আবার গাছতলায় গিয়ে ধন্না দেবেন? ঘরে যাবেন যা আপনারা দুজনেই!

উৎকণ্ঠায় মাধবীর চোখে জল এসে গেল। সদানন্দ তাকিয়ে রইল সেদিকে। তার মুখখানা নরম হয়ে এল।

সদানন্দ : মহেশ, আমি তোমায় পরীক্ষা করছিলাম।

মহেশ : পরীক্ষা প্রভু?

সদানন্দ : হ্যাঁ, এ পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ। আমি সব জানি মহেশ, তুমি আসবার এক মুহূর্ত আগে আমি আসন ছেড়ে উঠেছি। দরজা বন্ধ ছিল, তোমার জন্য খুলে রেখেছি। তোমায় দেখে রাগের ভান করেছিলাম। আমায় না জানিয়ে কেউ কি আমার কাছে আসতে পারে মহেশ? এখন বাড়ি যাও, ক'দিন বিশ্রাম করে আবার দেখা করতে এসো। তখন তোমার কথা শুনব।

অভিভূত মহেশ টলমলে পায়ে এগিয়ে আসতে আসতে পড়ে গেল দড়াম করে!

Cut to

Scene-57

আশ্রমের বাইরে গ্রামের লোকেরা ধরাধরি করে মহেশকে মাথায় তুলে নিয়েছে। মহেশ হাত-পা ছুঁড়ছে আপত্তিতে। কেউ শুনছে না। তারা জয়ধ্বনি দিচ্ছে মহেশ চৌধুরি কী জয়।

শশধরের হাত ধরে যাচ্ছে মহেশের স্ত্রী।

Cut to

Scene-58

সদানন্দের ঘর। দরজায় দাঁড়িয়ে মাধবী মহেশকে নিয়ে জনতার উচ্ছ্বাস দেখছে। সদানন্দ তাকে ডাকল।

সদানন্দ : এদিকে এসো মাধবী।

মাধবী কয়েক পা এগিয়ে এসে থামল।

সদানন্দ : আরও কাছে এসো

মাধবী একেবারে কাছে এসে হাঁটুগেড়ে বসল। সদানন্দ তার চিবুক ধরে মুখখানা উঁচু করল।

সদানন্দ : তুমি তো কম দুষ্টু মেয়ে নও। তোমার জন্য আমার সাধনা ভঙ্গ হল!

মাধবী : ওঁর স্ত্রী যে মরে যাচ্ছিলেন।

সদানন্দ : তাহলে অবশ্য তুমি লক্ষ্মী মেয়ে।

মাধবী : ওঁরা দুজনে বৃষ্টিতে ভিজে, রোদে পুড়ে...কিছু না খেয়ে... সে দৃশ্য চোখে দেখা যায় না।

সদানন্দ : ঠিক আছে, পরে সব শুনব।

মাধবী : কিন্তু আপনি ও কথা বললেন কেন মহেশবাবুকে?

সদানন্দ : আমি তো জানতাম না যে এত কাণ্ড হয়ে গেছে? তুমি ডেকে নিয়েছ জানলে কি আর আমি রেগে উঠতাম?

মাধবী : না, সে কথা নয়। আপনি মিছে কথা বললেন কেন? কেন বললেন, আপনি সব জানতেন, ওকে পরীক্ষা করছেন?

সদানন্দ : ওটা কী, জানো মাধবী...

মাধবী : কেন আপনি মিছে কথা বললেন? কেন, কেন?

মাধবী ঝরঝর করে কাঁদতে লাগল।

Cut to

Scene-59

একবার নদীর ধারে, একবার আশ্রমের মধ্যে পায়চারি করছেন সদানন্দ।

একটা গাছতলায় এক গয়লানি গরুর দুধ দুইছে। পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে মাধবী। কাছে এসে দাঁড়ালেন সদানন্দ। চোখাচোখি হতে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন।

সদানন্দ : রাত্রে একবার আমার ঘরে আসবে, মাধু?

মাধবী : রাত্রে? কখন?

সদানন্দ : যখন তোমার সুবিধে হয়।

মাধবী : সন্ধেবেলা?

সদানন্দ : না, একটু বেশি রাত করে এসো। এই এগারোটা সাড়ে এগারোটার সময়।

মাধবী : আজ নয়...পর্শু যাব।

সদানন্দ : না, আজই।

মাধবী : কেন, যদি পর্শু যাই?

সদানন্দ : তুমি কিছু বোঝো না মাধু। আজ ত্রয়োদশী, মেঘটেঘ না করলে চমৎকার জ্যোৎস্না উঠবে, জ্যোৎস্নায় বসে তোমার সঙ্গে...গল্প করব। এসো ঠিক

মাধবী : উমাশশী, রত্না ওরা টের পেয়ে যাবে যে! একটা কেলেঙ্কারি হবে।

সদানন্দ : সে ব্যবস্থা আমি করব!

Cut to

Scene-60

সদানন্দের ঘর। বিপিন হুঁকোয় তামাক টানছে। হুঁকোটা এগিয়ে দিল সদানন্দের দিকে। সদানন্দ দু'টান দেওয়ার পর—

সদানন্দ : তুই আমাকে কিছু বলবি? ওসব টাকাপয়সার হিসেব আমার মাথায় ঢোকে না। তুই যা ভাল বুঝবি—

বিপিন : টাকা পয়সার কথা বলতে আসিনি।

সদানন্দ : তবে?

বিপিন : মেয়েটাকে তোর ঘরে আবার ডাকাডাকি শুরু করেছিস?

সদানন্দ : কে বলল তোকে?

বিপিন : কে আবার বলবে? আমি সব টের পাই। তুই তোর মনের কী সব অন্ধকার টন্ধকারের কথা বলেছিলি! তা থেকে শুদ্ধ হবার জন্য সাতদিন একটানা সাধনার সংকল্প করলি...সব ঘুচে গেল? একটা মেয়ের জন্য? সাধনসঙ্গিনী ছাড়া সাধন হয় না?

সদানন্দ : তোকে সব ব্যাপারে কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি?

বিপিন : ওকে আশ্রমে রেখেছি আমি।

সদানন্দ : তাই বলে ওর ওপর তোর অধিকার জন্মে গেছে?

বিপিন : অধিকারের কথা নয়। ওর ভালমন্দের একটা দায়িত্ব তো আমার আছে!

সদানন্দ : অ! ভালমন্দের দায়িত্ব!

বিপিন সারা মুখ ভবিয়ে হাসল।

সদানন্দ : হঠাৎ হাসলি যে বড়?

বিপিন : আমার হাসিরও কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি তোকে?

Cut to

Scene-61

জ্যোৎস্না রাত। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্না পড়েছে মাটিতে। তার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিপিন। আশ্রমের লোকেরা কাজকর্ম সেরে শুতে যাচ্ছে একে একে। একটা ঘর থেকে খালি গলায় গান শোনা যাচ্ছে।

বিপিন : এখন গান বন্ধ করো। এটা গানের সময় নয়।

সঙ্গে সঙ্গে গান থেমে গেল। আবার এগিয়ে গেল বিপিন। একটি কুটিরের বারান্দায় আলো-অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে একজন নারী ও পুরুষ। রত্নাবলী ও শশধর।

বিপিন : কে ওখানে?

শশধর : আজ্ঞে আমি...মহেশ চৌধুরির ভাগনে। সেই যে সেদিন..

বিপিন : এত রাত্রে এখানে কী করছেন?

শশধর : মামা পাঠালেন...বিশেষ করে বললেন

রত্নাবলী : মহেশবাবুর খুব অসুখ। একশো চার ডিগ্রি জ্বর উঠেছে। মাধবীকে একবার দেখতে চান

বিপিন : রাত্রে আশ্রমে বাইরের লোক আসা আমি পছন্দ করি না। খবরটা দিনের বেলা দেওয়া যেত না?

রত্নাবলী : সন্ধে থেকেই জ্বর বেড়েছে। খুব উথাল-পাথাল করছেন...মাধবীর নাম বলছেন বারবার

শশধর : জ্বরের ঘোরে একবারে বেহুঁশ অবস্থা। কোবরেজমশাই পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেছেন...মামা মাধবীকে একবার দেখতে চাইছেন। তাই ভাবলাম, খবরটা দিতে এসেছি, এটুকুও যদি জানাতে পারি...

বিপিন : প্রভুর আশীর্বাদ চাননি, শুধু মাধবীকে দেখতে চেয়েছেন? তাতেই ভাল হয়ে উঠবেন। বেশ কথা! আপনি ফিরে যান, মহেশবাবুকে বলুন, আমি নিজে মাধবীকে নিয়ে যাচ্ছি

শশধর : আজ রাত্রেই যাবেন?

বিপিন : অসুখ-বিসুখের সময় কি দিন-রাত্রির বিচার করলে চলে? সময় বুঝে তো অসুখ হয় না। বুড়ো মানুষ, এমন অসুখে পড়েছেন, তাঁর সামান্য একটা ইচ্ছে যদি আমরা পূর্ণ করতে না পারি, আমাদের আশ্রমে থাকা কেন? নিজেরা সুখে থাকার জন্য আমরা আশ্রমে বাস করি না

শশধর : আজ্ঞে, কী যে বলব

বিপিন : আপনি আর দাঁড়াবেন না, এগিয়ে পড়ুন। গিয়ে বলুন, আমরা ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পৌঁছে যাব

শশধর এগিয়ে যায়। রত্নাবলী দাঁড়িয়ে থাকে।

বিপিন : উমা, মাধবী, এরা সব কোথায়?

রত্নাবলী : ওরা খাচ্ছে।

বিপিন : ওরা খাচ্ছে, আর তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলে! তোমার বুঝি উপোস! যাও, ভেতরে গিয়ে মাধবীকে ডেকে দাও!

রত্নাবলী : এত রাত্রে যাবেন কী করে? খেয়া নৌকো তো বন্ধ!

বিপিন : সে ভাবনা তো তোমাকে ভাবতে বলিনি! যাও, খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ো!

রত্নাবলী : আমি সঙ্গে যাব না?

বিপিন : না!

রত্নাবলী : আমি সঙ্গে না গেলে মাধু আপনার সঙ্গে যাবে না!

বিপিন : মাধু যাবে কি যাবে না, সেটা তার মুখ থেকেই শুনব।

রত্নাবলী : আপনি কি বুঝতে পারেন না, এত রাতে মাধু যদি একলা আপনার সঙ্গে যায়—

বিপিন কাছে এগিয়ে আসে, তীব্র চোখে চেয়ে থাকে রত্নাবলীর দিকে। আঙুল তুলে বলে—

বিপিন যাও, মাধবীকে ডেকে দাও।

Cut to

Scene-62

বিপিন একটু দূরে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছে। দরজার কাছে এসে দাঁড়াল মাধবী আর রত্নাবলী। রত্নাবলী মাধবীর হাত চেপে ধরে আছে, মাধবী হাত ছাড়িয়ে ছুটে এল বিপিনের কাছে।

মাধবী : কী ব্যাপার, আপনাকে পাঠিয়েছে? না গেলে জোর করে ধরে নিয়ে যাবেন? এতদূর!

বিপিন : কেউ আমায় পাঠায়নি—

মাধবী ছুটে সামনের দিকে খানিকটা যেতেই বিপিন এসে তাকে ধরল।

বিপিন : ওদিকে কোথায় যাচ্ছ?

মাধবী : ফোঁপর দালালি করবেন না। কোনদিকে যেতে হবে আমি জানি!

বিপিন : শোনো, শোনো, আগে একটা কথা শোনো

মাধবী : ও, আপনি বুঝি আগে নিজের পাওনা মিটিয়ে নেবেন? শিগগিরই নিন, রাত্তিরে একটু ঘুমোতে হবে তো!

বিপিন : তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে মাধু? কী বলছ পাগলের মতন!

মাধবী : মাথা খারাপ হবে না? যা আরম্ভ করে দিয়েছেন আপনারা! আমি কি একটা বেশ্যা যে যখন খুশি ডাকবেন...এর চেয়ে কুমার সাহেবের মিস্ট্রেস হয়ে থাকাও ভাল ছিল! তবু তো কিছুদিন মজা করে নিতাম!

মাধবী কাঁদতে শুরু করলে বিপিন তার মাথাটা বুকে চেপে ধরে। মাধবীর পিঠের ওপর তার আঙুল কাঁপে।

বিপিন : মাধু, কে তোমার ওপর অত্যাচার করেছে বলো। কালই তাকে আশ্রম থেকে দূর করে তাড়িয়ে দেব! এ আশ্রম আমার! কে তোমার মনে কষ্ট দিয়েছে?

মাধবী তবু কাঁদতেই থাকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে

বিপিন : কেঁদো না, কেঁদো না। বলো, তুমি কী চাও? অন্য কোথাও গিয়ে থাকতে চাও?

মাধবী : কোথায় যাব! কার কাছে যাব?

বিপিন : যেখানে যেতে চাও, পাঠিয়ে দেব। তোমার নামে আমি একটা বাড়ি কিনে দিতে পারি। ব্যাঙ্কে তোমার নামে টাকা থাকবে

মাধবী : তার মানে আপনার মিসট্রেস হয়ে থাকতে হবে? প্রথম থেকেই বুঝি এরকম ভেবে রেখেছিলেন? তাহলে আমাকে ওঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন কেন?

বিপিন : না, না, মানে...ওসব কথা পরে হবে। এখন চলো, তোমাকে মহেশবাবুর ওখানে রেখে আসি।

মাধবী : মহেশবাবুর ওখানে?

বিপিন : হ্যাঁ, এখানে তোমার থাকা চলবে না?

মাধবী : সে কি, গুরুঠাকুরটির অনুমতি নিতে হবে না?

বিপিন : আমি কারুর অনুমতির পরোয়া করি না।

Cut to

Scene-63

নদীর ঘাটে খেয়া নৌকোটা বাঁধা আছে। জ্যোৎস্নায় সেটা দুলতে দেখা যায়। মাঝি নেই। বিপিন আর মাধবী এসে নৌকোয় ওঠে। বিপিন নিজেই বৈঠা ধরে। নৌকোটা অনেক দূরে মিলিয়ে যায়।

Cut to

Scene-64

একটা পুরনো আমলের পালঙ্কে শুয়ে আছে মহেশ চৌধুরি। তার মাথায় জলপট্টি দিচ্ছে মাধবী, মহেশের স্ত্রী সরমা মহেশের পা টিপছে। বাড়ির বাইরে অনেক লোকের ভিড় জমেছে।

মহেশ : বাইরে অত গোলমাল কীসের?

মাধবী : অনেক লোক আবার খবর জানতে এসেছে।

মহেশ : আমার আবার খবর কী? আমি ভাল হয়ে গেছি। ওদের আশ্রমে যেতে বলো, আসল খবর, মনের খবর, সত্যের খবর সেখানেই পাবে প্রভুর কাছে।

সরমা : বাড়িতে লোকজন এলে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া যায় নাকি?

দরজা দিয়ে ঢুকল বিপিন। তার পোশাক আজ সাধারণ নয়, বেশ সাজগোজ করেছে। গলায় একটা চাদর। হাতে ছোট্ট ঝুড়িতে কিছু আপেল-বেদানা।

বিপিন : কেমন আছেন চৌধুরিমশাই?

মহেশ : আরে, আপনি কষ্ট করে রোজ রোজ আসেন, এতখানি পথ

বিপিন : আসব না? আপনার এত বড় একটা রোগের ফাঁড়া গেল... বাইরে অনেক লোক জমেছে দেখছি। আশ্রমে এখন বিশেষ কেউ যায় না, আপনার কাছেই আসে।

মহেশ : ছি ছি, কী লজ্জার কথা! আমি কে?

বিপিন : আসবে না কেন, নিশ্চয়ই আসবে। আপনার অসাধারণ ভক্তির জোরের কথা সবাই জেনেছে। আমিও আপনাকে আগে চিনতে পারিনি, কত কটু কথা বলেছি, সেজন্য মার্জনা করবেন

মহেশ : না, না, ও কথা বলবেন না। আমি অতি নগণ্য মানুষ। প্রভুর একজন ভক্ত। রোগশয্যায় শুয়েও প্রভুর আশীর্বাদ টের পেয়েছি। আপনার দয়াতেই মাধবী-মা রয়েছে এ বাড়িতে, কী সেবাই যে করেছে—

বিপিন : মাধবীর এখানে মন বসেছে?

মহেশ : একেবারে বাড়ির মেয়ের মতন

বিপিন ফলের ঝুড়িটা শিয়রেব কাছে রাখতেই মহেশ আবার ত্রস্ত হয়ে ওঠে

মহেশ : এসব কী, এসব কী! আপনার পদধূলিই তো যথেষ্ট।

বিপিনের সঙ্গে সঙ্গে মাধবীও বাইরে বেরিয়ে আসে। এটা বাড়ির পিছন দিক। সামনে একটা উঠোন। সেখানে বড় বড় থালায় বড়ি, আচার শুকোতে দেওয়া আছে।

বিপিন : তোমার এখানে কিছু অসুবিধে হচ্ছে না তো মাধু?

মাধবী দু'দিকে মাথা নাড়ল।

বিপিন : আর কিছুদিন এখানে থাকো, তারপর—

মাধবী : আমি যে এখানে চলে এসেছি, উনি কী বললেন?

বিপিন : কিছু বলেননি।

মাধবী : কিছুই না? একেবারে কিছুই না?

বিপিন : কী বলবে? বলবার ক্ষমতা থাকলে তো বলবে?

মাধবী : আশ্রমের সবাই কেমন আছে?

বিপিন : আছে একরকম। মুশকিল হয়েছে প্রভুটিকে নিয়ে। আশ্রমের কীসে উন্নতি হবে সে চিন্তা ওর নেই, দিনরাত নিজের কথাই ভাবছে। আমার এটা হল না, সেটা হল না, ওটা চাই, সেটা চাই... ওকে নিয়ে সত্যি খুব মুশকিলে পড়েছি মাধু!

মাধবী : উনি কিন্তু সাধারণ মানুষ নন!

বিপিন অবাক হয়ে মাধবীর দিকে তাকায়। উঠোনে আচার-বড়ির থালায় একটা বেড়াল মুখ দিতে এসেছে। হুশ হুশ করে বেড়ালটাকে তাড়াবার জন্য ছুটে যায় মাধবী।

Cut to

Scene-65

একটা জেলখানাব বাইরেব দরজা। সেই দরজার এক পাল্লা খুলে একজন কয়েদিকে বাইরে যেতে দেওয়া হল। পাজামা-পাঞ্জাবি পরা একটি যুবক, কাঁধে একটা ঝোলা ব্যাগ। মহেশ চৌধুরির ছেলে বিভূতি।

বিভূতি প্রথম এদিক-ওদিক তাকিয়ে মুক্তির স্বাদ নেয়। তারপর চলতে শুরু করে।

Cut to

Scene-66

মেঠো রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছে বিভূতি। গুনগুন করে গান গাইছে। দু'পাশের মাঠে কাজ করছে কিছু লোক। তারা অবাক চোখে দেখল বিভূতিকে। দুটি যুবক ছুটে এল রাস্তার দিকে। এদের নাম বিশু আর কানাই।

বিশু : আরে বিভূতিদা, তুমি কবে জেল থেকে ছাড়া পেলে?

বিভূতি : এইতো আজই! বিশু, কানাই, তোরা সব কেমন আছিস?

কানাই : ভাল আছি। ইস, আগে থেকে খবর পেলাম না, তাহলে আমরা সবাই মালা নিয়ে জেল গেটে থাকতাম!

বিভূতি : ধুর, মালা দিয়ে কী হবে? দে, একটা বিড়ি দে!

বিশু : তোমার বাবার খুব অসুখ করেছিল।

বিভূতি : জানি, খবর পেয়েছি। সেই জন্যই তো সদাশয় সরকার ছেড়ে দিল। কতদিন বাইরে রাখবে তার অবশ্য ঠিক নেই। তারপর তোদের খবর কী বল' কাশেম আলির জমিটা উদ্ধার হয়েছে?

কথা বলতে বলতে ওরা এগিয়ে যায়

Cut to

Scene-67

উঠোনে রোদ্দুরে একটা আরাম কেদারায় বসেছে মহেশ। পেছনে দাঁড়িয়ে তার মাথার পাকা চুল বেছে দিচ্ছে মাধবী। সরমা একটা কুলোভর্তি চাল নিয়ে কাঁকর বাছছে। শীতের দুপুর।

বিভূতির হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল শশধর।

শশধর : দেখো, কে এসেছে! কে এসেছে!

সরমা : খোকা!

বিভূতি : কীরকম চমকে দিলাম তোমাদের!

সরমা : খোকা!

মহেশ : তোকে ছেড়ে দিল? উকিলবাবু যে বলেছিল...

বিভূতি : পুরোপুরি ছাড়েনি। এই এলাকার বাইরে কোথাও যেতে পারব না। পুলিশ এসে খোঁজ নেবে।

বিভূতি প্রথমে বাবাকে প্রণাম করল। কৌতূহলী চোখে একবার তাকাল মাধবীর দিকে। তারপর মাকে প্রণাম করতেই মা আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে জড়িয়ে ধরল ছেলেকে।

সরমা : এ কী চেহারা হয়েছে তোর!

মহেশ : পাপ করলে প্রায়শ্চিত্ত তো করতে হবেই।

সরমা : পাপ? খবরদার তুমি ওসব অলক্ষুণে কথা বলবে না!

বিভূতি : পাপ বলছ বাবা? তার কতটুকু মোটে দেখেছ। আরও অনেক বাকি আছে।

সরমা : না খোকা, তুই আর মারামারি করতে যেতে পারবি না।

বিভূতি : ওসব কথা পরে হবে। এখন খেতে দাও মা। খুব খিদে পেয়েছে। খালি খেতে দাও, দিনরাত শুধু খেতে দাও...

Cut to

Scene-68

বারান্দায় খেতে বসেছে বিভূতি। বাড়ির সবাই গোল হয়ে ঘিরে তার খাওয়া দেখছে। সরমা খাবার তুলে দিচ্ছে তার পাতে।

সরমা : জেলখানায় তোকে বুঝি কিছু খেতে দিত না?

বিভূতি : একবারে কিছু না দিলে বেঁচে আছি কী করে? দিত, দিত, রুটিগুলো প্রায়ই পোড়া লেগে যেত, কালো কালো, খিদের মুখে তাও বেশ ভালই লাগত। আর আলুর তরকারি, তাতে রোজই নুন দিতে ভুলে যেত। একেবারে আলুনি কি খাওয়া যায়! আমাদের সঙ্গে ছিল একজন, হরপ্রসাদ, সে কী করে যেন খানিকটা নুন জোগাড় করেছিল, আমরা তার কাছ থেকে একটু নুনের জন্য কাকুতি-মিনতি করতাম। সে দিতে চাইত না। সামান্য নুনের জন্য এক একদিন কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে যেত!

সরমা : মাছ-মাংস কিছু দিত না?

বিভূতি : স্বপ্নে, স্বপ্নে! স্বপ্নে আমরা পোলাউও খেতাম। এক একদিন স্বপ্নে দেখেছি তোমার হাতের রান্না আলু-পোস্ত!

সরমা : ওরে আলু-পোস্তর বাটিটা এনে দে

মাধবী আলু-পোস্তর বাটি রাখল বিভূতির থালার পাশে।

মহেশ : এই হল মাধবী। আমার অসুখের সময় কী সেবাই যে করেছে! ওর সেবাতেই আমি বেঁচে উঠেছি!

সরমা : আমরা আর কেউ কিছু করিনি, শুধু ও একলাই সেবা করেছে!

মাধবী : আমি বাইরের লোক তো, তাই আমার বেশি প্রশংসা হচ্ছে।

বিভূতি আর মাধবী চোখাচোখি করে রইল।

Cut to

Scene-69

পরের দিন সকাল। গায়ে চাদর, গলায় মাফলার জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে মহেশ। পাশে মাধবী।

মহেশ : একবার আশ্রমে যাবে? প্রভুর চরণ বন্দনা করে আসতে চাই।

মাধবী : হ্যাঁ, চলুন, চলুন! ওদের অনেক দিন দেখিনি।

মহেশ : বিভূতি, বিভূতি!

বিভূতি বাইরে চলে এল। সঙ্গে সরমা।

মহেশ : আমাদের একটু আশ্রমটা ঘুরিয়ে নিয়ে আসবি?

বিভূতি : আশ্রম? সেখানে গিয়ে কী করব? কতদিন পর ফিরলাম, গ্রামের লোকজনদের সঙ্গে দেখা করতে হবে—

মহেশ : সে পরে দেখা করিস। এখন আমাদের সঙ্গে একটু চল

মাধবী : চলুন না, আশ্রমটা একবার দেখে আসবেন

বিভূতি : দেখার কী আছে? কতবার গেছি

মাধবী : এখন অনেক বদলে গেছে।

মহেশ : (সরমাকে) তুমিও চলো, তৈরি হয়ে নাও!

সরমা : আশ্রম মাথায় থাক, তোমরা ঘুরে এসো

ওরা হাঁটতে শুরু করে। একটু পরে শশধর দৌড়ে গিয়ে ওই দলে যোগ দেয়।

Cut to

Scene-70

নদীর ধার দিয়ে সবাই আশ্রমের দিকে উঠে আসছে। বিভূতি একটা কাটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে পড়ল।

বিভূতি : তোমরা ভেতরে ঘুরে এসো। আমি হাঁপিয়ে গেছি।

মাধবী : ওখানে বসলেন! লাল লাল পিঁপড়ে আছে।

বিভূতি : সাপখোপ থাকলেও আমি আর এখান থেকে নড়ছি না!

সবাই সেখানে বসে পড়ল। দূর থেকে ছুটে এল রত্নাবলী।

রত্নাবলী : মাধু, বেঁচে আছিস তাহলে?

মাধবী : আমার মতন মেয়েরা সহজে মরে না। তোমাদের খবর কী বলো?

রত্নাবলী : খবর আর কী! যেমন চলার তেমনই চলছে। তোর ঘরখানা এখনও খালি পড়ে আছে।

মহেশ : কেমন আছ, মা?

রত্নাবলী : আপনার অসুখের কথা শুনে খুব দেখতে যাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আমাকে আর কে নিয়ে যাবে!

শশধর : জানলে আমিই নিয়ে যেতাম সঙ্গে করে!

মহেশ : এই আমার ছেলে বিভূতি

রত্নাবলী : ও, আপনিই তো পুলিসের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন?

বিভূতি : আমার চেহারা দেখে কি সেরকম বীরপুরুষ মনে হয়?

মাধবী : তাগড়া জোয়ান হলেই কি বীরপুরুষ হয়?

একটা ছায়া পড়তেই রমেশ ফিরে তাকাল। সেখানে নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে সদানন্দ। মহেশ মাটিতে শুয়ে পড়ে তার পায়ে মাথা ঠেকাল।

তারপর প্রণাম করল শশধর। তারপর রত্নাবলী। একটু দ্বিধা করে মাধবী। অন্যদের প্রণাম নিয়ে একটাও কথা বলেনি সদানন্দ। মাধবীর চিবুক ছুঁল।

সদানন্দ : কেমন আছ, মাধু?

মাধবী : ভালই আছি।

মহেশ : (বিভূতিকে) এঁকে প্রণাম কর

সদানন্দ : থাক থাক

মহেশ : প্রণাম কর বিভূতি, এঁর আশীর্বাদে তুই ছাড়া পেয়েছিস।

বিভূতি উঠে দাঁড়ায়নি। দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার জানাল।

বিভূতি . নমস্কার, ভাল আছেন? অনেকদিন পর দেখা হল। আপনার আশীর্বাদ যে গভর্নমেন্টকেও টলিয়ে দিতে পারে, তা তো জানতাম না।

সদানন্দ আমার বলে নয়, আশীর্বাদ আন্তরিক হলে ভগবানকে পর্যন্ত টলিয়ে দিতে পারে বাবা।

বিভূতি : ভগবানের কথা বাদ দিন। তিনি তো সব সময়ই টলছেন মাতালের মতো। টাল সামলাতে প্রাণ বেরুচ্ছে আমাদের।

মহেশ : ছি ছি ছি! বিভূতি!

বিভূতি : কী বলছ বাবা?

মহেশ : পায়ে হাত দিয়ে এঁকে প্রণাম করো। নিজের ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চেয়ে নাও!

বিভূতি : এঁকে আমার প্রণাম করতে ইচ্ছে হয় না। ক্ষমা চাওয়ার মতন অন্যায় কথা তো কিছু বলিনি!

মহেশ এঁকে আমি দেবতা মনে করে পূজা করি। আমার ছেলে তুই, এঁকে তোর প্রণাম করতে ইচ্ছে হয় না? মুখের উপর যা-তা বললি, তবু অন্যায় হয়নি?

বিভূতি মাথা নাড়ল। তার মুখের ভাব শান্ত

মহেশ করবি না প্রণাম?

বিভূতি : না।

সদানন্দ : কী ছেলেমানুষী করছ মহেশ?

মহেশ ছেলেমানুষী প্রভু?

সদানন্দ : তুমি কি ভাবো ওর প্রণাম পাওয়ার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে আছি?

মহেশ : তা ভাবিনি প্রভু। ও প্রণাম করুক না করুক তাতে আপনার কিছু আসে যায় না- -সর্বনাশ হবে ওর নিজের। ও যে আমার সন্তান প্রভু!

সদানন্দ ভয় নেই, ওর কিছু হবে না। প্রণাম নিয়ে আমি আশীর্বাদ বিক্রি করি না মহেশ। আশীর্বাদ করাটা আমার ব্যবসা নয়, ভুলে যাও কেন? ছেলেমানুষের কথায় আমি যদি রাগ করি, আমি যে ওর চেয়েও ছেলেমানুষ হয়ে যাব!

মহেশ . তা কি জানি না প্রভু? আপনি দেবতা, আপনার কি রাগ-দ্বেষ আছে? কিন্তু আপনাকে প্রণাম না করলে ওর অকল্যাণ হবে।

সদানন্দ : অনিচ্ছায় প্রণাম করার চেয়ে না করাই ভাল মহেশ।

মহেশ : না প্রভু, প্রণম্যকে প্রণাম করতেই হয়। প্রণাম করতে করতে মনে ভক্তি আসে। বিভূতি, প্রণাম করো এঁকে।

বিভূতি কথা না বলে দু'দিকে মাথা নাড়ল

মহেশ : বিভূতি এখনও বলছি প্রণাম কর। যদি না করিস, এই জন্যেই আমি যে-দিকে দু'চোখ যায় চলে যাব। কোনওদিন আর ফিরব না।

বিভূতি : আমি পারব না বাবা

মাধবী : আহা এত করে বলছেন, প্রণাম করেই ফেলুন না একবারটি!

বিভূতি মাধবীর দিকে চেয়ে রইল। এরপরে সেখানে উপস্থিত হল বিপিন। রত্নাবলীকে ঠেলে সরিয়ে সামনে এল।

বিপিন : মাধু! আমায় না জানিয়ে আশ্রমে এসেছ যে!

মহেশ : আমি ওকে এনেছি বিপিনবাবু।

বিপিন : চুপ করুন, আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করিনি!

বিপিন মাধবীর হাত ধরতে গেলে বিভূতি তড়াক করে নেমে এসে মাধবীকে আড়াল করে দাঁড়ায়। তীব্র চোখে চায় বিপিনের দিকে। মহেশ ছেলেকে সরিয়ে দেয়।

মহেশ : মাধু আশ্রমে আসতে পারবে না, এমন হুকুম দিয়েছিলেন, জানতাম না বিপিনবাবু!

মাধবী : হুকুম দিয়েছেন মানে? উনি হুকুম দেবার কে? বেশ করেছি আশ্রমে এসেছি

বিপিন : আশ্রমটা বেড়াবার জায়গা নয়, মাধু!

মাধবী : এসেছি তো, কী করবেন, মারবেন?

সদানন্দ : আহা, কী আরম্ভ করেছ তোমরা

বিপিন : ছেলেমানুষী করো না মাধু, আমার সঙ্গে এসো—

বিপিন আবার তাকে ধরবার জন্য হাত বাড়ায়। মাধবী তেজের সঙ্গে হুঃ বলে সেই হাত সরিয়ে দেয়। অন্য সবাইকে উপেক্ষা করে সে গিয়ে দাঁড়ায় বিভূতির সামনে।

মাধবী : চলুন আমরা ফিরে যাই! যাবেন?

সদানন্দ : আমার ওখানে একবার আসবে না মাধু?

মহেশ : যাও মা, যাও, প্রভুর মন্দিরে একবার যাও!

মাধবী দু'দিকে মাথা নাড়ল। বিভূতি মাধবীকে নিয়ে চলে যেতে উদ্যত হল।

মহেশ : বিভূতি, বিভূতি, কোথায় যাচ্ছিস, এদিকে আয়। শুনে যা

বিভূতি : কী বলছ বাবা

মহেশ : প্রভুকে প্রণাম করে তারপর যা

সদানন্দ : আবার শুরু করলে? তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করছ মহেশ!

মহেশ : বাড়াবাড়ি প্রভু? ও যদি আপনাকে প্রণাম না করে, তাহলে আমাকে চলে যেতে হবে, যেদিকে দু'চোখ যায়, যেতেই হবে।

সদানন্দ : তাই তুমি যাও, বজ্জাত কোথাকার!

মহেশ : ওকে প্রণাম না করিয়ে কেমন করে যাব প্রভু? বিভূতি এখনও বলছি, প্রণাম কর

বিভূতি নড়ে না। সবাই উদ্গ্রীব। পেছনে অনেক ভিড় জমেছে। সদানন্দ রাগে কাঁপতে কাঁপতে

এগিয়ে এসে মহেশের গালে জোরে একটা থাপ্পড় কষিয়ে দিল। সবাই আঁতকে উঠল। মাধবী হাত চাপা দিল মুখে।

বিভূতি বাবার এই অপমানের শোধ নেওয়ার জন্য একটা লাঠি নিয়ে মারতে গেল সদানন্দকে। মহেশ বিভূতিকে জড়িয়ে ধরে কেড়ে নিল সেই লাঠি।

মহেশ . ছি! বিভূতি ছি!

তারপর মহেশ সদানন্দের পায়ের কাছে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মহেশ . আমায় মাপ করুন প্রভু। আপনাকে রাগিয়েছি, মাপ করুন। ছেলে আমার আপনার দিকে লাঠি তুলেছিল, এজন্য আমায় মাপ করুন।

বিভূতি : তোমার কী লজ্জাশরম নেই বাবা?

মহেশ : কী বলছিস তুই পাগলের মতো? প্রণাম কর বিভূতি, প্রণাম কর। শিগগির প্রভুকে প্রণাম কর। আমি না তোর বাপ বিভূতি? আমার দেবতাকে মারবার জন্য তুই লাঠি তুলেছিস? তোর যে হাত খসে যাবে, কুষ্ঠ হবে হাতে। এখনও প্রণাম করে পাপস্খালন করে নে! ও বিভূতি—

মহেশের ভাবভঙ্গি একেবারে পাগলের মতন। সদানন্দের পায়ে সে অনবরত মাথা ঠুকছে।

মাধবী . (বিভূতিকে ফিসফিস করে) একবার প্রণাম করে নিন না। তারপর ওঁকে নিয়ে বাড়ি যাই চলুন।

বিভূতি শেষ পর্যন্ত সদানন্দের পায়ে হাত ছোঁয়াল।

Cut to

Scene-71

মহেশের বাড়ির বারান্দা। সবাই বিকেলের জলখাবার খাচ্ছে। বিভূতির থালায় পিঠে পায়েস। তার মা তাকে আরও দিতে গেলে বিভূতি বাধা দেয়।

বিভূতি · আর দিও না। আর পারব না। প্রথমে মনে হয় অনেক খাব, রাক্ষসের মতন খাব, কিন্তু একটু খাবার পরেই মুখ মেরে দেয়।

সরমা . অনেক দিনের অনভ্যাস!

বিভূতি : সকালে কী কাণ্ড হয়েছে, তুমি শুনেছ মা?

সরমা · কিছু কিছু শুনেছি শশধরের কাছে।

বিভূতি : আচ্ছা বাবা, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?

মহেশ কে আগে কথাটা তোলে দেখছিলাম। পাগলামি মনে হয়েছে তোদের, না? কেন বল তো? পাগলের কথা, কাজ, কোনও কিছুর মধ্যেই সামঞ্জস্য থাকে না। আমি তো খাপছাড়া কিছু বলিনি, করিওনি!

বিভূতি : বলোনি? করোনি?

মহেশ : না, আমি আবোলতাবোল কথা কোনওদিন বলি না। খাপছাড়া কাজ করি না। মাঝে মাঝে ভুল হতে পারে, তা সেটা সবারই হয়।

বিভূতি : এরকম অহঙ্কার তো কখনও দেখিনি তোমার। নিজেকে প্রায় মহাপুরুষে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছ!

মহেশ : তা করিনি। একটা সোজা সত্য কথা বলেছি। তোর অহঙ্কার বলে মনে হল কেন জানিস? তোর সঙ্গে কথা বলার সময় সব সময় আমার মনে থাকে যে তুই আমার ছেলে। আর আমার বিচার করার সময় তুই ভুলে যাস যে আমি তোর বাবা।

বিভূতি : বিচারের কথা হচ্ছে না। কিন্তু...তুমি একজনের ভক্ত হতে পারো, তা বলে তোমার আত্মমর্যাদা থাকবে না?

মহেশ : আত্মমর্যাদা বলতে তোরা কী বুঝিস? ফাঁকা গর্ব, গোঁয়ার্তুমি? মানুষেব সঙ্গে মানুষের সঙ্ঘর্ষ ছাড়া আত্মমর্যাদা টেঁকে না? ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের ঠোকাঠুকি লাগবে, দরকার হলে প্রকাশ্যেও হাতাহাতি হবে, লাঠি হাতে মারতে উঠবি, তবে তোদের আত্মমর্যাদা ঠিক থাকবে! কী বলো মাধু, তাই না?

মাধবী : কী জানি, ওসব বড় বড় দার্শনিক কথা ভাল বুঝি না।

মহেশ : বড় বড় দার্শনিক কথা আবার কখন বললাম? জানলে তো বলব। আচ্ছা কথাটা তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি

মাধবী : থাক না। আমার না বুঝলেও চলবে।

মহেশ : উঃ না, কথাটা তোমাকে না বুঝিয়ে ছাড়ব না।

মাধবী : বুঝেও যদি না বুঝি?

মহেশ : হেসো না, এটা হাসির কথা হয়। সকালে বিপিনবাবুর সঙ্গে ঝগডা করলে...উনি রাগ করেছিলেন বলে তুমিও ফুঁসে উঠলে... দু'জনেরই মনের শান্তি নষ্ট হল। কিন্তু তুমি যদি হাসিমুখে দুটো কথা বলতে তাহলে হয়ত বিপিনবাবুর রাগ জল হয়ে যেত। তুমি ভাবলে, বিপিনবাবুর সঙ্গে ভালভাবে কথা বললে সবাই মনে করবে তুমি ভীরু, অপদার্থ। আত্মমর্যাদা বাঁচাবার জন্য তোমাদেব ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। তোমরা সকলকে হিংসা করো কিনা, তাই এমন হয়। নিজের যাতে ক্ষতি নেই, পরের জন্য সেটুকু ত্যাগও কি করা যায় না?

বিভূতি গালে যে চড় মারে, তার পায়ে লুটিয়ে পডার চেয়ে ওরকম ঝগড়া ঢের ভাল।

মহেশ : গালে চড় মেরেছেন, প্রভুর সঙ্গে কি আমার এইটুকু সম্পর্ক বিভূতি! আমাকে চড় মেরেছেন, সেজন্য নিশ্চয়ই মনে মনে উনি অনেক কষ্ট পাচ্ছেন। আমি সোজাসুজি ওঁকে দেবতার মতো ভক্তি করি।

বিভূতি : মানুষের পক্ষে মানুষকে দেবতার মতো ভক্তি করা...

মহেশ : উচিত নয়। মানুষ কখনও মানুষকে দেবতার মতো ভক্তি করে না। কিন্তু সংসারে সেবকম কটা মানুষ আছে বল তো? সবাই যদি মানুষ হত বিভূতি, পৃথিবীটা স্বর্গ হয়ে যেত!

বিভূতি : তোমার এ কথা ঠিক নয় বাবা। একজন মানুষ আর একজনকে দেবতার মতন ভয়-ভক্তি করে বলেই সংসারে এত বেশি অমানুষ আছে, সবাই মানুষ হতে পারছে না। একজন মানুষের চাপে অন্যরা কুঁকড়ে যাচ্ছে। তাদের মনের বিকাশ হচ্ছে না।

মহেশ : মনের বিকাশ হবার জন্যই একজনকে পথ দেখাতে হয়।

বিভূতি : আমাকে কেন তুমি জোর করে ওঁকে প্রণাম করালে? আমি তো ওঁকে দেবতার মতন ভক্তি করি না। কোনও ভক্তিই নেই

মহেশ : হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি। তুই আমার ছেলে বলেই প্রণাম করিয়েছি। তুই ভক্তি করিস বা না করিস, সে প্রশ্ন এখানে ওঠে না। আমি তোর বাবা, আমি তোকে দিয়ে প্রণাম করাতে পারি, তবু যদি জোর না করতাম, সেটাই আমার অন্যায় হত। অন্য কাউকে তো আমি জোর করে প্রণাম করাই না।

বিভূতি : তোমার এই যুক্তিটা আমি মানতে পারলাম না। তুমি আমার বাবা, আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি, মান্য করি। কিন্তু কোনও বাবাও যদি ছেলেকে কোনও অন্যায় আদেশ করে, তবে ছেলের তা প্রতিবাদ করা উচিত।

বাইরে থেকে কয়েকজন বিভূতির নাম ধরে ডাকল।

Cut to

Scene-72

বাড়ির বাইরে আট-দশজন লোক জড়ো হয়েছে। বিভূতি দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল।

বিভূতি : কী রে, তোরা কেউ এর মধ্যে আমার সঙ্গে দেখা করলি না! আমি ভাবলাম, আমি জেলখাটা আসামি, তাই পুরনো বন্ধুরা আমার সঙ্গে মিশতে ভয় পাচ্ছে।

বিশু : না, না, ভয় পাব কেন? সারাদিন কাজকম্মে ব্যস্ত ছিলাম

বিভূতি : কাশেম, তোমার জমিটা আছে না মহাজন গিলে খেয়েছে?

কাশেম : খেয়েছে, কিন্তু হজম করতে পারেনি। সাপের ছুঁচো গেলার মতন অবস্থা!

বিভূতি : বলো, তোমার বৃত্তান্তটা শুনি

কাশেমের কাঁধে হাত দিয়ে বিভূতি দলবল সমেত এগিয়ে যায়।

Cut to

Scene-73

নদীর ধারে বসে আছে সদানন্দ। আধো-অন্ধকার। নদীর জলে চিকচিক করছে চাঁদের আলো। দূর থেকে হ্যাজাক বাতি হাতে ঝুলিয়ে কেউ হেঁটে আসছে। কাছে আসতে দেখা গেল, সে বিপিন।

বিপিন : তোর ঘরে খুঁজে এলাম। তুই এখানে বসে আছিস যে?

সদানন্দ : ঘরে থাকতেই হবে নাকি?

বিপিন : সন্ধেবেলার আসরে আজ অনেক লোক এসেছিল। তোর উপদেশ শোনার জন্য বসেছিল। তুই তখন ঘরের দরজা বন্ধ করে বসেছিলি।

সদানন্দ : রোজ রোজ মানুষের মন একরকম থাকে না। মন অস্থির থাকলে অন্যকে উপদেশ দেওয়া যায় না। আজকের প্রণামীর পয়সাগুলো তোর কক্ষে গেল, তাই না?

বিপিন : সদা, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এলাম তোকে। আগের মতন আমার কথা শুনে চলবি কি চলবি না তুই?

সদানন্দ : আমি কি তোর মাগনায় কেনা চাকর যে তোর হুকুম মেনে চলব?

বিপিন : তোর সঙ্গে সেরকম ব্যবহার কখনও করিনি। সেরকম সম্পর্ক নয় তোর সঙ্গে। আমার কথা শুনে চলা মানে আমার হুকুম মেনে চলা নয়। নিজেই ভেবে দ্যাখ, আমি বুদ্ধি খাটিয়ে আশ্রমের উন্নতির ব্যবস্থা করব, তুই আমার একটা কথা মানবি, একটা মানবি

না, তাহলে কি আশ্রম চলে? আশ্রমের জন্য তোকে দরকার আছে, কিন্তু আশ্রম চালাবার ক্ষমতা তোর নেই, তুই যদি...

সদানন্দ : হ্যাঁ হ্যাঁ জানি। আসল কথাটা পরিষ্কার করে বল

বিপিন : আসল কথাটা এই আগে যেমন সব বিষয়ে আমার কথা শুনে চলতিস, তেমনভাবে যদি না চলিস, তোকে দিয়ে আমার আর কাজ হবে না।

সদানন্দ : তাহলে কী করবি?

বিপিন : তোকে বিদেয় করে দেব!

সদানন্দ : বিদেয় করে দিবি? তোর আস্পর্দ্ধা তো কম নয়! তোকে কে বিদেয় দেয় তার ঠিক নেই

বিপিন : হাঃ! আমার আশ্রম থেকে আমাকে কে বিদেয় দেবে?

সদানন্দ : আমি একটি মুখের কথা বললে সবাই তোকে কেটে মাটিতে পুঁতে ফেলবে, তা জানিস?

বিপিন : তাই বুঝি? বলেই দ্যাখ না মুখের কথাটা

বিপিন ফস করে একটা বিড়ি ধরাল। নিঃশব্দ হাসিতে ভরে গেল তার মুখ।

বিপিন : তুই বড় বোকা, সদা। সবাই টিপ টিপ করে প্রণাম করে, আর তুই ভাবিস তোর জন্য প্রাণ দিতে সবাই ছটফট করছে। প্রাণ পাওয়া অত সহজ নয় রে। আমি তোকে ভড়ং শিখিয়েছি, সেই ভড়ং করে তুই লোকের মনে খানিকটা ভয়, খানিকটা ভক্তি জমিয়েছিস। সকলের সামনে মহাপুরুষের মত চলিস ফিরিস, সবাই তোকে মহাপুরুষ বলে ধরে নিয়েছে। লোকে যেমন সহজে বিশ্বাস করে তেমনি সহজে বিশ্বাস ভেঙে যায়। তোর ওই ভড়ং যে আমি যে-কোনওদিন ফাঁস করে দিতে পারি। কাল যদি রটিয়ে দিই, তোর অত্যাচারে মাধুকে আশ্রম ছাড়তে হয়েছে, সবাই তাই বিশ্বাস করে বসবে। মাধুকে নিয়ে যে কয়েকটা বোকামি করেছিস...

সদানন্দ : মাধুকে নিয়ে কী বোকামি করেছি?

বিপিন : আহা, হা, বুঝেও যেন বুঝিস না। চোর যেমন ভাবে যে সে চোর নয়। আজ সকালেই তো সকলের সামনে কেঁদে কেঁদে বললি, একবার আমার ঘরে আসবে না মাধু? মহাপুরুষ সদানন্দের কী করুণ মিনতি একটা মেয়ের কাছে। মাধু মুখ ফিরিয়ে গট গট করে চলে গেল—লোককে যদি উসকে দি যে এর মানেটা কী...

সদানন্দ : সব লোকের মন কি তোর মতন নোংরা, কদর্য হয়! তুই বড়লোকের পা-চাটা, ফন্দিবাজ, বিশ্বাসঘাতক

বিপিন : আমি তোর সঙ্গে ঝগড়া করতে চাই না সদা। তিনদিনের মধ্যে তুই আমার আশ্রম ছেড়ে চলে যাবি। এই আশ্রমের সব কিছু আমার। তুই সতিাই আমার চাকর, তোকে থাকবার কোয়ার্টার দিয়েছি, খেতে পরতে দিয়েছি, চাইলে মাইনে বাবদ কিছু টাকা দিয়ে চুকিয়ে দেব, ব্যাস!

সদানন্দ : এই আশ্রম তোর? আমি কিছু করিনি? রাজাসাহেব তোর মুখ দেখে এই সব কিছু দান করেছেন?

বিপিন : তোর চাঁদপানা মুখখানা দেখিয়েছি আর এই আশ্রমের জমি, বাড়ি, পাশের আমবাগান

সব আমার নামে লিখিয়ে নিয়েছি। আইনত সব কিছুর মালিক এখন আমি। রাজাসাহেবও আর কিছু করতে পারবেন না। আমি অকৃতজ্ঞ নই, আশ্রমের জন্য তুই যা সার্ভিস দিয়েছিস, সে জন্য কিছু টাকা তোকে আমি দেব। তা নিয়ে অন্য জায়গায় তুই ছোটখাটো একটা আশ্রম খুলতে পারিস। আর একটা জিনিসও তোকে দিলাম সদা। তুই মাধুকে নিয়ে নিস। ওকে আর আমার দরকার নেই।

সদানন্দ : হারামজাদা!

Cut to

Scene-74

বিভূতি একটা সাইকেলে চেপে বেরিয়ে গেল। উল্টোদিকের রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছে সদানন্দ। আলখাল্লা পরা, কাঁধে একটা গেরুয়া রঙের পুঁটুলি। মহেশের বাড়ির সামনে এসে সে দাঁড়াল।

সদানন্দ : মহেশ! মহেশ!

মহেশ দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেই দারুণ অবাক।

মহেশ : প্রভু, আপনি? চোখে ভুল দেখছি না তো? আপনি... এই অধমের বাড়িতে

সদানন্দ : তোমার কাছেই এলাম, মহেশ!

মহেশ : একটা খবর দিলেই আমি ছুটে যেতাম আশ্রমে। আপনি এতদূর...কষ্ট করে

সদানন্দ : বিপিন আমাকে আশ্রম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

মহেশ : এবার কি কানে ভুল শুনছি? বিপিনবাবু...

সদানন্দ : ঠিকই শুনছ। আশ্রমে আর আমার জায়গা নেই। কোথায় যাই, ভেবে পেলাম না। তাই তোমার কাছে এলাম। তোমার বাড়িতে আমায় থাকতে দেবে?

মহেশ : বিপিনবাবুর এতখানি আস্পর্ধা হয় কী করে? আশ্রম আপনার...

এরমধ্যে মাধবী পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

মাধবী : আপনাকে তাড়িয়ে দিলেন কেন বিপিনবাবু?

মহেশ : কী যে বলো মা! প্রভুকে তাড়াবার সাধ্য কার আছে? উনি রাগ করে চলে এসেছেন নিশ্চয়ই

সদানন্দ : না, মহেশ, বিপিন আমাকে তাড়িয়েই দিয়েছে।

মহেশ : তাই কি হয় প্রভু? আপনি ছলনা করছেন। বিপিনবাবুর কী এমন ক্ষমতা

সদানন্দ : আশ্রমটা বিপিনের সম্পত্তি, সব কিছু নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছে। আমি নাকি আশ্রমের শুধু শিক্ষক হিসেবে ছিলাম। বিষয়বুদ্ধি তো নেই—

মহেশ : আপনার বুদ্ধির কাছে বিপিনবাবুর বিষয়বুদ্ধি! ক'বিঘে মেঠো জমি বিপিনবাবু নিজের নমে লিখিয়ে নিয়েছেন, আর আপনি জয় করেছেন এতগুলো মানুষের মন। আপনাকে নিয়েই তো আশ্রম। দেবতা ছাড়া কি মন্দির হয়? আপনি যেখানটায় থাকবেন, সেখানটাই আশ্রম। মাধু মা, এক ঘটি জল নিয়ে এসো

মাধবী ভেতরে চলে গেল। মহেশ হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইল।

মহেশ : বিপিনবাবুর ওপর প্রথমে রাগ হয়েছিল, এখন মায়া হচ্ছে। বুদ্ধির দোষে মানুষ এমন সর্বনাশও করে!

মাধবী জল নিয়ে এল। মহেশ সেই জল ঢেলে ধুইয়ে দিল সদানন্দর পা। হাঁটু গেড়ে বসল।

মহেশ : আপনি আমার এখানে থাকবেন প্রভু? আমার এত বড় সৌভাগ্য হবে, আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। আজ আমার জীবন সার্থক হল। এ বাড়ি আপনার। এ বাড়ির মেয়ে-পুরুষ সবাই আপনার দাস-দাসী।

Cut to

Scene-75

একটা প্রশস্ত ঘর। পালঙ্কের ওপর সুদৃশ্য চাদর পাতা। সেই পালঙ্কে জোড়াসন করে বসে আছেন সদানন্দ। বাড়ির লোকেরা মেঝেতে কার্পেট পাতা, ফুলদানি সাজানো, ধূপধুনো জ্বালাতে ব্যস্ত। মহেশ তদারক করছে।

Cut to

Scene-76

রান্নাঘরে ব্যস্ত সরমা। একটা মোড়ায় বসে আছে বিভূতি। একটা ছোট প্লেট থেকে সে কিছু একটা খাবার চাখছে।

বিভূতি : ব্যাপারটা কী হল বলো তো মা? বাবা ওই লোকটাকে বাড়িতে ডেকে আনলেন কেন?

সরমা : কী জানি বাপু। তোর বাবা ডেকে আনেননি, আশ্রমে কী যেন গোলমাল হয়েছে, উনি নিজেই চলে এসেছেন।

বিভূতি : গোলমাল মানে নিশ্চয়ই টাকাপয়সা নিয়ে ঝগড়া। ওরা তো টাকা রোজগারের জন্যই আশ্রম খোলে। সরল, নিরীহ মানুষগুলোকে ধর্মের ফাঁকা বুলি দিয়ে ভোলায় আর প্রণামী আদায় করে। একসময় লাভের বখরা নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি লেগে যায়! বাবা যে কেন ওই ভণ্ড, বদমাশটাকে মাথায় তুলে নাচছেন, তা বুঝি না!

সরমা : বাবার সামনে ওভাবে কথা বলো না। উনি মনে দুঃখ পাবেন।

বিভূতি : ঠিক আছে, বাবা না হয় ওই সদানন্দকে গুরু বলে মেনেছেন। তা মানুন। তা বলে ওই লোকটাকে বাড়িতে এনে তুলতে হবে? আমি থাকলে তক্ষুনি বিদায় করে দিতাম।

সরমা : তুই বিদায় করার কে? তুই কি বাড়ির মালিক? তোর বাবা এ বাড়ির কর্তা, তাঁর ইচ্ছে হয়েছে, গুরুদেবকে বাড়িতে রেখেছেন।

বিভূতি : বাঃ তা বলে আমাদের মতামত নেবেন না? তোমার মতামত নিয়েছিলেন?

সরমা : হুঃ, আমার আবার মতামত! তোর মতামতই বা নিতে যাবেন কেন? তুই এক পয়সা রোজগার করিস? ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছিস। জেল খেটেছিস, কেউ চাকরি-বাকরিও দেবে না।

বিভূতি : ওসব চাকরি-বাকরি আমার দ্বারা হবে না! আর একটু লাউয়ের তরকারি দাও তো, বেশ হয়েছে!

Cut to

Scene-77

সদানন্দ শুয়ে আছেন খাটে। ঘরের দরজা বন্ধ। সেই দরজা খুলে মাধবী এসে দাঁড়াল। ঘরোয়া শাড়ি পরা। পান খেয়ে ঠোঁট লাল।

তাব দিকে চোখ পড়তেই সদানন্দ ধড়মড় করে উঠে বসলেন।

সদানন্দ : এসো মাধু, বসো।

মাধবী : বসছি। কিন্তু ব্যাপারটা কী হল বলুন তো?

সদানন্দ : ব্যাপার আর কী হবে? ঝগড়া করে চলে এলাম। ওরকম স্বার্থপর ছোটলোকের সঙ্গে মানুষের পোষায়! এতদিন সহ্য করেছিলাম, আর সহ্য হল না।

মাধবী : আপনাদের দিয়ে কোনও ভাল কাজ হবে কী করে? খালি নিজেদের মধ্যে মারামারি করলে কোনও কাজ হতে পারে? মুখে বলতেন মানুষের সেবা, দেশের সেবা...ছি ছি, নিজের নিজের স্বার্থচিন্তাই যদি করবেন দিনরাত, তাহলে এসব কাজে কেন আসেন আপনারা?

সদানন্দ : স্বার্থচিন্তাই যদি করতাম মাধু, আশ্রম ছেড়ে আজ চলে আসতে হত না। বিপিনের বদলে আশ্রমটা আমিই দখল করতাম।

মাধবী : পারলে তা করতেন!

সদানন্দ : আমাকে কি তুমি বিপিনের মতো অপদার্থ ভাব?

মাধবী : বিপিনবাবুকে আমি মোটেই অপদার্থ মনে করি না।

সদানন্দ : তবে, মহাপুরুষ ভাব বুঝি?

মাধবী : বিপিনবাবু কেন মহাপুরুষ হবেন, মহাপুরুষ তো আপনি।

সদানন্দ : তোমার কাছে অন্তত তাই বটে। আমাকে মহাপুরুষ না ভেবে তো তোমার উপায় নেই।

মাধবী : কেন?

সদানন্দ : তোমাকে যে তাহলে দ্বিচারিণী হতে হবে।

মাধবী কয়েক মুহূর্ত সদানন্দেব দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

সদানন্দ : রাগ করলে মাধু, শোনো, শুনে যাও

মাধবী তবু দরজা দিয়ে বেবিয়ে যেতে গিয়ে বিভূতির মুখোমুখি পড়ে যায়। বিভূতি তাকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢোকে। জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

বিভূতি : যদি কিছু মনে না করেন, আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করব? ইচ্ছে না হলে উত্তর দেবেন না।

সদানন্দ : মনে করব কেন? যা খুশি জিজ্ঞেস করতে পারো।

বিভূতি : আপনি ওই আশ্রমের সাধু হবার আগে কোথায় ছিলেন? আপনার কোনও জীবিকা ছিল?

সদানন্দ : পূর্বাশ্রমের কথা তো বলতে নেই।

বিভূতি : জন্ম থেকেই নিশ্চয়ই সাধু হননি। কখন সাধু হলেন, বা কেন হলেন...

সদানন্দ : এইটুকু বলতে পারি, আমার বাবা-মা ছিল, সংসারও ছিল। একসময়ে সংসারে আর মন টিকল না, সব কিছুই অসার মনে হত, তাই একদিন সব ছেড়েছুড়ে বেরিয়ে এলাম।

বিভূতি : সেই থেকে সাধু হলেন। সাধনা-টাধনাও করেছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু সাধু-সন্ন্যাসীরা তো হিমালয়ের গুহায় কিংবা কোনও নির্জন স্থানে তপস্যা করে। আশ্রম খুলে বসার দরকার কী?

সদানন্দ : সব সাধুকেই হিমালয় যেতে হবে, এমন কোনও বাধ্যবাধকতা আছে কি?

বিভূতি : না, সে কথা বলছি না। আমি জানতে চাই, যারা সংসার বিরাগী হয়ে ঘর ছেড়ে চলে যায়, তারাই আবার সংসারী মানুষদের মধ্যে ফিরে আসে কেন?

সদানন্দ : কেউ কেউ ফিরে আসে, কারণ তারা স্বার্থপরের মতন শুধু নিজের মুক্তির উপায় চিন্তা না করে সাধারণ মানুষদের কিছু সাহায্য করতে চায়। এই সমস্যা-জর্জরিত জীবনে কিছুটা শান্তির পথ দেখাতে চায়।

বিভূতি : তার জন্য পয়সা লাগে। সার্কাস দেখতে গেলে লোকজনকে যেমন টিকিট কাটতে হয়, তেমনি আপনাদের দর্শন করতে গেলেও প্রণামী দিতে হয়।

সদানন্দ : তোমার কি ওই প্রণামীতে আপত্তি, না লোকজন আসায় আপত্তি? সার্কাসে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে লোক ডাকতে হয়, আমার কাছে এমনি মানুষ ছুটে আসে। প্রণামীর কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। কেউ দেয়, কেউ দেয় না। একটা আশ্রমে অনেক মানুষ থাকে, তাদের খরচ চালাবার জন্য কিছু টাকাপয়সার দরকার তো হয়ই। আমি অবশ্য ওসব নিয়ে কোনওদিন মাথা ঘামাইনি।

বিভূতি . একজন মহাপুরুষ বলেছিলেন, খালি পেটে ধর্ম হয় না! ঠিকই বলেছিলেন। এ দেশের অর্ধেকের বেশি মানুষ এখনও দু'বেলা খেতে পায় না, তা কি আপনারা জানেন না? সেই সব মানুষের যাতে খাদ্যের সংস্থান করা যায়, তারা সমাজে সমান সুযোগ পায়, আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচতে পারে, সেই চেষ্টাই কি আগে করা উচিত নয়?

সদানন্দ : তুমি সেই চেষ্টা করো। তুমি যেটা প্রধান কাজ মনে করো, তুমি করো সেটা। আমি আমার কাজ করি।

বিভূতি . এ দেশের অধিকাংশ মানুষ অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে না কেন জানেন? তার মূলে আছেন আপনারা। যুগ যুগ ধরে আপনারা তাদের ভগবান, ভাগ্য, নিয়তি, দেবতার দয়া, এইসব নিয়ে গালগল্প শুনিয়ে এসেছেন। গরিব মনে করে, গরিব থাকাটা তার নিয়তি। কারুর ছেলে চিকিৎসার অভাবে মারা গেলে সে মনে করে, ভগবান তাকে কাছে টেনে নিয়েছেন। গরিবকে গরিব আর বড়লোককে বড়লোক ভগবানই বানিয়েছেন। তাই বলেন না আপনারা?

সদানন্দ : আমি ভগবানের কথা কারুকে বলি না। পুজোআচ্চার কথা বলি না। ভগবান আছেন না নেই, সে ব্যাপারে আমি নিজেই নিশ্চিত নই।

বিভূতি . সে কী? তবু আপনি সাধু সেজেছেন!

সদানন্দ : সেজেছি? তুমিও তো বড়লোক বাপের হোটেলে খেয়েদেয়ে গরিবের উদ্ধারকারী সেজেছ!

বিভূতি : আমি তবু বাপের হোটেলে খাচ্ছি, আপনি কাদের ঘাড়ের ওপর বসে খাচ্ছেন?

বাইরে থেকে মহেশের গলায় ডাক শোনা গেল, বিভূতি, বিভূতি!

বিভূতি আর কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে গেল।

Cut to

Scene-78

সকালবেলা। বিভূতি সাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে। একটুখানি যেতেই চেন খুলে গেল। নিচু হয়ে বিভূতি সেটা ঠিক করতে লাগল। তারপর মুখ তুলতেই দেখতে পেল, একটু দূরে মাধবী দাঁড়িয়ে আছে।

মাধবী : আপনি রোজ সকাল সকাল কোথায় বেরিয়ে যান?

বিভূতি : এই গ্রামে গ্রামে ঘুরতে যাই। লোকজনের সঙ্গে দেখা করি।

মাধবী : আবার ফেরেনও তো অনেক রাতে। বাড়িতে বুঝি মন টেকে না?

বিভূতি : বাড়িতে...মানে...এত লোকজনের ভিড় লেগে গেছে...

মাধবী : আমিও তো এসে ভিড় বাড়িয়েছি

বিভূতি কিছু বলল না।

মাধবী . বেশিদিন থাকব না, ভয় নেই।

বিভূতি · ভিড় মানে, আমি তা বলতে চাইনি...ওই যে ওনার কাছে সব লোকজন আসে

মাধবী : আপনার কাছে জেলখানার গল্প শোনার ইচ্ছে ছিল

বিভূতি : হবে একদিন

বিভূতি সাইকেলে উঠে পড়ে।

Cut to

Scene-79

একটা গ্রাম্য চায়ের দোকান। বাইরে একটা বেঞ্চির ওপরে বসে আছে বিভূতি। আর কয়েকজন দাঁড়িয়ে। কয়েকজন মাটিতে উবু হয়ে বসে আছে। সকলের হাতে ছোট চায়ের গেলাস।

বিভূতি · রহিমচাচা, মহাজনের কাছে প্রত্যেক বছরই কি তোমাদের টাকা ধার করতে হয়? না করে পারো না?

রহিম : চাষের সময় যে টাকা লাগে তা আসবে কোথ্‌ থেকে! বীজধান কিনতে হয়, সার কিনতে হয়, হালের বলদ ভাড়া লাগে

বিভূতি · ধান বিক্রি করে যে টাকা পাও, তা থেকে জমাতে পারো না কিছু?

রহিম : জমা! খোরাকি ফুরিয়ে গেলে ঘটিবাটি পর্যন্ত বিক্কিরি করে দিতে হয়। পারলে নিজেকেও বিক্রি করে ফেলি।

সবাই হেসে ওঠে। বিভূতিও হাসে।

বিভূতি . সেই জন্যই তো কো-অপারেটিভ করার কথা এত করে বলি। সে যতদিন না হচ্ছে, ততদিন মহাজনের কাছে ঋণ নিতে যাবার সময় বিশু কিংবা আজিজকে সঙ্গে নিয়ে যাবে।

রহিম : কেন, ওরা যাবে কেন?

বিভূতি : তোমরা তো লিখতে পড়তে শিখলে না। মহাজন তোমাদের মুখে বলে পঞ্চাশ টাকা, লিখিয়ে নেয় পাঁচশো টাকা। তোমরা না বুঝে টিপসই দিয়ে আসো। তাতেই তো সর্বনাশ হয়। জমিজমা বন্ধক পড়ে। বিশু আর আজিজ লেখাপড়া জানে, ওদের সঙ্গে রাখবে। ওরা ভাল করে দেখেশুনে দিলে তারপর টিপসই দেবে।

অন্য একজন : মহাজন যদি তাতে রাজি না হয়! যদি বলে, ওরা কেন ফোঁপর দালালি করতে এসেছে?

বিভূতি : শোনো, মহাজন তো দয়া করে তোমাদের টাকা দেয় না। তার নিজের স্বার্থটাই বেশি। এমনিতেই কত সুদ নেয়। যদি আপত্তি করে, পিঠ ফিরিয়ে চলে আসবে। দেখবে, তখন আদর করে ডাকছে। মোট কথা, না বুঝেশুনে সই দেবে না।

হারাধন : বিশুটা তো এক নম্বরের হারামজাদা। ওকে ডাকলেই কি সঙ্গে যাবে? ওর স্বার্থ কী?

বিভূতি : যাবে না মানে? না গেলে ওর মাথা ফাটিয়ে দেব না? টাকা পাবার পর ওকে না হয় একটা চমচম খাইয়ে দিও!

রহিম : হুঃ, চমচম! ওব যে একখানা পুত্রসন্তান জন্মাল, তার জন্য আমাদের দুটো বাতাসাও খাওয়াল না।

বিভূতি : অ্যাঁ, বিশে, তোর ছেলে হয়েছে কিছু বলিসনি?

বিভূতি বিশুর পিঠে জোরে একটা চড় কষায়

বিভূতি : আজ সক্কলের চায়ের দাম তুই দিবি!

হারাধন : আমি আর এক গ্লাস চা খাব!

রামলোচন : আর একটা ব্যাপারে তোমাকে একটা বিহিত করতে হবে বিভূতিদা। নন্দপুরে প্রতি বছর তিনদিন ধরে যাত্রা হয় জানো তো? এবারেও হবে। কিন্তু ওবা আমাদের যাত্রা শুনতে দেয় না।

বিভূতি : আরে ধুর, ওসব যাত্রা ফাত্রা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না।

রামলোচন : কথাটা ভাল করে শুনে দেখো। যাত্রাব জন্য ওরা হাট থেকে আমাদেব কাছ থেকেও চাঁদা তোলে। সব্বাইকে দিতে হয়। কি গো, চাঁদা দাও না তোমরা?

দু-তিনজন : দিই তো বটেই। না দিয়ে কী উপায় আছে।

রামলোচন : আমাদের কাছ থেকে চাঁদা নেবে, তবু আমাদের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে!

বিভূতি : চাঁদা যখন দাও, তখন আগেভাগে গিয়ে সামনে বসে পড়বে।

রামলোচন : তাই তো গিয়েছিলাম গত বছর দল বেঁধে। ওদের লোকেরা এই মারে তো সেই মারে। আমাদের খেঁকিয়ে তাড়িয়ে দিল। আমরা নিচু জাত, ছোটলোক, তাই আমরা বাবুদের পাশে বসতে পারব না!

বিভূতি : ছোটলোক! ঠিক আছে, দেখাচ্ছি মজা

Cut to

Scene-80

মহেশের বাড়ির বাইরের দিকেব একটা ঘরে, বেদির ওপরে বসে আছেন সদানন্দ। বড় বড় প্রদীপ ও ধূপধুনো জ্বলছে। দল বেঁধে ভক্তরা আসছে সদানন্দকে দর্শন করতে। ভিড় সামলাচ্ছে শশধব।

সদানন্দ হাত তুলে আশীর্বাদ করছে। কারুকে বা দিচ্ছে একটা ফুল বা বেলপাতা। ভিড় ক্রমশ বাড়ছে।

Cut to

Scene-81

আগেকার আশ্রম। সেখানে চালাঘরের নিচে বসে মাত্র পাঁচ-ছ'জন বুড়োবুড়ি। বাইরে চিন্তিতমুখে পায়চারি করছে বিপিন। তারপর সে নিজেই বেদির ওপর বসে পড়ল।

এক বৃদ্ধা : প্রভু কোথায়? তিনি আর আসবেন না?

বিপিন : না, আসবেন না। তোমাদের কী প্রশ্ন আছে আমাকে বলো।

কেউ কিছু বলল না, দুজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা উঠে চলে গেল

Cut to

Scene-82

সন্ধে হয়ে গেছে। মহেশের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল রত্নাবলী। দরজা ধরে একটু নাড়া দিতেই বেরিয়ে এল শশধর।

রত্নাবলী : চলে এলাম গো, রাস্তা চিনে চিনে

শশধর : এসো, এসো, সবাই খুব খুশি হবে।

রত্নাবলী : আগে একটু পা ধোব। পা না ধুয়ে গেরস্ত বাড়ি ঢুকতে নেই।

দুজনে উঠোনে গিয়ে দাঁড়াল। ঘটি এনে নিজেই পা ধুইয়ে দিতে গেলে রত্নাবলী ঘটিটা কেড়ে নিল।

বাড়ির ভেতরে গান শোনা যাচ্ছে। মাধবী চলে এসেছে উঠোনে।

মাধবী : ওমা, রত্না? তুই কী করে এলি?

রত্নাবলী : এলাম রে! তোকে না দেখে আর থাকতে পারছিলাম না।

মাধবী এক পলক শশধরের দিকে তাকাল। তার মুখে বিগলিত হাসি।

মাধবী : এত প্রেম? আমার জন্য, না কার জন্য? এই রাত্তিরবেলা এলি কী করে, সঙ্গে কেউ নেই!

রত্নাবলী : রাত্তিরেই তো লুকিয়ে লুকিয়ে আসতে হল।

মাধবী : কেন, লুকিয়ে কেন?

রত্না : বিপিনবাবু টের পেলে তাড়িয়ে দেবেন না আশ্রম থেকে?

মাধবী : ইস, দেয় তো দেবে! এখানে এসে থাকবি তুই! চল, ভেতরে চল।

Cut to

Scene-83

ভেতরের একটি ঘর। একটা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে বসে আছেন সদানন্দ। গায়ে সাদা শাল। মেঝেতে মহেশ, সরমা ও আরও দু-তিনটি বউ বসে আছে ঘোমটা দিয়ে। একজন কপালে তিলক কাটা লোক গান গাইছে খঞ্জনি বাজিয়ে।

মাধবী আর রত্নাবলী সেই ঘরে ঢুকল। রত্নাবলী সদানন্দকে প্রণাম করল না।

মাধবী : এই দেখুন, কে এসেছে!

মহেশ : এসো মা, এসো, এসো। এতদিন আসোনি কেন?

মাধবী : ভয়ে আসতে পারেনি, পাছে বিপিনবাবু তাড়িয়ে দেন। আমি বলেছি, তুই এখানে এসেই তো থাকতে পারিস!

মহেশ : নিশ্চয়ই। তুমি আমার মেয়ের মতন, তুমি এসে থাকলে আমরা বড় খুশি হব!

রত্নাবলী: আমি তো যখন খুশি এসে থাকতেই পারি...শুধু উমা মাসির জন্য

মহেশ : প্রভু এখানে আছেন...উমা মাসিকেও এখানে নিয়ে এসো।

রত্না : উমা মাসি আসবে না। খুব চটে আছে

সদানন্দ : উমা চটে আছে কেন?

রত্না : আজ্ঞে আপনি সন্ন্যাস ছেড়ে দিলেন বলে

সদানন্দ : সন্ন্যাস ছেড়ে দিলাম? সন্ন্যাস ছেড়ে দিলাম মানে?

রত্না : সন্ন্যাস ছেড়ে দিয়ে চলে আসেননি আপনি?

সদানন্দ : বিপিন তোমাদের তাই বলেছে বুঝি?

রত্না : হ্যাঁ। তাছাড়া, সন্ন্যাস না ছাড়লে গেরস্তর বাড়ি তিনরাত্তিরের বেশি থাকছেন কী করে?

কয়েক মুহূর্ত সবাই চুপ। সদানন্দের দৃষ্টি কঠোর হয়ে ওঠে

সদানন্দ : তাই বুঝি তুমি আজ আমায় প্রণাম করলে না?

রত্না : আজ্ঞে না। আমার আজ কাউকে প্রণাম করতে নেই!

সদানন্দ : ও। আর কী বলেছে বিপিন আমার নামে?

মহেশ : প্রভু?

সদানন্দ : না মহেশ, আমায় শুনতে দাও। বলো রতন, বলো, আর কী বলেছে বিপিন?

রত্না : আর কী বলব! ও তো সবাই জানে।

সদানন্দ : তবু তুমিই বলো না, শুনি।

রত্না : আপনি জানেন না কিছু?

সদানন্দ : না জানি না। কিছু মানে কী?

রত্না : তবে তো সত্যি নয়। ওমা, আমি তো সত্যি কিনা জানতেই ছুটে এলাম! এখন দেখছি সত্যি নয়। কী কাণ্ড মা, অ্যাঁ! এমন করে বলতে পারেন বিপিনবাবু!

সদানন্দ : কী ছ্যাবলামি করছ রতন? কী সত্যি নয়? কী বলেছে বিপিন?

রত্না : আর আমি তা মুখে উচ্চারণ করতে পারব না। সত্যি যখন নয়, ছি ছি

সদানন্দ : রতন!

সেই বজ্রগম্ভীব ডাকে সবাই চমকে উঠল। রত্নাবলীর মুখ মাটির দিকে।

সদানন্দ : আমার দিকে ফিরে বসো...মুখ তুলে তাকাও...আমার চোখের দিকে...এইবার বলো

রত্না : প্রথমে আশ্রমে রটেছিল, আপনি নাকি সন্ন্যাস ছেড়ে দিয়েছেন...তারপর এই ক'দিন আগে রটেছে...আপনি মাধুকে বিয়ে করে সংসারী হতে চান...সেই জন্যই সন্ন্যাস ছেড়ে দিলেন

সবাই নির্বাক। শুধু সিধে হয়ে বসে আছেন সদানন্দ, জ্বলজ্বল করছে তাঁর চোখ। কয়েক মুহূর্ত পরে মহেশ হেসে উঠল।

মহেশ : বিয়ের কথাটা মিথ্যে নয় মা। তবে বিপিনবাবু একটু ভুল শুনেছেন। মাধুর বিয়ে হবে আমাদের বিভূতির সঙ্গে।

সকলেই তাকাল মহেশের দিকে। সদানন্দের দৃষ্টি বদলে গেল। কুঁচকে গেল ভুরু।

রত্না : সত্যি?

মহেশ : সত্যি বইকি মা, এখন একটা শুভদিন দেখে—

সদানন্দ : মহেশ?

মহেশ : প্রভু!

রত্নাবলী : তুই কী মাধু, আমায় জানাসনি কিছু!

মাধবী মহেশের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

রত্নাবলী উঠে দাঁড়িয়ে তার হাত ধরে টানল। ওরা দুজন, অন্য মহিলারাও উঠে গেল একে একে। শুধু বসে রইল সরমা।

সদানন্দ : তোমার মতিগতি কিছুই বুঝতে পারছি না মহেশ।

মহেশ : প্রভু?

সদানন্দ : আমি আমার ঘরে যাচ্ছি। একটু পরে এসে আমার সঙ্গে দেখা করো।

মহেশ আর সরমা মুখোমুখি। মহেশের মুখে মিটিমিটি হাসি।

মহেশ : তুমি কি বলবে বলো।

সরমা : খোকার বিয়ে হবে...তুমি আর মেয়ে পেলে না?

মহেশ : কেন, মাধু তো বেশ মেয়ে?

সরমা : আমার অমন ছেলে...তার জন্য একটা কুড়োনো মেয়ে? কী জাত, তার ঠিক নেই।

মহেশ : তোমার ছেলে জাত মানে না।

সরমা : ও এখন বিয়ে করবে কি না...তুমি ওর একটা মতামত নেবে না?

মহেশ : তা তো নিতেই হবে...এটা জোর করে চাপানো যাবে না, তা জানি। তবু হঠাৎ বলে ফেললাম...মাধুরও তো পছন্দ-অপছন্দ আছে. .সে যদি আমার মুখের ওপর না বলে বসত? কথাটা বলে ফেলেই আমার এমন ভয় করছিল...এই দ্যাখো, এখনও বুকটা কাঁপছে

সরমার ডান হাতটা টেনে সে তার বুকের ওপর রাখে

Cut to

Scene-84

সদানন্দের ঘর। হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে মহেশ

সদানন্দ : তবে কি বলতে চাও, ওদের দুজনের মধ্যে কোনও কথাই হয়নি?

মহেশ : আজ্ঞে না। তবে ওদের দুজনে বেশ ভাব হয়েছে, সেটা বোঝা যায়।

সদানন্দ : ভাব আর প্রণয় তো এক নয় মহেশ। দুজনে মেলামেশা করলে, ভাব হওয়াটা আশ্চর্য কী। কিন্তু বিয়ে হল আলাদা ব্যাপার। সকলের সামনে কথাটা বলার আগে ওদের একবার জিজ্ঞেস করা তো উচিত ছিল! আমার সঙ্গেও তো পরামর্শ করতে পারতে।

মহেশ : সময় পেলাম না প্রভু। আপনার নামে অমন একটা কুৎসিত কথা রটেছে শুনে মনে হল, বিয়ে যখন ওদের হবেই

সদানন্দ : বিয়ে যখন ওদের হবেই মানে?

মহেশ : আজ্ঞে, আপনার আশীর্বাদে বিয়েটা ওদের নির্বিঘ্নে হয়ে যাবে প্রভু! ছেলেটার মাথা একটু ঠান্ডা হবে, মেয়েটাও সুখী হবে।

সদানন্দ : মহেশ, তোমার ব্যাপার ভাল বুঝতে পারছি না। বিভূতির একটা বিয়ে দিতে চাও, ভাল কথা। কিন্তু মাধুর সঙ্গে বিয়ে হবে কী করে? মাধু আশ্রমে এসেছে, সংসার ভাল লাগেনি বলে। সেবা আর আধ্যাত্মিক সাধনা নিয়ে ওর জীবনটা কাটিয়ে দেবার ইচ্ছে। আমি ওকে দীক্ষা দেব, নিজে ওকে সাধনপথে চালিয়ে নিয়ে যাব। ওর বিয়ের প্রশ্নই তো উঠতে পারে না।

মহেশ : প্রভু?

সদানন্দ : তুমি বুঝতে পারছ না মহেশ, ও মেয়েটার মধ্যে খাঁটি জিনিস আছে? আমি কি সাধে ওকে বেছে নিয়েছি? একদিন ও অনেক উঁচুতে উঠে যাবে, হাজার হাজার মানুষের জীবনে সুখশান্তি এনে দেবে। এমন একটা খাঁটি জিনিস নষ্ট হতে দেওয়া যায়?

মহেশ : প্রভু?

সদানন্দ : আঃ! বলো না কী বলতে চাও!

মহেশ : বিয়ে না দিলে মেয়েটির মন শান্ত হবে না প্রভু। বিয়ের জন্য মেয়েটি ছটফট করছে।

সদানন্দ : তোমায় বলেছে নাকি, তাড়াতাড়ি আমার বিয়ে দিয়ে দিন, তাড়াতাড়ি আমার বিয়ে দিয়ে দিন!

মহেশ : আপনার তো অজানা কিছু থাকে না প্রভু! কেন মনে কষ্ট দিচ্ছেন আমার। কোনও মেয়ে অমন করে বলে না। কিন্তু মেয়েমানুষের মন কি বোঝা যায় না? রাজাসাহেবের ছেলে তো ওকে বিয়ের লোভ দেখিয়েই বার করে এনেছিল।

সদানন্দ : ছেলেমানুষ হঠাৎ একদিন মনের ভুলে কী করেছিল...

মহেশ : আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিও তো তাই বলি। নইলে নিজের ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে চাইতাম? বিয়ে করে সংসারী হবার ইচ্ছে মেয়েটির প্রবল

সদানন্দ : কিন্তু মহেশ

মহেশ : বিয়েটা হয়ে যাক, দুজনকেই আপনি দীক্ষা দিয়ে পায়ের তলায় আশ্রয় দেবেন। যেমন চান, তেমন করে গড়ে তুলবেন। ওরা তো আপনারই সন্তান প্রভু!

Cut to

Scene-85

রান্নাঘর থেকে রাগ রাগ মুখ করে বেরিয়ে আসছে বিভূতি। উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে মাধবী। বিভূতি তার মুখোমুখি পড়ে থতমত খেয়ে যায়। মাধবীর মুখে মিটিমিটি হাসি।

বিভূতি : না, না, আমি এখন কিছুতেই পারব না

মাধবী : আপনার যত তেজ বুঝি মায়ের কাছে?

বিভূতি : এই যে... বাবা কী কাণ্ডটাই করছেন.. সবাইকে বলে বেড়াচ্ছেন... এখন কী করা যায় বলুন তো!

মাধবী : সেটা আপনি ঠিক করুন।

বিভূতি : আপনারও তো একটা মতামত আছে

মাধবী : আমারটা আমি বুঝব, আপনারটা আপনি বুঝুন!

বিভূতি : কী মুশকিল, এটা তো আলাদা কিছু নয়, দুজনের ব্যাপার! আপনি হাসছেন কেন?

মাধবী : আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, কেউ আপনাকে জোর করে জলে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে!

বিভূতি : আমার অনেক কাজ...বিয়ে টিয়ের কথা ভাবিই নি

মাধবী : কাজ নিয়েই থাকুন না। বাবার কথা কি মানতেই হবে?

বিভূতি : মোটেই না...আমি বাবাকে বলে দিয়েছি...

শশধর এসে কাছে দাঁড়ায়। দুজনে তাকায় তার দিকে।

শশধর : সাধুজি একবার ডাকছেন আপনাকে

মাধবী : আমাকে? বলো গিয়ে, আমি যাব না

বিভূতি : কেন, যাবেন না কেন?

মাধবী : ওর কাছে একা একা যেতে আমার কেমন ভয় করে

বিভূতি : ভয়? ভয় আবার কীসেব?

মাধবী : যাব?

বিভূতি : হ্যাঁ, যান। শুনুন না উনি কী বলেন

Cut to

Scene-86

সদানন্দের ঘর। দবজা ঠেলে ঢুকল মাধবী।

সদানন্দ : এসো মাধু। দরজাটা বন্ধ করে দাও।

মাধবী : কেন?

সদানন্দ নিজেই উঠে এসে দরজা ও জানালা বন্ধ করে দেয়।

সদানন্দ : দু-তিনবার তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। তুমি আসোনি। আমাকে একবারে ত্যাগ করলে মাধু?

মাধবী : সব সময় লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে...

সদানন্দ মাধবীর একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে

সদানন্দ : তুই এই বিয়েতে রাজি হয়েছিস? ওই হারামজাদা ছেলেটাকে তোর পছন্দ হল? বল, বল, আমার চোখের দিকে তাকা, সত্যি করে বল, আমাকে ছেড়ে তুই...বিয়ে করবি? সংসার করবি? বল

মাধবী : ছাড়ুন, ছাড়ুন, আমার লাগছে, খুব লাগছে, আঃ আঃ

মাধবী অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়ল

Cut to

Scene-87

বিভূতির ঘর। সে ঘন ঘন সিগারেট টানছে।

Cut to

Scene-88

সদানন্দের ঘর। মেঝেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে মাধবী। সদানন্দ একটা কুঁজোর জল ছিটিয়ে দিল তার চোখেমুখে। তারপর খুলে দিল জানালা-দরজা। মাধবী ধড়মড় করে উঠে বসল।

সদানন্দ : ভয় পেয়েছিলে, তুমি যাও মাধু!

মাধবী : আপনি কী করলেন আমার?

সদানন্দ : কিছুই করিনি

মাধবী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে ছুটে বেরিয়ে গেল

Cut to

Scene-89

বিভূতির ঘর। কাঁদতে কাঁদতে ঢুকল মাধবী।

বিভূতি : এ কী? কী হয়েছে?

মাধবী : ওই লোকটা...। ওই লোকটা আমাকে অপমান করেছে

বিভূতি : অপমান করেছে মানে? কী করেছে আমাকে বলো—

মাধবী : হাত চেপে ধরেছিল... ধমকে ধমকে ভয় দেখাস

বিভূতি : ভয় দেখাল?

মাধবী : তুমি যদি এর প্রতিকার না করো—

বিভূতি : তুমি বসো, আমি আসছি

মাধবী : কী করবে? থাক, থাক, যা হবার তো হয়েই গেছে

মাধবী বিভূতির হাত চেপে ধরলেও সে হাত ছাড়িয়ে বেরিয়ে গেল

Cut to

Scene-90

সদানন্দর ঘর। দড়াম করে দরজা ঠেলে ঢুকল বিভূতি। সদানন্দ ধ্যানস্থ

বিভূতি : মাধবীর সঙ্গে এরকম ব্যবহার করার মানে?

সদানন্দ : দ্যাখো বিভূতি, তুমি ছেলেমানুষ...আমাদের সাধন প্রক্রিয়ায়

বিভূতি : নিকুচি করেছে সাধন প্রক্রিয়ার

খুব জোরে সে সদানন্দর নাকে একটা ঘুসি মারল। সদানন্দ টলে পড়ে যাচ্ছিল। বিভূতি আবার মারতে গেল তাকে। মহেশ পেছন থেকে এসে জড়িয়ে ধরল ছেলেকে।

বিভূতি : ছেড়ে দাও বাবা, বজ্জাতটাকে আমি খুন করব

মহেশ : ছিঃ বিভূতি, ছিঃ

বিভূতি : আমাকে ছিঃ বলছ! জানো, ও কী করেছে?

মহেশ : জানি।

বিভূতি : জানো?

বিভূতিকে ছেড়ে দিয়ে মহেশ সদানন্দের সেবা করতে গেল। শশধরও এসে পড়েছে। সদানন্দ চোখ বুজে রয়েছে। বিভূতি তখনও ফুঁসছে।

মহেশ : বিভূতি বাইরের রোয়াকে কাঠের বাক্সটার মধ্যে একটা হাতুড়ি আছে, নিয়ে আয় তো!

বিভূতি : হাতুড়ি দিয়ে কী করবে?

মহেশ : নিয়ে আয়, একটা কাজ আছে

বিভূতি হাতুড়িটা নিয়ে ফিরে এল

বিভূতি : তুমি মারবে? মারো, বজ্জাতটার মাথা ভেঙে দাও

সদানন্দ চোখ মেলল। তার দু'চোখে ত্রাস

মহেশ : প্রভু, আমার ছেলের হয়ে আমি আপনার কাছে মাপ চাইছি। ছেলে প্রায়শ্চিত্ত করবে না, ওকে বলা বৃথা। ছেলের হয়ে আমি প্রায়শ্চিত্ত করছি, আপনি মঞ্জুর করুন।

হাতুড়ি দিয়ে মহেশ নিজের নাকে মারল সজোরে। একেবারে রক্তারক্তি কাণ্ড

বিভূতি : বাবা!

বাড়ির সবাই ছুটে এসেছে। মহেশ কারুর সেবা নেবে না। পাশের বাড়ি থেকে ডাক্তারকে ধরে এনেছে বিভূতি। মহেশ তাকেও দেখতে দেবে না।

মহেশ : কিছু দরকার নেই, আমার কর্মভোগ আমাকে ভোগ করতে দিন!

Cut to

Scene-91

একটা রাস্তায় দশজন বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকের মাঝখানে একটু একটু ফাঁক রেখে। প্রথমে ডাক্তারটি। এরা একজন আর এক জনের দিকে ফিরে কথা বলছে।

ডাক্তার : সদানন্দ সাধুর সঙ্গে মহেশ চৌধুরির দারুন মারামারি হয়েছে! রক্তারক্তি কাণ্ড। তারপর মহেশবাবুর এমন অনুতাপ হয়েছে যে, বিনা চিকিৎসায় মরে যেতে চান।

দ্বিতীয় জন : মারামারি হল কেন? হল কেন? (অন্যজনের দিকে ফিরে) শুনেছ, সদানন্দ সাধু মহেশ চৌধুরিকে এমন মেরেছে

তৃতীয় জন : গুরুশিষ্যে ঝগড়া। রোজই নাকি এমন হয়! (অন্যজনের দিকে ফিরে) মহেশ চৌধুরি মারা গেছে!

চতুর্থ জন : এখনও মরেনি। তবে গুরু খুব পেঁদিয়েছে। (অন্যজনের দিকে ফিরে) আর ওই গুরুর কাছে যাবি?

পঞ্চম জন : আলবাৎ যাব। কত বড় সাধক, শিষ্যকে মারধোর করলেও শিষ্য তাকে ছাড়ে না। (অন্যজনের দিকে ফিরে)সদানন্দ স্বামীর গা থেকে জ্যোতি ফুটে বেরুচ্ছে তা জানিস?

ষষ্ঠ জন : আরে রাখ রাখ, গুরু মিলে লাখে লাখ চেলা মিলে এক। মহেশ চৌধুরির মতন

একটা শিষ্য খুঁজে আন তো! (অন্যদিকে ফিরে) আমি হলে ওরকম গুরুকে দূর দূর করে বাড়ি থেকে খেদিয়ে দিতাম।

সপ্তম জন : ওসব ভদ্দরলোকদের লীলাখেলা, আমরা কী বুঝব! (অন্যজনের দিকে ফিরে) বিয়েটা হচ্ছে না ভেঙে গেছে? শুনেছিস কিছু?

অষ্টম জন : মেয়েছেলেটাকে নিয়েই তো আসল ঝগড়া। সদানন্দ সাধু মহেশকে মেরেছে। বিভূতি তার শোধ নিতে সাধুকে শুইয়ে দিয়েছে! (অন্যদিকে ফিরে) বিয়ে হবে না, ওই বিয়ে হবে না!

নবম জন : কবে হবে! মহেশ চৌধুরির জেদ! (অন্যজনের দিকে ফিরে) গুরু-শিষ্যের ঝগড়ার সময় মেয়েটা ভেগে পড়েছে, ভেগে পড়েছে

দশম জন : নিজের চোখে দেখে এলাম মেয়েটা চান করছে পুকুরে। ও মেয়েকে দেখলে মাথা ঘুরে যায় মাইরি! (পাশের দিকে ফিরে, আর কেউ নেই যদিও) মহেশ চৌধুরি ধন্য, এমন ভক্তি দেখিনি, এখনও পা টিপে দিচ্ছে

এই সময় শোনা যায় বিয়েবাড়ির শানাই

Scene-92

ফুলশয্যার রাত। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে খাটে পা ঝুলিয়ে বসে আছে বিভূতি। সর্বাঙ্গে ফুলের সাজে সেজে ঢুকল মাধবী। বিভূতি চেয়ে আছে তো চেয়েই আছে।

মাধবী : আমরা কী কথা বলব, তা শোনার জন্য বাইরে কয়েকজন আড়ি পেতে আছে।

বিভূতি : কী বলব?

মাধবী : তা কি আমি শিখিয়ে দেব নাকি?

বিভূতি : এই সময় ঠিক কী বলতে হয় তা আমি জানব কী করে? আগে তো আর বিয়ে করিনি।

মাধবী : আমিও বুঝি আগে বিয়ে করেছি?

বিভূতি : মাঝে মাঝেই আমি ভাবছি, যদি আমাকে আবার জেলে যেতে হয়

মাধবী : ওরকম অলক্ষুণে কথা কেউ এই রাতে বলে না

বিভূতি : তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে!

মাধবী : (হাসতে হাসতে) এই তো বেশ শিখে গেছ

কাছে এসে সে বিভূতির পাশে বসে পড়ে

মাধবী : আমাকে তুমি কোনওদিন ছেড়ে যাবে না? কথা দাও

(বিভূতি গাঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তার দিকে)

Cut to

Scene-93

প্যাঁক প্যাঁক করে একঝাঁক হাঁস বেরিয়ে যাচ্ছে বাড়ি থেকে। রাখাল ছেলে গরু চরাচ্ছে মাঠে। কয়েকটা ছাগলছানা লাফালাফি করছে। নদী দিয়ে ভেসে যাচ্ছে নৌকো।

মহেশ চৌধুরির বাড়ির উঠোনে গোবর ছড়া দিচ্ছে মাধবী।

রান্নাঘরে সবমার পাশে দাঁড়িয়ে রান্না শিখছে।

সন্ধ্যাবেলা প্রদীপ জ্বেলে দিচ্ছে বারান্দায়

Cut to

Scene-94

ধ্যানে বসে আছে সদানন্দ। মাঝে মাঝে যেন অসহ্য যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছে তার মুখ। আবার চোখ দিয়ে জল ঝরছে। কখনও মাথা নাড়ছে জোরে জোরে। বিড়বিড় করে কিছু বলছে।

কিছু একটা শব্দ শুনে সে দরজা খুলে বাইরে এল। একটু দূরে, বারান্দা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে মাধবী।

সদানন্দ : মাধু, একবার শুনে যাও

মাধবী দু'দিকে মাথা নাড়ল।

সদানন্দ : একবারটি লক্ষ্মীটি

মাধবী . আমার বিয়ে হয়ে গেছে না?

সদানন্দ : জরুরি কথা আছে।

মাধবী গ্রাহ্য করল না, সোজা এগিয়ে গেল

Cut to

Scene-95

হাতে একগাদা বাসন নিয়ে পুকুরের দিকে এগিয়ে আসছে মাধবী। বাসনগুলো হাত থেকে ফেলে দিয়ে সে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

Cut to

Scene-96

বেদিতে বসে আছে সদানন্দ। ভক্ত, দর্শনার্থীদের লম্বা লাইন। ভিড় আগের থেকেও বেড়েছে। কিন্তু এখন অনেকেই সদানন্দের আগে মহেশকে প্রণাম করে। মহেশ প্রণাম নিতে চায় না। বাধা দেয়। সদানন্দের দিকে দেখিয়ে দেয়। লোকে তবু জোর করেই প্রণাম করে মহেশকে।

দৃশ্যটা ফেড আউট করে যায়।

আবার ফেড ইন করতে দেখা যায় বেদিতে বসে আছে সদানন্দ, সামনে মহেশ, অন্য আর কেউ নেই। মহেশের হাত দুটি উরুর ওপরে রাখা।

সদানন্দ : কী, কিছু বলবে?

মহেশ : না।

সদানন্দ : মাঝে মাঝে তুমি একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকো

মহেশ : আপনার ভেতরটা দেখবার চেষ্টা করি

সদানন্দ : তার জন্য দিব্যদৃষ্টি লাগে। তা কি তোমার আছে?

মহেশ : প্রভু!

সদানন্দ : আমার ভেতরটা...এক একসময় নিজেই বুঝি না।

মহেশ : আর বুঝি এগোতে পারছেন না প্রভু?

সদানন্দ : কীসের এগোতে পারছি না? কে বললে তোমাকে, এগোতে পারছি না?

মহেশ : এগোতে না পারলে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন। পিছিয়ে আসছেন কেন প্রভু? এখন পিছু হটতে শুরু করলে কি তার উপায় আছে? প্রথমটা হয়তো ভাল লাগবে, কিন্তু দু'দিন পর নিজের হাত-পা কামড়াতে ইচ্ছে হবে। এমন যন্ত্রণা পাবেন, এখন তা ভাবতেও পারবেন না।

সদানন্দ : তুমি আমাকে উপদেশ দিচ্ছ মহেশ?

মহেশ : আজ্ঞে না, ছি ছি, আমি অতি সামান্য, সে যোগ্যতাই আমার নেই। আমি শুধু আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি!

সদানন্দ : তুমি একেবারে বিনয়ের অবতার! ইদানীং তো দেখছি, লোকে তোমাকেই বেশি ভক্তি-শ্রদ্ধা করে।

মহেশ : আমি সাধারণ মানুষ। আপনি সাধক, যোগী। আপনি উচ্চ থেকে উচ্চতর মার্গে উঠে যাবেন, মানুষকে শান্তির পথ দেখাবেন...হঠাৎ পিছুটানে থমকে পড়া আপনাকে মানায় না প্রভু!

সদানন্দ : আবার উপদেশ!

Cut to

Scene-97

ঘরে প্রদীপ জ্বলছে। বাইরে নিঝুম রাত। শিরদাঁড়া সোজা করে যোগাসনে বসে আছে সদানন্দ। আস্তে আস্তে সে চোখ খুলল। সেই চোখে ধকধক করছে ক্রোধ।

সদানন্দ : হে ঈশ্বর, তুমি সত্যিই আছ? যদি থেকে থাকো, তাহলে, লোকে তোমায় অন্তর্যামী বলে, তুমি নিশ্চয়ই জানো যে আমি সত্যি সত্যি তোমার অস্তিত্বে কখনও বিশ্বাস করতে পারিনি। চেষ্টা করেছি, খুঁজেছি। এখনও খুঁজে চলেছি। তোমাকে বিশ্বাস না করেও কেন তোমাকে এত ডাকছি, তা জানো না? আমি সংসার ছেড়েছিলাম কেন? ভোগ-বাসনা মেটাবার জন্য? না, মোটেই না। ওসব আমার যথেষ্ট ছিল! নারীসঙ্গ পাবার জন্য? তাও নয়। ইচ্ছে করলে আমি তাও অনেক পেতে পারতাম... চেয়েছিলাম জীবনটাকে উন্নত করতে পরিশুদ্ধ করতে...বিপন্ন দুঃখী মানুষদের কিছুটা সাহায্য করতে... এর মধ্যে কোনও কপটতা ছিল না, তবু যে আমি নিচে নেমে যাচ্ছি তা তুমি দেখছ না? আমাকে রক্ষা করার জন্য কেন তুমি পথ দেখাচ্ছ না? তাতেই তো তোমার অস্তিত্ব প্রমাণ হত। আছ? আছ? সত্যিই আছ? আমাকে বাঁচাও।

Cut to

Scene-98

মাঠ দিয়ে হেঁটে চলেছে মহেশ। বিকেল। আকাশে কালো মেঘ। ঘন ঘন বিদ্যুতের সঙ্গে মেঘের গর্জন। মহেশের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। একসময় অদূরে প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল।

একটা গাছতলায় কিছুলোক জড়ামড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। একজন হেঁকে বলল:

এক ব্যক্তি : ও কর্তা, এখন মাঠের মধ্যে হাঁটবেন না। মাথায় বাজ পড়বে যে। এখানে এসে দাঁড়ান

মহেশ কয়েক মুহূর্ত তাঁদের দিকে তাকিয়ে রইল।

মহেশ : গাছতলায় থাকলে বাজ-পড়া থেকে বাঁচা যায় না। তোমরা বরং দৌড়ে কোনও পাকা বাড়িতে যাও

আবাব সে হাঁটতে লাগল । একটু বাদেই উঠল ঝড়। সেই সঙ্গে ভয়ঙ্কর বজ্রপাতের শব্দ। তবু মহেশ হাঁটা থামাল না। যেন সে আকাশের দেবতাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে।

Cut to

Scene-99

বিপিনের আশ্রমে যখন মহেশ এসে পৌঁছোল, তখন তার সর্বাঙ্গ বৃষ্টিতে ভেজা। কিন্তু ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি। দু-একজনকে জিজ্ঞেস করে সে বিপিনের ঘরে এসে উপস্থিত হল।

বিপিন চৌকির ওপর কিছু টাকা-পয়সা ছড়িয়ে বসে আছে। মহেশকে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

বিপিন : এ কী, এ কী, একেবারে পাঁঠা-ভেজা ভিজেছেন যে! নিন নিন, ওই গামছাটা দিয়ে মাথাটা মুছে নিন। জামাটা খুলে ফেলুন। এমন ঝড়জলে কেউ বেরোয়?

মহেশ : এই ঝড়জলের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে আজ আমার একটা মহা উপকার হয়েছে। একটা রাস্তা দেখতে পেলাম।

বিপিন : সে কি মশাই, ঝড়ের সময় একেবারে দিক দিগন্ত অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। তার মধ্যে আপনি আবার কী রাস্তা দেখতে পেলেন?

(মহেশ হাসতে হাসতে মাথা মুছতে লাগল।)

মহেশ এই বুঝি আজকের প্রণামীর টাকা?

বিপিন আরে দূর দূর। আজ তো একজন ভক্তও আসেনি। অন্যদিনও. সবাই তো এখন আপনার আশ্রমেই ছুটছে। সদানন্দকে গুরুজি বানালাম আমি, আর এখন তাকে নিয়ে আপনি ফায়দা লুটছেন। আরে মশাই, আমি কি নিজের জন্য কখনও টাকাপয়সা চেয়েছি? টাকাপয়সা কি আমি চিবিয়ে খাব? এত বড় আশ্রম, অনেক লোকজন, বলতে গেলে একটা বিরাট সংসার, এটা চালাবার কত খরচ। কুমার সাহেব আর এদিককার পথ মাড়ান না। আশ্রম চালাতে গিয়ে আমি হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি।

মহেশ : আমি কি আপনার আশ্রমের ক্ষতি করতে চেয়েছি কখনও? আপনার গুরুজি কি নিজেই আমার বাড়িতে আতিথ্য নেননি?

বিপিন : তা গিয়েছিল, কিন্তু দু'দিন পরেই ওর রাগ পড়ে যেত। কিন্তু আপনি এমন আঁকড়ে ধরালেন...এখন আপনার আশ্রম তো খুব রমরমিয়ে চলছে

মহেশ : আপনি ওঁকে আবার এখানে ফিরিয়ে আনুন!

(কথাটা শুনে বিপিন হতভম্ব হয়ে গেল। তার চোয়াল ঝুলে পড়ল।)

বিপিন : অ্যাঁ? আপনি ওকে আসতে দেবেন? সদানন্দ হচ্ছে রঙের টেক্কা, ও যার কাছে থাকবে, তারই জিত। আপনি হাতের মুঠোয় পেয়েও ছেড়ে দেবেন ওকে?

মহেশ : উনি যোগী পুরুষ, আমার মতন গৃহস্থের সংসারে ওঁর পক্ষে বেশিদিন থাকা ঠিক নয়। তবে উনি নিজে থেকে গেছেন, আমি কী করে ওঁকে চলে যেতে বলি বলুন? তাই ভেবে দেখলাম, আপনার পক্ষে ওঁকে ফিরিয়ে আনাটাই সব থেকে সঙ্গত হবে।

বিপিন : আমি বললে ও আসবে কেন?

মহেশ : আমি জানি, ওখানে উনি খুব মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে রয়েছেন।

বিপিন : আমি একদিন ওকে এই আশ্রম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি

মহেশ : দুই বন্ধুতে ঝগড়া হয়েছিল। ওসব রাগ-অভিমান কি বেশিদিন থাকে? ভাল করে বুঝিয়ে বলবেন

বিপিন : তাড়িয়ে দিয়েছিলাম বটে, কিন্তু সদা আমার ছেলেবেলার বন্ধু, ওকে ছেড়ে থাকতেও কেমন কেমন লাগছে। ও আসবে? আমার এই আশ্রমে সত্যি ফিরে আসবে?

Cut to

Scene-100

আশ্রমে নিজের ঘরে ফিরে এসেছে সদানন্দ। কাঁধের ঝোলাটা নামিয়ে রাখল। তাকের ওপর কয়েকখানা ধর্মগ্রন্থ, নেড়েচেড়ে দেখল। জানালাটা খুলে তাকাল বাইরের অন্ধকারের দিকে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বিপিন। হাতে হুঁকো-কল্কে, ফুঁ দিয়ে আগুন উসকোচ্ছে। নিজে এক টান দিয়ে সেটা বাড়িয়ে দিল সদানন্দের দিকে।

সদানন্দ : এবার থেকে আমার সব কথা শুনে চলবি?

বিপিন : না।

সদানন্দ : আশ্রমের ব্যাপারে আমার কাছে কিছু গোপন করবি না?

বিপিন : করব।

সদানন্দ : আমার কোনও ইচ্ছেতে বাধা দিবি না?

বিপিন : বুঝে দেখতে হবে। উল্টোপাল্টা কিছু হলে বাধা দিতেই হবে।

সদানন্দ : সে কি, তাহলে আমাকে অত সাধাসাধি করে ফিরিয়ে আনলি কেন?

বিপিন : কারণ, এটাই তোর আসল জায়গা। এখানেই তোকে মানায়। ওই মহেশের বাড়িতে আর বেশিদিন থাকলে তোর ওপর লোকের ভক্তি চটে যেত।

সদানন্দ : তুই সব বুঝিস, তাই না? আমার জন্য একটা কাজ তোকে করতেই হবে বিপিন। কথা দে।

বিপিন : আগে শুনি।

সদানন্দ : মাধুকে আমার চাই।

বিপিন : মাধুকে তোর চাই! তার মানে? তুই...তুই

সদানন্দ : না হলে আমি চলে যাব। ঠিক চলে যাব

বিপিন : কিন্তু মাধুর যে বিয়ে হয়ে গেছে

সদানন্দ : তাতে কী?

বিপিন : তাতে কী। তাতে কী? সদা, তুই একটা পাঁঠা। আস্ত পাঁঠা! আগে বলিসনি কেন, বিয়ের আগে? মেয়েটা তোর কথায় তখন উঠত, বসত

সদানন্দ : কী জানিস বিপিন, আগে মেয়েটাকে বড় মায়া করতাম। তখন কি বুঝেছি যে এমন পাজি, শয়তান মেয়ে, তলে তলে এমন বজ্জাত! আমি ডাকলে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়...একটা রাত্তিরের জন্য ওকে শুধু আমি চাই, ব্যাস, তারপর চুলোয় যাক, যা খুশি করুক, আমার বয়ে গেল। ওর অহঙ্কারটা ভাঙতে হবে।

বিপিন : তুই যদি অন্য মেয়ে চাস

সদানন্দ : চোপ! উমা আর রতনকে পাঠাবি, ওরা ভুলিয়ে ভালিয়ে মাধুকে নিয়ে আসবে। এই ঘরে মাধুকে বসিয়ে রেখে ওরা চলে যাবে। তারপর আমি না ডাকলে কেউ আর এদিকে আসবে না।

বিপিন : উমা আর রত্না? ওরা এ কাজ করতে রাজি হবে কেন?

সদানন্দ : হবে, হবে, আমি বললেই হবে!

বিপিন : তোকে ওরা যতই ভক্তি করুক, এরকম মতলবের কথা শুনলেই ওদের মন বিগড়ে যাবে। আশ্রম ছেড়েই চলে যাবে, বাইরে গিয়ে সব জানিয়ে দেবে।

সদানন্দ : সে আমি বুঝব। তুই ব্যবস্থা কর

বিপিন : কিন্তু মহেশ বা বিভূতি যদি পুলিস ডেকে আনে?

সদানন্দ : আনে তো আনবে!

বিপিন : কী পাগলের মতো কথা বলছিস! মাথাটা একেবারে গেছে! একটা মেয়ের জন্য...

সদানন্দ : তুই বড় বোকা বিপিন! পুলিস আশ্রমের ধারে আসা মাত্র উমা, রতন আর আশ্রমের অন্য মেয়েরা মাধুকে ঘিরে বসে থাকবে, পুলিস এসে দেখবে, মাধুকে কেউ জোর করে ধরে রাখেনি। মেয়েদের সঙ্গে গল্প করছে। তবু যদি জেলে যেতে হয়, আমি যাব। সব দোষ আমি নিজের ঘাড়ে নেব, তোর কোনও ভয় নেই!

বিপিন : কিন্তু এত হাঙ্গামা করার কী দরকার?

সদানন্দ : সে তুই বুঝবি না।

Cut to

Scene-101

বিকেলের সভা। প্রচুর ভক্ত এসেছে আজ। সদানন্দের আসনের কাছে অনেক ফুল। থালাভর্তি মিষ্টি। শ্রীকণ্ঠ গান গাইছে। ঠিক যেন আগের পরিবেশ।

গান শেষ হতেই ভক্তরা একে-একে প্রণাম করতে আসে। দৃশ্যটা কোলাজের মতন। অন্য নারী-পুরুষদের আলাদা করে দেখা যাচ্ছে না, তারা আসছে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে সদানন্দের উপদেশ :

সদানন্দ : তিন মাস মাছ-মাংস আর মেয়েমানুষ ছোঁবে না, যাও।

এবার যাও...

শোন পুজোআচ্চা যা খুশি করিস, রোজ মাকে প্রণাম করবি সকালে...

গাছে যেমন রোজ জল দিতে হয়, তেমনি মনের মধ্যেও আলো বাতাস খেলাতে হয়, মনের দরজা-জানালা বন্ধ রাখবি না...

হারামজাদা, আমার পায়ে চুমো খাচ্ছিস কেন? ওঠ, ওঠ,

হঠাৎ চালাঘরটা একেবারে ফাঁকা হয়ে যায়। সদানন্দ নিজের আসনে বসে আছে, বিপিন প্রণামীর টাকা ভরছে একটা থলেতে।

সদানন্দ : উমা আর রতন গিয়েছিল?

বিপিন : হ্যাঁ, গিয়েছিল মাধুকে নেমন্তন্ন করতে। মাধু আসেনি, আর আসবে না বলেছে।

সদানন্দর মুখখানা খুনির মতো নৃশংস হয়ে ওঠে। প্রণামীর টাকা মাড়িয়ে সে হেঁটে চলে যায়।

Cut to

Scene-102

চারজন পুলিসের সিপাই হেঁটে আসছে গ্রামের রাস্তা দিয়ে। সঙ্গে একজন সাব-ইনস্পেক্টর। লোকটি বেশ লম্বা-চওড়া, তাঁর নাম বিষ্ণুপ্রসাদ। উচ্চারণে অবাঙালি টান। তারা এসে ঘিরে ফেলল মহেশের বাড়ি।

বিষ্ণুপ্রসাদ : এ বিভূতিবাবু, বিভূতিবাবু! বাহার হয়ে আসুন!

বাড়ির দরজা-জানালা খুলে গেল। অনেকেই ভিড় করে দাঁড়াল দরজায়। বিভূতি এগিয়ে গেল।

বিভূতি : কী ব্যাপার প্রসাদজি?

বিষ্ণুপ্রসাদ : আপনার সঙ্গে পুরানা দোস্তি, অনেকদিন দেখা হয় না, তাই এসে পড়লাম।

বিভূতি : তা এত সকালে? খবর দিয়ে এলেই পারতেন?

বিষ্ণুপ্রসাদ : সকালে না এলে কি চা-নাস্তা খাওয়াতেন?

বিভূতি : আসল ব্যাপারটা কী বলুন তো?

বিষ্ণুপ্রসাদ . তেমন কিছু না। আপনার বাড়ি সার্চ করব। স্রেফ নাম কা ওয়াস্তে। আবার কি ওইসব কাম-কারবার শুরু করেছেন নাকি?

বিভূতি : কিছুই শুরু করিনি।

(বিষ্ণুপ্রসাদের ইঙ্গিত পেয়ে সিপাইরা বাড়ির মধ্যে ঢুকে যায়। বিষ্ণুপ্রসাদ একটা সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেটটি বিভূতির দিকে বাড়িয়ে দেয়। বিভূতি প্রত্যাখান করে।)

বিষ্ণুপ্রসাদ : বিয়ে-শাদি করেছেন, আবার ওসব ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়ার কী দরকার? রিপোর্ট আছে, আপনার বাড়িতে আর্মস লুকিয়ে রেখেছেন।

বিভূতি . আর্মস? বাজে কথা। কে রিপোর্ট দিল আপনাকে?

বিষ্ণুপ্রসাদ : সে নাম কি আমরা ফাঁস করতে পারি? তবে এইটুকু বলতে পারি, যিনি বলেছেন, তিনি ঝুট বলবার মানুষ নন। মহাপুরুষ।

বিভূতি : মহাপুরুষ?

বিষ্ণুপ্রসাদ : মাঝে মাঝে প্রণাম করতে যাই। তো একদিন বললেন, এই এলাকায় শান্তি আছে, কেউ একজন শান্তি নষ্ট করতে চাইছে; তুমি দেখবে না প্রসাদ? আপনি নিজেই তবে বুঝুন, মহাপুরুষ যেমন একজনই আছেন, তেমন অশান্তি করার মতন মানুষ তো শুধু আপনিই আছেন! ঠিক কি না?

বিভূতি : সদানন্দ!

(বিষ্ণুপ্রসাদ হাত জোড় করে কপালে ঠেকাল)

বিষ্ণুপ্রসাদ : ঘরে আপনার নতুন বউ, এখন কী আর এসব ছেলেমানুষী পোষায়? ছাড়ুন, এসব এখন ছাড়ুন।

বিভূতি : মিথ্যে কথা। সব মিথ্যে কথা।

বিষ্ণুপ্রসাদ : তবু সাবধান হয়ে যান দাদা। বাড়িতে পুলিস আসা কি ভাল? রিপোর্ট পেলে আমাদের আসতেই হয়। ওই তো কথায় বলে না, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, আর পুলিসে ছুঁলে...একশো, কম সে কম একশো...হা-হা-হা-হা

Cut to

Scene-103

বিভূতি ঘরে ঢুকতেই সরমা ছুটে এসে তার হাত চেপে ধরেন।

সরমা : খোকা, আবার বাড়িতে পুলিস আসে কেন? তুই কী করেছিস?

বিভূতি : আমি কিছুই করিনি মা।

সরমা : তবে পুলিস এমনি এমনি আসে? তুই আবার জেলে যাবি?

বিভূতি : আমি মোটেই আর জেলে যেতে চাই না। একজন মিথ্যে মিথ্যে আমার নামে লাগিয়েছে। বাবা, দেখলে তোমার মহাপুরুষের কাণ্ড?

(একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে মহেশ। তার মুখখানা থমথমে)

মহেশ : ওর অধঃপতন হয়েছে।

বিভূতি : এঃ, ও আবার ওপরে উঠল কবে যে পতন হবে? ও লোকটা বরাবরই ভেতরে ভেতরে এমন শয়তান। সাধে কি আমি ওকে ঘুসি মেরেছিলাম!

মহেশ : ঘুসি মারলে তোমার কোনও লাভ হয় না। তাতে তোমার নিজেরই ক্ষতি হয়।

বিভূতি : ওসব কথা তুমি আমাকে আর বুঝিয়ো না। ও যদি ফের আমার পেছনে লাগতে চেষ্টা করে, আমি আর ছাড়ব না। ওর ছাল ছাড়িয়ে নেব, তারপর নুন আর লঙ্কা মাখিয়ে দেব।

সরমা খোকা!

Cut to

Scene-104

জানলার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে মহেশ। অন্ধকার। এর পরের দৃশ্যটি অনেকটা স্বপ্নের মতো। হয়তো বাস্তবে এসব কথাবার্তা হয়নি। একটা মাঠ কুয়াশায় ঢাকা, তার মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে সদানন্দ আর মহেশ। কেউ মুখোমুখি হচ্ছে না, দূরে দূরে হাঁটতে হাঁটতে পরস্পরের কথার উত্তর দিয়ে যাচ্ছে।

মহেশ : মানুষ যখন উঁচু পাহাড়-পর্বতে ওঠে, কত যত্নে, কত সাবধানে, প্রাণপণ চেষ্টায় তিল তিল করে ওঠে, সময়ও লাগে অনেক। কিন্তু মানুষ যখন পা পিছলে নিচে পড়তে থাকে, কত তাড়াতাড়ি, পড়বার সময় কোনও কষ্টও হয় না, সময়টা শুধু চোখের পলকে ফুরিয়ে যায়।

সদানন্দ : উঁচু থেকে একেবারে নিচে পড়লে চিরকালের মতন কষ্টও ফুরিয়ে যায়।

মহেশ : ফুরিয়ে যায়, না অন্যরকম কষ্ট শুরু হয়, তা কে জানে!

সদানন্দ : আমি জানি। যে সীমার মধ্যে কষ্ট, সেটাই যদি পার হয়ে গেলাম, তবে আর কষ্ট কীসের? যারা বোকা, তারাই বেঁচে থেকে রোগের জ্বালা, শোকের জ্বালা ভোগ করে। অথচ আত্মহত্যা করা অত সহজ!

মহেশ : আত্মহত্যা করা সহজ? মানুষ সব সময় আত্মরক্ষাই করতে চায়। আত্মহত্যা করা সহজ হলে মানুষের জীবনটাই আগাগোড়া বদলে যেত। আপনি চেষ্টা করে দেখুন তো, আত্মহত্যা করতে পারেন কি না?

সদানন্দ : তুমি হঠাৎ আমাকে আত্মহত্যার পরামর্শ দিতে এসেছ বুঝি?

মহেশ : মরুভূমিতে তৃষ্ণায় মরবার সময় কোনও মানুষকে যদি এক গেলাস জল আর এক তাল সোনার মধ্যে বেছে নিতে বলা হয়, তখনও সে

সদানন্দ : আমি বুঝি তাই করেছি?

মহেশ : আপনার আসল তৃষ্ণার কথা আপনি ভুলে যাচ্ছেন। তাকেই বলে পাপ।

সদানন্দ : পাপ? অনুতাপ না হলে আবার পাপ কীসের?

মহেশ . অনুতাপ হবেই। ভগবান দেন বলে নয়, লোকে বলে বলে নয়, মনের মধ্যে অনুতাপ আসবেই। যদি না মনটা একেবারে শুকিয়ে যায়

সদানন্দ : সাধারণ লোকের হতে পারে, সকলের হয় না। মনকে যদি বশ করা যায়, আফশোস হতে না দিলে কেন হবে?

মহেশ : অসাধারণ মানুষও যখন তখন সাধারণ হয়ে যেতে পারে। তখন আর মনকে বশ করতে পারে না। অনুতাপ বড় ভীষণ জিনিস, মনকে একেবারে ক্ষয় করে দেয়। যেমন ধরুন, আপনি যদি গায়ের জোরে মাধুর উপর অত্যাচার করেন

সদানন্দ : তার মানে?

মহেশ : একবার মাধুকে ধরে টানাটানি করেছিলেন কিনা, তাই কথার কথা বলছি! আপনি সাধক, আপনার তো জানা উচিত, যোগ সাধনায় নিয়ম কেন এত কঠোর। তেইশ ঘণ্টা উনষাট মিনিট তপস্যা করেও এক মিনিটের জন্য শিষ্যাকে দিয়ে গায়ের ঘামাচি মারানোর জন্য সব তপস্যা বিফল হয়ে যায়।

সদানন্দ : গায়ে ছাই মেখে যে তপস্যা? হুঁঃ। মাথায় উকুনভর্তি জটা রাখিনি। নাভি পর্যন্ত ঝোলা দাড়ি রাখিনি। তবু লোকে আমায় মানে। আমি আমিই: আমার বিচার করা তোমার দ্বারা সম্ভব নয়, মহেশ!

Cut to

Scene-105

বিভূতির শয়নকক্ষ। তার বুকে মাথা দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মাধবী। বিভূতি হাত বুলিয়ে দিচ্ছে তার মাথায়।

বিভূতি ভয় নেই, এত ভয় পাচ্ছ কেন?

মাধবী পুলিশ দেখে আমার এখন বুক কাঁপানি... এখনও শরীরটা কেমন কেমন করছে

বিভূতি বলছি তো, অত ভয়ের কিছু নেই।

মাধবী তোমায় যদি আবার জেলে নিয়ে যায়—

বিভূতি : নেবে কেন? সার্চ করে আমার বাড়িতে কিছু পায়নি। শুধু একজন আমার নামে লাগিয়েছে বলে

মাধবী : সত্যি উনি এমন কাজ করলেন?

বিভূতি : কেন, ও কি এমন কাজ করতে পারে না!

মাধবী : পারে। ও লোকটা সব পারে। ওর অসাধ্য কিছু নেই। ওর মতো ভয়ানক মানুষ...

বিভূতি : আমিও কম যাই না। ও আমার কিচ্ছু করতে পারবে না!

মাধবী : তুমি ওর সঙ্গে মারামারি করতে যাবে?

বিভূতি : দরকার হলে যেতে হবে। আবার শয়তানি করলে ওকে এমন শিক্ষা দেব

মাধবী : আমাকে জড়িয়ে ধরো, আরও শক্ত করে ধরে থাকো। তোমার কিছু হলে... আমি মরে যাব।

বিভূতি : আমার কিছু হবে না মাধবী। আমি তোমার কাছে থাকতে চাই। এই ঘর-সংসার চাই। এইসব কিছু এখন এত ভাল লাগে

মাধবী : তোমার ঘুম পেয়েছে?

বিভূতি : তুমি ঘুমোবে না?

মাধবী : এসো, আজ আমরা সারারাত জেগে থাকি...

Cut to

Scene-106

দুপুর। শশধর উঠোনে বসে একটা কাটারি দিয়ে ছোবড়া কেটে নারকোল বার করছে। মাধবী এসে তার পাশে দাঁড়াল।

মাধবী : কটা হল? এক-দুই-তিন-চার-পাঁচ

শশধর : আর দুটো বাকি আছে।

মাধবী : আর লাগবে না। আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবে? চলো না, আশ্রমটা একবার ঘুরে আসি

শশধর : আশ্রমে? সাধুবাবাকে তুমি এখনও এত ভক্তি করো, তা তো জানতুম না!

মাধবী : ভক্তি না ছাই! যাচ্ছি তার মুণ্ডুপাত করতে। আমাদের বাড়িতে পুলিস লেলিয়ে দেয়। এমন আস্পদ্দা! চলো, তোমারও রত্নাবলীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।

শশধর : কিন্তু মামাকে জিজ্ঞেস করতে হবে না? উনি কি মত দেবেন?

Cut to

Scene-107

মহেশ শুয়ে আছে পালঙ্কে। বুকের ওপর মহাভারত খোলা। মাধবী এসে তার পায়ের কাছে দাঁড়াল।

মহেশ : কিছু বলবে মা?

মাধবী : বাবা, আমি একবার আশ্রম যাব? বিকেলের মধ্যেই ফিরে আসব।

মহেশ : আশ্রমে যাবে? কার সঙ্গে যাবে?

মাধবী : শশধর নিয়ে যাবে।

মহেশ : বেশ তো। যাও। পুরনো সাথীদের দেখতে সাধ হচ্ছে বুঝি? ঘুরে এসো।

মাধবী প্রণাম জানিয়ে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য দরজা দিয়ে ঢুকল সরমা।

সরমা : তুমি ওকে ওই বাঘের গুহায় আবার যেতে দিলে?

মহেশ : বাঘের গুহা আবার কী? দিনদুপুরে

সরমা : মোটেই ওর এখন যাওয়া উচিত নয়।

মহেশ : যেতে চাইলে কি আমি না বলব! জানো তো, সেটা আমার স্বভাব নয়।

সরমা : বিভূতি বাড়িতে থাকলে কিছুতেই ওকে যেতে দিতে রাজি হত না।

মহেশ : এই তো তোমাদের দোষ। বিভূতি কী বলত, তা তুমি নিজে ভেবে নিলে কী করে?

Cut to

Scene-108

গোটা আশ্রমের দৃশ্য। রত্নাবলীর কুটিরে এসে ঢুকছে মাধবী আর শশধর। রত্নাবলী একটা কাঁথা সেলাই করছিল, ওদের দেখে খুশি হয়ে উঠল।

রত্না : ওমা, মাধু! আয়, আয়! এতদিনে আমাদের মনে পড়ল! সেদিন আশ্রমে একটা উৎসব ছিল, গুরুজি তোকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে আসতে বললেন, তুই তো এলি না।

মাধবী : উনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন বলেই সেদিন আসিনি।

রত্না : বোস, বোস। তোর বিয়ের গল্পই তো শোনা হয়নি। বরকে কেমন লাগল। আমরা তো ভাই ওসব জানি না

মাধবী : দাঁড়া, পরে এসে গল্প করব! আগে চট করে ওঁর সঙ্গে দেখাটা করে আসি। সেদিন আসিনি বলে নিশ্চয়ই খুব চটে আছেন।

রত্না : চটে আছেন, কী করে জানলি?

মাধবী : ওঁকে চিনি না আমি? শশধরকে রেখে গেলাম, ততক্ষণ গল্প কর ওর সঙ্গে।

Cut to

Scene-109

সদানন্দের মহলের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে মাধবী। মুখোমুখি বিপিনের সঙ্গে দেখা।

বিপিন কী সর্বনাশ, মাধু, তুমি এখানে?

মাধবী এমনিই এলাম। এর মধ্যে সর্বনাশের কী আছে?

বিপিন এমনিই মানে? তোমায় কে আসতে বলেছে?

মাধবী কেউ বলেনি। একবার ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

বিপিন কেন?

মাধবী আমার দরকার আছে।

বিপিন কী দরকার?

মাধবী আছে!

বিপিন : তোমার বিয়ে হয়ে গেছে, এখন তোমার কিছুতেই ওঁর সামনাসামনি যাওয়া উচিত নয়। সেটা তুমি বোঝ না? নিজের ভাল নিজে বোঝ না?

মাধবী : আপনার ভয় নেই। উনি আমার কিছু ক্ষতি করতে পারবেন না। আপনার যতসব উদ্ভট ধারণা, উনি সেরকম মানুষ নন।

বিপিন : আমার যেমন ধারণাই থাক, ওঁর সঙ্গে দেখা করা হবে না। চলো, তোমাকে বাইরে রেখে আসি

মাধবী : কেন আবার কী? আমার আশ্রমে যদি তোমায় ঢুকতে না দিই, তুমি কি গায়ের জোরে ঢুকবে?

সদানন্দের ঘরের দরজা খুলে গেল। গেরুয়া লুঙ্গি পরে। খালি গা। সে ওদের কথা শুনছে।

সদানন্দ : এসো মাধু, ভেতরে এসো। বিপিন, তুমি এখন বাইরের দরজার কাছে বসবে যাও তো, কেউ যেন আমাদের বিরক্ত না করে

বিপিন : না, না, মাধুকে এখন এখানে...

সদানন্দ এগিয়ে এসে মাধবীর হাত ধরে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। মাধবী আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে, বিপিনবাবু, ও বিপি—বোঝা যায়, সদানন্দ তার মুখ চেপে ধরেছে।

বিপিন বন্ধ দরজাটা ঠেলবার চেষ্টা করে

বিপিন : সদা, সদা, তুই কি আমাদের সকলকে না ডুবিয়ে ছাড়বি না? দরজা খুলে দে, ওকে ছেড়ে দে!

সদানন্দ : *(Off voice)* কেন ভাবছিস তুই? কিছু হবে না, তোর কোনও ভাবনা নেই। যদি হয় তোর বোকামির জন্য হবে।

বিপিন : তোর পায়ে পড়ি সদা

সদানন্দ : *(Off voice)* পায়ে পড়িস আর যাই-ই করিস, কিছু লাভ হবে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাধার মতন কেন সময় নষ্ট করছিস? একজন কেউ এসে পড়লে ভাল হবে? এই সোজা কথাটা বুঝতে পারছিস না, মাধু একা ফিরে গেলে ও কারুর কাছে কিছু বলবে না। কিন্তু অন্য কেউ জানতে পারলে, না বলে ওর উপায় থাকবে না।

বিপিন বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

সদানন্দ : (Off voice) বিপিন গেলি? বাইরে গিয়ে পাহারা দে!

বিপিন : যাচ্ছি

Cut to

Scene-110

সদানন্দের ঘরের মধ্যে। সদানন্দ মাধবীর মুখ চেপে ধরে আছে। ছটফট করে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে মাধবী। বিপিন চলে যাওয়ায় সদানন্দ মাধবীকে ছেড়ে দিল।

সদানন্দ : চ্যাঁচাবার চেষ্টা করলে তোমাকে খুন করে ফেলব!

আতঙ্কে অজ্ঞান হওয়ার মতো চোখ বুজে ঢলে পড়ে যাচ্ছিল মাধবী। সদানন্দ তাকে দু-হাতে ধরে ফেলে ঝাঁকুনি দিতে লাগল।

সদানন্দ : এই এই, ওসব ন্যাকামি করতে হবে না। চোখ মেলে তাকাও।

মাধবী আস্তে আস্তে চোখ মেলল। হেলান দিয়ে দাঁড়াল খাটে। মুখ মুছতে লাগল আঁচল দিয়ে।

মাধবী : উফ্! রাক্ষসের মতন গায়ের জোর! খুন করে ফেলবেন? অত সোজা নাকি?

সদানন্দ : দরকার হলে আমি সব পারি।

সদানন্দ মাধবীর দু-কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়াল। মাধবীর ঠোঁটে ফুটে উঠল কৌতুহলের হাসি।

সদানন্দ : আমি জানতাম, তোমাকে আসতেই হবে।

মাধবী : তাই বলে বুঝি পুলিস পাঠাতে হবে বাড়িতে?

সদানন্দ : তাতেও যদি তুমি না আসতে, তাহলে ওই বাড়িতে আমি আগুন জ্বালিয়ে দিতাম।

মাধবী : ইস্! তারপর কেউ যদি এই আশ্রমটাতেই আগুন ধরিয়ে দিত?

সদানন্দ : তাতে তুমি খুশি হতে? তুমি যদি চাও, আমি নিজেই এই আশ্রমটা পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারি।

মাধবী তীক্ষ্নস্বরে হেসে উঠল। সদানন্দ তার কোমর জড়িয়ে উঁচু করে তুলে ঘুরাতে লাগল। ঘুরল কয়েক পাক।

মাধবী হেসেই চলেছে। হঠাৎ হাসি থামিয়ে—

মাধবী : জানলা খোলা, জানলা খোলা।

Cut to

Scene-111

খানিকটা দূরে একটা দাওয়ায় বসে আছে বিপিন। একটার পর একটা বিড়ি খেয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে সদানন্দের বন্ধ দরজার দিকে। আশ্রমের কিছু লোক অবাক হয়ে দেখে যাচ্ছে তাকে। বেলা ঢলে পড়েছে। বাইরের লোক আসছে সাধুজির উপদেশ শুনতে।

রত্নাবলী এগিয়ে এল বিপিনের দিকে।

রত্নাবলী : আপনি এখানে বসে আছেন?

বিপিন : এমনিই...মানে উনি একজনকে বিশেষ উপদেশ দিচ্ছেন, আমারও একটু দরকার আছে

রত্না : একজন মানে তো মাধু? সে তো অনেকক্ষণ গেছে!

বিপিন : হেঁ হেঁ, মাধুকে উনি একটু বেশি পছন্দ করেন। তাছাড়া অনেকবার আমায় বলেছেন, বিবাহিত জীবনের কর্তব্য সম্বন্ধে উনি মাধুকে কিছু বলবেন। সেই কথাই বলছেন বোধহয়।

রত্না : এতদিন এক বাড়িতে থেকে এলেন। তখন বললেন না—

বিপিন : বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই কি উপদেশ দেওয়া যায়? অ্যাদ্দিন ইচ্ছে করেই কিছু বলেননি, আজ মাধু নিজে থেকে এসেছে

রত্না : আমরাও একটু উপদেশ শুনে আসি

বিপিন : না, না, যেও না। উনি কাউকে যেতে নিষেধ করেছেন

বিপিন বাধা দেওয়ার আগেই রত্নাবলী হনহন করে এগিয়ে গেল; দাঁড়াল দরজার সামনে। একটু ইতস্তত করে ঠেলা দিল। আশ্চর্য, দরজাটা খোলা। ভেতরের জানালাও খোলা।

খাটের ওপর বসে আছে সদানন্দ। দু'পা ঝোলানো। তার পায়ের কাছে একটা মোড়ায় বসে আছে মাধবী। সদানন্দের বদলে মাধবীই কথা বলছে। দরজাটা খুলতেই তার কথা থেমে গেল। সদানন্দ মুখ তুলে দেখল রত্নাবলীকে। তার মুখে উদার হাসি।

মাধবী : না, মানুষ ভাল। দুজনেই ভাল। তবে এক সংসারে থাকলে খটাখটি তো হবেই। বাবা আর ছেলেতে প্রায়ই...

সদানন্দ : এসো রতন!

রত্নাবলী আঁচলটা ভাল করে জড়িয়ে কুণ্ঠিতভাবে ভেতরে এসে বসল।

সদানন্দ : তুমি একা এসেছ?

রত্না : আজ্ঞে হ্যাঁ। ভাবলাম যে একবার—

সদানন্দ : দেখে আসি ওরা কী করছে? বন্ধুর জন্য ভাবনা হচ্ছিল, চাবুক মারছি, না! গায়ে ছ্যাঁকা দিচ্ছি ভেবে পাচ্ছিলে না কেমন? আশ্রম ত্যাগ করার জন্য আমি কাউকে শাস্তি দিই না রতন। যার গলায় খুশি মালা দিয়ে তুমিও যেদিন ইচ্ছে আশ্রম ছেড়ে চলে যেতে পারো। আমি কিছু বলব না!

রত্নাবলী মুখ নিচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল।

মাধবী : এবার থেকে মাঝে মাঝে আশ্রমে আসব ভাই। ওঁকে প্রণাম করে যাব।

বিপিন : (বাইরে থেকে, *off voice*) প্রভু, চালাঘরে অনেকে আপনাকে দর্শন করার জন্য অপেক্ষা করে আছে। তাদের আজ ফিরে যেতে বলব?

সদানন্দ : না, না, আমি যাচ্ছি, যাচ্ছি

সদানন্দ বেরিয়ে গেল। রত্নাবলী বেশ কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল মাধবীর মুখের দিকে।

রত্নাবলী : সত্যি করে বল তো, হঠাৎ আজ এখানে এলি কেন?

মাধবী : হঠাৎ...মাঠে এমনিই এলাম।

রত্না : এমনি এলে না তোমার মাথা! ছিঃ, ধিক তোকে। ঘরে যদি মন না বসে, তাহলে ঘরের বউ সাজতে গেলি কেন? কে তোর পায়ে ধরে সেধেছিল?

মাধবী : একজন সেধেছিল ভাই!

রত্না : হাতে কী হয়েছে?

মাধবী : হাতটা প্রায় ভেঙে যাচ্ছিল আর একটু হলে। গায়ে কী জোর মানুষটার!

রত্না : কেন, এত জোর হাত ধরল কেন?

মাধবী : রাগের চোটে, আবার কেন?

রত্না : তারপর?

মাধবী : তারপর আবার কী? আমি কটমট করে তাকাতে হাত ছেড়ে দিয়ে বকবকানি শুরু করে দিল। আর থামেই না

হাসতে হাসতে মাধবী ঢলে পড়ল রত্নাবলীর গায়ে।

Cut to

Scene-113

বিভূতির শয়নকক্ষ। মাধবী একপাশ ফিরে শুয়ে আছে। তার পিঠের দিকে বসে আছে বিভূতি। এক হাতে বই, অন্য হাতে বিড়ি।

বিভূতি : এখনও বুঝলাম না, কেন তুমি ওখানে গিয়েছিলে?

মাধবী : বললাম তো, তোমার পেছনে কেন পুলিস লেলিয়ে দেবে?

বিভূতি : সে ব্যবস্থা আমি নিজে করতাম। তার জন্য তোমাকে যেতে হবে?

মাধবী : তুমি যদি মাথা গরম করে ওর সঙ্গে মারামারি করতে, তাহলেও আবার থানা পুলিস হত।

বিভূতি : সেই জন্য তুমি আগে থেকেই গিয়ে ওর কাছে দয়া চাইবে?

মাধবী : মোটেই দয়া চাইনি!

বিভূতি : তবু তুমি ওই একটা হিংস্র, নোংরা লোকের কাছে নিজের থেকে গেলে, এটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না

মাধবী : হিংস্র? আমি ওকে ভয় করি নাকি? আমি মোটেই অবলা নই। নিজেকে রক্ষা করার শক্তি আমার কাছে।

বিভূতি : কিন্তু এতদিন তোমাকে ও অপমান করেছিল, তুমি ভয় পেয়ে ছুটে এসেছিলে আমার কাছে। আমি ওর নাকে একটা ঘুসি মেরেছিলাম, মনে নেই?

মাধবী : এখন তুমি আমার পাশে আছ, আমার মনের জোর অনেক বেড়ে গেছে

বিভূতি : ঘরে আর কেউ ছিল?

মাধবী : হ্যাঁ, ছিল রত্না, আর ইয়ে, আরও যেন কে কে...আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে, চোখ টেনে আসছে। লক্ষ্মীটি, আজ ঘুমোই?

বিভূতি বাতি নিভিয়ে দিল। ঘর একেবারে অন্ধকার। শুধু দেখা যেতে লাগল বিভূতির বিড়ির আগুন। সে ঘরে পায়চারি করতে লাগল। তারপর এক সময় বেরিয়ে গেল দরজা খুলে।

Cut to

Scene-114

বাইরে একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিভূতি। অল্প চাঁদের আলো পড়েছে তার মুখে। তার মনের মধ্যে যুদ্ধ চলছে, মুখে সেই ছাপ।

গভীর রাত। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। দূরে একটা কুকুর ডেকে উঠল।

Cut to

Scene-115

মহেশ খেতে বসেছে। তাকে পরিবেশন করছে সরমা আর মাধবী। একটা পোষা বেড়াল এক কোণে গুটিসুটি মেরে বসা। মহেশ ডাল দিয়ে ভাত মাখছে।

মহেশ : খোকা এখন খাবে না?

সরমা : তার তো পাত্তাই নেই। সারাদিন টো-টো করে কোথায় ঘুরে বেড়ায়! কাল রাত্তিরে কখন ফিরল টেরই পাইনি। বউমা, খোকা কাল রাত্তিরে খেয়েছিল?

মাধবী : না। উনি বললেন, কার বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছেন।

মহেশ : তোমার ছেলে গ্রামে গ্রামে লোক খেপিয়ে বেড়াচ্ছে। আবার একটা গোলমালে জড়িয়ে পড়বে।

সরমা : ও যে বলেছে, আর ওসবের মধ্যে যাবে না?

মহেশ : যাচ্ছে তো দেখছি। কানে খবর আসছে। নিজের চোখেও দেখেছি। ঘরে ওর মন বসছে না।

(মাথায় ঘোমটা, মাধবী পরিপূর্ণ গৃহবধূ। সে মুখ নিচু করে আছে।)

সরমা : আর একটু পোস্ত বাটা নাও

বাইরে বিভূতির গলা শোনা গেল।

বিভূতি : (*off voice*) কই, খাবার জায়গা টায়গা হয়নি? খিদেয় পেট জ্বলছে।

সরমা : বউমা, খোকার পাত পেতে দাও

মাধবী আগে একটা আসন পেতে দিল। তারপর থালা আর জলভর্তি গেলাস রাখল। বিভূতি ভেতরে এসে কারও সঙ্গে কোনও কথা না বলে খেতে শুরু করে দিল।

মহেশ : কাশেম আলির জমিটা নাকি তোরা জোর করে দখল নিয়েছিস?

বিভূতি : জমিটা যখন কাশেম আলির, তখন দখল তো নিতেই হবে। এমনি এমনি না দিলে জোর করতেও হবে।

মহেশ : মহাজন কি ছাড়বে? সে বদলা নিতে আসবে না?

বিভূতি : আসে আসুক!

মহেশ : অর্থাৎ আবার মারামারি শুরু হবেই।

বিভূতি : ভাল কথা যদি না শোনে, তাহলে মারামারি হয় হোক। মহাজনের বাপের সাধ্য নেই, ও জমি আবার কেড়ে নেবার!

মহেশ : তুমি বুঝি আবার জেলে যেতে চাও?

বিভূতি : সাধ করে কেউ জেলে যায়?

মহেশ : অমন করে লোকজনদের খেপিয়ে তুললে জেলেই তো যেতে হয় বাবা। একটা কিছু ঘটলে তোমাকেই প্রথম ধরে নিয়ে যাবে।

বিভূতি : নেয় নেবে!

সরমা : অমন অলক্ষুণে কথা বলিসনি খোকা! তুই যে কথা দিয়েছিলি

বিভূতি : মা, কথা দিয়েছিলাম। কিন্তু মানুষের প্রতি যদি অন্যায়, অবিচার হয়, জুলুম হয়, তা দেখেও আমি ঘরের কোণে লুকিয়ে বসে থাকব?

মহেশ : গরিব-দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়ানো নিশ্চয়ই উচিত কাজ। কিন্তু তাদের মারামারি করতে উসকানি দেওয়া কি ঠিক? এ হিংসার তো শেষ নেই, চলতেই থাকবে!

বিভূতি : মুখের কথা, যুক্তি-তর্কে কাজ না হলে জোর করেই অধিকার আদায় করতে হবে। বাবা, এ পৃথিবীতেই দুটো শ্রেণীর মধ্যে মারামারি আরও বহুদিন চলবে!

সরমা : ওসব কথা এখন থামাও তো। খাবার পড়ে রইল। বউমা, মাছের ঝোল নিয়ে এসো—

মাধবী মাছের ঝোলভর্তি বড় একটা বাটি নিয়ে আসছে। বেড়ালটার লেজে বুঝি একটু পা পড়ে গেল। বেড়ালটা মা-ও করে জোরে লাফিয়ে উঠতেই ভয় পেয়ে আছাড় খেয়ে পড়ে গেল মাধবী। মাছের টুকরো, ঝোল ছড়িয়ে গেল চারদিকে।

সরমা : কিছু হয়নি, কিছু হয়নি! আরও মাছ আছে।

মহেশ : বউমা, তোমার লাগেনি তো?

বিভূতি : বাড়িতে কুকুর-বেড়াল রাখা আমি একদম পছন্দ করি না।

দূর ছাই—হারামজাদা বেড়াল..

জলভর্তি গেলাসটা সে বেড়ালটার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে উঠে গেল খাওয়া ছেড়ে।

Cut to

Scene-116

মহেশ পালঙ্কে শুয়ে আছে। সরমা এক গেলাস দুধ নিয়ে এল।

সরমা : এই নাও!

মহেশ : আমার দরকার নেই।

সরমা : খেয়ে নাও। কিছুই তো খেলে না, মাঝপথে খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

মহেশ : কেন ছেলেমানুষী করছ? বলছি তো দরকার নেই।

সরমা : তুমিই ছেলেমানুষী করছ! না খেলে শরীর টেকে?

মহেশ : তুমি খেয়েছ?

সরমা : আহা-হা, কী কথাই শুনলাম! বাড়ির মেয়েরা কী খায় না খায়, তা নিয়ে পুরুষরা কখনও মাথা ঘামায়?

মহেশ উঠে বসল। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টিতে

মহেশ : সরমা, আমি না খেলে তুমি কষ্ট পাও। আমি এমন একটা কথা বলব, যা শুনলে তুমি অনেক বেশি কষ্ট পাবে... ক'দিন ধরেই ভাবছি কথাটা, আজ মন ঠিক করে ফেললাম। বিভূতিকে আর এখানে রাখা যাবে না। তাকে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলব।

সরমা : খোকা আমাদের একমাত্র সন্তান, একে তুমি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে?

মহেশ : ব্যাপারটা সেরকমই দাঁড়ায় বটে।

সরমা : সে কী দোষ করেছে জানতে পারি? ওর মতন ভাল ছেলে, সৎ ছেলে, আদর্শবাদী ছেলে এ গ্রামে আর একটাও আছে?

মহেশ : ও ভাল ছেলে, সৎ ছেলে, আদর্শবাদী ছেলে, তা সবই ঠিক। কিন্তু ওর সঙ্গে আমার মতের কোনও মিল নেই। দিন দিন পার্থক্যটা আরও বাড়ছে। এক বাড়িতে থাকলে আরও সঙ্ঘর্ষ হবে!

সরমা : বাবা ছেলেতে কথাকাটাকাটি সব বাড়িতেই হয়। ছেলে বড় হয়েছে, তার নিজস্ব মতামত থাকবে না? সব তোমার সঙ্গে মিলতেই হবে? ওর একটু মাথা গরম

মহেশ : মতের অমিল থাকতে পারে। কিন্তু অশ্রদ্ধা থাকবে কেন? নাঃ, ওর এ বাড়িতে থাকা চলবে না।

সরমা : ঠিক আছে, তাড়িয়ে দাও! আজই, এক্ষুনি বলে দাও!

মহেশ : দিতাম। কিন্তু অন্য একটা কথাও ভাবছি। বিভূতি তো শুধু আমার একার ছেলে নয়, তোমারও ছেলে। এ বাড়িতে তোমারও অধিকার আছে। তোমার মত না থাকলে...

সরমা : আজ যে পরপর নতুন কথা শুনছি! আমার ছেলে, আমার বাড়ি, আমার অধিকার! ছাই অধিকার! আমরা তো তোমাদের সেবাদাসী। যা হুকুম করবে, তাই মানতে হবে।

মহেশ : আমি তো সেরকম মনে করি না।

সরমা : ওই লক্ষ্মীছাড়া সাধুটাকে যে অতদিন এ বাড়িতে রাখলে, তখন আমার মত নিয়েছিলে?

মহেশ : তখন ভুল করেছি। তা বলে বারবার ভুল হবে কেন?

সরমা : বেশ, আমার মত নেই। আমার ছেলেকে আমি এ বাড়িতেই রাখতে চাই। তাহলে তুমি কী করবে?

মহেশ : আর একটা উপায় আছে। খোকা থাকবে, আমিই বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। ছেলে আর স্বামী, এই দুজনের মধ্যে যদি তোমাকে বেছে নিতে বলা হয়

সরমা : আমি আর তখন কী করব, গলায় কলসি বেঁধে পুকুরে ডুব দেব!

মহেশ : ওটা কথার কথা। আমি জানি, ছেলের দিকেই তোমার টান বেশি।

সরমা : তা সত্যি। হ্যাঁ, সত্যি। তুমি না থাকলেও আমার কোনক্রমে দিন কেটে যাবে, কিন্তু ছেলেকে ছাড়া আমি বাঁচব না!...ছেলে বড় হয়েছে, বিয়ে-থা করেছে, সে তার ইচ্ছে মতন চলুক না। তুমি ওকে নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছ কেন? তুমি নিজের কাজ করো।

মহেশ : ছেলের জন্য দুশ্চিন্তাতেই তো আমি নিজের কাজের কথা কিছুই ভাবতে পারছি না!

Cut to

Scene-117

বিভূতির শয়নকক্ষ। দেওয়াল আয়নার সামনে চুল আঁচড়াচ্ছে মাধবী। খাটে হেলান দিয়ে বসে আছে বিভূতি। প্যান্ট-শার্ট পরা।

বিভূতি : আমি এখনও বুঝতে পারছি না, তুমি সেদিন আশ্রমে গিয়েছিলে কেন?

মাধবী : বাঃ তোমাকে বললাম যে!

বিভূতি : কী বললে?

মাধবী : কতবার বলব? বাড়িতে পুলিশ এসেছিল, সেই জন্য

বিভূতি : সেই জন্য তুমি ওই লোকটার কাছে গিয়ে কেঁদেকেটে বললে, আমার স্বামীকে বাঁচান?

মাধবী : মোটেই সে কথা বলিনি!

বিভূতি : তবে কী বলেছ?

মাধবী : বলেছি, মানে চোটপাট করে বলেছি, আপনি আমার শ্বশুরবাড়িতে পুলিস লেলিয়ে দিয়েছেন কোন সাহসে?

বিভূতি : তাতে কী বলল?

মাধবী : বললেন, পুলিস কোথায় যাবে না যাবে, তা নিয়ে কি আমি মাথা ঘামাই? এত তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ভাববার সময় আমার নেই।

বিভূতি : মিথ্যে কথা! ভণ্ড কোথাকার। ও-ই যে পুলিস পাঠিয়েছে তার আমি আরও প্রমাণ পেয়েছি। তখন ঘরে আর কেউ ছিল?

মাধবী : হ্যাঁ ছিল, আরও তিন-চারজন

বিভূতি : কতক্ষণ ছিলে?

মাধবী : এই কিছুক্ষণ।

বিভূতি : দুপুরে গিয়েছিলে, ফিরলে সন্ধের পর

মাধবী : রত্না, উমা মাসি, গিরিবালা ওরা ছাড়তেই চাইছিল না। তুমি বারবার এই সব জিজ্ঞেস করছ কেন বলো তো? তোমার কী হয়েছে?

বিভূতি চুপ করে গেল। তার সারা মুখে বেদনার আকিবুঁকি। মাধবী চুল আঁচড়ানো শেষ করল।

মাধবী : তুমি জামা-কাপড় ছাড়বে না?

বিভূতি : মাধবী, আমার কাছে এসো

মাধবী এসে একেবারে খাটের ধার ঘেঁষে দাঁড়াল। বিভূতি একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল তার মুখের দিকে।

মাধবী : ক'দিন ধরেই তোমাকে অস্থির অস্থির দেখছি।

বিভূতি : মাধবী, তুমি খুব সুন্দর। আমাকে তোমার পছন্দ হয়নি, না?

মাধবী : ওমা, এ কী কথা? আমার চেয়ে সুখী কে।

বিভূতি দু'হাতে মাধবীর কোমর জড়িয়ে ধরে মাথা গুঁজল তার বুকে। মাধবী ছোট্ট একটা হাই তুলল।

Cut to

Scene-118

এক জায়গায় যাত্রাপালার আয়োজন হয়েছে। যাত্রা এখনও শুরু হয়নি, একটু বাকি আছে। লোকজন আসছে দলে দলে। সামনে সতরঞ্চি, পেছনে তেরপল পাতা। বেশ কিছু জায়গা ভরে গেছে, সামনে কিছু কিছু খালি আছে।

একজন মাইকে বলছে: হ্যালো হ্যালো মাইক টেস্টিং, মাইক টেস্টিং...ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর

Cut to

Scene-119

মাঠের মধ্য দিয়ে দশ-বারো জনের একটি দল নিয়ে আসছে বিভূতি। তার সঙ্গীদের দেখলেই বোঝা যায় দীন-দরিদ্র, কেউ ঠেঙো ধুতি পরা, কেউ লুঙ্গি, গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জি।

বিভূতি : শোন। তোরা সবাই চাঁদা দিয়েছিস, যাত্রা দেখার অধিকার নিশ্চয়ই তোদের আছে। সামনে যদি জায়গা থাকে, সামনেই বসবি। জেঁকে বসবি, কিছুতেই আর উঠবি না।

কানাই : যদি বসতে না দেয়?

বিভূতি : আমার সঙ্গে গিয়ে বসে পড়বি। কিন্তু গালাগাল, হাতাহাতি চলবে না। শান্তভাবে বসে থাকবে।

বিশ্ব : এই নন্দপুরের লোকরা বড় টেঁটিয়া!

কানাই : যদি ওরা গালাগালি শুরু করে? যদি মারধর করতে আসে?

বিভূতি : তবু চুপ করে বসে থাকবি, কথাটি কইবি না। আমাদের ভদ্র ব্যবহারে ওরাই লজ্জা পাবে।

বিশু : ওদের কি লজ্জা-ঘেন্না আছে?

বিভূতি : ওরা যদি ছোটলোকমি করে, আমরা কেন ছোটলোক হতে যাব?

Cut to

Scene-120

একটা ছোট ঘরে বসে আছে যাত্রা-শিল্পীরা। একটি মেয়ে-সাজা ছেলে বিড়ি টানছে। তার বুকের আঁচল খসে পড়েছে। রাজা মোটা গোঁফ লাগাচ্ছে। খুলে যাচ্ছে বারবার। সেনাপতি একটা মরচে ধরা তলোয়ার ঘোরাচ্ছে বন বন করে। একজন কালো পোশাক পরে আছে জল্লাদের মতন।

জল্লাদ : (সেনাপতিকে) এই লিটো, তোর কাছে সেফটিপিন আছে, দে-তো!

সেনাপতি : নেই।

রাজা : কখন শুরু হবে? আর কত দেরি।

সেনাপতি : আগে প্রেসিডেন্টের লেকচার হবে, তবে তো!

মেয়ে-সাজা ছেলেটি নিজের বুকে হাত দিল, খসে পড়ল একটা নারকোলের মালার অর্ধেক।

সে বলল : এই মাইরি, এটা বারবার খুলে যাচ্ছে, কী করি বল তো?

Cut to

Scene-121

সামনের দিকে কিছু জায়গা খালি। বিভূতি তার দলবল নিয়ে বসে পড়ল। উদ্যোক্তাদের কয়েকজনের নজর পড়ল সেদিকে। একজনের মুখভর্তি পান। তারা এগিয়ে এল।

উদ্যোক্তা ১: এই এই, এখান থেকে ওঠ, ওঠ, এ জায়গাটা ছেড়ে দে!

বিভূতি : কেন, এ জায়গা ছাড়তে হবে কেন?

উদ্যোক্তা ২: এখানটা ভদ্দরলোকদের জন্য রিজার্ভ করা

বিভূতি : এরা সবাই চাঁদা দিয়েছে। যে আগে আসবে সে যেখানে ইচ্ছে বসবে।

উদ্যোক্তা ১: চাঁদা দিয়েছে বলে কি মাথা কিনে নিয়েছে নাকি? যত সব চাষভুষোর দল। হঠ্, হঠ্!

বিভূতি : কেন এভাবে বলছেন? ওরা কি জন্তুজানোয়ার যে হঠ্ হঠ্ করছেন?

উদ্যোক্তা ২: আপনি বসুন, চাইলে আপনার দু-একজন বন্ধুও এখানে বসতে পারে। বাকিদের ওই যে পেছনে

বিভূতি : এরা সবাই আমার বন্ধু!

উদ্যোক্তা ১: আর আমরা বুঝি তোমার শত্রু?

বিভূতি : না, না, তা বলছি না।

একজন পিচ করে অনেকখানি পানের পিক ছিটিয়ে দিল বিভূতির মুখে। জামায়। বিভূতির দৃষ্টি কঠোর হয়ে এল।

বিভূতি : এটা কী হল?

উদ্যোক্তা ১: আরে এ শালাই, চাষাভুষোদের খেপিয়ে বেড়ায় না? এখানে লিডারগিরি করতে এসেছে।

উদ্যোক্তা ২: নিজের গ্রামে গিয়ে মস্তানি করো। এই নন্দপুরে খাপ খুলতে পারবে না।

যে পানের পিক ছুঁড়েছিল, বিভূতি তার কলার চেপে ধরে মারল মুখে একটা ঘুসি। অমনি শুরু হয়ে গেল মারামারি। উসকে উঠল দু-গ্রামের পুরনো ঝগড়া। যে যাকে পাচ্ছে মারছে। বিভূতির পা ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে একজন ফেলে দিল মাটিতে। চিৎকার শোনা যেতে লাগল, মার মার, মার শালাদের ..

Cut to

Scene-122

সকাল। উঠোনে একটা মোড়ায় বসে আছে বিভূতি। তার মাথায় পেট্টি বাঁধা। গালে, বাঁহাতের কনুইতেও তুলো দেওয়া। সে চা খাচ্ছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল মহেশ। ছেলের সামনে দাঁড়াল।

মহেশ : তুমি কাল নন্দপুরে গিয়ে দাঙ্গা করে এসেছ?

বিভূতি : না। দাঙ্গা যাতে না হয় সেই চেষ্টা করেছিলাম।

মহেশ : এখনও দু-গ্রামের লোক দেখা হলেই মারামারি করছে।

বিভূতি : তার মানে মারামারির প্রবৃত্তিটা ওদের মধ্যে আগে থেকেই ছিল। যে-কোনও ছলছুতোয় সেটা লাগতই।

মহেশ : শুরুটা কি তুমি করেছিলে? সেটা আমার জানা দরকার।

বিভূতি : সেটা আসল প্রশ্ন নয়। শুরুর জন্য যে আমি দায়ী নই, সেটা জোর দিয়ে বলতে পারি।

মহেশ : এই যে এত লোকের মাথা ফাটল, হাত-পা ভাঙল, এতে লাভটা কী হল?

বিভূতি : লাভ হয়তো কিছু নেই। তবে আগামী বছর যাত্রার সময় নন্দপুরের লোকেরা চাষী-মজুরদের সঙ্গে জন্তুজানোয়ারের মতন ব্যবহার করতে বোধহয় সাহস পাবে না।

Cut to

Scene-123

মাঠের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে মহেশ আর শশধর।

শশধর : মামা, কেন ওদিক পানে যাচ্ছ? এখনও লোকজন খেপে আছে।

মহেশ : কেউ কেউ বলছে, বিভূতিই মারামারিটা শুরু করেছে। সেটা সত্যি কিনা যাচাই করা দরকার।

শশধর : বিভূতিদা ও কাজ করতেই পারে না। লোকে মিথ্যে কথা বলছে। অত ভাল ছেলে

মহেশ : ভাল ছেলে বলেই তো মুশকিল! ভালত্বটা প্রমাণ করার জন্য রক্তারক্তি করতেও পেছপা হবে না। এসব, একবার শুরু হলে যে আর থামে না। বিভূতিই শুরু করেছে, এটা প্রমাণ হলে আমি সবার সামনে ওকে শাস্তি দেব!

মাঠের প্রান্তে রাস্তা। সেখানে কয়েকটি দোকান। একটি চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে পাঁচ-সাতটি যুবক। উত্তেজিতভাবে কথা বলছে। মহেশ আর শশধর সেখানে আসতেই ওদের কথা বন্ধ হয়ে গেল।

মহেশ : বাবা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব? কাল নন্দপুরে যাত্রার আসরে ঠিক কী হয়েছিল? চতুর্দিকে এত গুজব

১ম : আমরা কিছু জানি না।

২য় : এ লোকটা কে রে? টিকটিকি নাকি?

৩য় : এ তো সেই বিভূতি হারামজাদার বাবা

৪র্থ : আমাদের পুলিসে ধরিয়ে দিতে চায়?

মহেশ : না, না, পুলিস-টুলিস কিছু নয়, আমার ছেলে

আর কেউ কিছু শুনল না, হিংস্রভাবে মহেশকে মারতে শুরু করে দিল।

Cut to

Scene-124

রাস্তা দিয়ে শশধর ছুটছে আর পাগলের মতন চিৎকার করছে।

শশধর : বাঁচাও, বাঁচাও, আমার মামাকে মেরে ফেলল! আমার মামা অতি ভালমানুষ, বাঁচাও, আমার মামা মহেশ চৌধুরি

রাস্তায় কিছু লোক জমছে। তাদের জনে জনে হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে শশধর ওই একই কথা বলছে।

Cut to

Scene-125

একদল লোক নিয়ে ফিরে এল শশধর। সব কটা দোকানের ঝাঁপ ফেলা। অন্য কেউ কোথাও নেই। শুধু রাস্তার মাঝখানে পড়ে আছে মহেশ। রক্তাপ্লুত, অজ্ঞান।

শশধর একটা গরুর গাড়ি হাত তুলে থামাল। তারপর তাতে ধরাধরি করে তোলা হল মহেশকে।

Cut to

Scene-126

খাটে শুয়ে আছে মহেশ। সারা মুখটাই প্রায় ব্যান্ডেজে ঢাকা। এক পায়ে ব্যান্ডেজ। এখনও জ্ঞান ফেরেনি। খাটের দু'পাশে বসে আছে বিভূতি আর সরমা। ক্রমে ভোর হল, দূরে ডেকে উঠল মোরগ।

Cut to

Scene-127

একই দৃশ্য। সকাল। বিভূতি মহেশের কানের কাছে মৃদুকণ্ঠে ডাকতে লাগল :

বিভূতি : বাবা, বাবা!

মহেশ চোখ মেলে তাকাল। সে এমনই মার খেয়েছে যে বাঁচবে কিনা এখনও ঠিক নেই। চোখ দুটি জলে ভরা।

বিভূতি : এখন কেমন আছ?

মহেশ : আছি, ঠিক আছি।

বিভূতি : বাবা, তোমাকে কারা মারল?

মহেশ : ওই ওরা ছিল চার-পাঁচজন।

বিভূতি : কেন মারল?

মহেশ : তোমার জন্য। পাপ করলে তুমি, তোমার বাপ বলে আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করলাম। ভালই হয়েছে।

বিভূতি : তুমি আমার বাবা. শুধু এই জন্য মারল? কে কে ছিল সেখানে?

মহেশ : তাদের নাম জেনে কী হবে? ওরা সবাই ভাল লোক। অকারণে কখনও মারত না। আমি তো কোনওদিন ওদের কোনও ক্ষতি করিনি, খারাপ কথাও বলিনি, তবু বিভূতির বাপ, বিভূতির বাপ বলতে বলতে...

সরমা : খোকা, এখন আর ওঁকে কথা বলাসনি। দেখছিস না কষ্ট হচ্ছে

বিভূতি : আমি যদি ওদের সবকটাকে তোমার মতন অবস্থা না করি, তা হলে আমি বাপের ব্যাটা নই!

মহেশ : তুমি যদি আবার ওদের পেছনে লাগতে যাও, তোমায় আমি জন্মের মতন ত্যাগ করব বলে রাখছি!

বিভূতি : তা তুমি ত্যাগ করো যাই-ই করো, তা বলে মুখ বুজে এ অন্যায় সহ্য করা

মহেশ : কীসের অন্যায়? যদি করেই থাকে অন্যায়, তোর তাতে কী? মেরেছে আমাকে, তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই!

বিভূতি : বাঃ বেশ, তোমাকে মারবে, আর আমি তোমার ছেলে হয়ে

মহেশ : তুমি ওদের পেছনে লাগবে, আর বদনাম জুটবে আমার। সবাই বলবে, আমি তোমায় দিয়ে ওদের মারিয়েছি।

বিভূতি : লোকে কী বলবে, সেই ভেবে মুখ বুজে এত বড় অন্যায় সহ্য করে যাবে? লোকের নিন্দে-প্রশংসা দিয়ে তোমার নীতি ঠিক হয়, আর কিছু নেই তার পেছনে?

সরমা : চুপ কর না খোকা! এখন এইসব আবার শুরু করলি?

বিভূতি : নিন্দে-প্রশংসা তো আমারও আছে। আমার বাপকে ধরে এমনভাবে মারল, আমি যদি চুপ করে থাকি, লোকে আমায় অপদার্থ বলবে, ভীরু, কাপুরুষ বলবে!

মহেশ : কী করবি তুই?

বিভূতি : ওদের বুঝিয়ে দেব, মারতে খালি ওরা একাই জানে না

মহেশ : তাতে লাভ কী হবে?

বিভূতি : ভবিষ্যতে আর এরকম করবে না।

মহেশ : আরও বেশি করে করবে। একবার এ পক্ষ, একবার ও পক্ষ! তার চেয়ে আমি সেরে উঠে যদি ওদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলি, ভাই বলে জড়িয়ে ধরি, ওরা কীরকম লজ্জা পাবে বল তো!

বিভূতি : ছাই পাবে! সে যুগ আর নেই। ওরা ভাববে, আবার মার খাওয়ার ভয়ে খাতির করতে এসেছ!

মহেশ : কেউ মার দিলেও মহেশ চৌধুরি কিছুতেই সে মার ফিরিয়ে দিতে চায় না। সেটা বর্বরতা। তার বদলে মহেশ চৌধুরি নিজে মরতেও রাজি আছে।

বিভূতি শশধরকে ইঙ্গিতে দরজার বাইরে ডেকে নিয়ে গেল।

বিভূতি : বাবাকে কে কে মেরেছে, তুই চিনতে পেরেছিস? চুপ করে আছিস কেন, বল!

শশধর : যোগেন, দীনু, রামনাথ, হরেন, আর নগেনের মেজমামা...

Cut to

Scene-128

নিজের ঘরের খাটে চিত হয়ে শুয়ে আছে বিভূতি। মাধবী একবার ঢুকে কিছু একটা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

বিভূতি ওপরের দিকে তাকিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছে। মাধবী আবার ঢুকল ঘরে। সে একটা আখ ছুলে ছুলে চিবোচ্ছে। স্বামীর দিকে একবার আখটা বাড়িয়ে দিল।

বিভূতি মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল।

মাধবী : বাবাকে ওরকম ভাবে মারল, পুলিস কিছু করতে পারে না?

বিভূতি : পুলিস এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না।

মাধবী : ওঁর মতন মানুষকে যারা মারে, তারা কি মানুষ না জন্তু?

বিভূতি : শুধু আমার বাবা বলেই মেরেছে।

মাধবী : ওদের শাস্তি হওয়া উচিত। দারুণ শাস্তি।

বিভূতি : হ্যাঁ, শাস্তি তো দিতেই হবে। আমি মারামারি পছন্দ করি না, কিন্তু কাপুরুষতা ঘৃণা করি।

মাধবী : অমন বাপের ছেলে হয়ে তোমাকে তো কিছু করতেই হবে!

বিভূতি : ওদের শাস্তি দিতে গেলে...ওরাও যদি উল্টে আমাকে মারতে আসে, একেবারে শেষ করে দেয়...

মাধবী : না, না, তাহলে তুমি যেও না

বিভূতি : আমি না গিয়ে গুণ্ডা পাঠাব ওদের মারবার জন্য? ওদের শাস্তি দিতে হবে, অথচ আমি লুকিয়ে থাকব তোমার আঁচলের তলায়—তাহলে তুমি সারা জীবনে আর আমাকে শ্রদ্ধা করতে পারবে?

মাধবী : কী যে বলো! তুমি আমার কাছে যেমন আছ তেমনই থাকবে।

বিভূতি : যেমন আছি তেমনই থাকব? যেমন আছি

বিভূতি উঠে বসে একটা বিড়ি ধরাতে চেষ্টা করল। মাধবী আঁচল ফেলে ব্লাউজের বোতাম ঠিক করছে, বিভূতি সেদিকে তাকাল না।

Cut to

Scene-129

যে দোকানগুলোর সামনে মহেশকে মারা হয়েছিল, সেখানে এসে উপস্থিত হল বিভূতি তার দলবল নিয়ে। কয়েকজনের হাতে লাঠিসোঁটা, বিভূতির হাত খালি, তার মাথায় এখনও ফেট্টি বাঁধা।

চায়ের দোকানটি বন্ধ। অন্য একটি দোকানের সামনে এসে বিভূতির চ্যালা কানাই জিজ্ঞেস করল—

কানাই : যোগেন কোথায়? যোগেন? আর দীনু?

দোকানদার : যোগেন, দীনু, ওদের চিনি না তো?

কানাই : চেনো না? সেদিন মহেশ চৌধুরীকে এখানে ওরা মেরেছিল, তুমি দেখনি?

দোকানদার : না দেখিনি। বিশ্বাস করো ভাইটি, সেদিন আমি দোকানে ছিলাম না।

কানাই : চায়ের দোকানটা খোলেনি কেন?

দোকানদার : জানি না। দু'দিন ধরে বন্ধ দেখছি।

বিশু এক লাফে উঠে গিয়ে দোকানদারের গলা চেপে ধরল।

বিশু : যোগেনের বাড়ি কোথায় শিগগির বলো।

দোকানদার : জানি না, সত্যি আমি জানি না।

Cut to

Scene-130

একটা বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াল এই দলটি।

কানাই : যোগেন, যোগেন।

দরজা খুলে বেরিয়ে এল একজন মাঝবয়সী লোক। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে।

লোকটি: যোগেন তো এখানে থাকে না।

কানাই : কোথায় গেছে?

লোকটি: সে তো মামার বাড়িতে থাকে। বর্ধমানে।

কানাই : যোগেনের বন্ধু দীনুর বাড়ি কোন্‌টা?

লোকটি: কে দীনু? আমি তো চিনি না বাবা

কানাই : ঠিক আছে, আমরা আবার আসব

ওরা পেছন ফিরে চলতে শুরু করল। লোকটি একটুক্ষণ চেয়ে থেকে আবার মুখ খুলল।

লোকটি: হ্যাঁগো, মহেশ চৌধুরি বেঁচে আছেন তো? অমন দেবতুল্য মানুষটা...কী সব কাণ্ড

কেউ কোনও উত্তর দিল না।

Cut to

Scene-131

গ্রামের বিভিন্ন রাস্তায়, গাছপালার আড়ালে দেখা যাচ্ছে বিভূতি আর তার দলবল খুঁজছে সেই পাঁচজনকে। কখনও ওরা দৌড়াচ্ছে, কখনও থামছে কোনও বাড়ির সামনে। কখনও ঝোপঝাড়ে লাঠি দিয়ে পিটোচ্ছে।

এক সময় অন্য দিক থেকে একটি ছেলে দৌড়ে এসে বিভূতির কানে কানে কিছু বলল।

বিভূতি : আশ্রমে? সদানন্দের আখড়ায়...

Cut to

Scene-132

চমৎকার তারাভরা আকাশ। পূর্ণিমার চাঁদ।

আশ্রমের সামনে খোলা জায়গায় বসেছে কীর্তনের আসর। পাশাপাশি দুটি চৌকি পাতা। একটিতে বসে আছে সদানন্দ। অন্যটিতে কীর্তন গায়ক ও পাখোয়াজ-তবলচিরা। সামনে সতরঞ্চিতে বসে আছে শ-দেড়েক শ্রোতা। দুটি চৌকির মাঝখানেও বসে আছে কিছু লোক। তার মধ্যে সেই পাঁচজন যুবক।

গান জমে উঠেছে খুব। গায়ক মাঝে মাঝে আখর দিচ্ছে। মগ্ন হয়ে শুনছে সবাই, কারুর কারুব চোখে জল এসে গেছে।

আসরের পেছন দিকে এসে দাঁড়াল। বিভূতি ও তাব দলবল। চোখ দিয়ে তারা অপরাধীদের খুঁজতে লাগল। সদানন্দব চৌকির পাশে বসা তাদেব দেখতেও পাওয়া গেল। একজন সঙ্গী বিভূতিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়েও দিল।

সেই পাঁচজনও বিভূতিকে দেখেছে। সদানন্দও বিভূতিকে দেখে হাতছানি দিয়ে ডাকল। বিভূতি গ্রাহ্য করল না।

ক্যামেরা একবার বিভূতিব দিক থেকে, আর একবাব সদানন্দর দিক থেকে দৃশ্যটি ধরবে।

বিভূতির সঙ্গে এখন আরও কয়েকটি নতুন জোয়ান ছেলে।

কানাই : এত লোকের মাঝখানে কিছু করা কি ঠিক হবে?

বিশু : সবাই মন দিয়ে গান শুনছে

বিভূতি : প্রথমে ডাকব, যদি আসে তো ভালই। না হলে ঘাড় ধরে টেনে আনতে হবে। ওদের শাস্তি দিতে হবে সবার সামনে।

কানাই : আসবে কি?

বিভূতি : তুমি গিয়ে ডাকো

কানাই লোকজনদের পাশ দিয়ে গিয়ে এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

কানাই : এই যে শুনুন, একটু উঠে আসুন তো।

যোগেন: উঠে আসব? কেন?

কানাই : মহেশবাবুর ছেলে বিভূতিবাবু আপনাদের একবার বাইরে ডাকছেন, বিশেষ দরকার।

যোগেন: আমাদের ডাকছে? মানে কাদের?

কানাই : এই যে আপনি, উনি, উনি, উনি আর উনি। এই পাঁচজন

যোগেন: ডাকলেই যেতে হবে? এখন যেতে পারব না।

দীনু : আমরা এখন গান শুনছি

এই সব কথাবার্তায় গায়কটি বিরক্ত হয়ে ওদের দিকে তাকাচ্ছে। কানাই ফিরে গেল। বিভূতিকে ফিসফিস করে সব জানাল।

এবার বিভূতি তার পুরো দলবল নিয়ে এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

বিভূতি : উঠে এসো, উঠে এসো তোমরা

পাঁচজনই ভয় পেয়ে গেছে। পংশুমুখে তাকাচ্ছে পরস্পররের দিকে। বিভূতির দলের লোকরা তাদের টেনে টেনে তুলতে লাগল, তারা বিশেষ বাধা দিল না।

বিপিন : চৌধুরিমশাই কেমন আছেন?

বিভূতি : ভাল না।

হাত তুলে বিভূতি গায়ককে গান থামাতে বলল। তারপর যোগেনের কলার চেপে ধরে টানতে টানতে শ্রোতাদের একেবারে সামনে নিয়ে গেল।

বিভূতি : আপনারা শুনুন, এই পাঁচটা গুন্ডা মিলে কাল সকালে আমার বাবাকে বিনা দোষে এমন মেরেছে যে তিনি বাঁচবেন কিনা ঠিক নেই। আপনাদের সকলেব সামনে আমি এদের শাস্তি দিচ্ছি, আপনারা দেখুন।

বিভূতি যোগেনের মুখে একটা ঘুসি মারল তার সঙ্গীরাও মারতে লাগল অন্য চারজনকে। ওদের আর প্রতিরোধ করারও সাহস নেই। পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে।

শ্রোতাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। মেয়েরা চিৎকাব করতে লাগল। সবাই পিছিয়ে যেতে লাগল ভয়ে।

সদানন্দ : বিভূতি, বিভূতি, থামো।

বিভূতি ভ্রূক্ষেপ কবল না। সদানন্দ নেমে এল চৌকি থেকে। বাধা দিতে গেল বিভূতিকে।

সদানন্দ : এখানে এসব কী হচ্ছে?

বিভূতি : আপনি এই গুন্ডাদের আশ্রয় দিয়েছেন? সরে যান এখান থেকে

বিভূতি এক ধাক্কা দিতেই সদানন্দ হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। তারপর উঠে দাঁড়াল আস্তে আস্তে। দু'হাত তুলে সে জনতাকে সম্বোধন করল

সদানন্দ : আমার আশ্রমে এসে একজন গুন্ডা গুন্ডামি করছে, আমায় অপমান করছে, তোমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখছ? আমাকে মারল, এ অপমান তোমবা সহ্য করবে? আমার যদি একজন ভক্তও এখানে থাকে—

এবার গর্জন করে ছুটে এল জনতা। শুরু হয়ে গেল মারামারি। একজন পেছন থেকে এসে লাঠি দিয়ে মারল বিভূতিব মাথায়, সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সদানন্দের পায়ের কাছে। তাব পবও লাঠি চালাতে লাগল তার পিঠে। কে কাকে মারছে বোঝা যাচ্ছে না। সদানন্দও মার খেল কয়েক ঘা।

এর মধ্যে শশধরের কাঁধে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে হাজির হল মহেশ।

মহেশ : ওরে রাখ, রাখ। ও বিভূতি, রাখ রাখ।

কয়েকজন মুখ ফিরিয়ে তাকাল মাত্র, গ্রাহ্য করল না। বেশ কয়েকজন হতাহত হয়ে মাটিতে লুটোচ্ছে।

এমন সময় দূরে শোনা গেল পরপর দুটো গুলির আওয়াজ। তাতেই মারামারি হঠাৎ থেমে গেল।

খোলা পিস্তল হাতে নিয়ে ছুটে আসছে দারোগা বিষ্ণুপ্রসাদ, তার সঙ্গে দু'জন সেপাই।

রণে ভঙ্গ দিয়ে সবাই ছুটে পালাল এবার।

আশ্রমের কিছু লোক ছাড়া পুরুষমানুষ আর কেউ নেই। কিছু গ্রামের মেয়ে কান্নাকাটি করছে, এই মারামারির মধ্যেও তাদের কয়েকজনের চুড়ি আর হার ছিনতাই হয়েছে।

মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে কয়েকজন। চারটি শরীর একেবারে নিস্তব্ধ।

সদানন্দ আহত হয়েছে, তার নাক দিয়ে, মুখ দিয়ে-রক্ত গড়াচ্ছে। দারোগা ছুটে এল তার কাছে।

বিষ্ণুপ্রসাদ : আরে গুরুজি, এ কী ব্যাপার? ছি ছি ছি, আপনার গায়ে হাত তুলেছে? কী নিয়ে লাগল? আমি ওই আমবাগানে একটা রেপ কেসের খবর শুনে আসামি পাকড়াতে এসেছিলাম, হঠাৎ শুনি এদিকে গোলমাল, আর চ্যাঁচামেচি

সদানন্দ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর একটু দূরে একই রকম স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মহেশ। বিপিন আর অন্যদের মুখেও কথা নেই।

বিষ্ণুপ্রসাদ : আপনারা চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছেন কী? গুরুজিকে নিয়ে যান। চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন!

সদানন্দ : আমার তেমন কিছু হয়নি, আগে অন্যদের সেবার ব্যবস্থা করো তোমরা।

কয়েকজন আহতকে ধরে ধরে তুলে নিয়ে যাওয়া হল। বিষ্ণুপ্রসাদ নিথর শরীরগুলি উল্টে উল্টে দেখতে লাগল। একটি কানাই, অন্য দুটি অচেনা। চতুর্থটি বিভূতি। মৃত

বিষ্ণুপ্রসাদ : আরে রাম রাম। এ যে বিভূতিবাবু। উনি এর মধ্যে এলেন কী করে? এ তো পলিটিক্যাল কেস নয়!

মহেশ একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল ছেলের মুখের দিকে। বিভূতির শরীরটা দুমড়ে মুচড়ে গেছে। মুখখানা পরিষ্কার।

বিষ্ণুপ্রসাদ : কে মারল বিভূতিবাবুকে? আমি ছাড়ব না। সবকটাকে ফাঁসিতে লটকাব। লাশ কেউ ছোঁবেন না। পোস্ট মর্টেম হবে। আমি থানায় গিয়ে মুদ্দোফরাস পাঠাচ্ছি—

দারোগা চলে গেল। সদানন্দকেও কয়েকজন ধরে ধরে নিয়ে গেল আশ্রমে। শশধর এক কোণে দু'হাতে মুখ চেপে নিঃশব্দে কাঁদছে। মহেশের পাশে বিপিন ছাড়া আর কেউ রইল না।

বিপিন : কী যে হয়ে গেল...চোখের নিমেষে...কে যে কাকে থামাবে

মহেশ : শশধর, বাড়িতে গিয়ে খবর দে। বাড়ির মেয়েদের নিয়ে আয়

বিপিন : এত রাত্রে... মেয়েরা আসবে? এমন সাঙ্ঘাতিক খবর...

মহেশ আস্তে আস্তে বিভূতির পাশে গিয়ে বসল। কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে হাত বুলোল ছেলের শরীরে। তারপর আকস্মিক জলপ্রপাতের মতো কেঁদে উঠল বিরাট শব্দে।

মহেশ : খোকা, খোকা, তুই এ কী করলি! আমার যে আর কেউ রইল না। খোকা, খোকা—

Cut to

Scene-133

একটা ইজিচেয়ারে বসে আছে মহেশ। মুখের ক্লোজ আপ। সেই মুখ পাথরের মতো।

মেঝেতে এক পাশ ফিরে শুয়ে আছে সরমা। চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে কিন্তু কান্নার শব্দ নেই।

মহেশ যেখানে বসে আছে সেখানেই একটা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে শশধর।

একটা জানালার কাছে ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে মাধবী।

তার বৈধব্যের বেশ। খোলা চুল। মুখের ক্লোজ আপ। শূন্য দৃষ্টি।

কেউ কান্নার শব্দ করছে না। তবু সারা বাড়িতে একটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

Cut to

Scene-134

খাটের ওপর বসে আছে সরমা। মেঝেতে মাধবী।

সরমা : ও আর বাঁচবে না। তিনদিন কিছু খায়নি। জলের গেলাসও ছুঁতে চায় না।

মাধবী : আমি পায়ে ধরে সেধেছি...

সরমা : বাঁচবে না। না বাঁচুক। বেঁচে আর কী হবে? ওর আগে আমিই যেন যেতে পারি। হে মা কালী, ওর আগেই যেন...তুই যা আমার কাছ থেকে। তোর এই বেশ আমি সহ্য করতে পারছি না। রাক্ষুসী, তোর মতন যেন আমার মাথার সিঁদুর খোয়াতে না হয়...

মাধবী সরমার পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে। সরমা নিজের কান্না সংযত করে মাধবীর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়

সরমা : আমরা দুজনেই চলে যাব। কিন্তু তোকে আরও অনেক দিন বাঁচতে হবে। তুই কী নিয়ে বাঁচবি হতভাগী।

Cut to

Scene-135

একই জায়গায় বসে আছে মহেশ। এক গেলাস লেবুর শরবত নিয়ে ঢুকল মাধবী। গেলাসটা এগিয়ে দিল।

মহেশ : কেন বারবার আনছ? আমার লাগবে না।

মাধবী : আপনি কিছুই খাবেন না? আপনি তিলে তিলে নিজেকে...

মহেশ : খাব না কেন? তেমন খিদে পেলে খেতেই হবে। না খেয়ে মানুষ কতদিন থাকতে পারে। আমার খিদে-তেষ্টা কিছুই পাচ্ছে না যে।

মাধবী : খিদে না পেলেও লেবুর শরবত খাওয়া যায়। নিন, নিন

মহেশ অনেকটা যেন বাধ্য হয়েই লেবুর শরবত খেল।

মাধবী : বাবা, আপনি কিছুই করবেন না? এই রকম চুপ করে শুধু বসে থাকবেন?

মহেশ : কী করব?

মাধবী : ওই লোকটাই যে খুন করল, তার কোনও শাস্তি হবে না?

মহেশ : সদানন্দ স্বামী?

মাধবী : হ্যাঁ, নিশ্চয়ই!

মহেশ : তুমি কী করে জানলে, তুমি তো সেখানে ছিলে না!

মাধবী : লোকের কাছে শুনেছি। আপনিও তো জানেন। ওই তো সকলকে খেপিয়ে দিল, সকলকে ডেকে খুন করতে বলল—

মহেশ : খুন করতে বলেননি, বলেছিলেন—

মাধবী : তার মানেই তো তাই। 'এ লোকটা আমায় অপমান করেছে, তোমরা চুপ করে সহ্য করবে', এ কথা বলে সবাইকে খেপিয়ে দেবার আর কী মানে হয়? সবাই এসে একজনকে মারতে আরম্ভ করল

মহেশ উনি হয়তো বিভূতিকে শুধু আসর থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্য সবাইকে ডেকেছিলেন।

মাধবী : না, না, আপনি বুঝতে পারছেন না। আশ্রমের লোকরাই তো তাড়িয়ে দিতে পারত... ওকে খুন করাই ওই লোকটার উদ্দেশ্য ছিল। পুলিস লেলিয়ে দিয়েছিল মনে নেই? ওকে জেলে পাঠালে আমার পেছনে লাগার সুবিধে হত। জেলে পাঠাতে পারল না, তাই একেবারে মেরে ফেলল।

মহেশ : বিভূতিকে তো উনি আশ্রমে ডেকে নিয়ে যাননি। বিভূতি নিজেই হাঙ্গামা করতে গিয়েছিল।

মাধবী : আমার বিয়ে হবার পর থেকেই দিনরাত ভাবত, কী করে ওকে সরানো যায়। সে দিন সুযোগ পাওয়া মাত্রই...যেই বুঝতে পারল লোকজনকে খেপিয়ে দিলেই সবাই মিলে ওকে মেরে ফেলবে, অমনি খেপিয়ে দিল

মহেশ চুপ করে রইল। মাধবী আরও কিছু বলতে গেল –

মাধবী : বাবা

মহেশ : এখন থাক মা, এসব কথা শুনতে ইচ্ছে করছে না!

Cut to

Scene-136

দু'হাঁটুতে মাথা গুঁজে বিছানার ওপর বসে আছে মহেশ। একটা খবরের কাগজ হাতে নিয়ে ঢুকল মাধবী।

মাধবী : বাবা, কাগজে কী সব লিখেছে দেখেছেন?

মহেশ হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিল অনেকটা অনিচ্ছুকভাবে। উদাসীনভাবে চোখ বোলাতে লাগল।

মাধবী : আশ্রমের কত গুণগান বেরিয়েছে। আশ্রম থেকে বলা হয়েছে, ওদের কোনওই দোষ নেই, আপনার ছেলে নাকি একদল গুন্ডা ভাড়া করে হামলা করতে গিয়েছিল, তাই ভক্তরা বাধা দিতে গিয়ে

মহেশ : গুন্ডা ভাড়া করার কথাটা মিথ্যে। আশ্রম সম্পর্কে যা লিখেছে, তা তো মিথ্যে নয়

মাধবী : আপনি এখনও এই কথা বলছেন? বাবা, আমার চোখে আর কান্না আসে না, ভেতরটা সবসময় জ্বলছে। আপনি কিছু করবেন না?

মহেশ : কিছু তো করতেই হবে। তবে কী করব তাই-ই ভাবছি।

মাধবী : আপনার কিছু করা উচিত কিনা, তাও ভাবছেন বোধহয়?

মহেশ : হ্যাঁ। তাও ভাবছি বইকি! সব কথা না ভেবে কিছু করতে আছে? সব কথা ভাবছ না বলেই সদানন্দের দোষের কথা ভেবে তুমি অস্থির হয়ে পড়েছ!

মাধবী : স্বামীজির দোষ আছে বলেই...

মহেশ : দোষ তো তোমারও থাকতে পারে মা?

মাধবী : আমার?

মহেশ : তুমি আগেও ভাবতে, সদানন্দ তোমার জন্য এমন পাগল যে বিভূতিকে খুন পর্যন্ত করতে পারে। তাই এত সহজে সদানন্দকে দোষী ভেবে নিয়ে এমন অস্থির হয়ে পড়েছ যে—একবার একটু সন্দেহও জাগেনি। তোমার কোনও দোষ না থাকলে এসব কথা ভাবতে কেন?

মাধবী : আমি...

মহেশ : তোমার কী দোষ তুমি জানো না? সেইখানেই তো মুশকিল। নিজের দোষ যদি আমরা বুঝতে পারতাম, তবে আর ভাবনা আর ছিল কী? আমিই কী আমার দোষ জানি?

Cut to

Scene-137

সদানন্দের কুটির। সদানন্দ খাটের উপর সোজা হয়ে বসা। দাঁড়িয়ে আছে বিপিন। সন্ধে রাত।

সদানন্দ : একটা ভাল দেখে উকিল জোগাড় করতে হবে।

বিপিন : সে ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

সদানন্দ : পুলিশ যাদের ধরেছে, তাদের ছাড়িয়ে আনা আমার কর্তব্য। দারোগাটাকে একবার ডেকে আনতে পারিস? তাকে আমি সব বুঝিয়ে দেব

বিপিন : তাকে তিনবার খবর পাঠানো হয়েছে, আসেনি। ও খুব বাড়াবাড়ি করছে। ধরপাকড় চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের কোনও কথা শুনছে না

সদানন্দ : না শুনুক! দারোগা কী করবে? কোর্টে এমনভাবে কেসটা সাজাতে হবে...সব দোষ চাপিয়ে দিতে হবে বিভূতি আর মহেশের নামে!

বিপিন : মহেশ? সে তো ভাল উদ্দেশ্যেই..

সদানন্দ : ওসব কথা রাখ। আমি যে এ আশ্রম ছেড়ে মহেশের বাড়িতে গিয়েছিলাম, তা ঘুণাক্ষরেও বলবি না। বলবি, মহেশ ছলছুতো করে ওর বাড়িতে আমাকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে গিয়ে জোর করে আটকে রেখেছিল। ওদের বাপ-ব্যাটার মতলব ছিল, আমাকে রেখে ওখানেই একটা আশ্রম খোলার।

বিপিন : লোকে এটা বিশ্বাস করবে?

সদানন্দ : লোকের কথা এখানে আসছে কোথা থেকে? বলবি তো আদালতে। কয়েকটা সাক্ষী তৈরি রাখতে হবে। ওদের মতলবটা যখন খাটল না, আমি জোর করে এখানে আবার চলে এলাম, তখন ওরা চক্রান্ত করল, এই আশ্রমটা ধ্বংস করে দেবে। বিভূতিটা তো একটা জেলখাটা আসামি, তার গুন্ডামির কথা আদালত সহজেই বিশ্বাস করবে। সে আরও অনেক গুন্ডা আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এই আশ্রম ভাঙতে এসেছিল। এই পবিত্র আশ্রমে কত মানুষ আসে শান্তির খোঁজে, তারা বিভূতিকে বাধা দিয়েছে...তাদের দোষ নেই...মহেশটাকেও জড়াতে হবে...ওকে এবার সরিয়ে ফেলা দরকার

Cut to

Scene-138

সদানন্দের কুটির থেকে বেরিয়ে আসছে বিপিন। হাঁটতে হাঁটতে চলে এল নদীর ধারে। সেখানে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমে চেনা যায়নি, একটু পরে বোঝা গেল, সে মহেশ।

বিপিন : কে?

মহেশ : আমি মহেশ, আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এলাম

দু'জনে কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দ হয়ে রইল।

বিপিন : কী কাণ্ড হয়ে গেল বলুন তো! আপনার একমাত্র ছেলে, তার অনেক গুণও ছিল, নতুন বিয়ে হয়েছে...এখনও ভাবতেই পারছি না

মহেশ : পুলিশ অনেককে ধরেছে শুনলাম

বিপিন : হ্যাঁ, তা ধরেছে। তবে ক্ষতি যা হবার তা তো হয়েই গেছে

মহেশ : আমার ছেলের দোষে এতগুলি লোক জেলে যাবে বিপিনবাবু?

বিপিন : না, মানে, শুধু তো আপনার ছেলের দোষ নয়। ওরাও মারামারি করেছিল

মহেশ : তা করেছিল। কিন্তু দোষ তো ওদের নয়। বিভূতি হাঙ্গামা না বাধালে কিছুই হত না।

বিপিন : দোষ তো শুধু এক পক্ষের থাকে না

মহেশ : কিছু একটা করা যায় না বিপিনবাবু?

বিপিন : কী করা যাবে বলুন!

মহেশ : যদি বিভূতির নামে সব দোষ চাপিয়ে দেওয়া যায়

বিপিন : অ্যাঁ?

মহেশ : বিভূতি আর নেই। সে সব সুনাম-দুর্নামের উর্ধ্বে। যদি আদালতে প্রমাণ করা যায় যে বিভূতিই সবকিছুর জন্য দায়ী, তাহলে এই লোকগুলি ছাড়া পেয়ে যাবে। একেবারে ছাড়া না পেলেও শাস্তি কমে যাবে

বিপিন : আদালতে কীভাবে প্রমাণ করবেন?

মহেশ : আমি সাক্ষী দেব। সব কথা খুলে বলব।

বিপিন : আপনি...আপনি সাক্ষী দেবেন? কী বলছেন মশাই?

বিপিন বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে। তারপর সে হঠাৎ মহেশের হাত চেপে ধরে।

Cut to

Scene-139

থানা। সামনে একজন রাইফেল-বেয়নটধারী পাহারাদার। ভেতরে দারোগা বিষ্ণুপ্রসাদ, একজন লোকের চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাচ্ছে।

তার মুখখানি রাগে গনগনে।

বিষ্ণুপ্রসাদ : বল, বল এখনও সত্যি কথা বল। যদি প্রাণে বাঁচতে চাস

লোকটি মুখ দিয়ে বুঁ বুঁ শব্দ করছে শুধু।

বিষ্ণুপ্রসাদ : বোবা সাজছিস শালা? তোর মতন ধড়িবাজ আমি ঢের...

এই সময় মহেশ এসে ঢুকল ভেতরে। বিষ্ণুপ্রসাদ হুঙ্কার দিয়ে উঠল

বিষ্ণুপ্রসাদ : এ লোকটা কে? ভেতরে কে আসতে দিল। দরওয়াজা, দরওয়াজা!

হঠাৎ সে চিনতে পারল মহেশকে। মহেশের খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মলিন পোশাক। মহেশকে চিনতে পেরে বিষ্ণুপ্রসাদের মুখখানা নরম হয়ে এল। লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে একজন সেপাইকে ইঙ্গিত করল ভেতরে নিয়ে যাবার জন্য।

বিষ্ণুপ্রসাদ : চৌধুরিবাবু! আসুন, আসুন, বসুন।

মহেশ : আপনাকে অসময়ে এসে বিরক্ত করলাম?

বিষ্ণুপ্রসাদ : না, না, কিছুমাত্র না। আমি তো আপনারই কাজ করছি। কী খাবেন বলুন, চা? সিগারেট?

মহেশ : আমি ওসব কিছু খাই না।

বিষ্ণুপ্রসাদ : চা-ও খান না! তারপর কী খবর বলুন, নতুন কোনও প্রমাণ পেলেন?

মহেশ উত্তর না দিয়ে দারোগার মুখের দিকে স্থির ভাবে চেয়ে রইল।

বিষ্ণুপ্রসাদ : আমি এগারোজনকে পাকড়াও করেছি। আরও তিন ব্যাটা কোথাও গাপটি মেরে আছে। ঠিক ধরে ফেলব শালাদের। দু'চারটাকে ফাঁসিতে লটকাব

মহেশ : দারোগাবাবু, আপনাকে আমি একটা কথা বলতে এসেছি

বিষ্ণুপ্রসাদ : হাঁ হাঁ, বলুন, বলুন।

মহেশ : আপনি যাদের ধরেছেন, তাদের ছেড়ে দেওয়া যায় না? যদি কেস তুলে নেওয়া হয়

বিষ্ণুপ্রসাদ : কেস তুলে নেব? কেন? ও, আপনি ভাবছেন, প্রমাণ করা যাবে না? আলবাৎ প্রমাণ করা যাবে। আমার হাতে অনেক প্রমাণ এসেছে। যাত্রার আসরে কী হয়েছিল আমি জানি। ওই লোকগুলো মারামারি করার জন্য তৈয়ার হয়েছিল...দুই গ্রামের ঝগড়া

মহেশ : ওসব তো পুরনো কথা।

বিষ্ণুপ্রসাদ : একটার থেকে আর একটা আসে। পরদিন ওই হারামাজাদাগুলো, আপনাকে, শুধু বিভূতিবাবুর বাবা বলেই বিনা দোষে, আপনাকে অমনভাবে মারল, ছি ছি ছি ছি! বিভূতিবাবু তো উচিত কাজই করেছেন। বাবার অপমানের বদলা নিতে গিয়েছিলেন। বেশ করেছেন। আমার ফাদারের গায়ে যদি কেউ হাত তোলে, আমি, আমি তার জান লিয়ে লিব!

মহেশ : দারোগাবাবু, আমি আদালতে গিয়ে বলতে চাই যে বিভূতিরই সব দোষ। সে-ই মারামারি লাগিয়েছে। এই লোকগুলিকে যেন শাস্তি দেওয়া না হয়!

বিষ্ণুপ্রসাদ : কী বললেন? দাঁড়ান, দাঁড়ান, ঠিক শুনছি তো? আপনি আদালতে গিয়ে কী বলবেন?

মহেশ : আমার ছেলের নামে দোষ স্বীকার করব!

বিষ্ণুপ্রসাদ : আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে চৌধুরিবাবু?

মহেশ : না, মাথা ঠিকই আছে। আমি অনেক ভেবেচিন্তেই এ কথা বলছি।

বিষ্ণুপ্রসাদ : না, আপনি ঠিক বলছেন না। আপনার ছেলে কী দোষ করেছে? বাবার অপমানের শোধ নিতে গিয়েছিল! পারফেক্টলি জাস্টিফায়েড! আমি আপনার ছেলেকে চিনি না? হাঁ, আমিই আগে একবার তাকে অ্যারেস্ট করে জেলে ভরেছিলাম, কিন্তু সে তো পলিটিক্যাল কেস। সেটা ছিল আমার ডিউটি। কিন্তু মানুষ হিসেবে তাকে আমি শ্রদ্ধা করি। সৎ মানুষ, নিজের জন্য কিছু চাননি। পরের উপকারের কথা ভাবতেন

মহেশ : আমার ছেলে কতখানি সৎ, নিষ্ঠাবান, নির্লোভ, আদশর্বাদী ছিল তা কি আমি জানি না? গ্রামের সবাই বলত, হীরের টুকরো ছেলে, গরিব মানুষদের বিপদে-আপদে পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে! তার তেজ, নিষ্ঠা, সাহস... গর্বে আমার বুক ভরে যায়...কিন্তু, কিন্তু

মহেশের গলা কাঁপতে থাকে। চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে জল। থানায় অন্য লোকজনরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে মহেশের কথা শোনে। মহেশ নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করে।

মহেশ : ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত এই সব বিচার করার ক্ষমতা না থাকলে ওইসব গুণও ব্যর্থ হয়ে যায়। যখন তখন মাথা গরম করলে...কী তুচ্ছ কারণে তার প্রাণটা চলে গেল...

বিষ্ণুপ্রসাদ : তাকে যারা মেরেছে, তাদের শাস্তি দিতেই হবে

মহেশ : (মাথা নাড়তে নাড়তে) না, আমি কারুর শাস্তি চাই না, আমি নিজে আদালতে গিয়ে...

বিষ্ণুপ্রসাদ : আপনি এরকম সাক্ষী দিলে তো কোনও কেসই টিকবে না।

মহেশ আস্তে আস্তে চেয়ার থেকে উঠে ফিরে যেতে লাগল। আর সকলে নির্বাক। সে দরজার কাছে গেলে বিষ্ণুপ্রসাদ তাকে ডাকল।

বিষ্ণুপ্রসাদ : চৌধুরিবাবু, একটু দাঁড়ান!

সে উঠে গিয়ে মাথা থেকে টুপিটা খুলে ফেলল। তারপর ঝুঁকে পড়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল মহেশকে।

Cut to

Scene-140

দেওয়ালে বিভূতির একটা বাঁধানো ছবি।

সেদিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে সরমা। মহেশ আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকল। সরমা একবার তাকে দেখেই মুখ ফিরিয়ে নিল।

সরমা দেশসুদ্ধ লোকের কাছে তুমি তোমার ছেলের নিন্দে করে এলে?

মহেশ কোনও উত্তর দিল না।

সরমা ছেলেটা মরে গিয়েও তোমার কাছ থেকে দয়া-মায়া-স্নেহ কিছুই পাবে না?

মহেশ তবু চুপ করে রইল।

সরমা তুমি মানুষ না পাথর?

মহেশ এগিয়ে গিয়ে সরমার কাঁধে হাত রাখতেই সে ঝট করে সরে গেল।

সরমা আমি অনেক সয়েছি, আর সইব না। এবার গলায় দড়ি দেব। তুমি থাকো এই সংসার নিয়ে...

সরমা বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে মাধবী। তারও চোখে জল।

মহেশ তুমি আমায় কিছু বলবে?

মাধবী কিছু না বলে দৌড়ে চলে গেল।

Cut to

Scene-141

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছে মহেশ। রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছে বিপিন।

Cut to

Scene-142

মহেশের বাড়ির সামনে বিপিন। দরজাব কাছে এসেও দ্বিধা করল। পেছন ফিরল। তখন দবজা খুলে বেরিয়ে এল মহেশ।

মহেশ : কী ব্যাপার, বিপিন?

বিপিন : ব্যাপার মানে...না, সেরকম কিছু না...হাঁটতে হাঁটতে কেন যেন এদিকে চলে এলাম...আপনাকে ডাকতে চাইনি

মহেশ বেরিয়ে এসে বিপিনের পাশে দাঁড়াল।

মহেশ : তোমার মনটা খুব খারাপ হয়ে আছে দেখছি।

বিপিন ক'দিন ধরে কিছুই ভাল লাগছে না।

মহেশ কেন, কী হয়েছে?

বিপিন আশ্রম নিয়ে আমি পাগল হয়ে গেলাম। চৌধুরিমশাই! যা ভেবেছিলাম, তা তো কিছুই হল না। একটার পর একটা হাঙ্গামা লেগেই আছে। কত বড় উদ্দেশ্য নিয়ে এই আশ্রমটার গোড়াপত্তন করেছিলাম, দিন দিন কী অবস্থা হচ্ছে...এত চেষ্টা করছি, কিছুতেই গোল্লায়-যাওয়া ঠেকাতে পারছি না

মহেশ বিপিনের পাশাপাশি হাঁটতে লাগল।

মহেশ কেন, তুমি তো আশ্রমের টাকা আব সম্পত্তি বাড়াবার চেষ্টা করেছিলে, তা তো বেড়েছে। নাম ছড়াবার চেষ্টা কবছিলে, তা-ও তো ছড়িয়েছে?

বিপিন কিন্তু যে উদ্দেশ্যে আশ্রম করেছিলাম, তার যে কিছুই হচ্ছে না, ববং উল্টো ফল হচ্ছে।

মহেশ : সে দোষটা তোমার!

বিপিন : আমার দোষ? আমি কী করেছি?

মহেশ তোমার উদ্দেশ্যটাই ঠিক ছিল না।

বিপিন : আমি তো মানুষের ভাল করবার জন্যই...বিশ্বাস করুন, আমি নিজের জন্য কিছু চাইনি। ক'দিন ধরে কী ভাবছি জানেন, অনবরত কথাটা মাথায় ঘুরছে, আপনাব মতন মানুষকে যদি আশ্রমে পেতাম

মহেশ : পাবে।

বিপিন আপনি আশ্রমে যোগ দেবেন? সত্যি?

মহেশ : দেব। আমি ঠিক করেছি, আশ্রমের ভারটা আমিই নেব। মন দুর্বল কিনা, তাই ভাবছিলাম, ধীরেসুস্থে ক'দিন পরে আশ্রমে যাব। কিন্তু ঠিক যখন করে ফেলেছি, অনর্থক আর দেরি করে লাভ কী বলো?

বিপিন : নিশ্চয়ই

মহেশ : চলো, তবে আজই যাই। সব কিছু ঢেলে সাজাতে হবে। শুধু কীর্তন গান আর উপদেশ দিয়ে মানুষকে ভুলিয়ে রাখলে চলবে না।

বিপিন : আপনি যা ভাল বুঝবেন... কিন্তু সদানন্দের বিষয়ে কী করা যাবে।

মহেশ : একে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিলেই চলবে

বিপিন : যদি সহজে যেতে না চায়?

মহেশ : যাবে, যাবে আমি বললেই যাবে। মাধুকেও আর এখানে রাখা চলবে না।

বিপিন মাধুকে কোথায় পাঠাবেন? ওর মামাদের কাছে?

মহেশ : মাধু আর সদানন্দ একসঙ্গেই যাবে।

Cut to

Scene-143

অনেক রাত। আশ্রমের বাইরে গাছতলায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে সদানন্দ আর মাধবী। সদানন্দের হাতে একটা বড় পুঁটলি। আকাশে চাঁদ আছে। উল্টো দিকে বিপিন আর মহেশ।

বিপিন তোর পাওনাগন্ডা মিটিয়ে দিয়েছি সদা। যেখানে ইচ্ছে চলে যা। জীবনে আর এদিককার পথ মাড়াবার চেষ্টা করিস না।

সদানন্দের মুখে তাচ্ছিল্যের ভাব। মাধবী মাথা নিচু করে আছে।

মহেশ : তোমাকে একটাই কথা মনে করিয়ে দিই সদানন্দ। রামায়ণের রাবণের প্রধান দোষ ছিল কী জানো? সে ছিল তেজি পুরুষ আর ভোগী। সীতার মতন এক পরমা সুন্দরীকে সে জোর করে হরণ করতে চেয়েছিল। সেকালের বিচারে এটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সীতা হরণের জন্য সে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ ধরেছিল কেন? সেই থেকে সে সাধুদের নামে কলঙ্ক দিয়ে গেছে। তোমার নিয়তি তোমাকে যেখানে টেনে নিয়ে যায় যাও, কিন্তু আর কখনও সাধুর ভেক ধরো না।

Cut to

Scene-144

সদানন্দ আর মাধবী অন্ধকারের মধ্যে হেঁটে গিয়ে নৌকোয় উঠল। সদানন্দ একবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল আশ্রমের দিকে।

আশ্রমের বিভিন্ন কুটিরে বিন্দু বিন্দু আলো দেখা যাচ্ছে।

নৌকোটা কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর আবার মুখ ফিরিয়ে সদানন্দ মাধবীর কাঁধে হাত রাখল।

'দেখা' চলচ্চিত্রের প্রাথমিক চিত্রনাট্য

[গলি দিয়ে হেঁটে আসছে একটি যুবতী, বয়েস বত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে। সুশ্রী, আত্মমগ্ন, মুখ ঈষৎ নিচু। সদ্য বৃষ্টি হয়ে গেছে এক পশলা, এখনও মেঘলা আকাশ। যুবতীটির নাম সুরমা, তার হাতে একটা লাল রঙা ছাতা। সময়, মধ্যাহ্ন।

একটি বাড়ির পুরোনো লোহার গেট। অর্ধেক খোলা। ভেতরে একটা শীর্ণ চেহারার বাগান, তারপর বেশ বড় একটা বাড়ি। এক কালে শৌখিন ছিল, অনেক দিন সংস্কার হয় নি। এক পাশে একটা মজা পুকুর। বাগানটি যদিও দেওয়াল দিয়ে ঘেরা, কিন্তু কোনো কোনো জায়গায় দেয়াল ভাঙা, তা দিয়ে পাড়ার লোকেরা ঢুকে পড়ে, পুকুরে স্নান করে, কাপড় কাচে, সাইকেল রিক্সা ধোয়। ছেলেরা ছিপ ফেলে মাছ ধরার চেষ্টা করে।

একজন বুড়ো দারোয়ান মাঝে মাঝে তাড়া করে তাদের। ছেলেরা মজা করে তাকে নিয়ে।

সরমা বাগান থেকে ঘুরে গেল বাড়িটার পেছন দিকে। ক্যামেরা সামনে ও পেছন থেকে তাকে অনুসরণ করছে। খুব নজর দিলে বোঝা যায়, সে সামান্য খোঁড়া। সামানাই। একটা শুকনো গোলাপ গাছের ডালে তার আঁচল আটকে যায়। সে ছাড়াতে চেষ্টা করে। সহজে ছাড়ানো যায় না। বিরক্ত হয়ে সে ডালটাই ভেঙে দেয়।

কয়েকটা সিঁড়ির পর বারান্দা। তারপর ঘর। পুরোনো আমলের বড় পাল্লা। দরজা ঠেলে ঢুকলো সরমা, ছাতাটা ছুঁড়ে দিল একটা চেয়ারে। অন্য একটা চেয়ারে বসে সে শাড়ি থেকে কাঁটা ছাড়াবার চেষ্টা করে যেতে লাগলো।

মুখ তুলে একবার ডাকলো ছেলেকে।]

সরমা : সুমন, সুমন!

[কোনো সাড়া নেই]

[কাঁটাওয়ালা ডালটা জোর করে ছাড়াতে গিয়ে ফ্যাঁস করে ছিঁড়ে গেল আঁচলের খানিকটা।]

সরমা : [মুখ তুলে, রাগের সঙ্গে] সুমন, অ্যাই সুমন!

[চেয়ার ছেড়ে উঠে সে বারান্দায় ও পাশের ঘরে খুঁজতে লাগলো সুমনকে।]

Scene 2

[বাড়ির সামনের দিকে বাগান। *কাক ছাড়া অন্য কোনো পাখির ডাক শোনা যায় না। কিছুদূরে* একটা ছাপাখানার অস্পষ্ট শব্দ।

বাড়িটার এক কোণে দোতলার ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে একজন মানুষ। বেশ স্বাস্থ্যবান, মধ্যবয়স্ক, মাথা ভর্তি অনেক চুল নুন-গোলমরিচ রঙের। ধপধপে সাদা গেঞ্জি পরা এবং ধুতি। প্রশস্ত বুক। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। এর নাম শশিভূষণ।]

Scene 3

সরমা সিঁড়ি দিয়ে উঠছে দোতলায়।

[শশিভূষণেব ঘরের দরজা খোলা। বারান্দায় শশিভূষণকে দেখা যাচ্ছে পেছন দিক থেকে।]

সরমা : শশীদা, সুমনকে দেখেছো?

শশিভূষণ : [মুখ না ফিরিয়ে] এই কাকগুলো কেন আমার কাছেই এসে ডাকাডাকি করে?

[সরমা বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। খুব কাছেই একটা গাছের ডালে একটা কাক তারস্বরে ডাকছে। সরমা কয়েকবার হুস হুস করলো। একটা নকল ঢিল ছোঁড়ার ভঙ্গি করলো। কাকটা গ্রাহ্য করে না। সরমা ঘরের ভেতর থেকে একটা ঝুল ঝাড়া আনতেই কাকটা অবজ্ঞার সঙ্গে সরে গেল খানিকটা। তাও ডাকতে লাগলো খুব জোরে।]

সরমা : আমিও কাকের ডাক সহ্য করতে পারি না।

শশিভূষণ : আগে কত রকম পাখি আসতো। কত দোয়েল পাখির শিস শুনেছি!

Scene 4

[সরমা উঠে এসেছে ছাদে।

অনেকগুলো ফুলের টব। তারমধ্যে একটি টবের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছে ন'বছরেব বালক সুমন। একটা গোলাপ গাছে শুধু দু'তিনটে কুঁড়ি, একটা কুঁড়ির দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে। হাতে একটা চকলেটের বার, ঠোঁট মাখামাখি. একটু একটু দুলছে সে। পাশে একটা খোলা বই। তাতে একটা ফোটা ফুলের ছবি।]

সরমা : এখানে কী করছিস?

সুমন : পড়ছি তো!

Scene 5

[শশিভূষণের ঘর। একটা স্ট্যাণ্ডের ওপর পুরোনো আমলের রেকর্ড প্লেয়াব। বেকর্ড ঘুরছে, কৃষ্ণচন্দ্রেব গান। আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে।

সবমা ও সুমন এসে দাঁড়ালো দরজার কাছে।

শশীব হাতে সব সময় সিগারেট। মুখ রেকর্ডের দিকে।]

শশী : ছাদে কী করছিল?

সরমা : দ্যাখো না কাণ্ড। একটা ফুলের টবের পাশে বসেছিল। কুঁড়ি থেকে কী করে ফুল ফোটে তাই দেখবে।

শশী : তোমার এ ছেলে দেখছি ডারউইন না হয়ে যায় না!

সুমন : না, আমি আলেকজাণ্ডার হবো।

সরমা : ডারউইন কে, তুই জানিস?

সুমন : আমি আলেকজাণ্ডার হবো।

শশী : (সহাস্যে) আজ সকালে কী করেছে জানো? আমাকে ঘোড়া বানিয়ে ও আমার পিঠে চেপেছে।

সুমন : টগ বগ টগ বগ!

সরমা : ওমা, কী অসভ্য ছেলে? তুমি ওকে বকো না কেন শশীদা? বড্ড লাই দাও!

শশী : ভুল তো কিছু করে নি, ও আলেকজাণ্ডার হতে চায়, আসল আলেকজাণ্ডারের প্রাইভেট টিউটর ছিলেন অ্যারিস্টটল। দুরন্ত ছেলে আলেকজাণ্ডার সেই অ্যারিস্টটলকেও ঘোড়া বানিয়ে তাঁর পিঠে চেপেছিল!

[(সুমনের দিকে ফিরে) যা শিখিয়েছিলাম মনে আছে তো? আলেকজাণ্ডার হতে গেলে বীরের সঙ্গে বীরের মতন ব্যবহার করতে হবে।]

সরমা : চল, এখন চান করিয়ে দেবো।

সুমন : না, আমি শশীদার কাছে আর একটু পড়বো।

সরমা : আবার শশীদা? বলেছি না, শশী কাকা বলে ডাকতে!

সুমন : আমার শশীদাই বলতে ভালো লাগে।

শশী : ঠিক আছে বলুক না!

Scene 6

[সিঁড়ি দিয়ে সুমনের হাত শক্ত করে ধরে টেনে টেনে নামাচ্ছে সরমা।]

Scene 7

[রেকর্ডটা থেমে গেছে। হাত বুলিয়ে বুঝে বুঝে আর একটা রেকর্ড চড়ালো শশী। পিন বদলালো। তার ঘরে টু ইন ওয়ানও রয়েছে কয়েকটা। প্রচুর ক্যাসেট। দেয়ালে অনেকগুলো ঘড়ি।

গানটা শুরু হবার পর সে প্যাকেট খুলে একটা সিগারেট নিয়ে রাখলো ঠোঁটে। লাইটারটা ধরাতে গিয়ে সেটা পড়ে গেল টেবিল থেকে। শশী সেটা হাত দিয়ে খুঁজছে, পাচ্ছে না। সে বসে পড়লো মেঝেতে। লাইটারটা পাশেই পড়ে আছে, সে দু'হাত দিয়ে খুঁজছে অন্য দিকে।

এতক্ষণে বোঝা যাবে যে সে অন্ধ।

উঠে দাঁড়িয়ে শশী সিগারেট ধরালো।

সঙ্গে সঙ্গে একটা ফ্ল্যাস ব্যাক। দুম দুম করে একটা বিগ ব্যাণ্ড বাজছে। এন সি সি বা ঐ জাতীয় পোশাক পরা দশ বারোটি ছেলে মার্চ করছে তার পেছন পেছন। পায়ে ভারী বুট, বেশ জোর আওয়াজ হচ্ছে তাদের পদক্ষেপের। ওদের মধ্যে একজন যুবক শশিভূষণ, চক্ষুষ্মান। মাত্র ১৫ সেকেণ্ডের মতন এই দৃশ্যটি।]

Scene 8

[একটা ঘরে ছাপাখানার শব্দ হচ্ছে সেখান থেকে বেরিয়ে এলো এক বৃদ্ধ। ক্ষয়ে যাওয়া চেহারা। টিনের কৌটো থেকে বিড়ি বার করে ধরালেন। এর নাম নিবারণ। তার এক হাতে একটা লাল রঙের খেরো খাতা।

দু'পা এগোতেই একটা বিড়াল তার সামনে দিয়ে চলে গেল। তিনি মুখখানা বিকৃত করলেন।]

নিবারণ : আ মলো যা!

[তিনি পিছিয়ে গিয়ে দরজার কাছে একবার বসে পড়লেন। আবার উঠে আসতে যেতেই বেড়ালটা ফিরে এলো।

আবার তিনি বিকট মুখভঙ্গি করে দরজার কাছে বসলেন।]

নিবারণ : হারামজাদা, তোর কি আর জায়গা নেই হিসি করার?

বিড়ালটি বললো, মিঁ-আ-আ-ও!

নিবারণ : পাশের বাড়িতে বিয়ে হচ্ছে। যা-না সেখানে, অনেক এঁটোকাটা পাবি।

Scene 9

[ইজিচেয়ারে বসে সিগারেটে ধোঁওয়ায় রিং ওড়াচ্ছে শশী। দরজায় কাছে নিবারণ। বারান্দায় সেই কাকটা ডেকেই চলেছে।]

নিবারণ : [গলা খাঁকারি দিয়ে] শশী, ও শশী, এ হপ্তার হিসেবটা বুঝে নেবে নাকি?

[শশী মাথা নাড়লো।]

নিবারণ : কাগজ এয়েছে সাড়ে সাত রিম অ্যান্টিক, পেমেন্ট হয় নি, দত্তর দোকানে অ্যাকাউন্ট, সামনের মাসে হিসেব চুকিয়ে দিতে হবে। তিন কৌটো রং, পুস্তনির মার্বেল পেপার দু'দিস্তে।

শশী : ঐ কাকটা কী বলতে চায় শুনে আসুন তো? কেন শুধু আমারই বারান্দায় বসে আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এত ডাকে?

[নিবারণ উঠে এলো বারান্দায়।]

নিবারণ : অ্যাই তুই কী চাস রে?

[কাকটা দু'বার কা-কা করলো।]

নিবারণ : কা-কা-কা-কা—

কাক : কা-কা-কা

নিবারণ : কা-কু-কি-কা

কাক : কা-আ

নিবারণ : বুঝেছি।

[সে ঘরে ফিরে এলো। এর মধ্যে আর একটি বিড়ি ধরিয়েছে।]

নিবারণ : তুমি অত গান-বাজনা শোনো তো সব সময়। কাকটাও গান শুনতে আসে।

শশী : কাক বুঝি এই সব গান ভালোবাসে।

নিবারণ : 'অঙ্গার শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতে'! কয়লাকে এক শো বার ধুলেও ফর্সা হয় না। তেমনি ও ব্যাটার গলায় মধু ঢেলে দিলেও কা-কা করবে। তবে বোধহয় আগের জন্মে কোকিল ছিল।

শশী : আপনি আগের জন্মে কী ছিলেন?

নিবারণ : নিশ্চয়ই অতি ধূর্ত শিয়াল। সেইজন্যই এ জন্মে বোকা হয়ে রইলাম। ঠিক উল্টো হয় তো!

শশী : পরের জন্মে কী হয়ে জন্মাবেন ঠিক করে রেখেছেন?

নিবারণ : তুমি ওসব মানো না, কিন্তু আমি মানি। কর্মফল অনুসারে জন্ম হয়। পরের জন্মে আমি মেয়ে মানুষ হবো। মেয়েদেরই তো যুগ আসছে। হাফ প্যান্টুল আর গেঞ্জি পরবো, মদ খাবো আর স্বামীকে পেটাবো, আমার পাশের বাড়িতে যা দেখি।

শশী : বাকি হিসেবটা শোনান।

নিবারণ : শুনেই বা কী করবে! দিন দিন লোকসানই তো বাড়ছে। তোমার এই প্রেসটা এবার বেচে দাও।

শশী : বাবার আমলের প্রেস, হঠাৎ বেচে দিতে যাবো কেন?

নিবারণ — সে আমল কি আর এখন আছে? লেজার প্রিন্টিং, কমপিউটারের যুগ এসে গেছে, এখন এই মান্ধাতার আমলের লেটার প্রেস কে পুঁছবে? ক্যালেণ্ডার, বিয়ের পদ্য এই সব ছাপার জন্য কিছু খদ্দের আসে, তাও তো বিয়ের পদ্যর চল উঠে যাচ্ছে। ছেলে মেয়েরা বাপ-মাকে না জানিয়ে ধেই ধেই করে রেজিস্ট্রি বিয়ে করে আসে।

শশী — যাদের যাদের কাছে পাওনা আছে আমাদের, সেগুলো আদায়ের জন্য ব্যবস্থা কী করছেন? গত মাসে দেড় লাখ টাকা আউটস্ট্যাণ্ডিং ছিল।

নিবারণ — লোক তো পাঠাচ্ছি সব জায়গায়। কিছু কিছু আসছে। সবচেয়ে ছ্যাঁচড়া তোমার ঐ ছোট পত্রিকাগুলো। পরে দাম দেব বলে ছাপা ফর্মাগুলো নিয়ে যায়, তারপর আর পাত্তা নেই। ঐ যে গণকণ্ঠ না হ্যানোকণ্ঠ ম্যাগাজিনটা, দু'সংখ্যার পেমেন্ট কমপ্লিট করে নি, এবারেও ছাপিয়েছে, টাকা না নিয়ে ডেলিভারি নিতে এসেছে। আমি দিইনি। আগে মালকড়ি ছাড়ো! এবারে আবার সম্পাদকটা নিজে আসে নি, একটা সাজ গোজ করা ছুঁড়িকে পাঠিয়ে দিয়েছে। ভেবেছে, মেয়েছেলে দেখলেই আমি গলে যাবো।

শশী — আপনি গলে যান নি, বোঝাই যাচ্ছে।

নিবারণ — এ জন্মে আমি কোনো মেয়েছেলেকে দয়া করছি না। পরের জন্মে দেখা যাবে।

শশী — মেয়েটিকে ভাগিয়ে দিয়েছেন?

নিবারণ — ভাগালেও কি যায়? নাছোড়বান্দার মতন গেড়ে বসে আছে। কাল নাকি তাদের পত্রিকার উদ্বোধন হবে হাওড়ায়। আজ চাই-ই চাই।

শশী — মেয়েটাও কবিতা লেখে নাকি?

নিবারণ — তা কে জানে?

শশী — মেয়েটিকে পাঠিয়ে দিন আমার কাছে।

Scene 10

[অনেকখানি খোলা প্রান্তর। শনশন করে বইছে হাওয়া। কয়েকটা গরু বাছুর ছুটছে, পেছন পেছন লাঠি হাতে তাড়াচ্ছে একটা বাচ্চা। মাঠের পাশে একটি সরু খাল কিংবা নদী। উঁচু পাড়। শেষ বিকেল।

একটা গাছতলায় পা ছড়িয়ে আধ শোওয়া হয়ে আছে যুবক শশিভূষণ, সে এখন সিগারেট টানছে না। সামনে বসে এক তরুণী এক মনে পড়ছে কবিতা। নিজের নয়, শশীর কবিতা, শশীভূষণ শুনতে শুনতে একটা-দুটো শব্দ শুধরে দিচ্ছে। দৃশ্যটা যেন ছবি-ছবি, ঠিক *realistic* মনে হয় না, হয়তো কখনো এমন ঘটে নি, শশীর এরকম একটা শখের কল্পনা ছিল। তরুণীটির নাম রেবা। তার চোখে চশমা।]

রেবা — এই লাইনদুটো দারুণ।

শশী — তোমার চশমায় আকাশ দেখা যাচ্ছে।

রেবা — কী করে এরকম লেখো? 'ঘুম থেকে উঠে আসে ঘুম, নদী থেকে উঠে আসে নদী...'

শশী — ধ্যুৎ, ওসব কিস্যু হয় নি। তোমার গলায় শুনতে ভালো লাগছে।

রেবা — আর একটু পড়ি?

শশী — আমার ইচ্ছে করছে তোমার কোলে মাথা দিয়ে শুতে!

[নিজেই সে সরে এসে রেবার কোলে মাথা দেয়। প্যান্টের পকেট থেকে বার করে একটা ব্র্যাণ্ডির পাঁইট। লম্বা চুমুক দেয় তাতে।

এই সময় শোনা যায় একটা সুর। সেই রাখাল ছেলেটি একটি মাটির বেহালা বাজাচ্ছে।...]

Scene 11

[শশীর ঘর। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে একটি ছিপছিপে তরুণী। সে শব্দ শঙ্খ পত্রিকার সহ সম্পাদিকা।]

শশী : কে?

তরুণী : আমি শব্দ শঙ্খ পত্রিকার পক্ষ থেকে আসছি, আপনি দেখা করতে বলেছেন।

শশী : গলার আওয়াজটা ঠিক আছে। কাছে এগিয়ে এসো, তোমাকে ছুঁয়ে দেখি, তুমি কেমন মানুষ।

[শশী তার গালে, ঠোঁটে, কাঁধে, বুকে, কোমরে হাত বুলোতে লাগলো। সেই স্পর্শে কিছুটা লোভের পরিচয় আছে।

সারা অঙ্গে ঘোরা ফেরার পর শশীর আঙুলগুলো ফিরে এলো মেয়েটির ঠোঁটে। স্পষ্ট সে আদর করছে, যেন এক্ষুনি চুমু খাবে। কোনো রকমে সামলে নিয়ে একটু সরে গেল শশী। ইজি চেয়ারে বসে পড়লো।]

শশী : বাঃ! বোসো। তোমার নাম কী?

তরুণী : রিমা। রিমা দত্ত।

শশী : রিমা? এ আবার কী ধরনের নাম?

রিমা : কেন, এ নামটায় আপনার আপত্তি আছে?

শশী : বাংলা নামের একটা মানে থাকবে না?

রিমা : মানে থাকতেই হবে? আমার নাম রাখা হয়েছিল গরিমা, তার থেকে নিজেই ছোট করে নিয়েছি।

শশী : গরিমা? তোমার ঠোঁটে গরিমা আছে ঠিকই।

রিমা : আমি আপনার অনেক কবিতা পড়েছি। এখনো মুখস্থ বলতে পারি। একবার আপনাকে একটা চিঠিও লিখেছিলাম।

শশী : [নিজের চোখের দিকে আঙুল দেখিয়ে] এর আগে না পরে?

রিমা : আমি ঠিক জানতাম না!

শশী : তোমাদের সম্পাদক নিজে না এসে তোমাকে পাঠালো কেন?

রিমা : আমি নিজেই আসতে চেয়েছি। আমি আপনার এত ভক্ত, খুব দেখার ইচ্ছে ছিল। আপনি আর লেখেন না কেন? কবি মিলটন তো অন্ধ হবার পরেও লিখতেন। আপনি আমাদের পত্রিকায় একটা কবিতা দিন।

শশী : তুমি একে তো মেয়ে, তারপর এইসব তোষামোদ করে ভেবেছো টাকার ব্যাপারটা চেপে যাবে? পত্রিকা ডেলিভারি নেবার জন্য পুরো টাকা এনেছো?

রিমা : সবটা জোগাড় করতে পারি নি। আপনি কবি, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন, লিট্‌ল ম্যাগাজিন চালাতে গেলে কত রকম অসুবিধেয় পড়তে হয়, বিজ্ঞাপন পাই না।

শশী : লিট্‌ল ম্যাগাজিন চালাতে গেলে অনেক অসুবিধে, কষ্ট, অনেক অপমান সহ্য করতে হয়। স্টলের মালিকরা পুরো পয়সা দিতে চায় না, বিজ্ঞাপন জোগাড় করতে জুতোর

শুকতলা ক্ষয়ে যায়—সবই পার্ট অফ দা গেইম। প্রেস তোমাদের বিনা পয়সায় ছেপে দেবে কেন? আমি দান ছত্তর খুলে বসিনি।

রিমা : বিনা পয়সায় তো চাই নি। আস্তে আস্তে শোধ করবো।

শশী : এর আগের দু'বারও ঐ কথা বলে শোধ করো নি!

রিমা : এবার আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি।

শশী : পয়সা কম থাকলে কথার দামও কমে যায়। সেটাই স্বাভাবিক।

রিমা : স্যার, আমি আপনার সামনে লিখে দিয়ে যাচ্ছি... ইয়ে, মানে, দেবী সরস্বতীর নামে প্রতিজ্ঞা করে বলছি।

শশী : থাক, থাক, ও সব আদিখ্যেতার দরকার নেই। টাকা জোগাড় করে আনো, পত্রিকা পাবে।

রিমা : এবারের মতন, মানে, কালই আমরা একটা কবি সম্মেলনে—

শশী : তুমি প্রেম করো কারুর সঙ্গে?

রিমা : অ্যাঁ? হ্যাঁ, করবো না কেন?

শশী : একবারও ব্যর্থ হয়েছো?

রিমা : না।

শশী : প্রেমে ব্যর্থ হয়ে কষ্ট না পেলে কবিতা লিখবে কী করে? কবিতা লেখার আগে খুব এক চোট কেঁদে নিতে হয় জানো না?

রিমা : আপনি বুঝি খুব কেঁদেছেন?

শশী : এখন আর... চোখ দিয়ে জল পড়ে না, গলার কাছে আটকে যায়। কত টাকা এনেছো?

রিমা : তিন শো।

শশী : কত টাকার বিল হয়েছে?

রিমা : সতেরো শো আশি।

[শশী আপন মনে হাসলো। পেছন ফিরে গিয়ে সে একটা টেবিলের দেরাজ খুললো। টেনে আনলো একটা একশো টাকার বাণ্ডিল। পনেরো শো টাকা গুণে বার করলো।]

শশী : যাও, বিল মিটিয়ে দাও।

রিমা : এ কী আপনি... আপনি টাকা দিচ্ছেন?

শশী : নিবারণবাবুর কাছ থেকে রিসিট চেয়ে নেবে।

রিমা : এটা কত দিনের মধ্যে শোধ দিতে হবে?

শশী : দিতে হবে না। যাও, কেটে পড়ো। দেরি করলে আমি আবার টাকাটা কেড়ে নিতে পারি।

রিমা : আপনার পা ছুঁয়ে একবার প্রণাম করবো?

শশী : না!

রিমা : একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি? আপনি এভাবে টাকাটা দিচ্ছেন, আমি মেয়ে বলে?

শশী : অফ কোর্স! তোমাদের ঐ হেঁড়ে গলার সম্পাদকটা হলে মোটেই দিতাম না। পুরুষ মানুষ মেয়েদের প্রতি দুর্বল হবে এটাই তো স্বাভাবিক।

[হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে]

যাও! গেট লস্ট!

Scene 12

[সকাল দশটা। সাদা লাঠি হাতে নিয়ে বাগানে পায়চারি করছে শশী। ঠোঁটে সিগারেট।

খানিক দূরে একটা গরু ঘাস খাচ্ছে। তার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে নিবারণ।

গরুটা একবার হাম্বা করে উঠলো।

নিবারণও আওয়াজ করলো, হাম্বা।

কাছে এগিয়ে এলো শশী।]

শশী : নিবারণ কাকা, গরু কি বলছে?

নিবারণ : বলছে, নয়নতারা গাছ খেয়ে ওর অম্বল হয়েছে।

শশী : আপনি পশু-পাখির ভাষা শিখলেন কী করে?

নিবারণ : শিখেছি আমার বাবার কাছ থেকে। আমার বাবা এমনকি সাপের সঙ্গেও কথা বলতে পারতেন।

[শশী জ্বলন্ত সিগারেটটা ফেলে দিল। সেটা পড়লো একটা ফুল গাছে।]

নিবারণ : এঃ, সিগারেটটা ফুল গাছে ফেললে? গাছের কষ্ট হবে না?

শশী : এখানে ফুলগাছ আছে বুঝি?

নিবারণ : এত সিগারেট খাও কেন? সর্বক্ষণ ঠোঁটে জ্বলছে। আগে কিন্তু খেতে না।

শশী : বিড়ির গন্ধ পাচ্ছি যেন! জানেন না, নিজে কোনো দোষ করলে তা নিয়ে অপরকে উপদেশ দেওয়া চলে না।

নিবারণ : আমার তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, কিন্তু তোমার এখনো বয়েস পড়ে আছে।

শশী : অত বিড়ি খেলে পরের জন্মে আপনার মেয়ে হওয়া হবে না। মেশিনের আওয়াজ পাচ্ছি না কেন? প্রেস খোলেন নি?

নিবারণ : সকাল থেকে লোড শেডিং। মেশিন চলবে কী করে? সেইজন্যই তো বলি ভালোয় ভালোয় প্রেসটা বেচে দাও! রাজি থাকো তো বলো, আমিই কিনে নিই।

শশী : আপনার অনেক টাকা হয়েছে বুঝি?

নিবারণ : টাকা? তুমি আমার কাছ থেকে টাকা নেবে? সারা জীবন এই প্রেসের জন্য খেটে খেটে হাড় পর্যন্ত কালি হয়ে গেছে। আমি একটা টাকা দেবো, তুমি লিখে দাও আমার নামে।

শশী : [হাসতে হাসতে] প্রেসে কোনো লাভ নেই, অনবরত লোকসান হচ্ছে বলছেন, তবু প্রেসটা কেনার জন্য আপনার এত আগ্রহ, এর কী মানে হয় জানেন?

নিবারণ : তোমার কি টাকার অভাব? এত বড় বাড়িটা... শুধু শুধু ফেলে রেখেছো, প্রোমোটারের হাতে দিলে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা পাবে।

শশী : বিপ্লব বুঝি আপনাকেও ফুসলেছে?

নিবারণ : ঐ তো তিনি এসে পড়েছেন।

Scene 13

[গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকলো স্বাস্থ্যবান পুরুষ। দেখলেই বোঝা যায় বেশ অবস্থাপন্ন, চোখে মুখে আত্মম্ভরিতার ছাপ। সুট-টাই পরা। তার সঙ্গে দু'জন যুবক। এরা বিপ্লবের চামচে বা বডি গার্ড ধরনের। বিপ্লব তাদের গেটের কাছে অপেক্ষা করার ইঙ্গিত করলো। তারপর সে চলে এলো শশীর মুখোমুখি।

এখানে একটি বিচিত্র ব্যাপার ঘটবে। বিপ্লব যখন কথা বলবে, তখন তার সুট-টাই পরা এই চেহারা থাকবে। আর শশী যখন কথা বলবে তার দিকে চেয়ে, তখন বিপ্লবের পোশাক হয়ে যাবে, একবার জিন্স টি-শার্ট, একবার পা-জামা-পাঞ্জাবি, কখনো মুখে খোঁচা খোচা দাড়ি। অর্থাৎ শশী কখনো বিপ্লবকে সুট-টাই পরা অবস্থায় দেখে নি।]

বিপ্লব . গুড মর্নিং ছোড়দা। কেমন আছো আজ?

শশী : কালকের চেয়ে খারাপ নেই। মাসিমা কেমন আছেন?

বিপ্লব · মা, হ্যাঁ ভালোই আছেন, ঐ যা বাতের কষ্ট।

শশী : নিশ্চয়ই কিছু কাজের কথা বলতে এসেছিস?

বিপ্লব : আমি শুনলাম ছোড়দা, কিউবায় নাকি চোখের দারুণ অপারেশন হয়। মিরাকিউলাস রেজাল্ট পাওয়া যাচ্ছে। তুমি একবার কিউবায় গিয়ে ট্রাই করো না! হয়তো ভালো হয়ে যাবে।

শশী : কিউবা? সেখানে একজনও অন্ধ আছে কিনা খোঁজ নিয়ে দেখেছিস?

বিপ্লব : [কাঁধ শ্রাগ করে] চোখ থাকতেও অন্ধ, তুমি যদি তাই মিন করো, তা হলে নিশ্চয়ই আছে।

শশী : না, আমি তা মিন করি নি। আমার মতন অন্ধ আছে কি না। ওরা নিজের দেশের সবাইকে সারিয়েছে?

বিপ্লব : তা আমি ঠিক জানি না। তবে, তুমি একবার ট্রাই করে দেখো না।

শশী : কিউবায় যাবার ভাড়া, চিকিৎসার খরচ তুই দিবি?

বিপ্লব : দিতে পারি। আমি তোমার সঙ্গেও যেতে পারি। একজন তো দরকার।

শশী : তার বদলে?

[একটা ছোট্ট ফ্লাস ব্যাক। অন্ধকার রাস্তা দিয়ে খুব স্পিডে যাচ্ছে একটি গাড়ি। খানিকটা এঁকেবেঁকে যাচ্ছে, মনে হয় কোনো মাতাল চালাচ্ছে। শোনা গেল একটা তীব্র হর্ন। তার ওপরে বিপ্লবের কথার ওভারল্যাপ।]

বিপ্লব : এরকম একটা জগদ্দলের মতন বাড়ি রেখে দিয়ে কী হবে? মেইনটেনান্সেরও তো অনেক ঘটা। শুনলাম নাকি, তুমি একজন মহিলাকে বিনা ভাড়ায় থাকতে দিচ্ছো?

শশী : বিনা ভাড়ায় নয়, সে দিতে চেয়েছিল, আমি নিতে রাজি হইনি। কারণ, ও আমার মাস্টার মশাইয়ের মেয়ে। যাঁকে আমি সবচেয়ে শ্রদ্ধা করি।

বিপ্লব : ওসব দয়া টয়া করার ফল কী জানো? আর কোনো দিন উঠবে না। এ বাড়ি ভাঙা হলে ও একটা ফ্ল্যাট ক্লেইম করবে।

শশী : বাড়িটা ভাঙা কি ঠিক হয়ে গেছে নাকি?

বিপ্লব : খামোকা জেদ ধরে থেকে লাভ কী? তুমি একটা পুরো ফ্লোর পাবে। আগাগোড়া মার্বল ফিনিস, আরও যা টাকা পাবে তা দিয়ে সারা জীবন পায়ের ওপর পা দিয়ে চলে যাবে।

শশী : বিপ্লব, তোর মনে আছে, তুই যখন ছোট ছিলি আমাদের বাড়িতে এসে থাকতিস মাঝে মাঝে, ছোটাছুটি করে খেলতিস এই বাগানে।

বিপ্লব : ওসব সেন্টিমেন্টাল কথা বাদ দাও! এতখানি জমি, কলকাতার যা অবস্থা, এ ভাবে ফেলে রাখা বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

শশী : তুই এখন ক'টা বাড়ি বানাচ্ছিস রে?

বিপ্লব : তিন জায়গায় কাজ চলছে। জমি পাওয়াই তো শক্ত!

শশী : চা-টা খাবি কিছু?

[বিপ্লব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাত নেড়ে চায়ের ব্যাপারটা উড়িয়ে দিল।]

বিপ্লব : টার্মস অ্যাণ্ড কণ্ডিশান্‌স নিয়ে কবে তোমার সঙ্গে বসবো বলো।

শশী : ফের ঐ কথা নিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করলে একটা থাপ্পড় কষাবো!

[একটি ছোট ফ্ল্যাস ব্যাক। দুম দুম করে বিগ ড্রাম বাজছে, কিন্তু সেটা দেখা যাচ্ছে না। আগের একটি দৃশ্যে দুই সারিতে কয়েকজন যুবক যেমন মার্চ করে যাচ্ছিল, এখনও তারাই মার্চ করে যাচ্ছে, তবে তাদের পোশাক সাধারণ শার্ট-প্যান্ট বা পাজামা-পাঞ্জাবি। কয়েকজনের হাতে লাঠি, শশী আর বিপ্লবকে এদের মধ্যে চেনা যাচ্ছে। বিপ্লবের হাতে রিভলভার।]

আবার বাগান। মুখ গম্ভীর করে দাঁড়িয়ে আছে বিপ্লব।]

শশী : আমরা এক সময় সমাজ বদলের স্বপ্ন দেখেছিলাম, কত ঝুঁকি নিয়েছি। এখন আমার না হয় চোখ দুটো গেছে বলে সরে থাকার তবু যুক্তি আছে, তুই কী করছিস?

বিপ্লব : পার্টি ফাণ্ডে মোটা টাকা দিচ্ছি!

Scene 14

[একটা কুয়োর ধারে দাঁড়িয়ে আছে সরমা। একজন ঝাঁকড়া-চুলো শিল্পী তাল তাল কাদামাটি লেপে দিচ্ছে তার গায়ে। খুব জোরে জোরে। সরমা কেঁপে কেঁপে উঠছে। তার সারা শরীর ঢেকে গেল। গলা পর্যন্ত। সরমা আর্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠলো।]

সরমা : কী করছো পাগলের মতন, আমার কষ্ট হচ্ছে।

শিল্পী : [গর্জন করে] চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো, নড়বে না।

সরমা : আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

[শিল্পী সরমার মুখেও মাটি লাগালো। সেই অবস্থায় পালাতে গিয়ে সরমা দড়াম করে পড়ে গেল মাটিতে।]

Scene 15

[ঘরের মধ্যে শুয়ে আছে সরমা। গায়ে একটা পাতলা চাদর।

বারান্দায় সুমন একটা কাঠের ঘোড়ায় চেপে দুলতে দুলতে আপন মনে বিড়বিড় করছে। শশী এসে সেখানে দাঁড়ালো।]

শশী : হাই আলেকজাণ্ডার!

সুমন : শশীদা! শশীদা! চকোলেট এনেছো?

শশী : না, আনা হয় নি তো। আলেকজাণ্ডার কি চকলেট খায়?

[সুমন একটুক্ষণ ভুরু কুঁচকে চিন্তা করলো।]

সুমন : আলেকজাণ্ডার কী খায়?

শশী : আলেকজাণ্ডার আঙুর খায় আর খেজুর খায়।

সুমন : আমিও আঙুর খাবো, খেজুর খাবো।

শশী : চকলেটের বদলে তাই এনে দিতে হবে। আর কাঠের ঘোড়া নয়, তোমাকে আমি সত্যিকারের একটা ঘোড়া কিনে দেব। এই বাগানে তুমি সেই ঘোড়া ছোটাবে।

সুমন : বাবা আমাকে একটা ঘোড়া কিনে দেবে বলেছিল। দেয় নি। বাবা মিথ্যেবাদী।

শশী : পরে দেবে নিশ্চয়ই। তখন তোমার দুটো ঘোড়া হবে।

সুমন : না দেবে না। বাবা আর আসবে না। বাবার সঙ্গে আমার ডিভোর্স হয়ে গেছে।

[শশী হেসে উঠলো। শব্দ শুনে বাইরে চলে এলো সরমা।]

সরমা : শশীদা, এসো বসো। চা-করে দিচ্ছি।

শশী : এ কী, তুমি এসময় বাড়িতে যে! স্কুলে যাও নি?

সরমা : জ্বর জ্বর লাগছে, তাই আজ আর গেলাম না।

সুমন : সেইজন্য আমারও ছুটি!

[শশী লাঠি ঠুকে ঠুকে সরমার কাছে এসে তার কপালে হাত রাখলো।]

শশী : বেশ জ্বর। চা করতে হবে না, শুয়ে থাকো।

সরমা : তুমি তো এই সময় চা খাও। করতে কোনো অসুবিধে নেই।

[সরমা পরে আছে একটি সাধারণ হাউজ কোট। কিন্তু বিপ্লবের মতনই, শশী যখনই সরমার দিকে তাকায়, তাকে সে দেখতে পায় একটা লাল শাড়ি পরা অবস্থায়। ঐ শাড়িতেই সে সরমাকে শেষ দেখেছে।

একটি ছোট ফ্ল্যাস ব্যাক। সেই ঝাঁকড়া-চু লা শিল্পীটি সরমার স্বামী। তার নাম নিখিল। একটা সরু গলি দিয়ে নিখিল আর লাল রঙের শাড়ি পরা সরমা হেঁটে আসছে. দূরে দাঁড়িয়ে আছে একটা রিক্সা। নিখিল মাঝে মাঝে টলে টলে পড়ে যাচ্ছে, তাকে ধরে রাখছে সরমা। নিখিল রাগের সঙ্গে কিছু বলছে, শোনা যাচ্ছে না।

গলির একটি বাড়ির রকে দাঁড়িয়ে আছে শশী আর সরমার বাবা অবিনাশ। তিনি ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, হাতে চুরুট। দু'জনেই তাকিয়ে আছে গলির দিকে।]

অবিনাশ : শিল্পীরা কি নিষ্ঠুর হয়?

শশী : কেউ কেউ... পিকাসো নিষ্ঠুর ধরনের ছিলেন শুনেছি।

অবিনাশ : ছবি আঁকবে অবন ঠাকুরের স্টাইলে আর জীবনযাত্রা হবে পিকাসোর মতন? প্রত্যেক রাতে ওকে এই ভাবে ধরে ধরে আনতে হয়। তারপরেও ঘরের মধ্যে ঢুকে ও খুকিকে মারে।

শশী : আপনি তা সহ্য করছেন?

অবিনাশ : খুকিই তো ওকে ছাড়তে চায় না।

[নিখিল আর সরমা রকে উঠে এলো। নিখিল একবার এই দু'জনের দিকে অবজ্ঞার চোখে তাকিয়ে চলে গেল ভেতরে।

ফ্ল্যাস ব্যাক শেষ। এখানকার বারান্দায় একটা মোড়ায় বসে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে শশী।]

শশী : স্যার কেমন আছেন? চিঠি পেয়েছো?

সরমা : প্রায়ই ফোন করি। বাবা বেশ মজাতেই আছেন। গাছ লাগাচ্ছেন খুব।

শশী : গাছ লাগাচ্ছেন, কোথায়?

সরমা : নর্থ বেঙ্গলে গাছ খুব কমে যাচ্ছে। তাই বাবা পাড়ার ছেলেদের জুটিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে গাছের চারা পুঁতছেন।

শশী : ভাবছি একবার দেখা করতে যাবো। দেখা? হ্যাঁ, দেখাই!

সরমা : আমরা এক সঙ্গে যেতে পারি। সামার ভ্যাকেশানে ভাবছি মাসখানেক বাবার কাছে কাটিয়ে আসবো।

Scene 16

[এখন একটা কালো চশমা পরেছে শশী। হাতে সাদা লাঠি। সে এগোচ্ছে গেটের দিকে।

বুড়ো দারোয়ান তাকে দেখে সেলাম ঠুকলো।]

শশী : দারোয়ান কোথায়? দারোয়ান?

দারোয়ান : এই যে এখানে হুজুর।

শশী : একটা ট্যাক্সি ডাকো।

[দারোয়ান বেরিয়ে গেল, পাড়ার কয়েকটি ছেলে একটু দূরে দাঁড়িয়ে জটলা করছিল। কাছে এগিয়ে এসে বললো, নমস্কাব স্যার, নমস্কার।]

একজন : স্যার আপনি বেরুচ্ছেন? একটা কথা ছিল।

শশী : বলো।

একজন : স্যার, আমাদের সরোস্‌সোতি পুজোর চাঁদাটা আজ দেবেন?

শশী : প্রেসের ম্যানেজারবাবুকে বললে দিয়ে দেবেন।

একজন : ম্যানেজারবাবু বড্ড খ্যাক খ্যাক করেন। মাত্তর দশটা টাকা ঠেকাতে চান। আপনাকে স্যার এবার আমাদের ফাংসানে বিসেস অতিথি হতে হবে!

শশী : কাল সকালে এসো। দশ টাকার বেশিই দেব, কিন্তু বিশেষ অতিথি হবো না। পুজো প্যাণ্ডেলে যাবো না।

[অন্য একটি ছেলে চুপি চুপি শশীর পাশ দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করছে এই ফাঁকে।]

শশী : কে ভেতরে যাচ্ছে?

একজন : কই, কেউ না তো!

[শশী বাঁ দিকে লাঠিটা বাড়িয়ে দিয়ে ছেলেটিকে আটকালো।]

শশী : আমি সব টের পাই। একটা ম্যাজিক দেখবে? সবাই এক লাইন করে দাঁড়াও।

[শশী সারবদ্ধ ছেলেদের একজনের কাঁধে লাঠিটা ছুঁইয়ে দিল।]

শশী : তোমার নাম শিবু, তাই না?

[ছেলেটি অবাক। শশী আর একজনের কাঁধে লাঠি ছোঁয়ালো।]

শশী : আর তোমার নাম ছোটে লাট।

[তৃতীয় জনের কাঁধে লাঠি ছুঁইয়ে শশী হাসলো।]

শশী : আর তুমি হচ্ছো ভাঁড়ু। তুমিই ভেতরে ঢুকছিলে। কেন?

ভাঁড়ু : আর কিছু না স্যার, মানে, আপনার বাগানে নিমগাছ আছে, কয়েকটা নিমপাতা।

শশী : নিমপাতা... লুকিয়ে না নিলে বুঝি মজা হয় না? কাল সকালে আমি যখন বাগানে বেড়াবো—

[ট্যাক্সি এসে থামলো। তাতে উঠে পড়লো শশী।]

Scene 17

[অন্ধকার রাস্তায় খুব জোরে ছুটছে একটা গাড়ি। একেবেঁকে। এবার দেখা গেল, সেই গাড়িটা চালাচ্ছে শশী। চুল উস্কোখুস্কো। পাশে বসা একটি মেয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।]

Scene 18

[একটা উঁচু বাড়ির ছাদ। রাত্রি। একপাশে একটা আলো জ্বলছে। একটা ছোট টেবিলের দু'পাশে কয়েকটি চেয়ার। দুটি গেলাসে হুইস্কি ঢালা হলো। শশী আর তার বাল্যবন্ধু অশেষ গেলাস দুটো তুলে নিয়ে বললো, চিয়ার্স।]

শশী : অশেষ, আজ কি আকাশটা মেঘলা না তারা ফুটেছে?

[আকাশে ঝকঝক করছে তারা। তবু সেদিকে তাকিয়ে অশেষ বললো—]

অশেষ : মেঘলা।

শশী : আমি আর কোনোদিন চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র কিছুই দেখতে পাবো না।

অশেষ : আমরাই বা আকাশের দিকে তাকাবার সময় পাই কখন? বহুলোক রাত্তিরের আকাশ দেখেই না।

শশী : পৃথিবীর অধিকাংশ প্রাণী মুখ নিচু করে হাঁটে। মানুষই আকাশ দেখতে পায়।

অশেষ : তবু দেখে না।

শশী : মানিক কোথায় রে? সে এখন কী করছে?

অশেষ : তুই কাগজ পড়িস? মানে, কেউ তোকে পড়িয়ে শোনায়

শশী : হ্যাঁ, প্রেসের একটি ছেলে

অশেষ : খবরের কাগজে মানিক দত্তগুপ্তর নাম প্রায়ই থাকে। সে এখন নামকরা ট্রেড ইউনিয়ন লিডার।

শশী : তার মানে কটা কারখানা বন্ধ করিয়েছে?

অশেষ : খবরের কাগজগুলো সাধারণ পাঠকদের মধ্যে এই বিশ্বাস করিয়ে দেয়, যেন ট্রেড ইউনিয়নের জন্যই কারখানা বন্ধ হয়, মালিকপক্ষের কোনো দোষ নেই।

শশী : চতুর্দিকে যে এত কল-কারখানা বন্ধ হচ্ছে শুনতে পাই

অশেষ : তা নিয়ে তোর মাথা ঘামাবার দরকারটা কী?

শশী : তুই, আমি, মানিক, রতন সব একসঙ্গেই তো রাজনীতি শুরু করেছিলাম, এই দেশটার জন্য —

অশেষ : তুই সব সময়ই ছিলি হাফ হার্টেড। তুই বক্তৃতা দিতে পারতিস ভালো, কিন্তু শুধু শহরের আশে পাশে! মফঃস্বলে যেতে বললেই তোর গায়ে জ্বর আসতো! ধনীর দুলাল!

শশী : আর কিছু না ভাই, গ্রামে কমোড থাকে না বলে আমার খুব অসুবিধে হতো। রাত কাটাতে হলে

অশেষ : কমোডের অভাবে দেশোদ্ধারের কাজ বন্ধ! তুই যে গরম গরম কবিতা লিখতি, সেগুলোও কৃত্রিম। প্যানপেনে প্রেমের কবিতাগুলোতেই তোর হাত খুলতো! প্রেম প্রেম করেই তোর বারোটা বাজলো।

শশী : প্রেম!

অশেষ : ক'টা মেয়ের সর্বনাশ করেছিস?

শশী : সর্বনাশ করেছি?

অশেষ : দু'তিনজনের কথা তো আমিই জানি।

[এই সময় ছাদের কার্নিসের ধারে একটি তরুণী মেয়েকে দেখা গেল। তার সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন আলো ফুটে বেরুচ্ছে। গাছতলায় যে মেয়েটি কবিতা পড়ছিল, এ সেই রেবা। সে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।]

অশেষ : রেবার সঙ্গে আর তোর যোগাযোগ আছে?

শশী : নাঃ!

অশেষ : আমার সঙ্গে রেবার দেখা হয়েছিল, গতবছর, আসানসোলে। তোর কথা একবারও জিজ্ঞেস করে নি।

শশী : [সামনের দিকে তাকিয়ে] তুমি কেমন আছো, রেবা?

অশেষ : কী বললি?

শশী : আমার সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়।

অশেষ : কার সঙ্গে?

[চেয়ার ছেড়ে শশী এগিয়ে গেল পাঁচিলের কাছে, রেবার দিকে। এখন আর রেবা সেখানে নেই। দশতলার ছাদ থেকে দেখা যায় আলোকোজ্জ্বল কলকাতা।]

শশী : এখান থেকে কী দেখা যায় রে অশেষ?

অশেষ : কিচ্ছু না। শুধু অন্ধকার।

শশী : অন্ধকার শব্দটার আর কোনো মানে নেই আমার কাছে। সব সময় কিছু না কিছু দেখি। যা নেই, তাই দেখি।

অশেষ : তুই কবিতা লেখা ছাড়লি কেন? প্রেমের কবিতা হোক আর যাই-ই হোক, কবিতা লেখাতেই তোর মুক্তি।

শশী একটা গান ধরে ফেললো :

আমাকে যে রাখবে ধরে, এই হবে যার সাধন
সে কি অমনি হবে?

[হঠাৎ দৃশ্যটি দিনের আলোয় ঝলমল করে ওঠে। সেই মাঠের ধারে সরু নদী। রেবার সঙ্গে হাঁটছে শশী।]

রেবা : আমাকে সন্ধের আগে ফিরে যেতে হবে।

শশী : তুমি অমিতকে ঝোঁকের মাথায় বিয়ে করতে রাজি হয়ে গেলে?

রেবা : তুমি তো কিছু বলো নি।

শশী : তুমি একটু অপেক্ষা করলে না? তখন আমরা জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছিলাম।

রেবা : কার জীবন নিয়ে?

শশী : মানে, আমাদের নিজেদের জীবন

রেবা : আর তোমার মাস্টার মশাইয়ের মেয়ে?

শশী : মানে? সে আবার কী করলো?

রেবা : সে তোমায় কষ্ট দেয় নি?

শশী : না, না, না, সরমা খুব অল্প বয়েস থেকে নিখিলকে অ্যাডমায়ার করে

রেবা : তাকে অ্যাডমায়ার করে, আর তোমাকে

শশী : তুমি ভুল ভেবেছো, একদম ভুল

রেবা : তোমার সব কবিতাগুলো আমি ভুলে যাচ্ছি।

[দু'জনে আবার কিছুক্ষণ হাঁটে। আর একটা গাছতলায় প্যান্টের দু'পকেটে হাত দিয়ে, পা ফাঁক করে ভিলেনের কায়দায় দাঁড়িয়ে আছে অশেষ। সে ইঙ্গিতে শশীকে নিজের কাছে ডাকলো।]

অশেষ : আর্টিস্ট অ্যাণ্ড পোয়েট। মেয়েরা এই দু'জনের মধ্যে কাকে বেশি ভালোবাসে বল তো?

শশী : তুই-ই বুঝি এসব বাজে কথা ছড়াচ্ছিস? সরমার সঙ্গে আমার সে রকম কিছুই নেই।

অশেষ : তোর চোখ দেখলেই বোঝা যায়, তুই মিথ্যে কথা বলছিস। পরশু দিন আমাদের ফাঁকি দিয়ে তুই কোথায় সরে পড়েছিলি?

শশী : সেদিন, সেদিন আমার মাসির বাড়িতে

অশেষ : ফের মিথ্যে কথা। যেমন নিখিল, তেমন তুই! তোরা দু'জনেই ডিকাডেন্ট কালচারে বুঁদ হয়ে আছিস। শালা—

[শশীর পেটে একটা ঘুঁষি কসালো অশেষ

আবার সেই ছাদ। আবার গেলাসে হুইস্কি ঢালা হচ্ছে। দু'জনে দুটো গেলাস তুলে নিয়ে বললো চিয়ার্স। কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো পরস্পরের দিকে।]

অশেষ : আজ আমরা কোনো পুরোনো কথা বলবো না।

Scene 19

[সিঁড়ি দিয়ে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে নামছে শশী। পাশে অশেষ।]

অশেষ : আমি ধরবো?

শশী : না। আমার কারুর সাহায্য লাগে না—তবু একটু পরেই হুড়মুড় করে পড়ে গেল সে।

Scene 20

[একটা মেয়েদের স্কুল ছুটি হচ্ছে। গেট দিয়ে বেরিয়ে আসছে ইউনিফর্ম পরা মেয়েরা। একটু পরে বেরুলো সরমা, আর একজন শিক্ষিকার সঙ্গে হাঁটছে।

রাস্তার অন্য ফুটপাথে সেই ঝাঁকড়া-চুলো শিল্পী নিখিল। সে অপেক্ষা করছিল। এখন অনুসরণ করতে লাগলো সরমাকে।

অন্য শিক্ষিকাটি একটা বাসে উঠে পড়েছে। সরমা দাঁড়িয়ে আছে আর একটি বাসের জন্য। নিখিল চলে এলো তার কাছে। হাত-পা নেড়ে সে কিছু বলতে শুরু করলো। ওদের কথা শোনা যাবে না। সরমা বারবার মাথা নাড়ছে। বাস স্টপে অপেক্ষমাণ আর কয়েকজন যাত্রী ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে ওদের।]

Scene 21

[বারান্দার কাছে গাছের ডালে সেই কাকটা অনবরত ডেকে চলেছে। গান শুনতে শুনতে শশী উঠে এলো বারান্দায়।]

শশী : তুই কী চাস আমার কাছে?

[কাকটা ডাকছে।]

শশী : আমি তোকে গুলি করে মারতে পারি।

Scene 22

[একটা মাঠ দিয়ে ছুটছে শশী। কয়েক শো কাক তাড়া করছে তাকে। সারা আকাশ কাকে ভরে গেছে। অসংখ্য কাকের ডাক।

শশী একটা গাছতলায় দাঁড়াতেই ঝড় উঠলো।

একটা সাপ চলে যাচ্ছে তার সামনে দিয়ে।

যেন একটা চাকাওয়ালা কাঠের তক্তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে নিবারণ, অর্ধ বৃত্তাকারে শশীর সামনে দিয়ে যেতে যেতে তিনবার বললো, আমার বাবা সাপের সঙ্গেও কথা বলতে পারতেন

একটা ফুলগাছ দাউ দাউ করে জ্বলছে

কয়েকটি ঘোড়া ছুটে যাবার শব্দ হলো--

একটা মেয়েকে কে যেন ছুঁড়ে দিল একটা পুকুরের মধ্যে। ছিটকে উঠলো জল·

মাঠের মধ্য থেকে শশীর দিকে এগিয়ে আসছে রেবা। তার সারা শরীর দিয়ে যেন আলো ফুটে বেরুচ্ছে।]

রেবা : অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছো কেন শশী?

শশী : কে?

রেবা : অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছো কেন শশী?

শশী : আমার কাছে অন্ধকার কথাটার আর কোনো মানে নেই। আমি সব সময় কিছু না কিছু দেখতে পাই।

[গাছটায় আগুন জ্বলছে।

তোলপাড় হচ্ছে পুকুরের মাঝখানটার জল। কয়েকটা হাঁস পালাচ্ছে। এক সময় দেখা গেল দুটি মেয়েলি হাত, কোনো ডুবে যাওয়া মেয়ের হাত ব্যাকুল ভাবে ডাকছে কারুকে।

গা থেকে কোট খুলে শশী ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে।

সেই মেয়েটিকে উদ্ধার করে সে পাড়ে নিয়ে এলো। এখন বোঝা গেল, সেই মেয়েটি সরমা। সে লাল শাড়ি পরা।]

শশী : পুকুরে নেমেছিলে কেন? তুমি তো সাঁতার জানো না।

সরমা : ইচ্ছে করে নামিনি। একজন ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে!

শশী : সে কি? কে তোমাকে ফেলে দিয়েছে?

সরমা : কে আমাকে বারবার এ রকম ফেলে দিচ্ছে, তা তুমি জানো না, শশীদা?

Scene 23

[ঘরে তালা বন্ধ করে বেরুলো সরমা। ইস্কুলের পোশাক পরে আছে সুমন। তার হাত ধরে সরমা এগিয়ে গেল গেটের দিকে।]

Scene 24

[একটা রিক্সা থেকে ছেলেকে নিয়ে নামলো সরমা। সুমন দৌড়ে চলে গেল ইস্কুলের মধ্যে। সরমা বাস স্টপের দিকে এগোচ্ছে, হঠাৎ তার পাশে এসে গেল তার প্রাক্তন স্বামী নিখিল। সে কী বলছে, এবারেও তা শোনা গেল না।]

Scene 25

[একটা গান বাজনার দোকানে বসে আছে শশী।

বিভিন্ন ক্যাসেট শুনে শুনে কিনছে। দেশি ও বিদেশি দু'রকম সঙ্গীতই তার ভালো লাগে। একজন কর্মচারি তার পাশে এসে দাঁড়ালো।]

কর্মচারি : স্যার, আপনার ট্যাক্সি এসে গেছে!

[শশী চেক বই বার করে লিখতে লাগলো।]

Scene 26

[দোকান থেকে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সিতে উঠলো শশী। রিমা নামের মেয়েটি তার পাশে এসে দাঁড়ালো।]

রিমা : আপনার সঙ্গে একটা কথা বলতে চাই।

শশী : কে?

রিমা : আমি রিমা দত্ত, আমাদের পত্রিকা নিতে গিয়েছিলাম।

[পিছন থেকে অন্য গাড়ি হর্ন দিচ্ছে। ট্যাক্সিচালক বিরক্ত।]

রিমা : আপনার সঙ্গে ট্যাক্সিতে খানিকটা যেতে পারি?

শশী সরে বসলো। রিমা উঠতেই চলতে শুরু করলো ট্যাক্সি।

রিমা : আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম দু'বার। আপনার লোক ওপরে উঠতে দেয় না

শশী : কেন গিয়েছিলে?

রিমা : আমরা একটা বেশ বড় কবি সম্মেলন করছি। আপনাকে সভাপতি হতে হবে।

শশী রিমার বাহুতে ও পিঠে একবার হাত বুলিয়ে দেখলো। আগের দিনের মতনই রিমা জিন্‌স ও টি-শার্ট পরে আছে.

শশী : তুমি বুঝি শাড়ি পরো না?

রিমা : ঝামেলা! বিয়ে বাড়িতে পরি। আগামী পঁচিশ তারিখ সম্মেলন হবে উত্তর পাড়ায়।

শশী : তোমার পোশাকের কী রং?

রিমা : এটা? মেরুন বলতে পারেন। তা হলে কার্ডে আপনার নাম ছাপিয়ে দিচ্ছি।

শশী : সভাপতি? কত টাকা দিতে হবে?

রিমা : টাকা? না, না, টাকা কেন দেবেন, আপনাকে আমরা সম্মান জানাবো।

শশী : আমি অনেকদিন লেখা ছেড়ে দিয়েছি। ওসব সভা-টভায় আমি যাই না।

রিমা : কেন যাবেন না? এটা আমাদের দাবি। দৃষ্টিশক্তি নেই বলে আপনি সবকিছু ছেড়ে এরকম পালিয়ে থাকবেন কেন?

[শশী সিগারেট ধরাবার জন্য একটু সময় নিল। তারপরই তার কণ্ঠস্বর রুক্ষ হয়ে গেল।]

শশী : কবিতা লিখতে চাও, লেখো। আমার কাছে এসে এসব ন্যাকামি করবার কোনো দরকার নেই!

রিমা : আপনি যতই বকুনি দিন, আমি আপনাকে ছাড়ছি না।

শশী : আগেকার দিন হলে আমি তোমাকে আমার ঘরে নিয়ে তুলতাম। তারপর নুন আর গোলমরিচ মাখিয়ে জ্যান্ত খেয়ে নিতাম এই শরীরটা। এখন আমি মেয়েদের মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

[ভয় না পেয়ে রিমা খিলখিল করে হেসে উঠলো।]

রিমা : ওটা ছেড়েছেন, ভালোই করেছেন। তা বলে কবিতা লেখা ছাড়বেন কেন? চোখ না থাকলেও আপনার অনুভূতি আছে, স্মৃতিশক্তি আছে, কত পড়াশুনো করেছেন।

শশী : চোখ না থাকলে মানুষ নিজেকে বড় বেশি দেখতে পায়। তাই অন্য আর কিছু চিন্তা করে না।

রিমা : নিজেকে নিয়েই লিখবেন। আপনি মুখে মুখে বলে যাবেন, আমি টুকে নেব...

শশী : তুমি কোথায় নামবে?

রিমা : আপনার বাড়ি পর্যন্ত যাবো। তার আগে আমার মোটেই নামার ইচ্ছে নেই।

Scene 27

[একটা বেশ লম্বা মিছিল যাচ্ছে। তার থেকে বেরিয়ে এলো শশী। মিছিলের একজন তাকে ডাকলো, শশী হাতের ইঙ্গিত করে জানালো, সে পরে আসছে। আসলে সে পালাচ্ছে।

তার বন্ধু অশেষের *off voice.*]

অশেষ : আমরা একটা কারখানা খোলার আন্দোলনে মিছিল করেছিলাম, তুই তার থেকে পালিয়ে ছিলি।

Scene 28

[একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প। অনেকে রক্ত দিচ্ছে। সেখান থেকে বেরিয়ে আসছে শশী।]

অশেষ (*off voice*) : আমরা ব্লাড ডোনেশান ক্যাম্প করেছিলাম, তুই রক্ত দিসনি, কাওয়ার্ড!

Scene 29

[একটা ঘরের মধ্যে সাত-আটটি ছেলে। একজন শ্রেণি সংগ্রাম ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছে।]

অশেষ (*off voice*) : আমরা স্টাডি সার্কল চালিয়েছি, তোর পাত্তাই নেই, তুই তখন...

Scene 30

[রেবা আর শশী দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ। রেবা নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছে, শশী প্রবল ভাবে মাথা ঘষছে তার বুকে।]

Scene 31

[আবার ছাদের ওপর অশেষ ও শশী মুখোমুখি। দু'জনের হাতে হুইস্কির গেলাস।]

অশেষ : অথচ এসব তুই-ই প্ল্যান করেছিস, অন্যদের ডেকে ডেকে জড়ো করেছিস, তারপর নিজেই কেটে পড়েছিস একসময়—

Scene 32

[দুর থেকে দেখা যাচ্ছে, সামনের রাস্তা দিয়ে বাড়ির গেটের দিকে হেঁটে আসছে সরমা। তার পেছন পেছন নিখিল। গেটের কাছে এসে মুখ ফিরিয়ে নিখিলকে দেখতে পেল সরমা।]

সরমা : তুমি কেন আমাকে আবার বিরক্ত করছো? এটা তোমার পাগলামি।

নিখিল : [খুব শান্ত ও ভদ্র ভাবে] পাগলামি কেন হবে? তুমি ফিরে এসো আমার কাছে।

সরমা : ফিরে যাবো? তা হলে এত কাণ্ড করে বিয়েটা ভাঙা হলো কেন?

নিখিল : আমরা আবার বিয়ে করবো।

সরমা : প্লিজ, এসব কথা আমাকে আর বোলো না।

নিখিল : তোমাকে আমার খুব দরকার। আমি ছবি আঁকতে পারছি না। তোমার যে ছবিটা আঁকছিলাম।

সরমা : ছবির জন্য তুমি অনেক মেয়ে পাবে। আগেও তো দেখেছি।

নিখিল : অনেক মেয়ে ফেয়ে নয়। তোমার ঐ ছবিটা শেষ করতে না পারলে—

সরমা : ছবিটা শেষ হয়ে গেলে তারপর কী হবে? তুমি আমাকে ছবির রং, ফ্রেম, ক্যানভাস, তাল তাল মাটি, পাথর এই রকমই একটা কিছু মনে করো। আমি আর কিছু না। আমার যে ছবিটা আঁকছিলে, সেটা মোটেই আমার মতন নয়।

নিখিল : শরীরটা তোমার মতন নয়। যে-কোনো শরীর সবাই আঁকতে পারে, মুখচ্ছবিটাই আসল। শোনো, ছবির মডেলরা এক সময় বুড়ি হয়, মরে যায়, আমার মতন আর্টিস্টরাও মরে ভূত হয়ে যায়, কিন্তু ছবিটা যদি সার্থক হয়, তার আয়ু হয় অন্যরকম। ঠোঁটের কোণে একটু হাসি, সেটাই হয়ে যায় অনন্ত মুহূর্ত।

[সরমা তার শাড়িটা সামান্য তুলে বাঁ পায়ের গোড়ালিটা দেখালো।]

সরমা : কী রকম মেরেছিলে মনে আছে?

নিখিল : ভুল করেছি, অন্যায় করেছি। ক্ষমা করো।

সরমা : ওরকম কথা অনেকবার শুনেছি। সন্ধের পর তুমি পাগল হয়ে যাও।

নিখিল : আর একবার চান্স দাও, প্লিজ

সরমা : না!

[গেট খুলে সে ভেতরে ঢুকে এলো।

তার চোখে আবার ভেসে উঠলো সেই দৃশ্যটা। তাল তাল মাটি তার গায়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে নিখিল। মাটিতে ঢেকে গেল শরীর। তার মুখেও মাটি মাখছে। পালাতে গিয়ে পড়ে গেল সরমা।

নিখিল তাকে লাথি কষাচ্ছে।]

Scene 33

[একটি শিল্পীর ঘর দেওয়ালে অনেক ছবি। কিছু ছবি অসমাপ্ত।

একটি বড় ক্যানভাসে একটি নগ্ন নারী। একেবারে *Frontal Nude,* খুবই সুগঠিত। ছবির ওপরের দিকে এক কোণে একটা মৌচাক। সেখান থেকে বেরিয়ে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি।

জল রঙে আঁকা নারীটির মুখখানা খুবই অস্পষ্ট।

ঘরের এক কোণে টুলের ওপর বসে আছে নিখিল। সে কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। হঠাৎ এক সময় সে উঠে গিয়ে ব্রাস নিয়ে সাদা রং দিয়ে মুখখানা মুছে দিল একেবারে।]

Scene 34

[নিজের ঘরে বসে গান শুনছে শশী। রাত্রি।

হঠাৎ কেউ একজন পেছন থেকে এসে ধাক্কা মেরে চেয়ারসুদ্ধ তাকে হুড়মুড় করে ফেলে দিল মাটিতে। লোকটিকে প্রথমে দেখা গেল না।]

নিখিল : *(off voice)* শালা, শুয়োরের বাচ্চা!

শশী : এ কী ব্যাপার? কে?

নিখিল : তোর যম। আজ তোকে শেষ করে ফেলবো।

শশী : নিখিল!

নিখিল : হারামজাদা, তুই আমার বউকে এখানে আটকে রেখেছিস।

শশী : [উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে] প্রথম কথা, সরমা এখন তোমার বউ নয়, দ্বিতীয় কথা, তাকে আমি মোটেই এখানে আটকে রাখিনি। তার থাকার জায়গা নেই, তাই থাকতে দিয়েছি। ইচ্ছে করলে অন্য যে-কোনো জায়গায় চলে যেতে পারে।

নিখিল : আমার সঙ্গে মাজাকি হচ্ছে? মাস্টারের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে যেতিস। বিয়ে করার মুরোদ হয়নি। আমাদের বিয়েটা তো তুই-ই ভেঙেছিস!

শশী : একদম বাজে কথা। সরমার সঙ্গে কোনোদিন সেরকম সম্পর্ক ছিল না

নিখিল : চোপ! আমাদের বিয়েটা ভাঙিয়ে এখন তাকে এখানে রক্ষিতা করে রেখেছিস, তাতেই বেশি মজা, অ্যাঁ?

শশী : মুখ সামলে কথা বলো নিখিল। তোমাকে এখানে কে আসতে দিয়েছে?

নিখিল : তোকে না পৃথিবী থেকে সরাতে পারলে সরমার মন ফিরবে না। ওকে আমার চাই।

শশী : এক্ষুনি এই ঘর থেকে বেরিয়ে যাও! নইলে—

নিখিল : চোপ! ভয় দেখাচ্ছিস! শালা অন্ধ, তোকে গলা মুচড়ে শেষ করে গেলে কে আটকাবে?

[শশী তার সাদা লাঠিটার মাথা দু'প্যাঁচ ঘোরাতেই তার থেকে বেরিয়ে এলো একটা সরু, লিকলিকে, অতি ধারালো গুপ্তি। সে সেটা তলোয়ারের মতন উঁচু করে ধরলো।]

শশী : পাগলা কুকুর কামড়াতে এলে আটকাবার ব্যবস্থা আমার করা আছে!

[সে গুপ্তিটা বেশ অভ্যস্ত ভঙ্গিতে তলোয়ারের মতন চালাতে লাগলো। নিখিল এমনিতেই প্রচুর মাতাল হয়ে এসেছে, হকচকিয়ে গেল ওটা দেখে। পিছিয়ে যেতে গিয়ে টলে পড়ে গেল দেয়ালে।

শশী এগোতে এগোতে অস্ত্রটা প্রায় নিখিলের বুকে বিঁধিয়েই দিত। এই সময় বারান্দা দিয়ে ছুটে এলো সরমা।]

সরমা : শশীদা! শশীদা! এ কী করছো?

শশী : ও তোমাকে আর আমাকে অপমান করেছে। ওকে শাস্তি দিতেই হবে।

সরমা : না, না, ওরকম কোরো না। আমি ওকে সরিয়ে নিচ্ছি। সে দু'হাতে নিখিলকে জড়িয়ে টানতে টানতে নিয়ে গেল।

Scene 35

[চলন্ত ট্রেনের কামরা। দু'দিকের জানলায় মুখোমুখি শশী ও সরমা।

অনেক প্রান্তর, জঙ্গল ও নদী পার হয়ে যাচ্ছে ট্রেন। একটা নদী আসতেই শশী যেন দেখতে পেল রেবাকে। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে তার দশ বছর আগেকার চেহারা।]

Scene 36

শশী : আমার জন্য একটু অপেক্ষা করলে না রেবা?

রেবা : তোমার জন্য আমি অনন্তকাল অপেক্ষা করতাম, যদি জানতাম, তুমি আমাকে চাও।

শশী : তোমাকে চাই নি?

রেবা : শুধু কি আমাকেই চেয়েছো?

শশী : এই আকাশ, বাতাস বিকেলের মেঘ, ভোরবেলার গান, একটা ভিখিরির বাচ্চার মুখের হাসি, ধান খেতে ফড়িং-এর ওড়াউড়ি এই ধরনের সবকিছু বাদ দিয়ে শুধু তোমাকেই চাই নি!

রেবা : একজন কবি যখন কবিতা লেখে, আর যখন লেখে না, যেন দু'জন সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ। আমি তোমার কবিতার মানুষকে চিনি, অন্য মানুষটাকে কখনো বুঝতে পারিনি। বরং ভয় করে।

শশী : অথচ সেই অন্য মানুষটা তোমার দয়া চেয়েছিল। কবি তো কিছু চায় না, অন্য মানুষটাই লোভী, কাঙাল।

রেবা : অন্য মানুষটা বেশির ভাগ সময় বসে থাকতো তার এক মাস্টার মশাইয়ের বাড়িতে। তাতেই যে আমার মন ভেঙে গিয়েছিল শশী!

শশী : আমি স্যারের বাড়িতে যেতাম বলে.. কী বলছো রেবা, বুঝতে পারছি না। সেটা কি অন্যায়?

রেবা : সরমা আমায় বলেছে...

শশী : সরমা কী বলেছে? বলো, বলো, বলো

Scene 37

[রেলের কামরায় আবার মুখোমুখি সরমা ও শশী। পাশে ঘুমিয়ে আছে সুমন।]

শশী : সরমা, তোমার সঙ্গে রেবার শেষ দেখা হয়েছে কবে?

সরমা : রেবা, মানে লেক গার্ডেন্সের রেবা? কী জানি, ওর বিয়ের পর বোধহয় আর... হঠাৎ রেবার কথা জিজ্ঞেস করলে কেন?

শশী : রেবা যে তোমার বন্ধু ছিল, জানতাম না!

সরমা : বন্ধু, হ্যাঁ। এক সময় বেশ বন্ধুত্ব ছিল, আমরা একসঙ্গে ফরাসি শিখতে যেতাম।

শশী : তোমার বাবাও তো ভালো ফরাসি জানেন। আপোলোনিয়ারের একটা কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন, তার মধ্যে দুষ্মন্ত আর শকুন্তলার কথা আছে।

সরমা : রেবার জীবনটাও এখন অনেকটা শকুন্তলার মতন।

Scene 38

[মালকোছা মেরে ধুতি পরা, খালি গা, মুখ ভর্তি কাঁচা পাকা দাড়ি, জঙ্গলের মধ্যে গাছ পুঁতছেন সরমার বাবা অবিনাশ। আর একটি সাতাশ-আঠাশ বছরের ছেলে উবু হয়ে খুরপি দিয়ে মাটি খুঁড়ছে আর গান গাইছে গুন গুন করে।

একটা গাড়ির আওয়াজ শুনে অবিনাশ সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, কপালে হাত দিয়ে দেখাব চেষ্টা করলেন। সময় সকাল।]

Scene 39

[জঙ্গলের মধ্যে একটা বাংলো ধরনের বাড়ি। তার সামনে থামলো একটা ট্যাক্সি, তার থেকে নামলো সরমা, শশী আব সুমন।]

শশী : সরমা, বাড়িটা দেখতে কেমন? একতলা, না দোতলা?

[সরমা বাড়িটার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিল। শশীর চোখে ভেসে উঠলো অন্য একটা বাড়ি।]

সরমা : সামনে চারটে সিঁড়ি, তারপর বড় বারান্দা।

শশী : ঠিক আছে।

সুমন : ঘোড়া, ঘোড়া আছে এখানে। আমি ঘোড়ায় চড়বো।

[দুটো ছোটো ছোটো ঘোড়া ঘুরছে বাগানে। সুমন সেদিকে ছুটে গেল।]

শশী : আকাশ কি মেঘলা?

সরমা : হ্যাঁ, সত্যি মেঘলা, তুমি বুঝলে কী করে?

শশী : [সহাস্যে] আমি গন্ধ পাই।

Scene 40

[বসবার ঘর। শশী লাঠি দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে, একটা সোফায় বেশ সচ্ছন্দে বসে পড়লো।]

শশী : আগে এক কাপ চা খেতে হবে।

সরমা : আমি দেখছি। বাবা বাড়িতে নেই মনে হচ্ছে।

[দরজার কাছে অবিনাশ। যে ছেলেটি মাটি খুঁড়ছিল, তিনি তার কাঁধ ধরে আছেন।]

অবিনাশ : এই তো আমি এসে গেছি। ট্রেন ঠিক টাইমেই এসেছে?

[সরমা তার বাবাকে প্রণাম করলো। শশীও। অবিনাশ তার সঙ্গের ছেলেটিকে বসিয়ে দিলেন একটা চেয়ারে। সে ছেলেটি জন্মান্ধ।]

শশী : ঘরের মধ্যে আর কে আছে?

অবিনাশ : এই ছেলেটির নাম হারান। খুব গুণী ছেলে।

শশী : হারান, ওর বয়েস কত?

অবিনাশ : ওর বয়েস এই আঠাশ-তিরিশ হবে। ও নিজেই জানে না।

শশী : হারান, তোমার গায়ের রং কী?

[হারান যে-ই মুখ তুললো, সঙ্গে সঙ্গে তার সামনেটা সম্পূর্ণ কালো হয়ে গেল। শশী চেনা মানুষদের অন্য পোশাকে তবু দেখতে পায়, অর্থাৎ তাদের আগেকার চেহারা কল্পনায় দেখে, কিন্তু হারান কিছুই দেখে না। সে সামনের দিকে চেয়ে কথা বলার সময় সম্পূর্ণ ঘরটাই অন্ধকার হয়ে যায়।]

হারান : রং কাকে বলে আমি জানি না।

অবিনাশ : শশী, এ ছেলেটি জন্ম থেকেই কিছুই দেখে না। এই পৃথিবীটা যে কেমন, সে সম্পর্কেই ওর কোনো ধারণা নেই।

সরমা : বাবা, একে তুমি কোথায় পেলে?

অবিনাশ : রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছি বলতে পারিস। একটা রিফিউজি কলোনিতে ছিল। কোথায় বাবরি মসজিদ ভাঙলো, তার ফলে এত দূরে কত মানুষের ঘর পুড়লো! এ ছেলেটা দিন আর রাত্তিরের তফাৎ বোঝে না, নারী আর পুরুষের চেহারা কেমন হয় জানে না, ও নিজেই যে কী রকম সে সম্পর্কেও কোনো ধারণা নেই, তবে ওর একটা অসাধারণ গুণ আছে। যে-কোনো গান একবার শুনলেই তুলে ফেলে। গলাটাও মিষ্টি, পরে শোনাবো ওর গান—

এই সব কথার মধ্যে শশী এক পলকের জন্য একটি জন্মান্ধ ভিখিরি ছেলেকে দেখতে পেল। এর পর থেকে সে হারানকে সে রকমই দেখবে।

শশী : পরে কেন, এখনই শুনি না একটা

অবিনাশ : হারান, সেই গানটা শোনা তো, 'তুই লাল পাহাড়ি দেশে যা—'

[হারান বিনা ভনিতায় গানটা শুরু করে দিল। মাঝে মাঝে ঘরটা অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, আবার অন্যদের *Point of view* থেকে আলো জ্বলে উঠছে।]

Scene 41

[বাগানে সুমনকে একটা ঘোড়ায় চাপিয়ে দৌড় করাচ্ছে একজন ভৃত্য। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে ঋষি।]

সুমন : শশীদা, এই দ্যাখো, আমি ঘোড়া চালানো শিখে গেছি!

[শশী সেদিকে তাকালো। সে সুমনকে দেখলো বাচ্চা আলেকজাণ্ডারের পোশাকে।]

শশী : ঠিক আছে আলেকজাণ্ডার, এবার রাজ্য জয় করতে বেরিয়ে পড়ো!

Scene 42

[অন্ধকার রাস্তায় একটা গাড়ি এঁকেবেঁকে ছুটছে। শশী গাড়ি চালাচ্ছে. তার পাশে একটি মেয়ে মুখ নিচু করে কাঁদছে। মেয়েটিকে চেনা যাচ্ছে না।

উল্টো দিক থেকে হেডলাইট জ্বেলে আসছে একটা ট্রাক. একেবারে মুখোমুখি। শেষ মুহূর্তে শশী গাড়ি ঘোরাবার চেষ্টা করতেই ধাক্কা লাগলো একটা গাছের সঙ্গে। গাড়ির দরজা খুলে শশী গড়িয়ে পড়ে গেল নিচে।]

Scene 43

[হাসপাতালের টেবিল। শশী শুয়ে আছে আচ্ছন্ন অবস্থায়. কয়েকজন ডাক্তার ও নার্স ঘিরে আছে তাকে। ঘরের আলোটা এক একবার কমে আসছে, এক একবার উজ্জ্বল হচ্ছে, আবার কমে আসছে, একবার খুব উজ্জ্বল হয়েই হঠাৎ সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে গেল।]

শশী : (চিৎকার করছে সেই অন্ধকারের মধ্যে) আমি দেখতে পাচ্ছি না, আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

Scene 44

[আবার সেই অন্ধকার ছাদ। হুইস্কির গেলাস হাতে মুখোমুখি শশী আর অশেষ। তারা ভর্তি আকাশ। চাঁদও দেখা যাচ্ছে।]

অশেষ : সেই অ্যাকসিডেন্টের সময় তোর গাড়িতে কে ছিল?

শশী : এতদিন পর আর তা জেনে কী হবে?

অশেষ : একটি মেয়ে ছিল, শেষ পর্যন্ত তার কী হলো?

শশী : তার কোনোই ক্ষতি হয় নি, পায়ে সামান্য চোট লেগেছিল।

অশেষ : বেচারা শশী! তুই প্রেম প্রেম করে এত হেদিয়ে মরলি, অথচ সত্যিকারের ভালোবাসা পেলি না কোনো মেয়ের কাছ থেকে। জীবনের আর সবকিছুও ব্যর্থ হয়ে গেল।

শশী : সবই কি ব্যর্থ হয়েছে।

অশেষ : তা ছাড়া কী? তুই এখন, একটা গুড ফর নাথিং! সারাদিন কী করিস? চোখ দুটো গেছে বলে শুধু বসে বসেই দিনগুলো কাটিয়ে দিচ্ছিস!

শশী : আমার অন্য বন্ধুরা, তুই, তোরা কী করছিস? কোন্ মহৎ কাজ নিয়ে মেতে আছিস, বল না আমাকে!

অশেষ : আমরা নিজেদের সাধ্য মতন কাজ করে যাচ্ছি।

শশী : কে কে মোটা হয়েছে? কে কে শুধু গাড়িতে চড়ে, ট্রাম-বাস ছুঁয়েও দেখে না?

অশেষ : সারা জীবন ট্রাম-বাসে চড়তে হবে, তার কোনো মানে নেই। গাড়িতে সময় বাঁচে।

শশী : দেশটা কতটা বদলেছে রে? আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে। এখনো মানুষ ব্রিজের তলায় সারা জীবন কাটিয়ে দেয়? বিয়ে বাড়ির সামনে ভিখিরিরা কুকুরদের সঙ্গে ঝগড়া করে খাবার কেড়ে নেয়?

অশেষ : [হা-হা করে হেসে] ওল্ড রোমান্টিক। ঐসব দিয়ে দেশের পরিবর্তন মাপা যায় না। তুই প্রেমে সার্থক হোস নি। কিন্তু রোমান্টিক কবিতাগুলো ভালোই লিখেছিলি। বোধহয় ব্যর্থ প্রেমেই প্রেমের গভীরতা বেশি বোঝা যায়।

[দেয়ালের কাছে রেবাকে দেখা গেল। তার সর্বাঙ্গ দিয়ে আলো বেরুচ্ছে। শশী এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে দিকে।]

শশী : রেবা, রেবা, তোমাকে কী বলেছিল সরমা? তুমি কেন অত কেঁদে ছিলে? বসো, বসো—

Scene 45

[অবিনাশের পাশাপাশি জঙ্গলের দিকে হাঁটছে শশী। সময়, ভোর। শশীর পরণে পা-জামা পাঞ্জাবি, অবিনাশ পরে আছেন ধুতি ও ফতুয়া। শোনা যাচ্ছে অনেক রকম পাখির ডাক।]

শশী : স্যার, কী কী গাছ লাগাচ্ছেন?

অবিনাশ : সোনাঝুরিই বেশি, ওগুলো তাড়াতাড়ি বাড়ে। তা ছাড়া কাঞ্চন, চমৎকার ফুল হয়। আগে এসব দিকে কী সুন্দর শালের জঙ্গল ছিল, কেটে কেটে একেবারে শেষ করে দিল।

শশী : যতদিন দেশে এত গরিব লোক থাকবে, ততদিন

অবিনাশ : বেশি গাছ কাটে তো ব্যবসায়ীরা, বে আইনি ভাবে... দেখো সাবধান, সামনে একটা গর্ত আছে।

শশী : এখানে কাক নেই?

অবিনাশ : নাঃ, বিশেষ চোখে পড়ে না

[একটা দোয়েল পাখি শিস দিল। দূরে শোনা গেল কোকিলের ডাক]

শশী : কতদিন পর দোয়েলের শিস শুনলাম! পাখিরা আমাদের বিনা পয়সায় কত রকম সুর শোনায়।

অবিনাশ : পাখিরা অবশ্য আমাদের জন্য ডাকে না। ডাকে অন্য পাখির জন্য। যেমন ফুল আমাদের জন্য ফোটে না। ফুলেরা এত সুন্দর হয় শুধু মৌমাছি, ভোমরা, আর সব পোকা মাকড়ের জন্য।

শশী : তা জানি, কিন্তু মৌমাছি-ভোমরারা কি ফুলের সৌন্দর্য অ্যাপ্রিশিয়েট করতে পারে, না শুধু মধু খেতে আসে!

অবিনাশ : তা হলে ফুলের এত বিচিত্র বর্ণবাহার কেন? মধু তো আছেই, মেয়েরা যেমন সাজগোজ করে, ফুলেরাও সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় নেমে প্রেমিকদের ডাকে।

শশী : মেয়েদের সঙ্গে ফুলের তুলনা চলে না। মেয়েরা অতি কঠিন প্রাণী।

অবিনাশ : হা-হা-হা

শশী : স্যার, গাছ আপনার সঙ্গে কথা বলে?

অবিনাশ : বলে বোধহয়, আমি এখনো বুঝতে পারি না। তবে একটা কিছু বলে, তা টের পাই। গৌতম বুদ্ধ বোধিবৃক্ষের তলায় বসে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। অনেকে বলে, সেই গাছই তার মনে গভীর জীবন বোধের সঞ্চার করেছিল। যে-কোনো গাছের তলায় তুমি যদি অনেকক্ষণ বসে থাকো, দেখবে, তোমার মনটা কেমন শান্ত হয়ে যাবে।

শশী : আমরা গাছতলায় আর বসি না, তাই পৃথিবীতে অশান্ত মানুষের সংখ্যা এত বাড়ছে। আমিও নিজের হাতে কয়েকটা গাছ পুঁতবো। যতদিন বাঁচবো, মনে মনে ভাববো, সেই গাছ বড় হচ্ছে, তাতে ফুল ফুটছে, ফল ফলছে, পথিকদের ছায়া দিচ্ছে, আশ্রয় দিচ্ছে কত পাখিকে।

অবিনাশ : শুধু তাই নয়, গাছও তোমার কথা ভাববে। হ্যাঁ, সত্যি, গাছ মানুষের জন্য ভাবে।

Scene 46

[জঙ্গলের মধ্যে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে কতকগুলো চারা গাছের শিকড়ে মাটি লাগিয়ে তৈরি করছে হারান। হঠাৎ একটা দোয়েল পাখির শিস শুনে সেও অবিকল সেই রকম শিস দিয়ে উঠলো।]

[একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে শশী আর অবিনাশ।]

অবিনাশ : দেখো হারানের কাণ্ড। পাখির ডাকের সঙ্গে ওর ডাকের তফাৎ বুঝতে পারলে?

শশী : ও কি পাখির ভাষা বোঝে?

অবিনাশ : না। ও শুধু সুরটা তুলে নেয়।

শশী : যারা জন্মান্ধ, তাদের কি কল্পনাশক্তি থাকে? তারা কল্পনায় কী দেখবে?

অবিনাশ : এর উত্তর দেওয়া খুব শক্ত। ভাবছি, ওকে কলকাতায় পাঠাবো। ওর গান নিশ্চিত সকলের ভালো লাগবে। তারপর ওর গান রেকর্ড হতে পারে, ফিল্মে গাইতে পারে, তাহলে ওর বেঁচে থাকা কিছুটা সার্থক হবে।

শশী : কলকাতায় আমার বাড়িতে থাকবে!

[অবিনাশ আর শশী হারানের পাশে বসে গাছ পুঁততে লাগলো।]

শশী : হারান, তুমি আমার সঙ্গে কলকাতায় যাবে?

হারান : কলকাতা কী?

শশী : একটা খুব বড় জায়গা। সেখানে অনেক মানুষ থাকে। আমরা ট্রেনে করে যাবো।

হারান : ট্রেন মানে... যাতে ভয়ংকর শব্দ হয়?

শশী : হ্যাঁ। সেখানে অনেক লোক তোমার গান শুনবে। তুমি অনেক টাকা পাবে।

অবিনাশ : [হেসে] ও টাকার মানেই বা কি বোঝে?

শশী : এক হিসেবে সুখের জীবন। সারা জীবন যে টাকাই চিনলো না

[দূরে একটা কোকিল কয়েকবার ডেকে উঠতেই হারান কু কু করে তার উত্তর দিতে শুরু করে।]

Scene 47

[বাড়ির সামনে একটা জিপ গাড়ি। মিহির নামে একজন রেঞ্জার ওদের একটা ফরেস্ট বাংলোতে বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্য এসেছে। টিফিন ক্যারিয়ার ও কয়েকটি ব্যাগে নানা রকম খাদ্য পানীয় উঠছে জিপে।

অবিনাশ, শশী আর মিহির সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। ভেতর থেকে হারানের হাত ধরে বেরিয়ে এলো সুমন। তার পেছনে বেশ সাজগোজ করে সরমা।]

মিহির : আপনি সত্যি যাবেন না?

অবিনাশ : নাঃ, শরীরটা আজ ভালো নেই। তোমরাই ঘুরে এসো!

মিহির : গেলে কিন্তু ভালো লাগতো।

অবিনাশ : আমি তো আগে দেখেছি। আর দেরি করো না, উঠে পড়ো।

[মিহির নিজেই জিপের চালক। সামনের সিটে বসানো হলো হারানকে। পেছনে সরমা ও শশী, তার পাশে সুমন। জিপটা চলতে শুরু করলো।]

Scene 48

[জিপ চলছে জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে।]

সুমন : কই কিছু দেখা যাচ্ছে না তো!

শশী : দাঁড়াও, আগে সন্ধে হোক।

সুমন : দিনের বেলা হরিণরা কী করে?

শশী : বাঘের ভয়ে লুকিয়ে থাকে।

সুমন : আর বাঘেরা কী করে?

শশী : তারা ঘাপটি মেরে ঝোপের আড়ালে বসে থাকে।

সুমন : আর হাতি?

মিহির : [ঘাড় ঘুরিয়ে] হাতির কথা বলো না বাবা। ওরা দিন রাত্তির মানে না। যখন তখন রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে থাকে। সে রকম কিছু হলেই মহা ঝামেলা!

সুমন : আমি হাতি দেখবো। আমি হাতি দেখবো!

Scene 49

[শশীর চোখে ভেসে উঠলো অন্য দৃশ্য। রেবার হাত ধরে সে এই রকম একটা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ছুটছে। ছুটছে তো ছুটছে। আকাশে গুরু গুরু করছে মেঘ। প্রচণ্ড শব্দে কাছেই বজ্রপাত হলো। সঙ্গে চোখ ঝলসানো বিদ্যুৎ।]

রেবা : আমাকে তুমি কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?

শশী : যেখানে আমাদের কেউ দেখতে পাবে না।

রেবা : সেখানে আমি কেন যাবো তোমার সঙ্গে!

শশী : কেন যাবে না?

রেবা : আমার বিয়ে হয়ে গেছে।

শশী : না, তোমার বিয়ে হয় নি।

রেবা : কী পাগলামি করছো, শশী! বাবা আমাব জন্য অপেক্ষা করছে, একটু বাদেই ট্রেন ধরতে হবে।

শশী : তোমার বাবা নেই, মা নেই, কেউ নেই।

[রেবা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। হাত ছাড়িয়ে নিল শশীব কাছ থেকে। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে তার।]

রেবা : আমার আর কেউ নেই, শুধু তুমি আছো?

শশী : হ্যাঁ। যখন এই কথাটাই সত্যি হোক চেয়েছিলাম, তখন তুমি অনেক দূরে সরে গিয়েছিলে।

রেবা : তখন দেশোদ্ধার করবো বলে মেতে উঠেছিলাম। ভেবেছিলাম, বিপ্লব এসে গেল! অন্য কোনো দিকে মন দেবার সময় নেই, লড়াই করতে হবে। এই হাতে সত্যি সত্যি রিভলভার ধরেছি, বিশ্বাস করো, বোমা ছুঁড়েছি।

রেবা : আমাকেও কেন তখন ডাকো নি? আমিও তোমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারতাম না? অন্য কয়েকটি মেয়ে তো গিয়েছিল।

শশী : তখন অনেক রকম ভুল করেছি, এটাও তার মধ্যে একটা।

রেবা : এখন বড় দেরি হয়ে গেছে শশী!

[রেবা হাঁটতে হাঁটতে মিলিয়ে গেল গাছপালাব আড়ালে। শশী দাঁড়িয়ে রইলো একা। আবার বজ্রপাত হলো।

তারপরই জিপ গাড়ির শব্দ।]

Scene 50

[আবাব জিপ গাড়ির মধ্যে।]

সুমন : তারপর আলেকজাণ্ডার কী করলো?

সরমা : কতবার ঐ একই গল্প শুনচি!

সুমন : আঃ মা, শুনতে দাও না!

শশী : তারপর তো আমাদের দেশের রাজা পুরুর সঙ্গে আলেকজাণ্ডারের খুব লড়াই চলতে লাগলো। অনেক দেশ জয় করেছেন আলেকজাণ্ডার কিন্তু এখানকার লড়াই অন্যরকম।

সুমন : কেন অন্যরকম?

সরমা : এখানে যে সৈন্যরা হাতির পিঠে চড়ে লড়াই করে! আলেকজাণ্ডারের সৈন্যরা তো আগে হাতি দেখেনি।

হারান : হাতি কী?

মিহির : আবার আপনারা হাতির কথা শুরু করলেন?

সুমন : কেন হাতি দেখেনি?

সরমা : আলেকজাণ্ডার যেখানে জন্মেছেন, সেই ম্যাসিডোনিয়ায় হাতি নেই, গ্রীসে হাতি নেই, আরব দেশ জয় করতে করতে এসেছেন, সেখানেও হাতি নেই।

সুমন : আলেকজাণ্ডার হাতি দেখে ভয় পেয়েছিলেন?

শশী : না, আলেকজাণ্ডার ভয় পান নি। তাঁর সৈন্যরা তো ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করে। সেই ঘোড়াগুলো হাতির কাছে এগোতে সাহস পাচ্ছিল না। তখন আলেকজাণ্ডার একটা বুদ্ধি করলেন, তিনি তাঁর সৈন্যদের বললেন, যেমন করে পারো রাজা পুরুকে বন্দী করে আনো। রাজা পুরু ধরা পড়ে গেলেন, তখন তাঁর সৈন্যরা ভয় পেয়ে পালাতে লাগলো।

সুমন : তারপর? তারপর?

শশী : বন্দী করে রাজা পুরুকে আনা হলো আলেকজাণ্ডারের কাছে। তিনি ইচ্ছে করলে তখনই পুরুর মুণ্ডুটা কেটে ফেলতে পারতেন। তা না করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমার কাছে কী রকম ব্যবহার আশা করো। রাজা পুরু তেজের সঙ্গে বললেন, বীরের প্রতি বীরের মতন ব্যবহার। আলেকজাণ্ডার বললেন, সত্যি তুমি বীরপুরুষ। তোমাকে সম্মান জানানো উচিত। আলেকজাণ্ডার পুরুকে মুক্তি দিলেন, তার রাজ্যও ফিরিয়ে দিলেন। শুধু তাই নয়, আর যুদ্ধ না করে ফিরে গেলেন নিজের দেশে।

সরমা : তুমি যদি আলেকজাণ্ডারের মতন হতে চাও, তা হলে শুধু নিজে বীরপুরুষ হলেই হবে না, অন্য বীরদেরও সম্মান জানাতে শিখতে হবে।

[একটুক্ষণ চুপ। জিপ ছুটছে। সুমন ভুরু কুঁচকে চিন্তা করছে।]

সুমন : আমার বাবা কী বীর?

[সরমা তাকালো শশীর দিকে। শশী সুমনের মাথায় হাত রাখলো।]

শশী : হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। যে নিজের কাজ খুব ভালো পারে, সে-ই বীর। তোমার বাবা কত ভালো ছবি আঁকেন।

Scene 51

[ফরেস্ট বাংলোর দোতলার বারান্দা। একটা হ্যাজাক জ্বলছে। বাইরে মিশমিশে অন্ধকার। কয়েকটা কুকুর অবিরাম ডেকে চলেছে।

একটা প্লেটে মুর্গি ভাজা। কয়েকটা গেলাশ, রামের বোতল।]

মিহির : এখানে একটা পুকুর আছে, রাত্তিরে অনেক জন্তু-জানোয়ার জল খেতে আসে। ভাগ্যে থাকলে আপনারা কিছু দেখতেও পারেন।

সুমন : হাতি আসবে? আমি হাতি দেখবো!

মিহির : তাও আসতে পারে।

শশী : হাতির ডাক শুনলে তবু আমি কল্পনায় হাতি দেখতে পাবো। হারান কি বুঝবে?

সরমা : জীবনে কত কিছুই ওর জানা হবে না!

[সে একটা মুর্গি ভাজা হারানের হাতে তুলে দেয়।]

শশী : কুকুরগুলো এত ডাকছে কেন?

মিহির : বোধহয় ধারে কাছে কোনো লেপার্ড এসেছে।

সুমন : চিতা বাঘ?

মিহির : বাংলায় চিতা বাঘই বলে, আসল চিতা অন্য রকম, তা আর এ দেশে নেই. এই লেপার্ডগুলো ছোট ছোট, কিন্তু দারুণ হিংস্র, কুকুর ওদের প্রিয় খাদ্য।

সুমন : চিতা বাঘ যদি ওপরে উঠে আসে? তোমার বন্দুক আছে?

শশী : কী বীরপুরুষ, ভয় পেলে নাকি?

সুমন : আমি মোটেই ভয় পাই না।

[মিহির দুটি গেলাসে রাম ঢাললো। তারপর তাকালো সরমার দিকে।]

মিহির : আপনি?

সরমা : নাঃ, আমি কোল্ড ড্রিংকস নেবো।

শশী : সরমা, আজ খাওনা একটু। আগে তো খেয়েছো?

সরমা : অনেক দিন... আচ্ছা, একটুখানি দিন!

মিহির : [হারানের দিকে ইঙ্গিত করে।] একে দেবো?

সরমা : কখনো খেয়েছে কি না জানি না। হারান, তুমি কোনো দিন মদ খেয়েছো?

হারান : মদ কী?

সরমা : তা হলে জীবনে একবার অন্তত স্বাদ নিয়ে দেখুক না!

শশী : প্রথমবার খেলে বেশি নেশা হয়ে যেতে পারে। যদি হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে পড়ে, কিছুই তো বুঝবে না., ডেঞ্জারাস।

মিহির : আমি ওকে অন্য জিনিস দিচ্ছি।

শশী : ও কত কিছু চেনে না! হিন্দু, মুসলমান, ক্রিশ্চানের তফাৎ বোঝে না। টাকা চেনে না। সম্পত্তি চেনে না। আদিমকালে আমরা সবাই এরকমই তো ছিলাম। সভ্যতা আমাদের যে দৃষ্টিশক্তি দিল, তাতে কী লাভ হলো? চতুর্দিকে শুধু লোভ, হিংসা, মারামারি কাটাকাটি।

সরমা : নারী পুরুষের তফাৎ নিশ্চয়ই বোঝে। হারান, তুমি ছেলে না মেয়ে?

হারান : আমি ছেলে।

সরমা : মেয়েরা কেমন হয় তুমি জানো?

হারান : জানি। মেয়েরা নরম নরম।

[মিহির আর সুমন হেসে উঠলো।]

শশী : ভালো করে যদি বুঝতে বাবা, তা হলে টের পেতে ঐ নরম শরীরই কত কঠিন হৃদয় হতে পারে।

সরমা : আ-হা-হা। পুরুষদের মতন মেয়েরা কখনো অত নিষ্ঠুর হয় না।

শশী : লেডি ম্যাকবেথের কথা মনে করো।

হারান : মার একটা মা ছিল, খুব নরম।

শশী : হ্যাঁ, মায়েরাই শুধু নরম।

মিহির : একটা গান হোক বরং

[হারান দু'লাইন গান গাইতে না গাইতেই দূরে শোনা গেল হাতির ডাক।]

সুমন : ওটা কি?

মিহির : চুপ, হাতি আসছে।

[হারান ছাড়া আর সবাই বারান্দার রেলিং-এর কাছে ছুটে গেল। হাতির ডাক ক্রমশ কাছে আসছে। এর মধ্যে চাঁদ উঠেছে, অন্ধকার খানিকটা পাতলা।]

মিহির : একটা নয়, মনে হচ্ছে হাতির পাল।

সরমা : টর্চ নেই?

মিহির : এখন আলো ফেলতে নেই। কথাও বলতে নেই।

[পুকুরের ধারে অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে হাতিগুলোকে। অনেকগুলো ডাকছে এক সঙ্গে। গা ছমছম করে। সুমন জড়িয়ে ধরে আছে মাকে। হারান যেখানে বসেছিল, সেখানেই বসে আছে এক ভাবে।

শশী এক চুমুকে তার গেলাসের পানীয় শেষ করলো।

মিহির সুমনকে উঁচু করে তুলে ধরলো হাতি দেখাবার জন্য। সরমা সরে এসে শশীর গা ঘেঁষে দাঁড়ালো।]

সরমা : এত কাছে, ওরা কখনো বাংলোর মধ্যে ঢোকে না?

মিহির : হঠাৎ এসেও পড়তে পারে। ওদের তো মর্জি বোঝা ভার, এদিকে আসতে চাইলে ওদের আটকাবার সাধ্য কারুর নেই। একবার একটা বাংলো তছনছ করে দিয়েছিল।

সরমা : আজ যদি সে রকম হয়।

শশী : হয় হোক!

মিহির : না ম্যাডাম, অত ভয় পাবেন না। হাতিদের ডিস্টার্ব না করলে ওরা কোনো ক্ষতি করে না।

সরমা : আমি নিজের জন্য ভয় পাই না। কিন্তু ছেলেটা

শশী : সুমনের জন্য চিন্তা কোরো না। ওর কিছু হবে না।

Scene 52

[দলে দলে হাতি যেন তাড়া করে আসছে। শশী, চক্ষুষ্মান, পাঁজা কোলা করে ধরে আছে সুমনকে। ছুটছে'

পর মুহূর্তেই দেখা যায়, সুমনের বদলে সরমা তার দু'হাতের মধ্যে। সে ছটফট করছে।

তারপর সম্পূর্ণ অন্ধকার। শোনা যাচ্ছে শুধু হাতির ডাক।]

Scene 53

[এখন সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ রাত্রি। বারান্দার রেলিং-এর কাছে দাঁড়িয়ে সরমা, সে রামের গেলাসে চুমুক

দিচ্ছে। জন্তু-জানোয়াররা আর নেই। শুধু দূরে শোনা যাচ্ছে একটা ময়ূরের ডাক। একটা ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলো শশী।]

শশী : সরমা?

সরমা : কী?

[সেই শব্দ শুনে সরমার দিকে এগিয়ে গেল শশী।]

শশী : ঘুমোলে না?

সরমা : ঘুম আসছে না। এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে বেশ লাগছে।

শশী : আমারও ঘুম আসছে না। একটু বেশি নেশা করে ফেলেছি আজ।

সরমা : আমিও... অনেকদিন পর

[শশী সরমার কাঁধে হাত রাখলো। সরমা আপত্তি করলো না।]

শশী : শেষের দিকে হাতিগুলো এমন চিৎকার করছিল যে মনে হচ্ছিল, সত্যিই বুঝি বাংলোর কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকে পড়বে।

সরমা : আমারও বুক কাঁপছিল।

শশী : এখন শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম, যদি আজই জীবনের শেষ রাত হতো তা হলে একটা কথা তোমাকে বলাই হতো না।

সরমা : আমাকে?

শশী : তুমি যখন কলেজে পড়তে, আমি তোমাদের বাড়ি প্রায়ই যেতাম, স্যারের সঙ্গে আমার অনেক সিরিয়াস আলোচনা হতো, কিন্তু এক একদিন আমার মনে হতো

[কথা বলতে বলতে শশী সরমার কোমরে হাত রাখে। তাকে টেনে আনতে চায় বুকের কাছে। সরমা নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়।]

সরমা : এ কী করছো শশীদা?

শশী : আমার এক একদিন মনে হতো, স্যার বাড়ি না থাকলে বেশ হয়, আমি সেদিন শুধু তোমার সঙ্গে গল্প করবো।

সরমা : আমার সঙ্গে? বাজে কথা! তোমার তখন অনেক বান্ধবী ছিল।

শশী : বান্ধবী না, এমনি চেনা। সে রকম তো থাকেই। কিন্তু তোমাকে দেখলেই আমার বুকটা ধক করে উঠতো।

সরমা : তাই নাকি? তোমার তখন দারুণ গ্ল্যামার, চেহারা ভালো, টাকা পয়সা খরচ করো দু'হাতে, গাড়ি চালাও, কবি হিসেবে নাম হচ্ছে, ওদিকে আবার বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছো, তুমি আঙুল তুলে ডাকলেই সুন্দরী মেয়েরা ছুটে আসে, সেই তোমার কেন বুক ধক করবে এরকম একটা খেঁদিপেঁচির জন্য?

শশী : তখন বুঝিনি। এখন নিজেকে ভালো বুঝতে পারি। ওসব গ্ল্যামার ট্যামার কিছুই কিছু নয়। ও সবের জন্য অনেক সময় জীবনের সত্যটাই আড়াল হয়ে যায়। আমি আসলে তোমাকেই চেয়েছিলাম সরমা।

সরমা : চেয়েছিলে, তখন বলো নি কেন?

শশী : বলতে পারি নি। দ্বিধা ছিল। তা ছাড়া আমার মনে হতো, তুমি নিখিলের জন্য।

সরমা : বাজে কথা। তখনো নিখিলের সঙ্গে আমার ভালো করে পরিচয়ই হয় নি।

শশী : তুমি নিখিলের স্টুডিওতে যেতে।

সরমা : আরও অনেকের সঙ্গে

শশী : কিন্তু আমার বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল

সরমা : তবে একটা কথা শোনো শশীদা। সরমা নামে এক গরিব অধ্যাপকের মেয়ে শশী নামে একজন প্রতিভাবান কবির দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতো। কবি তখন সেই সাধারণ মেয়েটিকে পাত্তাই দেয়নি, তার অনেক সঙ্গিনীর মধ্যে একজন ছিল রেবা, দারুণ অ্যাট্রাকটিভ, সেই রেবাই মন জুড়ে ছিল কবির। এটাই আসল সত্যি কথা।

শশী : তখন হয়তো নিজের মনটাকেই চিনতাম না। বাইরে থেকে দেখেছি। এখন অন্যরকম দেখতে পাই। আজ বুঝতে পারছি, কত বড় ভুল করেছি জীবনে। এখন কি সেই ভুলটা

সরমা : দিনের পর দিন যে মেয়েটি উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে থাকতো তোমার দিকে, তুমি তাকে অবহেলা করেছো, তাকে ঠেলে দিয়েছো অন্য দিকে, তার মনটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে... এতদিন বাদে

শশী : না, না, ওসব সত্যি নয়। আমি তোমাকে চাই। কেন বাকি জীবনটা নষ্ট করবো। এসো

[শশী আবার সরমাকে টেনে নিয়ে আদর করবার চেষ্টা করে। সরমা রাজি নয়, সে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চায়। শশী জোর করে তার মাথাটা গুঁজে দেয় সরমার বুকে।]

সরমা : [কঠোর সরে] আমারও আত্মসম্মান আছে। ছেড়ে দাও শশীদা! এবার শশী তাকে ছেড়ে দেয়। সরমা চলে যায় নিজের ঘরে।

Scene 54

[খাটের ওপর ঘুমিয়ে আছে সুমন। সরমা তার মাথার কাছে এসে চুলে হাত বুলিয়ে দেয়। সুমন জাগে না।

সরমা আয়নার কাছে এসে কাপড় ছাড়তে শুরু করে। তার ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। শাড়িটা একবার খুলে ফেলেও আবার পরে নিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।]

Scene 55

[শশী এখনো দাঁড়িয়ে আছে বারান্দার সেই একই জায়গায়।

সরমা রামের বোতল থেকে গেলাসে আরও খানিকটা রাম ঢেলে তাতে জল মেশায়। সেই শব্দ শুনে শশী তাকে ডাকলো।]

শশী : সরমা!

[সরমা সেই ডাকে সাড়া না দিয়ে গেলাসটা হাতে নিয়ে নেমে যায় সিঁড়ি দিয়ে। বাগানে সে বেড়াতে থাকে একা একা। এখন জ্যোৎস্না বেশ উজ্জ্বল।

এক তলার একটা ঘর থেকে চাপা গলায় গান ভেসে আসছে।

একটু বাদে সরমা এগিয়ে আসে সেই ঘরের দিকে।]

Scene 56

[ঘরের মধ্যে খাটিয়ায় বসে গান গাইছে হারান। পাশে আওয়াজ শুনে হঠাৎ সে থেমে গেল।]

হারান : কে?

সরমা : থেমো না। গাও, গাও।

[হারান আবার গাইতে থাকে। সরমা তার গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। তাকে আদর করতে করতে তার একটা হাত তুলে রাখে নিজের বুকে। হারানের গান থেমে যায়। সরমা তার গেলাসটা হারানের ঠোঁটে চেপে ধরে।]

সরমা : খাও!

[হারান দিব্যি একটা চুমুক দেয়। এবার সরমা তার ঠোঁটের কাছে নিয়ে যায় নিজের ঠোঁট। তাকে পাগলের মতন আদর করতে থাকে।]

সরমা : গান করো, গান করো।

[হারান জড়িয়ে ধরে সরমার কোমর। দু'জনে পড়ে যায় বিছানায়। দু'জনে শরীর নিয়ে মেতে ওঠে। তখনও সরমা একই কথা বলতে থাকে]

সরমা : গান করো, থেমো না, অনেক গান গাও

Scene 57

[অবিনাশের বাড়ি। সামনের সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে আছেন অবিনাশ। বারান্দার একটা চেয়ারে বসে আছে শশী। সামনের উঠোনে দাঁড়িয়ে নিখিল।]

অবিনাশ : তুমি এত দূরে চলে এসেছো?

নিখিল : আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

অবিনাশ : এ বাড়ির সন্ধান তোমাকে কে দিল?

নিখিল : আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

অবিনাশ : আশ্চর্য কথা। এত কাণ্ড করে ডিভোর্স হলো, এখনো তুমি তাকে স্ত্রী বলছো?

নিখিল : ওসব তো কাগজের লেখা পড়ার ডিভোর্স। মানুষের জীবনের সম্পর্ক অত সহজে শেষ হয়ে যায় না।

অবিনাশ : অত সব খারাপ কথা, অত তিক্ততা তা হলে কিসের জন্য? মেয়েটা প্রায় মরেই যাচ্ছিল।

নিখিল : কী মুস্কিল, তা বলে সরমার সঙ্গে আপনি একবার আমাকে দেখা করতেও দেবেন না? After all we are civilized people.

অবিনাশ : তোমার ব্যবহারে অনেক সময়ই তা বোঝা যেত না। তুমি অমানুষ হয়ে উঠতে। খবর পাঠিয়েছি, সরমার ইচ্ছে হলে দেখা করবে।

নিখিল : আমি মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি

অবিনাশ : তাতে কী আসে যায়? মানুষ হিসেবে তুমি যা বদলে গেছ, আর ফিরতে পারবে? এক সময় আমরা তোমার ছবি দেখে মুগ্ধ হতাম। তুমি গ্রামে গ্রামে ঘুরে সাধারণ মানুষের জীবনের ছবি আঁকতে। তারপর যেই তোমার খ্যাতি হলো, তথাকথিত ইনটেলেকচুয়ালদের সঙ্গে মিশে মদ-গাঁজা-ভাঙ ধরলে, তোমার ছবির ধরনও বদলে গেল। বেলেল্লাপনাই যেন আধুনিকতা

নিখিল : আপনি ইতিহাসের পণ্ডিত হতে পারেন, কিন্তু একজন শিল্পী কী ছবি আঁকবে, সে সম্পর্কে ফতোয়া দেবার অধিকার আপনার নেই।

অবিনাশ একজন সাধারণ দর্শক হিসেবে তো মতামত জানাতে পারি। যে-ই তোমার নাম ডাক হলো, অমনি তোমার ছবিও হয়ে গেল বড় লোকদের দেওয়ালে টাঙাবার মতন ইলাস্ট্রেটিভ। ফিগার ড্রয়িং, শুধুই মেয়েদের ফিগার, যেন পুরুষ মানুষদের অস্তিত্বই নেই।

নিখিল আপনি ছবির কিছুই বোঝেন না। বিষয়বস্তুতে কিছুই আসে যায় না। পেইন্টিং-এ ফর্মই আসল, আর রঙের ব্যবহার। প্রত্যেক শিল্পীই বারবার ফর্ম বদলায়

[হঠাৎ চেঁচিয়ে]

সারা জীবন গরিবের ছবি আঁকতে হবে, এরকম আমাকে কেউ মাথার দিব্যি দিয়েছে? ন্যুড স্টাডি প্রত্যেক শিল্পীর কাছেই একটা চ্যালেঞ্জ। শিগগির সরমাকে ডাকুন।

অবিনাশ খবর পাঠিয়েছি তো! এক সময় অত অপমান করে সরমাকে তাড়িয়ে দিয়ে আবার তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছো, তোমার লজ্জা করে না? শশী, তোমার মনে আছে, সরমার ডিভোর্স নিয়ে কী কাণ্ডই না হয়েছিল!

শশী এ ব্যাপারে আমি কোনো মন্তব্য করতে চাই না।

নিখিল দ্যাট্স লাইক আ জেন্টলম্যান। এ ব্যাপারে ওর নাক গলাবার কোনো দরকার নেই।

Scene 58

দোতলার ঘরের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সরমা। দূরের গাছপালা দেখছে।

Scene 59

[একটি ঘরে ১৫/১৬টি যুবক যুবতী। বিভিন্ন ধরনের পোশাক। ঘরটা ধোঁয়ায় ভর্তি। কেউ সিগারেট, কেউ গাঁজা, কেউ মদ খাচ্ছে। সব দেওয়ালে ছবি।

সবচেয়ে বেশি উন্মত্ত নিখিল। তার হাতে রামের বোতল, বোতল থেকেই সে চুমুক দিচ্ছে।

এক কোণে দু'হাতে হাঁটু জড়িয়ে বসে আছে সরমা। নিখিল টলতে টলতে তার কাছে এসে বোতলটা মুখে চেপে ধরলো। সরমা মুখ সরিয়ে নিয়ে ঘাড় নেড়ে জানালো, সে খাবে না।

একটি মেয়ে গান ধরলো, উই শ্যাল ওভারকাম

আরও কয়েকজন গলা মেলালো তার সঙ্গে।

এই গানের মাঝে মাঝে নিখিল চেঁচিয়ে উঠছে, হরি ওঁ তৎ সৎ।

গান শেষ হতে না হতেই একটি যুবক উঠে দাঁড়িয়ে বললো, সাইলেন্স, সাইলেন্স!

সবাই থেমে গেল।]

যুবকটি : যতক্ষণ আমরা আলোর মধ্যে থাকি, ততক্ষণ প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের একটা সম্পর্ক থাকে। রাইট? আর যতক্ষণ আমরা অন্ধকারে, তখন কেউ কারুর নয়।

অন্য একজন : না, ঠিক হলো না, 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।'

আর একজন: লাইটস অফ! লাইট্স অফ!

[ঘরের আলো নিভে গেল।

তারপর শুরু হলো অন্ধকারে নানা রকম শব্দ। ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি, উঃ আঃ, চুমুর শব্দ, গেলাস ভাঙা।

আবার আলো জ্বলে উঠলো।

তখনো মেঝেতে দু'জোড়া ছেলে মেয়ে জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে।

একটি বড় সড় চেহারার মেয়েকে দেয়ালে চেপে ধরে আছে নিখিল, সেই মেয়েটির আঁচল লুটোচ্ছে, ব্লাউজের একটি বোতাম খোলা।

ঘরের এক কোণে বসে থাকা সরমার অপমানিত মুখ।]

Scene 60

[জানলার ধারে দাঁড়ানো সরমা। তার মুখখানি পাথরের মতন।]

একজন ভৃত্য: বাবু আপনাকে একবার নিচে আসতে বললেন।

সরমা : বলেছি তো, আমি যাবো না, যাবো না, যাবো না!

Scene 61

[নিচে অবিনাশ, শশী ও নিখিল।]

অবিনাশ : সে আসতে চাইছে না, আমি কী করবো?

নিখিল : সরমা জানে যে আমি এসেছি?

অবিনাশ : দু'বার খবর পাঠিয়েছি।

নিখিল : আপনি যে সত্যি কথা বলছেন, তা কী করে বুঝবো!

অবিনাশ : তোমার মতন একজন রাম-শ্যাম-যদুর জন্য আমি মিথ্যে কথা বলবো?

নিখিল : মিথ্যে না হোক, সত্য গোপন করতে পারেন।

অবিনাশ : কেন বাড়াবাড়ি করছো নিখিল? মানবিক সম্পর্ক একবার ভেঙে গেলে আর জোড়া লাগানো যায় না।

নিখিল : ওসব নীতিকথা আমি শুনতে চাই না। আমি ভেতরে গিয়ে একবার সরমার সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চাই।

অবিনাশ : আমার আপত্তি থাকলেও তুমি জোর করে ভেতরে ঢুকবে? এই না বলছিলে। তুমি সিভিলাইজড।

শশী : নিখিল, আমি একটা অযাচিত পরামর্শ দেবো? এখানে গায়ের জোর ফলাতে যাওয়াটা বোধহয় ঠিক হবে না।

নিখিল রুষ্ট চোখে তাকালো শশীর দিকে। তারপর পিছিয়ে গেল কয়েক পা। ওপরের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলো।

নিখিল : সরমা, সরমা!

[শশীর ঠোঁটে পাতলা হাসি]

নিখিল : সরমা, সরমা, আমি তোমার সঙ্গে শুধু একবার কথা বলতে চাই!

[বাগানের এক পাশ দিয়ে এগিয়ে এলো হারান। শব্দ শুনে সোজা যেতে লাগলো নিখিলের দিকে। ধাক্কা খেল নিখিলের সঙ্গে।]

হারান : সরমা কোথায়?

নিখিল : এ আবার কে?

[হারান হাত বুলোবার চেষ্টা করলো নিখিলের মুখে। নিখিল তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল।]

অবিনাশ : এই, ওকে কিছু করবে না!

Scene 62

[গভীর রাত, চারদিক শুনশান। বাড়ির সামনে, দু'হাত তুলে এদিক ওদিক ছুটছে প্রেতের মতন এক মূর্তি। সে হারান! সে যেন কাকে খুঁজছে।]

Scene 63

[কলকাতায় শশীর বাড়ি। সকাল। একটা ঘর থেকে শোনা যাচ্ছে হারানের গান।

নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে সরমা বাড়িটা ঘুরে চলে এলো সামনের দিকে। পাড়ার কয়েকটা ছেলে নিমগাছের ডাল ভাঙছে। প্রেস চলার শব্দ। নিবারণ হাত বুলিয়ে আদর করছেন একটা গরুকে।]

Scene 64

[শশী দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়।

দরজা দিয়ে ঢুকলো সরমা। তার হাতে একটা টিফিন কৌটো।]

সরমা : শশীদা, তোমার জন্য খানিকটা লাউ চিংড়ি এনেছি। তুমি ভালোবাসো।

শশী : লাউ চিংড়ি, বাঃ!

সরমা : দুপুরে ভাতের সঙ্গে দিতে বলো রঘুকে। ওকে রান্না ঘরে দেখলাম না। তোমাকে চা করে দেবো?

শশী : না, এখন চা খাবো না।

সরমা : সুমনের স্কুলে কী একটা গণ্ডগোল হয়েছে, বন্ধ। আমাকে তো আমার স্কুলে যেতেই হবে। তাই ছেলেকে রেখে যাবো তোমার কাছে।

শশী : তা বেশ তো, থাকুক। কী হয়েছে ওর স্কুলে

সরমা : ঠিক জানি না, বাড়িটার মালিকানা নিয়ে নাকি মামলা হচ্ছে! শশীদা, আজ সন্ধেবেলা হারানকে এক জায়গায় গান গাইতে নিয়ে যাবো। তুমি যাবে?

শশী : নাঃ!

সরমা : বুধসন্ধ্যা নামে একটা ক্লাবের ঘরোয়া ফাংশান। ওদের কয়েকজন মেম্বারকে আমি চিনি।

শশী : কালকেও এক জায়গায় গিয়েছিল না? কেমন হলো?

সরমা : বেশ ভালোই গেয়েছে, সবাই প্রশংসা করছিল। মজা কি জানো, প্রশংসায় হারানের কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। এক প্লেট ভর্তি মিষ্টি দিয়েছিল, গপাগপ করে খেয়ে যেতে লাগলো।

শশী : জোয়ান ছেলে, খাবেই তো।

Scene 65

[চেয়ার-টেবিলে খেতে বসেছে শশী। রঘু নামের পরিচারকটি খাবার দিচ্ছে তাকে। ভাত মাখতে মাখতে থেমে গেল শশী। মুখখানা উঁচু করে চুপ করে রইলো।]

রঘু : আর একটু ডাল দেবো?

শশী চুপ করে রইলো।

রঘু : মাছ দিই?

শশী : না, খেতে ইচ্ছে করছে না।

[পাত ছেড়ে উঠে পড়লো শশী। বেসিনে হাত-মুখ ধুলো। তারপর চলে এলো পাশে নিজের ঘরে। সিগারেট ধরালো। একটা বাজনার রেকর্ড চালিয়ে শুয়ে পড়লো খাটে। বিষণ্ণ ভাবে সিগারেট টানছে। এক সময় খুব কাশতে লাগলো।]

Scene 66

[একজন মধ্যবয়স্কা বিধবা মহিলা, শশীর মা, ডাকছেন শশীকে। দুপুর।]

মা : শশী, শশী!

[বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো যুবক শশী। তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছছে। সেই অবস্থায় বসে পড়লো খাওয়ার টেবিলে।]

মা : চুল আঁচড়ালি না?

শশী : পরে হবে, পরে হবে। অনেক দেরি হয়ে গেছে।

মা : ফিরলিই তো আড়াইটে বাজিয়ে। এতবেলা পর্যন্ত রোজ রোজ কে বসে থাকবে?

শশী : তুমি খেয়ে নাও না কেন? বলেছিই তো, আমার ভাত ঢেকে রাখবে।

মা : সেটাই উচিত। ঠাণ্ডা কড়কড়ে ভাত খাবি।

শশী : বেগুন ভাজা করেছো?

মা : আসছে! ভাত ভাঙ, ঘি দিচ্ছি

শশী : আমার দু'একজন বন্ধু দেখে ফেলেছে। তারা ঠাট্টা করে বলে, তুই মায়ের আদুরে ছেলে, মা গেরাস গেরাস করে তোকে খাইয়ে দেন

মা : অনেক বড় বয়েস পর্যন্ত তাই দিয়েছি বাপু! নিজের হাতে খেতেই পারতিস না

শশী : মা, তোমার আরও কয়েকটা ছেলে মেয়ে থাকা উচিত ছিল। তুমি তাদের আদর-যত্ন করতে পারতে। আমাকে তো বেশি পাবে না

মা : কেন, তুমি কোন্ রাজকার্যে ব্যস্ত থাকো?

শশী : রাজকার্যের ঠিক উল্টো কার্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ছি।

মা : তোর একটা ছোট বোন ছিল

শশী : আমার একটা বোন ছিল? কোথায় গেল সে?

মা কোনো উত্তর না দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

Scene 67

[হারানের হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠছে সরমা।]

Scene 68

[শশী এখনো শুয়ে আছে খাটে।

দরজার কাছে হারান আর সরমা। সন্ধে।]

সরমা : হারানকে নিয়ে যাচ্ছি শশীদা

শশী : ঠিক আছে, ঘুরে এসো

সরমা : তুমি ওকে আশীর্বাদ করো। আজ অনেক গুণী-জ্ঞানীদের সামনে...

শশী : আশীর্বাদ টাশির্বাদের দরকার নেই। গলা খুলে গাইবে, প্রাণ দিয়ে গাইবে। ঠিক আছে তো হারান?

[হারান মোটা গলায় বলে] হুঁ।

[সরমা হারানকে ধরে পেছন ফেরে।]

Scene 69

[হারানকে বাইরে দাঁড় করিয়ে ঘরের মধ্যে ফিরে আসে সরমা। শশীর খাটের পাশে দাঁড়ায়।]

সরমা : সন্ধে হয়ে গেছে, এখনো শুয়ে আছো কেন শশীদা?

শশী : সন্ধে হয়ে গেছে?

সরমা : অনেকক্ষণ। দাঁড়াও, আলোটা জ্বেলে দিচ্ছি

শশী : আলো জ্বেলেই বা কী হবে?

সরমা : তবু ঘরটা ঝলমলে দেখায়। ওঠো, ওঠো

[সে হাত ধরে শশীকে টেনে তুলে বসালো।]

সরমা : ইস, গেঞ্জিটা কী ময়লা হয়ে গেছে! বদলাও নি কেন? রোজ গেঞ্জি বদলাবে। তুমি নিজেকে দেখতে পাও না, কিন্তু অন্য লোক তো তোমায় দেখে।

শশী : তাতে কী আসে যায়?

সরমা : হ্যাঁ, আসে যায়। মনে হচ্ছে আজ স্নানও করো নি। কী, সত্যি করে বলো!

শশী : করিনি বোধহয়

সরমা : বোধহয়! ওঠো, উঠে পড়ো, আমি তোমার গা-টা মুছিয়ে দিচ্ছি

শশী : কী ব্যাপার, সরমা?

সরমা : মনে হচ্ছে, তুমি আজ খুব মন খারাপ করে আছো।

শশী : না তো!

সরমা : সারাদিন কেমন যেন আলগা আলগা কথা বলছো। তোমার মন খারাপ দেখলে আমারও মন খারাপ হয়ে যায়!

[সরমার কোমর একেবারে শশীর মুখের কাছে। শশী হাত দিয়ে তাকে দেখলো। সরমা সরে গেল না। হঠাৎ শশী উঠে দাঁড়ালো।]

শশী : [রুক্ষ স্বরে] তোমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে পড়ো

সরমা : তুমি আমাদের সঙ্গে গেলে পারতে। লোকজনের মধ্যে থাকলে--

শশী : না। আমি যাবো না।

[সে সরে গেল সরমার পাশ থেকে।]

Scene 70

[আবার সেই অন্ধকার ছাদ। টেবিলের দু'পাশে দুই বন্ধু। হাতে মদের গেলাশ। শশী খুব কাশছে। সিগারেটটা রেখে দিল অ্যাশট্রেতে।]

অশেষ : তুই এখনো এত সিগারেট খাস কেন? সবাই এখন ছেড়ে দিচ্ছে!

শশী : ঠিক আছে। একটু আধটু কাশি সবারই হয়।

অশেষ : অ্যাকসিডেন্টটা হবার আগে তুই সিগারেট খেতিসই না।

শশী : একটা-দুটো খেতাম। তুই ধরিয়েছিলি।

অশেষ : এবার ছেড়ে দে। আমাদের সবারই তো বয়েস হচ্ছে। ক্লান্ত সৈনিকেরা সবাই ঘরে ফিরেছে। শান্ত শিষ্ট সংসারি হয়েছে। শুধু বিজন ছাড়া

শশী : বিজন কী করছে এখন?

অশেষ : বিজনকে তোর মনে আছে? বিজন দাশগুপ্ত

শশী : বাঃ মনে থাকবে না? দত্তাবাদ থানা আক্রমণের সময় বিজনই তো নেতৃত্ব দিয়েছিল।

অশেষ : হ্যাঁ, একমাত্র সেই অ্যাকশানে তুই শেষ পর্যন্ত সঙ্গে ছিলি। আমাকে আর বিজনকে প্রটেকশান দিয়েছিলি। সেই বিজন জেল থেকে ছাড়া পাবার পরও আর ঘর সংসার করলো না। বিয়ে করলো না। বনগাঁর দিকে একটা গ্রামে থাকে।

শশী : তোর সঙ্গে দেখা হয়?

অশেষ : বিজন শহরে আসে না। আমি দু'তিনবার গেছি ওর কাছে। গ্রামের মানুষদের মধ্যে সলিড কাজ করছে। একটুও বদলায় নি।

শশী : পুরোনো বন্ধুদের খুব দেখতে ইচ্ছে করে আমার।

অশেষ : দেখা কথাটা তোর মুখ ফস্কে এখনো বেরিয়ে যায়

শশী : তা ঠিক নয়। আমি দেখতে পাই। যেমন তোকে দেখছি।

[অশেষ ঢোলা পাঞ্জাবি ও পা জামা পরে আছে। দাড়ি কামানো মুখ, মাথায় অল্প টাক। এখন সে বদলে গেল। প্যান্ট-শার্ট পরা তরুণ, মুখে দাড়ি, মাথা ভর্তি চুল।]

অশেষ : দশ-এগারো বছর আগেকার দেখা থমকে আছে তোর চোখে। তুই কি জানিস, আমি এখন দাড়ি কামাই, মাথায় টাক পড়েছে। এর মধ্যে কত কিছু বদলে গেছে।

শশী : হ্যাঁ, বদলে গেছে। আমি শুধু নিজের বদলটাই টের পাই। আরও কিছু কিছু দেখি। অন্ধ হয়ে একটা সুবিধে হয়েছে, বুঝলি অশেষ। আমার জীবন থেকে অন্ধকার ব্যাপারটাই মুছে গেছে। তোরা আলো ছাড়া কিছু দেখতে পাস না। আমার আলোর দরকার হয় না।

অশেষ : দ্যাট্স ইন্টারেস্টিং!

শশী : এখন আমি কারুর কথা শুনলে তার অন্তরটাও দেখতে পাই।

অশেষ : সেটা আমি বিশ্বাস করি না। মানুষের ভেতরটা স্বয়ং অন্তর্যামীর পক্ষেও বোঝা দুঃসাধ্য।

শশী : হয় তো ভুল দেখি। একটা কিছু কাঁপে। যেন অনেকগুলো তার ঝংকার দিয়ে ওঠে, তার মধ্যে একটা দুটো বেসুরো।

অশেষ : তুই এখন সর্বক্ষণ গান শুনিস।

শশী : বদলে যাওয়ার কথা হচ্ছিল, একটি জন্মান্ধ ছেলে, ওদের ব্যাপারটা তো আলাদা, আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, কলকাতা মানে কী? উত্তর দিতে গিয়ে আমার খটকা লেগেছিল, আমি নিজেই তো জানি না কলকাতা এখন কী রকম!

অশেষ : এত উঁচু উঁচু বাড়ি উঠছে যে অনেক রাস্তা তুই আর কল্পনাই করতে পারবি না। পুরোনো বাসিন্দারা বাড়ি বেচে দিচ্ছে, সেখানে গড়ে উঠছে নতুন নতুন ফ্ল্যাট বাড়ি, সেখানে আসছে অন্য রাজ্যের মানুষ, শহরের চরিত্রটাই বদলে যাচ্ছে। এখন যাকে বলে প্রমোটারদের রাজত্ব চলছে। অন্যান্য সব ব্যবসার মতন এ ব্যবসাতেও বাঙালি বিশেষ নেই। তোর টি ভি আছে।

শশী : টি ভি দিয়ে কী করবো?

অশেষ : ও, আই অ্যাম সরি। টিভি'র বদলে রেডিয়োই তোর পক্ষে... আমিও টিভি দেখতে পারি না, বাংলা অনুষ্ঠান প্রায় নেই বলতে গেলে, যা আছে, তাও দেখার যোগ্য নয়। এ শহরের অনেক ছেলে মেয়ে এখন আর বাংলায় কথা বলে না, ইংরিজি বলে, হিন্দি গান শোনে। এখন মিষ্টির দোকানের সাইন বোর্ডও বাংলায় লেখা হয় না। সমস্ত ব্যবসার জায়গা আর সাইন বোর্ড দেখলে বোঝাই যায় না যে এ শহরে বাঙালিরা থাকে।

শশী : আমরা অনেক কিছু হারিয়েছি, এবার কি বাংলা ভাষাটাও হারাবো?

অশেষ : আর একবার গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও করার উদ্যোগ নেওয়া উচিত হয় তো। গ্রামগুলো এখনো নষ্ট হয় নি। কিন্তু কে সে উদ্যোগ নেবে?

শশী : আমরা কি মরে গেছি, অশেষ?

টেবিলে প্রবল চাপড় মেরে সে বলে উঠলো ধ্যাৎ!

Scene 71

[রিক্সা থেকে নামলো সরমা। পয়সা দিয়ে, গেট খুলে, সে জোরে জোরে হাঁটতে লাগলো। তারপর দৌড়োতে শুরু করে চলে এলো নিজের ঘরে।]

Scene 72

[সরমার ঘরের মধ্যে। সে দরজাটা বন্ধ করে দিল। একটুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সে কাঁদতে লাগলো হু হু করে। কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়লো খাটে।

পাশের ঘরে বসে দুলে দুলে পড়ছে সুমন। মায়ের কান্না শুনে উঠে এলো এ ঘরে।]

সুমন : মা, তোমার কী হয়েছে?

[সরমা কান্না থামাতে পারলো না।]

সুমন : মা, তুমি কাঁদছো কেন?

[সরমা তবু কাঁদছে।]

সুমন : মা, ও মা

[সে এসে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরলো। আর সেও কাঁদতে শুরু করলো।]

সুমন : মা, তুমি কেন কাঁদছো? কেন?

[সরমা দু'হাতে বুকে টেনে নিল ছেলেকে]

Scene 73

[দোতলার লম্বা বারান্দা দিয়ে হেঁটে আসছে সরমা।

শশীর ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলো। শশী নেই। পাশের ঘরে, বারান্দাতেও নেই। ঘরের মেঝেতে কয়েকটা ক্যাসেট পড়ে আছে, সেগুলো তুলে রাখলো সরমা। ঘরটা একটু গুছিয়ে দিল।]

Scene 74

[ছাদে পায়চারি করছে শশী।

সরমা ঢুকে কয়েক পা এগোতেই শশী মুখ ফেরালো।]

শশী : সরমা?

সরমা : তুমি পায়ের আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারো?

শশী : প্রত্যেক মানুষের পায়ের আওয়াজ আলাদা। আজ খুব মেঘ করেছে তাই না?

সরমা : তাও বুঝতে পারো কী করে? সত্যি মেঘ করেছে।

শশী : 'শুনেছো কি বলে গেল সীতানাথ বন্দো
আকাশের গায়ে নাকি টক টক গন্ধ!
টক টক থাকে নাকো হলে পরে বৃষ্টি
তখন দেখেছি চেটে, একেবারে মিষ্টি।'
আমি টক টক গন্ধ পাচ্ছি!

সরমা : আকাশ একেবারে কালো হয়ে আছে। একটু পরেই বৃষ্টি নামবে!

শশী : আগে ছাদের এই দিকটা থেকে একটা ঝিল দেখা যেত। সেখানে অনেক পাখি আসতো। সেই ঝিলটা এখনো আছে?

সরমা : না। সে ঝিল বুজিয়ে অনেকগুলো ফ্ল্যাট বাড়ি হয়েছে।

[শশীর চোখে অনেকগুলো ফ্ল্যাট বাড়ির ছবি ভেসে উঠলো এক মুহূর্তের জন্য।]

শশী : সেই পাখিগুলো কোথায় গেল? তুমি আজ কী রঙের শাড়ি পরে আছো?

সরমা : এটা? কচি কলাপাতা বলতে পারো।

[শশী এতক্ষণ সরমাকে লাল শাড়ি পরা দেখছিল। এখন রং বদলে গেল।]

শশী : সরমা, তুমি আমাকে নিশ্চয়ই কিছু বলতে এসেছো!

সরমা : হ্যাঁ।

শশী : বলো

সরমা : শশীদা... আমি... এখান থেকে চলে যাচ্ছি

শশী : চলে যাচ্ছো? কেন? কেউ তোমাকে কিছু বলেছে? ঐ হারামজাদা বিপ্লবটা

সরমা : না, না, কেউ কিছু বলে নি। আমি হঠাৎ আজ মন ঠিক করে ফেলেছি। আমি ফিরে যাচ্ছি নিখিলের কাছে।

শশী : নিখিলের কাছে।

[সে সরমার কাছ থেকে অনেকটা সরে গেল। অন্যদিকে ফিরে রইলো।]

শশী : সে আবার তোমার কাছে এসেছিল?

সরমা : না, আর আসে নি। কোনো যোগাযোগের চেষ্টাও করে নি। আমি কাল একজনের কাছে শুনলাম, ওর খুব অসুখ। আর ছবি আঁকে না, কারুর সঙ্গে কথা বলে না, কিছু খেতে চায় না, সারাদিন শুধু শুয়ে থাকে। তাতেই বুঝতে পারলাম, ওর কোনো কঠিন অসুখ হয়েছে।

শশী : অসুখ হলে মানুষ হাসপাতালে কিংবা নার্সিংহোমে যায়। ওর এত বন্ধু বান্ধব

সরমা : কোনো বন্ধু বান্ধবের সঙ্গেও ও আর মেশে না। আমি তো জানি, মানুষটা যেমন জেদী,

তেমনি অভিমানী। দিনের পর দিন ও রং-তুলি ছুঁচ্ছে না, এটা ওর পক্ষে খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার। ছবিই তো ওর ধ্যান জ্ঞান। এই অবস্থায় হঠাৎ আত্মহত্যাও করে ফেলতে পারে।

শশী : তুমি শুধু একজন লোকের মুখে এসব শুনেছো? সে কে?

সরমা : আজ সকালে আমি ওর ওখানে গিয়েছিলাম। দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে রইলো, আমার সঙ্গে একটা কথাও বললো না। পুরোনো কাজের লোকটি এখনো রয়ে গেছে। আমাকে দেখে সে কেঁদে ফেললো। বললো, বউদি, দাদা আর বাঁচবে না! আমি ফিরে যাচ্ছি শশীদা, ওকে বাঁচিয়ে তুলতে চাই।

শশী : হয়তো ওর মনের এই অবস্থাটা সাময়িক। তুমি ফিরে যাবে, তারপর ও যদি আবার আগের মতন ভায়োলেন্ট হয়ে ওঠে?

সরমা : আমি বুঝে গেছি, আমি না ফিরলে ওকে আর ছবি আঁকায় ফেরানো যাবে না। একজন শিল্পীকে আমরা এই ভাবে শেষ হয়ে যেতে দেবো?

[শশী চুপ। সরমা কয়েক পা এগিয়ে এলো।]

সরমা : তা ছাড়া, সুমনের সঙ্গে তো ও কখনো খারাপ ব্যবহার করে নি? সুমন তার বাবার সঙ্গ থেকে কেন বঞ্চিত হবে? সুমনকে আমি বুঝিয়েছি, ও যেতে রাজি হয়েছে।

[শশী চুপ। সরমা এগিয়ে এসে শশীর হাত ধরলো।]

সরমা : হারানের কী হবে... তুমি ওকে বরং বাবার কাছেই পাঠিয়ে দিও।

শশী : হারানকে আমি কলকাতায় এনেছি, ওর দেখাশুনোর ব্যবস্থা আমিই করবো!

সরমা : শশীদা, তুমি মন থেকে অনুমতি দাও, আমি আজই

[সরমা একটু নিচের দিকে ঝুঁকতেই শশী তাকে দু'হাতে চেপে ধরলো।]

শশী : প্রণাম ট্রনাম করতে হবে না, প্লিজ। ও সব আদিখ্যেতা আমার ভালো লাগে না।

[সরমার মুখটা সে তার মুখের ঠিক সামনে তুলে ধরলো। যেন সরমাকে সে দেখতে পাচ্ছে।]

শশী : আমি মন থেকেই বলছি, জীবনটা তোমার নিজের, কী ভাবে বাঁচবে তা তুমিই ঠিক করবে, অন্যদের কথা শুনবে কেন?

সরমা : আমি মাঝে মাঝে এলে তোমার সঙ্গে দেখা করে যাবো

শশী : এসো—

[সরমাকে ছেড়ে চলে গেল খানিকটা দূরে। ছাদের দেয়াল ধরে হাঁটতে লাগলো জোরে জোরে। একটু পরেই এলো সুমন।]

সুমন : শশী কাকু, আমরা চলে যাচ্ছি!

শশী : শশীদা ছিলাম, হঠাৎ শশীকাকু হয়ে গেলাম কী করে?

সুমন : মা বলেছে, তোমাকে কাকু বলতে হবে।

শশী : ঠিক আছে।

সুমন : আমরা বাবার কাছে চলে যাচ্ছি।

শশী : বেশ ভালো কথা।

সুমন : বাবা ঘোড়া কিনে দেবে। তুমি তো দিলে না।

শশী : একজন কেউ দিলেই হলো। ঘোড়াটাই তো আসল

সুমন : শশীকাকু, তুমি কি বীরপুরুষ?

শশী : না, আমি কাপুরুষ

সুমন : কিন্তু মা যে বললো... আমরা অনেক দূরে চলে যাচ্ছি

শশী : এখন একবার কাছে এসো, আমাকে ধরো

[সুমন কাছে আসতেই শশী তাকে শূন্যে তুলে দু'গালে চুমো দিল]

শশী : তুমি যতদূরেই যাও, আমি তোমায় ঠিক দেখতে পাবো।

Scene 75

[ঘরের মধ্যে উন্মত্তের মতন ভাঙচুর করছে শশী। সব ক্যাসেট ফেলে দিচ্ছে। ফুলদানি ভাঙছে। হাতের কাছে যা পাচ্ছে সব। দরজার কাছে রঘুর ভয়ার্ত মুখ।]

রঘু : দাদা, দাদা, এ কী করছেন।

শশী : যা, দূর হয়ে যা

[দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল। একটা অব্যবহৃত স্ট্যাণ্ড ল্যাম্প রয়েছে পুরোনো আমলের। সে তুলে আছাড় মারলো। তারপর মিউজিক সিসটেমে দমাদম মারতে লাগলো লাঠির বাড়ি।]

Scene 76

[একদল লোক তাড়া করে আসছে, শশী একটা বোমা ফাটালো। তারপর ছুটলো পেছন ফিরে। তার এক পাশে অশেষ, অন্য পাশে বিজন নামে বন্ধু। কেউ কথা বলছে না, ছুটছে।]

[এখন শশী একা ছুটছে। মাঠের মধ্যে। মায়ের কণ্ঠস্বর] শশী, শশী, কতক্ষণ তোর ভাত নিয়ে বসে থাকবো?

[আকাশে ঝাঁক ঝাঁক পাখি। বৃত্তাকারে ঘুরছে। তারপরই সমস্ত পর্দা জুড়ে একটি মাত্র কাক। ডাকছে কর্কশ স্বরে।

শশী ছুটছে। একটা পুকুরের মাঝখানে দুটি মেয়েলি হাত। শশী গায়ের কোট খুলে ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে। সরমাকে উদ্ধার করে আনলো। সরমা উঠে দাঁড়িয়ে ভাস্কর্যের ভঙ্গিতে রইলো কয়েক মুহূর্ত, দুটো হাত মাথার পেছন দিকে। তারপর আবার সে ঝাঁপ দিল জলে। জল ছিটকে লাগলো শশীর চোখে। সে অন্ধ হয়ে গেল!

একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে অন্ধ শশী। ঠোঁটে সিগারেট, পরপর দেশলাই কাঠি জ্বালতে পারছে না। আলেয়ার মতন কয়েকটা আলো দপ দপ করে জ্বলে উঠলো তার চার পাশে।]

অশেষের কণ্ঠস্বর : তোর লেখা একটা কবিতা আমরা সুর দিয়ে গাইতাম, সেটা একজন রেকর্ড করেছে। তোর নাম দেয় নি। লিখেছে অজ্ঞাত!

রেবার কণ্ঠস্বর : তুমি কি শুধু আমাকেই চেয়েছিলে?

[নদীর ধারে বসে আছে শশী। কোমর জলে দাঁড়িয়ে রেবা।]

শশী : এই নদীটাকে বাদ দিয়ে শুধু তোমাকে চাই নি। রেবা খিলখিল করে হেসে উঠলো।

রেবা : তা হলে আমার বদলে তুমি নদীটাকেই নাও!

[রেবা সাঁতার কাটতে লাগলো জলকন্যার মতন।

একটা জেলখানার বন্ধ গেট। তাতে দমাদম করে ঘুঁষি মারছে শশী।

রাস্তায় অনেক মানুষ। তারা সবাই অন্ধ। তাদের মাঝখান দিয়ে হাঁটছে চক্ষুষ্মান শশী।

একটা গাড়ি চালাচ্ছে একজন অন্ধ মানুষ। তার পাশে বসে মুখ নিচু করে একটি মেয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে, তাব মুখ দেখা যাচ্ছে না।

আবার গাছতলায় দাঁড়িয়ে অন্ধ শশী। ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট। সে খুব কাশতে লাগলো। এক সময় গলগল করে রক্ত বেরুতে লাগলো তার মুখ দিয়ে।

স্কুল ব্যাগ কাঁধে নিয়ে সুমন দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে শশীর দিকে।]

Scene 77

[শশীর বাড়ি। বেলা দশটা-এগারোটা।

দশ-বারোজন মিস্তিরি বড় বড হাতুড়ি দিয়ে ভাঙছে একটা দেয়াল। পাড়ার লোকে ভিড করে দেখছে।

বাগানে দাঁড়িয়ে শশী কথা বলছে নিবারণের সঙ্গে। প্রেস থেকে বার করা হচ্ছে মেশিনপত্তর আর প্রচুর ছাপা ফর্মা, অনেক বাজে কাগজ, পুরোনো কাগজ।]

শশী : আপাতত প্রেসটা আপনার বাড়ি থেকে চালান। পরে আমি এখানে নতুন শেড করে দেবো।

নিবারণ : আরও কিছু টাকা ঢালো। মডার্নাইজ না করলে তো প্রফিট করা যাবে না। অফসেট আনতে হবে।

শশী (সহাস্যে) : খুব বেশি মডার্নাইজ করতে হলে তো আপনার বদলে একজন তরুণকে ম্যানেজার করতে হয়!

নিবারণ : সে তোমার যেমন মর্জি। আমি বুড়ো হলেও গায়ে এখনো যথেষ্ট জোর আছে। মাস্‌ল দেখবে?

নিবারণ পাঞ্জাবির হাতা গুটিয়ে মাসল দেখায়।

নিবারণ : টিপে দেখো!

শশী : আপনি নিশ্চয়ই লোহা চিবিয়ে হজম করে ফেলতে পারেন?

নিবারণ : ওটা তো কথার কথা, তবে, এখনো এক কিলো মাংস

শশী : শুধু গায়ের জোর দিয়ে তো আধুনিক প্রেস হবে না। কমপিউটার শিখুন।

[প্রচণ্ড গতিতে একটা গাড়ি এসে ব্রেক কষলো গেটের কাছে। তাব থেকে নেমে ছুটতে ছুটতে এলো বিপ্লব। সে শশীর মাসতুতো ভাই, প্রমোটার।]

বিপ্লব : ছোড়দা, তুমি এ কী করলে?

শশী : কি রে, অনেকদিন তোর পাত্তা পাওয়া যায় নি!

বিপ্লব : পাত্তা পাওয়া যায় নি মানে? আমাকে একটা খবর পাঠালেই... তুমি অন্য লোককে দিয়ে দিলে? একবার আমাকে জিজ্ঞেসও করলে না? এরা কী রকম ঠকায় তুমি জানো না!

শশী : সব প্রমোটারই বুঝি ঠকায়?

বিপ্লব : আমি তোমার নিজের লোক, আমি কি তোমাকে ঠকাতাম? আমি তোমাকে সবচেয়ে ভালো টার্ম অফার করেছিলাম।

শশী : আমি তো কোনো প্রমোটারকে দিই নি! একজন কনট্রাকটারকে দিয়ে এই পুরোনো ঝুরঝুরে বাড়ি ভেঙে ফেলে একটা ইস্কুল বানাচ্ছি।

বিপ্লব : ইস্কুল?

শশী : তোরা তো ইস্কুল প্রমোট করিস না!

বিপ্লব : ইস্কুল, মানে, কলকাতায় নতুন স্কুল বানিয়ে কী হবে? বরং মফঃস্বলে... গ্রামের কত ছেলে এখনো স্কুলে পড়ার সুযোগ পায় না

শশী : আর কলকাতার সব জমিতে তোরা ফ্ল্যাট বাড়ি খুলে কংক্রিটের জঙ্গল বানাবি!

বিপ্লব : ঠিক আছে, আমাকে বললে একটা ইস্কুলও বানিয়ে দিতাম। তাও তো অনেক জমি পড়ে থাকবে! এরকম প্রাইম ল্যাণ্ড

শশী : বাঃ, ইস্কুল হবে আর খেলার মাঠ থাকবে না? ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি করবে, খেলবে, আমি সেই কলকাকলি শুনবো... তুই চা খাবি?

বিপ্লব : চা? না, আমি এ সময় চা খাই না!

শশী : মাসিমার শরীর কেমন আছে?

বিপ্লব : মা ভালো আছে। মা বলেছিল, তুই শশীকে আমার নাম করে বলবি, তা হলে ও জমি নিশ্চয়ই তোকে দেবে!

শশী : ইস্কুল হচ্ছে শুনলে মাসিমা ঠিক খুশি হবেন। আমার মায়েরই তো বোন। শোন বিপ্লব, কনস্ট্রাকশান ঠিক হচ্ছে কি না, তুই মাঝে মাঝে এসে দেখে আমাকে পরামর্শ দিবি তো?

[বিপ্লব উত্তর না দিয়ে, রাগ দমন করার চেষ্টায় বড় বড় নিশ্বাস ফেলতে লাগলো।]

Scene 78

[নিজের ঘরে শশী। দেয়ালে হাত দিয়ে দিয়ে ঘড়িগুলো ঠিক করছে। কয়েকটা ঘড়ি বেঁকে আছে। দরজার কাছে একটি মেয়ে। তার নাম রিমা।]

রিমা : আমি রিমা, একটা লিট্‌ল ম্যাগাজিনের পক্ষ থেকে আসছি। একবার ভেতরে আসতে পারি?

শশী : না, আসতে পারো না! যখন তখন একজন মানুষের কাছে আসা যায় না। প্রাইভেসি বলে একটা ব্যাপার আছে, তা বোধ হয় জানো না? শব্দটার বাংলাই নেই!

রিমা : আপনি আগে দু'বার আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু বলেছি তো, আমি নাছোড়বান্দা। বারবার আসবো।

শশী : কেন? তুমি আমার কাছে কী চাও?

রিমা : কিছু না। একদম কিছু না!

শশী : আবার প্রেসে পত্রিকা ছাপিয়েছো? ধার মেটাতে পারছো না?

রিমা : সে পত্রিকাটি উঠে গেছে।

শশী : বেশ হয়েছে? তবে আমার কাছে ঘুরঘুর করছো কেন? তোমার নিজের বয়েসী ছেলেমেয়ে... তোমার কোনো প্রেমিক নেই?

রিমা : ছিল। ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। সে জন্য খুব কেঁদেছি। আপনিই তো বলেছিলেন প্রেমে ব্যর্থ হয়ে না কাঁদলে কবিতা লেখা যায় না।

শশী : বেশ করেছো, এখন যাও গিয়ে রাশি রাশি ব্যর্থ প্রেমের পদ্য লেখো। সেগুলো যেন আমাকে শোনাবার চেষ্টা কোরো না।

রিমা : আমি মোটেই নিজের কবিতা শোনাতে আসি নি। আপনি এখন আর কাঁদেন না?

শশী : ডেঁপো মেয়ে। সে কথা তোমাকে বলতে যাবো কেন?

রিমা : আপনাকে একটা দারুণ জিনিস দেখাতে এনেছি।

শশী : দেখাবে?

[রিমা খুব কাছে এসে শশীর পাশে বসলো। কাঁধের ব্যাগ থেকে বার করলো একটা খুব পুরোনো ডায়েরি। তার অনেক পাতা খসে বেরিয়ে আছে।

সেই ডায়েরিটা সে শশীর হাতে ছোঁয়ালো।]

রিমা : এটা কী বলুন তো!

শশী : একটা খাতা।

রিমা : কিসের খাতা, কার খাতা?

[শশী ডায়েরিটার মলাটে ও ভেতরের পাতায় হাত বুলিয়ে দেখতে লাগলো।]

রিমা : এটা আমি চুরি করেছি বলতে পারেন। প্রেসের সব কাগজপত্র বার করা হচ্ছে, বাজে কাগজের বাণ্ডিলে ছিল, হয়তো ওরা ফেলেই দিত। অনেক পাতা জলে ভিজে গেছে। কিছু কিছু বেশ পড়া যায়

শশী : এসব কবিতার আর কোনো মূল্য নেই আমার কাছে।

রিমা : তারিখ লেখা আছে, অন্তত সতেরো বছর আগে, এখনো পড়লে মনে হয় নতুন, এত ভালো লাগছে

[রিমার দু'কাঁধে হাত রাখলো শশী।]

শশী : তুমি আমার কাছে কী চাও, সত্যি করে বলো তো

রিমা : এই কবিতাগুলো ছাপাবার অনুমতি দেবেন?

শশী : তাতে তোমার কী লাভ?

রিমা : লাভ? লাভের কথা তো ভাবি নি। আপনি আমার প্রিয় কবি... এক একটা কবিতা অসমাপ্ত মনে হয়, একটু পড়ে শোনাবো?

[রিমা পড়তে শুরু করে]

স্বপ্নের মত একটি বিন্দু দুলছে অন্ধকারে...

[শশী জোরে জোরে মাথা দোলাতে থাকে অসমর্থনের ভঙ্গিতে]

শশী : থামো, থামো, কিচ্ছু হয় নি। তখন আমি অন্ধকারের মানেই বুঝতাম না।...

[একটুক্ষণ চুপ]

তোমার কাছে কলম আছে? লেখো

[শশী কবিতাটি নতুন ভাবে রচনা করতে শুরু করে। কান্না নেমে আসে তার দু'চোখ দিয়ে।]

স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজী

পাহারাদারদের বুটজুতো পরা পায়ের মশমশ শব্দ। দূরে কুকুরের ডাক। গভীর রাত্রি।
একটা গাড়ির ইঞ্জিনে স্টার্ট নেবার শব্দ। একটা দরজা বন্ধ হলো। শোঁ করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা। হেড লাইট জ্বলছে, গাড়িটা এগিয়ে যাচ্ছে।

কথক : ১৬ই জানুয়ারি, ১৯৪১ সাল। সুভাষচন্দ্র বসু গৃহবন্দী। এলগিন রোডের বাড়ির সামনে চব্বিশ ঘণ্টা পুলিশ ও গোয়েন্দারা পাহারা দেয়। সবাই জানে তিনি অসুস্থ। আসলে তিনি অসুস্থ নন, মাতৃভূমিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার তীব্র বাসনায় তিনি জীবনপণ করেছেন।

এই রাতে ইংরেজ সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি বাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছেন। তাঁর পরনে পাঠানের ছদ্মবেশ, মুখে দাড়ি, নাম নিয়েছেন মহম্মদ জিয়াউদ্দিন। গাড়ি চালাচ্ছেন তাঁর দাদা শরৎচন্দ্র বসুর ছেলে শিশির।

[গাড়ি ছুটে চলেছে। রাস্তায় মোষের পাল। লেভেল ক্রসিং। ভোর হচ্ছে আস্তে আস্তে। গরুর গলার ঘণ্টার টুংটাং শব্দ। কোনো স্নানযাত্রী মন্ত্র পড়ছে, ওঁ জবাকুসুমং সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ম্ মহাদ্যুতিম্।...]

কথক : ধানবাদ শহরে দিনের বেলাটা কাটিয়ে সুভাষচন্দ্র আবার রাতের অন্ধকারে গোমো স্টেশন থেকে চেপে বসলেন কালকা মেলে। এবার তিনি একা। তিনি বিখ্যাত দেশ নেতা, দু'বার সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছেন। কিন্তু ছদ্মবেশের জন্য সহযাত্রীরা কেউ তাঁকে চিনতে পারলো না।

[ট্রেন ছাড়ার শব্দ। ফেরিওয়ালাদের চিৎকার, যাত্রীদের হুড়োহুড়ি। প্লাটফর্মের পরিবেশ। ট্রেন ছুটছে।]

কথক : দিল্লির বাইরে একটা স্টেশনে নেমে তিনি আবার ধরলেন ফ্রন্টিয়ার মেল। পৌঁছোলেন পেশোয়ার।

[ট্রেন থামা এবং অন্য ট্রেন ছাড়ার শব্দ।]

কথক : আগে থেকেই ব্যবস্থা করা ছিল, পেশোয়ারের দেশকর্মীরা তাঁকে সাহায্য করবেন। এখানে সুভাষচন্দ্রের সর্বক্ষণের সঙ্গী হলেন ভগৎরাম তলোয়ার।

[পেশোয়ারের বাজার, নানা ধবনের গুঞ্জন, পাখির ডাক, মসজিদে আজান, একদল মিলিটারি মার্চ করে যাচ্ছে।]

কথক : পদে পদে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়। সুভাষচন্দ্র যেমন এখানেও জিয়াউদ্দিন, তেমনি ভগৎরামও নাম নিলেন রহমৎ খান। গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায় সুভাষচন্দ্রকে পাঠানদের মতন

পরিচ্ছদে বাঙালি বলে চেনা যায় না, কিন্তু কথা বললেই লোকে বুঝে যাবে, তাই তিনি বোবা সেজে রইলেন। কোনো ক্রমে পৌঁছোতে হবে কাবুলে, ব্রিটিশ রাজত্ব সীমার বাইরে।

[গাড়ির হর্ন, ঘোড়া ছুটে যাচ্ছে, বড় বড় ট্রাক চলাচলের শব্দ। ঝোড়ো হাওয়া।]

কথক : কঠিন, দুর্গম পথ। প্রবল শীত। তার মধ্য দিয়ে এই দু'জন কখনো গাড়িতে, কখনো ছোটো ছোটো ঘোড়ায় চেপে, কখনো পায়ে হেঁটে, শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন কাবুলে।

[ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে শোনা যাবে ফিসফিস কথা

ভগৎরাম: আর ইউ টায়ার্ড? ওয়ান্ট টু টেক রেস্ট?

সুভাষচন্দ্র: নো নো, আই অ্যাম ফাইন, মুভ অন, মুভ অন

আবার শহরের কোলাহল। একটা ব্যান্ডপার্টি যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে।)

কথক : সুভাষচন্দ্র দেশের বাইরে গিয়ে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করতে চান। এজন্য বিদেশী কোনো শক্তির সাহায্যের প্রয়োজন। প্রথম থেকেই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েত দেশে গিয়ে স্টালিনের কাছে সহযোগিতা চাইবেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও মস্কো থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

[একটা ইতালিয়ান গানের সুর।]

কথক : সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল জার্মানি থেকে। ইতালিয়ান দূতাবাস থেকে পাওয়া গেল নকল পাসপোর্ট। আবার ছদ্মনাম। জিয়াউদ্দিন হলেন অরলানদো মাৎসোট্টা। পরিধানে পাক্কা সাহেবের পোষাক।

[আবার গাড়ি, আবার ট্রেনের শব্দ।]

কথক : কলকাতা থেকে পলায়নের পর দশদিন পর্যন্ত ইংরেজ সরকার কিছুই টের পায় নি। দেশের মানুষ বিভ্রান্ত। গান্ধীজী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ উদ্বিগ্ন হয়ে টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছেন। আসল ঘটনা জানে মাত্র দু-একজন। অন্যদের কিছু বলা হচ্ছে না। অনেকেই ভাবছে, তিনি সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে চলে গেছেন।

[শান্তিনিকেতনের পরিবেশ। কোরাসে দু'লাইন গান: জয়যাত্রায় যাও গো...]

কথক : রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে খুব স্নেহ করেন। তিনি দারুণ চিন্তিত। শরৎ বসু শেষ পর্যন্ত তাঁকে প্রকৃত গোপন খবরটি না জানিয়ে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাদ করেছিলেন সুভাষকে।

[মিলিটারি মার্চ। হাইল হিটলার! হাইল হিটলার। ঘন ঘন বিমান উড়ছে। দূরে মেশিনগানের শব্দ।]

কথক : সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষের ইতিহাসের বৃহত্তম ও বীভৎসতম যুদ্ধ চলছে। এই যুদ্ধের হোতা অ্যাডল্ফ হিটলার। এমন নৃশংস, নিষ্ঠুর, রক্তলোলুপ স্বৈরাচারীও ইতিহাসে আগে দেখা যায় নি। এই হিটলারের সঙ্গে হাত মেলাবেন সুভাষচন্দ্র?

[পটভূমিতে যুদ্ধের গোলাগুলি ও বোমাবর্ষণ চলছে। নারী ও শিশুদের কান্না।]

কথক : বিপ্লবের সময়, যুদ্ধের সময়, আমাদের শত্রুর যে শত্রু, তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নেওয়া একটি প্রতিষ্ঠিত নীতি। ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ চলছে জার্মানদের, এখনই জার্মানদের সাহায্য

নিয়ে ইংরেজদের আরও আঘাত হেনে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। সুভাষচন্দ্র নাৎসী সেনাদের অমানবিক কার্যকলাপ সমর্থন করতে বাধ্য নন। এবং জার্মান সরকার যে অর্থ সাহায্য করবে, তা গ্রহণ করা হবে ঋণ হিসেবে, ভারত স্বাধীন হলে ফেরৎ দেওয়া হবে পুরোপুরি।

[কলকাতার পরিবেশ। ফেরিওয়ালার ডাক। রিক্সার ঠুং ঠাং, ট্রাম। বাংলায় কেউ কাকুকে ডাকছে।]

কথক : ইংরেজ সরকার বহু চেষ্টা করেও সুভাষচন্দ্রের কোনো হদিশ না পেয়ে হঠাৎ রটিয়ে দিল যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

[হকারের চিৎকার. টেলিগ্রাম, টেলিগ্রাম! সুভাষচন্দ্র বসু পরলোকে। সুভাষবাবু আর নেই। সুভাষবাবুকা ইন্তেকাল হো গয়া! এক সঙ্গে বহু লোক চেঁচিয়ে উঠলো . এই কাগজ! কাগজ দেখি· আমায় একটা দাও! একী সুভাষবাবু সত্যি বেঁচে নেই। কোথায় মারা গেলেন।

কেউ বললো, হতেই পারে না, অসম্ভব! একজন কেঁদে উঠলো।]

কথক · অচিরেই শোনা গেল, বার্লিন রেডিও থেকে সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠস্বর। দেশবাসীর উদ্দেশে তাঁর আহ্বান।

সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠস্বর .

আমি সুভাষচন্দ্র বসু, এখনও বেঁচে আছি, আজাদ হিন্দ রেডিও থেকে আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি! ব্রিটিশ সংবাদ সংস্থাগুলি সারা বিশ্বে আমার মিথ্যে মৃত্যুসংবাদ রটাচ্ছে! ভারতের ইতিহাসের এই সংকটময় মুহূর্তে আমি মরে গেলে তাদের সুবিধে হয়। এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে তারা ভারতকেও জড়িয়ে নিতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। ভারতবাসীদের আমি মনে করিয়ে দিতে চাই, এই যুদ্ধে ব্রিটিশের সঙ্গে কোনোরকম সহযোগিতা করা উচিত নয়, তাতে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি বিলম্বিত হবে। ইনকিলাব জিন্দাবাদ! আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ!

কথক : বার্লিনে সুভাষচন্দ্র স্থাপন করলেন 'স্বাধীন ভারত কেন্দ্র'। প্রবাসী ভারতীয় হিন্দু, মুসলমান, ক্রিশ্চান, শিখ, পার্শিরা সমবেত হলো তাঁর নেতৃত্বে। হিন্দ্ রেডিও, আজাদ মুসলিম রেডিও এবং জাতীয় কংগ্রেস রেডিও, এই তিন কেন্দ্র থেকে নিয়মিত প্রচারিত হতে লাগলো ভারতের স্বাধীনতার বাণী। ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে তিনি গড়ে তুললেন, এক ভারতীয় সেনাবাহিনী...

[অনেক লোক একসঙ্গে বলছে, নেতাজী! নেতাজী!]

কথক : কিছু কিছু জার্মান অফিসার সহানুভূতিশীল হলেও হিটলার ভারতীয়দের অবজ্ঞার চোখে দেখে। শেষ পর্যন্ত আশানুরূপ সাহায্য পাওয়া গেল না। ইতিমধ্যে জার্মানি রাশিয়া আক্রমণ করে বসেছে।। জাপানও যুদ্ধে যোগ দিয়েছে।

[প্রবল যুদ্ধ, বিমান ও কামানের গর্জন, আর্ত চিৎকার]

কথক : ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২। সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ শক্তি পরাজিত হলো জাপানের কাছে।

[বিউগল বাজছে, ক্লান্ত পায়ে মার্চ করে যাচ্ছে পরাজিত সৈন্যরা। অন্যদিকে বিজয়ীদের উল্লাসধ্বনি।]

কথক : আর একজন বিপ্লবী, রাসবিহারী বসু, ইংরেজ পুলিশের শ্যেন দৃষ্টি এড়িয়ে পালিয়ে

গিয়েছিলেন দেশের বাইরে। তিরিশ বছর আগে। বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ-কে বোমা মেরে হত্যার চেষ্টা করার অপরাধে তাঁকে ধরার জন্য পুরস্কার ঘোষিত হয়েছিল। জাপানির ছদ্মবেশে তিনি জাপানে পৌঁছে আত্মগোপন করেছিলেন।। এতগুলি বছরেও তাঁর দেশপ্রেম অবিচল, বিপ্লবের আগুন প্রজ্জ্বলন্ত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে স্বাধীনতাকামী ভারতীয়রা স্থাপন করেছেন ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লিগ, রাসবিহারী তার সভাপতি।

(ডুম ডুম ডুম করে গম্ভীর শব্দে ড্রাম বাজছে। অগ্রগতির ধ্বনি। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আকাশে, আসন্ন ঝড়ের ইঙ্গিত।)

কথক : মাত্র একশো দিনের মধ্যে জাপান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেকগুলি দেশ জয় করে পৌঁছে যায় বার্মা পর্যন্ত। পরাজিত ইংরেজ বাহিনীর মধ্যে প্রচুর ভারতীয় সৈন্য বন্দী হয়েছে। তাদের অনেককে নিয়ে ক্যাপটেন মোহন সিং-এর নেতৃত্বে গড়া হয়েছে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি বা আজাদ হিন্দ ফৌজ। জাপানিদের সাহায্য নিয়ে এই বাহিনী সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারত স্বাধীন করার জন্য উন্মুখ।

[ড্রাম বেজে চলেছে। তার মধ্যে মধ্যে শোনা যাচ্ছে সম্মিলিত কণ্ঠে: আজাদ হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ! আজাদ হিন্দ্ ফৌজ জিন্দাবাদ!]

কথক : কিন্তু রাসবিহারী এখন বৃদ্ধ। অশক্ত, টি বি রোগগ্রস্ত। মোহন সিং-এর নেতৃত্ব সেনাবাহিনীর অনেক উচ্চতর অফিসার মানতে রাজি নয়। এমন একজন নেতার প্রয়োজন, যিনি হবেন সর্বাধিনায়ক, যিনি সকলের মান্য, সকলের আদর্শ। কে হতে পারেন সেই নেতা? কে? যখনই এই প্রশ্ন ওঠে, সকলেরই মনে পড়ে একটি নাম: সুভাষচন্দ্র বসু!

[সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস, জাহাজের ভোঁ, আকাশ থেকে বোমাবর্ষণ]

কথক : জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে প্রবল যুদ্ধ চলেছে। তারই মধ্যে সুভাষচন্দ্র পাড়ি দিলেন জার্মানি থেকে জাপানের দিকে। জাহাজে বা উড়োজাহাজে আসা অত্যন্ত বিপজ্জনক, সুভাষচন্দ্র এলেন সমুদ্রের তলা দিয়ে সাবমেরিনে। একজন মাত্র সঙ্গী আবিদ হাসান। সুদীর্ঘ আড়াই মাসের যাত্রা। যে-কোনো মুহূর্তে শত্রুপক্ষের আক্রমণের আশঙ্কা।

[বোমা বর্ষণের শব্দের মধ্যে হঠাৎ শোনা গেল একটি জাপানি গান।]

কথক : জাপানের মাটিতে পা দিয়ে অনেক স্বস্তি বোধ করলেন সুভাষচন্দ্র। জার্মানির সঙ্গে অনেক তফাৎ। জাপান এসিয়ার একটি দেশ, অনেকটা আমাদের আত্মীয়ের মতন। প্রধানমন্ত্রী তোজোর কাছ থেকে সুভাষচন্দ্র পূর্ণ সাহায্যের আশ্বাস পেলেন।

[অজস্র কণ্ঠে সুভাষচন্দ্র বসু জিন্দাবাদ!]

কথক : সিঙ্গাপুরে রাসবিহারী বসু সুভাষচন্দ্রকে বরণ করলেন ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লিগের সভাপতি পদে। সুভাষচন্দ্র হলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক।

১৯৪৩ সালের ৫ই জুলাই সিঙ্গাপুর টাউন হলের সামনের ময়দানে পূর্ণ সামরিক পোশাকে সজ্জিত হয়ে সেনাবাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করলেন সুভাষচন্দ্র। এখন থেকে তিনি সকলের নেতাজী। তিনি জানালেন স্বাধীনতার চরম সংগ্রামের আহ্বান।

নেতাজীর কণ্ঠস্বর:

আজ আমার জীবনের সবচেয়ে গর্বের দিন! আজ আমি সারা বিশ্বের কাছে ঘোষণা করতে পারি যে ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামী সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ... কমরেডস, যোদ্ধৃবৃন্দ, এখন থেকে তোমাদের রণহুঙ্কার হোক : চলো দিল্লি! চলো দিল্লি! এই স্বাধীনতার যুদ্ধে আমাদের মধ্যে ক'জন শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকবো তা জানি না। কিন্তু আমি জানি, আমরা জয়ী হবোই এবং আমাদের বিজয়ী বাহিনী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কবরভূমি—দিল্লির লালকেল্লায় মার্চ করে যাবে! ... আমি তোমাদের পাশে পাশে সব সময় থাকবো। আমি থাকবো অন্ধকারে এবং সূর্যালোকে, আমি থাকবো দুঃখের দিনে ও আনন্দের দিনে, আমি থাকবো যন্ত্রণার সময়ে ও বিজয়ের মুহূর্তে। ... বর্তমানে আমি কিছুই দিতে পারবো না। তোমাদের সহ্য করতে হবে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, অনেক কিছুর অভাব, ক্লান্তিহীন যাত্রা এবং মৃত্যু। কিন্তু তোমরা যদি জীবন ও মৃত্যুতে আমাকে অনুসরণ করো, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তা তোমরা করবেই, আমি তোমাদের পৌঁছে দেব জয়ে এবং স্বাধীনতায়। ..

ইনকিলাব জিন্দাবাদ! আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ!

[বহু কণ্ঠে মুহুর্মুহু সেই ধ্বনি এবং নেতাজী জিন্দাবাদ]

কথক : আজাদ হিন্দ ফৌজে জাতি-ধর্মের কোনো ভেদ নেই। হিন্দু-মুসলমান-শিখ-খ্রিস্টান সবাই সমান।

[নেপথ্যে 'কদম কদম বঢ়ায়ে যা' গান]

কথক : নারীদের নিয়েও গড়া হলো এক বাহিনী। ভারতীয় রমণীরা পুরুষদের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবে, একথা জাপানিরাও প্রথমে বিশ্বাস করতে পারে নি। প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের দুঃসাহসিনী যোদ্ধা ঝাঁসির রানী লক্ষ্মী বাঈ-এর নামে রাখা হলো সেই বাহিনীর নাম। এর অধিনায়িকা হলেন এক তরুণী ডাক্তার, তার নামও লক্ষ্মী, লক্ষ্মী স্বামীনাথন। এক হাজার জন যুবতী সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করতে লাগলো।

[মেয়েদের কুচকাওয়াজ ও মেয়েদের কণ্ঠে 'ম্যায় ভারত কী বেটী' গান।]

কথক : প্রায় চল্লিশ হাজার প্রাক্তন সৈনিক ও নতুন স্বেচ্ছাসেবী যোগ দিয়েছে আজাদ হিন্দ ফৌজে। আরও মানুষ চাই, অর্থ চাই, অস্ত্র চাই! পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ঝড়ের মতন ঘুরতে লাগলেন নেতাজী। তাঁর আহ্বানে ছুটে এলো সেখানকার ভারতীয়রা। মহিলারা তুলে দিল সব স্বর্ণ অলঙ্কার, বালকেরা দিল তাদের জমানো টাকা। কিছু কিছু ধনী ব্যবসায়ী কার্পণ্য করলেও অনেক মধ্যবিত্ত ও গরিবরা দান করলো যথাসর্বস্ব। যে-সব যুবকদের সঞ্চয় কিছুই নেই, তারা রক্তের অক্ষরে লিখে দিল আত্মদানের শপথ।

[গয়না ও টাকা পয়সা জমা পড়ার ঝনঝন শব্দ। কে আগে এসে দান করবে তা নিয়ে জনতার মধ্যে হুড়োহুড়ি।

নেপথ্যে শোনা যাচ্ছে নেতাজীর গম্ভীর কণ্ঠ : আমায় রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব! তুম মুঝে খুন দো, ম্যায় তুমে আজাদি দুঙ্গা!)

কথক : একুশে অক্টোবর স্থাপিত হলো স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার। দেশ যখন শত্রুর দখলে

থাকে, তখন দেশের বাইরে থেকে এই সরকার কাজ চালায়। সিঙ্গাপুরে ক্যাথে সিনেমা হলে এক বিপুল জনসভায় নেতাজী এই সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান, প্রধানমন্ত্রী, বিদেশমন্ত্রী ও যুদ্ধমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন:

নেতাজীর কণ্ঠস্বর:

ঈশ্বরের নামে আমি এই পবিত্র শপথ নিচ্ছি, ভারত স্বাধীন করার জন্য, আমার দেশের আটত্রিশ কোটি মানুষের জন্য ...

[হঠাৎ থেমে গেলেন, তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। সভাস্থল একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল, তারপর আরও অনেকের কান্না শোনা গেল। একটু পরেই নেতাজী নিজেকে সামলে নিলেন।]

আমি সুভাষচন্দ্র বসু, স্বাধীনতার এই প্রধান যুদ্ধ আমার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত চালিয়ে যাবো।

আমি প্রতিনিয়ত এই ভারতবর্ষের একজন সেবক হয়ে থাকবো এবং আটত্রিশ কোটি ভাই বোনের মঙ্গল সাধনই হবে আমার সর্বোচ্চ কর্তব্য।

স্বাধীনতা অর্জনের পরেও এই ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য আমি শেষ রক্তবিন্দু বিসর্জন দেবার জন্য প্রস্তুত থাকবো।

[নেতাজী জিন্দাবাদ! জয়ধ্বনি· ভারতমাতা কি জয়! আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ! জয় হিন্দ'।]

কথক : এই প্রবাসী সরকারকে জাপান তো সঙ্গে সঙ্গে স্বীকৃতি দিলেন, আরও স্বীকৃতি এলো জার্মানি, ইটালি সমেত নটি দেশ থেকে। এই সরকারের পক্ষ থেকে নেতাজী আনুষ্ঠানিক ভাবে ইংল্যান্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। আয়ার্ল্যান্ডের প্রখ্যাত বিপ্লবী ডি ভ্যালেরা অভিনন্দন বার্তা পাঠালেন নেতাজীকে।

[চলো দিল্লি! চলো দিল্লি! শ্লোগান।]

কথক : জাপানিরা চেয়েছিল, আজাদ হিন্দ ফৌজের কিছু কিছু সৈন্য জাপানি সৈন্যদের পাশে থেকে লড়াইয়ে সাহায্য করবে। নেতাজী তাতে রাজি নন। আজাদ হিন্দ ফৌজ নিজ উদ্যোগে কোনো একটি ফ্রন্টে আক্রমণ চালাবে। বিজয় হর্ষে সীমানা অতিক্রম করে তারা স্বদেশের মাটিতে পুঁতে দেবে জাতীয় পতাকা। নেতাজী আরও একটি শর্ত দিলেন, ভারতীয়রা জাপানের যে-সব অংশ দখল করবে, সেই সব অংশেরও অধিকার দিতে হবে অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারকে। সেখানকার প্রশাসন থাকবে এই সরকারের হাতে। জাপানিদের পিছু হঠে যেতে হবে। এক বিদেশী শাসকদের কবল মুক্ত হয়ে ভারত আবার দ্বিতীয় কোনো বিদেশী শক্তির আধিপত্য মেনে নেবে না। ...

[বেজে উঠলো দামামা। যুদ্ধের প্রস্তুতি]

কথক : জাপানিবা আন্দামান-নিকোবর দ্বীপ থেকে ইংরেজদের তাড়িয়ে দিয়েছে। সেখানকার আংশিক প্রশাসনের ভার দেওয়া হলো অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারের হাতে। ব্রিটিশের চোখে ধুলো দিয়ে কলকাতা থেকে চুপি চুপি সীমান্ত অতিক্রম করার তিন বছর পর নেতাজী আবার পা দিলেন ভারত ভূখণ্ডে। এই দ্বীপ দুটির তিনি নতুন নাম রাখলেন 'শহীদ' ও 'স্বরাজ'। কত স্বাধীনতা সংগ্রামী আন্দামানের কারাগারে অকথ্য অত্যাচার সহ্য করেছেন, মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁদের উদ্দেশে তিনি প্রণাম জানালেন।

।বিউগ্‌ল বেজে উঠলো। পতপত করে উড়লো ত্রিবর্ণ পতাকা। নেতাজীর নামে জয়ধ্বনি! বন্দেমাতরম্‌। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

কথক : এবার আসল যুদ্ধ!

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে চরম আঘাত দেবার জন্য জাপানিরা বর্মা সীমান্ত দিয়ে প্রবেশের প্রস্তুতি নিয়েছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের তিনটি ডিভিশনও প্রস্তুত, নেতৃত্বে আছেন মেজর জেনারাল জামান মিয়ানি আর কর্নেল শা নওয়াজ। যাত্রা শুরুতে দেশের দিকে এক হাত তুলে নেতাজী বললেন .

নেতাজীর কণ্ঠস্বর:

ঐ যে নদীর ওপারে, জঙ্গল ছাড়িয়ে, পাহাড়ের পরপারে রয়েছে আমাদের প্রার্থিত ভূমি—যে ভূমি থেকে আমরা উঠে এসেছি, যে ভূমিতে আবার আমরা ফিরে যাবো। ঐ শোনো, ভারত আমাদের ডাকছে। রক্তকে আহ্বান জানাচ্ছে রক্ত। ওঠ, ওঠ, আর একটুও সময় নষ্ট করা যাবে না। অস্ত্র তুলে ধরো। শত্রুশ্রেণীর মধ্য দিয়ে আমরা পথ নির্মাণ করে যাবো! আর যদি ঈশ্বরের অভিপ্রায় হয়, আমরা শহীদের মৃত্যু বরণ করবো। শেষ ঘুমের আগে আমরা চুম্বন করবো সেই পথকে যে পথ দিয়ে আমাদের সৈন্যবাহিনী যাবে দিল্লির দিকে। দিল্লির পথই স্বাধীনতার পথ। চলো দিল্লি।

।অস্ত্রের ঝনঝনা ও প্রবল যুদ্ধ। বিমান থেকে বোমাবর্ষণ।

কথক : মধ্যে কিছুদিন সময় পেয়ে এদিকে ব্রিটিশ বাহিনী শক্তি সংহত করেছে। তাদের সৈন্য সংখ্যা, বিমান সংখ্যা অনেক বেশি। অকুতোভয় জাপানিদের প্রধান শক্তি তাদের দুঃসাহস, আর আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান শক্তি তাদের স্বাধীনতার জন্য জীবন-মরণ পণ। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর কোহিমা দুর্গ ছেড়ে পালালো ইংরেজরা। ইমফল দখলের জন্য তিনদিক থেকে চলতে লাগলো লড়াই।

।যুদ্ধের মধ্যেই ঘন ঘন উল্লাসধ্বনি। জয় হিন্দ।।

কথক : আজা হিন্দ ফৌজের একটি বাহিনী এস এ মালিকের নেতৃত্বে আলাদা ভাবে লড়তে লড়তে মনিপুরের সৈরাং নামে একটি অঞ্চল জয় করে নেয়। নিজেদের সামর্থ্যে এই প্রথম ভারতভূমি জয়। সেখানে ওড়ালো স্বাধীন সরকারের পতাকা। স্থানীয় অধিবাসীরা ছুটে এসে স্বাগত জানালো এই বিজয়ীদের।

।মনিপুরী নাচ, গান, আনন্দধ্বনি।

কথক : ইমফল দখলের লড়াই চললো প্রায় দু'মাস ধরে। জাপানিদের সঙ্গে সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজ এখানে অসম সাহসের সঙ্গে লড়েছে। ইংরেজরাও ইমফলের দখল রাখার জন্য মরিয়া।

নেতাজী ভেবেছিলেন, ইমফল জয় করতে পারলে সমতলে নেমে যাওয়া সহজ হবে। আসাম থেকে বাংলায়। সেখানে বিপুল জন সমর্থন পাওয়া যাবে। আজাদ হিন্দ ফৌজের এই বিজয় অভিযান দেখে ইংরেজ বাহিনীর মধ্যে যে-সব ভারতীয় সৈন্য আছে, তারাও আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেবে।

নেতাজীর এই স্বপ্ন সফল হয়নি। সাধারণ মানুষকে নেতৃত্ব দেবে কে? সাধারণ মানুষ আজাদ হিন্দ ফৌজ বা নেতাজীর সংবাদ বিশেষ কিছু জানতেই পারে না। ইংরেজ সরকার সে-সব খবর চাপা দিয়ে নানারকম অপপ্রচার করে।

[যুদ্ধ চলছে, তার মধ্যে আকাশে দেখা গেল বজ্র-বিদ্যুৎ। তারপর ঝড় বৃষ্টি।]

কথক : এর মধ্যে নামলো বৃষ্টি, প্রবল বৃষ্টি। আসাম-মনিপুরে বর্ষাকাল শুরু হতে না হতেই নদীনালা ভেসে যায়। দুর্গম অরণ্যেও আশ্রয় পাওয়া যায় না। সেই সঙ্গে শুরু হয় নানারকম রোগ। খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

[বিদ্যুৎ চমকে দেখা যাচ্ছে, সৈন্যরা পাহাড়ি পথ দিয়ে ফিরে যাচ্ছে।]

কথক : ইমফল জয় করা হলো না। বাধ্য হয়ে শুরু হলো পশ্চাৎ অপসারণ। জাপানিদেরও খাদ্য ওষুধে কম পড়েছে, তারা তার থেকে আর ভারতীয়দের ভাগ দিতে চায় না। খাদ্যের অভাবে ভারতীয় সৈনিকরা ঘাসপাতা খেতে লাগলো। সেই সঙ্গে কলেরা, ম্যালেরিয়া, উদরাময় রোগ, কিন্তু ওষুধ নেই। পেছন দিক থেকে তেড়ে আসছে ইংরেজ বাহিনী, বিমানে এসে বোমাবর্ষণ করে যাচ্ছে। জল কাদায় ধুঁকতে ধুঁকতেও ভারতীয় সৈন্যরা যে প্রতিরোধের লড়াই চালিয়ে গেল এগারো দিন ধরে, পৃথিবীতে তার তুলনা কমই আছে।

[মুমূর্ষুদের কাতর আর্তনাদ। তারই মধ্যে গোলাগুলি বিনিময় চলছে।]

কথক : নেতাজী চেয়েছিলেন, আবার ইম্‌ফল আক্রমণ করা হবে। একবার না হলে দশবার। কিন্তু ইতিমধ্যে যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হয়েছে, হারতে শুরু করেছে জাপানিরা।

ইংরেজ সৈন্য বার্মায় ঢুকে পড়েছে, কিছুদিনের মধ্যেই তারা রেঙ্গুন দখল করবে। নেতাজী কিছুতেই শত্রুপক্ষের হাতে বন্দী হতে পারেন না। তাঁর মন্ত্রীরা সিদ্ধান্ত নিলেন, অতি দ্রুত বিশেষ বিমানে নেতাজীকে দূরতর কোনো নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দিতে হবে। কিন্তু তাঁর সৈন্যদল, বিশেষত ঝাঁসি রানী বাহিনীর মেয়েদের ফেলে কিছুতেই একা চলে যেতে রাজি নন নেতাজী।

শুরু হলো রেঙ্গুন থেকে ব্যাংককে ফিরে যাবার পালা। একুশ দিনের পথ। কখনো ট্রাকে, কখনো পায়ে হেঁটে। কোমর-জল নদী পেরিয়ে। পেট-ভরা খাদ্য জোটেনি দু'বেলা, রাত্তিরে ঘুম নেই, যখন তখন শত্রুর আক্রমণে মৃত্যুর আশঙ্কা ...

[গান কদম কদম বঢ়ায়ে যা দূর থেকে বিমান উড়ে এসে মেশিনগানের গুলিবৃষ্টি করে যাচ্ছে। কেউ কেউ চিৎকার করছে, সো যাও! লাই ডাউন! নেতাজী নেতাজী, প্লিজ লাই ডাউন!]

কথক : ইতিমধ্যে জার্মানি যুদ্ধে হেরে গেছে। জাপানের কোণঠাসা অবস্থা। মালয়ের সেরামবন নামে একটি ছোট শহরে নেতাজী তাঁর বিশ্বস্ত সহকর্মীদের নিয়ে পরবর্তী কার্যক্রম আলোচনা করতে লাগলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ কিছুতেই নিরস্ত হবে না, ভারতভূমিতে প্রবেশ করতেই হবে। সৈন্যদের মনোবল এখন অটুট।

এই সময় এলো চরম দুঃসংবাদ। হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে অ্যাটম বোমা পড়েছে। এই বোমা মহাপ্রলয় ঘটিয়ে দিতে পারে। বাধ্য হয়ে জাপান আত্মসমর্পণ করেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ।

[বিউগ্‌লে করুণ সুর বাজছে। বহু নারী পুরুষের হর্ষধ্বনি ও কান্না]

কথক : আজাদ হিন্দ ফৌজ এখন কী করবে? জাপানের কাছ থেকে আর কোনো সাহায্য পাবার আশা নেই। একমাত্র উপায় রাশিয়ার শরণাপন্ন হওয়া। অনেকদিন থেকেই নেতাজী সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার সাহায্য নিতে চেয়েছিলেন, কিছুতেই যোগাযোগ করা সম্ভব হয় নি। এখন তিনি ঠিক করলেন, যে-কোনো উপায়ে স্বয়ং মানচুরিয়াতে উপস্থিত হয়ে রাশিয়ার সাহায্য নিয়ে আবার শুরু করতে হবে স্বাধীনতার সংগ্রাম। খুবই বিপদসঙ্কুল এই যাত্রা, ইংরেজ আমেরিকান বাহিনী সন্ধান পেলেই বন্দী করবে তাঁকে। তবু তাঁকে যেতেই হবে। যাবার আগে নেতাজী বলে গেলেন :

নেতাজীর কণ্ঠস্বর :

আমাদের ইতিহাসের এই অভূতপূর্ব সংকটের সময় আমার শুধু একটাই কথা বলার আছে। আমাদের এই সাময়িক ব্যর্থতায় কেউ নিরাশ হয়ো না। উৎফুল্ল থাকো। উৎসাহ বজায় রাখো! সবচেয়ে বড় কথা, এক মুহূর্তের জন্যও ভারতের নিয়তি সম্পর্কে বিশ্বাসে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ো না। পৃথিবীর কোনো শক্তি ভারতকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বেঁধে রাখতে পারবে না। ভারত স্বাধীন হবেই এবং খুব শীঘ্রই!

[একটি বিমান আস্তে আস্তে চলতে শুরু করে জোর শব্দ তুলে উড়ে গেল।

গান : নেতাজী হামারে হাসতে হাসতে জি না

জঞ্জির গোলামি তুম নে তোড়া .।

কথক : প্রায় দু'হাজার আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিক শেষ পর্যন্ত দিল্লির লালকেল্লায় প্রবেশ করলো, কিন্তু বিজয়ীর উল্লাসে নয়, যুদ্ধবন্দী হিসেবে মাথা নিচু করে। ইংরেজ সরকার তাদের বিচার করবে।

[পরপর মাটিতে বন্দুক-রিভলভার ছুঁড়ে ফেলে দেবার শব্দ। ক্লান্ত ভাবে মার্চ করে যাচ্ছে বন্দীরা।]

কথক : এই প্রথম ভারতের মানুষ আজাদ হিন্দ ফৌজের শৌর্য-বীর্যের কথা জানলো। শুধু ভারতীয়দেরই নিয়ে গড়া হয়েছিল এক সেনাবাহিনী, তারা ইংরেজদের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ করেছে, কিছুদিনের জন্য হলেও ইংরেজদের হটিয়ে দিয়ে ভারতের মাটিতে তুলেছে স্বাধীনতার ঝাণ্ডা। অবিশ্বাস্য হলেও তা সত্য। এদের অসম সাহসিকতা, এদের জ্বলন্ত দেশপ্রেম, এদের আত্মত্যাগের মহিমায় সাধারণ মানুষের বুক গর্বে ভরে যায়।

বিচার শুরু হতেই প্রতিবাদে ফেটে পড়লো সারা দেশ। এই সৈন্যরা বিশ্বাসঘাতক নয়, এরা দেশপ্রেমিক, এদের মুক্তি দিতে হবে! সবচেয়ে প্রথম উত্তাল হলো কলকাতা।

[ঘোড়সওয়ার পুলিশের অত্যাচার, লাঠি-গুলি-টিয়ার গ্যাস]

কথক : রসিদ আলী নামে একজন আজাদ হিন্দ সেনানীর শাস্তির কথা ঘোষিত হতেই তার মুক্তির দাবিতে স্বতঃস্ফূর্ত তীব্র প্রতিবাদে পথে পথে শুরু হলো লক্ষ লক্ষ মানুষের মিছিল। দেশের যে-সব নেতা, যে-সব দল আজাদ হিন্দ ফৌজকে সমর্থন করেন নি, নেতাজীকে মনে করেছিলেন দিকভ্রান্ত, এখন তাঁরাও জনতার আবেগের সামিল হলেন। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি পাশাপাশি। সুভাষচন্দ্র বসু [illegible]

জানে না, তবু লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখে তাঁর নাম।

[বন্দেমাতরম। ইনকিলাব জিন্দাবাদ। ইংরেজ সরকার ভারত ছাড়ো। আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি চাই! নেতাজী জিন্দাবাদ!]

কথক : আজাদ হিন্দ ফৌজ মানুষের ভয় ভাঙিয়ে দিয়েছে। ইংরেজের অধীনে ভারতীয় সৈনিকদের মধ্যেও জাগিয়ে তুলেছে অসন্তোষ। বোম্বাইতে শুরু হয়ে গেল নৌবিদ্রোহ!

[পরপর জাহাজের ভোঁ। তার মধ্যে স্বদেশী শ্লোগান।]

কথক : বোম্বাইয়ের 'তলোয়ার' জাহাজের বিদ্রোহী নাবিকদের সমর্থন করে দেশের মানুষ। বিক্ষোভ ছড়িয়ে যায় করাচি, মাদ্রাজ, জব্বলপুর, দিল্লিতে। বিমানবাহিনী ও স্থলবাহিনীতেও বিক্ষোভ শুরু হলো। ২৮শে জুলাই ডাক, টেলিগ্রাফ ও রেলওয়েতে শুরু হলো ধর্মঘট। চরম অত্যাচার, উৎপীড়ন করেও ইংরেজ একসময় বুঝে যান আর কিছুতেই কোটি কোটি ভারতবাসীকে শৃঙ্খলিত রাখা যাবে না। সারা দেশ জুড়ে ধ্বনি উঠেছে স্বাধীনতা! স্বাধীনতা!

[মিটিং, মিছিল, শ্লোগান, পুলিশের অত্যাচার চলছে।]

কথক : অবশেষে এলো সেই সুবর্ণ দিন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট লাল কেল্লায় ওড়ানো হলো জাতীয় পতাকা। যুগ যুগ ধরে বহু মানুষের আত্মত্যাগে এসেছে এই স্বাধীনতা। ফাঁসির দড়ি, কারাগার, দ্বীপান্তর, গুলি, লাঠি অগ্রাহ্য করে জেগে উঠেছে জনসাধারণ। নেতাজীর স্বপ্ন সফল হলো, কিন্তু সেই পরমক্ষণেও তিনি রইলেন অদৃশ্য হয়ে। তাঁর কীর্তি তাঁর জীবনকে ছাপিয়ে গেল।

[জনগণ মন অধিনায়ক ....]

সাক্ষাৎকার

১
কৃত্তিবাস

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

'কৃত্তিবাস-কবিগোষ্ঠী' সম্পর্কে আলাদা প্রবন্ধ না লিখে আপনার প্রশ্নগুলিরই উত্তর পরপর সাজিয়ে দিচ্ছি। সেটাই আপাতত আমার পক্ষে সুবিধেজনক।

১. **প্রশ্ন** : সমকালীন তরুণ কবিগণের মধ্যে 'কৃত্তিবাস-কবিগোষ্ঠী' ব'লে একদলের পৃথক নাম কেন? তাঁদের বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা কী?

উত্তর : 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা প্রায় বারো বছর ধ'রে বেরুচ্ছে। বাংলাদেশে এমন কোনো উল্লেখযোগ্য তরুণ কবি নেই, যিনি কৃত্তিবাসে একবারও লেখেন নি। সে-দিক দিয়ে 'কৃত্তিবাস গোষ্ঠী নিরপেক্ষ। আবার কোনো-একটি কাগজকে কেন্দ্র ক'রে একদল লেখক মিলিত হয়, যারা একসঙ্গে আড্ডা মারে ও হৈ-হল্লা করে। তারা ঐ পত্রিকার নামে চিহ্নিত হয়—এর উদাহরণ বিদেশে বহু আছে, উল্লেখ করার দরকার নেই— 'আমাদের দেশেও 'সবুজ পত্র' ও 'কল্লোল' নিয়ে এমন লেখকসম্প্রদায় গ'ড়ে উঠেছিল। 'কৃত্তিবাস'-গোষ্ঠী বলতে এমন দশ-বারো জন কবির নাম করা যায়। এঁদের লেখার ভঙ্গি বা চরিত্রের নির্দিষ্ট মিল নেই— 'কিন্তু একটা সাধারণ যোগসূত্র আছে। এঁদের সকলেরই কবিতা আত্মজীবনীমূলক। নিজের জীবন ছাড়া আর কোথাও সত্যি কথা নেই পৃথিবীতে। এবং কবিতার জন্য এঁরা নিজের জীবনকে যোগ্য ক'রে নিতে চাইছেন।

২. **প্রশ্ন** : আপনারা সাহিত্যের কোন্ আদর্শ অনুসরণ করেন? সত্য, না সুন্দর? চারুশীলন ও শুচিশীলন সম্পর্কে আপনাদের ধারণা কী?

উত্তর : এগুলো সবই সমালোচনার ভাষা। কবিতা লেখার সময় কেউ এ-সব ভাবে নাকি? পৃথিবী, গাছপালা, নারীর শরীর ও অবহেলা, সুন্দর পোশাক ও স্নানের সময় নগ্নতা, নিয়নের আলো কিংবা ব্ল্যাক-আউট, ট্রেনের শব্দ, নাকের ডগায় ফুস্কুরি—ইত্যাদি যাবতীয় জিনিসের প্রতি কখনো ঘৃণা, কখনো ভালোবাসা—এই সব নিয়ে কবিতা। ওপরের ঐ চারটে শব্দের প্রতিও কখনো ঘৃণা, কখনো ভালোবাসা। জীবন এই রকম।

৩ **প্রশ্ন** : কাব্যের বস্তু ও রীতি—content & form—সম্পর্কে আপনাদের ধারণা কী?

উত্তর : কনটেন্ট সম্পর্কে আগেই বলেছি। নিজের জীবন—এবং তাতে যা-কিছু ছায়া পড়ে। ফর্ম সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যায়, ন্যাকামিবর্জিত, যতদূর সম্ভব মুখের ভাষায় লেখার চেষ্টা চলছে এখন। অনেকে পয়ার ভেঙেচুড়ে যে-রূপ দিচ্ছেন—তাও মুখের ভাষার ঝোঁক অনুযায়ী। শব্দব্যবহারের মূল্য তার ধ্বনিসংগতি ও অমোঘতায়—এ ছাড়া আর কোনো বিচার নেই।

৪. **প্রশ্ন** : ঐতিহ্যকে আপনারা কতটা মানেন?

উত্তর : আমাদের পত্রিকার নাম 'কৃত্তিবাস'—এবং ভেবেচিন্তেই এ নাম দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য কিছুর মতোই— 'ঐতিহ্যে'র প্রতিও কখনো অসম্ভব মমত্ববোধ, কখনো উপহাস বা ঘৃণা। 'বিদ্রোহ' কথাটা আজকাল অতিব্যবহারে বাজে হয়ে গেছে—কিন্তু ঐতিহ্যের প্রতি 'বিদ্রোহ'—সত্যিকারের নতুন

ঐতিহ্য সৃষ্টি ও প্রবহমানতা রক্ষায় সাহায্য করে। নজরুল নিজেকে বিদ্রোহী ভৃগু বলেছিলেন—কিন্তু ভৃগুর মধ্যে বিদ্রোহ কিছু ছিল না। সে বিষ্ণুর বুকে লাথি মেরেছিল—কিন্তু সে ছিল যাগযজ্ঞবাদী, সনাতনপন্থী। বিষ্ণুই সেখানে সংস্কারক—তিনি যজ্ঞ ভাঙতে এসেছিলেন। আসল বিদ্রোহী গৌতম বুদ্ধ, যিনি সত্যিই ব্রাহ্মণ্য গোঁড়ামির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। আবার চৈতন্যদেব, যিনি অগ্রাহ্য করেছিলেন এতকালের বর্ণাশ্রম। সুতরাং বিদ্রোহও কি ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়? ঐতিহ্য কথাটা বড়ো ঝাপসা অর্থে ব্যবহার হয় এখন। মাছ পাওয়া যাচ্ছে না ব'লে কেউ যদি বাড়িতে গো-মাংস খায়, কিংবা ধুতি-চাদরের খরচ বেশি ব'লে যদি আজকালকার ছেলে-ছোকরারা চোঙা-প্যান্ট পরা শুরু করে—আমার পক্ষে, সেটা কোনোক্রমেই ঐতিহ্যবিরোধী নয়। তা হলে জঙ্গল কেটে দুর্গাপুর বানানোও ঐতিহ্যবিরোধী!

৫. **প্রশ্ন** : আপনাদের গোষ্ঠীর কবিভাষার বৈশিষ্ট্য কী?

উত্তর : এ-প্রশ্ন বিস্তারিত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। এ-বিষয়ে শঙ্খ ঘোষ শিগগিরই দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখবেন।

৬ **প্রশ্ন** : আপনারা কি বিদেশী কোনো কবিগোষ্ঠী দ্বারা অনুপ্রাণিত?

অথবা, আপনাদের অনুসৃত আদর্শ ও পন্থার অনুরূপ কবিগোষ্ঠী কি অন্যান্য দেশে আছে? থাকলে কোন-কোন্ দেশে আছে? তাদের পরিচয় ও বক্তব্য কী?

উত্তর : হ্যাঁ এবং না। বিদেশের কোনো বিশেষ কবিগোষ্ঠী আমাদের প্রেরণা দেবে—বাংলাদেশ এখনো তেমন অসহায় হয়ে যায় নি। আবার বিদেশের কোনো কাব্য-আন্দোলন থেকে উপকৃত হওয়া—পৃথিবীর অন্য সমস্ত দেশের কবিদের কাছেই গৌরবের বিষয়, একমাত্র বাংলাদেশেই তা নিন্দনীয়। এ ভারি আশ্চর্য! ফরাসিদেশের সিম্বলিস্ট ও পরবর্তী কালের সুরিয়ালিজম্ দ্বারা একটু-আধটু প্রভাবিত হন নি, এমন আধুনিক লেখক পৃথিবীতে খুব কম। অন্য লেখকরা গৌরবের সঙ্গে এ-কথা স্বীকার করেন, কিন্তু আমাদের দেশে এ যেন খুবই লজ্জার বিষয়! মহাত্মা গান্ধির জীবনে আমেরিকান কবি থোরোর প্রভাব ছিল অপরিসীম, তা বলে কি গান্ধিজি ছোটো হয়ে গেছেন নাকি? আবার, এলিয়টের লেখায় যদি ভারতীয় দর্শনের উল্লেখ থাকে, আমরা পুলকিত হই—আঁদ্রে জিদ্ রবীন্দ্রনাথের লেখা অনুবাদ ও আলোচনা করলে আমাদের গর্ব—কিন্তু বাঙালি লেখক কোনো বিদেশী সাহিত্যের আবেদন স্বীকার করলে—অমনি ধিক্কারযোগ্য হয়। এ কি স্বার্থপরতা না হীনমন্যতা? আবার কোনো বাঙালি লেখক যদি যৌন-বিষয়ক বাড়াবাড়ি করে, তবে বলা হবে হেনরি মিলার বা সিলিন বা বারোজের প্রভাব পড়েছে, কালিদাস ও ভারতচন্দ্রের নাম মনেও পড়ে না।

তিরিশ বছর আগে পৃথিবীতে কেউ-ই অ্যাটম বোমা বানাতে জানত না। কিন্তু এখন পৃথিবীর কয়েকটা দেশ—কেউ কারুর কাছ থেকে না-শিখেই নিজে-নিজে অ্যাটম বোমা বানাতে শিখে যাচ্ছে। তেমনি, আধুনিকতার কয়েকটি চিহ্ন ঝড়ের হাওয়ার মতো পৃথিবীর অনেক দেশেই আপনি জেগে ওঠে—কেউ কারুকে জাগায় না, পরে মুখ দেখাদেখি ক'রে আশ্চর্য হয়। কৃত্তিবাসের কবিদের সঙ্গে পৃথিবীর অনেক দেশের আধুনিক কবিতার কিছু কিছু মিল আছে—কিন্তু কেউ কারুকে অনুপ্রাণিত করে নি। কৃত্তিবাসের কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্য পৃথিবীর অন্যত্র যে তেমন ছড়ায় নি, তার কারণ বাংলাভাষা ছড়ায় নি। তবে, কিছু অনুবাদে, কিছু ব্যক্তিগত যোগাযোগে কৃত্তিবাসের গুণগ্রাহী বিদেশী কবির দল নানা দেশে ছেড়ে-ছড়িয়ে আছে।

৭. **প্রশ্ন** : আপনাদের গোষ্ঠীর প্রধান-প্রধান লেখক কে? তাঁদের কয়েকটি (৪/৫টি) কবিতার বৈশিষ্ট্য কোথায়, উৎকর্ষই বা কী তা নিয়ে আলোচনা করুন।

উত্তর : **কৃত্তিবাসের প্রধান কবিদের মধ্যে আছেন শঙ্খ ঘোষ (কবিতার বইয়ের নাম 'দিনগুলি রাতগুলি'), অরবিন্দ গুহ ('নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত'), তারাপদ রায় ('তোমার প্রতিমা'), শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় ('র‍্যাঁবো, ভের্লেন এবং নিজস্ব'; 'আহত ভ্রূ-বিলাস'), জ্যোতির্ময় দত্ত ('জলের আলপনা'),**

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ('চারিদিকে পৃথিবী'; 'যে কোনো নিঃশ্বাসে'), বিনয় মজুমদার ('ঈশ্বরীর প্রতি কবিতাগুচ্ছ'), শংকর চট্টোপাধ্যায় ('এই দশকের কবিতা'র সম্পাদক), প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত ('সদর স্ট্রিটের বারান্দা'), সুধেন্দু মল্লিক ('হিরণ্ময় অন্ধকার'), সুনীল বসু ('সিন্ধুসারস'; 'তিমির তরঙ্গ'), প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় ('অতলান্ত'), মোহিত চট্টোপাধ্যায় ('গোলাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'), আনন্দ বাগচী ('স্বাগত সন্ধ্যা'; 'তেপান্তর'), শক্তি চট্টোপাধ্যায় ('হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য'; 'ধর্মে আছো জিরাফেও আছো'), উৎপলকুমার বসু ('চৈত্রে রচিত কবিতা'; 'পুরী সিরিজ'), সমীর রায়চৌধুরী ('ঝর্ণার পাশে শুয়ে আছি') এবং দীপক মজুমদার (নাটক : 'বেদানার কুকুর ও অমল') আমার কবিতার বইয়ের নাম 'আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি'।

এঁদের মধ্যে কৃত্তিবাসের সামান্য দল ভেঙে যখন হাংরি জেনারেশন নামে আলাদা কিছু একটা হয়—তখন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, উৎপলকুমার বসু ও সমীর রায়চৌধুরী তাতে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে উৎপলকুমার বসু ও সমীর রায়চৌধুরী এখনো কৃত্তিবাসের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছেন।

কবিতা আমার ভালো লাগে কিংবা খারাপ লাগে। কবিতার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করার আমি ঠিক উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারি নি এখনো।

শ্রদ্ধা ও নমস্কারান্তে,

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

২

দেখা-সাক্ষাৎ

সাগরময় ঘোষ ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ

কথাসাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষ গত ৫ই অক্টোবর তারিখে বাংলাদেশে এসেছেন। তারা এখানে পক্ষকাল অবস্থান করবেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বহুসংখ্যক জনপ্রিয় উপন্যাসের রচয়িতা। হাল আমলের বাংলা সাহিত্যের তিনি অন্যতম কর্ণধার।
সাগরময় ঘোষ ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ঢাকা অবস্থানকালে আমাদের প্রতিবেদক তাঁদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। তার বিবরণ ·

প্রথম সাক্ষাৎ : বছর পাঁচেক আগে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলাম। তখন তাঁকে যেমন দেখেছি, এখনও তেমনি দেখলাম। মানে, চেহারার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। শুধু মুখমণ্ডল একটু রক্তাভ ঠেকল আমার কাছে। জুলফির সব চুল পাকা—আগের মতই। তবে, পাতলা হয়েছে!

একটি সাপ্তাহিকীর অফিসে তার সঙ্গে দেখা। সেখানে অনেকেই তার জন্য অপেক্ষমাণ ছিলেন। সুনীলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বেলাল চৌধুরী। তিনিই উপস্থিত সকলের সঙ্গে সুনীলের পরিচয় করিয়ে দিলেন। সুনীল কথায় কথায় এখানকার বিভিন্ন সাপ্তাহিকীর প্রকাশের তারিখ সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। যে-পত্রিকা বুধবার বেরোবার কথা, সে পত্রিকা সোমবার বাজারে বেরিয়ে যায় শুনে কেমন যেন একটু বিমূঢ় বোধ করলেন মনে হলো।

এরপর সুনীল হঠাৎ রশীদ করিমের কথা জিজ্ঞেস করলেন।

বেলাল বললেন, একটু আগে আমরা জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে গিয়েছিলাম। সেখানে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

তখন সুনীল কবি রফিক আজাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, রোববার পত্রিকায় রশীদ করিম একটা লেখা লিখেছিলেন। তাতে বেশ একটু খোঁচা ছিল।

রফিক আজাদ বললেন, লেখাটি আপনি পড়েছেন?

সুনীল বললেন, হ্যাঁ, পড়েছি। শামসুর রাহমানের সঙ্গে লেখাটা নিয়ে টেলিফোনে কথাও হয়েছে। রশীদ করিম আমার আর শামসুর রাহমানের কবিতার তুলনা করতে গিয়ে আমাকে একটু খোঁচা দিয়েছিলো।

এরপর হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে বললেন, হাসান আজিজুল হক—সে এখন কি করছে?

বেলাল চৌধুরী বললেন, হাসান আজিজুল হক অস্ট্রেলিয়ায় গেছেন। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের মেটাফিজিকস নিয়ে থিসিস লিখবেন।

সুনীল হেসে বললেন, অলোকরঞ্জনের ভাই শুভরঞ্জন বিষ্ণু দে'র কবিতার উপর রিসার্চ করবে। ভেবে দেখো একবার, বিষ্ণু দে'র কবিতার উপর রিসার্চ করার জন্য জার্মানী যেতে হলো।

একথা শুনে সবাই হাসলেন। কিন্তু কেউই গলা ছেড়ে নয়।

বললাম, কৃত্তিবাস কি বন্ধ হয়ে গেল?

সুনীল বললেন, তিন বছর পর আবার একটা সংখ্যা বের করেছি।

বললাম, এবার যে দু'টি পুজো সংখ্যা ঢাকায় এসেছে, তাতে আপনার লেখা চোখে পড়ল না।

সুনীল বললেন, এবার সিনেমা পত্রিকায় উপন্যাস লিখিনি। 'প্রসাদ'-এ একটা লেখা দিয়েছি। ছোটগল্প।

উপস্থিত একজন প্রশ্ন করলেন, এবার ঢাকায় এসে আপনার কি কি পরিবর্তন চোখে পড়ল?

সুনীল বললেন, সবে তো এসেছি। রাস্তাঘাট খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দেখলাম।

এমন সময় কে একজন সুনীলকে তাঁর অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে তিনি বললেন, আমাকে একটু বেরুতে হচ্ছে। আবার দেখা হবে।

দ্বিতীয় সাক্ষাৎ : প্রথম দিন বোধ্য কারণেই, সুনীলের সঙ্গে প্রয়োজনীয় বাক্যালাপ করা সম্ভব হয়নি। আমি যখন বেরিয়ে আসি তখন সাগরময় ঘোষকেও বারান্দায় দেখেছিলাম। তাঁকে ঘিরে কয়েকজন দাঁড়িয়ে বসেছিলেন। সে সময় তাঁকে বিরক্ত করা সমীচীন মনে হয়নি আমার। একদিন পর সুনীল এবং সাগরময় ঘোষের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলাম।

তখন বিকেল। কামরায় ঢুকতেই বাংলাদেশের একজন গদ্যশিল্পী সুনীলের একমাত্র সন্তান শৌভিককে দেখিয়ে আমাকে বললেন, ওর খুব বই পড়ার শখ। কিন্তু পড়ার মত কিছু পাচ্ছে না। আমি 'টিনটিন' সিরিজের উল্লেখ করাতে সুনীল বললেন, ওর এ-ত টিনটিন আছে।

শরৎ শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে সুনীলের একটি তথাকথিত মন্তব্য শরৎচন্দ্রের অনেক ভক্তের মনে আঘাত দিয়েছিল। কোলকাতার একটি সাপ্তাহিকে এ নিয়ে বিস্তর লেখালেখিও হয়েছিল। শুরুতে আমি সুনীলকে এ ব্যাপারেই প্রশ্ন করেছিলাম।

সুনীল বললেন, শরৎ শতবার্ষিকী উপলক্ষে বোম্বেতে একটি সভার আয়োজন করা হয়। উদ্যোক্তাদের মধ্যে সাগরদা'র (সাগরময় ঘোষ) একজন ভাইও ছিলেন—সলিল ঘোষ। তারা যখন আমাকে ওই উৎসবে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে আসেন, তখন আমি বলেছিলাম, এ ব্যাপারে আমাকে ডাকাডাকি না করাই ভাল। তার কারণ, শরৎচন্দ্র সম্পর্কে একান্তভাবে প্রশংসাসূচক আমি কিছু বলতে পারব না। আর এ ধরনের অনুষ্ঠানে ভাল কিছু বলতে না পারলে কিছু না বলাই উচিত। যারা আমন্ত্রণ জানাতে এসেছিলেন তাঁরা বললেন, আপনার যা বলবার আপনি বলবেন। আমি শরৎচন্দ্র সম্পর্কে খারাপ কোনো কথা বলিনি। তাঁর সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে আমার ধারণার কথাটিই বলেছিলাম। সন্তোষদাও (সন্তোষকুমার ঘোষ) একই রকম বলেছিলেন। আমি যা বলেছিলাম, সেটা কেউ লিখে রাখেনি। কিন্তু সেটা নিয়েই দারুণ হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেল। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, যা আমি বা আমরা বলিনি, তার উপর ভিত্তি করে নানা কথা লেখা হতে লাগল।

সাগরময় ঘোষ সুনীলের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। তিনি বললেন, যুগান্তর পত্রিকা বুদ্ধদেব বসুকে একবার অকারণে আক্রমণ শুরু করেছিল। আর এ ব্যাপারে বিষ্ণু দে বুদ্ধদেব বসুর বিরুদ্ধে একটি চিঠিও লিখেছিলেন।

—কি রকম? আমি জানতে চাইলাম।

সাগরময় ঘোষ বললেন, সেটা ছিল রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর বছর। কে একজন অভিযোগ করেন যে, বুদ্ধদেব বসু আমেরিকায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নাকি কটূক্তি করেছেন। কিন্তু ব্যাপারটা একেবারে বানোয়াট। এই ব্যাপারেও কাগজেকলমে কোনো প্রমাণ ছিল না। শেষপর্যন্ত অবশ্য অভিযোগকারীদের

বক্তব্য যে ভুল, সেটাই প্রমাণিত হয়েছিল। বুদ্ধদেব বসু তো শেষজীবনে রবীন্দ্রনাথের যারপরনাই ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন।

'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষ ১৯৪০ সালের পহেলা জানুয়ারী তারিখে 'দেশ'-এ যোগদান করেন। প্রায় সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর ব্রত পালন করে চলেছেন। এই চার দশক সময়সীমার মধ্যে বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব দিকপাল লেখকের রচনাই 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা তিনি বহুসংখ্যক তরুণ লেখককে বৃহত্তর পাঠকসমাজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। অতীত এবং বর্তমানের অনেক অনেক লেখকের আত্মপ্রকাশের পথ সুগম করে দিয়েছেন তিনি। তাঁর বয়স এখন সত্তরের কোঠায়। কিন্তু এখনও তিনি সজীব। স্মৃতিশক্তিও অত্যন্ত প্রখর। তিনটি বই লিখেছেন তিনি। এগুলোর মধ্যে একটি 'সম্পাদকের বৈঠকে'—সাহিত্যিকদের নিয়ে লেখা।

সাগরময় ঘোষকে আমি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে একটি প্রশ্ন করেছিলাম। 'এক্ষণ' পত্রিকায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে দিনলিপি প্রকাশিত হয়েছে এবং তাতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে পরিচিতি ফুটে উঠেছে, সেটা কতদূর সঠিক সেটাই জানতে চেয়েছিলাম আমি।

প্রশ্ন শুনে খানিক চুপ থেকে তিনি বললেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ বয়সে দারুণ ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে পড়েছিলেন। লেখার মানও খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ফ্রাস্ট্রেশনই মদ্যপানের দিকে অতিরিক্ত ঝুঁকে পড়ার কারণ। আর ওঁর এককালের বন্ধুরা—তাঁরাও ওঁকে শেষদিকে দেখতে পারত না।

সুনীল বললেন, 'এক্ষণ' পত্রিকায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে ডায়েরীটা প্রকাশিত হয়েছে সেটাতে অনেক কিছু নেই। আমার মনে হয় এডিট করা হয়েছে।

এরপর সাহিত্যিকদের মধ্যে রেষারেষির ভাব নিয়ে কথা উঠল। সাগরময় ঘোষ বললেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তারাশঙ্করের একটা রেষারেষির ব্যাপার ছিল। তারাশঙ্কর এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যেও ছিল কিছুটা। কিন্তু বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত বেশী ছিল না।

বললাম, আপনি 'সম্পাদকের বৈঠকে' বইতে যেসব সাহিত্যিকদের কথা লিখেছেন তাঁদেরও মধ্যেও কি রেষারেষি ছিল?

সাগরময় ঘোষ তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, ছিল! এককালে যাঁরা সুহৃদ ছিলেন, সাহিত্যচর্চায় নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন, একসঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন, আড্ডা দিতেন—তাঁদের মধ্যেও রেষারেষি ছিল। এঁদের অনেকে তো শেষজীবনে একে অন্যের মুখদর্শনও করতেন না। যেমন প্রেমেন্দ্র মিত্র আর অচিন্ত্য সেনগুপ্ত। দু'জনে হরিহর আত্মা ছিলেন। কিন্তু যখন এঁরা বুড়ো হয়েছেন, তখন এঁদের পরস্পরের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়েছে। এ রকম আরও অনেক আছে।

বললাম, ইদানীং নাকি এ রকম একটা রেষারেষির ভাব সমরেশ বসু আর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যে দেখা দিয়েছে।

সাগরময় ঘোষ বললেন, না, না—এটা ভুল সংবাদ।

সুনীল বললেন, আমাদের অগ্রজ লেখকদের মধ্যে সমরেশ বসুর সঙ্গেই আমার সম্পর্ক সবচেয়ে ভাল। রেষারেষির কোনো প্রশ্নই আসে না।

আমি একটা কথা খুব জোর দিয়ে বলতে পারি, সাগরময় ঘোষ বললেন, আমাদের লেখকদের মধ্যে সুনীলই একমাত্র যে অন্যের সম্পর্কে কখনও খারাপ কথা বলে না। লোকের বদনাম করা ওর স্বভাবের মধ্যে নেই।

সুনীল যেন কতকটা আত্মগতভাবেই বললেন, আমি কেন কারও সঙ্গে রেষারেষি করতে যাব? আমার তো কোনো অ্যাম্‌বিশান নেই। আমি যেমন আছি, তেমনই থাকতে চাই।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আর এক নাম নীললোহিত। নীললোহিত তার ছদ্মনাম। নীললোহিতের একটি উপন্যাস চলতি বছরের শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। সাগরময় ঘোষ উপন্যাসটির মেজাজ

সম্পর্কে বলতে সুনীলের আত্মপ্রকাশ-এর উল্লেখ করলেন। সুনীলকে বললেন, তোমার 'আত্মপ্রকাশ'-এর সঙ্গে উপন্যাসটি লেখার ভঙ্গিরও মিল আছে।

বললাম, নীললোহিত ছদ্মনামে আপনি কেন লেখেন? সেকি, যে-সব লেখা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে লিখে অ্যামবারাস্‌ড হবেন ভাবেন সেটা এড়াবার জন্য?

সুনীল প্রশ্নটা শুনে কি একটু বিব্রত হলেন? আমার ভুল হতে পারে। তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, না, না। সে রকম কোনো ব্যাপার নেই। নীললোহিত একটি চরিত্র। নীললোহিতের বয়স সাতাশ। সে বেকার। বিয়ে করেনি। আমি বিবাহিত। এক সন্তানের জনক।

বললাম, আপনার বয়স কত?

সুনীল বললেন, পঁয়তাল্লিশ বলতে পারেন, ছেচল্লিশের কাছাকাছি।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সম্পর্কে বাংলাদেশের অনেক পাঠকের কৌতূহলের আমিও একজন অংশীদার। সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত 'দেশ' পত্রিকায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বহু স্মরণীয় ছোটগল্প এবং কয়েকটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। লেখক হিসাবে স্বরাজ্যে স্বরাট হলেও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, জনপ্রিয় লেখক নন। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সম্পর্কে জানতে চাইলে সাগরময় ঘোষ বললেন, খুবই পাওয়ারফুল লেখক। কম্প্রোমাইজ করতে জানেন না। আর গৃহিণীপনা ওর স্বভাবে নেই। খুব ভাল একটা চাকরি করতেন। বিজ্ঞাপনের 'কপি' লেখার কাজ—বিখ্যাত একটি এ্যাডভার্টাইজিং ফার্মে। সেখানকার চাকরি ছেড়ে দিলেন লেখায় পুরো সময় দেয়ার জন্য। এতদিন চাকরি করলে অফিসার হয়ে যেতেন। আনন্দবাজারেও চাকরী করতেন। কিন্তু আনন্দবাজারেও থাকলেন না। স্বরাজ পত্রিকায় চাকরি নিয়েছিলেন। সেখানেও থাকলেন না। আমি একদিন বলেছিলাম, আপনি চাকরি ছেড়ে দিলেন! জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বললেন, ট্রামে উঠতে আর নামতে যে হয়রানী—অনেক সময় লেগে যায়। ফিরে এসে আর লেখা হয় না। তাই চাকরি ছেড়ে দিলাম। লেখার জন্য এত ভালবাসা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর।

সুনীল বললেন, ওর ছোট গল্প খুব ভাল। খুবই পাওয়ারফুল লেখক।

মনে পড়ল, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সম্পর্কে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'দেশ'-এর পাতায় একটি হৃদয়গ্রাহী লেখা লিখেছিলেন।

সাগরময় ঘোষ বললেন, খুবই খেটেখুটে লেখেন। উপন্যাসগুলো ওর 'ক্লিক' করে না। তবে, বারো ঘর এক উঠোন খুব ভাল লেখা। ওই উপন্যাসটা পাবলিক নিয়েছিল।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে ছবি তৈরী করেছেন সত্যজিৎ রায়। এছাড়া ইন্দর সেন এবং স্বদেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। আর একজন পরিচালক সুনীলের ছোটদের জন্য লেখা একটি উপন্যাস অবলম্বনে ছবি তৈরী করেছেন।

উপন্যাসের চিত্ররূপ প্রসঙ্গে প্রশ্ন রাখতে সুনীল বললেন, আমি ছবি দেখি না। ক'সপ্তাহ আগে 'জীবন যে রকম' ছবি মুক্তি পেয়েছে। আমি দেখিনি—'সবুজ দ্বীপের রাজা' দেখেছিলাম। আন্দামানের পটভূমিতে লেখা—ছবিটাও সেখানে তোলা।

৩

গতবারের পত্রিকার রেশ ধরে এবারও আমরা যখন ঠিক করলাম যে, আর একটি শিশু-কিশোর বিষয়ক সংখ্যা প্রকাশ করব—তখন আমরা এটাও ভেবেছিলাম যে—এবারের সাক্ষাৎকার বিভাগের আলোচনাটা মূলত শিশুকিশোর সাহিত্যকে কেন্দ্র করেই করার চেষ্টা করব। ঐ ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতেই আমরা গিয়েছিলাম আজকের অগ্রগণ্য কিশোর সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর কাছে। কিছুটা সংশয়, কিছুটা ভয় নিয়েই আমরা যখন তার কাছে কথাটা পাড়লাম—অবাক হয়ে দেখেছিলাম প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে তিনি রাজি হয়েছিলেন এবং খুবই স্বল্প সময়ের পবওয়ানাতেই সুনীলদা আমাদের সঙ্গে এক দীর্ঘ সকাল কাটিয়েছিলেন। তারই ফলশ্রুতি এই সাক্ষাৎকার।
আরব্ধর পক্ষ থেকে সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছিলেন বিশ্বজিৎ দাশগুপ্ত, শান্তনীল গাঙ্গুলী, সঞ্জয় রায় এবং বিশ্বজিৎ দত্ত।

আরব্ধ : একসময় আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলা সাহিত্যে প্রচুর শিশু-সাহিত্যিক এসেছেন যাদের সাহিত্যকর্ম শুধুই শিশুদের নিয়ে, যেমন—খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সুকুমার রায়, উপেন্দ্রকিশোর, লীলা মজুমদার, ধীরেন্দ্রলাল ধর, সুনির্মল বসু, স্বপন বুড়ো, শিবরাম চক্রবর্তী—অথচ বর্তমানে শুধু লীলা মজুমদার ও শৈলেন ঘোষ ছাড়া আর তেমন কাউকে পাচ্ছি না—এর কারণ কী?

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : সময়ের ধারা অনুযায়ী এরকম হয় বোধহয়। আমি ঠিক জোর দিয়ে বলতে পারব না কেন এরকম হলো। কিন্তু ধরো আগেকার দিনে তো খুব বেশি বই বিক্রি হতো না, লেখকরা যারা ছোটদের জন্য বই লিখত তারা এটা জীবিকা বলে মনে করতেন না। তারা অন্য কাজ করতেন। আসলে তারা ছোটদের ভালোবেসে এই সমস্ত সাহিত্য রচনা করতেন। এখন হয়তো একটা জীবিকার প্রশ্ন এসেছে। কিন্তু আমি তাও বলব জীবিকার প্রশ্ন এলেও ছোটদের বইতো এখন আরো বেশি বিক্রি হয়। তাই ছোটদের জন্য লেখাটা ক্ষতিকর নয়। তবু কেন যে অনেকে এগিয়ে আসছে না কে জানে! আগেও ধরো অনেক লেখক বড়দের জন্যেও লিখত পাশাপাশি ছোটদের জন্যও লিখত। যেমন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাছাড়া বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ—এরা সকলেই বড়দের পাশাপাশি ছোটদের জন্য লিখেছেন। যেমন এখন আমরা লিখছি।

আরব্ধ : আচ্ছা এ প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে হয়—আপনার সাহিত্যকর্ম তো শুরু হয়েছিল বড়দের জন্যই, তারপর বেশ কিছুদিন বাদে আপনি ছোটদের সাহিত্যের জগতে এলেন—এটা কোন্ জায়গা থেকে?

সুনীল : ছোটদের জন্য লেখার ব্যাপারটা আসলে আমি বেশ কিছুদিন বাদেই শুরু করেছি। প্রথম দিকে ছোটদের জন্য লেখার কথা আমি ভাবিনি—তখন তো একটা কবিতার পত্রিকা বার করতাম। একটা কবিতার আন্দোলন করব—নতুন কিছু ঘটাব—এই সমস্ত ভাবনা ছিল। সত্যিকথা বলতে কী যখন আনন্দমেলা পত্রিকাটা প্রথম প্রকাশ হয় তখন সেই পত্রিকার পক্ষ থেকে আমাকে লেখার কথা বলা হয়। আর তখনই আমি ছোটদের জন্য লিখতে শুরু করি। এমন নয় যে আমি নিজে থেকে লিখতে শুরু করেছিলাম।

আরব্ধ : বাইরের ঐ তাগিদের জন্যই?

সুনীল : হ্যাঁ, ঠিক তাই।

আরব্ধ : তারপরে কি এখন নিজের থেকে লিখতে ইচ্ছা করে?

সুনীল : হ্যাঁ, খুবই ইচ্ছে করে। লিখতে শুরু করার পর দেখলাম লিখতে বেশ ভালো লাগছে। আমি তো নানারকম লিখি, যখন ছোটদের জন্য লিখি তখন যেন বয়সটা আমার পিছিয়ে যায়, আমি বারো-তেরো বছরের একটা ছেলে হয়ে যাই। আমি একদম বাচ্চাদের জন্য—মানে ৬-৭ বছরের ছেলে মেয়েদের জন্য, আমি লিখতে পারিনা। আমার ঐ বয়সের কোনো স্মৃতি নেই। আমার বারো-তেরো বছর বয়সের স্মৃতি আছে, আমি ঐ বয়সটায় ফিরে যাই আর তখনকার মন নিয়ে আমি লেখার চেষ্টা করি।

আরব্ধ : এখানে একটা প্রশ্ন মনে হলো আপনার শৈশবটা তো কেটেছে বাংলাদেশে...

সুনীল : না পুরোটা বাংলাদেশে কাটেনি। আমি সৌভাগ্যবান যে আমি গ্রামেও থেকেছি, শহরেও থেকেছি। তার কারণটা হচ্ছে যদিও আমার জন্ম বাংলাদেশে কিন্তু আমার বাবা আগে থেকেই কলকাতায় ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করেছিল, ফলে আমরা সপরিবারে কলকাতাতেও থেকেছি যাকে বলে—"রিফিউজিদের" মতো পার্টিশনের পর এদিকে আসিনি। আগেও এখানে থাকতাম, মানে যাওয়া আসা করতাম। ফলে শহরের জীবনটাও আমি জানি, গ্রামের জীবনটাও আমি জানি।

আরব্ধ : এ প্রসঙ্গ ধরেই প্রশ্নটা রাখছি—আপনার কোনো ছোটদের গল্পে এখনও পর্যন্ত কিন্তু বাংলাদেশ পাইনি। অথচ আপনি বললেন যে আপনি ছোটদের নিয়ে লেখার সময় বারো-চোদ্দো বছর বয়সে চলে যান,—তা আপনার বারো-চোদ্দো বছর বয়সের অভিজ্ঞতায় তো বাংলাদেশ রয়েছে। যে বাংলাদেশ আপনার কবিতায় কিন্তু বারবার ফিরে আসে—

সুনীল : দু-একটা বড়দের উপন্যাসেও তো রয়েছে—হ্যাঁ, ছোটদের জন্য সেভাবে লেখা হয়নি। আমি গত বছর যখন বাংলাদেশে যাই, তখন আমি একবার ময়মনসিংহেও গিয়েছিলাম। এর আগে আমি কখনো ময়মনসিংহ যাইনি। তসলিমা নাসরিনের গাড়িতে, সঙ্গে শামসুর রাহমান ছিল, বেলাল চৌধুরী ছিল, সেখানে একটা বিরাট রাজবাড়ি দেখেছিলাম ভীষণ সুন্দর। রূপকথায় যেমন পড়ি অনেকটা সেরকম। মস্ত বড় বাগান-টাগান, নাচঘর, মন্দির—সব ভেঙে ভেঙে পড়ছে—সেখানে গোপন সিন্দুকও ছিল, মাটির তলায় পোঁতা। ওখানে নাকি মাঝে মাঝে সোনাও পাওয়া যায়। একবার ওখানকার লোকেরা খুঁজতে গিয়ে এক মন সোনা পেয়েছিল। তা ঐ সমস্ত জায়গা দেখে—সে ভীষণ রোমাঞ্চকর জায়গা—মনে হয়েছিল এ পরিবেশটা নিয়ে লেখা যায়। কিন্তু এখনো লেখা হয়ে ওঠেনি। দেখা যাক কী হয়...

আরব্ধ : আপনার বেশিরভাগ শিশু-কিশোর সাহিত্য খুব নরম আর স্পর্শকাতর মনে হয়। খুব ভালোবাসাময় মনে হয় সম্পর্কগুলো—কিন্তু, আজকের দিনে একটি বাচ্চাকে অনেক crudity face করতে হয়, তাদের অনেক মিথ্যাচার করাতে হয়—অনেক খারাপ অভিজ্ঞতা হয়। এই যে তারা নানারকম crudity face করছে, শঠতা দেখছে—পরিচিত হচ্ছে। আপনার সাহিত্যে এগুলো আমরা পাই না—আরও অনেক শিশু-কিশোর সাহিত্যেও আমরা পাই না—এমনটা কেন?

সুনীল : এটা একটা নিজস্ব যুক্তি খাড়া করেই করা হচ্ছে। এরকমটা নয় যে আমি অন্যমনস্কভাবে বাদ দিচ্ছি। এটা সাধারণভাবে বলা যায় যে বয়স্ক সাহিত্য হচ্ছে সমাজের দর্পণ। যাকে বলে, সমাজের যে সমসাময়িক বাস্তবতা সেটা বাদ দিয়ে সাহিত্য হয় না। অর্থাৎ চারিপাশে যেটা ঘটছে—মিথ্যাচারিতা, ক্রুরতা, সম্পর্কের জটিলতা, বিশ্বাসহীনতা—এ সমস্ত বাদ দিয়ে বড়দের সাহিত্য হয় না। এ সব বাদ দিয়ে যদি কেউ লেখে তাহলে লোকে বলবে—এ হে কী লিখছে! কিন্তু শিশুদের সাহিত্য ঠিক বাস্তব নয়। শিশুদের সাহিত্য কিছুটা আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার জন্য, কিছুটা কল্পনা শক্তির বিস্তার ঘটানোর জন্য। ছেলেমেয়েরা তো এসব দেখছে। তারা তো বড় হয়ে এ সমস্ত বিষয় পড়বেই। ছেলেবেলায়

কিছুটা পড়ুক না যাতে উচ্চ আদর্শর কথা আছে, যাতে কল্পনার অবাধ বিস্তার আছে। হিমালয়ে চড়ব, অমুক করব, তমুক করব এই সমস্ত যদি তাদের মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তাহলে হয়তো ভবিষ্যৎ জীবনে এর প্রতিফলন পড়তে পারে—এই ভেবেই এ সমস্ত করা। তাই এ সমস্ত ক্রুরতা বা সম্পর্কের জটিলতা ইত্যাদি শিশু সাহিত্যে ঢোকানোর পক্ষপাতী আমরা নই।

আরব্ধ : কিন্তু ছোটদের নানানভাবে এই সমস্ত বাস্তবকে তো face করতেই হয়।

সুনীল : হ্যাঁ করতে তো হয়ই কিন্তু আবার এ সমস্ত বাস্তব থেকে তাদের সরিয়েও তো নিই। ধরো, সে রাস্তায় একটা খারাপ কিছু দেখল, আবার সে যখন বাড়িতে ফিরল তখন তাকে রূপকথার গল্প বলি। আমরা চেষ্টা করি মাঝে মাঝে বাস্তব থেকে তাকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার।

আরব্ধ : তার মানে কী এটা—ছোটদের ভুলিয়ে রাখবার জন্য...

সুনীল : ভুলিয়ে রাখার জন্য মানে এই নয় যে ঘুম পাড়িয়ে রাখার জন্য, বরং তাদের কল্পনাটাকে উদ্দীপ্ত করার জন্য। তারা যে পরিবেশে যেভাবে আছে সেই পরিবেশ ছাড়িয়ে তারা যেন আরো কিছুটা যেতে চায়,—সেটারই একটা চেষ্টা থাকে।

আরব্ধ : অনেকটা সেই ভাবে—যেভাবে আমরা খারাপ জিনিস থেকে ছোটদের চোখটা সরিয়ে রাখার চেষ্টা করি, সাহিত্যেও হয়তো...

সুনীল : হ্যাঁ, ঠিক সেই ভাবেই, তবে সরিয়ে দেওয়া মানে এই নয় যে চোখটা ঢেকে দেওয়া—চোখটা অন্যদিকে সরিয়ে দেওয়া। তখন আমরা তাদের গান শুনতে বলি, ছবি আঁকতে বলি।

আরব্ধ : আচ্ছা সুনীলদা একটা কথা—কিছুদিন আগে ছোটদের একটা নাটক দেখলাম—চেতলা কৃষ্টি সংসদের নাটক। শিশু শ্রমিকদের কেন্দ্র করে একটা নাটক। সেই নাটকে অনেক কিছু মজা আছে কিন্তু যন্ত্রণাও আছে। তা এই নাটকটা দেখে অনেকেই প্রশ্ন করেছেন যে, এটা কি আদৌ বাচ্চাদের নাটক? তারা কি আদৌ enjoy করতে পারবে?—তা তখন আমাদের একটা জিনিস মনে হয়েছিল, ধরুন একটা বাচ্চার উপর বড় কেউ অত্যাচার করছে, কষ্ট দিচ্ছে—এরকম কোনো জায়গা দেখে যদি তারা অন্যের যন্ত্রণার প্রতি একটু সচেতন হয়ে ওঠে, একটু যদি মানবিক হয়ে ওঠে—সেটা কি দরকার নয়? কিন্তু সেক্ষেত্রে এই crudity-তো তারা দেখল—

সুনীল : যদি সেরকম হয়তো ভালোই। তাই তো হচ্ছে, তুমি যা বলছ—নাটকের মেসেজ-টা তো শেষ পর্যন্ত ভালো হওয়ার দিকে—সেতো ঐ নয় হৈচৈ, খুনোখুনি, অমুক তমুক—তা তো নয়...

আরব্ধ : না, তা নয়।

সুনীল : তা সেরকম চরিত্র ছোটদের গল্পে থাকে,—থাকে না? যেমন ধরো একটা পশুপ্রাণীকে ভালোবাসা—গ্রামের একটা ছেলের সাথে শিক্ষিত একটা পরিবারের ছেলের বন্ধুত্ব হলো,—তাদের মনকে একটু নরম করে রাখা। সত্যি কথা বলতে কী, "স্বাভাবিক ভাবে শিশুরা একটু হিংস্র"—বিজ্ঞানের দিক থেকে এটা সত্যি যে যতদিন না যৌন চেতনার উদ্ভব হয় ততদিন পর্যন্ত মানুষের মধ্যে হিংসা-টিংসা ইত্যাদি প্রবৃত্তিগুলো একটু বেশি থাকে। যৌন চেতনা এসেই তাকে ভালোবাসতে শেখায়—গান, কবিতা-টবিতা, শিল্প ভালোবাসতে শেখায়—এটা একটা বিজ্ঞানের সত্য। এজন্য দেখবে একটা ছোট ছেলে অনায়াসে একটা প্রজাপতির ডানা ধরে ছিঁড়ে ফেলতে পারে—আমাদের মায়া হবে। আমরা ফুলটাকে ভালোবাসতে শেখাই। দেখবে তেরো, চোদ্দ, পনেরো বছরের পর এটা আসে। আগে এটা আসে না। তাহলে এসব জিনিস যদি আমরা লিখি তাহলে সেটা খুব হয়তো বাস্তব হবে কিন্তু তাদের ঐ প্রবৃত্তিকে আরো উশকে দেওয়া হবে।

আরব্ধ : এই চেষ্টাটাই তাহলে আপনার সাহিত্য জুড়ে চলে, যেখানে 'পৃথা ও চন্দ্রদেবতা' 'একটি হাঁসের পালক' গল্পে আপনি—

সুনীল : হ্যাঁ, ঐগুলোয় চেষ্টা করা হয়েছে।

আরব্ধ : এখানে আর একটা কথা মনে হচ্ছে, এই গল্পগুলো আমাদের ভীষণ ভালো লাগে।

আমরা বড়রা যখন পড়ি 'একটি হাঁসের পালক'-এর মতো গল্প বা 'পার্বতীপুরের রাজকুমার' বা 'সত্যি রাজপুত্র'—আমাদের অসাধারণ লাগে। নিজেদের এই ভালোলাগা থেকে আমাদের মনে হয় শিশু সাহিত্য এইরকমই হওয়া উচিত। অথচ ধরুন আমাদের ওখানে একটা কিশোর পাঠাগার রয়েছে "কিশোর মহল" ওখানে যখন আমরা ঐ বইগুলো খোঁজ করতে যাই তখন দেখি ঐ বইগুলো পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু আমরা একেবারে পাচ্ছি না—'কাকাবাবু সিরিজ'। ছোটদের কাছে সেগুলোর চাহিদা অনেক বেশি...

সুনীল : তা তো ঠিকই,—

আরব্ধ : এটা আমাদের জানতে ইচ্ছে করে যে, এই ধরনের বইগুলো আমাদের ভালোলাগে বলে শিশুদের এগুলো পড়া উচিত বলে মনে করি। ছোটদেরও কি ওটাই ভালোলাগে?

সুনীল : সব শ্রেণীর ছোটদের ভালোলাগে না। তুমি দেখবে যে, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটদের লেখাগুলো যেগুলো আমরা মনে করি খুবই ভালো সেগুলো কিন্তু ছোটরা পছন্দ করে না, বড়রা পছন্দ করে। কিন্তু কী করা যাবে, কিছু কিছু ছোট ছেলে—তাদের হয়তো ভালো লাগবে। বা, ছোটবেলায় হয়তো পড়ল—অতটা কিছু বুঝল না, বড় হয়ে মনে করবে যে ঐ বইটা অর্ধেক পড়েছিলাম পড়িতো বাকিটা। আমি একটা বই লিখেছি "উদাসী রাজকুমার" বলে, ইতিহাসের একটা ঘটনা নিয়ে...

আরব্ধ : হ্যাঁ, আনন্দমেলায় ধারাবাহিক ভাবে বেরিয়েছিল।

সুনীল : কেউ পড়তে চায় না। অথচ সেটা খুব মন দিয়ে লেখা, ভালো করে লেখা। কাকাবাবুর অনেক গল্প তো ভালো হয় না, তাড়াহুড়ো করে লেখা কিন্তু সেগুলো বাচ্চারা পড়ে যেহেতু অ্যাডভেঞ্চার থাকে। কিন্তু যেটায় ধরো ইতিহাস বা ঐরকম থাকে বেশি পড়তে চায় না—কিছু সংখ্যক পড়ে, যেসব ছেলে-মেয়েরা আবার কল্পনাপ্রবণ হয় তারা পড়ে। তা কী করা যাবে এরকমই হচ্ছে। তারা অ্যাডভেঞ্চার অমুক-তমুক পড়তে ভালোবাসে। মারামারি, খুনোখুনি, চোর ডাকাতের গল্প এসব পড়তেই ভালোবাসে। তবু আমরা চেষ্টা করি—আমি এতগুলো কাকাবাবুর গল্প লিখেছি কোনো প্রত্যক্ষ খুনের ঘটনা লিখিনি পরিষ্কার করে—ভয়ংকরভাবে মারল বা গলা কেটে ফেলল এসব একদম লিখিনা—কক্ষনো লিখিনা। কিন্তু যেগুলো দেখবে শস্তাদরের ছোটদের লেখা ছোটরা সেগুলোই বেশি পড়ে।

আরব্ধ : "সত্যি রাজপুত্র" গল্পটা আমাদের অসাধারণ লেগেছে এর language খুব ফুরফুরে—এত soft, অধিকাংশ গল্পেই আপনার language খুব ভালো। তা যাই হোক, এই গল্পে একটা বিষয় striking লাগে যে বাচ্চা ছেলেটির একটা উপলব্ধির জায়গা হচ্ছে—ছোটদের জায়গা থেকেই বুঝে যাচ্ছে যে, ডাকাতের থেকেও মহাজনরা আরো খারাপ—

সুনীল : হ্যাঁ—সবচেয়ে খারাপ জিনিস হলো বাচ্চাদের গল্পে যদি উপদেশ দেওয়া হয় বাচ্চারা তাহলে রেগে যায়। তারা ভাবে উপদেশ দিচ্ছে, জ্ঞান দিচ্ছে। যেগুলো আমাদের মনে হয় বাচ্চাদের জানা উচিত সেগুলো গল্পের মধ্যে দিয়ে খুব আস্তে আস্তে জানাতে হয়। "সত্যি রাজপুত্র" গল্পে আমি এটাই জানাতে চেয়েছি। আসলে বাচ্চাটা তো একটা বাড়ির ঘেরাটোপের মধ্যে থাকত বাস্তবটা জানত না। সে যখন বাইরে বেড়িয়ে এল, আরো অনেক মানুষজনের সঙ্গে মিশল তখন সে বাইরের পৃথিবীটা-বাস্তবটা চিনতে শিখল, সে চাষিদের দেখল...

আরব্ধ : হ্যাঁ এখানে একটা ব্যাপার আমাদের খুব Interesting লেগেছে, যে ছেলেটা চাষিদের সঙ্গে ওরকম একটা মানবিক ব্যবহার করল, সে কিন্তু নিজের বাড়ির চাকর বা ড্রাইভারের সঙ্গে খুব রূঢ় আচরণ করছিল—

সুনীল : হ্যাঁ আগে তো সে বাইরেটা দেখেনি, সে ওরকম পরিবেশের মধ্যে ছিল না। আর ওইসব বাড়ির ছেলেরাতো ওই রকম রূঢ় আচরণই করে।

আরব্ধ : তার মানে এই ব্যাপারটা আপনি খুব সচেতনভাবে রেখেছেন?

সুনীল : হ্যাঁ তাই। তবে খুব আস্তে আস্তে খুব সাবধানে। বেশি বেশি হয়ে গেলেই ভাববে, ঐ উপদেশ দিচ্ছে বা জ্ঞান দিচ্ছে।

আরব্ধ : এইখান থেকে আপনাকে একটা প্রশ্ন করছি আমার ছেলেবেলায় বা কৈশোরে আপনার লেখা পড়েছি অনেক, তা ধরুন আমার ছেলেবেলা থেকে এখনকার ছেলেবেলা সময়ের হিসেবে ১৫-১৬ বছর হলেও পাল্টে গেছে অনেক। আমরা সেইসময় গুলি খেলতাম, ডাংগুলি খেলতাম...

সুনীল : তাই নাকি তোমরাও এসব খেলতে!

আরব্ধ : সে সময় ধরুন আমরা সেই সমস্ত খেলা খেলতাম যে সমস্ত খেলায় পয়সা লাগে না কিন্তু খেলা যায় অনেকে। আমাদের প্রচুর বন্ধু ছিল—বন্ধু নিয়ে খেলতাম। ঐ রকম একটা ছেলেবেলায় আমরা আপনার লেখা পড়েছি, পড়ে প্রচুর মজা পেয়েছি। তা ধরুন এখনকার একটা ছেলে সে অনেক খেলনা নিয়ে খেলে—তার বন্ধু প্রায় নেই বললেই হয়। তা এই যে শৈশবটা অনেক পাল্টে গেছে সেই অনুযায়ী আপনার গল্প কি কোথাও পাল্টে গেছে বা আপনি কি feel করেছেন?—কিছু মনে হয়েছে?

সুনীল : আসলে আমি যখন লিখি তখন তো আমি আমার শৈশবে ফিরে যাই ফলে সেই পরিবেশটাই এসে যায়। মাঝে মাঝে অবশ্য সচেতনভাবে ভাবি আরে এখনকার একটা ছেলে এইভাবে তো ভাবে না, খেলে না। আবার আমার অবচেতনে আমার ছেলেবেলাটাই ফিরে ফিরে আসে।

এখনকার একটা ছেলে তো টেলিভিশন দেখে আমাদের সময় তো টেলিভিশন ছিল না। আমি একটা গল্পে লিখেছি টেলিভিশনের ভিতর থেকে আর একজন কথা বলতে লাগল—এখনকার পরিবেশের ওপর। আমার মনে হয় এখন যারা লিখছে মানে এখন যারা লিখতে শুরু করেছে তাদের লেখায় আরো বেশি বেশি করে আসবে। আবার কিছু বিষয় থাকে যা চিরকালের বদলায় না। যেমন অনেক সময় বাচ্চাদের একটা কুকুর নিয়ে প্রীতি থাকে, ভালোবাসা থাকে—যা আগেও ছিল এখনও আছে। বা ধরো পাহাড় সম্বন্ধে একটা মোহ যা চিরকালীন সেগুলো আমার লেখায় আসে।

আরব্ধ : আবার একটা ফারাক খুব চোখে পড়ে—যেমন ধরুন তখন আমরা ঘনাদা, টেনিদা, বগলা মামার মতো গল্প প্রচুর পড়তাম, তা এই চরিত্রগুলো—ঘনাদা, টেনিদা, বগলা মামা, এদের তুলনায় কাকাবাবু, ফেলুদা, ঋজুদা অনেক বেশি Sophisticated—ঘনাদা যেমন বানোয়ারীর তেলেভাজা পেলেই খুশি, বগলা মামাতো একজন ঘরোয়া লোক। কিন্তু এখনকার ঋজুদাকে দেখুন, তাকে যেন একটু দূরের মানুষ মনে হয়। কাকাবাবুও তার জায়গায় দাঁড়িয়ে অনেক Sophisticated; বাজে কথা বলা পছন্দ করে না, সাধারণ লোকের ইয়ার্কিকে পাত্তা দেয়না—

সুনীল : একটা ছোট ছেলে আছে—

আরব্ধ : হ্যাঁ জোজো। ছেলেটা একদম অন্যরকম খুব মজার—তা ধরুন এই চরিত্রগুলো একদম বদলে গেল কেন?

সুনীল : সময় অনুযায়ী তো বদলাবেই। যেমন ধরো প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা। সে তো মেসে থাকত। মেসের লোকেদের সঙ্গে গল্প গুজব করতে গিয়েই গল্পগুলো বলত। তা মেস তো এখন ধরো উঠেই গেছে, আমরা জানিও না মেসের গল্প। আমরা যেগুলো জানি সে গুলোই লিখি। আর তাছাড়া কাকাবাবুতো প্রথম থেকেই এক রকম ভাবে তৈরি হয়ে গেছে—এখন তো আর পাল্টানো যায় না।

আরব্ধ : কিন্তু প্রথম থেকে এভাবেই বা তৈরি হলো কেন? ধরুন ফেলুদা—তার কোনো ত্রুটি নেই, সামান্য কিছু ত্রুটি থাকলেও তো বোঝা যায় যে, পাশে বসে গল্প করতে পারে—কিন্তু ফেলুদা একদম Perfect—ঋজুদারও কোনো ত্রুটি নেই—কাকাবাবুরও কোনো ত্রুটি নেই...

সুনীল : কেন ওই যে পা খোঁড়া...

আরব্ধ : কিন্তু তার তো অনেক পা ওয়ালা লোকের চেয়েও ক্ষমতা অনেক বেশি। এখনকার

যে কোনো চরিত্রই দেখছি এরকম হয়ে যাচ্ছে,—এরকম হয়ে গেল কেন? এখনকার বাচ্চারা ঐ রকমই পছন্দ করে?

সুনীল : বাচ্চারা পছন্দ করে কী করে না সে সব ভেবে চিন্তে তো লেখা হয় না—যে লেখক ঐগুলো লিখছে তার জীবনযাপনের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই ঐগুলো তৈরি হয়। আমি তো লেখার সময় হিসাব করতে বসিনা যে বাচ্চারা খুশি হবে কী হবে না। মনে যে রকম আসে—আমার জীবনযাপন, আমার যে পরিবেশ তার অনেকটা প্রভাব ফেলে।

আরব্ধ : আচ্ছা সুনীলদা, বিদেশী যে সমস্ত থ্রিলারগুলো আছে সেগুলো আমরা কিছু কিছু পড়েছি। যদিও ছোটদের খুব বেশি পড়িনি—কয়েকটি ছাড়া। পাঁচটি ছেলে মেয়েকে নিয়ে একটা অ্যাডভেঞ্চারের ব্যাপার...

সুনীল : Five boys–

আরব্ধ : হ্যাঁ।

সুনীল : কোনো কোনো বাঙালি লেখকের লেখাতেই ওগুলো পেয়ে যাবে—

আরব্ধ : একদম—পঞ্চপাণ্ডব—হুবহু...। তা সেক্ষেত্রে থ্রিলারগুলোতে একটা ব্যাপার দেখেছি—থ্রিলারগুলো খুব টানটান হয়, সেখানে কিছু ক্রুয়েলিটি থাকে আপনি যেটা বললেন যে ক্রুয়েলিটি গুলো দেখাতে চান না।— 'একদম খুন করে দিচ্ছে' 'বিষ মিশিয়ে দিচ্ছে'...

সুনীল : বললাম তো ঐ রগরগে বিষয়গুলো দিলে বাচ্চারা খুব পছন্দ করে, পড়ে বেশি। কিন্তু আমার মতে দেওয়া উচিত না।

আরব্ধ : হ্যাঁ আপনার থ্রিলারের মধ্যে অনেক soft জায়গা থাকে তাই না?—তা এই যে soft জায়গাগুলো—এর ফলে কখনো আমাদের মনে হয়েছে Thriller-এ যে একটা বিষয় থাকে, আপনার গল্পগুলোর মধ্যে সেটা কোথাও loose করে, এগুলোকে আপনি কোনো ক্ষতি বলে মনে করেন না?

সুনীল : আমি থ্রিলার লিখিনা। যেমন ধরো আমি সব সময় বলি আমি গোয়েন্দা কাহিনী লিখিনা। আমার যে কাকাবাবু সে গোয়েন্দা নয়। একটা খুন হলো—নানা রকম চিহ্ন দেখে নানা রকমভাবে খুনিকে ধরল—তা নয়, কাকাবাবুর গল্পগুলো অ্যাডভেঞ্চারের গল্প, কোনো একটা অজানা বিষয় নিয়ে আরম্ভ হয়—chase করে—অমুক তমুক করে। কাজেই গোয়েন্দা গল্প আমি লিখিনা যারা লেখে তাদের ওটা দরকার।

আমার গল্প ঢিমে তালে ভাবে আরম্ভ হয়—কাকাবাবু একটু গল্প করছে -এর সাথে গল্প করছে—ওর সাথে গল্প করছে—করতে করতে একটা কোনো ঘটনা ঘটল—বেশির ভাগই আউটডোরে, মানে বাড়ির মধ্যে না—পাহাড়ে, জঙ্গলে, বা মরুভূমিতে, বা অনেক সময় শহরেও। যাতে ছোটদের একটা কল্পনার বিস্তার হয়। নিজেরা যেমন ঘরের মধ্যে থাকতে বাধ্য, কিন্তু ঐ গল্প পড়তে পড়তে তারা কাকাবাবুর সাথে হিমালয়ে যাচ্ছে, মিশরে যাচ্ছে,—সঙ্গে সঙ্গে Journey-টা শুরু হয়। Journey-টা আমি ওভাবেই শুরু করি। ফলে যে পড়ছে সেও তখন ওভাবে যেতে থাকে। তা এটার বদলে যারা ওরকম লেখে—ওরকম টানটান লেখে তাদের আর একরকম লেখা।

আরব্ধ : তাহলে এটাকে আপনি থ্রিলার বলতে রাজি নন?

সুনীল : না আমি রাজি নই।

আরব্ধ : আচ্ছা সুনীলদা, আনন্দমেলা—২৬শে ডিসেম্বর ১৯৯০-এর ভারতীয় কিশোর সাহিত্য শীর্ষক লেখায়—বাঙালিদের বই পড়ার এত আগ্রহ বিষয়ে এক মারাঠি লেখকের প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলেছেন যে, আপনারা ছোটবেলায় শুধুমাত্র ভূত বা ডিটেকটিভ গল্প পড়ে বড় হননি, সে সময় শিশু সাহিত্য অনেক rich ছিল, ভালো ভালো শিশু পত্রিকা বেরোত ফলে ভালো সাহিত্যের রস আপনারা ছোটবেলা থেকেই আস্বাদন করতেন—ভালো সাহিত্যের প্রতি নেশার জন্ম ঐ ছোটবেলা

থেকেই—ফলে আমাদের সুসাহিত্য পড়ার অভ্যাস তৈরি হয়েছে।—কিন্তু এটা তো ঠিক আজকের দিনে বাচ্চাদের হাতে ঐ ভালো গল্পগুলোর থেকে ভূত বা ডিটেকটিভ গল্পই বেশি পৌঁছায়—

সুনীল : ঐগুলো পড়ুক ক্ষতি নেই আমিও এক সময় পড়েছি তা ঐগুলোর সাথে সাথে ভালো গল্পগুলো পড়লে হয় কী—একটা সাহিত্য রস আস্তে আস্তে গড়ে ওঠে, গ্রহণ করার ক্ষমতা বাড়ে। ভূতের বা ডিটেকটিভ গল্পে সাহিত্য রস থাকে না কিন্তু অন্য ধরনের গল্পগুলোয় কিছুটা হলেও সাহিত্য রস থাকে—ফলে পরবর্তী জীবনে সাহিত্য পড়ার দিকে একটা ঝোঁক বাড়ে।

আরব্ধ : কিন্তু ধরুন আপনি যেটা বলেছেন—ছেলে বেলা থেকে ভালো সাহিত্যের রস আমরা পেতে থাকি এবং বড় সাহিত্যিকরাও ছোটদের জন্য লিখেছেন। কিন্তু আজকে দাঁড়িয়ে দেখছি কমিক্‌সের বা থ্রিলারের দিকেই প্রধান ঝোঁক এবং চাহিদাও সেরকম তৈরি করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে কী, মানে পরবর্তী প্রজন্মের ক্ষেত্রে সেরকম—

সুনীল : কিন্তু আমরা এখনো... এখনো আমরা এটা বলব না যে তারা শুধু কমিক্‌স পড়ছে। তাদের মধ্যে কমিক্‌স কিছু পড়ছে, থ্রিলার কিছু পড়ছে আবার এই ধরনের লেখাও কিছু কিছু পড়ছে। কিছু কিছু পড়লেই যথেষ্ট। ধরো কবিতা তো লোকে সব সময় পড়ে না, মাঝে মধ্যে একটা কবিতা নিয়ে পড়ে—সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে তার মধ্যে একটা কাব্যরস গ্রহণের ক্ষমতা তৈরি হয়েছে। সেরকম কমিক্‌স পড়ুক, থ্রিলার পড়ুক—আটকানো যাবে না, আর আটকানোর কোনো মানেও হয়না। তার সঙ্গে সঙ্গে যদি বড় সাহিত্যিকদের লেখা সাহিত্যধর্মী গল্পও পড়ে তাহলে ভবিষ্যৎ জীবনে হয়তো সাহিত্যের প্রতি একটা অনুরাগ তৈরি হবে—যেটা এখনো পর্যন্ত হচ্ছে। আমি যেটা ঐ মারাঠি ভদ্রলোককে বলেছিলাম—আমাদের এখানে কলেজের ছেলেরা নিজেদের পয়সা বাঁচিয়ে গল্পের বই-কবিতার বই কেনে এটা কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য অনেক জায়গাতেই নেই।—কেউ কেনেনা।

আমরা ছোটবেলা থেকে পড়ি বলেই বোধ হয় বড় হয়ে একটা সাহিত্য পড়ার তৃষ্ণা জেগে ওঠে। ওই বই পড়ার তৃষ্ণা থেকেই আমরা আরও বই পড়তে চাই—এভাবেই একটা অভ্যাস গড়ে ওঠে। আর কমিক্‌স-থ্রিলারের একটা সীমা আছে তো, একটা বয়সের পর আর ভালো লাগবে না।

আরব্ধ : এই মুহূর্তে ধরুন সবচেয়ে জনপ্রিয় শিশুকিশোর পত্রিকা হলো আনন্দমেলা। কারণ অন্য পত্রিকাগুলোর অনেক কম সারকুলেশন। সবার কাছে ঠিকমতো পৌঁছয় না। সংখ্যাও তো অনেক কম।

সুনীল : শুকতারার সারকুলেশনও কম নয়! তবে ওটা বোধহয় অন্য জায়গায় চলে। আনন্দমেলাটা শহরে চলে। শুকতারাটা গ্রামে মফস্বলে একটু বেশি...।

আরব্ধ : আমরা দীর্ঘদিন ধরে আনন্দমেলা পড়ছি। এবং আগেকার আনন্দমেলা—যেটা হয়তো অতটা চকচকে ছিল না, আকৃতিও একটু ছোট ছিল। কিন্তু তখন আমরা দেখতাম কমিক্‌সের সংখ্যা খুব বেশি হলে চারটে,—তিনটে থেকে চারটে, বাড়তে বাড়তে আজ আনন্দমেলায় কমিক্‌সের সংখ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে 'নয়'। একটা শারদীয়া আনন্দমেলা নিলে তাতে ছোট গল্প-বড় উপন্যাসের মধ্যে ডিটেকটিভ গল্প বা থ্রিলার ৭০% জায়গা জুড়ে আছে, এমনকী যে কোনো বড় সাহিত্যিক-রাও ডিটেকটিভ গল্প বা থ্রিলার লিখছেন, তা 'এই যে আটকানো যাবে না'—ঠিক কথা। কিন্তু এটা কী কোনোভাবে উশকে দেওয়াও নয় ওই থ্রিলার বা কমিক্‌সের দিকে?

সুনীল : হুঁ। পত্র-পত্রিকা যারা বার করে তারা শুধু দেখে কোন্‌টা কম চলে কোন্‌টা বেশি চলে। তা লেখকরাও যদি সেটা দেখে সেটা খুবই দুঃখের কথা। লেখকরা নিজেদের মতো করে লিখবেন সেটাই আশা করা যায়। তবে ঐ যে বললাম ৩০%ও যদি পড়ে—বাকি লেখা—সেটাও যদি ছোটরা পড়ে—তার মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া হবে সেটা হয়তো রয়ে যাবে অনেক বেশি দিন। অনেক সময় অনেক লেখা আমরা পড়ি এবং ভুলে যাই। পড়লাম, পড়ার সময় ভালো লাগল,—একমাস পরে

ভুলে গেলাম। দেখবে কোনো কোনো লেখা মনের মধ্যে দাগ কেটে যায়। কোন্‌গুলো দাগ কাটে সেটা যদি বিশ্লেষণ করো তো দেখা যাবে সাহিত্যগুণ যে লেখাগুলোয় বেশি সেগুলোই দাগ কাটছে। কমিক্‌স তো আমরা কতই পড়ছি, কিন্তু মনে থাকে কি?—মনে থাকে না। কাজেই ৩০% যদি অন্যরকম হয় সেগুলোও যদি পড়ে—তারও একটা প্রভাব থাকবে।

আরব্ধ : আচ্ছা সুনীলদা এরকম যে trend-টা হচ্ছে—এটাকে জোর করে আটকানোর সত্যি কোনো মানে হয় না—আর আটকানো যায়ও না...

সুনীল : যেই আটকাতে যাবে অমনি গোপনে গোপনে পড়বে। তাতে কোনো লাভ নেই।

আরব্ধ : না সত্যিই কোনো লাভ নেই। কিন্তু এই যে trend এটা কি ক্রমশ ওই থ্রিলার বা কমিক্‌স সর্বস্ব সাহিত্যের দিকে চলে যেতে পারে?

সুনীল : হ্যাঁ, তাও হতে পারে।

আরব্ধ : কিন্তু আপনি যেটা উল্লেখ করেছিলেন ভালো রুচিসম্পন্ন পাঠকদের কথা, সেই পাঠকদেরও কি আমরা হারাতে পারি না?

সুনীল : হতে পারে, হতে পারে। সেরকম বিপদের সম্ভাবনা তো আছেই। লোকে তো এখন অলরেডি বলতে শুরু করেছে—এরপরে এমনদিন আসবে যে কেউ বই পড়বে না।

আরব্ধ : আপনিও কি এরকম জায়গাতেই আছেন? আপনারও কি মনে হয় T.V. বা অন্যান্য মিডিয়া যেভাবে গ্রাস করছে...

সুনীল : টিভির থেকে? টিভির থেকেও বিপদজনক হচ্ছে কম্পিউটার।

আরব্ধ : কীভাবে?

সুনীল : এরপর হয়তো কম্পিউটার গল্প বলে দেবে। কম্পিউটারকে বলা হবে— 'কম্পিউটার একটা গল্প দাওতো'। একটা গল্প দিয়ে দেবে। সেদিন আসতে হয়তো বেশি দেরি নেই। লেখকের দরকার হবে না। বই পড়া উঠে যাবে কী না যাবে এই নিয়ে অনেক আলোচনা চলছে। যাবে হয়তো... হয়তো যাবে না। পরে হয়তো আবার কিছু দিন বাদে লোকে বলবে না বই পড়েই ভালো ছিলাম। আবার হয়তো বই পড়তে আরম্ভ করবে।

আরব্ধ : সাহিত্যিকের প্রয়োজনীয়তা হারাতে পারে বলেও আপনি ভাবছেন...

সুনীল : সেরকম একটা সম্ভাবনাও আছে। কম্পিউটারে যদি আগে থেকে নানারকম জিনিস ফিট করে দেওয়া হয়—কম্পিউটার তো পারমুটেশন-কম্বিনেশন করতে পারে। দরকার পড়ল—কম্পিউটার একটা গল্প লিখে দিল— (হেসে)।

আরব্ধ : আচ্ছা কবিতার ক্ষেত্রেও কি এটা হতে পারে?

সুনীল : অরিজিন্যাল কবিতা হয়তো হবে না। কিন্তু কেউ কেউ বলল 'কম্পিউটার বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষে একটা কবিতা দাওতো'—সেটা দিয়ে দেবে।

আরব্ধ : নির্মম। ভাবা যাচ্ছে না...

সুনীল : আসলে কিছুই বলা যায় না ঠিক কী হবে। কয়েকশো বছর আগেও তো কেউ বই পড়ত না। বই জিনিসটাতো ৫০০-৬০০ বছরের ব্যাপার। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস দেখলে, পাঁচ-ছশো বছর আগে কে বই পড়ত—কেউ পড়ত না। বই জিনিসটাই ছিল না।

আরব্ধ : লোকে মুখে মুখে কবিতা বলত।

সুনীল : লোকে মুখে মুখে শুনত। মুখে মুখে ব্যাপারটাই কম্পিউটার করে দিচ্ছে। আগে কী হতো একটা জায়গায় লোকেরা বসতো—একজন শুনিয়ে দিত, রামায়ণের গল্প..। সেটাই হয়তো অনরকম ভাবে ফিরে আসছে।

আরব্ধ : আচ্ছা, 'আকাশ দস্যু' গল্পে আপনি আফ্রিকান আর ভারতীয়দের অনেক উঁচুতে তুলে ধরেছেন অর্থাৎ Blackদের আপনি অনেক উঁচু নজরে দেখেছেন, এটা কী আপনার...।

সুনীল : বলছ আমার ইচ্ছা পূরণ কিনা। আমার মনে হয়েছিল—বাচ্চাদের যেন কালো সম্পর্কে অবজ্ঞা না থাকে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে... দেখো বিবর্তনের প্রক্রিয়া লক্ষ করলে দেখা যাবে যে—একটা দেশ খুব বড় হচ্ছে, আর অন্য দেশগুলো নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। সেই প্রক্রিয়াতেই হয়তো একদিন দেখা যাবে—আমরা যে দেশগুলোকে এখন অবজ্ঞা করি, তাচ্ছিল্য করি—তাঁরাই হয়তো কয়েকশো বছর বাদে উপরে উঠে যাবে। যদি দেখা যায় যে আফ্রিকায় কালো লোকেরা ভীষণ ধনী হয়ে উঠেছে, বিজ্ঞানের দিক থেকে খুব এগিয়ে গেছে। তখন দেখবে মেয়েরা কালো লোকেদের খুব বিয়ে করছে। তখন হয়তো দৃষ্টিভঙ্গীটাই বদলে যাবে।

আরব্ধ : সেটাও আছে আপনার গল্পে। যে white, সে কালো লোকটির প্রতি একটু ঈর্ষা বোধ করছে। এখন যেমন 'কালো' হলে সে 'শাদার' প্রতি ঈর্ষা বোধ করে।

সুনীল : জিনিসটা উল্টে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছুই নয়। ইতিহাসের বিবর্তনে এটা হতেই পারে। যেমন আমরা লিখি—আবার আর্থার সি ক্লার্ক, যাকে কল্পবিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ লেখক বলা যেতে পারে—তার বই'তেও আছে। তার ২০১০ আর ২০৬১ এই দুটো বই'তে আছে যে কালো লোকেরা মহাকাশ যান চালাচ্ছে, তারাই Control করছে। বিবর্তনের ফলে এরকম হতেই পারে।

আরব্ধ : আচ্ছা আর্থার সি ক্লার্ক বা অ্যাসিমভ কিংবা অন্যান্য বিদেশী কল্পবিজ্ঞানের গল্প যে দু-একটি আমরা পড়েছি—তাতে একটা জিনিস লক্ষ করেছি যে, বিজ্ঞানের ভিতটা খুব Strong, গল্পগুলো মূলত তখনকার বিজ্ঞানের কোনো hypothesis-কে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যে'ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদার কথাই ধরুন সেখানে গল্পের basic যে জায়গাটা সেটা কিন্তু একটা বৈজ্ঞানিক সত্য আর ঐ বৈজ্ঞানিক সত্যকে কেন্দ্র করেই ঘনাদার Adventure বা গল্পগুলি গড়ে উঠে। কিন্তু আজকের বাংলা সাহিত্যে যে কল্পবিজ্ঞানের গল্পগুলো আমরা পাচ্ছি সেটা প্রোফেসর শঙ্কুই হোক বা অন্য কোনো কল্পবিজ্ঞানের গল্পই হোক তাতে কিন্তু বিজ্ঞানের ভিতটা প্রায় নেই, গোটাটাই প্রায় কল্পনা—এ বিষয়ে আপনি কী মনে করেন?

সুনীল : ঠিকই বলেছ। আমাদের এখানে বিজ্ঞানের বিষয়টা কম, কারণ যারা বিজ্ঞান ভালো পড়েছে তারা লেখার জন্য এগিয়ে আসেনি। সাহিত্যিকরা তো সবাই আর বিজ্ঞানী নয়। তারা বিজ্ঞান বিষয়টা ভালো জানে না। আমি ধরো বিজ্ঞান কিছু পড়েছিলাম... কলেজেও কিছু Science পড়েছিলাম। কাজেই যেটুকু পারি সেটুকু লিখি... কল্পনাটাই বেশি থাকে, বিজ্ঞানটা কম। আর আর্থার সি ক্লার্ক বা অ্যাসিমভ ওনারা ছোটদের জন্য লিখেছেন কিনা জানিনা... ওনারা লিখেছেন বড়দের জন্য।

আরব্ধ : হ্যাঁ বড়দের জন্য—

সুনীল : আর শুধু বড়দের জন্যই নয়। আর্থার সি ক্লার্কের লেখায় কোনো গল্পই থাকে না—পুরোটাই বিজ্ঞান। খালি কিছু চরিত্র থাকে। কাজেই ওটা খুবই উচ্চস্তরের লেখা, সেরকম লেখা আমাদের এখানে কেউ লেখেননি, বা লেখার চেষ্টাও করেননি। তবে ঠিকই বলেছ আমাদের এখানে কল্পনার ভাগটাই বেশি থাকে। আমি যে 'আকাশ দস্যু' বলে গল্পটা লিখেছিলাম—তাতে আমি ওইটুকুনি বিজ্ঞান দিয়েছিলাম যে এমন একটা সময় হবে যখন মানুষের সব অভাব মিটে যাবে। খাদ্য-বস্ত্র-সোনাদানা কোনোটাই খুব একটা দুর্লভ মনে হবে না। দুর্লভ হয়ে উঠবে চোখের মণি, কানের পর্দা এইসব। একটা ধনী লোক তার হয়তো সবই আছে কিন্তু তার ধরো—চোখটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তখন সে কী করবে—তার তো চোখের মণি দরকার। আবার ধরো—কোনো একটা বিস্ফোরণ হলো, তাতে একটা পুরো জাতির... সবার কানের পর্দা ফেটে গেল, কালা হয়ে গেল—তখন কানের পর্দা দরকার। এসবই transplant করা যায়—এখনই, ভবিষ্যতে আরো ভালো করা যাবে। আর তখন ডাকাতিটা ঐ পর্যায়ে চলে যাবে। চোখের মণি ডাকাতি করা হবে, কানের পর্দা ডাকাতি করা হবে। এখন যেমন কিডনি transplant হয় সেরকম।

আরব্ধ : আপনার একটা গল্পে পড়েছিলাম—আলোর তরঙ্গ দিয়ে মানুষের প্রতিলিপি গঠন—এই সমস্ত বিষয়গুলো কি আপনার শুধুই কল্পনা?

সুনীল : না-না এটার তো theory আছে। parallel ভাবে এখানে যা ঘটছে ঠিক অবিকল সেরকম একটা অন্য কোথাও আছে।

আরব্ধ : মানে আপনি ঐ বিজ্ঞানের জায়গাটাও কোথাও কোথাও রাখছেন। আপনার মেঘচুরি গল্পটাতে যেমন...

সুনীল : মেঘ কোথায় কোথায় আছে সেটা এখনো জানা যায়নি। মেঘ তো এখন পৃথিবীতেই আছে। আর তো কোথাও নেই—আর কোথাও জলের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে আর্থার সি ক্লার্ক নাকি বলেছিলেন হেলিম পর্বতে জলের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাই বলছি যে যদি কোথাও পণো প্রাণ থাকে বা মানুষের মতো প্রাণী থাকে তবে তাদের হয়তো জলের অভাব হবে, তখন এরা হয়তো জল চুরি করবে। একেই বলে Hypothesis—ঠিক বিজ্ঞান নয়।

আরব্ধ : আচ্ছা এ সম্বন্ধেই আর একটি প্রশ্ন করছি আপনি বলছেন যে বিজ্ঞানের জায়গাটা খুব Strong ভাবে ধরা হয় না। কল্পনাটাই প্রধান। কিন্তু এই কল্পনার জায়গা দিয়েই কী গল্পে এমন অনেক উপাদান ঢুকে পড়তে পারে না, যেটা সরাসরি বিজ্ঞানের বিরোধী জায়গায় দাঁড়াচ্ছে। একদম কুসংস্কারের জায়গায়?

সুনীল : সেটা খুব খারাপ। সেটা যদি থাকে তবে পাঠকদের উচিত তক্ষুনি সেটার প্রতিবাদ করা।

আরব্ধ : ধরুন প্রোফেসর শঙ্কুর কিছু গল্প যেমন 'প্রেফেসর শঙ্কু ও হাড়' সেখানে একজন সাধু উল্টো দিকে হাত ঘুরিয়ে কতগুলি হাড় থেকে একটা জীবন্ত প্রাণী সৃষ্টি করে দিল, বা অনেক গল্পে দেখা যাচ্ছে নানারকম ভবিষ্যৎবাণী শেষে ফলে যাচ্ছে এমনকী 'ইজিপ্টিয়' এক বুড়ি, ইংল্যাণ্ডের এক ডাইনী, বা কোনো জ্যোতিষী—যাদের আমাদের মনে হয় বিজ্ঞানের বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে আছে- Ultimately তাদের কথাটাই কিন্তু সত্যি বলে প্রমাণিত হচ্ছে, শ্রেষ্ঠ Scientist ক্রোল বা সণ্ডার্স বা শঙ্কু সেখানে যেন পিছু হটে আসছে। এই ভাবেই কল্পনার বিস্তার হতে হতে এটা কি কখনো এমন কোনো গল্পে দাঁড়িয়ে যেতে পারে যা কুসংস্কার?

সুনীল : না, বরং এটার উল্টোটাই হওয়া উচিত।

আরব্ধ : কিন্তু এটা আমরা প্রচুর পেয়েছি, কল্পনার জায়গা দিয়েই এটা প্রবেশ করে।

সুনীল : হয়তো এটা মজা করেই লিখেছিলেন... কৌতুক করেছেন আর কী।

আরব্ধ : আচ্ছা ভালো একটা 'ইলাসট্রেশন' একটা গল্পে বা কবিতার ক্ষেত্রে তার শাখা-প্রশাখা মেলে দিতে সাহায্য করে। সেক্ষেত্রে একটা ভালো গল্পের সাথে যদি একটা বাজে 'ইলাসট্রেশন' থাকে তবে আমাদের মনে হয় যে গল্পের মেজাজটা কোথাও ব্যাহত হচ্ছে।

সুনীল : হুঁ, চোখকে পীড়া দেয়।

আরব্ধ : হ্যাঁ ঠিকই, সেক্ষেত্রে আপনার কিছু লেখায় যেমন খুব ভালো 'ইলাসট্রেশন' পাই যেমন 'মালঞ্চ মালা', 'বটুক মামা', 'তেপান্তরের মাঠ' ইত্যাদি। আবার পাশাপাশি সেরকম পীড়া দিয়েছিল শৈব্যা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত আপনার কিশোর অমনিবাস—অত্যন্ত বাজে ইলাসট্রেশন।

সুনীল : হুঁ ফাঁকি দিয়েছে—শিল্পী ফাঁকি দিয়েছে (হাসি)।

আরব্ধ : সেখানে প্রশ্নটা হচ্ছে যে—

সুনীল : প্রকাশকের শিল্পী নির্বাচনটা ভুল হয়েছে আর কী।

আরব্ধ : হ্যাঁ এখানেই প্রশ্নটা যে, একজন সাহিত্যিকের প্রকাশিত বই-এর ক্ষেত্রে...

সুনীল : এটা তো আমাদের খুব একটা হাতে থাকে না।

আরব্ধ : অথচ ধরুন এটাতো আপনার সাহিত্যের সাথে যুক্ত, অথচ সাহিত্যিকের কোনো হাত থাকে না?

সুনীল : প্রকাশকরা তো আমাদের দেখায় না, কী হচ্ছে না হচ্ছে, ছাপা হওয়ার পর যখন বইটা হাতে দেয় তখন বলতে পারি—না ভালো হয়নি।

আরব্ধ : তাহলে আপনার কী মনে হয়না যে সাহিত্যিকের এটা হাতে থাকা উচিত?

সুনীল : কোনো কোনো লেখক অবশ্য এ নিয়ে মাথা ঘামায়, আমি ঘামাইনা কারণ আমি সময় পাই না।

আরব্ধ : আচ্ছা আপনার কিছু গল্পে ভূতের বিষয় আছে, তা এটাকে কেন্দ্র করে আমাদের কিছু প্রশ্ন—

সুনীল : আমি ভূত বিশ্বাস করি না। আমি ভূতের গল্পও সেরকম লিখিনি।

আরব্ধ : আচ্ছা প্রশ্নটা একটু বলছি, আপনার যে কটা ভূতের গল্প পড়েছি—একটা ফিলিং থাকে, একটা রহস্য থাকে—কিন্তু গল্পটা শেষ পর্যন্ত ঠিক ভূতের গল্প হয়ে ওঠে না, হয় সেটা কোনো কল্পবিজ্ঞানের জায়গায় চলে যাচ্ছে নয়তো খুব মানবিক—যেমন 'অচেনা বন্ধুর মুখ' অসাধারণ। 'পার্বতীপুরের রাজকুমার'—এটাতে জাতিস্মরের একটা ব্যাপার আছে.

সুনীল : না, ওটা ঠিক জাতিস্মরের ব্যাপার নয়, ওটা হচ্ছে যে Extra Sensory Perception। যা নিয়ে এখনো অনেক গবেষণা হচ্ছে, মানুষের মন হচ্ছে একটা রহস্যময় জটিল ব্যাপার। মানুষের মন কী কী হতে পারে তা এখনো বিজ্ঞান পুরোপুরি জানতে পারেনি—তার চর্চা হচ্ছে। যেমন ধরো এইখানে বসে যদি একটা লোক বলে- জানোতো আমেরিকায় এখন গাড়ি থেকে একটা লোক পড়ে গেল। তোমার মনে হবে গাঁজাখুরি কথা, হতে পারে না—কী করে বলবে এখানে বসে কিন্তু কোনো কোনো লোকের নাকি এরকম একটা ক্ষমতা থাকে, একে বলে Extra Sensory Perception মানে এমন একটা অনুভূতির ক্ষমতা আছে—যে ওখানে বসে একটা লোক কী চিন্তা করছে তার তরঙ্গটা সে ধরে নেবে। এটা অনেকটা বেতার তরঙ্গের মতো। যেমন ধরো তোমার রেডিও সিগন্যালগুলো বা অনুষ্ঠানগুলো তো হাওয়ায় ভাসছে তোমার বাড়ির রেডিও সেট সেগুলো ক্যাচ করে ধরে নিয়ে তোমায় শুনিয়ে দিচ্ছে। তা কোনো কোনো লোকের মাথাটাই নাকি অন্য লোকের চিন্তাগুলো ধরতে পারে। এটা অবশ্য এখনো প্রমাণিত হয়নি—কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘটেছে। কাজেই এ Extra Sensory Perception Eye আমি মাঝে মাজে ব্যবহার করি। ধরো একটা নতুন জায়গায় গেলেই কেউ কেউ বুঝতে পারে যে সে আগে এই জায়গায় এসেছে। কী করে যে এটা হয় তা আমি বলতে পারব না। বিজ্ঞানীরা যেটা ব্যাখ্যা করেন যে যদি ক্লান্ত অবস্থায় কেউ কোথাও পৌঁছায় তখন এরকম হতে পারে যে চোখের পাতা ফেলেই আগের মুহূর্তটা ভুলে যায়, সে যে দেখেছে সেটা ভুলে গিয়ে ভাবে এটাতো প্রথম দেখলাম।

আরব্ধ : ও আগের মুহূর্তের ঐ দেখাটাকে তার মনে হয় স্মৃতি!

সুনীল : এটার এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন কেউ কেউ।

আরব্ধ : আচ্ছা আপনার গল্পের ভূতের জায়গাটা..

সুনীল : সরাসরি ভূতের গল্প আমি লিখি না।

আরব্ধ : সেটাই বলছি যে ভূতের ব্যাপারে আপনি সাবধানতা অবলম্বন করেন।

সুনীল : হ্যাঁ।

আরব্ধ : আচ্ছা এই যে গল্পগুলো যেখানে আপনি বললেন—আমরা সবাই জানি—আপনি নাস্তিক। তা সেক্ষেত্রে আপনার কিছু কিছু গল্পে তো ভূতের উপস্থিতি আছে।

সুনীল : একেবারে ভূতের উপস্থিতি কী আছে কোনো গল্পে! রহস্যময় কোনো ব্যাপার আছে।

আরব্ধ : হ্যাঁ ঐতিহাসিক কোনো জায়গায় চলে যায়। কিন্তু আপনার ঐ গল্পটায় পড়েছিলাম—যেখানে একটা জমিদারবংশ পুরো শেষ হয়ে গেল—গ্রামকে পুড়িয়ে মেরেছিল...

সুনীল : ও সে একটাই লিখেছি। পুরোটাই একটা কল্পনার ব্যাপার আর কী—ঐ আকাশ দস্যু

গল্পে—না তো ওটা জলদস্যুর পরেরটা বিশু ঠাকুরকে নিয়ে। তা ধরো সে সব গল্পে—আমি ঠিক ভূতের গল্প একদম লিখতে চাই না।

আরব্ধ : একদম অন্যরকম ভূতের গল্প পড়ি আমরা দুজনের, একজন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়—যেখানে ভূতকে মনে হয় পাশে বসে আড্ডা মারতে পারে, চা খেতে পারে এই রকম বিষয়টা আমাদের খুব মজা লাগে, আর হচ্ছে লীলা মজুমদারের ভীষণ মজার ভূত—কখনো গাছে ওঠে, মানুষকে ভয় পায়...

সুনীল : ওরকম লিখলে ক্ষতি নেই তবে আমার হাতে ওরকম আসে না।

আরব্ধ : এলেও খুব soft—ওরকম হাড়হিম করা ব্যাপার থাকে না, যে রকম হাড়হিম করা ভূতের গল্প বাংলা সাহিত্যে প্রচুর লেখা হয়েছে।

সুনীল : এক সময় প্রচুর লেখা হয়েছে।

আরব্ধ : অধুনাও লেখা হয়েছে।

সুনীল : অধুনাও লেখা হয়েছে!

আরব্ধ : ধরুন সত্যজিৎ রায়ের প্রচুর ভূতের গল্প আছে। 'নীল আতঙ্ক' - ভয়ংকর ভয়ের, তারপর 'খগম', 'ব্রাউন সাহেবের কুঠি', 'মিঃ শাসমলের শেষ রাত্রি'—এই যে হাড়হিম করা ভূতের গল্পগুলো -বাচ্চারা খুব রুদ্ধশ্বাসে পড়ে। কিন্তু ছোটদের শীর্ষেন্দুর ভূতের গল্প পড়ে শুনেছি তাদের খুব একটা পছন্দ হয়নি—

সুনীল : ওটা বড়রা বেশি ভালোবাসে।

আরব্ধ : হ্যাঁ সেই জায়গাটা, কিন্তু ওদের যেটা বলেছি—'মিঃ শাসমলের শেষ রাত্রি' বা 'খগম' ওরা রুদ্ধশ্বাসে শুনল, ভয় পাচ্ছে কিন্তু শুনবে। তা আপনি কি এই ধরনের গল্পের বিরোধী? —এটা জানতে চাই।

সুনীল : না একেবারেই না। এক একজন লেখকের এক একরকম মনোভাব। বিরোধী নই। বিভিন্ন রকম হলে ক্ষতি কী। পড়লাম মজা লাগল ভুলে গেলাম। আর ছোটরাও বোধহয় এখন খুব একটা ভূতে বিশ্বাস করে না এখন যা অবস্থা হয়েছে, করে কি?

আরব্ধ : করে করে (হেসে)...। আমার তো মনে হয় করে, তবে একটু বড় হয়ে আর করে না, তবু বোধহয় মনের মধ্যে কোথাও...। আপনি কি এরকম গল্প লিখতে চান না?

সুনীল : না আমি লিখতে চাই না, বা বলতে পারো যে সেভাবে মজা করে লিখতে পারি না।

আরব্ধ : মানে আপনি মজা করে লিখতে পারেন না কিন্তু হাড়হিম করা লিখতে চান না।

সুনীল : না লিখতে চাই না।

আরব্ধ : আপনার সমস্ত গল্প অধিকাংশ সময়েই খুব কোমল, যখন আপনি ভূতের গল্প হাজির করছেন সেই ভূতের গল্পও কোমল হয়ে উঠছে তবে আপনার গল্পের মূল জায়গাটা কি মানবিকতা?

সুনীল : হ্যাঁ, মানুষের গল্পই ভালো, ভূতের গল্প থেকে মানুষের গল্পই ভালো।

আরব্ধ : আচ্ছা কোনো পাঠক যদি বলে বাংলার কিশোর সাহিত্যে আপনার গল্প বা উপন্যাস যেভাবে স্থান করে নিল, আপনার ছড়া বা কবিতা সেভাবে পারল না—

সুনীল : হুঁ তা হতে পারে, আমি ছড়া তো লিখতে পারি না। ছোটদের কবিতা কিছু লিখেছি। কিন্তু ছড়া যাকে বলে, বা Nonsense ছড়া সেটা আমার হাতে আসে না, ছোটদের কবিতা কিছু কিছু লিখেছি, একটা বইও বেরিয়েছে "আ চৈ আ চৈ চৈ" বলে।

আরব্ধ : অথচ আপনি প্রধানত একজন কবি হিসাবে পরিচিত' এটা ঠিক কেন ঘটল?

সুনীল : আসলে কী জানো তো—এগুলো অনেকটা নির্ভর করে পত্র-পত্রিকার উপরে। পত্র-পত্রিকায় যদি আমি বলি যে অন্য কিছু লিখব তবে সেটা হবে না। তা আমারও আর লেখা হয় না।

আরব্ধ : হ্যাঁ আপনার এরকম একটা আপশোস আছে যে—আপনি একটা T.V. সাক্ষাৎকারেও বলেছিলেন—"কাকাবাবু তো বছরে একটা করে লিখতেই হয়।"

সুনীল : আমি অন্য কিছু লিখতে চাইলে লিখতে দেয় না তো আমায়। এখন আমি যদি বলি পুজো সংখ্যায় আমি অন্য একটা গল্প লিখব—লিখতে দেবে না আমায়। ঐ কাকাবাবুই লিখতে হবে।

আরব্ধ : কিন্তু একজন সাহিত্যিকের তো একটা দায়বদ্ধতার ব্যাপার থাকে সেক্ষেত্রে আপনি কী নিজেকে সেই জায়গায় একটু...

সুনীল : সাহিত্যিকের দায়বদ্ধতা থাকে ঠিকই কিন্তু আমার মতো যারা এত বেশি লেখে মানে অনেক বেশি লেখার চাপে যারা বন্দি তাদের কিন্তু বেশির ভাগটা পত্র-পত্রিকার প্রকাশক—এদের উপর নির্ভর করতে হয়। এটা করাটা যে খুব একটা দোষের তা নয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে দেখা গেছে সাহিত্যিকদের উপর এটা আসে। আর যারা অল্প লেখে, সারা বছরই ভেবেচিন্তে কম লেখে—তাদের প্রসঙ্গ আলাদা, কিন্তু আমি পাবি না। তারা ইচ্ছা করলে পারেন। কিন্তু আমার তো কম লেখার উপায় নেই। আমি যদি ইচ্ছা করিও এখন—তবুও উপায় নেই।

আরব্ধ : মানে আপনার ইচ্ছা থাকলেও সেটা হচ্ছে না।

সুনীল : হচ্ছে না। এটা হয়—একটা চক্র আছে, সেই চক্রে পড়ে যেতে হয়।

আরব্ধ : তাহলে কী, সাহিত্যকে পেশা করলে এই ভাবে বাঁধা পড়ে যেতে হয়?

সুনীল : হ্যাঁ হতে পারে, যেমন ধরো তোমাকে আমি উদাহরণ দিচ্ছি—আমি 'দেশ' পত্রিকাতে একটা ধারাবাহিক উপন্যাস লিখছি 'প্রথম আলো' সেটার জন্য আমাকে প্রচুর পড়াশুনা করতে হচ্ছে, ওরকম একটা লেখা যখন বিদেশে কেউ লেখে তখন তারা অন্য কিছু লেখে না। তাবা ওটা নিয়েই পড়ে থাকে সর্বক্ষণ—বুঝেছ, আর আমি যদি চাই সর্বক্ষণ ওটা নিয়ে পড়ে থাকতে—আমাকে দেবে না। আমি বলেছিলাম পুজো সংখ্যাতে একটাও লিখব না। শুধু ওইটা নিয়েই পড়ে থাকব, কিন্তু আমাকে প্রকাশকরা, পত্র পত্রিকার সম্পাদকরা বলল—না ওটা হবে না, 'লিখতেই হবে'। তার মানে এই নয় যে না লিখলে আমার কোনো আর্থিক ক্ষতি হবে। আমার সেরকম কোনো ক্ষতি হবে না। আমার সে অবস্থা নেই, এখন ওরা যে চাপ দিচ্ছে, সেটা ভালোবাসার চাপ ওটাকে এড়ানো যায় না।

আরব্ধ : আপনার চারপাশের বন্ধু বান্ধব—সবকিছু মিলে এরকম একটা জায়গা তৈরি হয়ে যাচ্ছে—

সুনীল : কাজেই ওটা কিন্তু একরকম ভাবে ক্ষতিই হচ্ছে, কারণ যদি আমি ঐ লেখাটাই মন দিয়ে লিখতে পারতাম তা হলে আরও একটু ভালো হতে পারত। কিন্তু পারছি না ফলে এ রকম একটা চাপে লেখকরা পড়ে যায়। দায়বদ্ধতার প্রশ্নটা এখানে ঠিক আসে না। তুমি বলছ যে ওটা ছিঁড়ে বেড়িয়ে যাচ্ছেন না কেন? হ্যাঁ বলতে পারো নিশ্চয় বলতে পারো কিন্তু কী করব হচ্ছে না।

আরব্ধ : আসলে আমরা আপনার লেখা খুব পছন্দ করি, বিশেষ করে বাচ্চাদের লেখা আমরা ভীষণ ভাবে চাই।

সুনীল : আমি ছোটদের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি তার শ্রেষ্ঠ চিঠিটা আমার মনে আছে এখনো। সেই চিঠিটা কেউ পোষ্ট না করে, হাতে করে এনে আমাদের ডাক বাক্সে ফেলে গিয়েছিল। চিঠির তলায় কোনো নাম ছিল না। এক লাইনের চিঠিটা ছিল এই যে— "আপনি কী এক বছরের জন্য অন্য সমস্ত লেখা বন্ধ করে শুধু ছোটদের জন্য লিখতে পারেন না!— এই আমার দাবী" চিঠিটা খুব ভালো লেগেছিল, কিন্তু পারি না।

আরব্ধ : একদম এই জায়গা থেকে একটা প্রশ্ন করছি—যে প্রশ্নটা আপনাকে প্রথমে করেছিলাম, এ রকম কেউ নেই যে শুধু ছোটদের জন্য লিখেছেন। শুধু সাহিত্যে বলে নয়। কোথাও একজন কোনো ক্ষেত্রে আমরা এমন কাউকে পেলাম না যিনি শুধু ছোটদের জন্য ভাবনা চিন্তা করছেন।

সুনীল : আরও দুঃখের কথা ছোটদের জন্য ভালো সিনেমা করা হচ্ছে না। নিয়মিত দেখানো উচিত ছোটদের film।

আরব্ধ : ঠিকই। আচ্ছা এই যে একটা লেখা ছোটদের বা বড়দের জন্য লেখা হয় এটা কীভাবে আলাদা করা হয়—এটা কি শুধু বিষয়ের উপর নির্ভরশীল? আপনার কী মনে হয়? আপনি তো দুজনের জন্যই লেখেন?

সুনীল : খানিকটাতো বিষয় আছেই, আর দৃষ্টিভঙ্গিটাও একটু পাল্টে যায়, লেখার সময় ওই যে বললাম—ছোটদের জন্য লেখার সময় আমার বয়সটা এগারো-বারো বছর হয়ে যায়, এবং ওই দৃষ্টিভঙ্গিতে আমি লিখি।

আরব্ধ : আচ্ছা আপনার কী মনে হয় এখন বড়দের লেখা নিয়ে যে রকম চর্চা হচ্ছে, গবেষণা হচ্ছে, ছোটদের জন্য সেরকম হচ্ছে কিছু?

সুনীল : কিছুই হচ্ছে না, তোমরা করছ বলে তো ভালো লাগছে কাজটা। কিছুই হচ্ছে না। করা উচিত তো,—তুমি যে আমার ওই মারাঠি লেখকের কথাটা উল্লেখ করলে—ছোটদের সাহিত্য নিয়ে বাংলায় আমাদের যে গর্ব ছিল, সেটা যাতে শেষ না হয়ে যায়। হয়ে গেলে অন্য সাহিত্যও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বড়দের সাহিত্য যেটা বলি, সেটাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে, ছোটবেলা থেকে সাহিত্যের প্রতি যদি আগ্রহটা না জন্মানো যায়, তবে ওটা বড় হয়েও হবে না—তারা বড় হয়ে থ্রিলার পড়বে, অমুক পড়বে আর তো কিছু করবে না! এমন লোকও তো আছে যারা সাহিত্য পড়ে না, এয়ারপোর্ট থেকে, স্টেশন থেকে শস্তা বই কিনে নিয়ে পড়ে। তাদের সংখ্যা যাতে না বেড়ে যায় সে জন্য ছোটদের সাহিত্য নিয়ে চর্চা করা—গবেষণা করা উচিত, ছোটদের সাহিত্যের যাতে প্রসার হয় তা চেষ্টা করা উচিত। শুধু তাই নয় ছোটদের film যাতে আরও কিছু তোলা হয়—এসব চেষ্টা তো নিশ্চয় করা উচিত।

আরব্ধ : আচ্ছা আপনি যে Seriousness নিয়ে বড়দের সাহিত্য চর্চা করেন সেই Seriousness নিয়েই কি ছোটদের সাহিত্য চর্চা করেন?

সুনীল : যখন লিখি তখন আমি চেষ্টা করি Serious হওয়ার, এখন পারি কিনা সেটা আলাদা ব্যাপার। সবসময় যা চেষ্টা করা যায়, ফল যে তার ভালো হবেই—তার কোনো মানে নেই। বড়দের লেখার ক্ষেত্রেও এটা হয়। ধরো একটা লেখা খুব কোমর বেঁধে একটা বিষয়বস্তু ধরে লেখবার চেষ্টা করলাম, সেটা দাড়াল না, ঠিক মতো হলো না—এটা তো হয়ই। ছোটদের লেখা হয়তো কোনো কোনোটা ভালো হলো না— .. হয়ও না– কিন্তু লেখার সময় যত্নের কোনো অভাব থাকে না। মনে তো তাই থাকে যাতে সুষ্ঠু ভাবে লেখা হয়। ইচ্ছাটা থাকে চেষ্টাটা থাকে কিন্তু সব সময় হয় না।

আরব্ধ : আচ্ছা আর একটা কথা বলছি রূপকথা প্রসঙ্গে সেটা হচ্ছে যে 'গ্রিমভাইদের রূপকথা' বা দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের রূপকথার যে গল্পগুলো আমরা বাচ্চাদের বলি সেখানে ওরা সাংঘাতিক enjoy করে—সেই সমস্ত রূপকথার গল্পেও দেখেছি ভয়ংকর ভয়ংকর কিছু বিষয় আছে, খুব দুঃখজনক কিছু বিষয় আছে গলাটা কেটে দিল নিজের ছেলেটার। ছোটদের মনে এর কি কোনো খারাপ প্রভাব পড়ে?

সুনীল : না রূপকথা লেখার একটা ভঙ্গি আছে যেটা আগে রক্ষা করা দরকার, শুনতে শুনতে মনে হয় এটা একটা গল্প—এটা সত্যি নয়, এরকম হয় না, একটা গল্প বানিয়ে বলা হচ্ছে। এই ভঙ্গিটা ধরে রাখতে হয়। সেটা যদি থাকে তাহলে দাগ কাটে না। এ তো গল্প, এ তো কখনো ঘটেনি—এই ভঙ্গিটাই রাখা জরুরি। তা রূপকথা লিখতে গিয়ে যদি বাস্তব হয়ে যায় তাহলে সেটা আর রূপকথা থাকবে না।

আরব্ধ : বাস্তবের সাথে মিলিয়ে মিশিয়ে যদি...

সুনীল : তা হলে সেটা রূপকথা থাকবে না। আর রূপকথা সবাই তো লিখতে পারে না। দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার যেমন পেরেছেন, তেমন তো আর কেউ পারলেন না।

আরব্ধ : এখনকার রূপকথা সত্যি কথা বলতে কী ক্লিসেই লাগে—

সুনীল : আমি তো সেই জন্য রূপকথা লিখি না। আমি পারি না। আমি সাধারণত দুটো জিনিস লেখার চেষ্টা করি একটা হচ্ছে Adventure মানে একটা দুরন্ত কোনো জায়গা—অগম্য জায়গা, যেখানে কেউ কখনো যেতে পারে না—মানুষ সেখানে যেতে পারে না—একটা খোঁড়া লোক সেখানে চলে যাচ্ছে। আর একটা হচ্ছে ইতিহাস চেতনা যেমন 'জলদস্যু', 'উদাসী রাজকুমার', আর একটা বণিকদের নিয়ে লিখেছিলাম অন্ধকারের বন্ধু।... এই সমস্তই আর কী।

৪

সরকারের ভৃত্য হয়ে বৈজ্ঞানিকদের অস্ত্র বানানো ঠিক নয়

বি নি : বিজ্ঞান আপনার দৃষ্টিভঙ্গীতে—

● আমি বিজ্ঞানকে দেখি একটা যুক্তিবাদী দর্শন হিসাবে। মানুষের ইতিহাসে তো অনেক রকম দর্শনের জন্ম হয়েছে; তারমধ্যে বিজ্ঞানও একটা দর্শন। এই দর্শন যুক্তিতে আরো বিশাল। এই জন্য বিজ্ঞানের ক্রমশ উন্নতি হচ্ছে। যাবতীয় মানুষ যারা এই দর্শনের চর্চা করে তারা সবাই জানে আমি যুক্তিটুক যদি না অনুসরণ করি তাহলে বিজ্ঞানে আমি কিছু করতে পারবো না। এজন্য বিজ্ঞান আরো এগিয়ে যাবে মানুষকে সঙ্গী করে। এবং আরো বেশী করে যুক্তিবাদী করে তুলবে মানুষকে।

বি নি . মানব জীবনে বিজ্ঞান যেভাবে জড়িয়েছে সেই অনুপাতে বাংলা সাহিত্যে কি এসেছে?

● বাংলাসাহিত্যে বিজ্ঞানের চর্চা খুব একটা নেই। গোড়ার দিকে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বা জগদীশ বোস, জগদানন্দ রায় এঁরা যেভাবে বিজ্ঞান নিয়ে সুন্দরভাবে লিখতেন পরবর্তীকালে অনেক বড় একটা গ্যাপ পড়ে গেছে। কিছুকাল সাহিত্যিকরা বিজ্ঞান-টিজ্ঞান চর্চা করতেন না, লিখতেনও না। ফলে সাহিত্যের মধ্যে বিজ্ঞান ততটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। তবে ইদানীং বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও বিজ্ঞান নিয়ে লেখালেখি বাড়ছে। সায়েন্স ফিকশনও লিখছেন কেউ কেউ। লেখালেখির আরো চেষ্টাও চলছে।

বি নি আপনার বিজ্ঞান নির্ভর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি কি?

● এইভাবে যদি জিজ্ঞাসা কর তাহলে বলব কোন লেখাই নেই। তবে সায়েন্স ফিকশন যাকে বলা হয় ওই ধরনের একটা বড়দের লেখা লিখেছি, তার নাম হচ্ছে 'অমৃতের পুত্র কন্যা'। কতকগুলি তথ্যের উপর ভিত্তি করে লেখা। এ ছাড়া ছোটদের জন্য কিছু লিখেছি।

বি নি . আপনি নিয়মিত বিজ্ঞান পত্র-পত্রিকা পড়েন নাকি?

● সায়েন্স টুডে পড়ি, দেশ পত্রিকার বিজ্ঞান বিভাগটি ভালো লাগে, উৎস মানুষ পত্রিকাটি মন দিয়ে পড়ি। এ ছাড়া ইংরাজীতে লেখা বিভিন্ন বিজ্ঞানের বই পড়ে থাকি।

বি-নি বিজ্ঞানকে সাহিত্যে জনপ্রিয় করে তোলার ব্যাপারে আপনার কোন দায়িত্ব আছে বলে মনে করেন?

● আমার ভূমিকা অতি সামান্য। আমি আমার লেখালেখির মধ্যে যদি মানুষকে এইটুকু বোঝাতে পারি যে, যা তুমি দেখছ বা তোমার জীবনে যা পেয়েছ যুক্তি দিয়ে বিচার কর। এ চেতনা যদি জাগাতে পারি সেটাই যথেষ্ট। অন্ধ বিশ্বাসের বদলে যুক্তি দিয়ে যাচাই কর। মনটা খোলা রাখ। আগে থেকে যেটা শুনে এসেছ সেটাই একমাত্র সত্য না বলে, ভবিষ্যতে অনেক কিছু সত্য হতে পারে।

বি-নি : মহাকাশ অভিযান সম্পর্কে আপনার প্রতিক্রিয়া।

● খুবই ভালো হয়েছে। প্রথম কথা আমাদের কল্পনার জগতকে কত বিস্তারের সুযোগ করে দিচ্ছে। অন্য গ্রহে বসবাস সত্যিই যদি সম্ভব হয় সেকি সাংঘাতিক ব্যাপার হবে পৃথিবীর ইতিহাসে,

মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির পিছু পিছু আমাদের মনটাকে দৌড় করাতে হবে। একটা ঘটনা বলি এ প্রসঙ্গে যেটা তোমাদের কাগজের পক্ষে ভালো হবে।

কিছুদিন আগে ফ্রান্সে গিয়েছিলাম। সেখানে একটি ছাত্র আন্দোলন দেখার সুযোগ হয়। আমাদের দেশে তো ছাত্র আন্দোলন দেখেছি। ওখানে ছাত্র আন্দোলনের রূপটা দেখার জন্য পিকেটিং-এর কাছে গেলাম। ওখানে ইট পাটকেল ছোঁড়াছুঁড়ি ছিল। কিন্তু পুলিশের হাতে কাঁদানে গ্যাস বা রাইফেল ছিল না। জল ছিটিয়ে ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা চলছিল। আন্দোলনের কারণ ফরাসী সরকার কম্পিউটার বিজ্ঞানকে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে রাখতে চায়, ছাত্ররা তা মানতে নারাজ। কিন্তু ছাত্ররা সরকারী বিলকে রদ করতে পারে নি। আমরা থাকতে থাকতেই বিল পাশ হয়ে গেল। আসল কারণ আগামী দিনে কম্পিউটার মানব জীবনে এত বেশী ব্যবহার করা হবে, সেখানে শিল্পী, কবি, শিক্ষক বলে কথা নয় সবাইকে কম্পিউটার অপারেশন জানতে হবে। নচেৎ সে অচল। আসলে বিজ্ঞানের দুটো দিক আছে, ওটা গেল একটা দিক। আরেকটা হো'ল মানুষের ধ্বংসের জন্য বিজ্ঞান। এটা অবশ্য বিজ্ঞানের দোষ নয়। দুঃখের বিষয় বৈজ্ঞানিকেরা কোন কোন দেশের সরকারের ভৃত্য হয়ে গিয়ে মানুষের ধ্বংসের জন্য অস্ত্র তৈরী করছে। আজ বিজ্ঞান একদিকে মানুষকে যেমন বাঁচাচ্ছে আর অন্যদিকে ধ্বংসের জন্য তৈরী হচ্ছে। কোনটা জয়ী হবে সেটাই দেখার।

বি নি : বিজ্ঞান যে ভাবে দিনের পর দিন কল্পলোকগুলিকে ভেঙ্গে দিচ্ছে তাতে আগামী মানুষের কল্পলোক কি হতে পারে?

● ভাঙ্গলে কী যায় আসে। চাঁদে মানুষ পা রাখার পর অনেকে ভেবেছিল চাঁদ ময়লা হয়ে গেল আর কেউ চাঁদ নিয়ে কবিতা লিখবে না, গানও গাইবে না, তা কিন্তু হয়নি। চাঁদ নিয়ে যা হবার ঠিকই হচ্ছে। কল্পনার জায়গাগুলো ঠিকই থেকে যায়। এ নিয়ে একটা গপ্পো বলি—থিওফিল গতিয়ে বলে একজন ফরাসী সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁকে নিউটন একদিন বোঝালেন রামধনু জিনিষটা কী। উনি বললেন ওটা যে আকাশের গায়ে আপনারা দেখছেন, ও হোল এক ফোঁটা জলের উপরে সূর্য কিরণের ফল। থিওফিল গতিয়ে শুনে বল্লেন, তা তো সব বুঝলাম। কিন্তু জেনে লাভ কী হোল এবং রামধনু নিয়ে নানা রঙের ভাবনাটাই ভালো ছিল নাকি।

বিজ্ঞান ও কল্পনা দুটোই থাকবে। বিজ্ঞানের সঙ্গে কল্পনাও আরো এগিয়ে যাবে। আগে যেমন ছোট ছেলেরা রাম লক্ষ্মণ সেজে খেলা করত, এখন তারা খেলা করে বিভিন্ন গ্রহের মানুষ সেজে।

৫
দুই বাংলার জনপ্রিয় দুই কথাশিল্পী
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও ইমদাদুল হক মিলন

সাহিত্য সৃষ্টির অনুপম সৌকর্য দিয়ে ভূগোলের সীমানাকে অতিক্রম করেছেন যে ক'জন --তাঁদের মধ্যে একজন পশ্চিমবঙ্গের সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অন্যজন বাংলাদেশের ইমদাদুল হক মিলন। নিরবচ্ছিন্নভাবে লিখে যাচ্ছেন দু'জনই।

বয়স ষাটের ওপরে হলেও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় দেহ এবং মনে এখনো তরুণ। কি কবিতা, কি ছোট গল্প বা উপন্যাস- সবকিছুতেই সুনীল পাঠকদের হৃদয় কেড়েছেন। তার গল্প বা উপন্যাসের চরিত্রগুলো যেন এসমাজেরই একেকটি জীবন্ত মানুষ। সুনীল সম্বন্ধে বাঙালি পাঠককে বোধহয় বেশি কিছু বলবার নেই। বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ ইমদাদুল হক মিলনের বিচরণ মূলতঃ ছোটগল্প এবং উপন্যাসের মধ্যে। যে ক'জন সাহিত্যিক স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে পাঠক সৃষ্টি করতে পেরেছেন, আরও স্পষ্ট করে বলা চলে, বই কিনে পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন--সন্দেহাতীতভাবে ইমদাদুল হক মিলন তাদের মধ্যে অন্যতম।

সমকালীন বাংলা সাহিত্যের এই দুই সাহিত্য প্রতিভাকে নিয়ে অন্যদিন-এর বিশেষ প্রতিবেদন। এক মাহেন্দ্রক্ষণে সমবেত হয়েছিলেন এই দুই পাঠক নন্দিত কথাশিল্পী। দুই ভুবন সেদিন এক হয়ে গেল...

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। কবিতা, ছোটগল্প এবং উপন্যাস সাহিত্যের এই তিনটি শাখাকে আপন রচনা শৈলীতে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে বাংলা ভাষাভাষী বিশাল জনগোষ্ঠীর মাঝে গড়ে তুলেছেন আপন আসন। স্বকীয়তায় কিংবা সমকাল দর্শনে সদা ভাস্বর। সম্প্রতি বেড়িয়ে গেলেন তাঁর আপন ভুবন---ঢাকা থেকে। আপন ভুবন এই অর্থে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বাংলাদেশের সন্তান। জন্ম সেপ্টেম্বর ৭, ১৯৩৪, ফরিদপুরে। ষাটোর্ধ্ব এই আপাদমস্তক বাঙালি সাহিত্য-প্রবর পশ্চিমবাংলার শিল্প-সাহিত্য জগতে নেতৃস্থানীয়। সাহিত্যকর্মের প্রভায় তিনি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে, বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীর বাংলাভাষী পাঠকদের মাঝে আজ অতি পরিচিত।

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ। বর্তমানে তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। প্রথম উপন্যাস : আত্মপ্রকাশ। প্রথম কাব্য : একা এবং কয়েকজন। সনাতন পাঠক, নীললোহিত এবং নীল উপাধ্যায় ছদ্মনামে লিখে থাকেন। গ্রন্থ সংখ্যা দু'শয়ের বেশি।

একুশের কবিতা উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে ঢাকায় ছিলেন মাত্র দু'দিন। সতীর্থ এবং অসংখ্য অনুরাগীদের টানা হেঁচড়ার মাঝখানে অন্যদিনের জন্য বেশ খানিকটা সময় ছেড়ে দিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। অন্যদিনের সঙ্গে সুনীলের কথোপকথনে জানা গেল লেখকের প্রথম যৌবনের কথা, বেঁচে থাকার সংগ্রামের কথা এবং সর্বোপরি, তাঁর সাহিত্য ভাবনার কথা।

অন্যদিন : আপনার জন্মতো ফরিদপুরে, আপনার শৈশব কেটেছে কোথায়? কলকাতায় কবে গিয়েছেন?

সুনীল : আমরা অনেকদিন আগে থেকেই কলকাতায় থাকতাম। আমার বাবা কলকাতায় কাজ করতেন। সেই জন্য কলকাতায় থাকা। ফরিদপুরে ছেলেবেলার অনেকটা সময় কাটিয়েছি। আসা যাওয়া করতাম। এক সময় টানা এক বছরও ওখানে থেকেছি। ১৩/১৪ বছর বয়সের পর থেকে

আর আসা হয়নি।

অন্যদিন : শেষ কবে গ্রামে আসেন?

সুনীল : ১৯৪৮ সালের পরে গ্রামে যাওয়া হয়নি।

অন্যদিন : বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আপনি কি এসেছেন?

সুনীল : বহুবার এসেছি কিন্তু ফরিদপুরে আর যাওয়া হয়নি।

অন্যদিন : 'আনন্দবাজার' পত্রিকার সঙ্গে কবে থেকে যুক্ত?

সুনীল : আমি 'আনন্দবাজার' পত্রিকার সঙ্গে লেখালেখির সূত্রে অনেক আগে থেকেই যুক্ত। আমি আগে সরকারি চাকরি করতাম। সেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমেরিকায় চলে গিয়েছিলাম। তো আমেরিকায় থাকলে হয়তো এতদিন একটা মেম বিয়ে করে, সেইখানে বাড়িঘর করে, গাড়ি চালিয়ে জীবন কাটাতে হতো। সে জীবন আমার পছন্দ হয়নি বলে আমি ফিরে এলাম ১৯৬৪ সনে। এসে বেকার অবস্থা। তখনই আমাকে পদ্য লেখা শুরু করতে হলো। আমি তখন প্রচুর গদ্যও লিখতে শুরু করি। যেহেতু আমাদের দেশে 'আনন্দবাজার' পত্রিকাই লেখকদের পয়সা দেয় বেশি, সেজন্য ওখানেই আমি বেশি লিখতাম। লিখতে লিখতে তারপর ওরা আমাকে চাকরির জন্য ডাকলো। ৫/৬ বছর শুধু আমি লেখক হিসাবেই ছিলাম। 'আনন্দবাজার' পত্রিকাতে চাকরি সূত্রে যুক্ত হয়েছি ১৯৭০ সনে। ১৯৬৪ সন থেকে টানা ৬ বছর আমি ফ্রিল্যান্স লেখক ছিলাম। আমি ভেবেছিলাম আমি চাকরি করবো না। ফ্রিল্যান্স লেখক হিসাবে বাংলায় লিখে সংসার চালানো খুব শক্ত ব্যাপার। কেননা আমাদের দেশে এমন পত্রিকা নেই যারা পয়সা দেয়, একটা দুটো পত্রিকাই আছে। এখনতো পত্রিকার সংখ্যা অনেক বেড়েছে, তখন আরও কম ছিল।

অন্যদিন : আপনার ঐ আমেরিকা থাকাকালীন সময়ে প্রকাশিত 'পশ্চিম সমুদ্র তীরে' ছাড়া অন্য কোন উপন্যাস প্রবাসের অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেছেন কি?

সুনীল : আমেরিকার অভিজ্ঞতা আমার অনেক বইতেই আছে। "নীললোহিত" ছদ্মনামে "সুদূর ঝর্ণার জলে" বইটিতে, আমার ঐ সময়কার কথা লেখা আছে। এছাড়া "ছবির দেশে কবিতার দেশে" বলে একটি ভ্রমণ কাহিনীর বই আছে, তার মধ্যেও ঐ কথা কয়েকটা আছে। এছাড়া "পূর্ব-পশ্চিম" উপন্যাসেও কয়েকখানা ছবি আছে। এরকম আরও নানান লেখা আছে।

অন্যদিন : বই-এর বাইরের অভিজ্ঞতার কথা জানতে চাচ্ছিলাম।

সুনীল : বই-এর বাইরে অভিজ্ঞতার কথা মুখে বলা যায়? লিখতে বসলে মনে পড়ে।

অন্যদিন : আপনার লেখালেখির শুরু কি দিয়ে হয়েছে—কবিতা, গল্প না উপন্যাস?

সুনীল : কবিতা দিয়েই প্রথম শুরু করি। একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে প্রথম কবিতা লিখি, চিঠির আকারে। সেটা একটা পত্রিকায় পাঠিয়ে দিই, এবং ছাপা হয়। আমিতো অবাকই হয়েছিলাম যে, কি করে ওটা ছাপা হলো। তারপর থেকেই বেশ কিছুদিন কবিতা লিখি।

অন্যদিন : সেই মেয়েটির নাম কি বলবেন না উহ্যই থাকবে?

সুনীল : জানানো যায় না। কারণ তাকে তো আর দেখতে পাচ্ছো না।

অন্যদিন : কবিতার নাম কি ছিল?

সুনীল : কবিতাটির নাম ছিল "একটি চিঠি"। ১৯৫১ সালে কবিতাটি 'দেশ' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। এটিই আমার প্রথম মুদ্রিত রচনা।

অন্যদিন : তিনটির মধ্যে কোনটিতে আপনি স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন বেশি? সবগুলোতেই আপনি সিদ্ধহস্ত সেটা অবশ্যই স্বীকার করবো আমরা।

সুনীল : সবগুলোতেই স্বাচ্ছন্দ বোধ করি। তবে স্বাচ্ছন্দবোধ আর সার্থকতার ভেতরে তফাত আছে।

অন্যদিন : আপনি তিনটি ছদ্মনাম ব্যবহার করেন, নীললোহিত, সনাতন পাঠক আর নীল উপাধ্যায়।

ছদ্মনাম ব্যবহারের পেছনে বিশেষ কোন কারণ আছে কি?

সুনীল : হ্যাঁ, একটাই কারণ সেটা হলো, একসময় বহু লিখতে হতো, সেই সময় আমি ফ্রিল্যান্স লেখক ছিলাম। তা একজন লেখকের লেখা বারবার প্রকাশিত হলে লোকে হয়তো বিরক্ত হয়ে যেতো। ঐ জন্য অনেক নাম নিয়ে আমি লিখেছিলাম। বিভিন্ন ধবনের লেখা বিভিন্ন নামে লিখেছিলাম। "নীললোহিত" নামে সাধারণত আমি ভ্রমণ কাহিনী বা ভ্রমণ উপন্যাস লিখতাম। সনাতন পাঠক হিসাবে আমি বই, পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন ধরনের লেখা লিখতাম, প্রবন্ধ লিখতাম। আর নীল উপাধ্যায় নামে বিদেশী কাহিনী লিখতাম। এজন্যই এতগুলো নাম নেয়া হয়েছে।

অন্যদিন : জনপ্রিয় উপন্যাস এবং বক্তব্যধর্মী উপন্যাস—এ দু'টিকে আপনি কিভাবে দেখেন?

সুনীল : জনপ্রিয় উপন্যাস কাকে বলে আমি জানিনা। কোন কোন উপন্যাস জনপ্রিয় হয়ে যায়। কেউ ইচ্ছা করে জনপ্রিয় উপন্যাস লিখতে পারে না। কারণ জনপ্রিয় হবে নাকি হবে না, জানবে কি করে? পাঠকের উপর সেটা নির্ভর করে। লেখকতো নিজে লেখে, কোনটা জনপ্রিয় হয় কোনটা জনপ্রিয় হয়না। কেউ একটু হাল্কা ধরনের লেখে কেউ একটু গভীর ধরনের লেখে। একেকজন লেখকের একেক রকম ব্যাপার।

অন্যদিন : ঔপন্যাসিক হিসাবে আপনাব উদ্দেশ্য কি? পাঠককে সাময়িক আনন্দ বেদনাব স্বাদ দেয়া নাকি কোন বিষয়ে পাঠককে ভাবিয়ে তোলা?

সুনীল : আসলে একটা উপন্যাসে সবই থাকে। একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে তো আর উপন্যাস লেখা হয় না। যেমন, যখন ইতিহাসের পটভূমিকায় লিখি, তখন মনে হয় ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করা দরকাব। ইতিহাস তো আছেই। ব্যাখ্যা সাধারণত লেখকেরা করে না। ব্যাখ্যা করাব উদ্দেশ্য নিয়ে লিখিনা। পাঠক যাতে সচেতন হয়, এজন্য সামনে এগোবাব জন্য মাঝে মাঝে পেছনে তাকাতে হয়। আমি একটা উপমা দিচ্ছি, যখন আমরা তীর ছুড়ি তখন তীরটাকে আগে পেছনে টানতে হয় তাব পরে তীরটা সামনে বেশ ছুটে যায়। তেমনি আমাদের সভ্যতা সংস্কৃতিকে মাঝে মাঝে পেছনের দিকে সরে এসে তাকিয়ে দেখাতে হয়। তাহলে সামনে এগোনো যায়। তবে সব লেখাই আনন্দের জন্য। চিন্তা করতে হলেও তার মধ্যে একটা আনন্দ থাকা দরকার। শুধু চিন্তা করার জন্য লিখলে কেউ পড়তে চায়না।

অন্যদিন : আপনাব প্রথম উপন্যাস "আত্মপ্রকাশ", দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত। বই হিসেবে প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস কোনটি?

সুনীল : আসলে একটা Confusion আছে আমার প্রথম উপন্যাস নিয়ে। "আত্মপ্রকাশ" দেশ পত্রিকার সম্পাদক আমাকে লিখতে বলেন, হঠাৎ করেই। তা লেখাব পর পুজো সংখ্যায় এটা বেরোয় এবং বই হিসাবেও এটা বেরিয়ে যায়। কিন্তু তারও আগে আমি একটা উপন্যাস লিখছিলাম, সেটা হলো "যুবক যুবতীরা"। কাজেই ঐ লেখাটা আগে, কিন্তু ছাপানোটা পরে।

অন্যদিন : "আত্মপ্রকাশ" উপন্যাসটি কত সালে প্রকাশিত হয়?

সুনীল : পুজো সংখ্যায় বেরিয়েছিলো। সালে প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ বইটা লেখার রয়্যালটির টাকা দিয়ে আমি বিয়ে করেছিলাম। কারণ তখন আমার চাকরি ছিল না। টাকা কোথায় পাবো?

অন্যদিন : এ বইটি লেখার পেছনে ঘটনাটি বলবেন কি?

সুনীল : ঘটনাটা কিছুই না। "দেশ" পত্রিকা আমাদের ঐ অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা। ঐ পত্রিকায় সাধারণত নামকরা, প্রতিষ্ঠিত লেখকদের লেখা ছাপা হতো। যে সময়ের কথা, তখন আমি চ্যাংড়া কবি। সেই সময় আমাকে কেউ চিনত না। আমার খ্যাতি থেকে অখ্যাতি বেশি। নামের থেকে দুর্নাম বেশি। যেন ভাংচুর করতে এসেছি, গণ্ডগোল করতে এসেছি, এমন একটা ভাব। তো এরকম একটা সময়ে দেশ পত্রিকার মতো পত্রিকায় উপন্যাস লিখতে পারাটা খুব আশ্চর্যের ঘটনা।

কিন্তু সম্পাদক ভেবেছিলেন যে, আমাকে একটা পরীক্ষা করবেন। একদম নতুন আনকোরা কোন লেখককে দিয়ে লেখাবেন। তো সে জন্য আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে সম্পাদক বললেন, তোমাকে উপন্যাস লিখতে হবে। আমি প্রথম ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কি যে লিখব, অত বড়ো পত্রিকায়, পাঠকরা পড়বে, মারবে আমাকে, এসব ভেবেছিলাম। যাই হোক, ভাবলাম, চেষ্টা করে দেখা যাক। সময় বেশি ছিল না। তো লিখে ফেললাম। লিখে ফেলে পাঠকরা কি বলবে, সম্পাদক কি বলবে, এই ভয়ে আমি কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম। যাতে কাউকে Face করতে না হয়। এই আর কি...।

অন্যদিন : আমাদের বই মেলায় তো আপনি বেশ কয়েকবার এসেছেন, তো মেলার অনুভূতিটা কি?

সুনীল : বই মেলায় এবার আমি যাইনি। এবাব আমি কবিতা উৎসবের আহ্বানে এসেছি। বই মেলায় আমি একবারই এসেছিলাম। এমনিতে আমার আসা হয়না। অন্যান্য সময় বেড়াতে এসেছি বা আমন্ত্রণে এসেছি, সেমিনার করতে এসেছি, কবিতা পড়তে এসেছি। বই মেলার জন্য আমি একবারই এসেছি।

অন্যদিন : "পূর্ব পশ্চিম"-এর পরে আপনার এ ধরনের বড় মাপের লেখা আর কি কি প্রকাশিত হয়েছে?

সুনীল : "পূর্ব-পশ্চিম"-এর পরে এই যে এখন আমি লিখছি "প্রথম আলো" বলে একটি উপন্যাস। ধারাবাহিক ভাবে "দেশ" পত্রিকাতে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রথম খণ্ডটি বই আকারে প্রকাশিত হয়ে গেছে। দ্বিতীয় খণ্ডটি এখনও আমি লিখছি। এটা বেশ বড। হয়তো 'পূর্ব পশ্চিমের' থেকেও বেশ বড় হবে। এবং এটি একটি ঐতিহাসিক পটভূমিকায় এবং একই সঙ্গে বলা যায়, আমার "সেই সময়" উপন্যাসের পরবর্তী ইতিহাস। মানে গত শতাব্দী শেষ হচ্ছে এবং এই শতাব্দী শুরু হচ্ছে। এরকম সময়েব বাংলা এবং অবিভক্ত ভারতের অনেক জায়গার রাজনৈতিক উত্থানের কথা এর মধ্যে আছে এবং এই উপন্যাসের অন্যতম নায়ক হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অন্যদিন : সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

সুনীল : দেখো, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্বন্ধে আমার মনে একটা বেদনাবোধ আছে। এখন আমরা বিংশ শতাব্দীর শেষে এসে পৌছেছি। মানুষ গ্রহ-গ্রহান্তরে যাচ্ছে, বিজ্ঞান আমাদের কত যুক্তিবাদী হতে শেখাচ্ছে, বিজ্ঞান আমাদের নতুন নতুন পথের সন্ধান দিচ্ছে অথচ এখনও আমরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করছি। এর থেকে লজ্জার কি হতে পারে। এটা শুধু আমাদের এখানেই নয়, সারা পৃথিবীতেই।

অন্যদিন : আচ্ছা আপনার একটা গল্প পড়েছিলাম, "আমার একটি পাপের কাহিনী।" এই গল্পটিতে পাপ-পুণ্যের একটি ব্যাখ্যা আপনি দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছেন। আপনি নিজে এ ব্যাপারে কতটা...

সুনীল : পাপ-পুণ্য মানে—ধর্মীয় পাপ-পুণ্যে বিশ্বাস নেই আমার। ব্যক্তিগতভাবে আছে। যেটা আমার বিবেকসম্মত নয়, এমন কাজ যদি আমি করি তাহলে আমার মনে হয় সেটা আমার পাপ। কোন ধর্মীয় বিধি-নিষেধের পাপ আমি জানি না। ঐ গল্পটা ছিল একটা প্রেমের গল্প। আমি লিখেছিলাম যে, একটি মেয়ে, সে আসলে ফরাসী ছিল, আমি গল্পে একটু পাল্টে দিয়েছিলাম যে, সে ইটালীয়ান। তো সেই মেয়েটির সঙ্গে আমার খুব গভীর বন্ধুত্ব ছিল। যে যখন কয়েকদিনের জন্য তার দেশে বেড়াতে যায় তখন একটা ইনসিওরেন্স পায়। খেলার ছলে ইনসিওরেন্স করে আমাকে নোমিনি করে যায়। প্লেনটি যখন আকাশে উঠলো তখন আমি ভাবলাম যে, এই প্লেনটি যদি ক্র্যাশ করে আর মেয়েটি যদি মারা যায়, তাহলে আমি ১ লক্ষ ডলার পাব। ১৯৬০ এর দশকে ১ লক্ষ ডলারের অনেক দাম...

অন্যদিন : বাংলা উপন্যাসের এখন যে ধারাটা এটা সম্পর্কে একটু বলুন?

সুনীল : বাংলা উপন্যাসে বৈচিত্র্য আছে। বাংলা উপন্যাস নানা রকম বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা হয়। কিন্তু শুধু একটা কথাই বলব যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের উপন্যাসের সঙ্গে বাংলা উপন্যাসের তুলনা করলে, এর দুর্বলতা ধরা পড়ে। উপন্যাসের ফরম নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে অন্যদেশে। আমাদের দেশে সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনেক কম দেখা যায়। আজকাল "ম্যাজিক রিয়ালিজম" হয়েছে পশ্চিমে। তাই নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে। অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান তিনটি সময়কে মিলিয়ে দিয়ে, আগে পিছে করে দিয়ে লেখা হচ্ছে। সেই জিনিসটা আমাদের এখানে তেমন করে লেখা হয় না। তার কারণটা বোধহয় এই যে, আমাদের পাঠকরাও প্রস্তুত নয়। "শক্ত অভিযান" নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলাম এই ধরনের একটা ব্যাপার নিয়ে। সেটা কেউ পড়েনা। সমস্ত বইয়ের মধ্যে ঐ বইটার বিক্রি সবচেয়ে কম।

অন্যদিন : বাংলাদেশে রচিত উপন্যাস সম্পর্কে আপনি কিছু মন্তব্য করবেন কি?

সুনীল : এখানে অনেক বৈচিত্র্য আছে। যেমন আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের "চিলে কোঠার সেপাই" বইটা চমৎকার। সেলিনা হোসেন যিনি আঞ্চলিক ভাষায় একেকটা অঞ্চল নিয়ে লেখেন, তার মধ্যে খুব গভীরতা আছে। আরেকজন খুব ভাল লিখতেন নাম মাহমুদুল হক। Powerful লেখক ছিলেন। আজকাল তার লেখা দেখিনা। এখনকার জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদ, ইমদাদুল হক মিলন, এরা বেশ ভাল লেখেন। আমি এদের অনেক লেখা পছন্দ করি।

অন্যদিন : চলচ্চিত্রের ব্যাপারে কিছু বলুন।

সুনীল : আমার জীবনের প্রথম চলচ্চিত্র, গল্প থেকে প্রথম চলচ্চিত্র করেন সত্যজিৎ রায়। সেটার নাম হলো "অরণ্যের দিন রাত্রি।" এবং তিনি তারপরেই আর একটা করেন, সেটার নাম "প্রতিদ্বন্দ্বী"। পরে ছবি করেছেন তপন সিংহ, মৃণাল সেন। অন্যান্য অনেকেও করেছেন। এর মধ্যে আমি ছোটদের জন্য যেগুলো লিখি 'কাকা বাবু' সিরিজে তারমধ্যে "সবুজ দ্বীপের রাজা" তপন সিংহ করেছিলেন। সেই ছবিটি বাচ্চাদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। আমাদের ভারতবর্ষে ওটা বিভিন্ন ভাষায় ডাবিং করে দেখানো হয়েছিল।

অন্যদিন : বাচ্চাদের জন্য আপনার কতগুলো কাহিনী চলচ্চিত্র হয়েছে?

সুনীল : বাচ্চাদের জন্য গোটা তিনেক হয়েছে বোধহয়।

অন্যদিন : আর বড়দের জন্য?

সুনীল : গোটা পনের হয়েছে।

অন্যদিন : আপনিতো কবিতাও লিখতেন। কবিতার যে ফর্মটা এখন, যে ফর্মটা খানিকটা আবার Change হচ্ছে। নতুন ফর্মের দিকে যে যাচ্ছে, এ সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

সুনীল : ছন্দটা ভাঙা গিয়েছিল, মানে ছন্দের মুক্ত দরকার ছিল। এখন যে কোন ভাবে লেখা যায়। গদ্যেও লেখা যায়, ছন্দেও লেখা যায়। তবে ভাষার একটা প্রবণতা থাকে। আমি দেখেছি যে, বাংলা ভাষার প্রবণতা ছন্দের। এজন্য অনেক কবি গদ্যে লিখলেও আবার ছন্দে ফিরে আসছেন। ছন্দের একটা বড় গুণ হচ্ছে স্মরণযোগ্যতা, মনে থাকে। সেই জন্য মনে হয় ছন্দের দিকে ঝোঁক বাড়ছে।

অন্যদিন : আমাদের কবিতা উৎসব কেমন লাগছে?

সুনীল : কবিতা উৎসব দেখে আমি ভাষণে বলেছি যে, বিস্ময়কর ব্যাপার, এত বিশাল সমাবেশ, এত আগ্রহ। আমি বলব, বিশেষ করে আমাদের ওখানে কবিতা উৎসব হয়, কিন্তু এত জনসমাবেশ হয়না। এতক্ষণ কেউ বসেও থাকেনা। আমাদের ওখানে দু'ঘণ্টার বেশি হলে কোন লোক থাকে না। হল ফাঁকা হয়ে যায়। কবিতার প্রতি টানটা এখানে খুব বেশি। তো এই টানটা কেন? এজন্য সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দরকার।

অন্যদিন : স্বাধনীতার পরে বাংলা ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে, এখানে কোন পরিবর্তন আপনার চোখে

ধরা পড়েছে কিনা?

সুনীল : স্বাধীনতার আগে থেকেই এই অংশের বাংলা গদ্যে খুব উন্নতি হয়েছে। পাকিস্তান আমলে এখানকার বাংলাটাকে পরিশুদ্ধ রূপে ধরে রাখার অনেক চেষ্টা করা হয়েছে। এখনও নানা রকম পরীক্ষা হচ্ছে। আমি মনে করি এখানকার ভাষায় যদি কিছু দেশজ শব্দ, আঞ্চলিক শব্দ ঢুকিয়ে দেয়া যায়, তাহলে দারুণ উন্নতি হবে। ভাষার প্রসারতা দরকার, আস্তে আস্তে প্রসারতার জন্য কিছু কিছু যেমন, আমিও অনেক সময় করেছি ওখানে, প্রথমে পাঠকরা বুঝতে পারেনি, কিন্তু আমি জানি লিখলে বুঝতে পারবে। যেমন 'উদলা' বলে একটা কথা আছে, আমি এই শব্দটি ব্যবহার করি। তো পশ্চিমবাংলার লোকেরা প্রথমে এটা বুঝতে পারে নি। ভাবে এটা আবার কি? কিন্তু আমি জানি দু'তিনবার ব্যবহার করলেই ঠিক বুঝে যাবে। কাজেই এরকম কিছু কিছু শব্দ মনে হয় ব্যবহার করা উচিত।

অন্যদিন : ওখানে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষার বিকাশের ক্ষেত্রে সে রকম কিছু কাজ কি হচ্ছে?

সুনীল : হ্যাঁ, হচ্ছে তো বটেই। ভাষাতো আর থেমে থাকে না। সংস্কৃত ভাষার যে অবস্থা হয়েছিল। সংস্কৃত ভাষা, তার এত বেশি সূক্ষ্ম, চুলচেরা বিচার নিয়ে পণ্ডিতরা যে মাথা ঘামাতে আরম্ভ করলো, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্নও হয়ে গেলো, সেই ভাষার মৃত্যু হয়ে গেলো। সেই জন্যই ভাষাকে সব সময় এগুতে হয়।

অন্যদিন : আপনার উপন্যাসে পুরুষ এবং নারী চরিত্রে, প্রেমের ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব যে দর্শন, এ দর্শন তো অবশ্যই আপনি বিশ্বাস করেন, এটা অনেক সময় অনেকের ক্ষেত্রে ভিন্ন রকম মনে হয়, এটা একটু ব্যাখ্যা করবেন কি?

সুনীল : এটা নানা রকম ক্ষেত্রে হয়। কারণ মানুষতো আর এক রকম নয়। সেই জন্যই পৃথিবীটা এখনও একটা আশ্চর্য ব্যাপার হয়ে আছে। মানুষকে কোন সংজ্ঞা দিয়ে বাঁধা যায় না। মানুষকে কোন শ্রেণীর মধ্যে বেঁধে ফেলা যায় না। গল্পেতো বিভিন্ন ধরনের বিচিত্র কাহিনী থাকে। কারণ সবসময় তো এক রকম কাহিনী, এক রকম দর্শন নিয়ে লেখা হয়না। তবে আমি মনে করি যে, নারী হোক, বা পুরুষ হোক, যারই চরিত্র হোক, সাহিত্যের মধ্যে তা ফুটে উঠুক। শুধু তার নিজস্ব বিচার বুদ্ধি যেন কাজ করে, লেখক যেন চাপিয়ে না দেয় তার উপরে। লেখক যদি তার ইচ্ছেটা, আদর্শটা চাপিয়ে দেয়, তাহলে সাহিত্য অবাস্তব হয়ে যায়। বিভিন্ন রকমের যে নারী পুরুষ দেখতে পাওয়া যায়, লেখার মধ্যেও সেই বিভিন্নতা আসা উচিত।

অন্যদিন : আপনার কি ধরনের চরিত্র সৃষ্টি করতে ভাল লাগে?

সুনীল : ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলো বাদ দিলে, বেশীর ভাগ উপন্যাসই হচ্ছে প্রথম পুরুষের, আমি করে লেখা। অর্থাৎ নিজেকে তাতে সম্পৃক্ত করা। নিজের জীবনের যে ঘটনা সেই গুলো নিয়েই আমি লিখি।

অন্যদিন : রবীন্দ্র নজরুলের পরে তো অনেকখানি সময় আমরা পেরিয়ে এলাম বাংলা সাহিত্যে, বেশ অনেক সময়। সবাই বলে ঐটাই বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ... আপনার অভিমত কি?

সুনীল : সকলেই বলে আগের যুগটাই ভাল ছিল। জীবনানন্দ যখন লিখতেন, লোকে তাকে যাচ্ছে তাই গালাগাল করতো। তাঁর সম্বন্ধে যে কত সমালোচনা হয়েছে তাঁর কোন ইয়ত্তা নেই। কাজেই সমসাময়িক যুগের বিচারটা সমসাময়িক কালে করা যায় না। এই সময়ে কি হচ্ছে আর না হচ্ছে, আজ থেকে ৪০ বছর পর তার বিচার হবে। দেখবে আমাদের মধ্যে একটা ঝোঁক থাকে বর্তমান সময়কে ছোট করে আগেরটাকে গৌরবময় করা। আগে কি বড় বড় লেখা হয়েছে, দারুণ লেখা হয়েছে, এখন যাচ্ছে তাই লেখা হচ্ছে! তখনকার পত্র পত্রিকার পাতা উল্টালে দেখা যাবে তখনও ঐ কথাটাই বলা হতো। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এই কথা শুনতে হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ যখন

পরিণত বয়স্ক তখনও বলা হয়েছে, একি হা হুতাশ করা বাজে বাজে কবিতা উনি লিখছেন। বাংলা ভাষার সর্বনাশ করা হচ্ছে। এর থেকে ভারতচন্দ্র কত ভাল ছিল, মাইকেল কত ভাল ছিল! চিরকালই এরকমই হয়।

অন্যদিন : আপনি যে বললেন রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের পরে, জীবনানন্দ দাস তাঁদের সমপর্যায়ের কবি?

সুনীল : কেউ কেউ মনে করে জীবনানন্দ রবীন্দ্রনাথের থেকেও শক্তিশালী কবি, কবিতার বিচারে। রবীন্দ্রনাথ তো সমস্ত মিলিয়ে সাহিত্যিক একজন। সাহিত্যে এই ব্যক্তিত্বের সাথে তুলনা করার মতো কেউ নেই। শুধু কবিতার বিচারেই অনেকে মনে করেন রবীন্দ্রনাথের থেকে বড় কবি জীবনানন্দ।

অন্যদিন : বিশ্বকাপ ক্রিকেট শুরু হচ্ছে কিছু দিনের মধ্যেই, আপনার প্রিয়দল কোনটি?

সুনীল : আমি ঠিক খেলার লোক না। খেলা সম্বন্ধে আমি বেশি কিছু বলতে পারবো না। এমনকি কোন কোন দলের কোন কোন খেলোয়াড় ভাল করছে, সে খবরও আমি রাখি না। ক্রিকেট খেলা দেখতে ভাল লাগে, তাই দেখি।

অন্যদিন : কলকাতার বই মেলা এবং ঢাকার একুশের বই মেলার বিশেষত্বটা কি?

সুনীল : ঢাকার বই মেলার একটা বিশেষত্ব হচ্ছে যে, এখানকার যারা এই মেলায় আসে, সকলে বাংলা ভাষার যে সম্ভার সেগুলো দেখতে পায় ও কেনার সুযোগ পায়। কলকাতার বই মেলায় তা নেই। কলকাতার বই মেলা আকারে বড় এবং তা খানিকটা আন্তর্জাতিক এবং বহু ভাষার বই থাকে, ফলে বহু ভাষার বই এখানে পাওয়া যায়। এখানে তফাত আছে।

অন্যদিন : ওখানে আমাদের দেশের লেখকদের বই কেমন চলছে?

সুনীল : এখন যাচ্ছে। আগে বাংলাদেশের বই প্রদর্শনী করা হতো, বিক্রি হতো না। এখন বিক্রি করা হয়। বাংলাদেশের লেখকরা এখন পশ্চিমবাংলায় মোটামুটি জনপ্রিয়। ইমদাদুল হক মিলন, হুমায়ূন আহমেদ, এদের নাম best seller list এ বের হয়। ইমদাদুল হক মিলনের "নূরজাহান" বইটা বেশ ভাল। কবিতার বই তো আগেই বেরুত। শামসুর রাহমান, আল মাহমুদের বই, অনেক আগেই বেরিয়েছে।

অন্যদিন : অন্যদিনের পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ। আর পাঠকদের জন্য যদি কিছু বলেন।

সুনীল : পাঠকদের জন্য শুভেচ্ছা। বাংলাদেশের পাঠকদের কাছ থেকে চিঠি পেয়ে মাঝে মাঝে অভিভূত হয়ে যাই আমি। দুঃসাহসিক উপহার পাঠায়। খামের মধ্যে ভরে শাল পাঠিয়ে দেয়। সেটা হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রচুর। পোস্ট অফিস থেকে যে মেরে দেয়নি, সেটা আশ্চর্যের ব্যাপার। একটি মেয়ে নিজে হাতে বুনে একটি শাল আমাকে পাঠিয়েছে। সেটা যখন আমি গায়ে দিই, সেই মেয়েটির স্পর্শ যেন আমি অনুভব করি। এত ভাল লাগার জিনিস সে পাঠিয়েছে। কাজেই এগুলো দেখে যখন আমি অভিভূত হয়ে যাই, মনে হয় অনেক বেশি পাওয়া হয়ে গেলো, এর চেয়ে বেশি আর চাই কি।

৬

দূরদর্শনের অনুষ্ঠানসূচিতে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছে, এই অভিমত জানিয়ে যাঁরা দূরদর্শনের নীতি পরিবর্তনের দাবিতে আন্দোলন করছেন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে একটি কথোপকথন।

প্রশ্ন : সুনীলদা, প্রথমেই আপনাকে জিজ্ঞেস করি, দূরদর্শনে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি কোণঠাসা বলে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে, আপনি তাতে যুক্ত হতে গেলেন কেন?

উত্তর : বিবেকের দায়ে আমি এসেছি বলা যেতে পারে। বাংলা ভাষার একজন কর্মী হিসেবে বাংলার অপমান আমার গায়ে লাগে। অনেকেই আমাকে বলে যে আপনি তো আনন্দবাজারের লোক। আপনি এতে কেন? এর সঙ্গে আনন্দবাজার বা আমার চাকরির কোনও সম্পর্ক নেই।

প্রশ্ন : কোণঠাসা বলতে আপনারা ঠিক কী বোঝাতে চাইছেন? ভারতের অন্যান্য দূরদর্শন কেন্দ্রগুলিতে আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতির তুলনায়ও কি বাংলা অবহেলিত?

উত্তর : কোণঠাসা বলতে যা বোঝাতে চাইছি তা এই যে যাকে বলে 'প্রাইম টাইম' (৬টা থেকে ১০টা), সেই সময়ে পশ্চিমবাংলায় বাস করে আমি কেন দূরদর্শনের কোনও একটা 'চ্যানেলে' বাংলা অনুষ্ঠান দেখতে পাব না? রেডিও-তে তো পাই। তার সম্বন্ধে তো এই অভিযোগ ওঠেনি। অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার ক্ষেত্রেও আমি মনে করি প্রত্যেকের নিজস্ব চ্যানেল থাকা উচিত। গুয়াহাটি থেকে অসমিয়া, ভুবনেশ্বর থেকে ওড়িয়া ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচারিত হওয়া উচিত।

প্রশ্ন : এই যে 'প্রাইম টাইমে' হিন্দি অনুষ্ঠান দেখতে হয়,-- এটাকে কি আপনি হিন্দির আগ্রাসন বলে মনে করেন?

উত্তর : নিশ্চয়ই।

প্রশ্ন : তা হলে কিন্তু আরও একটা প্রশ্ন ওঠে, দূরদর্শন তো কেবল নয়, হিন্দি চাপিয়ে দেবার এই চেষ্টা তো অন্যভাবেই হয়েছে। হিন্দি সিনেমা, গান, ক্যাসেট ইত্যাদি। দূরদর্শনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামলে, এ সবের বিরুদ্ধেও তো কিছু বলতে হয়। নয় কি?

উত্তর : হিন্দি ভাষার বিরুদ্ধে আমার আপত্তি নেই। হিন্দি সাহিত্য আমি পছন্দ করি। কিন্তু কুরুচিপূর্ণ হিন্দি অনুষ্ঠান, যা দূরদর্শনে প্রচারিত হয়, আমার আপত্তি সেইখানে। আর হিন্দি সিনেমা, সে তো তুমি ইচ্ছে করলে নাও দেখতে পার। ছেলেমেয়েদের নাও দেখাতে পার। কিন্তু দূরদর্শন যে শয়নকক্ষে এসে হাজির হয়েছে। একে ঠেকানো যাবে কী করে? আপাতত তাই দূরদর্শন দিয়েই আন্দোলন শুরু হোক।

প্রশ্ন : আপনার কি মনে হয় যে দূরদর্শন সরকারি বলেই, এই বিক্ষোভ? অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি, সরকারি ভাবে কুরুচিপূর্ণ অনুষ্ঠান প্রচারিত হওয়ার বিরুদ্ধেও কি এই বিক্ষোভ?

উত্তর : সরকারের ভুল নীতিই এর জন্য দায়ী। বেসরকারি উপদেষ্টা কমিটি যদি থাকত, তা হলে তাঁরা ভাষা ও অনুষ্ঠানের মানের উন্নতির দিকে নিশ্চয়ই নজর দিতেন।

প্রশ্ন : এক্ষেত্রে, আরও একটা প্রশ্ন ওঠে, তা হল, দূরদর্শন কিন্তু অনেকটাই এখন বেসরকারি হাতে। বিজ্ঞাপনদাতা ও বেসরকারি প্রযোজকের হাতে সময় বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। এর পিছনে আছে রাজনৈতিক দলগুলির বহুদিনকার দাবি। সুতরাং আন্দোলন যদি করতেই হয় তা হলে বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে করতে হয় না?

উত্তর : না। বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে করতে হয় না। সময় বিক্রি করতে হলে, প্রথমেই শর্ত হবে আঞ্চলিক চ্যানেলগুলিতে আঞ্চলিক ভাষায় অনুষ্ঠান করতে হবে। বাংলার সময় বিক্রি হয়ে গেল বোম্বাইয়ের কোম্পানির কাছে—যারা হিন্দি অনুষ্ঠান করবে, তা হবে না। তারপর সেই অনুষ্ঠানের মান কেমন হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। আর একটা কথা, সময় বিক্রি হচ্ছে ঠিক কথা—কিন্তু সরকারি একটা নিয়ন্ত্রণও আছে।

প্রশ্ন : দূরদর্শন থেকে যে বাংলা অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়, সিনেমা এবং গান উপলক্ষে, আমরা দেখি যে বাঙালি শ্রোতা সে বস্তুকে বেশ উপাদেয়ই মনে করে। তা কিন্তু মূলত হিন্দিরই অনুকরণ। সে ক্ষেত্রে ভাষার প্রশ্ন বাদ দিলে, অনুষ্ঠানের গুণগত মান কিন্তু কিছু পাল্টাচ্ছে না। এ-বিষয়ে আপনি কী বলেন?

উত্তর : বাংলা অনুষ্ঠানের মান খারাপ। আমি সাধারণভাবে বলছি। দেশ সদ্য স্বাধীন হবার পর অনেকে বলত যে ইংরেজ রাজত্বই ভাল ছিল। বাংলা অনুষ্ঠান খারাপ বলাটা সেইরকমই মূর্খের মতো কথা। আসলে বাংলা অনুষ্ঠানের স্বাধীনতা এত কম—টাকা এত কম দেয়, হিন্দিকে জনপ্রিয় করার জন্য ইচ্ছে করে বাংলাকে কোণঠাসা করা হয়। যদি বাংলার অধিকারটা স্বীকৃত হয়, তা হলে বাংলা অনুষ্ঠানের মানেরও পরিবর্তন হবে। অনেক ভাল ভাল পুরনো, নতুন বাংলা সিনেমা আছে। তার বদলে হিন্দির অনুকরণে তৈরি বাংলা সিনেমাই দেখানো হয়। বাংলা থিয়েটার কত উন্নত—কিন্তু দূরদর্শনের নাটক দেখলে, সে কথা একবারও মনে হবে?

প্রশ্ন : কথা হচ্ছে, বেসরকারি হাতে দূরদর্শনের চ্যানেল চলে গেলে, সাধারণ এবং অধিকাংশ দর্শক যা পছন্দ করেন, অর্থাৎ হাল্কা আমোদ-প্রমোদ—তাঁরা তাই দেখাতে চাইবেন। কারণ তাঁদের মূল লক্ষ্য হবে মুনাফা—সুস্থ সংস্কৃতির প্রসার নয়।

উত্তর : ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা আমরা চিন্তা করব না। ওটা আমাদের বিষয় নয়, অনুষ্ঠানের মানের উন্নতির জন্য দরকার হলে, দ্বিতীয় পর্যায়ে আন্দোলন শুরু হবে। কিছু কিছু হস্তক্ষেপ দরকারই।

প্রশ্ন : 'দূরদর্শনে বাংলা চাই'—এই স্লোগান খুবই আন্তরিকতাপূর্ণ কিন্তু এটা তো বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা নয়। আজকে যে 'খোলা বাজারের' নীতি মেনে নেওয়া হয়েছে তাতে গোটা দুনিয়াকেই বাজার হিসেবে ভাবা হচ্ছে। ভারতও তার অংশীদার। এই গোটা নীতিরই একটা অংশ সংস্কৃতি। তাকে কী ভাবে আলাদা ভাবে চিন্তা করা যাবে? এই ব্যবস্থায় সংস্কৃতিও পণ্য মাত্র। এই ব্যাপারে কিন্তু প্রতিবাদ হয়নি। তাহলে আজ প্রতিবাদ করে কী হবে?

উত্তর : তুমি যা বললে, তার সঙ্গে আমাদের দাবির কোনও সংঘাত তো নেই। বাংলা ভাষায় একটা চ্যানেল থাকবে, তাতে আমি ইচ্ছে করলেই বাংলা অনুষ্ঠান দেখতে পাব—এই দাবির সঙ্গে 'খোলা বাজারের' নীতির কোনও বিরোধ নেই।

প্রশ্ন : আরও একটা কথা, আজকের দূরদর্শন কঠিন এক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মুখোমুখি। উপগ্রহের সাহায্যে বিদেশি অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ আছে। সেক্ষেত্রে একটা চ্যানেল যদি বাংলাকে দেওয়াও হয়, তা হলে কি বাঙালি দর্শক-শ্রোতা তাতে মন দেবেন? এই প্রতিযোগিতায় বাংলা চ্যানেল টিকে থাকতে পারবে?

উত্তর : এই প্রতিযোগিতাতে নামতেই হবে। এখন তো, অসম প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় নামতেই দিচ্ছে না। তা হলে আর তার উৎকর্ষ প্রমাণিত হবে কী করে? তোমার কোনও 'চয়েস' থাকবে না কেন? এখনই বাংলা অনুষ্ঠান দুর্বল বলছ। সুযোগ না পেলে, আরও দুর্বল হবে। দূরদর্শনে

লোক সংগীতের কোনও স্থানই প্রায় নেই। রবীন্দ্রসঙ্গীত কমতে কমতে প্রায় পাঁচ মিনিটে এসে ঠেকেছে। এভাবে কী হবে! যে হিন্দি অনুষ্ঠানের জন্য তিন লক্ষ টাকা বরাদ্দ সেই অনুষ্ঠান বাংলায় হলে পঞ্চাশ হাজার দেওয়া হয়। এ ভাবে কি কোনও প্রতিযোগিতা হয়? আর তুমি যে প্রশ্ন করছ, বাঙালি দেখবে কি না? আমি বলব বাঙালির মধ্যে বাংলা ভাষার প্রতি সেই অনুরাগ আছে। তার একটা প্রমাণ যখন 'ন্যাশানাল প্রোগ্রাম' হয়, তখন অনেক বাঙালিই বাংলাদেশ দেখেন, বাংলাদেশের অনুষ্ঠান ভাল হয় বলে অনেকেই মনে করেন। এর কারণ তাতে জোর দেওয়া হয়।

প্রশ্ন : বিদেশি প্রতিযোগিতাকে নিয়ন্ত্রণ করার ওপর জোর দিয়ে লোকসভায় বিল এসেছে। তার প্রতিবাদও শোনা গেছে। কেউ কেউ এসে সেন্সরশিপের সঙ্গে তুলনা করেন। আপনি কি মনে করেন এই ধরনের নিয়ন্ত্রণমূলক বিল প্রত্যাহার করা উচিত?

উত্তর : বিলটা এখনও পর্যন্ত ঠিকমত আকার পায়নি। চব্বিশ ঘণ্টা দেখাবে, এই রকম বিদেশি চ্যানেলকে যদি সময় দেওয়া হয়, তা সেন্সর করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। যেমন বি.বি.সি-র সংবাদ—তা কোথাওই সেন্সাব করা যায় না। তা হলে তারা দেখাবেই না। বিলটা এখনও খুব স্পষ্ট নয় তাই মন্তব্য করতে পারছি না। এ ছাড়াও, অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। যেমন ধর, এখানে মদের বিজ্ঞাপন দেওয়া নিষেধ। কিন্তু স্টার টি.ভি.তে দেওয়া যায় এবং তা এখানে আমরা দেখছি। আমাদের বিজ্ঞাপনদাতারা কোটি কোটি টাকার বিদেশি মুদ্রায় সেইসব বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন। সেটা আটকানো উচিত কি না, আগে সেই নীতি ঠিক করা দরকার।

৭

মোহাম্মদ হোসেন

লন্ডনে এখন শীত পড়তে শুরু করেছে। মাঝে মধ্যে আবহাওয়া ক্ষ্যাপে যায় এবং বৃষ্টি নামে এবং এই বৃষ্টির মধ্যেই ব্রাইটন থেকে লন্ডন রওয়ানা হলাম। ঘণ্টা দেড়েকের পথ। উদ্দেশ্য দু'টো। এক লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিতব্য 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' এর উপর তিনদিন ব্যাপী সিম্পোজিয়ামে (২৭-২৯ অক্টোবর ২০০০) অংশগ্রহণ এবং দ্বিতীয় বিশিষ্ট উপন্যাসিক কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ।

লন্ডন ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলর হলে পৌঁছে গেলাম যথা সময়ে। গিয়ে তো অবাক বক্তৃতা শুনতে হলে দশ পাউন্ড (অর্থাৎ বাংলাদেশী টাকায় আট'শ টাকা) দিতে হবে, প্রবেশ ফি। বক্তৃতা শুনার জন্য আট'শ টাকা! অবশ্য আমাকে রক্ষা করলেন কবি অমলেন্দু বিশ্বাস, যিনি এ অনুষ্ঠানের চেয়ারপার্সন এবং যার দাওয়াত পেয়ে আমি এখানে এসেছি। তিনি আমাকে লেখক সাংবাদিক পরিচয়ে ভেতরে ঢুকালেন। ঢুকে দেখি মহাকাণ্ড। আমাদের রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আলোচনা করার জন্য বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতরা উপস্থিত। আলোচনার জন্য এসেছেন, আমেরিকা থেকে অধ্যাপক কার্লো কপোলা, কানাডা থেকে ডঃ ক্যাথলিক এম ও কনেল, ভারত থেকে ডঃ সুদীপ্ত কবিরাজ, অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়, ল্যাটভিয়া থেকে অধ্যাপক ভিকটরস, স্পেন থেকে অধ্যাপক জম পাজ, স্পেন থেকে স্টেল্লা নোয়া, রাশিয়া থেকে অধ্যাপক জানিল চ্যাক, নেদারল্যান্ড থেকে অধ্যাপক রকাস প্রট এবং যুক্তরাজ্যের লেখক মাইকেল মারল্যান্ড। তা ছাড়াও বাংলাদেশ থেকে এসেছেন ডঃ আনিসুজ্জামান এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে সংযুক্ত হয়েছেন লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

সবাই মনোযোগ দিয়ে আলোচনা শুনছে, কেউ প্রশ্ন করছে, উত্তর দিচ্ছেন আলোচকেরা। আর আমি ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সেই ফাঁকে একটু কাট্ মেরে দিলাম। অবশ্য তখন সুনীল'দার একটু সিগারেটের নেশাও পেয়েছিল এবং সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতেই আমি ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লন্ডন ইউনিভার্সিটির করিডোরের সোফায় বসে আড্ডা দেই কিংবা ছোট্ট একটি সাক্ষাৎকারও হতে পারে।

মোহাম্মদ হোসেন ঃ আচ্ছা সুনীল'দা কেমন আছেন?

সুঃ গঙ্গো ঃ ভালই আছি ভাই।

মোহাম্মদ হোসেন ঃ মানুষ কিভাবে ভাল থাকে?

সুঃ গঙ্গো ঃ অন্যালোকদের সাথে কথা বলে যখন আনন্দ পাওয়া যায় তখনই ভাল।

মোঃ হোসেন ঃ কিন্তু ধরেন আপনার স্বাস্থ্য রোজগার সব ভাল অথচ লিখতে পারছেন না, তখন?

সুঃ গঙ্গো ঃ লিখতে না পারলে মন ভাল থাকে না, তখন আমি করি কি, কেবল ঘুরে বেড়াই।

মোঃ হোসেন ঃ তার মানে লিখতে পারছেন না বলেই লন্ডন এসেছেন?

সুঃ গঙ্গো ঃ হ্যাঁ ধরতে পারো, তাছাড়া অনুষ্ঠানে যোগ দিতেও এসেছি।

মোঃ হোসেন ঃ আচ্ছা আপনার পেশাতো লেখালেখিই, এছাড়াও অন্যকিছু কি করছেন?

সুঃ গঙ্গো ঃ হ্যাঁ খানিকটা সমাজসেবায় ব্যস্ত আছি। 'আত্মীয়সভা' বলে একটি সংগঠনের আমি

সভাপতি যে সংগঠন দুস্থ শিল্পী, সাহিত্যিকদের সেবা করে।

মোহাম্মদ হোসেন ঃ কি রকম সেবা?

সুঃ গঙ্গো ঃ যেমন ধরো অনেক শিল্পী সাহিত্যিক টাকা পয়সার অভাবে চিকিৎসা করতে পারে না। আমরা যদি এরকম কোন লেখক শিল্পীর কথা শুনি তাহলে তাকে গোপনে কিছু টাকা দিয়ে আসি।

মোঃ হোসেন ঃ গোপনে কেন?

সুঃ গঙ্গো ঃ এটা প্রচারের বিষয় নয় বলেই।

মোঃ হোসেন ঃ আচ্ছা আপনার সব'চে ভাল অথবা প্রিয় লেখা কোনটা?

সুঃ গঙ্গো ঃ কোনটাই না।

মোঃ হোসেন ঃ ভাল লেখার সংজ্ঞা দিতে পারেন?

সুঃ গঙ্গো ঃ যেমন ধরো কবিতা, কবিতা কিছুতেই বুঝানো যায় না কোনটা ভাল কোনটা খারাপ, সেটা পাঠকের অভিজ্ঞতা দিয়ে যাচাই করতে হয়। যত ভাল কবিতা তুমি পড়েছো, তার সাথে যদি এটা মিলে যায় তাহলে এটাও ভাল।

মোঃ হোসেন ঃ যেমন আপনার কেউ কথা রাখেনি কবিতাটি খুব জনপ্রিয়, এটা কি ভাল কবিতা?

সুঃ গঙ্গো ঃ কবিতাটি খুব তাড়া হুড়ো করে লেখা। লিখেছিলাম মাত্র পনের কুড়ি মিনিটে। এখন দেখছি সবাই এটাই পড়ে, ভাল কিনা জানি না।

মোঃ হোসেন ঃ আপনিতো খুব জনপ্রিয় লেখক, সে অর্থে কি ভাল?

সুঃ গঙ্গো ঃ জনপ্রিয় নাকি আমি? তবে আমার সব সময় মনে হয় যেরকম লেখা উচিত তেমনটি আমি পারছি না, চেষ্টা করে যাচ্ছি।

মোঃ হোসেন ঃ স্ত্রীর চোখে আপনি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কেমন লেখক?

সুঃ গঙ্গো ঃ ওতো কড়া সমালোচক। যে কোন লেখা বেরুলেই বলবে, আরো মন দিয়ে লেখা উচিত ছিল। ভাল লেখা উচিত ছিল।

মোঃ হোসেন ঃ আপনার প্রথম লেখা কোনটা?

সুঃ গঙ্গো ঃ সেটা একটা কবিতা, পনের/ষোল বছর বয়সে লিখেছিলাম, একটা মেয়ের প্রেমে পড়ে একটা চিঠি আর কি। সে বিষয়ে এখন 'দেশ' পত্রিকায় লিখছি, স্মৃতি স্মৃতিকথা।

মোঃ হোসেন ঃ লেখালেখিতে এলেন কেন?

সুঃ গঙ্গো ঃ আর কিছু পারি নাতো। না হতে পারলাম খেলোয়াড়, না গায়ক, না চিত্রশিল্পী; টুকটাক লিখতে পারি তাই তো এ লাইনে।

মোঃ হোসেন ঃ আপনার প্রিয় লেখক কে?

সুঃ গঙ্গো ঃ অনেকেই। যেমন ছোট বেলায় আমরা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে খুব বিদ্রুপ করতাম, বলতাম রবীন্দ্রনাথ পড়ার দরকার কি। কারণ রবীন্দ্র ভক্তরা এমন একটা আবহ সৃষ্টি করছিল যে, আমরা খুব জ্বালাতন বোধ করতাম। তারা বলতো নতুন লেখার দরকার নেই তাই রাগ করে আমরা এমনটা করতাম। আমার প্রিয় লেখক অনেকেই যেমন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্ত, জীবনানন্দ, মানিক, সতীনাথ ভাদুড়ী, সৈয়দ ওয়ালি উল্লাহ।

মোঃ হোসেন ঃ আপনার প্রিয় মানুষ?

সুঃ গঙ্গো ঃ এ মুহূর্তে তুমি।

মোঃ হোসেন ঃ আপনার প্রিয় ভাষাতো বাংলা অথচ কলকাতার ছেলেমেয়েরাই এখন বাংলা ভুলে যাচ্ছে, কোন উদ্যোগ নিয়েছেন কি?

সুঃ গঙ্গো ঃ আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। আশা করি তোমরাই (বাংলাদেশের মানুষেরা) বাংলাকে টিকিয়ে রাখবে।

মোঃ হোসেন ঃ সত্যজিৎ রায় আপনার লেখা অবলম্বনে দু'টো বাংলা ছবি করেছেন, অরণ্যের দিনরাত্রি ও প্রতিদ্বন্দ্বী, যতটুকু শোনা যায়, আপনি নাকি ওই ছবি দুটোর বিষয়ে সন্তুষ্ট নন। কেন?

সুঃ গঙ্গো ঃ দেখো সিনেমাতো অন্য একটা শিল্প। একটুখানি বদলে গেলে মন খারাপ হয়। নিজের সৃষ্টি যখন চলচ্চিত্রে গিয়ে একটু অন্যরকম হয়ে গেল তখন মন খারাপ হওয়াই স্বাভাবিক। তবে ছবি দু'টো যখন লেখকসত্তা নিয়ে দেখেছি তখন খারাপ লেগেছে আবার যখন চলচ্চিত্রের দর্শক হিসাবে দেখেছি তখন ভালই লেগেছে।

মোঃ হোসেন ঃ তো সত্যজিৎ এর সৃষ্টি আপনার ভাল লাগলো না অথচ মেধাহীন লেখক তসলিমা নাসরীনকে নিয়ে আপনারা খুব হৈ চৈ করলেন, কেন?

সুঃ গঙ্গো ঃ জানতাম তুমি এ প্রশ্নটা আমাকে করবে। তসলিমা নাসরীনের প্রথম যে আগমনটা তা অভিনন্দন জানানোর মতই, কারণ সে একটি মেয়ে হয়ে অনেক সাহস দেখিয়েছে, সমাজের অনেক দূষিত ব্যাপার সে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে এবং তার কিছু কিছু কবিতাও বেশ ভাল. কলামগুলোও ভাল তবে তার গল্প উপন্যাস ভাল না।

মোঃ হোসেন ঃ লজ্জা?

সুঃ গঙ্গো ঃ ওটা নিয়ে হৈ চৈ হযেছে, তবে তার 'নির্বাচিত কলাম' ভাল।

মোঃ হোসেন ঃ 'স্যাটানিক ভার্সেস' নিশ্চয় পড়েছেন, সালমান রুশদী কেমন লেখক?

সুঃ গঙ্গো ঃ ও হচ্ছে আস্ত একটা মূর্খ লেখক। কোন কিছু না জেনে তার সম্পর্কে লেখা তো মূর্খতা-ই, কি বলো? তবে তার লেখার ক্ষমতা আছে।

মোঃ হোসেন ঃ ভারতের প্রকাশনী সংস্থা বাংলাদেশে বইয়ের বাজার দখল করতে চায়. এ নিয়ে ঢাকায় হৈ চৈও হচ্ছে, এ ব্যাপারে আপনার কোন বক্তব্য আছে নাকি?

সুঃ গঙ্গো ঃ যেমন বাংলাদেশের লোকেরা আমাদের বই পড়ে, অটোগ্রাফ নেয় এবং তাতে আমাদের খুব ভাল লাগে কিন্তু বইবাবদ আমরা কোন পয়সাই পাইনা। কারণ আমাদের সমস্ত বই জাল হচ্ছে। তাতে ভারতের প্রকাশকদের ক্ষতি হচ্ছে কারণ বই বের করছে ওরা, পয়সা কামাচ্ছে বাংলাদেশের প্রকাশকেরা এবং সেজন্য আমাদের প্রকাশকেরা চেয়েছিল ঢাকার প্রকাশকদের সাথে যৌথভাবে বই প্রকাশ করতে যাতে সকলেরই লাভ হয়।

মোঃ হোসেন ঃ কিন্তু কাজটা কি এরকমও হতে পারে না, ভারতের প্রকাশকেরা ঢাকার প্রকাশকদের সাথে যৌথভাবে বাংলাদেশী লেখকদের বই প্রকাশ করতে?

সুঃ গঙ্গো ঃ এখনতো হতে বাধ্য। যেমন 'গ্যাট' চুক্তি হবার পর সব ওপেন. ঢাকার লোকেরা এসে কলকাতায় হোটেল খুলছে।

মোঃ হোসেন ঃ আরেকটা কথা. আপনারা মানে কলকাতার লেখকেরা যখন বাংলাদেশে আসেন তখন আপনাদেরকে দারুন ভাবে অভ্যর্থনা জানানো হয় অথচ বাংলাদেশের লেখকেরা যখন কলকাতা বইমেলায় গেলো, কেউ একটু খোঁজও নিলনা, বিষয়টি কেমন হলো?

সুঃ গঙ্গো ঃ মেলা কমিটির অব্যবস্থার কারণে হতে পারে তবে পশ্চিমবাংলার মানুষের খাতির করার যে মনোভাব ছিলনা তা নয়, বাংলাদেশের লোকেরা এখানে এলে মানুষজন খুশি হয়। তবে বাংলাদেশের লোকেরা যেভাবে দশ/বার রকমের পদ দিয়ে আপ্যায়ন করায়, এখানকার লোকেরা তা নয়, বড়জোর ২/৩ পদ।

মোঃ হোসেন ঃ অভিযোগ আছে পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশের লেখকদের লেখা ছাপা হয় না অথচ বাংলাদেশে ওদের লেখা ছাপা হচ্ছে। এটা কেন হচ্ছে।

সুঃ গঙ্গো ঃ কই ছাপা হচ্ছে তো 'দেশ' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় গত তিন বছর ধরে হুমায়ূন আহমদ, মিলন ওদের লেখা বেরুচ্ছে।

মোঃ হোসেন ঃ ওরা তো জনপ্রিয় কিন্তু জনপ্রিয় নন অথচ মেধাবী তাদের লেখা ছাপা হয়না।

সুঃ গঙ্গো ঃ দেখো বাংলাদেশেও যেসব লেখকের (পশ্চিমবঙ্গের) লেখা ছাপা হয় তারাও হাতে গোনা এবং জনপ্রিয়। অপরিচিত মেধাবী লেখকের (পশ্চিমবঙ্গের) লেখা বাংলাদেশেও ছাপা হচ্ছে না। নাম হলে সবাই ছাপে!

মোঃ হোসেন ঃ অনেকে বলেন ঢাকাতেই এখন সৃজনশীল কিংবা মূলধারার চর্চা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে নয়, মন্তব্য করুন।

সুঃ গঙ্গো ঃ কথাটা আমি এ মুহূর্তে মানতে রাজী নই তবে আমার বিশ্বাস, পনের, কুড়ি বছর পর ঢাকা-ই হয়ে যাবে বাংলা সাহিত্য চর্চার প্রধান কিংবা একমাত্র স্থান।

মোঃ হোসেন ঃ দেখুন বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবাংলার ভাষা এক এবং সংস্কৃতি, কৃষ্টিও কাছাকাছি। তবুও আমরা আলাদা, কেউ কেউ এমনও স্বপ্ন দেখে যে, আমরা এক হয়ে গেছি। আপনার এরকম কোন স্বপ্ন?

সুঃ গঙ্গো ঃ দেখো এটাতো রাজনৈতিক বিভাজন। আর এই বিভাজনটা অন্যেরা চাপিয়ে দিয়েছিল, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক চাপে নিজের দোষে, ধর্মীয় কারণে আমরা ভাগ হয়েছি। আমি মনে করি আপাতত মিলনের কোন সম্ভাবনা নেই, ভবিষ্যতে কি হবে জানিনা।

মোঃ হোসেন ঃ বাংলাদেশের বর্তমান সাহিত্য চর্চার মান সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

সুঃ গঙ্গো ঃ বাংলাদেশের গল্প উপন্যাসটা তুলনামূলক ভাবে দুর্বল তবে কবিতা, প্রবন্ধ ভাল। অবশ্য এখন কিছু কিছু ভাল গল্প উপন্যাস বেরুচ্ছে।

মোঃ হোসেন ঃ আপনার এ মুহূর্তের স্বপ্ন কি?

সুঃ গঙ্গো ঃ স্বপ্নের শেষ নেই। তবে এখনকার স্বপ্ন পরবর্তী প্রজন্মকে অগ্রসর দেখা যাতে ওরা সুন্দর একটি বিশ্ব গড়তে পারে।

মোঃ হোসেন ঃ কোন রাজনৈতিক দলে বিশ্বাস করেন?

সুঃ গঙ্গো ঃ কোন রাজনীতিতে বিশ্বাস করিনা, পর্যবেক্ষণ করি এবং আমার মতে কোন লেখক শিল্পীরই দলভুক্ত হওয়া উচিত নয়।

মোঃ হোসেন ঃ কিন্তু আমাদের এখানে দেখা যায় লেখক, শিল্পীদের কোন না কোন দলের লেজুড়বৃত্তি করতে।

সুঃ গঙ্গো ঃ ওই করেই তো সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হলো। সরকার বুদ্ধিজীবীদের ভয় পায় না। কিনে নেয়, এটা সেটা দেয়।

মোঃ হোসেন ঃ অনেকে মনে করেন নবেল পুরস্কার পাওয়ার মতো লেখক বাংলা সাহিত্যেও আছেন কিন্তু আমাদের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে কি?

সুঃ গঙ্গো ঃ বাংলা ভাষায় অন্ততঃ চার জন আছেন যারা নবেল পাওয়ার যোগ্যতা রাখেন কিন্তু বাংলা ভাষাটা এতটা পরিচিত নয় তাছাড়াও নবেল এখন রাজনৈতিক পুরস্কার হয়ে গেছে, দেশ ধরে ধরে দেয়। যেমন এ বছর পর্তুগাল পরের বছর চীন।

মোঃ হোসেন ঃ যেমন এ বছর চীনের গাও পেয়েছেন যিনি নিজেকে চিত্রশিল্পী হিসাবে পরিচয় দেন। লেখক হিসাবে নয় অথচ তিনিই কিনা সাহিত্যে নবেল পেলেন।

সুঃ গঙ্গো ঃ হ্যাঁ ইটালীর দাড়িয়ে ফোঁ তো নাট্যকার অথচ তাকেই সাহিত্য পুরস্কার দেয়া হয়েছে। তিনি নিজেই প্রশ্ন করেছেন, আমি তো অভিনেতা আমাকে এটা দেয়া হচ্ছে কেন?

মোঃ হোসেন ঃ আচ্ছা দাদা, আপনার মধ্যে এমন কোন ঘটনা আছে কি যা আপনাকে প্রতিনিয়ত পোড়ায় অথচ বলতে পারছেন না।

সুঃ গঙ্গো ঃ শোন, যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন দেশ ভাগের ক্ষতটা যাবে না এটাই আমার কষ্ট।

মোঃ হোসেন ঃ হ্যাঁ আপনার পূর্ব পশ্চিম পড়লেই বুঝা যায়, দুঃখটা কোথায়?

সুঃ গঙ্গো ঃ হ্যাঁ।

মোঃ হোসেন ঃ আচ্ছা, সুনীলদা মৃত্যুকে তো সবাই বিশ্বাস করে, কি রকম মৃত্যু চান।

সুঃ গঙ্গো ঃ খুব অল্প সময়ের মধ্যে মরতে চাই, জ্বালা যন্ত্রণা চাই না।

মোঃ হোসেন ঃ পরকালে বিশ্বাস করেন?

সুঃ গঙ্গো ঃ না, ঈশ্বরকেও বিশ্বাস করি না, স্বর্গ নরক এবং ধর্মটর্মেও আমার বিশ্বাস নেই।

মোঃ হোসেন ঃ লিটিল ম্যাগাজিন বিষয়ে কিছু বলুন।

সুঃ গঙ্গো ঃ ওটা হচ্ছে পুরো বাঙালি ব্যাপার। ঢাকা ও পশ্চিমবঙ্গে এতো বেশি পত্র পত্রিকা বের হয় যে, অন্য ভাষার লোকেরা শুনলে হা হয়ে যায়। তবে নতুন লেখক সৃষ্টিতে এটার দরকার আছে। আমি নিজেই তো লিটিল ম্যাগাজিন থেকে উঠে এসেছি।

মোঃ হোসেন ঃ আচ্ছা আপনি যে এ পর্যন্ত উঠে এসেছেন তার রহস্য কি?

সুঃ গঙ্গো ঃ রহস্য কিছুই না 'চেষ্টা'।

মোঃ হোসেন ঃ আচ্ছা সুনীলদা একটু চেষ্টা করুন তো নিজের সম্পর্কে বলতে। অর্থাৎ আপনি ঘরে কেমন, বাইরে কেমন।

সুঃ গঙ্গো ঃ (হেসে) মানুষ কখন যে, কিভাবে থাকে সে তা নিজে সব সময় বুঝতে পারে না। সে জন্যই আমি যে স্মৃতিকথাটা লিখছি তার নাম দিয়েছি 'অর্ধেক জীবন' কারণ বাকী জীবনটা আমি নিজেই জানিনা।

মোঃ হোসেন ঃ তবে আপনি কি এটা জানেন, আপনার সবচে বড় দোষ কোনটা?

সুঃ গঙ্গো ঃ দোষ তো অনেক। তবে প্রধান দোষ হচ্ছে হঠাৎ করে কারো সাথে মিশতে পারি না।

মোঃ হোসেন ঃ আর বড় গুণ?

সুঃ গঙ্গো ঃ তাতো জানি না।

মোঃ হোসেন ঃ লিখতে পারা?

সুঃ গঙ্গো ঃ না, না লেখক হওয়া বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে মানুষ হওয়া।

মোঃ হোসেন ঃ আচ্ছা আপনি কোন পরিচয়ে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন কবি, ঔপন্যাসিক, সাংবাদিক?

সুঃ গঙ্গো ঃ যখন আমি একা থাকি তখন আমি নিজেকে কবি মনে করি, আর লোকজনের মাঝখানে যখন থাকি তখন সবাই ঔপন্যাসিক হিসাবে পরিচয় করিয়ে দেয় আর সাংবাদিক আমি কখনোই ছিলাম না। সংবাদপত্রে লিখেছি।

মোঃ হোসেন ঃ তো এখন কি লিখছেন?

সুঃ গঙ্গো ঃ ওই যে বললাম স্মৃতিকথা লিখছি। তবে পুজো সংখ্যায় একটা মজার লেখা লিখেছি, তা হলো রবীন্দ্রনাথের জীবনের অজ্ঞাত এক প্রেম কাহিনী, যেটি আমি আবিষ্কার করেছি। লেখাটার শিরোনাম 'রানু ও ভানু' ভানু হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের একটা নাম এবং রানু একটা মেয়ের নাম, ওদেরই প্রেম কাহিনী।

মোঃ হোসেন ঃ নতুন লেখকদের প্রতি আপনার কোন পরামর্শ?

সুঃ গঙ্গো ঃ আরো নতুনদের উপরই তো ভরসা, আমরা তো শেষ, চেষ্টা করো, চেষ্টা।

মোঃ হোসেন ঃ আমার শেষ প্রশ্ন আপনি নিজেকে কোন মাপের লেখক মনে করেন?

সুঃ গঙ্গো ঃ লিখেছি অনেক কিন্তু সার্থকতা অর্জন করতে পারি নাই।

মোঃ হোসেন ঃ কিন্তু আপনি বাংলাদেশে গেলে তো ভক্তদের লাইন পড়ে যায়।

সুঃ গঙ্গো ঃ ওটা হচ্ছে ভালবাসা।

মোঃ হোসেন ঃ কিন্তু আপনি লেখালেখি না করলে এই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে চিনতো কে?

সুঃ গঙ্গো ঃ এটা ঠিক এবং মানুষের ভালবাসা পেয়েই বেঁচে আছি এবং এটাই বড় পুরস্কার।

মোঃ হোসেন ঃ আপনি ভাল থাকুন সুনীলদা, অনেক ধন্যবাদ।

সুঃ গঙ্গো ঃ তোমরাও খুব ভাল থেকো দেখা হবে।

অতঃপর আমাদের কথোপকথন যখন শেষ হলো দেখলাম ঠিক তখন কাকতালীয়ভাবে আলোচনা সভারও বিরতি হয়েছে। সবাই চা খাবার জন্য কেন্টিনের দিকে ছুটছে। তখন আমার সফরসঙ্গী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র নেতা ইমানুজ্জামান মহি ও অভিনেতা মৃদুল তাড়া দিল ট্রেন ধরার জন্য কারণ ছ'টার আগেই আমাদের বাড়ি ফিরতে হবে। অতঃপর অনিচ্ছাস্বত্ত্বেও ট্রেনে চেপে বসলাম এবং মাঝপথে আমার সঙ্গীদ্বয় নেমে পড়লো আর আমার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নেমে এলেন। আমি ভাবতে থাকলাম রবীন্দ্রনাথ কত বড়, তার সৃষ্টি নিয়ে পৃথিবীব্যাপী গবেষণা হচ্ছে, এক ইংরেজ তার সাথে সেক্সপিয়ারের যোগসূত্র খুঁজে বেড়ান, ল্যাটভিয়ার অধ্যাপক ভিকটরস তাকে আবিষ্কার করেন বিশ্বসাহিত্যের আদর্শিক লেখক হিসাবে এরকম কত কিছু। এবং এরকম অনেক কিছু ভাবতে ভাবতেই এক সময় খেয়াল করলাম ট্রেন আমার গন্তব্য ফেলে অনেক দূরে চলে এসেছে এদিকে কাজের সময়ও হয়ে গেছে। অবশেষে কি আর করা টেক্সি করে কাজে আসতে হলো আঠার পাউন্ড বেশি দিয়ে, (বাংলাদেশী টাকায় প্রায় দেড় হাজার টাকা)। এটা আমার জরিমানা। আসতে আসতে মহিলা টেক্সিচালককে বলছিলাম, এই পেনাল্টি রবীন্দ্রনাথ আর সুনীলের জন্য। বোকা মহিলা কিছু না বুঝেই হেসে বল্লেন—ইজ ইট! তখন লন্ডনের রাস্তায় রাত নামতে শুরু করেছে।

৮

আবুল বাশার

প্রঃ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পর কাকে আপনি জনপ্রিয় বাঙালী বলে মনে করেন? সত্যজিৎ রায় না জ্যোতি বসু?

উঃ সত্যজিৎ রায়কেই আমি জনপ্রিয় বাঙালী বলে মনে করি।

প্রঃ কেন?

উঃ জনপ্রিয় কথাটার মধ্যে লুকিয়ে আছে প্রিয় এই শব্দটি, তাই প্রিয় অর্থে সত্যজিৎ নিশ্চয়ই জনপ্রিয়, তিনি আমার প্রিয়—আমাদের সকলের প্রিয়।

প্রঃ জ্যোতি বসু কি আমাদের প্রিয় নন?

উঃ জ্যোতি বসুকে আমি ভক্তি শ্রদ্ধা করি কিন্তু দূর থেকে। ওনাকে দূর থেকে ভক্তি শ্রদ্ধা করা যায় কিন্তু কখনই কাছের লোক হিসাবে ভাবা যায় না। কিন্তু প্রিয় ব্যক্তি তো তিনিই—যাঁকে খুব কাছের লোক হিসাবে ভাবা যায়। সত্যজিৎকে সব সময়েই কাছের লোক হিসাবেই মনে হয়।

প্রঃ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জনপ্রিয়তার কারণ শুধুমাত্র তাঁর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিল না, ডাক্তার হিসাবেও তিনি কিংবদন্তী ছিলেন। এই দুই মিলেই তিনি জনপ্রিয়। আপনার কি মনে হয় যে জ্যোতি বসু শুধুমাত্র রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বলেই তাঁর জনপ্রিয়তা কম?

উঃ এখানে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার যে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আমার মতে জনপ্রিয় ছিলেন না। তবে একথা মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে শুধুমাত্র রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হবার জন্যই জ্যোতি বসুকে ঠিক সেভাবে জনপ্রিয় বলা যায় না।

প্রঃ অর্থাৎ শুধুমাত্র রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থাকলে তাঁকে জনপ্রিয় বলা যায় না।

উঃ সাধারণ ভাবে এর উত্তর দেওয়া যায় না। শুধুমাত্র রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থাকলেই যে তিনি জনপ্রিয় হন না একথা ঠিক নয়, আবার যে জনপ্রিয় হবেনই একথাও ঠিক নয়।

প্রঃ চলচ্চিত্র নির্মাতা সত্যজিৎ লেখক শিল্পী সত্যজিতের একই ব্যক্তির এতগুলো গুণই কি তাকে এতো জনপ্রিয় করেছে বলে আপনার মনে হয়?

উঃ হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয়ই। একজনের মধ্যে এতগুলো শিল্পীসত্তার সমাবেশই সত্যিই আশ্চর্যজনক। কিন্তু এর থেকেও আমার মনে হয় যে ব্যক্তি হিসাবে সত্যজিৎ অনেক বড়। আসলে আমরা বড় মাপের মানুষ বলতে যা বুঝি সত্যজিৎ তাই।

প্রঃ জনপ্রিয়তার আর একটি দিক আছে। যেমন জীবিত অবস্থায় একজন যতোটা জনপ্রিয়তা অর্জন করেন মৃত্যুর পর তাঁর সেই জনপ্রিয়তা থাকে না। এক্ষেত্রে আপনি কি মনে করেন। শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জনপ্রিয় ব্যক্তি রাজনীতির ক্ষেত্রে জনপ্রিয় ব্যক্তির চেয়ে অনেক বেশী স্মরণীয় হন? অর্থাৎ শিল্প বা সংস্কৃতির শিকড় কি রাজনীতির শিকড়ের চেয়ে অনেক বেশীদূর ছড়ায়?

উঃ সব সময়ই যে তা হয় সে কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে

তা হয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। শিল্প বা সংস্কৃতি জগতের লোককে মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী মনে রাখে।

প্রঃ বর্তমানে জনপ্রিয় বাঙালীদের মধ্যে আমি সত্যজিৎ রায় আর জ্যোতি বসুর তুলনা করেছি। আপনি কি অন্য কোন নাম বলতে পারেন জনপ্রিয়তার নিরিখে যাঁকে এঁদের সঙ্গে তুলনা করা যায়?

উঃ না অন্য কারও নাম উল্লেখ করা যায় না। আমার মতে সত্যজিৎ রায়ই বর্তমানে শ্রেষ্ঠ ভারতীয় শুধুমাত্র শ্রেষ্ঠ বাঙালী নন।

ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পর আপনি কাকে জনপ্রিয় বাঙালী বলে মনে করেন—সত্যজিৎ রায় না জ্যোতি বসু?

উঃ সত্যজিৎ রায়।

প্রঃ আপনি সত্যজিৎকে জনপ্রিয় মনে করেন—জ্যোতি বসুকে নয় কেন?

উঃ জনপ্রিয়তার প্রশ্ন আসে ব্যক্তিত্বের কারণে নিঃসন্দেহে জ্যোতি বসু একটি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তাঁর নিজস্ব রাষ্ট্রপরিচালনার যে কৌশল প্রশাসক হিসেবে সেটা হয়তো মান্য করার মতোই। কিন্তু তিনি যে রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী তার রূপায়ণের ক্ষেত্রে এই প্রশাসক এবং তাঁর রাজনৈতিক সত্তার একটা বিরোধ দেখতে পাই। এই বিরোধের ফলে তার জনপ্রিয়তাকে ব্যাখ্যা করা রীতিমতো একটা শক্ত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সময় যে ধরনের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আমরা পেয়েছি যেমন নেতাজী বা মহাত্মা গান্ধী—তাঁদের মধ্যে এই বিরোধ ছিল না অর্থাৎ এই প্রশাসনিক সত্তার সঙ্গে রাজনৈতিক সত্তার বিরোধ—এটা ছিল না। তাদেরকে আমরা তাঁদের আদর্শের রূপকার হিসাবে শ্রদ্ধা করেছি এবং সেইভাবেই তাঁরা জনপ্রিয় হয়েছেন। সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে জ্যোতি বসুর জনপ্রিয়তা বিতর্কিত।

সত্যজিৎ রায়ের জনপ্রিয়তার কারণ এক জন পুরোপুরি শিল্পীর জনপ্রিয়তা। জনপ্রিয় হিসাবে তাঁকে দেখার ক্ষেত্রে জ্যোতি বসুর মত কোন বিরোধ নেই। তাঁর নির্মাণ এবং সৃষ্টি নিয়ে বিরোধ রয়েছে ঠিকই কিন্তু তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর ক্ষেত্রে কারুরই চূড়ান্ত অসুবিধা হয় না। এটা আমার ধারণা।

৯

প্রণব হোড়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যখন কবিতা লেখেন তখন তিনি রূপসম্ভোগের কবি, যখন কাহিনী লেখেন তখন জীবনের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ একজন লেখক—কখনো বা যৌবনের দুরন্ত প্রতিচ্ছায়া। সহজ সরল ভঙ্গিমায় গদ্যে ও পদ্যে সুনীলের লেখনী অনবরত এঁকে চলে মহাপৃথিবীর আলোকচিত্র। বহু কবিতা প্রেমিকের কাছে সুনীল তাই—"আমার প্রিয় কবি।" পাঠকের কাছে—"আমার প্রিয় লেখক।" আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভাষা ও বর্ণনা সৃষ্টিতে সুনীল সত্যি এক মহান রূপকার। কিন্তু সেখানেই সব নয়। কবি ও লেখক সত্তাকে সুনীলের ভিতর থেকে সরিয়ে নিলে আর এক সুনীলকে পাওয়া যায়—তিনি সদ্যজাত অথচ পরিপক্ক নাট্যকার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। আর তাঁকেও সরিয়ে নিলে পাওয়া যাবে অভিনেতা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে। আবার যখন এই মানুষকেই দেখা গেছে ক্যাপস্টান সিগারেটের বিজ্ঞাপনের পোস্টারে। তখন প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ব্যক্তিত্বপূর্ণ ও পৌরুষদীপ্ত দিকটা। সব মিলিয়ে সুনীল এক অসাধারণ প্রতিভা। আর সুনীলের সেই বহুমুখী প্রতিভা সুনীল আকাশের মতনই ব্যাপ্তময়।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে প্রশ্ন—আপনার লেখা নাটক 'প্রাণের প্রহরী' গত ২৪শে জানুয়ারী, ৮৬-তে রবীন্দ্র সদন মঞ্চে অনুষ্ঠিত হলো। আপনি নাটকটির প্রধান চরিত্র ডাঃ ঋষি লাহিড়ীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই 'প্রাণের প্রহরী' কি আপনার লেখা প্রথম নাটক?

সুনীল — হ্যাঁ। এটা আমার সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক। এর আগে এই কাহিনীর থিমকে কাব্যনাট্যের রূপ দিয়েছিলাম। কিন্তু নাটক প্রথম এটিই।

প্রঃ অভিনয়েও কি আপনি এই প্রথম?

উঃ না না। কলেজ জীবনে অভিনয় করেছি। সেই সময় আমাদের সাথে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ছিল। আমাদের চাইতে সৌমিত্র এক বছরের জুনিয়র ছিল। তারপর চুয়ান্ন-পঞ্চান্ন সালে কমলকুমার মজুমদার 'হরবোলা দল' নামে যে নাটকের দল গড়েছিলেন তাতেও আমি যুক্ত ছিলাম। আমাদের সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। সে সময় দুটি নাটক আমরা করেছিলাম। রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' ও সুকুমার রায়ের 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল।' মুক্তধারাতে আমি বিভূতির চরিত্রে অভিনয় করেছি। আর লক্ষ্মণের শক্তিশেলে জাম্বুমানের ভূমিকায়।

তখন আমরা অবশ্য নাটক নিজেরাই মঞ্চ বানিয়ে করেছি। সিগনেট প্রেসের বাড়ীতেই বেঁধেছিলাম সেই মঞ্চ।

প্রঃ ডাঃ ঋষি লাহিড়ী আপনার অঙ্কিত চরিত্র, মঞ্চে সেই চরিত্রে অভিনয় করেছেন আপনি। অর্থাৎ সৃষ্টির ভিতর স্রষ্টা যখন একাত্মা তখন নিশ্চয় অনবদ্য হয়ে উঠেছিল আপনার অভিনয়!

উঃ মনে হয় না। অভিনয় ভীষণ কঠিন ব্যাপার। নাটকটা লিখবার সময় আমি এই চরিত্রে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কল্পনা করেছিলাম। আসলে যে অভিনেতা—তাকে সবসময় মনে রাখতে হবে 'আমি

অভিনয় করছি।' কিন্তু আমার ক্ষেত্রে তা পারিনি। মঞ্চে উঠে আমার মনেই ছিল না আমি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। কেবল মনে হচ্ছিল আমি ডাঃ ঋষি লাহিড়ী। চরিত্রটি তাই ফোটাতে পারিনি বলে আমার ধারণা।

প্রঃ যদি 'প্রাণের প্রহরী' নাটকটিকে বাংলা বা হিন্দিতে চলচ্চিত্রায়িত করা হয় তাহলে ডাঃ ঋষির ভূমিকায় কাকে আপনার উপযুক্ত মনে হবে?

উঃ বাংলায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। হিন্দীতে নাসিরুদ্দিন শাহ।

প্রঃ কবিতা, কাহিনী, অভিনয় এই তিনের ভিতর কোন মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছানো অধিকতর সহজ মনে হয় আপনার?

উঃ অভিনয় প্রথম। বিশেষ করে ফিল্ম, টি, ভি'র মাধ্যমে সর্বস্তরে তা পৌঁছাতে পারে।

প্রঃ কোন ফিল্মে অভিনয় করেছেন কি?

উঃ করিনি বললে ভুল হবে। পূর্ণেন্দু পত্রী'র 'ছেঁড়া তমসুক' ছবিতে আমি এক কবিতা পাঠের আসরের দৃশ্যে ছিলাম। স্বনামেই কবিতা পাঠ করেছিলাম সেখানে।

প্রঃ বহু ঘরোয়া আসরে আপনি নিজের কবিতায় সুর দিয়ে গান গেয়েছেন। এই সুর দেওয়ার ব্যাপারটা আপনি কি ভাবে করেন?

উঃ সুরটা মন থেকেই বেরিয়ে আসে। কোন মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের সাহায্যে নয়। ছোটবেলায় একবার তবলা শিখতে গিয়েছিলাম। তবে বেশীদূর এগোন হয়নি। বাঁশি বাজানো শিখতে গিয়েছিলাম, বাড়ীতে বড়রা আপত্তি করেছেন! সেসময় মনে করা হতো বাঁশি বাজালেই টি. বি, হয়। এখন গান বাজনা ভালোবাসি এই পর্যন্ত।

প্রঃ 'প্রাণের প্রহরী'র পর আরো নাটক লেখার ইচ্ছা আশাকরি আছে।

উঃ হ্যাঁ। এই তো শারদীয় আনন্দলোকে আমার আর একটি নাটক প্রকাশিত হলো, 'রাজাবাণী' নামে। ভবিষ্যতে আরো নাটক লেখার ইচ্ছা আছে। আমি নাটক লিখতে চাই বাস্তব আর প্রতীকতা মিশিয়ে।

প্রঃ আপনি কি চিত্রনাট্যও লিখেছেন?

উঃ তাও কয়েকটা লিখেছি। গরম ভাত ও ভূতের গল্প অবলম্বনে 'শোধ', 'মহা পৃথিবী', 'রাধাকৃষ্ণ' এই তিনটি চিত্রনাট্য লিখেছি। তিনটিরই পরিচালক বিপ্লব রায়চৌধুরী। আর একটি চিত্রনাট্য লিখে আমি বি. এফ. জি. এ থেকে শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য লেখার পুরস্কার পেয়েছি, সেটি হচ্ছে 'বারবধূ', তার পরিচালক ছিলেন বিজয় চট্টোপাধ্যায়।

প্রঃ আপনার প্রিয় চিত্রাভিনেতা, চিত্রাভিনেত্রী এবং চিত্র পরিচালক কে কে?

উঃ বাংলার সৌমিত্র, অপর্ণা। বোম্বের নাসিরুদ্দিন, কুলভূষণ, শাবানা, স্মিতা। আর চিত্র পরিচালকদের ভিতর বাংলায় সত্যজিৎ থেকে গৌতম ঘোষ। বম্বেতে গোবিন্দ নিহালনী, রবীন্দ্র ধর্মরাজ, মণি কাউল।

প্রঃ 'প্রাণের প্রহরী' কি বিদেশ থেকে আমন্ত্রণ পেয়েছে?

উঃ আমেরিকা, ফ্রান্স থেকে 'বুধসন্ধ্যা'কে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। কিন্তু আমরা যেতে পারছি না। আসলে আমরা যাঁরা এতে অভিনয় করছি তাঁরা সকলেই এত ব্যস্ত যে এক সাথে কাজ থেকে ছুটি নিতে পারছি না।

প্রঃ কিছুদিন আগে ক্যাপস্টান সিগারেটের বিজ্ঞাপনে আপনাকে দেখা গেছে মডেল হিসাবে—

উঃ হ্যাঁ হ্যাঁ। কিন্তু সে জন্য ভেবো না আমি প্রচুর টাকা পয়সা পেয়েছি। ওরা বললো— সুনীলদা আপনার ফটো ব্যবহার করলে ক্যাপস্টান ভালো সেল হবে। তাই দিয়েছিলাম অনুমতি। কিন্তু সত্যি আমি খুব অন্যায় করেছি কারণ আমি ক্যাপস্টান খাই না। এই দেখো না টেবিলের উপর চার্মসের প্যাকেট—আমি চার্মস খাই।

১০

কোনও লেখক সম্পর্কে জানতে গেলে দুটো জিনিষ সবার আগে জানতে হয়; হাউ হি লিভস অ্যাণ্ড হাউ হি লাভস্। কেমন ভাবে তিনি বাস করেন, কেমন করে তিনি ভালবাসেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে এ দুটি প্রশ্নই আমার অজানা থেকে গেছে। আমি তাঁর ফ্ল্যাটে কোনওদিন যাইনি। তাঁর সাক্ষাৎকারটি আমি নিয়েছিলাম দেশ পত্রিকার অফিসে তাঁর লেখার টেবিলে। সুনীলের টেবিলের সামনের চেয়ারটি ফাঁকা পাওয়াই মুশকিল। কী ভাগ্যি, তাঁর টেবিলের সামনে চেয়ার বেশি নেই এবং দেশ পত্রিকার অফিসে বহিরাগতদের অবাধ প্রবেশাধিকারও নেই। যদি এর বিপরীত অবস্থা হত তাহলে সুনীলের ঘরে দিনের যে কোনও সময়ই দর্শনার্থীর স্থান সঙ্কুলান হতনা।

সুনীল তাঁর ভালবাসা সম্পর্কে আমাকে কিছুই জানাননি। তাঁর বিবাহের বৃত্তান্তটিও সংক্ষেপে সেরেছেন। তাঁর নীরা কে? এই চিরন্তন প্রশ্নের উত্তরও তাঁর ভাষা একটু বদলিয়ে বলতে হয় আমার হ'লনা পাওয়া, পাওয়া হলনা, হলনা পাওয়া।

সুনীলের সঙ্গে কথা বলার সময় তাঁর বন্ধু ও সহকর্মী শীর্ষেন্দু ছিলেন। তিনিও মাঝে মাঝে রসের যোগান দিচ্ছিলেন। আর ছিলেন আনন্দ বাগচি, কবি ও ছোটগল্প লেখক ও সাহিত্যে নিবেদিত প্রাণ এই মানুষটির কথা কোথাও বড় করে লেখা হয়নি। কিন্তু সুনীল তাঁকে কলেজ জীবন থেকে ঘনিষ্ঠভাবে চেনেন, কাজেই তাঁর উপস্থিতি জীবন্ত রেফারেন্সের মত কাজ করছিল।

প্রশ্ন ঃ আপনার লেখার মধ্যে নায়কের শৈশবে ও প্রথম যৌবনের দারিদ্র্যের কথা প্রায়ই এসে পড়ে। আমি শুনেছি আপনার ছেলেবেলাও যথেষ্ট দারিদ্র্যের মধ্যে কাটে। তার জন্যই কি দারিদ্র্য বার বার আসে?

সুনীল ঃ তা হবে হয়তো। আমার বাবা কলকাতায় স্কুল মাস্টারি করে সংসার চালাতেন। তখনকার দিনে স্কুল মাস্টারদের কত টাকাই বা মাইনে ছিল। দুর্ভিক্ষের সময় আমরা ফরিদপুরের গ্রামে ছিলাম। তখন আমরা প্রায় দিনই শুধু আলু সেদ্ধ খেয়ে থাকতাম।

প্রশ্ন ঃ কলকাতায় আপনারা কোন অঞ্চলে থাকতেন?

সুনীল ঃ বাবা টাউন স্কুলে পড়াতেন। আমরা ওর কাছাকাছিই থাকতাম। আমি টাউন স্কুল থেকেই ১৯৫০ সালে ম্যাট্রিক পাশ করি।

প্রশ্ন ঃ ছোটবেলায় কোন ধরনের বই পড়তে আপনি ভালবাসতেন?

সুনীল ঃ সব ধরনের বই-ই আমি পড়তাম। আমাদের পাড়ায় বয়েজ ওন লাইব্রেরি ছিল। মার জন্য সেখান থেকে দুখানা করে বই নিয়ে আসতাম। অনেক লোকের বাড়ি প্রাইভেট লাইব্রেরি ছিল। আমি সেখান থেকেও বই নিয়ে আসতাম। কবে থেকে গল্পের বই পড়া শুরু করি বলতে পারবনা। তবে আমি লেখক ধরে ধরে পড়তাম। প্রভাবতী দেবীসরস্বতী, ফাল্গুনি মুখোপাধ্যায় আমার প্রিয় লেখক ছিলেন। কল্লোল যুগের লেখক অচিন্ত্য মানিকেরও খুব ভক্ত ছিলাম। তাছাড়া পাড়ায় আবৃত্তি করতাম।

প্রশ্ন ঃ ছোটবেলায় কি ভেবেছিলেন লেখক হবেন?

সুনীল ঃ না। আমার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল নাবিক হয়ে বিশ্ব ভ্রমণ করা।

প্রশ্ন ঃ পড়াশোনা আপনার কেমন লাগত?

সুনীল ঃ একদম ভাল না। আমি ভাল ছাত্রও ছিলাম না। তাছাড়া স্কুলে পড়ার সময় থেকেই আমাকে ট্যুইশনি করতে হতো। আমি নানা শ্রেণীর লোকের ছেলেমেয়ে পড়িয়েছি। যেমন মুদির ছেলে, জমিদার বাড়ির মেয়েকে পড়িয়েছি। প্রথমেই বলেছি আমাদের পারিবারিক অবস্থা ভাল ছিল না। দেশ বিভাগের পর কাকা জ্যাঠা কলকাতায় এসে আমাদের সঙ্গেই থাকতেন। সুতরাং একটা সময় আমাদের পরিবারটাও বড় হয়ে গিয়েছিল।

প্রশ্ন ঃ কলেজে পড়াশোনা করেছেন কোথায়?

সুনীল ঃ প্রথমে ঢুকি সুরেন্দ্রনাথ কলেজ। বাড়ির কাছে স্কটিশ ও প্রেসিডেন্সি কলেজ ছিল। কিন্তু দুটোতেই কোএড আছে বলে ও দুটোর একটাতেও পড়া হল না। এছাড়া সুরেন্দ্রনাথে ভর্তি হয়েছিলাম হাফ ফ্রি হবে বলে। আমার ইন্টারমিডিয়েটে সায়েন্স ছিল, এটাও জানিয়ে রাখি। বাবা চাননি যে আমি কলেজে পড়ি। তিনি ভেবেছিলেন আমি একটা চাকরি বাকরি দেখে নেবো। আমি একরকম জোর করেই কলেজে ভর্তি হই। একদম ফ্রি স্টুডেন্টশিপ পাবো বলে। তারপর আমি দমদম মতিঝিল কলেজে গিয়ে ভর্তি হই। কলকাতার ছেলে গিয়ে দমদমে পড়ছে তখনকার দিনে এটা ভাবা যেতনা। আমি আই এস সি শেষ করলাম। পরীক্ষা দিলাম, কিন্তু রেজাল্ট ভাল হলনা। আমি বি এ ক্লাশে ভর্তি হই সিটি কলেজে। অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে ভর্তি হলাম।

প্রশ্নঃ আপনার কবিতা লেখার সূত্রপাত নাকি এই কলেজে পড়ার সময়?

সুনীল ঃ হ্যাঁ। সিটি কলেজে ভর্তি হয়ে কৃত্তিবাস প্রকাশের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি। আমি কবিতা লিখব আগে ভাবিনি। বন্ধুদের মধ্যে দীপক মজুমদার কবিতা লিখত বলে সবাই তাকে সম্মান করতো। আমি ভাবলাম, দীপক মজুমদার যদি পাবে, আমি কেন পারব না? আমি একটা কবিতা লিখে ফেললাম। কবিতার নাম 'একটি চিঠি'। সেটি দেশে পাঠালাম। ছাপা হয়ে গেল। কেউ বিশ্বাস করলনা, কবিতাটি আমার লেখা।

প্রশ্ন ঃ এরপর কৃত্তিবাস?

সুনীল ঃ হ্যাঁ, ১৯৫৩ সালে। দীপক মজুমদার ও আনন্দ বাগচি মিলে কৃত্তিবাস বার করে। আনন্দ ছিল স্কটিশের ছাত্র, দীপক টাউন স্কুলে আমার সহপাঠী ছিল। স্কটিশে পড়ত দীপক। তবে কৃত্তিবাস বার করার মূলে ছিলেন দীনেন গুপ্ত। প্রথমে আমি ও দীপক একটি কবিতার বই করব এই প্রস্তাব নিয়ে দীনেনবাবুর কাছে গেলাম। উনি বললেন, এমন একটা কিছু করো যাতে তোমাদের বয়সী সকলের লেখা তাতে বেরুতে পারে। উনি বললেন, তরুণদের লেখা থাকবে এমন একটা পত্রিকা বার করো। কৃত্তিবাস বেরুল। কৃত্তিবাসে লেখা থাকত তরুণতম কবিদের। দীনেনবাবু প্রথমে কাগজ দিলেন। বাকিটা আমরা পকেট থেকে দিলাম।

প্রশ্নঃ প্রথম পর্যায়ে কৃত্তিবাস কতদিন চলেছিল?

সুনীল ঃ ত্রৈমাসিক হিসাবে ২৫ সংখ্যা পর্যন্ত চলে। ধীরে ধীরে একটা গোষ্ঠী গড়ে উঠল। প্রথমে এলেন শঙ্খ ঘোষ। তারপর ষষ্ঠ সংখ্যা থেকে শক্তি চট্টোপাধ্যায় এল। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এল। কৃত্তিবাস ছিল দল নিরপেক্ষ। সম্পাদক ছিলাম প্রথমে আমি, আনন্দ ও দীপক। পরে আমি একা।

প্রশ্ন ঃ পাশ করার পর আপনার প্রথম চাকরি কোনটি?

সুনীল ঃ প্রথমে অনেকদিন বেকার বসে ছিলাম। তখন ৫০ দশকের গোড়ায় কোথাও চাকরি ছিলনা। ১০০ জায়গায় ইন্টারভিউ দেই। টুকটাক অনেক কাজ করেছি। যেমন বয়স্ক শিক্ষার প্রচারক, বীমা অফিসার ট্রেনিং নিতে গিয়ে চলে আসি। কোথাও চাকরি হয়নি জামার বোতাম লাগাইনি বলে। কোথাও কবিতা লিখি শুনে চাকরি হয়নি। এরই মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ল্যারিক্যাল চাকরির

জন্য পরীক্ষা দিই। টিউশ্যানি করতাম দিনে চারটি করে।

তিনবছর বেকার থাকার পর ১৯৫৭ সালে চাকরি পেলাম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কেরাণীর চাকরি। ১৯৫৮ সালে বাংলায় প্রাইভেটে এম এ দিলাম। আমি ঠিক করেছিলাম শিক্ষকতার চাকরি করবো না। বাবার অবস্থা দেখে মনে মনে বিতৃষ্ণা এসেছিল। কবিতার জগতে ভাঙচুর করবো এটাই মনে ছিল।

প্রশ্ন ঃ সে সময় কবি হিসাবে আপনার খ্যাতিও হয়ে গিয়েছিল। আমি ৫৯-৬০ এর কথা বলছি।

সুনীল ঃ খ্যাতি না বলে অখ্যাতি বলতে পারেন। আমাকে অশ্লীল কবি বলা হত। প্রতিষ্ঠিত কবিরা বলতেন আমি ছন্দকে ভেঙে ফেলছি।

প্রশ্ন ঃ আপনি ষাটের দশকের গোড়ায় জনসেবকে কাজ করতেন। রবিবারের পাতা দেখতেন।

সুনীল ঃ হ্যাঁ। রাতে জনসেবকে যেতাম। দিনের বেলা সরকারি চাকরি করতাম।

প্রশ্ন ঃ এরপরের মোটামুটি ঘটনা আমি জানি। আপনি আমেরিকা চলে গেলেন। তার আগে গিনসবার্গ এসেছিলেন কলকাতায়। আপনার খুব বন্ধু ছিলেন তিনি। হ্যাংরি জেনারেশন বলে শক্তি ও আপনি একটি নতুন মুভমেন্ট তৈরি করেছিলেন। আমেরিকায় যাওয়া আপনার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট।

সুনীল ঃ ১৯৬৩ সালে আইওয়াতে রাইটার্স ওয়াকশপে যোগদানের জন্য আমি একটি স্কলারশিপ পেয়ে গেলাম। বাংলা কবিতার একটি ইংরাজি সঙ্কলন ওঁরা বার করছিলেন। আমি এ ব্যাপারে সাহায্য করবো এটাই ছিল আমার কাজ। কিন্তু যার সঙ্গে কাজ করছিলাম তার সঙ্গে মতের মিল হল না।

প্রশ্ন ঃ কি নিয়ে?

সুনীল ঃ শব্দ চয়ন নিয়ে। ধরুন এক জায়গায় লেখা আছে শ্মশানবন্ধু। উনি সে জায়গায় লিখলেন 'পল বেযাবার' অর্থাৎ কফিন বাহক। তারা কালো পোশাক পরে গম্ভীর মুখে যায়। শ্মশান বন্ধুরা কাঁধে গামছা ফেলে বল হরি, হরি বোল বলতে বলতে যায়। তারা কি করে পল বেযারার হয়। রথের মেলার উনি ইংরাজি করলেন খ্রীষ্টমাস ফেয়ার—বলুন এটা মানা যায়? তাই এক বছরের মাথায় দেশে ফিরে এলাম। অথচ পাঁচ বছর থাকতে পারতাম। বিশ্বাবিদ্যালয় থেকেও একটা ডিগ্রি আনতে পারতাম।

প্রশ্ন ঃ দেশে ফিরে কি করলেন?

সুনীল ঃ দেশে ফিরে ভাবতে বসলাম আমি কি করতে চাই? বুঝলাম আমার কোনও বড় চাকরি ভাল লাগবেনা। আরামের জীবনও পছন্দ নয়। দেখলাম বাংলায় কিছু লিখলে আনন্দ পাই। আর বাংলায় লিখতে গেলে কলকাতাতেই থাকতে হবে। অধ্যাপক পল অ্যাঞ্জেলকে না বলে আমি চলে আসি। উনি বার বার বলেছিলেন, কেন যাচ্ছ? থাকো সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি জোর করে চলে আসি। যখন দমদমে নামলাম, পকেটে ট্যাক্সি ভাড়াও ছিলনা। কারণ লণ্ডন কায়রো হয়ে দেশ দেখতে দেখতে আসছিলাম। দেশে ফিরে টানা ছ বছর বেকার ছিলাম।

প্রশ্ন ঃ কিন্তু আনন্দবাজারে তখনতো নিয়মিত লিখতেন। মনে আছে আমেরিকা থেকে আপনার গদ্য লেখা বেরিয়ে ছিল দেশে। সম্ভবত আমেরিকার চিঠি বা ওই জাতীয় কোনও নামে। সন্তোষদা (ঘোষ) সবাইকে ডেকে বলেছিলেন, অসাধারণ গদ্য। গদ্য কাকে বলে শেখো। তখন আপনি আমেরিকায়। ফিরে এসে আপনিতো আনন্দবাজারে অজস্র লেখা লিখতে শুরু করলেন—

সুনীল ঃ হ্যাঁ। তখনও কিন্তু আমার চাকরি হয়নি। আমি লিখি টাকা পাই। পেটের দায়েই গদ্য লেখা শুরু করি। নীললোহিত, নীল উপাধ্যায় আর সনাতন পাঠক এই তিন নামে আমি লিখতাম। নীললোহিত নামে লিখতাম ভ্রমণ, নীল উপাধ্যায় নামে আন্তর্জাতিক বিষয়ের উপর লেখা। সনাতন পাঠক নামে বইপত্রের রিভিউ।

প্রশ্ন ঃ আপনার বিয়ের ব্যাপারে কিছু বলুন। স্বাতীদেবীর সঙ্গে আপনার বিয়েটাও তো একটা

নাটকীয় ব্যাপার ছিল--

সুনীল ঃ (একটু অপ্রস্তুত অবস্থায়) ঃ বেকার অবস্থার মধ্যেই বিয়ে করি। একটি মেয়ে আমার লেখা পড়ে আমাকে চিঠি লিখত। তারপর একদিন আলাপ হল। তারপর বিয়ে হল তার সঙ্গে। তার বাড়ির আপত্তি ছিল। তা সত্ত্বেও বিয়ে হয়ে গেল। এই আর কি?

প্রশ্ন ঃ বিয়ের পর কোথায় উঠলেন?

সুনীল ঃ বাবার মৃত্যুর পর দমদমে বাসা করেছিলাম। সেই বাড়িতে উঠলাম।

প্রশ্ন ঃ আপনার প্রথম উপন্যাস আত্মপ্রকাশের কথাও মনে আছে! দেশ শারদীয় সংখ্যায় একদিন ঘোষণা দেখলাম আপনি উপন্যাস লিখবেন। আপনার প্রথম উপন্যাস সম্ভবত সেটা ১৯৬৫।

সুনীল ঃ না, ১৯৬৬। সাগরদা আমাকে বললেন, এবার পুজোয় তোমাকে উপন্যাস লিখতে হবে। তখন আত্মপ্রকাশ লিখলাম, এটিকে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসও বলতে পারেন। তবে পাঠক এটাকে নিল। পরের বছর অরণ্যের দিনরাত্রি লিখলাম। এটি আমার দ্বিতীয় উপন্যাস।

প্রশ্ন ঃ 'অরণ্যের দিনরাত্রি' কোথায় বেরিয়েছিল মনে নেই—

সুনীল ঃ জলসায়। এর একটু ইতিহাস আছে। জলসার প্রেসে আমরা কৃত্তিবাস ছাপতাম। প্রেসে ধার হয়ে গিয়েছিল। ধার মেটাতে পারছিলাম না। তখন মালিক বললেন, ঠিক আছে ধার শোধ হবে। আমি তখন 'অরণ্যের দিনরাত্রি' লিখে দিলাম।

প্রশ্ন ঃ সত্যজিৎবাবুর কীভাবে নজরে এল উপন্যাসটি?

উত্তর ঃ কেউ হয়ত পড়ে শোনায় ওঁকে। উনি আমায় একদিন ডেকে পাঠালেন, কথাবার্তা হল। উনি বললেন, ছবি করবেন। 'অরণ্যের দিনরাত্রি' সিনেমা হতেই আমার বেশ নাম হয়ে গেল। সবাই তখন আমাব কাছে গদ্য চান। আমি পদ্যের বদলে বেশি করে গদ্য লিখতে লাগলাম।

প্রশ্ন ঃ আনন্দবাজারে পাকাপাকি ভাবে জয়েন করলেন কবে থেকে?

সুনীল ঃ ১৯৭০ সাল থেকে। সে সময় বাংলাদেশ যুদ্ধের খবর করতাম। এরপর আনন্দবাজার ডেস্কে কাজ করেছি দীর্ঘ দিন।

প্রশ্ন ঃ 'অরণ্যের দিনরাত্রি'র পর আপনার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস কোনটি?

সুনীল ঃ 'অর্জুন'। ১৯৭১ সালেই বই হয়ে বেরোয়। তার আগে আনন্দবাজার পুজো সংখ্যায় বেরিয়েছিল। এরপর 'জীবন যে রকম' আনন্দবাজারে ধারাবাহিকভাবে বেরোয়। তারপব সিরিয়ালাইজ হয় 'একা এবং কয়েকজন'। পাঁচ ছ বছর ধরে আনন্দবাজারে নীল লোহিতেব লেখা বার হয়।

প্রশ্ন ঃ আপনার ইতিহাসশ্রয়ী লেখাগুলি বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। 'সেই সময়' তো একটা খুব ভাল থিম হয়েছে। সময় খুব ভালভাবেই ফুটেছে। সময়ই এখানে নায়ক। তা বাদে আপনি আর্যদের ভারত আগমনের ব্যাপার নিয়ে 'আমিই সে' উপন্যাস লিখেছেন। সাড়ে তিনহাজার বছর আগে সাইবেরিয়ার নিম্ন প্রান্তের তৃণভূমিতে যাযাবর মানবগোষ্ঠীর কাহিনী।

সুনীল ঃ ইতিহাস আমার খুব প্রিয়। সবচেয়ে প্রিয় ভারতের ইতিহাস।

প্রশ্ন ঃ একা এবং কয়েকজনের মধ্যেও ইতিহাস নির্ভরতা আছে।

সুনীল ঃ হ্যাঁ। তবে আধুনিক ইতিহাস। এই বইটি মূলতঃ সশস্ত্র সংগ্রাম থেকে ৪২-এর আন্দোলন পর্যন্ত ঘটনাকে নিয়ে...

প্রশ্ন ঃ সেই সময় উপন্যাসে আপনি কিন্তু কালীপ্রসন্ন সিংহের চরিত্রের বিকৃতি ঘটিয়েছেন—

সুনীল ঃ দেখুন, কালীপ্রসন্ন সিংহের সম্পূর্ণ জীবন চরিত কোথাও নেই। এজন্য কল্পনা মেশাতে হয়েছে। এই স্বাধীনতা আমি গ্রহণ করেছি। সেজন্য কালীপ্রসন্ন সিংহ নামটি কোথাও ব্যবহার করিনি। ধরে নিন, নবীনকুমার একজন আলাদা লোক—

প্রশ্ন ঃ কিন্তু নবীনকুমার যে কালীপ্রসন্ন তা প্রকাশ্যই হয়ে পড়ে। বিদ্যোৎসাহিনী সভা—মহাভারত অনুবাদ এসব তো কালীপ্রসন্নেরই কীর্তি, সবাই জানে। আর আপনিও জানেন কাকে নিয়ে লিখেছেন।

আচ্ছা, এত মানুষ থাকতে কালীপ্রসন্নকে নিয়ে লিখলেন কেন?

সুনীল ঃ আমি বেঙ্গল রেনেশাঁসকে নিয়ে লিখতে চেয়েছি। তাকে তুলে ধরতে চেয়েছি। এমন একজনকে নিতে চেয়েছি যে কোনও দলে ছিল না, তাই কালীপ্রসন্ন চরিত্রকে বেছে নিলাম। কালীপ্রসন্ন এক যিশু সংস্কৃতির প্রতিনিধি, যে ইংরাজি শিখেছে কিন্তু নিজেদের ঐতিহ্য ছাড়েনি। বিদ্যাসাগরকে তিনি সমর্থন করেছেন।

প্রশ্ন ঃ কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করছি, টিভি সিরিয়ালটি কিন্তু আমার একদম ভাল লাগেনি।

সুনীল ঃ আমি আপনার সঙ্গে একমত। টিভিতে ঠিক তুলে ধরতে পারেনি, এসব জিনিয করা শক্ত।

প্রশ্ন ঃ আপনার নিজের লেখা সম্পর্কে আপনার কি মত?

সুনীল ঃ শুরু করার সময় মনে হয় দারুণ কিছু লিখছি। মাঝামাঝি গিয়ে মনে হয় কিছু হচ্ছেনা। যতই লিখছি তত বুঝি যেটা মাথায় আছে তাকে প্রকাশ করা খুব কঠিন।

প্রশ্ন ঃ তাহলে উপন্যাস লিখে এখনও তৃপ্তি পাননি? কিন্তু কবিতা লিখে—

সুনীল ঃ কবিতায় আনন্দ খুব বেশি। অতৃপ্তি অতখানি নয়।

প্রশ্ন ঃ গল্প কবিতা উপন্যাস কোন মাধ্যমে সবচেয়ে ভাল বলা যায়—

সুনীল ঃ যে কোনও মাধ্যমে। যদি শিল্পসম্মত হয়। তাহলে যে মাধ্যমেই বলা হোক না কেন, তা সার্থক হতে পারে।

প্রশ্ন ঃ আপনি গদ্যে একদম অলঙ্কার ব্যবহার করেন না কেন?

সুনীল ঃ লেখার দুটি স্তর থাকে। একটি তার পাঠযোগ্যতা আর একটি গভীরতা। আমি এ দুটির মধ্যে সামঞ্জস্য আনার চেষ্টা করছি।

প্রশ্ন ঃ আপনার রোম্যান্টিক চরিত্র সম্পর্কে কি আপনি সচেতন?

সুনীল ঃ আমি বুঝি যে আমি অপরিশোধ্যভাবে রোম্যান্টিক। তবে আমি কবিতা কবিতা গদ্য লিখিনা। কিন্তু যতবড় তত্ত্ব কথা বা গম্ভীর আলোচনা হোকনা কেন, আমি সেটা পাতলা করে দেব : এটাই আমার মেজাজ।

প্রশ্ন ঃ আপনার লেখার মূল সুরটা কি?

সুনীল ঃ চিন্তার মুক্তি। আমি পিছু টানে বিশ্বাস করিনা। বাপ ঠাকুর্দা বলেছেন বলেই নত মস্তকে মেনে নিতে হবে এটা ঠিক নয়। আমি ঈশ্বর, ধর্ম, গুরুদেবে বিশ্বাস করিনা। কর্মফলেও বিশ্বাসী নই। কর্মফল টল আবার কি! পৃথিবীর সব মানুষ নিজেই তার নিয়ন্তা। মানুষ অসংখ্য ঘটনার স্রোতে ভেসে যায় এটা ঠিক নয়। যে স্রোতকে বোঝবার চেষ্টা করবে, সে বড় জোর নাকানি চোবানি খাবে এই যা।

প্রশ্ন ঃ আপনি বললেন আপনি ঈশ্বর মানেন না, কিন্তু বহির্জগতের পিছনে কোন নিয়ন্তা আছে একজন, এমন কি ভাবেন না?

সুনীল ঃ না আমি বিশ্বাস করিনা এসব। অনুভবও করিনা। প্রকৃতির নিয়মে প্রকৃতি চলছে।

প্রশ্ন ঃ কিন্তু বেদ উপনিষদের মধ্য দিয়ে তো সেই এক অনির্বচনীয় বিশ্বসত্তার স্বরূপের কথা বলা হয়েছে...

সুনীল ঃ দেখুন, বেদ উপনিষদ টোটেম যুগের ধ্যান ধ্যারণা। এখনকার দিনে তো লেখা নয়। সে সময় এই সব সংস্কার ছিল' যাকে মানুষ ব্যাখ্যা করতে পারত না, বলত ভগবান। এখন বিজ্ঞান সবার ব্যাখ্যা দিয়েছে। যেগুলোর ক্ষেত্রে বাকী আছে, একদিন না একদিন তার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন ঃ আপনিতো রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা নিয়ে লিখেছেন...

সুনীল ঃ কিন্তু আমার রাধাকৃষ্ণ প্রেমিক প্রেমিকা। তারা ভগবান নয়। রাধাকৃষ্ণ লিজেণ্ডটি আমার ভাল লাগে, তাই লিখেছি।

প্রশ্ন ঃ আপনি ঠাকুর রামকৃষ্ণকে কি ঈশ্বর বলে মনে করেন?

সুনীল ঃ একদম নয়। তাঁকে অবতার মনে করাটাও আমার কাছে হাস্যকর। আপনি জানেন, আমি প্রথম বয়সে সরস্বতী প্রতিমা দেখে অভিভূত হয়ে তাকে চুম্বন করি। সে যে দেবী তা আমার উপলব্ধি হয়নি।

প্রশ্ন ঃ তাহলে আপনার ব্যক্তিজীবনে ধর্মের কোনও আবেদন নেই?

সুনীল ঃ না। তাই বলে কোনও ধর্মবিশ্বাসীকে আমরা আঘাত দিতে চাইনা। ধর্মকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে রাখলে কারও কোনও ক্ষোভ থাকেনা।

প্রশ্ন ঃ রাজনীতি কি আপনাকে ভাবায়?

সুনীল ঃ রাজনীতিতে কোথায় কি ঘটছে তা লক্ষ্য করি। লেখকের রাজনৈতিক বিশ্বাস থাকতে পারে কিন্তু তার কোনও দলে থাকা উচিত হবেনা। লেখককে সমাজের বিবেকের ভূমিকা পালন করতে হবে। তবে পৃথিবী লেখক-শিল্পীর কথামত চলেনা। যদি চলত তাহলে পৃথিবী রাম রাজত্ব হয়ে যেত।

প্রশ্ন ঃ আপনি একদা বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে কিছু অবমাননাকর উক্তি করেছিলেন?

সুনীল ঃ বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধা ও আপত্তি দুই-ই আছে। ভাষা শিল্পী হিসাবে বঙ্কিম অনন্য। বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগে এতবড় লেখক এসেছেন, এতে সাহিত্যের মান উঁচু হয়ে গেছে। বঙ্কিম সম্পর্কে আমার আপত্তি একারণে যে এতবড় একজন লেখক নিজের যুগে প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন। নতুন যে সব সংস্কার হচ্ছিল তিনি তার বিরোধিতা করে গেছেন। আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস না করে কারও ক্ষতি করিনি, আর বঙ্কিম স্ত্রী শিক্ষার বিরোধিতা করে দেশের ক্ষতি করে গেছেন। তিনি মুসলমানদের বিরোধিতা করেছেন।

প্রশ্ন ঃ আপনার জীবনের আনন্দদায়ক মুহূর্ত কোনটি?

সুনীল ঃ আমার জীবনে অভিযোগ কম। যখন খেতে পেতাম না তখনও মনে আনন্দ ছিল, এখনও আছে। আমাকে আপনি কখনও বিসন্ন উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত দেখবেন না। জীবনে যা এসেছে তাকে সহজভাবে গ্রহণ করেছি।

প্রশ্ন ঃ আপনার জীবনের উদ্দেশ্য?

সুনীল ঃ পরলোক নেই। কর্মফল নেই। একটিই মাত্র জীবন, ফূর্তি করে কাটিয়ে দাও।

প্রশ্ন ঃ যখন লেখেন তখন কি একটা পরিকল্পনা করে নেন?

সুনীল ঃ বেশির ভাগ লেখার আগে কোনও পরিকল্পনা নেই। প্রথম লাইনটা ইমপর্ট্যান্ট। সেটা ঠিক করার পর বাকিটা আপনা আপনি এসে যায়।

প্রশ্ন ঃ কখন লেখেন?

সুনীল ঃ সকাল ৮টা থেকে বেলা সাড়ে এগারটা, এটাই আমার লেখার সবচেয়ে বড় সময়। তবে কখনও রাত জেগে দুটো তিনটে পর্যন্ত লিখি।

১১

(...কবিতা লেখা কঠিন ব'লে--- দাউদ হায়দার
... তবে কবিতাকে আমি পুরোপুরি ভুলে যাবো - উৎপল বসু)

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর সঙ্গে :

বিকেল পাঁচটা ত্রিশ মিনিট, বাইশে আগস্ট--উনিশ শ' আশি। আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসের চারতলায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মুখোমুখি হ'লাম। পাশে বসে আছেন দাউদ হায়দার। সুনীলদাই আলাপ করিয়ে দিলেন। প্রীতি বিনিময়ের অব্যবহিত পরেই।

প্রঃ সুনীলদা, সংস্কৃতির মাধ্যম হিসেবে আপনি কবিতাকে বেছে নিলেন কেন?

উঃ ইচ্ছে করে তাই লিখি। বড় বড় কথা ভালবাসি না, হৃদয়ে উচ্ছ্বাস, মনের আবেগ...পৃথিবীকে খুব ভালবাসি... এসব একদম পছন্দ করি না।

প্রঃ কবিতা মানুষকে কতখানি বাঁচতে শেখায়?

উঃ সবাইকে নিশ্চয়ই নয়, কারণ কবিতা সকলের জন্য নয়। যারা কবিতা পড়ে, পড়ে আনন্দ পায় কবিতা কেবল তাদের জন্যই।

প্রঃ আপনার কবিতায় **নীরা** শব্দটির বার বার উল্লেখ দেখেছি। তাৎপর্যটুকু বলবেন?

উঃ 'তোমার কাগজটি বেশ সুন্দর, ছিমছাম।' সুনীল গাঙ্গুলী প্রশ্নটি এড়িয়ে যেতে চাইছেন বিভিন্ন কথায়। উপস্থিত দাউদ হায়দার, সুব্রত সরকার প্রভৃতি সকলেই এই প্রশ্নের উত্তর শোনার অপেক্ষায় আগ্রহ প্রকাশ করলেন, কিন্তু সুনীলদা স্পষ্ট করেই বলে দিলেন 'পরিষ্কার করে কিছু বলবো না। সে জন্য বেশী অনুরোধও করো না। নীরা' একটি মেয়ে হ'তে পারে কিংবা নারীও হ'তে পারে-- যাকে নিয়ে লেখা বা যার কথা আমার কবিতায় বার বার এসে গ্যাছে।

প্রঃ 'নীরা' আপনার কবিতার প্রেরণা নয় কি?

উঃ হতে পারে।

প্রঃ আপনি তো তরুণদের কবিতা পড়েন। কার কার লেখা আপনার প্রতিশ্রুতিময় মনে হয়?

উঃ নাম করতে বলো না। মফঃস্বল কিংবা শহর, যে যেখান থেকেই লিখুন না কেন কবিতা কবিতাই। তার কোন পার্থক্য হওয়া উচিত নয়। তবে মফঃস্বল থেকে যাঁরা লেখেন তাঁদের কবিতায় স্বাভাবিক ভাবেই নদী, গাছপালা, প্রকৃতি প্রভৃতি বেশী আসে। শহরের সঙ্গে যোগাযোগের অভাবে, বই পত্রের অভাবে কিংবা টাটকা ভাষার সঙ্গে যোগাযোগ থাকে না বলে তাঁরা ঠিকঠিক পারেন না।

প্রঃ অনুবাদের পরেও **বিদেশী শব্দ ও অনুষঙ্গ** থেকে যাচ্ছে অনেকের কবিতায়। এগুলো ঠিক?

উঃ অনুবাদ সম্পর্কে দু'রকম মত। বিষ্ণুবাবু 'ক্রিষ্টমাস্ ফেয়ার'কে 'রাথের মেলা' করেছিলেন। তাঁর মতে হয়তো ওটাই ঠিক। আবার কেউ কেউ মনে করেন, বিদেশী কবিতার বাংলা অনুবাদের পরেও বিদেশী ষ্টার, গন্ধ প্রভৃতি ঠিক ঠিক রাখা দরকার। আমি অবশ্য সবকিছু বদলানোটা পছন্দ করি না। অনুবাদ কবিতা পড়লে যেন বাঙালী কবিতা বলে মনে না হয়।

প্রঃ আশি'র দশকের কবিতার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?

উঃ আশির দশক কি শুরু হ'য়েছে? আমার তো মনে হয় আশি-দশক একাশি থেকে শুরু হবে। আর তখনকার কবিতার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে আমি কি করে ব'লবো। আশি'র কবিরাই তা বলবে।

প্রঃ আপনার **প্রথম প্রকাশিত কবিতা** কোন্‌টি?

উঃ 'একটি চিঠি' কবিতা, কোনো একটি মেয়েকে উদ্দেশ্য করে লেখা। 'দেশে' বেরিয়েছিল ১৯৫০ সালে।

প্রঃ বর্ষার সময় একপ্লেট **গরম খিচুড়ি** ও **একটি সুন্দর** কবিতা যদি পাশাপাশি থাকে আপনি কোনটা আগে বেছে নেবেন?

উঃ খিচুড়ি আমার খুব ভালো লাগে। আরো ভালো হয় সঙ্গে যদি ইলিশ মাছ থাকে। আগে খিচুড়িটা শেষ ক'রবো, পরে কবিতাটি পড়বো।

চৌদ্দ-আট-আশিতে ৪৫এ রাসবিহারী এভিনিউতে আলোক সরকারের সঙ্গে ঃ

প্রসঙ্গ—কবিতার মধ্যে আপনি কি খুঁজে পান?

উত্তর ঃ প্রশ্নটি রীতিমতো অন্তত আমার কাছে এ বিষয়ে স্পষ্ট করে বলা শক্ত। বস্তুগ্রাহ্য কিছুই খুঁজে পাই না। মনে হয়, অভিজ্ঞতা কল্পনা এবং নির্মাণ এই তিনের ভিতর দিয়ে হয়ে-ওঠা কবিতার শিল্প-কর্মই আমাকে আকর্ষণ করে। তাজা জীবন অথবা গূঢ় দর্শন সবকিছু শেষ পর্যন্ত জোলো মনে হয় যদি না তা শিল্প শাসিত হয়। এই শাসনের যোগ্যতা অবশ্যই জ্ঞান, জিজ্ঞাসা এবং নৈপুণ্যের উপর নির্ভর করে, সার্থক কবিতার ভিতর তাদেরও খুঁজে পাই।

প্রঃ কবিতার সঙ্গে সাহিত্যের অপরাপর অঙ্গে কি যোগাযোগ?

উঃ একটা সময় ছিল যখন মানুষ কেবল কবিতাই লিখতো। তারপর নাটক, তারপর উপন্যাস, ছোট গল্প ইত্যাদি। সাহিত্যের সব অঙ্গের সঙ্গেই কবিতার সম্পর্ক মাতা-পুত্রের সম্পর্ক। তবে যেমন হয় দুরন্ত সন্তান মাতৃ শাসন মানতে চায় না; কিন্তু দিন শেষে তাকে ফিরতে হয় মাতৃক্রোড়েই। সব মহৎ সাহিত্যই শেষ পর্যন্ত কবিতার নিবিড়তার ভিতর সুপ্ত হয়। বৈসাদৃশ্য যেটুকু তা ওই আপাত দুরন্তপনায়। বলা বাহুল্য, আমি মহৎ সাহিত্যের কথাই বলছি। অপরিণত অথবা বাণিজ্য অভিলাসী সাহিত্যের কথা বলছি না।

সেদিন আটাশে আগষ্ট' আশি, 'আনন্দমেলা' বিভাগে শ্যামলকান্তি দাশের মুখোমুখি ঃ

প্রঃ 'কবিতা' জিনিষটা কী?

উঃ কবিতা জিনিষটা কি এতো আপনার কাছে বলা বাহুল্য, এজন্যই যেহেতু আপনি একটি কবিতা পত্রিকার সম্পাদক যেহেতু এসব আপনার জানা। অতএব আমার এগুলো বলার দরকার নেই। তাছাড়া কবিতা কী বা কবিতার সংজ্ঞা কী এসবের জন্য অনেক বইপত্র আছে সেগুলো পড়ে নিলেই চলবে।

প্রঃ তবু আপনার ধারণা?

উঃ আমার ধারণা আমি কবিতাতেই বলি।

প্রঃ আচ্ছা, আজকাল তো **অনেক বিদেশী কবিতা** অনুবাদ হচ্ছে—অনুবাদ প্রণালী সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

উঃ দেখুন, আমি ইংরেজী ভাষাটা এতো কম জানি, শুধু ইংরেজী ভাষাই কেন, প্রতিবেশী ভাষাগুলো সম্পর্কে আমার ঠিকমতো যোগাযোগ হয়নি, অতএব কোন বিদেশী ভাষা বা তার অনুবাদ সম্পর্কে আমার কোন কথা বলা ঠিক হবে না।

প্রঃ ইংরেজী ভাষা কম জানেন অথচ একটা **রিল্‌কে** সংখ্যা বেশ সুন্দর ভাবে করেছিলেন কি করে?

উঃ তা আমার কিছু অনুবাদ পড়ে ভালো লেগেছিলো বলে। তাতে আমি শুধু সম্পাদনা করেছি মাত্র। আর সব কাজ সমস্ত যোগ্য লোকেদের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। আর কোন কিছু করতে পারিনি।

প্রঃ আপনার **প্রথম কবিতা** কোথায় প্রকাশ হয়েছিল?

উঃ তেরশো বাহাত্তর সালের বৈশাখে পাঠশালা পত্রিকায় 'এইতো আমার পণ' কবিতাটি।

প্রঃ এখন আপনি কবিতার জন্য কতখানি সময় দেন?

উঃ সময় পেলেই কবিতার জন্য সময় দিই। কবিতা আমার অণুতে পরমাণুতে জড়িত। কবিতা বাদ দিয়ে, কবিতা ব্যাতিরেকে কিছু ভাবতে পাবিনি, কবিতা না লিখতে পারলে কষ্ট হয়। লিখতে পারলে খুবই আনন্দ পাই, অতএব সময় অসময়ের কোন ব্যাপার নেই।

প্রঃ আপনার সব থেকে প্রিয় জিনিষ কি?

উঃ এতো বড় উদ্ভট প্রশ্ন। প্রিয় জিনিষ কি নয়! (উপস্থিত কৃষ্ণা বসু বলে উঠলেন, এটাও কি আপনার Interview-র মধ্যেই? প্রতিবেদকের উত্তর ঃ সব, সব। সুনীল গাঙ্গুলীকে খিচুড়ি ভালো লাগে কিনা জিজ্ঞেস করছি—সেটাও আমার ইন্টারভিউর মধ্যে) শ্যামল বললেন ঃ একজন পদ্য লেখক, একজন শিল্পীর, একজন কবির যা যা প্রিয় হওয়া উচিত আমারও তাই। সব ভালো লাগার মধ্যদিয়েই কবিতার উপকরণ উঠে আসে, খুঁজে পাই কবিতার শরীর।

১২

'বাংলা সাহিত্যে যৌবনের প্রতীক' বলে একদা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে বরণ করেছিলেন এক প্রবীণ কবি সমালোচক বিমলচন্দ্র ঘোষ। ষাট দশকের গোড়ায় অভিনন্দিত সাহিত্যের সেই যুবরাজ আজ স্বমহিমায় সৃজনশীলতার সিংহাসনে। সাহিত্যের দু ধারায়—গদ্যে ও পদ্যে—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের যাতায়াত শুধু অনায়াস আর অবিরতই নয়—ক্রমগভীরতার গতিধর্মে তা সমস্ত অর্থেই জীবন্ত। উপন্যাসে তাঁর 'আত্মপ্রকাশে'র সঙ্গে বাঙালি পাঠক পাঠিকা তাকে অনুভব করেছেন বসন্তের প্রথম হাওয়ার রোমাঞ্চ শিহরনে। আবার 'মহাপৃথিবী', 'গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প' কিংবা 'সাজাহানও তার নিজস্ব বাহিনী'র মতো গল্পে তার অনুরাগীরা তাঁকে আবিষ্কার করেছেন অন্য এক কলমে।   সালে 'সেই সময়' উপন্যাসের জন্য সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পেয়েছেন বঙ্কিম পুরস্কার। সময়ের বিভিন্ন পর্বে, কাছে ও দূরে, জীবনে ও সাহিত্যে নারীকে যেমনভাবে দেখেছেন, গড়েছেন কিংবা আগামী দিনে গড়তে চাইছেন—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কোনো আড়াল না রেখে, তারই আলোচনা করেছেন এবারের 'শিল্পীর চোখে নারী'তে।

'আমার চোখে মেয়েদের বেশ বড়রকমের পরিবর্তন যেটা—সেটা হল এখনকার মেয়েরা বিভিন্ন ব্যাপারে মেয়েদের সমর্থন করতে আরম্ভ করেছেন। আগে এটা তেমন ছিল না, বরং এর উল্টোটাই ছিল প্রবলভাবে। মেয়েরাই ছিলেন মেয়েদের সবচেয়ে বড় নিন্দুক।

'আমার দুই আন্তর্জাতিক প্রেমিকা আছেন। আবাল্য আমি তাঁদের প্রেমমুগ্ধ। তাদের একজন হলেন জোয়ান অব আর্ক আর অন্যজন ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল। ছেলেবেলা থেকে এঁদের জন্যে গড়ে উঠেছে আমার আলাদা ধরনের অনুভূতি।

'অনুভবের জগতের ওই নারীরা আমার কাছে যত আপন ছিলেন, প্রত্যক্ষ জগতের নারীরা ততখানি আপন হতে পারেননি, অর্থাৎ আমিই তাঁদের খুব কাছের হয়ে উঠতে পারিনি। মেয়েদের সঙ্গে আমার এই বাস্তব জগতের দূরত্বটা একেবারে ছেলেবেলা থেকেই। দূরত্বটা ছিল বলেই বোধহয় রহস্যটা আরো ঘন হয়েছে। অপার কৌতূহল নিয়ে তাই আমি নারীকে আবিষ্কার করতে চেয়েছি সেই অনুভবের তীব্রতায়। মেয়েদের স্ত্রীলোক হিসেবে দেখা নয়, এঁদের সব সময় আমি দেখতে চেয়েছি নারী হিসেবে।

'বয়ঃসন্ধিকালে আমি মেয়েদের সঙ্গে মিশতেই পারতাম না। আমার বন্ধুরা মিশত, আমি দূর থেকে দেখতাম। এর আগে নারীকে দেখা তো গ্রামবাংলার নস্টালজিয়ার মধ্যে। হ্যাঁ, তার আগে দুই নারীর কাছ থেকে আমি দুটি জগৎ উপহার পেয়েছি। দিদিমার কাছ থেকে আমি পেয়েছি রূপকথার জগৎ আর সাহিত্যের জগৎ আমি পেয়েছি আমার মার কাছ থেকে। মার অনুরাগ ছিল আধুনিক সাহিত্যে। মার জন্যে লাইব্রেরি থেকে আমায় বই নিয়ে আসতে হত, সেই সুবাদে আমার পড়াও হয়ে যেত। গ্রাম্য ছড়া, প্রবাদ, কথকতা সব দিদিমার কাছ থেকে শোনা। পূর্ববাংলার ভাষায় খুব মিষ্টি আওয়াজের গলায় কথা বলতেন দিদিমা।

'আমাদের বাঙাল বাড়িতে কোএজুকেশনের ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি ছিল। বাড়ির কাছেই ছিল স্কটিশচার্চ কলেজ। বন্ধুরা ভর্তি হল সেখানে। আমার ভর্তি হওয়া হল না।

'তবু মেয়েবন্ধুর ব্যাপারে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি। আমার এক বন্ধুর বোনের ছিল গভীর সাহিত্যবোধ। সে কবিতা ভালবাসত বলেই আমি কবিতা লিখতে শুরু করেছিলাম। তাকে উদ্দেশ্য করেই আমি লিখেছিলাম 'একটি চিঠি'। সেই নারী আমার বিভিন্ন উপন্যাসে চরিত্র হিসেবে ঘুরে ঘুরে এসেছে।

'কিন্তু দল বেঁধে যখন আড্ডা দিয়েছি, সাহিত্য করেছি, তখন কবিতা সিংহ ছাড়া আর বান্ধবী কোথায়? প্রথম যৌবনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার যে প্রবল নেশা ছিল; তাতেও তো বন্ধুরাই সঙ্গী। নিসর্গের সৌন্দর্যের মতোই আদিবাসী রমণীর সৌন্দর্যর টানও অনুভব করেছি তখন। মনে আছে, প্রথম যেবার আমি বিদেশে যাই, তারপর ফিরে এসে গিয়েছিলাম চাইবাসাতে। সেবার চাইবাসাতে দেখেছিলাম ফুলমণি নামে একটি ওঁরাও মেয়েকে। আমার মনে হয়েছিল এত সুন্দর মেয়ে আমি য়ুরোপেও কোথাও দেখিনি।

'নরনারীর জীবনসম্পর্ক, তাদের আকর্ষণ ও সংকটই আমার লেখার প্রধান বিষয়। এবং বিষয়টি অনন্ত ও চিরনূতন। অশেষ রহস্যের একটা টান, মূলত নরনারীর প্রেম-অপ্রেমের সম্পর্কের আবর্তে থাকে বলেই হয়তো মেয়েদের সাদামাটাভাবে দেখার অবকাশ আমার হয় না। আমি মেয়েদের দেখি রোমান্টিকভাবে। মেয়েদের ওই সাদামাটা দিকটা তেমনভাবে যে আমার লেখায় আসেনি সেটাকে আমি আমার দুর্বলতা মনে করি।

'হ্যাঁ, বাংলা উপন্যাসের প্রধান লেখকরা মাতৃচরিত্র নির্মাণে বেশিরভাগই রেখেছেন নৈপুণ্যের পরিচয়। সেদিক থেকে দেখতে গেলে আমার লেখায় মা চরিত্র তেমন জায়গা পায়নি। মাসি, পিসি, কাকি, জেঠি এঁরা সবাই কম এসেছেন আমার লেখায়।

'আমি জীবনের যে অংশটা নিয়ে লিখি সে অংশটায় এঁদের ভূমিকা কম।

'অদূর ইতিহাসের পটভূমিতে নারীচরিত্র নির্মাণের সময় 'মেক বিলিভ'-এর বিশেষ ভূমিকা। সেখানে সেকালের নাটক থেকে, প্রহসন থেকে সংলাপের ভাষা গড়ে নিতে হয়েছে। প্রবাদের ব্যবহারে, কোথাও কোথাও সেদিনের কথা হিসেবে শুনতে ভাল লাগে এমন প্রবাদ বানিয়েও নিয়েছি।'

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনে ও সাহিত্যে পৃথিবীর দুই গোলার্ধের নরনারীর মুখের ভিড় ক্রমশ বাড়ছে। য়ুরোপ আমেরিকার নারীজগতের সঙ্গে আমাদের দেশের নারীজগতের তফাতটা তাই ওঁর কাছে স্পষ্ট। প্রধানত অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ফলেই পাশ্চাত্যের নারীজীবন প্রাচ্যের তুলনায় অনেকটা আলাদা। ওখানে একটি মেয়ে যেভাবে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সুযোগ পায় তাতে স্বনির্ভর হয়ে বাঁচতে পারে। আঠারো-উনিশ বছরের মেয়েরা ওদেশের ছেলেদের মতোই স্বাধীন জীবন যাপন করতে পারে সহজে। সুযোগ পেলে আমাদের দেশের সাধারণ মেয়েরাও ওদের সমান দক্ষতার অধিকারী হতে পারে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানে ওই সুযোগ অর্থাৎ অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সেই জোরটারই একান্ত অভাব।

প্রসঙ্গত গত কয়েক দশকের পাশ্চাত্য কথাসাহিত্যের লেখক হিসেবে পুরুষের তুলনায় নারীর আধিক্য এবং প্রায় একই সঙ্গে বেশ কিছু সংখ্যক লেখিকার আত্মপ্রকাশ সম্পর্কে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য, 'ওদেশে পুরুষেরা সায়েন্স এবং টেকনোলজির দিকে বেশি ঝোঁকার ফলে দেখা যাচ্ছে শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে মেয়েদের ভূমিকাটাই বড় হয়ে উঠছে। জনপ্রিয় নারী ঔপন্যাসিকরা পুরুষদের তুলনায় সংখ্যায় বেশি হয়ে পড়েছেন।

'ভারতীয় সাহিত্যে অন্যান্য ভাষার তুলনায় বাংলাভাষাতেই মেয়েরা কিছু উল্লেখযোগ্য লেখা লিখেছেন। তবে আশ্চর্যের বিষয়—গত শতাব্দীর শেষে এবং এই শতাব্দীর প্রথমে যে পরিমাণে বাঙালি মেয়েরা সাহিত্যে এসেছিলেন, এ মুহূর্তে তুলনায় তাঁদের অল্প বলে মনে হয়। আশ্চর্য, শিশুসাহিত্যেও বাঙালি লেখিকাদের উপস্থিতির সংখ্যা তেমন বড় মাপের হয়নি। লীলা মজুমদার

যথার্থই বলেছিলেন, 'মেয়েদের হাত থেকে যথার্থ শিশুসাহিত্য বেরনো উচিত ছিল।' অথচ এখানে ছোটদের জন্যে লেখা ছেলেরাই বেশি লেখে।

'লেখালিখির ব্যাপারে মেয়েদের জন্যে আলাদা জগৎ গড়ে, শিশুসাহিত্যের মতো নারীসাহিত্য বলে কিছু একটা তৈরি হোক—সেটা মোটেই কাম্য নয়। আমার মনে হয়, মেয়েদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা কম বলেই আমরা ভাল লেখিকা পাচ্ছি না। লেখার জন্যে কষ্ট স্বীকার, অনেক কিছুকে ত্যাগ করে কঠোর প্রতিজ্ঞা নিয়ে লেখার মধ্যে থাকা, এটা ছেলেদের মধ্যে যেমন দেখেছি, মেয়েদের মধ্যে তেমন দেখিনি। মেয়েরা বেশির ভাগই শখের লেখা লেখেন। লিখতে এসে লেখার জগতে খুব বেশিদিন থাকেন না, চলে যান।

'এমনিতে নানা কারণেই স্বাভাবিকভাবে বাইরের জগৎ সম্পর্কে আমাদের মেয়েদের অভিজ্ঞতাটা কম, তার ওপর আর একটা বড় সমস্যা হল—মেয়েরা অন্দরমহল সম্পর্কে লিখতে ভয় পান। অন্দরমহল নিয়ে যেটুকু তাঁরা লেখেন সেটা খুব ওপরে ওপরে।

'বাংলা গল্প-উপন্যাস ছেলেদের তুলনায় মেয়েরাই সংখ্যায় বেশি পড়েন। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, পাঠক এবং পাঠিকাদের মধ্যে পাঠিকারাই লেখককে বেশি চিঠি লেখেন। সাধারণত মেয়েরাই ভাল চিঠি লিখতে পারেন।

'অতিরিক্ত মেধা মেয়েদের নারীত্ব কিছু পরিমাণে ঝরিয়ে দেয় বলে আমার মনে হয় কিনা—এমন প্রশ্নের উত্তরে আমি বলব, সেই অতিরিক্ত মেধার সঙ্গে যেটা দরকার সেটা হল সাধারণ জ্ঞান। যেমন মেয়েদের পোশাকের ব্যাপারে শাড়ি এবং স্ল্যাকস সবই আমার পছন্দ, কিন্তু বেশি ভাল লাগে সেই রমণীকে যিনি বোঝেন কোনটা কাকে মানাবে। সব রঙ যেমন সবাইকে মানায় না, তেমনি সব পোশাক মানায় না সবাইকে। মেয়েদের লম্বা চুলও আমার ভাল লাগে, ভাল লাগে ছাঁটা চুলও। এখানেও সেই মানানোর প্রশ্ন থেকে যায়।'

একদিকে 'রাধাকৃষ্ণ', 'শকুন্তলা' ইত্যাদির মতো প্রাচীন সাহিত্যের নতুন উপন্যাসরূপ, অন্যদিকে সেই সময়-এর মতো বিশেষ কালপর্বের উপন্যাস রচনা, মাঝখানে সমকালের নরনারীর জীবন সম্পর্কের অন্তর্গত কাহিনীর বিপুলায়তন কথাসাহিত্য, সবকিছু মিলিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নারীচরিত্র নির্মাণের শিল্পকর্ম এক বহুমাত্রিক চরিত্রবিচিত্রা। এর মধ্যে সমকালের চরিত্রেরা উঠে আসে প্রবহমান জীবন থেকে। উনিশ শতকী চরিত্রদের লেখক কীভাবে চয়ন করেছেন তা আগেই জানিয়েছেন কথায় কথায়। কিন্তু যখন প্রাচীন সাহিত্য থেকে তাঁর কলম গড়ে তোলে নতুন উপন্যাস, তখন লেখকের উপজীব্য কী?

'রাধাকৃষ্ণের রাধাকে আমি নতুন করে লিখেছি। লেখার সময় উপাদান সংগ্রহ করেছি পল্লীগাথা, লোককাহিনী, লোকগীতির বিভিন্ন ধারা থেকে। ওইসব নিয়ে ক্রমে যখন রাধাকে নির্মাণ করলাম তখন মনে হল সে আমার গড়া নিজস্ব এক নারীচরিত্র হয়ে উঠেছে। শকুন্তলার ক্ষেত্রে তেমন হয়নি। কালিদাসকে অনুসরণ করেই আমি লিখেছি 'শকুন্তলা'। বিদেশী লোককাহিনী থেকে আমি যেমন লিখেছি 'সোনালীর দুঃখ', তেমন আর একটি কাহিনী লেখার কথা ভাবছি একটি ফরাসী লোককাহিনী থেকে। এলোইস আর আবেলার কাহিনী। এক পাদ্রীর সঙ্গে এক রমণীর প্রেমোপাখ্যান। এলোইস এমনই এক আকর্ষণীয় নারীচরিত্র যাকে পাওয়ার জন্যে পাদ্রী আবেলা ধর্মকর্ম সব ছেড়ে দিয়েছিল।

'বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় নারীচরিত্র সৃষ্টির উল্লেখ করতে বললে প্রথমেই আমার মনে পড়ে বুদ্ধদেব বসুর 'তিথিডোরে'র স্বাতীকে, যদিও আমার স্ত্রীর নাম স্বাতী। মনে পড়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র কুসুমকে। 'ঘরে বাইরে'র বিমলা আর 'পল্লীসমাজের' রমাকেও। তবে রবীন্দ্রনাথের নারীচরিত্রেরা— বিশেষ করে 'গোরা' উপন্যাসের মেয়েদের কেমন ছবির মেয়ে বলে মনে হয়। ডস্টয়ভস্কির 'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেন্টে'র সোনিয়ার মতো তারা রক্তমাংসের নয় যেন।

'আমার নিজের লেখা থেকে আমার প্রিয় নারীচরিত্রদের বাছা আমার পক্ষে সবচেয়ে শক্ত কাজ।

ভয় পাই, কেননা আমার কল্পনার নারীদের মধ্যে একজনের চেয়ে আর একজনকে যদি ভাল বলে ফেলি আর তার ফলে যদি বাকিরা সব চটে যায়।

'আমার লেখা নিয়ে যখন ফিল্ম হয় তার বেশিরভাগই আমি দেখি না। 'অরণ্যের দিনরাত্রি' অবশ্য একাধিকবার দেখেছি। এই ছবিতে শর্মিলা যে চরিত্রটিতে অভিনয় করেছেন, আমার কল্পনার সঙ্গে মোটেই মেলে না। অরণ্যের দিনরাত্রি দেখতে বসে, যখনই শর্মিলা অভিনীত চরিত্রটি এসেছে– আমি চোখ বন্ধ করেছি।

'তবে আমার দেশের প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীদের আমি কম দেখিনি। তাঁদের কথা ধ্যান করেছি একসময়। মাধবী মুখার্জি কিংবা কাবেরী বসু—এঁরা এক বিশেষ ধরনের নারীপ্রতীক হয়ে এসেছেন আমার কাছে। রবীন্দ্রনাথের গানের ব্যাপারে আমি কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুচিত্রা মিত্র—দুজনেরই ভক্ত ছিলাম। এখন আমার সবচেয়ে প্রিয় শিল্পী হচ্ছেন ঋতু গুহ।

'আমার প্রিয় সুন্দরীদের প্রসঙ্গ উঠলে বলব গড়িয়াহাটের মেয়েদের আমার দেখতে সবচেয়ে ভাল লাগে। আমার বাল্য কৈশোর যৌবনের মতো অনেকটা দূরত্বে না থাকলেও আমার আজকের জীবনেও নারীবন্ধুর তেমন প্রাচুর্য নেই। আমার এখনকার বান্ধবীরা বেশিরভাগই আমার বন্ধুর স্ত্রী কিংবা আমার স্ত্রীর বান্ধবী। 'বুধসন্ধ্যা' নামে আমাদের একটি সংস্থা আছে—সেখানে আসেন অনেক মহিলা—এছাড়াও তো আমার শ্যালিকারা সংখ্যায় অনেক এবং তারাও বেশ সুন্দরী।

'সাহিত্যি জগতের বিদেশিনী? হ্যাঁ, বেশ কয়েকজন লেখিকা এবং নারীর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে বিদেশে। এঁদের মধ্যে দুজনের কথা মনে পড়বে সবার আগে। একজন হলেন হাঙ্গেরিয়ান ছোটগল্প লেখিকা আনা সোমলিও। বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ। প্রথমবার দেখা আমেরিকায়। দ্বিতীয়বার দেখা বেলজিয়মে। লেখিকা হিসেবে আনার দুঃসাহসের পরিচয় আছে নানারকম নিরীক্ষার মধ্যে। রেজিমের বিরুদ্ধে ও লেখে। আনা অপূর্ব সুন্দরী। ও আমায় বলেছিল, ওর শরীরে ভারতীয় রক্ত আছে। তার কারণ হাঙ্গেরিতে থাকে অনেক জিপসি। আমাদের ধারণা, সেইসব জিপসি, ওখানে গেছে ভারতবর্ষ থেকেই।

'দ্বিতীয় যে বিদেশিনীর কথা মনে পড়ে তার নাম ফ্রাসিন গাবোঁ। ফরাসী কবি। বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ। চোদ্দখানা কবিতার বই বেরিয়েছে ওর।'

নারীজগতের সঙ্গে আগের দূরত্বের অনেকটা সরে গেলেও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কখনোই তাঁর লেখায় অভিজ্ঞতার বাইরে যেতে চান না একান্ত নিরুপায় না হলে। জেন অস্টেন যেমন তাঁর উপন্যাসে দুজন পুরুষের একান্ত নিভৃত সংলাপকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন তাঁর নারী জীবনের অভিজ্ঞতার সীমা মনে রেখে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও ঠিক তার উল্টোটা লেখার ব্যাপারে—অর্থাৎ দুটি নারী খুব অন্তরঙ্গভাবে কথা বলছে—তেমন সংলাপ লিখতে স্বস্তিবোধ করেন না। প্রয়োজনে অবশ্য তাঁকে বানিয়ে নিতে হয়।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাঁর 'ম্যারেজ অ্যাণ্ড মর্যাল' গ্রন্থে দাম্পত্যজীবনের ভাঙাগড়ার স্বাভাবিকতার প্রসঙ্গে বলেছেন, সন্তানের জন্মের পর 'ম্যারেজ' একটা 'ইন্সটিটিউশনে' পরিণত হয়। সম্পর্কের নিরীক্ষা যা কিছু তার আগেই সেরে ফেলতে হবে। দাম্পত্যজীবনে কোনোদিক থেকে যাতে ঘাটতি না থাকে সেজন্যে সবদিকটাই বোঝাপড়া হয়ে যাওয়া দরকার। প্রাকবিবাহ, সহবাসও।

এই প্রসঙ্গে আসতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বললেন, 'প্রাকবিবাহ সহবাসের বিরোধিতার কোনো কারণ দেখি না। মানুষের জীবন তার নিজের—সেটা নিয়ে সে কী করবে না করবে সে সিদ্ধান্ত সে নিজেই নেবে।'

১৩

কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অনেক আগে থেকেই প্রিয়। নীললোহিত 'চোখের সামনে' এসে আপনজন হয়েছেন আর 'সেই সময়'-এর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়- এর বৈদগ্ধ্যে বিমুগ্ধ পাঠককুলের মধ্যে আমরা অনেকেই আছি। কাজেই পার্থপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় যখন গর্বিত ভঙ্গিতে এসে জানালেন যে প্রাক্ পূজার দুর্মূল্য-সময়ের কিছুটা সুনীলদা তাকে দিতে রাজী হয়েছেন, তখন আমাদের বিস্ময় ও খুশিটুকু নীলকণ্ঠ পাঠকদের সাথে ভাগ করে নিতে মনস্থির করি

সম্পাদক 'নীলকণ্ঠ'

● প্রথম সাহিত্যকর্ম কখন কিভাবে শুরু? প্রথম রচনাটি কী?

—প্রথম কবিতা দিয়ে শুরু। একটি মেয়েকে চিঠি লেখার বদলে চিঠির আকারে কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলাম দেশ পত্রিকায়, ১৯৫১ ছাপা সেই কবিতাটির নাম—একটি চিঠি।

● প্রেরণার উৎসটি কী?

– আমি প্রেরণায় বিশ্বাস করি না।

● নিজের বিচারে সফল রচনার কি জনসমাদরেও সফল?

—আমি নিজের কোন রচনাকে এখনও সফল মনে করিনা।

● সাহিত্যের কোন বিভাগ আপনার প্রিয় অথবা স্বাচ্ছন্দ্যভূমি —ছোট গল্প, উপন্যাস বা রম্য রচনা?

—আমার প্রথম প্রিয় কবিতা। এছাড়া যখন যেটা লিখি সেটাতেই মন বসে যায়।

● সবুজ দ্বীপের রাজা বা অন্যান্য কিশোর গ্রন্থ কি স্বতঃপ্রবৃত্ত রচনা না অনুরোধে...?

—কোন লেখা অন্যের অনুরোধে লেখা হয়নি। কিছু একটা লেখার জন্য অনুরোধ আসে। কিন্তু কী নিয়ে লিখব কোন বিষয়টা কখন আমার কলমে আসবে সেটাতো শুধু আমার মস্তিষ্কের উপরই নির্ভর করে। আমি আন্দামান গিয়েছিলাম বেড়াতে, সেখানকার অভিজ্ঞতা নিয়ে সবুজ দ্বীপের রাজা লেখা হয়েছে।

● সমাজ তথা দেশের রাজনীতিক, আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে সাহিত্য ও সাহিত্যিকই বা কতটা প্রভাবিত হয়। প্রতিফলন ঘটে তাঁর সৃষ্টিতে?

—একটা প্রবন্ধ ঘেঁষা প্রশ্ন। দুচার কথায় বড় উত্তর দেওয়া যায় না আপাতত আমার হাতে বেশী সময় নেই।

● স্বদেশের কোন গ্রাম বা শহর আপনার মনের আরাম-আনন্দের ক্ষেত্র (অবশ্যই কোলকাতাকে বাইরে রেখে)?

—কোন বিশেষ জায়গা নয়, অনেক ছোটছোট জায়গাই আমায় টানে। যেমন সাঁওতাল পরগণা।

● বিদেশ ভ্রমণে কোন জায়গা কি এমনভাবে আপনাকে আকৃষ্ট করেছে যে দ্বিতীয়বার ভ্রমণের একটা সংকল্প নিয়েছেন মনে মনে?

—আপাতত তুরস্কে আরেকবার যাওয়ার ইচ্ছে আছে।

● একটা সাধারণ প্রশ্ন—আপনার প্রিয় বিদেশী ও স্বদেশী লেখক।

—প্রিয় লেখকরাও মাঝে মাঝে বদলে যায়। এই মাসে আমার প্রিয় লেখক ডস্তয়েভস্কি এবং বাল্মীকি।

● আপনি প্রেমেন্দ্র মিত্রকে কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক অথবা ঘনাদার স্রষ্টা হিসেবে সফল এবং স্মরণীয় মনে করেন?

—ছোট গল্প লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রই আমার কাছে বেশী শ্রদ্ধেয়। তাঁর কিছু কিছু কবিতাও ভালো লাগে। ঘনাদা ভালো লাগে না। কিন্তু তার ছোটদের জন্য অন্য অনেক লেখার আমি ভক্ত।

● কালকূটের 'কোথায় পাব তারে', 'বিবর', 'প্রজাপতি'-র সমরেশ বসু অথবা 'আবাদ', 'বি. টি রোডের ধারে'-র সমরেশ বসু—কে আপনার বিচারে বেশি সফল এবং স্মরণীয়?

—কালকূটের থেকে সমরেশ বসু আমার কাছে বেশি প্রিয় লেখক। সমরেশ বসুর গোড়ার দিকের লেখাগুলি আমার কাছে স্মরণীয়।

১৪

প্রশ্ন ঃ আপনি লিখেছেন "কবিরা দুঃখী।" কেন? কবি সুনীল কী দুঃখী এখনো?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, আমি এখনো বলি কবিরা দুঃখী। দুঃখ মানে অতৃপ্তি। কবি কখনো কোনো কিছুর মধ্যেই সম্পূর্ণ তৃপ্ত হ'তে পারে না। বস্তুগত দিক থেকেও কবি কী পারে সুখী হ'তে? বা অপর কাউকে সুখী করতে? কবি মাত্রেরই একটা নিজস্ব আলাদা জগৎ আছে। সেই জগৎ-টার মধ্যে থেকে কবি জীবন প্রকৃতি সব কিছুকেই দেখে, জানে, উপলব্ধি করে। নিজের ধারণায় বোধে কবি খুব নিঃসঙ্গ। কোনো কিছুতেই তার আশা মেটে না। কবিতার জন্য সে অনেক কিছুই ত্যাগ করে। কবিতা বড় অভিমানী। কবিতাকে ভালবাসলে তার আর রেহাই নেই। জীবনের মধ্যে থেকেও, জীবনের কথা লিখেও একটা ডিটাচমেন্ট গড়ে ওঠে কবির সঙ্গে। মেটিরিয়ালিসটিক্ দুঃখের স্থান সেখানে খুব একটা বেশি নেই। কবির মনোবেদনা ঘিরে থাকে নিজেকে প্রকাশ করতে না পারার দুঃখে, কবিতা লিখতে না পারার অসহ দুঃখে, নিজের মত করে জীবনটাকে বশে আনতে না পারার দুঃখে।

এখনো আমি কবির সেই দুঃখটাকে ভুলে থাকতে পারি না।

কবিতা লিখে আমার তৃপ্তি আসে না। মনে হয় খুবই কাঁচা রয়ে গেছে। আরও আরও ভালো লেখার জন্য ছটফট করি। সেদিক থেকে দেখতে গেলে আমার 'জুলপি সাদা' হয়ে গেলেও আমি নিজেকে এখনো নবীন কবি মনে করি।

প্রশ্ন ঃ আপনি লিখেছিলেন "কবিদের পক্ষে সবচেয়ে জরুরী হল ভাষাজ্ঞান।" কবির ভাষাজ্ঞানটা কী আপনার ধারণায়?

উত্তর ঃ 'ভাষাজ্ঞান' মানে আমি বলতে চেয়েছি কবিতা লেখার ভাষাজ্ঞান। গদ্য লেখার ভাষা ও কবিতা লেখার ভাষা কখনো এক নয়। আবার এই ভাষাজ্ঞানটা কিন্তু শিখে নিয়ে কবিতা লেখা হয় না। মানে কোনো Process নেই কবিতা লেখার ভাষা শিখে নেওয়ার। ওটাকে আয়ত্ত করতে হয়। বোধকরি একজন কবি সারাজীবন ধরেই কবিতার ভাষাটাকে আয়ত্ত করে যান। ফ্রেঞ্চ, ইংলিশ, বাংলা এক একটি ভাষায় কবিতা লেখার ভাষাগত Process-টাও আলাদা। প্রত্যেক ভাষাতেই কবিতা লেখার একটা আলাদা ভাষা আছে।

কবিতার অনুভূতি খুবই সূক্ষ্ম অথচ গভীর। গদ্যের মত তরল ও বিস্তৃতভাবে লেখার অবকাশ কবিতায় নেই। তা ঐ ভাষার সূক্ষ্মতাটা অর্জন করতে হয়। যে কবির যত বেশী ঐ সূক্ষ্মতা ও গভীরতা অর্জনের ক্ষমতা আছে—তিনি কবি হিসেবে ততটাই বড় হয়ে উঠতে পারেন। 'ভাষাজ্ঞান' বলতে আমি ভাষাতত্ত্ব বা ব্যাকরণগত দিক্‌টার কথা বলিনি। একটি কবিতা শব্দের মধ্য দিয়ে কবির অনুভব ও উপলব্ধির কথা কিভাবে নির্মাণ করে—তার কথাই বলেছি। আর এই জ্ঞান কবিতা লেখার শুরু থেকেই কবিকে আয়ত্ত করে নিতে হয়। নেওয়া দরকার, অন্তত কবিতা যদি তাকে লিখতেই হয়।

প্রশ্ন ঃ আপনি বলেছিলেন "সুধীন্দ্রনাথ আপনাকে তেমনভাবে মাতাননি।" সুধীন দত্তের ভাষাজ্ঞান সম্পর্কে তো কোনো দ্বিধার অবকাশ নেই। তাহলে তিনি আপনাকে মাতাতে পারেন নি কেন?

উত্তর ঃ এ কথা ঠিক সুধীন দত্ত একজন বড় কবি। তাঁর ভাষাজ্ঞানও অসামান্য। কিন্তু কোনো কোনো কবির সঙ্গে মানসিক মিল থাকে, কোনো কোনো কবির সঙ্গে থাকে না। আমার মানসিক মিলনটা ঘটেছিল জীবনানন্দের সঙ্গে। সুধীন দত্তের সঙ্গে সেই মিলটা অন্তত আমার মানসিকতায় বোধ করিনি।

তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয়ও ছিল। তাঁর বাড়ীতে মনোরম আড্ডাতেও গেছি আমি। তর্কাতর্কিও হয়েছে। খুবই ভদ্র, রুচিবান ছিলেন। কিন্তু তার কবিতা আমাকে কখনো তেমন ভাবে টানেনি। টানতে পারেনি।

ব্যাপারটা হচ্ছে, কল্লোল যুগে বাংলা গদ্য ও কবিতায় একটা বড় ধরনের পরিবর্তন এসে যায়। তখনকার কবিরা রবীন্দ্রনাথ থেকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে লিখতে শুরু করলেন, আলাদা ডিকশন—আলাদা ভাষা প্রয়োগ। কিন্তু সুধীন দত্ত কবিতাকে অনেকটা সংস্কৃত ভাষা অনুসারী করলেন। আভিধানিক শব্দ-ঘেঁষা। ব্যক্তিগত জীবনে আমরা যার ব্যবহার করি না। আমি বলছি, মানে আমার রুচির দিক থেকে বলছি—একালের কবিতা কখনো সুধীন দত্তের ভাষার মত ভাষায় সার্থক হ'তে পারে না। একালের কবিতা জীবনযাত্রার সঙ্গে অন্তরঙ্গ। অনেকটা আত্মজীবনী হ'য়ে ওঠে এখনকার কবিতা বা স্বগতোক্তি, আভিধানিক ভাষায় যা প্রকাশ সম্ভব নয়। সুধীন দত্তের কবিতায় ভাষা বড্ড বেশি জ্ঞানকেন্দ্রিক্। কবিতা ও অভিধান পাশাপাশি রইলেও, এক করা তো যায় না। তাই সুধীন দত্তের কবিতা আমাকে তেমন ভাবে মাতায়নি।

প্রশ্ন ঃ আপনি লিখেছিলেন "কবিতা দীক্ষিত পাঠকের জন্য।" কেন? আপনিই আবার লিখেছিলেন "মুখের ভাষায় কবিতা লেখার প্রথম সার্থক উদাহরণ রামপ্রসাদ।" কিন্তু রামপ্রসাদের কবিতা কী শুধুমাত্র দীক্ষিত পাঠকদের জন্য? সব শ্রেণীর মানুষই তো তাঁর আস্বাদ করে আসছে দীর্ঘকাল। কেন?

উত্তর ঃ এখনো কিন্তু কবিতা যে আলাদা ধরনের শিল্প, দীক্ষিত পাঠকের জন্য—এই ধারণায় আমি বদ্ধমূল বিশ্বাসী। একসময় কবিতা ছিল সার্বজনীন। কারণ তখন গদ্য ছিল না। ধারাপাতও মিল দিয়ে লেখা হ'ত। বড় বড় কাহিনী বা গদ্যের বিষয়ও কবিতায় লেখা হ'ত। যেমন চৈতন্যের জীবনী নিয়ে এখন লেখা হ'লে তা নিশ্চয় গদ্যে লেখা হ'ত। চৈতন্য জীবনী গ্রন্থগুলি গদ্যে লেখার অসুবিধে ছিল বলে কবিতার ফর্মেই তখন লিখতে হয়েছে। ছাপাখানা ছিল না। মুখস্থ ক'রে ক'রে কাহিনীগুলি ছড়াবার দায়িত্ব ছিল যা কবিতা ছাড়া সম্ভব হয়নি। আবার ছন্দ থাকলেই মিল থাকলেই তা কবিতা নামে চলতো। এখন ছাপাখানার দৌলতে লেখার বা প্রয়োজনের অনেকটা দায় ও দায়িত্ব বহন করছে গদ্য। গদ্য আয়ত্ত করা এবং গদ্য পড়ে বোঝা অনেকটাই সহজ। কবিতাকে আর সেই দায় বহন করতে হয় না। এখন কবিতা ক্রমেই শিল্প হ'য়ে উঠেছে। কবিতাকে গ্রহণ করবার মত দীক্ষিত পাঠকও তৈরী হ'য়ে গেছে। একটু বুঝিয়ে বলা যাক্। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় চমৎকার গান করেন, আমির খাঁও চমৎকার গান করেন। হেমন্তের গান যেমন খুব জনপ্রিয়, মাঠে-ঘাটে শোনা যায়—অসংখ্য মানুষ শুনে আনন্দ পায়, বুঝতে পারে, তেমন ভাবে কী আমির খাঁর গান সবাই শুনতে চাইবে? তা সম্ভব কিনা জানি না। আমির খাঁর গান বিশেষ গান। অতি সূক্ষ্ম সুরের কাজ, তা বুঝতে গেলেও চর্চার প্রয়োজন। প্রথম থেকেই যারা ঐ ধরনের গান শুনতে অভ্যস্ত, যাদের মধ্যে ঐ গানের প্রতি ভালোলাগা ভালোবাসার বীজ তৈরী হয়ে আছে—তাদের জন্যই আমির খাঁর গান উপযোগী। আমির খাঁর গান মাঠে-ঘাটে ছড়ানো সম্ভব নয়, দরকারও নেই। কবিতা এখন বিশেষ শিল্প। যারা এ বিষয়ে আগ্রহী, গভীর ভাবে ভালোবাসে—তাদের জন্যই কবিতা।

রামপ্রসাদের উদাহরণটা এই প্রসঙ্গে খাটে না। কারণ সে সময় গদ্যের প্রচলন ছিল না। রামপ্রসাদের কবিতায় যে চলতি কথার ঝোঁক আছে তা তখনকার দিনে বেশ অভিনব—আমি এ কথাই বলতে চেয়েছি। পরবর্তীকালে যারা চলতি ভাষায় কবিতা লিখেছেন, তার প্রথম সার্থক উদাহরণ তো রামপ্রসাদই। তবে জনপ্রিয় হ'য়ে ওঠার অন্যতম কারণ রামপ্রসাদী সুর। অনেক সময় কোনো কবির

কবিতাও জনপ্রিয় হতে পারে। যেমন রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা খুবই জনপ্রিয়। ভালো কবিতাও জনপ্রিয় হয়, তা ব'লে কবিতাকে জনপ্রিয় হ'তেই হবে এমন দাবী করা যায় না। রবীন্দ্রনাথেরই "একী সত্য একী সত্য/ও আমার চিরভক্ত"-এই কবিতার মধ্যে আছে "মোর নয়নের নিবিড় তিমির আলো/যেন ঈশান কোণের ঝটিকার মত কালো"—এখন এইটি কী ভাবা যায় এই কবিতার সূক্ষ্মতা সকলের বোঝা সম্ভব? 'আলো'কে 'কালো'র সঙ্গে যে তুলনা দিলেন—তার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা কী সকলেই বুঝে নিতে পারে? ঐ সূক্ষ্ম অনুভূতি মানে কবিতাকে ধরে রাখার মত অনুভূতি যাদের মধ্যে রয়েছে, তারাই এর অর্থটুকু বুঝে নেবে।

'দীক্ষিত' বলাতে আমি ইনিসিয়েটেড পাঠক বলেছি। শিক্ষিত ও ইনিসিয়েটেড তো এক নয়। কবিতার জন্য আগ্রহী, কবিতার প্রতি মনস্ক পাঠককেই আমি দীক্ষিত পাঠক বলেছি। সেই দিক থেকে বলা যায়, কবিতাকে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতেই হবে এমন কোনো দাবী ঠিক নয়।

প্রশ্ন ঃ একটি কবিতায় আপনি লিখেছিলেন যে 'গদিমোড়া চেয়ারে' বসলে 'পশ্চাতদেশ ব্যথা করে।' তখন লাথি মারতে ইচ্ছে করে ঐ গদিমোড়া চেয়ারটিকে। কেন? সত্যিই লাথি মারতে পারেন?

উত্তর ঃ এটা ঠিকই, আমি এখন একটা গদি মোড়া চেয়ারে বসে থাকি—আপিসে। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে অনেকে আসে, কিন্তু লেখককে তো ফেরাতেই হবে। সকলকে তো খুশি করা যায় না। অনেকেই মনে করে, যে যা লিখছে তা বিরাট কিছু—আসলে তা তো ঠিক নয়। তাই আমি অনেক সময় গম্ভীর হয়ে থাকি, ভুরু কুচকে কঠিন চোখে তাকাই। আসলে এটা করতেই হয়, বিশেষতঃ আপিসে। তবে গদি মোড়া চেয়ারে বসা ঐ ভূমিকাটা কী আমি পছন্দ করি? করি না। মাঝে মাঝে আমি টেবিলের ওপাশে বসা লোকটা হয়ে যাই। কিংবা ঐ নবীন কবি, ইস্তিরি বিহীন মলিন জামা গায়ে, দুরু দুরু বক্ষে আমার সামনে এসে দাঁড়ায়—তখন মনে হয় আমিও তো একদিন কবিতার জন্য ঐ রকমই ছিলাম—আমারও এই জীবনটা শুরু হ'য়েছিল অনেকটাই ঐ ভাবে—তখন সত্যিই ঐ গদিমোড়া চেয়ারটায় লাথি মারতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছেটাই করে, মারি না। যেমন এক এক সময় তো ইচ্ছে করে এই দশতলার উঁচু বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে পড়ি, মনুমেন্ট থেকে ঝাঁপ দিয়ে কিরকম সুন্দর পাখির মত ভাসতে ভাসতে একদম নিচে পড়ে যাই। এ সবই ইচ্ছে, কিন্তু পারি না। ঐ গদিমোড়া চেয়ারটাও ছাড়বার ইচ্ছে হয়, ছাড়ি না। একদিন হয়তো ছাড়তেও পারবো।

প্রশ্ন ঃ সম্প্রতি একটি কবিতায় একজন কবির অনুভবে আপনি রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে অস্বীকার করেও আবার স্বীকার করে নিয়েছেন—একটু বুঝিয়ে বলুন।

উত্তর ঃ ব্যাপারটা হচ্ছে কী, রবীন্দ্রনাথ কবি-ই নন, খারাপ লিখতেন—এ কথা যে বলে ধরে নিতে হবে তার মাথা খারাপ আছে, সে কিছুই জানে না। রবীন্দ্রনাথের কবিতা-গান সবই শিল্প। তাকে অস্বীকার করাটাই বাতুলতামাত্র। তাঁর এক একটা গান শুনলে এখনো শিহরণ আসে, মুগ্ধ হতে হয়। অসম্ভব শব্দদক্ষ কবি। একজন রসভোক্তা হিসেবে এইটিই সঠিক ধারণা ও উপলব্ধি। কিন্তু যখন আমি লিখবো, তখন রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণ ভুলে নিজেকে একা এবং একমাত্র মনে করে লিখতে হবে। এ প্রসঙ্গে বলি—

মায়াকোভস্কি একটা জায়গায় কবিতা পড়তে গিয়ে দেখেন সামনে পুশকিনের ছবি রাখা আছে। তিনি প্রথমে পুশকিনের ছবিটা নামিয়ে রাখলেন। তারপর নিজের কবিতা পড়লেন। পড়া হ'লে পুশকিনের ছবিটা যথাস্থানে রেখে চলে গেলেন। অর্থাৎ মায়াকোভস্কি যখন পড়ছেন তখন পুশকিনকে সামনে রাখা কেন? তখন তো মায়াকোভস্কিই সব।

সে রকমই আমি যখন লিখবো তখন রবীন্দ্রনাথ আবার কে? তখন তাঁকে মাথার ওপর তুলে নেবার কোনো মানেই হয় না।

প্রশ্ন ঃ "গদ্যছন্দে মনোবেদনা" জানাতে গিয়ে আপনি এক সময় কবিতা ছাড়া "ঢাউশ ঢাউশ"

উপন্যাস বা বই বা লিখতে না পারার ক্ষোভ জানিয়েছিলেন। এখন আপনি নিজেই অকাতরে বিরাট বিরাট উপন্যাস লিখছেন—তাহলে কবি সুনীলের আর ক্ষোভ নেই তো? কেন?

উত্তর ঃ খুব কঠোর প্রশ্ন। আগে এক সময় লিখেছিলাম কবিতা লিখে তেমন পয়সা পাওয়া যাচ্ছে না—ঢাউশ ঢাউশ উপন্যাস তো কত লেখকই লিখছেন। জীবন কী নিষ্ঠুর—আমায় কেমন বদলে দিয়েছে। এখন আমাকে কোথায় নিয়ে এসেছে। এখন তো সত্যিই আমি মোটকা মোটকা উপন্যাস লিখছি! এর জন্য এখনো আমার "গদ্যছন্দে মনোবেদনা" জানাতে ইচ্ছে করে। জানাই। কিন্তু যখন কবিতা লিখতে বসি—কালো রঙের খাতাটি নিয়ে... কাটাকুটি করি... একটি শব্দের জন্য ছটফট করি... এক লাইন লিখে পছন্দ হয় না, আবার লিখি, তখন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় গদ্য-লেখকটার কথাও ভুলে যাই। কোনো মেটিরিয়্যাল প্রাপ্তির কথাও সেই সময় মনে আসে না। কবিতা লিখতে না পারার বেদনা কোনো প্রাপ্তি দিয়েও পূর্ণ হয় না। আসলে মানুষ তো একই রকম হয় না। সম্পূর্ণ আদর্শবাদী, সম্পূর্ণ ভালো বা মন্দ—এমন হয় না। একটা বৈপরীত্য থাকেই। আমার মধ্যেও কবিতা লেখা ও গদ্য লেখার একটা বৈপরীত্য আছে। কবি সুনীলের মনোবেদনাটা এখন সোচ্চার না হলেও, আছে! ভেতরে ভেতরে টের পাই।

প্রশ্ন ঃ কবিতার নামকরণ ব্যাপারটা আপনি কিভাবে ঠিক করেন?

উত্তর ঃ কবিতা লেখার আগে নামের চিন্তা কখনো করি না। লেখা হয়ে গেলে ভাবি। কবিতার প্রথম লাইনটা লিখতে গিয়ে মনে হয় স্বর্গপ্রেরিত, ম্যাজিক! প্রথম লাইনটা লিখে ফেলাই সবচেয়ে কঠিন। অনেক সময় প্রথম লাইনটাই কবিতার নাম হয়ে যায়। যেন প্রথম লাইনটার দাবী অন্য সব লাইনগুলোর থেকে একটু বেশিই থাকে।

প্রশ্ন ঃ একটি কবিতায় আপনি এক সময় 'কবিতা লেখার সব প্রতিশোধ' নিতে চেয়েছেন। 'প্রতিশোধ' মানে?

উত্তর ঃ 'সব প্রতিশোধ' মানে ব্যক্তিগত নয় পৃথিবীর যাবতীয় কবি, যারা নিপীড়িত তাদের হয়েও প্রতিশোধ নিতে একজন কবি হিসেবে আমার উঠে দাঁড়ানো। জীবনানন্দ যাদের সম্বন্ধে বলেছিলেন 'শ্লেষ্মারক্ত মাখামাখি হয়েছিল' বা 'হাঙরের পেটে লুটোপুটি খেয়েছিল' সেইসব কবিদের যন্ত্রণা-অবহেলার প্রতিশোধ নেবে পরবর্তী কবিরাই। প্রতিশোধ নেওয়া মানে কবিতার সম্মানটাকে ধরে রাখা। ঐ কবিতার আর একটা লাইনে বলেছি "মেষ পালকের গানে এ পৃথিবী বহুদিন ঋণী"—আদিযুগে মেষ পালকেরা যে গান গাইতো, তার থেকেই তো কবিতার জন্ম। তাদেরও সম্মান জানাবার, তাদেরও মূল্যটুকু তুলে ধরার দায়িত্ব কবিদের আছে। পূর্ববর্তী কবিদের সৃষ্টির মূল্যটুকু অবহেলিত হতে দিলে চলবে না—পরবর্তী কবিদের সেই মূল্যটুকু সম্মানটুকু রক্ষা করে যেতে হবে— আমার প্রতিশোধটা এমনই বলা যায়।

১৫
প্রিয়লাল রায়চৌধুরী

প্রশ্ন : কবিতা আপনার জন্মভিটে। গদ্য আপনার বেড়াবার জায়গা। আপনি প্রবাসী হলেন কেন?

উত্তর : প্রবাসীতো হইনি। কবিতাতেই তো আছি। আগে যখন শুধু কবিতা লিখতাম তখনও বেশি লিখতাম না। এখনও লিখি না। তবে এখন গদ্যটা বেশি লিখি। কবিতা একটু আড়ালে পড়ে গেছে।

প্রশ্ন : আপনার কবিতা আবেগময় এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কবিতার আদর্শ সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

উত্তর : বলা খুব শক্ত। সৎভাবে নিজেকে প্রকাশ করাই কবিতার আদর্শ। আসলে আমরা কবিতার মধ্যে কোন না কোনভাবে আত্মজীবনী লিখছি।

প্রশ্ন : আপনার কবিতার প্রাণধর্ম "তারুণ্য"। এই শক্তির উৎস আপনার ব্যক্তিগত জীবনে কেমনভাবে নিহিত আছে জানতে ইচ্ছে করে।

উত্তর : এটা কি করে বলব। আমার কবিতায় কি আছে তা তো অন্য লোকেরা বলবে। অকপটে সব বলতে চাই—এটাই আমার একমাত্র ইচ্ছে।

প্রশ্ন : অনেকে বলেন কবিতা পারিপার্শ্বিকতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে সৃষ্টি হয়। আবার কেউ কেউ বলেন কবিতা আত্মজৈবনিক। আপনার অভিজ্ঞতা কি বলে?

উত্তর : প্রত্যেক কবিতার উল্লেখযোগ্য হল প্রথম লাইন। এই প্রথম লাইন একজন কবির মাথায় কি করে আসে—কেউ বলতে পারে না। এমন একটা লাইন আসে—যা কখনও ভাবিনি। পরের অংশটুকু চেষ্টা করে—effort এ হয়। এই প্রথম লাইনটা রহস্যজনক—ব্যাখ্যার অতীত। আত্মজৈবনিক?—হ্যাঁ।

প্রশ্ন : এই সময়কার কবিতা সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

উত্তর : একেবারে সমসাময়িক কবিতায় দেখা যাচ্ছে অনেকেই মোটামুটি পাঠযোগ্য কবিতা লেখে। কেউ কেউ বেশ ভাল লেখে। এখন যে শুধু শহরের ছেলেরাই কবিতা লেখেন তা নয়, গ্রাম থেকেও উচ্চমানের কবিতা পাই। তবে একটা জিনিস কবিদের মনে রাখা উচিত—কবিতার একটা বড় গুণ স্মরণীয়তা। পড়লে যেন দুএকটা লাইন মনে গেঁথে থাকবে। যেটা অনেক কবিতায় পাই না।

প্রশ্ন : আপনি কি মনে করেন না যে একজন কবিকেও তার সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হয়?

উত্তর : কবিতা লিখে মানুষের দুঃখ দারিদ্র দূর করা যাবে এটা বিশ্বাস করি না। এই সব উদ্দেশ্য প্রকটভাবে মনে রেখে যা লেখা হয় তা অকবিতা। তাতে সমাজেরও উপকার হয় না। কাব্যসাহিত্যেরও হয় না। যাঁরা খাঁটি কবি কবিতার মধ্যে সমসাময়িক জীবন তাঁরা ফুটিয়ে তুলতে বাধ্য। তা সার্থক হলেই কবিতার সমাজসেবা হবে।

প্রশ্ন ঃ আপনার লেখায় পড়েছিলাম "Socialist Realism" অর্থাৎ 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' ব্যাপারটা আপনি বোঝেন না। আপনার সাম্প্রতিক রুশদেশ ভ্রমণের সময় এরকম 'বাস্তবতা' কিছু পেয়েছেন কি?

উত্তর ঃ ওদের দেশের সাহিত্যের আগেকার বিধিনিষেধ আস্তে আস্তে কমে এসেছে। এখন মানুষের হৃদয়ের জটিলতা নিয়ে অনেক লেখাই হচ্ছে যার সবটাই শুধুমাত্র Socialist Realism-এর উপর নয়।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি মনে করেন আবৃত্তিযোগ্যতা কবিতার একটি গুণ?

উত্তর ঃ এটা নিয়ে অনেকদিন তর্ক চলছে। কবিতা পাঠ্য না শ্রাব্য। আমার দুটোর দিকেই মত আছে। শুধু একরকম হবে এটা বিশ্বাস করি না। আজকাল আবৃত্তির উপর অনেকখানি জোর দেওয়া হচ্ছে। ভবিষ্যতের যুগ Audio-Visual উন্নতির যুগ। এরপর বই না পড়ে মানুষ Video দেখে নেবে। আবৃত্তিশিল্পের ভবিষ্যত খুবই উজ্জ্বল। কবিদের মুখ থেকে কবিতা শোনার একটা ভিন্নতর আবেদন আছে। কিন্তু যারা কবিতা নিয়ে আবৃত্তিচর্চা করছে তাদের আবেদন নিশ্চয়ই শিল্প হতে পারে। অনেকে ধরে নেয় আবৃত্তিকারেরা কবিতার মানে না বুঝে পড়ে। আমি তো অনেক আবৃত্তিকারকে চিনি যাঁরা কবিতা বেশ বুঝে পড়েন।

প্রশ্ন ঃ বিদেশী বহু কবির সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছে, ঘুরেছেনও অনেক দেশ। বাইরের কোনো দেশে কবিতাকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য কবি নন অথচ অন্য ব্যক্তিত্বের সচেষ্ট প্রয়াস লক্ষ্য করেছেন কি?

উত্তর ঃ না। এ জিনিসটা দেখার অভিজ্ঞতা হয় নি। আমি বাইরে দেখেছি শুধু কবি সম্মেলন অথবা নামকরা Actor বা Actress-এর পাঠ।

প্রশ্ন ঃ আপনি একসময় কবিতা আন্দোলন করেছিলেন। সে আন্দোলন সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর ঃ আমাদের ঠিক আগে চল্লিশের কবিরা আন্দোলন করেছিলেন। অনেকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে লোকদের কবিতা শোনাত। একজনের নাম খুব মনে পড়ে। অরুণ কুমার সরকার। বেশি দিন চলেনি। পঞ্চাশের দশকে দলবেঁধে মফস্বলে নানান জায়গায় গিয়ে কবি সম্মেলন করতাম। সম্মেলনে মাঝে মাঝে শম্ভু মিত্র আবৃত্তি করতেন। আবৃত্তিকে popular করে সব্যসাচী। বহু কবি সম্মেলনে কবিতা আবৃত্তি করেছেন।

প্রশ্ন ঃ আপনি একসময় ছন্দকে বলেছেন 'বয়স্যের তর্জনী'। ছন্দকে কি সত্যিই আপনি এই দৃষ্টিতে দেখেন?

উত্তর ঃ সব যুগেই কবিরা ছন্দ নিয়ে experiment করেন। সকলেই ভাঙবার চেষ্টা করেন। আমরাও ভাঙবার চেষ্টা করেছি। কথাটা এই মনোভাবেরই একটা Expression. কিন্তু প্রত্যেক কবিরই ছন্দ জানা উচিত এবং জেনে ভাঙচুর করা উচিত।

প্রশ্ন ঃ আজকাল অনেক কবিই প্রথাসিদ্ধ ছন্দে লেখেন না, বিমূর্ত কবিতার দিকে ঝোঁক. কেন?

উত্তর ঃ কেন! আজকালকার কবিরা তো ছন্দ মিলিয়েই লিখছেন।

প্রশ্ন ঃ চল্লিশের দশকের কবিদের বর্তমান কবিতা সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

উত্তর ঃ চল্লিশের কবিদের মধ্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায় চেষ্টা করেছেন একেবারে মুখের কথা দিয়ে কবিতা লিখতে। তাঁর ইদানীং কালের কবিতায় তৎসম শব্দ প্রায় নেই। পরীক্ষাটা তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন। নীরেনদা'ও আগের থেকে অনেক বদলেছেন। কবিতার মধ্যে কাহিনী আনছেন Communication-এর জন্য।

প্রশ্ন ঃ রবীন্দ্রনাথের কবিতা আপনার কেমন লাগে?

উত্তর ঃ রবীন্দ্রনাথ বিরাট প্রতিভাবান কবি। পৃথিবীতে এমন সাহিত্য ব্যক্তিত্ব খুব কমই আছে। আমাদের এখন রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তে ভাল লাগে না। কারণ ভাষা পুরোনো হয়ে গেছে।

Abstractionটা কম ছিল। অবশ্য তাঁর সময়ের কথা চিন্তা করলে ঠিক আছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলো লম্বা। আরো ছোট করে লেখা যেতে পারতো। রবীন্দ্রনাথের গান appealing। ছোট ব'লে। গদ্যের রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এখনও খুবই পাঠযোগ্য। আর "সীমার মাঝে অসীম" বা ব্রহ্ম ইত্যাদি ব্যাপারগুলো অকপট নয়। আসলে ওঁর ছিল আকণ্ঠ সৌন্দর্য্যতৃষ্ণা।

প্রশ্ন ঃ কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা পাঠক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে কতটা প্রিয়?

উত্তর ঃ আমার কোন লেখাই আমার প্রিয় নয়। নিজের কবিতা পড়তে গেলে ত্রুটিগুলো দেখতে পাই। বড্ড অস্বস্তিতে ভুগি।

প্রশ্ন ঃ আপনার কবিতার বহু আলোচিত 'নীরা' কে?

উত্তর ঃ একটা Symbol

প্রশ্ন ঃ আপনার প্রিয় গান বা কবিতা কিছু আছে কি?

উত্তর ঃ "আমি সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়" গানটি বারবার শুনতে ভাল লাগে। কবিতা "তুমি তো তুমিই ওগো সেই তব ঋণ"... খুব ভাল লাগে। ঋণ! এত অপূর্ব ব্যবহার!! কিসের ঋণ বোঝা যাচ্ছে না।

প্রশ্ন ঃ কবিতায় সঙ্গীত বা আলোর ব্যবহার কি আপনার মনঃপূত?

উত্তর ঃ দোষের কিছু নয়। আমেরিকায় ষাটের দশকে দেখেছি কবিতা পাঠের সঙ্গে পিয়ানো, ব্যাঞ্জোর ব্যবহার। আলোর ব্যবহারও হত। তাতে কোন ক্ষতি তো হয়নি। এক ধরনের নতুন কাজ। খারাপ কি ভাল, বলবে ভবিষ্যত।

প্রশ্ন ঃ আবৃত্তির কোন Tradition আছে কি?

উত্তর ঃ ভারতবর্ষের সব জায়গাতেই কবিতা গান গেয়ে শোনানো হয়। British influence-এ আমরা বাঙলীরা কবিতা পাঠ বা আবৃত্তি করি। এর কোন Tradition নেই। কবিতা আমার মতে গান করে শোনানোর চাইতে আবৃত্তি করে শোনানো অনেক ভাল।

প্রশ্ন ঃ আপনাকে নিয়ে দুটো কবিতা সন্ধ্যা হ'ল। কেমন লাগল?

উত্তর ঃ এরপর আমাকে নিয়ে যদি কোন কবিতা সন্ধ্যা হয় আমি যাব না। কারণ—ভাল লাগে না। তাছাড়া নিজের কবিতা অন্যের কণ্ঠে শুনতে বড় বাধো ঠেকে। মনে হয় ঠিকমত লিখতে পারিনি।

প্রশ্ন ঃ আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন?

উত্তর ঃ না। যারা ভগবানে বিশ্বাস করে তারা পাগল। পাগল অর্থাৎ যুক্তিবোধ নেই।

প্রশ্ন ঃ আপনি মৃত্যুভয় করেন?

উত্তর ঃ রিল্কের কথা "৩৫ বছর কেটে যাবার পর যে মৃত্যু চিন্তা করে না, সে নির্বোধ"—আমি নির্বোধ নই।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি সুখী?

উত্তর ঃ সুখী। নিশ্চয়ই সুখী। সুখ আর তৃপ্তি এক জিনিস নয়। আমি তৃপ্ত নই।

১৬

(সর্বজন প্রিয় সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এ বছর তাঁর 'সেই সময়' গ্রন্থটির জন্য আনন্দমী পুরস্কার পেয়েছেন। যদিও ঔপন্যাসিক হিসেবেই তাঁর এই প্রাপ্তি, কবি ও 'কৃত্তিবাস' সম্পাদক সুনীলই তরুণ কবিদের কাছে আকর্ষণীয়। বেশ কিছুদিন আগে দু'টি ইংরেজী ভাষার কাগজে তাঁর সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। ২০শে নভেম্বর, ১৯৮৪ 'পেট্রিয়ট' ও ১৬ই অক্টোবর ১৯৮৩তে 'দি সানডে অবজারভার' পত্রিকায়। সাক্ষাৎকারদুটির আংশিক অনুবাদ সম্বলিত নিচের লেখাটি সাহিত্যানুরাগীদেব কথা মনে রেখে প্রকাশ করা হোলো।— সঃ)

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৩৪ সনে পূর্ববঙ্গে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা ছিলেন প্রধান শিক্ষক। খুব অল্প বয়সেই লেখালেখি শুরু করেন। সিটি কলেজের ছাত্র ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ। ছাত্রাবস্থাতেই শক্তি, শঙ্খ, আলোকরঞ্জন-এর সঙ্গে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৫৮ সনে 'একা এবং কয়েকজন' নামে তাঁর ১ম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। যদিও কবি হিসেবে তাঁর জনপ্রিয়তায় সন্দেহের অবকাশ নেই, তবু সুনীল এখন পর্যন্ত জনতার রায়ে উপন্যাস মাত্রাধিক সফল। তৃতীয় বিশ্বের সামান্য কয়েকজনের সঙ্গে খ্যাতির শীর্ষে তিনি আজ। ১৯৬৬ সনে উপন্যাস লিখতে শুরু করেন। 'মর্নিং শোজ্ দি ডেজ' এর মতোই অর্থবহ ছিল তার 'আত্মপ্রকাশ'। সুনীলের সরল স্বীকৃতি 'পরিবারকে অর্থনৈতিক নির্ভরতা দেয়া নিশ্চয় দোষের নয়' থেকে অনুমান করা যায় উপন্যাস লেখার অন্যতম উদ্দেশ্যটুকু। যদিও এরজন্য ওঁকে অনেক নিন্দামন্দ শুনতে হয়েছে। সাংবাদিকতায় এসে হেমিংওয়ে টাইপ গদ্য লেখায় অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন। রাশিয়ান লেখক দস্টয়ভস্কির দ্বারা তিনি এক সময় প্রভাবিত হয়েছিলেন। ভারতীয় মানসিকতায় রাশিয়ান লেখকদের ভাবনা চিন্তা গ্রহণযোগ্য বলেই তাঁর কাছে মনে হয়েছে। এছাড়া কাফ্কা। 'লেখক হিসেবে কাফ্কা নিজেই ছিলেন 'এক্সাইল'। প্রথমতঃ একজন ইহুদী, দ্বিতীয়ত চেকোশ্লোভাকিয়ায় বসে জার্মান ভাষায় লিখেছেন।' ফরাসী কবিদেব মধ্যে বোঁদলয়ের, র‍্যাঁবোই তাঁর বেশি পছন্দ।

● গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি?

ধারণা গড়ে তোলার জন্য ওরা আমাকে পর্য্যাপ্ত সময় দেয়নি। এ বছর (১৯৮৩) জুন মাসেই আমি ওদের কথা শুনি। 'সেই সময়' এর বিরুদ্ধে (এবং-সং ১৮, সম্পাদকীয় দ্রষ্টব্য) চীৎকার চেঁচামেচি শুরু করেছিল। বিস্মিত হয়েছিলাম। দীর্ঘকাল লেখার সঙ্গে জড়িত আছি। কিন্তু ওদের কথা জানতাম না।

● আপনি অন্তত এই সংঘের কয়েকজনের নাম শুনে থাকবেন।

হ্যাঁ। আমি এঁদের কয়েকজনকে চিনি। এঁরা কেউই প্রকৃত লেখক বা শিল্পী নন যেরকম ওরা ভান করেন। ওঁরা আসলে রাজনীতিবাজ।

● অনুগ্রহ করে আপনি ওদের নাম বলবেন?

নারায়ণ চৌধুরী নামে একজন ব্যক্তি আছেন। প্রথমে উনি ছিলেন গান্ধীবাদী। এখন উনি বাম

বুদ্ধিজীবীদের প্রবক্তা। এইসব বাম চিন্তাবিদরা সাহিত্যের ওপর প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ। আর সেই জন্যই আমি ওঁদের কথাবার্তায় গুরুত্ব দিই নি। যদি আমাকে কোনো বই সম্পর্কে বলতে হয় তাহলে প্রথম কাজ বইটি পড়ে ফেলা। এরপর নিন্দা বা প্রশংসার প্রশ্ন আসে। ওরা সমালোচনা করতে হয় বলে সমালোচনা করে। আমি ওঁদের 'ইগ্‌নোর' করি এই জন্যই যে ওঁরা আমার বইটি পড়েনি।

মার্ক্সবাদীদের মতে আমরা হচ্ছি প্রতিক্রিয়াশীল, সি-আই-এর এজেন্ট, সামাজিক অবক্ষয়ের কারণ। আমি জানি না এ ধরনের সংঘ কবে জন্মেছে। তবে এই সব তথাকথিত মার্ক্সবাদী বুদ্ধিজীবীরা চিরকালই আমাদের মত কবি, লেখক, শিল্পীদের আক্রমণ করে এসেছে। কিন্তু এইসব অসঙ্গত আলোচনা আমাদের ছুঁতে পারে না।

● কিন্তু আপনি ছিলেন এদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য?

হ্যাঁ। ওঁদের কাছে আমি শুধু প্রতিক্রিয়াশীল নই, শত্রুও। ওঁরা আমাকে এমনিতেই সহ্য করতে পারে না। তার ওপর আমি আবার আনন্দবাজারে কাজ করি। **পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভায় প্রকৃতপক্ষে কোনো বিরোধী দল নেই। কংগ্রেস (ই) এখানে খুবই দুর্বল। সেই কারণেই এবিপিকে (আনন্দবাজার পত্রিকা) ওরা বিরোধী দল বলে মনে করে।** অনেক মার্ক্সবাদীই মনে করেন ওদের আক্রমণ করে মাঝে মধ্যে সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় আমিই লিখি। কিন্তু আসল সত্য হোলো আমি কখনোই সম্পাদকীয় লিখিনি। সাহিত্যের পাতাই দেখি। এখন অবশ্য এবিপি গ্রুপ-এর 'দেশ' পত্রিকায় কাজ করছি। যা সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক কাগজ। এপ্রসঙ্গে একটা কথা আমি বলি, মার্ক্সসিস্ট কর্মী বলে খ্যাত এরকম অনেকে চিঠিতে কিংবা টেলিফোনে আমায় জানিয়েছে যে তাঁরা আমার লেখার প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন নন। আমি আশা করবো প্রকাশ্যে ওঁরা ওদের পছন্দের কথা বলুক।

● সাম্প্রতিক বিতর্ক 'সেই সময়' নিয়ে, আপনি কি সংক্ষেপে উপন্যাসের গল্পটি বলবেন?

উপন্যাসটি দু'খণ্ডের। ১৮৪০ থেকে ১৮৭০। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা। বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রামকৃষ্ণ এরকম প্রখ্যাত ব্যক্তিরাই এই গ্রন্থের চরিত্র। মার্ক্সবাদীরা আমাকে ঐসব ঐতিহাসিক চরিত্রদের দুর্নাম দেওয়ার জন্য অভিযুক্ত করেছেন। এটা নিশ্চয় মনে আছে যে এইসব প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের মার্ক্সসিস্টরাই নানা ভাবে দুর্নাম করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে একটি সি পি আই (এম) জর্ণাল-এ রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরিবারকে নিয়ে ধারাবাহিক লেখা বেরিয়েছিল।

● মার্ক্সবাদীদের অভিযোগ যে 'সেই সময়' তরুণদের নষ্ট করবে—

এইসব সমালোচকদের কাছে 'লিটেরেচার ইজ গ্রীক।' এরা জনসংঘের মতই নীতিবাগীশ। এঁরা যখনই কোনো উপন্যাসে যৌন-অন্তরঙ্গতা বা দৈহিক ভালবাসার কথা দেখেন, তখনই অধোগামিতার কথা বলেন। 'গেল গেল' রব তোলেন। এখন ওঁরা একটি নতুন কথা বলছেন 'অপসংস্কৃতি', ওদের এ্যাটিচিউডটাই 'ফানি'। আমরা সকলেই প্রেমে পড়ি, প্রেমিকার সঙ্গে মিলন সুখ উপভোগ করি কেউ কেউ। এটা আসল সত্য। এ সত্যকে লুকোনোর চেষ্টা করছে কেন ওরা। তাছাড়া প্রেমের গল্প হচ্ছে ঘটনার বর্ণনা। আমি ওঁদের ঔদ্ধত্য ও বোকামি দেখে বিস্মিত।

● 'সেই সময়' এর প্রধান চরিত্র কে?

নবীনকুমার। যাকে সেই সময়ের সমাজের ও সাহিত্যের এক প্রধান ব্যক্তিত্ব কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুকরণে সৃষ্টি করা হয়েছে।

● আপনি কি দক্ষিণপন্থী বা বামপন্থী অথবা সুবিধাবাদী?

যৌবনে অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টির স্টুডেন্টস্ ফ্রন্টের সভ্য ছিলুম। ক্রমেই তাঁদের অপছন্দ করতে লাগলুম। কেননা ওরা লেখককে টার্ম ডিক্টেট করতে শুরু করেছিল। এস, এফ র সঙ্গে দূরত্ব তখন থেকেই বাড়লো। এরপর আর কোনো রাজনৈতিক দলেই আমি ছিলাম না।

যখন কংগ্রেস এই রাজ্যে সরকার ছিল, আমি কখনোই রাইটার্স বিল্ডিংয়ে মন্ত্রীদের সঙ্গে দ্যাখা করতে যাইনি। আমি এটা এখনও মেনে চলি। রাজনীতি থেকে সরে থাকতে চাই। অবশ্য আমার

নিজস্ব একটা 'পলিটিক্যাল ফেইথ' তো আছেই। আমি মনে করি এই সভ্যতা সমাজবাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

● পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীদের কি আপনি সমাজবাদী বলবেন?

না। অতীতের কংগ্রেসরাজ-এর সঙ্গে বর্তমান শাসক বামফ্রন্টের কোনো পার্থক্য নেই। কংগ্রেসীরাও নিজেদের সমাজবাদী বলে মনে করেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে সুনীল ঋণী। জীবনানন্দই তাঁকে বেশি আকৃষ্ট করে। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পেই রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া যায় বলে তাঁর ধারণা। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতারও তিনি একনিষ্ঠ পাঠক। অনুবাদের মাধ্যমে হলেও প্রেমচাঁদ তার প্রিয়।

● বামপন্থীরা শিল্প সংস্কৃতিতেও প্রকাশ্যে বাধার সৃষ্টি করেছেন...

ওদের এই অযথা হস্তক্ষেপ এতটাই অগোছালো যে নিজেদের কথা নিজেদেব হজম করতে হচ্ছে। সংগীতশিল্পী ঊষা উত্থুপের কথাই ধরা যাক। এনিয়ে জ্যোতি বসু ও যতীন চক্রবর্তীর মধ্যে চোখাচোখিও ছিল না।

আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলি। একদিকে মার্ক্সবাদীবা 'সেই সময়'কে প্রতিক্রিয়াশীল লেখা বলেছেন (সরকারী স্বীকৃতি হিসেবে বঙ্কিম পুরস্কার পাওয়ার পরও) অন্যদিকে 'গরমভাত' ও 'মহাপৃথিবী' নামে দুটি উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ণে বামফ্রন্ট সরকার অর্থ সাহায্য করেছেন। আসলে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই ওঁদের। এই অপেশাদারী ভঙ্গির জন্যই আমার করুণা হয়।

এক সময় অনেক প্রখ্যাত লেখক ও তাত্ত্বিক ওদের সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু সকলেই হতাশ হয়ে সংশ্রব ত্যাগ করেছেন। **শুধু তৃতীয় শ্রেণীর লেখকরাই লেফটিস্ট ক্যাম্পে রয়ে গেছেন। শিল্প বা সংস্কৃতির ওপরে বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেবারও কোনো মানুষ নেই ওদের মধ্যে।** বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য একটি ব্যতিক্রম। উঁচুমানের নেতোরা পড়েনটড়েনও না। পরিবর্তে ওরা নীচু তলার পার্টি ওয়ার্কারের সিদ্ধান্তের ওপরেই নির্ভরশীল।

সমরেশ বসু এক সময় বামপন্থীদের সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু তাঁকে এত সুন্দরভাবে বিপর্যস্ত করা হয়েছিল যে উনিও ওঁদের হতাশ করেন। এখন সমরেশ অনেক ভালো আছেন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে হিন্দী সাহিত্য খুব একটা এগোয় নি। তুলনায় মালয়ালম ও মারাঠী সাহিত্য অনেক পরিণত। বাসুদেবন নায়ার এর কাজ ওঁর ভাল লাগে। সোভিয়েট ইউনিয়নে গিয়ে লক্ষ্য করেছেন সাহিত্য বিষয়ক বিপুল কর্মকাণ্ড। মোট ৭৮টি ভাষা আছে ইউ এস এস আর এ। অনুবাদের মাধ্যমে বৃহত্তব পাঠকের কাছে সেইসব লেখা পৌঁছে দেয়ায় সাহিত্যেরই মঙ্গল হচ্ছে বলে সুনীল জানিয়েছেন। এদিকে বেশির ভাগ ভারতীয় লেখকই এক সময় পাশ্চাত্য সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এমন কি প্রখ্যাত শক্তি চট্টোপাধ্যায়ও তাঁর কবিতায় ক্রীশ্চিয়ান সিম্বলিজম ব্যবহার করেছেন। যদিও এখন শক্তি আর করেন না।

যে লেখক যে ভাষায় চিন্তা করেন, তাতেই তাঁর লেখা উচিত বলে মনে করি। ইংরেজীতে লেখেন, এবং ভাল লেখেন এরকম অনেকেই বৃহত্তর পাঠকের কাছে পৌঁছুতে পারছেন না এই জন্য যে তিনি চিন্তা করছেন এক ভাষায়, লিখছেন অন্য ভাষায়। ফলে লেখা হয়ে পড়ছে এ্যাকাডেমিক, অ-ভারতীয়। রাজীব প্যাটেল গুজরাতী ভাষায় লেখেন। তাঁর কবিতায় গুজরাতী লোকগাথা ও গ্রামের মৌখিক ভাষা এমন দক্ষতায় মিশেছে যে একটা নতুন স্টাইলের জন্ম দিয়েছে যা ইংরেজী ভাষায় লেখা হলে সম্ভব হোত না।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় যে বলেছেন নোবেল প্রাইজ নিয়ে রাজনীতি হচ্ছে এতে আমি একমত। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখকদেরই এই পুরস্কার পাওয়া উচিত। অনেক সময় অনেক লেখক এই পুরস্কার পাচ্ছেন যাঁদের নামও আমরা শুনিনি।

বেলজিয়ামে World Bienniel Poetry Conference-এ ৪৭টি দেশ থেকে ২৫০ ডেলিগেট উপস্থিত ছিলেন। ভারত থেকে একমাত্র সুনীলই গিয়েছিলেন। পাঠক শুনে দুঃখ পাবেন যে অধিকাংশদেরই ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে কোনো ধারণা নেই। বেশির ভাগই ভগবদগীতা, বেদ ছাড়া কিছু জানেন না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ওদের কাছে একজন সন্ন্যাসী ছাড়া কিছু নন যিনি মিস্টিক কবিতা লিখেছেন। ওঁরা জানেই না যে রবীন্দ্রনাথ রিয়ালিস্টিক ছোট গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন। **ওঁরা মনে করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় সাহিত্য শেষ হয়ে গেছে।**

সুনীলের মতে মৃণাল সেন একজন কমিটেড পরিচালক। লেফট ওরিয়েন্টেড ফিল্মই তিনি বেশি করেন। খুবই প্রতিভাবান ও দক্ষ পরিচালক। যদিও মাঝেমধ্যে তিনি নিজের প্রতি অবিচার করে ফেলেন কোনো কোনো ছবিতে। এখন অবশ্য মৃণাল স্টাইল পাল্টেছেন। সত্যজিৎ রায় রেঁনোয়া দ্বারা এক সময় প্রভাবিত হয়েছিলেন। চিত্র পরিচালকদের মধ্যে উনি হচ্ছেন মার্শাল প্রুস্ত।

স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে একটা জীবনীগ্রন্থ লেখার ইচ্ছে আছে যাতে আমি তাঁর সত্য জীবনটাকে তুলে ধরতে চাই। ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর একটা সম্পর্ক ছিল—এটা আমি সেখানে বলতে চাই। কিন্তু আমার প্রকাশক প্রত্যাখ্যান করেছেন কেননা, এতে নাকি সারা বাংলা ক্ষেপে যেতে পারে।

● শুনেছি, নিষিদ্ধ জায়গায় যেতে আপনার পছন্দ ছিল...

ছোটবেলায়। যখন ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের মিশতে দেয়া হোত না। বয়ফ্রেন্ড বা গার্লফ্রেন্ড ব্যাপারটা অজানা ছিল। তাই বন্ধুদের নিয়ে বেশ্যালয়ে যেতাম। সেখানে অনেক মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল। গল্প করতাম, তাস খেলতাম। ওদের সঙ্গে মদ খেতাম। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ওদের সঙ্গে ঘুমোতো। এসব নিয়ে আমার কোনো অপরাধবোধ নেই।

● ব্রথেলের এক সুন্দরী তরুণী পুলিশ স্টেশনে এসেছিল আপনাকে উদ্ধার করতে, এ বিষয়ে সবিস্তারে যদি ..

১৯৬৪ সালের ঘটনা। আমরা কয়েকজন ব্রথেলের যে ঘরে বসে মদ্য পান করছি, ঐ বিল্ডিংয়েরই আর একটি ঘরে তখন একটি খুন হয়। যথারীতি পুলিশ আসে। চারদিক ঘিরে ফেলে। আমাদেরও। নিকটবর্তী পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর যার ঘরে বসে আড্ডা মারছিলাম সেই তরুণী থানায় আসে। হ্যাঁ, এই ঘটনা আমাকে এখনও মুভ করে। কখনোই ভুলতে পারব না।

১৭

('আবর্ত' সাহিত্য পত্রিকা থেকে গল্পকার শচীন দাশকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল কবি ও ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য। শচীন যে সব তাকে প্রশ্ন করেছেন এবং তিনি যা যা উত্তর দিয়েছেন তাই এখানে প্রকাশ করা হ'ল।
মূলত গত দুই দশক ধরে বাংলা কবিতা ও গদ্যের ইতিহাসে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম শোনেননি, বোধকরি এমন দু'একজনও নেই। 'একা এবং কয়েকজন', 'আমি কী রকমভাবে বেঁচে আছি', 'বন্দী জেগে আছো?' কিংবা 'দাঁড়াও সুন্দর' প্রভৃতি কবিতাগ্রন্থে যেমন, তেমনি 'যুবক যুবতীরা', 'আত্মপ্রকাশ', 'অর্জুন' 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'আমিই সে', প্রভৃতি উপন্যাস এবং 'বিজনের বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য', 'প্রতিশোধের একদিক', 'তিনটে খাঁচা', 'দূর থেকে দেখা', 'খরা' ইত্যাদি গল্পে সুনীলকে পাওয়া যায় গভীরভাবে।
তবে বিখ্যাত পত্র-পত্রিকায় তিনি অজস্র লিখে চললেও লিটিল ম্যাগাজিনের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়েন নি। এখনো অসংখ্য লিটিল ম্যাগাজিনে কবিতা লেখেন। লিখতে ভালবাসেন। কেননা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, মূলত লিটিল ম্যাগাজিনেই তাঁর অসংখ্য ভালো কবিতা রচিত হয়ে গেছে।) সম্পাদক — 'আবর্ত'।

প্রশ্ন ঃ আমাদের ধারণা প্রকৃত লেখক মাত্রেই কোন ব্যক্তিগত সংকট বা Crisis থেকে প্রেরণাতাড়িত হয়ে লেখেন। আপনার লেখার প্রেরণা হিসেবে এ'জাতীয় কোন সংকট কাজ ক'রে বলে আপনার মনে হয়?

উত্তর ঃ ব্যক্তিগত সংকট থেকে প্রেরণা আসে, সে কথা ঠিক। তবে সেটা প্রথম জীবনেই বেশী সত্য থাকে। নানা রকম ব্যর্থতা ও অপমানের গ্লানি থেকে মুক্তির একটা পথ পাওয়া যায় নিজের রচনায়। নানা জাতের অপমান আমাকে লেখার জন্য অনেকবার উত্তেজিত করেছে। তবে সাহিত্য জগতে কিছুদিন থাকবার পর, প্রতিটি লেখাই এক একটি আলাদা নির্মাণ। তার কার্যকারণ অনির্দিষ্ট। যেমন জুয়া খেলায় হেরে গিয়ে দ্রুত টাকা রোজগারের আশায় ডস্টয়েভস্কি তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পটি লিখেছিলেন।

প্রশ্ন ঃ পঞ্চাশের দশকে আপনি কবি হিসেবে যথেষ্ট মৌলিকতা এবং ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু তাসত্ত্বেও আপনি সাম্প্রতিক কালে কবিতা থেকে গদ্য রচনায় বেশী ঝুঁকেছেন কেন? আত্মপ্রকাশের মাধ্যম রূপে উপন্যাস বা গল্প কি অধিকতর সার্থক বলে মনে হয়?

উত্তর ঃ কবিতা রচনা আমি বন্ধ করিনি, তবে তার অধিকাংশই প্রকাশিত হয় লিট্‌ল ম্যাগাজিনে। আমি কোনোদিনই খুব বেশি কবিতা লিখতাম না। কবিতা লিখতে কিংবা লেখার জন্য প্রস্তুত হতে আমার বেশী সময় লাগে, সে তুলনায় গদ্য লিখতে পারি খুব তাড়াতাড়ি। প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে অবশ্য আমি গদ্য বা কবিতায় কোনো ভেদ দেখি না।

প্রশ্ন ঃ আমরা জানি জীবিকার জন্যই আপনি একটি সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত—এতে ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয় আপনাকে অনেক লেখাই লিখতে হয়। এর ফলে আপনার সৃষ্টিশীল লেখায় কোন ক্ষতি হয় বলে কি আপনি মনে করেন?

উত্তর : সবচেয়ে ভালো, কোথাও চাকরি না করা। আমি সরকারি অফিসে কেরানিগিরি করেছি, এখন সংবাদপত্রে কাজ করি। চাকরি হিসেবে সংবাদপত্রের কাজটাই ভালো। বেশী লিখলে কারুর কোনো ক্ষতি হয় বলেও মনে হয় না। সংবাদপত্রে কাজ না করেও তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক বেশী লিখেছেন। সংবাদপত্রে যেগুলি অনিচ্ছার সঙ্গে লিখতে হয়, সেগুলো ওপরের স্তর দিয়ে চলে যায়, ভেতরের কিছু ওলোট পালোট করে না।

প্রশ্ন : আপনার প্রতিটি উপন্যাসেই দেখা যায় নগর জীবনের মানসিকতাই প্রাধান্য লাভ করছে—কিন্তু গ্রামীণ জীবন বা তার মানসিকতা নিয়ে উপন্যাস লেখার কথা কি আপনি ভাবেন না?

উত্তর : আমার গ্রাম সম্পর্কে তেমন অভিজ্ঞতা নেই। পূর্ববঙ্গের গ্রামে কিছু দিন কাটিয়েছি, তার চিহ্ন আছে কিছু কিছু রচনায়। পশ্চিমবাংলার গ্রামকে ভালো করে চিনলে, একদিন লিখবো নিশ্চয়ই।

প্রশ্ন : কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করছি উপন্যাস রচনায় আপনি পুরাণ প্রতিমা বা Myth কে Structure হিসেবে ব্যবহার করছেন—এই রীতি পরিবর্তনের পেছনে কোন তাগিদ কাজ করে?

উত্তর : হ্যাঁ একথা ঠিক নানা ভাবে মীথ্‌কে ব্যবহার করার ইচ্ছে প্রায়ই আমার মনে জাগছে। কেন যে এই ইচ্ছেটা জাগছে, বা কিসের তাগিদে, তা ঠিক বলতে পারবো না। এর পেছনে কোন সজ্ঞান প্রয়াস নেই।

প্রশ্ন : আচ্ছা, আপনি কি মনে করেন একজন লেখকের পক্ষে অধিক পঠন পাঠন তার মৌলিক লেখক সত্তাকে ক্ষুণ্ণ করে?

উত্তর : না। আমি অশিক্ষিত সাহিত্যিক পছন্দ করি না। শুধু নিজের অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট নয়, গ্রন্থ সমূহে মনুষ্যজাতির যে অভিজ্ঞতার কথা আছে তাও যথা সম্ভব জানা দরকার। স্বভাব-কবিত্ব জিনিসটা আসলে খুব ছোট মাপের হয়।

প্রশ্ন : আপনার সমসাময়িক লেখকদের সম্পর্কে ধারণা আমরা নানা জায়গায় পড়েছি, পরবর্তী সময়ের কোন কোন কবি ও লেখককে আপনি লেখক হিসেবে স্বীকার করেন?

উত্তর : অনেকেই ভাল লিখছেন। এটা শুধু মনে রাখা কথা নয়, সত্যি। পত্রপত্রিকা সবই আমি পড়ি, যেহেতু পড়াটাই আমার নেশা। তবে চট করে দু'চারজনের নাম করলে আরও ক'জনের নাম বাদ পড়ে যাবার সম্ভাবনা। এ সম্পর্কে বিস্তৃত ভাবে পরে কিছু লেখা যাবে এখন।

প্রশ্ন : একসময় আপনার সম্পাদিত 'কৃত্তিবাস' বাংলা কবিতার আন্দোলনে এক নতুন পথে বাঁক নিয়েছিল—দীর্ঘদিন বাদে আবার নতুন পর্যায়ে আপনি 'কৃত্তিবাস' সম্পাদনা করছেন—জানতে ইচ্ছে হয় 'কৃত্তিবাস' নিয়ে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি?

উত্তর : সত্যিকার বলতে কি, কৃত্তিবাস সম্পাদনার ব্যাপারে এক সময় আমি যতটা সময় দিতে পারতাম এখন আর পারি না। এটা শুধু আমার সময়ের অভাবের জন্যই নয়। আজকাল আমার একটু ক্লান্ত লাগে। সম্পাদনার কাজে আমার ঝোঁক চলে গেছে। পত্রিকা মানেই তো দলাদলি, আমার আর ভাল্লাগে না। কৃত্তিবাস এখন চলছে নিজের নিয়মে।

প্রশ্ন : নিজের লেখালেখি সম্পর্কে আপনার কি মনে হয়?

উত্তর : এখনো সত্যিকারের সার্থক কিছু লিখতে পারিনি। তবে লেখার ইচ্ছে আছে। আর দশ বছর যদি বাঁচি, তাহলে হয়তো অন্তত একখানা ভাল বই লিখে যেতে পারবো।

প্রশ্ন : আচ্ছা আপনার লেখার জগতে বাইরের অভিজ্ঞতাই কি বেশী কাজ করে— অর্থাৎ আমি বলতে চাই এলোমেলো ঘোরা, কিংবা বিভিন্ন দেশভ্রমণ ইত্যাদির ইমেজ কি বেশী কাজ করে—নাকি শুধুমাত্র ইনট্যুইশন?

উত্তর : এক একজনের ক্ষেত্রে এক একরকম। আমার ক্ষেত্রে, ভ্রমণটা বেশ উপকার দেয়। যেমন উদাহরণ দিচ্ছি, কয়েকদিন আগে মুকুটমনিপুর বলে একটা জায়গায় পা দিয়েই আমার মনে হলো, জন্মান্তর বিষয়ে একটা কিছু লিখবো। এর সঙ্গে মুকুটমনিপুরের সম্পর্ক কি? কিছুই না। তবু এ কথাটা আমার কলকাতায় মনে পড়েনি, ঐ জায়গায় গিয়েই মনের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

১৮

'সত্তর দশক'-এর তরফ থেকে সুজয় বসু ইতিপূর্বে আমাদের বহুবিতর্কিত ঔপন্যাসিক সমরেশ বসুকে কিছু প্রশ্ন করেছিলেন সেই প্রশ্নোত্তর পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

বর্তমান সংখ্যায় কিছু প্রশ্ন রাখা হয়েছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে। গত পনের বছরে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম শোনেন নি, আধুনিক কবিতার এমন পাঠক কেউ আছেন কিনা জানি না, আমরা তার সঙ্গে পরিচিত হইনি। কবি সুনীল এখন উপন্যাস লিখছেন, এ পর্যন্ত বহু উপন্যাস লিখেছেন বাংলাদেশের সব বিখ্যাত পত্রপত্রিকায়, তার মধ্যে অনেকগুলিই ইতিমধ্যে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হোয়ে গেছে। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে বহু পঠিত, বহু আলোচিত 'যুবক যুবতীরা', 'আত্মপ্রকাশ', 'অর্জুন', 'প্রতিদ্বন্দ্বী'। তাঁর কবিতাগ্রন্থ 'একা এবং কয়েকজন', 'আমি কীরকমভাবে বেঁচে আছি', 'বন্দী, জেগে আছো?', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'ও প্রকাশিত হোয়ে গেছে। সুনীল এ পর্যন্ত অনেকগুলি ছোটগল্পও লিখেছেন।

কিন্তু লিটল ম্যাগাজিনের সঙ্গে এখনো তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সেটা এই সাক্ষাৎকার থেকেই বোঝা যাচ্ছে। আজ হয়তো কবি সুনীল অপেক্ষা, ঔপন্যাসিক অথবা গল্পকার সুনীল অনেক বেশি জনপ্রিয়। সেটাই স্বাভাবিক, কবিতার সঙ্গে জনপ্রিয়তার বিরোধ তো অনেককালের। সুনীল বলেছেন, শুধু কবিতার জন্যে বেঁচে থাকা, শুধু কবিতার জন্যে এই পৃথিবীতে আরো দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে লোভ হয়, তাঁর।

সম্পাদক, সত্তর দশক

সুজয় বসু

বসু : উপন্যাস লেখবার সময়ে কিভাবে আপনি আপনার লেখার কাঠামো গড়ে তোলেন? উপন্যাস হোলে কি লেখকের সেই বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভাল পরিচয় থাকা উচিত?

গঙ্গোপাধ্যায় : উপন্যাস লেখবার সময় আমি কোনোকিছু ভেবে চিন্তে শুরু করি না। হঠাৎ কিছু একটা মনে আসে, লিখতে শুরু করি।

উপন্যাস লিখতে হলে সেই বিষয়বস্তু সম্পর্কে ত ভাল পরিচয় রাখতেই হবে। তবে এটার দুটো অর্থ করা যেতে পারে। একন, শুধু কয়লাখনি সম্পর্কে যদি লিখি তবে আমাকে কয়লাখনি সম্বন্ধে ডিটেল্‌স জানতে হবে, কিন্তু আমি যদি কয়লাখনিতে দুটি তরুণ-তরুণীকে নিয়ে উপন্যাস লিখি তাহলে কয়লাখনি সম্পর্কে পরিচয় না থাকলেও চলে।

বসু : বর্তমানে সাহিত্যে শ্লীলতা ও অশ্লীলতা নিয়ে অনেক বাগ-বিতণ্ডা আরম্ভ হোচ্ছে, এবং ব্যাপারটার যথেষ্ট গুরুত্বও আছে। আচ্ছা, আপনার মতে সাহিত্যে অশ্লীলতা বলতে কি বোঝায়?

গঙ্গোপাধ্যায় : পুরো বিতর্কটাই অর্থহীন। কেননা ভাল জিনিষের মধ্যে কখনই অশ্লীল কিছু থাকতে

পারে না। তাছাড়া সাহিত্য কখনও অশ্লীল হতে পারে না। অনেক বই নোংরা হয়, কিন্তু তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

বসু : আপনার গল্প উপন্যাসের নায়িক-নায়িকারা সম্পূর্ণভাবে পরাজয় স্বীকার করে না। এর দ্বারা কি বোঝায় না যে আপনি আশাবাদী?

গঙ্গোপাধ্যায় : আমি আমার গল্প উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের একেবারে নিরাশার মধ্যে ফেলে রাখি নি। তারা কিভাবে হতাশা, দৈন্য কাটিয়ে সমস্ত পরাজয়ের বেদনা ভুলে উপরে উঠছে—সেইটাই আমি দেখিয়েছি। আমি চিরকাল আশাবাদী। কেননা জীবনে স্ট্রাগল ত থাকবেই এবং সেই বাধা-বিপত্তিকে পর্যুদস্ত করে এগিয়ে যাওয়া—সেটাই তো মূল কথা। মানুষ সবসময় তার পরিবেশকে ছাড়িয়ে উপরে উঠতে চায়।

বসু : রাজনীতিকে আপনি কি পরিমাণ গুরুত্ব দেন?

গঙ্গোপাধ্যায় : রাজনীতি ব্যাপারে আমি একদম মাথা ঘামাই না। তাই রাজনীতি আমার গল্প-উপন্যাসে একেবারে অনুপস্থিত। তাছাড়া, রাজনীতি সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্তন হোচ্ছে। জিনিষটা খুবই সাময়িক।

বসু : সমসাময়িকদের মধ্যে কার কার কথা আপনি উল্লেখযোগ্য মনে করেন?

গঙ্গোপাধ্যায় : সমসাময়িকদের মধ্যে বিমল কর, সন্তোষকুমার ঘোষ, রমাপদ চৌধুরী, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, কমলকুমার মজুমদার, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ প্রভৃতির লেখা আমার ভাল লাগে।

বসু : একনাগাড়ে আপনি কতক্ষণ লিখতে পারেন?

গঙ্গোপাধ্যায় : একসঙ্গে দু-তিন ঘণ্টার বেশী নয়।

বসু : আপনার লেখায় কার কার প্রভাব পড়েছে বলে মনে করেন?

গঙ্গোপাধ্যায় প্রত্যেক লেখকই বলতে চান যে তার মতন লেখা আগে পৃথিবীতে আগে কেউ লেখেনি। কেউ কি আর তার লেখায় অন্যের প্রভাব স্বীকার করেন? তবে যদি জানতে চাওয়া হয়, সেটা প্রশ্ন করা উচিত পাঠককে। কারণ তাঁরা বিচার করবেন, আমার লেখায় কার কার প্রভাব পড়েছে।

বসু : আচ্ছা, একজন সার্থক সাহিত্যিক হতে গেলে অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উভয়দিক দিয়ে তার কি কি গুণ থাকা দরকার বলে আপনি মনে করেন?

গঙ্গোপাধ্যায় : সার্থক সাহিত্যিক হতে গেলে ভাষার উপর খুব দখল থাকা চাই। অনেকের বিশেষ করে মেয়েদের দেখবেন, যে কোন ঘটনা খুব ডিটেলসে তারা বলতে পারে। কিন্তু লিখতে দিলে তারা একদম পারবে না। তাছাড়া, সাহিত্যিক হতে গেলে ছোটবেলা থেকেই তার এর প্রতি আসক্তি এবং লেখবার ক্ষমতা থাকা চাই। তা না হলে সম্ভব নয়।

বসু : আপনি ত' দেশ-বিদেশের বহু জায়গাতেই ঘুরেছেন, এবং অভিজ্ঞতাও হয়েছে কিছু। আচ্ছা বলতে পারেন জীবনের সংজ্ঞা কি? শুধু যশ এবং অর্থ হলেই কি জীবন সার্থকময় হয়ে ওঠে? না তার আরও কিছু প্রয়োজন?

গঙ্গোপাধ্যায় : জীবনের সঠিক অর্থ কি কেউ বলতে পারে? বলতে গেলে সারাজীবন ধরেই এর অর্থ খুঁজে যেতে হয়। কেউ হয়ত সারাজীবন ধরে অন্বেষণ করে এর সার্থকতা খুঁজে পায়, আবার কেউ হয়ত তাও পায় না।

শুধু যশ এবং অর্থ পেলেই জীবন কখনই সার্থক হতে পারে না। তার আরোও কিছু চাই। তবে সেটা প্রত্যেকে তার নিজের ব্যক্তিগত জীবনে খুঁজে বের করবার চেষ্টা করে।

বসু : আপনার 'প্রতিদ্বন্দ্বী' উপন্যাসের নায়ক সিদ্ধার্থ কোলকাতার অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে নি; তাই ব্যর্থ হয়ে শহর ত্যাগ করেছে। আচ্ছা, এ জগতে কি সৎ ও অধ্যবসায়ের কোন মূল্যই নেই?

গঙ্গোপাধ্যায় : শহরের সর্বময় নীচতা ও কপটতায় পর্যুদস্ত হয়ে শহর ত্যাগ করলেও সিদ্ধার্থ এটা কখনই মেনে নেয় নি। এই নোংরামির বিরুদ্ধে সে তীব্র প্রতিবাদ করেছে। বইয়ের শেষদিকে আমি তার বক্তব্য রাখতে চেষ্টা করেছি। সে বলেছে, আবার সে ফিরে আসবে, এবং প্রতিশোধ নিয়ে সব কিছু জয় করবে।

বসু : সমরেশ বসুকে কেমন লাগে?

গঙ্গোপাধ্যায় : সমরেশ বসুর সব লেখা ভাল লাগে না। কিছু কিছু ভাল লাগে; আবার কিছু কিছু খারাপ লাগে।

বসু : আপনি কি পাঠক-পাঠিকাদের কথা চিন্তা করে লেখেন? যদি লেখেন তবে তা কোন শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকাদের জন্য?

গঙ্গোপাধ্যায় : পাঠক-পাঠিকাদের কথা চিন্তা করেই আমি লিখি। তবে তা কোন শ্রেণীর পাঠকের জন্য নয়। প্রত্যেকেরই জন্য। যার খুশী পড়বে, যার খুশী পড়বে না—তাতে আমার কিছু যায় আসে না।

বসু : আপনাকে অনেকে উপন্যাসকার অপেক্ষা কবি হিসাবেই চিহ্নিত করেন। ঔপন্যাসিক হিসাবে আপনাকে মানতে চান না। আপনি কি তা স্বীকার করেন?

গঙ্গোপাধ্যায় : হ্যাঁ, স্বীকার করি।

বসু : আচ্ছা, উপন্যাসের চরিত্র-চিত্রণের সঙ্গে আপনার ব্যক্তিগত চরিত্রের কোন সদৃশ আছে কি?

গঙ্গোপাধ্যায় : হ্যাঁ। প্রায় প্রত্যেক বইতে আমার নিজের ব্যক্তিগত জীবনের কোন না কোন ঘটনার কথা উল্লেখ আছে। তবে তা হুবহু নয়, তার সঙ্গে কল্পনার সংমিশ্রণ করে জিনিসটাকে আরোও বিস্তৃত করে লেখা।

বসু : আপনার বাল্যকাল সম্পর্কে কিছু বলুন।

গঙ্গোপাধ্যায় : ১৯৩৪ সালে ৭ই সেপ্টেম্বর ফরিদপুরের মাইজপাড়ায় আমার জন্ম। বাবা ছিলেন কোলকাতার শ্যামপুকুর টাউন স্কুলের মাস্টার। ঐ স্কুল থেকেই দ্বিতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেছি। লেখার ব্যাপারটা শুরু হয়েছে এর পর থেকেই। সুরেন্দ্রনাথে আই-এস-সি ফার্স্ট ইয়ারে পড়বার সময়েই আমার লেখা প্রথম কবিতা 'একটি চিঠি' প্রকাশিত হয়। যখন আমি আই-এস-সি পাশ করে ইকনমিক্স নিয়ে বি-এ ক্লাশে ভর্তি হোলাম আমহার্স্ট স্ট্রীটের সিটিতে, ঠিক সেই সময়ে দীপক মজুমদার, আনন্দ বাগচী এবং আমি এই তিনজন মিলে 'কৃত্তিবাস' নাম দিয়ে একটা পত্রিকা বের করেছিলাম। বর্তমানে কৃত্তিবাস পত্রিকা অন্য লোকে চালান। এইসময় 'হরবোলা' নামে একটা থিয়েটার ক্লাবের সেক্রেটারীও ছিলাম। পরিচালক, সঙ্গীতশিক্ষক এবং মঞ্চসজ্জায় ছিলেন যথাক্রমে কমলকুমার মজুমদার, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ও সত্যজিৎ রায়। চুয়ান্ন সালে বি-এ পাশ করলাম। এই সময় ইউনেসকোর আডাল্ট এডুকেশন প্রোগ্রাম অনুসারে বই লেখার চাকরি করেছি দু-এক মাস। 'পরিকল্পনা' নাম দিয়ে একটা বইও লিখেছিলাম তবে সেটা লিখতে হয়েছিল কৃষকদের সঙ্গে থেকে তাদের কথ্যভাষার সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে। আমার প্রথম কবিতার বই 'একা এবং কয়েকজন' প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে। এরই মধ্যে প্রাইভেটে এম-এ পরীক্ষা দিয়েছিলাম এবং সেকেন্ড ক্লাশে পাশও করেছি। আমি ছাত্র হিসাবে কোনোদিনই খুব ভালো ছিলাম না। এর

আগে ছাপ্পান্ন সালে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের হেলথ ডিপার্টমেন্টে চাকরী পেয়েছিলাম। তারপর একসঙ্গে দুটো চলতে লাগল—একদিকে কবিতা এবং অন্যদিকে চাকরী। তবে এই সময়টা আমি অমানুষিক পরিশ্রম করতাম। দৈনিক সতেরো-আঠারো ঘণ্টার বেশী খাটতাম। কেননা বাবা মারা যাবার পর আমার উপরই সংসার নির্ভর করত। তারপর ৬৩ সালে আমেরিকার আইওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে একটা invitation পেয়ে গেলাম, বাংলা কবিতা অনুবাদ করবার জন্য। এই university থেকে প্রত্যেকবার রাশিয়া, পোল্যান্ড, জার্মানী প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের লেখকদের আমন্ত্রণ জানানো হয় সাহিত্যের জন্য। প্রধানতঃ সাতান্ন-আটান্ন সাল থেকেই আমি প্রথম উপন্যাস লিখতে শুরু করি। কিন্তু প্রথম যে উপন্যাসটা লিখেছিলাম তা প্রকাশকের অভাবে শেষ পর্যন্ত ছাপা হয়নি। বিদেশ থেকে ফেরার পর বেশ কিছুদিন চাকরী বাকরী পাই নি, তখন বাধ্য হয়ে আমাকে অনেক ফিচার লিখতে হয়েছে। গল্প উপন্যাস এই সময় বেশী লিখতে শুরু করি।

বসু : আপনার হবি?

গঙ্গোপাধ্যায় : বই পড়া।

বসু : ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু বলুন।

গঙ্গোপাধ্যায় : ইচ্ছে আছে চাকরী ছেড়ে দিয়ে কম লিখব। কিংবা লটারীর প্রাইজ পেলে সব ছেড়েছুড়ে কোনো সমুদ্রের ধারে গিয়ে থাকবো।

বসু : আচ্ছা, আপনি ত একসময় লিটল ম্যাগাজিনে প্রচুর কবিতা লিখেছেন কিন্তু এখন আর সে রকম লেখেন না?

গঙ্গোপাধ্যায় : এখন আগের থেকে সংখ্যায় কম লিখি বটে কিন্তু প্রায় সব লিটল ম্যাগাজিনের সঙ্গেই আমার যোগাযোগ আছে। মাঝে মাঝে আমার কবিতাও সেখানে বেরোয়, হয়তো আপনাদের চোখে পড়ে না। কারণ, আমি জানি, কবিতা নিয়ে কথা বলা আজকাল একটা ফ্যাশান হলেও অনেকেই এখনো কবিতা পড়ে না।

বসু : পঞ্চাশের তুলনায় ষাট দশকে পত্র-পত্রিকা বেশী বেরিয়েছে। সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে পঞ্চাশের তুলনায় ষাট দশককে কি আপনি দুর্বল মনে করেন? না কি পঞ্চাশের তুলনায় ষাটের সম্ভাবনা বেশী?

গঙ্গোপাধ্যায় : সব সময়েই আগের যুগের চেয়ে পরবর্তী যুগের সম্ভাবনা বেশী। আমি অবশ্য ষাটের যুগ; পঞ্চাশের যুগ—এসব বিশ্বাস করি না। মাত্র দশ বছরে সাহিত্যে একটা করে নতুন যুগ আসে নাকি? আমি ত নিজেকে সত্তর দশকের লেখক বলে মনে করি। আগেকার তুলনায় এখন পত্র-পত্রিকা বেশী বেরুচ্ছে। কিন্তু কোনো পত্রিকাই খুব বেশী উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠতে পারছে না। ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে।

বসু : নিজের রচনা আপনার নিজের কাছে কেমন লাগে?

গঙ্গোপাধ্যায় : একদম ভালো লাগে না।

১৯

আমরা বিনা টিকিটের যাত্রী ছিলাম

লেখক এবং পরিচালকের মধ্যে সম্পর্কটা কেমন হয়? কতটা অভিমান থাকে লেখকের মনে? আর কতটা তৃপ্তি? সত্যজিতের কোনও ছবির মূল কাহিনীকার আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে মন খুলে কথা বলেননি। প্রথম সেই কাজটি করলেন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, এই সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকার। কথা বলেছেন শিবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়।

■ যে সমস্ত ঘটনা ভিত্তি করে 'অরণ্যের দিনরাত্রি' উপন্যাসটি আপনি লিখেছিলেন, আমরা শুনেছি-- তার কিছু ঘটনা আপনার জীবনে সত্যিই ঘটেছিল। আমরা কি ঠিক শুনেছি?

■ কবিতার জগৎ থেকে আমি যখন উপন্যাস লিখতে আসি, তখন ঠিকই করেছিলাম যে খুব একটা বানিয়ে বানিয়ে গল্প লিখব না বা, লিখতে পারব না। আমার নিজের জীবনের ঘটনাগুলো উপন্যাসের উপজীব্য হবে। যে কারণে, 'আত্মপ্রকাশ' ও (প্রথম উপন্যাস) আমি উত্তম পুরুষে লিখেছি। তার নায়কের নামও সুনীল। আমার জীবনের সঙ্গে তার কতকটা মিলও আছে। 'অরণ্যের দিনরাত্রি' আমার দ্বিতীয় বা তৃতীয় উপন্যাস। ঠিক ওইসময় আমরা চারজনে একসঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলাম। জঙ্গলে একটা বাংলোতে ছিলাম। এই সব ঘটনা ভিত্তি করেই লেখা। কিন্তু হুবহু সেই ঘটনা নয়। যেহেতু এটা উপন্যাস, তাই বাস্তবের সঙ্গে কল্পনা মেশাতেই হয়েছে। চরিত্রগুলো হুবহু বাস্তবের চরিত্রের মতো নয়। আমরা যে চার বন্ধু গিয়েছিলাম, উপন্যাসের একেকটি চরিত্র সেই চার বন্ধুর এক একেকজনের মতো—এরকমও নয়। অনেকে মিলেমিশে ছিল আর কী—হয়তো তার মধ্যে আমাদের অন্য বন্ধুদের কথাও আছে। তখনকার দিনের প্রতিনিধি চারটি যুবকের কথাই লিখেছি।

■ বাস্তবে সেই চার জনের নাম কী? আপনার সঙ্গে কী শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় আর তারাপদ রায় গিয়েছিলেন?

■ না। খানিকটা ভুল আছে। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় পরবর্তীকালে অনেকবার ওইসব নিয়ে লেখালিখি বা বলাবলি করেছে বটে। সবই তার শোনা কথা। সে আমাদের সঙ্গে যায়নি সেবারে। শক্তি... আমি...গিয়েছিলাম। আমাদের সঙ্গে শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় গিয়েছিল। আর একজন গিয়েছিল, সে লেখক নয়। সে ভাস্কর দত্ত, এখন ইংল্যান্ডে থাকে। ভাস্কর সব জায়গাতেই যেত।

■ আপনাদের ওই বিখ্যাত ভ্রমণ কোন সালের ঘটনা?

■ অবিকল বলতে পারব না, '৬৫ অথবা ৬৬'। কারণ আমি তো একসময় বিদেশে গিয়েছিলাম। '৬৪ সালের শেষের দিকে ফিরেছিলাম। এই ঘটনা তার কিছুদিন পরেই ঘটেছিল। ওই '৬৫ অথবা '৬৬। '৬৫ই হবে মনে হয়।

■ আপনাদের চারজনের মধ্যে ক'জন ইতিমধ্যেই চাকরি পেয়ে গিয়েছিলেন। এবার একটা প্রশ্ন করছি, অবাক হবেন না—যিনি চাকরি পেয়েছিলেন, তখন তার মাইনে কত ছিল? মাইনের

ব্যাপারটা জানতে চাওয়ার একটা কারণ আছে। আসলে 'অরণ্যের দিনরাত্রি' সিনেমায় ওই চার জনের মধ্যে অন্তত একজনকে কোনও অফিসের উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসেবে দেখানো হয়েছে। যে ভূমিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু সত্যিই কি আপনাদের চারজনের মধ্যে উচ্চপদস্থ অফিসার কেউ ছিলেন? আসলে আমরা বোঝার চেষ্টা করছি, আপনাদের আসল চরিত্রের সঙ্গে সত্যজিৎ রায় তাঁর সিনেমার চরিত্রদের মেলাতে চেয়েছিলেন কি না।

■ উপন্যাসের চরিত্রগুলোর থেকে সত্যজিৎ রায়ের ফিল্মের চরিত্রগুলো অনেক বদলে গিয়েছিল। আমরা গিয়েছিলাম ট্রেনে। উনি দেখাচ্ছেন, এরা যাচ্ছে গাড়ি করে। শুধু ট্রেনে যাইনি, আমরা বিনা টিকিটের যাত্রী ছিলাম। সেটা খানিকটা অ্যাডভেঞ্চারের লোভে। আর, দ্বিতীয়ত, আমরা জানতাম না কোথায় যাব। ভেবেছিলাম যদি টিকিট চেকার ধরে, তবে ফাঁকি মারার চেষ্টা করব। আর যদি তা না পারি, ধরা পড়ে যাই, তাহলে টিকিটটা কোনও রকমে দিয়ে যেখানে পারব সেখানে নেমে পড়ব। এই ধরনের একটা বোহেমিয়ান অ্যাটিচিউড ছিল। সেই তুলনায় সত্যজিৎ রায়ের চরিত্রগুলো অনেক হিসেবি। অনেক শহুরে। আমরা প্রায় সকলেই তখন বেকার। একমাত্র শরৎ মুখোপাধ্যায় ছাড়া। শরৎ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয়ের পর্ব থেকেই তিনি বেশ বড় চাকরি করতেন। তবে যখন আমাদের সঙ্গে মিশতেন তখন তাঁর সেই পরিচয়টা প্রকাশ পেত না। ভাস্কর দত্ত তখন একটা জায়গায় অ্যাপ্রেনটিস-এর কাজ-টাজ করছে, তাছাড়া ও একটু স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে। কিন্তু বাকি আমরা বেশ গরিব। তুমি তো জানো, শরৎ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। তখনকার দিনে কোনও বিলিতি মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানিতে কাজ করতেন। খুব সম্ভবত, বার্মা শেল বা এই ধরনের কোনও কোম্পানিতে। সরকারি চাকরি করতেন না।

■ তখন শরৎবাবুর মাইনে কি এতটা বেশি ছিল যে উনি ইচ্ছে করলে আপনাদের মতো চারজন বন্ধুকে নিয়ে গাড়ি নিয়ে জঙ্গলে বেড়াতে যেতে পারতেন? আপনার কি মনে হয়?

■ ওঁর যে কত মাইনে ছিল, সেটা আমি বলতে পারব না। তবে শরৎ মুখোপাধ্যায়ের একটা গাড়ি তখন ছিল। সেই গাড়ি করেও আমরা অন্য সময়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। সুতরাং তার গাড়িতে করে যাওয়াটা অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু সেবারে কোনও গাড়ির প্রশ্ন ছিল না। আমরা ওইভাবেই গিয়েছিলাম।

■ উপন্যাসে আপনি লিখেছেন, যে দুজন তরুণীর সঙ্গে অরণ্যে গিয়ে আপনাদের দেখা হয়ে গেল, তাদের মধ্যে একজন কলেজে আপনাদের কারও সহপাঠিনী ছিল। এটা কি সত্যি ঘটনা? সত্যি কি এই ভ্রমণে গিয়ে আপনাদের সঙ্গে দুই তরুণীর দেখা হয়ে গিয়েছিল? আর সত্যিই তাঁদের মধ্যে একজন সহপাঠিনী? না কি, উপন্যাসের খাতিরে এটা আপনার কল্পিত ঘটনা?

■ আসলে দুজন তরুণীকে দেখেছিলাম এইটুকু সত্যি। বাকি সবটাই কল্পনা। আসলে দুই তরুণীর সঙ্গে আমাদের ওখানেই আলাপ হয়েছিল। সেই আলাপও অতখানি গভীর পর্যায়ে পৌঁছায়নি। তাদের কেউই আমাদের সঙ্গে কলেজে পড়ত না। সহপাঠিনীর ব্যাপারটা পুরোপুরি কল্পিত।

■ উপন্যাসের এক চরিত্র সহপাঠিনী ছিল বলেই পাঠকদের মনে এক ধরনের প্রত্যাশা সৃষ্টি হয়। মেয়েটির সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই পাঠকদের মনের গোপনে একটু একটু করে উষ্ণতা জমতে থাকে। উপন্যাস যত এগিয়ে চলে, ততই মনে মনে তারা আশা করতে থাকে---এই পুরনো পরিচয় এতদিনে আসল প্রেমে রূপান্তরিত হবে অরণ্যের পরিবেশে। উপন্যাসটার অনেকগুলো টানের মধ্যে এই প্রত্যাশাটা একটা বড় টান। কিন্তু 'অরণ্যের দিনরাত্রি' সিনেমায় ওই তরুণীর সঙ্গে চার যুবকের দেখা হয়ে যায় আকস্মিকভাবে। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে চার যুবকের একজন ফরেস্ট-বাংলোর জানালায় এসে দাঁড়াল। তখন সকাল সাতটা-সাড়ে সাতটা হবে। যুবকের গালে তিনদিনের না কামানো দাড়ি: কর্কশ গালে হাত বুলোচ্ছে। আর উদ্দেশ্যহীনভাবে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাংলোর পাঁচিলের বাইরে রাস্তাটার দিকে। হঠাৎ

তার চোখ দুটি বিস্ফারিত হল। ভুরু ক্ষণিকের জন্য কুঁচকে গেল। এবার তার দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা দেখতে পেলাম, অনেক দূরের রাস্তা দিয়ে মর্নিংওয়াকে বেড়িয়েছে দুই তরুণী। তাদের একজনের পরনে সাদা শাড়ি, মাথায় সাদা ছাতা। সাদা আঁচল উড়ছে ভোরের হাওয়ায়। তার পাশেই হাঁটছে কালো চশমা পরা আর একজন কম বয়সী মেয়ে। তার পরণে স্ল্যাক্স। অনেক দূর থেকে এই দুই তরুণীকে দেখার পর যুবকের মুখে যে ব্যঞ্জনা খেলে গেল, তাকে অপ্রত্যাশিত চমক ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। যেন সে আশাই করেনি, আলিপুর-ধাঁচের সফিসটিকেটেড মহিলাদের দেখা পাওয়া যাবে এই অরণ্যে। সুতরাং সিনেমায় এই দুই তরুণী এসেছে অপ্রত্যাশিত চমক হিসেবে। যে কোনও চমক নিশ্চিত উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করে দর্শকের মনে। সেটাই ঘটেছিল সিনেমায়। ওই দুই তরুণীকে ঘিরে সিনেমার চার যুবকের মধ্যে যথেষ্ট ঔৎসুক্য উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হয়েছিল। অথচ বইয়ের পাঠক হিসেবে বলতে পারি, উপন্যাসে এই তরুণীরা এসেছিল স্বস্তি নিয়ে। শান্তি নিয়ে। কারণ যেহেতু ওদেরই একজন দশ বছরের পুরনো বন্ধু, তাই সে কেমন মেয়ে সেটা তো জানাই ছিল। তাই তাকে চিনে নেওয়ার জন্য বা জিতে নেওয়ার জন্য কোনও উৎকণ্ঠাই কাজ করেনি উপন্যাসের যুবকদের মনে। উপন্যাসের পাঠকদের মনেও। আমাদের মনে হয়, এই দুই তরুণী আগে থেকে চেনা কি অচেনা—এই তথ্যটার উপরেই এই কাহিনীর রস অনেকটা নির্ভরশীল। কারণ উৎকণ্ঠা আর শান্তির মধ্যে যে গভীর তফাত—এই তথ্যটা পাল্টে দিলেই মূল কাহিনীর রসোপলব্ধিতে সেই প্রভেদটা সৃষ্টি হচ্ছে। এই তথ্যটা পাল্টে দেওয়ার ফলেই সত্যজিৎ রায় হয়তো নিজেরই অজ্ঞান্তে, শান্তি ও স্বস্তির কাহিনীকে উৎকণ্ঠার কাহিনীতে রূপান্তরিত করে ফেলেছিলেন। এ বিষয়ে আপনার কি মত? সিনেমাতেও যদি অন্তত একজন তরুণী দশ বছরের পুরনো সহপাঠিনী হতেন, তাহলে কি শেষ পর্যন্ত সিনেমাটা মূল উপন্যাস থেকে এতটা বিচ্যুত হত? মূল উপন্যাস থেকে বিচ্যুতির এটাই কি প্রথম পদক্ষেপ?

■ খুব কঠিন প্রশ্ন। তবে সিনেমাতে যেভাবে সত্যজিৎবাবু দেখিয়েছেন, সেটা ভিস্যুয়ালি খুব সুন্দর হয়েছে, উপন্যাস লেখার সময় আমাকে খানিকটা বাস্তবের কথা চিন্তা করতে হয়েছে তো! একদম অচেনা কোনও মেয়ের সঙ্গে চারটি ছেলের হঠাৎ আলাপ করা—আমি যে সময়টার কথা বলছি, সেই সময়ে খুব স্বাভাবিক ঘটনা ছিল না। ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে চারটে ছেলে দুটি অল্পবয়েসি মেয়ের সঙ্গে অমন চট করে গিয়ে আলাপ করতে পারত না। করলে তারা খারাপ মনে করত। যদিও বা আলাপ হত, তাহলেও তার প্রোসেসটা স্লো হত। এরা তো বেড়াতে গেছে মাত্র কয়েকদিনের জন্যে। কাজেই সেটা খুব বাস্তবসম্মত হত না বলেই আমাকে দেখাতে হয়েছে যে ওদের একজনের সঙ্গে পূর্ব পরিচয় ছিল। সেই সূত্র ধরে ওরা মেয়েদের বাড়িতে গেল। দ্বিতীয়ত, আরেকটা ক্ল্যাশ রয়েছে। উপন্যাসটির নাম হচ্ছে 'অরণ্যের দিনরাত্রি'। এখানে লেখা হয়েছে দিনটা একরকম, রাত্তিরটা আরেকরকম। দিনের বেলায় অরণ্যটাকে ঠিক অরণ্য বলেও মনে হয় না। কাছে কাছে বাড়ি দেখতে পাওয়া যায় এবং লোকগুলোর ব্যবহারের মধ্যেও খানিকটা ভদ্র সভ্য নাগরিক জীবনের ছায়া খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু যখন অরণ্য অন্ধকার হয়ে যায়, তখন সবটাই রহস্যময়, অচেনা, ভয়াল হয়ে যায়। তেমনই এদের জীবনেও যেন খানিকটা পরিবর্তন ঘটে। এটা কিন্তু উপন্যাসের মধ্যে মাঝে মাঝে রয়েছে। সত্যজিৎবাবু হয়তো সেদিকটার দিকে তেমনভাবে নজর দিতে চাননি। তিনি অন্য একটা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অরণ্যের ছবিটা তুলেছেন। অনেক সময় লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি আর চলচ্চিত্র পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গির একটা তফাত হতে পারেই।

■ সেই জায়গাটাতেই আমরা এবার আসছি। হয়তো এই ঘটনাগুলো বা তফাতগুলো নিয়ে আপনি অনেকসময় কিছু টুকরো মন্তব্য করেছেন, সেই মন্তব্যগুলো থেকেই পরে অনেকরকম বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে।

■ সবচেয়ে মজা কি জানো তো, আমি একদিন টিভিতে সত্যজিৎবাবুর একটা ইন্টারভিউ

শুনছিলাম। হঠাৎ এক জায়গায় প্রশ্নকর্তা বললেন, আপনি যেসব লেখকের গল্প নিয়ে ছবি করেছেন, তারা কী মনে করে ছবিগুলো সম্পর্কে? তো, উনি প্রথমেই বললেন, সুনীল আমার 'অরণ্যের দিনরাত্রি' পছন্দ করেনি। ইংরেজিতে ইন্টারভিউ হচ্ছিল। আমার পরিষ্কার মনে আছে, উনি বললেন, Sunil did not like Aranyer Din Ratri. শুনে আমি খুব চমকে উঠেছিলাম। উনি স্ট্রেট এই কথাটা বললেন। আমি ওঁকে কোনওদিনই এই কথাটা বলিনি। আমি হয়তো আড়ালে আবডালে বন্ধুবান্ধবদের কাছে একটু বলেছি। কী করে যেন ঘুরতে ঘুরতে ওঁর কানে কথাটা চলে গেছে। আমি ঠিক 'পছন্দ করি না' বলতে চাইনি। আমি বলতে চেয়েছিলাম যে আমি ঠিক যে milieu-এর কথা লিখেছিলাম, উনি সেটা থেকে সরে গেছেন। এবং উনি বোধহয় ওই অরণ্যের চরিত্রটা বা এই যে বেপরোয়া বাউণ্ডুলে জীবনের চরিত্রটা ফোটাতে চাননি। ওঁর মনের মধ্যে হয়তো কোনও ধারণা ছিল। উনি সেইভাবেই ছেলেগুলোকে ফুটিয়েছেন। ফলে আলাদা ছবি হয়েছে। ছবিটির অনেকগুলো গুণও আছে। কিন্তু উপন্যাসের থেকে অনেকখানি সরে গেছে।

■ সুনীলদা, এরা তো দুটি সৃষ্টি। এক সৃষ্টি হিসেবে ভাবার কোনও কারণ নেই। সমস্ত ল্যাঙ্গুয়েজ আলাদা। মিডিয়াম আলাদা। আপনি ভাল করেই জানেন আমি কী বোঝাতে চাইছি। এবং মানসিকতার দিক থেকে আপনারা দুজনে সম্পূর্ণ দুরকম মানুষ। দুজনের ছোটবেলাটা একদম আলাদা। Social Milieu আলাদা, মানসিক গঠন আলাদা। এমনকি অরণ্য—যে অরণ্য সিনেমা ও উপন্যাসটির recurring motif, সেই অরণ্য সম্বন্ধে ধারণাটাও আলাদা। কলকাতার বাইরে, শান্তিনিকেতনে থাকার ফলে সত্যজিৎ রায়ের মনের গঠন হয়েছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম—

■ নিশ্চয়ই—

■ এবং আপনার মানসিকতা একেবারে অন্যরকম। যদিও আপনারা প্রায় একই পাড়ার লোক। দুজনেই উত্তর কলকাতায় অনেকদিন কাটিয়েছেন। কিন্তু তফাত অনেক। এবং এক্ষেত্রে 'টাইমিং'-এর তফাতটা মস্তবড়। কারণ আপনাদের দুজনের বয়সের যে কম ফাঁকটা আপাতদৃষ্টিতে ছোট সময় বলে মনে হয়, ওই সময়কালের ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু অনেক—

■ হ্যাঁ, কারণ ওই সময় একেকটা দশকের তফাতটা অনেকখানি। আমাদের জীবনযাপনের ধারণধারণাটাই ছিল আলাদা। যেমন ধরো, সত্যজিৎবাবু নিজেও হয়তো একসময় দারিদ্র্য ভোগ করেছেন। কিন্তু ওই দারিদ্র্য ওঁদের ছিল না যে হঠাৎ একটা ট্রেনে চেপে বসলাম বিনা টিকিটে—কোথায় যাব ঠিক নেই, এটা ওঁদের ছিল না। কিন্তু আমরা সত্যিসত্যিই তো এরকম করেছি। আমরা জঙ্গলে অনেক ঝুঁকি নিয়েছি। যেমন ধরো তোমাকে বলি—মজার কথা। উনি যখন ছবিটা করবেন বলে ঠিক করলেন, তখন একদিন আমাকে ডেকে অনেক প্রশ্ন করেছিলেন। মজার মজার প্রশ্ন। যেমন ধরো, কোন ঋতুতে আমরা গিয়েছিলাম। 'কলকাতার কোন জায়গায় আপনারা meet করেছিলেন ট্রেন ধরার জন্যে?' শুনে বললেন, 'আপনাদের এই চার বন্ধুর কার কোথায় বাড়ি?'—অর্থাৎ, যে তথ্যগুলো উপন্যাসে নেই, সেগুলো উনি জানতে চেয়েছিলেন। এই সব জিজ্ঞেস করতে করতে হঠাৎ বললেন 'আচ্ছা, আপনারা যে মহুয়া খেতেন, সত্যিই খেতেন কি?' আমি বললুম, 'হ্যাঁ, প্রচুর খেয়েছি আমরা। 'মহুয়া খেতে কেমন?'—আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। তখন আমি ওঁকে জিজ্ঞেস করলুম, 'দুধ খেতে কেমন বলতে পারবেন? দুধ খেতে কেমন সে কি বর্ণনা করা যায়? সে তো খেয়ে বুঝতে হয়। মহুয়াও সেইরকমই খেয়ে বুঝতে হবে।' তো উনি বলে উঠলেন, 'না, না, না, না,! আমি মহুয়া-টহুয়া খেতে পারব না।' এই ধরনের ব্যাপার আর কী। কাজেই মহুয়া খেয়ে যে কী ধরনের নেশা হয়, সেটাই বা উনি বুঝবেন কী করে। যেমন, ছবিতে ওরা নেশা করতে করতে হঠাৎ এক সময় চুপ করে গেল। আসলে কিন্তু ঠিক উল্টো হয়। চুপ থেকে প্রথমে আস্তে চেঁচামেচি হয়। তারপর হৈ চৈ। শেষের দিকটা ভীষণ হল্লা হয়। উনি উল্টো করেছেন। এইসব টেকনিক্যাল ছোটখাটো ভুল নিয়ে কিছু আসে যায় না কোনও ভাল ছবিতে। ছবির মূল সুরটা ঠিক থাকলেই হল।

■ মূল উপন্যাস থেকে আর কোন কোন বিচ্যুতি আপনার কাছে দুঃখজনক মনে হয়েছে?

যেমন, ট্রেনের বদলে সাদা গাড়ি করে বেড়াতে যাওয়া। এতে কি মূল উপন্যাসের খাঁটি বোহেমিয়ান সুরটা শুরু থেকেই নষ্ট হয়ে যায়নি?

■ আমার তো তাই মনে হয়। ওই বললাম যে, milieu টাই বদলে গেছে। ছবিতে বোহেমিয়ান সুরটা তো একেবারেই ছিল না। তাছাড়া, যদিও আমার উপন্যাস একটা ন্যারেটিভ স্টাইলে লেখা এবং আপাতত একটা বাস্তব বর্ণনা, কিন্তু আমার সবসময়েই একটু অ্যাবস্ট্র্যাকশনের দিকে যাওয়ার ঝোঁক থাকে। তখন তো আরও বেশি ছিল। লক্ষ্য করলে দেখবে, উপন্যাসে একটা ফুলগাছ খোঁজার ব্যাপার আছে। যে গাছটা ওরা কেউই খুঁজে পাচ্ছে না। সেটা এমন একটা ফুল গাছ, যাতে কাঁটা আছে, আর সাদা ফুল ফোটে। কোনও পাতা নেই। এরকম গাছ বাস্তব নয়। এটার হয়তো অন্য কোনও ব্যঞ্জনা আছে। দ্বিতীয়ত, আমি ওখানে দেখেছিলাম, একটি আদিবাসী মেয়ে মাতাল হয়ে ওখানে নাচছিল। নাচতে নাচতে বারবার সে বলছে, 'দে, দে।' সে কিন্তু পয়সা চাইছিল না। মদও চাইছিল না। সে একটা অন্য কিছু চাইছিল, 'দে, দে' বলে, সেটা কী—সেটা এরা চারজনের কেউই বুঝতে পারেনি। এই ধরনের ছোটখাটো অ্যাবস্ট্র্যাকশন আমার লেখায় ছিল। সত্যজিৎ রায় অ্যাবস্ট্র্যাকশনের পরিপন্থী। উনি রূপক বা সিম্বল পছন্দ করেন। নানা ধরনের সিম্বল ওঁর ছবিতে আছে। কিন্তু অ্যাবস্ট্র্যাকশন ওঁর ছবিতে থাকে না। ফলে উনি সযত্নে এসব ব্যাপারগুলো বাদ দিয়েছেন।

■ সিনেমায় শমিত ভঞ্জর হারিয়ে যাওয়া পার্স নিয়ে একটা অদ্ভুত ঘটনা আছে। ত্রিপাঠিদের বাংলোর লনে ব্যাডমিন্টন খেলতে গিয়ে উৎসাহের দাপটে শমিতের পার্সটা পড়ে যায়। শমিত সেটা খেয়াল করেনি। পরে ওই তরুণীদের মধ্যে একজন সেই পার্সটা ফেরত দেয়। এই ঘটনায় অসীম (যে ভূমিকায় সৌমিত্র ছিলেন) মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েছিল। কারণ শমিতের পার্সের মধ্যে একটা মান্থলি টিকিট ছিল। অসীমের দুশ্চিন্তা এই মান্থলি টিকিট নিয়ে, তার ভয় হল, ওই তরুণীদের মধ্যে কেউ হয়তো পার্সটি খুলে দেখেছে। আর ভিতরে যে একটা মান্থলি টিকিট আছে, সেটা দেখতে পেয়ে গেছে। এখানেই ভয়। কারণ ভুল করে যদি ওই তরুণীরা ওটাকে অসীমের পার্স বলে ভেবে নেয়, তাহলেই মুশকিল। কারণ, কলকাতায় অসীম গাড়ি করে অফিস যাতায়াত করে। সে ট্রামেবাসে ওঠে না। তাই তার মান্থলিও লাগে না। কিন্তু ওই মান্থলিটা যদি মেয়েরা কেউ হঠাৎ দেখে ফেলে? তাহলেই আর প্রমাণ করা যাবে না যে, ওই সাদা অ্যাম্বাসেডারটা তার নিজেরই গাড়ি। মেয়েরা ভেবে বসবে ওটা ভাড়া করা গাড়ি। সেটাই অসীমের উৎকণ্ঠার কারণ। তাই সে একদিন সন্ধেবেলা শমিতের কাঁধে ধাক্কা দিয়ে প্রায় ধমকের সুরে বলল—'তুই কাল যাবি, ওদের বাংলোয় যাবি, গিয়ে বলবি ওটা আমার পার্স ছিল, ওটা আমার মান্থলি...'

অরণ্যে দিনরাত্রি সিনেমার দর্শক হিসাবে আমরা বলতে পারি, উপরের এই ঘটনাটি যথেষ্ট অপমানজনক। বন্ধুতে বন্ধুতে সম্পর্কের ব্যাপারে যথেষ্ট সিনিক্যাল। বাস্তবে আপনারা যে চারজন অরণ্যে গিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি কখনও এতটা তিক্ত ছিল? সামান্য মান্থলি টিকিট নিয়ে কি আপনাদের মধ্যে এতটা অন্তর্কলহ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল? নাকি অন্তর্কলহ থাকলেও সেটাকে ইচ্ছে করেই আপনি উপন্যাসে এড়িয়ে গিয়েছিলেন? কারণ কোনও বন্ধুর সামান্যতম নীচতাও প্রকাশিত হোক, সেটা আপনি চাননি।

কিন্তু সত্যজিৎ রায় তো এরকম কোনও যুবকের সঙ্গেই কোনওদিন ব্যক্তিগতভাবে ঘনিষ্ঠ ছিলেন না। সেই কারণেই কি বন্ধুত্বের মধ্যে এই নীচতার কাঁটাকে প্রকট করে তুলতে সত্যজিৎ দ্বিধান্বিত হননি? এককথায় প্রশ্নটা এই যে, আপনাদের বন্ধুত্বের মধ্যে সত্যিই কি ছোটখাটো অথচ তীব্র সঙ্কীর্ণতার কোনও স্থান ছিল? ওই পার্স-এর ঘটনায় যেমন ক্ষুদ্র নীচতা প্রকাশিত হয়, তেমন ক্ষুদ্রত্ব কি আপনাদের মধ্যে সত্যিই ছিল? যদি না থাকে তাহলে কি সিনেমায় দেখানো চরিত্রদের ক্ষুদ্রত্বের জন্যই ছবিটা আপনার ভাল লাগেনি?

■ কখনওই না। আমাদের মধ্যে এধরনের স্বভাবই ছিল না. একজন লোক মান্থলি টিকিট কেটে

ট্রামে চাপলে সে অন্যের চোখে ছোট হয়ে যাবে এটা আমরা ভাবতুমই না। আমাদের মাথাতেই কখনও আসতও না। কাজেই ওই ধরনের কোনও সিচুয়েশন উপন্যাসে আসাটা অস্বাভাবিক। ওই ধরনের কোনও ব্যাপার আমাদের মধ্যে ছিল না। বন্ধুত্বের মধ্যে যে কলহ হবে না—তা নয়। এবং সেটা যে লেখা হবে না—তাও নয়। কিন্তু এই উপন্যাসে সেটা উপযুক্ত হত না। কারণ এই কাহিনীর স্পিরিটটাই ছিল যে ওরা একসঙ্গে বেরোচ্ছে, একসঙ্গে হইচই করছে। এমন কোনও ঘটনা সেখানে ঘটেনি, যাতে তাদের মধ্যে এরকম কোনও তিক্ততা সৃষ্টি হতে পারে।

■ 'অরণ্যের দিনরাত্রি' সিনেমা প্রথম দেখার অভিজ্ঞতাটা মনে পড়ে?

■ আমি প্রথম ছবিটা দেখি, টালিগঞ্জের কোনও স্টুডিওতে। মনে নেই এখন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আমার পাশে বসেছিল, এটা মনে আছে। আমার প্রথম যেটা অবাক লেগেছিল, তাহল ডাকবাংলোর চৌকিদার। ওই ফিল্মে সে এত বেশি বাস্তব ছিল, যে আমি ফিসফিস করে সৌমিত্রকে বললাম, ওটা কি কোনও আসল চৌকিদারকে দিয়ে করানো হয়েছে? সৌমিত্র বলল, 'না-না-না, ওতো স্টুডিওর একজন একস্ট্রা। একজন পরিচালক কী সাংঘাতিক চরিত্র হ্যান্ডেল করতে পারেন তার একটা নিদর্শন। আমি ওরকম বাংলোতে অনেক গেছি। সত্যজিৎবাবু হয়তো অত যাননি। কিন্তু না গেলেও ওঁর পারসেপশনটা এমন ছিল যে ওরকম চৌকিদার কেমন হতে পারত, সেটা হুবহু এনে দিয়েছেন সাধারণ একজন স্টুডিওর একস্ট্রাকে দিয়ে।

আমার যতদূর মনে হয়, উপন্যাসের চারটে চরিত্রই তো তথা তথাকথিত মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। সত্যজিৎবাবু এদের হয়তো দূর থেকে দেখেছেন, এদের উনি সেভাবে চেনেন না। উনি ভিস্যুয়ালি যতভাবে এই ধরনের একটি গ্রাম বা গ্রামের মানুষ বা শহরের মানুষকে উপস্থিত করতে পারতেন, হয়তো এদের ভিতরের মূল্যবোধ সম্বন্ধে ওঁর তত পরিষ্কার ধারণা ছিল না। সেই জন্যই উনি অত নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের বদলে ছেলেগুলোকে একটু উচ্চমধ্যবিত্ত করে তুলেছিলেন। এবং ওঁর কাছাকাছি সমাজের মানুষদের মধ্যে থেকে নিয়ে আসেন। যাতে ওঁর পক্ষে এদের মূল্যবোধটা বোঝা বা ফোটানো সুবিধা হয়। হয়তো সেই জন্যই তাদের ফল্টগুলোকে হাইলাইট করতে হয়েছিল। অপর্ণা সেনকে নিয়ে একটা ছোট্ট দৃশ্য ছিল, যাতে জানা যায় যে, সে মাথায় নকল চুল পরে। যেটা দেখে তার একজন প্রেমিক ক্ষুব্ধ হয়েছিল। আমার উপন্যাসেও এরকম কোনও ব্যাপার নেই। নকল চুল পরাটরা তখন আমাদের কল্পনার মধ্যেই কোথাও ছিল না। এগুলো হচ্ছে ওঁর কাছাকাছি সমাজের ছবি যেটা উনি চেনেন। সেজন্যে উনি উপন্যাস থেকে কোনও কোনও জায়গায় সরে গেছেন। এক-একটা মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক স্তরের বদল অনেক সময় হয়। কিন্তু তার সঙ্গে তার মানসিকতারও বদল হবে কিনা, সেটা বিবেচ্য। সকলের ক্ষেত্রে হয় না। অনেকে তার পুরোনো অর্থনৈতিক স্তরটা অস্বীকার করতে চেষ্টা করে। অনেকে আবার তা করে না। আমি আজ ইচ্ছে করলে স্কচ হুইস্কি খেতে পারি, আবার জঙ্গলে মহুয়াও খেতে পারি। আমি যেমন ইচ্ছা করলে বাংলো আগে থেকে বুক করে জঙ্গলে যেতে পারি, আবার তেমনই হঠাৎ ইচ্ছে করে কোনও বুকিং ছাড়া চলে যেতে পারি। আমার এখনও মনে হয়, ওদের মধ্যে একজন অন্তত হতে পারত একটু কল্পনাপ্রবণ বা বেপরোয়া এধরনের কিছু। হয়নি। আমি যদি এখনও জঙ্গলে যাই এবং ছবির ওই চারজনের মতো যুবককে দেখি, আমি তাদের সঙ্গে খুব একটা মেলামেশা করব না।

২০

[সাম্প্রতিককালের লেখকদেব মধ্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্থান এবং লোকপ্রিয়তা সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার নেই।

অপকট সৌন্দর্যের দোয়াতে কলম ডুবিয়ে তিনি লেখা আঁকেন। বাস্তবতার পাথুরে পথে তিনি তার শব্দের নির্ঝর এমন অপরূপভাবে বইয়ে নিয়ে যান যা সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত।

নিবিড় অনুভব-কাতরতা, অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টি, জীবন সচেতনতা, তুচ্ছ ক্ষুদ্র ঘটনা বিন্দুর নিখুঁত কারুকর্ম এবং পরিব্যাপ্ত কাব্যিক আমেজ তার লেখনী শক্তির কয়েকটি দিক।

আমাদের পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দু'জন তরুণ সাহিত্যিক সম্প্রতি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়েব সান্নিধ্যে কিছুক্ষণ কাটিয়ে এসেছেন, তাঁদের কথা বার্তার কিছু অংশ এখানে পরিবেশিত হ'ল। —সং]

প্রশ্ন ঃ 'মনীশা' চরিত্রটির কি কোন ফ্যাকচুয়াল ব্যাকগ্রাউণ্ড আছে?

—দেখুন, ঠিক নেই বললে ভুল হবে। আবার আছে বললে ঠিক বলা হবে না। সম্পূর্ণ কাল্পনিকও নয় আমার সম্পূর্ণ বাস্তবও নয়—কিছু কল্পনা কিছু বাস্তব মিলিয়ে এই চরিত্রটি তৈরি।

প্রশ্ন ঃ নীরা কি মনীষারই আর এক নাম?

—হ্যাঁ, কবিতার ক্ষেত্রে নীরা।

প্রশ্ন ঃ আপনার 'স্বপ্ন লজ্জাহীন' উপন্যাসটি আমাদের খুব ভালো লেগেছে—

—তাই নাকি। কিন্তু অনেকে এ লেখাটিকে বাজে বলেছেন। কিছুই হয়নি বলেছেন।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি লিখে satisfied?

—না।

প্রশ্ন ঃ আপনার নিজের লেখা সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?

—কিছু হচ্ছে না—

প্রশ্ন ঃ তবুও comparatively কোনটা আপনার মতে ভালো?

—কোনটাই নয়।

প্রশ্ন ঃ এতো বেশী লিখতে হয় বলে আপনি ক্লান্তি বোধ করেন না?

—আমি আরও বেশী লিখতে পারি।

প্রশ্ন ঃ কোনটা লিখে আপনি বেশী আনন্দ পান—গল্প, উপন্যাস না কবিতা?

—গদ্য আমি খুব তাড়াতাড়ি লিখতে পারি। কিন্তু কবিতা লিখতে সময় নিই।

প্রশ্ন ঃ আপনি সাধারণত কখন লেখেন?

—সাধারণত সকালের দিকে লিখে থাকি।

প্রশ্ন ঃ আপনি এতো লেখেন কি করে?

—এই প্রশ্ন আমাকে অনেকেই করেছেন। গদ্যটা আমি একটু তাড়াতাড়ি লিখতে পারি। ...ভাবছি লেখা এবার কমিয়ে দেবো।

প্রশ্ন ঃ পুজোর আগে যখন লেখার চাপ পড়ে, তখন কি করেন?
—তখনও শুধু সকালের দিকে লিখি। রাত্রি জেগে আমি কোন দিনই লিখি না।

প্রশ্ন ঃ আপনার প্রথম প্রকাশিত বই 'যুবক যুবতীরা' না 'আত্মপ্রকাশ'?
—বই হিসাবে প্রথম প্রকাশিত 'আত্মপ্রকাশ'। কিন্তু 'যুবক যুবতীরা'র কিছু অংশ আমি আগেই লিখি।

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা, আপনি মেয়েদের মন এতো ভালো বোঝেন কি করে?
—বুঝি কি! (স্মিত হাসি)

প্রশ্ন ঃ লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?
—লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনই তো সাহিত্যের প্রাণ। ...তবে আজকাল এতো বেশী লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন বেরুচ্ছে!

প্রশ্ন ঃ আপনি নিজে অবসর সময়ে একটা পত্রিকা প্রকাশ করেন না কেন?
—প্রথমতঃ আমার অবসর খুব কম। আর তাছাড়া এখন আমার এতো বেশী চেনাশুনা হয়ে গেছে...কার লেখা ছাপাবো, কাকে বাদ দেবো......। ফলে ভালো পত্রিকা হবে না—

প্রশ্ন ঃ লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন আপনি পড়েন?
--হ্যাঁ, পড়ি।

প্রশ্ন ঃ আপনার কাছে কোন লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন লেখা চাইলে আপনি কি দেন?
—হ্যাঁ, দিই। কিন্তু মুশকিল কি জানেন, একজনকে দিলে অন্যরাও তখন যেন লেখা পাবার অধিকারী হয়ে যায়—ব্যাপারটা এই রকম, ওকে লেখা দিলেন আমায় কেন দেবেন না? তাছাড়া...আমি সময়ও খুব কম পাই।

প্রশ্ন ঃ আধুনিক তরুণ সাহিত্যিকদের মধ্যে কার লেখা আপনার ভালো লাগে?
—শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের লেখা আমার বেশ ভালো লাগে। আর একজন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়—যদিও খুব কম লেখেন, তবু ভালো লেখেন।

প্রশ্ন ঃ কবিদের মধ্যে? মানে কার লেখা আপনার ভালো লাগে?
—জীবনানন্দ দাশ।

প্রশ্ন ঃ তাঁর পরবর্তীকালে?
—কবি বিষ্ণু দে'র লেখা আমার এক সময়ে ভালো লাগতো। ইদানীং ভালো লাগে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতা.....শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ।

২১

বিনোদন ঃ বিনোদন বিচিত্রা পত্রিকার পক্ষ থেকে আজকে আমরা একটি 'গোলটেবিল' বৈঠকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি শ্রী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে। তাঁর পরিচয় বিস্তারিত ভাবে দেওয়ার কিছু নেই। তাঁকে প্রশ্ন করেছেন কবি জয় গোস্বামী, কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত, চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ এবং বাদল বসু এবং বিনোদন বিচিত্রার পক্ষ থেকে মালবিকা মিত্র। আমরা আজকের প্রশ্নমালার ভেতর দিয়ে এবং খোলামেলা আলাপচারিতায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়— কবি সাহিত্যিক এবং মানুষ ও তাঁর বিভিন্ন অভিজ্ঞতা এবং সে সব অভিজ্ঞতা কি ভাবে তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলন ঘটিয়েছে এগুলি জানতে চাই।

প্রথমেই প্রশ্ন জয় গোস্বামীর।

জয় ঃ সুনীলদা, আপনার যে প্রথম কবিতার বই বেরিয়েছিল 'একা এবং কয়েকজন' সেটা বেরিয়েছিল বোধহয় '৫৭ সালে। তাতে আমরা দেখেছি যে ধরনের ভাষায় কবিতা লেখা হয়েছে, যেমন ধরা যাক একটি কবিতায় আছে—

যদি কোনদিন একা তুমি যাও কাজলাদিঘিতে
যখন বিকেল আসন্ন শীতে মন্থর—বেগ,
দেখবে কত না রহস্য আছে এই পৃথিবীতে
কত স্বপ্নের অচেনা আকাশ ছায়াময় মেঘ'

বা 'নক্ষত্র' কবিতায় 'হে আকাশ' তুমি আজ বলো আমার শৈশবে ছিল কোন দূর নক্ষত্রের আলো' কিম্বা—'ঝড় দিসনে আকাশ ওই সুন্দরীর ঘরে'

এই ধরনের ভাষা থেকে তার ঠিক দশ বছর পরে, যখন আপনার কবিতার বই 'আমি কি রকমভাবে বেঁচে আছি', বের হয় তখন আমরা দেখলাম যে ভাষা একেবারে আমূল পাল্টে গেছে। এই যে একেবারে পাল্টে যাওয়া ভাষা এবং 'আমি কি রকম ভাবে বেঁচে আছি' বাংলা কবিতায় ভীষণই উল্লেখযোগ্য।

প্রত্যেকেই জানে এ বইয়ের গুরুত্বের কথা। ভাষা যে এতটা পাল্টে গেল দশ বছরের মধ্যে এর কি কারণ, এটা আমাদের জানতে ইচ্ছে করছে।

সুনীল ঃ প্রথম বইটা যখন বের হয় তখন আমার বয়স বাইশ তেইশ বছর হবে। তখন সরল সাদাসিধে ছেলে ছিলাম আর ভাষাও সে রকম ছিল। আরেকটা যা হয়, প্রথম দিকের লেখায় একটু প্রথাসিদ্ধ ভাষার দিকে ঝোঁক থাকে।

রবীন্দ্রনাথ পড়ে মানুষ হয়েছি, ফলে রবীন্দ্রমানসিকতা তখন বড় বেশি থাকে। তারপর আস্তে আস্তে আমরা যখন সচেতন হই, তখন নিজেদের ভাষা খুঁজতে থাকি। তখন মনে হয় যে ভাষায় এতদিন লেখা হয়েছে তার বাইরে গিয়ে অন্য একটা ভাষা তৈরি করতে হবে।

সেই তৈরি করা ভাষার জন্য আমরা অভিধানের দিকে যাইনি। আমার মনে হয়েছিল যে মুখের কথার ভাষার কাছাকাছি যেতে হবে। হাটে বাজারে লোকে যে ভাষায় কথা বলে, তার মধ্যেও একটা

রিদম আছে। সেই গদ্যের মধ্যেও কোথাও একটা ছন্দ বের করা যায়। ওই জন্যই তখন ও ধরনের কর্কশ গদ্য ভাষায় লেখার চেষ্টা করেছি। যে জন্যে আমার দ্বিতীয় বইটার নামও ওরকম গদ্যময়—'আমি কি রকম ভাবে বেঁচে আছি'। ওর মধ্যে অনেক কবিতাই মনে হয় যেন কবিতার ভাষায় লেখা নয়, মুখের ভাষায় লেখা। কিন্তু তার মধ্যে সেটা গদ্যের সীমারেখা পেরিয়ে কবিতার দিকে যায় কিনা, এরকম নানা ধরনের পরীক্ষা ছিল। কাজেই খানিকটা তফাৎ তো হবেই। বয়সের জন্যও খানিকটা তফাৎ হয়েছে আর বেশিটা 'পাকা হয়ে গিয়েছিলাম' তখন সে জন্যে হয়েছে।

জয় ঃ 'আমি কি রকম ভাবে বেঁচে আছি' এই বইতে অনেক কবিতাই আছে 'আমি' নিয়ে। আবার এমন অনেক কবিতা আছে যাতে দেখা যায় যে কোন চরিত্র এসে যাচ্ছে। তখন কি আপনি গল্প উপন্যাস লিখতে শুরু করেছেন বা লেখার কথা ভেবেছেন যে যার জন্য কবিতার মধ্যে চরিত্র এসে যাচ্ছিল এবং চরিত্রের মধ্যে একটা নাটক থাকছিল?

সুনীল ঃ গল্প উপন্যাস ভেবে যে চিন্তা করেছি তা নয়। এটার প্রধান কারণ হল যে তখনকার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কবিতা। সেই সব কবিতাতেও কিন্তু এমন একটা ঝোঁক ছিল। তার মধ্যে হঠাৎ একটা চরিত্র আসা, একটা কোন কাহিনীর ঝিলিক দেওয়া, এটা কিন্তু তখনকার কবিতারও একটা চরিত্রের লক্ষণ ছিল। যেমন ধরো, আমরা টি.এস. এলিয়েট-এর কবিতা খুব পড়তাম। টি.এস.এলিয়েট-এর খুব বিখ্যাত কবিতার প্রথম লাইনই কি খুব নাটকীয় নয় কী—

'লেট্স গো দ্যান ইউ অ্যান্ড আই আলফ্রেড' তারপর 'ইন দ্য রুম দ্য উওমেন কাম অ্যান্ড গো টকিং অফ মাইকেল অ্যাঞ্জেলো'

এরকম হঠাৎ হঠাৎ একটু নাটক এবং দু-একটা চরিত্র উঁকি দিয়ে যেত। এটাকে তখনকার দিনে আধুনিকতা বলা হত। হয়তো আমি তার প্রভাবে পড়ে গিয়েছিলাম। আর কবিতাগুলো বেশীরভাগই যে উত্তম পুরুষে বলা বা 'আমি' 'আমি' করে বলা, সেটা খুব সচেতনভাবেই করেছি। কারণ আমি তখন বলতাম যে আমাদের কবিতা হবে স্বীকারোক্তিমূলক। সবই জীবন থেকে নেওয়া হবে। মানে কাল্পনিক কোন পাহাড়ের বর্ণনা বা সমুদ্রের বর্ণনা, এসব লেখার কোন মানে হয় না।

সুতরাং যে জীবনযাপন করছি সেটাই যাতে আমরা কবিতার মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে পারি। সেজন্যেই বেশিরভাগ কবিতা তখন ওই ফার্স্ট পারসেনে লেখা এবং নিজের জীবনেরই কোন না কোন ঘটনার সঙ্গে জড়িত।

পরে যখন আমি উপন্যাস লিখতে শুরু করি তখনও কিন্তু আমি ওরকমই ভাবনাচিন্তা করেছিলাম, যে উপন্যাসগুলোও লিখব এভাবেই। যেটা হবে আমার নিজের জীবনের ঘটনা এবং 'আমি' 'আমি' করেই লিখব। শেষ পর্যন্ত অবশ্য উপন্যাসে সেটা আমি রাখতে পারিনি, কিন্তু ওভাবে ভেবে আরম্ভ করেছিলাম। এজন্যে প্রথম উপন্যাসের নামও দিয়েছিলাম 'আত্মপ্রকাশ'।

এটা ডেলিবারেট দেওয়া। যেটা আমার নিজের কথা বলছি। কাহিনী বানাচ্ছি না এরকম একটা ব্যাপার।

মল্লিকা ঃ সুনীলদা, আপনি গদ্যের কথায় যেহেতু এলেন এবং জয় যেটা বলছিলেন, প্রথম প্রশ্নটাই অর্থাৎ সাদাসিধে ভাষার কথা। আমার মনে হয় যে আপনার গদ্যগুলোতেও, যে কত সহজ ভাষা হতে পারে এবং পড়তে পড়তে মনে হয় যেন আপনার সঙ্গেই কথা বলছি বা আপনার কথা বলা শুনছি। এরকম একটা জায়গা থেকেই গল্প উপন্যাসগুলো যেন এগোতে শুরু করে।

একদিকে আপনি অত্যন্ত সরল সাদাসিধে ভাষায় নিজে লিখছেন, সেটা সচেতনভাবেই হয়ত। অন্যদিকে আপনার প্রিয় লেখক কমলকুমার মজুমদার। এই যে আপনার পছন্দের বৈচিত্র এবং প্রসারতা. যেটা থেকে আমরা সবসময় লিখতে চেষ্টা করি। আপনি এই বিষয়ে বলবেন একটু বিস্তারিত করে। কীরকম ধরনের আপনার পছন্দ বা নানারকমের পছন্দের মধ্যে কোন বিরোধ হয় কি না?

সুনীল ঃ না, আমার মনে হয় বিরোধ হওয়া উচিত না। কারণ আমার পড়ার অভ্যাস ছিল বিচিত্র।

আমি যেমন একদিক থেকে গল্প বা আধুনিক উপন্যাস, কবিতা পড়েছি। তেমনি গোয়েন্দা গল্প পড়তাম, ভ্রমণ কাহিনী, ইতিহাস নানা রকম পড়েছি। তখন আমি একটা ব্যাপার লক্ষ করেছি যে আমাদের সমবয়সী বন্ধুরা তারা মনে করত জেমস জয়েস আর ফ্রাঞ্জ কাফ্‌কা এঁরাই যেন আধুনিক লেখক। এর বাইরে অন্য সব লেখককে এরা নস্যাৎ করে দিচ্ছে। আমি আমার এরকম কোন বন্ধুকে বলেছিলাম যে তুমি চার্লস ডিকেন্স পড়বে না? সে বলল, দরকার নেই। সে দস্তোয়ভোস্কির খুব ভক্ত। আমি বললাম তুমি পুশকিন পড়বে না? সে বলল না, দরকার নেই। আমি আবার ওসবে বিশ্বাস করতাম না। আমি পুশকিনও পড়ব আবার দস্তোয়ভোস্কিও পড়ব। ডিকেন্সও পড়ব আবার জেমস জয়েসও পড়ব।

সেইরকমই বাংলাতেও আমি কমলকুমার মজুমদারের লেখার ভক্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার ভক্ত, আবার সতীনাথ ভাদুড়ীর গদ্যেরও ভক্ত।

কিন্তু নিজে যখন লিখব তখন ওদের মত করে লিখব কেন, তখন তো আমাকে নিজের ভাষাতেই লিখতে হবে। নিজের ভাষার জন্য আমি ঠিকই করেছিলাম যে গদ্যের ভাষা হবে কমিউনিকেশনের ভাষা। যাতে সহজেই সোজাসুজি আমার কথাগুলো বলা যায়। ব্যাপারটা অবশ্য মোটেই সহজ নয়।

খুব সহজ করে, একেবারে কোন স্টাইল নেই এটা বজায় রেখে লেখা আসলে কিন্তু শক্ত এবং সময়ও লাগে। শেষ পর্যন্ত আমি ঠিকই করেছিলাম যে কোন স্টাইল নেই, এটাই আমার স্টাইল। সে ভাবেই লিখে যাওয়া। যে সব বিষয় নিয়ে লিখছি সে বিষয়গুলো যাতে যাদের জন্য লিখছি তাদের হৃদয়ে পৌঁছে যায়, ভাষা কোন বাধা না হয় এটা আমার মাথার মধ্যে ছিল। অত্যন্ত ভাষার কারিকুরি করতে গিয়ে অনেক সময় দেখা যায় যে মর্মে প্রবেশ করা যায় না।

মল্লিকা ঃ সুনীলদা, আমরা আমাদের এখানে দেখি যে কবিতায় তো বটেই অনেক সময় গদ্যেও অনেকে মনে করেন যে একটু জটিল, একটু দুর্বোধ্য করে না লিখলে বোধহয় ঠিক জাতের লেখা হয় না। আপনাকেও নিশ্চয়ই এরকম অনেক প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হতে হয়েছে?

সুনীল ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাকেও শুনতে হয়েছে অনেক। অনেকেই মনে করেন যে ওই গদ্যের বাক্যগুলো খুব জটিল এবং খানিকটা কৃত্রিম না হলে খুব আধুনিক হওয়া যায় না। ওগুলো অবশ্য খুব সোজা। ইচ্ছে করলে ওরকম গদ্য কে না লিখতে পারে, আমিও পারি।

তবে আমার মনে হয় যাদের চিন্তা খুব পরিষ্কার নয় তারাই ওই ধরনের জটিল গদ্য লেখে। যদি না স্টাইলের ব্যাপারটা থাকে। আমি কমলকুমারের কথা ছেড়ে দিচ্ছি, কারণ এঁরা কিন্তু খুব আউটস্ট্যান্ডিং লেখক। এঁরা নিজস্ব একটা স্টাইল সৃষ্টি করেছেন, সেভাবেই সারা জীবন লিখেছেন। এঁদের কখনও অনুসরণ করার প্রশ্ন ওঠে না। প্রত্যেক ভাষাতেই এরকম একজন দুজন লেখক থাকেন কিন্তু মূল ভাষার স্রোত এভাবে এগোয় না।

সে জন্যই আমি চেষ্টা করেছিলাম যাতে ভাষাটা কখনও কৃত্রিম না হয়। ভাষাটা সহজ সাবলীল থাকে। সেটাই আমার উদ্দেশ্য ছিল।

বিনোদন ঃ সুনীলদা, একটু আগে আপনি বললেন যে 'আত্মপ্রকাশ' আপনার প্রথম উপন্যাস। কিন্তু আমরা যতদূর জানি যে 'উত্তর তরঙ্গ' পত্রিকায়, বোধহয় সেটা সম্পাদনা করতেন বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়—তাতে আপনি 'যুবক যুবতীরা' বলে একটা উপন্যাস শুরু করেছিলেন। সেটা বেশ কয়েকটা সংখ্যা বেরিয়েও ছিল। এখন আপনি 'আত্মপ্রকাশ'কে আপনার প্রথম উপন্যাস বলবেন না 'যুবক যুবতীরা'।

সুনীল ঃ হ্যাঁ, এটা নিয়ে খানিকটা জটিলতা আছে। ব্যাপারটা হচ্ছে আমি যখন ১৯৬৩ সালে বিদেশে যাই তখন ওখানে বসে আমি প্রথম ভেবেছিলাম একটা উপন্যাস লিখব। ওখানে বসেই আমি 'সোনালী দুঃখ' বলে একটা কাহিনী লিখি। এটা একটা বিদেশের ছায়াতে লেখা। তারপর আমি 'যুবক যুবতীরা' লেখার চেষ্টা করি। সেটা অনেকটা বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গের টেকনিকে।

যেন এক একটা চ্যাপ্টারে এক একটা চরিত্র কথা বলছে। বেশির ভাগই আমাদের নিজেদের জীবনের কথা এবং বন্ধুবান্ধবদের জীবনের কথা খানিকটা ওলোটপালট করে দেওয়া। কেউই ফোটোটাইপ নেই কিন্তু মূল বিষয় আমাদের বন্ধুবান্ধব।

ওটা যখন লিখতে শুরু করেছিলাম তখন আমার কলকাতার যারা বন্ধুবান্ধব তাদের দু-একজনকে লেখার কিছু কিছু অংশ পাঠিয়েছিলাম খুব ভয়ে ভয়ে, যে কেমন হচ্ছে। কেউই বিশেষ কিন্তু আমাকে উৎসাহ দেখায়নি। বিশেষ করে আমার বন্ধু দীপক মজুমদার বলেছিল অতি যাচ্ছেতাই হচ্ছে। কাজেই আমি তখন ভয়ে ওটা পুরো শেষ করিনি।

তারপর কলকাতায় এসে প্রথমে 'উত্তর তরঙ্গ' না, আরেকটা কি কাগজে যেন ওটা আমার কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল এবং ছাপা শুরু হয়েছিল। যিনি কাগজটা সম্পাদনা করতেন সেই ভদ্রলোকের নাম আমি ভুলে গেছি! তিনি একটা টিউটোরিয়াল হোম চালাতেন। টিউটোরিয়াল হোম ব্যবসা তখন ভাল চলত। অনেক কাঁচা টাকা পাওয়া যেত। তিনি সেই টাকা দিয়ে একটা পত্রিকা বের করতেন। ভদ্রলোক দাগ দিয়ে দিয়ে আমার লেখা কেটে দিতেন। তার ধারণা ছিল ওগুলো অশ্লীল। আমার তো তখন খুব মাথা গরম ছিল। আমি একদিন সেই ভদ্রলোককে বিরাট ভয় দেখালাম যে খবরদার আপনি যদি একটা লাইনও কাটেন তাহলে আমি আপনার মাথা ভাঙব। এরকমই একটা কথা বোধ হয় বলেছিলাম। যাইহোক সেই ভদ্রলোক তো ভয় পেয়ে গেলেন বললেন আমি ছাপব না। দরকার নেই। আমি ফিরিয়ে নিয়ে চলে এলাম। পরে সেটা 'উত্তর তরঙ্গ'তে ছাপা হয়েছিল। পুরোটাই ছাপা হয়েছিল। কোন কাটাকাটি না করেই।

এরমধ্যে একদিন সুশীল রায়ের বাড়িতে সাগরময় ঘোষ আমাকে বললেন, যে তুমি একটা উপন্যাস লেখ। একথা তো আমি অনেক জায়গায় বলেছি যে প্রথমে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, কারণ 'দেশ' পত্রিকার পুজো সংখ্যায় লেখা খুব সহজ কথা নয়। এর আগে আমার বয়সী কেউ সেখানে লেখেওনি। তখন তো 'দেশ' পত্রিকার পুজো সংখ্যায় এতগুলো উপন্যাস বের হত না। আগে বের হত একটা আর সেই বছর থেকেই তিনটে উপন্যাস শুরু হল। তিনটে উপন্যাস যতদূর মনে পড়ে বিমল কর, সমরেশ বসু এবং আমি এই তিনজন লিখেছিলাম।

সাগরদা বলায় খুব ভয় পেয়ে গেলাম। যাই হোক কোনরকমে সেটা লিখে ফেললাম। সেটাও নিজের জীবন থেকে নেওয়া এবং নায়কের নাম দিলাম সুনীল। যে প্রোটাগনিস্ট তার নাম সুনীল। অ্যাজ ইভ যেন নিজের ঘটনা বলছি। তাও তো সব সত্যি নয়, অনেক বানানো আছে ওর মধ্যে। ওই উপন্যাসটা 'দেশ' পত্রিকায় ছাপা হয়ে গেল এবং বই হিসেবেও কদিন বাদে বেরিয়ে গেল। কাজেই বই হিসেবে 'আত্মপ্রকাশ' প্রথম বেরিয়েছে বলে, ওটাকেই আমার প্রথম উপন্যাস বলে এখন সবাই জানে।

বিনোদন ঃ আমরা যতটা জানি আপনি উপন্যাস লেখা শুরু করার আগে, মানে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লেখা শুরু করার আগে 'নীললোহিত'-এর আবির্ভাব ঘটেছিল। আপনি তখন ফিচার লিখতেন প্রচুর এবং 'আনন্দবাজার' পত্রিকার রবিবাসরীয়তে 'নীললোহিতের চোখের সামনে' লিখতেন। আপনি একটু আগে যে সহজ সরল ভাষায় কথা বললেন সেটা কি আপনি ওই ফিচার লিখতে গিয়েই শুরু করেন না কি উপন্যাসের জন্য আলাদা কোন ভাষা ভেবেছেন। এই প্রসঙ্গে আরেকটা কথা মনে পড়ছে যে আপনি কিন্তু ছোটগল্পটা অনেক আগে লিখতে শুরু করেছিলেন। লালমোহন দাস একটি কাগজ সম্পাদনা করতেন 'ছোটগল্প' নামে। সেখানেও কিন্তু আপনি বেশ কিছু গল্প লিখেছিলেন।

সুনীল ঃ আসল ব্যাপারটা হচ্ছে যে, পুরো পঞ্চাশের দশকে আমি কবিতাই লিখতাম। মাঝে মাঝে হাত খরচ জোটাবার জন্য আনন্দবাজারের রবিবাসরীয়তে একটা-আধটা গল্পও পাঠিয়েছি এবং ছাপাও হয়েছে। ১৫ টাকা পাওয়া যেত আর বেশ ভালই লাগত। এই উপলক্ষে গল্প লেখা। এছাড়া লালমোহন দাসের ' ছোটগল্প' নামে তরুণদের একটা নামকরা পত্রিকা ছিল। তাতে ওরা চেয়েছিল

এবং আমিও দু-একটা লেখা তাতেও দিয়েছি। ওই যে বললাম যদিও কবিতাই লিখতাম কিন্তু আমার মনের মধ্যে বোধহয় বরাবরই গল্প উপন্যাস লেখার ঝোঁক ছিল।

একটা ঘটনা বলি। বোধহয় কেউই জানে না সেটা, জানার কথাও নয়। এসবেরও আগে যখন আমরা 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা সবে মাত্র প্রকাশ করি তখনই আমরা ভেবেছিলাম যে আমি, দীপক মজুমদার এবং আনন্দ বাগচী তিনজন মিলে একটা উপন্যাস লিখব। যেরকম হয়। আগেকার দিনে বারোয়ারী উপন্যাস লেখা হত যেরকম করে। এক একজনের এক একটা চ্যাপ্টার লেখা। সেটা লিখে আমরা শেষও করেছিলাম। সে উপন্যাসটার নাম আমার মনে নেই, সেটা কোথায় হারিয়ে গেছে তাও জানি না। কাজেই গদ্য লেখার একটা ঝোঁক আমার ছিল। আসলে ফিচার লিখতে শুরু করি অনেকটা আমি জীবিকার কারণে। বিদেশ থেকে যখন ফিরে আসি তখন একদম বেকার ছিলাম। আর একটা হাস্যকর ধারণা আমার মধ্যে ছিল লেখক যে হবে সে কেন চাকরি করবে? শুধু লিখেই তো তার জীবনযাপন করা উচিত। বিদেশ থেকে আমার মধ্যে এই ভূতটা চেপেছিল। ওদেশের লেখকরা তখন এসব কথা বলত। আসলে ওদের দেশের জীবনযাপনের চেয়ে আমাদের দেশে জীবনযাপন অনেক শক্ত, কারণ একটা পারিবারিক দায়িত্ব থাকে আর দ্বিতীয় কারণ হল বাংলা লিখে জীবনযাপন করা যায় না। সেজন্য আমাকে প্রচুর লিখতে হত।

আমি তখন অনেকগুলো ছদ্মনামে লিখেছি। সনাতন পাঠক নামে আমি বই, পত্র-পত্রিকা সম্বন্ধে লিখেছি। নীল উপাধ্যায় নামে আমি বিদেশের নানান কাহিনী নিয়ে লিখতাম। নীললোহিত নামে আধা রম্যরচনা আধা ভ্রমণ কাহিনী মতন একটা জিনিস লিখতাম। আস্তে আস্তে 'নীললোহিত' একটা চরিত্র হল, যার বয়স সাতাশ। আর নিজের নামে তো প্রচুর লিখতাম।

এখন গদ্য ভাষাটা বেশি লেখার জন্য সরল হয়েছে, না আমি প্রথম থেকেই ঠিক করেছিলাম যে সহজ সরল ভাষায় লিখব, এটা বলা শক্ত। বোধহয় দুটো ব্যাপারেই আমার মধ্যে কাজ করেছিল।

বিনোদন ঃ 'আত্মপ্রকাশ' বা 'যুবক যুবতীরা' বিষয়ের দিক থেকে যা আপনি ভেবেছিলেন বা যাদের নিয়ে লিখেছিলেন যে সব চরিত্র বা ঘটনা নিয়ে, তার কাছাকাছি সময়ে বা একটু পরে 'সরল সত্য' নামে আপনার একটি উপন্যাস বের হয়। যতদূর মনে হয় এটা কোন বড় কাগজে বেরোযনি, 'ঘরোয়া' বলে একটা পত্রিকায় বেরিয়েছিল।

'সরল সত্য' কিন্তু 'আত্মপ্রকাশ' বা 'যুবক যুবতীরা' দুটি লেখার চেয়ে অনেক বেশি গভীর। আপনি নিশ্চয়ই সে সময়ে আলোচনায় শুনেছেন যে ওই লেখাটিকে অনেকেই খুব বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন সেই সময়ে। একটা অন্য ধরনের লেখা, গভীরতা বেশি।

তার মধ্যেও কিন্তু আপনার বন্ধুবান্ধব বা আর যাদের নিয়ে আপনি লিখতেন, আপনি যেটা বলছেন যে জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে। এতেও প্রত্যক্ষ জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল। সেটা কিন্তু ছিল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনের অভিজ্ঞতা। সেটা বন্ধু বান্ধবদের অভিজ্ঞতা নয়।

আপনার কি মনে হয় না যে আপনি 'আত্মপ্রকাশ' বা 'যুবক যুবতীরা' বা পরবর্তীকালে 'অরণ্যের দিনরাত্রি' যাদের নিয়ে লিখেছিলেন বা চরিত্র করে—সেই চরিত্রগুলো বা সেই ধরনের লেখা পড়ে আর আপনার ভাল লাগেনি বলেই আপনি 'সরল সত্য'র দিকে ঝুঁকে ছিলেন? কারণ পরবর্তীকালে আপনার লেখা কিন্তু এই 'সরল সত্য' থেকেই একটু অন্যদিকে ঘুরে যায়।

সুনীল ঃ হ্যাঁ, সেটা ঠিকই। প্রথম কথা ওই চরিত্রগুলোকে যে আমার ভাল লাগেনি তা নয়। দু-তিনটে উপন্যাস বন্ধুবান্ধবদের এবং নিজের ঘটনা নিয়ে লিখতে লিখতে মনে হল এর মধ্যে একটা একঘেয়েমি এসে যেতে পারে। সে জন্যেই আমি তখনকার মত ওটা থামিয়ে দিয়েছিলাম। বহুপরে অবশ্য আবার 'বন্ধুবান্ধব' নামে একটা বই লিখেছিলাম। কিন্তু 'সরল সত্য'টা অন্যভাবে লেখার চেষ্টা ছিল।

আসলে কি ভেবে লিখেছি তা তো বলতে পারি না, অন্ধের মত লিখেছি তখন। ভীষণ লেখার

চাপ ছিল। একটা দারিদ্রের ব্যাপার ছিল, সংসার চালানোর ব্যাপার ছিল, কাজেই খালি মনে হত তাড়াতাড়ি লেখাটা শেষ করতে হবে। আমার লেখার মধ্যে প্রধান দোষ যেটা, সেটা হল ওই তাড়াতাড়ি লেখা।

তাড়াতাড়ি লেখার জন্য অনেক লেখা একটু এলোমেলো হয়েছে। শেষটা ঠিক মত হয়নি। আবার কেউ কেউ বলে ওই তাড়াতাড়ি লিখি বলেই পাঠকরাও তাড়াতাড়ি পড়ে ফেলে এবং তাড়াতাড়ি ভুলেও যায়।

জয় ঃ এই যে আপনি 'সরল সত্য' লেখার কথা বললেন এবং তারপরেও আপনি 'স্বপ্ন লজ্জাহীন', 'কালো রাস্তা সাদা বাড়ি' বা 'প্রতিদ্বন্দ্বী' এসব লেখা লিখেছেন। হঠাৎ আবার 'আমিই সে' উপন্যাস লেখার কথা মনে হল কি করে?

সুনীল ঃ আমার মধ্যে ইতিহাসের একটা ঝোঁক বরাবরই ছিল যদিও আমি ইতিহাসের ছাত্র ছিলাম না। প্রথমে ছিলাম বিজ্ঞানের ছাত্র পরে অর্থনীতির। তবুও ইতিহাসের প্রতি একটা টান আমার সব সময়ে ছিল। পরবর্তীকালে যেটা আমার 'সেই সময়' লেখার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। 'সেই সময়' আমি যে বিষয় নিয়ে লিখেছি সেটা নিয়ে কিন্তু পড়াশোনা করেছি বহু আগে থেকেই। বাচ্চা বয়েস থেকেই আমি উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস পড়তাম। তোমরা শুনলে হয়ত হাসবে, এই উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস পড়তে পড়তে আমার মাঝখানে ধারণা হয়েছিল যে আমার ব্রাহ্ম হওয়া উচিত। আমি তখন ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে বলেওছিলাম যে আমি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিতে চাই। সেখানে একজন লাইব্রেরিয়ান ছিলেন বয়স্ক লোক, তিনি খুব ভাল কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, এখনই ব্যস্ত হওয়ার কি আছে, আরেকটু বয়স হোক, আরেকটু ভালভাবে চিন্তা কর, তারপর।

পরে অবশ্য ধর্ম পাল্টানো নিয়ে আর কোন প্রশ্ন আমার মনে জাগেনি। যাই হোক, ওইসময় আমি একটা বই পড়েছিলাম। রাহুল সাংকৃত্যায়নের 'ভলগা থেকে গঙ্গা' উনি যে পর্যন্ত লিখেছিলেন তার পরের একটা পার্ট লেখা যেতে পারে বলে আমার তখন মনে হয়েছিল। এটা ভেবে আমি তখন 'আমিই সে' লেখার কথা চিন্তা করি।

তখন আমি এও ভেবেছিলাম যে ওর উপাদানগুলো আমি নেব বেদ ও উপনিষদ থেকে। কারণ অনেকে বলেন যে 'বেদ' জিনিসটা আর্যরা নিয়ে এসেছিল বাইরে থেকে। ওটা এখানেই যে সব লেখা হয়েছিল তা নয়। হয়ত ইরান বা মধ্যপ্রাচ্যে লেখা হয়েছিল এখানে নিয়ে চলে এসেছে। ফলে ওর থেকে কিছু কিছু উপাদান আমি নিয়েছি। যেমন ইন্দ্রের কথা, ইন্দ্র তুমি আমাদের নগর জয় করে দাও। এসব কথাগুলো যেন মনে হয় আর্যরা যখন বাইরে থেকে আসে তখনকার কথা।

এছাড়াও আরেকটা কারণ আছে। আমি একদিন একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। একটা অদ্ভুত স্বপ্ন! আমি এক জায়গায় বলেওছি যে স্বপ্ন দেখাটা আমার একটা রোগ। এমন এমন অদ্ভুত স্বপ্ন দেখি যে ফ্রয়েডের বাবার সাধ্য নেই তার ব্যাখ্যা করে।

স্বপ্নটা আদিমকালে ছিল একটা নদীর ধারে কিছু লোক একটা ভেড়ার বাচ্চাকে ওপারে ছুঁড়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। খুব আদিমকাল বলে মনে হয়েছিল। নদীর ওপারে একটা মাত্র লোক দাঁড়িয়ে আছে, এই স্বপ্নটা আমি কেন দেখেছিলাম জানি না। পরে আমার মনে হয়েছিল যখন 'আমিই সে' লিখতে শুরু করি, এমনও তো হতে পারে যে একটা লোক নদীর জলে পড়ে গিয়েছিল এবং ভাসতে ভাসতে ওপারে চলে গেছে, তখন তো নৌকা কিছু ছিল না, খরস্রোতা নদীতে নামলে মৃত্যু হত। একটা লোক কোনক্রমে ওপারে চলে গেছে। সে কি খাবে, খাওয়ার কোন ঠিক ছিল না বলেই এপারের লোকগুলো তাকে ভেড়া ছুঁড়ে পাঠাবার চেষ্টা করছিল। লক্ষ্য করবে যে 'আমিই সে' উপন্যাসে এই ব্যাপারটা আমি রেখেছি। যে লোকটা নদীর ওপারে চলে গিয়েছিল সেই প্রথম আস্তে আস্তে নদীর ওপারে গিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মহেঞ্জোদরো গিয়ে দেখল সেখানে শস্য ফলে আছে। শস্যের দেশে সে পৌঁছে গেল।

জয় ঃ সুনীলদা, আপনি স্বপ্নের কথা বললেন, এই প্রসঙ্গে আমার আপনার একটা কবিতার কথা মনে পড়ছে, যেখানে আছে—

'যেন আমি ও আমার মৃত্যু একই বালিশে মাথা রেখে শুয়ে আছি
যেন একই স্বপ্ন দুজনে দেখছি'

এই যে 'আমি কি রকমভাবে বেঁচে আছি'র কবিতা, এই কবিতার মধ্যে একটা স্বপ্নও আছে। কখনও সেই স্বপ্ন ঘুমের, কখনও বা সেই স্বপ্ন জেগে থাকার একটা ভূমিকা নিচ্ছে। যেমন আপনার 'কয়েক মুহূর্ত' বলে একটা কবিতা। একটা কথার সঙ্গে আরেকটা কথা সেই লেখা পদ্ধতির মধ্যেই খুব জড়িয়ে আছে। আমি আরেকটা কবিতার কথা বলব 'নীরা ও জীরো আওয়ার, এখানে আছে যে—

'কেউ শূন্যে ওঠে কেউ শূন্যে নামে এই
প্রথম আমার মৃত্যুও
অমরত্বের ভয় কেটে যায় আমি হেসে
বন্দনা করি
ওঁ শান্তি হে বিপরীত সাম্প্রতিক গণিতের
বীজ
তুমি ধন্য তুমি ইয়ার্কি অজ্ঞান হবার আগে
তুমি সশব্দ
অভ্যুত্থান তুমি নেশা তুমি নীরা তুমি
আমার ব্যক্তিগত পাপমুক্তি'।

এই যে এ ধরনের ভাষা, কিম্বা ধরুন আপনার 'জুয়া' কবিতাটা। যেখানে জীবন বদলে নেওয়া হচ্ছে নিখিলেশের সঙ্গে। আরেকটা কবিতায় আছে যে আমি ও নিখিলেশ আমরা দুজন, তারপর আমরা চারজন। এই যে কখনও ঘুমে কখনও জাগরণে, কখনও বা শব্দগুলো যতি চিহ্ন হারিয়ে একটা আর একটার ভেতর ঢুকে পড়েছে। যেমন 'কয়েক মুহূর্ত' কবিতায়। এই যে কবিতাগুলো স্বপ্নের মধ্যে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে, এই বিষয়ে একটু বলবেন, কি ভাবে এমন ঘটছিল।

সুনীল ঃ তুমি নিজে কবি তুমি তো জানই এটা একটা ঘোরের মত ব্যাপার আসে এক এক সময়, যখন কবিতাগুলো বেরিয়ে আসে। কি ভাবে আসে বলা যায় না। যেমন স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা যায় না। এই স্বপ্নগুলো ঠিকই কখনও ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন কখনও জাগ্রত সময়ের স্বপ্ন। এক এক সময় মনে হয় সব কবিতাই স্বপ্ন। সেরকমভাবেই লেখা। যেন ওটা আমি লিখছি না ওটা আমার ভেতর থেকে অন্য একজন কেউ লিখছে। এজন্যে আমি পরে অন্য একটা জায়গায় লিখেছিলাম—

'যে লেখে সে আমি নয়
কেন যে আমায় দোষী কর'।

জয় ঃ আরেকটা কথা বলছি, এর পাশাপাশি আপনার কিছু স্টেটমেন্ট এর মত কবিতাও ছিল। যেমন—

'বেয়ারা পাঠিয়ে কারা টাকা তোলে ব্যাঙ্ক থেকে' তারপরে আরও একটা কবিতার মধ্যেও ছিল, সেটা অবশ্য 'বন্দী জেগে আছো' বইতে 'ইন্দিরা গান্ধী'কে নিয়ে লেখা।

আবার তার পাশে এরকম কবিতাও ছিল যে—আমি ও আমার আত্মা।

'ওই একটা ট্রেনের সঙ্গে আমার আত্মা ছুটে যাচ্ছে' এই যে কবিতাটা। একই সঙ্গে আপনার স্টেটমেন্টের মত কবিতা আবার একই সঙ্গে তার পাশাপাশি এমন কবিতা যা গভীর রহস্যময়। এটা যদিও ঠিকই যে খুব সহজ ভাষায় লেখা হয়েছে বলে বাইরে থেকে মনে হচ্ছে। কিন্তু এর অর্থ

খুব গভীর খুব রূঢ় একই সঙ্গে এই দুটো ধরনের ব্যাপার আপনি কি করে রাখতে পারছিলেন?

ধরা যাক আমরা যদি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কথা ধরি। তিনি এমন অনেক কবিতা লিখেছেন যা সহজ ভাষার লেখা, মানুষের জীবন নিয়ে লেখা, কিন্তু তার কবিতার মধ্যে রহস্যের দিকটা নেই। অথচ আপনার এই সময়ের কবিতায় অর্থাৎ 'বন্দী জেগে আছো' বা 'আমি কি রকম ভাবে বেঁচে আছি' এই দুটো বইতেই দেখতে পাচ্ছি একই সঙ্গে পাশাপাশি এই দু'রকমের কবিতা রয়েছে। এটা কি করে সম্ভব হয়েছে?

সুনীল ঃ এর মধ্যে খানিকটা সচেতন ব্যাপার আছে। তখন আমাদের ওই পঞ্চাশ-ষাটের দশকে একটা মার্কসিস্ট চিন্তাধারার প্রভাব ছিল। আরেকটা ছিল সোসালিস্ট রিয়ালিজিম। এর কথা তখন খুব বেশী উঠত। কেউ কেউ মনে করত যে সমস্ত কবিতা বা সাহিত্যই হওয়া উচিৎ সমাজ বদলের হাতিয়ার, বা জনগণের জন্য—এই কথাটাই তখন ভয়ংকর ভাবে আলেচিত হত।

আমার কিন্তু মনে হত যে আমি মুক্ত ও স্বাধীন। আমি ইচ্ছা করলে প্রেমের কবিতা লিখব, আমি ইচ্ছা করলে কোন জটিল চিন্তার কথা লিখব, আমিই আবার ইচ্ছা করলে তিনজন শ্রমিক যে অনশন করছে তাদের কথাও লিখব। এটা আমার ইচ্ছের উপর নির্ভর করে। আমাকে কেউ বলে দেবে না যে আমি কি ভাবে লিখব। কিম্বা আমার কবিতা কিসের জন্য ব্যবহৃত হবে এটা মানব না।

তখন যেহেতু অনেকেই শ্রমিকদের কথা, নির্যাতিত মানুষদের কথা, এসবই বেশি লিখত এবং সোজাসুজি ভাষায় লিখত তো আমার মনে হত আমরাও এমনই অনুভব করি। আমরা এমন নয় যে সব সময় একটা নির্বিকার জগতে রয়ে গেছি, আমাদের চারপাশে যা ঘটছে তা আমরা অনুভব করছি না এবং সে বিষয়ে লিখতে গেলে হয়ত সোজাসুজিই লেখা দরকার। এই জন্যে আমি অনেক সময় সেগুলো সোজাসুজি ভাষাতেই লিখেছি। তাতে আমার মধ্যে কোন বিরোধ ঘটেনি।

আমি যদি দেখতাম যে একদল শ্রমিক আমরণ অনশনে বসে আছে তাহলে আমার নিজের ভাত খেতে গিয়ে বমি এসে যেত। মনে হত ওরা অনশনে বসেছে আর আমি ভাত খাচ্ছি কি করে। নিশ্চয়ই ওদের সঙ্গে আমার কোথাও একটা মনের মিল বা সাযুজ্য আছে।

মল্লিকা ঃ সুনীলদা, আপনি এই যে নানারকম লেখার কথা বলছেন বা নানারকম লিখবেন বলে ঠিক করেছিলেন। যেমন প্রেমের কবিতাও লিখবেন আবার অনশনে থাকা শ্রমিকদের কথাও লিখবেন, আবার যে-কোনরকম গল্পও লিখবেন। এই সমস্ত কিছুর মধ্যে আপনার নিজের বিশেষ কিছু ভাল লাগে বা ভাল লেগেছে এমন কোন ধরনের লেখা, সেরকম কিছু আছে?

সুনীল ঃ আসল কথা হল পৃথিবীর সাহিত্যে শেষ পর্যন্ত যেটা টেঁকে সেটা হচ্ছে সম্পর্কের জটিলতার ব্যাপার। এছাড়া যতই তুমি বল, যা কিছু নিয়েই তুমি লেখ, যত সমস্যা নিয়েই তুমি লেখ এমনকি যদি ইতিহাস নিয়েও লেখ সবই হল টাইম সার্ভার। যেগুলো বেঁচে থাকে তা হল মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের জটিলতা এবং রহস্য।

কোন লেখকেরই লিখতে গেলে বা পড়তে গেলে এগুলোই সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে। কিন্তু নানান প্রয়োজনে তাকে অনেক কিছু নিয়ে লিখতে হয়। সেজন্যই একজন লেখক যদি কখনও এরকম লেখেন যে 'গরম ভাত বা নিছক ভূতের গল্প' যেখানে একজন মানুষের খাওয়া-পরার সমস্যাটাই প্রধান। আবার সে হয়ত 'রাতপাখি'র মত একটা গল্প লিখতে পারে যেখানে পুরো ব্যাপারটাই বা বিষয়টাই রোমান্টিক। আমি অন্তত এটাতে বিশ্বাস করি। আসলে আমি ছাত্র বয়সে একটু রাজনীতি করতাম। ছাত্র বয়সে আমি এস. এফ-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলাম। এস.এফ-এর হয়ে আমি রাস্তায় ঝান্ডা ফান্ডা নিয়ে মিছিলও করেছি। এমন কি এক পয়সার ট্রাম আন্দোলনে ইঁটও ছুঁড়েছি। পুলিশ গুলি চালিয়েছে, টিয়ার গ্যাস চালিয়েছে, ছুটে ছুটে পালিয়েছি। এসব অভিজ্ঞতা আমার আছে। মানুষের মুক্তি সমাজের বৈষম্য এটা যে দূর করা দরকার সেটা আমার মনের মধ্যে কাজ করত অল্প বয়স

থেকেই। কিন্তু যখন আমায় রাজনীতির দাদারা বলতেন যে সুকান্তর মত লেখ, প্রেমের কবিতা লেখা চলবে না। তখনই আমার মধ্যে বিদ্রোহ চাড়া দিয়ে উঠত। এ আবার কি? এদের কথা শুনতে পারব না। সেই জন্যেই আমি আস্তে আস্তে রাজনীতি থেকে নিজেকে বিযুক্ত করে ফেলি।

তবে লেখার মধ্যে আমার যখনই মনে হয়েছে এসব ব্যাপার তখনই লিখেছি। দুই-ই লিখেছি। অনেক সময় আমাকে অনেকে বলত ও, তো প্রেমের কবিতাই বেশি লেখে। তবে আমি লিখেছি কিন্তু নানারকমই।

মল্লিকা ঃ এরকম তো আমরা সারা পৃথিবীতেই দেখি অনেক লেখকই কিছুদিন কোন রাজনৈতিক পার্টির সঙ্গে থেকেছেন বা থাকার চেষ্টা করেছেন কিন্তু থাকতে পারেননি। আপনার কি মনে হয় যে সবসময়ই একজন স্বাধীন লেখক বা একজন স্বাধীন শিল্পীর সত্তার সঙ্গে বিরোধ লেগে যায়। কোন একটা দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকা কি খুব অসম্ভব বলে মনে হয় আপনার?

সুনীল ঃ হ্যাঁ, আমি এটা দেখেছি। পরবর্তীকালে যখন পৃথিবীর নানান দেশে ঘুরেছি, ধর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর যে পরিবর্তন হল সেগুলোও দেখেছি। তাতে আমার মনে হয়েছে যে রাজনীতির দরকার তো আছে ঠিকই, হয়ত বিপ্লবেরও দরকার আছে, শ্রেণী সংগ্রামেরও দরকার আছে, এগুলো কোনটাই আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু এর জন্য সমস্ত লোককেই রাজনীতির অন্তর্গত করতে হবে এটার কোন মানে হয় না।

যারা চিকিৎসক, যারা ইঞ্জিনিয়ার, যারা টেকনিকাল কাজ করেন তাদেরও কি রাজনীতির মধ্যে আনতে হবে? তাহলে তারা নিজেদের কাজ করবেন কি করে? আমার সব সময়ে মনে হয়েছে যে রাজনৈতিক দলগুলোরই উচিৎ লেখক ও শিল্পীদের রাজনীতিতে কুক্ষিগত না করা। এরা হচ্ছে সমাজের বিবেক। যখন একটা দেশ বা সরকার ভাল কিছু করবে তখন তারা তার সমর্থন করবে আবার সরকার যখন ভুল করবে তাব সমালোচনাও করবে।

সুতরাং তাদের যদি স্বাধীন থাকতে দেওয়া হয় তাহলেই শুধু যে শিল্প সাহিত্যের উপকার হয় তা নয়, সারা দেশেই উপকার হতে পারে। সারা দেশকেই এরা খানিকটা এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে পারে।

মল্লিকা ঃ আমি এমনি একটা উদাহরণ দিচ্ছি যে নেরুদা কিন্তু রাস্ট্রব্যবস্থায় অংশ নিয়েছিলেন। অক্টোভিও পাজও নিয়েছিলেন কিন্তু তিনি আবার পদত্যাগও করেছিলেন। আপনার কি মনে হয় যে এতদূব পর্যন্ত গেলে, রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে বা রাজনীতির সঙ্গে কোন সৃষ্টিশীল লেখকের অসুবিধা হতে পারে?

সুনীল ঃ আমার তো তাই মনে হয। তুমি যে নেরুদার কথা বললে, কিন্তু নেরুদার আত্মজীবনী পড়লে দেখবে অনেক সময় তিনি দলের যে নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন তা নিয়ে বিরোধ ছিল। আমাদের দেশেই তো যখন কংগ্রেসে দল হয় তখন বঙ্কিমবাবুকে বলা হয়েছিল, আপনি কংগ্রেসে যোগ দিন, তিনি বললেন—না। বিদ্যাসাগর মশাইকে বলা হয়েছিল যে আপনি কংগ্রেসে যোগ দিন, তিনি বললেন—না। সে রকমই দেখা যায় যে পৃথিবীর যারা এরকম কাজের সঙ্গে যুক্ত, সৃষ্টিশীল বা শিল্প-সাহিত্যের কাজের সঙ্গে যুক্ত তারা কিন্তু রাজনীতির মধ্যে যেতে চান না। রাজনীতির মধ্যে গেলে একটা ঘেরাটোপের মধ্যে যেতে হয়, কতকগুলো নির্দিষ্ট পূর্ব বিশ্বাস মেনে চলতে হয়। শিল্পী-সাহিত্যিকদের কিন্তু স্থির বিশ্বাস বা পূর্ব বিশ্বাস মানলে চলে না। তারা যখন তখন মত বদলাতে পারে। তারা দোলাচলে থাকতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তো কত বার মত পাল্টেছেন। এমন হতেই পারে।

বিনোদন ঃ সুনীলদা, এবার একটু অন্যদিকে যাই আমরা। আমাদের কাগজের যারা পাঠক-পাঠিকা, বুঝতেই পারছেন আপনার চেয়ে অনেক ছোট। তারা আপনাকে দেখছে, বা আমরা আপনাকে দেখছি কিন্তু একটা প্রতিষ্ঠিত অবস্থায়। যখন আপনি আপনার প্রতিভার মধ্যগগনে। কবিতা, উপন্যাস, গল্প সব দিকেই ছড়িয়ে পড়েছেন।

সুনীল ঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছি কি? এখনও তো ভেতরে ভেতরে চ্যাংড়াই রয়ে গেছি।

বিনোদন ঃ সে তো হয়েছেনই। না হলে আমরা আপনাকে এ প্রশ্ন করতাম না। একটা কথা আপনি বললেন যে লেখার গোড়াতে আপনারা সেই সময় কি ভাবতে শুরু করেছিলেন। এটা অনেককে জড়িয়ে বললেন। আপনার কি মনে হয় যে আপনার যে চিন্তাধারা ছিল সে কবিতাই হোক কিম্বা গল্প উপন্যাসই হোক, আপনার সমসাময়িক আর যারা ছিলেন মানে গুছিয়ে বলতে গেলে 'কৃত্তিবাস'-এর সঙ্গে তারাও কি একইরকম ভাবনায় লিখছিলেন?

সুনীল ঃ এটা একটা বেশ চমৎকার ব্যাপার। কৃত্তিবাসে আমরা অনেকে একসঙ্গে দলবদ্ধ হয়েছিলাম। আমাদের জীবনযাত্রার মিল ছিল। আমরা একসঙ্গে অনেকটা সময় কাটাতাম, কিন্তু কারোর লেখার সঙ্গে কারোর লেখার কোন মিল নেই। লেখার ক্ষেত্রে কিন্তু আলাদা হয়ে গিয়েছিলাম। এমন নয় যে আমরা সংঘবদ্ধভাবে কোন লেখার তত্ত্ব ঠিক করেছি। এমন নয় যে আমরা সকলেই একরকম বিষয় নিয়ে লিখব যা সাধারণত রাজনৈতিক দলের লোকেরা করে সেরকম কিছু ছিল না। যে যার নিজের মত করে লিখেছি। প্রত্যেকেই একটা আলাদা আলাদা পদ তৈরি করেছে। অথচ ভেতরে ভেতরে কোথাও যেন একটা সূক্ষ্ম মিল রয়েছে। বিষয়বস্তুর মিল নেই, স্টাইলের মিল নেই। এমন কি কেউ বেশি লিখছে বা কেউ কম লিখছে তা সত্ত্বেও আমার মনে হয় মানসিকতার একটা সূক্ষ্ম মিল কোথাও ছিল।

বিনোদন ঃ সেই মিলটা কি, একটু বলুন না।

সুনীল ঃ প্রথম কথা হল যে সমস্ত প্রথা আমরা মেনে চলি সেগুলোকে প্রশ্ন করা। আমাদের বাপ-ঠাকুরদা যা বলে গেছেন সেগুলো মেনে নেব কিনা। আমাদের বাপ-ঠাকুরদা বলতে সাহিত্যের যারা বাপ-ঠাকুরদা তাদের কথা বলছি। তারা যা বলেছেন যেভাবে লিখেছেন সেটা মানব কিনা তা আগাগোড়া প্রশ্ন করা। আর ভাষা এবং শব্দ ব্যবহার নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করা এমনই সাধারণ কিছু দিক ছিল। আরও ছিল এই যে একটা বাধা ভেঙে দেওয়া। মানে নির্দিষ্ট কোন সাহিত্যিক বিশ্বাসের বদলে লেখকরা যেমন খুশি লিখতে পারে। বলা যেতে পারে এক ধরনের অ্যানারকিজিম আমদানি করেছিলাম।

এটার কারণ ছিল একটা প্রতিক্রিয়া। যেহেতু তখন মার্কসবাদীদের পক্ষ থেকে বড় বড় ফতোয়া দেওয়া হত যে সাহিত্য এই গণ্ডির মধ্যে থাকবে। সাহিত্যের উদ্দেশ্য এই বা অন্য কিছু নিয়ে লিখলেই প্রতিক্রিয়াশীল হবে। যেহেতু এরকম ফতোয়া থাকত সেই জন্য আমরা ঠিক করেছিলাম যে ওরা যে বিষয় নিয়ে লেখে আমরাও সেই বিষয় নিয়ে লিখব। দেখিয়ে দেব যে ওই নিয়েও লেখা যায়। আবার প্রেমের কবিতাও লেখা যাবে। তাই চে গুয়েভারাকে নিয়ে লিখতে আমাদের কোন অসুবিধে হয়নি। কোন কবিকে গুলি করে মারলে তার প্রতিবাদ করতে আমাদের কোন অসুবিধা হয়নি। নিরন্ন মানুষের কথা লিখতেও আমাদের কোন অসুবিধা হয়নি। কিন্তু তার মধ্যে কোন বিশেষ ডগমার অনুপ্রবেশ না ঘটে সেজন্য বিশেষ সচেতন ছিলাম। হয়ত এটাই সাধারণ মিল ছিল।

বিনোদন ঃ আমরা যতদূর জানি যে কৃত্তিবাসের প্রথম সংখ্যায় শঙ্খ ঘোষের একটি কবিতা ছাপা হয় 'দিনগুলি রাতগুলি'। তা শঙ্খ ঘোষ নিজে তো মার্কসিস্ট অন্তত আমরা তো সেরকমই জানি। তখনও ছিলেন। কিন্তু কবিতার কথায় আপনি যা বললেন—আপনি এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায় ছাড়া শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত বা আর যাঁরা কৃত্তিবাসে লিখতেন তারা কিন্তু আপনার কথা মত সে ধরনের লেখা লেখেননি। তাদের একটা নিজস্ব ধারা ছিল। এবং কিছুটা যেন প্রথা মেনেই লেখা। প্রথা ভেঙে নয়। তাদের বিষয়ে হয়ত পার্থক্য ছিল, ছন্দে অনেক বৈচিত্র্য ছিল। এই ব্যাপারটা আপনার কি মনে হয়? আপনারা এক সময়ে লিখছেন, কৃত্তিবাসেই লিখছেন অথচ একরকম হচ্ছে না।

সুনীল ঃ কৃত্তিবাসে কিন্তু আমরা একটা জিনিস করেছিলাম যেটা অন্য অনেক পত্রিকাই করে না। আমি দাবি করতে পারি যে ওটাই ছিল আমাদের বৈশিষ্ট্য। কৃত্তিবাসে আমরা দলমত নির্বিশেষে

সকলের কবিতাই ছাপতাম। আমরা কখনই ভাবিনি যে অমুকে অমুক দলে বিশ্বাসী বা আদর্শে বিশ্বাসী বলে তার লেখা ছাপা হবে না। আমাদের মান ছিল লেখাটা কবিতা হচ্ছে কিনা। সেজন্য কৃত্তিবাসে তখন যারা বামপন্থী কবি ছিল তাদের সকলেরই কবিতা ছাপা হয়েছে। এবং পরে যারা উগ্রপন্থী হয়েছে, যেমন কিছু কিছু কবিরা যারা নকশাল করত তাদের লেখাও এক সময়ে কৃত্তিবাসে ছাপা হয়েছে। যারা রাজনীতির নিরপেক্ষতার বিশ্বাসী ছিল তাদের লেখাও ছাপা হয়েছে। যেহেতু আমরা লেখকের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতাম সেইজন্য দলমত-নির্বিশেষে সকলের কবিতাই ছেপেছি। কখনই এ বিষয়ে আমাদের ভেদাভেদ ছিল না। আর শঙ্খ ঘোষ তো ছিলেন কৃত্তিবাসের প্রথম সংখ্যার প্রধান কবি। ওঁর লেখা জোগাড় করতে পেরে আমরা নিজেদের গর্বিতবোধ করতে পেরেছিলাম। শঙ্খ ঘোষ বামপন্থীদের সঙ্গে হেঁটেছেন তবে ওর লেখার মধ্যে উগ্র বামপন্থীবোধ আমরা বিশেষ দেখিনি। আমাদের যেটা চোখে পড়েছে সেটা হল তাঁর নতুন ভাষা। আমরা যেমন একটা কথ্যভাষার আমদানি করি শঙ্খ ঘোষও তেমনি তার লেখার মধ্যে এরকম একটা কথ্যভাষা নিয়ে এসেছিলেন। আসলে আমি মিলটা কোথায় বোঝাতে চাইছি। তাঁকে অনেকক্ষেত্রে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উত্তরসূরী বলা যায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায় যেমন সার্থকভাবে কথ্যভাষা ব্যবহার করেছেন, শঙ্খ ঘোষ তার থেকে আরও সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন। যেটা শক্তিও করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে আমিও করেছি। হয়ত এখানেই কোন সূক্ষ্ম মিল আছে।

বিনোদন ঃ কিন্তু আপনি গদ্যের দিকে কি বলবেন? সাধারণভাবে বলা হয় যে পঞ্চাশের দশকের যারা লেখক তারা কবিই হোক বা গদ্যকার তাদেরই এখনও সবচেয়ে শক্তিশালী লেখক বলে ধরা হয়। এমন নয় যে পরে কেউ আসেননি। কিন্তু একসঙ্গে একটা দশকের ভেতর অনেক ভাল উল্লেখযোগ্য কবি, গদ্যকার, ঔপন্যাসিক যে উঠে আসে, আপনার এটাকে কি মনে হয়। আর আপনাদের কবিতার দিকে যে চিন্তাটা ছিল তা কি গল্প বা উপন্যাসের ক্ষেত্রেও ছিল?

সুনীল ঃ আমরা আমাদের চিন্তার মধ্যে সাহিত্যের সব কটা দিকই রেখেছিলাম। যে জন্য আমরা কৃত্তিবাসে একটা অদ্ভুত পরীক্ষাও করেছিলাম। আমরা ভেবেছিলাম কৃত্তিবাস নামে একই সঙ্গে দুটো পত্রিকা বের করব। একটায় থাকবে শুধু কবিতা, আরেকটায় থাকবে গল্প, সম্ভব হলে উপন্যাস, প্রবন্ধ, আলোচনা ইত্যাদি। এরকম সংখ্যা আমরা একটাই বার করতে পেরেছিলাম। শুনলে খুব হাসির কথা মনে হবে যে কবিতা কৃত্তিবাসের সম্পাদক ছিলাম আমি আর গদ্য কৃত্তিবাসের সম্পাদক ছিল শক্তি। ও তখন প্রধানত কবি ছিল। তাতে কমলকুমার মজুমদারের 'ফৌজি বন্দুক' ছাপা হয়েছিল। সন্দীপনের 'ক্রীতদাস ক্রীতদাসী' ছাপা হয়েছিল। দ্বিতীয় সংখ্যার যে পরিকল্পনা করেছিলাম তাতে মতি নন্দী, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, এদের গল্প ছিল। কমলকুমার মজুমদারের 'গোলাপ সুন্দরী' থাকার কথা ছিল। দ্বিতীয় সংখ্যাটা শেষ পর্যন্ত শক্তির এলোমেলো স্বভাবের জন্য বের করা যায়নি। এই জন্যেই বলছি আমাদের চিন্তা সব দিকেই ছিল।

তুমি যে বললে এক সময় এতগুলো লেখক আসে কি করে, আসে কারণ সাহিত্য একটা ঢেউয়ের মত। এক-একটা সময় দেখা যায় যে অনেক লেখক একসঙ্গে এল, আবার ঢেউটা ভেঙে গেলে দেখা যায় যে কোন নতুন লেখক আসছে না। তাতে নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। একটা ঢেউয়ের পর যেমন আরেকটা ঢেউ আসে তেমনই, যেমন এখন দেখা যায় যে একসঙ্গে অনেক নতুন লেখক লিখছেন। এদের মধ্যে অনেকেই বেশ শক্তিশালী। এরকম তো হয়ই।

বিনোদন ঃ কিন্তু সেই সময় কৃত্তিবাসের বাইরেও, বিশেষ করে গদ্যের ক্ষেত্রে। গল্পের ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন আনার চেষ্টা হয়েছিল। কিছু কিছু আন্দোলনও চলেছিল। কারণ আপনাদের কৃত্তিবাসের গল্প সংখ্যা যখন বার হয় সেই সময় 'ছোটগল্প নতুন রীতি' বলে একটা ব্যাপার চলছিল। তারও আগে, কারণ, 'ছোটগল্প নতুন রীতি' একটু পরের বলতে হবে। আমরা যা বইপত্তর ঘেঁটে দেখেছি এবং যা শুনেছি যে 'দেশ' পত্রিকায় একটু অন্য ধরনের গল্প ছাপার ঝোঁক দেখা যায়। এবং সে

সময় বিমল কর দেশে গল্প দেখতেন। অনেক লেখক কিন্তু এই সময় এসেছেন। তাদের সঙ্গে আপনাদের তফাৎটা কোথায়?

সুনীল ঃ আমি বলতে চাই যে গদ্য সাহিত্যে কৃত্তিবাসের কোন প্রভাব নেই। বরং বিমল কর, তিনি একটু বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও তার থেকে কমবয়সী যারা নতুন ধরনের গল্প লিখতে আগ্রহী তাদের একসঙ্গে জড়ো করেছেন এবং 'দেশ' পত্রিকায় তাদের গল্প ছেপেছেন। পরবর্তীকালে 'ছোটগল্প নতুন রীতি' নামে একটা আন্দোলনও শুরু করেন। এ কৃতিত্ব বিমল করেরই সম্পূর্ণ। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক ওই ব্যাপারটার মধ্যে আমি জড়িত ছিলাম না। তখন আমি সেরকমভাবে গদ্য লিখতামও না। যখন লিখতে শুরু করলাম তখনও আমি ওই আন্দোলনে জড়িত ছিলাম না। যদিও অনেকেই সে সময় কৃত্তিবাসে লিখেছেন তবুও আমরা আট দশজন মিলে একটা কোর গ্রুপ হয়ে গিয়েছিলাম। সেই দল থেকে আমি কবিতা লেখক হিসেবেই উঠে এসেছি।

কিন্তু গদ্য যখন আমি লিখি তখন আমি ছিলাম নিঃসঙ্গ। আমি কোন দলে ছিলাম না। অনেকে তখন আমাকে বলেছে এ লোকটা কেন উপন্যাস লিখছে। আমার ট্র্যাজেডি হচ্ছে যখন কবিতা লিখতাম তখন লোকে বলত এ লোকটা কবিতা ভাল লেখে না, আবার যখন গদ্য লিখলাম তখন বলত এ কবিতাটা ভাল লিখত গদ্য লেখার আবার কি দরকার ছিল। এসব কথা তো শুনতেই হয়েছে। তার মধ্যে থেকে যা ইচ্ছে তাই লিখে গেছি।

বিনোদন ঃ কৃত্তিবাসের বাইরে সেই সময় যারা গল্প লিখতেন, আপনার নিশ্চয়ই কোন কোন লেখকের নাম মনে আছে, তারা কারা? কারণ আপনিও তখন গদ্য লেখার দিকে ঝুঁকেছিলেন।

সুনীল ঃ তখন কৃত্তিবাসের বাইরে থেকে যারা উঠে আসে যেমন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু পালিত, দেবেশ রায় আরো আছে অনেকে, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় তো ছিলেনই। মতি নন্দী সম্পর্কে বলতে গেলে বলব তার সঙ্গে কৃত্তিবাসের খানিকটা যোগাযোগ ছিল।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় গল্প লেখক হলেও সে প্রায়ই বলত আমি কৃত্তিবাসে কিছু লিখতে চাই। তখন আমি বলতাম কৃত্তিবাসে তো আমরা গল্প টল্প ছাপি না। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় জোর করার পরে আমরা কৃত্তিবাসের নিয়ম ভেঙে তার 'বিদ্যুৎ চন্দ্র পাল সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য' নামে একটি অসাধারণ গল্প ছাপিয়েছিলাম। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় যদিও সে গদ্য লেখক, গল্প ও উপন্যাস লেখক হিসেবেই এখন সুপরিচিত। তবুও কৃত্তিবাস দলের সঙ্গে তার ছিল আগাগোড়া যাতায়াত। পরে যখন কৃত্তিবাস মাসিক হয় তখন তাতে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ও নিয়েছিল।

শুনলে এখন মজা লাগবে যে মতি নন্দীকে প্রথম আলাপ করিয়ে দেয় কৃত্তিবাসেরই একজন কবি শিবশম্ভু পাল, সে আমার বাড়িতে একদিন এক নবীন লেখককে নিয়ে এল, তার নাম মতি নন্দী। বলল মতি একটা গল্প পড়ে শোনাবে। সে যে গল্প পড়ে শোনাল, তার নাম 'ছাদ'। মতির গল্পটা শোনার পর আমরা সকলেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করি।

কৃত্তিবাসে এখন যেহেতু গল্প সংখ্যা বেরচ্ছে না, তাই আমরাই তাকে বলি যে 'দেশ' পত্রিকায় নতুন ধরনের গল্প বেরচ্ছে, ওখানে পাঠাও। আমরা বলার পর মতি ওটাকে 'দেশ' পত্রিকায় পাঠায় এবং ছাপাও হয়। ওটাই ওর প্রথম গল্প।

আমার পক্ষে খুবই শ্লাঘার ব্যাপার আমি বলতে পারি যে, 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় আমি একটা অতি সাধারণ গল্প লিখেছিলাম। সেই গল্পটার নাম ছিল 'পটভূমি'। মতি নন্দী সেই গল্পটা অবলম্বন করে একটা নাটক লেখে এবং সেটা ওর পাড়াতে না কলেজে কোথায় যেন অভিনয়ও করায়। আমার খুব আশ্চর্য লেগেছিল যে আমার একটা অতি সাধারণ গল্প মতি নন্দীর মত লেখক নাট্যরূপ দিয়েছিল। দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও এরকম সম্পর্ক ছিল। কৃত্তিবাসের দ্বিতীয় সংখ্যাতে দীপেনের যে গল্পটা ছাপার জন্য আমরা নিয়েছিলাম সেটার নাম হচ্ছে 'অশ্বমেধের ঘোড়া'। এই গল্পটা আমরা ছাপতে পারিনি কিন্তু পরবর্তীকালে এই গল্পটাই চিহ্নিত করে দীপেনকে ছোট গল্পকার হিসেবে।

বিনোদন ঃ সুনীলদা, এই যে আপনি আপনাদের সমসাময়িক লেখকদের কথা বলছেন, যাদের নিয়ে আপনাদের সময় একটা মিথ তৈরি হয়েছিল প্রায়। একটা সময় আপনাদের লেখা, আপনাদের জীবনযাত্রা ইত্যাদি নিয়ে বেশ একটা রহস্যময় দিক দেখতে পেয়েছি। কিন্তু পরবর্তীকালে আপনাদের এখন যে মিলের কথা বললেন সেই মিলের কথা, বন্ধুত্বের কথা যা আপনি বলেছেন সেটা কেমন যেন ভেঙে যায় বলে মনে হয়। এবং প্রকাশ্যে সংবাদপত্রের পাতায় যখন দেখি আপনাদের সেই সমস্ত বন্ধুরা একে অপরকে নিয়ে লিখছেন এবং সে লেখার মধ্যে একটা জায়গায় যেন বিদ্বেষ আছে।

সুনীল ঃ আমি তোমাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আমি কি আমার সমসাময়িক কোন বন্ধুর বিরুদ্ধে কোথাও কিছু লিখেছি? এক লাইনও লিখেছি কি?

বিনোদন ঃ আপনি লেখেননি বলেই তো জিজ্ঞেস করছি তারা যখন লেখেন সেটা অন্যদের কাছে কি পরিচয় দেয় বা আপনার তখন কি মনে হয়, আপনি সেগুলোকে—

সুনীল ঃ আবার তোমায় থামিয়ে দিচ্ছি। আমি যখন লিখিনি তখন আমাকে এই প্রশ্ন করা চলে না। আমি তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি, আমি নিজের কাছে নিজে শপথ নিয়েছি যে আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন আমি আমার সমসাময়িক লেখক বা বন্ধুবান্ধবদের বিরুদ্ধে এক লাইনও লিখব না। আর তারা যদি কিছু লেখে আমার বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদও করব না। কে কি লিখেছে আমি ওই নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না। আমি লিখিনি আমি কখনও লিখব না এটাই শেষ কথা।

বিনোদন ঃ বাদলদা আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। আপনার সবচেয়ে বড় প্রকাশক। দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু। বাদলদা আপনি কি কিছু প্রশ্ন করবেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে।

বাদল ঃ এতক্ষণ যে কবিতা ও সাহিত্যের যে কচকচি হল যেটা আমি কিছু বুঝেছি কিছু বুঝিনি। যাই হোক আপনি প্রথমে লিখতে শুরু করেন কবিতা, তারপর সম্ভবত বড়দের উপন্যাস এবং সব শেষে ছোটদের বই। প্রকাশক হিসেবে আমার মনে হয়েছে যে আপনার সমস্ত ছোটদের বই 'হিট'। এটা কেন?

সুনীল ঃ 'হিট' নাকি? আমি জানব কি করে?

বাদল ঃ আমি প্রকাশক হিসেবে বলছি হিট। আপনার গদ্য লেখা মানে বড়দের জন্য ভুষি হয়েছে, ছোটদের জন্য একটা লেখাও তা হয়নি, কেন?

সুনীল ঃ তা তো জানি না। তবে এটা বলতে পারি যে যেহেতু আমি ছোটবেলায় প্রচুর রহস্য, রোমাঞ্চ, অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী পড়তাম। যখন আমাকে প্রথম আনন্দমেলার সম্পাদক বললেন, ছোটদের জন্য একটা কিছু লিখতে, তখন আমি ভাবলাম ঠিক আছে লিখতে পারি। আমি তো নানারকম লেখাই লিখি, অনেকগুলো নামে। আসলে যখন আমি ছোটদের জন্য লিখি তখন আমার বয়স বারো বছর হয়ে যায়। ঠিক বারো বছর বয়সে আমি যে ধরনের লেখা পড়তে ভালবাসতাম, আমার যে ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, যে উৎসাহ ছিল, আগ্রহ ছিল ঠিক সেই রকম একটা চোখ দিয়ে আমি ঘটনাগুলো দেখি এবং লিখি। এই হচ্ছে আমার ছোটদের লেখার প্রক্রিয়া।

আর যখন নীললোহিত নামে লিখি তখন আমার বয়স হয়ে যায় সাতাশ। তার বেশি বাড়ে না। একটা বেকার সাতাশ বছরের ছেলে যার জীবনে প্রেম নেই, কেউ পাত্তা দিচ্ছে না, যে গুণ আমার একটা সময়ে ছিল সেটা মনে করে লিখি।

আর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় হিসেবে নানাধরনের লেখা লিখি যেগুলো আপনার মতে ভুষি হয়ে যায়। তা কি আর করা যাবে।

বাদল ঃ ঠিক ভুষি হয় না। আসলে আপনি আপনার লেখক জীবনে কোন কিছু প্ল্যান করে করেন না বলে আমার মনে হয়। আমার মনে হয় এটা থাকা উচিৎ। যেমন আপনি একটা বই একজন প্রকাশককে দেবেন বলে কথা দিলেন আবার ওই বইটাই অন্য একজন প্রকাশক চাইলে

আপনি ঘাড় নেড়ে দিলেন। এতে হয়ত ওই প্রকাশক খুশি হলেন কিন্তু লেখক হিসেবে আপনার বদনাম হয়ে যায়। এটার জন্য কেন আপনি প্ল্যানিং করেন না?

সুনীল ঃ অনেকেই বলে যে মাঝে মাঝে কলেজ স্ট্রিটে যাও না কেন বা ওই প্রকাশক তোমার অনুমতি না নিয়েই বই ছাপছে তাকে ধমকাও না কেন। বা একই লেখা দু'জায়গা থেকে বেরোল, চিঠিপত্র লেখ না কেন, ইত্যাদি। আমার বউ-ও বলে। আসলে বইয়ের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। আর ওসব করতে পারলাম না। আসলে অভ্যাসের মধ্যে নেই বলেই বোধহয় এ জীবনে আর পারা যাবে না। আর ওসবই যদি চিন্তা করি তো লিখব কখন?

বাদল ঃ আপনি একটু আগে বললেন যে লেখার মধ্যে কোন স্টাইল নেই, সেটাই স্টাইল। ঠিক সেরকম ওই প্রকাশনার ক্ষেত্রেও কোন স্টাইল না রেখে স্টাইল রাখতে হবে। একজন লেখক হিসেবে কিছুই নেই অথচ আছে এটাই রাখতে হবে।

সুনীল ঃ এতদিন যখন পারিনি তখন এ জীবনে আর পেরে উঠব বলে মনে হয় না।

বাদল ঃ আপনি একটু আগে বললেন যে আপনি নাকি মাথা গরম করেছেন অনেক ব্যাপারে। অথচ আমরা আপনার সাহিত্য জীবনে, লেখার মধ্যে বা বিভিন্ন ব্যাপারের মধ্যে কোন মাথা গরমের ভাব দেখিনি। সব সময় একটা নিস্পৃহ ভাব কেন? মাথা গরম করলে মনে হয় অনেক বেশি জিনিস জানতে পারব।

সুনীল ঃ এই কয়েকদিন আগে আমার দুজন সম সাময়িক লেখক বলেছেন যে সুনীল কারো নিন্দে করে না কেন? কেনই বা কিছু রিয়্যাক্ট করবে না। আমি বললাম এতো মহা মুশকিল, নিন্দে করতেই হবে এর কোন মানে আছে নাকি? হ্যাঁ, আমি হয়ত একটু বেশি শাণ্ড হয়ে গেছি, অল্প বয়সে এরকম ছিলাম না। তখন বেশ রাগী ছিলাম। আমি একটা ছোট্ট ঘটনার কথা বলি! সে সময় আমি বেকার ছিলাম। ছোটখাটো পত্রপত্রিকায় এক আধটা লেখা পাঠিয়ে ১০-১৫ টাকা পেতাম। তা দিয়ে হাত খরচ চলত আবার সংসারও চালাতে হত অনেক সময়। ওইরকম একটা সময় আমি তখন বসুমতী পত্রিকাতে একটা গল্প পাঠিয়েছিলাম। গল্পের নামটা এখনও আমার মনে আছে 'সমান্তরাল'। তখন বসুমতী খুব নাম করা প্রতিষ্ঠান। ওদের নিজস্ব পাবলিকেশন ছিল। দৈনিক বসুমতী, মাসিক বসুমতী ছিল। সম্পাদক ছিলেন প্রাণতোষ ঘটক। আনন্দবাজারের কাছাকাছি একটা প্রতিষ্ঠান। লেখা ছাপা হয়ে গেল কিন্তু কিছুতেই টাকা দেয় না। শেষে একদিন চলে গেলাম ওদের অফিসে। ওখানে গিয়ে খোদ সম্পাদক প্রাণতোষ ঘটকের ঘরে ঢুকে গেলাম। আমি তো বাচ্চা ছেলে। উনি পাত্তাই দিচ্ছেন না। বললেন কি ব্যাপার, কি চাই? আমি সদ্য তখন বিদেশ থেকে ফিরেছি। ওখানে লেখকদের সঙ্গে প্রকাশকদের কি রকম সম্পর্ক হওয়া উচিত এ ব্যাপারে ও দেশের বই, পত্রপত্রিকা পড়ে যা জেনেছি সেই ভূত মাথার মধ্যে ঘুরছে।

আমি ওনাকে বললাম যে 'আমার একটা গল্প ছাপা হয়েছে অথচ তিন মাস হয়ে গেল টাকা পাইনি।' আমি ভাবলাম এটা ফেয়ার এনাফ। টাকা পাইনি সম্পাদককে বলছি উনি ব্যবস্থা করে দেবেন।

উনি তখন অদ্ভুতভাবে বললেন 'কি নাম তোমার? তোমার নাম তো শুনিনি। তা গল্প ছাপা হয়েছিল বুঝি? ছাপা হয়েছিল এই তো যথেষ্ট। আবার টাকা কীসের? ওই তো অনেক লোক পড়েছে। যাও যাও, বাড়ি যাও'। উনি এরকম বলছেন কিন্তু আমি তা মানব কেন? উনি আমায় যাই ভাবুন না কেন আমি তো নিজেকে তখন লেখক বলে মনে করছি। আমি লেখক উনি সম্পাদক। বীরের প্রতি বীরের ব্যবহার আশা করছি। উনি আমাকে ওরকম হ্যাটা করতে আমি বললাম, 'তা তো চলবে না। আপনাদের পত্রিকা বিক্রি হচ্ছে এবং আমি তাতে লেখা দিয়েছি। লেখাটা অতটা জায়গা নিয়েছে পত্রিকার সুতরাং টাকা দেওয়ার একটা নিয়ম নিশ্চয়ই আছে, তা হলে টাকা দেবে না কেন'? যাইহোক উনি তো টাকা কিছুতেই দেবেন না। শেষে একথা সেকথার পর পকেট থেকে একটার দশ টাকার নোট বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন যাতে আর কথা না বাড়াই।

আমার বয়স তখন কম আর মেজাজও গরম। তার সঙ্গে খুব মারকুট্টেও ছিলাম। ট্যাক্সিওয়ালাদের সঙ্গে খুব মারামারি করতাম। আমার তো মাথা গরম হয়ে গেল, ভিখিরি নাকি যে পকেট থেকে টাকা বের করে দিচ্ছে। আমি সেই টাকাটা ওনার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললাম 'দাঁড়ান আমি আসছি। এসে একটিন কেরোসিন দিয়ে বাড়িটা পুড়িয়ে দিয়ে যাব'। পরে অবশ্য আর যাইনি।

বাদল ঃ আপনার লেখক জীবনের প্রথম দিকে, আপনি বলছেন যে অর্থের জন্য অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হয়েছে। এখন তো আপনার সেই আর্থিক অসুবিধা নেই। তা হলে এখন লেখা কমিয়ে দিচ্ছেন না কেন?

সুনীল ঃ ওই যে বলে না বাঘের পিঠে চাপলে নাকি নামা যায় না, নামলে বাঘে খেয়ে ফেলবে ওরকম ব্যাপার। একটা চক্রে পড়ে গেছি। এই চক্র থেকে বেরুবার চেষ্টা করছি পাঁচ বছর ধরে। সত্যিই আমার এখন আর টাকার দরকার নেই। আমার একমাত্র ছেলে। সে বিদেশে থাকে, তার ব্যবস্থা সে করে নিয়েছে। যা টাকা এখন পাই তাতে আমাদের স্বামী-স্ত্রীতে ভালভাবেই চলে যায়।

কিন্তু ওই যে অনুরোধ উপরোধ, চাপ একটা থাকেই। এখন আমার শখ হয় গদ্য লেখা কমিয়ে আবার বেশি করে কবিতা লিখব। যেটাতে আমি বেশি আনন্দ পাই। আগে পুজো সংখ্যার তিন-চারটে লেখা লিখতাম। এ বছর থেকে আমি একটা লিখব। দেখা যাক এভাবে পারা যায় কিনা।

বাদল ঃ আপনার বড় বড় যে সমস্ত উপন্যাস বেরিয়েছে এবং তার জন্য যে সমস্ত পড়াশুনা আপনি করেন—যা বই পড়েন এবং যত লেখেন, অত সময় পান কি করে?

সুনীল ঃ মানুষের জীবনে কত সময় পড়ে থাকে। কতক্ষণ তো শুয়েই থাকি, কিছু করি না। কাজ করতে চাইলে সময়ের অভাব হয় না। আমাকে এরকম অনেকেই বলেন, এত লেখেন কি করে? আমি সকলকে বলি তাও তো রাত্রে লিখি না। রাত্রে লিখলে এর ডবল লিখতে পারতাম। আমি লিখি শুধু সকালে, রাতে কোনদিন এক লাইনও লিখিনি। পড়ার সময়ও পাওয়া যায়। একটা মানুষ যদি দিনে চার ঘণ্টা লেখে আর চার ঘণ্টা করে পড়ে তাহলে অনেক লেখা অনেক পড়া যায়। কাজেই সময়ের অভাব হয় না।

বিনোদন ঃ সুনীলদা, আপনি তো বললেন যে গদ্য লেখা কমিয়ে ক্রমশ কবিতার দিকে ঝুঁকবেন। আচ্ছা আপনার এই যে খ্যাতি তা কবিতার জন্য কতটা আর গদ্যর জন্য কতটা, আপনার কি মনে হয়?

সুনীল ঃ এইরে, খ্যাতির কথা আমি কি করে বলব। আমি নিজেই জানি না যে সত্যিই আমার কোন খ্যাতি আছে কিনা। আমার বউয়ের কাছেই আমার কোন জনপ্রিয়তা নেই। সে তো সব সময় বলে কী সব লিখছ? অন্য অনেকেই বলে যে লেখা ভাল হয়নি। সুতরাং আমি কি করে জানব যে সত্যিই আমার কোন খ্যাতি আছে কিনা।

বিনোদন ঃ আপনাকে একটা ঘটনা মনে করিয়ে দিই যে আপনার ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সৌমিত্র মিত্র 'আবৃত্তিলোক'-এর তরফ থেকে আপনাকে একটা সংবর্ধনা দেয়। সেখানে নানা প্রশ্নের মধ্যে আপনি বলেছিলেন যে আপনার কাছে বহু মহিলা পাঠিকা আছেন যারা আপনার কবিতার ভক্ত। কিন্তু যার সঙ্গে আপনার প্রেম-প্রণয় এবং বিবাহ হল মানে স্বাতীদি, তিনি কিন্তু আপনার কবিতার প্রেমে আসেননি। আপনার একটা উপন্যাস পড়ে উনি তার জামাইবাবুর সঙ্গে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। এটা কি করে হল?

সুনীল ঃ না, একটু তথ্যের ভুল আছে। স্বাতী প্রথমে আমাকে চিঠি লিখত। আমি আনন্দবাজার পত্রিকার 'লুইস ক্যারল' সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে স্বাতী ওই প্রবন্ধটা পড়ে আমাকে প্রথম চিঠি লেখে। চিঠি লেখার পর আমিও উত্তর দিই। এভাবে চিঠির মাধ্যমেই একটা যোগাযোগ থাকে।

স্বাতী আমাদের বাড়িতে ওর জামাইবাবুর সঙ্গে যখন প্রথম আসে সেটা কবিতার সূত্রেই। ও

একটা কৃত্তিবাস পত্রিকা কিনতে এসেছিল। আমার বাড়িতে ছিল কৃত্তিবাসের সম্পাদকীয় দপ্তর। ওখানে তো পত্রিকা বিক্রি হত না হত স্টলে। আমি তখন আমার একটা সম্পাদকের কমপ্লিমেন্টরি কপি ওদের দিই। ওরা তো কিছুতেই কমপ্লিমেন্টরি নেবে না। তখন কৃত্তিবাসের দাম ছিল এক কিম্বা দু'টাকা। ওর জামাইবাবু জোরাজুরি করে দু'টাকা দিয়ে বইটা নিলেন। স্বাতীও কিন্তু কবিতা পড়ত। কবিতা পড়ার ঝোঁক ওর ছিল এবং এখনও আছে। কিন্তু অনেক লিটল ম্যাগাজিন পড়ে। আমাদের বাড়িতে যত লিটল ম্যাগাজিন আসে, আমি হয়তো পড়ার সময় পাই না ও কিন্তু সব উল্টেপাল্টে পড়ে। অনেক সময় ওই আমাকে জানায় কোন লেখাটা ভাল হয়েছে বা কে ভাল লিখেছে। ওর কবিতা পড়ার ঝোঁক আছে আর আমার কবিতার তো খুব কঠোর সমালোচক।

বিনোদন ঃ গল্প, উপন্যাসের সমালোচনা করেন না?

সুনীল ঃ তাও করে। মূলত কবিতার কথাই বলে।

বিনোদন ঃ আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন গৌতমদা। চলচ্চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ। গৌতমদা, এখন আপনি কিছু জিজ্ঞেস করুন না সুনীলদাকে।

গৌতম ঃ আপনি বললেন যে আপনি প্ল্যান করে কিছু করেন না বা লেখেন না কিন্তু দেখা গেছে যে বিগত দশ পনের বছরে আপনি বেশ কয়েকটি উপন্যাস লিখেছেন যেটাতে একটা ইতিহাসের পর্যালোচনা আছে। এটাতো প্ল্যান ছাড়া হয় না। এটা একটা প্রশ্ন আর তার সঙ্গে যুক্ত করছি এই ধরনের উপন্যাস মানে 'পূর্ব পশ্চিম', 'সেই সময়', 'প্রথম আলো' এগুলো ধারাবাহিকভাবে কি করে লেখা সম্ভব? কারণ ইতিহাসের পর্যালোচনার তো একটা রিভাইস করার ব্যাপার আছে। সেটা কী ভাবে কিস্তিতে দেওয়া যায়। এই দুটো প্রশ্ন মিলিয়ে দিলাম।

সুনীল ঃ আমি ইতিহাস নিয়ে মাঝে মাঝেই লিখেছি। ছোট ছোট লেখাও লিখেছি। আমি আগেই বলেছি যে 'সেই সময়' যে বিষয় নিয়ে লিখেছি সে বিষয়ে পড়াশোনার আগ্রহ আমার ছোটবেলা থেকেই ছিল। একদিন একটা স্বপ্ন দেখলাম, দিবাস্বপ্ন। দেখলাম যে মাইকেলের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের খুব ঝগড়া হচ্ছে। তখনই আমার মাথায় এল যে এটা নিয়ে তো লিখলে হয়। এঁরাই হবে চরিত্র। বাস্তব ও জীবন্ত চরিত্র। মাইকেল, বিদ্যাসাগর এবং এদের সমসাময়িক লোকেরা।

যেহেতু আগে থেকে পড়া তাই কাজটা করতে আমার কোন অসুবিধা হয়নি। যখন শুরু করি তখন কোন কাহিনীর পরিকল্পনা আমার ছিল না। শেষপর্যন্ত কোথায় যাবে তাও জানতাম না। খালি ভেবেছিলাম যে টাইম স্প্যানটা ঠিক রাখব। আমি ১৮৪০ সাল থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত লিখব। যেহেতু কালীপ্রসন্ন সিংহ-এর আদলে আমি নবীনকুমারকে তৈরি করলাম এবং কালীপ্রসন্নর জন্ম ১৮৪০ সালে এবং মৃত্যু ১৮৬৯ বা ৭০ সালে। ফলে ওই সময়টা বেছে নেওয়ায় আমার পক্ষে সুবিধা হল। প্ল্যানটা ছিল সময় সম্পর্কে কিন্তু কাহিনী সম্বন্ধে কোন প্ল্যানই আমাব ছিল না। এরকমই 'প্রথম আলো' উপন্যাসে 'ভরত' নামে একটা চরিত্রকে আমি অ্যাক্সিডেন্টালি নিয়ে আসি। তখনও আমি জানতাম না যে কোথায় যাবে। কিন্তু কি করে যেন ওই প্রধান চরিত্র হয়ে গেল। সেরকমই 'ভূমিসুতা' একটি মেয়েকে আমি নিয়ে এসেছিলাম। ওরাই যে শেষপর্যন্ত নায়ক-নায়িকা হবে এটার কিন্তু প্রথমে কোন প্ল্যানই ছিল না। ভূমিসুতার কথা উপন্যাস শুরুর বেশ কয়েক কিস্তির পর আমার মাথায় আসে। কিন্তু প্ল্যানটা ছিল ওই টাইম স্প্যান। মানে ১৮৮৩-৮৪ সাল থেকে ১৯০৫ বা ৭ সাল পর্যন্ত লিখব। যার মাঝখানে আমাদের দেশের রাজনৈতিক উত্থানের ব্যাপারটা থাকবে এবং বঙ্গভঙ্গ থাকবে। প্রথম আমাদের দেশে রাস্তায় নেমে যে রাজনীতি শুরু হয়েছিল সেটা থাকবে। ওখানেই শেষ করে দেব। 'পূর্ব-পশ্চিম' সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়। ওটা লেখার সময় আমার মাথায় ছিল দেশভাগ এবং দু'দিকের বাঙালিরা। তারা যে ভাগ হয়ে গেছে এটা। এইটা একটা 'পূর্ব-পশ্চিম' আর আরেকটা 'পূর্ব-পশ্চিম' হচ্ছে ১৯৬০ থেকে ৭০-এর দশক থেকে শুরু হল। এদেশের যারা ভাল ভাল ছেলে মেয়ে তারা সব পশ্চিমে চলে যেতে লাগল, বাবা মাকে ফেলে।

সেখানেও একটা পূর্ব-পশ্চিম ভাগ হয়ে যায়। এটাই ছিল থিম। গল্প আমি কোনদিনই আগে থেকে ভাবতে পারি না। ফলে ধারাবাহিকভাবে লিখতে কোন অসুবিধা হয় না।

বরং লিখতে লিখতে মাথায় নতুন নতুন চিন্তা এসে যায়। নতুন নতুন চরিত্র আসে। হয়ত একসঙ্গে বসে লিখলে এত বড় হত না কিম্বা এত ভাল হত না।

গৌতম ঃ আপনি যে স্প্যান নিয়ে কাজ করছেন, ঊনবিংশ শতাব্দী নিয়ে বা বর্তমান সময়। আপনার কি মনে হয় না যে এখন যেভাবে সামাজিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে গত কয়েক বছরে বিশেষ করে মধ্যবিত্ত জীবনে। এটা নিয়ে বা এই সময়টা নিয়ে একটা বড় মাপের কিছু কোন লেখা। এরকম কিছু পরিকল্পনা আপনার আছে কি?

সুনীল ঃ এখন বড় কিছু লিখলে পুরনো ইতিহাস নিয়ে আর কিছু লিখব না। এখনকার ইতিহাস যাকে বলে সেটা নিয়ে কিছু লেখার চেষ্টা করব অথবা আত্মজীবনী লিখব। সেটাও একটা ইতিহাস হতে পারে। নিজের জীবনকে কেন্দ্র করে এই সময় যেভাবে আবর্তিত হয়েছে সে রকম। বড় কিছু লিখলে এ দুটো বিষয় নিয়েই লিখব বা লেখার চেষ্টা করব।

গৌতম ঃ একটু আগে আপনি বললেন যে স্বাতী আমার কবিতার বড় সমালোচক। কবিতার কি সত্যিই কোন সমালোচনা হয় সুনীলদা? আমরা জানি কবিতা নিয়ে প্রচুর সমালোচনা হচ্ছে শুধু আমাদের দেশে নয় বিদেশেও। ঠিক সমালোচনা কিভাবে করা যায়?

সুনীল ঃ এটা ঠিক কথা। সত্যি কথা বলতে কি আমাদের দেশের সাহিত্যে সমালোচনার জায়গাটা বেশ দুর্বল। আমাদের উপন্যাস, নাটক, কবিতা কোন কিছু নিয়েই ভাল আলোচনা হয়নি। যা হয়েছে সেটা থিসিস্। স্বাতী আমাকে যেটা বলে সেটা হল তুমি এরকম না করে ওরকম কর বা তুমি এটা আরেকটু মন দিয়ে লিখতে পারতে। কখনও বলে তোমার এই কবিতাটা আরও ভাল হত যদি তুমি এই সময় ওই উপন্যাসটা না লিখতে এরকম আর কী। ভেতরে ভেতরে একটা প্রতিক্রিয়া হয়।

বিনোদন ঃ সুনীলদা, এই প্রসঙ্গে আপনাকে একটা ছোট্ট প্রশ্ন করছি। আপনি বহু জায়গায় কবিতা পড়েন। সভা সমাবেশে বা কবিদের আসরে। কিন্তু দেখা যায় সবসময়েই নীরা সম্পর্কিত কবিতা পড়ার আব্দার আসে। কিন্তু আপনি বহু গুরুত্বপূর্ণ কবিতা লিখেছেন। আপনি গোড়ার দিকে 'চেগুয়েভারার প্রতি', 'ধাত্রী' অথবা—ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি। এমন অনেক। আপনার কি মনে হয় না যে নীরার প্রতি বেশি জোর দিতে গিয়ে আপনার সেই সব গুরুত্বপূর্ণ কবিতা ঠিক মত আলোকিত হয়নি?

সুনীল ঃ কবিতার ক্ষেত্রে কোনটা গুরুত্বপূর্ণ কোনটা নয় বলা শক্ত। আর তাছাড়া আমি নানারকম বিষয় নিয়ে লিখি ফলে আমার কোন অসুবিধা হয় না। আর নীরার কবিতা নিয়ে সাধারণ লোকের উৎসাহ থাকে। প্রথম কথা প্রেমের কবিতার প্রতি ঝোঁক মানুষের চিরকালই থাকে। আমি প্রেমের কবিতাটা নির্লজ্জ প্রেমিকের মতই লিখি। নীরার কবিতা এখনও আমার লিখতে ইচ্ছে করে।

জয় ঃ সুনীলদা, 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসে নকশাল আন্দোলনের কথা খুবই আছে। কিম্বা সত্তর দশকে লেখা আপনার একটা গল্প আছে 'পলাতক ও অনুসরণকারী'। এই গল্প বা উপন্যাস ছেড়ে আমার আপনার একটা কবিতার কথা মনে পড়ছে তাতে প্রত্যক্ষভাবে নকশাল আন্দোলনের কথা না থাকলেও ছিল। কবিতা হল 'কবির মৃত্যু' —লোরকা স্মরণে। কবিতাটা সত্তর সালে শারদীয়া 'দেশ' পত্রিকায় বার হয়। আমরা আগে যে দীর্ঘ কবিতা পড়েছি, সুধীন দত্ত বা বিষ্ণু দে-র কবিতা বা জীবনানন্দ দাসের কবিতা বা ৬৮-৬৯ সাল শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন 'জাবাল সত্যকাম' বা 'আরুণী উদ্দালক'-এর মত কবিতা। তার পাশে আপনার এই কবিতা আগে কখনও বাংলা কবিতায় আসেনি। এই যে নতুন একটা ফর্ম। পুরোটা গদ্যে লেখা। যাতে মনে হচ্ছে একটা গল্প বলা হচ্ছে অথচ থেকে থেকেই কবিতা এবং সেখানে আছে যে, 'রক্তপাত ছাড়া পৃথিবী উর্বর হবে না'। এই নতুনভাবে

একটা দীর্ঘ কবিতা লেখার কথা আপনার মাথায় এল কি করে?

সুনীল ঃ আসলে নকশাল আন্দোলন যখন চলে তখন আমার একটু বয়স হয়ে গেছে। কিন্তু আমার মনে হত আমি যদি তখন কলেজের ছাত্র হতাম তবে আমিও নকশাল হতাম। কিন্তু এটাও ঠিক নকশালদের আমি সমালোচনাও করি। আমার মনে হত 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান' এই শ্লোগানটা ঠিক নয়। মনে হত কন্সস্টেবল খুন করা ঠিক হচ্ছে না। আসলে ওদের আন্তরিকতার অভাব ছিল তা নয় ওদের আদর্শটা ঠিক ছিল কিন্তু বৈপ্লবিক শিক্ষাটা সম্পূর্ণ না করেই তাড়াতাড়ি করে আন্দোলনে নেমে পড়েছিল। এটা ঠিক না। যাই হোক মনে মনে একটা সমর্থন ছিল। যখন আমি পূর্ব-পশ্চিমে নকশালদের ব্যাপারটা লিখি তখন আমার লাভ হয়েছিল এটাই যে সে সময়কার কিছু কিছু নকশাল নেতা আমার কাছে এসে আমায় অনেক তথ্য দিয়েছে। চারু মজুমদার যে আটটা পয়েন্টে ছিল এগুলো আমি জানতাম না, ওরাই এ তথ্যগুলো আমাকে দিয়ে গেছে।

'কবির মৃত্যু' ওরকম সময়ে কাছাকাছি লেখা। ওই কবিতায় কিন্তু নকশালদের সমালোচনাও ছিল। তাতে আমি লিখেছি, "বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক— সামাজিক বিপ্লব" এবং প্রতিটি মানুষের নিজস্ব বিপ্লব 'অর্থাৎ প্রতিটি মানুষের নিজস্ব বিপ্লবকে অবহেলা করলে চলবে না। ব্যক্তি স্বাধীনতা চেপে দিয়ে কোন বিপ্লব সার্থক হয় না। ফলে সমর্থন থাকলেও স্বতঃস্ফূর্ত লেখা। নিজের চিন্তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

জয় ঃ 'প্রতিধ্বনি তুমি তো স্বর্গের দিকে গিয়েছিল কেন ফিরে এলে' এই কবিতাতেই দেখেছি যে কবিতার দু'টো লাইন আপনি লিখলেন, লিখেই সে কবিতাটা কী ভাবে আপনি লিখছেন সেটা কবিতার মধ্যে লিখতে শুরু করলেন। এভাবে পুরো কবিতাটি আপনি লিখেছেন। এভাবে যে কবিতা লেখা যায় সেটা আপনার আগে বাংলা কবিতায় কেউ ভাবেনি। দ্বিতীয় কথা হল আমি দেখেছি যে কখনও ছোট কাগজের সম্পাদককে আপনি ফেরান না। অত ধারাবাহিক লেখার মধ্যেও আপনি ছোট ছোট কাগজকে কবিতা দিয়ে যাচ্ছেন। এসব কবিতাতেও আপনি অদ্ভুত পরীক্ষা করেন। যেমন—

'রতি কৌতুকে দোলে চন্দ্রমা দোলে চন্দ্রমা' বলেই আপনি আবার লিখতে শুরু করলেন—'আমি এটা কেন লিখলাম' বলে গদ্য, মানে দুটো স্বর। একটা কবিতা লিখছে অন্যটা তাকে দাঁড়িয়ে সমালোচনা করছে। এই যে পরীক্ষাগুলো আপনি দীর্ঘদিন করে আসছেন। আপনি কখনও পাঠকের কথা চিন্তা করেন না? পাঠকের খারাপ লাগতে পারে বা ভাল লাগতে পারে এটা কী কখনও আপনার মনে হয় না?

সুনীল ঃ আমার নিশ্চয়ই মনে হয়, আমি পাঠকদের কথা চিন্তা করি। তবে সমস্ত পাঠক নয়, চার-পাঁচজন পাঠকের কথা চিন্তা করি। মনে হয় জয়, মল্লিকা, স্বাতী বা দিব্যেন্দু ওরা পড়ে কি বলবে। তবে সমস্ত পাঠক, যাদের আমি দেখতে পাই না তারা কি ভাবল সেটা তো বোঝার উপায় নেই। তবে পাঠকের কথা আমি নিশ্চয়ই চিন্তা করি। আমার মনে হয়েছে যে কবিতা লেখার যে প্রক্রিয়া সেটাও যদি লিখে দেওয়া যায় তবে এটাও একটা কবিতার অন্তর্গত হতে পারে। আমার মনে হয় এটাও একটা ভাল ফর্ম। যে কবিতাটা আমি লিখেছি এবং যে পাঠক পড়বে, দু'জনের মধ্যে একটা ভাল সেতু হতে পারে যোগাযোগের। আর লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকদের ফেরাই না কারণ আমিও লিটল ম্যাগাজিন থেকেই এসেছি। সুতরাং ওদের কষ্ট বা আত্মদানটা আমি বুঝি। এজন্য ওদের লেখা দিতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে হয়।

মল্লিকা ঃ সুনীলদা, 'সেই সময়', 'পূর্ব-পশ্চিম' ও 'প্রথম আলো' এই তিনটে উপন্যাস পড়ে আমার মনে হয়েছে, সেই সময় উপন্যাসের চরিত্রগুলো সম্বন্ধে আপনি অনেক বেশি ক্রিটিক্যাল ছিলেন। কিন্তু 'প্রথম আলো' উপন্যাসের চরিত্রগুলো অনেক বেশি বিখ্যাত। কিন্তু সেই চরিত্রগুলোর নেগেটিভ দিকগুলো আপনি খুব বেশি দেখাননি বা দেখাতে চাননি। আমরা জানি যে রবীন্দ্রনাথ এবং ইন্দিরাদেবীর মধ্যে একটা বাড়তি সম্পর্ক ছিল বলে আপনার ধারণা এবং উপন্যাসের একটা

সময়ে একটা পর্বে এসে সেই টেনশনটা তৈরিও হয়েছিল কিন্তু তারপর আর আপনি সেটার মধ্যে ঢোকেননি। আপনার নিজের কী মনে হয়?

সুনীল ঃ এগুলো লেখার জন্য আমাকে অনেক তথ্য জোগাড় করতে হয় প্রচুর পড়তে হয়। এবং সব মিলিয়ে একটা ধারণা তৈরি করে তবে আমি লিখি। তথ্যের সবটা তো আমি লিখি না, পঁচাত্তর ভাগ লিখি আর পঁচিশ ভাগ বাদ দিই। কারণ আমাদের দেশের যারা আইডল যেমন রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ সবাই ভাবে এরা মহাপুরুষ। এদের সম্পর্কে কিছু বলা চলবে না। কিন্তু আমি মনে করি কেউ জন্ম থেকে মহাপুরুষ হয় না। তাদের নানারকম দোষ থাকে, দুর্বলতা থাকে। তার থেকে উত্তীর্ণ হয়ে উঠে যারা মহৎ কিছু সৃষ্টি করে তারাই মহাপুরুষ। এই ত্রুটিগুলো আমি দেখবার চেষ্টা করেছি। যেমন ধর, আমি লিখেছি যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাবার টাকাগুলো পাওয়ার জন্য তাঁর মেয়েদের যাচ্ছেতাই বিয়ে দিয়েছিলেন। যিনি লিখেছেন—'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার'—

তিনি কি করে তাঁর মেয়েদের দশ এগার বছরে বিয়ে দিচ্ছেন? তিনি কি করে তার প্রথম মেয়ের বিয়েতে পণ দিতে রাজি হলেন? এটা কি অত বড় কবির পক্ষে সাজে? দেবেন্দ্রনাথ পণ প্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পণ প্রথা মেনে নিয়ে কুড়ি হাজার টাকা পণ দিয়ে মেয়ের বিয়ে দেন কেননা প্রথম হচ্ছে বিহারীলাল চক্রবর্তীর ছেলে দ্বিতীয়ত টাকাটা দেবেন দেবেন্দ্রনাথ তখনও অবধি নিয়ম ছিল ঠাকুর পরিবারের কোন ছেলেমেয়ের বিয়ে দিলে, টাকাটা বাবামশাই দেবেন। ছোট, মেজ মেয়ের বিয়ে দেন রাস্তা থেকে ছেলে ধরে এনে। কেন না বাবামশায়ের বয়স হচ্ছে। আমি কিন্তু বেশি করে ব্যবহার করিনি ওগুলোকে। শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়' রবীন্দ্রনাথের পক্ষে একটা বিরাট ভুল। ওতো আমি ডিটেল্‌সে লিখেছি। আমি চেয়েছি প্রতিটি লাইন লোকে পড়ুক। সব কিছুর তথ্য আছে। বানানো নয়। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কনট্রাডিকশন থাকলেও তিনি তা কাটিয়ে উঠেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি বলেছিলেন 'ধর্মের ভড়ং-এর থেকে নাস্তিকতা অনেক ভাল'। রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত ভুলের মধ্যে দিয়ে গেছেন সেগুলো দেখাতে আমি ত্রুটি রাখিনি। আমি ওর বউদির সঙ্গে প্রেমটা দেখিয়েছি কিন্তু ভাইঝির সঙ্গে প্রেমটা যদি দেখাতাম তাহলে লোকে মারত। ওইটা আমি দেখাইনি। ইন্দিরাদেবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে চিঠিপত্র তা বাংলা সাহিত্যে এক অপূর্ব বিস্ময়। এক একদিনে রবীন্দ্রনাথ দু'টো করেও অসাধারণ চিঠি লিখেছিলেন। ইন্দিরাদেবীকে লেখা মূল চিঠি কিন্তু পাওয়া যায়নি। ইন্দিরাদেবী রবীন্দ্রনাথের লেখা মূল চিঠিগুলো একটা খাতায় কপি করতেন। এবং যখন 'ছিন্ন পত্রাবলী' ছাপার প্রস্তাব হল তখন উনি ওই চিঠির বহু জায়গা মোটা মোটা কালি দিয়ে কেটে দিয়েছিলেন। যাতে না পড়া যায়, আবার খাতার অনেক পাতা কাঁচি দিয়ে অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক কাটা। তাহলে কি এমন চিঠি কাকা তার ভাইঝিকে লিখছেন যা অন্য কোন মানুষ পড়তে পারবে না। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ যখন দ্বিতীয়বার বিলেত যান তখন তিনি তাড়াতাড়ি ফিরে আসেন কারণ ইন্দিরা তাকে চিঠি লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আমি এটা আর বেশি দূর টেনে নিয়ে যাইনি উপন্যাসে। আসলে এতে কী ধরনের রিঅ্যাকশন হয় তার একটা গল্প বলে শেষ করে দিচ্ছি। আমি ওতে লিখেছি যে, রবীন্দ্রনাথ নীল রঙের সুইমিং ট্র্যাক্ পরে চন্দননগরের গঙ্গা সাঁতারে পার হচ্ছেন। তাতে এক ভদ্রমহিলা কড়া ভাষায় চিঠি লিখলেন যে, এসব তথ্য আপনি কোথায় পেলেন। নাকি আপনি সেখানে ছিলেন। দেখেছেন।

আমি এটা কেন লিখলাম। লিখলাম এই কারণে যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে তিনি ভাল সাঁতার কাটতেন এবং চন্দননগরের গঙ্গা পারাপার করতেন। তা যারা ভাল সাঁতার কাটে তারা কি জোব্বা পরে কাটে না জাঙিয়া পরে কাটে। তিনি তখন সবে ইংল্যান্ড থেকে ফিরেছেন আর ইংল্যান্ডে তখন নীল রঙের জাঙিয়া খুব পপুলার ছিল।

আমি সে ভদ্রমহিলাকে চিঠি লিখলাম যে দেখুন আমি এই এক কারণে লিখেছি। ভদ্রমহিলা

তখন উত্তর দিলেন যদি সত্যিও হয় তবুও আপনার লেখার কি দরকার।

গৌতম ঃ আচ্ছা সুনীলদা একটা প্রশ্ন আমার অনেক লেখককেই করতে ইচ্ছে করে। যে আমাদের দেশেই তামিল সাহিত্য, বা উর্দু সাহিত্য যদি ধরেন আর বিদেশে চীনা সাহিত্য বা স্প্যানিশ সাহিত্য যদি ধরি। তাহলে আমরা দেখেছি যে একটা দীর্ঘদিনের ভাষার ব্যবহার সেটা বর্তমানেও হারিয়ে যায়নি। আজ থেকে দেড়শো বছর আগে বাংলা সাহিত্যের যে ভাষা ছিল তা হারিয়ে গেছে। একজন চাইনিজ সাধারণ লোক দুশো বছর আগে চীনা সাহিত্যের কিছু বুঝতে পারে। কিন্তু এখানে বিদেশিরা আসার পর বাংলা সাহিত্যে একটা আমূল পরিবর্তন হল মানে নতুন কিছু তৈরি হল। আমাদের গ্রামবাংলার মানুষ যে ভাষার সঙ্গে পরিচিত ছিল তা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। আজকালকার কোন ছেলেমেয়ে **বঙ্কিমচন্দ্র** পর্যন্ত পড়ে না। পাঠ্য হিসাবে পড়ে হয়তো কিন্তু পাঠক হিসেবে পড়ে না। আপনার কি মনে হয় না এর জন্য কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার প্রয়োজন আছে?

সুনীল ঃ আমাদের দেশে আগে ছিল 'ওরাল সাহিত্য' যা মুখেমুখে তৈরি হত। সে সাহিত্যটাও খুব ভালই ছিল। যেমন ধর বৈষ্ণব পদাবলী বা শাক্ত পদাবলীর যে প্রমাণ আমরা পাই যা ছাপাখানা আবিষ্কার হবার আগে থেকেই চলে আসছে। তাতে বোঝা যায় যে বেশ উন্নত মানের সাহিত্য আমাদের ছিল। কাব্য সাহিত্য মনে রাখা যায় কিন্তু গদ্য সাহিত্য তো সে ভাবে মনে রাখা যায় না। ফলে গদ্যগুলো আমরা পাইনি। এজন্য গদ্য সাহিত্য আমাদের সাহিত্যও অনেক প্রাচীন কিন্তু কবিতা ছাড়া অন্য কিছু তেমনভাবে রক্ষিত হয়নি। একটা জিনিস করলে হয় যেমন চার্লস ল্যাম্বের আছে না 'টেলস ফ্রম শেকস্‌পীয়ার' অর্থাৎ চার্লস ল্যাম্ব পড়লে শেকস্‌পীয়ার কি লিখেছিলেন তা জানা যায় শেকস্‌পীয়ার না পড়লেও। সেরকম এখন এই তো বাদলবাবু বসে আছেন। এখন তো কপি রাইটের ব্যাপার নেই। বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলো একটু সরল ভাষায় কাউকে দিয়ে লেখান আপনি তবে ছেলেমেয়েরা পড়তে পারে। একটু আধুনিক করে একটু সংক্ষেপে লেখাতে পারেন আপনি।

বিনোদন ঃ সুনীলদা দীর্ঘক্ষণ আমরা আপনার সঙ্গে কথা বললাম। এখানে অন্যরা যাঁরা আছেন তাঁরাও স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেকেই একটা অন্যতর আনন্দ উপভোগ করলেন—আজকের এই মনোজ্ঞ আলোচনায়। আমাদের বিশ্বাস, পাঠক-পাঠিকারাও এই লেখা পড়ে তৃপ্ত হবেন। আপনাকে ধন্যবাদ জানাব না—কৃতজ্ঞতা জানাই। আশাকরি আপনারা প্রত্যেকেই আমাদের আহ্বানে পরে আবার সাড়া দেবেন।

২২

এক

এক বছর ধরে অ্যামেরিকাতে ইন্ডিয়া ফেস্টিভ্যাল চলছে। দেশ থেকে কত কিছু এলো গেলো! চিত্রকর এলেন, কারিগর এলেন, গায়ক-গায়িকা এলেন, যাদুকর এলেন, নাট্যকার এলেন, নট-নটীরা এলেন। উড়োজাহাজ বোঝাই করে এলো রাজা-রাজড়ার পোষাক-আষাক—মিউজিয়ামে মিউজিয়ামে "authentic"' ভারতবর্ষ প্রদর্শিত হলো। কবিরাই বাকি ছিলেন। অবশেষে, অশোক বাজপেয়ী নিয়ে এলেন কবিদের। গত পাঁচই-ছয়ই-সাতই মে নিউ ইয়র্কের মিউজিয়াম অব মডার্ণ আর্টে, আর দশই মে সেন্ট্রাল পার্কে কবিতাপাঠের আসর বসেছিলো।

সেন্ট্রাল পার্কেই দেখা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। এককালে ইনি এবং অন্যান্যরা "বাংলা কবিতার কাঁধ থেকে চাদরটা সরিয়ে" দিয়েছিলেন। এখন প্রবীণ হয়েছেন, প্রতিষ্ঠাও পেয়েছেন।

মে মাসের শেষে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হলো নিউ ইয়র্কের কবিতার আড্ডায়। সেখানেই এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের শুরু।

দুই

"অ্যামেরিকান পাঠকদের বা কবিদের বাংলা কবিতা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু ধারণা নেই। এ্যালেন গীনসবার্গ হচ্ছেন ব্যতিক্রম।"

আমি প্রশ্ন করেছিলাম, এই নিয়ে তো তিনবার এলেন অ্যামেরিকাতে। অ্যামেরিকানদের কাছ থেকে বাংলা কবিতার ব্যাপারে কিরকম সাড়া পান?" তো, তার উত্তরে কথাগুলো বলছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। "এ্যালেন আমাদের দেশে গেছে, আমাদের সঙ্গে থেকেছে মিশেছে—ওঁর এসব বিষয়ে আগ্রহ আছে। কিন্তু, অন্যান্যদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আগ্রহ ঐ সংস্কৃত-সাহিত্য, বেদ, উপনিষদ, পুরাণে বা দর্শনেই সীমাবদ্ধ। আবার, কালিদাসের নামই অনেক শোনেনি। কাজেই, বাংলা কবিতা সম্বন্ধে খুব একটা উৎসাহ পাওয়া যায় না; কবিতা শোনার পর অবাক হয়ে বলে, আরে! এরকম আছে নাকি!"

জিগ্যেস করলাম, "আপনার কবিতা শোনার পর কোনোভাবে তারিফই করলো না?" সুনীলদা বললেন, "একটা limitation তো আছে। বাংলা ওরা বুঝতে পারছে না, ওরা শুনছে ইংরেজী অনুবাদ; অনুবাদ সার্থক, কি ব্যর্থ তার উপর কবিতার সার্থকতা নির্ভর করে অনেকটা। আমাদের দেশের ইংরেজী ব্রিটিশ-ঘেঁষা। তাই, অনুবাদগুলো অ্যামেরিকানদের কাছে সবসময় ঠিক বোধগম্য হয় না। অ্যালেন যেমন, এবারের অনুষ্ঠানগুলোতে আমার কবিতার অনুবাদ যখন পড়ছিলেন, তখন কিছু কিছু জায়গায় পাল্টে নিচ্ছিলেন শব্দ। এক জায়গায় ছিলো ঃ I shall destroy। এ্যালেন বললেন ঃ দেখো, I shall-টা বড়ো formal—কবিতায় ওটা হয় না। আমরা বলি ঃ I'll। যাই হোক, প্রথম যারা আমার কবিতা শুনলো তারা অনেকেই অবাক হয়ে গিয়েছিলো। তাদের ধারণা ছিলো বাংলা কবিতা বোধহয় সুর করে গানের মতন করে পড়া হয়, বা ধর্মীয় বিষয় নিয়ে লেখা হয়। একদম আধুনিক মানুষকে

নিয়ে যে লেখা হয়, এটা তারা জানতো না। ফলে, কবিতা শুনে তারা বিস্মিত হলো। কেউ কেউ বললো, বেশ strong কবিতা, চট করে ভোলা যায় না।"

আসলে, বাংলা কবিতার ব্যাপারে অজ্ঞতা অ্যামিরিকানদের পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু না। বললাম, "গীনসবার্গের কবিতা আপনারা প্রথম যখন পড়েছিলেন, তখন আপনাদের appreciation-টা নিশ্চয় একরকম স্তরে হয় নি—তাই না?"

উত্তরে সুনীলদা বলে উঠলেন, "ঠিক তাই। গীনসবার্গের কবিতা আমাদের বেশ ভালো লেগেছিলো তখন। ওঁর কবিতা গদ্য-ঘেঁষা; কিন্তু, তার মধ্যেও যে গুপ্ত কবিত্ব ছিলো সেটা আমাদের ভালো লেগেছিলো। সেই সময়ে, মানে 'হাংরী জেনারেশন'-এর সময়ে, অনেক কবির ওপরই গীনসবার্গের কবিতার প্রভাব পড়েছিলো আমাদের দেশে। তেমনি, গীনসবার্গের ওপর কিন্তু আমরা কিছু লোক প্রভাব ফেলেছিলাম। গীনসবার্গ নিজেই সেটা স্বীকার করেছেন। গীনসবার্গের সূত্র ধরে অন্যান্য আমেরিকান কবির ওপরেও হয়ত আমাদের প্রভাব খানিকটা পড়েছে। কাজেই, ব্যাপারটা একতরফা নয়।"

ব্যাপারটা একতরফা কি একতরফা নয়, বলা মুস্কিল। অ্যামেরিকায় উপ-সংস্কৃতির ছড়াছড়ি। কে কার ওপর কখন কীভাবে প্রভাব ফেলেছে, ঠিক করে বলা কঠিন। কে জানে, হয়ত সুনীলদার অনুমানটা ঠিক। প্রশ্ন করলাম, "অ্যামেরিকান সাহিত্য-জগতে এবার উল্লেখযোগ্য কিছু চোখে পড়লো যা বলার মতন? যেমন, কোনো নতুন ধারা? বা, যা দেখলেন তা' কি ভালো লাগলো?"

"খুব একটা সময় এবার পাইনি, ঘুরে ঘুরেই বেড়ালাম। বইপত্র নিয়ে যাচ্ছি, গিয়ে পড়ে দেখবো।"

"না, সিনেমা থিয়েটারও তো কিছু দেখলেন।"

"হ্যাঁ, সিনেমা থিয়েটার দেখেছি। সাধারণভাবে এবার যা দেখলাম তাতে মনে হলো অ্যামেরিকায় একটু conservatism এসে গেছে। একদশক আগে এদের ভাঙচুর করার ঝোঁক ছিলো, নানান দিকে উৎসাহ ছিলো; এখন যুবসমাজকে কেমন ভদ্র-সভ্য বলে মনে হলো! আর, কবিদের মধ্যে দেখছি ধর্মীয় ব্যাপারে ভীষণ ঝোঁক এসে গেছে। আধ্যাত্মিক ব্যাপারে ঝোঁক এসে গেছে। এটা আমাদের কাছে আশ্চর্যের। আমরা আবার আধ্যাত্মিকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। Colorado-তে Naropa Institute নামে এক বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান আছে; সেখানে বৌদ্ধ তন্ত্র-টন্ত্র শেখানো হয়; তুলনা করার জন্য হিন্দু তন্ত্র-ও শেখানো হয়। সেখানে শিল্প-সাহিত্যেরও চর্চা হয়, পড়ানো হয়। গীনসবার্গ ওখানে পড়িয়েছেন কিছুদিন। ওখনাকার কবিদের দেখলাম তন্ত্র, সাধনা, যোগ, ইত্যাদি নিয়েই বেশী আগ্রহ।"

একটু হতাশার সুরেই কথাগুলো বললেন সুনীলদা। অ্যামেরিকা এবার তাঁকে কিছুটা নিরাশ করেছে। অতএব, বাংলা কবিতা নিয়ে পড়লাম, তারপর।

"আপনার মনে যখন প্রথম কোনো ভাবনা আসে, বিষয় আসে, ইমেজ তৈরি হয়—তখন, কবিতায় না গল্পে তাকে প্রকাশের তাগিদ অনুভব করেন? মানে, কখন কবিতা-কে, কখন গল্প-কে প্রকাশমাধ্যম হিসেবে বেছে নেন আপনি? যে বিষয় নিয়ে গল্প লিখলেন, সেই একই বিষয় নিয়ে কবিতা লেখেন না কেন?"

"দ্যাখো শক্তি, এটার কোনো নিয়ম নেই। কবিতা যে কী করে লেখা হয়ে যায় সেটা একটা রহস্য! নিজে অনেকসময় ভাবি, কবিতা-র প্রথম লাইনটা কি করে আসে? ভেবেচিন্তে আগে থেকে তৈরি করে কবিতার প্রথম লাইনটা পাওয়া যায় না। প্রথম লাইনটা যেন বিদ্যুতের মতন চলে আসে। তারপরে, দ্বিতীয় তৃতীয় লাইন ভেবেচিন্তে..."

"অর্থাৎ, calculate করে..."

"হ্যাঁ, calculate করে লেখা যায়। কিন্তু, ঐ প্রথম লাইনটা আসে ম্যাজিকের মতন। এ ব্যাপারে Auden ঠাট্টা করে একটা কথা লিখেছিলেন ঃ Those who are true cristians ought to write prose–because, poetry is magic। —খ্রীষ্টানেরা তো ম্যাজিকে বিশ্বাস করে না, তাই

কবিতা লিখবে কি করে? সত্যিই, কবিতা যেন ম্যাজিকের মতন। আর, গল্প-টল্প—কখনও বিষয়বস্তু হিসেবে মাথায় আসে, কখনও কোনো দৃশ্য দেখে মাথায় আসে। যেমন, তোমাকে একটা উদাহরণ দিই। আমার একজন চেনা ছেলে—কবিতা লেখে—বসিরহাটের দিকে গ্রামে তার নিজের বাড়ী আছে। অনেকদিন ধরে ও আমাকে বলতো, চলুন আমাদের গ্রামে। গ্রাম আমার ভালো লাগে, তাই পাঁচ-ছ'দিনের জন্য ওদের গ্রামে গিয়েছিলাম। পুরো মুসলমানদের গ্রাম। তাদের সাথে মেলামেশা করছি, বেশ ভালো লাগছে। ওদের বাড়ীর সামনে উঠোনে দেখতুম জন মজুররা রোজ কাজ করছে। ছেলেমেয়ে সবাই। তার মধ্যে এক যুবতী একদিন আমার জানলার কাছে এসে বললো : আচ্ছা দাদা, একটা কথা কন তো। আপনারে আমি বিচার চাইছি।—আমি বললাম : কি ? —ও বললোঃ যে ছেলেমেয়ের মা বেঁচে আছে, তাদের কি অনাথ বলা যায়?—অদ্ভুত প্রশ্ন! সাথে সাথে হুড়মুড় করে মাথায় পুরো একটা কাহিনী চলে এলো। শুনলাম, মেয়েটার আগে বিয়ে হয়েছিলো; কিন্তু, বিয়েটা ওর বাবা-মা-র পছন্দে হয়নি। মেয়েটার তিনটে বাচ্চা হয়। স্বামী হিংস্র-প্রকৃতির ছিলো, কোথায়, মারামারিতে খুন হয়! তা তিনটে বাচ্চা নিয়ে অসহায় অবস্থায় মেয়েটা গ্রামে ফিরে এসেছে। ওর বাবা-মা চায় ও আবার বিয়ে করুক। মেয়েটি দেখতে ভালো, বেশ স্বাস্থ্যবতী। এদিকে কেউই চায় না ঐ তিন বাচ্চা সমেত ওকে বিয়ে করতে। তবে, বাচ্চাগুলোর কি হবে? তখন, অনেকে মিলে পরামর্শ করে ঠিক করলো যে, বাচ্চাগুলোকে অনাথ আশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া হোক? মেয়েটা তো ওদের মা। সে বললো, কি করে ওদের অনাথ বলছো তোমরা? আমি তো বেঁচে আছি! "অনাথ" বলে যাদের বাবা-মা কেউ নেই। —তা' ঐ যে মেয়েটা একটা প্রশ্ন করেছিলো, তা-ই নিয়েই গল্প লিখেছিলাম। একবার রেলস্টেশনে ট্রেন থেমেছে ; নেমেছি জল খেতে। গরমকাল। কলের জলে জল খাবো। পাশের একটা লোক বললোঃ গেলাস নেবেন?—তার কাছে একটা গ্লাস ছিলো। বললামঃ দিন। —যেই গেলাস নিতে গেছি অমনি সে বললো : তুমি অমিয় না? —আমি বললাম : না, আমার নাম তো অমিয় নয়। —কথাটা শোনামাত্র মাথায় একটা গল্প এসে গেলো।"

বললাম, "তার মানে, কবিতা লেখাটা আপনার কাছে একধরনের sensuality। আর, গল্প লেখেন human relation, human condition, এসব নিয়ে।" "হ্যাঁ, mainly তাই। আবার, অনেকসময় থীম্-টা আগে থেকে চিন্তা করি। কাহিনী আর চরিত্রগুলো পরে আসে। এভাবে ভেবেচিন্তে কবিতা লিখতে পারি না। কবিতার প্রথম লাইনটা কোথা থেকে আসে কে জানে। হয়ত মহাশূন্য, মহাকাশ থেকে চলে আসে। অবাক হয়ে ভাবি, এরকম তো চিন্তা করিনি কখনও!'

"সুনীলদা, বড়ো কবিতা আর আজকাল লেখাই হচ্ছে না।"

"হ্যাঁ, হচ্ছে না। কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী ধারা থেকেই বলা যায় যে মহাকাব্যের যুগ শেষ হয়ে লিরিকের যুগ এলো। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তো লিরিক লিখেছেন। নবীন সেনের আত্মজীবনীতে আছে, যখন রবীন্দ্রনাথের সাথে তাঁর প্রথম আলাপ হয়, তিনি বলেছিলেন : ছেলেটি তো বেশ ভালো, বেশ প্রতিভাবান দেখছি। কিন্তু, ও ওর ক্ষমতার অপব্যবহার করছে, কারণ ও মহাকাব্য লেখে না। ও বেশী দূর যেতে পারবে না।—এরকম ধারণা ছিলো নবীন সেনের। তা দেখা গেলো যে, রবীন্দ্রনাথ সব মহাকাব্য-টাব্য ধ্বংস করে একাই উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর লিরিক কবিতাই জয়ী হয়ে গেলো। পরবর্তীকালে জীবনানন্দ বা কেউই বড়ো কবিতা লেখেননি। একটা সুর-রিয়ালিস্ট আন্দোলনের প্রভাবও এর মধ্যে আছে হয়ত—যেখানে সবকথা বলার দরকার হয় না। এরপর থেকেই কবিতা দুর্বোধ্য হয়ে গেলো। এখন কবি ইশারায় ইঙ্গিতে বলেন—ফলে, দীর্ঘ কবিতা লেখার চলটা চলে গেলো। ইদানীং অবশ্য শক্তি বা আমি কয়েকটা দীর্ঘ কবিতা লিখেছি। তার মধ্যে খানিকটা বর্ণনা থাকে, খানিকটা কাহিনীর আভাস থাকে, খানিকটা আত্মজীবনীর মতন।"

"দীর্ঘ কবিতা লেখা না হওয়ার কারণ কি? অস্থিরতা?"

"প্রধান কারণ হচ্ছে, যে চিন্তা বা ইমেজগুলো মাথায় এলো, ইচ্ছে করলে সেগুলো এখন অনেক

সংক্ষেপে বলা যায়। যদি বক্তব্যমূলক কবিতা হয় তো অন্যকথা। দেখো, শিল্প, বিমূর্তবাদের দিকে এগোবে, এটাই শিল্পের নিয়তি। ছবি, মানে painting যেমন, বাস্তবকে অতিক্রম করতে করতে প্রায় বিমূর্ত হয়ে গেছে; গান যেমন, হতে হতে, পল্লীগীতি থেকে শুরু করে এমন একটা জায়গায় চলে গেছে যে কথার দরকার হয় না। সব শিল্পই বিমূর্তবাদের দিকে এগোবে। নিয়তি! তবে, অন্যধরনের কবিতাও লেখা হতে পারে—আত্মজীবনীমূলক বা বর্ণনামূলক। সেগুলো বড়ো কবিতা হয়। ও কাজটা কিন্তু, মহাকাব্য লেখার আর কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। গদ্যই করে দিচ্ছে।"

গদ্যই কি তবে কবিতার সবচেয়ে বড়ো শত্রু? জিগ্যেস করলাম সুনীলদাকে।

সুনীলদা বললেন, "কবিতা আর painting-এর মধ্যে খুব মিল আছে একদিক থেকে। Painting-এর সবচেয়ে বড় শত্রু হলো photography। Photography এসে painting-এর বাস্তবতাকে পুরো দখল করে নিলো। তখন painting-কে অন্যদিক খুঁজতে হলো। তাই ক্রমশঃ সে abstract হয়ে যাচ্ছে। কবিতার ক্ষেত্রেও তাই। আগেকার দিনে সবই কবিতায় লেখা হতো। ধারাপাত কবিতায় লেখা হয়েছে। রামায়ণ মহাভারতও। কেননা, গদ্য তখন ছিলো না। তারপর এইটিন্থ সেঞ্চুরি-র সময় গদ্য যেই এসে গেলো, তক্ষুনি কাজের ব্যাপারগুলো সে সব দখল করে নিলো। মানে, কবিতা দিয়ে আর কাজ চলবে না। গদ্য এসেই জনপ্রিয় হয়ে গেলো। কবিতা তখন বললো, গদ্যে যা হয় তা করবো না। ফলে, কবিতাও abstract হলো। এবং, পাঠক হারাতে লাগলো।"

যে প্রশ্ন করবো বলে তৈরি হয়ে বসেছিলাম, সেটা করার সুযোগ এবার পেলাম। জিগ্যেস করলাম, "কবিতাকে জনপ্রিয় করার জন্য আপনারা কি করছেন? একটা চিরাচরিত অপবাদ নিয়ে কবিতার বয়স বাড়ছে—কবিতা নাকি 'দুর্বোধ্য'। দিন দিন কবিতা আরো জটিল হবে, কেননা মানুষের হাবভাব আরো জটিল হচ্ছে। ফলে, কবিতার সাথে পাঠকের বিচ্ছিন্নতা আরো বাড়বে। তাহলে, কবিতার কি হবে?"

সুনীলদা একটু সময় চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "প্রশ্নটা বেশ ভালো। দেখো, কবিতা দুর্বোধ্য হবেই। আমি সব জায়গাতেই বলি, সকলের কবিতা পড়ার দরকার নেই।"

"কেন? একথা বলছেন কেন?"

"বলছি, কারণ, কবিতাকে যদি একটা সূক্ষ্ম শিল্প রাখতে হয়, তার বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে হয়, তাহলে যারা দীক্ষিত পাঠক তারাই কবিতা পড়বে। সকলের জন্য লিখতে হলে কবিতাকে সরল করতে হবে, জল মেশাতে হবে। সুতরাং, আমি বলবো যে, একশ্রেণীর পাঠক যাদের আগ্রহ আছে কবিতার বিষয়ে, তারাই পড়ুক। যদি কেউ একটা পাতা উল্টে বলে ঃ দুর্বোধ্য আমি তাদের বলবো, তোমাদের কবিতা পড়ার দরকার নেই। গল্প, উপন্যাস পড়ো, কিম্বা সিনেমার ম্যাগাজিন পড়ো। তোমার জন্য কবিতা লেখা হবে না। কবিতা তার জন্যই লেখা হবে যে রবীন্দ্রনাথ পড়েছে, জীবনানন্দ পড়েছে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় পড়েছে।"

মনে হলো সুনীলদা যেন একপেশে কথা বলছেন। আমার বিশ্বাস, যে কোনো শিল্প কর্মকে তারিফ করার জন্য একটা training-এর দরকার, অভ্যাসের দরকার। অ্যামেরিকাতে music appreciation, poetry appreciation, modern art appreciation-এর ক্লাশ হয়। সেমিনার হয়, প্রচুর বই লেখা হয়। আমাদের দেশে কিন্তু এসব হয় না। হওয়া কি দরকার নয়? তাই প্রশ্ন করলাম, "কোনো পাঠক যদি বলে, আমি যে শিক্ষিত পাঠক হবো, তার সুযোগ কোথায়?"

সুনীলদা স্বীকার করলেন, সুযোগ নেই। বললেন, "এ-ব্যাপারে আমার যেটুকু জ্ঞান বুদ্ধি আছে, বলছি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজগুলোতে—আমি যতটুকু জানি—মৃত কবিদের ছাড়া উল্লেখ করা হয় না। আধুনিকতাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করার কথাই বলা হয় সেখানে। ফলে, ছাত্রছাত্রীদের কোনো training হয় না। দুঃখের কথা। আর ; আলাদাভাবে বিশ্ববিদ্যালয় যা কলেজের বাইরে কেউ তো কখনও উদ্যোগ নেয়নি। অবশ্য, তবুও এর মধ্যে দেখতে পাই একটা স্রোত। কোথাও থেমে

তো নেই বাংলা কবিতা! এখন আঠারো-উনিশ বছরের ছেলে বা মেয়ে আসছে, তাদের কথা শুনে অবাক লাগছে। এরা কবিতা সম্বন্ধে কতো জানে, কতো বোঝে! এদের দেখো, এরা নিজে নিজে পড়তে পড়তে কেউ কেউ তৈরি হয়ে যাচ্ছে। কাজেই, স্রোত তো থেমে নেই। আমাদের দেশে আরেকটা জিনিস সাহায্য করে, যেটা অন্য অনেক ভাষাতেই নেই। সেটা হচ্ছে আমাদের দেশে প্রচুর লিটিল ম্যাগাজিন আছে—মফস্বল থেকে, গ্রাম গঞ্জ থেকে, পাড়া পাড়া থেকে অনেক লিটল ম্যাগাজিন বেরোয়। ফলে, ছেলেমেয়েরা নতুন কিছু পড়ার স্বাদ পায়। স্বাদ পেতে পেতে তারা খানিকটা শিক্ষিতও হয়। এই যে সব সময় নতুন কবিরা আসছে, কোথাও আমরা থেমে থাকিনি—এটা বলবো একটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ।"

প্রশ্ন করলাম, "আপনি বললেন ঃ কবিতা সবার পড়ার দরকার নেই।— তা না বলে যদি বলা যায় ঃ সবরকমের কবিতাই লেখা হোক না?"

"না, সেটা কবিতা থাকবে না।"

"মানে বিশুদ্ধতা বজায় থাকবে না?" (আমি কিন্তু ঠাট্টা করার জন্য কথাটা বললাম না। চাইছিলাম, সুনীলদা যাতে আরো কিছু বলেন)

"হ্যাঁ, বিশুদ্ধতার প্রশ্ন। কেউ যদি বলে, আমি একটা জিনিস প্রচার করতে চাই। আমি তাকে বলবো, কবিতা লেখার দরকারটা কি? গদ্য লেখো। তুমি যদি classical সংগীত পরিবেশন করতে চাও, তবে কিশোরকুমার, মান্না দে-র মতন গান গেয়ে পার পেয়ে যাবে ভেবো না। আমার মতে, কবিতা যদি খুব জনপ্রিয় হয় তো কবিতার ক্ষতি সেখানে। আমি চাই না কবিতা জনপ্রিয় হোক।"

বললাম, "তার মানে, কবিা কোনোদিনই প্রতিষ্ঠা পাবে না!"

"না, কোনোদিনই পাবে না। অনেক এমন ভাষা আছে যাতে ভালো কবিতা পড়ার পাঠকই নেই।"

"পাঠকদের ভালো কবিতা পড়াব অভ্যেস নেই বলুন।"

"হ্যাঁ, অভ্যেসও নেই, তাছাড়া ঐ জটিল শিল্পের দিকে তাদের কেউ চালিতও করেনা। তাই তারা অল্পতেই সন্তুষ্ট থাকে। বাংলা ভাষায় কিন্তু একটা ট্র্যাডিশান আছে। লিটিল ম্যাগাজিন বেরোয়, অনেক ছেলে-মেয়ে কবিতা লেখে, চর্চা করে। ধরো, তিন-চার হাজার ছেলেমেয়ে কবিতা লেখে। তাহলে তিন-চার হাজার পাঠকও পাচ্ছি। যারা কবিতা লেখে তারা কবিতা পড়েও। তিন চার হাজার পাঠক কম নয়।"

"কিন্তু, কবিতা নিয়ে আলোচনা তেমন হয় না।"

"হ্যাঁ, হয় না। বরং বাংলাদেশে হয়। ওখানে কবিতা নিয়ে একটা উন্মাদনা আছে। ওদের পত্র পত্রিকায় কবিতা নিয়ে সিরিয়াস আলোচনা হয়।"

ঘুরে ফিরে আবার সেই একই প্রশ্ন করলাম, "কবিতার ঘাড় থেকে দুর্বোধ্যতার অপবাদ কাটাতে হবে, কি হবে না?"

সুনীলদা জোর দিয়ে বললেন, "না। দুর্বোধ্যতা কাটাতেই হবে তেমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। কারুর কবিতা দুর্বোধ্য হতে পারে, কারুর কবিতা আপাতভাবে সরল হতে পারে। কিন্তু সরল হলেও কবিতার মধ্যে গভীর কোনো অর্থ লুকিয়ে থাকতে পারে।"

বললাম, "হ্যাঁ, সেটা আমাদের appreciation level-এর ওপর নির্ভর করে।"

"সেই। কাজেই, আমি বলবো যে, কবিতার ব্যাপারে খানিকটা শিক্ষিত না হলে কবিতা বোঝা যাবে না।"

এখানেই যদি থেমে যেতাম, তবে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যেতো। পাঠকদের কবিতা পড়তে অভ্যস্ত করার দায়িত্ব কবিদের, সমালোচকদের। কবিতার স্বার্থে এঁরা সচেতনভাবে কী করার চেষ্টা করছে জানি না। কবিতা কবিদের তৈরি খোলসে ঢুকে বসে রইলে ফল ভালো হবে কী? বললাম, "আজকাল কোনো art form-ই স্বয়সম্পূর্ণ নয়। ইদানীং, এক art form অন্য অনেক art form-এর

সাথে interact করছে। নতুন এস্থেটিকস্ তৈরি হচ্ছে! তাই, জিজ্ঞেস করছিলাম যে, কবিরা যদি পারফরমিং আর্টস্-এর সাথে এক যোগে কাজ করে তো কেমন হয়? অর্থাৎ পারফরমিং আর্টস্-এর ঐশ্বর্যগুলোকে কাজে লাগিয়ে কবিতাকে একটা নতুন ডাইমেনশান্ দেওয়ার চেষ্টা করলে কেমন হয়? এতে কবিতার সঙ্গে মানুষের সংযোগ আরো বাড়বে না কী? তাছাড়া, যে লক্ষ লক্ষ মানুষ কবিতা পড়তে অভ্যস্ত নন, তাঁরা এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে কবিতায় অনেক বেশী অভ্যস্ত হয়ে উঠবেন হয়ত।"

জবাবে সুনীলদা বললেন, হ্যাঁ, কথাগুলো ঠিকই। আমাদের দেশে এগুলো হচ্ছে আস্তে আস্তে। যেমন ধরো, আগে কবিতা শুধুমাত্র পত্রপত্রিকায় ছাপা হতো। কেউ পড়লো কি পড়লো না। কিম্বা, বই ছাপা হলো, কয়েকজন কিনলো কি কিনলো না। কিন্তু, কবিতা এখন মঞ্চে এসে গেছে। এখন আমাদের দেশে প্রায়ই কবিতাপাঠের আসর বসে। কবিরা মঞ্চে কবিতা পড়েন। এতে পাঠকদের বা শ্রোতাদের হয়ত খানিকটা সুবিধা হয়। তারপরের স্তরটা হচ্ছে, যাঁরা পেশাদারী আবৃত্তিকার, তাঁরা এখন আধুনিক কবিতা আবৃত্তি করছেন। পাড়ায় পাড়ায় এখন আবৃত্তির ক্লাস শুরু হয়েছে। নতুন ছেলেমেয়েরা এসে আবৃত্তি শেখে। জলসা টলসায় এখন আবৃত্তিকাররা আবৃত্তি করেন, শুধুমাত্র গান বা হাস্যকৌতুকই হয় না। ফলে, কবিতা এভাবে মঞ্চে এখন পারফরমিং আর্টস্-এর কাছাকাছি এসেছে। কিছু কিছু থিয়েটারেও আধুনিক কবিতার ব্যবহার হচ্ছে। বহুরূপী নাট্যগোষ্ঠী যেমন একবার আমাকে তাঁদের একটা নাটকের জন্য কিছু সংলাপ কবিতায় লিখে দিতে বলেছিলো। আমি লিখে দিয়েছিলাম। গৌতম চৌধুরী নামে নতুন একজন কবিতা লেখে—সে কিছু কিছু নাটকের গান লিখে দেয়। --এ সমস্ত খুব বেশি হচ্ছে না, একটু একটু হচ্ছে। ফিল্মে হয়নি কিছুই। ফিল্মের সঙ্গে কবিদের কোনো যোগাযোগ নেই। যারা ফিল্মের গান লেখে তারা রাবিশ—তারা কবিই না। 'রাবিশ' কথাটা একটু কটু হয়ে গেল—মানে, মানুষগুলো ভালো কিন্তু গান যেগুলো লেখে সেগুলো রাবিশ। painting-এর সঙ্গে, painter-দের সাথে খানিকটা যোগাযোগ হয়েছে। আজকাল অনেক বই বেরোয় যেখানে কবিতার সঙ্গে ছবি থাকছে। ছবিগুলো কিন্তু ঠিক illustration না। এ-ব্যাপারে নীরদ মজুমদার, প্রকাশ কর্মকার, রবীন মণ্ডল, ইত্যাদি শিল্পীরা এগিয়ে এসেছেন। তবে, এদেশে এসব যতটা হয়েছে, তার তুলনায় আমাদের দেশে অনেক কম। তাছাড়া, আমাদের দেশে এসব করার সুযোগও তো কম।"

"কবিরা মঞ্চে কবিতা পড়েন, না অভিনেতা অভিনেত্রীরা?"

দুরকমই হয়। প্রধানতঃ, কবিরা আর পেশাদারী আবৃত্তিকাররাই মঞ্চে কবিতা পড়েন। মাঝে মাঝে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়--তিনি নিজেও কবি—নিজের আর অন্যদের কবিতা পড়েন। অপর্ণা সেনও মাঝে মাঝে পড়েন। উনি আধুনিক কবিতা ভালোবাসেন। প্রায় একহাজার লোক টিকিট কেটে এসব শুনতে আসে।

আমাদের এখানে নিউ-ইয়র্কে গ্রিনীচ ভিলেজে একটা কাফে আছে যেখানে সপ্তাহে একদিন করে কবিতা আবৃত্তি হয়। লোকে খায়-দায়, কবিতা শোনে। ছোট্ট একটা স্টেজের ওপর সব হয়। এতে, আমার মনে হয়, শ্রোতা বা পাঠকের সাথে কবিতার দূরত্ব কিছুটা কমে। সেটাই বললাম সুনীলদাকে। "এসবে কি কবিতার বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়।"

সুনীলদা আবার ঐ বিশুদ্ধতার ওপরই জোর দিলেন। বললেন, "বিশুদ্ধতা তো রক্ষা করতেই হবে। আমার মতে, কবিতা যে যা লিখছে তা-ই থাকুক। তবে, পাঠকদের একটু কাছাকাছি পৌঁছোতে পারলে ভালোই তো। আমি বলবো না যে, কবিরা স্টেজে উঠে কবিতা পড়বেন বলে দর্শকদের মুখ চেয়ে সরল সরল কবিতা লিখবেন , চটপট করে হাততালি পাওয়ার মতন কবিতা লিখবেন, বা রঙচঙ ব্যবহার করবেন—আসলে, এসব আসরে সেসব শ্রোতারাই আসবে যারা কবিতা বোঝে বা ভালবাসে। যারা বোঝেনা, তাদের জন্য extra কিছু করা, film actor, actrees-দের আনা, আমার মতে উচিত না।"

কবিতাকে ভিস্যুয়াল আর্ট ফর্মের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সুনীলদার কোনো ছুঁৎমার্গ নেই। তবে, ওঁর মতে, "কবিতাকে কবিতা থাকতে হবে।"

জিজ্ঞেস করলাম, "আমাদের দেশে এসব না হওয়ার কারণ কি শুধুই অর্থনৈতিক?"

বললেন, "হ্যাঁ, এসব করতে হলে পয়সার দরকার। কে করবে? কবিরা নিজেরা তো করতে পারেন না। কেউ sponsor না করলে হবে কি করে?"

বললাম, "আপনারা এস্টাব্লিশমেন্টের মধ্যে আছেন। আপনারাই করবেন। আপনারা ইচ্ছে করলে অনেক কিছু করতে পারেন।"

দীর্ঘ কৈফিয়ত দেওয়ার সুরে সুনীলদা বললেন, "আমি কতগুলো করবো? আমি অনেক কিছুই করি। এখন যদি আবার অনুষ্ঠান করতে শুরু করি তো সব আমাকে ঘিরে ধরে বলতে শুরু করবেঃ আমাকে চান্স দিন। অমুককে চান্স দিন। আমার নিজের কিছুই করা হয়ে উঠবে না। আমি প্রযোজনার ব্যাপার থেকে দূরে সরে থাকতে চাই। কাউকে "না" বলতে পারি না আমি। একেই তো কবিতা ছাপাবার জন্য অনেকে আমাকে ধরে—যেহেতু 'দেশ' পত্রিকার কবিতার portion টা দেখি আমি। আবার যদি অনুষ্ঠান করার দিকে যাই তো...। আমি তো এখন একটা অন্য জিনিস করছি।"

"কি?"

"বুধসন্ধা' বলে একটা ক্লাব করেছি আমরা। সেখানে কবি, শিল্পী, লেখকদের মেলাবার চেষ্টা করছি-আমরা। কারণ, একটা বয়সের পর এঁরা পরস্পর পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। এক অনুষ্ঠানে, বা বিয়ে বাড়ী শ্রাদ্ধ বাড়ী ছাড়া দেখা হয় না। তা, 'বুধসন্ধ্যায়' সবার দেখা হয় একটা আদানপ্রদান হয়। সেখানে কবিতাপাঠ হয়, গান হয়, নানা বিষয়ে আলোচনা হয়, নাটক হয়। সেজনই আমি নাটক লিখতে শুরু করলুম। আগে তো নাটক লিখিনি কখনও। নাটকে অভিনয় করছি আমরাই। তবে, এটাতো ঠিক নাটকের অভিনয় নয়। কেননা, লোকে জানলো বুদ্ধদেব গুহ, সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নাটক করছে—আলাদা একটা আকর্ষণ। টিকিট ভালো বিক্রী হয়। একবার পুলিশ টুলিশ দিয়ে ভিড় সামলাতে হয়েছিলো। টিকিট বিক্রী করে যে টাকা পাই, তা ঠাকুরপুকুর অঞ্চলে এক ভদ্রলোক খুব চেষ্টা করে একটা ক্যান্সার হসপিটাল করেছেন—তাঁকে সব দিয়ে দিই। অথবা, বনগাঁয় কোনো নমঃশূদ্রের ছেলের পড়াশুনোর খরচের টাকাটা দিয়ে দিই। খানিকটা সামাজিক কাজও হয়, আমাদের কিছুটা তৃপ্তিও হয়।" সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আর শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার বই "সুন্দর রহস্যময়" প্রায় দুবছর আগে নিউ ইয়র্কেই এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে দেখেছিলাম। বইটাতে নীরদ মজুমদারের ছবি ছিল কবিতার সাথে। জানতে চাইলাম, দেশে বইটা বেরোনোর পর পাঠকের response কিরকম।

সুনীলদা বললেন, "response ভালোই। এখন প্রকাশ কর্মকারের আঁকা ছবি দিয়ে আমার আর শক্তির আরেকটা কবিতার বই বেরোচ্ছে।"

"Response ভালো মানে?"

"পাঠকরা এটা নিচ্ছে। প্রকাশকরাও এখন আগ্রহ দেখাচ্ছে। আগে, ওরা ঝুঁকি নিতে চাইতো না। এখন একটা দুটো বেরোবার পর যখন দেখছে বইগুলো বাজারে ভালোই চলছে। অতএব, আগ্রহ দেখাচ্ছে। ফলে, শিল্প-র সাথে কবিতাকে মেলাবার যে উদ্যোগ, সেটা খানিকটা সার্থক হচ্ছে বলা যায়। ফ্রান্সে কবিতার সাথে শিল্পীদের ছবি অনেকদিন ধরেই বেরোচ্ছে। আমাদের দেশে আগে হতো না এটা। রবীন্দ্রনাথের বেলায় হয়েছিল কারণ ওঁরই ভাইপো-ভাইঝি সব ছিলো—কিন্তু, এখন যেভাবে হচ্ছে, সেভাবে কখনও হয়নি।" —হঠাৎ খেয়াল হলো, যে চাঞ্চল্য নিয়ে আমি প্রশ্নগুলো করে চলেছি, সুনীলদা-র মধ্যে তার বিন্দুমাত্র নেই! 'তান্ত্রিক "কবিরা এরকমই হন। কোনোকিছুতেই যেন বিচলিত হন না। আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে এবার প্রশ্ন করলাম "কবি হিসেবে নিজেকে আপনি কতটা committed মনে করেন? কার কাছে committed?"

সুনীলদা বললেন, "আমি প্রত্যক্ষভাবে কোনো commitment feel করি না। তবে, ভিতরে ভিতরে একটা commitment আছে বৈকি। যে ভাষা নিয়ে লিখছি, তার কাছে। মানে, বাংলা ভাষা। সেই ভাষাকে যদি অন্ততঃ একটা পা এগিয়ে দিতে পারি, সেটাই আমার কাছে বিরাট কাজ হবে। পারবো বা পেরেছি বলে দাবী করছি না। পারবোই না হয়তো। তবুও চেষ্টা। এতোকালে বাংলা ভাষার যে-ঐশ্বর্য গড়ে উঠেছে তাতে যদি একটা ঘাসফুলও পরাতে পারি তো জীবন ধন্য হবে।"

এখানেই আলোচনা শেষ হচ্ছিলো। কিন্তু, "সুনীলদা, আজ থেকে কুড়ি বছর আগে যে কবিতাগুলো লিখেছিলেন, সেগুলো পড়লে বুকের মধ্যে কাঁপুনি আসে। আজকাল আপনি আর সেরকম কবিতা লিখতে পারেন না।"

হেসে বললেন, "ঠিক বলেছো। সত্যিই আমরা এখন এস্টাব্লিশমেন্টের ভেতর ঢুকে গেছি। সেখানে কাজকর্ম করি। এখনকার যারা নতুন কবি, তারা আবার নতুন করে ভাঙচুরের কথা লিখবে। আমাদের আইডিয়া ছিলো, আমরা এস্টাব্লিশমেন্টের মধ্যে ঢুকে সেটাকে বদলাবো। তা' খানিকটা বদলেছে নিশ্চয়ই—এস্টাব্লিশমেন্ট এখন অনেককে স্বীকার করে নিচ্ছে। এখন অনেকে এক্সপেরিমেন্ট করতে পারে তার মধ্যে ঢুকে। এই কাজ খানিকটা করেছি।"

"তেমন কিছু কি হচ্ছে?"

"কিছুটা হচ্ছে। এস্টাব্লিশমেন্টকে পুরোপুরি ভাঙা যায় না। এস্টাব্লিশমেন্ট হচ্ছে অনেকটা গ্যাসীয় পদার্থের মতন । তাকে ভাঙতে গেলে সে আবার ঘিরে ধরে। এবং, বোঝাও যায় না কখন ঘিরে ধরেছে। তবুও খানিকটা গুণগত পরিবর্তন হচ্ছে।"

বললাম, "আপনারা প্রতিষ্ঠিত কবিরা এখন সেই যন্ত্রণা থেকে কবিতা লেখেন না আর। অভ্যাসবশতঃ লেখেন।"

আবার হাসলেন উনি। বললেন, "সেটা ঠিকই। অস্বাভাবিক কিছু না। প্রথম যৌবনের যে কবিতা, তার সাথে পরিণত বয়সের কবিতার কোন মিল থাকতে পারে না। আমরা এখন লিখি উপলব্ধির কবিতা। অল্প বয়সে লিখতাম রাগ থেকে, দুঃখ থেকে, হতাশা থেকে—তার তেজ অনেক বেশী। সেজন্য, ওরকম কবিতার স্বাদ পেতে গেলে এখনকার তরুণ কবিদের কাছ থেকেই পেতে হবে। আমাদের কাছ থেকে ওটা আর আশা করা যায় না।"

২৩

'উত্তরণ'কে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে বললেন প্রথিতযশা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

উত্তরণ ঃ আপনি বলে থাকেন যে আপনি প্রথমে কবি, পরে সাহিত্যিক। আপনার বিখ্যাত কবিতা 'কবির মৃত্যু'-তে আপনি বলেছেন, কবির হাত কখনও শিকলে বাঁধা থাকে না। আপনার কি মনে হয় আপনার হাত কখনও শিকলে বাঁধার চেষ্টা হয়েছে? কেউ করেছে সে চেষ্টা?

সুঃ গঙ্গো ঃ না । এটা ঠিকই যে এখনও পর্যন্ত আমাদের দেশে এটুকু গণতান্ত্রিক আবহাওয়া আছে যে, কবিকে বা লেখককে কোনও বিশেষ শক্তি দিয়ে বাঁধার চেষ্টা কখনও হয়নি। লেখার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আমাদের দেশে আছে।

উত্তরণ ঃ আপনার অধিকাংশ কবিতায়, 'যদি নির্বাসন দাও' থেকে শুরু করে 'সাঁকোটা দুলছে' পর্যন্ত অনেক কবিতাতেই পূর্ব বাংলার প্রতি একটা নস্টালজিক টান দেখতে পাওয়া যায়। এটাকে কি আমরা দুই বাংলার পুনর্মিলনের একটা ইচ্ছা বলে ধরে নিতে পারি?

সুঃ গঙ্গো ঃ কোনও ধরনের স্পষ্ট বক্তব্য দিয়ে তো কবিতা হয় না, কবিতা হয় অনুভূতি দিয়ে। যখন যে অনুভূতিটা আসে তার ভাষা ও শিল্প ভাব প্রকাশের নামই কবিতা। যেহেতু পূর্ব বাংলায় আমার জন্ম সেহেতু একটা টান তো থাকবেই।

উত্তরণ ঃ অনেক বড় মাপের সাহিত্যিক হওয়া সত্ত্বেও আপনার সৃষ্ট 'কাকাবাবু', 'ফেলুদার' কাছে হেরে গেল। এর কারণ কি বলে আপনার মনে হয়?

সুঃ গঙ্গো ঃ যদি হেরে গিয়ে থাকে তো হেরে গেছে। আমি তো একটা বই লিখেছি 'কাকা বাবু হেরে গেলেন' নামে। আমার কোনও প্রতিযোগিতা নেই।

উত্তরণ ঃ না, প্রতিযোগিতার কথা নয়, এর কারণ এটুকু শুধু.....।

সুঃ গঙ্গো ঃ কেউ যদি ভাবে হেরে গেল তো হেরে গেল, কি আর করা যাবে।

উত্তরণ ঃ এবারে একটা রাজনীতি সংক্রান্ত প্রশ্ন, নিরপেক্ষ সাহিত্যস্রষ্টা হিসাবে বিখ্যাত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের মনে হচ্ছে সাম্প্রতিক ভারতের যে রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত তাতে আপনি সূক্ষ্ম ভাবে জড়িয়ে পড়ছেন। এটা কি আপনার সচেতন প্রচেষ্টা?

সুঃ গঙ্গো ঃ আমি ঠিক রাজনীতি বা কোনও দলের সঙ্গে জড়িয়ে পরি না। তবে একটা স্বাধীন মতামত সকলেরই থাকে। যে মৌলবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, আমি এর বিরুদ্ধে। আমি মনে করেছিলাম যে, মানুষ ধর্মটাকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে রাখবে এবং ধর্ম নিরপেক্ষ হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোতে মৌলবাদ বেড়েছে এবং আমাদের ভারতেও মৌলবাদ ভীষণভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এটা খুব অশুভ লক্ষণ, এতে কখনই শান্তি আসতে পারে না। তাছাড়া প্রচুর অর্থব্যয়, প্রাণনাশ এসব চলে —তাই ধর্মীয় মৌলবাদের এই প্রসারে দুঃখ পাই। এই জন্যই চেষ্টা করি যাতে মানুষের মন থেকে মৌলবাদটা উবে যায় এবং তারা ধর্মীয় ব্যাপারে সহনশীল হয়। এটুকুই আমার চেষ্টা। এছাড়া কোনও রাজনৈতিক ক্রিয়া-কর্ম আমার নেই।

উত্তরণ ঃ এ প্রসঙ্গেই আসছে বিশ্ব বঙ্গ সম্মেলনের কথা। বলা হচ্ছে যে 'বিশ্ব বঙ্গ সম্মেলন' কার্যতঃ ফ্লপ। এর কারণ কি?

সুঃ গঙ্গোঃ অনেকটা ঠিক। বিশ্ব বঙ্গ সম্মেলন-এর যে বিরাট প্রস্তুতি ছিল, যতখানি আকাঙ্ক্ষা ছিল তার কিছুই মেটেনি। অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে অভিনবত্বও কিছু দেখা যায়নি। আর আমি এর সঙ্গে খুব বেশি জড়িত ছিলাম না কিন্তু। এটা বাইরের লোকের ধারণা আমি খুব বেশি জড়িত ছিলাম না কিন্তু। এটা বাইরের লোকের ধারণা আমি খুব বেশি জড়িত ছিলাম, এটা ভুল, এখানে অনেকগুলো কমিটি ছিল। সর্বমোট ২৮টা কমিটি। আমি একটা কমিটির চেয়ারম্যান ছিলাম। সেই কমিটির কাজ ছিল একটা স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করা। বাংলার শিল্প সংস্কৃতি, বিজ্ঞান চর্চা, ইতিহাস—সব মিলিয়ে আমরা কি কি পেয়েছি বা কি পাইনি তা নিয়ে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের লেখা স্মারকগ্রন্থ। সেটা আমি প্রকাশ করে দিয়েছি, বেশ ভালোই হয়েছে বইটা। বাকি কিছুর সঙ্গে আমি জড়িত ছিলাম না।

উত্তরণ ঃ নতুন যারা আজকাল কিছু সৃষ্টির জন্য কলম ধরছে, তাদের জন্য আপনার পরামর্শ কি?

সুঃ গঙ্গোঃ (হাসি) আমার পরামর্শ তারা শুনবে কেন? যে যার নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী চলবে।

উত্তরণ ঃ অবশ্যই, আপনি বাংলা সাহিত্যের একজন দিকপাল।

সুঃ গঙ্গোঃ আমি তো দেখতে পাচ্ছি বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে নতুন যারা লিখছে খুবই ভালো লিখছে। এটা খুবই আশার কথা। লেখা অকারণ জটিল হচ্ছে না, তার আবেদনও সকলের কাছে পৌঁছচ্ছে। সেই তুলনায় আমি বলব গদ্যটা একটু দুর্বল হয়ে গেছে। তেমন প্রতিভাবান গদ্য লেখকের সংখ্যা বিশেষ নেই। আশা করছি তারাও আসবে। আমার উপদেশ বা পরামর্শ কিছু নেই, তবে একটা কথা হচ্ছে যে যারা লিখতে আসবে তাদের প্রচুর পড়তে হবে। না পড়ে লেখা যায় না। অনেকেই আজকাল লিখছে দেখছি যারা আগেকার কে কি লিখেছে, ভালো জানে না। ফলে সে নতুন কি লিখবে ভেবে পায় না।

উত্তরণ ঃ রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ এদের বাদ দিয়ে এখন যারা লিখছেন, বা বেঁচে আছেন এই অর্থে আপনার প্রিয় কবি ও সাহিত্যিক কে কে? কাদের লেখা পড়তে আপনি পছন্দ করেন?

সুঃ গঙ্গোঃ মুশকিল হচ্ছে কি, আমি তো সকলকে চিনি, সকলের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্বন্ধ আছে। আমি দু'চারজনের নাম বললে বাকিরা দুঃখিত হয়, সুতরাং এই প্রশ্নটা আমি এড়িয়ে যাই। বলতে পারি, অনেকেই আমার প্রিয়।

উত্তরণ ঃ একবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যের ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন আসবে বলে আপনার মনে হয়?

সুঃ গঙ্গোঃ একবিংশ শতাব্দীতে নানারকম পরিবর্তন আসবে এবং সে পরিবর্তনগুলো খুব দ্রুত হবে। বিজ্ঞানের যে ভাবে অগ্রগতি হচ্ছে, ১৮০০ সালের আগে পৃথিবীটা একরকম ছিল, ১৮০০ সালের পর থেকে পৃথিবী অন্যদিকে দ্রুত দৌড়চ্ছে। কাজেই সাহিত্যে বিজ্ঞানের প্রভাব পশ্চিমী জগতে কিভাবে পড়বে সেটা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের সাহিত্যে তার প্রভাব কতটা পড়বে বলা শক্ত। পশ্চিমী জগতে আস্তে আস্তে বই জিনিষটাই উঠে যাবে, এটা এখন পর্দায় লেখা হবে, মানুষ তাই দেখে দেখে শিখবে। আমাদের দেশে এই প্রযুক্তি আসতে তো অনেকদিন সময় লাগবে। আজকের ভারতের সর্বমোট জনসংখ্যার এক শতাংশও ইন্টারনেট ব্যবহার করে কিনা সন্দেহ, অথচ পশ্চিমে সেটা ৮৭ শতাংশ। এটা বিশাল তফাৎ। কাজেই সেখানে একরকম পরিবর্তন হবে, এখানে একরকম পরিবর্তন হবে। আমাদের দেশে শিক্ষার হারটাইতো এখনো অসম্পূর্ণ। আমাদের প্রধান কাজ হবে আগে শিক্ষার বিস্তার করা, তারপর আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কথা ভাববো। এই আমার আশা।

উত্তরণ ঃ বইমেলায় আপনার নতুন কি বই বের হচ্ছে?

সুঃ গঙ্গো ঃ বইমেলায় আমার পুজো সংখ্যায় যেগুলো লিখি প্রতিবারের মত সেগুলো বই হয়ে বেরুচ্ছে। তারমধ্যে ছোটদের জন্য কাকাবাবুর একটি বই বেরুচ্ছে, নাম 'কাকাবাবু ও ছদ্মবেশী'। একটা উপন্যাস লিখেছি, সামান্য সংশোধন করে সেটা বেরুবে, নাম 'অন্য জীবনের স্বাদ'।

আর একটা বই বেরুচ্ছে যেটার প্রতি আমার আগ্রহটা বেশি, সেটা হচ্ছে যে আমি এ পর্যন্ত যতগুলো নাটক, কাব্যনাটক এবং সংলাপ কবিতা লিখেছি সেগুলো একসঙ্গে বই আকারে, সেটার নাম 'নাটক ও কাব্যনাটক সমগ্র'।

উত্তরণ ঃ নিঃসন্দেহে এটা বাংলার একটা খুব কাজের বই হবে। সম্প্রতি পশ্চিমবাংলায় যেটা দেখা যাচ্ছে যে 'Literature for literture's sake'-এর মত একটা ব্যাপার। সাহিত্য শুধুমাত্র সাহিত্যের জন্য হয়ে গেছে। যুবসমাজ পুরোপুরি কেরিয়ারমুখী হয়ে পড়েছে। তাদেরতো একটু ঘরে ফেরানো দরকার। আমরা যারা সে উদ্দেশ্যে কিছু সাহিত্য ও সংস্কৃতির কাজ করছি, তাদের জন্য আপনার পরামর্শ কি?

সুঃ গঙ্গো ঃ এখন কথা হচ্ছে যে এখানে একটা দ্বন্দ্ব আছে। কেউ কেউ মনে করেন যে সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন করতে হবে, আবার কেউ বলেন যে সাহিত্যের কাঁধে এতটা দায়িত্ব দেওয়া উচিৎ নয়, তাতে সাহিত্যের শিল্পরসটা ক্ষুণ্ন হয়। এখন মুশকিল হচ্ছে যে দুটোর একটা ভাবসাম্য রক্ষা করা দরকার। তুমি যদি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বা একটা কিছু প্রচার করার জন্য লেখালেখি শুরু কর, দেখা যায় সেগুলো নিরস হয়ে যায়, লেখাটার সবটাই নষ্ট হয়ে যায়। পড়তে গেলেও তার মধ্যে এমন একটা শিল্পরস থাকতে হবে যা মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করবে। সুতরাং তোমাকে শিল্পসৃষ্টির কথা মাথায় রাখতে হবে। আমরা সামাজিক মানুষ, তাই সমাজের কথা, দেশের জনসাধারণের কথাও মাথায় রাখতে হয়। এ দুটো দিককে মেলাতে যে পারে, সেইই সবচেয়ে ওপরে থাকে। কাজেই শিল্পসাধনা করতে গিয়ে দেশ ও সমাজের কথা ভুললে চলবে না।

উত্তরণ ঃ আপনার কাছে আমাদের শেষ প্রশ্ন, গত শতাব্দীর সেরা সাহিত্যিক কে বলে আপনার মনে হয়।

সুঃ গঙ্গো ঃ নিঃসন্দেহে, কোনরকম দ্বিধা না করে বলা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উত্তরণ ঃ অনেক ধন্যবাদ, আপনাকে, আপনার মুল্যবান সময় আমাদের জন্য ব্যয় করার জন্য।

২৪

প্রিয়লাল রায়চৌধুরী

প্রশ্ন ঃ কবিতা আপনার জন্মভিটে। গদ্য আপনার বেড়াবার জায়গা। আপনি প্রবাসী কেন?

উত্তর ঃ প্রবাসীতো হইনি। কবিতাতেই তো আছি। আগে যখন শুধু কবিতা লিখতাম তখনও বেশি লিখতাম না। এখনও লিখি না। তবে এখন গদ্যটা বেশি লিখি। কবিতা একটু আড়ালে পড়ে গেছে।

প্রশ্ন ঃ আপনার কবিতা আবেগময় এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কবিতার আদর্শ সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

উত্তর ঃ বলা খুব শক্ত। সৎভাবে নিজেকে প্রকাশ করাই কবিতার আদর্শ। আসলে আমরা কবিতার মধ্যে কোন না কোনভাবে আত্মজীবনী লিখছি।

প্রশ্ন ঃ আপনার কবিতার প্রাণধর্ম 'তারুণ্য'। এই শক্তির উৎস আপনার ব্যক্তিগত জীবনে কেমনভাবে নিহিত আছে জানতে ইচ্ছে করে।

উত্তর ঃ এটা কি করে বলব। আমার কবিতায় কি আছে তা তো অন্য লোকেরা বলবে। অকপটে সব বলতে চাই—এটাই আমার একমাত্র ইচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ অনেকে বলেন কবিতা পারিপার্শ্বিকতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে সৃষ্টি হয়। আবার কেউ কেউ বলেন কবিতা আত্মজৈবনিক। আপনার অভিজ্ঞতা কি বলে?

উত্তর ঃ প্রত্যেক কবিতার উল্লেখযোগ্য হল প্রথম লাইন। এই প্রথম লাইন একজন কবির মাথায় কি করে আসে—কেউ বলতে পারে না। এমন একটা লাইন আসে যা কখনও ভাবিনি। পরের অংশটুকু চেষ্টা করে-effort-এ হয়। এই প্রথম লাইনটা রহস্যজনক—ব্যাখার অতীত। আত্মজৈবনিক? হ্যাঁ।

প্রশ্ন ঃ এই সময়কার কবিতা সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

উত্তর ঃ একেবারে সমসাময়িক কবিতায় দেখা যাচ্ছে অনেকেই মোটামুটি পাঠযোগ্য কবিতা লেখে। কেউ কেউ বেশ ভাল লেখে। এখন যে শুধু শহরের ছেলেরাই কবিতা লেখেন তা নয়, গ্রাম থেকেও উচ্চমানের কবিতা পাই। তবে একটা জিনিস কবিদের মনে রাখা উচিত—কবিতার একটা বড় গুণ স্মরণীয়তা। পড়লে যেন দু-একটা লাইন মনে গেঁথে থাকবে। যেটা কবিতায় পাই না।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি মনে করেন না যে একজন কবিকেও তার সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হয়?

উত্তর ঃ কবিতা লিখে মানুষের দুঃখ দারিদ্র্য দূর করা যাবে এটা বিশ্বাস করি না। এই সব উদ্দেশ্য প্রকটভাবে মনে রেখে যা লেখা হয় তা অকবিতা। তাতে সমাজের ও উপকার হয় না। কাব্যসাহিত্যেরও হয় না। যাঁরা খাঁটি কবি কবিতার মধ্যে সমসাময়িক জীবন তারা

ফুটিয়ে তুলতে বাধ্য। তা সার্থক হলেই কবিতার সমাজসেবা হবে।

প্রশ্ন ঃ আপনার লেখায় পড়েছিলাম "Social Realism" অর্থাৎ 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' ব্যাপারটা আপনি বোঝেন না। আপনার সাম্প্রতিক রুশদেশ ভ্রমণের সময় এরকম 'বাস্তবতা' কিছু পেয়েছেন কি?

উত্তর ঃ ওদের দেশের সাহিত্যে আগেকার বিধিনিষেধ আস্তে আস্তে কমে এসেছে। এখন মানুষের হৃদয়ের জটিলতা নিয়ে অনেক লেখাই হচ্ছে যা সবটাই শুধুমাত্র Socialist Realism এর উপর নয়।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি মনে করেন আবৃত্তিযোগ্যতা কবিতার একটি গুণ?

উত্তর ঃ এটা নিয়ে অনেকদিন তর্ক চলছে। কবিতা পাঠ্য না শ্রাব্য। আমার দুটোর দিকেই মত আছে। শুধু একরকম হবে এটা বিশ্বাস করি না। আজকাল আবৃত্তির উপর অনেকখানি জোর দেওয়া হচ্ছে। ভবিষ্যতের যুগ Audio Visual উন্নতির যুগ। এরপর বই না পড়ে মানুষ Video দেখে নেবে। আবৃত্তিশিল্পের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। কবিদের মুখ থেকে কবিতা শোনার একটা ভিন্নতর আবেদন আছে। কিন্তু যারা কবিতা নিয়ে আবৃত্তিচর্চা করছে তাদের আবেদন নিশ্চয়ই শিল্প হতে পারে। অনেকে ধরে নেয় আবৃত্তিকারেরা কবিতার মানে না বুঝে পড়ে। আমি তো অনেক আবৃত্তিকারকে চিনি যাঁরা কবিতা বেশ বুঝে পড়েন।

প্রশ্ন ঃ বিদেশী বহু কবির সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছে, ঘুরেছেনও অনেক দেশ। বাইরের কোনো দেশে কবিতাকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য কবি নন অথচ অন্য ব্যক্তিত্বের সচেষ্ট প্রয়াস লক্ষ্য করেছেন কি?

উত্তর ঃ না; এ জিনিসটা দেখার অভিজ্ঞতা হয়নি। আমি বাইরে দেখেছি শুধু কবি সম্মেলন অথবা নামকরা Actor বা Actress-এর পাঠ।

প্রশ্ন ঃ আপনি একসময় কবিতা আন্দোলন করেছিলেন। সে আন্দোলন সম্পর্কে কিছু বলুন?

উত্তর ঃ আমাদের ঠিক আগে চল্লিশের কবিরা আন্দোলন করেছিলেন। অনেকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে লোকদের কবিতা শোনাত। একজনের নাম খুব মনে পড়ে। অরুণ কুমার সরকার। বেশী দিন চলেনি। পঞ্চাশের দশকে দলবেধে মফস্বলে নানান জায়গায় গিয়ে কবি সম্মেলন করতাম। সম্মেলনে মাঝে মাঝে শম্ভু মিত্র আবৃত্তি করতেন। আবৃত্তিকে popular করেন সব্যসাচী। বহু কবি সম্মেলনে কবিতা আবৃত্তি করেছেন।

প্রশ্ন ঃ আপনি একসময় ছন্দকে বলেছেন 'বয়স্যের তর্জনী'। ছন্দকে কি সত্যিই আপনি এই দৃষ্টিতে দেখেন?

উত্তর ঃ সব যুগের কবিরা ছন্দ নিয়ে experiment করেন। সকলেই ভাঙবার চেষ্টা করেন। আমরাও ভাঙবার চেষ্টা করেছি। কথাটা এই মনোভাবেরই একটা expression. কিন্তু প্রত্যেক কবিরই ছন্দ জানা উচিত এবং জেনে ভাঙচুর করা উচিত।

প্রশ্ন ঃ চল্লিশের দশকের কবিদের বর্তমান কবিতা সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

উত্তর ঃ চল্লিশের কবিদের মধ্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায় চেষ্টা করেছেন একেবারে মুখের কথা দিয়ে কবিতা লিখতে। তাঁর ইদানীং কালের কবিতায় তৎসম শব্দ প্রায় নেই। পরীক্ষাটা তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন। নীরেনদা'ও আগের থেকে অনেক বদলেছেন। কবিতার মধ্যে কাহিনী আনছেন Communication-এর জন্য।

প্রশ্ন ঃ রবীন্দ্রনাথের কবিতা আপনার কেমন লাগে?

উত্তর ঃ রবীন্দ্রনাথ বিরাট প্রতিভাবান কবি। পৃথিবীতে এমন সাহিত্য ব্যক্তিত্ব খুব কমই আছে। আমাদের এখন রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তে ভাল লাগে না। কারণ ভাষা পুরানো হয়ে

গেছে। Abstractionটা কম ছিল। অবশ্য তাঁর সময়ের কথা চিন্তা করলে ঠিক আছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলো লম্বা। আরো ছোট করে লেখা যেতে পারতো। রবীন্দ্রনাথের গান appealing। ছোট ব'লে। গদ্যের রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এখনও খুবই পাঠযোগ্য। আর 'সীমার মাঝে অসীম' বা ব্রহ্ম ইত্যাদি ব্যাপারগুলো অকপট নয়। আসলে ওঁর ছিল আকণ্ঠ সৌন্দর্য্যতৃষ্ণা।

প্রশ্ন ঃ কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা পাঠক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে কতটা প্রিয়?

উত্তর ঃ আমার কোন লেখাই আমার প্রিয় নয়। নিজের কবিতা পড়তে গেলে ত্রুটিগুলো দেখতে পাই। বড্ড অস্বস্তিতে ভুগি।

প্রশ্ন ঃ আপনার কবিতার বহু আলোচিত 'নীরা' কে?

উত্তর ঃ একটা symbol.

প্রশ্ন ঃ আপনার প্রিয় গান বা কবিতা কিছু আছে কি?

উত্তর ঃ 'আমি সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়' গানটি বারবার শুনতে ভাল লাগে। কবিতা 'তুমি তো তুমিই ওগো সেই তব ঋণ'..... খুব ভাল লাগে। ঋণ! এত অপূর্ব ব্যবহার !! কিসের ঋণ বোঝা যাচ্ছে না।

প্রশ্ন ঃ কবিতায় সঙ্গীত বা আলোর ব্যবহার কি আপনার মনঃপূত?

উত্তর ঃ দোষের কিছু নয়। আমেরিকায় ষাটের দশকে দেখেছি কবিতা পাঠের সঙ্গে পিয়ানো, ব্যাঞ্জোর ব্যবহার। আলোর ব্যবহারও হত। তাতে কোন ক্ষতি তো হয়নি। এক ধরনের নতুন কাজ। খারাপ কি ভাল, বলবে ভবিষ্যৎ।

প্রশ্ন ঃ আবৃত্তির কোন Tradition আছে কি?

উত্তর ঃ আবৃত্তির কোন Tradition নেই। কবিতা আমার মতে গান করে শোনানোর চাইতে আবৃত্তি করে শোনানো অনেক ভাল।

প্রশ্ন ঃ আপনাকে নিয়ে দুটো কবিতা সন্ধ্যা হ'ল। কেমন লাগল?

উত্তর ঃ এরপর আমাকে নিয়ে যদি কোন কবিতা সন্ধ্যা হয় আমি যাব না। কারণ—ভাল লাগে না। তাছাড়া নিজের কবিতা অন্যের কণ্ঠে শুনতে বড় বাধো বাধো ঠেকে। মনে হয় ঠিকমত লিখতে পারিনি।

প্রশ্ন ঃ আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন?

উত্তর ঃ না যারা ভগবানে বিশ্বাস করে তারা পাগল। পাগল অর্থাৎ যুক্তিবোধ নেই।

প্রশ্ন ঃ আপনি মৃত্যুভয় করেন?

উত্তর ঃ রিল্কের কথা '৩৫ বছর কেটে যাবার পর যে মৃত্যু চিন্তা করে না, সে নির্বোধ— আমি নির্বোধ নই।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি সুখী?

উত্তর ঃ সুখী। নিশ্চয়ই সুখী। সুখ আর তৃপ্তি এক জিনিস নয়। আমি তৃপ্ত নই।

২৫

● তালিবানদের বুদ্ধমূর্তি ধ্বংসের চেষ্টা সম্পর্কে আপনার প্রতিক্রিয়া কী? কী কারণে তারা এ-সব করছে বলে আপনার মনে হয়?

সুনীল ঃ প্রতিক্রিয়া প্রকাশের জন্য কয়েকটি শব্দ যথেষ্ট নয়। ক্ষোভ-রাগ-গভীর বিষাদ-দুশ্চিন্তা—সবই এক সঙ্গে মিলে-মিশে যাচ্ছে। তালিবানরা যে ধরনের কাজ করছে, যে-সব বিচিত্র ফতোয়া জারি করছে তা শুধু অন্যায় নয়, প্রত্যক্ষভাবে প্রগতির পরিপন্থী। মেয়েদের আটকে রেখে, বোরখা পরতে বাধ্য করে, কাজের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে, পুরুষদের দাড়ি রাখা নিয়ে হুকুম জারি করে একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি তৈরি করছে। ইসলাম ধর্মের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্কে নেই। সামগ্রিকভাবে বললে, ওরা যেন জোর করে সভ্যতার চাকা পেছন দিকে ঘুরিয়ে দিতে চাইছে।

বুদ্ধমূর্তি ধ্বংসের চেষ্টা কোনও সামান্য ঘটনা নয়। নিতান্ত উন্মাদ ছাড়া এমন কাজ কেউ করে না। এই কাজে তাদের দেশের মানুষ-সহ সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কোনও উন্নতি ঘটবে না। ইসলাম ধর্ম তো মাত্র ১৪০০ বছর আগের ঘটনা, কিন্তু মানুষের সভ্যতা তারও অনেক আগে শুরু হয়েছে। প্রত্যেক দেশের নিজস্ব ঐতিহ্য থাকে। ধর্মকে অসুন্দর চেহারায় মাঝখানে টেনে এনে অশান্তি সৃষ্টি করা কোনও দেশের ঐতিহ্যে নেই, থাকতে পারে না। ভারতে অনেক মুসলমান আছেন যাঁরা রামায়ণ-মহাভারত সম্পর্কে রীতিমত অভিজ্ঞ। হিন্দুদের ধর্মাচরণে কখনও কোনও বিরোধিতা তাঁরা করেননি। পীরের দরগায় প্রার্থনা করা নিয়ে ভারতের গ্রামের মানুষদের মনে কোনও ধরনের ভেদবুদ্ধি কাজ করে না। কুচক্রী, মূর্খ ও উন্মাদ না হলে কেউ ধর্ম নিয়ে মারামারি করে না। ইজিপ্টে মানব সভ্যতার পাঁচ-ছ হাজার বছরের পুরনো নিদর্শন আছে, গোটা পৃথিবীর মানুষ আজও অবাক হয়ে সে-সব দেখে থাকে। সেখানকার শাসকরাও প্রধানত ইসলামের উপাসক, কিন্তু সেখানে তো তালিবানদের মত কাণ্ড কখনও ঘটেনি। শুধু বুদ্ধমূর্তি কেন, কোনও ঐতিহাসিক নিদর্শনে হাত দেওয়ার অধিকার কারও নেই। ওদের বুদ্ধমূর্তি ধ্বংসের যুক্তিটাই অত্যন্ত বাজে এবং ক্ষতিকারক। ইসলাম তো নিরাকার, তা হলে মসজিদ তৈরি হয়েছে কেন? আসলে মসজিদ, মন্দির, গির্জা সবই মানুষের সভ্যতার, ইতিহাসের অংশ। এগুলো ধ্বংস করার অধিকার কোনও দেশের কোনও ধর্মোন্মাদদের নেই।

● তালিবান ধর্মোন্মাদদের এই দৃষ্টান্ত মানুষের সভ্যতার পক্ষে কতটা বিপজ্জনক? গোটা পৃথিবীর মানুষের কাছে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশা করছেন?

সুনীল ঃ এই দৃষ্টান্ত খুব, খুবই বিপজ্জনক। এ ধরনের মৌলিক ধ্বংসকার্য কেউ কখনও করেনি তা নয়, কিন্তু আধুনিক পৃথিবীতেও এটা অকল্পনীয় ছিল। সুতরাং অন্য উন্মাদরা উৎসাহ পেলে সর্বনাশ হবে। এ ধরনের কাজে যে উদ্বেগ, তা খুব স্বাভাবিকভাবেই আন্তর্জাতিক। মিশরের 'আসোয়ান ড্যাম' যখন তৈরি হয় তখন সেখানকার একাধিক ঐতিহাসিক স্থাপত্য জলে ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। গোটা পৃথিবীতে তা নিয়ে আলোড়ন ওঠায় তাদের সঙ্গে সঙ্গে অন্য ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল। ঐতিহ্য সংরক্ষণ যদি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ না হয়, তা হলে ইউনেস্কো আমাদের দেশের তাজমহল সংরক্ষণ

নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে কেন? মানুষ মারা যেমন অপরাধ, অন্যায় যুদ্ধ করা যেমন অপরাধ, হাজার হাজার বছরের পুরনো মূর্তি বা ঐতিহাসিক নিদর্শন ধ্বংস করা একইরকম, সম্ভবত আরও বড় অপরাধ। কারণ আর কখনও এ-সব নিদর্শন ফিরে পাওয়া যাবে না।

● আমাদের দেশে তালিবানদের এই কাজের জন্য কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হবে বলে মনে করেন?

সুনীল ঃ প্রতিবেশী কোনও দেশে এই ধরনের অযৌক্তিক, কুৎসিত ঘটনা ঘটলে আমাদের এখানে মৌলবাদীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। আমাদের দেশের সব মানুষকে এ সম্পর্কে সচেতন ও সতর্ক থাকতে হবে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রনীতিতে ধর্মের ঘোষণা থাকায় আমাদের দেশে হিন্দু মৌলবাদ জেগে উঠেছে—এই কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। বলতে পারি, আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতাই এখন টলমল করেছে। এই সঙ্কটে দেশের মানুষের শুভবোধ জাগ্রত থাকবে—এই আশা করছি।

● এই পরিস্থিতিতে ভারত সরকারের ভূমিকা আপনি সমর্থন করেন? কী হওয়া উচিত আমাদের সরকারের নীতি?

সুনীল ঃ আমি ভারত সরকারের বক্তব্য সম্পূর্ণ সমর্থন করি। আমাদের পক্ষে আনন্দের কথা যে, এই সঙ্কটে দেশের সব রাজনৈতিক দল একমত হয়ে তালিবানদের উন্মাদ-চিন্তার নিন্দা করছে। ভারত সরকার যে বুদ্ধমূর্তিগুলো কিনে নিয়ে মিউজিয়ামে রাখার প্রস্তাব দিয়েছে, সেটা অত্যন্ত বাস্তবিক সিদ্ধান্ত। কারণ ওদের দেশে তালিবানরা তো সেখানকার মিউজিয়ামও বোমায় উড়িয়ে দিতে চাইছে।

● হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী—এই পরিস্থিতি কীভাবে স্বাভাবিক হতে পারে? আমাদের দেশের ধর্মীয় গুরুদের ভূমিকা এখন কী হওয়া উচিত?

সুনীল ঃ গোটা পৃথিবীর সঙ্গে আমাদেরও মাথা ঠিক রাখতে হবে। শুভবুদ্ধি-বিবেচনাবোধের প্রয়োগই একমাত্র সমাধান। কোনও ধরনের ভেদবুদ্ধির কোনও স্থান নেই। প্রতিশোধস্পৃহায় কেউ যেন মসজিদ, মুসলিম স্থাপত্যের গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত না দেয়, সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে। এই কাজে সরকার-সহ দেশের সব মানুষের নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে। আমাদের এই বিশাল দেশে অসংখ্য মুসলমান জ্ঞানী, শিক্ষিত মানুষ আছেন। তাঁদের উচিত হবে অবিলম্বে পরিষ্কার ভাষায় তালিবানদের কাজের নিন্দা করা। হিন্দু ধর্মের গুরুস্থানীয় ব্যক্তিত্ব-সহ আমাদের মত সাধারণ মানুষদের কাজ হবে দেশবাসীকে বলা, বোঝানো যে তালিবানদের এই কুকীর্তি উন্মাদের মত আচরণের জন্য ভারতীয় মুসলমানেরা কোনওভাবেই দায়ী নন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তিশালী দেশগুলোর কাজ হবে অবিলম্বে তালিবানদের এই ভয়ঙ্কর কাজ থেকে নিবৃত্ত করা, প্রয়োজনে যুদ্ধের হুমকিও দিতে হবে। আর নীতিগতভাবে প্রতিবাদ জানানো প্রয়োজন রাষ্ট্রসংঘ-সহ সব ছোট-বড় দেশেরই। এ কাজে যেন দেরি না হয়। কারণ এরই মধ্যে ধ্বংসের কাজ শুরু হয়ে গেছে। মনে রাখতে হবে, উন্মাদদের আচরণে কখনও গতির অভাব হয় না।

২৬

তৎকালীন ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহাকুমার মাইজপাড়া গ্রামে ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন কবি-কথাসাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। বাংলা কবিতার ওপর প্রথম ভিন্নমাত্রিক অভিঘাত করেন তাঁর 'কৃত্তিবাস' কবিতা-পত্র সম্পাদনার মাধ্যমে--যার যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৫৩ সালে। প্রথম জীবনে কবিতার জন্য তিনি জাগতিক জীবনের যে-কোনো প্রাপ্তিকেই হেলায় তুচ্ছজ্ঞান করেছেন, ভেসেছেন নিজের গণ্ডির ভেতরে-বাইরে আপার বাউণ্ডুলেপনার স্বকীয় সৃজনশীলতায়।

'কৃত্তিবাস' প্রকাশনার উত্তরোত্তর ঋণের বোঝা কমাতেই উপন্যাসের জন্য প্রথম কলম ধরেন। অতঃপর বাকিটুকু হয়ে ওঠে বাংলা সাহিত্যের অভাবিত ইতিহাস। বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় তরুণ সুনীলের পরপর দুটি উপন্যাসকে চলচ্চিত্রে রূপদান করেন।

শিলালিপি : সুদীর্ঘকাল সাহিত্যের সব শাখায় সমান গুরুত্বে কাজ করতে গিয়ে সাহিত্য সম্পর্কে এই বয়সে এসে আপনার সম্যক উপলব্ধিটা কী রকম?

সুনীল : উপলব্ধির কথা তো মুখে বলা যায় না। উপলব্ধিকে উপলব্ধি করতে হয়। ১৫ বছর বয়সে আমার প্রথম লেখা ছাপা হয়েছিল। তার মানে ধরো, ষাট বছর ধরে লেখালেখি করছি।

শিলালিপি : একজন লেখক তাঁর লেখার টেবিলে যখন চরিত্র সৃষ্টি করেন, ঘটনাপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করেন, তখন তাঁর ভেতরে যে সৃজনশীলতার আনন্দ অনুভব হয়, তা কি কল্পনায় ঈশ্বরের সৃজন-আনন্দের মতোই?

সুনীল : ঈশ্বরের তুলনা করে কোনো লাভ নেই। শিল্পীরা নানারকম সৃষ্টির মধ্যে এক রকম আনন্দ তা অবশ্যই পান। আবার অনেক সময় সেটা জীবিকার ক্ষেত্রেও কাজে লেগে যায়। আমরা যে ভাবি, শুধু আনন্দের জন্য সৃষ্টি তা তো নয়। প্রফেশনালিজম কথাটা বাংলায় শুনতে খারাপ লাগে। আবার চমকে উঠে ভাবি—এ কী! উনি টাকা-পয়সার জন্য লিখছেন। বিদেশে কিন্তু অ্যামেচার আর প্রফেশনাল লেখকদের মধ্যে সুস্পষ্ট তফাৎ আছে।

শিলালিপি : সাহিত্যিকদের জীবনে অমোঘ অনিশ্চয়তা কি তাঁর সৃজনশীলতাকে সমৃদ্ধ করে বলে মনে করেন?

সুনীল : আমি তা মনে করি না।

শিলালিপি : এলোমেলো বোহিমিয়ান জীবন?

সুনীল : এটা যার যার নিজস্ব পদ্ধতি। ওটা কেউ ঠিক করে দেয় না বা ওভাবে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ কি এলোমেলো জীবনযাপন করতেন? জীবনানন্দ দাশও মোটেই এলোমেলো জীবনযাপন করতেন না, কিন্তু আবার শরৎচন্দ্র করতেন। নজরুল করতেন।

শিলালিপি : এলোমেলো জীবনযাপন ব্যাপারটা না হয় ইচ্ছাকৃত, কিন্তু জীবনের অমোঘ অনিশ্চয়তার তো কারো হাত থাকে না।

সুনীল : ইচ্ছাকৃত নয়। ওটা ওর ধাতুর মধ্যে রয়েছে। শক্তি চট্টোপাধ্যায় ওরকম ছটফট না করে থাকতে পারবে না। আবার শঙ্খ ঘোষ শান্তভাবে থাকবে, এগুলো ইচ্ছাকৃত নয়, এগুলো তার স্বভাবের মধ্যেই আছে।

শিলালিপি : প্রথম জীবনের অমোঘ অনিশ্চয়তার অভিজ্ঞতা অনেক লেখককে ভীষণভাবে সমৃদ্ধ করেছে। আপনাকেও। *অর্ধেক জীবনে* যেমনটি আমরা পাই। একদিকে বেকার জীবনের হীনমন্যতা, অন্যদিকে... আপনি কি মনে করেন, মানুষের জীবনের অনিয়ন্ত্রিত অনিশ্চয়তা ভালো লেখক হওয়ার অন্যতম অনুঘটক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে?

সুনীল : ওই সময় পরস্পরবিরোধী দুটি কাজ করে। একটা হচ্ছে—বেকার জীবন; লোকের কাছে অপমানিত হতে হচ্ছে, প্রত্যাখ্যাত হতে হচ্ছে। সেই সঙ্গে একটা তেজও থাকে—ধুত্তুরি, এসব কিছুই আমি গ্রাহ্য করি না। আমি সব ভেঙেচুরে দেব। দুই রকমই কাজ করে। অনিশ্চিত জীবন আমি তো ইচ্ছাকৃতভাবে বেছে নিয়েছি। ধরো, একটা সময়ে স্কলারশিপ পেয়ে আমেরিকা চলে গেলাম। সেই সময় আমেরিকায় থেকে যাওয়া তো খুবই সহজ ছিল। কিন্তু বাংলা ভাষার টানে আমি ফিরে আসি। তখন এখানে জীবিকা নির্বাহ করা ভীষণ কঠিন ছিল। আমেরিকা থেকে ফিরে এসে আমি কী করব, না করব, কিছুই জানি না। চাকরিবাকরি কিছুই ছিল না। তবুও ফিরেছিলাম ঝুঁকি নিয়ে। এমনও হতে পারত, দেশে এসে কিছুই করতে পারলাম না, লেখাটেখা কারো কিছুই পছন্দ হল না। না খেতে পেয়ে মরে গেলাম—তাও হতে পারত।

শিলালিপি : এর সঙ্গে এটা কি আমরা বলতে পারি যে বড় প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে আপনার সৃষ্টিকর্মের মূল্যায়ন এমনভাবে এত সহজে নাও হতে পারত?

সুনীল : দেখো, পৃষ্ঠপোষকতা তো এমনি এমনি হয় না। বড় প্রতিষ্ঠান তো কাউকে পোষ্যপুত্র রাখে না। সেখানে তোমার যোগ্যতা প্রমাণ করতে হয়। ধরো, আমার প্রথম লেখা তো আমি ডাকে পাঠিয়েছি এবং ছাপা হয়েছে। সুযোগ আবার কী!

শিলালিপি : কিন্তু আমরা দেখতে পাই, বড় বড় প্রতিভা আছে—যারা বড় কোনো প্রতিষ্ঠানের ধ্বজাধারী না বলে অনেক ক্ষেত্রেই যথার্থ মূল্যায়ন পান না, বেশি মানুষের কাছে সহজে পৌঁছান না?

সুনীল : এটা ঠিকই যে কোনো কোনো লেখকই থাকেন এমন যাঁরা কোনো প্রতিষ্ঠানে যেতে চান না, যাঁরা প্রতিষ্ঠানবিরোধী হন। কেউ কেউ ছোট কাগজে লিখতে, নিভৃতে থাকতে ভালোবাসেন। আবার কেউ কেউ চান, আমার লেখা যাতে বেশি লোক পড়ে সেজন্য আমি বড় জায়গায় যাব। একেকজন লেখকের মানসিকতার ওপর এসব নির্ভর করে।

শিলালিপি : একজন মহৎ কবির জন্মের জন্য মহৎ অডিয়েন্স বা পাঠকমণ্ডলী দরকার। হুইটম্যানের এ ভাবনার সঙ্গে আপনি কতটা একমত?

সুনীল : এ কথা অনেক লেখকই বলেছেন, শুধু হুইটম্যান নন, টি এস এলিয়টসহ আরো অনেকেই। পাঠক সমাজ যতটা তৈরি, সাহিত্য ঠিক ততটাই হবে। যদি পাঠক সমাজের রুচি নিচের দিকে থাকে তাহলে উচ্চমার্গের সাহিত্য সৃষ্টি হবে না।

শিলালিপি : আপনার নিজের ক্ষেত্রে কি কথাটা সত্য? অর্থাৎ আপনার নিজের পাঠক সমাজ যদি নিম্নরুচির হয় তাহলে আপনার দ্বারাও কি উচ্চমার্গের সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হবে না?

সুনীল : নিশ্চয়ই। আমরা তো কতগুলো জিনিস লিখতে পারি না। ইচ্ছে করে, তবুও পারি না। কারণ সেসব লেখা, বিশেষ করে কেউ পড়বে না বা বুঝবে না।

শিলালিপি : শুধু পাঠকদের জন্যই সাহিত্য সৃষ্টি। অর্থাৎ পাঠক-অডিয়েন্সের গ্রহণযোগ্যতায় প্রশ্ন থাকলে তা লেখা যাবে না? আর বেশিরভাগ নাই-বা বুঝতে পারল, উত্তর-প্রজন্মও তো না বুঝে ওঠা লেখার ভেতর সার্থক শিল্পরস খুঁজে পেতে পারে। তাদের কথা ভেবেও কি লেখা যায় না?

সুনীল : আমাদের মতো লেখক যারা অর্থাৎ পত্রপত্রিকায় লেখা না দিলে আমাদের মারবে ধরে (হেসে)। আমদের তো উপায় নেই যে একলা বসে বসে নিভৃতে এক্সপেরিমেন্ট করে লিখতে পারি। মানে যাকে বলে একদম অ্যাবসট্রাক্ট লেখা। যার মানে বোঝা দুরূহ। সেই লেখা কি আমরা লিখতে পারি? সেজন্য আমরা করি কী, অন্য অনেক লেখার মধ্যে আমাদের সেই অ্যাবসট্রাক্ট ভাবনাগুলো একটু একটু করে মিশিয়ে দিই।

শিলালিপি : তার মানে, আপনি লিখতে চান ঠিকই, কিন্তু পাঠক সমাজের গ্রহণযোগ্যতার অভাব বোধ থেকে পিছিয়ে আসেন...

সুনীল : তুমি একটা লেখা লিখলে কিন্তু কেউ তা বুঝল না, তা হলে তা লিখে লাভটা কী? এটা কবিতার ক্ষেত্রে হয়। কবিতা কয়টা লোক বোঝে? কবিতার মধ্যে এই বিমূর্ত ভাবটা থাকে। আর কবিরা জানেন আমার বেশি পাঠকের দরকার নেই।

শিলালিপি : আপনার 'কবি' ও 'কথাশিল্পী' সত্তার মধ্যে কোনটাকে বেশি সৃজনশীল ও আনন্দদায়ক বলে মনে করেন?

সুনীল : আনন্দদায়ক যদি বলো তবে 'কবি'সত্তা। কথাসাহিত্যে তো বড্ড পরিশ্রম করতে হয়, তাই না?

শিলালিপি : আপনার কাছে লেখালেখির আনন্দ ও কষ্টসাধ্য শ্রমের মধ্যে আনুপাতিক অনুভূতিটা কী করম?

সুনীল : লেখালেখিটা কষ্টেরই, আনন্দের নয়। শারীরিক কষ্ট, মানসিক কষ্ট। কষ্টের বোধ সবচেয়ে বেশি। তবে লেখাটা শেষ হতে পারে। একটানা কোনো দুঃখ ও কষ্ট কবিতার ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোনো না কোনো অতৃপ্তি বা দুঃখবোধ লেখার মধ্যে চলে আসে। লেখার মধ্যে উচ্ছলতা-আনন্দ-টগবগে ভাব সহজে থাকে না।

শিলালিপি : আর বাংলাদেশের পাঠকমহল ও ভারতীয় বইয়ের বিশাল বাজার নিয়ে....

সুনীল : বাংলাদেশে ভারতীয় বইয়ের বিশাল বাজার নিয়ে কী বলব? আমার তো সব বই-ই ওখানে পাইরেট করে বিক্রি হয়। সারা বাংলাদেশেই সেই জাল বই ছেয়ে গেছে। এমনও দেখা গেছে, যে বইটা এখানে প্রকাশ পায়নি, এমন বইও ওখানে বেরিয়ে যাচ্ছে। যেমন ধরো, আমি 'রানু ও ভানু' নামে একটা উপন্যাস পূজা সংখ্যায় লিখেছিলাম, সেটা আমি আনন্দ পাবলিশার্সকে দিয়ে বলেছিলাম, এক্ষুনি বই করবে না, একটু দাঁড়াও, আমি কিছু সংশোধন করব, তারপর বই বেরোবে। কিন্তু বাংলাদেশে পূজা সংখ্যা থেকে উপন্যাসটি বই আকারে ঠিক বেরিয়ে যায়।

শিলালিপি : কিন্তু বাংলাদেশের বই তো এখানে বিশেষ আসে না।

সুনীল : আসে না—তা তো নয়; কোনো বাধা তো নেই। এখানে পাঠক সৃষ্টি করতে হবে। এখানে তো পত্রপত্রিকায় বাংলাদেশের লেখকদের লেখা বেরোয়...এর আগে 'দেশ' পত্রিকায় পূজা সংখ্যায় হুমায়ুন আহমেদের লেখা বেরিয়েছে অনেক।

শিলালিপি : কিন্তু সেটা মনে করা হয় বাংলাদেশে হুমায়ুন আহমেদের বিশাল জনপ্রিয়তার জন্য। সেই জনপ্রিয়তার রেশ ধরে 'দেশ' পত্রিকার বাড়তি কাটতির জন্য...

সুনীল : কিন্তু এটাও তো সত্যি, এ দেশের পাঠকদের কাছে হুমায়ুন আহমেদকে উপস্থাপন করা হচ্ছে। আর 'দেশ' এখানেই সর্বাধিক বিক্রি হয়।

শিলালিপি : দু' একজন, যেমন হুমায়ূন আহমেদকে দিয়ে কি পাঠকদের প্রকৃত মন জয় হচ্ছে?

সুনীল : বাংলাদেশের পাঠকদের সার্বিক মন জয় করে ছাপা সম্ভব হয় না—এটা যেমন সত্যি, তেমনি এখানকার পাঠকদের কাছে ওইসব লেখক পরিচিত হয়ে উঠছে, তাতে এখানে তাদের একটা বইয়ের বাজার তৈরি হতে পারে। শামসুর রাহমান থেকে শুরু করে এখন অনেকের বই-ই ছাপা হয়, বিক্রি হয়। আগে যেমন বলা হতো একেবারেই বিক্রি হয় না, সেটা কিন্তু এখন আর সত্য নয়; হয়তো তা খুব বেশি নয়। তার জন্য আগে এখানে মার্কেট তৈরি করতে হবে।

শিলালিপি : সম্পাদকের চাপে লিখে যাচ্ছেন, অনেকটা ঠিকাদার লেখা; ক্লান্তি আসে না?

সুনীল : কী বলছ, ঠিক বুঝতে পারছি না।

শিলালিপি : মানে, কিছু লেখা আছে, যা ঠিকাদারি গোত্রের লেখা, চাপে পড়ে লেখা. সম্পাদকের ফরমায়েশি লেখা যাকে বলে...

সুনীল : কী ধরনের লেখা?

শিলালিপি : গল্প-উপন্যাস কবিতা। ধরুন উপন্যাস...

সুনীল : সম্পাদকের চাপে পড়ে এখন আর আমি উপন্যাস লিখি না।

শিলালিপি : আগে তো লিখেছেন যথেষ্ট।

সুনীল : সে তো অল্প বয়সে যখন আমার দারিদ্র্য ছিল, খাওয়া-পরার সমস্যা ছিল, লিখে আমার খেতে হতো, তখন অনেক লিখেছি। ছোটখাটো সিনেমা পত্রিকায়, অমুক পত্রিকায়, তমুক পত্রিকায়। অনেক লেখা হয়তো হালকা হয়েছে। তবে ওরকম একটা লেখা বেশি জনপ্রিয় হয়ে গেছে। যেমন ধরো 'অরণ্যের দিনরাত্রি'। সেটা আমি হেলাফেলা করে আমার পত্রিকার (কৃত্তিবাস) ধার মেটানোর জন্য লিখেছিলাম। সেটাই সিনেমা হলো, জনপ্রিয়ও হলো খুব। কাজেই হেলাফেলা করে লেখাও কখনো কখনো উত্তীর্ণ হয়। এখন অবশ্য আমি ওরকমভাবে সম্পাদকদের অনুরোধে কিছু লিখি না। এখন আমি যা লিখি স্বতঃস্ফূর্তভাবে লিখি।

শিলালিপি : মনে হয় না কখনো, আপনার লেখায়-ভাবনায়-সৃজনশীলতার রিপিটেশন হচ্ছে? পৌনঃপুনিকতা আসছে?

সুনীল : যদি পাঠকদের মনে হয়, হতে পারে, তাহলে লিখব না।

শিলালিপি : আপনার নিজের কী মনে হয়? পৌনঃপুনিকতা কি আপনাকে আবদ্ধ আছে?

সুনীল : মনে তো হয় না। আমি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দিক ও বিষয়বস্তু নিয়ে বৈচিত্র্যময় লেখা লিখি।

শিলালিপি : পাঠক হিসাবে আপনার নিজের লেখার সমালোচনা কীভাবে করবেন?

সুনীল : নিজের লেখার সমালোচনা তো এক লাইনে বলতে পারি—সার্থক লেখা একটাও এখনো লিখতে পারিনি। আমাকে যখন প্রশ্ন করা হয়, নিজের কোন লেখাটা আপনার পছন্দ—আমি উত্তরে বলি, যে লেখাটা এখনো লেখা হয়নি।

শিলালিপি : এমন কোনো লেখার কথা জানতে চাইছি—যা লিখতে না পারার যন্ত্রণা বয়ে বেড়ান।

সুনীল : অনেক আছে। অনেক কবিতা মাথায় আসে—যা শেষপর্যন্ত লেখাই হয় না। গদ্য লেখারও অনেক বিষয়বস্তু মাথায় ঘোরে, কিন্তু মনে হয়, আমি তার উপযুক্ত নই এখন। এখনো ঠিকঠাক তৈরি হয়ে উঠতে পারিনি। এখন অনেক আছে।

শিলালিপি : খুব আত্মতৃপ্তি পেয়েছেন এমন একটি লেখার নাম...

সুনীল : শোনো, আত্মতৃপ্তি হচ্ছে মৃত্যুর সমান। যেই লেখক মনে করে—আহ্ খুব ভালো লিখেছি—যা যা লিখেছি দারুণ লিখেছি—সেই লেখক আর এগোতে পারে না।

শিলালিপি : *সেই সময়, প্রথম আলো* ও *পূর্ব পশ্চিম*—এই তিন ঐতিহাসিক ট্রিলজির পরবর্তী অর্থাৎ পূর্ব পশ্চিমের পরবর্তী পটভূমির আর কি কোনো উপন্যাস আমরা পেতে পারি?

সুনীল : আমার চেষ্টা আছে। শেষ আরেকটা লিখে যাব আশা করছি। খুব বড় একটা পরিকল্পনা আছে। দেখা যাক কতটা পারি। পাঁচ পুরুষের কাহিনী লিখব। ধরো, আমার ঠাকুরদাদা থেকে শুরু করে অর্থাৎ আমার ঠাকুরদাদা, আমার বাবা, আমি, আমার ছেলে এবং আমার নাতি—এই যে বিরাট বিবর্তন হয়েছে...; আমার ঠাকুরদাদা গ্রামের টোলের পণ্ডিত ছিলেন, আর আমার নাতি জন্ম থেকেই আমেরিকার নাগরিক। কত বড় পরিবর্তন! এই সময়কালটাও তো প্রায় ১০০ বছরের ওপরে। এটা নিয়ে একটা লেখার ইচ্ছে আছে। এতে কিন্তু আমি আমার পরিবারের কথা লিখব না। তুলনা দিলাম, কিন্তু কাল্পনিক...

শিলালিপি : অর্থাৎ আপনাদের এই পাঁচ প্রজন্ম যে 'সময়'টাতে জীবনধারণ করেছেন, সেই সময়কাল পৃথিবীর যে বিবর্তন—পাঁচ পুরুষের ভেতর দিয়ে সেটাকে তুলে ধরবেন?

সুনীল : হ্যাঁ।

শিলালিপি : মানুষকে পৃথিবীর জন্য কতটা বিপজ্জনক বলে মনে করেন?

সুনীল : পৃথিবী তো বেশ অনিরাপদ হয়ে গেছে। এই পৃথিবীর পরিবেশ সবচেয়ে বেশি নষ্ট করেছে মানুষ। হিংসা আর এত অস্ত্র সংগ্রহ করেছে, সেগুলো শেষপর্যন্ত মানবজাতির জন্য আত্মঘাতী হয়ে দেখা দিতে পারে।

শিলালিপি : কয়েক বছর আগে দেশ পত্রিকার আপনার লেখা 'রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার অতঃপর পুনরাবিষ্কার' শিরোনামে একটি লেখা পড়লাম। আপনাদের প্রথম জীবনে এই যে রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করা এবং পরে তাঁকে..

সুনীল : ব্যাপারটা কী ছিল জানো, রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করার কারণটা ছিল এই...ঠিক রবীন্দ্রনাথ না; আমি তো অনেক জায়গায় লিখেছি—তখন তো আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিতা মুখস্থ করতাম, রবীন্দ্রনাথের গান গাইতাম অথচ মুখে রবীন্দ্রনাথের নিন্দা করতাম। তার কারণ হচ্ছে, তখনকার দিনের যারা রবীন্দ্রভক্ত, তারা সব সময় এমন একটা ভাব করত যে রবীন্দ্রনাথের পর আর কিছু হবে না। রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা সাহিত্যে আর যেন কিছু নেই! তরুণ লেখকরা কিছুই লিখতে পারে না। তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার জন্যই রবীন্দ্রনিন্দা ছিল আমাদের সেই ক্ষোভের প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের লেখার বিষয়ে কোনো ক্ষোভ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ তখনো আমাদের যেভাবে মুগ্ধ করত এখনো করে। তা ছাড়া এখন সেই অবস্থাটা চলে গেছে। এখন আর কেউ রবীন্দ্রনাথই শেষ কথা বলে মাথা ঘামায় না। এমন তো রবীন্দ্রনাথকে ক্লাসিক্যাল পর্যায়ে ফেলা হয়েছে। ক্লাসিক্যাল পর্যায়ের লেখকদের সঙ্গে তো দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে হয় না। তাদের মাথায় রেখে দিলেই হয়। এ জন্য রবীন্দ্রনাথের লেখা এখন আবার নতুন করে পড়লে আমার বেশ ভালো লাগে।

শিলালিপি : এমন লেখার পরিমাণ কতটা—যেসব লেখা ছাপা আকারে দেখে আপনার কষ্ট হয়েছে, লজ্জা লেগেছে?

সুনীল : অনেক আছে। কোনো লেখাই আমাকে তেমন সন্তুষ্ট করে না—সে তো আগেই বলেছি। তা ছাড়া অনেক লিখলে...অনেকে তো বলেন, রবীন্দ্রনাথের চেয়েও আমি বেশি পাতা লিখে ফেলেছি, সেই লেখার মান যেমনই হোক। কত লেখা কত জায়গায় ছড়িয়ে আছে তা আমি নিজেও জানি না। এর মধ্যে অ-নে-ক লেখা আছে খুবই দুর্বল, পাতে দেওয়ার যোগ্য নয়।

শিলালিপি : মহাকাব্যিক ঢঙে উপন্যাস আপনার হাতে যেভাবে, যে বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনায় সৃষ্টি হয়—তাতে আমাদের আকাঙ্ক্ষা আরো বেড়ে যায় যে এমন ঐতিহাসিক লেখা যদি আপনার কাছ থেকে আরো পাওয়া যেত!

সুনীল : ইতিহাসের চরিত্রদের নিয়ে উপন্যাস লেখা অনেক পরিশ্রমের কাজ। এবার ঐতিহাসিক পটভূমিতে একটা গল্প লিখেছি। অনেকেই বলছেন, এসব তো আগে জানতাম না! আমি লিখেছি, বার ভুঁইয়াদের মধ্যে কেদার রায় এবং ঈশা খাঁ—এদের দুজনের খুব বন্ধুত্ব ছিল। এরা যদি একসঙ্গে

লড়াই করত তবে অনেক কিছু করতে পারত। কিন্তু পারল না। গল্পটার মধ্যে আছে, ঈশা খাঁ করল কী কেদার রায়ের বিধবা বোনকে জোর করে বিয়ে করল। সেই বিয়ের কারণে দুজনের ঘোর শত্রুতা শুরু হয়ে গেল। কী দুঃখের কথা! ওরা একতাবদ্ধ হলে হয়তো মোগলের বিরুদ্ধে জিততেও পারত। প্রথমে তাই করেছিল। কিন্তু পরে ওই বিয়ের কারণে দুজনে জাতশত্রুতে পরিণত হলো। তাতে দুজনের সমূহ ক্ষতি হলো। এক পর্যায়ে দু জনই ধ্বংস হয়ে গেল। গল্পটার নাম—'কীর্তিনাশার এপারে-ওপারে'—পদ্মার এক নাম কীর্তিনাশা। সেই কীর্তিনাশা তাদের সব কীর্তি ধুয়েমুছে শেষ করে দিয়েছিল।

শিলালিপি : নতুন করে জীবন সাজানোর সুযোগ পেলে কী কী সংশোধনী আনতে দ্বিধা করতেন না?

সুনীল : আমি যে জীবনটা কাটিয়েছি—তাতে আমার কোনো অনুতাপ নেই। বেশ ভালোই কাটিয়েছি। তবে নতুন করে জন্ম নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হলে মেয়ে হয়ে জন্মাতাম। পুরুষ জন্মটা দেখলাম, মেয়েদের জীবনটা কেমন—সেটা দেখতাম। যদিও জানি এটা একটা হাইপোথেটিক্যাল কোশ্চেন, তবুও বলছি।

শিলালিপি : 'বিবাহ' নামক প্রতিষ্ঠানের প্রতি আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কী রকম?

সুনীল : 'বিবাহ' তো একটা কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান, প্রকৃতি প্রদত্ত না, জোর করে সমাজের ওপর চাপিয়ে দেওয়া। উত্তরাধিকারের ব্যাপারটা ঠিক রাখার জন্য। না হলে জীবজন্তুদের ভেতরে যেমন বিবাহ নেই মানুষের ভেতরে তা থাকার কথা না। জীবজন্তু থেকে মানুষ তো প্রকৃতিগতভাবে আলাদা কিছু না। মানুষও তো একটা জন্তু। বিবাহ শুধু সামাজিক সুবিধার জন্য রাখা হয়েছে, সম্পত্তির জন্য। জীবজন্তুদের তো সম্পত্তি নেই, তাই বিবাহও নেই।

শিলালিপি : বিবাহপ্রথায় বিশ্বাসী নন, কিন্তু বিবাহিত, এই সুদীর্ঘ বিবাহিত জীবন সম্পর্কে যদি কিছু বলেন...

সুনীল : জানো তো, আমার বিবাহিত জীবনটা খুব ভালো। আমি অন্যদের দিকে তাকিয়ে দেখি তাদের অনেকেরই দাম্পত্য জীবনে কত অদ্ভুত সব অশান্তি বাসা বাঁধে। তা বউয়ের সঙ্গে আমার ভালোই সম্পর্ক। অনেক দিন তো হয়ে গেল।

শিলালিপি : যোগ্য সহধর্মিণী...

সুনীল : যোগ্য কি না জানি না, আমি তার যোগ্য কি না তাও জানি না। এমনও তো হতে পারে, সে হয়তো আমার চেয়ে ভালো। কিন্তু আমাদের দুজনের মধ্যে বেশ ভাব আছে। আর স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা—তোমাদের তো সবে শুরু হলো—বেশি দিন বিবাহিত জীবনযাপনের পর যদি দেখা যায়, তাদের মধ্যে তখনো বেশ ইয়ার্কির সম্পর্ক আছে, দুজন দুজনকে নিয়ে মজা করছে—তাহলে বুঝবে ভালো আছে। আর যদি দুজনই ফরমাল হয়ে যায় বা গম্ভীর হয়ে থাকে এবং দিন দিন তা বাড়তে থাকে—সেটা খুব খারাপ লক্ষণ। আমার স্ত্রীর সঙ্গে, জানো তো, এখনো আমার বেশ ইয়ার্কি-ঠাট্টা চলে।

শিলালিপি : স্ত্রীর পর আপনার জীবনে আর কে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে?

সুনীল : (হেসে) সেটা বলব কেন? সেটা বলব কী! পারিবারিকভাবে বললে মায়ের কথা...

শিলালিপি : বাংলাদেশ তো আপনার কাছে ভীষণ নস্টালজিক জায়গা। যেমন কয়েক দিন আগে আপনার একটা লেখায় পড়লাম যদি বর্ধমানের কোনো প্রত্যন্ত গ্রামে আপনার জন্ম হতো তাহলে সেই জন্মভিটা নিয়ে আপনার মনে কোনো আদিখ্যেতাই থাকত না। যেহেতু মাদারীপুরের মাইজপাড়ায় আপনার জন্ম, শৈশবও কেটেছে এবং সেটা এখন একটা ভিন্ন দেশ, তাই চাইলেও এখানে সহসা যাওয়া সম্ভব নয়—এই টানাপোড়েন আপনাকে খুব যন্ত্রণা দেয়?

সুনীল : হ্যাঁ, ঠিকই, শৈশব মানুষের কাছে ভীষণ মধুর। আর মানুষ যা সহজে পায় তার প্রতি

আসক্তি এবং আকর্ষণ কম থাকে। উল্টোভাবে যা আমার নিজের তা দুর্লক্ষ্য হয়ে গেলে কষ্ট তো লাগবেই।

শিলালিপি : আপনার সেই জন্মভূমি বাংলাদেশ, স্বপ্নের বাংলাদেশ আপনার চোখে কী রকম হলে ভালো লাগবে?

সুনীল : বাংলাদেশের যখন জন্ম হয় তখন আমাদের অন্যরকম একটা আশা ছিল। আমাদের শুধু নয়, বাংলাদেশের বহু মানুষ, যারা কোনো না কোনোভাবে দেশ স্বাধীনের লড়াইয়ে নেমেছিল, আশা করেছিল যে এটা একটা স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ তো হবেই; এখানে বাংলা ভাষার প্রকৃত মর্যাদা রক্ষিত হবে, বাংলা সংস্কৃতির মর্যাদা রক্ষিত হবে, বাঙালিরা অর্থনৈতিকভাবে আরো সমৃদ্ধি অর্জন করবে এবং ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে প্রগতির পথে এগিয়ে যাবে। তার অনেক কিছুই হয়নি। ভারতেও যেমন স্বাধীনতার পর আমরা যা যা আশা করেছিলাম, তা তো হয়নি। অনেক কিছুই হয়নি।

শিলালিপি : আপনি যখন আপনার খোলামেলা বা বিতর্কিত ভাবনাগুলোকে প্রকাশ করতে ভয় পান, যখন আপনার মনে হয় যে আপনার ভেতরটা স্বআরোপিত বা বাধ্যগত কিছু নিষেধাজ্ঞার ঘেরাটোপে বন্দি হয়ে আছে—তখন আপনার সেই ভাবনাগুলোকে আপনি কতটা কবিতায় এবং কতটা পদ্য বা, গল্পে বা উপন্যাসে প্রকাশ করেন?

সুনীল : আমি একটা জিনিসই ভয় পাই, সেটা হচ্ছে ধর্মীয় সমালোচনা। আমার মনের মধ্যে ধর্ম সম্পর্কে অনেক বক্তব্য আছে। কিন্তু সব সময় এটা লিখে প্রকাশ করি না। তার কারণ হচ্ছে, আমি একটা জিনিসকে খুব ঘৃণা করি—দাঙ্গা। আমার লেখার কারণে যদি কোনো দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়, তবে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে। আমি চাই না, আমার লেখার জন্য একটাও নিরীহ প্রাণ নষ্ট হোক। আসলে ধর্ম জিনিসটাকে নিয়ে আমি যতটা লিখতে পারতাম, ততটা লিখি না। এই একটা বিষয় বাদ দিয়ে আর কোনো বিষয়ে আমার কোনো ভয় নেই।

শিলালিপি : আপনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

সুনীল : তোমরাও ভালো থেকো।

২৭

প্রশ্ন : রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা সাহিত্যে আর কোনও নোবেল পুরস্কার নেই কেন?

উত্তর : অনেক বাঙালি লেখকই নোবেল পুরস্কার পেতে পারতেন। অনেকে মানে, আমি বলব অন্তত রবীন্দ্রনাথের পর শরৎচন্দ্রের কথা তো উঠেইছিল। তাছাড়া তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ি অথবা জীবনানন্দ দাশ—আমার মতে এঁরা যে কেউই নোবেল পুরস্কার পেতে পারতেন।

প্রশ্ন: তাহলে কেন পেলেন না ওঁরা?

উত্তর: নোবেল পুরস্কার দেওয়ার পদ্ধতিটাই যে এখন বদলে গিয়েছে। আগে যেমন কমিটির মেম্বাররা নিজেরাই খোঁজখবর করতেন। রবীন্দ্রনাথকে বলতে গেলে ওঁরাই খুঁজে বার করেছিলেন। ইংল্যান্ড থেকে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের খানিকটা পরিচিতি হয়েছিল।

প্রশ্ন: অর্থাৎ নোবেল পুরস্কার পেতে হলে পশ্চিমী জগতে পরিচিতিটা জরুরি?

উত্তর: তা তো ঠিকই। পশ্চিমী জগতে পরিচিতি না পেলে যেন ঠিক হয় না। এখন তো আবার সুপারিশের ব্যবস্থা চালু হয়েছে। নোবেল পুরস্কার যিনি পেয়েছেন, তিনি কারও নাম সুপারিশ করলে, তবেই কমিটি বিবেচনা করবে। আমাদের দেশে তো অন্যরকম একটা সমস্যাও রয়েছে।

প্রশ্ন: যেমন?

উত্তর: ধর, নোবেল কমিটি হয়তো সাহিত্য অ্যাকাডেমির কাছে নামের তালিকা চাইল। এখন আমাদের দেশে মুস্কিল হচ্ছে, সাহিত্য অ্যাকাডেমির ২২টা ভাষা। আর প্রত্যেক ভাষার প্রতিনিধিরাই মনে করেন, বড় লেখক আছেন একমাত্র তাঁদের ভাষাতেই। আর তাই তাঁরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের ভাষার লেখকদের নাম পাঠান। তা নিয়ে ঝগড়াঝাটিও হয়। মাঝে মধ্যে তাও অন্য একটা-দুটো নাম ওঠে। তার মধ্যে আমার নামও যে ওঠেনি, তা নয়।

প্রশ্ন: কী হল তারপর?

উত্তর : গুজরাতের এক প্রতিনিধি একবার আমার নাম তুলেছিলেন। কিন্তু সেভাবে বললে তো হয় না। সিদ্ধান্ত হয়েছে, যাঁর বয়স বেশি, তাঁর নামই দিতে হবে। তেমনই শেষবার পাঠানো হয়েছিল আর কে নারায়ণনের নাম। কিন্তু এইভাবে করলে তো মুস্কিল! কেননা, যিনি বয়স্ক তিনিই যে সব থেকে ভালো লেখক, তার তো কোনও মানে নেই। এইসব কারণে, আমাদের এখান থেকে নোবেল পুরস্কার পাওয়াটা কঠিন হয়ে গিয়েছে।

প্রশ্ন: কিন্তু, কখনও কি মনে হয়, পুরস্কার দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনার প্রভাব থাকে? অর্থাৎ, কোনও বিশেষ দেশ, কোনও বিশেষ পরিস্থিতি...?

উত্তর : হ্যাঁ, তা তো হয়ই। অনেক সময়েই রাজনৈতিক বিবেচনা আসে। দেখবে, নোবেল প্রাইজ দেওয়ার সময় ওরা দেখে নিচ্ছে, কোন কোন দেশ আগে পায়নি। যেমন পর্তুগাল আগে পায়নি। গতবছর চিন থেকে ওরা একজনকে খুঁজে বার করেছিল। দুঃখের বিষয়, এই বিচারে একটা কৌশল আছে। ওই চিনা লেখক অনেকদিন ধরে ইউরোপে আছেন।

প্রশ্ন : তার মানে, আবার সেই পশ্চিমী যোগাযোগ?

উত্তর : ওই যে বললাম, ইউরোপিয়ান কানেকশন না-থাকলে হয় না। ইউরোপে থাকলে অনেকের সঙ্গে কথাবার্তা হয়, যোগাযোগ হয়, লবি করা যায়। দ্বিতীয় কথা, ওঁর বইটার মধ্যে একটু সাম্যবাদ-বিরোধী মনোভাব ফুটে উঠেছে। তুমি তো জানো, নোবেল কমিটি এটাই চায়। বইটা আমি পড়েছি—দ্য সোল মাউন্টেন। আমার কিন্তু অত ভালো লাগেনি। আমাদের দেশের ভালো ভালো লেখা যদি নোবেল পুরস্কার না পায়, তাতে আমাদের কোনও ক্ষতি নেই। নোবেল কমিটিরই ক্ষতি।

প্রশ্ন : তার মানে আপনার মতো, সাহিত্যের মান নয়, লবিই আসল কথা?

উত্তর : নোবেল কমিটির ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায়, প্রতিটি পুরস্কার, এমনকী বিজ্ঞানের পুরস্কারের জন্যও লবি করতে হয়। যেমন, সম্প্রতি জানা গিয়েছে, সি ভি রমন যেবার পুরস্কার পান, তার আগে সাত-আট বছর ধরে তিনি চেষ্টা করে গিয়েছেন। সে বছর আমাদের মেঘনাদ সাহার নামও উঠেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মেঘনাদ সাহা লবি করতে জানতেন না। উনি জানতেনই না যে, ওঁর নাম উঠেছে। তুমি দেখবে, অনেকের সম্পর্কে বলা হয়, সাত-আট বছর আগেই নাকি তাঁর নাম উঠেছিল। পুরস্কার পেলেন এই বছর। তার মানে, তিনি চেষ্টা করেছেন সাত-আট বছর ধরে।

প্রশ্ন : আর এবারের সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার?

উত্তর : এবার যিনি পেয়েছেন, নাইপল, ওঁর তো অনেক আগেই পাওয়া উচিত ছিল...।

প্রশ্ন : রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কারের ব্যাপারে আপনি কী বলবেন?

উত্তর : রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কারের ব্যাপারটা খুব মজার। রবীন্দ্রনাথকে তিনটে নোবেল দেওয়া উচিত ছিল। গীতাঞ্জলির জন্য পেলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর থেকে অনেক ভালো কবিতা লিখেছেন, ছোট গল্প লিখেছেন, অনেক ভালো উপন্যাস লিখেছেন, নাটক লিখেছেন। অন্য লেখকদের তুলনায় ওঁর কাজ অনেক বড় মাপের।

২৮

● লেখার জগতে আপনার প্রবেশ কবে ও কীভাবে?---আপনার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস কী? তার সম্বন্ধে দু' এক কথা বলবেন?

❑ স্কুল থেকে কলেজে ভর্তি হওয়ার আগে মাঝখানের যে সময়টা সেই সময় আমি লেখা শুরু করি। ১৯৫১ সালের মার্চ মাসে দেশ পত্রিকায় একটা কবিতা পাঠিয়েছিলাম। সেই ছাপা হয়েছিল। কবিতাটার নাম 'একটি চিঠি'। তারপর ডাকে আমি আরও লেখা পাঠিয়েছিলাম, সেগুলোও ছাপা হয়েছিল। আমার লেখা ওদের পছন্দ হতে থাকায় ওরা তারপর নিজেরাই আমার লেখা চাইতে লাগল। আমিও লেখা দিতে থাকলাম, তখন গল্পও লিখতে শুরু করলাম। কলেজে 'কৃত্তিবাস' বলে একটা কবিতার পত্রিকা বার করতাম। আমি ছিলাম তার সম্পাদক। ওই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে তখন অনেক কবি এসে জুটেছিল। তাঁদেরকে বলা হয় কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর কবি। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, তারাপদ রায় এছাড়া আরও অনেকে ছিলেন এই গোষ্ঠীর কবি। এরপর বেশ কিছুদিন কবিতা লেখার পর আস্তে আস্তে গল্প, উপন্যাস লেখা শুরু করি।

১৯৬৬ সালে শারদীয়া দেশ পত্রিকায় আমার প্রথম উপন্যাস বেরোল 'আত্মপ্রকাশ'। সাগরময় ঘোষ যখন আমাকে এই উপন্যাসটা লিখতে বললেন তখন উপন্যাস ঠিক কীভাবে লিখতে হয় সে ধারণা ছিল না আমার। এই উপন্যাসটা লেখার আগে আমি বিদেশে ছিলাম। তখন একজন বিখ্যাত বিদেশী লেখক আমায় বলেছিলেন কাহিনী বানাবার চেয়ে নিজের জীবন থেকে কাহিনী খুঁজে বার করা অনেক সোজা। সেইজন্য আমি নিজেই নিজের জীবনের কোনো একটা ঘটনা নিয়ে শুরু করেছিলাম। তারমানে পুরোটাই যে আমার জীবনের ঘটনা তা নয়। কিছুটা আমার নিজের কিছুটা কল্পনা। যেহেতু উপন্যাসটার নাম 'আত্মপ্রকাশ' এবং 'আমি আমি' করে লেখা এবং নায়কের নামও সুনীল, তাই পাঠকেরা হয়তো ভাবে যে ওটা সবটাই আমারই জীবনের একটা ঘটনা।

● 'সেই সময়' উপন্যাস সম্পর্কে একটা প্রশ্ন উঠেছিল যে—নবজাগরণের মনীষীদের সম্পর্কে আপনি খোলাখুলি আলোচনা করেছেন, এই সম্পর্কে আপনি কিছু বলবেন?

❑ হ্যাঁ, কেউ কেউ আপত্তি করেছিল। আসলে আমার বক্তব্য ছিল যে কোনো মানুষই মহাপুরুষ হয়ে জন্মায় না। সবাই সাধারণ মানুষ হয়েই জন্মায়। মাঝে মাঝে তারাও ভুল করে, দোষ করে, তারা পা পিছলে পড়ে যায়। তারপর তারা নিজেদের চেষ্টায় অনেক উঁচু জায়গায় ওঠে। কেউ মহৎ হয়ে যায়। তা আমি সেই তাঁদের প্রথম জীবনের যে দুর্বলতা ছিল সেগুলো গোপন করিনি। তাঁদের নীরা কবিতাটা পড়লে মনের মধ্যে যে মূর্তি বা ছবিটা ওঠে সেটাই যথেষ্ট। এর আর ব্যাখ্যা করার দরকার নেই।

● নারী আপনার লেখার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রেরণা—একথা আপনি বারবার বলেছেন। কিছু বলবেন এ সম্পর্কে?

❑ হ্যাঁ, নারীর প্রেরণা না পেলে আমি লিখতে পারতাম না। তবে এই নারী নানারকম হতে পারে—কখনও আমার মা ছিলেন সেই নারী, কখনও আমার স্ত্রী, কখনও আমার বান্ধবীরা। আবার

কখনও কারোর সাথে হয়তো একদিন দেখা হয়েছে, সেও আমার লেখায় প্রেরণা দিয়ে গেছে।

● বিদেশী লেখকদের মধ্যে কোন লেখক আপনার প্রিয় এবং কেন বলবেন?

❑ আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি সারাজীবন তো আর একই লেখককে ভালো লাগে না। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লেখককে ভালো লাগে। তবু অ্যালেন্স গিন্সবার্গ বলে একজন কবি আছেন তাঁর লেখা আমার খুব ভালো লাগে।

আর ভালো লাগে তার কারণ, উনি আমাদের এখানে কয়েকবার এসেছিলেন, আমাদের ভাবনা চিন্তার সাথে তাঁর ভাবনা চিন্তার মিল আছে। আমিও তাঁর ওখানে গেছি, আমার সাথে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কও ছিল। তাঁর লেখার মেজাজটা আমি ধরতে পারি। এছাড়াও তিনি পৃথিবীতে একজন উল্লেখযোগ্য কবি। এইসব কারণেই তাঁকে আমার ভালো লাগে।

● আপনি 'কাকাবাবু' চরিত্রটিকে পঙ্গুহিসাবে দেখালেন কেন?

❑ 'পঙ্গু লঙ্ঘ হতে গিরী'—মানে মনের জোর থাকলে যে পঙ্গু সেও গিরী লঙ্ঘন করতে পারে। সেটাই আমি দেখিয়েছি। সাধারণত অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীতে নায়করা দেখতে সুন্দর হয়, লাফাতে পারে ঝাঁপাতে পারে, সব কিছু করতে পারে। তো আমি দেখিয়েছি যে—

● পুরস্কারের ভূমিকাটা কী?

❑ হ্যাঁ এসেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পেতে পারতেন, সতীনাথ ভাদুরী পেতে পারতেন, জীবনানন্দ দাশ পেতে পারতেন। এছাড়া আরও অনেকে আছেন যাঁরা নোবেল পুরস্কার পেতে পারতেন। কিন্তু এখন নোবেল পুরস্কারের মধ্যে নানা জটিলতা ঢুকে গেছে। সেই জন্য পাওয়া শক্ত।

সাহিত্য জীবনে পুরস্কারের একটা ভূমিকা তো আছেই। পুরস্কার হচ্ছে এক ধরনের স্বীকৃতি। আর আমার মতে বড় বড় যে পুরস্কার দেওয়া হয় তা দেওয়া হয় সাধারণত বয়স্ক লেখকদের। তখন ওই পুরস্কার তাদের না দিলেও চলত। অল্প বয়সে যখন তাদের সংগ্রাম করতে হয়, সাধনা করতে হয়, অনেকসময় দারিদ্র্য ভোগ করতে হয় তখন ওই রকম একটা পুরস্কার পেলে অনেকটা সুবিধা হয়। আর সুবিধা বলতে—যদি কোনো লেখকের দারিদ্র্য থাকে তাহলে পুরস্কারের টাকা পেলে সুবিধা হবে। দ্বিতীয় হচ্ছে যে, তাদের লেখা প্রকাশের অত সুযোগ থাকত না। কিন্তু পুরস্কার পাওয়ার সাথে সাথে তার খ্যাতিও ছড়িয়ে পড়বে। এরফলে প্রকাশের সুযোগ অনেক বেশি হবে। আর আর্থিক নিরাপত্তার নিশ্চিন্ততা এসে গেলে নতুন ধরনের লেখার জন্য আরও অনেক বেশি সময় ব্যয় করতে পারবে। আমাদের অল্প বয়সে কত লিখতে হয়েছে জীবিকার জন্য। যদি আর্থিক নিরাপত্তা থাকত এত লিখতাম না। আরও কম লিখতাম। আরও ভেবে চিন্তে ভালো লেখার চেষ্টা করতাম।

● ক্ষুদ্র পত্রিকা সম্বন্ধে আপনি কিছু বলবেন?

❑ ছোট পত্রিকা বাংলার একটা বৈশিষ্ট্য। বাংলাতে প্রচুর লিটল ম্যাগাজিন বা ছোট পত্রিকা বেরোয়। এটা আমি মানুষ হিসাবে দেখিয়েছি। মানুষ যেমন দুর্বল হয়, মানুষ যেমন ভুল করে তাঁদেরও সেগুলো দেখিয়েছি। এটার কারণ হচ্ছে, যারা এই উপন্যাসটা পড়বে তাদের মনে হতে পারে যে আমরাও তো তাহলে এরকম হতে পারি। কারণ আমরাও ভুল করি, আমরা দোষ করি। ইচ্ছা করলে আমরাও সেগুলো কাটিয়ে মহৎ হতে পারি। সেইজন্যই আমি তাঁদের সাধারণ মানুষ করে দেখিয়েছি।

● বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাসকে যে অর্থে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা হয় সেই অর্থে আপনার 'সেই সময়' উপন্যাসকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতে পারি?

❑ বঙ্কিমের কয়েকটি উপন্যাস আছে যেগুলি ইতিহাস ভিত্তিক উপন্যাস। তার সঙ্গে আমার তুলনা করা যায় না। বঙ্কিম বঙ্কিমের মতন লিখেছেন। এখনতো উপন্যাস লেখার আঙ্গিকটা পাল্টে গেছে। বঙ্কিমের আঙ্গিক আর আমার আঙ্গিক তো এক হতে পারে না। আমার আঙ্গিকে ইতিহাসের পটভূমিটা বেশি। বঙ্কিম তার উপন্যাসের মধ্যে ইতিহাসের একটা আবছা রূপরেখা টেনে তার মধ্যে

রোমান্স কাহিনী তৈরি করেছেন। আমি চেষ্টা করেছি আমার উপন্যাসের মধ্যে ইতিহাসকে বাস্তব করে তুলতে।

● 'নীরা' এই নামটি আপনার কবিতায় বার বার এসেছে। এটা কি কেবল প্রতীক মাত্র নাকি এর পিছনে কোন রক্তমাংসের শরীরী মূর্তি আছে?

❑ এই নীরা ব্যাপারটা কবিতা পড়ে যেটুকু বোঝা যায় তার বাইরে আর বলার কিছু থাকে না। কারণ এসব জিনিস ব্যাখ্যা করা যায় না। সুতরাং যেই আমাকে জিজ্ঞাসা করে তাকেই আমি বলি যে ভদ্রলোক খোঁড়া কিন্তু বুদ্ধির জোরে আর মনের জোরে তিনি অনেক অপরাধীদের দমন করতে পারেন। কাজেই বুদ্ধির জোর আর মনের জোর যে শারীরিক শক্তির থেকেও বেশি আমি সেটাই বোঝাতে চেয়েছি। আর পঙ্গুদের মানসিক জোর বাড়ানোও আমার অন্যতম উদ্দেশ্য। তাছাড়াও যে কোনো লোক ভাববে যে বুদ্ধির জোরটা আসল, শুধু পঙ্গু হওয়াই বড় কথা নয়। দৌড় ঝাপ না করে শুধু বুদ্ধি দিয়েই সব সমস্যার সমাধান করা যায়। কাজেই প্রত্যেকেই যারা পঙ্গু নয় তারাও বুদ্ধি যাতে বেশি ব্যবহার করে আমি সেই জনাই কাকাবাবুকে পঙ্গু হিসাবে দেখিয়েছি।

● রাজনীতি ও সাহিত্যের মধ্যে কী সম্পর্ক আছে?

❑ না থাকাই ভালো। তবে কোন কোন লেখক জড়িয়ে পড়েন কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে। প্রত্যক্ষভাবেও যুক্ত থাকেন। প্রত্যক্ষভাবে কোন লেখক যুক্ত থাকলে হয়কি লেখাগুলো একমুখী হয়ে যায়। রাজনৈতিক দল থেকে দূরে থাকতে পারলে লেখকের স্বাধীনতা বেশি থাকে। সাহিত্যে একটা সমসাময়িক বাস্তবতা থাকে। সমসাময়িক ঘটনাগুলো সাহিত্যে ফুটে ওঠে। সেই জন্য যদি কোন রাজনৈতিক দল কোন প্রশংসনীয় কাজ করে তার প্রশংসা করা যায়। আবার অন্যায় কাজ, যে কাজে দেশের ক্ষতি হবে তাকে আক্রমণ করা যায়। এইজন্য কোনো দলীয় সদস্য হলে এগুলো করা যায় না। দলীয় সদস্য হলে একটাই বলতে হবে। আর একটু বাইরে থাকলে প্রশংসাও করা যায় আবার আক্রমণও করা যায়।

● বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পরে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার মতো আর কোনো সাহিত্যিক কি আসেন নি?

❑ সাহিত্য বা সাহিত্যিক জীবনে ভারতের অন্য ভাষায় দেখিনি। ছোট পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ খুবই প্রশংসনীয়। এইসব ছোট পত্রিকা থেকেই তো বড় বড় লেখকেরা বেরিয়ে আসে। ছোট পত্রিকার নানারকম লেখা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা হয় এবং সেখান থেকে আমরা নতুন নতুন ভালো ভালো লেখকদের পাই।

● আপনি কি আপনার লেখার মধ্য দিয়ে কোনো জীবন দর্শন প্রকাশ করতে চান?

❑ হ্যাঁ, শুধু তো গল্প লেখার জন্য লিখি না, জীবন দর্শন অবশ্যই আছে। সেই জীবন দশনটা হচ্ছে—মানুষ যেন ধর্মান্ধতা থেকে মুক্তি পায়, মানুষ যেন দেশ বা জাতির বিচার না করে মানুষকে শুধু মানুষের মতো দেখতে পারে, সারা দেশ বা পৃথিবীতেই মানুষের প্রতি মানুষের যে অবিচার আছে সেগুলো যেন দুর করা যায়। ব্যক্তিগত লেবেলে প্রত্যেক মানুষই যে যে মানসিক অবস্থায় আছে তার থেকে একটু উঁচুতে উঠতে হবে। এই উঁচুতে ওঠার চেষ্টা করাটাই হচ্ছে মনুষ্যত্ব। এগুলো কিন্তু আমার লেখায় খুব স্পষ্টভাবে থাকে না। কারণ স্পষ্টভাবে থাকলে তো প্রচার হয়ে যাবে।

● আপনিতো শাসকদলের পক্ষে অনেক কথা বলেছেন, যেমন—পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতার নাম পরিবর্তন, বাংলা ভাষা চালু করা ইত্যাদি। আপনার দীর্ঘ এই লেখক জীবনে আপনাকে আগে তো কখনও এই ভূমিকায় দেখা যায়নি। এই ভূমিকায় কেন এলেন বলবেন?

❑ আমি সারা জীবন একই ভূমিকায় থাকব তার তো কোনো মানে নেই। আর এগুলো তো শাসকদলের পক্ষ নিয়ে নয়। এগুলো হচ্ছে আমাদের বাংলার দাবি। শাসকদলের কাছে আমরা এই দাবি পেশ করেছি, তারা সমর্থন করেছে। এখানে পক্ষ নেওয়ার তো কোনো ব্যাপার নেই।

২৯

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রধানতম চিরসবুজ লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আগামী ৭ সেপ্টেম্বর সত্তর বছরে পা দেবেন। ওই দিন তার জন্মদিন। সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় তার কীর্তি ও অবদান অপরিমেয়। মৃদুভাষণের পক্ষ থেকে এই অগ্রগণ্য ও বরেণ্য স্রষ্টার অন্তরঙ্গ এক আড্ডার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন তাপস কুমার দত্ত ও শর্মিষ্ঠা দত্ত।

'দেশ' দফতরে বাংলার এই কিংবদন্তিতুল্য সাহিত্যিকের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্ব মুহূর্তে একটুক্ষণের তরে, সহজাতভাবে, আমরা যখন কলকাতার আকাশ পানে তাকাই, দেখি, শরতের শুরুতে আকাশজোড়া সাঁতরে ও দাবড়ে বেড়ানো পেজাতুলা ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘদলকে। আমাদের প্রশ্নসংক্রান্ত ভয় ও ভাবনাসমূহ যেন আকাশের ওই ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘদলেরই প্রতিরূপ। আশ্চর্য এক আপ্লুত করা বিমুগ্ধতায় দেখতে পাই, কত অক্লেশে, অকৃত্রিম অন্তরঙ্গে, ভালোলাগায় এবং ভালোবাসায়, আমাদের মন নানা রঙে দ্রবীভূত করে তোলেন এই চিরায়ত মানবিক ও মননশীলতায় সমৃদ্ধ ব্যক্তিত্বের অবিসংবাদিত সাহিত্যস্রষ্টা।

আলাপচরিতার শুরুতেই সদ্য অকালপ্রয়াত বহুমাত্রিক লেখক হুমায়ুন আজাদের এক উদ্ধৃতি শোনানো হয়, যেখানে ড. আজাদ রাষ্ট্র ও সমাজের চালকদের তুলনা করেছেন বনাশুয়োদের সঙ্গে। যতো বিষ, মাদক, অপব্যাপার রয়েছে সে সব কিছুতেই জনগণকে কীভাবে বুঁদ করে রাখা হয়, দিয়েছেন তার দ্ব্যর্থহীন ইঙ্গিত। সমাজকে যারা প্রকৃত কিছু দেয়, এই রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জীবিতকালে তারা কতোটাই না নিন্দিত হয়, এমনকি যখন তখন নিহতও হয়।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে আমাদের প্রথম প্রশ্ন ছিলো যে, **সমাজ-রাষ্ট্র ও সাহিত্যে সত্যিকারের অমূল্য-ধারক কিছু অবদান রাখার জন্যেই কি হুমায়ুন আজাদকে অকালে এবং অসময়ে চলে যেতে হলো?**

তিনি বিষণ্ন হলেন, খ্রিয়মাণ গলায় বললেন, উনি যে রকম ক্রুদ্ধ ভাষায় কথা বলেছেন, আমি তো ওভাবে বলি না। মোটামুটিভাবে ওনার সঙ্গে আমি একমত, তবে আমার ভাষা আলাদা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে, ওঁর চলে যাওয়াটা ভীষণ দুঃখজনক এবং পরিতাপের বিষয়। কিন্তু কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে বার করা শক্ত। তবে মৌলবাদীদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পরও উনি ওই গুরুতর অবস্থা থেকে উঠে এসে যখন বিদেশে গেলেন, সঙ্গে কারো থাকা অবশ্যই উচিত ছিলো। ওসব জায়গায়...মানে শরীরের ওপর যাদের এতো ভয়াবহ ধকল গেছে একবার, তাদের শরীর যখন-তখন খুব বেশি অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে এবং এক্ষেত্রে বিশেষ করে রাত্রিবেলা তাদের পাশে কারো থাকা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।

আপনার কি মনে হয় বিগত কয়েক দশক আগে থেকে বিশ্বজুড়ে রাজনীতিতে যেরকম মন্দির-মসজিদের প্রত্যাবর্তন ঘটেছে, তাতে করে আগামী কয়েক দশক পর উপমহাদেশে ধর্মরাজত্ব

প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে? বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন রকম উন্মাদনা দেখা যাচ্ছে।

এটা ঘটছে মতলববাজদের জন্যে। পৃথিবীতে একটা মৌলবাদীদের দিকে ঝোঁক দেখা যাচ্ছে, কিন্তু আবার সুস্থতার দিকে ঝোঁক আছে। এমন নয় যে, সিংহভাগ মানুষই মৌলবাদী হয়ে গেছে।...এমনও কিছু কঠোর মানুষ আছে যারা সুস্থ চিন্তা, মানবিক চিন্তার ধারক। কাজেই কারা জয়ী হবে, তা বলার সময় এখনো আসেনি। আমি মনে করি, যারা মুক্ত ও সুস্থ চিন্তা করে, মানবিকতাকে যারা সব কিছুর ঊর্ধ্বে বিবেচনা করে—শেষপর্যন্ত তারাই জয়ী হবে। মৌলবাদীরা কিছু হটে যাবে।

কিন্তু কয়েক দশক আগেও তো আমরা এখনকার মতোই আশাবাদী ছিলাম...।

এখন বোধহয় মৌলবাদী ব্যাপারটা চূড়ান্ত জায়গায় এসে পৌঁছেছে। এর বেশি আর যেতে পারবে না। এরপর এদের পশ্চাদপসারণ শুরু হয়ে যাবে...।

সব সময়ই দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে একটা বিদ্রোহ আন্দোলনের দেশ...একটা ভালো বাতাবরণ তৈরি হতে না হতেই—হয়তো তা খুব সাময়িক সময়ের জন্য স্থিতি হয়; কিন্তু 'পিছিয়ে পড়া' ব্যাপারটাকে আমরা কোনো প্রকারেই পেছনে ফেলতে পারছি না।...

এই পর্যায়ে তিনি নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হন। বাংলাদেশ তো তাঁরও জন্মভূমি, ফরিদপুরের মাইজপাড়া নামের অখ্যাত কোনো রত্নাগর্ভা গ্রামে তাঁর জন্ম। এদেশ নিয়ে তাঁর অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস, ভালোবাসার ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনাও তাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফুটে ওঠে বিষণ্ন কণ্ঠে, এটা ঠিকই যে, বাংলাদেশের যখন জন্ম হয় তখন আমাদের অন্যরকম একটা আশা ছিলো। আমাদের শুধু না, বাংলাদেশের বহু মানুষ, যাঁরা কোনো না কোনোভাবে দেশ স্বাধীনের লড়াইতে নেমেছিলো, আশা করেছিলো যে, এটা একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশ তো হবেই, এখানে বাংলা ভাষার প্রকৃত মর্যাদা রক্ষিত হবে, বাংলা সংস্কৃতির মর্যাদা রক্ষিত হবে, বাঙালিরা অর্থনৈতিকভবে আরো সমৃদ্ধি অর্জন করবে এবং ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে প্রগতির পথে এগিয়ে যাবে। তার অনেক কিছুই হয়নি। ভারতেও যেমন স্বাধীনতার পর আমরা যা যা আশা করেছিলাম, তা তো হয়নি।

অনেক কিছুই হয়নি। এখনো তো আমাদের গ্রামদেশের মানুষ না খেয়ে মরে, তা কি আমরা স্বাধীনতার আগে ভেবেছিলাম?

আমরা ভেবেছিলাম যে, এসব কিছু থাকবে না। কিন্তু হয়তো ভারতে বাংলাদেশের তুলনায় গণতান্ত্রিক বোধটা বেশি আছে। মৌলবাদ কিন্তু এখানেও স্বাধীনতার পর থেকে অনেক বেশি মাথাচাড়া দিয়েছে, কিন্তু আবার তার বিরুদ্ধে লড়াইটাও চলছে। ভয়ের কথা হলো—বাংলাদেশে যারা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, ক্রমশ তারা অনেক বেশি ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে যাচ্ছে।

এবং দেখা যাচ্ছে যে, দেশের এখনই যা অবস্থা সেটাই অকল্পনীয়। এরচেয়ে ভয়ঙ্কর কিছু ভাবনা মাথায় ঠাঁই দেয়াটাই অসহনীয়তার চূড়ান্তে চলে যাচ্ছে। আপনারও কি তাই মনে হয় না?

তিনি বিষণ্নতায় নিমজ্জিত থেকে মাথা দোলান, হুম তাই-ই। সেটাই তো মুশকিলের কথা।

আপনার 'প্রথম মানবী' গল্পটির জন্য ' দেশ'-এর ২ এপ্রিল সংখ্যাটি বাংলাদেশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছে। কেন?

তিনি শ্লেষাত্মকভাবে শরীর দুলিয়ে হেসে ওঠেন। বলেন, আমি কিছুই বুঝতে পারিনি কেন ওটাকে ওঁরা নিষিদ্ধ করলো। তারপরে দেখলাম যে, ওঁরা বলেছে না কি ধর্মের বিশ্বাসে আঘাত দেয়া হয়েছে। ওদের বক্তব্যটা আমার মাথায় ঢুকলো না। গল্পটা লেখা হয়েছে স্রেফ নারী-পুরুষের সমান অধিকারের ব্যাপার নিয়ে।

আমাদের যা মনে হয়, আপনার গল্পটির প্রধান দুটি চরিত্র আদম ও হবাকে (যা বাংলাদেশে 'হাওয়া' হিসেবে পরিচিত) নিয়ে একটি ধর্মীয় মিথ প্রচলিত আছে, সেই মিথটার ওপর আপনার এক্সপেরিমেন্টাল বা প্রতীকী কাহিনী তাঁদের কাছে সমর্থনযোগ্য মনে হয়নি।

এ তো ভারি মুশকিলের ব্যাপার! আদম এবং হবাকে (হাওয়া) মুসলিমরা মনে করে যে, ওদেরও

পূর্বপুরুষ সে আমি জানি। বাইবেলের ওই বিশ্বাসটাকে ওঁরাও গ্রহণ করে, আবার এ নিয়ে ইহুদিদেরও একটা বিশ্বাস করে আছে যে, হবার (হাওয়া) আগেও একটা মেয়ে ছিলো, আমি তাকে নিয়েই লিখেছি (প্রথম মাধবী গল্পের 'লিলিথ' চরিত্র)। তা এটা তো একটা লেখা এবং এর মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত হানার কী আছে? আর গল্পের মূল বিষয়বস্তু তো আগেই বলেছি—নারী-পুরুষের সমানাধিকার। ভিত্তিহীন ব্যাপার, কোনো একটা ছুঁতো করে বন্ধ করা। এটা তো এক ধরনের অশিক্ষা বা চক্রান্ত বা মতলববাজির নিদর্শন। না-হলে কোনো লেখার মধ্য থেকে নিজেদের মনগড়া কী-একটা পেলো না পেলো....এগুলোকে নিষিদ্ধ করা অত্যন্ত অন্যায়।।

অথচ এসবের চেয়ে অনেক ভয়ঙ্কর লেখা তাদের চোখ এড়িয়ে যায় বা এড়িয়ে না গেলেও অনেক সময় সেসব লেখা নিয়ে বিশেষ উচ্চবাচ্য করেন না। যেমন—হুমায়ূন আজাদের 'শুভব্রত ও তাঁর সম্পর্কিত সুসমাচার' উপন্যাসটির কথা বলা যেতে পারে। প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী এর প্রতীকী ইঙ্গিতময় দিকটা উপলব্ধি করতে পারলে 'পাক সার জমিন সাদ বাদের' মতোই...। হুমায়ূন আজাদের মতে, নির্মলেন্দু গুণের কিছু কবিতার ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যেতে পারে। এই যে ইঙ্গিতময় প্রতীকী অংশ বা লেখা সমূহ ধরতে না পারার যে অনুর্বর অক্ষমতা; আবার কখনো-সখনো হাস্যকর আরোপিত ইঙ্গিতময় দিক খুঁজে বের করা...।

ওই যে বললাম। এসব কিছু মতলববাজি এবং অশিক্ষার নিদর্শন। এগুলো অন্যায়, অত্যন্ত অন্যায়।

এরপর আমরা প্রসঙ্গ পাল্টে, তাঁর মতে, একটা মাইনর ব্যাপারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তিনি যেহেতু প্রথাগত ধর্মে বিশ্বাসী নন, প্রথাগত পড়াশোনাতেও বিশ্বাসী নন, সেহেতু কোন যুক্তিতে তাঁর বইয়ের ফ্ল্যাপে, তিনি যে এম এ পাস, তথ্যটি সযত্নে সন্নিবিষ্ট হয়?

(খুব খানিকটা হেসে) বইয়ের ফ্ল্যাপে তো আমি লিখি না, সে তো অন্য লোক লেখে।

অন্য কেউ লিখলেও দায়টা আপনি এড়াতে পারেন না। প্রকাশক ফ্ল্যাপে যে কোনো তথ্য লিখতে চাইলেই কেন লিখতে পারবে?

(অবিরত উচ্ছ্বাসে হাসতে হাসতে) ও আচ্ছা, আচ্ছা। ঠিক আছে বলে দেবো, আর লিখবে না।

তিনি চেয়েছিলেন তাঁর লাইফের বেটার হাফ নির্বাচনের ক্ষেত্রে অপ্রথাগত উদাহরণ তৈরি করতে। শ্রদ্ধেয়া স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়কে আবিষ্কারের পূর্বে ভাবতেন যে, অব্রাহ্মণ (অহিন্দু) বা বিধবা কেউ হবেন তাঁর জীবন সঙ্গিনী...।

এ প্রসঙ্গে জানালেন, ওটা আমার সংস্কারমুক্ত ঐচ্ছিক আকাঙ্ক্ষা ছিলো। কিন্তু ব্রাহ্মণ হলেও যা অবিধবা হলেই যে আমি রিফিউজ করবো এটা তো কোনো কারণ হতে পারে না, তাই না?

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের বেশিরভাগ জনপ্রিয় লেখকদের লেখায় থাকে কতকগুলো পাগলামোর ঘটনা, কিছু রোমাঞ্চকর ঘটনা, কিছু সুখকর ঘটনা ও একটু বেদনাদায়ক ঘটনা। গতানুগতিক ছাঁচে ঢালা সস্তা জটিলতার বাইরে নতুন তেমন কিছু নেই। আর জনপ্রিয়তার সস্তা স্বাদ পাবার জন্যই কি তরুণ লেখকরাও এই ধরনের লেখায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উৎসাহী হয়ে থাকে বলে মনে হয় আপনার?

না তো। সব সময়ই সব ভাষায় সাহিত্যের দুটো ধারা থাকে। একটা ধারা হচ্ছে—নতুন কিছু সৃষ্টি করা, সাহিত্যে নতুন আঙ্গিক নিয়ে আসা, ভাষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। আর একটা ধারা হচ্ছে—খুব সহজ-সরল গল্প, সেন্টিমেন্টাল গল্প লেখা। তাতে এক ধরনের পাঠকগোষ্ঠীকে মুগ্ধ করা যায়; এমন একটা ধারা সবসময়ই থাকে।

একজন মহৎ কবির জন্মের জন্য মহৎ অডিয়েন্স বা পাঠকমণ্ডলী দরকার। হুইটম্যানের এই ভাবনার সঙ্গে আপনি কতোটা একমত?

এই কথা অনেক লেখকই বলেছেন, শুধু হুইটম্যান নয় টি. এস. এলিয়ট বলেছেন, 'এভরি

জেনারেশন গেটস দ্য লিটারেচারস ইট রিজার্ভস'। তার মানে, "পাঠক সমাজ যতোটা তৈরি সাহিত্য ঠিক ততোটাই হবে। যদি পাঠক সমাজের রুচি নিচের দিকে থাকে তা হলে উচ্চমার্গের সাহিত্য সৃষ্টি হবে না।"

আপনার নিজের ক্ষেত্রেও কি কথাটা সত্য? অর্থাৎ আপনার নিজের পাঠকসমাজ যদি নিম্নরুচির হয় তা হলে আপনার দ্বারাও কি উচ্চমার্গের সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হবে না?

নিশ্চয়ই। আমরা তো কতকগুলো জিনিস লিখতে পারি না। ইচ্ছে করে, তবুও পারি না। কারণ সেসব লেখা বিশেষ কেউ পড়বে না বা বুঝবে না।

শুধু পাঠকদের জন্যই সাহিত্য সৃষ্টি? অর্থাৎ, পাঠক অডিয়েন্সের গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্ন থাকলে তা লেখা যাবে না? আর, বেশিরভাগ নাই-ই বা বুঝতে পারলো, উত্তর প্রজন্মও তো এই না-বুঝে ওঠা লেখার ভেতরে সার্থক শিল্পরস খুঁজে পেতে পারে। তাদের কথা ভেবেও কি লেখা যায় না?

এই সময়ে একচোট হেসে নেন তিনি। হাসতে হাসতেই বল্লেন, আমাদের মতো লেখক যারা...অর্থাৎ পত্রপত্রিকায় লেখা না দিলে আমাদের মারবে ধরে। (উচ্ছল হেসে) আমাদের তো উপায় নেই। যে একলা বসে বসে নিভৃতে এক্সপেরিমেন্ট করে—সে লিখতে পারে, মানে যাকে বলে একদম অ্যাবসট্রাক্ট লেখা। যার মানে বোঝা দুরূহ। সেই লেখা কি আমরা লিখতে পারি? সেই জন্য আমরা করি কী, অন্যান্য অনেক লেখার মধ্যে আমাদের সেই অ্যাবসট্রাক্ট ভাবনাগুলো একটু একটু করে মিশিয়ে দিই।

তার মানে, আপনি লিখতে চান ঠিকই, কিন্তু পাঠক সমাজের গ্রহণযোগ্যতার অভাববোধ থেকে পিছিয়ে আসেন...

তুমি একটা লেখা লিখলে কিন্তু কেউ তা বুঝলো না, তা হলে তা লিখে লাভটা কী? এটা কবিতার ক্ষেত্রে হয়। কবিতা কটা লোক বোঝে? কবিতার মধ্যে এই বিমূর্ত ভাবটা থাকে। আর, কবিরা জানে আমার বেশি পাঠকের দরকার নেই।।

এ পর্যায়ে প্লাটফর্মের একটু লঘু দিকে আমরা অগ্রসর হই। বলি, কবিতা লেখার ক্ষেত্রে আপনি তা এক দফায় বসে লেখেন, না কি বার-বার সংশোধন করেন!

আমি মাথার মধ্যে সংস্কার করি। আমার মাথার ভেতরে একটা লাইন গুঞ্জরিত হয়, এটা মাথার মধ্যেই যাবতীয় সংশোধন করে তারপর লিখি। লেখার পরে আর বিশেষ কাটাকাটি করি না।।

আর কবিতার নানান প্রকরণের মধ্যে, যেমন—উপমা, রূপক বা চিত্রকল্প কোনো ধরনের প্রকরণে লিখতে আপনার বেশি আনন্দ হয়?

ওভাবে আমি ঠিক ভাবি না। যখন যে প্রকরণটা মাথায় আসে তখন সেটাই ভালো লাগে।।

হঠাৎ আমরা তাঁর বার্ধক্য উপভোগের দিকে মনোযোগ দিই এবং বার্ধক্যের প্রশংসা নিরূপায়িত আঙুর ফল টকের মতো কি-না ভাবার্থে প্রশ্ন করলে তিনি অকপটে জানান—

বার্ধক্য তো অনুভব করছি না, বয়সের দিক থেকে নিশ্চয়ই বার্ধক্য ধরা চলে, কিন্তু মনের দিক থেকে তা তো কখনোই অনুভব করছি না। যখন ছোট ছিলাম, তখন মনে হতো সত্তর বছর বয়স! ওরে বাব্বা রে! সে তো একেবারে বুড়ো থুথ্থুরে। লাঠি নিয়ে হাঁটে। সর্বনাশ! এখন সত্তুরে এসে দেখছি, কই তেমন তো কিছু খারাপ নয়।

নির্লজ্জভাবে প্রশ্ন তুলি—থাকবেন না, চলে যেতে হবে একদিন এই বোধটা কখনো কি আতঙ্কিত করে?

তিনি সহজাত মানসিক সুদৃঢ়তায় বলেন, নাহ। আমার করে না। আমার মনে হয়, যে বেশ ভালোই একটা জীবন কাটালাম।

আপনার কাছে লেখালেখির আনন্দ ও কষ্টসাধ্য শ্রমের মধ্যে আনুপাতিক অনুভূতিটা কী রকম?

লেখালেখিটা কষ্টেরই, আনন্দের না। শারীরিক কষ্ট, মানসিক কষ্ট। কষ্টের বোধ সবচেয়ে বেশি। তবে লেখাটা শেষ হলে অন্যরকম একটা আনন্দের বোধ হতে পারে। একটানা কোনো দুঃখ ও কষ্ট কবিতার ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোনো না কোনো অতৃপ্তি বা দুঃখবোধ লেখার মধ্যে চলে আসে। লেখার মধ্যে উচ্ছলতা-আনন্দ-টগবগে ভাবা সহজে থাকে না।

আপনার কি মনে হয়, প্রকৃত শিল্পী মাত্রই তিনি এক ধরনের উদ্বাস্তু এবং খাপ না খাওয়া মানুষ?

হুম্। সে তো বটেই। তাকে অনেক সময় মানিয়ে নেবার চেষ্টা করতে হয়। কিন্তু সে অন্যদের মতো নয়। প্রকৃত শিল্পী কিছুতেই আর দশজনের মতো নয়, কিছু কিছু ব্যাপারে সৃষ্টি ছাড়া লোক সে হবেই।

আমাদের সমাজ হচ্ছে একটি পীড়নকারী সমাজ। দুর্বলদের ওপর সবলদের অত্যাচার প্রথাগতভাবে প্রবহমান। নারীরা এখনো আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় পদানত হয়ে থাকতে, দুর্বল প্রতিপন্ন হতে বাধ্য হয়। দু-একটা ব্যতিক্রম ছাড়া, কেন এই বাধ্যবাধকতা?

নারীদের পদানত করে রাখাটা একটা কাপুরুষতা। কাপুরুষতা এই জন্য যে, শুধু শারীরিক শক্তি বলে নারীদের নিচে রাখার চেষ্টা। কিন্তু আমরা দেখতে পাই মেয়েরা মেধাতে, কল্পনাশক্তিতে, সবকিছুতেই পুরুষদের সমান হতে পারে, সব কাজেই এগিয়ে যেতে পারে, অথচ পুরুষরা শুধু শারীরিক শক্তির অমানবিক সুযোগ নিয়ে ..আর যেহেতু মেয়েদেরকে গর্ভধারণ করতে হয়, সন্তান জন্ম দিতে কিছুদিন তাদের আবদ্ধ হয়ে থাকতে হয়—এই জাতীয় কুৎসিত সুযোগ নিয়ে পুরুষরা তাদের ওপর অত্যাচার করে।

কিন্তু তৃতীয় বিশ্বে এটা মাত্রাতিরিক্ত দেখা যায়।

তৃতীয় বিশ্বে বেশি, কিন্তু সারা বিশ্বেই তো আছে, কোনো জায়গা থেকেই একেবারে মুছে যায়নি। আবার কোনো কোনো জায়গায় মেয়েরা বেশি অধিকার পেয়ে যাচ্ছে। অথবা মেয়ে-পুরুষের সমান অধিকার দিতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, বিবাহ টিকছে না, ভেঙে যাচ্ছে।

আপনার কি এরকম কোনো আক্ষেপ আছে যে, এই সমাজে জন্মগ্রহণ না করে যদি ইউরোপ বা প্রথম বিশ্বের কোনো দেশে আপনার জন্ম হতো তা হলে অনেক ভালো হতো?

আমি ওই বিষয়ে ভাবিনি এই জন্য যে, অল্প বয়স থেকেই আমি এই বাংলা ভাষার নেশায় নিমজ্জিত। এই ভাষা ছেড়ে কোথাও যেতে পারবো না। আমি তো গিয়েছিলাম, বিদেশে অনেক বছরই ছিলাম। চলে এসেছি কেন? এই ভাষার টানেই চলে এসেছি।

না, আমি বলছিলাম যে, আপনার এই ভাষার ওপর ভালোবাসার শেকড় গেঁথে যাবার পর তার টানে আপনি চলে আসতেই পারেন, কিন্তু সেই শেকড় গাঁথবার আগে...

বাকিটা তো হাইপোথিসিস। যদি এই হতো, যদি ওই হতো, ওভাবে ভেবে লাভ নেই। আমি এই বাংলা ছেড়ে কোথাও যেতাম না।

আপনার প্রথম জীবনের দারিদ্র্যের জন্য যে ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন হয়েছে সেটা কি পরবর্তী সময়ে সাহিত্য সৃষ্টির সময় আপনার ভাবনা জগতকে সমৃদ্ধ করেনি?

তা তো জানি না। (হেলে-দুলে হেসে) ওভাবে তো ইচ্ছে করে হয় না, দরিদ্র পরিবারে জন্মেছি, সংগ্রাম করতে হয়েছে, পায়ে দাঁড়াবার জায়গা জোগাড় করতে হয়েছে। সেসব অভিজ্ঞতা লেখার কাজে লাগবে কি-না তা তো তখন ভাবিনি, লিখতে গিয়ে পরবর্তী সময়ে হয়তো এসে গেছে।

'দেশ' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য; তাঁর মতো করে এতো বৈচিত্র্য বিষয়ে এবং বিশাল শব্দ, বাক্যের স্রোতে 'দেশ'কে এতো বৈভবে আর কেউ ভাসাতে পারেনি। 'দেশ'-এর আঁতুর ঘরে শীর্ষ পর্যায়ের নীতি-নির্ধারক হওয়া সত্ত্বেও নিরোদ সি চৌধুরীর বাংলাদেশকে নিয়ে

লেখা অতি বিতর্কিত ভয়াল প্রবন্ধটির জন্য তাঁর দায় এবং তৎকালীন সেই লেখাটিকে ঘিরে 'দেশ' পত্রিকার ওপর যে ঝড় বয়ে গিয়েছিলো সেই প্রসঙ্গে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জানালেন–

'দেশ' পত্রিকার ওপর ঝড় বয়ে গিয়েছিলো তা নয়, কয়েক বছরের জন্য বাংলাদেশে 'দেশ' পত্রিকাকে নিবিদ্ধ করে দেয়া হয়েছিলো। তো 'দেশ' পত্রিকা এতো বড় একটা সংস্থার সঙ্গে জড়িত যে, বাংলাদেশে পনেরো কুড়ি হাজার কপি বিক্রি না হলে 'দেশ' পত্রিকার বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় না। কিন্তু বাংলাদেশের পাঠকদের ক্ষতি হয়—যারা এই পত্রিকার পাঠক তারা বঞ্চিত হয়।

মি. চৌধুরী যে কথাটা অসতর্কভাবে লিখেছিলেন, তার জন্য আমরা সম্পাদকীয় কলামে মার্জনা চেয়েছি। একটা ভুল তো মানুষের হতেই পারে। ভুলটা যদি আমরা জোর করে বজায় রাখতাম তাহলে একটা মানে ছিলো। আমরা যখন ওটার জন্য ক্ষমা চেয়েছি এবং 'ভুল'কে ভুল বলে স্বীকার করেছি, তারপর তো ওটাকে নিয়ে জোরাজুরি করার কোনো মানে ছিলো না। কাজেই, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে স্বার্থসম্পন্ন মতলববাজ কিছু লোক মিলিয়ে ওটা করেছে।

আর বাংলাদেশের পাঠকমহল ও ভারতীয় বইয়ের বিশাল বাজার নিয়ে...

বাংলাদেশে ভারতীয় বইয়ের বিশাল বাজার নিয়ে কী বলবো? আমার তো সব বইই ওখানে পাইরেট করে বিক্রি হয়। সারা বাংলাদেশেই সেই জাল বই ছেয়ে গেছে। এমনো দেখা গেছে, যেই বইটা এখানে প্রকাশ পায়নি, এমন বইও ওখানে বেরিয়ে যাচ্ছে। যেমন ধরো—আমি 'রানু ও ভানু' নামে একটা উপন্যাস পূজা সংখ্যায় লিখেছিলাম, সেটা আমি আনন্দ পাবলিশার্সকে বলেছিলাম যে, এক্ষুণি বই করবে না, একটু দাঁড়াও আমি কিছু কিছু সংশোধন করবো, তারপর বই বেরুবে। কিন্তু বাংলাদেশে পূজা সংখ্যা থেকে উপন্যাসটি বই আকারে ঠিক বেরিয়ে যায়।

কিন্তু বাংলাদেশের বই তো এখানে বিশেষ আসে না।

আসে না, তা তো নয়; কোনো বাধা তো নেই। এখানে পাঠক সৃষ্টি করতে হবে। এখানে তো পত্রপত্রিকায় বাংলাদেশের লেখকদের লেখা বেরোয়.. প্রতি বছর পূজা সংখ্যায় 'দেশ' পত্রিকায় হুমায়ূন আহমেদের লেখা বেরোয়।

কিন্তু সেটা মনে করা হয় যে, বাংলাদেশে হুমায়ূন আহমেদের বিশাল জনপ্রিয়তার জন্য। সেই জনপ্রিয়তার রেশ ধরে 'দেশ' পত্রিকার বাড়তি কাটতির জন্যে...

কিন্তু এটাও তো সত্যি যে, এদেশের পাঠকদের কাছে হুমায়ূন আহমেদকে উপস্থাপন করা হচ্ছে। আর 'দেশ' এখানেই সর্বাধিক বিক্রি হয়।

দু-একটা হুমায়ূন আহমেদকে দিয়ে কি পাঠকদের প্রকৃত মন জয় হচ্ছে?

বাংলাদেশের পাঠকদের সার্বিক মন জয় করে ছাপা সম্ভব হয় না—এটা যেমন সত্যি, তেমনি এখানকার পাঠকদের কাছে ওইসব লেখক পরিচিত হয়ে উঠছে, তাতে করে এখানে তাদের একটা বইয়ের বাজার তৈরি হতে পারে শামসুর রাহমান থেকে আরম্ভ করে এখন অনেকের বই-ই ছাপা হয়, বিক্রি হয়। আগে যেমন বলা হতো একেবারেই বিক্রি হয় না, সেটা কিন্তু এখন আর সত্য নয়, হয়তো তা খুব বেশি নয়। তার জন্য আগে এখানে মার্কেট তৈরি করতে হবে।

সম্পাদকের চাপে এই যে লিখে যাচ্ছেন, অনেকটা ঠিকাদারি লেখা ক্লান্তি আসে না?

কী বলছো ঠিক বুঝতে পারছি না।

মানে, কিছু লেখা আছে যা ঠিকাদারি গোত্রের লেখা, চাপে পড়ে লেখা, সম্পাদকদের ফরমায়েসি লেখা যাকে বলে...

কী ধরনের লেখা?

গল্প উপন্যাস-কবিতা। ধরুন উপন্যাস...

সম্পাদকদের চাপে পড়ে এখন আর আমি উপন্যাস লিখি না।

আগে তো লিখেছেন যথেষ্ট?

সে তো অল্প বয়সে যখন আমার দারিদ্র্য ছিলো, খাওয়া-পড়ার সমস্যা ছিলো, লিখে আমার খেতে হতো, তখন অনেক লিখেছি। ছোটখাটো সিনেমা পত্রিকায় অমুক পত্রিকায় তমুক পত্রিকায়। অনেক লেখা হয়তো হালকা হয়েছে। তবে ওবকম একটা লেখা বেশি জনপ্রিয় হয়ে গেছে। যেমন ধরো—অরণ্যের দিনরাত্রি। সেটা আমি হেলাফেলা করে আমাব পত্রিকার (কৃত্তিবাস) ধার মেটানোর জন্য লিখেছিলাম; সেটাই সিনেমা হলো, জনপ্রিয়ও হলো খুব। কাজেই, হেলাফেলা করে লেখাও কখনো কখনো উত্তীর্ণ হয়। এখন অবশ্য আমি ওরকমভাবে সম্পাদকদেব অনুরোধে কিছু লিখি না। এখন আমি যা লিখি স্বতঃস্ফূর্তভাবে লিখি।

মনে হয় না কখনো, আপনার লেখা য়-ভাবনায়-সৃজনশীলতায় রিপিটেশন হচ্ছে? পৌনঃপুনিকতা আসছে?

সে যদি পাঠকদেব মনে হয়, হতে পাবে না। লিখবো না।

আপনার নিজের কী মনে হয়? পৌনঃপুনিকতা কি আপনাকে আবদ্ধ করছে?

আমায় লেখায়?

হ্যাঁ।

মনে তো হয় না। আমি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দিক ও বিষয়বস্তু নিয়ে বৈচিত্র্যময় লেখা লিখি।

তাঁর অনেক কাহিনী সেল্যুলয়েড বন্দি হয়েছে। সেই তখন, যখন অবধি তিনি গদ্য শিল্পীর প্রাথমিককালে, বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্রকারের (সত্যজিৎ রায়) পর পর দুটো ছবির কাহিনীকার হিসেবে আবির্ভূত হন। তাব যেসব লেখা নিয়ে চলচ্চিত্র হয়েছে, সেসব চিত্র কাহিনী পর্দায় দেখার সময় কখনো কি তাঁর মনে হয়েছে যে, এই কাহিনী কি আমার? আমি তো এভাবে লিখিনি। আমাদের এই জিজ্ঞাসাব জবাবে জানালেন

এটা খুব শক্ত ব্যাপার। সাহিত্যকে যখন সিনেমা করা হয় তখন তা অনেকটাই বদলে যায়। সিনেমা যাবা করে তাবা বলে যে, এটা তো আলাদা এক মিডিয়াম, এটার জন্য কাহিনীর কিছুটা অদল-বদল করতেই হয়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাব কাহিনী থেকে যেসব সিনেমা হযেছে সেসব আমাব পছন্দ হয়নি।

নিজের কাহিনীর ওপর এভাবে কলম চালালে আপনার আপত্তি...।

আপত্তি হলেও মানে না ওবা। তবে সত্যজিৎ বায় আমার কাহিনী নিয়ে যে দুটো সিনেমা করেছিলেন, তার মধ্যে 'প্রতিদ্বন্দ্বী'টা আমার খু' পছন্দ হয়েছে।

আপনি নাকি 'অরণ্যের দিনরাত্রি' সিনেমা নিয়ে সত্যজিৎ রায়ের কাছে ইতিবাচক মন্তব্য করেছিলেন; অথচ ক'দিন আগে এক টিভি সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, আপনার কাহিনীর ওপর ওরকম কাটা-ছেঁড়া আপনার ভালো লাগেনি - বিজয়া রায় (সত্যজিতের পত্নী) সেরকমই একটা অভিযোগ 'আমাদের কথা'য় সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন।

বিজয়া রায ঠিক বোঝেননি ব্যাপাবটা।.. আমি স ত্যজিৎ বাযকে বলেছিলাম যে, আপনাব 'অবণ্যের দিনবাত্রি'টা ফিল্ম হিসেবে খুবই ভালো হযেছে, কিন্তু আমার কাহিনীর সঙ্গে অনেক তফাৎ রয়েছে, কাহিনীকাব হিসেবে আমার একটু আপত্তি—এটা তো বলতেই পারি আমি।

বিবাহপ্রথায় বিশ্বাসী নন, কিন্তু বিবাহিত, এই সুদীর্ঘ বিবাহিত জীবনে সম্পর্কে জানতে চাইলে বললেন—

জানো তো, আমার বিবাহিত জীবনটা খুব ভালো। আমি অন্যাদেব দিকে তাকিয়ে দেখি তাদের অনেকেরই দাম্পত্য জীবনে কতো অদ্ভুত সব অশান্তি বাসা বাঁধে। তা, বউয়ের সঙ্গে আমার ভালোই সম্পর্ক। অনেক দিন তো হয়ে গেলো।

যোগ্য সহধর্মিণী...

যোগ্য কি-না জানি না, আমি তার যোগ্য কি-না তাও জানি না। এমনো তো হতে পারে, সে হয়তো আমার চাইতে ভালো। কিন্তু আমাদের দুজনের মধ্যে বেশ ভাব আছে। আর স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা—তোমাদের তো সবে আরম্ভ হলো—বেশিদিন বিবাহিত জীবনযাপনের পর যদি দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে তখনো বেশ ইয়ার্কির সম্পর্ক আছে, দুজন দুজনকে নিয়ে মজা করছে—তা হলে বুঝবে ভালো আছে। আর যদি দুজনেই ফরমাল হয়ে যায় বা গম্ভীর হয়ে থাকে এবং দিন দিন তা বাড়তে থাকে—সেটা খুব খারাপ লক্ষণ। আমার স্ত্রী'র সঙ্গে, জানো তো, এখনো আমার বেশ ইয়ার্কি-ঠাট্টা চলে।

স্ত্রী'র পরে আপনার জীবনে আর কে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে?

(খুব হেসে) সেটা বলাবো কোনো? সেটা বলবো কী? পারিবারিকভাবে বললে মায়ের কথা...

মায়ের অনুপস্থিতি এখনো তো খুব কাঁদায়....

এই তো কিছুদিন আগে চলে গেছেন, কাঁদায় না ঠিক। আমি বুঝতে পারি, আমার মা ঠিক সময়েই গেছেন। চুরাশি বছর বয়স তো ভালো বয়স। তবে একটা শূন্যতা বোধ তো থাকেই।

আপনার একটা ছবি আনন্দবাজারে এসেছিল বেশ সুন্দর একটা ফুলের তোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। জন্মদিনটা একটু নিভৃতে, অনাড়ম্বরে পালন করতে ইচ্ছে করে না?

উপায় নেই তো। আগে তো জন্মদিন পালন এভাবে হতোই না। এখন লোকে দিনটা জেনে গেছে, তাই...।

আত্মহত্যা করতে কখনো সাধ জেগেছে?

অল্প বয়সে সাধ জেগেছে কয়েকবার, এখন আর করে না।

আপনি যখন আপনার খোলামেলা বা বিতর্কিত ভাবনাগুলোকে প্রকাশ করতে ভয় পান, যখন আপনার মনে হয় যে, আপনার ভেতরটা স্ব-আরোপিত বা বাধ্যগত কিছু নিষেধাজ্ঞার ঘেরাটোপে বন্দি হয়ে আছে—তখন, আপনার সেই ভাবনাগুলোকে আপনি কতোটা কবিতায় এবং কতোটা গদ্য বা গল্পে বা উপন্যাসে প্রকাশ করেন?

আমি একটা জিনিসই ভয় পাই, সেটা হচ্ছে—ধর্মীয় সমালোচনা। আমার মনের মধ্যে আছে, ধর্ম সম্পর্কে আমার অনেক বক্তব্য আছে। কিন্তু সব সময় এটা লিখে প্রকাশ করি না। তার কারণ হচ্ছে, আমি একটা জিনিসকে খুব ঘেন্না করি—দাঙ্গা। আমার লেখার কারণে যদি কোনো দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়, তবে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে। আমি চাই না, আমার লেখার জন্য একটাও নিরীহ প্রাণ নষ্ট হোক। আসলে ধর্ম জিনিসটাকে নিয়ে আমি যতোটা লিখতে পারতাম, ততোটা লিখি না। এই একটা বিষয় বাদ দিয়ে আর কোনো বিষয়ে আমার কোনো ভয় নেই।

৩০

❑ ১৯৫১-তে আপনার প্রথম কবিতা প্রকাশ। অর্থাৎ এবছর আপনার লেখক জীবনের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হল। অর্ধেক শতাব্দী বলা যায়।

❑ ❑ হ্যাঁ, শতাব্দী শব্দটা শুনলেই কত বড় মনে হয়। বছর তার পাশে অনেক ছোট। বেশ মজার।

❑ লেখক জীবনের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে কী মনে হচ্ছে আপনার?

❑ ❑ সত্যি বলতে কি, পঞ্চাশ বছর কী করে পেরিয়ে গেল টেরই পাইনি। একেবারে যেন ম্যাজিকের মতো। যেন আমার জীবনটা কোন জাদুকরের হাতের খেলা। মনে হচ্ছে, এই তো সেদিন লেখালেখি শুরু করেছি। ঘাড় ঘোরালেই যেন সেই দিনগুলোকে দেখতে পাব। অথচ পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে গেল। মাঝখানের এই ব্যবধানটা যে পঞ্চাশ বছর, তা ভাবতেই আমার ভয় করে।

❑ প্রথম কবিতাটি লিখেছিলেন 'অপর্ণা' নামের একটি মেয়েকে নিয়ে। লেখক জীবনের পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে এসে তাঁকে আর মনে পড়ে? কেমন সে দেখতে ছিল? সে দিনগুলোর দিকে ফিরে তাকালে কী মনে হয়?

❑ ❑ প্রথম জীবনের সেই বালিকার কথা সবই স্পষ্ট মনে আছে। চোখ বুজলে তাকে দেখতে পাই কখনও কখনও। কিন্তু সে আসলে কে, কেমন সে দেখতে ছিল, তা অন্যদের জানাতে যাব কেন? এই যে অপর্ণা নামটা বলেছি, তাও তার আসল নাম নয়। জীবনের সবকিছু হাটের মাঝে বলবার নয়।

❑ পঞ্চাশ বছরে লেখক হিসেবে খ্যাতি প্রতিষ্ঠা-অর্থ সবই পেয়েছেন। নিজেকে কতখানি সফল মনে করেন?

❑ ❑ সবই পেয়েছি নাকি? [মৃদু হাসি] আমি তো জানি না। আমার চোখের সামনে তো জীবনের ব্যর্থতাই বেশি। ঠিক নিজের মনের মতো একটাও লেখা লিখতে পারিনি। সেজন্য অতৃপ্তি রয়ে গেছে। এজীবনে এই অতৃপ্তি আর যাবে না। বলতে পারো খাওয়া-পরার সমস্যাটা ঘুচে গেছে। হ্যাঁ, তবু এটাকেই একটা সাফল্য বলা যেতে পারে।

❑ অমরত্বের প্রতি লোভ আছে?

❑ ❑ তুমি তো জানো, আমার অনেক কাল আগে লেখা একটা কবিতার লাইন ছিল, 'শুধু কবিতার জন্য আমি অমরত্ব তাচ্ছিল্য করেছি।' অমরত্ব সম্পর্কে এটুকুই আমার বলবার কথা।

❑ অমরত্বের প্রতি লোভ তো মানুষের জীবনে খুবই স্বাভাবিক। তাহলে আপনার নেই কেন?

❑ ❑ শারীরিক মৃত্যুর পরের কোনো কিছু নিয়েই আমার মাথাব্যথা নেই। যদি অমরত্ব থাকেও, তা আমার জন্য নয়। রক্তমাংসে আমি কখনও তাকে অনুভব করব না। তাহলে অমরত্ব নিয়ে ভাবার কী আছে?

❑ আপনার যে প্রায় জন-নেতার মতো ইমেজ, তার গোপন রহস্য কী বলুন তো? মানে

বলছি, আপনি তো পাবলিক ফিগার—

❑ ❑ পাবলিক ফিগার হয়ে উঠেছি নাকি! কই আমি তো জানি না। রাস্তা দিয়ে যখন হাঁটি, তখন তো তেমন কিছু টের পাই না। আমাকে ঘিরে ভিড়ও জমে না, গুঞ্জনও শুনতে পাই না। তাহলে পাবলিক ফিগার হলাম কী করে।

❑ ধরুন, আপনাকে একটি ঘরে আজ থেকে বন্দি করে রাখা হল। সেখানে নিজের একটিই বই আপনি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন। নিজের কোন বইটা আপনি নিয়ে যাবেন?

❑ ❑ নিজের বই নিতে যাব কোন দুঃখে! পৃথিবীতে আরও ভালো ভালো কত বই আছে! না, নিজের লেখা কোনো বই আমি সঙ্গে নেব না। যদি একটিই মাত্র বই নিতে দেওয়া হয়, তাহলে এইমুহূর্তে নির্বাচনে আমি সঙ্গে নেব 'অখণ্ড গীতবিতান'।

❑ এক প্রবল উন্মাদনায় সবকিছু ওলোটপালোট করে দেওয়ার বিদ্রোহী তাড়নায় আপনাদের লেখালেখির দিনগুলো শুরু হয়েছিল। আর আজ—লেখক জীবনের পঞ্চাশ বছরে আপনি একজন বিগ্রহ। এই ব্যাপারটাকে ভার মনে হয় না।

❑ ❑ অল্প বয়সের উন্মাদনা এখন নেই বটে, কিন্তু আমি বিগ্রহ হলাম কী করে, কবে থেকে! দেখো, আমি কোনরকম গুরুবাদে বিশ্বাস করি না। নিজে কারুর শিষ্য হইনি, কারুর গুরুও হতে চাই না। অল্পবয়সে নানারকম বিদ্রোহ করার ইচ্ছে ছিল, দু'একটা ঝুঁকিও নিয়েছি। এখন সেই বিদ্রোহের ভার তরুণদের ওপর। আমি তাঁদের দিকেই তাকিয়ে আছি। আবার বলছি, বিগ্রহ ব্যাপারটা আমি সত্যিই বুঝি না। আর এখন বড়জোর প্রতিবাদী হতে পারি, কিন্তু বিদ্রোহী হওয়া মানায় না।

❑ আত্মজীবনীর নাম 'অর্ধেক জীবন' দিয়েছেন কেন?

❑ ❑ পুরো লেখাটা পড়বার পর এর অর্থ যদি বোঝা না যায়, তাহলে আর ব্যাখ্যা করে কী হবে। আর সব অর্থ বোঝারও তো দরকার নেই। আমি তো অন্তত প্রয়োজন মনে করি না।

❑ ধরুন, 'আবোল তাবোল'-এর মতো আপনার বয়স আবার কমিয়ে দেওয়া হল। জীবনটাকে তাহলে কীভাবে শুরু করবেন?

❑ ❑ লেখালেখি রক্তেমজ্জায় মিশে গেছে বলতে পারো। যদি সত্যিই আমার বয়সটা আবার কমে যায়—আবার নতুন করে জীবন শুরু করা যায়, আমি আবার লেখালেখিই শুরু করব। হয়ত আরও একটু বেশি মন দিয়েই কাজটা শুরু করব। অন্য কিছু হতে চাই না আমি।

❑ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একাকী মুহূর্তে নিজেকে কীভাবে দেখেন?

❑ ❑ জীবনে একাকী মুহূর্তগুলি বড় দুর্লভ। নানা কাজে, নানাদিকে ঘুরে বেড়াতে হয়। তবু কখনও কখনও একা হতে হয়, হতেই হয়। সেই মুহূর্তগুলিতে আমি ধ্যান করি। অবশ্য এ ধ্যান অন্যরকম। ঐশ্বরিক কিছু এই ধ্যানের সঙ্গে জড়িয়ে নেই। ছাদে গিয়ে খোলা আকাশের নিচে বসি। হাতে থাকে সুরার পাত্র। মনে করার চেষ্টা করি, জীবনে কী কী ভুল করেছি। এক একটা ভুলের কথা মনে পড়ে আর হাসি পায়। দুঃখ হয় না, শুধু হাসি পায়।

৩১

রবিবারের সকালবেলা, সুনীলদা, দেরিতে হলেও সাহিত্য অকাদেমির সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার জন্য আপনাকে অভিনন্দন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : ধন্যবাদ।

প্রঃ ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পর আপনিই প্রথম বাঙালি, তিনি সাহিত্য অকাদেমির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। এটা কি সর্বভারতীয় সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের বাঙালির প্রতি শ্রদ্ধা, নাকি ব্যক্তিগতভাবে আপনার উপর তাঁদের আস্থার প্রতিফলন?

উঃ আসলে এটা নির্বাচনের মাধ্যমে হয়। মাত্র ৯৩ জন ভোটদাতা এখানে ভোট দেন। প্রতিটি ভাষা থেকে তিনজন প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব কেউ

লেখক, কেউবা অধ্যাপক। আমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন এম টি বাসুদেবন নায়ার, কেরালার নামী লেখক, আমার বন্ধুও বটে। কিন্তু সর্বভারতীয় স্তরে একজন বাঙালিকে নির্বাচন করা হয়েছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, আমি দক্ষিণ ভারত থেকে বেশি ভোট পেয়েছি। কারণ আমার লেখার অনুবাদের সঙ্গে ওখানকার মানুষ বেশি পরিচিত। তুলনায় উত্তর বা পূর্ব ভারতের মানুষরা নায়ারকে প্রায় চেনেনই না। আসলে যত বেশি লেখা অনুবাদ হবে, সর্বভারতীয় পাঠক-লেখক মহলে তত বেশি পরিচিতি বাড়ে।

প্রঃ আপনার ঠিক আগে পাঁচ বছর আগে আর এক বাঙালি সাহিত্যিক ওই পদে নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তিনি কিন্তু পরাজিত হন। ইতিমধ্যে কী এমন ঘটল যে নির্বাচকরা আপনার প্রতিই আস্থা জ্ঞাপন করলেন।

উঃ যিনি পরাজিত হয়েছেন, তাঁর সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য করা ঠিক হবে না। এখানে কোনও বাঙালি-অবাঙালি ব্যাপার নেই। আসল কথাটা হল পরিচিতি। বিভিন্ন ভাষার প্রতিনিধিরা প্রার্থীকে কতটা চেনেন সেটাই মুখ্য। আগেরবার যিনি পরাজিত হয়েছিলেন, তাঁকে লেখকের থেকেও বেশি একজন সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট রূপেই লোকে চেনেন। তাই তাঁর নির্বাচনের সময় প্রশ্ন উঠেছিল, তিনি পুরোপুরি লিটারেরি বডি-র অংশ নন। কিন্তু এক্ষেত্রে আমি সম্পূর্ণভাবেই একজন লেখক, আমার লেখা সর্বভারতীয় স্তরে অনুবাদ হয়েছে।

প্রঃ সাহিত্য অকাদেমির সভাপতি হিসেবে আপনার কাজ কী এবং সেই কাজে ইতিমধ্যে কতটা সাফল্য পেয়েছেন?

উঃ বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা আছে। সভাপতি হিসেবে নানারকম নীতি নির্ধারণ করতে হয়। যেহেতু এটা অল ইন্ডিয়া রাইটার্স বডি, তাই সব ভাষার লোকেদের মধ্যে পরিচিতি ঘটানোও একটা বড় দায়িত্ব। সাহিত্য অকাদেমি ২৪টা ভাষা নিয়ে কাজ করে। উদাহরণ দিলে বুঝবে যেমন উত্তর-পূর্বের লেখকরা কোনও গুজরাতি লেখককে চেনেন না। তাই সারা বছর ধরে বিভিন্ন সেমিনার, ওয়ার্কশপের

মাধ্যমে একপ্রান্তের লেখকদের অন্যত্র নিয়ে গিয়ে সেখানে পরিচয় করানো হচ্ছে। এতে লেখকরাও একটা বিশাল পরিচিতি পাচ্ছেন আস্তে আস্তে। যেমন—পঞ্জাবের লেখকরা গেলেন শিলং-এ, চেন্নাই-এ গেলেন বাঙালি লেখকরা। কলকাতাতে পি জি-র পেছনে (৪, ডি এল খান রোড) আমাদের নতুন অফিস হয়েছে। প্রচুর সেমিনারও হচ্ছে। এছাড়াও শিশুসাহিত্যের উপর পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। আসলে বর্তমানে শিশুসাহিত্যের ক্রমক্ষীয়মান অবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করতে, লেখকদের উৎসাহ দিতেই এই প্রচেষ্টা। ২৪টি ভাষার প্রতিটিকে এক্ষেত্রে সমান গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

প্রঃ যতদূর জানি, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সাহিত্য অকাদেমি চারটি বা পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত। এই অঞ্চলগুলি কি স্বাধীন নাকি দিল্লির নির্দেশে কাজ করে?

উঃ না, সাহিত্য অকাদেমি একটি স্বশাসিত, স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। এখানে সরকারের কোনও হস্তক্ষেপ নেই। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। এনডিএ সরকারের সময় যিনি সংস্কৃতি মন্ত্রী ছিলেন, তিনি বলেছিলেন হিন্দি ভাষার জন্য ২৫ লক্ষ টাকার একটি বিশেষ পুরস্কার দিতে। কিন্তু আমরা সেই দাবি মানিনি। সাহিত্য অকাদেমি প্রতিটি ভাষার সমান মূল্যের পুরস্কার দেয় (আগে ছিল ৫০ হাজার, এখন হয়েছে একলাখ)। তো সেখানে হিন্দিকে বিশেষ গুরুত্ব কেন দেওয়া হবে? দিতে হয় সরকার দিক। শেষপর্যন্ত অবশ্য সরকারও দেয়নি।

প্রঃ পূর্বাঞ্চলের কাজ কী?

উঃ এখানে ৭টি ভাষা আছে, যাদের একসঙ্গে 'সেভেন সিস্টার'স বলে, তা নিয়ে কাজ হয়, কলকাতা অফিস থেকে। মেঘালয়, অরুণাচল, মণিপুর, আসাম, ত্রিপুরার ভাষা ইত্যাদি। এছাড়া ওড়িয়া ভাষার কাজও এখান থেকে হয়।

আর শুধু সর্বভারতীয় স্তরে লেখকদের পারস্পরিক যোগাযোগই নয়। অনুবাদও সাহিত্য অকাদেমির একটা বড় কাজ। অনেকেই হয়তো জানেন না সাহিত্য অকাদেমি অন্যতম বড় প্রকাশক। গতবছর ২৪টা ভাষায় ৩৬৬টা বই প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিদিন প্রায় একটা করে বই। পুরস্কারপ্রাপ্ত অথবা ক্লাসিকস (সর্বভারতীয় স্তরে) অনুবাদ করে স্বল্পমূল্যে সাহিত্য অকাদেমি পরিবেশন করে।

প্রঃ সর্বভারতীয় ব্যাপারটা সামলানোর দায়িত্ব ও ঝক্কি কম নয়। এত দায়িত্ব আপনি সামলান কী করে?

উঃ একা হাতে আর কোথায়. এগজিকিউটিভ বডি আছে। নানারকম পরিকল্পনা আছে, সেই বডি-র কাছে সেগুলো পেশ করা হয়, বিভিন্ন তর্ক-যুক্তির পর হয়তো প্ল্যান পাশ হল। কেউ হয়তো ডিকশেনারি বা এনসাইক্লোপেডিয়া অফ এসথেটিক্স করার কথা বলল। সেই প্ল্যান এগজিকিউটিভ বডিতে যায়। তারপর সরকার অর্থসাহায্য করেন, এছাড়া লেখকদের বইয়ের বিক্রির অর্থও দেওয়া হয়। এসবের বাইরে সভাপতি হিসেবেও আমার নানারকম চিন্তাভাবনা থাকে।

প্রঃ সাহিত্য অকাদেমি ছাড়াও আপনি আরও দু-তিনটি সংস্থার সভাপতি। যেমন—শিশু কিশোর অকাদেমি, বুধসন্ধ্যা। এছাড়াও আছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করা। এতে আপনার নিজের লেখালেখির ক্ষতি হয় না? এত চাপ সামলান কী করে?

উঃ (হেসে) অনেক সময় সত্যিই হাসি পায়। এত সভাপতি কেন চারিদিকে। চাপ মনে করলেই চাপ। সবকিছুকে সহজভাবে নিলেই আর চাপ নেই। তবে হ্যাঁ, লেখার সময় কমে গেছে। পড়ার সময় তো আরও কমে গেছে। আমি নিজে লেখকের থেকেও বেশি একজন পাঠক। সেইসময়টা খুবই কমে গেছে।

প্রঃ সদ্য ইতালি থেকে ফিরেছেন। এই সাক্ষাৎকার যখন প্রকাশিত হবে, তখন আপনি মার্কিন মুলুকে। পুজোর লেখা কি আমেরিকায় বসে লিখবেন?

উঃ ছোটদের রোমাঞ্চ গল্পটা আমেরিকা যাওয়ার আগেই দিয়ে যেতে চাই। এছাড়াও নীললোহিত

আর আমার নিজের নামে দুটো উপন্যাস লিখব ওখানে বসে, শেষটা করব এখানে এসে। বঙ্গসম্মেলন, নিউইয়র্কে বাংলা বইমেলায় অংশগ্রহণের ফাঁকে ফাঁকেই লিখব।

প্রঃ আচ্ছা সুনীলদা, এবছর নতুন কী লিখবেন বলে পরিকল্পনা করেছেন?

উঃ শারদীয়া সংখ্যায় নিজের নামে যে-উপন্যাসটা লিখব তার বিষয়টা বেশ শক্ত। রামায়ণের কাহিনী। রামরাজ্য বলতে রামায়ণে যে একটা আদর্শ রাজ্যের কথা বলা হয়েছে, তা মোটেও সঠিক নয়। তখনও সেখানে অরাজকতা ছিল, শূদ্রদের উপর অত্যাচার হত। রামও দোষে-গুণে মেশানো একজন সাধারণ মানুষ। মানুষের মধ্যে সাম্য তখনও ছিল না এখনও নেই। ব্যাপারটা বিতর্ক সাপেক্ষ, তবে এটা একেবারেই আমার নিজস্ব মত।

প্রঃ আপনার লালন ফকিরকে নিয়ে লেখা 'মনের মানুষ' উপন্যাসটি নিয়ে গৌতম ঘোষ ছবি করছেন। এই উপন্যাস লেখার আইডিয়া পেলেন কোথায়?

উঃ (ইতিমধ্যে) একটা ফোন রিসিভ করে আবার ফিরে এলেন সাক্ষাৎকারে।

সুনীলদা, হ্যাঁ কোথায় যেন ছিলাম?

রবিবারের সকালবেলা, লালন ফকির...

সুনীলদা, লালনের গান ছোট থেকেই আমার খুব প্রিয়, বিভিন্ন শিল্পীর মুখে, রেকর্ড শুনে আমার।

খুব ভালো লাগত। কিন্তু ওঁর জীবনী আমার কাছে খুব একটা স্পষ্ট ছিল না। লেখার ইচ্ছে বহুদিন ছিল। কিন্তু মনে দ্বিধা ছিল। ওখানকার কুষ্টিয়া ভাষায় তো আর লিখতে পারব না। তারপর ভাবলাম সাধারণ বাংলাতেই তো লেখা যায়, মাঝে মাঝে দু-একটা কুষ্টিয়া শব্দ দিলেই তো হয়। আমরা যখন শাহজাহানের মুখে কোনও সংলাপ বসাই, সেখানে তো কোনও উর্দু কথা থাকে না।

অতদিন আগে লালনের কোনও জাতের বিচার ছিল না, বলেছিলেন, হিন্দু বা মুসলমান কেউ যেন না বিভেদ করে। শিষ্যরাও তাই বিশ্বাস করতেন। আসলে মনের ভিতরে যে-মানুষটা আছে, সেই আসল। সেখান থেকেই 'মনের মানুষ' নামটা। মানুষ হিসেবে শান্তিতে থাকাই সকলের কর্তব্য। হিন্দু বা মুসলমান পরিচয়টা আসল নয়।

তবে শুটিং-এ হাজির থাকতে পারিনি। গৌতম যখন বাংলাদেশ বা শান্তিনিকেতনে শুটিং করছে, শুনেছিলাম, কিন্তু ঠিক কো-অর্ডিনেট করা হয়নি। এখন ব্যাপারটা মিস করি।

প্রঃ আপনি, আর একটি খুব জরুরি কাজ করেন। 'কৃত্তিবাস' কবিতা পত্রিকার সম্পাদনা। সবটাই নিজে করেন, নাকি সহকারীরাই অনেকটা কাজ করে দেয়?

উঃ সহকর্মীরা আছেন। তবে সম্পাদক হিসেবে আসল দায়িত্বটা আমারই। আমার দেখা ছাড়া একটা লাইনও ছাপা হয় না। এটা আমার ছেলেবেলার শখ। তরুণ কবিদের সুযোগ দিই। সব লেখাই নিজে দেখে নিই।

প্রঃ বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ কেমন দেখছেন? পঞ্চাশের দশকে আপনারা যেমন হইচই ফেলেছিলেন, এখনকার তরুণরা সেরকম পারছেন না কেন? পাঠকরা কি তাঁদের ঠিকঠাক গ্রহণ করতে পারছেন?

উঃ কবিতার ভবিষ্যৎ জানো তো খুব একটা খারাপ না। তরুণ প্রজন্ম বেশ তৈরি হয়েই আসছে। এরকম না যে, তারা একেবারেই কিছু জানে না। অনেকের লেখাতেই বেশ 'স্পার্ক' আছে, তুলনামূলক ভাবে গদ্যের অবস্থা খারাপ। ভালো উপন্যাস, গল্পের অভাব আছে।

আমাদের সময় ব্যাপারটা অন্যরকম ছিল। তখন সবেমাত্র দেশ স্বাধীন হয়েছে। লেখার তাগিদ অনেক বেশি ছিল। জীবনধারণের প্রয়োজনেও লেখা ছিল। নতুন গড়তে হবে, ভেঙে ফেলো পুরনো সবকিছু, গুঁড়িয়ে দাও, আবার তৈরি করো—এরকম একটা উন্মাদনা ছিল। আসলে সাহিত্য জীবনযাত্রার সঙ্গেই সম্পৃক্ত। এখনকার মানুষের জীবনযাত্রা তো অনেকটা সহজ। অনেকেই অন্য জীবিকা পাশাপাশি

রেখে সাহিত্যচর্চায় আসছেন। এছাড়া গদ্যসাহিত্যে যে ডেডিকেশনটা লাগে, তা অনেক বেশি পরিশ্রমসাপেক্ষ। জীবনধারণের তাগিদটা সবসময় থাকে না বলে, হয়তো সেই পরিশ্রমটাও আসে না। সাহিত্য যেন শখের বশেই করেন।

তবে ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, শ্রীজাত, আর নতুন মেয়েটি, মন্দাক্রান্তা সেন, ও তো ডাক্তারি পড়া ছেড়ে লেখালেখির জগতে এসেছে।

প্রঃ সুনীলদা, আপনার এই যে কর্মবহুল জীবন, এতে আপনার স্ত্রী, স্বাতীদি কতটা প্রেরণার কাজ করেন?

উঃ স্বাতীর ভূমিকা অনেক বেশি। অনেকসময়ই বাড়িতে প্রচুর ভিড় হয়, স্বাতীকে সহ্য করতে হয়। প্রায়ই বাইরে যাই, তখন স্বাতীকে একা থাকতে হয়। তবে বেশিরভাগ সময়ই চেষ্টা করি স্বাতীকে নিয়ে যেতে। সাহিত্যিকদের মধ্যেই আমিই সবচেয়ে বেশি সস্ত্রীক বাইরে যাই। আর লেখার প্রেরণা হিসেবে স্বাতী ঠিক আমার কাছে কোথা থেকে শুরু হয়েছিল, তা বলা মুশকিল। ব্যস, চলতে চলতে একসঙ্গে হয়ে গেছি।

প্রঃ এই যে সংসারের সবকিছু স্বাতীদি একা সামলান, এই নিয়ে কোনও মনোমালিন্য?

উঃ ঠোকাঠুকি হয় না ভেবেছো! স্বাতী অন্তত আমাকে ১৪০ বার ডিভোর্সের কথা বলেছে। তবে ঠোকাঠুকি আছে, বড়োসড় কোনও ফাটল নেই। আমার তো মনে হয়, মাঝে মধ্যে স্বামী-স্ত্রী-র সম্পর্কে একটু ইয়ার্কি থাকলেই সম্পর্ক ঠিক থাকে। আর সেখানে বয়সও বোঝা যায় না। সবসময় গুরুগম্ভীর সম্পর্কের দরকার নেই। আমাদের মধ্যে এই ব্যাপারটা আছে।

প্রঃ সুনীলদা শেষ প্রশ্ন, এমন কোনও বিষয় আছে কি যা নিয়ে, লেখার খুব ইচ্ছে, অথচ লেখা হয়নি?

উঃ হ্যাঁ, সেরকম তো কিছু ছিলই। যেমন, বিবেকানন্দর জীবনী। এছাড়াও একশো বছর ধরে পাঁচ প্রজন্মকে নিয়ে বড় উপন্যাস লেখার ইচ্ছে আছে। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্ত পটভূমিকাই সেখানে থাকবে।

ধন্যবাদ, সুনীলদা। আপনি ভালো থাকুন, এই শুভেচ্ছা রইল।

স্মিতহাস্যে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে সুনীলদা সাক্ষাৎকার শেষ করলেন। নিজে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। বার বার বললেন, 'তুমিও ভালো থেকো।'

৩২

প্রশ্ন : কেমন আছেন এই প্রবাস ভূমে?

আমার তো প্রতি বছরই আসা হয় কোনো না কোনো কারণে। ভালোই লাগছে। এবার একটু শীতকালে এসে পড়েছি। সামার আমার কাছে ভালো লাগে। আমি গতবারও ছিলাম সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। শীত ছাড়া আর সবই ভালো।

প্রশ্ন : আমরা জানি, কবি-সাহিত্যিকরা স্বদেশে কিংবা প্রবাসে যেখানেই থাকুন সেখানেই তারা নতুন নতুন সৃষ্টি নিয়ে মেতে থাকেন। তা এখন আপনি কী নিয়ে কাজ করছেন—কবিতা, গল্প না উপন্যাস?

আমি আসলে প্রত্যেকবারই যখন আসি আমার এখানে কিছু লেখার চাপ থাকে। সোজা কথা লিখতে হয়। পাঠাতে হয় দেশে। এবার আমি দেশে অনেকগুলো লেখা শেষ করে তারপরে এসেছি। বলতে গেলে আমি এবার ছুটি কাটাতে এসেছি। আপনারা জানেন বাংলাদেশে 'কালি ও কলম' নামে একটা কাগজ আছে। সেখানে আমি একটি ধারাবাহিক উপন্যাস লিখছি 'মানুষ মানুষ' নামে। সেই লেখাটাই লিখছি ঢাকায় পাঠানোর জন্য। এর পাশাপাশি কিছু কবিতা লিখেছি। বড় কিছু লিখছি না।

প্রশ্ন : এক সময় কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নামেই আপনার অধিক পরিচিতি ছিল। এখন তা অনেকটাই ঔপন্যাসিকের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। এমনটা কেন হলো?

এর একটা কারণ আছে। এক সময় খুব কবিতা লিখতাম। এখন কবিতা খুব একটা লিখি না। গদ্য লিখি। গদ্য অনেক বড় হয়। আর এই গদ্যের আড়ালেই কবিতা চাপা পড়ে যায়। গদ্য লেখা শুরুর পিছনে আমেরিকার একটা ব্যাপার আছে। আমি খুব অল্প বয়সে আমেরিকায় এসেছিলাম ১৯৬৩ সালে। আপনাদের জানার কথা নয়। তখন আমার বয়স অল্প, বিয়ে করিনি। থেকে যাওয়া খুব সহজ ছিল। কোনো সমস্যা ছিল না। আমি আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে এসেছিলাম ইন্টারন্যাশনাল রাইটিং প্রোগ্রামে। তারা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। তখন আমার উপার্জন ভালো ছিল। আমার একজন ফরাসি বান্ধবী ছিল। তবুও আমি চলে গেলাম কেন?

প্রশ্ন: চলে গেলেন কেন?

আমার মাথার মধ্যে একটা পোকা ঢুকেছিল। আর সেটি হলো বাংলা ভাষায় লিখতে হবে। বাংলা ভাষায় লিখতে ভালো লাগে। বাংলা ভাষায় কবিতা লিখতে আনন্দ পাই। তখন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমাকে যদি বাংলা ভাষায় লিখতে হয় তাহলে যেখানকার মানুষ বাংলায় কথা বলে আমাকে সেখানে যেতে হবে। এই দেশে বসে আমি বাংলায় লিখতে পারবো না। অনেকে জোর করে আমাকে এখানে রাখতে চেয়েছিল, আমি কারো কথা শুনিনি, দেশে ফিরে যাই। ফিরে যাওয়ার পর তো আমি বেকার। চাকরি-বাকরি যা ছিল তা ছেড়ে দিয়ে এসেছিলাম। আমি যখন বেকার তখন খাওয়াবে কে? আর যা এখানে উপার্জন করেছিলাম তা যাওয়ার সময় সব টাকা খরচ করে ফেলেছিলাম।

আমি তখনই ভেবেছিলাম আমার মনে হয় আর আসা হবে না। তাই ভ্রমণে বের হলাম। আমি ভ্রমণ করতে ভালোবাসি। আমি প্যারিসে গেলাম, ইংল্যান্ডে নিমন্ত্রণ ছিল, সুইজারল্যান্ডসহ অন্যান্য দেশে গেলাম। এই দেশগুলো আমি ছোটবেলা থেকেই কল্পনায় দেখতাম। এসব দেশ ঘুরতে ঘুরতে আমি যখন ইজিপ্টে গেলাম এবং হোটেলে বসে দেখলাম আমার পকেটে আর মাত্র ১০ ডলার আছে। ভাগ্য ভালো টিকিটটা ছিল রাউন্ড ট্রিপ, যে কোনো জায়গায় নামা যেত। এভাবে চলতে চলতে যখন দেখলাম আর পয়সা নেই তখন চলে গেলাম কলকাতায়। কলকাতায় ফিরে গিয়ে খবরের কাগজে গদ্য লিখতে শুরু করলাম। কারণ কবিতা লিখলে টাকা দেয় না। খবরের কাগজে নানা ছদ্মনামে ফিচার লিখতাম। তারপরে উপন্যাস এবং গল্প লিখতে শুরু করলাম। তাও ২/১ খানা লেখার পর আর নাও লিখতে পারতাম। কিন্তু একটা উপন্যাস সত্যজিৎ রায়ের পছন্দ হলো, তিনি সিনেমা করবেন বললেন। তখন সত্যজিৎ রায়ের বিশ্বজোড়া নাম। তার আগে তিনি বড় বড় লেখকদের ক্লাসিক্যাল কাহিনী নিয়ে ছবি করেছেন। হঠাৎ আমার একটা গল্প নিয়ে তিনি ছবি বানাবেন তখন সকলের কৌতূহল হলো আমার ব্যাপারে, ছেলেটা কে রে বাপ্পা? কবি হিসেবে আমাকে কম লোকেই জানাতো। কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের কারণে অনেক লোকেই জেনে গেল আমাকে, আর তিনি যে ছবিটা করার সিদ্ধান্ত নিলেন সেই ছবিটার নাম ছিল 'অরণ্যের দিনরাত্রি'। তারপরে আমি আরেকটা ছোট উপন্যাস লিখলাম 'প্রতিদ্বন্দ্বী'। সেটাও সত্যজিৎ রায় সিনেমা করেছিলেন। সত্যজিৎ রায়ের মতো মানুষ আমার উপন্যাস নিয়ে পর পর দুটো সিনেমা করার পর কাগজের সম্পাদকরা বললেন, শুধু কবিতা লিখলে চলবে না। আপনাকে গল্প দিতে হবে, উপন্যাস দিতে হবে। যে কারণে আমি উপন্যাসের জগতে চলে গেলাম। প্রথম প্রথম আমি যে উপন্যাসগুলো লিখতাম সেগুলো আমি আমার জীবন নিয়ে লিখতাম। নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা। জ্যাকপেলওয়ার্ড নামের একজন আমেরিকান ঔপন্যাসিকের সঙ্গে আমার পরিচয় এবং বন্ধুত্ব হয়েছিল। আমেরিকায় আমি যখন ছিলাম তখন অনেক আধুনিক লেখকের সঙ্গে আমার পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়েছিল। এর মধ্যে এ্যালেন গিনসবার্গ হচ্ছেন বিশ্ববিখ্যাত কবি। তার সঙ্গে আমি তার নিউইয়র্কের বাড়িতেও ছিলাম। আরেকজন বিখ্যাত লেখক ছিলেন জ্যাকটেইলর। তার উপন্যাস 'অন দ্যা রোড' খুব নাম করেছিল। জ্যাকটেইলর একদিন আমাকে কথায় কথায় বলেছিল, জানো তো উপন্যাস লেখা খুব সোজা। আমি বললাম তাই নাকি। আমি তো জানিই না। সে তখন আমাকে বললো তুমি তোমার জীবনের যে কোনো একটা দিন ঠিক করো। যেমন তুমি দুই মার্চ কী করেছো চিন্তা করো। ধর তুমি বাসস্টপে দাঁড়িয়ে আছ। ওখান থেকেই শুরু কর উপন্যাস। তুমি বাসে উঠলে, বাস কোথায় গেল এবং কিভাবে গেল এগুলো লিখতে লিখতে দেখবে গল্প লেখা হয়ে গেল। নিজের জীবনের খণ্ড একটা অংশ লিখলে উপন্যাস হয়। আমাকে যখন খববের কাগজে লিখতে হলো তখন ওই উপদেশটা আমার মনে পড়ে গেল। তখন থেকেই আমি আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে লিখতাম। তারপর একটা সময় মনে হলো এর তো একটা সীমা আছে, যখন আমাকে খুব বেশি লিখতে হলো। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা আর কত লিখবো। লোকজন তো বিরক্ত হয়ে যাবে। সব তো একই রকম হয়ে যাবে। এরপর আমি পড়াশোনা করে ইতিহাস নির্ভর উপন্যাস লেখা শুরু করলাম। তার প্রথমটাই হচ্ছে 'সেই সময়'। পূর্ব-পশ্চিম এবং প্রথম আলোও ইতিহাস নির্ভর কাহিনী। এখন আমি দু'রকমই লিখি।

প্রশ্ন : ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি এবং আপনার ব্যক্তিজীবনকে নিয়ে লেখা বড় আকারের এবং একাধিক খণ্ডে রচিত উপন্যাস সেই সময়, পূর্ব-পশ্চিম, প্রথম আলো এবং অর্ধেক জীবনের মতো আর কোনো গল্প নিয়ে কাজ করছেন কি?

আমার একটা ইচ্ছা আছে। আমি বইপত্র জোগাড় করছি। বাংলাদেশে ইসলামের আগমন এবং সুফিধর্মের প্রভাব, হিন্দুদের মধ্যে কুসংস্কার এবং হিন্দুদের মধ্যে একশ্রেণীর লোকের আরেক শ্রেণীর

লোকের ওপর অত্যাচার যে সময়টার ছিল সেই সময়টা নিয়ে লেখার একটা ইচ্ছা আছে।

প্রশ্ন : আপনি সাংবাদিক হিসেবেও খ্যাত। বর্তমানে আপনি লেখালেখির কোন শাখাতে বেশি আনন্দের সন্ধান পান বা আনন্দ ভোগ করেন?

আমি সত্যিকারভাবে সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত ছিলাম না। তবে সংবাদপত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলাম। আমি হয়তো পুস্তক পরিচিতি বিভাগের সম্পাদক ছিলাম, যাকে বলে বিভাগীয় সম্পাদক।

প্রশ্ন : বাংলা সাহিত্য পশ্চিমবাংলা হিন্দির দাপটকে কতটা ঠেকাতে পারছে?

পশ্চিমবাংলাতে হিন্দির যে খুব একটা প্রভাব আছে তা নয়। তবে শহরের ছেলেমেয়েরা একটু-আধটু হিন্দি ভাষা ব্যবহার করছে। আজকাল তো ঢাকাতেও ছেলেমেয়েরা টিভিতে হিন্দি সিরিয়াল দেখছে। তবে হিন্দি ভাষার কোনো সামগ্রিক প্রভাব এখনো পড়েনি। আমাদের প্রধান দ্বন্দ্ব হচ্ছে ইংরেজির সঙ্গে। এটা ঢাকাতেও আছে। অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা এখন ইংরেজি শিখতে বাধ্য। ইংরেজি শিখতে গিয়ে তারা আর বাংলাটা শিখছে না। এই সমস্যাটা হয়েছে। তবুও বাংলাদেশে বাংলাটা বাধ্যতামূলক পড়তে তো হবেই। ঢাকাতে একটা কথা চালু আছে, ফেব্রুয়ারি মাসে সবাই বাঙালি, অন্য সময় ইংরেজদের অনুকরণ করে। ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠান হয় তখন সবাই বাংলা ভাষাপ্রেমী হয়। বড়রা পায়জামা-পাঞ্জাবি পরলেও ছেলেমেয়েরা পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে না। তারা প্যান্ট-শার্ট পরে। পশ্চিমবাংলার তো ছেলেমেয়েরা বাংলা কম শেখে। তবে গ্রামে এখনো বাংলা শেখে।

প্রশ্ন : দুই বাংলার সাহিত্যের তুলনামূলক বিচারে অনেকেই এখন বাংলাদেশকে পশ্চিমবঙ্গের উপরে রাখতে চান। আপনার মত—

অনেকে উপরে রাখতে চাইলে রাখবে, আমার কোন আপত্তি নেই। তবে সাহিত্য তো ওরকম কোন বিষয় নয়। বাংলাদেশে এখন লেখক-কবির সংখ্যা অনেকে বেড়েছে। পশ্চিমবাংলার তো আগে থেকেই ছিল। এখন যদি দুই ধারায় চলে তাহলে মন্দ কী? তবে একটা ধারা মুছে যাবে, আরেকটা ধারা থাকবে এটার কোন মানে হয় না, আবার কেউ কারো উপরে যাবে এটারও কোন মানে হয় না। আমার মতে বাংলাদেশে যেমন ভালো লেখা হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গেও ভালো লেখা হচ্ছে। তবে প্রকাশনার গুরুত্বটা মনে হয় বাংলাদেশে বেড়ে যাবে।

প্রশ্ন : লেখার গুণগত মান সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

আমি যদি মনে করি আমি দুই বাংলারই লেখক তাহলে আমি বাংলাদেশেরও লেখক পশ্চিম বাংলারও লেখক। বাংলাদেশের অনেক কাগজে আমার লেখা বের হয়। এরকম অনেকেই আছেন যারা দুই বাংলাতে লিখেন। কাজেই ওরকমভাবে ডিভিশন না রাখাই ভালো।

প্রশ্ন : অনেকেই মনে করে আপনি, সমরেশ মজুমদার, শীর্ষেন্দু, সমরেশ বসু, জয় গোস্বামী, সার্থকভাবেই আপনাদের পূর্বসূরিদের শূন্যতা পূরণ করতে পেরেছেন, আপনাদের উত্তরসূরিদের মধ্যে কি তেমন কাউকে দেখতে পাচ্ছেন যাদের মধ্যে আপনাদের শূন্যতা পূরণের সম্ভাবনা রয়েছে।

হ্যাঁ। আমি তো বিশ্বাস করি সাহিত্য থেমে থাকে না। সাহিত্য নদীর মতো, সব সময় স্রোত বইতে থাকে। আমাদের চেয়ে ভালো ভালো লেখক আসবে বলে আমি আশাবাদী। তবে আমি নাম বলি না। আমি সবাইকে চিনি। পাঁচজনের নাম বলবো পাঁচজনের নাম বলবো না তাতে অনেকে দুঃখ পান। আমি সাধারণভাবে বলতে পারি আমি আশাবাদী দুই বাংলাতেই আরো প্রতিভাবান লেখকের আবির্ভাব ঘটছে।

প্রশ্ন : বাংলা সাহিত্য চর্চা আগের মতো গুণে-মানে মৌলিকত্বে এবং ব্যাপকতাতেও হচ্ছে কি? না হলে কারণটা কী?

আমাদের কতগুলো প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সেটা হচ্ছে যদি পাঠক না থাকে তাহলে লেখা হবে না। একসময় ধারণা ছিল পাঠকদের টিভিতে টেনে নিচ্ছে। টিভির জন্য লোকজন বই

পড়বে না, তারা টিভি দেখবে। এখন টিভির চেয়েও বড় প্রতিযোগিতা হচ্ছে কম্পিউটারের সঙ্গে, ইন্টারনেটের সঙ্গে। এই আমেরিকায় বিখ্যাত লেখকদের বই আর বের হয় না, চলে যায় ইন্টারনেটে। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা ইন্টারনেটে এখনো সাহিত্য পড়ে না কিন্তু তারা বসে থাকে কম্পিউটার নিয়ে। তারা যদি বই না পড়ে কম্পিউটার নিয়ে বসে থাকে এবং কম্পিউটারে বসে সব জানতে চায় তাহলে লেখা কমে যাবে বাংলা সাহিত্যের। আর যদি এমন হয় কম্পিউটারও যদি টিভির মতো সীমাবদ্ধ হয়ে যায় তাহলে লোকজন আবার বই-এর দিকে ফিরে আসবে তাহলে আরো অনেক কিছু লেখা হবে। পাঠক না থাকলে প্রকাশকও বই ছাপবে না আবার লেখকও উৎসাহিত হবে না। নির্ভর করছে সাধারণ লোকের পাঠের অভ্যাসের উপর। তারা কোনদিকে যায়।

প্রশ্ন: দেখা যায় আমাদের মানুষদের মধ্যে পড়ার অভ্যাস কম?

অভ্যাস কম মানে কী। দেখা যায় ৬০ পার্সেন্ট লোক কোনো কিছুই পড়ে না। সবাইতো আর বই পড়বে না। শতকরা যদি ২৫ ভাগ লোক বই পড়তো তাহলেও অনেক হয়ে যেত আমাদের জনসংখ্যার দিক থেকে। তার থেকেও যদি কমে যায় তাহলে ভয়ের কথা।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের সাহিত্য কর্ম সম্পর্কে কি কোনো খোঁজখবর রাখেন? কাদের সম্ভাবনাময় বলে মনে করেন ভিন্ন ভিন্ন শাখায় যেমন কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে বা প্রবন্ধে। সংগীত, নৃত্যকলা এমনকি রঙ তুলি নিয়েও বলতে পারেন। দুই একজনের নাম বলতে বলা হলে কাদের নাম উচ্চারণে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেন?

বাংলাদেশে যে সব শিল্পী-লেখক রয়েছেন তাদের আমি চিনি। যেমন শাহাবুদ্দিন নামে একজন শিল্পী আছেন যিনি প্যারিসে রয়েছেন তিনি একজন ভালো শিল্পী। আমি বলবো বাংলাদেশের চলচ্চিত্র এখনো দুর্বল। দুই একটা ভালো ছবি হয় বটে কিন্তু অনেক ছবিই দুর্বল। তবে বাংলাদেশে পশ্চিমবাংলা থেকেও যে কাজটি ভালো হয় সেটি হচ্ছে গবেষামূলক লেখা, রিসার্স মেটেরিয়াল, প্রবন্ধের কাজ খুব ভালো হয়, কবিতাও অনেক ভালো হয়। গল্প উপন্যাসে দু'একজন ছাড়া তেমন কেউ আসেননি। তবে আসবে আশা করছি। গল্প-উপন্যাসে পশ্চিমবাংলা এখনো অনেক এগিয়ে আছে।

প্রশ্ন: সেই ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যে নোবেল পেলেন। তারপর অর্থনীতিতে অমর্ত্য সেন এবং শান্তিতে ড. ইউনূস বাঙালিদের মধ্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। সাহিত্যে আর কোন সম্ভাবনা আছে কী না?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন সেই তখন থেকে তা পরিবেশ অনেক পাল্টে গেছে। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা যে নেই তা বলা শক্ত। তবে অদূর ভবিষ্যতে আছে বলে মনে হয় না। কারণ অনুবাদের মাঝপথে আমাদের লেখাগুলো পড়তে হয়। আগে যেমন ভারতীয় সাহিত্য কী কোনো উদাহরণ পাওয়া যেত না। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের বই ছাড়া। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তার গীতাঞ্জলি অনুবাদ করেছিলেন নিজেই ইংরেজিতে লিখেছিলেন। এখন আমাদের দেশে যারা নাইপলের মতো লেখক যিনি নোবেল পুরস্কার পেলেন তিনি ভারতীয় কি ভারতীয় নয় এই একটা বিতর্কমূলক ব্যাপার। তেমনি এখন যারা ইংরেজিতে লিখছে, যেমন বিক্রম শেঠ, অমিতাভ ঘোষসহ অনেকে আছেন। বাংলাদেশের একটা মেয়ে মনিকা আলি ব্রিকলেন নামে একটা উপন্যাস লিখেছেন, যদিও সে লন্ডনে রয়েছেন। এমনকি সালমান রুশদিও পেয়ে যেতে পারেন। যারা ইংরেজিতে লিখছেন তাদের পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তাছাড়া আমাদের লেখাগুলোর তো ভালো অনুবাদের ব্যবস্থা নেই।

প্রশ্ন : আপনারা কি অনুবাদ করতে পারেন না?

যে লিখবে সে অনুবাদ করবে কেন? এটাতো অন্যদের কাজ।

প্রশ্ন : ড. ইউনূসকে নিয়ে পশ্চিমবাংলায় খুব একটা উৎসব দেখা যায় না। আগে যেমন অমর্ত্য সেনের সময় উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল—এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী?

এটা একদম ঠিক নয়। পশ্চিমবাংলায় জানুয়ারি মাসের ২৫ তারিখে তাকে বিরাট নাগরিক সংবর্ধনা দেয়া হবে। এর আগেও ড. ইউনূস সাহেবকে নিয়ে আমাদের দেশের বহু পত্রিকা কাভার স্টোরি করেছে। বরং পশ্চিমবাংলায় ড. ইউনূসেব একটা বিশেষ অবদান রয়েছে এবং আমাদের যারা অর্থনীতিবিদ তারা সবাই ড. ইউনূসের বন্ধু।

এমনকি আমাদের অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত তার সঙ্গে তো ড. ইউনূসের প্রায়ই কথা হয়। অমর্ত্য সেনের সঙ্গে তো আছেই। সুতরাং কথাটি মোটেও ঠিক নয়।

প্রশ্ন : আপনি আপনার তৃতীয় নয়ন দিয়ে যখন বাংলা শিল্প সাহিত্যের ভবিষ্যৎ দেখেন তখন তাকে কোন্ অবস্থানে দেখতে পান?

আমি দেখতে পাই বাংলা শিল্প সাহিত্য ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে এবং আরো উন্নতির সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। বাংলাদেশে যদি একটা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আসে তাহলে আরো বেশি উন্নতি হবে।

প্রশ্ন : আপনি বাংলাদেশের সন্তান, অর্জন যা কিছু তা পশ্চিমবঙ্গ—সেই বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে আপনি কী স্বপ্ন দেখেন?

আমি স্বপ্ন দেখি। আমি যখন ৫৫ বছর পরে বাংলাদেশে গেলাম এবং সেই বিষয়ে একটা লেখা লিখেছিলাম। সেই লেখাটার নাম হচ্ছে 'মাটি নয় মানুষের টানে'। ঐ যে মাটিটা আমি ছেড়ে এসেছি সেই মাটির জন্য আমার টান নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষের ব্যবহার দেখে এখনো অভিভূত হতে হয়। সাধারণ মানুষ এখনো ভালোবাসে। সুন্দর ব্যবহার করে—এটাই ভালো লাগে। কাজেই আমাদের মধ্যে যদি ভালোবাসার একটা সম্পর্ক থাকে এটাই যথেষ্ট। সুনীল নিজের জন্মভূমি নিয়ে বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি সীমান্তবর্তী বিভিন্ন ক্যাম্পে ঘুরে বেড়িয়েছি, মুক্তিযোদ্ধাদের খোঁজখবর নিয়েছি। তাছাড়া বাংলাদেশের অনেক অনেক গল্প আমি আমার মাসি, পিসিদের মুখে শুনেছিলাম। শুনেছিলাম জমির কথা, মাটির কথা, জাম গাছের কথা এবং পুকুর ভর্তি মাছের কথা। আমি পরবর্তীতে দৃশ্যগুলো দেখতে চাই না—সেইগুলো কল্পনায় রাখতে চাই।

প্রশ্ন : প্রবাসের সাহিত্য চর্চা এবং তার সম্ভাবনা নিয়ে বিশেষভাবে কিছু বলবেন?

১৯৬৩ সালে এখানে এসেছিলাম এবং বুঝতে পেরেছিলাম বাংলা ভাষায় লিখতে হলে এখানে বসে থাকলে চলবে না। যে জন্য আমার চলে যাওয়া। এখন অনেকেই বলে যে সত্যি কী তাই? আমি বলবো না। এখন অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আমি যখন এখানে এসেছিলাম তখন বাঙালি কোথায়? বলতে গেলে বাঙালি তো ছিলোই না। বাঙালিরা তো আসতে শুরু করে ১৯৬৫ সালের পর থেকে। আমি যে শহরে উঠেছিলাম সেখানে আর দুটো মাত্র বাঙালি ছিল। এখন সেই শহরে ৯শ'র মতো বাঙালি। আগে আমি রান্না করে খেতাম। হলুদ কোথায় পাওয়া যায় তা খুজতে খুঁজতে হয়রাণ হয়ে যেতাম। এখন তো সবকিছু পাওয়া যায় এবং পথে ঘাটে বাঙালির দেখা মেলে। এখন ইচ্ছা করলে এখানে বসেই লেখা যায়। নিউইয়র্ক শহর থেকে ১১টা এবং টরেন্টো শহর থেকে ৬টা পত্রিকা বের হয়। এইগুলো কিন্তু আমার সময়ে ছিল না। এখন সবকিছু পাল্টে গেছে। এখন বলতে গেলে বাঙালিরা কলোনি করে ফেলেছে।

প্রশ্ন : বিশ্ব সাহিত্যের আসরে বাংলা সাহিত্যের আসন কোথায়?

আমার মনে হয় যে, কোয়ালিটির দিক থেকে বাংলা সাহিত্যে খুবই উচ্চাঙ্গের রচনা আছে। যা নোবেল পুরস্কারও পেতে পারে। কিন্তু বিশ্ব সাহিত্যে বাংলা সাহিত্যে পৌঁছায়নি। অনেকে বাংলা সাহিত্যের নামও জানে না। আমি যখন সারা বিশ্ব ঘুরে ঘুরে দেখি—অনেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম ভুলে গেছে। নতুন প্রজন্ম তার নাম জানে না। তার কারণ হচ্ছে—আমরা গরিব, অশিক্ষিত প্রচুর। আমরা বলি পৃথিবীতে বাংলা পঞ্চম প্রধান ভাষা কিন্তু পঞ্চম প্রধান ভাষা হলে কি—এই যে প্রায় ২৫ কোটি মানুষ বাংলায় কথা বলে এদের মধ্যে লেখাপড়া জানে কত পার্সেন্ট? সর্বসাকুল্যে

৫০ পার্সেন্ট। অতএব সেখানে কমে গেল অর্ধেক। দাঁড়ালো সাড়ে ১২ কোটি। এই সাড়ে ১২ কোটির মধ্যে সাহিত্য তো দূরে থাক একটা বই কেনার ক্ষমতা ক'জনের আছে? যাদের ক্ষমতা আছে তারাও কেনে না। কারণ, তাদের অভ্যাস নেই। কাজেই বাংলা ভাষাভাষী লোক অনেক হলেও যেহেতু বাংলা ভাষাভাষী জাতি হিসেব এখনো উন্নত বা শক্তিশালী হতে পারেনি সেজন্য এখনো বাংলা সাহিত্যের কদরটা কম। লোকেরা খোঁজ করে না, একজন বিদেশি পাঠক জানতে চায় না বাংলায় কী লেখা হচ্ছে। জানতে চায় চীনা ভাষায় কি লেখা হচ্ছে। কারণ চীনের একটাই ভাষা। চীন এত বড় একটা দেশ তাদের ৯৫ ভাগ মানুষ একটা ভাষায় কথা বলে।

প্রশ্ন : বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতায় রবীন্দ্রনাথ কতটা প্রাসঙ্গিক?

রবীন্দ্রনাথ প্রচুর লিখেছেন। নানারকম লেখা লিখেছেন। কিছু কিছু লেখা পুরানো হয়ে গেলেও অনেক লেখা আছে এখনো টাটকা। তার অনেক গদ্য এবং কবিতা খুবই আধুনিক মনে হয় এবং তার যে চিন্তাধারা তা এখনো নতুন করে বাস্তবে দেখা যাচ্ছে। যেমন ধরুন পরিবেশ নিয়ে আজকাল অনেক লোক চিন্তা করেন। রবীন্দ্রনাথ বহু দিন আগেই বলেছিলেন কলকারখানা করে পরিবেশ নষ্ট করে কোনো মানুষ বাঁচতে পারবে না, মানুষ জাতিই ধ্বংস হয়ে যাবে। তার একটা নাটক আছে 'মুক্তধারা' নামে । সেই নাটকে তিনি উল্লেখ করেছিলেন নদীগুলোকে বাঁধ দিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে। তিনি এগুলো কতকাল আগে লিখেছিলেন—এখন নতুন তত্ত্ব বের হয়েছে নদীতে বাঁধ দেয়া ঠিক না। নদীতে বাঁধ দিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করে। নদীতে বাঁধ দিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করা হচ্ছে বটে কিন্তু নদীগুলো মরে যাচ্ছে।

প্রশ্ন : সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা, প্রগতিশীলতা এবং মানবিকবোধের আবেগ কতটুকু গ্রহণযোগ্য?

সাহিত্যে আমি বাংলা ভাষাতো বটেই, অন্য ভাষাতেও দেখেছি এমনকি পাকিস্তানের সাহিত্যেও—সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা থাকে না। সাহিত্যিকরা সাধারণত সাম্প্রদায়িক হয় না। দু'এক পার্সেন্ট হতে পারে বা সরকারি তাঁবেদার দু'একজন লেখক থাকে সরকারের কাছ থেকে পুরস্কার নেয়ার লোভে লিখে থাকেন। সাহিত্যিকরা, শিল্পীরা যারা গান গায় তারা সাম্প্রদায়িক হয় না। পশ্চিমবঙ্গে আল্লা মেঘ দে, পানি দে, ছায়া দে বলে গান করে হিন্দুরা, আবার মুসলমান গায়ক-গায়িকারা কৃষ্ণকে নিয়ে গান করে। এটা খুব ভালো লক্ষণ। রাষ্ট্রের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ছড়াবার চেষ্টা থাকে। তার কারণ হচ্ছে, রাজনৈতিক লোকেরা ক্ষমতা দখল করার হাতিয়ার হিসাবে ধর্মকে ব্যবহার করে, এটা ঠিক নয়।

প্রশ্ন: কখন আপনি লেখা শুরু করেছিলেন—এটা কি মনে আছে?

মনে থাকবে না কেন। লেখা শুরু করেছিলাম তখন আমার বয়স পনের টনের হবে। আমার বাবা আমাকে ছুটির সময় দুপুরবেলায় বাড়িতে আটকিয়ে রাখার জন্য টেনিসনের কাব্যগ্রন্থ দিয়ে বলেছিলেন অনুবাদ করতে হবে। সেটা আমি অনুবাদ করতে করতে কবিতা লেখা শুরু করি। তারপরে একটা লেখা পাঠিয়ে দিই তখনকার দিনের দেশ পত্রিকাতে। সেই লেখাটা ছাপা হয়েছিল। তবে কবে ছাপা হয়েছিল তা মনে নেই। পরবর্তীকালে খুঁজে খুঁজে বের করে জানা গেল ১৯৫১ সালের মার্চ মাসে আমার প্রথম কবিতা ছাপা হয়। তার পরেতো আমি একটা পত্রিকা সম্পাদনা করি 'কৃত্তিবাস' নামে, তা এখনো চলে।

প্রশ্ন : রাজনীতির ব্যাপারে উৎসাহবোধ করেন কেমন? ভারত-বাংলাদেশ-পাকিস্তানসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের রাজনীতি নিয়ে কিছু বলুন?

ছাত্র বয়সে সবার রাজনীতির দিকে একটু ঝোঁক থাকে। আমার বামপন্থী রাজনীতির দিকে ঝোঁক ছিল। বামপন্থী ছাত্রদলের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। রাস্তায় মিছিল-মিটিংও করেছি। পরবর্তীকালে আমি রাজনীতি থেকে সরে এসেছি। কারণ এটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এখন বামপন্থী দক্ষিণপন্থী কোনো

রাজনীতির মধ্যে আমি মাথা গলাই না। কিন্তু বহু রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। বেগম জিয়ার সঙ্গেও আমার অল্প একটু পরিচয় আছে।

প্রশ্ন : লেখালেখি ছাড়া জীবনের অন্য আর কোন্ ক্ষেত্রে আপনার পরিচিতি আছে বলে মনে করেন?

আমি এখনো বাংলা ভাষার চর্চা যেন কমে না যায় বা সরকার যাতে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা করে এর জন্য পশ্চিমবঙ্গে যে কিছু কিছু সামাজিক আন্দোলন হচ্ছে সেই সব আন্দোলনের সম্মুখভাগে থাকি।

প্রশ্ন : আপনার লেখালেখির ব্যাপারে কে বেশি আপনাকে উৎসাহ দেয় আপনার স্ত্রী না ছেলে?

আমার সন্তান তো বিদেশে থাকে। আর ত্যাগ স্বীকার করে আমার স্ত্রী।

প্রশ্ন : অনেক সময়ই দেখা যায় বাংলাদেশ এবং ভারতের সরকারের মধ্যে অনেক দূরত্ব, সেই দূরত্বের কারণে দু'দেশের জনগণকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়—এই সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

এটা দুঃখজনক। আমরা চাই যাতায়াতে যেন কোনো বাধা সৃষ্টি না হয়, মতামত বিনিময়ে যেন বাধার সৃষ্টি না হয়—যাওয়া আসা বাড়তে থাকলে আমরা বাঙালি হিসাবে আরো শক্তিশালী হবো—এটাই আমাদের রক্ষা করা উচিত।

প্রশ্ন : আপনার কতটা বই প্রকাশিত হয়েছে?

আমাদের ওখানে রফিকুল ইসলাম নামে একটা ছেলে আছে যে গবেষণা করে বের করেছে আমার বই-এর সংখ্যা কত। সেখান থেকে জানতে পারলাম আমার বই-এর সংখ্যা সাড়ে তিনশ'র বেশি।

প্রশ্ন : কিছুদিন আগে নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক—উলেসোইয়াংকার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিলো। উনার বক্তব্য থেকে জানতে পারলাম তিনি সর্বমোট ১২টা বই লিখেছিলেন এবং তার মধ্যে একটি নাটকের জন্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। আমাদের দেশের লেখকরা অনেক বেশি বেশি বই লিখেন অন্যদিকে তারা খুব কম লিখেন—

কারণটা সহজ। আমি যে সাড়ে তিনশ' বই লিখলাম। একজন মানুষের পক্ষে সাড়ে তিনশ' বই লিখা খুব শক্ত। এইগুলোর মধ্যে অনেকগুলো আছে কালেকশন। মানে আগেকার দুই তিনটা বইকে এক করা হয়েছে। বা অন্য লোকদের বই আমার নামে সম্পাদনা করেছি। সেই দিক থেকে আমার আসল বই দু'শর মতো হবে। দুই শ' বই লেখাওতো শক্ত। এই দেশের লোকজন শুনলে আঁতকে উঠবে। এত লেখা একজন মানুষ লিখে নাকি। কিন্তু আমাদের দেশেতো লেখকদের জীবিকা হয় লেখা দিয়ে। এদেশেতো প্রথম কথা সার্থক লেখকরা অনেক বেশি পয়সা পায়। দ্বিতীয় কথা, এদেশে অনেক ফাউন্ডেশন আছে তাবা লেখকদের পেট্রোনাইজ করে। তারা হয়তো একটা বই লেখার জন্য লেখককে তিন বছর ধরে টাকা দেয়। যার জন্য এই দেশের লেখকদের কোনো চিন্তা করতে হয় না—আমাদের দেশেতো পৃষ্ঠপোষকতা নেই। পৃথিবীর কোন কোন দেশে বড় বড় লেখকদের জন্য সুন্দর পরিবেশে বাড়ি তৈরি করে তাঁদের দেয়া হয়েছে নামমাত্র ভাড়ায়। আমাদের দেশে যদি এইরকম ব্যবস্থা থাকতো তাহলে লেখকদের অনেক সুবিধা হতো। আমাদের দেশেতো লেখকদের পত্রিকায় লিখে পয়সা কামাতে হয়, অনেক সময় বই-এর পয়সাও প্রকাশকদের কাছ থেকে ঠিকমতো পাওয়া যায় না। এইসব কারণে বেশি বেশি লিখতে হয়।

প্রশ্ন : আপনি অনেকদিন বিদেশে ছিলেন, আপনার লেখায় তার ছাপ রয়েছে এবং এর জন্য আপনার লেখাও অনেক শক্তিশালী। যেমন বাংলাদেশের লেখকদের মধ্যে হুমায়ুন আহমেদ,

ইমদাদুল হক মিলন, জাফর ইকবাল তারাও বিদেশে ছিলেন সে জন্য তাদের লেখাও বেশ সমৃদ্ধ। আপনি কি মনে করেন বিদেশে না এলে আপনার লেখা এত সমৃদ্ধ হতো না?

এখন তো অনেক লেখক বিদেশে যাতায়াত করছেন। আমি যেটুকু উপকৃত হয়েছি—আমি যেখানে ছিলাম সেখানে বহু দেশের লেখকদের জমায়েত ছিলো। এদের সঙ্গে একসঙ্গে থাকার ফলে তাদের দেশের সাহিত্যের অগ্রগতি সম্পর্কে আমি ধারণা পেয়েছিলাম। বিশ্বসাহিত্য কোন অবস্থানে ছিলো তার ধারণা পেয়েছিলাম। এটা আমার উপকারে এসেছিল। না হলে আমি যদি কলকাতায় বসে লিখতাম তাহলে হয়তো কূপমণ্ডুক হতাম। যা লিখতাম তাই মনে হতো আধুনিক হচ্ছে।

প্রশ্ন : গতবছর এখানে সমরেশ মজুমদার এসেছিলেন তার একটা ইংরেজি বই প্রকাশের জন্য। সেখানে এদেশের লেখকদের অনেকেই বলেছেন, বইটি আমেরিকান ওয়েতে লিখতে হবে—যদি আমেরিকায় বাজারজাত করতে হয়।

তারা ঠিক বলেছেন।

প্রশ্ন : আপনার যে লেখা—আপনার সাহিত্য সম্পর্কেতো এদেশের বা ওয়েস্টার্ন লেখকরা খুবই কম জানে কিন্তু আপনি আপনার সাহিত্য কর্ম এদের কাছে পৌঁছানোর জন্য কোনো ব্যবস্থা করছেন কি?

অনেকে করে আমি করি না। কারণ সাহেবেরা আমার লেখা না পড়লে আমার কিছু আসে যায় না। আমার বাঙালি পাঠকরা যদি আমার লেখা পড়ে, ভালোবাসে, আমাকে চিঠি লেখে এতেই আমি খুশি। সাহেবরা আমার লেখা পড়লো কি পড়লো না তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, অনেক পাঠক আমাকে চিঠি লেখে। যেগুলো পড়ে আমি ধন্য হয়ে যাই। এবার আমি জার্মানিতে বই মেলায় গিয়েছিলাম। সেখানে এক সাহিত্য সভায় শুনলাম বার্লিন থেকে এসে একটি মেয়ে হাসপাতালে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ভর্তি হয়েছে। তার এক হাতে আইভি দেয়া হচ্ছে। অন্য হাতটি ডাক্তারকে বলে মুক্ত রেখেছে। কারণ হিসাবে সে উল্লেখ করেছে, বাকি হাতটি দিয়ে আমি যেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের পূর্ব-পশ্চিম বইটি পড়ে শেষ করতে পারি এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারি। এর চেয়ে বড় পাওনা একজন লেখকের পক্ষে আর কী হতে পারে।

প্রশ্ন : তাহলে ওয়েস্টার্ন লেখকরা আপনার লেখা সম্পর্কে জানবে কী করে?

নাই জানুক না কেন? তাদের আগ্রহ থাকলে জানবে, আগ্রহ না থাকলে জানবে না। আমি নিজে উদ্যোগ নিয়ে কিছু করবো না।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের কোন্ কোন্ লেখকের লেখা আপনি পড়েছেন?

বাংলাদেশী লেখকদের মধ্যে শামসুর রাহমান, রফিক আজাদ, আল মাহমুদের লেখা আমি পড়েছি। তবে আল মাহমুদ এখন কেমন জানি হয়ে গেছেন।

প্রশ্ন : কী কী ভালোবাসেন?

আড্ডা মারতে, ভ্রমণ করতে, বই পড়তে এবং খেতে। খাওয়ার ব্যাপারে আমি মুক্তমনা কিন্তু পেটুক না। এমনকি আমি কুমিরের মাংস পর্যন্ত খেয়েছি।

প্রশ্ন : প্রবাসীদের সম্পর্কে কিছু বলুন।

আমি যা দেখছি তাতে মনে হচ্ছে প্রবাসী বাঙালিদের শক্তি বাড়ছে। বাঙালিদের নিজস্ব পত্রপত্রিকার সংখ্যা বাড়ছে। এমনকি আমি দেখছি নিউইয়র্কে পত্রিকায় চাকরি করে বাঙালিরা জীবিকা নির্বাহ করছে। এই রকমভাবে যদি হয় তাহলে এখানে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠা পাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। অন্যান্য কাজে যারা জড়িত আছেন এবং বাংলা ভাষা চর্চা করছেন এবং বাংলা ভাষা প্রসারের জন্য কাজ করছেন তাদের সকলের প্রতি আমার ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছা।

৩৩

যে সাহিত্যিক ইংরেজিতে সাহিত্য রচনা করলে অনায়াসে পেতেন বুকার বা নোবেলের মতো আন্তর্জাতিক পুরস্কার সেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের সম্বন্ধ বহুদিনের। অভিযান গোষ্ঠী আয়োজিত বর্ধমান বইমেলায় তিনি এসেছেন একাধিকবার। সুনীল শক্তিকে একত্রেও পেয়েছি আমরা। কখনও আবার সপত্নীক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এসেছেন বইমেলায়। সম্প্রতি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় তাকে দিয়েছেন সাম্মানিক ডি. লিট। সমাবর্ত অনুষ্ঠান শেষে শান্তিনিকেতন যাওয়ার পথে গাড়িতেই সাক্ষাৎকারে দিয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ীকে।

সাক্ষাৎকারে শুনিয়েছেন এমন অনেক কথা যা আগে কোথাও বলেননি। সঙ্গে উপরিপাওনা সুনীল জায়া স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়ের টুকিটাকি মন্তব্য।

--ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক

অভিযান সাময়িকী : প্রচণ্ড অভাবের সাথে লড়াই করে, শুধু লেখালেখিকে সম্বল করে আজকের এই সম্মান, প্রতিষ্ঠা..., নিজের জীবনকে আপনার উপন্যাসের মতো মনে হয় না?

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : (হাসি)...বেশিরভাগ মানুষের জীবনেই নানারকম ঘাত প্রতিঘাত থাকে, আমারটা একরকম অন্যদেরটা আরেক রকম।

অ: আপনার চরিত্রের দুটি দিক-- আপনি একদিকে লাজুক অন্যদিকে আপনি স্বভাব নেতা। আপনার মায়ের একটি লেখাতে পড়েছিলাম 'কখনো সর্দারি করতো না, কিন্তু সবার প্রিয় নেতা'। লাজুক হওয়া সত্ত্বেও নেতৃত্ব দেন কি করে?

সুনীল: (হাসি)...ঠিকই বলেছ। ভেতরে ভেতরে একটা বাধা থাকে। আমি খুব একটা লোকের সাথে মিশতে পারি না। কিন্তু ঐ এখন তো সভা সমিতি করতে হয়—এটা সেটা করতে হয়, হয়ে যায় ওটা। আগে যেমন, অনেক অল্প বয়সে সভায় দাঁড়িয়ে কিছু বলতে পারতাম না, পা কাঁপত। এখন তো অভ্যেস হয়ে গেছে। এইরকম হয় আর কি।

অ : আপনার চারিদিকে সবসময়ই ভীড় থাকে। এঁদের অধিকাংশই আপনার গুণসমৃদ্ধ, কেউ কেউ স্তাবক, কেউ কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঘোরাঘুরি করে। কখনও হয়তো কয়েকজন বন্ধুও থাকেন আপনার সাথে। স্বাতী বৌদির সাথেও আপনার অন্যরকম জুটি। তবু এতটা উঁচুতে উঠেছেন বলে নিজেকে কি নিঃসঙ্গ মনে হয়?

সুনীল : না। নিঃসঙ্গ সেভাবে মনে হওয়ায় সুযোগ নেই। তবে 'মিসআন্ডারস্টুড' মানে—ঠিক বুঝল না আমি যা বলতে চাই, বা কি করতে চাই কেউ বুঝল না এটা মাঝেমাঝে মনে হয়। তাছাড়া নিঃসঙ্গতা পাওয়া আজকাল দুর্লভ হয়ে গেছে। সেজন্য লেখার অসুবিধা হচ্ছে।

অ : একটি সাক্ষাৎকার বলেছিলেন, 'যৌন ক্ষমতাই লেখার শক্তি জোগায়, এ তো সৃষ্টিরই দুই ভিন্ন রূপ'। একটু যদি বিস্তারিত বলেন।

সুনীল : এটা একটা জৈব ব্যাপার। মনে যৌন ক্ষমতা যখন আস্তে আস্তে চলে যায় তখন মানুষ বার্ধক্যের দিকে পৌঁছায় তো, বার্ধক্যে দেখা গেছে অনেকের ক্ষেত্রেই সৃষ্টির ক্ষমতা কমেও যায়।

তখন মানে পাশাপাশি দুটো একইরকম হয়। দৈবাৎ দু'একটা ব্যতিক্রম আছে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এরকম হয়।

অ : আপনার বিখ্যাত কবিতার লাইন—'আমার ভালোবাসার কোনো জন্ম হয় না মৃত্যু হয় না' আপনি কি সত্যিই সব সময় রোমান্টিক? নাকি মাঝে মাঝে 'ইমেজ' বজায় রাখতে রোমান্টিক সাজেন/সাজতে হয়?

সুনীল : রোমান্টিক কেউ সাজতে পারে না। রোমান্টিক যারা তারা মাঝে মাঝে বাইরে আসতে বাধ্য হয়। বাস্তব হতে বাধ্য হয়। আমিও বাস্তব পরিবেশে আসতে বাধ্য হই। কিন্তু ভেতরে ভেতরে রোমান্টিকতা রয়ে গেছে।

অ : সাহিত্যের বিভিন্ন দিকগুলির মধ্যে কবিতাই আপনার সবচেয়ে প্রিয়। কবিতাব জন্য তেমন বড় কোনো পুরস্কার পান নি, এজন্য কষ্ট হয়?

সুনীল : না না, কষ্ট হয় না। অনেক সময় কেউ একটা কবিতা পড়ে যখন চিঠি লেখে তখন সেটাই ভালো লাগে।

অ : আপনি তো চিঠির উত্তর দেন না।

সুনীল : কিছু কিছু দিই। আগে দিতাম বেশি। এখন আর সময় পাই না।

অ : আমি অনেক ছোটবেলা থেকে আপনাকে ঠিক লিখছি।

সুনীল : একটাও উত্তব পাও নি? কেউ না কেউ পেয়েছে।

অ : যাইহোক আমি ভাগ্যবান নই।

স্বাতী : তুমি ঠিকই বলেছ। ও নিয়মিত উত্তর দেয় না। মাঝে মাঝে হয়তো কিছু উত্তর দিয়ে দিল এইবকম।

অ : একটা কথা আমরা প্রায়ই শুনি, "আনন্দবাজার গোষ্ঠী পয়সা দিয়ে লেখক পোষে"। যাঁবা এখানে সুযোগ পান না তাঁরা বলেন হিংসুকেরাই এরকম বলেন। আপনি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলে 'আনন্দবাজার'-এ থেকেও কোন কোন সময় আনন্দবাজারের বিরুদ্ধে লিখতে পেয়েছেন। অন্য যে কেউ তা করতে পারবে? আমার প্রশ্ন আনন্দবাজার গোষ্ঠী কি তাদের প্রতিষ্ঠানে কর্মরত লেখক কবির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন?

সুনীল : অনেকগুলো শর্ত আরোপ করে। যেমন অন্য কাগজে লিখতে পারবে না। কিন্তু লেখার ব্যাপারে এটা লিখতে পারবে না ওটা লিখতে পারবে না এরকম তো আমি কখনও শুনিনি। শর্ত যেগুলো করে অন্য কাগজে লিখতে পারবে না বা রেডিও-কে বা টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার দিতে পারবে না, অনুমতি ছাড়া।

অ : কি বলবে সেটা ঠিক করে দেয় ওরা?

সুনীল : না, তা করে না। মানে অংশগ্রহণ কবতে পারবে না। সেটা আমার ক্ষেত্রে হয়নি কখনও।

অ : দেশ পত্রিকার সম্পাদক রূপে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে দেখা যাচ্ছে না কেন?

সুনীল : আমার সম্পাদক হওয়ার যখন বয়স ছিল তখন তো আমাকে ওরা ডাকে নি। এখন আমার ঐ ভার নিতে ইচ্ছা করে না, বুঝেছ।

অ : আর সম্পাদক হিসেবে আপনি খুব দুর্বল। এটা শক্তি চট্টোপাধ্যায় বলতেন—এটা কি সত্যিই যে আপনি সবাইকে সুযোগ দিতে চান?

সুনীল : হ্যাঁ, সবাইকে মনে আমি চেষ্টা করি অনেককে সুযোগ দেবার।

অ : বানান ভুল না হলে।

সুনীল : হ্যাঁ, বানান ভুল না হলে, অনেক সময় অন্যাদের লেখা আমি কিছু কিছু সংশোধন করে দিয়েছি। ফেলে না দিয়ে সংশোধন করে দিয়েছি। এইভাবে করেছি আর কি। কিন্তু একেবারে দুর্বল আর অযোগ্য লেখা কখনও ছাপিনি।

অ : না, না, সেটা নয়।

অ : কবিতার প্রতি ভালবাসাটা সেটা প্রথম থেকে ছিল সেটা তো এখনও আছে। তাহলে এখন এইসব গল্প, উপন্যাস লিখতে গিয়ে মনে হয় সময়টা নষ্ট হচ্ছে?

সুনীল : নষ্ট নয়, উপন্যাস লেখার জগতে জড়িয়ে পড়েছি। নষ্ট বলব না।

অ : উপন্যাস বা গল্পের জন্য তো ভালোবাসা আছে?

সুনীল : নিশ্চয়ই, একটা লেখা শেষ করতে পারলে ভালো লাগে। কবিতার প্রতি আছে দুর্বলতা বুঝেছ। ভালোবাসার থেকেও দুর্বলতা হয়ে গেছে এবং কবিতা বা লিখতে পারার একটা যন্ত্রণাও হয়েছে।

অ : এখনও সেই যন্ত্রণা হয়?

সুনীল : হ্যাঁ, এখন যেমন এই এত ভীড়, লোকজন, তারপর গদ্য লেখা, কি সভাসমিতিতে যাওয়া এসব করলে কবিতা মাথায় আসে না, আসে না যখন তখন মনটা খারাপ লাগে। আমি বসলেই গদ্য লিখতে পারি, কিন্তু বসলেই তো কবিতা লিখতে পারি না।

অ : হ্যাঁ অনেকে বলেন, আপনি বাঁ হাতেও লিখতে পারেন।

সুনীল : তা নয়, ও নিয়ে একটা গল্প আছে। একবার 'পাখীর মা' বলে একটা গল্প 'দেশ' পত্রিকার জন্য আমাকে লিখতে হয়েছিল। মানে সাগরময় ঘোষ লিখতে বলেছিলেন একটা গল্প। তা আমি আজ দেব কাল দেব বলে দেওয়া হচ্ছে না। সাগরময় ঘোষ আমাকে ভালোবাসতেন কিন্তু মাঝে মাঝে খুব বকতেন। তা একদিন খুব বকলেন যে, 'তুমি গল্পটা দেবে না ঠিক করেছ, দরকার নেই তোমার কাছে আর গল্প, চাই না এইসব বড় লেখকের গল্প'। তখন আমি বললাম ঠিক আছে আমি লিখে দিচ্ছি, বলে আমি আমাদের অফিসে আনন্দমেলার ঘরটা ফাঁকা ছিল সেখানে গিয়ে—বসে গল্পটা লিখে ফেললাম—'পাখির মা' বলে। তিন ঘণ্টা সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় লাগল। তখন অনেকে এই ধর—জয় গোস্বামী বা এরা যারা ছিল কাছাকাছি এরা বলল, সুনীলদা আপনি সাড়ে তিন ঘণ্টার মধ্যে এত বড় একটা গল্প লিখে ফেললেন? খুব অবাক হয়ে গেছে। তখন আমি বললাম না এটা আমি সাড়ে তিন ঘণ্টায় লিখিনি, এই গল্পটা লিখতে আমার সময় লেগেছে চল্লিশ বছর সাড়ে তিন ঘণ্টা, বুঝেছো।

অ : এখন একটা 'ট্রেণ্ড' হয়েছে সাম্প্রতিক কোনো ঘটনাকে ভিত্তি করে কয়েকজন কবিকে কবিতা লিখতে বলা হল। দেশ পত্রিকায় এরকম দেখছি। এই ব্যাপারটা কিছুটা মেকী হয়ে যাচ্ছে না?

সুনীল : হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

অ : ধরুন জয় গোস্বামী লিখছেন বা আপনিও লিখছেন। এটা কবিকে চাপ দেওয়া মনে হয় না আপনার?

সুনীল : আমি লিখি না। আমি কখনও বিষয়ভিত্তিক কবিতা লিখি না। আমার মন থেকে যেটা আসে সেটা লিখি। আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা ধর্মান্ধতা নিয়ে আমার নিজের মনে এসেছে তাই লিখছি। কিন্তু এই আমেরিকায় আক্রমণ হল সেটা নিয়ে লিখতে হবে বলে আমি তো লিখিনি। এটা আমি পারি না লিখতে। আমি কবিতাটা কারও অর্ডারে বা বিষয় বলে দিলে লিখতে পারি না। গদ্য লিখতে হয়েছে এক সময় যখন গদ্যটা জীবিকা ছিল। তখন নানারকম ফিচার-টিচার লিখতে হতো। সম্পাদকরা বলতো এটা লেখ সেটা লেখ। এখন আর সেটা কমে গেছে।

অ : এখন তো আনন্দবাজারে আপনার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই যে আপনাকে সপ্তাহে এতগুলো লেখা লিখতেই হবে বা এরকম কিছু?

সুনীল : না, এরকম কিছু ব্যাপার নেই। কেউ বলেও না আমাকে। যখন ইচ্ছে হয় কিছু একটা লিখি।

অ : তাহলে আমরা যে শুনি আপনি আনন্দবাজারে চাকরি করেন, তাহলে কী করেন?

সুনীল : এখন হচ্ছে আমি বলতে গেলে কিছুই করি না। আমার নামটা থাকে। তবে আমি এখন দেশ পত্রিকার যে সম্পাদকীয় ঐটা লিখি।

অ : তাই?

সুনীল : আর কিছু নিয়মিত লিখি না।

অ : কিন্তু আমরা বুঝবো কি করে আপনি লেখেন?

সুনীল : সম্পাদক হিসেবে নাম থাকে না। কিন্তু সবগুলো আমার লেখা। যতগুলো দেখবে বুঝবে আমার লেখা। এই আর কি। এটা লেখাই আমার কাজ। বলতে পার দেশ পত্রিকা আমাকে রেখে দিয়েছে। নামটা যুক্ত আছে আর কি। বিশেষ কোনো কাজ করতে হয় না।

অ : আগে শুনতাম কবিতাগুলো আপনি দেখেন।

সুনীল : হ্যাঁ আগে দেখতাম। এখন তো জয় গোস্বামী দেখে। আগে বুক রিভিউ সেকশন দেখতাম। কোন সময় ছোট গল্প দেখেছি, প্রবন্ধ দেখেছি, সে সব দায়িত্ব থেকে বলতে পার মুক্তি দিয়েছে।

অ : প্রায় সব লেখকই বলেন শ্রেষ্ঠ লেখাটি এখনও লেখা হয়নি। আপনিও কি তাই বলবেন?

সুনীল : না সব লেখক বলে না। আমি তো বলিই বারবার সেকথা। অনেকে বলে যে তারা একখানা দারুণ লিখে ফেলেছে। আমি শুনতে পাই এমনকি অনেক তরুণ লেখকও বলে তারা দারুণ কবিতা লিখেছে। আমি বলি ওরে বাবা নিজে নিজেই দারুণ বলেছে। আমার লেখার পরেই মনে হয় ঠিক হল না। যেটাই লিখি, মনে হয় ঠিক হল না।

অ : 'একা এবং কয়েকজন', 'সেইসময়', 'পূর্ব পশ্চিম', 'প্রথম আলো'-র মতো বড় উপন্যাস আবার কবে শুরু করবেন?

সুনীল : একটা মনে মনে ভাবছি। আর একটু সময় লাগবে লিখতে।

অ : কি বিষয়ে?

সুনীল : এটা বিষয় মানে সাম্প্রতিক কাল নিয়ে। এটা ইতিহাসের পটভূমিকায় নয়। বলতে পার সাম্প্রতিক ইতিহাস। সবই তো ইতিহাস।

অ : হ্যাঁ সে তো বটেই। 'মায়াকাননের ফুল'-এর মতো পরীক্ষামূলক লেখা বেশি লেখেন নি কেন?

সুনীল : এটা আমার মনে হল একবার যে, ...পরীক্ষামূলক লেখা একবারই হয়, আবার যদি লিখতাম লোকে বিরক্ত হয়ে যেত।

অ : না মানে ঐ একইরকম পরীক্ষার কথা বলছি না। ধরুন বাংলা ভাষাকে নিয়ে কি অন্য ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষার কথা বলছি—মানে আপনি করলে হয়তো ভালো না হলেও আমরা পড়তাম।

সুনীল : ক্রিয়াপদ বাদ দিয়ে দেখা গেল যে ঠিক স্বাভাবিক নয়।

স্বাতী : না, তা নয়। ও বলছে যে তুমি আরও যদি এক্সপেরিমেন্ট করতে। আর তো ধব কেউ পড়ল কি না পড়ল তাতে কি তোমার যায় আসে না। তাহলে আর করনি কেন? অন্যকোনভাবে।

সুনীল : না না এক্সপেরিমেন্ট করা যায়। কিন্তু নিজের মনে তো একটা ইয়ে করতে হবে। ভাবতে হবে যে এটা ঠিক আছে আবার করি। এক্সপেরিমেন্ট আছে। যেমন ধর আমি বিভিন্ন লেখায় বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করি। ধর 'রাধাকৃষ্ণ' যখন লিখেছি বাংলাটা একরকম 'সেই সময়ে'র বাংলাটা অন্যরকম।

অ : হ্যাঁ নিশ্চয়ই।

সুনীল : মানে 'সেই সময়ে'র যে ভাষা তার সঙ্গে 'একা এবং কয়েকজনে'র ভাষার কোনো মিল নেই। কাজেই এগুলোও তো এক ধরনের পরীক্ষা।

অ : হ্যাঁ।

সুনীল : আর একটা আমি করেছিলাম, জয়াপীড় বলে আমার একটা উপন্যাস আছে। তাতে দেখবে, আমি চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু পরে গিয়ে দেখলাম সম্ভব নয়। যেহেতু 'জয়াপীড়'-এর কাহিনীটা তোমার এদেশে মানে মুসলমানদের আগমনের আগেকার গল্প। তারমানে আরবী, ফার্সি তো তখন আসা সম্ভব নয়। তখন সংস্কৃত ভাষা শব্দ নিয়েই নিশ্চিত লোকে কথা বলতো আমি লিখতে গিয়ে দেখলাম বাংলা ভাষা এমন পাল্টে গেছে যে তুমি আরবী ফার্সি বাদ দিয়ে কিছুতেই লিখতে পারবে না। আমি চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কয়েকপাতা লেখার পর বুঝলাম সম্ভব নয়। যেমন ধর তুমি 'পছন্দ' কথাটা তো ফার্সি বাদ দিয়ে কিছুতেই লিখতে পারবে না। আমি চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কয়েকপাতা লেখার পর বুঝলাম সম্ভব নয়। যেমন ধর তুমি 'পছন্দ' কথাটা তো ফার্সি বা আরবী একটা কিছু, পছন্দের বদলে অন্য কোন শব্দ কি দেওয়া যায়? দেওয়াই যায় না। এইরকম কিছু কিছু শব্দ আছে যেগুলো বাদ দিয়ে লিখব বলে ঠিক করেছিলাম কিন্তু শেষ অবধি দেখলাম অসম্ভব।

অ : আপনার 'সনাতন পাঠক' নামে লেখা একটি প্রবন্ধের বই পেয়েছি। কিন্তু আপনার আরেকটা ছদ্মনাম 'নীল উপাধ্যায়' নামে কোন লেখা পাই নি। সেগুলো কি বই আকারে বেরিয়েছে?

সুনীল : সে হারিয়ে গেছে।

অ : লেখাগুলো কি বিষয়ে ছিল বা কোথায় ছিল?

সুনীল : আসলে যখন ওগুলো বেরিয়েছে তখন তো তোমার নিশ্চয়ই জন্ম হয় নি। এটা '৬৬/'৬৭ সাল থেকে বোধহয় '৭০/৭২ সাল পর্যন্ত আমি ঐ নীল উপাধ্যায় নামে লিখতাম—আনন্দবাজারে পেছনের পৃষ্ঠায় 'দেশে-দেশে' বলে একটা পাতা বের হত। দেশে দেশে মানে পৃথিবীর নানান দেশে যেসব ঘটনা ঘটছে সেসব নিয়ে আর কি। খবর নয়, মানে খবরভিত্তিক ফিচার আর কি। সেইগুলো আমি নীল উপাধ্যায় নামে লিখতাম।

অ : মানে আপনি দেশে গিয়ে লিখতেন নাকি এখানে বসেই ঐসব ঘটনার বিশ্লেষণ করতেন?

সুনীল : আমি তো বিদেশে গিয়েছিলাম। তার আগেই আমি বিদেশে ঘুরে এসেছিলাম।

অ : অ্যাওয়া তো?

সুনীল : শুধু তো অ্যাওয়া যাই নি। অনেকগুলো দেশ ঘুরে তারপর এসেছিলাম। ফলে বিদেশ সম্বন্ধে একটা ধারণা ছিল। যেটা তখন অন্য অনেকেরই ছিল না। এখন যেমন প্রায় সবাই যায় তখন তো অত সহজ ছিল না। ফলে বিদেশ সম্বন্ধে আমার ধারণা ছিল এবং ওখানকার কোন খবর বের হলে কিংবা কোন ফিচার বের হলে আমার পক্ষে লেখা সহজ ছিল। মানে যেমন ধর হিটলার যে ইহুদীদের পুড়িয়ে মারত সেরকম একটা নতুন জায়গা খুঁজে পাওয়া গেল, তা আমি ওরকম কয়েকটা জায়গা তো দেখে এসেছি। ঐ জায়গাগুলো কিরকম ছিল না ছিল আমার পক্ষে বর্ণনা দেওয়া সোজা। এইরকম আর কি। তা ঐগুলো অনেক সময় সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে লেখা হত বলে পরে আমার ওগুলো বই হয়নি।

অ : ঐ লেখাগুলো তাহলে কোনভাবেই বই আকারে নেই।

সুনীল : ওর থেকে যেগুলো একটু বড় লেখা ছিল সেগুলো আমার আছে 'স্বর্গ নয়' বলে আমার একটা বই বেরিয়েছিল। ঐগুলো বিদেশের সব ঘটনা নিয়ে।

অ : এটা কি এখন পাওয়া যায়?

সুনীল : 'স্বর্গ নয়' নামে পাওয়া যায় না। এখন পাওয়া 'পশ্চিম সমুদ্র তীরে' এই নামে। মানে নীল উপাধ্যায়ের সব নেই কিছু আছে, আরও আরও বিদেশ সম্পর্কে যা লিখেছিলাম আছে।

অ : আপনার রচনাবলী বের হওয়ার কোনো পরিকল্পনা আছে?

সুনীল : এখন ঐ উপন্যাস সমগ্র খণ্ডে খণ্ডে বের হচ্ছে। ছোটগল্প সমগ্র, প্রবন্ধ সমগ্রও এইভাবে বের হবে।

অ : ছোটগল্প সমগ্র তো আপনার আছে 'মিত্র-ঘোষ' এর।

সুনীল : ওগুলোতো সময় অনুযায়ী তারিখ টারিখ দিয়ে করা নেই। আনন্দ পাবলিশার্স যখন করবে তখন ঐসব দিয়ে বের করবে। যেমন এখন ওরা উপন্যাস সমগ্র বের করছে তো সব উপন্যাসগুলোর পরিচয় দিচ্ছে কখন প্রকাশিত হয়েছিল কি বৃত্তান্ত এইসব।

অ : আমরা যখন ক্যুইজে জিজ্ঞেস করি আপনার প্রথম উপন্যাস কী? তখন কি 'আত্মপ্রকাশ' বলা উচিত নাকি 'যুবক-যুবতী'রা বলা ঠিক?

সুনীল : আত্মপ্রকাশই বলা উচিত। কারণ ওটা প্রথম ছাপা হয়েছিল। 'যুবক-যুবতী'রা অবশ্য আগে লিখেছিলাম। আরেকটা আমার বই আছে 'সোনালী দুঃখ' বলে ওটা বলতে গেলে যুবক-যুবতীদেরও আগে লেখা। ওটা আমি বিদেশে বসে লিখেছিলাম। কিন্তু ছাপা হয়েছিল পরে।

স্বাতী : ওটাকে ঠিক উপন্যাস বলা যায় কি?

সুনীল : ওটা একটা বিদেশী কাহিনী, মানে নায়ক-নায়িকা বিদেশী। ওটা আমি নিজের মত করে লিখেছি। কোনও বই থেকে লিখিনি। প্রচলিত কাহিনী অবলম্বনে বলতে পার।

স্বাতী : মার্গারিটা ঐ কাহিনীটা ওকে বলেছিল।

সুনীল : হ্যাঁ।

অ : মার্গারিটার কথা যদি একটু বলেন।

সুনীল : বইয়ের মধ্যে তো লিখে ফেলেছি।

অ : এখন কি সত্যিই মনে পড়ে?

সুনীল : এখন আর তেমন মনে পড়ে না। লিখে ফেললে মন থেকে চলে যায়।

অ : লিখে ফেললেন কেন তাহলে?

সুনীল : লেখা এসে গেল।

অ : মানে 'সুদূর ঝর্ণার জলে' লিখে চলে গেলে না 'ছবির দেশে কবিতার দেশে' লিখে?

সুনীল : 'ছবির দেশে কবিতার দেশে' লিখে।

স্বাতী : মার্গারিটার কথা তো শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন, কোথাও না?

অ : হ্যাঁ, 'ঘুমিয়ে পড়া অ্যালবাম'।

সুনীল : মুস্তাফা সিরাজও লিখেছে, দীপক লিখেছে, আসলে শঙ্খ ঘোষের লেখাটি লেখা তো, না হলে শীর্ষেন্দু অনেক সময় বলত ওটি আমার কাল্পনিক চরিত্র।

অ : 'ছবির দেশে কবিতার দেশে'র মতো একটা বড় লেখা তো আমেরিকার ওপরে হতে পারে?

সুনীল : আর আমেরিকার ওপরে কি লিখব। আমি ইয়েতে একটা লিখেছি পড়েছ কিনা জানি না। 'বিজনে নিজের সঙ্গে' ওটি সাউথ আমেরিকা নিয়ে লেখা।

অ : হ্যাঁ পড়েছি। ওটাতো উপন্যাসের আকারে।

সুনীল : হ্যাঁ উপন্যাস বলেই ছাপা হয়েছে। তবে ওটি আসলে ভ্রমণ কাহিনীই। বইটি কিন্তু অন্যরকমভাবে বেরিয়েছে। বইটার একদিকের নাম হচ্ছে 'বিজনে নিজের সঙ্গে' আর একদিকের নাম হচ্ছে 'আমাদের ছোট নদী'। মানে আমি অনেকগুলো নদী নিয়ে লিখেছিলাম, এদেশের, বিদেশের। বইটি আসলে দু'মলাটের।

অ : বেড়াতে খুব ভালোবাসেন, অন্য দেশে খুব যান। কিন্তু আমাদের এইসব ছোট ছোট গ্রামে যান না কেন?

সুনীল : আমি থেকেছি আগে। এখন আর সম্ভব হয় না। বয়সের একটা ব্যাপার আছে। যেমন ধর আমি হুগলীর আরামবাগের কাছে খুব রিমোট একটা গ্রামে, রাধানাথ মণ্ডল বলে একজন লেখক ছিল, গল্পটল্প লিখতো ওদের গ্রাম। কত 'রিমোট' জান, রামজীবনপুর বলে একটা শহর আছে মানে আধা শহর যেখান থেকে হেঁটে যেতে হয় মানে ওদের গ্রামে, যাওয়ার আর কোনো উপায় ছিল

না। আলপথ দিয়ে হেঁটে যেতে হয়। সেইখানে সেই গ্রামের বাড়িতে বেশ কয়েকদিন থেকেছি। সেখানে ইলেকট্রিসিটি নেই, কিচ্ছু নেই। সাপের উপদ্রব।

অ : ঐ অভিজ্ঞতা থেকেই কি নীললোহিতের 'আমার এক টুকরো পৃথিবী'?

সুনীল : হ্যাঁ, তারপর সুন্দরবনের গ্রামে গিয়ে থেকেছি আমি। এখন আর অতটা পারি না। এখন গতবছরে মালদার একটা গ্রামে গেলাম বুঝেছ, বেশ গ্রামই সেটি। একটি মুসলমান পরিবার আমাকে থাকতে দিয়েছিল। দেখি কি সকালবেলা উঠে—সর্বনাশ। আমাদের এখন কলকাতা শহরে থেকে থেকে কমোড-টমোড ব্যবহার করা অভ্যাস হয়ে গেছে—মাঠে যাওয়া তো এখন আর সম্ভব নয়।

অ : এতই গ্রাম!

সুনীল : এতই গ্রাম। তাই দেখলাম, এখন আর অত গ্রামে যেতে পারব না। ঘুরতে যেতে পারি কিন্তু রাত্তিরে থাকতে পারব না। আরেকটা ঘটনা বলি—সুন্দরবনে একটা চেনা ছেলে বাড়িতে নিয়ে গেল। সেখানে গ্রামের মধ্যে বাড়ি। সেখানেও কোনোরকম বাথরুমের ব্যাপার নেই। তখন সে করল কি, লোক ডেকে মাটি কেটে গর্ত খুঁড়ে দু'পাশ উঁচু করে একটা বানিয়ে ফেলল বুঝেছ। বানিয়ে তো ফেলল, তারপরে আরও বেশি বিপদ হল। তালগাছের ডাল কেটে কেটে বেড়া করে দিল একটু দূরে বাড়ি থেকে, সবই হল, সেখানে ঢুকে পড়ল একটা মস্তবড় সাপ। সে বিরাট সাপ—তখন তো নড়াচড়াও করা যায় না। কাজেই এরকম অভিজ্ঞতাও হয়েছে।

অ : কাকাবাবু চরিত্রটা কি পুরোপুরি আপনার কল্পনা?

সুনীল : হ্যাঁ কল্পনা তো বটেই। একটা চরিত্র তৈরি করেছিলাম এই জন্যই যে সাধারণত অ্যাডভেঞ্চার গল্পে কি হয়? নায়ককে খুব সুন্দর দেখতে হয়, ছিপছিপে হয়, সে সব কিছু পারে। তার বদলে আমি দেখলাম একজন ভদ্রলোক যিনি প্রতিবন্ধী কিন্তু মাথা দিয়ে তিনি সব কিছু করেন। মানুষের মাথাটাই তো আসল। সেইজন্য মাথা দিয়ে সব বিপদ থেকে উদ্ধার পান না সব সঙ্কটেরও সমাধান করেন যাতে মনের জোরটা বেশি বাড়ে আমার অল্প বয়সী পাঠকদের সেটাই ছিল ইচ্ছে বা উদ্দেশ্য আর কি।

অ : আপনি বিদেশে গেলেই কি 'নোট' নিয়ে আসেন? এই যেমন ধরুন কাকাবাবুকে মিশরে নিয়ে গিয়ে ফেললেন, ওখানকার 'ডিটেলস্' গুলো কি লিখে আনেন?

সুনীল : না যা মনে থাকে তাতেই চলে যায়।

অ : বেড়াতে গেলে সেই পটভূমিকায় কাকাবাবুকে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি কেন করেন?

সুনীল : মানে নিজের চোখে যে জায়গা দেখেছি সেটা বর্ণনা করা সহজ হয়। তাই না? সেজন্য কাকাবাবুর গল্পে যেসব জায়গার কথা আমি লিখেছি সে আফ্রিকাই বল কি গ্রীস বল সবগুলোই আমি নিজে গেছি।

অ : নীললোহিত এখন আর স্বাধীনভাবে বিনা টিকিটে ঘুরতে পারে না। এমনকি লোকে দেখে ফেলে বলে সকালে বেড়ানোও হয়না। আপশোষ হয় না? লেখার উপাদান পেতে অসুবিধা হয় না?

সুনীল : একটু তো হয়ই। কতগুলো তো মানে যেমন তুমি দ্যাখো খ্যাতি হলে এইরকম লোকে খাতির যত্ন করছে। তেমনি কিছু কিছু জিনিস তো হারাতেই হয়। এ হচ্ছে তাই। বুঝেছ। তবে বাজারটা কিন্তু আমি এখনও নিজেই করি।

অ : করেন?

সুনীল : বৌদিকে জিজ্ঞেস কর। বাজার এখনও আমি নিজের হাতেই করি।

অ : কমলকুমার মজুমদারের পরিচালনায় 'হরবোলা' তে নাটক করার অভিজ্ঞতা যদি বলেন। এখানে কি সত্যজিৎ রায়ও আসতেন?

সুনীল : হ্যাঁ। প্রথমে সত্যজিৎ রায়ই তো আমাদের ঐ 'সেট' করার ব্যাপারে সাহায্য করতেন।

কারণ হচ্ছে যে, তোমরা হয়তো জান হরবোলা ক্লাবটা যেখানে হত সেটা সিগনেট প্রেসের বাড়িতে।

অ : হ্যাঁ পড়েছি আপনার লেখায়।

সুনীল : হ্যাঁ পড়েছো। আর সিগনেট প্রেসের যিনি কর্ণধার ছিলেন দিলীপ কুমার গুপ্ত, তিনি তখন ডি.জি. কেয়ার বলে একটা বিজ্ঞাপন সংস্থার কর্তা ছিলেন।

অ : আচ্ছা,

সুনীল : সত্যজিৎ রায় সেখানে চাকরি করতেন। বিজ্ঞাপনে ছবি আঁকতেন। সিগনেট প্রেসে এইসব মলাট-টলাট আঁকতেন। ফলে দিলীপ যা বলবেন তা ওঁকে শুনতেই হবে। সেইজন্য দিলীপ গুপ্তর বাড়িতে 'হরবোলা' হত বলে উনি আসতেন, এসে আমাদের 'সেট' তৈরি করার ব্যাপারে সাহায্য করতেন।

অ : আর কমল মজুমদার উনি ডিরেকশন দিতেন তাই তো?

সুনীল : উনি সব কিছুই করতেন। পরিচালনা তো করতেনই, পোষাক কি হবে আরম্ভ করে সব কিছুই করতেন। এমনকি সত্যজিৎ রায়ও কীভাবে 'সেট' করবেন সেটাও উনিই বলে দিতেন।

অ : সত্যজিৎ রায়কেও উনি নির্দেশ দিতেন?

সুনীল : হ্যাঁ উনি নির্দেশ দিতেন। সত্যজিৎ রায় কমল মজুমদারকে খুব মানতেন।

অ : আপনার লেখাকে ভিত্তি করে যেসব সিনেমা, নাটক, সিরিয়াল হয়েছে/হচ্ছে সেগুলির অধিকাংশই আপনার পছন্দ হয়নি। এমনকি সত্যজিৎ রায়ের দুটি সিনেমাও আপনার পুরোপুরি ভালো লাগেনি। কেন?

সুনীল : হ্যাঁ ঠিকই বলেছ। প্রথমটি তত ভালো হয়নি। দ্বিতীয়টি 'প্রতিদ্বন্দ্বী'টি তবু অনেকটা হয়েছে। 'অরণ্যের দিনরাত্রি' আমার তেমন পছন্দ হয়নি।

অ : হয়নি মানে আপনারা যেভাবে বেড়াতে গিয়েছিলেন...

সুনীল : সেই ব্যাপারটাই উনি ধরতে পারেননি। উনি ওনার দিক থেকে দেখেছেন।

স্বাতী : সিনেমাটা তো একটা অন্য মাধ্যম, সেখানে একটু অন্যরকম হয়ে যেতে পারে।

সুনীল : তবে আমার একটা গল্প নিয়ে একজন করেছিল 'গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প' নিয়ে বিপ্লব রায়চৌধুরী হিন্দী করেছিল 'শোধ' সেটা কিন্তু বেশ ভালো হয়েছিল।

স্বাতী : কেন 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ভালো হয়েছিল।

সুনীল : হ্যাঁ প্রতিদ্বন্দ্বীর কথা বললাম, ভালো অরণ্যের দিনরাত্রির তুলনায় ভালো হয়েছিল। মানে আমার মনোমত হয়েছিল। আর শোধটিতে আমি খানিকটা চিত্রনাট্যে অংশগ্রহণ করেছিলাম তো—ওটা ভালো হয়েছিল।

অ : 'অর্ধেক জীবন' পড়ে মন ভরে নি। প্রায় সব কথাই আগে কোথাও না কোথাও পড়েছি। অনেক কথা কি না বলা রইল না?

সুনীল : তা থাকল। ঐ জন্যই তো অর্ধেক জীবন। আর যারা আমার সমস্ত লেখা খুঁটিয়ে পড়েছে, আমি মাঝে মাঝে কিন্তু উল্লেখ করেছি যে, এসব কথা আগে আমার লেখাতেও আছে।

অ : নিজেকে 'নোবেল প্রাইজ' পাওয়ার যোগ্য মনে করেন?

সুনীল : না অত আমার উচ্চাশা নেই। আমাদের বাংলা ভাষায় আরও অনেক লেখক লেখিকা আছেন তাঁরা পেতে পারেন। আগে তাঁরা পেয়ে নিন, তারপর।

অ: যেমন

সুনীল : যেমন ধর, এখন তো মহাশ্বেতা দেবী পেতে পারেন। অনায়াসে পেতে পারেন। এর আগে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্যই পেতে পারেন, সতীনাথ ভাদুড়ী আমার মতে, জীবনানন্দ দাশ পেতে পারতেন।

অ : গত কয়েকদিনের মধ্যে ভালো বাংলা বই কি পড়েছেন?

সুনীল : আমার তো তিলোত্তমা মজুমদারের উপন্যাসটি বেশ ভালো লেগেছে।

অ : বসুধারা। নতুন লেখকদের মধ্যে কাকে খুব সম্ভাবনাময় মনে হয়?

সুনীল : এই মেয়েটি মানে তিলোত্তমার খুব সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয়। কবিদের মধ্যে নিশ্চয়ই মন্দাক্রান্তা। খুবই শক্তিশালী। তারপরে ধর কিছুটা প্রতিষ্ঠিত হলেও পিনাকী ঠাকুর, শিবাশিস মুখোপাধ্যায় এরাও বেশ ক্ষমতাশালী। গদ্যে বরং খুব একটা বেশি দেখা যাচ্ছে না। কবিতায় অনেকেই আছে।

অ : কোনো সময় মনে হয় কালকে আর কিছুই মাথায় আসবে না। লিখতে পারবেন না?

সুনীল : না আমার তা মনে হয় না। অনেক সময় একটা কোনো লেখা লিখতে লিখতে হঠাৎ বাকিটা যেন কিছুতেই মনে আসছে না। কী করে শেষ করব, বা কী করে এগোব এরকম হয়। গাঁট আসে একটা। তখন কিছু পড়াশোনা করতে হয় অন্যদিকে মন ফেরাতে হয়। মন ফেরালে আবার এসে যায় বাকিটা। এই হচ্ছে ব্যাপার।

অ : কখনও কোনো সময় মনে হয় লেখা ছেড়ে দেব বা ভালো লাগছে না?

সুনীল : হ্যাঁ, তাও একেক সময় মনে হয়। কিন্তু এখন আমি যে চক্রের মধ্যে আছি চাইলেও কি ছাড়তে পারবো? তাহলে আমাকে বনবাসে যেতে হবে।

অ : কেন আপনার যদি ইচ্ছে হয় তাহলে পারবেন না? আপনি কি স্বাধীন নন তাহলে?

সুনীল : না, এটা ঠিক স্বাধীনতার প্রশ্ন না। এটা হচ্ছে ধর প্রিয়জনের চাপ। যাদের সঙ্গে মানে অন্তরঙ্গতা হয়ে গেছে, তাদের অনুরোধ-উপরোধ এগুলো এড়ানো যায় না। এখন এমন অনেক লেখা লিখতে হয়, যেগুলো না লিখলেও চলত। বুঝেছ। অনেক লিটল ম্যাগাজিনেই তো আমাকে কবিতা দিতে হয়। যে কবিতাগুলি ঠিকমতো গড়ে ওঠে নি। কিন্তু তাড়াহুড়ো করে দিতে হয়। কারণ যেহেতু সেই সম্পাদকেরা কাঁচুমাচু হয়ে আসে। চায়, না দিয়ে উপায় থাকে না।

অ : হ্যাঁ, লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকদের আপনি খুব ভালোবাসেন। আচ্ছা বাংলা লিটিল ম্যাগাজিনের ভবিষ্যৎ কি বুঝতে পারছেন?

সুনীল : না লিটল ম্যাগাজিন তো এখনও বের হয়। অনেকই বের হয়।

অ : না, বের হয়। কিন্তু অধিকাংশ লিটল ম্যাগাজিনই খুব কি ভারী হয়ে যাচ্ছে না। মানে খুব গুরুগম্ভীর বিষয়ে আলোচনা—বড় বড় প্রবন্ধ...

সুনীল : নানারকম থাকে। এই যে এরা বার করে, এগুলোতে অত গুরু গম্ভীর কিছু থাকে না। আসলে যেটা দরকার একটি লিটল ম্যাগাজিনের অন্তত দশ বছর টিকে থাকা দরকার। না হলে ঠিক ছাপটি পড়ে না। বেশিরভাগই আজকাল কি হয়, বের হয় বন্ধ হয়ে যায়। আবার নতুন নামে আরেকটি বের হয়। এরকম না হয়ে অন্তত দশ বছর যদি চলে তাহলে একটা স্থান থাকে।

অ : নতুন করে 'কৃত্তিবাস' বের হচ্ছে। সেটি কি আপনার ইচ্ছায় বের হচ্ছে নাকি জোর করে বের করানো হচ্ছে আপনার নাম দিয়ে?

সুনীল : না জোর করে মানে, ঠিক মাঝখানে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তা আমার এক বন্ধু ভাস্কর দত্ত, সে থাকত বিদেশে মানে তিরিশ বত্রিশ বছর পরে।

অ : যাঁর স্ত্রীর নাম ভিক্টোরিয়া?

সুনীল : হ্যাঁ, যার স্ত্রীর নাম ভিক্টোরিয়া। তা ভাস্কর কিন্তু লেখক ছিল না। কোনোদিন কিছু লেখে নি। কিন্তু আমাদের সঙ্গে থাকত, খুব ভালোবাসত। ও হঠাৎ কেন কৃত্তিবাস বন্ধ হবে, কেন বন্ধ হবে—ওর পছন্দ নয় তখন ও প্রদীপচন্দ্র বসুকে ধরে সে বিলেত থেকে ফোন করে করে, আসতো মাঝে মাঝে, তা ফোন করে করে প্রদীপচন্দ্র বসুকে বলল তুমি সব ব্যবস্থা কর। সুনীলকে সম্পাদক তো রাখতেই হবে। তুমি খাটাখাটনি করবে, প্রয়োজনে ও কিছু পয়সা দেবে। তা ওর আগ্রহ দেখে আমি রাজি হয়ে গেলাম। একজন বিদেশে বসে আছে। বাংলা কবিতা পত্রিকা নিয়ে

এত আগ্রহ। ও তারপরে কৃত্তিবাস পুরস্কারের পুনঃপ্রবর্তন করল। ভাস্কর প্রতি বছর শীতকালে দু-তিন মাস এখানে বসে থাকতে লাগল। তা দু-বছর আগে হঠাৎ সে মারা গেল। তা মারা যাওয়ার পর মনে হল ওর যখন এতটা ইচ্ছে ছিল, মানুষের স্মৃতিরক্ষা আর কি করে করা যায়, সেটিকে মূল্য দেওয়া। তখন ঠিক হল 'কৃত্তিবাস' বেরোবেই। ঐ পুরস্কারটাই চালু রাখতে হবে। ভাস্করের স্ত্রী কিছু টাকা দিয়েছে আর ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা কিছু টাকা দিয়েছে। একটি ট্রাস্ট করা হয়েছে। তারথেকে পুরস্কার দেওয়া হবে এবং 'প্রতিভাস' বলে একটি পাবলিশার্স তারা সাহায্য করছে পত্রিকা বের করতে। এখন ঠিক হয়েছে বছরে দুটো সংখ্যা বের হবে। বইমেলা আর পুজো সংখ্যা। আরও একটি জিনিস করা হবে বেশ ধুমধাম করে, সেটা হচ্ছে এই জুলাই মাসে কৃত্তিবাস পত্রিকার ৫০ বছর পূর্ণ হবে। প্রথম আরম্ভ হয়েছিল ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে। এই ৫০ বছর উপলক্ষে একটা উৎসব করব। বেশ বড় করে।

অ : এখন কৃত্তিবাসের কবিতা কি আপনি দেখেন?

সুনীল : হ্যাঁ, অন্যরা একটা প্রিলিমিনারী সিলেকশন করে এবং আমাকে দেয়। আমি প্রত্যেকটা লেখা না পড়ে প্রেসে দিই না।

অ : বৌদি আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করি। প্রথমেই জানতে চাইব সম্প্রতি 'সানন্দা'য় স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায় নামে দুটি গল্প বেরিয়েছে। ওটা কি আপনার লেখা?

সুনীল : না, ওটি আমার নয়। এটা আমাকে অনেকেই জিজ্ঞেস করছে। ওটা আমার লেখা নয়। আমি কোনো গল্প লিখিনি কখনও।

অ : আপনি এমনি কোনো লেখালেখি করেন নি কখনও?

স্বাতী : না। বিয়ে করার আগে আমার লেখিকা হওয়ার ইচ্ছা ছিল। বিয়ের পর চারপাশে সব বড় বড় লোক, বিমল কর, সমরেশ বসু, তারপর সুনীলের বন্ধুবান্ধবদের দেখে লেখক হওয়ার ইচ্ছে চলে গেল।

অ : না, মানে নিজে নিজেও কখনও কিছু লেখেন না?

স্বাতী : ঐ কখনও কেউ কিছু বললে। আমি ঠাট্টা করে বলি আমার সাহিত্য হচ্ছে সুনীল বিষয় সাহিত্য। আমি কখনও ক্রিয়েটিভ কোনো লেখা লিখিনি।

সুনীল : না, কিছু ফরাসী কবিতার অনুবাদ এক সময় ও করেছিল।

স্বাতী : সে কবে। এখন ভুলেও গেছি ফরাসী ভাষা। তবে আমার যে ইচ্ছে করে না তা নয়। এই বয়সে এসে ইচ্ছে করে কিছু লিখব। মাথার মধ্যে অনেক কিছু ঘোরে কিন্তু কখনও কাগজ কলম নিয়ে বসিনি আমি। আর আমার নিজের নামে লিখতে ইচ্ছে করে না। এবং আমার নামে নাহলে কিন্তু কেউ ছাপবেও না। সুনীলের বউ সেইজন্যই তো ছাপবে।

অ : ধরুন আপনি যখন সুনীলদাকে বিয়ে করেন তখন তো আপনার নিজস্ব একটা জগৎ ছিল। সেই জগৎটা কি সুনীলদার সাথে বিয়ে হওয়ার পরে হারিয়ে গেছে মনে হয় আপনার?

স্বাতী : শোনো, আজকালকার জেনারেশনে দেখছি অন্যরকম, অবশ্য এটা আমার ভালোই লাগে। কিন্তু আমাদের জেনারেশনে নিজেদের জগৎটা হারাতেই হতো। তখনকার সেটা ছিল রীতি। আমাকেও মেনে নিতে হয়েছে। এই সুনীলের বন্ধুরাই—সুনীলের জগৎ, তবে খারাপ লেগেছে তা বলব না, আবার কোথাও কোথাও একটা দুঃখবোধ তো থেকেই যায়।

অ : মানুষ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে আপনি সবচেয়ে কাছ থেকে দেখেন। আমরা যেভাবে দেখি তারসাথে পার্থক্যটা কীরকম? মানে আমরা যেন দেখি সব সময় হাসছেন, যতই মানুষ ঘিরে ধরুক তাও বিরক্ত হন না, বাড়িতেও কি তাই নাকি কখনও কখনও খুব রেগে যান?

স্বাতী : না, ওর কিন্তু ধৈর্য্য খুব বেশি। আমার সে তুলনায় ধৈর্য্য কম। আমি অনেক লোকজন ভীড় নিতে পারি না। সুনীল সেটা খুব নিতে পারে।

আমরা ছিলাম সাধারণ ঘরে, মানে বিয়ের আগে কীরকম ছিল, একটা সংসার, বাবা, মা ভাইবোন। ধর সকালে সাড়ে ছ'টায় উঠছি, কলেজে যাচ্ছি, পরে একটা স্কুলে পড়াতাম, পড়াতে যাচ্ছি, বাড়ি এসে দুপুরবেলা খেলাম বিকেলে কোন দিন গান শিখতে, কিম্বা একটা সময় ফ্রেঞ্চ জার্মান শিখতাম এইসব করে বেড়াচ্ছি, রাতে বাড়ি ফিরে খেয়েদেয়ে সাড়ে দশটার মধ্যে শুয়ে পড়লাম, এই একটা জগৎ ছিল।

তারপর সুনীলের সাথে বিয়ে হওয়ার পরেই, আমাদের বাড়িতে মদ্যপান ব্যাপারটা ছিল না তা নয়। বাবা কখনও কখনও কোনো অনুষ্ঠানে কিছু খেলেন সেটা ঐ যাকে বলে সামাজিক একটা মদ্যপান। মদ্যপানের সেই রূপটি আমি দেখিনি তেমন করে। তারপরে ওদের তো একটা অন্য জগৎ। দুর্দান্ত জগৎ। আমি ঐ ধরনের রাত করে আড়াইটার সময় বাড়ি ফেরা, ধর আমাদের বৌ-ভাতের দুদিন পরেই ওরকম। ওর মা ছিলেন আমাকে খুব ভালোবাসতেন। মানুষটি খুব বুঝদার মানুষ, বুঝতে পারতেন আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আড়াইটার সময় কেউ বাড়ি ফিরতে পারে আমি ভাবতেই পারছি না। নানা বইটই পড়ে বেশ একটা অ্যাডভেঞ্চারস জীবন আমার কাছে ভীষণ ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছিল। আবার নিজে যখন সেই জীবনযাপন করতে গেলাম, মাঝে মাঝে সত্যি রেগে যেতাম, ভীষণ আহত হতাম। আবার তারমধ্যেই সত্যি সবাইকে নিয়ে ননদ-দেওর এদের নিয়ে সেটাও ভালো লেগেছে। দুরকমই হয় আসলে।

অ : যখন আপনি সুনীলদাকে বিয়ে করেছিলেন তখন আপনি বেশ একটা সাহসিকতার কাজ করেছিলেন বলে মনে হয় না?

সুনীল : হ্যাঁ, বিরাট ঝুঁকি নিয়েছিল।

স্বাতী : হ্যাঁ, আমার তো বাড়িতে খুব আপত্তি ছিল! ঝুঁকি নিয়েছিলাম। কিন্তু পরে অনেকে অন্যরকমভাবে। আমি একটা মজার গল্প বলি—আমরা একদিন, ও আমি কয়েকজন মিলে নন্দনের চত্বরে ঘুরছি। এমন সময় একটা ছেলে এসে বলল, 'বৌদি বৌদি আপনাকে কয়েকটি বিশেষ কথা বলার আছে'। আমি বললাম বল। তা ছেলেটি বলল, 'আপনার মনে হয় না সুনীলদা যদি আজকে বিয়ে করত তাহলে আপনাকে বিয়ে করত না'। আমি বললাম তার মানে? বলল, 'আপনার চেয়ে অনেক সুন্দরী এবং গুণী একজনকে বিয়ে করতেন।

সুনীল : ও একটা বাজে ছেলে ছিল।

স্বাতী : তখন ও খুব রেগে গিয়েছিল। আমি একদম চুপ। কারণ আমি যখন বিয়ে করি তখন সবাই আমাকে বলেছিল তুমি ওকে বিয়ে কর না। কারণ তখন ও খুব একটা কুখ্যাত লোক ছিল। কুখ্যাত মানে ঐ অর্থে বলছি, কবি হিসেবে ওর খুব একটা অন্যরকম নাম ছিল। পাত্র হিসাবে ওর খুব সুনাম ছিল না। ন্যাচারালি বাবা-মা তো ভাববে না ওরকম ধরনের একজন দুর্দান্ত যুবক ভয় পাবে না। তাই তো।

সুনীল : তাছাড়া বেকার!

অ : বৌদি সারাদিন বাড়িতে কী করেন?

স্বাতী : ব্যস্ত থাকি নানা কাজে। কেউ না কেউ আসে। কিম্বা ফোন আসে। সুনীলদারই ফোন—তার উত্তর দিতে।

সুনীল : তোমারও আসে অনেক ফোন।

অ : নাটক-টাটক তো করেন?

স্বাতী : করি, কিন্তু নিয়মিত নয়। শখে করি যেমন গত বছর কেতকী কুশারী ডাইসন খুব করে ধরেছিলেন বলে করলাম। বেশ খানিকটা সময় দিয়েছিলাম। এ বছর যেমন আবার কিছু করছি না।

অ : সমাজ সেবাটেবার সাথে যুক্ত নন কোনোভাবে?

স্বাতী : আছি বিভিন্ন সংস্থায়। তবে প্রধান যেটা সেটা এতদূরে মানে বনগাঁয়। সে নিয়মিত যাওয়া হয় না।

সুনীল : বনগাঁয় একটা 'পথের পাঁচালী সেবা সমিতি' আছে। ওটা গ্রামের মেয়েদের নিয়ে কাজ করে তার সাথে বৌদি খানিকটা যুক্ত, আমিও যুক্ত।

অ : একটা প্রশ্ন মাঝে মাঝে যখন আমার খুব মন খারাপ হয় তখন আপনার কিছু বিশেষ লেখা পড়লে মন ভালো লাগে। কিন্তু মনে হয় আপনার সাথে দেখা করতে পারলে দুটো কথা বলতে পারলে ভালো হত। সেটা কি সম্ভব?

সুনীল : হ্যাঁ, তুমি কলকাতায় গেলে যে কোনো রবিবার সকালে আমার সাথে দেখা করতে পার। অন্যদিন আমি তো সাধারণত সকালেই লিখি। সকাল ৯টা থেকে ১টা আমার লেখার সময়। তবুও লোকজন এসে যায়। তবে রবিবার সকালটা যদি আমি কলকাতায় থাকি, ফ্রী রাখার চেষ্টা করি। ঐ সময় যে কেউ আমার সাথে দেখা করতে পারে।

অ : আপনারা প্রত্যেক শনি রবিবার বোধ হয় শান্তিনিকেতন আসেন, না?

সুনীল : না, না, মাসে একবার চেষ্টা করি।

অ : শান্তিনিকেতন এখনও ভালো লাগে?

সুনীল : আমাদের কাছে শান্তিনিকেতন মানে শুধু শান্তিনিকেতন নয়—শান্তিনিকেতন থেকে বাইরে আমাদের একটা ছোটখাটো বাড়ি আছে সেখানে নিরিবিলিতে থাকা যায় আর কি। কানে কোনো আওয়াজ আসে না, যন্ত্রের আওয়াজ আসে না। গাড়ি ঘোড়ার শব্দ পাওয়া যায় না।

অ : এখন আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা নিশ্চয়ই ধর্ম নিয়ে মাতামাতি এবং তারফলে নানান অশান্তি। ধর্ম বিষয়ে আপনার 'ভিউ' আমরা জানি যে, যার যা ধর্ম তাকে তা নিয়েই থাকতে দেওয়া, অথবা মাতামাতি না করা। এই বিশ্বাস বা বোধটা আপনার মধ্যে কী করে এল?

সুনীল : অল্প বয়স থেকেই আমাদের বাড়িতেও ধর্ম নিয়ে খুব একটা মাতামাতি ছিল না। যদিও ব্রাহ্মণদের বাড়ি। আমার বই পড়ে বা যে কোনো কারণেই হোক আমার কোনো ধর্ম বিশ্বাস জন্মায় নি। ভক্তি জন্মায়নি। আমি কিন্তু গান শুনতে ভালোবাসি। কীর্তন-কীর্তন আমি শুনতে ভালোবাসি। ভক্তিগীতিও আমার বেশ ভালো লাগে। ধর্ম একটা বিশ্বাসের ব্যাপার কিন্তু আমার নেই ওটা বুঝেছো। কিন্তু সেজন্য লোকেরা কেউ যদি কোনো বিশ্বাস নিয়ে থাকতে চায় তো থাকুন না কেন। কিন্তু সেটাকে বাইরে এনে আমার বিশ্বাসটা তোমার বিশ্বাসের চেয়ে ভালো, আমার ধর্ম তোমার ধর্মের থেকে ভালো এই বলে মারামারি, কাটাকাটি করা—এটা আমার মতে বর্বরতা। আমি ভেবেছিলাম মানুষ এই বর্বরতার ঊর্ধ্বে উঠে যাবে। কিন্তু কি দুঃখের বিষয় সেটা তো হলোই না, বরঞ্চ বেড়ে যাচ্ছে দেখছি। সব কিছুর মধ্যেই কিন্তু একটা স্বার্থ আছে, সঙ্কীর্ণতা আছে, ক্ষমতা দখলের চেষ্টা আছে, লোভ আছে। এই যারা ধর্ম নিয়ে খুব চেঁচামেচি করে তারা মানুষ হিসেবে কি ভালো? অনেকেই দেখা যাবে মানুষ হিসেবে ভীষণ খারাপ। লোককে ঠকায়, মিথ্যে কথা বলে। কাজেই এটা দুঃখের কথা। আমি ভেবেছিলাম মানুষ এ হবে—মানুষকে তো সবাই 'র‍্যাসনাল অ্যানিম্যাল' বলে মনে যুক্তিবাদী প্রাণী। অন্য প্রাণী থেকে মানুষের তফাৎ হচ্ছে মানুষ যুক্তি দিয়ে চলে। কিন্তু এরমধ্যে কোন যুক্তি নেই তো। এই ধর্মান্ধতার মধ্যে কোনও যুক্তি নেই। কত রকমের কুসংস্কার এখনও রয়ে গেছে—হাত দেখা, জ্যোতিষ, অমুক-অমুক/...

অ : কিন্তু আমি আপনার মায়ের লেখাতে পড়েছি যখন আপনার বাবা চলে যান সেই সময় হিন্দু ধর্মের যেসব নিয়মকানুন আছে সেগুলো সবই নিষ্ঠাব সঙ্গে পালন করেছিলেন। সেটা কি শুধু মাকে খুশি করার জন্যে?

সুনীল : নিশ্চয়ই। মাকে খুশি করাই তখন সবচেয়ে বড়। ময়ের তখন বয়স বেশি নয়। বাবা যখন চলে যান মা খুব একটা অসহায় বোধ করতেন। এইসময় আমি মা যাতে আঘাত না পান

সেইজন্য সবই মেনেছিলাম। মাথা ন্যাড়া করা থেকে আরম্ভ করে সব। কিন্তু মা যখন চলে গেলেন তখন আমি এগুলো করিনি। কারণ, তখন তো কাউকে আঘাত দেওয়ার প্রশ্ন নেই। আর আমার বিশ্বাস নেই আমি কেন করতে যাব?

অ : বাংলা ভাষাকে নিয়ে ইদানীং যেসব হচ্ছে অনেকে বলেন হুজুগ—

সুনীল : তা হুজুগ হলেই বা মন্দ কি। একটা কিছু তো হচ্ছে কিছু না হওয়ার থেকে। আরেকটা কি জানো তো অনেকে আছে, আমাদের বাঙালীদের স্বভাব নিজেরা কিছু করবে না কিন্তু অন্যেরা কেউ কিছু করলেই তার সমালোচনা করবে। সেই জন্যই অনেকে বলছে হুজুগ। ওসব করে কিছু হবে না। দেখা যাক কতদূর কি হয়।

অ : এবার কিছু ব্যক্তিগত প্রশ্ন আপনাদের ছেলে কোথায় থাকেন? কি করেন?

সুনীল : ও ইঞ্জিনিয়ার। বোস্টনে থাকে।

অ : ওনার স্ত্রী?

সুনীল : হ্যাঁ, ও জিওগ্রাফী পড়ে ওখানে কম্পিউটার ম্যাপিং করে।

অ : আমি আপনার খুব 'ফ্যান' বলে এই প্রশ্নটার উত্তর দিতে হয় যে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা ভাষা নিয়ে এত আন্দোলন করেন তা ওনার ছেলে কেন বাইরে থাকে?

সুনীল : এটা তো ছেলের সিদ্ধান্ত। আমার সিদ্ধান্ত নয়।

অ : মানে উনি কি বাংলা মাধ্যম স্কুলে পড়েছেন?

সুনীল : না।

অ : সেটা তো নিশ্চয় আপনার সিদ্ধান্ত ছিল।

সুনীল : আসলে ব্যাপারটা কি হল, আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম ওকে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে পড়াব। ওখানে তো বাংলা ভালো শেখায়। তো নরেন্দ্রপুরে ক্লাস সিক্সের আগে নেয় না। তা ক্লাস সিক্সের আগে কি করবে তখন ওকে ডন বস্কো স্কুলে দেওয়া হল। তো ক্লাস সিক্সে যখন ওকে নরেন্দ্রপুর ট্রান্সফার করার কথা ভাবলাম ততদিনে ওর একটা ব্যক্তিত্ব গ্রো করে গেছে। ওখানে কিছু বন্ধুটন্ধু হয়েছে। বলল, না আমি অন্য স্কুলে যাব না। কিন্তু আমার ছেলে বাংলা জানে। বই পড়ে। ও বাংলায় ছাড়া চিঠি লেখে না।

স্বাতী : তবু ঠিকই, ভালো বাংলা জানে না। পরে আমাদের মনে হয়েছে, তখন তো আর কিছু করার নেই। তা একবার বেলারুশ গিয়ে একটা ভ্রমণ কাহিনীর মতো করে বেশ হিউমার দিয়ে একটা লেখা লিখেছিল। কিন্তু সে ইংরেজিতে। বাংলার থেকে ইংরেজিতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য। আমার বৌমা তো ও দেশেই মানুষ। পপলু মানে আমার ছেলে ওকে কিছু কিছু বাংলা লেখা পড়ে শোনায়। আমার বৌমাও বেশ লজ্জা করে যে ও বাংলা জানে না। কিন্তু সুনীল বাংলা নিয়ে এসব তো আগে করেনি, বাংলায় লিখত এই পর্যন্ত।

অ : হ্যাঁ, অনেকেই বলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা নিয়ে কথা বলেন আর নিজের ছেলে...

স্বাতী : হ্যাঁ, এই 'স্টেটসম্যান', 'টেলিগ্রাফ' অনেকে জায়গাতেই ওকে ঠাট্টা করে লিখেছে যে, নিজের ছেলেকে বিদেশে পাঠিয়ে দিয়ে এখন আবার বাংলা নিয়ে এইসব করছে টরছে। এটা ঠিকই আমাদের ছেলে বিদেশে থাকে। তাই বলে ও এটা লড়বে না তাও তো ঠিক নয়। এটা ওর নিজস্ব সিদ্ধান্ত। তাছাড়া ১৬ বছর বয়স হয়ে গেলে ছেলেমেয়ের ওপরে তো আর বাবা-মায়ের জোর থাকে না।

অ : ছেলে আপনাদের কাছে থাকে না এজন্য আপনাদের একা লাগে না?

স্বাতী : আমার একা লাগে। বিয়ের পর ওদের সাথে তো সেভাবে কখনও থাকি নি। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে। বিদেশে গিয়ে থেকেছি ঠিকই। কিন্তু মেনে নিতে হয়। আজকাল তো অনেক

বাবামাকেই মেনে নিতে হয়। খোঁজখবর নেয় বাবার শরীর খারাপ হলে বা আমার শরীর খারাপ হলে। কিন্তু করার তো কিছু নেই। আর একদিন এরকম হবে ওরা থাকবে কিন্তু আমরা চলে যাব।

অ : সুনীলদা আপনার একা লাগে না?

সুনীল : একা লাগে না, তবে ওদের কথা মনে পড়ে মাঝে মাঝেই।

স্বাতী : ওর অবশ্য একা লাগার অবকাশ নেই।

সুনীল : আর আরেকটা কথা হচ্ছে আজকাল প্রায়ই দেখা হচ্ছে। স্বাতীও গিয়ে গিয়ে থেকেছে ওদের সঙ্গে। বছরের পর বছর দেখা হচ্ছে না তা তো নয়।

৩৪

'একটা পাহাড় কিনতে চেয়েছিলাম'

ওদেশ

একবার আমি জেলে যেতে বসেছিলাম। সেবারে আমি চেকোশ্লোভাকিয়াতে। তখন তো চেকোশ্লোভাকিয়া বলে একটা দেশ ছিল, এখন ভেঙে গেছে। একটি সরকারি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ওখানে গিয়েছিলাম আমি। ছ জনের দল। আট-দশ দিনের প্রোগ্রাম। সঙ্গে ইনটারপ্রেটর ছিল।

তখনও দেশটার অবস্থা বেশ খারাপ। নানারকম আন্দোলন চলছে দেশে—ভাঙবে ভাঙবে অবস্থা, কম্যুনিস্ট রাজত্ব শেষ হবে হবে করছে। খুব টালমাটাল অবস্থা—কারুর কোনও কাজে মন নেই। যেহেতু আমাদের সরকারি প্রোগ্রাম, ওদেরও সরকারি আতিথ্য, অতএব—ওই এটা ওটা দেখেটেকে সকলেই এবার ফেরার তোড়জোড় করছে। ওদের লোকজনও বিশেষ নেই কাছেপিঠে। শেষ দিনে আমাদেব একটা হোটেলে পৌঁছে দিল ওরা। বলল—'আগামীকাল তোমরা নিজেদের মতো চলে যেও'। দলের বাকি পাঁচ জন ঠিক করেছিল তখন থেকেই ভারতে ফিরে আসবে। আমি মনে মনে ভাবলাম আর একটা কোথাও একটু ঘুরে যাই—অবশ্যই নিজের খরচায়। তখন আমাদের সঙ্গে টার্কির তেমন কোনও যোগাযোগ ছিল না। তবুও আমার ইতিহাস ভালো লাগে—টার্কিটাই মাথায় ঘুরতে লাগল। ভাবলাম পাশেই ইস্তানবুল—গেলে কেমন হয়।

তাই করলাম। সবার দুপুরে ফ্লাইট, আমার ভোরবেলা, তাই আগের দিন সবাইকে বিদায় জানালাম।

কিন্তু ওই সময় ওদেশে একটা অদ্ভুত নিয়ম ছিল। পাসপোর্টটা জমা রেখে যেতে হবে। ফেরার সময় আবার পাসপোর্ট ফেরত দেবে। আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার ছিল—কম্যুনিস্ট দেশগুলোর পাসপোর্টের সঙ্গে ভিসা দিত না। তার মানে ওখানে যে গেছি তার কোনও প্রমাণ থাকত না। একটা আলাদা ফর্ম থাকত, তাতে ছবি থাকত। ফেরার সময় ওটা ছিঁড়ে ফেলে দিত। যাই হোক সে কাগজ জোগাড় হল। আমি সেই কাগজ নিয়ে ট্যাক্সি করে এয়ারপোর্টে গেলাম। কাউন্টারে এক মহিলা এসব দেখছিলেন। আমার কাগজ-পাসপোর্টও তিনি দেখলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কি তোমার পাসপোর্ট?'

আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম, দেখি অন্য একজনের ছবি, এ তো অন্য একজনের পাসপোর্ট। বুঝলাম এ এক মহা ঝামেলা শুরু হচ্ছে। ভদ্রমহিলা পরিষ্কার বললেন, 'দ্যাখো, আমার দুটো অলটারনেটিভ আছে, এক, তোমাকে এক্ষুনি জেলে দেওয়া। কারণ তোমার কাগজপত্র জাল। অথবা তোমাকে ছেড়ে দেওয়া—তুমি সোজা প্লেনে উঠে পড়বে। কিন্তু তাতেও লাভ নেই—ওদেশেও তোমাকে ঢুকতে দেবে না, তোমার পাসপোর্ট ভুয়ো—তুমি কী করবে বলো'।

আমি তো হাঁ—কী বলব। কিছুই বুঝতে পারছি না। তখন উনি বললেন—'আর একটা কাজ করতে পারো—হোটেলে ফিরে গিয়ে ঠিকঠাক পাসপোর্ট নিয়ে এসো—তাহলে হতে পারে।'

এদিকে আর আছে মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট। এই সময়ে কিছুই সম্ভব নয়। আবার ওই প্লেনে

যদি না উঠি তাহলেও বিপদ, কারণ এর পরের প্লেন পাঁচদিন পর, ওই পাঁচ দিন আমি চালাব কী করে। এছাড়া পাঁচ দিন ভিসাহীন অবস্থায় কাটালেও জেলে যেতে হতে পারে। মহাসংকটে পড়লাম।

কী করব ভাবছি, হঠাৎ দেখি একজন ভদ্রমহিলা আসছেন, আমার চেনা, তিনি আমাদের দলের গাইড—ইনটারপ্রেটর হিসেবে এ ক-দিন ছিলেন। এখন তাঁর ডিউটি শেষ হয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি এখানে কী করছ'। উনি বললেন, 'আর একটা দল আসছে, তাদের নিয়ে আমাকে এবারে যেতে হবে—'। এই মহিলাকে আমরা মোটেই পছন্দ করতাম না। কেমন যেন খিটখিটে স্বভাব, সব সময় আমাদের সঙ্গে মতের অমিল হত—কিন্তু এই মুহূর্তে ওকে দেখে মনে হল স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন আমার সামনে। আমি তাঁকেই সব কিছু খুলে বললাম।

ইনি শুনে মাথা নেড়ে বললেন, 'তুমি বিরাট ভুল করেছ, কেন পাসপোর্ট হাত ছাড়া করেছ, কেন দেখে নাওনি—ইত্যাদি।' আমিও আপ্রাণ বোঝালাম, 'আমার কী দোষ, গোলমাল তো ওরাই পাকিয়েছে, আমাকেও বিপদে ফেলেছে, এটা আসলে যার—তাঁকেও বিপদে ফেলেছে।' উনি বললেন, 'তুমি ওদের কড়া করে বকে দাও'। আমি বললাম, 'বকব কী, কথা বোঝে না—আনতাবড়ি ইয়েস—নো করছে—'। তখন ভদ্রমহিলার আসল চেহারা বেরোল। ইমিগ্রেশন-এর লোকজনকে কড়া ভাষায় তুলোধোনা শুরু হল— 'তোমাদের একটা দায়িত্ব নেই, তোমরা কোনও কাজের নও, লোকের বিপদে—।' 'যাও এক্ষুনি এটা নিয়ে গিয়ে ঠিক পাসপোর্ট নিয়ে এসো'। কথায় কাজ হল, হাবভাব দেখে মনে হল ওরা রাজি হয়েছে।

কিন্তু আমার দুশ্চিন্তা গেল না, সময় বেরিয়ে যাচ্ছে হু হু করে। মনে হল খবর পাঠিয়েছে ওরা কিন্তু কাজ হবে কী করে? আমি দাঁড়িয়ে আছি বোকার মতো, একের পর এক ট্যাক্সি আসছে, যাচ্ছে। সব চেয়ে বড়ো কথা ট্যাক্সিওয়ালা আমাকে চিনবে কী করে?

দাঁড়িয়ে আছি তো আছি—এমন সময় দেখি একটা ট্যাক্সি আসছে, ড্রাইভার জানলা দিয়ে হাত বার করে রেখেছে—তাতে একটা পাসপোর্ট ধরা। আরে ওটা তো আমার। দৌড়ে গিয়ে নিলাম সেটা, ভুল পাসপোর্টটা ফেরত দিলাম। ফিরে এসে মহিলাকে দেখাতে তিনি বললেন—'খুব জোর বেঁচে গেছ—এটা না হলে আমাদের জেলে পচতে হত তোমাকে, আমাদের জেল মোটেই ভালো না—।'

এরপর ইস্তানবুল যাওয়া নিয়ে আর কোনও গোলমাল হয়নি—কিন্তু সে তো অন্য গল্প।

এদেশ

আমাদের যখন বয়স কম ছিল তখন দেশেই আমরা খুব ঘুরতাম। বিদেশ যাওয়া খুব শক্ত ছিল। প্রথমত সরকার দিত মাত্র পাঁচ ডলার। খুব অনিশ্চিত ব্যাপার, কোথাও থামতে হলে, দরকার পড়লে ও দিয়ে কিছুই হত না। তাই দেশেই ঘুরতাম। পকেটে পয়সা ছিল না। তাই খুব সস্তার জায়গায় থেকেছি, গাছতলাতেও থেকেছি। গরমকালে রেলস্টেশনেও থেকেছি—তখন আমরা ছাত্র। আমাদের বেড়ানোটা এভাবেই আরম্ভ হয়েছিল।

বিনাটিকিটেও ট্রাভেল করেছি— 'অরণ্যের দিনরাত্রি' বইতেও এটা আছে। কী করব বেড়াতে ইচ্ছে করছে খুব, কিন্তু টিকিটের পয়সা নেই। অনেক বাংলোয় বুকিং ছাড়া, এমনি গিয়ে হাজির হয়েছি। মিথ্যে কথা বলতে হয়েছে—এই আমরা একে চিনি ওকে চিনি—এসব আর কী। একবার একটা বাংলোর চৌকিদার বলল 'রিজার্ভেশন স্লিপ কোথায়?' এদিকে ট্রেনে আসার সময় চেকারকে বলা হয়েছিল, 'পয়সা নেই—পাঁচজন আছি দুজনের টিকিটের দাম দিতে পারব।' তার হয়তো দয়া হয়েছিল—সে আমাদের তাই করে দিল—ছাপানো কাগজে রিসিট লিখে দিল। আমরা সেই স্লিপ

চৌকিদারকে দেখালাম—ময়লামতো খয়েরি রঙের কাগজ। সে তো আর পড়তে লিখতে জানে না—আমাদের ঘর খুলে দিল।

আমরা বেড়াতাম অনেকে। শক্তি চট্টোপাধ্যায় ছিল। খুব ঘুরত শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায়। তারপর ছিলেন ইন্দ্রনাথ মজুমদার—তিনি লিখতেন না। কলেজ স্ট্রিটের 'সুবর্ণরেখা'র মালিক। 'এক্ষণ' পত্রিকা বার করতেন।

এদিকে বিকেলবেলা ফরেস্টের লোক এসে হাজির হল। তখন আমাদের মাথাব্যথা যাতে ওই চৌকিদারের কোনও শাস্তি না হয়। আমরা স্বীকার করলাম—'দেখুন ওর কোনও দোষ নেই, আমরাই মিথ্যে কথা বলেছি—ইত্যাদি।' আমরা চেষ্টা করতাম কোথায় বাংলো আছে খুঁজে বার করার, জঙ্গলের মধ্যে ফাঁকা জায়গায়—যেখানে সরকারি অফিসার ছাড়া কেউ বিশেষ আসত না। এই যেমন ধরো কাঁকড়াঝোড়—এখন তো অনেকে জেনে গেছে। আমাদের সময়ে কেউ জানত না, সঙ্গে করে খাবার দাবার নিয়ে যেতে হত, তেমন রাস্তাও ছিল না।

একবার এখান থেকে ঘুরে এসে বোধহয় লিখেছিলাম। শক্তি-ও তখন একটা সিরিজ লিখছে। বেড়ানোর। লিখেছিল কাঁকড়াঝোড়ের কথা, পরে একবার যাবার চেষ্টা করে শুনলাম রিজার্ভেশন ফুল হয়ে গেছে। বুকিং অফিসার বললেন, 'লিখে লিখে আপনারা এমন করেছেন সে এখন ওই লেখা হাতে নিয়ে লোক আসে'।

হেসাডিতে একবার খুব মজা হয়েছিল। ওখানে তখন বাস-টাস চলত না। ওই ট্রাক ধরে যাওয়া আসা করতে হত। একবার আমাকে বোধহয় একা ফিরতে হবে—দেখি রোড-রোলার আসছে। হাত দেখাতে বলল, 'চলো, যাবে তো চলো।' তাতে চড়েই চলে গেলাম—কী করব।

পয়সা ছিল না বলেই এসব করতাম, অনেক সময় রিস্ক নিয়ে করতে হত। এমনও হত—কোথাও গেছি, পয়সা ফুরিয়ে গেছে, ফিরতে হলে ধার করতে হবে। কিন্তু ধার শোধ করব কী করে? তাই বলে খাওয়া-দাওয়া খামতি হত না, খাব না কেন?

আমাদের মধ্যে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় ছিল—সে ঘুরত ঠিকই কিন্তু অতটা নয়। ওর একটা ব্যাপার ছিল। যেটা আমরা গিয়েছিলাম—গল্প করেছিলাম—সেটা না গিয়েই ও লিখে ফেলত, 'অরণ্যের দিনরাত্রি'তে যারা ছিলাম, তাদের মধ্যে সন্দীপন ছিল না। শক্তি খুব বেশি যেত, আমার চেয়েও অনেক বেশি। ও এমন একটা কাজ করত যেটা আমরা পারতাম না। কোথাও গেল, গিয়ে রয়ে গেল। আমার তবু একটা বাড়ির প্রতি টান বা দায়িত্ব—কিছু একটা ছিল। কিন্তু শক্তি একেবারে বেপরোয়া ছিল। আমাদের আর এক বন্ধু ছিল—সমীর রায়চৌধুরী—সে লিখেছে পরে। চাকরি করত চাইবাসায়। আমাদের সঙ্গে কলেজ সূত্রে পরিচয়। কফি হাউসে আড্ডা মারা হত—সেখানে চাইবাসা নিয়ে অনেক কিছু বলত—'চাইবাসার মতো জায়গা হয় না—'। একবার ও যাচ্ছে, শক্তি বলল—'চল তোকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসি।' বলে নিজেই ট্রেনে উঠে পড়ল। আর ফিরলই না। মাসের পর মাস কেটে যাচ্ছে—শক্তি ফিরছে না। আমাদের চিন্তা হচ্ছে—কে যেন বলল ওকে জেলে রেখে দিয়েছে। তা জেলে যদি রাখে তাহলে তো আমাদের দায়িত্ব ওকে উদ্ধার করা। সন্দীপন আর আমি ভাবলাম জেলে তো ভালো খাবার পাওয়া যায় না—তাই কাজুবাদাম-টাদাম-সিগারেট এসব নিয়ে গেলাম। কোথায় আছে না আছে কিছুই জানি না। সমীর রায়চৌধুরী কোথায় থাকে তাকে তাও জানি না। চাইবাসা পৌঁছে আমরা একটা ডাকবাংলোয় উঠে পড়লাম। খোঁজখবর করলাম সারাদিন—গভর্মেন্টের আপিসে, সন্ধেবেলা কী করি—সন্দীপন আর আমি হাঁটছি। শুনলাম একটু দূরে ঝোড়ো নামে একটি নদী আছে—ওখানটাই ঘুরে আসি। সন্ধেবেলা—একটু আধটু রবীন্দ্রসংগীত গাইছি হাঁটতে হাঁটতে, হঠাৎ পাশের একটা বাড়ি থেকে একটা গলা ভেসে এল, 'অ্যায় এখানে কে রবীন্দ্রসংগীত গায়?'

দেখি শক্তি, সে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে সেই বাড়িতে—মেয়ে পরিবৃত হয়ে। তারা ন-টি বোন। বিভিন্ন বয়সের। এই ষোলো সতেরো থেকে পঁচিশ-ছাব্বিশ। সেইখানে শক্তি দেখলাম দিব্যি আছে।

শুনলাম ওই বাড়ির একটি মেয়ের সঙ্গে সমীর রায়চৌধুরীর বিয়ের কথাবার্তা হয়েছে। ওই হিসেবে বাকি মেয়েরা হয়ে গেল তার শ্যালিকা—অতএব তাদের সঙ্গে বন্ধুর প্রেম করতে কোনও আপত্তি নেই, শক্তি সেই ভূমিকায় রয়েছে।

শুধু তাই নয়, এরপর তো আমরা সমীর রায়চৌধুরীর বাড়ি চলে গেলাম, কিন্তু ওই বাড়িতে আমাদের কেউ নিয়ে গেল না। আলাপও করিয়ে দিল না, পাত্তাও দিল না। সকালবেলা উঠে শক্তি নিজেই চলে যায়, আমরা বসে থাকি। মনের দুঃখে হাঁড়িয়া খাই, কী করব। এবারে একটা নীললোহিত লিখেছি—সেটা আবার অন্য রকম করে, জানি না কী হবে। ম্যাজিক রিয়ালিজম হয়—সেটাকে ব্যবহার করেছি। একই লোক, একই সঙ্গে কি দু জায়গায় থাকতে পারে? একবার সে রয়েছে দুর্গাপুরে আবার একই সঙ্গে সে রয়েছে হিমাচল প্রদেশের একটা পাহাড়ি রাস্তায় দুটোই একসঙ্গে। এর মধ্যে একটা স্বপ্ন—এখন কোনটা স্বপ্ন, কোনটা বাস্তব—সেটাই দেখার।

আমার নিজের যে বেড়ানো তারও দুটো দিক আছে। দু রকমই ভালো লাগে। এই একবার ইউরোপ ঘুরে ফিরে আসার পর মনে হল—যাই সাঁওতাল পরগনাটা দেখে আসি, ওটারও একটা ভয়ানক আকর্ষণ আছে। এখন নানারকম গোলমাল হয় কিন্তু তখন তো ওসব ছিল না।

একবার গিয়ে দেখি ওখানে একটা পাহাড় নিলাম হচ্ছে। সত্যি একটা পাহাড়। তিন হাজার টাকায় একটা আস্ত পাহাড় পাওয়া যাচ্ছে। খুব শখ হয়েছিল একটা পাহাড় কিনব। কিন্তু আমার কাছে সে টাকা কই। কেনা হয়নি। এইসব নানারকম শখ হত, সেটা সত্যি কোনোদিনই হয়ে ওঠেনি।

তবে ফ্র্যাঙ্কলি একটা কথা স্বীকার করা উচিত, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তো একটা শারীরিক পরিবর্তন হয়। আগে যেটা পারতাম—গাছতলায় শুয়ে থাকা—আমি, শক্তি, ইন্দ্রনাথ—আজ কি আর পারব? একবার তো সকাল হতেই গাছতলায় গ্রামের লোক এসে ঘিরে ধরল। এই মারে কী সেই মারে। কারণ—সেটা উনিশশো পঁয়ষট্টি সাল। ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধ চলছে। তখন গুজব রটে গিয়েছিল যে—ছত্রিবাহিনী বলে একটা ব্যাপার, পাকিস্তানি প্লেন থেকে নেমে ছড়িয়ে পড়ছে সব জায়গায়। অতএব গাছতলায় আমাদের ঘুমোতে দেখে তারা ভাবল—এরা নিশ্চয়ই আকাশ থেকে পড়েছে, অতএব তারা মারবে আমাদের, একবার মারলে যাকে বলে মব্ ফ্রেনজি হয়ে যাবে। একবার শুরু করলে তো আর থামত না। দয়া করে আমাদের থানায় নিয়ে গেল। আমরা বাংলা জানি—অমুক তমুক বলে কোনও রকমে ছাড়া পেলাম। যাই হোক, এসব কি আর এখন পারব?